দামোদর গ্রন্থাবলী।

প্রথম খণ্ড।

হিতবাদীর ইলেক্ট্রিক যন্ত্রে
শ্রীঅন্নদা চরণ ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত।

১৩১২ সাল
৭ই আশ্বিন

সূচীপত্র।

প্রথম খণ্ড।

পরম পূজার্হ

৺রামরতন মুখোপাধ্যায়

পিতৃ-দেবের

স্বর্গীয় চরণোদ্দেশে

এই গ্রন্থ

গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক

উৎসর্গীকৃত

হইল।

—*—

"পথি চ্যুতং তিষ্ঠতি দিষ্ট-রক্ষিতং
গৃহে স্থিতং তদ্বিহতং বিনশ্যতি।
জীবত্যনাথোঽপি তদীক্ষিতে বনে।
গৃহেঽভিগুপ্তোঽস্য হতো ন জীবতি"

—শ্রীমদ্ভাগবতম্।

মা ও মেয়ে।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

---*---

দুর্গোৎসবের পূর্ব্বে ষষ্ঠীর দিন বেলা চারিটার সময় শরৎকুমারী তাহার জননী সুলোচনাকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"মা! বাবা কখন আসিবেন?"

সুলোচনা কন্যার বিশৃঙ্খল কেশরাশি সুবিন্যস্ত করিয়া দিয়া কহিলেন,—

"সন্ধ্যার পর। কেন, তুমি কি জান না, তিনি প্রতি বৎসর পূজার আগে ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যার পর বাটী আইসেন। এবারেও সেই সময় আসিবেন।"

বালিকা হাসিতে হাসিতে বলিল,—

"বাবা আমার জন্য কি কাপড় আনিবেন মা? পাড়ার সকলেই নূতন কাপড় পরিয়াছে?"

"তোমারও সন্ধ্যার পর তাঁহার সঙ্গে ভাল কাপড় আসিবে। তুমিও কালি প্রাতে কাপড় পরিয়া ঠাকুর দেখিতে যাইবে।"

বালিকা হাসিতে হাসিতে অন্য বিষয়ে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিল; সুলোচনা ভাবিতে লাগিলেন, 'সন্ধ্যার তো আর বিলম্ব নাই। তিনি ক্লান্ত হইয়া আসিতেছেন, আমি তাঁহার আহারের উদ্যোগ করিয়া রাখি।'

সুলোচনার স্বামীর নাম উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উমাচরণ কলিকাতায় একটী আফিসে কর্ম্ম করেন; মাসিক পঁচিশটি টাকা মাত্র বেতন পান কায়ক্লেশে স্বীয় বাসা-খরচ নির্ব্বাহ করিয়া, উমাচরণ প্রতিমাসে প্রায় পোনরটী টাকা সুলোচনার নিকট পাঠাইয়া দেন। সুলোচনা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তিনি সেই টাকা কয়টীতে আপনাদের খরচ চালাইয়া, মাসে মাসে ২৲ ৩৲ টাকা সঞ্চয় করিয়া রাখেন এবং তদ্দ্বারা সময়ে সময়ে কন্যা শরৎকুমারীর দুই একখানি অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দেন। এ সংসারে সুলোচনার স্বামী ভিন্ন আর কেহই নাই। নিতান্ত বাল্যকাল হইতেই সুলোচনা পিতৃমাতৃহীনা।

সুলোচনা সুন্দরীর শিরোমণি। তাঁহার বয়স পঞ্চবিংশ বর্ষ। তাঁহার পরিণত দেহ সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যে ঢল্ ঢল্ করিতেছে। দারিদ্র্য বা দৈহিক শ্রম তাঁহার অপার আনন্দ নষ্ট করিতে পারে নাই; সুতরাং তদ্ধেতু তাঁহার সৌন্দর্য্যও অপচিত হয় নাই; বরং চিত্তের অযথা প্রসন্নতা হেতু তাঁহার সৌন্দর্য্য আরও সমুজ্জ্বল হইয়া বিভাসিত হইতেছে। তাঁহার চিত্ত-প্রসাদের দুইটী বলবৎ কারণ ছিল। প্রথমতঃ তিনি দরিদ্রের কন্যা এবং দুরবস্থায় পালিতা ও

বৰ্দ্ধিতা, সুতরাং দারিদ্র্য তাঁহার অনভ্যস্ত নহে, অথবা তাঁহার পক্ষে বিশেষ ক্লেশজনক নহে। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার স্বামীর অপরিমেয় প্রেম। সেই অতুলনীয় প্রেমরাশি তাঁহার হৃদয়কে নিয়ত এমনই মাতাইয়া রাখিত যে, তুচ্ছ সাংসারিক চিন্তা সে পবিত্র চিত্তে স্থান পাইত না! আমরা এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া সুলোচনাকে অনেক রাজরাণীর অপেক্ষা সুখশালিনী ও সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করি। তাঁহার স্বামী রূপবান, জ্ঞানবান্ এবং বিদ্বান্। তাহার পর মানুষ মানুষকে যতদূর ভালবাসিতে পারে তিনি সুলোচনাকে ততদূরই ভালবাসিয়া থাকেন। তবে আর এ জগতে সুলোচনার চাই কি? সুলোচনা, স্বামীর সন্তোষ ও সুখই এক মাত্র ব্রত জানিয়া, পরমানন্দে জীবন পাত করিতেছেন।

শরৎকুমারী উমাচরণ ও সুলোচনার একমাত্র তনয়া। এক্ষণে তাহার বয়স আট বৎসর। বালিকার দেহ নিরুপম শ্রীতে পূর্ণ। তাহার বর্ণ চম্পকের ন্যায়; দেহের গঠন সুগোল ও সুকুমার; রাশি রাশি ঘন কৃষ্ণ কেশকলাপে পৃষ্ঠদেশ সমাবৃত; নেত্রদ্বয় বিশাল উজ্জ্বল ও স্থির। সুলোচনা, গৃহকর্ম্ম সমাপ্তির পর, অবকাশ-কালে, যত্ন সহকারে শরৎকুমারীকে লেখা পড়া শিখাইতেন। বুদ্ধিমতী শরৎকুমারী, এই অল্প বয়সে যতদূর শিখিতে পারা যায়, তাহা শিক্ষা করিয়াছে।

সুলোচনা উমাচরণের নিমিত্ত আহারাদির উদ্যোগ করিয়া রাখিলেন। তাহার পর তাঁহার সুখশান্তির নিমিত্ত যাহা যাহা প্রয়োজন হইতে পারে, সে সমস্তই ঠিক করিয়া রাখিলেন। তাহার পর সানন্দে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল; উমাচরণ আসিলেন না। শরৎকুমারী ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসিল,—

"কই মা, বাবা এখনও আসিলেন না তো?"

সুলোচনার মনের ব্যাকুলতা শরৎকুমারীর অপেক্ষা অনেক অধিক; তথাপি তিনি আত্ম-ব্যাকুলতা গোপন করিয়া বলিলেন,—

"হয়ত গাড়ি পান নাই বলিয়া আসিতেছেন না, নয়ত এখনও কাজ মিটে নাই। যাহাই হউক, আসিবেন এখনই।"

তখনই বাহিরের দ্বারে আঘাত শব্দ হই[illegible] এবং মানবকণ্ঠ-নিঃসৃত শব্দ উঠিল। সুলোচনা ব্যস্ততা সহ বাহিরে আসিলেন, শরৎকুমারীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিল। এ[illegible] জন লোক ডাকিয়া বলিল,—

"মা ঠাকুরাণি! দরজা খোল, বা[illegible] আসিয়াছেন।"

সুলোচনা ব্যস্ততা সহ দরজা খুলিলেন তাঁহার পশ্চাতে শরৎকুমারী। দরজা খুলিয়[illegible] দেখিলেন, একখানি পাল্কীর মধ্যে উমাচর[illegible] শয়ান। তিনি উত্থান-শক্তি বিরহিত। সুলো[illegible] চনাকে দেখিবা মাত্র উমাচরণ বলিলেন,—

"বড় পীড়া—আমাকে ঘরে লইয়া চল।"

শরৎকুমারী এই কথা শুনিয়া কাঁদি[illegible] উঠিল। সুলোচনা পাল্কীর মধ্যে হস্তদ্বয় দি[illegible] উমাচরণকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। উমাচর[illegible] উঠিয়া বসিলেন, তাহার পর সুলোচনা একজ[illegible] বাহককে উমাচরণের এক দিকের বাহু ধরি[illegible] বলিলেন এবং শরৎকুমারীকে পাল্কীর মধ্য[illegible] অন্যান্য সামগ্রী লইয়া আসিতে বলিলে[illegible] উমাচরণকে শয্যায় শয়ন করাইলে[illegible] উমাচরণ ব্যাগের চাবি সুলোচনাকে দিলে[illegible] সুলোচনা তন্মধ্য হইতে টাকা পয়সা বাহি[illegible] করিয়া, বাহকদিগকে দিয়া বিদায় করিলেন

তাহার পর তিনি বাষ্পাকুল লোচনে স্বামীর পদদ্বয় ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন এবং শরৎকুমারী পিতার মস্তক সমীপে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

সুলোচনা স্বামীর মুখে পীড়ার বৃত্তান্ত শুনিয়া বুঝিলেন যে, অদ্য রাত্রেই চিকিৎসা আরম্ভ হওয়া আবশ্যক। গ্রামে একজন মাত্র ডাক্তারের বাস। তাঁহার নাম রামচরণ ডাক্তার রামচরণ ডাক্তার চিকিৎসাবিদ্যা কখন অভ্যাস করেন নাই তিনি ইংরাজি ভাষায় Second Book of Reading পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; বাঙ্গালাতেও দুই এক খানা বটতলা অঞ্চলের অপূর্ব্ব গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তদনুযায়ী বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এই সকল মহাকার্য্য সাধিত করিয়া রামচরণ ডাক্তার আপনাকে একজন প্রকৃত প্রস্তাবে কৃতবিদ্য বলিয়া স্থির করিয়া লইলেন এবং অন্য কোনরূপ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে করিলেন না। যখন জীবিকা নির্ব্বাহার্থ অর্থোপার্জ্জন করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল, তখন রামচরণ, চিকিৎসা ব্যবসায়কে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ মনে করিয়া, তাহাই অবলম্বন করিতে সংকল্প করিলেন। চিকিৎসা কার্য্যে তিনি যে সক্ষম, তাহা মীমাংসা করিবার কতকগুলি হেতু ছিল। অর্থের প্রয়োজনীয়তা যখন তাঁহাকে নিতান্ত বিব্রত করিয়া তুলিল, তখন রামচরণ চাকরির চেষ্টায় কলিকাতায় আসিলেন। কলিকাতায় আসিয়া রামচরণ যাহাদের বাসায় অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। রামচরণ দেখিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই বাসায় আসিয়া মড়ার হাড় লইয়া নাড়াচাড়া করে। যখন বাসায় কেহ না থাকিত, তখন রামচরণ হৃদয়কে বলবান্ করিয়া, ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করিয়া, দুই এক দিন ঐ সকল অস্থিরাশিতে নির্ব্বিঘ্নে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। তাহার পর মীমাংসা করিলেন, "এই তো ডাক্তারি, ইহাতে আর ভয় কি?" রামচরণ স্থির করিলেন ডাক্তারি ব্যবসায়ই ভাল। অতএব ডাক্তারি করাই রামচরণের মত হইল। তাহার পর ছাত্রবর্গকে ডাক্তারি সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ২।৪টি ঔষধের নাম ইত্যাদি লিখিয়া লইলেন এবং একখানি বাঙ্গালা প্রেস্কৃপসন্-বুক সঙ্গে লইয়া রামচরণ ডাক্তার রূপনগরে আসিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। রূপনগরে রামচরণ অল্পদিনেই বিলক্ষণ পসার জমাইয়া লইলেন। যে রোগী রামচণের হাতে পড়িয়াও জীবন লাভ করিত, রামচরণ বুক বাজাইয়া বলিতেন,—"এরোগ কি সারে?—আমার যেই অনেক শিক্ষা—অনেক সন্ধান, তাই বাঁচাইতে পারা গেল।" যেটী মরে, রামচরণ তাহার সম্বন্ধে বলেন,—"উহার যে ব্যাধি হইয়াছিল তাহা অসাধ্য, একথা আমাদের ফারমাকোপিয়ায় স্পষ্ট লেখা আছে। সেই দিনই মরিত, আমি যাই তাই তিন দিন রাখিয়াছিলাম।" অধিকাংশ রোগীই রামচরণের প্রসাদাৎ অকালে ভব-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিত। কিন্তু রামচরণের বিদ্যা বুদ্ধি যেমন হউক, তাঁহার পসার প্রতিপত্তি যথেষ্ট। তিনি রূপনগর বঙ্গবিদ্যালয়ের সম্পাদক, ট্যাক্সের কর্ত্তা, চৌকিদারগণের মা বাপ, সেন্সসের সুপারভাইজর, ইত্যাদি ইত্যাদি। রামচরণ জানিতেন যে, ডাক্তার হইলেই এক একটু সুরাপান করা আবশ্যক। ফলতঃ এই বিদ্যাই যদি ডাক্তারির পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে রামচরণকে কম ডাক্তার বলা যায় না; কারণ রামচরণ, প্রগাঢ় সাধনা হেতু, এ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা

লাভ করিয়াছিলেন। সেই রামচরণ ডাক্তার ভিন্ন রূপনগরের আর গতি নাই। সুলোচনা সেই রাত্রেই রামচরণ ডাক্তারকে ডাকা স্থির করিলেন। কিন্তু গোলের কথা—কে সে রাত্রে রামচরণ ডাক্তারকে ডাকিতে যায়। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সুলোচনা একখানি পত্র লিখিলেন। লিখিলেন,—

"মহাশয়,

আমার বড় কঠিন পীড়া হইয়াছে। অতএব অদ্য রাত্রেই মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই পত্রবাহকের সহিত আমার বাটীতে আসিবেন। বিলম্ব হইলে অনিষ্ট হইতে পারে; অতএব দয়া করিয়া রাত্রেই আসিবেন। ইতি।

অনুগত

শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।"

তাহার পর একজন প্রতিবেশী ইতর লোককে ডাকিয়া, অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, তাহার দ্বারা যথাস্থানে পত্র প্রেরণ করিলেন। সুলোচনাকে পল্লীস্থ সকলেই বড় ভালবাসে। সুলোচনার অবস্থা মন্দ বটে, তথাপি তিনি দীন দরিদ্র প্রতিবেশিগণকে, কখনও বা অন্নের দ্বারা, কখন বা একখানি জীর্ণ বস্ত্রের দ্বারা, কখন বা দুই একটী পয়সার দ্বারা, নিয়তই সাহায্য করিয়া থাকেন। সুতরাং পার্শ্বস্থ দরিদ্রগণ তাঁহাকে বড় ভালবাসে এবং সকলেই তাঁহাকে অতি আত্মীয় বলিয়া মনে করে। যাহারা অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন লোক, সুলোচনা তাহাদের বিপদে বা সম্পদে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, তাহাদের জন্য শারীরিক শ্রম করিয়া এবং সততই সকলের সহিত মিষ্ট কথা কহিয়া ও নিয়ত সকলের কল্যাণ ও হিতান্বেষণ করিয়া সকলেরই বিশেষ অনুগ্রহ ও সমাদরের পাত্র হইয়াছিলেন।

সুলোচনা সে রাত্রে আর কাহাকেও তাঁহার বিপদের কথা জানাইলেন না। ভাবিলেন, এক্ষণে সকলকে সংবাদ দেওয়া অপেক্ষা যথাসম্ভব চিকিৎসার আয়োজন করাই সৎপরামর্শ। সুলোচনা, পত্রবাহককে বিদায় করিয়া, আবার স্বামীর পদ-প্রান্তে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, উমাচরণ এক একটী সম্বন্ধ-শূন্য, অর্থ-রহিত বাক্য বলিতেছেন। সুলোচনা বিশেষ করিয়া ধীরে ধীরে স্বামীকে তাঁহার বর্ত্তমান অসুখের কথা জিজ্ঞাসিলেন; কিন্তু কোনই সদুত্তর পাইলেন না। শরৎকুমারী পিতার এবংবিধ অবস্থা দেখিয়া, 'বাবা! বাবা! বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।' সুলোচনা তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন,—

"ভয় কি! এখনই ডাক্তার আসিয়া সকল রোগ ভাল করিয়া দিবে। ভয় কি?"

সুলোচনা অতি কষ্টে আত্ম-হৃদয়ের যৎপরোনাস্তি যাতনা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া দুহিতাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের তদানীন্তন অবস্থা কে বুঝিবে?

ক্রমে রাত্রি ১১টা বাজিয়া গেল। সুলোচনা রামচরণ ডাক্তারের জন্য ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। ডাক্তার হয়ত আসিবেন না ভাবিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি যখন এতাদৃশী অবস্থায় পীড়িতের অপেক্ষা বহুগুণে যাতনা ভোগ করিতেছেন সেই সময়ে বাহিরের দ্বারে পদাঘাত শব্দ হইল। তিনি বেগে সেই দিকে ধাবিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—

"কে?"

উত্তর হইল,—

"মা ঠাকুরাণি, ডাক্তার বাবু আসিয়াছেন।"

সুলোচনা দৌড়িয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া

দলেন। গ্রামের মধ্যে যাঁহারা পরমাত্মীয় কেবল তাঁহারাই সুলোচনার মুখ দেখিতে পাইয়াছেন; তদ্ভিন্ন আর কেহ কখন তাঁহাকে দেখে নাই, বা তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহে নাই। কিন্তু অদ্য সুলোচনা যে বিপদে পতিত, তাহাতে তিনি যাহা কখন করেন নাই, তাহাও তাঁহাকে করিতে হইল। তিনি রামচরণ ডাক্তারকে 'আসুন' বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। রামচরণ ডাক্তারের সহিত একজন ভৃত্য লণ্ঠন ধরিয়া আসিয়াছিল। রামচরণ বাটীর ভিতর অন্ধকার দেখিয়া লণ্ঠন-বাহককে সেই দিকে লণ্ঠন আনিতে আদেশ করিলেন। লণ্ঠন আসিলে তাহার আলোকে রামচরণ একবার সুলোচনার বদনের প্রতি নেত্রপাত করিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে সে পাশবনয়ন আর সেদিক হইতে ফিরিতে চাহিল না। রামচরণ কি করিতে আসিয়াছেন, কোথায় বা আসিয়াছেন, সকলই ভুলিয়া গেলেন। সুলোচনার ভুবনমোহিনী মাধুরী তখন তাঁহার চিত্তকে এককালে মোহিত করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি সেই স্থলে সেই লাবাণ্যময়ীর বদনের প্রতি চাহিয়া সমভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর সুলোচনা বলিলেন,—

"মহাশয়, আমার স্বামী—বোধ করি, তাঁহার সহিত আপনার পরিচয় আছে, আজি বড় পীড়িত হইয়া কলিকাতা হইতে বাটী আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্তই মহাশয়কে ডাকা হইয়াছে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে দেখিয়া যাহাতে তিনি শীঘ্র সারিয়া উঠেন, তাহার উপায় করিয়া আমাদের সকলকে প্রাণদান করুন।"

রামচরণ ডাক্তার একটু সুরাপান করিয়াছেন, মস্তিষ্ক স্বাধীন ছিল না; সুতরাং কথাবার্ত্তার গ্রন্থি ছিল না। বলিলেন,—

"তা—হাঁ—তা—চল! তুমি ভাব কিসের? তোমার আবার ভাবনা? চল চল।"

লণ্ঠন-বাহক ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত লণ্ঠন লইয়া চলিল। তাহার পরে, অগ্রে সুলোচনা পশ্চাতে ডাক্তার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ঘরের ভিতর একটী ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছিল, সুলোচনা তাহা উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। ডাক্তার রোগীর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সুলোচনার কমনীয় কান্তি সন্দর্শনে নিবিষ্ট রহিলেন। তখন রোগী একবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সুলোচনা ব্যস্ততাসহ রোগীর শয্যা-সমীপস্থ হইয়া ডাক্তারকে রোগীর অবস্থা দেখিতে অনুরোধ করিলেন। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"ইহাঁর কি ব্যারাম হইয়াছে?"

সুলোচনা বলিলেন,—

"কি হইয়াছে আপনি দেখুন।"

এই বলিয়া সুলোচনা যেমন যেমন শুনিয়াছিলেন ও এখন যেমন যেমন দেখিতেছেন, সমস্তই বলিলেন। ডাক্তার সে সকল কথার একটীতেও কর্ণপাত করেন নাই! তিনি অনিমিষ নয়নে সুন্দরীর মুখপানে চাহিয়াছিলেন এবং তদ্গত চিত্তে তাঁহার মনোহর ভঙ্গী সন্দর্শন করিতেছিলেন। সুলোচনার কথা সমাপ্ত হইল—তথাপি ডাক্তার রোগীর প্রতি মনোনিবেশ করিলেন না। তখন সুলোচনা তাঁহাকে রোগীর অবস্থা পরীক্ষা ও উপযুক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবার জন্য পুনরায় অনুরোধ করিলেন। ডাক্তার একটু হাসিয়া বলিলেন,—

"তাহার জন্য চিন্তা কি? তুমি বলিলে মরিতে পারি। রোগী দেখিতে হইবে? কই দেখি—উমাচরণ, আমাকে হাত দেও।"

কিন্তু উমাচরণ বাবু তো অজ্ঞান; হাত দিবে কে? রামচরণ সুলোচনাকে বলিলেন,—

"তোমার হাত দেখি।"

সুলোচনা বলিলেন,—

"সে কি কথা? আমার হাতে কি দেখিবেন?"

রামচরণ হাসিয়া বলিলেন,—

"তাতে দোষ কি? স্বামী স্ত্রীতে একই। তোমার হাতে কত কি আছে।"

রামচরণ সুলোচনার গম্ভীর ও কাতর বদনের প্রতি চাহিলেন। চিন্তায় এবং ডাক্তারের এবংবিধ বিসদৃশ ব্যবহারে সুলোচনা বড়ই কাতর হইলেন। কিন্তু কি করেন, তখন আর উপায়ান্তর নাই; তখন সেই ডাক্তারের হস্তেই তাঁহার জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি নির্ভর করিতেছে। তিনি, সেই জন্যই সমস্ত অসদ্ব্যবহার উপেক্ষা করিয়া স্বামীর সন্নিহিত হইলেন ও তাঁহার হস্তোত্তোলন করিয়া ধরিলেন এবং ডাক্তারকে দেখিতে বলিলেন। তখন সেই নর-কুল-গ্লানি রামচরণ, রোগীর হস্তে হস্তার্পণ না করিয়া, সুলোচনার সেই নবনীত-বিনিন্দিত কোমল বাহুলতা ধারণ করিলেন। তখন সেই ব্যথিতা, অপমানিতা, উৎকণ্ঠিতা, সাধ্বী, সজোরে স্বীয় হস্ত ঐ পাষণ্ডের হস্তনির্ম্মুক্ত করিয়া, কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া, অধোবদনে দাঁড়াইলেন।

হায়! এ সংসারে মানবের মনোবৃত্তির কি বিভিন্নতা! একজন যে কারণে ঘোর চিন্তায় আকুল, আর একজন সেই কারণেই, স্বীয় ঘৃণিত মনোবৃত্তি সাধনের বিশেষ অনুকূল বোধে, তাহারই জন্য সচেষ্টিত। ইহারা উভয়েই কি মনুষ্য? মনুষ্য-সমাজ এতাদৃশ বিভিন্ন প্রকৃতিক ব্যক্তিদ্বয়কে যদি একই নামে সম্বোধন করিতে পারে, তবে শৃগাল, ভল্লুক, সর্প প্রভৃতি জীবেরাও মনুষ্য নহে কেন? বরং মনুষ্য-পদ-বাচ্য হইতে তাহাদের অধিকতর অধিকার; কারণ তাহারা অপেক্ষাকৃত নিরপরাধ। তাহারা যাহা করে তাহার শুভাশুভ বা হিতাহিত চিন্তার ক্ষমতা তাহাদের নাই। কিন্তু আমি, তুমি, বা রামচরণ, বা দস্যু, বা হত্যাকারী যাহা করি বা করে, তাহার ফলাফল, পরিণাম সকলই আমরা জানি ও বুঝি। তথাপি আমরা যদি অযোগ্য কার্য্য হইতে নিরস্ত না হই, তাহা হইলে অবশ্যই আমরা শৃগাল, ভল্লুক, সর্প, প্রভৃতি জীবাপেক্ষা নিকৃষ্টতর জীব, তাহার সন্দেহ নাই।

রামচরণ সুলোচনার বিরক্তি দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন,—

"কি বলিলে? কখন হইতে পীড়া হইয়াছে?"

সুলোচনা আবার সমস্ত কথা বলিলেন। রামচরণ কোন্ রোগের সন্দেহে কোন্ কোন্ লক্ষণ বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিতে হয়, তাহার কিছুই জানিতেন না। সুতরাং একবার হাত দেখিয়া, একবার রোগীর কপালে হাত দিয়া এবং একবার পেট টিপিয়া যাহা হয় একটা সিদ্ধান্ত করিলেন। স্থির করিলেন, রোগীকে কল্যই 'ক্যাষ্টর অয়েল' দেওয়া আবশ্যক। তিনি মনে মনে হয়ত অন্য প্রকার ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন এবং সুলোচনাকে অভয় দিয়া বলিলেন,—

"আমি এখনই ঔষধ পাঠাইয়া দিতেছি। এই ঔষধ অদ্য শেষরাত্রে রোগীকে খাওয়াইয়া দিবে। বেলা ৮ টার সময় রোগী প্রায় সারিয়া যাইবে। আমি আবার সেই সময়ে আসিয়া আবশ্যক মত ব্যবস্থা করিয়া দিব।"

সুলোচনা সানন্দে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। তাহার পর রামচরণ ডাক্তার বলিলেন,—

"তোমার কোন ভয় নাই। আমি আবার কালি সকালে আসিব, এক্ষণে বিদায় হই।"

অগ্য আর অধিক বাড়াবাড়ি করা রামচরণ ডাক্তার যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। এই জন্যই উঠিবার উদ্যোগ করিলেন। তিনি উঠিয়া বাহিরে আসিলে সুলোচনা তাঁহার হস্তে একটী টাকা দিয়া বলিলেন,—

"কালি আসিতে ভুলিবেন না। যাহাতে উনি ত্বরায় ভাল হইয়া উঠেন তাহার উপায় করিবেন।"

রামচরণ টাকাটী সুলোচনাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন,—

"তোমার নিকট হইতে টাকা লইব? ছি! তোমার একটা কথার দাম লক্ষ টাকা! আবার টাকা কি?"

সুলোচনা অধোবদনে বলিলেন,—

"আপনি আমার সহিত ওরূপ কথা কহিতেছেন কেন? আমরা গরিব, কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের ঘৃণা করিবেন না।"

রামচরণ বলিলেন,—

"তুমি গরিব? তুমি যদি গরিব, তবে ধনী কে? আমরা তোমার চরণ সেবা করিতে পাইলেও জন্ম সার্থক মনে করি।"

সুলোচনা কথা কহিলেন না। সুলোচনা কেবল দায়ে পড়িয়াই তাহাকে পদাঘাতে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারিলেন না। তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে রামচরণ ডাক্তার লণ্ঠন-বাহকের সহিত প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন,—

"আমি এখনই নিজের লোক দিয়া ঔষধ পাঠাইয়া দিতেছি।"

রামচরণ ডাক্তার চলিয়া গেলে সুলোচনা দরজা বন্ধ করিয়া গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শরৎকুমারী মাতার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসিল,—

"মা! তুমি যে বলিয়াছিলে, ডাক্তার আসিলেই বাবা সারিয়া উঠিবেন। তা ডাক্তার তো চলিয়া গেলেন, কই, বাবা তো এখনও সারিলেন না?"

সুলোচনা কন্যার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "বাছা! মানুষের সহায় ঈশ্বর। মানুষ যাহা না পারে ঈশ্বর তাহা অনায়াসেই পারেন। তুমি এক মনে ঈশ্বরকে ডাক, তিনিই ভাল করিয়া দিবেন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

সমস্ত রাত্রি সুলোচনা ও শরৎকুমারী রোগীর পার্শ্বে বসিয়া কাটাইলেন। বার বার সুলোচনা শরৎকুমারীকে ঘুমাইতে বলিলেন। পিতৃ-গত-প্রাণা বালিকা ঘুমাইবে কিরূপে? সে অক্লান্ত ভাবে পিতার মস্তক সমীপে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। যথাসময়ে রোগীকে ডাক্তারের ঔষধ সেবন করাইয়া দেওয়া হইল।

প্রাতে সুলোচনা পল্লীস্থ সকলের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। সে পল্লীতে অনেক গুলি সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাস। প্রবীণা স্ত্রীলোকেরা এবং অভিজ্ঞ বৃদ্ধেরা একে একে উমাচরণের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুরুষগণের মধ্যে কেহ বা শাস্ত্র-ব্যবসায়ী, কেহ বা যাজক কেহ বা অধ্যাপক, কেহ বা বাঙ্গালা মুহুরী, কেহ বা ব্যবসাদার। তাঁহারা কেহই চিকিৎসাবিদ্যার কিছুই বুঝিতেন না। গ্রাম সম্পর্কে তাঁহারা কেহ বা সুলোচনার খুড় শ্বশুর, কেহ বা জ্যেঠশ্বশুর, কেহ বা ভাসুর হইতেন।

সুলোচনা সমবেত স্ত্রীগণের দ্বারা পুরুষগণকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। তাঁহারা সকলে রোগীর অবস্থা দেখিয়া ও সমস্ত কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ নানারূপ জল্পনা করিলেন, কিন্তু কোনই বিশেষ মীমাংসা করিতে পারিলেন না। যাঁহার যাঁহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তাঁহারা সকলে প্রস্থান করিলেন; অপর সকলে রামচরণ বাবুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে রামচরণ ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা ৮টা।

ডাক্তার রোগীকে দেখিয়া বলিলেন, রোগীর অবস্থা অদ্য অনেক ভাল। বস্তুতঃ উমাচরণ অদ্য আর অজ্ঞান নহেন, এবং ক্ষণে ক্ষণে প্রলাপ বলিতেছেন না। তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল ও শয্যা হইতে উঠিতে অক্ষম বটেন, তথাপি তাঁহাকে আশু দেখিলে অপেক্ষাকৃত সুস্থ বলিয়াই বোধ হয়। রামচরণ রোগীকে দেখিতে দেখিতে এক এক বার সুলোচনার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু অদ্য তাঁহার সুলোচনাকে গত রাত্রের ন্যায় কোনরূপ রসিকতার কথা বলিবার সুযোগ হইল না। কারণ, অদ্য সেই ক্ষুদ্র ঘরে অনেক লোক। রামচরণ, পাপ লোকগুলা যায় না কেন বলিয়া, মনে মনে তাহাদিগকে বিস্তর গালি দিতে লাগিলেন এবং তাহাদের এবংবিধ আত্মীয়তায় যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইতে লাগিলেন। যদি লোকগুলা ত্বরায় চলিয়া যায় ভাবিয়া, রামচরণ ডাক্তার নানা প্রসঙ্গে অনেক বিলম্ব করিতে লাগিলেন

কতক লোক, আর অপেক্ষা করিবার আবশ্যকতা নাই বুঝিয়া, চলিয়া গেল! কতক লোক, বিশেষ কোন কাজ না থাকায়, বসিয়া রহিল। রামচরণ ডাক্তার রোগীর সম্বন্ধে নানারূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং অদ্য পুনরায় ঔষধ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। রোগী রামচরণকে নানা প্রকার শিষ্টাচার দ্বারা তুষ্ট করিলেন, রামচরণও তাঁহার সহিত নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিলেন। পাঁচ রকমে অনেকই বিলম্ব হইল, কিন্তু তবুও হতভাগিনী প্রতিবেশিনীরা মরিতে লাগিল। তাহাদের কি বাড়ী ঘর নাই? তাহাদের কি মরিবার আর স্থান নাই? রামচরণ যখন বুঝিলেন যে, পাড়ার সর্ব্বনাশীরা এই খানেই মরিবে, তখন অগত্যা ক্ষুণ্ণ মনে সুলোচনার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া প্রস্থান করিলেন। রামচরণ ডাক্তার গমন করার পর একে একে পল্লীবাসিনী আত্মীয়ারাও চলিয়া গেলেন।

সুলোচনা স্বামীর পথ্যের আয়োজন করিতে গেলেন। শরৎকুমারী পিতার নিকট বসিয়া রহিল। উমাচরণ তখন ক্ষীণ স্বরে বলিলেন—

"পাগ্‌লি! কোথায় আছিস্?"

শরৎকুমারী বলিল,—

"কি বাবা, আমি তোমার কাছেই আছি?

উমাচরণ সস্নেহে কন্যার হস্তে স্বীয় হস্তার্পণ করিলেন। শরৎকুমারী বলিল,—

"বাবা, কালি তুমি অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলে, কথা কহিতে পার নাই, তোমার বড়ই কষ্ট হয়েছিল,—নয় বাবা?"

উমাচরণ বলিলেন,—

"আমার জন্য কি তোমার কালি বড়ই ভাবনা হইয়াছিল?"

শরৎ, কথার দ্বারা ইহার কোন উত্তর দিতে পারিল না। কিন্তু তাহার নয়ন হইতে দুই ফোটা অশ্রু উমাচরণের হস্তে আসিয়া পড়িল। উমাচরণ বলিলেন,—

"ভয় কি, ভাবনা কি? চিরদিন তো কেহ বাঁচে না। আমার কঠিন ব্যারাম হইয়াছে,

আমি যদি মরিয়া যাই, তাহার জন্য তুমি কাঁদিবে কেন? কাঁদিলে তো মরা মানুষ ফেরে না।”

শরৎকুমারীর চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল এবং সে রোদন-বিজড়িত স্বরে বলিল,—

“বাবা, বাবা, তুমি ও কথা বলিও না। তোমাকে ছাড়িয়া কে থাকিতে পারে?”

উমাচরণ আবার বলিলেন,—

“কেন শরৎ, লোকের মা বাপ কখন কি চিরদিন থাকে? আমারও বাপ মা ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহারা কেহই নাই।”

শরৎকুমারী বলিল,—

“বাবা, লোকের কথা বলিও না। লোকের যাহা হয় হউক, আমার বাবা চিরদিনই থাকিবেন।”

এই সময়ে ডাক্তারের প্রেরিত ঔষধ আসিয়া পৌছিল। সুলোচনা ঔষধ হস্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি কন্যাকে কাঁদিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

“ওকি, কাঁদিতেছ কেন?”

শরৎ উত্তর দিল না।

উমাচরণ বলিলেন,—

“সংসারে সকলেরই বাবা মরে বটে, কিন্তু শরৎ উহার বাবাকে মরিতে দিতে চায় না।”

সুলোচনা বলিলেন,—

“ভালই তো। আমর মেয়ে কি না; আমার বিশ্বাস ঈশ্বরই দরিদ্রের সহায়। তিনি দয়াসিন্ধু—তিনি সকলের বাসনাই সফল করেন।”

কথা সমাপ্তির পর সুলোচনা সিসি হইতে ঔষধ ঢালিয়া উমাচরণের নিকট লইয়া গেলেন। উমাচরণ ঔষধ খাইয়া বলিলেন,—

“ঈশ্বরই সকলের সহায় সত্য। কিন্তু মৃত্যু তো ঈশ্বরেরই বিধি। ঈশ্বরের বিধি কখনই অন্যথা হয় না। অতএব মৃত্যুর নিমিত্ত সকলেরই প্রস্তুত থাকা উচিত।”

সুলোচনা বলিলেন,—

“মৃত্যু হইবে জানিয়া সংসার শুদ্ধ লোক নিশ্চিন্ত থাকুক, কিন্তু আমি মৃত্যু হইবে না জানিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিব।

উমাচরণের বদনে হাসি আসিল, বলিলেন,—

“কথাটি শরৎকুমারীর জননীর মতই হইয়াছে বটে।”

সুলোচনা বলিলেন,—

“কেন? তুমি কি আমাকে সংসারের সকল লোকের সহিত সমান বলিয়া মনে কর? আমি কিসে লোকের সহিত সমান? এ জগতে কাহার স্বামী আমার স্বামীর ন্যায় গুণবান্ ও সচ্চরিত্র? কাহার স্বামী স্ত্রীকে এমন করিয়া ভাল বাসে? কোন্ স্বামী আপন সামান্য অবস্থা উপেক্ষা করিয়া পরিবার মধ্যে এমন সুখের রাজ্য বিস্তার করিয়া থাকিতে পারে? সংসারের কোন্ রাজরাণীর সুখ আমার সুখের সমান? সংসারের কাহার সহিত আমার তুলনা শোভা পায়? যাহার প্রতি বিধাতা এত সদয়, যাহার সুখ-সৌভাগ্য অতুলনীয়, সংসারের সাধারণ নিয়ম তাহার পক্ষে কখনই খাটিবে না। তুমি আমাকে সংসারের নিয়মানুসারে প্রস্তুত থাকিতে বলিও না। আমি সে নিয়মের অধীন নহি। আমি জানি, আমার সংসারের স্বতন্ত্র নিয়ম আছে।”

এই বলিয়া সেই পতি-প্রেম-গর্ব্বিতা কামিনী-কুল-কমলিনী সুলোচনা স্বামীর ললাটে যে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম বহিতেছিল, তাহা অঞ্চল দ্বারা মুছাইয়া দিলেন। উমাচরণ কোন উত্তর করিলেন না। সেই অতুলনীয় প্রেম-

প্রবাহ যেন সেইরূপ উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তারিত করিতে করিতে চিরদিন প্রবাহিত হইতে পারে বলিয়া, তিনি ঈশ্বর-সমীপে মনে মনে প্রার্থনা করিলেন। সংসারের বিপদ-বাত্যায় বা কালের কঠোর আক্রমণে সেই রমণীর সুখের প্রাসাদ বিচূর্ণিত হইয়া না যায় বলিয়া, তিনি কামনা করিলেন। তাঁহার নয়ন-প্রান্তে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল।

দুই ঘণ্টা অন্তর এক একবার ঔষধ খাওয়াইবার আদেশ ছিল। সুলোচনা ঠিক নিয়ম মত ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

রোগীর এরূপ অবস্থা অধিক কাল থাকিল না। একটা অভিনব উপসর্গ আসিয়া জুটিল। প্রথমে বিন্দু বিন্দু করিয়া কপালে, পরে সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম-প্রবাহ বহিতে লাগিল। এই উপসর্গে উমাচরণ নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দেহ বরফের ন্যায় শীতল হইয়া উঠিল। সুলোচনা প্রতিবেশিগণকে ব্যস্ততা সহ এই বিপদের কথা জানাইয়া আসিলেন। দুই একজন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা দেখিতে আসিলেন। তাঁহারা দেখিয়া বুঝিলেন যে, ইহা নিতান্ত কুলক্ষণ। তখনই ডাক্তারকে ডাকিতে পাঠান হইল। বেলা ১২ টার সময় ডাক্তার বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন প্রবীণ প্রতিবেশী অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং রোগীর অবস্থা বিশেষ সাবধানতা সহকারে দেখিতে অনুরোধ করিলেন। রামচরণ রোগীকে দেখিয়া বলিলেন,—

"বাঃ! ইনি তো ভালই আছেন। তবে আর কি? কল্য প্রাতে দেখিয়া ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিব।"

এই বলিয়া রামচরণ সুলোচনার দিকে নেত্রপাত করিলেন। দেখিলেন, সুলোচনা চেতনাহীন পুত্তলীর ন্যায় স্বামীর অর্দ্ধমুকুলিত নয়ন ও স্থির বদনের প্রতি চাহিয়া আছেন;

রামচরণ বলিলেন,—

"উমাচরণ বাবু তো সারিয়া গেলেন, কিন্তু তুমি এখনও কাতর কেন?"

সুলোচনা কোন উত্তর দিলেন না। তিনি এরূপ ঘটনা ও এতাদৃশ অবস্থা আরও দুই এক রোগীর প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের যে পরিণাম ঘটিয়াছিল, তাহাও তিনি জানিতেন। সেই জন্যই তিনি কোন উত্তর দিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, আমার কিসের ভয়? মনুষ্য প্রাণে যতটুকু সহে ততটুকু সহিত। তাহার পর উপায় তো আমার হাত।

রামচরণ ডাক্তার সুলোচনার সহিত কোনরূপ প্রকাশ্য কথাবার্ত্তা হওয়া অসম্ভব দেখিয়া ভাবিলেন, নয়নে নয়নে দুই একটা মনের কথা সারিয়া লওয়া যাউক। এই ভাবিয়া আত্মনয়নকে তদুদ্দেশে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে নয়নের সহিত এ নয়নের একবারও সাক্ষাৎ হইল না। অনেক চেষ্টাতেও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, রামচরণ ডাক্তার অগত্যা বাহিরে আসিলেন। তথায় দীননাথ চট্টোপাধ্যায় নামক একজন প্রবীণ প্রতিবেশী তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"কেমন দেখিলেন?"

রামচরণ বলিলেন,—

"বেশ। শরীর উত্তম শীতল। জ্বরের লেশ নাই। রোগী আরোগ্য হইয়া গিয়াছে আর কি?"

প্রতিবেশী বলিলেন,—

সেকি মহাশয়! এত ঘাম, এমন গা ঠাণ্ডা, এমন অজ্ঞান ভাব—এ সকল কি কুলক্ষণ নয়?”

রামচরণ বলিলেন,—

“কি গ্রহ! আপনি যাহা বলিতেছেন—সে বিকার—২০।২৫ দিন ভোগের পর সে সকল হইলে তাহাকে কুলক্ষণ বলা যায়। ৫ দিনের জ্বরে এ সকল লক্ষণ হইলে তাহা সুলক্ষণ, কুলক্ষণ নয়।”

দীননাথ বলিলেন,—

“আপনি ডাক্তার; অনেক দেখিয়াছেন, অনেক জানেন, সুতরাং আপনি যাহা বলিতেছেন তাহার উপর কোন কথা নাই। কিন্তু আমাদের যেন মনে হইতেছে, গতিক ভাল নয়।”

রামচরণ হাসিয়া বলিলেন,—

“ভাল দেখা যাউক, গতিক কি হয়। যদি কোন খারাপ লক্ষণ দেখ, আমাকে সংবাদ দিও। আমি রাত্রি ৮টার সময় আবার আসিব।”

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। তাহার পর সেই প্রবীণ প্রতিবেশী আবার একবার বাটীর ভিতর গমন করিলেন। রোগীর সমস্ত অবস্থা তিনি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বাহিরে আসিলেন। আসিবার সময় একজন বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী তাঁহার সঙ্গে আসিলেন,—

প্রতিবেশিনী জিজ্ঞাসিলেন,—

“কি দেখিলেন?”

চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

“বড় মন্দ। বোধ করি অগ্য রাত্রি কাটিবে না।”

প্রতিবেশিনীর নেত্র জল-ভারাকুল হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—

“এমন সোণার কার্ত্তিক, এমন মিষ্ট কথা, এমন ভাল স্বভাব মানুষের আর হবে না। মেয়েটা—বউটা, আহা! কোথায় ভাসিয়া যাইবে!”

প্রতিবেশী বলিলেন,—

“বিধাতার মনে যাহা আছে তাহাই হইবে।

তোমরা তিন চারি জন আজ সমস্ত দিন বাটী যাইও না, নিয়ত এখানেই থাকিও! আমিও আজি গৃহত্যাগ করিব না। বাটী হইতে আহার করিয়া আসিতেছি।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। সুলোচনা স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি বুদ্ধিমতী—তাঁহার বিপদের পরিমাণ কত, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত নাই। কিন্তু আশা মানুষকে প্রকৃত কথা বুঝিয়াও বুঝিতে দেয় না। আশা মধুর স্বরে সুলোচনার কর্ণে কত কথাই কহিতেছে, তাঁহার ব্যাকুল হৃদয়কে শান্ত করিতেছে, এবং তাঁহার জ্ঞানকে বিকৃত করিয়া দিতেছে। হায়! জগতে আশার আশ্বাস সময় বিশেষেও যদি সফলতা প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে মানব-কণ্ঠোত্থিত হাহাকার ধ্বনি অনেক কমিয়া যাইত সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ উমাচরণের অবস্থা মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া উমাচরণের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস সহ, ‘হা বিধাতঃ!’ বলিয়া বসিয়া পড়িলেন। উমাচরণের চরমকাল উপস্থিত হইবার যে আর বিলম্ব নাই, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না। শরৎ-

কুমারী 'বাবাগো' বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুলোচনা কখন অপর কোন পুরুষের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন না। কিন্তু অদ্য আর তাঁহার সে সঙ্কোচ নাই। তাঁহার লোচন দিয়া অবিরল ধারায় জল পড়িতেছে, কেশরাশি অবিন্যস্ত ও উচ্ছৃঙ্খল, নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ—তিনি অদ্য পাগলিনী। সুলোচনা স্বামীর শয্যা-পার্শ্ব হইতে উঠিয়া সেই প্রতিবেশীর সমীপস্থ হইলেন এবং তাঁহার পদ-নিম্নে পতিত হইয়া হস্তদ্বারা তাঁহার চরণ-যুগল বেষ্টন করিয়া বলিলেন,—

"ঠাকুর! আর কি উপায় নাই? এখন কি ঔষধ নাই? যদি কোন উপায় থাকে করুন। আমরা গরিব, আমাদের অর্থ নাই, কিন্তু চিরজীবন আমি সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া দাসী হইয়া থাকিব।"

বৃদ্ধ দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ের চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি সুলোচনাকে বলিলেন,—

"মা! উঠ। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। চেষ্টা কর, তাহার পর বিধাতার মনে যাহা আছে তাহার আর অন্যথা হইবার নহে। হা বিধাতঃ!"

সুলোচনা উঠিয়া অঞ্চলে অশ্রুমার্জ্জন করিয়া স্বামীর নিকটস্থ হইলেন। উমাচরণের অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইয়া আসিতেছে। যাঁহারা বুঝিতে পারেন, তাঁহারা এ অবস্থা দেখিলে জানিতে পারিতেন যে, আর অতি অল্পকাল উমাচরণ এজগতে থাকিবেন। উমাচরণ এখন অজ্ঞান নহেন। সময়ে সময়ে তাঁহার জ্ঞান হইতেছে। নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য ক্লেশে সম্পাদিত হইতেছে। উমাচরণ এক এক বার বেশ কথা কহিতেছেন। তখনই হয়ত গ্রন্থি-হীন, অর্থহীন কথা ব্যক্ত করিতেছেন। সুলোচনাকে কাঁদিতে দেখিয়া উমাচরণ কিয়ৎকাল নির্ব্বাক্ ভাবে সুলোচনার বদনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে কয়েক বিন্দু অশ্রু তাঁহার নয়ন বহিয়া পড়িল। তিনি কষ্টে বলিতে লাগিলেন,—

"সুলোচনা! বুঝিয়াছি এ যাত্রা আমি রক্ষা পাইব না। কিন্তু হৃদয়েশ্বরি! কাঁদ কেন? তোমার স্কন্ধে অনেক গুরু ভার পড়িতেছে। হা বিধাতঃ! বালিকা শরৎ—একটী ভাল বালকের সহিত উহার বিবাহ দিবে আর কি বলিব? আমি কিছুই তোমাদের জন্য করিলাম না। বিধাতাই ভরসা, তাঁহারই চরণে তোমাদের রাখিয়া চলিলাম।"

উমাচরণ নীরব হইলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া আবার জল পড়িতে লাগিল। সুলোচনার কি সাধ্য যে, তৎকালে অশ্রু সংবরণ করেন? সুলোচনা পাগলিনীর ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—

"নাথ! প্রাণেশ্বর! শেষে অদৃষ্টে কি এই ছিল? ভগবান, তোমার মনে কি এতই ছিল? কোন্ পাপে আমার এ শাস্তি? হৃদয়েশ, তোমাকে ছাড়িয়া তোমার দাসী এক দিনও থাকিতে পারিবে না। আমার এত কি ভাবনা—তুমি চল, আমিও তোমার সঙ্গিনী হইব।"

উমাচরণ আবার বলিয়া উঠিলেন,—

"মা কোথায়?"

তখন শরৎকুমারী 'বাবাগো, বাবাগো, শব্দে চীৎকার করিতে করিতে উমাচরণের সম্মুখে আসিয়া বসিল এবং মুমূর্ষু পিতার বদনের উপর বদন রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল,—

"বাবা, বাবা, আমাদের ছাড়িয়া তুমি কোথায় যাইবে বাবা? তোমাকে আর

দেখিতে না পাইলে প্রাণ থাকিবে কেন বাবা? ওঃ বাবা, বুক যে ফাটিয়া যায় বাবা! তোমার মত আমাদের আর যে কেউ নাই বাবা। তুমি আমাদের ফেলিয়া যাইও না বাবা, তোমার পায়ে পড়ি বাবা, তুমি আমাদের ছাড়িয়া যাইও না বাবা! ওঃ মাগো, মরি যে গো! ও মা আমার কি হইল মা!”

প্রতিবেশী প্রতিবেশিনী সকলেই উচ্চৈঃ-স্বরে কাঁদিয়া উঠিল। বাটীতে ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল। সেই বয়স্ক প্রতিবেশী আসিয়া রোরুদ্যমানা শরৎকুমারীকে ধরিয়া তুলিলেন এবং স্থানান্তরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শরৎ বলিতে লাগিল,—

“ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে আমার বাবার কাছ থেকে নিয়ে যেও না। আমি গেলে বাবা পলাইয়া যাইবেন। বাবা, বাবা, বাবাগো, তোমার কাছে আমাকে থাকিতে দেয় না যে গো!”

শরৎকুমারীর আর্ত্তনাদে মনোযোগ না করিয়া দুঃখিনী বালিকাকে সঙ্গে লইয়া প্রতি-বেশী বাহিরে আসিলেন এবং তথায় জন কয়েক স্ত্রীলোকের নিকটে তাহাকে সমর্পণ করিয়া, পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিলেন। উমা-চরণের চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। তিনি ধীরে ধীরে সুলোচনার হস্তে স্বীয় হস্ত দিয়া বলিলেন,—

‘সুলোচনে, মৃত্যু আর কিছুদিন যদি অপেক্ষা করিত, তাহা হইলে ভাল হইত। আমি তোমাদের জন্য কিছুই করিতে পারি নাই। তুমি নিরাশ্রয় নিরবলম্বন হইয়া বালিকা কন্যা লইয়া কি করিবে, কোথায় যাইবে, এ চিন্তা যখন আমার মনোমধ্যে উদিত হইতেছে, তখন আমার কি হই-তেছে কি বলিব? হা দয়াময়, হা ভগবন্! শেষে আমার এই করিলে? আমার বক্ষের ধন শরৎকুমারী, যাহার চক্ষে এক বিন্দু জল দেখিলে আমার হৃদয় ফাটিয়া যায়, আমার প্রাণের প্রাণ সুলোচনা, যাহাকে এক তিল ভুলিতে পারি না, তাহারা সকলে আজি পড়িয়া থাকিল, কিন্তু আমি আর থাকিব না। এ জগতে তাহাদের আমিই ভরসা, সকল বিপদে তাহারা জানে আমিই তাহাদের রক্ষা করিব, অভাব বা অপ্রতুল, কষ্ট বা যাতনা সকল বিষয়েই তাহারা কেবল আমাকেই আশ্রয় বলিয়া জানে, আজি তাহাদের ক্রন্দন, আর্ত্তনাদ, অনুরোধ সমুদায়ই উপেক্ষা করিয়া আমি এমন স্থানে যাইতেছি যে, সে স্থানে তাহাদের বিপদ বা সম্পদ, শোক বা সুখ কোন সংবাদই পৌঁছিবে না। কিন্তু কিছুতেই তো এ ব্যবস্থার অন্যথা হইবার নহে। জগদীশ্বর, তোমার মঙ্গলময় বাসনার অন্যথা করিতে কে পারে? যাহা তোমার বাসনা তাহাই হউক। কিন্তু প্রভো! এই প্রেম-পুত্তলী অবলা আজি নিঃসহায় অবস্থায় সংসার-সমুদ্রে পড়িতেছে; ইহার কি হইবে দেব? ওঃ ভগবন্! প্রাণ যে যায়! কিন্তু প্রাণেশ্বরী সুলোচনে আজ সর্ব্বস্বধন শরৎকুমারীকে কোথায় ভাসাইয়া চলিলাম।”

উমাচরণ নীরব হইলেন। সুলোচনা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—

“যিনি সকলের আশ্রয়, যিনি বিপন্নের ভরসা, তিনিই শরৎকুমারীকে রক্ষা করিবেন। তাহার জন্য ভাবনা কি? আর আমার কথা? যাহাকে তুমি কখন হৃদয় হইতে অন্তরিত করিতে পার না, যে তোমাকে সতত বক্ষের উপর রাখিতেই ভাল বাসে, তাহার সহিত কি বিচ্ছেদ হয়? তোমার আমার মিলন দিন, মাস, বৎসর বা যুগ দ্বারা নিরূপিত হইবার

নহে। দয়াময় পরমেশ্বর অনন্ত কালের নিমিত্ত, অনন্ত প্রেম আমাদের হৃদয়ে ঢালিয়া দিয়াছেন। তবে এত দুঃখ কি নাথ?

উমাচরণ সেই প্রেমময়ী রমণীর বদনের প্রতি বহুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"সুলোচনে! তুমি জানিতেছ, শরতের শুভাশুভ অতঃপর তোমারই উপর নির্ভর করিতেছে। আর আমি বলিতে পারি না; আর কিই বা করিব? এ কর্ত্তব্য কখন বিস্মৃত হইও না।"

ক্রমশঃ উমাচরণের বাক্য-কথনের ক্ষমতা তিরোহিত হইতে লাগিল। তিনি আবার ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ শরৎকে আমার নিকটে থাকিতে দেও।"

তৎক্ষণাৎ প্রতিবেশী মহাশয় আলুলায়িত-কুন্তলা উন্মাদিনীর ন্যায় শরৎকুমারীকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। শরৎকুমারী 'বাবাগো, বাবাগো বলিয়া' কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার বক্ষের উপর পড়িয়া গেল। উমাচরণ দুই হস্তে কন্যার গলদেশ ধারণ করিয়া বলিলেন,—

"মা আমার, কাঁদিও না।"

তখন সুলোচনার অবস্থা? লেখনী তাহা বুঝাইতে অক্ষম। সুলোচনা স্বামীর মস্তক সমীপে উপবিষ্টা। তাঁহার দেহ তর্ তর্ করিয়া কাঁপিতেছে, এবং বুদ্ধি ও জ্ঞান ক্ষণে ক্ষণে বিলুপ্ত হইতেছে। লোচন পূর্ণায়ত ও ঘোর রক্ত বর্ণ, কেশরাশি উচ্ছৃঙ্খল, ললাটে সতেজ শিরা সকল সমুত্থিত, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত এবং সর্ব্বেন্দ্রিয় আধিপত্য-হীন। ওঃ! সে অবস্থা দেখিলে পাষাণও বিগলিত হইয়া যায়। শরতের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ, প্রতিবেশিনী কামিনীগণের ক্রন্দন ধ্বনি, মরণোন্মুখ রোগীর বিসদৃশ ভাব এবং সুলোচনার সেই ভয়ানক অবস্থা সমবেত হইয়া তৎকালে সেই স্থানের যে অচিন্তনীয় আকৃতি সমুৎপাদন করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিতেও হৃদয় বিহ্বল হইয়া উঠে। কিন্তু এ দুঃখের কাহিনী আর আমরা বিশেষ করিয়া বলিতে অক্ষম। শীঘ্র এ ক্লেশের কথা সমাপ্ত করাই শ্রেয়ঃ।

রাত্রি যখন দ্বিপ্রহর তখন সকলে বুঝিল যে, আর কাল বিলম্ব নাই, অতএব রোগীকে বাহির করা আবশ্যক। প্রতিবেশী পুরুষ ও স্ত্রীগণ তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত লইল। তখন সুলোচনার সেই সংজ্ঞাহীন দেহে কতকটা জ্ঞানের উদয় হইল। তিনি বলিলেন,—

"কর কি? প্রাণেশ্বরের যদি মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে বাহিরে লইয়া যাও কেন? এই ঘরে এই শয্যায় উহাঁকে শেষ পর্য্যন্ত থাকিতে দাও।"

আর শরৎকুমারীর ক্রন্দন—সে কথা আর কি বলিব? চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সুলোচনার বাসনার অন্যথা করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন না। কামিনীগণের কেহ কেহ বিরুদ্ধ মত করিবার জন্য প্রস্তাব করিতেছিল, কিন্তু তিনি সকলকে নিরস্ত করিয়া দিলেন। তাহার পর উমাচরণের দেহে একে একে মৃত্যুলক্ষণ সকল প্রকটিত হইয়া আসিল। তখন তিনি ধীরে ধীরে 'মা—শরৎ' বলিয়া কন্যার মস্তকে হস্ত দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে হস্ত আর উঠিল না। শরৎ—

"বাবা, তুমি ভাল হয়ে উঠে এখনই আমাকে কোলে কর গো বাবা,"

ইত্যাদি হৃদয়-বিদারক শব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিল। সেই ক্রন্দন-ধ্বনিতে সুলোচনার আবার সংজ্ঞা হইল। তিনি স্বামীর মুখে মুখ দিয়া বলিলেন,—

"প্রাণ আমার, এখনও এখানে আছ? আমি তোমাকে স্বর্গে খুঁজিতেছিলাম।"

উমাচরণ জড়তাপূর্ণ ক্লেশ-নিঃসৃত স্বরে বলিলেন,—"প্রি—য়ে—সুলো—চ—না"

দরিদ্র উমাচরণ আর কথা কহিলেন না। সকলে বুঝিল তাঁহার জীবন-প্রদীপ অকালে নিবিয়া গেল। এ শোকতাপ-পরিপূর্ণ জগৎ হইতে উমাচরণের প্রাণপক্ষী পলায়ন করিল, এ ভব-রঙ্গ-ভূমে তাঁহার জীবলীলা সাঙ্গ হইল। এ জীবনের উৎকৃষ্ট অংশ অবিরত যাহাদের চিন্তায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, যাহাদের সুখ ও সন্তোষ সাধন করা জীবনের ব্রত ছিল, যাহাদের রোদন বা বিমর্ষ বদন তাঁহার হৃদয়ে যুগপ্রলয় সমুৎপাদন করিত, যাহাদের হাস্য ও আনন্দ তাঁহার পক্ষে স্বর্গ-সুখাপেক্ষাও অধিক বলিয়া জ্ঞান ছিল, তাহারা আজ কোথায় পড়িয়া রহিল, তাহা নির্ম্মম যম তাঁহাকে আর ভাবিতেও সময় দিল না। স্ত্রী কন্যার আর্ত্তনাদ, প্রতিবেশিগণের হাহাকার, কিছুই তাঁহার জীবন রক্ষার সহায়তা করিতে পারিল না। উমাচরণের যুবতী রূপবতী ভার্য্যা অদ্য অনাথা। অন্ন, বস্ত্র, লজ্জা, মান, আশ্রয় কিছুই তাহার থাকিল না; সকলই তাহাকে স্বয়ং দেখিয়া লইতে হইবে। আর উমাচরণের কন্যা? সেই পিতৃহীনা বালিকার নবীন জীবন সম্মুখে উপস্থিত। কিন্তু যাহার যত্নে, যাহার সহায়তায়, সে জীবন সুখময় হইতে পারিত, সে অদ্য এমন স্থানে প্রস্থান করিল যে, ইহ-জীবনে তাহার সহায়তা দূরে থাকুক, হৃদয়ের হৃদয়ভেদ করিয়া কাঁদিলেও, বারেক তাহার সাক্ষাৎ পাওয়াও যাইবে না।

প্রতিবেশিগণ মৃতের দেহ বস্ত্রাবৃত করিতে গেলেন। সুলোচনাকে ধরিয়া তুলিতে গিয়া তাঁহারা জানিতে পারিলেন, সুলোচনার জ্ঞান নাই, শরীর অবশ। তখনই সকলে মিলিয়া নানারূপ যত্ন করিতে লাগিলেন। বহুযত্নে সুলোচনার চৈতন্য জন্মিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—

"কে ও—তোমরা আমাকে এখানে আনিলে কেন? আহা! আমি তাঁহার সহিত কেমন সুখে স্বর্গে বেড়াইতেছিলাম।"

তাহার পর সেই পতিগতপ্রাণা সাধ্বীর দৃষ্টি সেই বস্ত্রাবৃত শবের উপর পড়িল। তিনি তৎক্ষণাৎ বেগে সেই দেহের উপর গিয়া পড়িলেন। আত্মীয় জনেরা তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে গেল; দেখিল পূর্ব্বের ন্যায় আবার তাঁহার চৈতন্য তিরোহিত। এইরূপে কখন বা বাক্-বিহীন সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায়, কখন বা উন্মাদিনীর ন্যায় বিকৃত-জ্ঞানযুক্ত অবস্থায় সুলোচনার বৈধব্যের প্রথম রাত্রি অতি-বাহিত হইল। আর সেই ধূল্যবলুণ্ঠিতা বালিকা শরৎকুমারী? তাহার সেই করুণার্দ্র বাক্য সে হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ, সে অবক্তব্য ক্লেশের কথা কে বলিতে পারে?

শরৎকুমারি! এ জগৎ সবে মাত্র তোমার সম্মুখে উন্মুক্ত হইতেছে। হৃদয়হীন, নির্ম্মম সংসারের সমস্তই এখনও তোমার পুরোভাগে রহিয়াছে। অতএব বালিকে! অন্ধকার শোকই অসহনীয় ব্যাপারের পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করিও না। অবনিমণ্ডল শোক, তাপ, কষ্ট ও যাতনার রঙ্গভূমি। তাই বালিকে! বুক বাঁধিয়া সকল বিপদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত হও, অবসন্নতা দূর করিতে চেষ্টা কর এবং শোকের প্রস্রবণ দিয়া যে সকল পবিত্র ধারা নয়ন হইতে নিঃসৃত হইতেছে, তাহা এখনই নিঃশেষ করিও না। ইহারই নাম সুখের সংসার!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

——*——

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর দিবস সেই শোক-পুরীতে কয়েকজন প্রতিবেশিনী শোকসন্তপ্তা সুলোচনার সান্ত্বনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন ও কয়জন প্রতিবেশী বিষণ্ণ বদনে অনাথিনীর ভাবী পরিণাম ও ইতিকর্ত্তব্যতা আলোচনা করিতেছেন।

সুলোচনার সেইরূপ অবস্থা। কখন বা চৈতন্ত লক্ষণ দেখা যাইতেছে, কখন বা তিনি অজ্ঞান। অন্ত বঙ্গদেশের গৌরবান্বিত সমাজিক সুব্যবস্থার পরিচায়ক দিন। অন্ত একাদশী! স্বার্থপর, নীচাশয়, হৃদয়হীন বাঙ্গালা, স্ত্রী থাকিতে, তাহার বুকে বসিয়া আপনার ইন্দ্রিয়-তৃষ্ণা নিবারণের জন্ত ইচ্ছা হইলে, সাতটা বিবাহ করিবে—সমাজ সে কার্য্যের অনুমোদন করিবে। স্ত্রী-বিয়োগ হইলে সামান্ত শিষ্টাচার পর্য্যন্ত অবহেলা করিয়া, হয়ত অশৌচান্তেই, পুনরায় বিবাহ করিবে—সমাজ তাহারও পোষক। প্রেম কাহাকে বলে তাহা কি তাহারা জানে? স্বার্থত্যাগ প্রেমের ভিত্তি, কিন্তু সে তো দূরের কথা—পর-হৃদয়ের ভাব অনুভব করা অধম বাঙ্গালীর ক্ষমতার বহির্ভূত। যে যে অবস্থায় নিজের যে যে ক্লেশ হয়, সেই সেই অবস্থায় যে অপরেরও অবিকল তদ্রূপ ক্লেশ হইতে পারে, একথা এ ঘৃণিত জাতি বুঝে না। তাহা বুঝে না বলিয়াই আজি তাহাদের এই অবস্থা—এত অধঃ-পতন। স্ত্রী-বিয়োগ এ অধম জাতির পক্ষে বিশেষ বিপদের কথা নহে। তাহারা, আপন পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, পুরাতনের পরিবর্ত্তে নবীনা প্রণয়িনী লাভ করিবে সুতরাং এরূপ ঘটনাকে তাহাদের ঘৃণিত মনোবৃত্তি ও জঘন্য শিক্ষা, সুখের ঘটনা রূপে তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত করে। ধিক্ এদেশে, ধিক্ এ জাতিকে! এই পাপে, এতাদৃশ হৃদয়হীনতা হেতু, বলিতে পারি না কেন, আজিও বাঙ্গালী নাম জগতীতল হইতে বিলুপ্ত হয় না! বুঝিতে পারিনা কেন, আজিও বঙ্গদেশ ভারতের মানচিত্রে স্থান পায়! এত মহামারী—এত ঝটিকাবর্ত্ত—এত জলপ্লাবন হইতেছে, কিন্তু এ পাপে বঙ্গদেশ রসাতলে যায় না কেন?

বঙ্গদেশ যে রসাতলে যায় না, সে কেবল পুণ্যস্বরূপিণী বঙ্গকামিনীর গুণে। বঙ্গীয় পুরুষ চরিত্র যেমন ঘৃণিত, বঙ্গীয় নারীর চরিত্র তেমনই উদারতা, স্নেহপরায়ণতা ও স্বর্গীয় মনোবৃত্তি সমূহে পরিপূর্ণ। তাঁহারা স্বার্থ-ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহারা মূর্ত্তিমতী দেবী; তাঁহাদের ব্যবহার অলৌকিক। যে দিকে নয়ন ফিরাইবে সেই দিকেই দেখিবে, শান্তি-রূপা বঙ্গকামিনী শান্তি-সলিল সেচন করিয়া মনের অনল নিবাইতেছেন। পশু-প্রকৃতিক স্বামী বারনারীর উরসে সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়া রাত্রিশেষে ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সে নরপ্রেতের মস্তকে বামপদাঘাত না করিয়া, দেখিবে তাহার দয়াময়ী ভার্য্যা তাহার স্বাস্থ্য ও কল্যাণ কামনা করিতেছেন। স্বামী আজীবন বিবিধ বিসদৃশ ব্যবহারে পত্নীকে দুঃখের ঘোর দাবদাহনে বিদগ্ধীকৃত করিয়াছেন—দেখিবে, পুণ্য-প্রতিমা পত্নী, সেই স্বামীর অবর্ত্তমানে স্বীয় জীবন ভোগ-সুখাদি বিরত করিয়া, তপস্বিনীর ন্যায় নিস্পৃহ ভাবে অতিবাহিত করিতেছেন। পুরুষ! তুমি প্রয়োজন বা অপ্রয়োজনে শত শত মহিলা-বেষ্টিত হইয়া থাক কিন্তু ঐ কুলকামিনী কেবল

তোমাকেই জানে তোমাকে নিদান্তে একবার দেখিতে পাইলে সে স্বর্গ-সুখ অনুভব করে, তোমার মুখে হাস্য দেখিলে সে অতুলানন্দ লাভ করে। তাই বলিতেছিলাম, এ জগতে বঙ্গমহিলার ন্যায় উদার প্রকৃতির রমণী আর নাই। এ বঙ্গ যে অদ্যাপি আছে এবং এখনও যে থাকিবে, সে কেবল এই পুণ্য-প্রতিমা বঙ্গসীমন্তিনীগণের দেবদুর্লভ গুণে। বঙ্গের কুলকামিনীগণ চিরদিন দুঃখিনী। জন্মমাত্র পিতা মাতা ও আত্মীয়গণ কন্যা হইল বলিয়া কাতর হন, ধাত্রী যে পুরস্কার পাইবে আশা করিয়াছিল, তাহার সফলতা হইল না দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে; গৃহাগত ভক্ষ্য সামগ্রীর সারাংশ পুত্রগণ আহার করে। কন্যা ভক্ষ্যাবশেষ মাত্র লাভ করিয়া তুষ্ট হয়; বিবাহ দিবার নিমিত্ত পিতার বহু যত্নার্জ্জিত অর্থরাশি ব্যয় হইয়া যায়; যিনি তাহাকে গ্রহণ করেন, তিনি তাহার পিতাকে চিরঋণে আবদ্ধ করিলেন বলিয়া এবং যাহার সহিত বিবাহ হইল, তিনি তাহাকে একটা হৃদয়-হীন ক্রীড়াপুত্তলী বলিয়া মনে করেন; সুরা ও দুর্ব্বৃত্ততা শীঘ্রই তাঁহার মৃত্যু ডাকিয়া আনিয়া দেয়, তাহার পর বঙ্গের বিধবা চিরদিন সকল সুখে বঞ্চিত হইয়া তাঁহার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে কালযাপন করে। বল দেখি, তাহার জন্মের পর হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কোন্‌টুকু সুখের দিন! তাহার উপর আবার অকারণ একাদশীর চাপ কেন? তুমি পুরুষ, তুমি এক দিনও উপবাস করিতে পার না, কিন্তু ঐ পতি-বিয়োগ-বিধুরা, ব্যথিতা, কোমলাঙ্গী কামিনী চিরদিন পক্ষান্তে নিরম্বু উপবাস করিবে, ইহাই কি সাধুসঙ্গত ব্যবস্থা? কেমন করিয়া বলিব, এদেশের পুরুষেরা মানব? তাহারা যদি রাক্ষস, পিশাচ, দৈত্য প্রভৃতির রূপান্তর না হয়, তবে তাহারা কি? কিন্তু এ পাপ রাজ্যের এই জঘন্য সামাজিক বৈষম্যের ও দুরবস্থার কথায় আমরা মূল বিষয় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। এক্ষণে তদনুসরণে প্রবৃত্ত হওয়া শ্রেয়ঃ।

অদ্য একাদশী। সুলোচনার জীবনে অদ্য প্রথম কঠোর একাদশী উপস্থিত। সুখের বিষয় অদ্য সুলোচনা এক প্রকার সংজ্ঞাহীনা। তাঁহার অধুনা যে অবস্থা তাহাতে ক্ষুৎপিপাসা বা দৈহিক কোন অভাব বা অসুখের জ্ঞান থাকে না। প্রতিবেশিনী কামিনীগণ সুলোচনার এই অজ্ঞান অবস্থা দেখিয়া নানারূপ কল্পনা করিতেছেন। একজন বলিলেন,—

"এই কাঁচা বয়স, তাহার উপর এই শোক। বাছা হয়ত সাম্‌লাইতে পারিবে না, মারাই বা যাইবে।"

আর একজন বলিলেন,—

"অহা, সে তো ভাগ্যের কথা। সুলোচনা যেরূপ সতীলক্ষ্মী, তাহাতে এ একাদশীর ভোগ হয়ত দেবতা উহাকে ভুগিতে দিবেন না।"

আর একজন বলিলেন,—

"না বাছা, যা হউক, কোলে এই মেয়েটা আছে; এটার একটা গতি দেখে মর্‌তে পারিলেই ভাল হয়।"

আর একজন বলিলেন,—

"তোমার আমার কথায় তো কিছু হবে না। যা অদৃষ্টে আছে তা হবেই।"

এইরূপ সময়ে রামচরণ ডাক্তার সেই বাটীতে প্রবেশ করিলেন। উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিগত রাত্রেই পরলোক গত হইয়াছেন এবং এক্ষণে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া পর্য্যন্ত সমাপিত হইয়া গিয়াছে, একথা রামচরণ জানিতেন কি না, তাহা আমরা বলিতে

পারি না। ফলতঃ অধুনা তিনি অন্তভাবেই উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াই দীননাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসিলেন। দীননাথ প্রথমে ডাক্তারকে অভ্যর্থনা, পরে কপালে করাঘাত করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত করিলেন। সমস্ত শুনিয়া রামচরণ একটুও বিস্মিত বা কাতর হইলেন না। কে বলিতে পারে, রামচরণের ঔষধ ও চিকিৎসা এ মৃত্যুর কারণ কি না। যাহাই হউক, দীননাথ বলিলেন,—

"মহাশয় আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। সম্প্রতি উমাচরণের স্ত্রীর ভয়ানক পীড়া উপস্থিত। অত্যধিক শোকে এ পীড়া ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যাহাই হউক, তাহার জন্য চিকিৎসার এক্ষণে কোন প্রয়োজন নাই। তবে আমরা বুঝি না, ইহাতে আশু মৃত্যু হয় কি না। সেইটা একবার মহাশয় পরীক্ষা করিয়া বলিলে ভাল হয়।

ডাক্তার বলিলেন,—

"বটে বটে? আহা! চলুন চলুন, এখনই দেখিতেছি।" তাহার পর রামচরণ রোগীর নিকটস্থ হইলে, অপরাপর স্ত্রীলোকগণ একটু সরিয়া তাঁহার জন্য স্থান করিয়া দিল। তিনি পীড়িতার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তখন সেই নর-প্রেত রামচরণ একবার নয়ন ভরিয়া রোগীর সেই স্পন্দহীন দেহ দেখিল। রোগীর অবস্থা এবং যে বিজাতীয় মনস্তাপ হেতু তাঁহার বর্ত্তমান দশা উপস্থিত, সে সকল কথা রামচরণ ভুলিয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল, সুলোচনার অর্দ্ধমুকুলিত স্থির নেত্র, তাঁহার ললাটের রাগরঞ্জিত শিরা সকল, শায়িতাবস্থায় তাঁহার আয়ত বক্ষের অপূর্ব্ব গঠন, তাঁহার অযত্ন ন্যস্তকেশরাশি, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার সুপরিণত দেহ; এই সকল দেখিয়া তাহার সাধ্য কি যে হৃদয়কে স্থির রাখে? যাহার হৃদয়ে এই অসহ্য শোকের ভার, এবং যে স্বয়ং অধুনা শঙ্কটাপন্ন তাহাকে দেখিয়া মনুষ্য কোন রূপ দুশ্চিন্তা করিতে পারে, এ কথা কে জানিত? পিশাচ রামচরণ আবার ভাবিতে লাগিল, এই প্রতিবেশিনী-গুলা সকল সময়ে এই খানেই মরে কেন? যাহাই হউক, আমরা অধুনা রামচরণের হৃদয়ের ভাব সম্পূর্ণরূপ ব্যক্ত করিতে বাসনা করি না। রামচরণ পীড়িতার হস্ত ধারণ করিলেন। কেন? নাড়ী পরীক্ষা করিতে? কোথায় নাড়ী? কেবা তাহা দেখে? রামচরণ স্বীয়-করে সুলোচনার মোহন-ভুজবল্লী স্থাপন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"এ নশ্বর জগতে এতদপেক্ষা অধিকতর সুখ আর কি আছে? ক্ষণেক পরে হস্ত ত্যাগ করিয়া রামচরণ পীড়িতার অধরোষ্ঠ একবার টিপিল, একবার তাঁহার গণ্ডদ্বয়ে হস্ত দিল। তাহার পর রামচরণ বদন আনত করিয়া পীড়িতার বক্ষের নিকট কর্ণ উপস্থিত করিল। তাহার গণ্ড সুলোচনার বক্ষ স্পর্শ করিল। তখন সে বেগে লাফাইয়া উঠিল এবং উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। তখন সে আর আপনাতে আপনি নাই। ভাবিল "যেরূপে হউক এই ভূর্লোক-দুর্লভ সুখ যদি আয়ত্ত না করিলাম, তবে বৃথাই এ জন্ম। যেমন করিয়া পারি, সুলোচনাকে আপনার করিব।" সে বাহিরে উপস্থিত হইলে দীননাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি বুঝিলেন মহাশয়?"

রামচরণ কি উত্তর দিবে? সে রোগ কি তাহা জানে না। জানিতে তাহার ক্ষমতা নাই—সে চেষ্টাও সে করে নাই। তবে কি বলিবে? কিন্তু কিছু একটা বলা তো চাই।

এই জন্য রামচরণ ডাক্তার কিছু থতমত খাইয়া—কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—

"দেখিলাম রোগ কঠিন বটে। মূর্চ্ছা রোগ। আরোগ্য হইয়া যাইবে। কিছু সময় লাগিবে। বিশেষ তদ্বির করা আবশ্যক। আমি সন্ধ্যার সময় আসিব।"

দীননাথ বলিলেন,—

"সন্ধ্যার সময় আপনার কষ্ট করিয়া আসিবার প্রয়োজন নাই। যদি আবশ্যক বুঝি, আমরা তৎক্ষণাৎ মহাশয়কে সংবাদ দিব।"

রামচরণ ডাক্তার অগত্যা সম্মত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

সুলোচনার সেই অবস্থা। কখন কিঞ্চিৎ চেতন, আবার তখনই অচেতন। আর শরৎকুমারী? সে পিতৃহীনা বালিকা ধূলাবলুণ্ঠিতা হইয়া অধোবদনে পড়িয়া রহিয়াছে। এক প্রতিবেশিনী কামিনী তাহাকে কত সান্ত্বনার কথা বলিতেছে। সে সেই সকল কথায় হয়ত আরও কাঁদিয়া উঠিতেছে। অহো! বালিকার হৃদয়ে কি ক্লেশ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—*—

আরও পাঁচ দিন অতীত হইল—সুলোচনার ব্যাধির কোন শান্তি হইল না। সময়ে সময়ে একটু একটু দুধ কোন প্রতিবেশিনী জোর করিয়া তাঁহার মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিত; কষ্টে ও অজ্ঞাতসারে তিনি তাহা উদরস্থ করিতেন মাত্র। কখন কখন তিনি কথা কহিতেন, কিন্তু সে সকল কথা অসম্বদ্ধ, লোকে তাহার অর্থ বুঝিতে পারিত না। কিয়ৎকাল মাত্র কথা কহিয়া আবার তিনি নীরব হইতেন, আবার তাঁহার নেত্র মুদ্রিত হইয়া আসিত এবং দেহ কঠিন হইয়া পড়িত। এইরূপে তাঁহার বৈধব্যের পাঁচদিন কাটিয়া গেল। প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীগণের যাতায়াত ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে লাগিল। দীননাথ চট্টোপাধ্যায় প্রত্যহ স্বয়ং দুইবার করিয়া আসিতেন এবং তাঁহার স্ত্রী দুই বেলা চারিটী করিয়া ভাত আনিয়া শরৎকুমারীকে খাওয়াইয়া যাইতেন। অন্যান্য প্রতিবেশিনীগণও এক একবার আসিতেন।

সুলোচনার এই অবস্থা দেখিয়া পল্লীবাসিনী কামিনীগণ নিতান্ত চিন্তিত ছিলেন, বিশেষতঃ কন্যাটীর জন্য সকলে আরও ব্যাকুল হইলেন। শরৎকুমারীর একে এই নিদারুণ কষ্ট, তাহার উপর তাহার মাতার এই অবস্থা! তাহার চিন্তা, ব্যাকুলতা ও ক্লেশের আর সীমা নাই। কেবল দিন রাত্রি বালিকা ক্রন্দনেই অতিবাহিত করে। যে যখন আইসে বালিকা তখনই তাহার পায় হাত দিয়া 'আমার মাকে ভাল করিয়া দেও' বলিয়া অনুরোধ করে। এইরূপ অত্যধিক মানসিক ক্লেশ, উৎকণ্ঠা ও অত্যাচার হেতু শরৎকুমারীর জ্বর হইয়া পড়িল। আত্মীয়গণ বালিকার জ্বর দেখিয়া ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু শরতের জ্বরে আশু সুলোচনার কিয়ৎ পরিমাণে চৈতন্যের লক্ষণ দেখা গেল। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার যেরূপ চৈতন্য হয়, সেইরূপ হইলে কেহ কেহ তাঁহাকে শরৎকুমারীর পীড়ার কথা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিল। যদিও একথা বুঝিতে না বুঝিতে তাঁহার চৈতন্য তিরোহিত হইয়া গেল, তথাপি যখন পুনরায় তাঁহার চৈতন্যের আবির্ভাব হইল, তখন তিনি প্রথমেই বলিলেন—

"শরৎ—শরৎ! আমার শরৎ কোথায়?"

সেই সময়ে শরৎকুমারী 'মা মা' বলিয়া জননীর কণ্ঠালিঙ্গন করিল। কিন্তু তখনই

পুনরায় সুলোচনার চৈতন্য অন্তর্হিত হইয়া গেল। এবার অচৈতন্য ভাবটা অধিকক্ষণ থাকিল না। অবিলম্বে আবার চৈতন্য হইল। তিনি বারংবার কন্যার বদন চুম্বন করিলেন। তখন কন্যার অবস্থা, আত্মাবস্থা, বাহ্য জগতের সত্তা এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান হইল। যাহাতে এক্ষণে তাঁহার সংসারের একমাত্র আনন্দবর্ত্তিকা, জীবনের একমাত্র লক্ষ্য স্থল, আশার একমাত্র যষ্টি শরৎকুমারী স্বচ্ছন্দ ও নির্ব্বিঘ্ন হয় এই চিন্তাই বলবতী হইয়া উঠিল।

এই সংসারে স্নেহ অসাধ্য-সাধনে অক্ষম। সকল ক্লেশ, সকল যাতনা, সকল মনস্তাপ স্নেহ ভুলাইয়া দেয়। স্নেহ মানুষকে দুষ্কর কার্য্যও সহজ-সাধ্য বলিয়া প্রতীত করায়; সংসারের যাবতীয় শিথিল বন্ধন দৃঢ় করিয়া দেয় এবং যে জীবন ভারভূত ও নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়, তাহাও স্নেহভাজনের কল্যাণ কামনায় রক্ষা করা আবশ্যক বলিয়া বোধ জন্মে। স্নেহের পবিত্র বন্ধন শূন্য হইয়া গেলে, মানব একদিনও সংসারে থাকিতে পারে না। ধনোপার্জ্জন. মানোপার্জ্জন বিষয়লালসা প্রভৃতি কার্য্য সমস্তের স্নেহই প্রধান প্রণোদক। আজি স্নেহের মধুর সম্বোধনে সুলোচনার বিগত চৈতন্যের পুনরাবির্ভাব হইল এবং তাঁহার কোন অনিষ্ট হইলে শরৎকুমারীর কি হইবে, এই ভাবনা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। শরৎকুমারীর বিবাহ হইলে তাহার ইষ্ট চিন্তার নিমিত্ত অনেক আত্মীয় হইবে। অতএব যতদিন শরৎকুমারীর বিবাহ না হয়, ততদিন তাহার ইষ্টানিষ্টের জন্য তিনিই দায়ী। এই ভাবিয়া সুলোচনা আপনার ব্যথিত হৃদয়কে সাংসারিক চিন্তায় নিযুক্ত হইতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তখন শরৎকুমারীর যথাবিধি চিকিৎসাদির উপায় চিন্তায় সুলোচনা ব্যস্ত হইলেন। ব্যস্ত হইলেন বটে—মনকে সকল ব্যথা ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন বটে, তথাপি তাঁহার যে যাতনা তাহাতো একবারও ভুলিবার নহে। তাঁহার অচৈতন্য ভাব ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু একেবারে গেল না। তত ঘন ঘন চেতনাশূন্য না হইয়া তিনি এখন সময়ে সময়ে অচেতন হইতে লাগিলেন। অসম্বন্ধ প্রলাপ বাক্য অনেক কমিয়া গেল, কিন্তু একেবারে গেল না।

সুলোচনা স্বয়ং রন্ধনাদি করিতে লাগিলেন। শরৎকুমারীর ব্যাধি ঈশ্বরেচ্ছায় চারি পাঁচ দিনের মধ্যে আপনিই সারিয়া গেল। তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিলে, বা অন্যমনস্ক দেখিলে শরৎ বড়ই বিমনা হইত এবং কাঁদিয়া আকুল করিত। তখন তাহার পিতার শোক বড়ই বাড়িয়া উঠিত এবং সে পিতাকে স্মরণ করিয়া মাটিতে পড়িয়া আছাড়াবিছাড়ি করিয়া কাঁদিত। শরৎকে অন্যমনস্ক রাখিবার নিমিত্ত সুলোচনা নয়নের অশ্রুজল নয়নেই মিশাইতেন এবং হৃদয়স্থ প্রবল শোকানল হৃদয়েই প্রচ্ছন্ন রাখিতেন। এইরূপ কষ্টে সুলোচনা ও শরৎকুমারীর দিন কাটিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—*—

সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। দেখিতে দেখিতে তিন মাস কাটিয়া গেল। তিন মাস গেল বটে, কিন্তু সুলোচনার পক্ষে

যেন তিন দিনও অতীত হইল না। তাঁহার যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তিনি তাহা প্রতিনিয়ত চক্ষের সমক্ষেই দর্শন করিতেছেন; কোথা দিয়া দিবা রাত্রি চলিয়া যাইতেছে, তিনি তাহা একবারও ভাবিতেছেন না। সুতরাং তিন মাস কাল তাঁহার পক্ষে তিন দিনও বোধ হইল না। তাঁহার চিত্ত একই চিন্তায় নিবিষ্ট, একই বিষয় অনুধ্যানে তিনি রত এবং একই প্রসঙ্গ তাঁহার আলোচ্য।

চিন্তা ও কালের মধ্যে অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। আমরা তাহা লক্ষ্য করি বা না করি, চিন্তা ও কাল উভয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রতি-নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে। দার্শনিক-প্রবর স্যর উইলিয়ম্ হ্যামিল্টন্ (Sir William Hamilton) * এবং হার্বার্ট স্পেন্সর (Herbert Spencer) † চিন্তা ও কালের সম্বন্ধ বিচার করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এতদুভয়ের সম্বন্ধ অতি নিকট ও অবিচ্ছেদ্য—একের সহিত অপর দৃঢ় সূত্রে গ্রথিত। পণ্ডিতবর লক (Locke) ‡ বলিয়াছেন, 'আমাদের মনে যুগপৎ যে সকল ভাব আবির্ভূত হয় তাহার আলোচনা দ্বারাই কালের উপলব্ধি হয়, এবং এই কারণেই যদি আমরা প্রশান্ত অর্থাৎ স্বপ্নাদি বিহীন ভাবে নিদ্রিত হই, তাহা হইলে নিদ্রাকালের বা তাহার দীর্ঘতার কোন উপলব্ধি করিতে পারি না, এবং যে সময় হইতে আমরা চিন্তার হস্ত হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নিদ্রিত হই ও নিদ্রাভঙ্গ সহকারে যে সময় আমরা পুনরায় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হই, এতদুভয়ের দূরত্ব-বিষয়ক কোনই বোধ জন্মে না।' তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে একই চিন্তায় নিবিষ্ট থাকে, এবং তাহার তথাবিধ চিন্তা কালে মনে অন্য যে সকল ভাবনা-প্রবাহ উপস্থিত হয়, তাহার প্রতি কোনই লক্ষ্য না করে, তবে তাহার একাগ্র-চিন্তাধিকৃত কালের বহুলাংশ তাহার অজ্ঞাতসারে পলায়ন করে, এবং সেই কাল তাহার বিবেচনায় অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া প্রতীত হয়। এ সম্বন্ধে অন্য কিছু আলোচনা করিবার এ স্থল নহে।

যাহা হউক সুদীর্ঘকালও সুলোচনার একই বিষয়াবিষ্ট চিত্তের নিকট অত্যল্প বলিয়া অনুমিত হইল। কাল চিত্তের শান্তি সংস্থাপন পক্ষে মহৌষধ। চিত্ত যে পরিমাণে আকুল হয়, পুনরায় তাহাতে শান্তি বিধানার্থ সেই পরিমাণে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়। সুলোচনার চিত্তের যে আকুলতা তাহা অপরিমেয়। সুতরাং তথায় প্রকৃত শান্তি সংস্থাপন কার্য্য কালের সাধ্যায়ত্ত নহে। সে ছিন্ন ভিন্ন দলিতকারী শোক; সে অবক্তব্য অসহ্য, দুর্দ্দমনীয় কাতরতা; সে তীব্র তুষানল—কাল তাহার নিকট পরাজিত। সে যন্ত্রণার একই ঔষধ; সে ঔষধ মৃত্যু। সুলোচনা মৃত্যুর সুশীতল ক্রোড়ে শান্তি পাইবেন বলিয়া আশা করিয়া আছেন, কিন্তু মৃত্যুরও মহৎ ব্যাঘাত রহিয়াছে। সে ব্যাঘাত শরৎকুমারী। এই ভীষণ সংসার-সমুদ্রে সহায় সম্পত্তি বিহীনা, বালিকা শরৎকুমারী কি উপায় অবলম্বন করিবে, এই ঘোর জীবন-যুদ্ধে জ্ঞানহীনা বালিকা কাহার আশ্রয় লইবে, ইহা যখন সুলোচনা চিন্তা করিতেন তখনই তাঁহার মৃত্যু-সঙ্কল্প হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দিতে হইত। তখনই ভাবিতেন, যতদিন পিতৃহীনা বালিকার একটা আশ্রয়-স্থান না হয় ততদিন এ জীবন না রাখিলেই নয়। অগত্যা সুলোচনা স্বীয়

* Lectures on Metaphysics Vol. II
† First Principles.
‡ Essay on Human Understanding.

দগ্ধ, দলিত, কাতর জীবনকেও রক্ষা করা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিলেন।

কিন্তু জীবন রক্ষা করিতে হইলে সাংসারিক নানাবিধ ব্যয় আছে। সর্ব্বোপরি ভরণ-পোষণ-ব্যয় অপরিহার্য্য। কোথায় তাহার সংস্থান, কোথায় তাহার উপায়? দরিদ্র উমাচরণ জীবনকালে যে যৎসামান্য অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাতে কায়ক্লেশে পরিবারের ভরণপোষণ মাত্র নির্ব্বাহিত হইত। সঞ্চিত কোন অর্থই নাই তো, আয়ের কোন উপায়ই নাই তো। সুলোচনা প্রাণ রাখিতে বাসনা করিলেন, কিন্তু কি উপায়ে প্রাণ ও দেহ একত্র থাকিবে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। থাকিবার মধ্যে আছে শরৎ-কুমারীর কয়েকখানি অলঙ্কার। তাহার মূল্যই বা কত? বড় জোর পঞ্চাশ টাকার অধিক নহে। যাহাই হউক, সে তো পবিত্র সম্পত্তি। শত সহস্র অভাব হউক, ভীষণ কষ্ট হউক, তথাপি দুঃখিনী শরতের সেই অলঙ্কার কয়খানি নষ্ট করিবার কথা সুলোচনা মনেও আনিতে পারিলেন না। অনন্যোপায় হইয়া সুলোচনা অনেক ক্রন্দন, অনেক চিন্তা, অনেক আলোচনা এবং ঈশ্বরসমীপে অনেক প্রার্থনা করিলেন।

নিবাসগ্রাম অতি সামান্য পল্লী। যদিও তথায় অনেকগুলি ভদ্রলোকের বাস, তথাপি কেহই সম্পন্ন নহেন, সকলেই দরিদ্র, কথঞ্চিৎ রূপে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন মাত্র। সম্পন্ন ও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে স্বাধীন ভাবে জীবিকার নানা উপায় উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু এতাদৃশ ক্ষুদ্র গ্রামে সেরূপ কোন উপায়ের সম্ভাবনা কোথায়? প্রায় তিন ক্রোশ দূরে রাজারহাট নামে এক প্রসিদ্ধ ও বিস্তীর্ণ নগর আছে। ঐ স্থান বস্ত্রবয়ন জন্য অতিশয় প্রসিদ্ধ। তত্রত্য তন্তুবায়েরা বিবিধ শিল্প-কৌশল-সংযুক্ত সূচীকর্ম্ম-সমন্বিত যে সকল বস্ত্র প্রস্তুত করে তাহা সর্ব্বত্র সাদরে পরিগৃহীত হয়। এই হেতু তথায় এতৎকর্ম্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। তথায় ভদ্র মহিলাগণও তন্তুবায়গণের নিকট হইতে বস্ত্র লইয়া তাহাতে আবশ্যক ও উপদেশ অনুযায়ী সূচীকর্ম্ম সংযুক্ত করিতে ও তদ্ধেতু আপনাদের পরিশ্রমের মূল্য গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হন না। বস্তুতঃ এতাদৃশ সদুপায় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে লোকের কুণ্ঠিত হইবার কোনই কারণ দেখা যায় না। যাহাই হউক, সুলোচনা সেই কর্ম্ম দ্বারা কোন প্রকারে জীবনপাত করা সৎ-পরামর্শ বলিয়া মনে করিলেন। মনে করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে অসুবিধা বিস্তর। প্রথম অসুবিধা, তথাকার তন্তুবায়গণ এতদ্দূরের লোককে বিশ্বাস করিয়া কাপড় দিবে কেন? দ্বিতীয় অসুবিধা, যদি বা বিশ্বাস করে, তাহা হইলেও প্রতিদিন এতদূরে কাপড় দিতে বা লইতে আসিবে কে? ব্যথিতা, বিধুরা সুলোচনা এ সকল অসুবিধা নিরাকরণের কোনই উপায় দেখিতে পাইলেন না।

পল্লীবাসী সকলেই সুলোচনার প্রতি যথেষ্ট কৃপালু। তাঁহাদের সকলের যত্ন, অনুকম্পা ও দয়ায় সুলোচনা এ তিন মাস অন্নবস্ত্রের বিশেষ কষ্ট পান নাই, কিন্তু নিয়ত এতাদৃশ ভারগ্রহণ তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত নহে, কাজেই জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য একটা সদুপায় নহিলেই নয়। কিন্তু পূর্ব্ব কথিত উপায় ভিন্ন অন্য কোন উপায় তো উপস্থিত নাই। উপায়হীনা, আশ্রয়হীনা, অনাথা সুলোচনা তাঁহার প্রধান ভরসা, অকৃত্রিম আত্মীয়, পরম-হিতৈষী ব্যথায় ব্যথিত দীননাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সমস্ত কথা জানাইলেন। তিনি

সমস্ত কথা শুনিয়া, এত অসুবিধা থাকিলেও, রাজারহাট হইতে কাপড়ের কার্য্য পাইবার সুবিধা করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। প্রত্যুত সেই দিনই করুণহৃদয় চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং রাজারহাট গিয়া একজন পরিচিত তন্তুবায়ের সহিত এতদ্বিষয়ক পরামর্শ স্থির করিয়া আসিলেন। স্থির হইল, তন্তুবায় রূপনগরবাসী এক পরিচিত ব্যক্তি দ্বারা কাপড় পাঠাইয়া দিবে ও আনাইয়া লইবে এবং তাহারই দ্বারা নিয়ম মত পয়সা পাঠাইয়া দিবে। পরদিন হইতে পরামর্শ মত কার্য্য চলিতে লাগিল। রূপনগরের রাধানাথ পাল নামক এক তেলি রাজারহাটের তন্তুবায়ের নিকট হইতে কাপড় আনিয়া সুলোচনার হাতে দিয়া গেল এবং যথাসময়ে পয়সা আনিয়া দিবে ও কাপড় লইয়া যাইবে বলিয়া গেল।

শরৎকুমারী বস্ত্র দেখিয়া জননীকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"এ কাপড় কি হবে মা ?"

অশ্রু-ভারাবনত-নয়না সুলোচনা বলিলেন,—

"ইহাতে ফুল তুলিতে হইবে।"

"কেন মা ?"

অতি কষ্টে অশ্রুবেগ সংবরণ করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া সুলোচনা বলিলেন,—

"তাহা হইলে পয়সা দিবে।"

শরৎকুমারী পুনরায় জিজ্ঞাসিল,—

"পরের কাপড়ে ফুল তুলিয়া পরের কাছ থেকে পয়সা লইবে মা ? পরের পয়সায় কাজ কি মা ?"

তখন সুলোচনার মাথা ঘুরিতে লাগিল, তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন বলিলেন,—

"আমাদের আর কে আছে বাছা ?"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সুলোচনার সংজ্ঞা তিরোহিত হইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

---*---

অতি প্রত্যূষে সুলোচনা গৃহকর্ম্মাদি শেষ করিয়া কাপড় লইয়া ফুল বুনিতেছেন। কিয়ৎকাল পরে শরৎ ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটস্থ হইল এবং কাপড়ের অপরাংশ লইয়া ফুল বুনিতে আরম্ভ করিল।

অদ্য উমাচরণের জীবন-সর্ব্বস্ব সুলোচনা ও শরৎকুমারীর এই দশা! তাঁহাদের দশার সহিত ভিখারিণীর অবস্থার বিশেষ প্রভেদ নাই; অদ্য তাঁহারা পরমুখপ্রত্যাশিনী। তাঁহাদিগকে ভাল কথা বলিবে, তাঁহাদের বিপদের অংশ গ্রহণ করিবে, তাঁহাদের বাসনা লক্ষ্য করিবে এ জগতে এমন কেহ নাই। অদ্য তাঁহারা অনাথা, নিরাশ্রয়া, ভীতা ও মর্ম্মাহতা। কবি বলিয়াছেন,—

"নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।"

কিন্তু এ অধঃপতিত চক্রনেমি কি আর কখন ঊর্দ্ধে উঠিবে? এ দগ্ধ জীবন কি আর কখন সজীব হইবে? এ মরুভূমে কখন কি সুশ্যামল তৃণক্ষেত্র দেখা দিবে ? এ বিপদ্-বাত্যা কখন কি বিদূরিত হইবে? এজগতে এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে কাহার ক্ষমতা আছে? যে দুর্লক্ষ্য সূত্র দ্বারা এই বিশ্বসংসার পরিচালিত হইতেছে; যে অমোঘ নিয়মের বশীভূত হইয়া মানব জন্ম, মৃত্যু ও জরার অধীন হইয়াছে; সেই সূত্রের সূত্রধর ও সেই

নিয়মের নিয়ন্তার মনে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পরমাণু হইতে অভ্রংকষ হিমাদ্রি পর্য্যন্ত এবং চক্ষুর-গোচর কীটাণু হইতে অতিকায় করিরাজ পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থ-বিষয়ক ব্যবস্থা স্থিরীকৃত আছে। অতএব সুলোচনা ও শরৎকুমারীর পরিণাম কি হইবে তাহার উত্তর তিনি ভিন্ন আর কে দিবে?

শরৎকুমারী একটী ফুল শেষ করিয়া বলিল,—

"দেখ দেখি মা ফুলটী কেমন হইল?"

সুলোচনা প্রথমে ফুল দেখিলেন, পরে অশ্রুপূর্ণ নয়নে শরতের মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন,—

"আমার ফুলের চেয়েও তোমার ফুল ভাল হইয়াছে।"

ফলতঃ এ কয়দিনে শরৎকুমারী সূচীকর্ম্মে বিলক্ষণ নিপুণা হইয়া উঠিয়াছেন। প্রথমতঃ শরৎ জননীকে এতাদৃশ কার্য্যে নিযুক্তা দেখিয়া এবং ক্রমশঃ কেন এ কাজ করিতে হইতেছে তাহা জানিতে ও বুঝিতে পারিয়া, যাহাতে এ বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারা যায়, তৎপক্ষে যত্নবতী হইলেন এবং প্রথম দিন মাতাকে ফুল কাটিতে দেখিয়া, স্বয়ং স্বতন্ত্র ছিন্ন বস্ত্রে ফুল কাটিতে আরম্ভ করিলেন। দুই চারিটী ফুলের পর তাঁহার কৃত ফুল সকল এমন ভাল হইতে লাগিল যে, তাঁহাকে নূতন বস্ত্রে ফুল বুনিতে নিষেধ করিবার কোনই কারণ থাকিল না। এইরূপে মা ও মেয়ে এই কার্য্য দ্বারা সময়পাত ও জীবিকাপাতের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে আর কিছু হউক না হউক, তাঁহাদের উভয়ের চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে কিয়ৎপরিমাণে আপনাদের অপরিমেয় শোক ও বিপদের চিন্তা হইতে বিরত হইতে লাগিল।

শরৎকুমারী জিজ্ঞাসিল,—

"মা কালি যে কাপড়ে ফুল তুলিয়া রাধানাথকে দিলে তাহার পয়সা পাইয়াছ?"

সুলোচনা বলিলেন,—

"না মা, সে পয়সা এখনও পাই নাই। রাধানাথ এখনই আসিবে কথা আছে। আসিলে পয়সা দিয়া যাইবে, আর এ কাপড়ও লইয়া যাইবে।"

শরৎকুমারী বলিলেন,—

"তবে মা, শীঘ্র বাকী ফুল কটা সারিয়া ফেল।"

মা ও মেয়ে আবার এক মনে কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে শরৎকুমারী আবার জিজ্ঞাসিল,—

"মা, আগেকার কাপড়ের জন্য তোমাকে কত পয়সা দিবে মা?"

সুলোচনা বলিলেন,—

"তাহা তো জানি না মা। শুনিয়াছি সে কাপড়ে যেরূপ কাজ ছিল, তাহাতে আট আনা দেওয়া উচিত। কত দিবে তাহা তাহারাই জানে; আমাদের অদৃষ্ট।"

"আট আনাই দিবে। আট আনায় আমাদের অনেক কাজ হবে, নয় মা?"

এইরূপ সময়ে বাহিরে কাশীর শব্দ করিয়া দরজা ঠেলিয়া রাধানাথ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল,—

"মা ঠাকুরাণি, কোথা গো!"

তাহাকে দেখিবামাত্র শরৎ বলিল,—

"এই যে মা, রাধানাথ দাদা আসিয়াছেন।"

সুলোচনা শরৎকুমারীর দ্বারা রাধানাথকে বসিতে বলিলেন। রাধানাথ লোকটা দেখিতে শুনিতে মন্দ নহে। দোষের মধ্যে রাধানাথ কিছু লোভী এবং প্রবঞ্চক। অন্যান্য বিষয়ে রাধানাথের চরিত্র নিতান্ত মন্দ নহে।

রাধানাথ সুলোচনাকে প্রণাম করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিল এবং টেঁক হইতে আটটী পয়সা বাহির করিয়া শরৎকুমারীকে বলিল,—

"দিদি! এই পয়সা কয়টা তোমার মাকে দেও।"

শরৎ পয়সা কয়টী জননীকে দিল। সুলোচনা পয়সা কয়টী গণিয়া লইতে লজ্জিত হইলেন সুতরাং হাতে করিয়া লইয়া আবার রাখিয়া দিলেন। বুঝিলেন, পয়সার সংখ্যা তাঁহার আশার অপেক্ষা অনেক কম। কিন্তু কি করিবেন? বলিলেন,—

"বাবা তুমি চিরজীবী হও। আমাদের তুমি যে উপকার করিতেছ, এমন আর কেহ করে না। আমরা যার-পর-নাই গরিব।"

রাধানাথ বলিল,—

"আমাকে কোন কথা বলিতে হইবে না মা, আমি আপনার সন্তান জানিবেন। এবার নাকি আপনার প্রথম কাজ, তাতেই তত ভাল ওতরায় নাই; পয়সা কিছু কম হয়েছে। ক্রমে বেশী হইবে। যাহাতে দু পয়সা বেশী আইসে আমি তাহার তদ্বির করিব। সে তাঁতীর হাত হইতে দুটা পয়সা ব্রাহ্মণের হাতে আনিয়া দিতে পারিলে লোকত ধর্ম্মত উভয়ত লাভ। এ কাপড়খানা শেষ হইয়াছে কি মা?"

সুলোচনা বলিলেন,—

"হইয়াছে।"

তাঁহার পর সুলোচনা কাপড় ভাজ করিয়া রাধানাথের নিকট দিলেন। রাধানাথ বগল হইতে একটী ক্ষুদ্রকায় মোট বাহির করিল। তাহাতে ২ খানি মাত্র নূতন কাপড় ছিল। সে কাপড় দুখানি সুলোচনাকে দিয়া রাধানাথ প্রাপ্ত বস্ত্রখানি গ্রহণ করিল এবং বলিল,—

"আজিকার কাপড় বড় ভাল। এ কাপড় কি কাহাকে দেয়, আমি অনেক বলিয়া কহিয়া আনিয়াছি। ইহাতে বড় সূক্ষ্ম কাজ চাই। বেটা তাঁতী বলে এ কাজ আপনাদের নয়। আমি বলি, আমার মা ঠাকুরাণী পারেন না এমন কর্ম্মই নাই। যাহা হউক, যাহাতে আমার মুখ রক্ষা হয় তাহা করিবেন। পয়সা কিছু বেশী দিতেই হইবে—কাজ তো সোজা নয়! এখন তবে আসি মা ঠাকুরাণী।"

সুলোচনা বলিলেন,—

"এস, তুমিই আমাদের সহায়। তোমাকে আর কি বলিব?"

রাধানাথ প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। শরৎ জিজ্ঞাসিল,—

"মা, রাধানাথ কত পয়সা দিল মা?"

সুলোচনা গণনা করিয়া বলিলেন,—

"আটটী"

শরৎকুমারী জননীর গলা জড়াইয়া সাশ্রু-নয়নে বলিল,—

"মা, তুমি দুই দিন অনবরত পরিশ্রম করিলে, তার মজুরি মোটে আটটী পয়সা মা?

সুলোচনা অঞ্চলে কন্যার নয়ন মার্জ্জন করিয়া বলিলেন,—

"কি করিব মা, আমার অদৃষ্ট।"

নবম পরিচ্ছেদ।

—*—

কায়ক্লেশে জীবন-যাত্রা চলিতে লাগিল। একদিন অন্তর আটটী, দশটী, কদাচ বা বারটী পয়সা রাধানাথ আনিয়া দিত। প্রতিদিন

হিসাবমত পাঁচ ছয়টীর অধিক পয়সা আয় হইত না। প্রকৃত পক্ষে সুলোচনা ও শরৎকুমারীর সমস্ত দিন শ্রমের পুরস্কার এত অল্প নহে। তাঁহারা যে কার্য্য করিতেন তাহাতে একদিন অন্তর তাঁহাদের অন্ততঃ চারি বা ছয় আনা পাওয়া উচিত। কিন্তু মানবচরিত্র বুঝা ভার। দেবচরিত্র প্রণিধান করা বরং সম্ভব, তথাপি মানব-প্রকৃতি প্রণিধান করা সহজ নহে। ক্ষুদ্র-হৃদয় রাধানাথ প্রতিদিনই অনাথা স্ত্রীলোকের বহু যত্নার্জ্জিত অর্থের কিয়দংশ আত্মসাৎ করিত। অগত্যা সুলোচনা দিনান্তে পাঁচ ছয় পয়সার অধিক পাইতেন না। কিন্তু যাহা পাইতেন ধরিতে গেলে রাধানাথ মধ্যে না থাকিলে তাহাও পাইতে পারিতেন না। সুতরাং রাধানাথ যাহা করে তাহা জানিলেও, সুলোচনার সতর্ক হইবার উপায়ান্তর ছিল না; বরং পাছে রাধানাথ অসন্তুষ্ট হয়, পাছে সে যতটুকু দয়া করিতেছে তাহাও না করে, এই ভয়ে নিয়ত শঙ্কিত থাকিতে হইত।

যাহা হউক, বহুযত্নে, সুলোচনা ও শরৎকুমারীর অবিরত শ্রমে দিনান্তে এই সামান্য মাত্র আয় হইতে লাগিল। যে আয় হইত তাহাতে দুই জনের দুই বেলা দূরে থাকুক, এক বেলা আহার চলাও অসম্ভব। সুলোচনা অন্নাদি প্রস্তুত করিতেন, শরৎ তখন কাপড়ের কাজ করিত। অন্নাদি প্রস্তুত হইলে সুলোচনা অগ্রে শরৎকে আহার করাইতেন। শরৎ আহার করিতে করিতে যদি প্রয়োজন হইত, তথাপি সাহস করিয়া আর চারিটী ভাত চাহিতে পারিত না। ভয়, পাছে মায়ের কম হইয়া যায়। মা কিন্তু জিদ্ করিয়া কন্যাকে পরিতোষ পূর্ব্বক খাওয়াইতেন এবং নিজের জন্য এখনও যথেষ্ট অন্নাদি আছে বলিয়া তাহাকে শান্ত ও আশ্বস্ত করিতেন। শরৎকুমারী আহার সমাপ্ত করিয়া পুনরায় কাপড় লইয়া বসিত। সুলোচনা সেই সময়ে কোন দিন মুষ্টি-পরিমিত অন্ন, কোন দিন শাক, কোন দিন উপবাস, কোন দিন—অহো! সে বিষাদ কাহিনী বর্ণনা করিতে লেখনী অক্ষম! বঙ্গের বিধবা—দিনান্তে একবার মাত্র আহারের এবং একবার জলযোগের ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু যাহার আহারই জুটে না সে জলযোগ করিবে কোথা হইতে? এই তো নিত্য ব্যবস্থা, তাহার উপর একাদশীর যন্ত্রণা। মনস্তাপে, দৈহিক শ্রমে, অনাহারে অনাথা সুলোচনা যার-পর-নাই ক্ষীণ ও কাতর হইতে লাগিলেন। কিন্তু পাছে কন্যা তাঁহার মনের ভাব জানিতে পারে, তাঁহার দেহের অবস্থা বুঝিতে পারে, তাঁহার আহারের বৃত্তান্ত অনুমান করিতে পারে এবং পাছে তাঁহাকে কাতর বা চিন্তিত দেখিলে, তাহার শোকাবেগ প্রবল হয়, এই ভাবনায় স্নেহপরায়ণা সুলোচনা হৃদয়ের ভাব সতত যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন রাখিতেন। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

শরৎকুমারী—পিতৃহীনা বালিকা, মাতার সাহায্যার্থ দিবারাত্রি পরিশ্রম করিত। জননী বারংবার নিষেধ করিলেও বালিকা কার্য্য হইতে বিরত হইত না। এইরূপ নিরন্তর পরিশ্রম এবং যথোপযুক্ত আহারের অভাব প্রযুক্ত, বালিকার স্বভাবতঃ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল দেহ অচিরে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িল। তাহার পর হঠাৎ একদিন বিষম জ্বর হইল। শোকসন্তপ্তা সুলোচনার সংসারে একমাত্র অবলম্বন শরৎকুমারীর কঠিন পীড়া! সুলোচনা ভয়ে ও ভাবনায় অধীর হইয়া উঠিলেন। যে সামান্য কার্য্য দ্বারা কথঞ্চিৎ উপায়ে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহিত হইতেছিল তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। রামচরণ ডাক্তারের দ্বারা শরৎ-

কুমারীর চিকিৎসা করা হইবে না, ইহা সুলোচনার স্থির প্রতিজ্ঞা হইল ; অগত্যা দীননাথ চট্টোপাধ্যায় রাজারহাট হইতে একজন বৈদ্য আনাইয়া চিকিৎসা চালাইতে লাগিলেন। বৈদ্য বলিলেন,—

"একচল্লিশ দিন রোগের মিয়াদ। একচল্লিশ দিন কাটিয়া গেলে রোগী সারিতে পারে।"

প্রতিদিন দুইবার করিয়া বৈদ্য আসিতে লাগিলেন। বৈদ্যের দর্শনী, ঔষধের ব্যয়, রোগীর পথ্যাদিতে অনেক খরচ হইতে লাগিল। সম্বলের মধ্যে শরৎকুমারীর কয়খানি সামান্য অলঙ্কার। কিন্তু শরৎকুমারীর জীবনের তুলনায় তাহার কোন মূল্য নাই। ক্রমে ক্রমে শরতের যে কিছু সামান্য ভূষণ ছিল তাহা বিক্রীত হইয়া গেল।

শরৎকুমারী অজ্ঞান। সুলোচনা নিরন্তর পীড়িতার পার্শ্বে বসিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন এবং 'যখন তেমন তেমন বুঝিব তখন আত্মহত্যা দ্বারা সকল যন্ত্রণার শান্তি করিব' বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেছেন।

ঘরে ঘটী বাটী সিন্দুক প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, চিকিৎসার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তাহাও গেল। তাহার পর ঘরখানি ও জমিটুকু বন্ধক দিয়া টাকা ধার লওয়া হইল। সুতরাং অর্থাভাবে শরতের চিকিৎসার কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। ইহার পর যে কি হইবে, তাহা ভাবিবার এখন সময় নহে, তাহা একবার মনেও হইল না। শরৎ ভাল হইলে হয়, ইহাই সুলোচনার একমাত্র চিন্তা। ঘরে ভাত খাইবার একখানি থালা, জল খাইবার একটী ঘটী, অধিক কি মাথা দিবার আশ্রয় স্থান টুকু থাকিল না।

যে বিধাতা তুঙ্গ শৃঙ্গ হিমাদ্রি রচনা করিয়াছেন, অতলস্পর্শী সমুদ্রও তাঁহারই রচনা। যে বিধাতা ধনজন-পরিবৃত অট্টালিকাবাসী ধনীর সৃষ্ট করিয়াছেন, অন্নবস্ত্রবিহীন, দারিদ্র্য-দুঃখ-নিপীড়িত ব্যক্তিও তাঁহারই সৃষ্ট। তাঁহার বাসনার মর্ম্মোদ্ভেদ করা ক্ষুদ্র মানবের, ক্ষুদ্র তার্কিকের সাধ্য নহে। ভাগ্যের গতি কখন কোন্ দিকে আবর্ত্তিত হয় এবং কাল-চক্র মানবের অদৃষ্টকে কখন কিরূপে উন্নত ও অবনত করে তাহা কে বলিতে পারে?

দশম পরিচ্ছেদ।

—*—

ধর্ম্মে ধর্ম্মে একচল্লিশ দিন কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার পর? সংস্থান যেখানে যাহা ছিল সবই গেল। এখন এ দুইটা প্রাণী খায় কি? বাঁচে কিসে? অতি যত্নে, অতি ক্লেশে শরৎ বাঁচিবার মত হইল বটে, কিন্তু এখন পথ্যাভাবে মারা যায় যে! ভিক্ষা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই তো! ভিক্ষা? কি ভয়ানক কথা! সুলোচনা ভিক্ষা করিবেন! না, না—প্রাণ থাকিতে সুলোচনা পরের নিকট অভাব জানাইতে বা কাহার করুণা উৎপাদন করিতে পারিবেন না। তবে উপায় কি? যে দিন শরৎ প্রথম পথ্য করিল, সে দিন করুণহৃদয় দীননাথ নিজ ভবন হইতে চারিটি ভাত দিয়া গেলেন। অর্দ্ধাশন বা উপবাসই সুলোচনার অবলম্বন, তাঁহার সেইরূপই চলিতে লাগিল। দীননাথ দরিদ্র, নিত্য অন্ন দ্বারা সাহায্য করা তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত। ক্ষমতা থাকিলেও সুলোচনা তাহা কদাচ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতে পারেন না কষ্টের আর অবধি নাই।

সুলোচনার দিন যায় না—প্রাণের শরৎকুমারী বাঁচে না। অগত্যা সুলোচনা প্রতিবাসিগণের নিকট আপনার অবস্থা না জানাইয়া থাকিতে পারিলেন না। কোন প্রতিবাসী একটু মিছরী, কেহ বা চারিটি সাগু, কেহ বা দুইটা পয়সা দিয়া সাহায্য করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাই বা তাহারা কয়দিন দিবে? প্রতিবেশীর মধ্যে কেহ কেহ বিরক্ত হইতে লাগিল, কেহ কেহ অক্ষমতা হেতু কোন প্রকার সাহায্য করা বন্ধ করিল, কেহ কেহ কেবল সহানুভূতি মাত্র প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হইল।

সুলোচনা কন্যার মস্তক সমীপে বসিয়া তাহার রুক্ষ কেশরাশি সুবিন্যস্ত করিতেছেন এবং তাহার রোগ-জীর্ণ, কাতর বদনের প্রতি চাহিয়া দেখিতেছেন, আর আকাশ পাতাল চিন্তা করিতেছেন। নয়নকোণে এক বিন্দু জল দেখা দিতেছে; তখনই সাবধানতা সহকারে সে বিষাদ-চিহ্ন বিদূরিত করিতেছেন। কি হইবে? কেমন করিয়া দিন যাইবে? এ চিন্তার অবসান নাই। কাপড়ের কাজ করিয়া যে দুই চারিটা পয়সা পাইতেন তাহাও এখন বন্ধ। শরৎ স্বচ্ছন্দ না হইলে কোন কাজই হয় না। আর তো উপায় নাই। তবে সুলোচনার জীবন-সর্ব্বস্ব শরৎকুমারী এক্ষণে কি আহার অভাবে মারা পড়িবে?

বাহিরের দ্বারে খিল্ আঁটা ছিল না—চাপা ছিল। ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া গেল। খুট খুট করিয়া জুতার শব্দ হইতে লাগিল। সুলোচনা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া আসিলেন। দেখিলেন কি? দেখিলেন, রামচরণ ডাক্তার। ভয়ে, বিরক্তিতে, ঘৃণায় সুলোচনার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। তিনি যথাসাধ্য যত্নে হৃদয়ের ভাব প্রচ্ছন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন। রামচরণ ভাবিলেন, 'প্রথম প্রথম ঐরূপই হয়—ক্রমে দেখা যাবে বলিলেন,—

"ভাল আছ তো?"

সুলোচনা উত্তর দিলেন,—"হাঁ।"

আবার রামচরণ জিজ্ঞাসিলেন,—

"শরতের বড় ব্যারাম হইয়াছিল, এখন ভাল আছে তো?"

"হাঁ।"

রাম। এত ব্যারাম, এত কষ্ট—আমাকে একটা কথা জানাইতে নাই।

সুলো। দরকার হয় নাই।

রামচরণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"সুলোচনা আমাকে পর ভাবিও না। আমার দ্বারা তোমার অনেক উপকার হইতে পারে। আমি মনে মনে কেবল তোমাদের কথাই ভাবি। কি করিলে তোমাদের উপকার হয় বল, আমি এখনই করিতেছি।"

সুলোচনা বলিলেন,—

"আমি অনাথিনী, নিঃসহায়া। ভিক্ষা ও পরানুগ্রহে আমি দিন যাপন করি। আপনি দয়া করিয়া আমার বাটীতে না আসিলে আমার বিশেষ উপকার হয়।"

রামচরণ বলিলেন,—

"সে কি কথা! তুমি ভিক্ষা করিবে! তোমার করুণা কত লোক ভিক্ষা করে—তোমার কিসের অভাব? এই লও টাকা—তুমি আমাকে পর ভাবিও না—তোমার কোন অভাব থাকিবে না।"

এই বলিয়া রামচরণ ডাক্তার পকেট হইতে চারিটি টাকা বাহির করিয়া সুলোচনাকে দিতে গেলেন।

সুলোচনা বলিলেন,—

"আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। টাকায় আমার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে দয়া করিয়া আপনি এস্থান হইতে বিদায় হউন। আপনার ন্যায় ব্যক্তি এস্থানে আসিলে আমার মহা অনিষ্টের সম্ভাবনা। লোকের শ্রদ্ধাই আমার জীবন।"

রামচরণ হাসিয়া বলিলেন,—

"লোক— এ রূপনগরে লোকটা কে? কোন্ ব্যাটা রামচরণের গোলাম নয়? রামচরণের কথায় কথা কহে—কার ঘাড়ে দুটা মাথা? তুমি লোকের কথা কহিও না।"

সুলোচনা কহিলেন,—

"আপনি বড় লোক তাহা আমি জানি—জানি বলিয়াই বলিতেছি, আপনি দয়া করিয়া আমার প্রতি কোন প্রকার অনুগ্রহ করিবেন না। আমি গরিব বটে, কিন্তু আমি বেশ আছি। আপনি এক্ষণে প্রস্থান করুন। যদি আমার কোন দরকার পড়ে তাহা হইলে আপনাকে জানাইব।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাইতেছি, তুমি টাকা কয়টা লও।"

সুলোচনা বলিলেন,—

"টাকায় আমার কাজ নাই—উহা আমি লইব না।"

রামচরণ বলিলেন,—

"তোমার এত অভাব, এত অপ্রতুল—তুমি টাকা লইবে না, এ কি কাজের কথা? সে কি, মারা পড়িবে নাকি? লও, টাকা লও।"

সুলোচনা বলিলেন,—

"আমার অভাব নাই, অপ্রতুল নাই, টাকাতেও কাজ নাই।"

রামচরণ কহিলেন,—

"আমি আর কি জানি না। তোমার খবর আমি সর্ব্বদা লই। তোমার কষ্ট হইয়াছে শুনিয়াই আমি টাকা লইয়া আসিয়াছি। তোমায় টাকা লইতেই হইবে। কেমন তুমি না লও দেখিতেছি।"

এই বলিয়া রামচরণ ডাক্তার সুলোচনার হস্তে টাকা দিবার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইলেন। সুলোচনা পিছাইয়া গেলেন। রামচরণ আরও অগ্রসর হইলেন। সুলোচনার দেহ ভয়ে ও ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল; তাঁহার বিলুপ্ত-শ্রী পুনরায় দেখা দিল, ললাট ও বদন রাগরঞ্জিত হইল। তিনি বলিলেন,—

"আমি টাকা লইব না বলিতেছি, তোমাকে চলিয়া যাইতে বলিতেছি—তুমি শুনিতেছ না। আমি অগত্যা চীৎকার করিয়া গ্রামের সমস্ত লোক জড় করিব। যদি ভাল চাও, এখনই এখান হইতে চলিয়া যাও।"

এই বলিয়া সুলোচনা বেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহদ্বার অর্গলবদ্ধ করিলেন। রামচরণ ডাক্তার বহুক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শেষে কি ভাবিয়া প্রস্থানোদ্যোগ করিলেন। গমন কালে বাহিরের দ্বার সজোরে রুদ্ধ করিলেন এবং বলিয়া গেলেন,—

"আচ্ছা।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দুই দিন শরৎকুমারীর কোনই আহার হয় নাই বলিলে হয়। কখন একটু আদটু মিছরি খাইয়া আছে। শরৎ আপনাদের অবস্থা

বুঝিতেছে এবং তাহার ভাবনায় জননীর কিরূপ যন্ত্রণা হইতেছে তাহাও উপলব্ধি করিতেছে, সুতরাং যতদূর সম্ভব যত্ন করিয়া নিজের কোন ক্লেশ জননীকে জানিতে দিতেছে না। ক্ষুধার ক্লেশে বালিকার প্রাণ ছটফট্ করিতেছে কিন্তু জননীকে বলিলে তিনিই বা কি করিবেন ভাবিয়া, বালিকা বিজাতীয় যন্ত্রণা মনেই চাপিয়া রহিয়াছে। ক্ষুদ্র মানবদেহে যতদূর কষ্ট সহিতে পারে, শরৎকুমারী ততদূর সহ্য করিল, তাহার পর অধুনা শরতের কষ্ট সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিতে চলিল। সুলোচনা কন্যার কষ্ট সম্পূর্ণই বুঝিতে পারিতেছেন এবং সে জন্য তাঁহার ক্লেশ শরতের ক্লেশের অপেক্ষা কোন অংশেই অল্প হইতেছে না। কিন্তু উপায় তো কিছুই দেখিতেছেন না।

ক্রমে রাত্রি অনেক হইল। তখন শরৎ ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িল! তাহার শরীর কাঁপিতে লাগিল, নয়ন দিয়া আপনা আপনি জল বহিতে লাগিল, চৈতন্য ক্ষণে ক্ষণে বিলুপ্ত হইতে লাগিল, এবং সর্ব্ব শরীর দিয়া নিরন্তর ঘর্ম্ম-বারি বিনির্গত হইতে লাগিল।

ধীরে ধীরে শরৎ বলিল,—

"ক্ষুধায় মরি যে মা? কথা কহিতে পারি না যে আর।" সেই মরণাপন্ন কন্যাকে আলিঙ্গন করিয়া সুলোচনা অধোবদনে রোদন করিতে লাগিলেন। শরতের জিহ্বা, কণ্ঠ, তালু শুষ্ক—কথা জড়তাপূর্ণ। শরৎ আবার বলিল,—

"এত করিয়া বাঁচাইলে মা, কিন্তু আজি আর বাঁচাইতে পারিলে না। ওঃ মাগো!"

কি ভয়ানক কণ্ঠস্বর! এ তো মুমূর্ষু ব্যক্তির স্বর। তবে কি শরৎ বাঁচিবে না?

সুলোচনা কি করিবেন? সংসার অন্ধকার, কোন দিকে বিন্দু মাত্র আশা নাই, কোন দিকে কোন ভরসা-স্থল নাই। তিনি এখন ভাবিতেছেন, 'আগে কেন মরি নাই!' মরণ হউক, বা না হউক, ভরসা কিছু থাকুক বা না থাকুক, তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে সংকল্প করিলেন। চেষ্টা কি? এ দ্বিপ্রহর রাত্রে, ঘোর অন্ধকারে কোথায় কি চেষ্টা সম্ভব? তিনি ভাবিলেন লোকের বাড়ী বাড়ী ফিরিবেন, সকলের দ্বারে দ্বারে চীৎকার করিবেন, এবং যেরূপে হউক, কিঞ্চিৎ আহার্য্য ভিক্ষা করিয়া গৃহে ফিরিবেন। এই তাঁহার শেষ সংকল্প। "ভয় কি মা, আমি এখনই তোমার খাবার আনিতেছি।" এই বলিয়া অনাথা দুঃখিনী জননী, ক্ষুৎপিপাসা কাতরা মুমূর্ষু কন্যার বদন চুম্বন করিয়া, হৃদয়কে অসাধ্য সাধনে প্রস্তুত করিয়া, সকল বিঘ্ন-বিপত্তির আশঙ্কা অমূলক জ্ঞান করিয়া, সেই গভীর রাত্রি কালে ভবন-দ্বারের বাহিরে শিকল দিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। উদ্দেশ্য—ভিক্ষা দ্বারা শরতের জন্য খাদ্য সঞ্চয়।

রাত্রি ঘোর অন্ধকারময়ী। সেই পল্লী-গ্রামের জনশূন্য সংকীর্ণ পথে সুলোচনা সেই রাত্রে একাকিনী বাহিরিলেন। দুই পদ মাত্র অগ্রসর হইতে না হইতে একটা গ্রাম্য কুকুর বিকট শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। তখনই সুলোচনার বোধ হইল, যেন এক জন লোক পথের একধার হইতে অপর ধারে গমন করিল। কে সে মানুষ? সে কি কোন শরীরী মানব না প্রেত-আত্মা? সে যাহাই হউক, সুলোচনার হৃদয় প্রথমতঃ ভয়ে আকুল হইয়া উঠিল। লোকটা রামচরণ ডাক্তার নয় তো! ভূত বা প্রেত, ব্যাঘ্র বা ভল্লুক, সকলের অপেক্ষা রামচরণ ডাক্তারই সুলোচনার অধিক ভয়ের কারণ। ভাবিলেন, রামচরণ ডাক্তারই যদি হয়, তাহা হইলে তাহাকেও

উপস্থিত বিপদের কথা জানাইলে অবশ্যই সে দয়া করিবে। এ দুঃখের বিবরণ শুনিলে ভূত হউক, রামচরণই হউক, সকলেই কাতর হইবে, সকলেই সহায়তা করিবে। অতএব ভয় কি? সুলোচনা স্থির করিলেন, 'যে সম্মুখ দিয়া গেল সে যেই হউক, তা'র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবেন।' কই আর তো সাড়া শব্দ নাই। তবে ও কিছু নয়—দেখিবার ভুল। সুলোচনা আবার কিয়দ্দূর মাত্র অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় মনুষ্যের পদ-ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি সশঙ্কিতে চারিদিকে চাহিলেন। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। দেখিতে না পান, তথাপি তিনি করযোড়ে কাতরভাবে বলিলেন,—

"দেব হও, দৈত্য হও, ভূত হও, মানব হও, যে হও আমার শরৎকুমারী খাদ্যাভাবে ক্ষুধার জ্বালায় মারা পড়িতেছে, তোমরা আমাকে সাহায্য কর—ভিক্ষা দেও।"—

সুলোচনা নীরব হইলেন। কিন্তু কেহই তাহার করুণ প্রার্থনায় উত্তর দিল না। তিনি 'হা বিধাতঃ' বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং অগ্রসর হইবার নিমিত্ত পা বাড়াইলেন। তখনই এককালে চারিদিক হইতে চারি ব্যক্তি তাঁহাকে বেষ্টন করিল। তিনি বলিলেন,—

"কে—কে আপনারা? শরৎকে খাইতে দিবেন? কি আনিয়াছেন দিন। বাছা ছট্‌ফট্ করিতেছে।"

লোকেরা সুলোচনার কথার কোনই উত্তর দিল না। এবং তাঁহাকে আর কথা কহিতেও অবকাশ দিল না। তখনই তাঁহার মুখে কাপড় দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। তিনি একবার স্পষ্টই ভাবে বলিলেন,—

"শরৎ।"

আর কথা তিনি বলিতে পারিলেন না। লোক কয়জন তাহার পর বিশেষ সাবধানতা সহকারে তাঁহাকে স্কন্ধে লইয়া চলিল। সুলোচনার সংসারের একমাত্র বন্ধন শরৎকুমারীর সেই দশা, এখানে সংসারবোধবিহীনা শরতের একমাত্র ভরসা সুলোচনার এই দশা!

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

মা ও মেয়ে।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

---*---

রূপনগরের দুই ক্রোশ দক্ষিণে কল্যাণপুর নামে একখানি অতি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। গ্রামে বড় জোর ঘর পনের কুড়ি লোকের বাস। অধিবাসিগণের কতক কৃষিজীবী, কতক বৈষ্ণব সুতরাং ভিক্ষুক, কতক সামান্য ব্যবসায়ী। সকলেই নিঃস্ব এবং সামান্য তৃণকুটীর ব্যতীত কাহারও আশ্রয় স্থান নাই।

সেই কল্যাণপুরে সুরূপা নাম্নী এক বৈষ্ণবী বাস করে। সুরূপার স্বভাব-চরিত্র বয়সকালে বড়ই মন্দ ছিল। এখন সুরূপার রূপ নাই, যৌবন নাই, মনে কোন অশান্ত প্রবৃত্তি থাকিলেও তাহার প্রকাশ নাই। সুরূপার নিজের কোন সামগ্রী না থাকিলেও, সে পরের মনোরথ সিদ্ধ করাইবার উপায় করিয়া দেয় এবং সেই উপায়ে কথঞ্চিৎ মনস্তুষ্ট লাভ করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। ফলতঃ সুরূপার আজি কালি ব্যবসায়ই ঐ। রামচরণ ডাক্তার সুরূপার প্রধান মুরুব্বি এবং সুরূপা রামচরণের প্রধান সহায়। তিনি সুরূপার সাহায্যে অনেক অসাধ্য-সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

সুরূপার সোহাগিনী নাম্নী এক কন্যা আছে। যথাকালে সুরূপা রাধারমণ দাস নামক এক বৈষ্ণব-পুত্রের সহিত সোহাগিনীর বিবাহ দিয়াছিল। রাধারমণ কিঞ্চিৎ লেখা পড়া জানিত। সে বৈষ্ণব-দলে মিশিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন না করিয়া, চাকরি বাকরির চেষ্টা করে। ক্রোশ দুই দূরে হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় নামক একজন অতি সৎস্বভাব জমিদারের বাস। রাধারমণ চেষ্টা-চরিত্র করিয়া হেমেন্দ্র রায়ের সংসারে মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে একটী সামান্য মুহুরির কর্ম্মে প্রবিষ্ট হয়। প্রাতে রাধারমণ বাটী হইতে আহার করিয়া কর্ম্মস্থানে গমন করে এবং সন্ধ্যাকালে পুনরায় বাটী ফিরিয়া আইসে।

সোহাগিনীর বয়স এখন ষোল বৎসর। সোহাগিনী সুন্দরী। একে সুন্দরী, তাহাতে পূর্ণ যৌবন উপস্থিত; সুতরাং সোহাগিনী লাবণ্য-জ্যোতিতে, ঢলঢলায়মানা। সোহাগিনী সতীত্ব ধর্ম্মের অপার মহিমা জানে। মাতার চরিত্র পূর্ব্বে নিতান্ত মন্দ ছিল এখনও বড় ভাল নয়, তাহা সোহাগিনীর অবিদিত নাই। সোহাগিনী মন্দ আলাপ, মন্দ সংসর্গ ও মন্দ চিন্তা অতি সাবধানতা সহকারে পরিত্যাগ করে। কিন্তু সোহাগিনীর মাতা তাহাতে

রাজি নহেন। তিনি কন্যার এমন দেবদুর্ল্লভ যৌবন, এমন সুকুমার শ্রী, সকলই বৃথা যাই-তেছে মনে করিয়া দুঃখিতা।

বেলা প্রায় দুই টা। সুরূপার একটী পয়স্বিনী গাভী আছে। সুরূপা তাহার সেবা করিতেছে। তাহাকে মনুষ্যের ন্যায় নানা প্রকার সোহাগ করিতেছে, এবং নানাবিধ মানবোচিত ও মানবাধিক বিশেষণে তাহাকে সম্ভাষিত করিতেছে। বড় গ্রীষ্ম, সোহাগিনী ঘরের ভিতর চৌকীর উপর অলস ভাবে পড়িয়া আছে।

টুক্ টুক্ করিয়া একটী মানব ছাতা মাথায় দিয়া সুরূপার গৃহ-প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুরূপা গোয়াল ঘরের ফাঁক দিয়া দেখিয়া বলিল,—

"এদিকে, এদিকে। কি ভাগ্য!"

লোকটা ছাতা বন্ধ করিয়া গোয়াল ঘরে প্রবেশ করিল। সুরূপা বলিল,—

"ডাক্তার বাবু! কি ভাগ্য আজি, এদিকে যে পদধূলি পড়িল?"

তখন আগন্তুক রামচরণ ডাক্তার পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া বলিলেন,—

"আর তো পারি না। তোমার বাড়ী আর নাহক আসিব না। লাভ কেবল জ্বলিয়া পুড়িয়া মরা। তুমি আমার কষ্ট দেখিতে ভালবাস। আমাকে এমন করিয়া আসিতে বলার চেয়ে, আসিতে না বলাই ভাল।"

সুরূপা বলিল,—

"কি করি—ডাক্তার বাবু, আমার কি অসাধ? মেয়ে যে কিছুতেই বুঝে না। আমার এই বয়সে আমি বিস্তর বিস্তর মেয়ে দেখিলাম, কিন্তু এমন একগুঁয়ে মেয়ে কখন দেখি নাই। কি জানি রাধারমণ লক্ষ্মীছাড়া বেটা ওকে কি মন্ত্র দিয়েছে।"

ডাক্তার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"ঐ এক কথা। ও কথা শুনিয়া আর কাজ নাই। বুঝিলাম, তুমি আমার প্রতি সদয় নও। তা নহিলে এও কি হয়? তুমি পার না কি? তোমার কথা সোহাগ শুনে না, কেমন করিয়া বিশ্বাস করি।"

সুরূপা বলিল,—

"ধর্ম্মসাক্ষী, ডাক্তার বাবু আমার দোষ নাই। আমি পাখী পড়াইবার মত করিয়া প্রতিদিন সোহাগীকে বুঝাই। কত ভয় দেখাই, কত লোভ দেখাই, কত গহনা, কত টাকার কথা বলি, কোন কথাই সে কাণে ঠাঁই দেয় না। উত্তরের মধ্যে কেবল কান্না। কি করি বল দেখি ডাক্তার বাবু?"

ডাক্তার বলিলেন,—

"আমি ঢের দেখিয়াছি, ঢের জানি। কেন তুমিই কি জান না? প্রথম প্রথম ঐরকমই হয়ে থাকে। তার পর একবার চক্ষুলজ্জা ভেঙ্গে গেলে, পোষাপাখীর মত এসে গায়ে বসে।"

সুরূপা বলিল,—

"একথা সত্য। আমার বোধ হয় এক-বার রাজি করিতে পারিলে আর ভাবনা ভাবিতে হইবে না। কিন্তু সেই একবারই তো শক্ত কথা!"

রামচরণ বলিল,—

"শক্ত কিছুই নয়। তুমি একবার আমাকে সুবিধা করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে দেখাইয়া দিই আমি কেমন কাজের লোক।"

সুরূপা বলিল,—

"তাই ভাল। আজিকে আমি একবার ভাল করিয়া বলিয়া দেখি। কোন ভাল ফল ফলে ভালই, না হয় কালি তোমাকে ছাড়িয়া দিব। তুমি নিজে যা হয় করিও।"

রামচরণ বলিল,—

"বেশ।"

তাহার পর রামচরণ সুরূপার নিকটে আসিয়া চুপি চুপি অনেক কথা বলিল। উভয়ে অনেক হাসিল। তাহার পর ছাতা মাথায় দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রামচরণ চলিয়া গেলে সুরূপা আসিয়া আস্তে আস্তে ঘরের দাবায় বসিল। বসিয়া তুড়ি দিয়া হাই তুলিল। তাহার হাই শুনিয়া সোহাগ বাহিরে আসিল। আসিয়া জিজ্ঞাসিল,—

"কাহার সহিত কথা কহিতেছিলে? কে আসিয়াছিল মা?"

সুরূপা বলিল,—

"কেন আসিবে না? কত ভদ্রলোক আমার বাটীতে আইসে, কিন্তু তোর জ্বালায় আর তো কেহ আসিবে না। তুই পোড়ারমুখী আপনিও মলি, আমারও মাথা খেলি।"

"সে কি, আমি তোমার কি করিলাম? আমি কি করিতেছি যে, আমার জ্বালায় আর কেহ আসিবে না? তুমি আমাকে গালি দিতেছ কেন?"

সুরূপা বলিল,—

"গালি দিই কি সাধ করে? তুই কোন কথাই শুন্‌বি না, কোন কথাই বুঝবি না। মরণ হয় তো বাঁচি।"

সুরূপা এইরূপে অনেক আস্ফালন করিতে লাগিল, কিন্তু সোহাগ তাহার এতাদৃশ ভাবের বিশেষ কোন অর্থ স্থির করিতে পারিল না। আবার সোহাগ কাতর ভাবে বলিল,—

"আমি কি শুনি না, কি বুঝি না—বল। আমার জন্য তোমার কি জ্বালা হইয়াছে, তা বুঝাইয়া দাও। এত ধূমধাম করিতেছ কেন?"

তখন সুরূপা বলিল,—

"জ্বালা নয়? জ্বালা আর কারে বলে? ডাক্তার বাবুর কথা তোমাকে রোজ রোজ বলি, তুই পোড়ারমুখী আমার কথা শুনিস্?"

সোহাগ কাঁপিয়া উঠিল। বলিল,—

"মা—মা—আবার ঐ কথা। আমি তোমাকে বলিয়াছি, আমার প্রাণ থাকিতে আমি তোমার ওসব কথা শুনিব না। ঐ কথায় যদি তোমার রাগ হইয়' থাকে, তাহাতে আমার হাত নাই। তোমার রাগ হয় হউক, তোমার যাহা হয় হউক! আমি তোমার ওরকম কথা কখনই কাণেও ঠাঁই দেব না।"

সুরূপা রাগের ভাণ করিয়া বলিয়া উঠিল,—

"কি? এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার কথা তুমি কাণেও ঠাঁই দেবে না? আমিও যদি বৈষ্ণবের মেয়ে হই, তো আমার কথা তোমাকে শোনাবই শোনাব। অধর্ম্ম হবে—পাপ হবে? পোড়ারমুখী! তোর মার অধর্ম্ম হয় নাই—তোর দিদিমার অধর্ম্ম হয় নাই! আজি উনি গোবরে পদ্ম হয়েছেন। সকলই উল্‌টো—সকলই বাড়াবাড়ি। পোড়ারমুখো রেখো। রেখো কাণে কি হরিমন্ত্র দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে; রেখোও যা, আর এক জনও তা।"

"সোহাগ অধোবদনে কাঁদিতেছিল। এক্ষণে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—

"সে যাই হউক, আমি তাকে ছাড়া আর কাহাকেও জানি না—জানিতে যেন কখন

আমার মতিও হয় না। সে আমার দেবতা। ভগবান করুন, তার কাছে আমি যেন কখন অবিশ্বাসিনী না হই।”

সোহাগ রোদন করিতে লাগিল। সুরূপা বলিল,—

“কে সে বেটা, তার কিসের মুরোদ? সে এক মাসে যা রোজগার করে, তুই এক—দিনে তার দশগুণ পাবি। সোণা দানা পর্‌বি, সুখে থাক্‌বি,—তা হবে না!”

সোহাগ বাধা দিয়া বলিল,—

“সোণা দানা আমি চাই না। ভিক্ষা করিয়া গাছতলায় রাঁধিয়া খাইব সেও ভাল, তথাপি আমি ধর্ম্মের মাথা খাইব না। তুমি আর যদি আমাকে ওকথা বল, তাহা হইলে হয় আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব, না হয় জলে ডুবিয়া মরিব।”

সুরূপা বলিল,—

“সতীত্বের কুঁড়ি। দেখি কেমন তোর ধর্ম্ম থাকে। আমি কথা কইলে তোমার সয় না—আমি আর কথা কহিব না।”

এই বলিয়া সুরূপা, উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, সে স্থান হইতে চলিয়া গেল! সোহাগিনী সেই স্থানে বসিয়া আপনার অবস্থা চিন্তা করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাত্রি ৯টা হইবে। রাধারমণ বসিয়া ভাত খাইতেছে; সম্মুখে সোহাগিনী বসিয়া আছে। ঘরে মিট্ মিট্ করিয়া একটী ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছে। দরিদ্রের ঘর; তথায় শোভনীয় বা দর্শনীয় বস্তু কিছুই নাই। রাধারমণ জানে, সোহাগিনী তাহার ঘরে যে শোভা বিস্তার করিয়া আছে, ভূমণ্ডলে তাহার তুলনা হইতে পারে এমন সামগ্রী কুত্রাপি নাই; আর সোহাগিনী জানে, যাহার রাধারমণ আছে, এ জগতে তাহার নাই কি? এমন প্রেমপূর্ণ, এমন মমতাপূর্ণ, এমন আত্মবোধবিহীনতাপূর্ণ এবং স্বার্থপরতাপূর্ণ যে সংসার, বোধ করি দিল্লীশ্বরের সংসার অপেক্ষা সুখ তথায় লুকাইয়া থাকিতে অধিকতর ভালবাসে।

রাধারমণ লোকটা দেখিতে সুপুরুষ। বয়স পঞ্চবিংশ বর্ষ হইবে। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। চক্ষু আয়ত ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। দেহ দীর্ঘ, পরিণত এবং কৃশতা বা রুগ্নভাব বিবর্জ্জিত।

রাধারমণ ভাত খাইতেছে, আর সোহাগিনী তাহার সম্মুখে বসিয়া আছে। এক এক গ্রাস ভাত মুখে দিতেছে ও যতক্ষণ তাহা উদরস্থ না হইতেছে, ততক্ষণ রাধারমণ থাকিয়া থাকিয়া, নিরাভরণা স্বর্ণকান্তি সোহাগিনীর মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিতেছে ভাত খাইবার উপকরণ নিতান্ত অল্পই ছিল। সোহাগিনী বলিল,—

“ভাত কি আমার মুখে?”

রাধারমণ বলিল,—

“তরকারী বড় নাই তো! ভাত মুখে দিয়া তোমার মুখপানে চেয়ে থাকিলে, কি করিতেছি তাহা ভুলিয়া যাই। কাজেই তরকারীর কথা মনেও পড়ে না।”

সোহাগিনী হাসিয়া বলিল,—

“একথা আমাকে আগে কেন জানাও নাই। এমন সহজ উপায় থাকিলে আমি আর তরকারী রাঁধিব কেন? কালি হইতে বেশ করিয়া প্রদীপে জোর আলো লাগাইয়া তোমার

সম্মুখে জঁাকাইয়া বসিয়া থাকিব ; তুমি দেখিও আর ভাত খাইও।”

রাধারমণ বলিল,—

“যদি শ্রম বাঁচাইতে তোমার মন হয়, তাহা হইলে আরও পার। ভাত না রাঁধিলেও চলে ! আমি আসিতে আসিতে যে দিন তুমি গল্প করিতে আরম্ভ কর, সে দিন আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা মনে পড়ে না। এ উপায়ে ভাতও বাঁচান যায়।”

সোহাগ বলিল,—

“না, তাতে আমার কাজ নাই।”

রাধারমণ বলিল,—“কেন ?”

সোহাগ বলিল,—

“তাহলে আমার মদনমোহন রোগা হয়ে, শুকাইয়া যাবে, অসুখ হবে। তা হবে না। আমার মদনমোহন খুব ভাত খেলে আমি ভালবাসি।”

রাধারমণের আহার কার্য্য শেষ হইলে উঠিয়া বাহিরে হাত মুখ ধুইতে গেল। সোহাগিনী পাথরখানি তুলিয়া সেই স্থানে উপুড় করিয়া রাখিল এবং ভোজনাবশিষ্ট সকল বাহিরে ফেলিয়া দিল। রাধারমণ হস্তাদি প্রক্ষালন করিয়া ঘরে আসিলে, সোহাগ তাহাকে একটা পান দিল। পান মুখে দিয়া রাধারমণ তামাক সাজিতে বসিল। প্রদীপের নিকট চকমকির বাক্স লইয়া রাধারমণ বসিল এবং কথা কহিতে কহিতে তামাক সাজিতে লাগিল। অন্যমনস্ক হইয়া রাধারমণ যে ঘরে তামাক থাকে সেই ঘরে কলিকার গুল ঢালিয়া ফেলিল এবং যে ঘরে কয়লা থাকে তথায় তামাক খুঁজিতে লাগিল। তাহার তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার ভাত এবং ভাতের তরকারী সোহাগ তাহার সম্মুখে জঁাকাইয়া বসিয়াছে। সুতরাং রাধারমণের এই দশা। অনেকক্ষণ পরে রাধারমণ বলিল,—

“সোহাগি, আজি কি তামাক ফুরাইয়াছে ?”

সোহাগি ব্যাপারটা কি বুঝিতে পারিয়াছিল। হাসি চাপিয়া বলিল,—

“হাঁ, নাই হয় ত।”

তখন অগত্যা রাধারমণ চকমকি ছাড়িয়া আসিল এবং হুঁকা কলিকা একপার্শ্বে রাখিয়া দিল।

তখন সোহাগী হাসিতে হাসিতে চকমকি হাতে লইয়া রাধারমণকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসিল,—

“একি ? চক্ষু কোথায় রাখিয়া তামাক খুঁজিয়াছিলে ?”

রাধারমণ বলিল,—

“তাই তো, অনেক তামাক কাছে দেখিতেছি। আগে দেখিতে পাই নাই, সে তোমারই জন্য।”

তখন রাধারমণ পুনরায় উঠিয়া তামাক সাজিতে গেল। সোহাগী কলিকায় তামাক সাজিতেছে দেখিয়া, রাধারমণ একখানি কয়লা লইয়া প্রদীপে ধরাইতে লাগিল। প্রথমে ঠিক করিয়া দেখিয়া হাত, কয়লা ও প্রদীপ যথাসন্নিবিষ্ট করিল। কিন্তু তখনই তাহার নয়ন ও মন, যেখানে সোহাগীর অঙ্গুলি তামাক কুচাইয়া কলিকায় দিতেছে, তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। তথায় তামাকের কৃষ্ণবর্ণ, সোহাগীর নখের উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ এবং তাহার অঙ্গুলির চম্পকবর্ণ অনিয়মিত ক্রমে সমবেত হইয়া মনোহর শোভা সমুৎপাদন করিতেছে। রাধারমণের চক্ষু কি সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও থাকিতে পারে ? চক্ষু সেইখানেই গেল। সুতরাং হস্ত ও তৎসংস্পৃষ্ট কয়লা ক্রমে প্রদীপ হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িল। সোহাগী এ রহস্য দেখিল এবং প্রবর্দ্ধমান হাস্যের বেগ অতি যত্নে সংবরণ করিয়া বলিল,—

“কই, আগুন দেও।”

রাধারমণ তাড়াতাড়ি কয়লায় ফুঁ দিতে গিয়া দেখে, কয়লা যেমন কালো তেমনি কালো। সোহাগী হা হা শব্দে হাসিয়া উঠিল এবং রাধারমণের গলা জড়াইয়া ধরিল। রাধারমণ তাহাকে আলিঙ্গন-বদ্ধ করিয়া ফেলিল। উভয়ে অনেকক্ষণ এইরূপ থাকিল। তাহার পর সোহাগী বলিল,—

"তামাক খাও।"

রাধারমণ উঠিয়া তামাক সাজিল। সোহাগী চৌকীর উপর যে মাদুর বিছান ছিল, ভিজা গামছা দিয়া একবার তাহা মুছিয়া ফেলিল। রাধারমণ তামাক খাইয়া শয্যায় আসিয়া বসিল। সোহাগিনীও ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া বসিল; বসিয়া ধীরে ধীরে অগ্রকার সমস্ত বৃত্তান্ত রাধারমণকে জানাইল এবং আশঙ্কা ও অভিমান হেতু, কাঁদিয়া ফেলিল। সাদরে রাধারমণ সোহাগীর নয়নের জল মুছাইয়া দিল এবং বলিল,—

"এত ভাবনা কি? আমি গরিব বটি, কিন্তু আমি যাঁহার আশ্রিত তিনি দয়ার সাগর। তাঁহার গুণ বলিয়া শেষ করা যায় না। আমার প্রধান ভরসা ঈশ্বর, তাহার পর ভরসা হেমেন্দ্র বাবু। আমার কখন মনে হয় না যে আমি সহায়হীন বা নিরাশ্রয়। তোমার ভয় কি? যখন বিপদ বুঝিব তখন বাবুকে জানাইব, তিনি সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারেন—করিবেনও। ভাবনা কি?"

সেদিন এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা হইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন বেলা ২॥টা, ৩টার সময়ে সোহাগিনী আপনার ঘরের ভিতর শুইয়া আছে। একটু ঘুমও আসিয়াছে। বড় গ্রীষ্ম। সোহাগিনীর শরীরের স্থানে স্থানে ঘর্ম্ম বাহিরিতেছে। ললাটে স্থূল স্থূল ঘর্ম্মবিন্দু সকল মুক্তাফলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। পূর্ণায়ত পরিপুষ্ট দেহ যৌবন-শ্রীতে ঝলমল করিতেছে। গ্রীষ্ম ও মানবহীনতা হেতু, সোহাগিনীর শরীরের উর্দ্ধাংশ শিথিলবাস রহিয়াছে। সুন্দরীর স্বভাব-কোমল কমনীয় কান্তিতে নিদ্রা যেন আরও কমনীয়তা ঢালিয়া দিয়াছে। সুন্দরীর বদনে পাপ-সংস্পর্শ-বিহীনতা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিতেছে। পবিত্রতা সকল অঙ্গে মাখা রহিয়াছে। সুন্দরী ঘুমাইতেছে।

ধীরে ধীরে; অতি সতর্কভাবে, একটী লোক সেই গৃহে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া সেই অনাবৃত-অবয়বা সুন্দরীর নিটোল সৌন্দর্য্য—ভুবনমোহিনী কান্তি একবার হৃদয় ভরিয়া দেখিল। দেখিবামাত্র তাহার সর্ব্ব শরীর দিয়া তাড়িত-প্রবাহ ছুটিয়া গেল। তাহার পাশব মূর্ত্তি আরও পশুভাব ধারণ করিল। সে ধীরে ধীরে আসিয়া সুন্দরীর শয্যায় উপবেশন করিল এবং ধীরে ধীরে সুন্দরীর পবিত্র অঙ্গে আপনার দুষ্কৃতি-রাগ-রঞ্জিত, কলঙ্কিত হস্ত সমর্পণ করিল। স্পর্শ মাত্র সোহাগিনীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে বেগে শয্যাত্যাগ করিয়া লাফাইয়া উঠিল এবং ঘরের এক প্রান্তে গিয়া, "একি—একি?—মা—!"

বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

আগন্তুক হাসিয়া বলিল,—

"ভয় কি? মা কোথায়? সে সব জানে; ভাবনা কি? এ দিকে এস।"

সোহাগ বলিল,—

"ডাক্তার বাবু, আপনার একি ব্যবহার? আপনি কোন সাহসে দরজা বন্ধ করিয়া আমার ঘরে আসিলেন? আপনি এখনই চলিয়া যাউন।"

ডাক্তার অচল। চলিয়া যাইতে সে আসে নাই, এক কথায় সে চলিয়া যাইবে কেন? বলিল,—

"যাও যাও করিতেছ কেন? ভয় কিসের? এদিকে এস, তোমার মা সব জানে; সে না বলিলে কি আমি এসেছি?"

সোহাগ বলিল,—

"মা বলিয়া থাকে বলুক, আমি মার কথা শুনি না। আমার যেমন মন, যেমন ইচ্ছা তেমনই কাজ আমি করিব। আপনাকে আবার বলিতেছি, আপনি চলিয়া যাউন।"

ডাক্তার বলিল,—

"ছি! তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ দেখছি যে! তোমার এত ভয় কিসের?"

ডাক্তার উঠিয়া সোহাগের নিকটে চলিল। সোহাগ বলিল,—

"ডাক্তার বাবু! এ সকল মতলব ত্যাগ করুন। যাহা হইবে না, যাহা ভাল নয়, যাহা পাপকার্য্য তাহা কেন করেন? আমি বলিতেছি, যতক্ষণ আমি বাঁচিয়া থাকিব, ততক্ষণের মধ্যে আমাকে স্পর্শ করিতে কখনই আপনার সাধ্য হইবে না। এখনও বলিতেছি, আপনি চলিয়া যাউন।"

ডাক্তার বলিল,—

"এত কষ্ট করিয়া যদি তোমাকে আজি হাতে পাইয়াছি, তবে চলিয়া যাইব কেন?"

এই বলিয়া বেগে গিয়া সোহাগের হস্ত ধারণ করিল। সোহাগ সজোরে তাহার হস্ত হইতে হস্ত ছাড়াইয়া লইল এবং দৌড়িয়া দরজা খুলিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে গেল। তখন ডাক্তার দরজার গায়ে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল এবং দুই হস্তে সোহাগের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিল। সোহাগ হাত ছাড়াইয়া লইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তখন সোহাগ কাঁদিতে লাগিল। বলিল,—

"আপনার পায়ে পড়ি, ডাক্তার বাবু, আমার সর্ব্বনাশ করিবেন না। আপনি অত্যাচার করিলে আমি প্রাণে বাঁচিব না। আমি গরিব, আমি দুঃখিনী, আমাকে প্রাণে মারিয়া আপনার কি লাভ?"

কত রোদনই সোহাগ করিতে লাগিল, কত কাকুতি মিনতিই সে করিল। কিন্তু নর-প্রেত ডাক্তার কিছুতেই কর্ণপাত করিল না। সে তখন পশু—অথবা পশু অপেক্ষাও অধম। ডাক্তারের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টায় সোহাগ অনেক যত্ন, অনেক শ্রম করিল। শ্রমে, আশঙ্কায়, রোদনে এবং কাতরতায় সোহাগ নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন সোহাগের গাত্র-বসন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, কেশপাশ উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, ভয়ে শরীর কম্পিত হইতেছে, সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া স্বেদ বাহিরিতেছে, এবং ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে। তখন সেই অবসন্না, ধর্ম্ম-ভীতা বালিকা সাহায্যের নিমিত্ত সকলকে ডাকিতে লাগিল; কিন্তু কেহই আসিল না। তখন দেহ ও মনের শক্তি এককালে শিথিল হইয়া গেল—মূর্চ্ছা যায় যায় অবস্থা। তাহার বোধ হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার; ধূমময়—

অন্ধকারময় সংসার কেবল ঘুরিতেছে ; সে যেন একটা সামান্য কীট, সামান্য কীটেরও যে শক্তি আছে তাহার যেন তাহাও নাই। সে হতাশ হইয়া বলিল,—

"হা দয়াময়, হা ভগবন্! এই কি তোমার দয়া? দুঃখিনীর কথা তুমি শুনিলে না? দুঃখিনীকে রক্ষা করিতে তুমি কোনই সাহায্য করিলে না?"

আর কথা বালিকা বলিতে পারিল না। সে চেতনাহীনা হইয়া পাষণ্ড ডাক্তারের অঙ্কে পড়িয়া গেল। কিন্তু তাহার প্রার্থনা নিষ্ফল হইল না। স্বর্গে সে কথা ধ্বনিত হইল। ঈশ্বর তাহার সহায় হইলেন। তখনই সজোরে বারংবার বাহির হইতে দ্বারে আঘাত হইতে লাগিল। দ্বার ভাঙ্গিয়া গেল। এককালে চারি ব্যক্তি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রথম প্রবেশকারী রাধারমণ। সে বেগে,

"সোহাগি—সোহাগি আমার! ভয় কি? বাবু আসিয়াছেন।"

বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সোহাগীকে কোলে লইয়া বসিল এবং সযত্নে শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

তখন দ্বিতীয় প্রবেশকারী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় বলিলেন,—

"লোকটা কে?"

ডাক্তার তখন এক পার্শ্বে অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান। একজন অনুচর বলিল,—

"রূপনগরের রামচরণ ডাক্তার।"

হেমেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন,—

"বাঁধ বেটাকে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রামচরণ ডাক্তারের কীর্ত্তি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সন্নিহিত গ্রাম সকলের দরিদ্র অধিবাসীবৃন্দ ভয়ে বড় একটা কোন কথা বলিত না, এবং জানিয়াও জানিত না। কিন্তু এখন তাহাদের ভয় অনেকটা ঘুচিয়াছে। ভয় দূর হইবার এক প্রধান কারণ হেমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের ভরসা। তাহারা বুঝে ও জানে যে, হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় যখন ডাক্তারের বিরোধী, তখন ডাক্তারের আর নিষ্কৃতি নাই। তাহারা বহুকাল ধরিয়া ডাক্তারের নানা অত্যাচার দেখিয়াছে ও নীরবে সহ্য করিয়াছে। বহুকালের অন্তর্যাতনা এখন ব্যক্ত করিবার সুযোগ হইয়াছে বলিয়া, আজি চারি পাঁচ খানি ক্ষুদ্র গ্রামবাসী নরনারী কেবল রামচরণ ডাক্তারের চরিত্র, তাহার দুষ্কৃতি ও তৎকৃত অত্যাচারের আলোচনা করিতেছে। তাই বলিতেছি, আজি রামচরণ ডাক্তারের কীর্ত্তি বড় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। আজি ঘাটে পথে কেবল ভাগ্যবান্ রামচরণ ডাক্তারের কথা। রামচরণ ডাক্তারকে হেমেন্দ্র বাবু ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন, সে বেত খাইতেছে, সে ক্ষত বিক্ষত-কায় হইয়াছে ; সকল লোকের মুখে কেবল এইরূপ প্রসঙ্গ।

কেবল রূপনগরে রামচরণের ভবনের অনতিদূরস্থ এক ক্ষুদ্র কুটীর-মধ্যে অন্য ভাব। তথায় এক সুন্দরী কামিনী অত্যন্ত চঞ্চল ও ব্যাকুল ভাবে গৃহমধ্যে বেড়াইতেছেন, থাকিয়া থাকিয়া ঘরের দ্বার খুলিয়া এক একবার বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, আবার তখনই দ্বার রুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহার হস্তের অঙ্গুলি সকল আপনা আপনি নড়িতেছে,

সমস্ত দেহটা এক একবার কম্পিত হইতেছে। বহু রোদনে হেতু তাঁহার লোচন রক্তবর্ণ হইয়াছে। তিনি ক্ষণে ক্ষণে সজোরে গৃহ মধ্যস্থ যে কোন সামগ্রীকে উভয় হস্তে ধারণ করিতেছেন এবং ছাড়িয়া দিতেছেন। তাঁহার অস্থিরতার সীমা নাই।

এই কামিনী ক্ষীণাঙ্গী। তাঁহার দেহের বর্ণ চম্পকের ন্যায় সুগৌর, লোচনদ্বয় আয়ত ও সতেজ। মুখশ্রী অনুপম। সুন্দরীর হৃদয়ে বিজাতীয় জ্বালা উপস্থিত হইয়াছে। তাহার নিদর্শন তাঁহার বদন পরিব্যক্ত করিতেছে। তিনি অস্থিরতা সহকারে আবার একবার দ্বার খুলিলেন, একবার চারিদিকে চাহিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখনই আবার দ্বার রুদ্ধ করিলেন। দ্বার রুদ্ধ করিবার অত্যল্প কাল পরেই দ্বারে মৃদু আঘাত হইল। বাহির হইতে কে বলিল,—

"দরজা খোল।"

কামিনী ব্যস্ততা সহকারে দ্বার খুলিল এবং দ্বার খুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল,—

"কি দেখিলে? কেমন আছেন? মারিয়াছে কি? বড় কষ্ট পাইতেছেন কি? ধরিয়া রাখিয়াছে নাকি?"

যে স্ত্রীলোক সেই ঘরে প্রবেশ করিল, সে প্রথমে স্থির হইয়া বসিল, তাহার পর বলিল,—

"আছেন ভাল।"

কমিনী আবার জিজ্ঞাসিল,—

"আসিতেছেন না কেন? তাঁহাকে কি সাজা দিয়াছে? লোকে বলিতেছে তাঁহাকে মারিয়া অধম করিয়াছে। কেদারের মা, সত্য করিয়া বল, তাঁহাকে কেমন দেখিলে?"

"তাঁহাকে মারে নাই, অযমও করে নাই। অপমান, তিরস্কার অনেক করিয়াছে। আজি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবে। বিকাল বেলা হয় ত আসিবেন।"

তখন কামিনীর হৃদয়-জ্বালা অনেক শান্ত হইল। সে 'আঃ' বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার অস্থিরতা অনেক কমিয়া গেল। তখন সে বলিল,—

"হে ভগবন্! এ কষ্ট তো আর সহে না। যাহাকে প্রাণের প্রাণ বলিয়া ভাল বাসি, যাহাকে সতত হৃদয় মধ্যে রাখিতে পারিলেও তৃপ্তি হয় না, তাহার কষ্টের সংবাদে প্রাণ যায় যে।"

কেদারের মা বলিল,—

"তুমি তো তাঁর জন্য মর, কিন্তু তিনি তোমার কে? তুমি বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যা। কত লোভ দেখাইয়া, কত প্রেমের ফাঁদ পাতিয়া তিনি তোমার ধর্ম্ম, কুল, মান সকলই নষ্ট করিয়াছেন। তোমার আশা কি? তাঁহার নিকট হইতে প্রাণের ভালবাসা তুমি চাও। ফল কি দাঁড়াইয়াছে? তুমি এখন দুই দিন অন্তরও একবার তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলে আপনাকে কৃতার্থ মনে কর। তিনি এখন তোমার কাছে আসিতে হইলে ত্যক্ত হন। তাঁহার মন এখন কেবল নূতন নূতন ফুলের মধু পাইতে ব্যস্ত, তিনি এখন কেবল নূতন খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। তাই বলিতেছিলাম, তাঁর জন্য মর কেন?"

কামিনী অনেকক্ষণ অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিল; তাহার পর বলিল,—

"আমি মরি কেন জানি না। কে জানে রামচরণ আমার হৃদয়ে কি আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে? আমি এক দণ্ড রামচরণকে না দেখিতে পাইলে সংসার অন্ধকার দেখি। রামচরণ আমার সর্ব্বস্ব। সেই রামচরণ আমাকে মাথায় করিয়া আনিয়া পা দিয়া

জ্বালিতেছে। রামচরণ আমাকে স্বর্গে তুলিয়া এখন একেবারে নরকে ফেলিয়া দিতেছে, রামচরণ এখন আমার পানে একবার ফিরিয়া তাকাইতেও চাহে না—আমি এখন তাহার চক্ষের বিষ হইয়াছি।"

"রামচরণ যদি এখন তোমাকে ঘৃণা করে বুঝিয়াছ, তবে আর তাহার ভাবনা ভাবিয়া শরীর পাত করিও না। সে শঠ, সে প্রবঞ্চক, কেবল পর মজানই তাহার কাজ। তাহাকে ক্রমে ক্রমে ভুলিতে—মন হইতে দূর করিয়া দিতে চেষ্টা কর।"

কামিনী বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন মার্জ্জন করিয়া বলিল,—

"তাহাকে ভুলিব—তাহাকে মন হইতে দূর করিব কেমন করিয়া? হৃদয় চিরিয়া ফেলিলেও তাহা হইতে রামচরণের মূর্ত্তি নষ্ট হইবে না তো। রামচরণকে ভুলিতে পারিব না; রামচরণের নাম আমার জপমালা। তাহার মূর্ত্তি আমার দিবানিশির ধ্যান। আমি তাহাকে ভুলিতে পারিব না। কিন্তু রামচরণের ব্যবহার আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমি যাহাকে এমন করিয়া প্রাণ লুটাইয়া ভাল বাসি, আমি যাহার প্রেমের জন্য ধর্ম্ম, কুল, মান সকলই জলাঞ্জলি দিয়াছি, যাহার চরণে আমি পোষা কুকুরের ন্যায় সতত অনুগত হইয়া থাকি, সে যে আমাকে এমন করিয়া ঘৃণা করে, আমাকে আর পায়ের নখেও স্থান দেয় না, এ কষ্ট আর সহিতে পারি না।

কামিনী যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল সেই খানেই বসিয়া পড়িল এবং বসিয়া বসিয়া অধোবদনে রোদন করিতে লাগিল।

কেদারের মা বলিল,—

"তুমি ধন্য, তাই রামচরণের এই ব্যবহার এত দিন সহ্য করিতেছ। এ জন্য যা হয় একটা উপায় করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। রামচরণ তোমাকে যেমন জ্বালাইতেছে, তার তেমনই সাজা আবশ্যক। সে যা হয় পরে করিও। এখন উঠ, হাত মুখ ধোও, খাওয়া দাওয়ার চেষ্টা দেখ। আমি এখন আসি।"

কেদারের মা চলিয়া গেল।

বেলা অপরাহ্ণ। সূর্য্য পশ্চিমাকাশের নিম্ন ভাগে ঢলিয়া পড়িয়া, ক্রীড়াশীল বালকের ন্যায়, লালাভের মেঘের সহিত খেলা করিতেছেন। তাঁহার সমুজ্জ্বল হাস্য এখন আর সমতল ও নিম্নভূমি সকল দেখিতে পাইতেছে না। বৃক্ষচূড়া প্রভৃতি উন্নত অবস্থাপন্ন পদার্থপুঞ্জই অস্তোন্মুখ সূর্য্যের প্রশান্ত হাস্য-জ্যোতিঃ সন্দর্শন করিতেছে।

সেই গৃহমধ্যস্থ শয্যায় কামিনী অধোবদনে শুইয়া আছে। তাহার লোচন দিয়া অবিরল জল পড়িয়া উপাধান সিক্ত করিতেছে।

রামচরণ ডাক্তার হেমেন্দ্র নারায়ণের নিকট অব্যাহতি লাভ করিয়া রূপনগর আসিয়াছেন, কিন্তু তিনি কামিনীর নিকট আসেন নাই। কামিনী ভাবিয়াছিল, রামচরণ রূপনগরে আসিয়াই শত কর্ম্ম ফেলিয়া অগ্রে তাহার নিকট আসিবেন। তাহার সে আশা ফলবতী হয় নাই। রামচরণ বেলা ১০ টার সময় রূপনগর আসিয়াছেন, অথচ এখনও তাঁহার সাক্ষাৎ নাই। কামিনী আরও ভাবিয়াছিল, তিনি না জানি কতই লজ্জিত হইয়াছেন। হয়ত তিনি আমার নিকট কথা কহিতেই কাতর হইবেন। আমি তাঁহাকে কোন অনুযোগ করিব না। তিনি নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিলেই আমি পরম লাভ জ্ঞান করি, তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই আমি স্বর্গসুখ মনে করি। তাঁহার যত দোষ থাক্, তিনি আমার দেবতা, তাঁহাকে দোষের কথা বলিয়া লজ্জা দিব না।

কামিনী অনেক আশা করিয়াছিল। অনেক আশায় অনেক ছাই পড়িয়াছে। হৃদয়ের স্থিরতা—দৃঢ়তা আর কতক্ষণ থাকে? কামিনী হতাশ হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

কামিনীর যখন এই অবস্থা, তখন অতি ব্যস্ততা সহকারে সেই ঘরে এক জন লোক প্রবেশ করিল। সে ব্যক্তি রামচরণ। রামচরণের আগমন মাত্র কামিনী প্রথমে ঘাড় তুলিয়া দেখিল লোকটা কে? সে, রামচরণকে দেখিবামাত্র তাড়াতাড়ি চক্ষের জল মুছিয়া দৌড়িয়া আসিয়া রামচরণের গলা জড়াইয়া ধরিল এবং বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। মনে মনে যত অভিমান ছিল, একটু একটু করিয়া মনে যত রাগ জমিতেছিল, এক মুহূর্ত্তে সকলই উড়িয়া গেল।

রামচরণ গলা হইতে কামিনীর হাত ছাড়াইল এবং কামিনীর শয্যায় আসিয়া উপবেশন করিল। বলিল,—

"আমার কাজ আছে। আমি এখনই যাইব তুমি ভাল আছ তো?"

কামিনী আবার চক্ষুর জল মুছিল। সে বহুদিন হইতে রামচরণের অনাদর ভুগিয়া আসিতেছে। সুতরাং অনাদর তাহার পক্ষে নূতন নহে। কিন্তু আজি—এই বিপদের পর—এত অপমানের পর—কয়দিনের পর কামিনী ভাবিয়াছিল, রামচরণ তাহার প্রতি হতাদর করিবে না, রামচরণ তাহাকে মনের সমস্ত জ্বালা জানাইবে এবং সহানুভূতি পাইয়া শান্ত হইবে। রামচরণের কথার ভাব শুনিয়া সে বুঝিল, আজিও রামচরণ সেই রামচরণ। প্রণয়ের সুশীতল সলিল-সিঞ্চনে তাহার বিশুষ্ক হৃদয় আজি কিয়ৎপরিমাণে শান্ত হইবে বলিয়া সে আশা করিয়াছিল। বুঝিল, আশা সফল হইবে না। এ বুঝা আজ নূতন নহে। বহুদিন—বহুদিন ধরিয়া কমিনী রামচরণের উপেক্ষা ও অনাদর ভুগিতেছে। বহুদিন ধরিয়া তাহার কাতর হৃদয় ক্ষত বিক্ষত ও মথিত হইয়াছে। আজি তাহার সেই ক্ষত বিক্ষত হৃদয় আরও একটু ক্ষত হইল মাত্র। সমুদ্রে শিশিরসম্পাতবৎ তাহা গণনায় আসিল না। কামিনী বলিল,—

"তোমার ভাবনায় প্রাণ আমার ছট্ ফট্ করিতেছিল। আমি এ কয়দিন স্নান করি নাই, আহার করি নাই, নিদ্রা যাই নাই। তুমি দু দণ্ড বইস, তোমাকে দেখিয়া আমি প্রাণ জুড়াই।"

রামচরণ বলিল—

"আমার ভাবনায় তুমি স্নান আহার কর নাই, সে তোমার নিতান্ত বোকামি। আমার জন্য ভাবনা কি? আমি মরিয়াছি কি? কোন্ বেটাই বা এমন আছে যে, আমাকে কোন কথা বলে? তুমি কি ভাব আমি ছোট লোক?"

কামিনী বলিল,—

"ঈশ্বর করুন তোমার যেন কখন কোন বিপদ না হয়। তুমি যেন অক্ষয় পরমায়ু লইয়া সুখে থাক। লোকে নানা কথা বলে, সেই সব শুনিয়াই ভয়-ভাবনা হয়।"

রামচরণ বিরক্ত হইল। বলিল,—

"লোকে কি বলে? লোকে বলে আমি সোহাগী বৈষ্ণবীর প্রতি অত্যাচার করিয়াছি, কেমন? খুব করিয়াছি—আবারও করিব। তুমি লোকের কথা শুনিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছ। ভাবিয়াছ রামচরণ তোমার হাত ছাড়া হইয়া গেল। কেন রামচরণ কি তোমার কেনা গোলাম? আমি কি খতে পত্রে তোমার কাছে বিকিয়ে আছি? আমি যেখানে খুসি যাইব, যা খুসি তাই করিব, তাতে তুমি

কথা কইবার কে? তুমি খাবে, পরবে, থাক্‌বে। আমার উপর হুকুম চালাইতে বা আমার কথায় কথা কহিতে তোমার ক্ষমতা নাই।

কামিনী সমস্ত শুনিল। ভাবিল 'হৃদয় ফাটে না কেন? মানুষ এতও সহিতে পারে?' অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল,—

"রামচরণ, প্রাণনাথ! অদৃষ্টে এত কষ্ট লেখা ছিল, তাহা আমি জানিতাম না। আমি তোমাকে যে রকম ভাল বাসি তাহা অন্তর্যামী ভগবান্ ভিন্ন আর কে জানিবেন। হৃদয় যদি দেখাইবার হইত, প্রাণের কথা যদি জানাইবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে, রামচরণ, তোমাকে আমার হৃদয়ের ভাব দেখাইতাম, প্রাণের কথা জানাইতাম। আমি হতভাগিনী, দুঃখভোগ করিতেই আমার জন্ম। আমি অতি বাল্য-কালে বিধবা হইয়াছি। ধর্ম্ম, কুল, মান সকলই বিসর্জ্জন দিয়া আমি তোমাকে প্রাণ লুটাইয়া ভাল বাসিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম—তোমার প্রথমকার কথা শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, আমার দুঃখময় অদৃষ্টে এতদিনে সুখ দেখা দিল। আমি অতুল সুখ-সাগরে ভাসিলাম। কোন ক্ষতিকেই ক্ষতি বলিয়া মনে হইল না। আমি তোমার কথায় ভুলিয়া, তোমার ফাঁদে পড়িয়া, তোমার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলাম। কিন্তু রামচরণ, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, তুমি এখন আমার কি দুর্দ্দশা না করিতেছ? তুমি আমাকে হৃদয়ে রাখিবে বলিয়া আশা দিয়াছিলে, মনে পড়ে কি রামচরণ? তুমি আমাকে হৃদয়ের একমাত্র রাণী করিবে বলিয়া-ছিলে, সে কথা মনে আছে কি রামচরণ? তুমি আমার প্রেমের চিরদিন অধীন ও অনুগত থাকিবে বলিয়া লোভ দেখাইয়াছিলে, কত আকাশের চাঁদ হাতে তুলিয়া দিয়াছিলে, কত ফাঁদ পাতিয়াছিলে, তাহার কিছুই কি মনে নাই রামচরণ? মনে থাকুক বা না থাকুক, আমি তোমাকে সকল কথা মনে করাইয়া দিতে চাহি না। আমি মন্দভাগিনী—তত সুখে আমার কাজ নাই—আমার তত আশা নাই। কিন্তু রামচরণ, ধর্ম্ম, মাথার উপর আছেন। একবার ভাবিয়া দেখ, তুমি আমার কি দুর্দ্দশা না করিতেছ? আমি তোমার হৃদয়-রাজ্যে রাণী হইতে চাহি না। দিনান্তে তোমার চরণ দেখিতে পাইলেই আমি সুখী হই। তুমি দেখা দেও কি? দেও না। তোমার মুখে দুইটা মিষ্ট কথা শুনিলে আমি কৃতার্থ হই। তুমি মিষ্ট কথা বলা দূরে থাক, কেবল ঘৃণা, তিরস্কার ও জ্বালার কথা ছাড়া আর কিছু বল কি? বল না। রামচরণ, আমি মানুষ—ক্ষুদ্র মেয়ে মানুষ। আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণে আর কষ্ট সহে না। আমি তোমার পায়ে পড়ি, রামচরণ, হয় আমাকে বধ করিয়া সকল জ্বালার শেষ করিয়া দেও; নয় প্রাণেশ্বর, হৃদয়-দেবতা, আমাকে সুখী কর, আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত কর।"

এই বলিয়া কমিনী রামচরণের চরণ ধরিয়া বসিয়া পড়িল, এবং অবিরল ধারায় অশ্রু-বিস-র্জ্জন করিয়া তাহার চরণ সিক্ত করিতে লাগিল।

পাষাণ—ভীষণ পাষাণময় রামচরণের হৃদয় বিগলিত হইবার নহে। রামচরণ কামিনীর হস্ত হইতে পা ছাড়াইয়া লইল এবং বলিল,—

"কামিনী! তোমার অন্যায় কথা আমি কেমন করিয়া শুনি। আমি তোমাকে কোন্ বিষয়ে অসুখী করিয়াছি বল। আমি তোমাকে আনিয়াছি সত্য—কিন্তু তুমি না আসিলে তোমাকে ধরিয়া আনি নাই। তোমার খাওয়া পরার কোন কষ্ট নাই। গহনা প্রতিকার

আমার যেমন ক্ষমতা তোমাকে দিয়াছি, তবে তোমার অসুখ কি? তুমি হাতী ঘোড়া চাহিলে আমি কেমন করিয়া দিব?”

“প্রাণনাথ, ছি, ছি,! গহনা প্রতিকারের জন্য তোমার এ দাসী কাঁদিতেছে না। তাহা আমি চাহি না; খাওয়া পরা, তাহাতেও আমার প্রয়োজন নাই। আমি উপবাস করিয়া থাকিতে হইলেও কাতর হইব না। আমার ভিক্ষা কি? দাসী কেবল তোমাকে চাহে। এ সংসারে তুমি ছাড়া আর কোন পদার্থে তাহার লোভ নাই। আর তুমি তাহাঁকে যাহা দিয়াছ, তাহা ফিরাইয়া লও, সেই সকলের জন্য সে একটী দীর্ঘ নিশ্বাসও ত্যাগ করিবে না। তাহার একমাত্র প্রার্থনা—তুমি তাহার হও।”

রামচরণ হাঃ হাঃ শব্দে হাসিতে হাসিতে বলিল,—

“মন্দ নয়। এ সুখের সংসার, এ চাঁদের হাট বাজার, আমি তোমার জন্য সব ছাড়িয়া দিই। আমি তোমাকে খাইতে দিই, পরিতে দিই—তুমি আমার হইয়া থাকিবে। আমার সুখের জন্য তুমি। তোমার হুকুম মতে আমি চলিব, এ আশা তুমি ত্যাগ কর। এ সংসারে তোমার ন্যায় শত শত মেয়ে মানুষ গড়াগড়ি যাইতেছে। আমি কেবল তদ্গত চিত্তে তোমাকেই ধ্যান করিব, এমন আশা যদি তুমি মনে করিয়া থাক, তবে তোমার ভুল হইয়াছে। যাহা হইবে না, যাহা হইবার নহে, তাহা ভাবিয়া যদি তুমি মনকে কাতর কর সে দোষ আমার নহে।”

আবার কামিনী নীরবে সমস্ত কথা শুনিল। আবার ভাবিল, ‘মানব-হৃদয়ে এ কষ্টও সহে।’ বলিল,—

“তবে—রামচরণ—তবে কি আমার এ প্রাণের ভালবাসা নয়? তবে কি আমার এ ভালবাসা বেশ্যার প্রেম? তবে কি আমি, ডাক্তার বাবু, তোমার নিকট গহনার লোভে, খাওয়া পরার লোভে, সতীত্ব, ধর্ম্ম, কুল, মান বিক্রয় করিয়াছি? তবে তোমার উপর আমার অন্য দাবি দাওয়া কিছুই নাই কি? তবে, রামচরণ, তবে কি আমি তোমার বেশ্যা মাত্র।”

রামচরণ হাসিয়া বলিল,—

“কেমন করিয়া কি বলিব বল? কে জানে, তুমি মনে মনে কত কি ভাব। এখন আমি চলিলাম। আমার দরকার আছে। আবার দেখা হবে।”

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, রামচরণ ডাক্তার চলিয়া গেল। উত্তরের অপেক্ষা করিলে উত্তর দিত কে? কামিনীর চৈতন্য তখন কামিনীতে নাই। অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিল। দেখিল, ঘরে আর কেহ নাই। তখন উর্দ্ধ-নেত্র হইয়া করযোড়ে কামিনী বলিল,—

“হে দয়াময়, হে পতিতপাবন, হে অনাথ-নাথ ভগবান, এ ধর্ম্মহীনা, পতিতা, ভ্রষ্টার প্রার্থনা তুমি শুনিবে কি? হে বিধাতঃ, এ জ্বালা আর সহে না। দয়াময়! দয়া করিয়া এ দুঃখিনীর জীবনের শেষ করিয়া দাও। মৃত্যু! আমাকে তোমার আশ্রয়ে লইয়া যাও। রামচরণ—পাপিষ্ঠ, নরাধম রাম-চরণ, আমি ক্ষুদ্র বেশ্যা? আমার প্রেম কেনাবেচার সামগ্রী? হৃদয়ের হৃদয় হইতে পবিত্র প্রেম আমি তোমাকে অকাতরে দান করিয়াছি। তুমি মূর্খ, তুমি শঠ, তুমি আমাকে বেশ্যা বলিয়া মনে কর! তোমার প্রদত্ত ভূষণ এই ত্যাগ করিলাম, তোমার বস্ত্র আর পরিধান করিব না, তোমার পাপ অন্ন

ইহজীবনে আর উদরে দিব না। রামচরণ, প্রত্যক্ষ জানিও, আর আমি তোমার প্রেমের ভিখারিণী নহি। আজি হইতে, রামচরণ— আজি হইতে এই পদ-বিদলিতা ব্যথিতা কামিনী তোমার প্রাণ শত্রু হইল। প্রতিজ্ঞা করিলাম, তোমার চক্ষে জল দেখিয়া, তোমাকে ছট্‌ফট্ করাইয়া, তোমার পাপের সমুচিত শাস্তি দিয়া, আমি ইহজগৎ হইতে প্রস্থান করিব।'

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

মা ও মেয়ে।

—— * ——

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—— * ——

দিনের পর দিন গড়াইতে গড়াইতে চলিল। দিনে দিনে মিলিয়া সপ্তাহ, সপ্তাহে সপ্তাহে মিলিয়া মাস এবং মাসে মাসে মিলিয়া বৎসর চলিতে লাগিল। এক, দুই করিতে করিতে ক্রমে তিন বৎসর হইয়া গেল। পিতৃ-হীনা, দুঃখিনী, মরণাপন্না শরৎকুমারীকে আমরা সেই দারিদ্র্যদুঃখ-নিপীড়িত রুগ্ন-শয্যায় ফেলিয়া আসিয়াছি। পাঠক! একবার সেই নিরাশ্রয়া বালিকার সন্ধান লইতে আপনার মন ব্যাকুল হইতেছে না কি?

সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে রূপনগরে দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ের কুটীর-প্রাঙ্গণে একটী ভুবনমোহিনী বালিকা আকাশ পানে চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছে। বালিকার অবিন্যস্ত ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি পৃষ্ঠাচ্ছাদন করিয়া ঘাসের উপর পড়িয়া লুটাইতেছে। বালিকার দেহ ঢল্ ঢল্ করিতেছে। উজ্জ্বল, আয়ত প্রশান্ত লোচনদ্বয় স্থির ভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। বালিকা বাম হস্তে ভর দিয়া ঈষদ্বক্র ভাবে বসিয়া আছে। বালিকার বয়স দ্বাদশ অতিক্রম করে প্রায়। অনেকক্ষণ সেইরূপ ভাবে বসিয়া থাকার পর, বালিকার নয়নযুগল যেন অশ্রুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বালিকা দীর্ঘ নিশ্বাস সহ 'মাগো' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া আর একবার আকাশের পানে চাহিল, চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—

"একটী—দুইটী—তিনটী তারা ফুটিয়াছে। এখনই আরও কত ফুটিবে। শুনিয়াছি তারাতেও মানুষ থাকে। যাহারা এখানে মরিয়া যায়, তাহারা গিয়া কি তারায় মানুষ হইয়া বাস করে?"

বালিকার কথা শেষ হইতে না হইতে এক বৃদ্ধা নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—

"শরৎ! মা তুমি এখানে? একি মা, চক্ষু ভার কেন?"

এই বলিয়া বৃদ্ধা শরতের লোচনদ্বয় অঞ্চল দ্বারা মুছাইয়া দিলেন। শরৎকুমারী বৃদ্ধার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল,—

"না মা, আমি তো কাঁদি নাই।"

বৃদ্ধার বর্ণ সুগৌর—মূর্ত্তি ভক্তিজনক। তাঁহার হস্তদ্বয়ে শঙ্খ-ভূষণ, সীমন্তে সুবিস্তৃত সিন্দুর-বিন্দু ও ভ্রূযুগলের মধ্যদেশে এক উল্কি-

তিলক শোভা পাইতেছে। বৃদ্ধার পরিধান মলিন বস্ত্র। নবীন পাঠিকারা যাহাই মনে করুন, আমি এই প্রাচীনার মূর্ত্তিকে ভক্তিজনক বলিয়া ফেলিয়াছি। বস্তুতঃ সেই সরলতাপূর্ণা শান্তিস্বরূপার প্রবীণ অবয়ব যথার্থই ভক্তির উত্তেজক। এই প্রবীণা দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ের ব্রাহ্মণী—করুণাময়ী।

করুণাময়ী শরৎকুমারীর আগুল্ফ লম্বিত কেশরাশি নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন,—

"চুলগুলা কি এমনই করিয়া রাখিতে হয়? একগাছ দড়ি দিয়াও কি বাঁধিতে নাই? চুলগুলা নুড়ো নুড়ো হইতেছে যে।"

শরৎকুমারী হাসিতে লাগিল—কথায় অন্য কোন উত্তর দিল না। করুণাময়ী আবার বলিলেন,—

"খাওয়া দাওয়া মনে নাই। চল, ভাত খেতে হবে না?, শরৎ বলিল,—

"না মা, আমি হয়ত আজি খাব না। শরীর কেমন কেমন বোধ হইতেছে।"

করুণাময়ী সোৎসুক ভাবে বলিলেন,—

"সে কি মা, শরীর খারাপ বোধ হইতেছে! দিনে বুঝি ঘুমিয়েছিলে?"

"না মা, দিনে তো ঘুমাই নাই।"

"চুল বুঝি ভাল করিয়া শুকাও নাই?"

"না মা, চুল তো বেশ করে শুকিয়েছিলাম।"

"তবে কি জানি কেন, শরীর আবার খারাপ হলো। চল এখান থেকে, আর হিম লাগিয়ে কাজ নাই।"

মা ও মেয়ে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

শরৎকুমারীকে আমরা সেই বিপন্ন দশায় দেখিয়াছিলাম। সে রাত্রি সেইরূপ ভাবেই কাটিয়া যায়। পরদিন প্রাতে দীননাথ চট্টোপাধ্যায় শরৎকুমারীর পীড়ার অবস্থা দেখিতে যান। তিনি দেখিতে পান, মরণাপন্না শরৎকুমারী একাকিনী শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহারই অপরিমেয় যত্নে ক্ষুৎপিপাসা-পীড়িতা শরৎকুমারী কথঞ্চিৎ সুস্থ হয়। কিন্তু সুলোচনা কোথায়? সে সংবাদ শরৎকুমারী জানে না, কেহই জানে না। দীননাথ চট্টোপাধ্যায় সাধ্যমত অনুসন্ধানের ত্রুটি করিলেন না, কিন্তু কোন সন্ধান হইল না। কত লোক কত কথাই বলিতে লাগিল; সঙ্গত অসঙ্গত কতই অনুমান করিতে লাগিল। সকলই অনুমান মাত্র, কার্য্যতঃ কোন সন্ধানই হইল না। তখন দীননাথ চট্টোপাধ্যায় অগত্যা সে আশা ত্যাগ করিলেন। তাহার পর অনাথা, আশ্রয়হীনা, দারিদ্র্য-দুঃখ-নিপীড়িতা, ব্যাধি-ক্লিষ্টা শরৎকুমারীকে আপনার বাটীতে আনিয়া রাখিলেন। নিঃসন্তান দীননাথ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার ব্রাহ্মণী করুণাময়ী পিতৃ-মাতৃ-হীনা শরৎকুমারীর পিতা মাতার স্বরূপ হইলেন। বস্তুতঃ জনক জননী সন্তানকে যেরূপ স্নেহ যত্ন করিয়া থাকেন, তাঁহারাও শরৎকুমারীকে তাহাই করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অবস্থা নিতান্ত হীন, সুতরাং শরৎকুমারীকে তাঁহারা অননুভূতপূর্ব্ব সুখ সংবেষ্টিত করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু অপরিমিত আন্তরিক স্নেহ যদি দেবদুর্লভ সুখ হয়, তাহা হইলে শরৎকুমারীর সে সুখের সীমা ছিল না।

পিতাকে শরৎকুমারী চক্ষের উপর মৃত্যু-কবলিত হইতে দেখিয়াছিল, সুতরাং মনকে এক প্রকার বুঝাইতে পারিয়াছিল। কিন্তু সেই স্নেহময়ী জননী, যিনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া নিয়ত শরতের মস্তক সমীপে বসিয়া থাকিতেন, যিনি আপনি না খাইয়া শরৎকে খাওয়াইয়া সুখী হইতেন, যিনি শয়নে স্বপনে প্রতিনিয়ত শরতের চিন্তায় নিযুক্ত থাকিতেন—সে জননী

আজ কোথায়? বালিকা শরৎকুমারী জননীর চিন্তা হইতে মনকে একবারও বিরত করিতে পারে নাই। তিন বৎসরের অধিক সুলোচনার সন্ধান নাই। এই সুদীর্ঘ কালও শরৎকুমারীর চিত্তকে প্রশমিত করিতে সক্ষম হয় নাই, দীননাথ ও করুণাময়ীর চেষ্টাও সফল হয় নাই। বালিকা এখন সর্ব্বদা সেই চিন্তা করুক না করুক, থাকিয়া থাকিয়া এক একবার চমকিয়া উঠে এবং এক একবার দৌড়িয়া বাহিরে আইসে—মনে হয়, বুঝি মা কথা কহিতেছেন, বুঝি মা আসিয়াছেন। বালিকার আশা একদিনও সফল হয় নাই।

ঘর খানি যাহার নিকট বন্ধক ছিল, সে তাহা বেচিয়া লইয়াছে। তথাপি শরৎকুমারী সেই স্থানটায় প্রায়ই যায়। তাহার মনে হয়, যদি মা ফিরিয়া আইসেন, তাহা হইলে সেই স্থানেই আসিবেন। কিন্তু তাহাকে না দেখিতে পাইলে, হয়ত আবার চলিয়া যাইবেন। বালিকার দুরাশা!

বালিকা শরৎকুমারী এক্ষণে যৌবন-রাজ্যে প্রবেশ করিতেছে। শরীর ও মন ক্রমশই পরিণত হইয়া উঠিতেছে। প্রাবৃট্‌কালে প্রবাহিণী যেরূপ প্রতিদিনই পরিপুষ্ট হয়, তদ্রূপ শরৎকুমারীর শরীর যৌবন-সমাগম হেতু দিন দিন অধিকতর লাবণ্যযুক্ত ও বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর গঠন ক্রমেই অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিতেছে।

দীননাথ চট্টোপাধ্যায় দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে শরৎকুমারীর বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। শরৎকুমারীকে কেহ বিবাহ করিতে চাহে না। এমন অপার্থিব সৌন্দর্য্য, এমন সৎ-স্বভাব, এমন বুদ্ধি, এমন কন্যারত্ন—কেহ বিবাহ করিতে চাহে না। তাহার কারণ আছে। শরৎকুমারীর জননী নিরুদ্দেশ। সে সম্বন্ধে নানা লোক নানা কথা বলে। এমন অবস্থায় কোন্ সাহসী পুরুষ, সমাজের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, এই দেব-দুর্লভ কুমারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইবে? সুতরাং দীননাথ চট্টোপাধ্যায় বহু চেষ্টাতেও শরৎকুমারীর সুযোগ্য পাত্র স্থির করিতে পারেন নাই। পিতৃ-মাতৃহীনা দুঃখিনী বালিকার জীবনে একমাত্র সুখের আশা আছে—সে আশা বিবাহ। হায়! অভাগিনী শরৎকুমারীর অদৃষ্টে সে সুখও কি ঘটিবে না?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

*

সেই রাত্রেই শরৎকুমারীর একটু জ্বর হইল। একটুই হউক আর অনেকই হউক, দীননাথ ও করুণাময়ী বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। প্রাতে উঠিয়াই তাঁহারা চিকিৎসার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। শরৎকুমারী ধীরে ধীরে করুণাময়ীকে বলিল,—

"মা, আমার অসুখ বেশী নয়। হয়ত আপনিই যাইবে। বাবাকে ব্যস্ত হইতে বারণ কর।"

এ স্থানে পাঠকগণকে বিদিত করা বিধেয় যে পিতৃমাতৃ-হীনা শরৎ এক্ষণে পিতৃ-মাতৃ-স্থানীয় দীননাথকে পিতা এবং তাঁহার পত্নীকে মাতা বলিয়া থাকে।

সেদিন কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু শরৎ-কুমারীর অসুখ আপনি সারিয়া গেল না। তখন দীননাথ এক জন চিকিৎসক ডাকাইয়া রীতিমত চিকিৎসা না করাইলে নয় বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু ডাকা যায় কাহাকে? এক

রামচরণ ডাক্তার—তাঁহাকে তো কোন ক্রমেই ডাকা হইবে না। তবে আর আছে কে? রাজারহাট প্রভৃতি দূর স্থান হইতে চিকিৎসক আনাইলে হলে, তাহাতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। সেরূপ সম্ভাবনা কৈ? দীননাথ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে করুণাময়ী আসিয়া বলিলেন,,—

"তুমি যদি একটু কষ্ট করিতে পার, তাহা হইলে এখনও ডাক্তার পাওয়া যায়।"

দীননাথ জিজ্ঞাসিলেন,—

"আমি একটু কেন অনেক কষ্ট করিতে পারি, কিন্তু ডাক্তার কোথায়?"

করুণাময়ী বলিলেন,—

"শুভোর মার সঙ্গে এখনই পথে দেখা হইয়াছিল। সে বলিল, তার বাপের বাড়ি আনন্দপুরের জমিদার হেমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বেটা,—কি ভাল নামটা বলিল—কলিকাতায় থেকে ভারি পণ্ডিত হয়ে দেশে এসেছে। সে বড়মানুষের ছেলে, পয়সার তো ভাবনা নাই। কি কাঙ্গাল, কি বড় মানুষ সে সকলকে ঘর থেকে ঔষধ দিয়ে যত্ন করে চিকিৎসা কচ্চে। তার অনেক যশ শুনিলাম। তুমি অন্য মত ছেড়ে দিয়ে তারই কাছে যাও।"

দীননাথ ক্ষণেক চিন্তার পর বলিলেন,—

"অসম্ভব নয়। হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় অতি মহাশয় ব্যক্তি। আমার ব্রহ্মোত্তর জমি লইয়া যখন আমিনেরা গোল তুলিয়াছিল, সেই সময় আমি একবার তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম। তিনি আমার পরিচয় লইয়া যেরূপ যত্নে আমার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, আর আমার জমি যেরূপ সহজে খালাস দিয়াছিলেন, তাহাতে আমি বুঝিয়াছিলাম, তিনি যে অতি মহৎলোক তাহার আর কথা নাই।" করুণাময়ী বলিলেন,—

"তবে তো তোমার জানা শুনাও আছে। তবে তুমি তাই যাও।"

"যাইব বটে—কিন্তু বড়মানুষের ছেলে এতদূর কষ্ট করিয়া আসিবে কি?

করুণাময়ী বলিলেন,—

"তার যখন এমন দয়ার শরীর তখন আসিতেও পারে। যদি তার মন হয় তবে আসার ভাবনা কি? ভাল, গিয়াই তো দেখ।"

দীননাথ বলিলেন,—

"আচ্ছা, তাই ভাল। তুমি আমার ভাত বাড়।"

দীননাথ আহারাদি সম্পন্ন করিয়া একটী জীর্ণ ছাতা ও একগাছি বংশ-যষ্টি হস্তে লইয়া, মাথায় একখানি গামছা দিয়া, এবং কোমরে একখানি চাদর বাঁধিয়া রূপনগর হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী আনন্দপুর গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

রাত্রি ৮ টা ৮৷৷৹ টার সময় দীননাথ বাটীতে ফিরিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়াই তিনি শরৎকুমারীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"মা, কেমন আছ?"

শরৎকুমারী বলিল,—

"আমি ভাল আছি বাবা।"

তাহার পর দীননাথ শরৎকুমারীর কপালে একবার হাত দিয়া এবং হাত ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—

"হাঁ, জ্বর এখন নাই। কি খাবে মা?"

শরৎ বলিল,—

"বাবা, খেতে কিছুই ইচ্ছা নাই।"

"তবেই তো রোগের শেষ আছে। একটু ঔষধ পেটে পড়া চাই।"

করুণাময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"যে জন্য গিয়াছিলে, তাহার কি হইল?"

দীননাথ বলিলেন,—

"সে কাজ সফল হইয়াছে। কালি বেলা ১০টার মধ্যে দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় শরৎকে দেখিতে আসিবেন। আহা কি চমৎকার ছেলে। সার্থক লেখাপড়া শিখেছে। রূপে কার্ত্তিক, গুণেও আশ্চর্য্য! বয়স কি? বড় জোর ২২ কি ২৩। কথা যে মিষ্ট তা আর কি বল্‌বো? হৈমবতী ব'লে এক রকম নূতন চিকিৎসা উঠেছে, দেবেন্দ্র বাবু তাই শিখেছেন। কত লোকের বাড়ী গিয়ে রোজ দেখেন, কত জনকে ঔষধ দেন তার সংখ্যা নাই। যেমন বাপ তার তেমনই ছেলে।"

করুণাময়ী বলিলেন,—

"এমন বড়মানুষের ছেলে এতদূর হইতে আমাদের বাড়ীতে আসিবেন, তা তাঁকে একটু বসিতে দিবার জায়গাও আমাদের নাই।"

দীননাথ বিষণ্ণ ভাবে বলিলেন,—

"আমরা গরিব জানিয়াই তো তিনি আসিতেছেন। আমাদের কি সাধ্য তাঁকে সন্তুষ্ট করি?"

হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিবার জন্য দীননাথ বাহিরে আসিলেন।

শরৎকুমারী করুণাময়ীকে বলিল,—

"কালি জমিদারের ছেলে আমাদের বাটীতে আসিবেন। তাঁহাকে বসাইবার আসনের জন্য তুমি ভাবিতেছ। আমি যে কাঁথাখানি তৈয়ার করিয়াছি, সেই খানি পাড়িয়া তাঁহাকে বসিতে দিলে হয় না মা?"

করুণাময়ী বলিলেন,—

"সেত ভালই হয়। তারও যে খানিকটা বাকি আছে।"

"অতি সামান্য বাকি আছে, আমি রাত্রেই সেটুকু সারিয়া রাখিতেছি।"

"না মা, তাতে কাজ নাই। তোমার এই জ্বর। এর উপরে আবার রাত জাগিলে অসুখ বাড়িবে।"

"আধ ঘণ্টায় হবে মা, কোন ক্ষতি হইবে না।"

"কি জানি ভয় হয়, পাছে অসুখ বাড়ে।"

"কোন ভয় নাই মা। তুমি বল, আমি তাহলে, সেটুকু করে রাখি।"

"সার কর।"

তাহার পর শরৎকুমারী উঠিয়া সিন্দুক হইতে সেই চমৎকার শিল্প-কৌশল সংযুক্ত কাঁথা বাহির করিল। তাহাতে যেরূপ সূক্ষ্ম সূচীকার্য্য ছিল তদ্দৃষ্টে দূর হইতে সেখানি জামিয়ার প্রভৃতির ন্যায় উচ্চ মূল্যের সামগ্রী বলিয়াই ভ্রম জন্মে। শরৎকুমারী সূচ সূতা প্রভৃতি লইয়া অবশিষ্ট কার্য্য সমাপনার্থ বসিল।

চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার গৃহিণী আহার সমাপনান্তে শয়ন করিলেন। শয়ন কালে তাঁহারা শরৎকুমারীকে কাঁথা রাখিয়া শয়ন করিবার জন্য অনেক করিয়া বলিলেন। শরৎকুমারী, 'এই হইল, এখনই হইবে' প্রভৃতি বলিয়া শয়ন করিল না। বাকি কাজটুকু সারিতে রাত্রি দুইটা বাজিয়া গেল। শরৎকুমারীর মাথা ঝম্ ঝম্ করিতেছে, শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। শরৎকুমারী সেই অবস্থায় অবসন্নভাবে শয্যায় পড়িয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

---*---

বেলা ৮৷৷০ টার সময় দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভবনদ্বারে অনেক গোল। বলিষ্ঠ অত্যুচ্চ অশ্বারোহণ করিয়া এক যুবাপুরুষ কুটীরদ্বারে উপস্থিত। যুবার পায়ে উজ্জ্বল

বিলাতী জুতা ও শুভ্র মোজা,, পরিধান অতি পরিষ্কার ধুতি, গায়ে হরিদ্রাবর্ণের চীনাকোট এবং কোমরে কুঞ্চিত চাদর বাঁধা। যুবার মূর্ত্তি অতি প্রশান্ত ও সৌম্য, দেহ পরিণত ও বলিষ্ঠ, বদনমণ্ডল বিশেষ জ্ঞানবত্তার পরিচায়ক। সেই অশ্বারূঢ় যুবক, বিশেষতঃ সেই অস্থির, উজ্জ্বলকায় অশ্ব দেখিবার নিমিত্ত, তথায় অনেক বালক, যুবক ও প্রৌঢ় ব্যক্তি সমাগত হইয়াছে। যখন অশ্ব যে দিকে মুখ ফিরাইতেছে, যখন যেরূপে পুচ্ছান্দোলন করিতেছে, যখন যেরূপে ভূ-পৃষ্ঠে পদাঘাত করিতেছে, বালকেরা তদ্গতচিত্তে তাহা দর্শন করিতেছে এবং অতিশয় আনন্দ ও কৌতূহল প্রকাশ করিতেছে। অনেকগুলি স্ত্রীলোক বৃক্ষান্তরাল হইতে অশ্ব ও অশ্বারোহী পুরুষকে দেখিতেছে এবং ফুস্ ফুস্ করিয়া নানারূপ বর্ণনা করিতেছে। ফলতঃ নরনারী সকলেই যেরূপ আগ্রহ সহকারে এই দৃশ্য দর্শন করিতেছে, তাহাতে নিশ্চয় বুঝা যাইতেছে যে, এ দৃশ্য তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন ও বিস্ময়জনক।

একজন লোক চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ডাকিয়া দিল। তিনি বাহিরে আসিবামাত্র যুবা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন এবং দীননাথের সমীপাগত হইয়া তাঁহাকে বিনীত ভাবে নমস্কার করিলেন। অশ্বরক্ষক অশ্ব লইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল। বালক বালিকা বহুদূরে থাকিয়া অশ্বের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে লাগিল।

দীননাথ যৎপরোনাস্তি সমাদর সহকারে যুবককে সঙ্গে লইয়া কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তিনি এতাদৃশ ক্লেশ স্বীকার করায় আপনাকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আরও কতকগুলি পল্লিবাসিনী স্ত্রীলোক পুরমধ্যে প্রবেশ করিল। দীননাথ ব্রাহ্মণীকে দেখিয়া বলিলেন,—

"ইনিই দরিদ্রপালক, প্রাতঃস্মরণীয়, হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র—দেবেন্দ্র নারায়ণ রায়। ধনে মানে কুলে শীলে ইহঁদের সমান আর কে আছে? ব্রাহ্মণি, আজি আমাদের কুটীর পবিত্র হইল। ইনি অশেষ বিদ্যা শিখিয়া গরিবের উপকারের জন্য ডাক্তারিও করিতেছেন।"

দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় ব্রাহ্মণীকে প্রণাম করিলেন। করুণাময়ী বলিলেন,—

"ভগবান্ তোমাকে চিরজীবী করুন। আমরা গরিব দুঃখী, আমাদের আশীর্ব্বাদ ছাড়া আর কি উপায় আছে?"

দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন,—

"আমাকে সন্তান বলিয়া মনে করিবেন। আপনাদের আশীর্ব্বাদ আমাদের সকল মঙ্গলের হেতু।"

দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বিনয় ও শিষ্টাচার দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল। অতুল ঐশ্বর্য্যশালী, মহামাননীয়, সর্ব্বজন-পরিচিত হেমেন্দ্রনারায়ণের একমাত্র পুত্রের এতাদৃশ কোমল স্বভাব ও এতাদৃশ অচিন্তিতপূর্ব্ব ভদ্রতা দেখিয়া দুই একজন পল্লিবাসিনী স্ত্রীলোকের নয়নে আনন্দাশ্রু আবির্ভূত হইল। কেহ কেহ বা মনে মনে, কেহ কেহ বা প্রকাশ্যে বলিল,—

"বাবা, তুমি চিরজীবী হও; বাবা, তুমি ক্রোড়পতি হও।"

দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। শরৎকুমারীর স্বর্ণকান্তি তাঁহার নেত্র-পথে পতিত হইল। তিনি অবাক্ হইলেন। দরিদ্রের কুটীরে এমন স্বর্ণকমল কে আশা করে? দেবেন্দ্র বুঝিলেন এরূপ রূপরাশি

আর কখন তাঁহার চক্ষুগোচর হয় নাই; তিনি আজি আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"ইহাঁরই কি অসুখ হইয়াছে? কি অসুখ?"

দীননাথ অসুখের বৃত্তান্ত সমস্ত বলিলেন। তাহার পর করুণাময়ী বলিলেন,—

"বাবা, তুমি আজ আসিবে, কিন্তু আমরা কাঙ্গাল মানুষ কোথায় তোমাকে বসিতে দিব বলিয়া ভাবিতেছিলাম। মেয়ে আমার ঐ কাঁথা তৈয়ারি করিয়াছিলেন। ওতে একটু কাজ বাকি ছিল। ওতেই তোমাকে বসিতে দিতে হইবে মনে করিয়া, বাকি কাজটুকু জেদ করিয়া সারিয়া রাখিবার জন্য, মেয়ে কালিকে শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়াছেন।"

দেবেন্দ্র বলিলেন,—

"এই কাঁথা এঁর তয়েরি? এযে অতি চমৎকার সামগ্রী!"

শরতের বদন লজ্জাযুক্ত হইল। ধীরে ধীরে শরৎ নয়নদ্বয় মুদিল। দেবেন্দ্র বুঝিলেন যে পীড়িতা কেবল ভুবনমোহিনী সুন্দরী নহেন, তিনি অসাধারণ শিল্পনিপুণা।

তাহার পর বলিলেন,—

"রাত্রি জাগিয়া অন্যায় করিয়াছেন। আমার জন্য এরূপ কষ্ট করিয়াছেন বলিয়া আমি আরও দুঃখিত হইতেছি, আমার জন্যই আজি তবে উহাঁর অসুখ বাড়িয়াছে।"

শরৎ আরও লজ্জিত হইলেন।

দেবেন্দ্র বলিলেন,—

"হাত দেখি।"

দেবেন্দ্রনারায়ণ ঘড়ি খুলিয়া তাহার সহিত মিলাইয়া রোগীর হাত দেখিলেন, তাহার পর জিহ্বা, তাহার পর চক্ষু ইত্যাদি পরীক্ষা করিলেন এবং নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার পর সমভিব্যাহারী একজন লোককে ঔষধের বাক্স আনিবার নিমিত্ত বলিয়া পাঠাইলেন। একজন লোক একখানি পরিষ্কৃত তোয়ালে বাঁধা একটী সুন্দর বাক্স আনিয়া দিল। বাক্সয় দুই খানি বড় বড় ইংরাজি পুস্তক এবং ৪।৫ খানি ছোট ছোট বাঙ্গালা পুস্তক ছিল। দেবেন্দ্র বাক্স খুলিয়া বলিলেন,—

"যে ঔষধ দিতেছি তাহা খাইতে কোন কষ্ট নাই। আজি নিয়মমত ঔষধ খাইলে, কালি আর কোন অসুখ থাকিবে না।"

দীননাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"এ কি ডাক্তারি ঔষধ বাবু?"

দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন,—

"আজ্ঞা হাঁ, এ ডাক্তারি ঔষধ বটে। ইহার নাম হোমিওপ্যাথি। এ চিকিৎসা বড় নির্ব্বিঘ্ন, অথচ বড় উপকারী। আপনারা যদি শিখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি ইহার বাঙ্গালা পুস্তক দিতে পারি। তাহা পাঠ করিলেই সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিবেন এবং অনেক চিকিৎসা শিখিতে পারিবেন।"

দীননাথ বলিলেন,—

"আমি আর বুড়া বয়সে কি শিখিব বাবু? শরত মা, তুমি তো দিন রাত্রি পড়, তুমি এ বই পড়িবে কি?"

ব্রীড়া-নম্র-বদনা শরৎকুমারী চুপ করিয়া রহিল।

দেবেন্দ্রনারায়ণ জিজ্ঞাসিলেন,—

"উনি পড়িতে জানেন?"

করুণাময়ী বলিলেন,—

"জানেন বই কি? কত রামায়ণের কথা, কত মহাভারতের কথা, কত মেঘনাদের কথা, মা কত কথাই আমাদের বই পড়িয়া বুঝাইয়া দেন। বই নিয়ে আর সূচ নিয়ে মা দিনরাত্রি ব্যস্ত। ওঁর প্রায় এক সিন্দুক বই।"

দেবেন্দ্র বলিলেন,—

"তবে উনিই পড়িবেন। এ বিদ্যা ওঁরই শিক্ষা করা আবশ্যক।"

এই বলিয়া দুই খানি পুস্তক দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে প্রদান করিলেন। তাহার পর রোগীর পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং বিদায় প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,—

"হয়ত কালি একবার আসিব।"

তাহার পর শরতের দিকে চাহিয়া বলিলেন,

"আজি যেন আবার শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিও না। অনেকক্ষণ ধরিয়া যেন পড়িও না। কাঁথা শেলাই করিতে হয়, ভাল হইয়া করিও। আমি এখন আসি।"

শরৎ লজ্জা সহকৃত ঈষদ্ধাস্য সহ বদন বিনত করিলেন।

ব্রাহ্মণীকে প্রণাম করিয়া দেবেন্দ্র বাহিরে আসিলেন। দীননাথের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া এবং সন্নিহিত ব্যক্তি সকলের প্রতি প্রীতিপূর্ণ হাস্য সহ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেবেন্দ্র অশ্বে আরোহণ করিলেন।

দীননাথ কৃতজ্ঞতা সূচক দুই একটা কথা বলিবেন মনস্থ ছিল, কিন্তু তাহা বলিবার আর সময় হইল না। দেবেন্দ্রনারায়ণের অশ্ব সবেগে ছুটিল। দেবেন্দ্রনারায়ণ ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন,—অদ্য তাঁহার সুপ্রভাত—অদ্য তিনি যে বালিকা দেখিলেন, তিনি রমণী রত্ন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—•—

পরদিন প্রায় সেই সময়েই, দেবেন্দ্রনারায়ণ কুমারীকে দেখিবার নিমিত্ত, রূপনগরে দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভবনে আগমন করিলেন। তিনি দেখিলেন শরৎকুমারী ভালই আছেন। অন্নাহার ব্যবস্থা করা হইল। তাহার পর দেবেন্দ্রনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"চিকিৎসার পুস্তক কিছু পড়া হইয়াছিল কি?"

শরৎকুমারী বলিল,—"একটু একটু পড়িয়াছি।"

দেবেন্দ্র বাবু আবার জিজ্ঞাসিলেন,—

"হোমিওপ্যাথিক কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছ কি?"

শরৎকুমারী বলিল,—

"তাহা বলিতে পারি না।"

তখন দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন,—

"বিষয়টা বড় শক্ত। যদি কোন সন্দেহ থাকে তাহা আমাকে বলিলে আমি বলিয়া দিতে চেষ্টা করি।"

দীননাথ বলিলেন,—

"তুমি যাহা বুঝিয়াছ, বাবুকে বল। যদি কোন জায়গায় ভুল থাকে বাবু বলিয়া দিবেন এখন।"

শরৎকুমারী লজ্জায় বদনাবনত করিলেন।

করুণাময়ী বলিলেন,—

"তাহাতে দোষ কি মা? বলনা কেন?"

শরৎকুমারী ধীরে ধীরে অতি অল্প কথায়, সেই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে যতদূর বুঝা যায় তাহা ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণ বিস্ময় মনে করিলেন। তিনি কখনই এত দূর প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি শরৎকুমারীকে আরও এক খানি হোমিওপ্যাথিক পুস্তক প্রদান করিলেন ও সময়ে সময়ে ভাল ভাল পুস্তক পাঠাইয়া দিতে চাহিলেন এবং তাহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহার পর হাসিতে হাসিতে শরৎকুমারী ও করুণাময়ীর নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,—

"চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত হয়ত কত শত বার সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু আপনাদের সহিত আর সাক্ষাৎ ঘটিবে না। আপনারা আমাকে আপনার লোক বলিয়া জানিবেন এবং যখন কোনরূপ আবশ্যক পড়িবে তাহা আমাকে বলিতে সঙ্কোচ করিবেন না।"

করুণাময়ী তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

শরৎকুমারীর বদন বিমর্ষ হইয়া গেল।

দেবেন্দ্রনারায়ণ বাহিরে আসিলেন। দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ও সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। দেবেন্দ্র বাহিরে আসিয়া দীননাথকে শরৎকুমারী সংক্রান্ত নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দীননাথ তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ জানাইলেন এবং যে কারণে এখন পর্য্যন্ত শরতের বিবাহ হয় নাই, তাহাও বলিলেন।

দেবেন্দ্র বলিলেন,—

"বড় দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু শরৎকুমারীর মাতার ভালরূপ সন্ধান হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আমি একবার এ সম্বন্ধে সন্ধান করিব। আপনি সে সময়ে একথা, আমার পিতা ঠাকুরকে জানাইলে, বোধ হয়, বিশেষ উপকার হইত। যাহা হউক, আমি অদ্যই গিয়া তাঁহাকে একথা জানাইব; বোধ করি, তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল হইবে না।"

দেবেন্দ্রনারায়ণ ভাবিতে ভাবিতে অশ্বারোহণ করিলেন। তাঁহার মনে হইল, যে ব্যক্তি শরৎকুমারীর স্বামী হইবে, এজগতে সেই ভাগ্যবান্।

সেই দিন প্রদোষকালে শরৎকুমারী ঘাসের উপর বসিয়া রহিয়াছে। আজি কিন্তু তাহার দৃষ্টি আকাশে নাই, আজি তাহার চিত্ত তারা-গণনায় নিযুক্ত নহে। আজি তাহার মনে স্বতন্ত্র প্রকার চিন্তা-প্রবাহ দেখা দিয়াছে। সে চিন্তার নাম কি তাহা সে জানে না, কেন মনের এ ভাব হইল তাহা সে বুঝে না, এভাব কিসের অঙ্কুর তাহাও সে জানে না, তথাপি তাহার চিত্ত-ক্ষেত্র আজি অভিনব চিন্তাতরঙ্গে আন্দোলিত। এ চিন্তার পরিণাম সুখ কি দুঃখময়, বালিকা তাহা এক একবার ভাবিতেছে, আবার তখনই সে ভাবনা হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিতেছে। বালিকা ভাবিতেছে—'মানুষ তো সকলেই, কিন্তু দেবেন্দ্রনারায়ণ আশ্চর্য্য মানুষ! এত দয়া, এত পরোপকার প্রবৃত্তি, এমন বিনয়, এত শিষ্টাচার, এত পাণ্ডিত্য, এক সঙ্গে আর কাহার আছে? দেবেন্দ্রনারায়ণ সাধারণ মনুষ্য নহেন। তিনি মনুষ্যের মধ্যে দেবতা।"

বলা বাহুল্য যে, শরৎকুমারী দেবেন্দ্রনারায়ণের গুণের বিশেষ পক্ষপাতিনী হইয়াছে।

বালিকা আবার ভাবিতেছে,—"যাহারা সর্ব্বদা এই দেবতার কাছে বাস করিতে পায়, তাহারাই সুখী। যাহারা দেবেন্দ্রকে আমাদের বলিতে পায় তাহাদের কি অতুল আনন্দ! তাহারা জীবনে নিশ্চয়ই স্বর্গসুখ অনুভব করে।"

বলা বাহুল্য যে শরৎকুমারী দেবেন্দ্রনারায়ণের নিতান্ত অনুরাগিণী হইয়াছেন।

বালিকা আবার ভাবিতেছে,—"তাঁহার সহিত ইহ জীবনে আর সাক্ষাৎ হইবে না। হায় আমার রোগ এত শীঘ্র সারিল কেন? রোগ না সারিলে প্রতিদিনই তো তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম। তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া সুস্থ থাকার অপেক্ষা, তাঁহাকে নিত্য দেখিতে দেখিতে চিরদিন রোগ-শয্যায় পড়িয়া

থাকাও ভাল। চেষ্টা করিয়াও তো রোগ করা যায়। আমি তাহাই করিব।”

বলা বাহুল্য যে, শরৎকুমারী দেবেন্দ্র-নারায়ণকে অজ্ঞাতসারে স্বীয় চিত্ত সমর্পণ করিয়াছে।

এই সকল ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে চিন্তা-তরঙ্গ ক্রমশঃ রূপান্তর পরিগ্রহ করিল। শরতের মনে হইল—“মা যদি থাকিতেন, তবে আজি এই দেবেন্দ্রনাথরায়ণকে দেখিয়া তাঁহার, না জানি, কত সুখই হইত। বাবার মৃত্যুর পর এমন লোক আর আমরা দেখি নাই। হায়! আজি মা কোথায়? আজি মা এই দেবতার কতই বর্ণনা করিতেন; আমি তাঁহার মুখে দেবেন্দ্রের কতই সুখ্যাতি শুনিয়া কতই পুলকিত হইতাম; আমার মার যদি বা কোন কথা বলিতে ভুল হইত, আমি তাহা বলিয়া দিতাম। মাগো! বাবার মৃত্যুর পর—তোমার অন্তর্ধানের পর, তোমার এ অভাগিনী কন্যা আর একদিনও আজিকার মত আনন্দ পায় নাই। এ সময়ে মা আমার কোথায় রহিলে? তুমি আইস মা, আমি আজি তোমার গলা জড়াইয়া মুখে মুখ রাখিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণের কথা বলি।”

দুঃখিনী বালিকা অঞ্চলে বদন আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—*—

সপ্তাহ অতীত হইল। বেলা প্রায় তিনটা। দীননাথ বাটি নাই, খাজনা আদায় করিতে গিয়াছেন। করুণাময়ী রান্না ঘরের মধ্যে অঞ্চল পাতিয়া শুইয়া আছেন। ঘরের ভিতর দুইটি সুন্দরী বসিয়া কথোপকথন করিতেছে; সুন্দরীদ্বয়ের একজন শরৎকুমারী, অপরা আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিতা, কল্যাণপুরের সুরূপা বৈষ্ণবীর কন্যা সোহাগী। সোহাগী কতক গুলি বঙ্গসাহিত্যের উৎকৃষ্ট পুস্তক লইয়া আসিয়াছে। কতকগুলি অতি উত্তম কাগজে জড়ান এবং তাহার উপর রেশমী ফিতা দিয়া বাঁধা। সকল পুস্তকের উপরই লাল কালিতে অতি পরিষ্কার অক্ষরে লিখিত,—

“শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীকে

উপহার স্বরূপে

প্রদত্ত হইল।”

“আমি কি বলিয়া কি বলিব? আমাকে যে তাঁহার মনে আছে, ইহা আমার নিতান্ত সৌভাগ্য। আর কি বলিলে ভাল হয়, তাহা আমি জানি না। তুমি ভাই, ভাল করিয়া যাহা বলিতে হয় বলিও।”

সোহাগিনী বলিল,—

“আমি কেমন করিয়া বলিব? আমার সঙ্গে তো তাঁর দেখা হবে না।”

“তবে তোমাকে বই দিল কে?”

“আমার স্বামী তাঁহার কাছারীতে কাজ করেন। তিনি স্বামীকে বড় ভাল বাসেন, বিশ্বাস করেন। আমাদের বাড়ী কল্যাণপুর। স্বামীকে তিনি এই বইগুলি দিয়া বলিয়া দেন যে, কোন বিশ্বাসী মেয়ে মানুষের হাত দিয়া এগুলি তোমার কাছে পৌছাইয়া দিতে হইবে, এবং তুমি কেমন আছ সে খবরও বিশেষ করিয়া জানিতে হইবে। পাছে অপর কোন লোকের দ্বারা ঠিক বাবুর মনের মত কাজ না হয়, এই ভয়ে আমার স্বামী আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।”

শরৎ সোহাগীর হাত ধরিয়া বলিলেন,—

"তবে ভাই, তুমি আমার জন্য অনেক কষ্ট করিয়াছ!"

সোহাগ বলিল,—

"তোমার জন্য ভাবিয়া তো করি নাই। বাবুর কাজ আমার স্বামীর করিতেই হইবে, আর স্বামীর করিতে হইলে কাজেই আমারও করিতেই হইবে। ইহাতে আমার বেশী কিছুই করা হয় নাই।"

"আমার খবর তুমি জানিয়া গেলে; কিন্তু যে দেবেন্দ্র বাবু আমাদের মত কাঙ্গাল দুঃখী লোকদের এত দয়া করেন, যিনি আমাদের এত অনুগ্রহ করেন, তাঁহার কোন খবর তো আমি জানিতে পারিলাম না। তুমি তো সেখানে কখনও যাও না।"

সোহাগ বলিল,—

"কেন যাইব না? আমি প্রায়ই তাঁদের বাড়ী যাই, সেখানে খাই দাই, থাকি। তা ছাড়া আমার স্বামীর মুখে তাঁহাদের খবর রোজি পাই। তুমি বাবুর কথা কি জানিতে চাও, বল। আমি সব খবর দিতে পারি।"

তখন শরৎকুমারী একে একে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিল। তিনি কেমন করিয়া লোক-জনের সঙ্গে কথা কহেন, তাঁহার স্বভাব কেমন, তাঁহার দয়া কেমন, তিনি কেমন করিয়া খান, কতক্ষণ পড়েন, সমস্ত দিন কি করেন, তাঁহার পিতৃ-মাতৃ ভক্তি কেমন, ইত্যাদি নানা কথা শরৎকুমারী জিজ্ঞাসা করিল এবং সোহাগী তাহার যে উত্তর দিতে লাগিল, তাহা নিজের মনের মত, হওয়াতে দেবেন্দ্রের প্রতি দেবতা বলিয়া তাঁহার যে ভক্তি ছিল, সেই ভক্তি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ভক্ত যেরূপ ভাবে হরি-গুণগাথা শ্রবণ করে, শরৎ সোহাগীর কথা সকল তদ্রূপ ভাবে শ্রবণ করিতে লাগিল।

রাধারমণ সোহাগীকে বলিয়াছিল যে, "বাবু মেয়েটিকে বড় ভালবাসেন—বোধ হয়।" সোহাগী বুঝিল,—"ছুঁড়িটা বাবুকে বড় ভাল-বাসে—নিশ্চয়।"

তাহার পর সোহাগী বলিল,—

"তবে এখন আমি আসি।"

শরৎ বলিল,—

"তা হবে না ভাই,—দেবেন্দ্র বাবুর এত দয়ার কথা মা শুনিয়া কি বলেন তাহা না শুনিয়া তোমার যাওয়া হবে না। দাঁড়াও মাকে ক।"

এই বলিয়া শরৎকুমারী করুণাময়ীকে ডাকিয়া আনিয়া, সমস্ত কথা বলিল এবং অতি আহ্লাদ ও গৌরব সহকারে একে একে তাঁহাকে পুস্তকগুলি দেখাইল। করুণাময়ী সমস্ত দেখিয়া অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—

"আমরা কাঙ্গাল। আমাদের যে তিনি এত দয়া করেন, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমরা তাঁহারই আশ্রিত।"

সোহাগী করুণাময়ীকে প্রণাম করিয়া বিদায় চাহিল। করুণাময়ী বলিলেন,—

"তা কি হয়? তোমায় একটু জল খাইয়া যাইতে হইবে। আমরা গরিব, আমাদের ঘরে তো আর কিছু নাই। চারিটি চালভাজা আর একটু গুড় আছে, তাই খেয়ে একটু জল খাও।"

সোহাগ বলিল,—

"মা ঠাকুরাণি, আমি আপনার দাসী। দাসীকে যা ইচ্ছা হয় দেন।"

সোহাগের জলখাওয়া হইলে সে বিদায় হইল। তাহাকে বিদায় দিবার নিমিত্ত শরৎ-

কুমারী ও করুণাময়ী ভবনদ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন। সোহাগ দৃষ্টির সীমা ছাড়িয়া গেল। শরৎ ভাবিলেন, 'দেবেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে যে কুমারীর বিবাহ হইবে, সে না জানি কত যুগ যুগ কত তপস্যাই করিয়াছে।' তাঁহারা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই রামমতি নাম্নী এক অর্দ্ধ-বয়সী প্রতিবেশিনী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"তোমাদের বাড়ী থেকে ও মেয়ে মানুষটি চলিয়া গেল, ও কে গা?"

করুণাময়ী বলিলেন,—

"ওর বাড়ী কল্যাণপুর, ও বৈষ্ণবদের মেয়ে।"

"ওমা! এতদূর থেকে একলা তোমাদের বাড়ী কেন এসেছিল? কই আর তো ওকে কখন দেখি নাই।"

"না, আর কখনও আসে নাই। একটু দরকারের জন্য আজি এসেছিল!"

"কল্যাণপুরে বৈষ্ণবদের যে পুরাণ জ্বরের ঔষধ আছে, তাই বুঝি শরতের জন্য ওকে দিয়ে আনাইলে?"

"না তা নয়। ও একজন লোকের কাছ থেকে এসেছিল।"

"কার কাছ থেকে? কই, কল্যাণপুরে তোমাদের জানা শুনা কেহই নাই তো।"

"না, কল্যাণপুরের কোন লোকের কাছে থেকে আসে নাই।"

"তবে কোথাকার লোক? যার কাছে থেকেই হউক, কোন অমঙ্গল না হইলেই হলো মা, আমাদের এই কথা।"

তাহার পর যেন নিজে বলিতে লাগিল,—

"ওদিকে তোমাদের কে আছে? আমরা কি সব জানি? আনন্দপুর থেকে তো ও আসে নাই গা?"

করুণাময়ী বলিলেন,—

"হাঁ—তাই বটে!"

"হাঁ—হাঁ রাজা বাবুর কাছে থেকে বুঝি? কিছু দিয়েছে কি গা? আহা হউক, হউক! আমাদের কি, আমরা শুনিলেই সুখী। কি দিয়েছে? দুটাকা দশটাকা হবে কি? তা হবে বৈ কি! তার যে দয়ার শরীর—বাপের কত টাকা। দেবতা ব্রাহ্মণে তাদের বড় ভক্তি। যেমন করে হউক দুটাকা পেলেই হ'লো মা।"

করুণাময়ী বলিলেন,—

'না, টাকা কড়ি কিছু দেয় নাই।"

"তবে জিনিস পত্র বুঝি। তা যাই হউক, যেমন করে হউক, দুটাকার উপকারতো হবেই, সংসার দুদিন সচ্ছল তো হবেই।"

"সে রকম কোন জিনিস নয়। শরৎ বড় পড়িতে ভাল বাসে, তাই তাকে খান কতক বই দিয়েছে।"

রামমতি চক্ষু বিস্তৃত করিয়া বলিল,—

"শরতকে বই দিয়েছে? তা দিক। শরতকে বড় ভাল বাসে বুঝি? তা আর বাসবে না! বই দিয়েছে, হয়ত তার ভিতর আরও কত কি আছে। তা দেখগে মা। আহা হউক। আমি যাই।"

এই বলিয়া রামমতি একটু বক্র হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল, মা ও মেয়ে দরজা বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সোহাগ খানিকটা দূর যাইতে না যাইতে, পার্শ্বস্থ বৃক্ষতল হইতে একটী পুরুষ মানুষ আসিয়া তাহার নিকটস্থ হইল এবং বলিল,—

"এত দেরি যে?"

সোহাগ বলিল,—

"যাহার প্রতি বাবুর এত টান, বাবুর

চাকরের বারমেসে মুনিব তাঁহার কাছে গিয়াই চলিয়া আসিতে পারে কি ?”

যে পুরুষকে সোহাগী এ কথা বলিল, বলা বাহুল্য যে, সে ব্যক্তি রাধারমণ।

রাধারমণ বলিল,—

“তুমি আমার রাইরাজা ; ঠাট্টা যাউক ; এখন দেখিলে কি বল।”

“দেখিব কি ? দেখিলাম জীবন্ত সরস্বতী।”

“বটে ? তাইতো ! বাবুর যেন একটু বিশেষ অনুরাগ বলে বোধ হয়। এদিকে কি রকম দেখিলে ?”

সোহাগী বলিল,—

“তোমার বাবুর কি তাহা জানি না, কিন্তু এদিকে অগাধ ভালবাসা।”

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে স্বামী ও স্ত্রী পথ চলিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

---*---

দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় দুই দিন শরৎকুমারীর চিকিৎসার জন্য আসিয়াছিলেন এবং সোহাগী একদিন কয়েকখানি পুস্তক লইয়া দীননাথের বাটীতে আসিয়াছিল ; এই মূল বৃত্তান্ত ক্রমশঃ রূপনগরের লোকের মুখে ভয়ানক রূপান্তরিত হইয়া উঠিয়াছে ! কথাটা হইয়াছে যে, শরৎ-কুমারী ও দেবেন্দ্রনারায়ণের অবৈধ প্রণয় জন্মিয়াছে। দীননাথ ও করুণাময়ী তাহা জানেন ও তাহার উৎসাহ দিয়া থাকেন। লোক সুও আছে, কুও আছে। সুলোকেরা প্রথম প্রথম এ কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিল যে, শরৎকুমারী নিতান্ত বালিকা। কিন্তু কুলোকেরা এক কথায় ইহার খণ্ডন করিয়া দিয়াছে। তাহারা বলিয়াছে যে, ‘এগারো বৎসর বয়সে এখন লোকের ছেলে হয় ; বারো বৎসর শরৎকুমা-রীর ছেলের মা হইবার বয়স ছাড়াইয়া গিয়াছে।’ সুলোকেরা আরও বলিয়াছিল যে, ‘দেবেন্দ্র-নারায়ণ অত্যন্ত সচ্চরিত্র।’ উত্তরে কুলোকেরা বলিয়াছিল, ‘এক বড় মানুষের ছেলে, তাহাতে বয়সকাল। এরূপ দোষ ঘটিলে সেটা তার পক্ষে বড় নিন্দার কথা নহে, তাহাতে তাহার চরিত্রেরও দোষ হয় না।’ সুলোকেরা উত্তর দিয়া উঠিতে পারে নাই ; কাজেই কুলোকদিগের জয় হইল। তাহার পর এই ভয়ানক কথা নানারূপে পল্লবিত হইতে লাগিল। সুলোকেরা কেহ কেহ বলিল, ‘দোষ তো ঘটিবারই কথা, এত বড় মেয়ে কখন কি আইবুড় রাখা সাজে ?’ কুলোকেরা কেহ কেহ বলিল, ‘এত জানা কথা। মার ঐ কীর্ত্তি—মেয়ে তার নাম রাখিবে না ? আইবুড় না রেখে হবে কি ? কে ঐ কীর্ত্তিধ্বজা আপনার ঘরে লইবে ?’ কেহ কেহ বলিল, ’মেয়ে মানুষকে লেখাপড়া শিখাইলেই এইরূপ বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে।’ অপবাদের প্রমাণও অনেক পাওয়া গেল। একজন বলিল, ‘দেবেন্দ্র বাবু যে শরৎকুমারীকে পত্র লেখে এবং শরৎকুমারীও যে দেবেন্দ্র বাবুকে পত্র লেখে, তাহা আমার খুড়ীর মামাত ভগ্নী বেশ জানে।’ আর একজন সাক্ষ্য দিল, ‘একদিন দেবেন্দ্র বাবুর একজন লোক এক তোড়া টাকা লইয়া দীন-নাথের বাটীতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা আমাদের মেজোবোর মাসতুতো ভাই স্বচক্ষে দেখিয়াছে।’ আর একজন বলিল, ‘শরৎ-কুমারীর গলায় একদিন এক ছড়া আশ্চর্য্য—প্রায় দু হাজার টাকা দামের, মুক্তার মালা হরের মা ভাল করিয়া দেখিয়াছে।’ একজন বলিল, ‘গত অমাবস্যার দিন ঘোর অন্ধকার

রাত্রে, আমাদের নসিরাম দেখিয়াছে, একজন লোক দীননাথের বাটী হইতে বাহির হইল। লোকটার হাতে হাতির দাঁতের ছড়ী, গলায় সোণার হার, পায়ে বার্নিস করা জুতা। লোকটার কাছে নসিরাম যাইতে না যাইতে আম গাছের আড়ালে যোলটা বেহারার এক পাল্কি ছিল, লোকটা তাহাতে উঠিয়াই আনন্দপুরের দিকে চলিয়া গেল।' অতএব এত অকাট্য প্রমাণ থাকিতে গ্রামের লোকেরা কেমন করিয়া একথা অবিশ্বাস করিবে? কেহই একথা অবিশ্বাস করিল না। সুলোকও ক্রমে কুলোক হইয়া পড়িল। কথা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধ দীননাথের কর্ণে ক্রমে এই নিদারুণ কথা আসিয়া পৌছিল। তিনি অবাক্ হইলেন। সত্যই বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিল। লোকগুলা এখন বৃদ্ধকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমাদের রামচরণ ডাক্তার দীননাথ চট্টোপাধ্যায়কে একঘরে করিবার প্রধান উদ্যোগী হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার রাগের প্রধান কারণ (১) দীননাথ শরতের পীড়ার সময় তাঁহাকে ডাকে নাই; (২) হেমেন্দ্রনারায়ণের পুত্র দীননাথের প্রধান সহায় অতএব দীননাথকে অপমান করিতে পারিলে প্রকারান্তরে হেমেন্দ্রনারায়ণকেও অপমান করা হয়। দলাদলির ঘোঁট পাকিতে লাগিল। নিরপরাধ পরদুঃখকাতর দীননাথ নিতান্ত বিপদাপন্ন হইয়া পড়িলেন।

রাত্রি নয়টা কি দশটা হইবে দীননাথ ফুস্ ফুস্ করিয়া করুণাময়ীকে কি কথা বলিতেছিলেন, শরৎকুমারী শুইয়াছিল। দীননাথ মনে করিয়াছিলেন, শরৎ ঘুমাইয়াছে। শরতের ঘুম আইসে নাই। দীননাথের অস্ফুট কথার মধ্য হইতেও শরৎকুমারী দুই একবার নিজের নাম শুনিতে পাইল। তাহার বাবা তাহার কথা কি বলিতেছেন, শুনিবার জন্য তাহার বড়ই আগ্রহ হইল। সে মনোযোগ সহকারে ঐ সকল কথা শুনিতে লাগিল। দীননাথ বলিলেন,—

"এখন উপায় কি?"

করুণাময়ী বলিলেন,—

"উপায় আর কি? লোকে একটা মিথ্যা কথা লইয়া কখনই আমাদিগকে এমনই করিয়া কষ্ট দিতে পারিবে না। ধর্ম্ম তো আছেন।"

দীননাথ বলিলেন,—

"আরে কথা যে মিথ্যা সেত তুমি বলিলে, আর আমি বলিলাম; লোকে তা বলে না যে।"

করুণাময়ী বলিলেন,—

"লোকে অমনই বলিলেই হইবে? লোকে জানুক, শুনুক, দেখুক। কোন দোষ পায় তখন বলুক, আমাদিগকে যে সাজা দিতে চায় দিউক—আমরা ঘাড় পেতে নেব।"

দীননাথ বলিলেন,—

"তাতো বটেই। দুদিন দেবেন্দ্র বাবু আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। শরৎ পড়িতে ভাল বাসে বলে, মেয়ে মানুষের হাত দিয়ে এক দিন তিনি কয়েকখান বই শরতকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই তো মোট কথা। কিন্তু লোকে কত কথাই বলিতেছে। লোকে বলিতেছে, দেবেন্দ্র বাবু আমাদের কত টাকা দিয়েছে, শরৎকে কত গহনা দিতেছে, প্রায়ই রাত্রে আমাদের বাটিতে আসে—আর মাথা মুণ্ড,—কি আর বলিব?"

এমন অন্যায় করিয়া কষ্ট দিয়া লোকের যদি সুখ হয় হউক। ভগবান্ আছেন, ইহার বিচার তিনিই করিবেন। আমরা গরিব, আমরা নিঃসহায়। কিন্তু তাই বলিয়া লোকে আমা-

দের কষ্ট দিয়া যে ভগবানের বিচারেও পার পাইবে, তা কখন মনেও ভেবো না।”

দীননাথ বলিলেন,—

“হা ভগবন্, বৃদ্ধকালে আমাকে কি বিপদেই ফেলিলে? নিজের ছেলে পিলে নাই, একটা পরের মেয়ে লইয়া শেষটা কত কষ্টই পাইতে হইল। জীবনটা দুঃখেই কাটিল। যাহা হউক দুঃখে কষ্টে শাকান্ন খাইয়া দিন কাটাইতে ছিলাম। নিরাশ্রয়া পরের মেয়েকে আনিয়া আশ্রয় দিলাম—ভাল কাজই করিলাম। তাহার কি এই পুরস্কার? শরৎকুমারী যে, আমার একমাত্র আদরের ধন, আজি তাহারই জন্য আমার এই লাঞ্ছনা। আজি সে যদি আমার ঘরে না থাকিত, তাহা হইলে তো কোন কথাই হইত না। যদি যথাসময়ে তাহার বিবাহ হইত, তাহা হইলেও তো কোন গোল উঠিত না। হায়! এখন করি কি?

সমাজ-ভীত, ধর্ম্ম-ভীত, নিরীহ ব্রাহ্মণ, আপনাকে বড়ই বিপন্ন বোধ করিয়া, স্বামী স্ত্রীতে বসিয়া নানারূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহারা কত কথাই বলিতে লাগিলেন, কত ভাবনাই ভাবিতে লাগিলেন। তাহার পর তাঁহারা ক্লান্ত ও হতাশ ভাবে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সরল-হৃদয়া শরৎকুমারী কাষ্ঠ-পুত্তলীর ন্যায় ভাবে সমস্ত কথা শুনিল। তাহার মালিন্য-বিরহিত পবিত্র হৃদয়ে পাপ কি, তাহার জ্ঞান পর্য্যন্ত জন্মে নাই। তাহার সম্বন্ধে যে যে অপবাদ ঘোষিত হইয়াছে, সে তাহা কিছুই জানে না—সে তাহার কিছুই বুঝে না। যে দোষে তাহার কোন সংশ্রব নাই এবং যে কার্য্য হেতু তাহার সরল হৃদয় একবারও সঙ্কুচিত বা কাতর হয় নাই, সেরূপ কোন কার্য্যের জন্য যদি লোকে মন্দ কথা কহে, তবে যাহারা সেরূপ নিন্দাবাদ করে তাহারাই প্রকৃত দোষী। সুতরাং সেরূপ কারণে শরৎকুমারীর মনে কোন প্রকার রাগের সঞ্চার হইল না; বিশেষ দুঃখও হইল না ভাবিল, ‘লোকে যদি বলে, অমুকের অনেক জিনিষ চুরি গিয়াছে, অথচ সে যদি দেখে, তাহার কোন জিনিষই লোকসান হয় নাই, যাহা যেমন ছিল তাহা ঠিক তেমনই আছে তাহা হইলে, সে যেমন লোকের কথা শুনিয়া দুঃখিত হয় না, তেমনই আমি যখন দেখিতেছি, লোকে যাহা বলিতেছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, তখন আমার দুঃখিত, বা লজ্জিত হইবার কোনই কারণ নাই তো।’ কিন্তু বালিকার মনে অন্য কারণে বিষম কষ্ট উপস্থিত হইল। সংসার-বোধ-বিহীনা বালিকা সে চিন্তায়, সে কষ্টে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাহার জন্য আজি তাহার একমাত্র আশ্রয়, পরম-স্নেহ-নিকেতন, পিতা-মাতার স্থলাভিষিক্ত এবং প্রতিপালক দীননাথ ও করুণাময়ী যার-পর-নাই কষ্ট পাইতেছেন, এ চিন্তা তাহাকে নিতান্ত ব্যথিত করিতে লাগিল। বালিকা কাঁদিতে লাগিল। ভাবিল, ‘এ অভাগিনীর জীবন কেবল অনন্ত ক্লেশে আচ্ছন্ন। কোথায় পিতা, আজি কোথায় মাতা! কোথায় গৃহ, কোথায় অন্ন বস্ত্র! দুঃখিনীর ইহ জগতে কিছুই নাই। পরের আশ্রয়ে, পরের অন্নে, পরের স্নেহে, পরের অনুগ্রহে বাঁচিয়া আছে। কিন্তু কি পরিতাপ, আজি সেই অকপট আত্মীয়ও এ দুঃখিনীর জন্য বিপদাপন্ন।

'আজি আমিই তাঁহাদের যাবতীয় ক্লেশের, যাবতীয় মনস্তাপের এবং যাবতীয় দুশ্চিন্তার কারণ। এ অভাগিনী যে দিক দিয়া যাইবে সেই দিকেই কি বিপদ; চিন্তা, হাহাকার, রোদন প্রভৃতি সঙ্গে সঙ্গে যাইবে? এরূপ জীবন লইয়া এই সংসারে কেমন করিয়া থাকিব?'

বালিকা এইরূপে পিতার কথা, মাতার কথা মাতার দেশব্যাপী কলঙ্কের কথা, দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ের কথা, একে একে সকলই ভাবিল। ক্রমে তাহার মনে হইল,—'আমি কে? আমার জন্য ইঁহারা এত কষ্ট কেন সহ্য করিবেন। আমি যদি না থাকি, তাহা হইলে, ইঁহাদের কোনই বিপদ ঘটিবে না। যত দায়, যত বিপদ, যত চিন্তা সকলই আমার জন্য। আমি যদি না থাকি, তাহা হইলে সে সকলও থাকিবে না। তবে আমার অভাবে উঁহাদের বড় কষ্ট হইবে বটে। কিন্তু বর্ত্তমান কষ্টের চেয়ে সে কষ্ট ভাল; কারণ তাহাতে লজ্জা নাই, অপমান নাই, ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিতে হইবে না। অতএব আমার এখানে না থাকাই সৎ পরামর্শ। আমি আর এখানে থাকিব না।'

থাকিব না,—যাইব কোথায়, করিব কি, খাইব কি ইত্যাদি কোন চিন্তাই বালিকার মনে আসিল না। বালিকা স্থির করিল,—'এখানে থাকিয়া ইঁহাদের কষ্ট দিব না। অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে, আমি আজি রাত্রেই এখান হইতে চলিয়া যাইব—এখানে আর থাকিব না।'

তখন বালিকা, কেমন করিয়া এই পিতৃ-মাতৃবৎ আত্মীয় জনকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইব ভাবিয়া, অধোবদনে ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল। কাঁদিয়া বালিকা হৃদয়কে অনেকটা দৃঢ়, অনেকটা সহিষ্ণু করিয়া লইল। গাত্রোত্থান করিয়া শরৎ হাতযোড় করিয়া, গলায় বস্ত্র দিয়া মনে মনে বলিল,—

"পিতামাতাকে অভাগিনী অনেক দিন হারাইয়াছে। কিন্তু আপনাদের অনুকম্পায় পিতা মাতার অভাব আমি জানিতে পারি নাই। আজি আপনাদের কাছ-ছাড়া হইতেছি, আজি আমি যথার্থই পিতৃ-মাতৃহীনা হইলাম। আমি আপনাদের নিকট হইতে বিদায় লইতেও পারিলাম না। দেখা করিলে আমাকে আপ-নারা ছাড়িবেন না তো। কিন্তু আপনাদের এ বৃদ্ধ বয়সে, এ ধর্ম্মচিন্তার সময়ে, আমি আপ-নাদের সর্ব্বপ্রকারে কষ্টের কারণ হইব না। অতএব বাবা, মা, আজি তোমাদের শরৎ বিদায় হইল। আমি তোমাদেরই দাসী। তোমরা দাসীকে আশীর্ব্বাদ করিও।"

চক্ষের জলে বালিকার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে ধীরে ধীরে ঘরের দ্বার খুলিল—বাহিরে আসিল। তখন আবার বলিল,—

"এই অসীম সংসারে অসংখ্য মানুষ, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষীর যে উপায়, আমারও সেই উপায়। যিনি সকলকে রক্ষা করিতেছেন, তিনি অবশ্যই আমাকেও রক্ষা করিবেন।"

বালিকা আবার একবার গৃহের দিকে চাহিয়া দেখিল। আবার মনকে বুঝাইয়া বাহিরে আসিল।

তখন রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। বসুন্ধরা নিস্তব্ধ। রজনী যেন ক্লান্ত হইয়া এলাইয়া পড়িয়াছে, অন্ধকারের গাঢ়তা যেন কমিয়া গিয়াছে। শ্বেত-বসনা ঊষা-সতীর পিঙ্গল-বর্ণা অগ্র-দূতী যেন দেখা দেয় দেয় হইয়াছে। শরৎকুমারী কাঁদিতে কাঁদতে চলিতে লাগিল। কোথায় যাইবে, অদৃষ্টে কি হইবে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের পদে পদে কতই বিপদ, বালিকা

তাহার কিছুই জানে না। সুতরাং যে দিকে পথ দেখিল সেই দিকেই অগ্রসর হইল।

বালিকে শরৎকুমারি! চারি বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, আবার বলিতেছি, 'এ সুখের সংসারে দুঃখের ভাগই অধিক। এই দুঃখরাশি ভেদ করিয়া দৈবাৎ সময়ে সময়ে কণিকামাত্র সুখ আসিয়া দেখা দেয়। সেই অত্যল্প সুখ তখন সকল বিগত ক্লেশ, বিগত যাতনা ভুলাইয়া দেয় এবং সংসারকে পরম সুখের স্থান বলিয়া প্রতিপন্ন করে।' বৎসে! অধীর হইও না—ব্যস্ত হইও না। যদি এ সুখের সংসার-সম্ভোগে সাধ থাকে, তবে, সহিষ্ণুতা সহকারে সুস্থির হইয়া অপেক্ষা কর। অবশ্যই একদিন সুখ তোমার আয়ত্ত হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—*—

বেলা প্রায় বারোটা। বড় রৌদ্র; সূর্য্যদেব যেন অগ্নিবর্ষণ করিতেছেন। বসুন্ধরা যেন তাপে তাপিত হইয়া কাঁপিতেছে। পক্ষিটী পর্য্যন্ত ডাকিতেছে না। কেবল এক একটা কাক থাকিয়া থাকিয়া চাপা গলায় অস্ফুট স্বরে এক একবার ডাকিতেছে। কোন জীবই আহারাদি স্বাভাবিক কার্য্যের চেষ্টাও করিতেছে না। সকলেই, অলস, শিথিল ও নিশ্চেষ্টভাবে, বাছিয়া বাছিয়া শীতল স্থানে লুকাইয়া, আতপ-তাপ হইতে শরীর রক্ষা করিতেছে।

রূপনগরের প্রায় তিন ক্রোশ দূরে, একটী জনহীন প্রান্তরের মধ্যে চারিদিকে বাঁশ, অশ্বথ, তেঁতুল প্রভৃতি বৃক্ষসমাবৃত ক্ষুদ্র একটি পুষ্করিণী আছে। সেই পুষ্করিণী-তীরে বৃক্ষছায়ায় শরৎকুমারী বসিয়া কাঁদিতেছে। কোমলাঙ্গী বালিকার পদতল ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে; বদনমণ্ডল শুষ্ক হইয়াছে; দেহ যৎপরোনাস্তি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; ক্ষুৎপিপাসাও নিতান্ত কাতর করিয়াছে। বালিকা, শ্রান্তিদূর করিবার নিমিত্ত, এই শীতল স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এখানে আসিয়াই, তৃষ্ণা দূর করিবার নিমিত্ত, অঞ্জলি অঞ্জলি করিয়া, প্রথমতঃ পেট ভরিয়া জল খাইয়াছে। লোকের সঙ্গে শরৎকুমারীর প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। যে দুই এক জন লোকের সহিত দেখা হইয়াছিল, তাহারা প্রায়ই হয়ত তাহার প্রতি অস্বাভাবিক ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়াছে, কেহ কেহ বা দুইটা কদর্য্য পরিহাস বাক্যও প্রয়োগ করিয়াছে। বালিকা লোকের ব্যবহার দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছে এবং ভাবিয়াছে, এ জগতে যদি সকলেই দেবেন্দ্রনারায়ণ হইত, তাহা হইলে কি সুখের বিষয়ই হইত।

বালিকা বৃক্ষ-ছায়ায় বসিয়া কাঁদিতেছে কেন? বালিকা ভাবিতেছে,—'কি করিলাম, এ কোথায় আসিলাম, এখন কোথায় বা যাইব? কত পথই আসিয়াছি। ফিরিয়া যাইব? না না, আর ফিরিব না। না জানি বাবা মা কতই কাঁদিতেছেন, কতই খুঁজিতেছেন, আমি ফিরিয়া গেলে তাঁহাদের কতই আনন্দ হইবে। কিন্তু আমি থাকিলেও তাঁহাদের কষ্ট অনেক বাড়িবে। তাঁহারা সমাজে স্থান পাইবেন না, আমার জন্য তাঁহাদিগকে পাপীর ঘৃণিত হইয়া থাকিতে হইবে, আমার জন্য তাঁহাদিগকে লোকের কত কথাই সহিতে হইবে, আর আমার জন্য তাঁহাদের কষ্টের—উদ্বেগের সীমা থাকিবে না।

তবে ফিরিব কেন ? ফিরিয়া কাজ নাই। কিন্তু এখন যাই কোথা—করি কি ?”

আবার বালিকা অনেকক্ষণ অনেক কথা আলোচনা করিল। তাহার পর ভাবিল, ‘এই পুষ্করিণীর জলে যদি ডুবি, তাহাতে ক্ষতি কি ? আমি মরিলে এ জগতের লাভ বই লোকসান নাই। আমি কাহারও কখন কোন কাজে লাগিব এমন বোধ হয় না। স্বয়ং কেবল দুঃখই ভোগ করিতেছি, আত্মীয় জনকেও কেবল দুঃখই দিতেছি। সম্মুখেও তো কোন সুখের চিহ্ন দেখিতেছি না। তবে এ জীবন নাই রাখিলাম। মৃত্যুর সুযোগও তো বে· উপস্থিত।’

বালিকা যখন এইরূপে ভাবনা ভাবিতেছে, তখন তাহার অজ্ঞাতসারে পশ্চাদ্দিক্ হইতে দুইটী লোক সেই ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। লোক দুইটির পরিচ্ছদ ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাহাদিগকে ইতর, অশিক্ষিত ও নিম্নশ্রেণীর লোক বলিয়াই বোধ হয়। আগন্তুকদ্বয়ও নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া শ্রান্তিদূর করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে আসিয়াছিল বলিয়া বোধ হইল। তাহারা, এরূপ স্থলে একটী যুবতী বসিয়া আছে দেখিয়া, প্রথমতঃ বিস্ময়াবিষ্ট, পরে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইল এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া শরৎকুমারীর নিকটস্থ হইল। শরৎকুমারী তাহাদিগকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল। আগন্তুকদ্বয়ের একজন বলিল,—

“ভয় নাই—ভয় নাই—চমকাও কেন ? আমরা মানুষ—খাব না।”

শরৎকুমারী লজ্জায় বদন বিনত করিলেন। পুরুষদ্বয় দেখিল যে, তাহাদের সম্মুখস্থ কিশোরী সুন্দরীর শিরোমণি। তাহারা আরও বুঝিল যে, সুন্দরীর নেত্রদ্বয় এখনও অশ্রুত্যাগ করিতেছিল। একজন বলিল,—

“তুমি কাঁদিতেছিলে ? তোমার এই বয়স, এত রূপ—তোমার কিসের দুঃখ ? তুমি একটু হাসিয়া চাহিলে, দুটা কথা কহিলে কত লোক কৃতার্থ হইয়া যায়। তোমার চক্ষে জল !”

শরৎকুমারী কি বলিবেন ? তিনি বুঝিলেন, এখানে আর থাকা ভাল নয়। ভাবিলেন, ‘হায় এ দারুণ রৌদ্রের সময় এই শীতল স্থানটায় বসিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছিলাম, ভগবান্ তাহাতেও বাদী ! অভাগীর কপালে কি কোন প্রকার সুখ নাই ?’

দীর্ঘনিশ্বাস সহ শরৎকুমারী গাত্রোত্থান করিলেন এবং অবনত মস্তকে সে স্থান হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। তখন আগন্তুকদ্বয়ের একজন গিয়া তাঁহার সম্মুখে পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—

“সে কি ! যাও কোথা ? আলাপ পরিচয় হইল, দুদণ্ড এখানে থাক, চাঁদমুখে দুই একটা কথা কও—আমোদ আহ্লাদ কর—তার পর যদি নিতান্তই যেতে হয়, যেখানে যাবে, বলিলে আমরা মাথায় করে পৌঁছে দিয়ে আসিব।”

আগন্তুকদ্বয়ের একজনই প্রথম হইতে কথা কহিতেছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি এক্ষণে বক্তার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিল এবং বলিল,—

“ছি ! কর কি ? কাজ কি ? ও বদ্‌রসিক মেয়ে মানুষ, ওকে যেতে দাও।”

শরৎকুমারী পথ পাইয়া দ্রুতগতি চলিতে লাগিল। লোকটা সঙ্গীকে বলিল,—

“এও কি কথা ? হাতে পেয়ে ছাড়তে আছে ? তোমার মত আহাম্মক দুনিয়ায় আর নাই। ছেড়ে দাও ধরে আনি।”

শরৎকুমারী পশ্চাতে দেখিলেন, লোকটা সঙ্গীর হাত হইতে হাত ছাড়াইয়া লইবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছে। শরৎকুমারী দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। লোকটা শরৎকুমারীকে

দৌড়াইতে দেখিয়া সঙ্গীর হাত ছাড়াইবার নিমিত্ত বড়ই জোর করিতে লাগিল। তাহার সঙ্গীও তাহাকে পুনঃ পুনঃ নিরস্ত করিতে লাগিল এবং সাবধানতা সহকারে ধরিয়া রাখিল। অনেকক্ষণ গোলমালের পর লোকটা সঙ্গীর হাত ছাড়াইয়া বেগে ছুটিতে লাগিল। শরৎকুমারী তখন প্রাণপণে দৌড়িতেছেন। পার্শ্বে বা পশ্চাতে কোন দিকেই শরৎকুমারীর দৃষ্টি নাই; তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছেন। ঘোর পরিশ্রম, এতাবৎকাল অনাহার, প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপ প্রভৃতি কারণে শরৎকুমারী নিতান্ত কাতর ছিলেন। কিন্তু এখন বিপন্না বালিকার আর সে সকল বোধ নাই—বালিকা তীরের ন্যায় ছুটিতেছে। কিন্তু সকল কষ্টই বুঝি বৃথা হয়; লোকটা নিকটস্থ হয় হয় হইয়া উঠিল। শরৎকুমারী পশ্চাতে তাহার পদধ্বনি শুনিতে লাগিলেন। ভাবিবার সময় নাই, চিন্তার অবসর নাই। দৌড়িয়া পলাইতে না পারিলে এ বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। বালিকা কেবলই দৌড়িতে লাগিলেন। সহসা বৃক্ষাদির ফাঁক দিয়া একটা অত্যুচ্চ শ্বেতাবয়ব ভবনের অংশবিশেষ শরৎকুমারীর চক্ষে পড়িল। সেই স্থানে আশ্রয় পাওয়া যাইবে ভাবিয়া শরৎকুমারী সেই দিকে গতি ফিরাইলেন। প্রাণপণে ছুটিতে ছুটিতে তিনি একটা অতিমনোরম, প্রকাণ্ড ভবনের দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং বেগে সেই দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন; তাহার পর 'মাগো' আমায় রক্ষা কর', বলিয়া তথায় পড়িয়া গেলেন।

সেই ভবন দ্বারের উভয়পার্শ্বে আট দশ জন গালপাট্টা আঁটা দ্বারবান্ বসিয়া কেহ বা থালায় করিয়া বুটের দাইল বাছিতেছিল, কেহ বা নলিচায় চিমটা বাঁধা লম্বা পিত্তলের হুঁকায় নল লাগাইয়া তামাক্ খাইতেছিল, কেহ বা ঘরে 'ভেজিবার' জন্য লম্বা লম্বা রেখা টানিয়া ঘটী বাটির অনুরূপ অক্ষরযুক্ত 'খৎ' লিখিতেছিল, কেহ বা সেই লেখকের পার্শ্বে বসিয়া তাহার অসাধারণ ক্ষমতার প্রশংসা করিতেছিল, কেহ বা পাথরের বাটিতে নীমের সোটা দিয়া 'ভাঙ্গ' ঘুঁটিতেছিল, কেহ বা আলকাতরামাখান, কাপড়ের ছাপা-লাগান, আম কাঠের সিন্দুকের মধ্যে আপনার জিনিস পত্র গুছাইয়া রাখিতেছিল, কেহ কেহ বা দেয়াল হেলান দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া ছিল। শরৎকুমারী এইরূপ ভাবে তথায় গিয়া পড়িলে, সকল দ্বারবানই একসঙ্গে 'ক্যা হুয়া—ক্যা হুয়া' শব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। কেহ কেহ লাঠি হস্তে বাহিরে ছুটিয়া আসিল, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। অনুসরণকারী যখন দেখিল, শরৎকুমারীর গতি এই দিকে ফিরিল, তখনই সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল এবং একটু কি ভাবিয়া চিন্তিয়া বিপরীত দিকে পলায়ন করিল। সুতরাং দ্বারবানেরা দেখিল, পথে তো কিছুই নাই। দ্বারবানেরা বুঝিল শরৎকুমারী মূর্চ্ছিতা। তাহারা নানা জনে নানা কথা কহিতে লাগিল; অথচ কি আবশ্যক, অথবা কে কি করিবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

"কি হইয়াছে? গোল কিসের? ব্যাপার কি?

উপরের বারান্দা হইতে একজন এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। একজন দ্বারবান্ তাঁহাকে সসম্ভ্রমে বৃত্তান্তটা জানাইল। তখনই সেই প্রশ্নকারী ব্যস্ততা সহ নামিয়া আসিলেন। দ্বারবানেরা বিশেষ সম্মান সহকারে সরিয়া দাঁড়াইল। তিনি একজন দ্বারবানকে শীঘ্র শীতল জল আনিতে এবং আর একজনকে পাখার বাতাস করিতে

আদেশ করিলেন। জল আসিলে ধীরে ধীরে তিনি শরৎকুমারীর মুখে, চক্ষে, কপালে, ঘাড়ে শীতল জল দিতে লাগিলেন এবং দ্বারবান্ অত্যধিক জোরে বাতাস করিতেছে দেখিয়া, তাহার নিকট হইতে পাখা লইয়া, স্বয়ং এক হস্তে বাতাস এবং অপর হস্তে জল প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বহুযত্নে, অনেকক্ষণ, পরে, শরৎকুমারীর চৈতন্য হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। দেখিলেন কি? দেখিলেন, তিনি মনে মনে যাঁহাকে মানবের মধ্যে দেবতা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, সেই দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় অতি যত্নসহকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

মা ও মেয়ে।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

---*---

সন্ধ্যার পর আমাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিত কুটিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কামিনী শুইয়া আছে। কামিনীর সে অপূর্ব্ব রূপ-শশধর যেন বিষাদ-মেঘাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সে চমৎকার উজ্জ্বলতা যেন নষ্ট হইয়াছে, তাহার সে টলটলায়িত পূর্ণতা যেন শুষ্ক হইয়াছে; সঙ্ক্ষেপতঃ কামিনীর দেহ প্রকাশ করিতেছে যে, তাহার মনে সুখ নাই—সে যেন বড় দাগা পাইয়াছে। কামিনী দাগা পাইয়াছে বটে, তাহার বড় সাধে ছাই পড়িয়াছে। রামচরণ তাহাকে যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা, ক্লেশের উপর ক্লেশ দিয়া, হতাদরের উপর হতাদর করিয়া নিতান্ত জ্বালাতন করিয়াছে। যে সুখের লোভে, যে প্রেমের আশায় সে জানিয়া শুনিয়া আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিয়াছে এবং ধর্ম্মের সুখ ছাড়িয়া অধর্ম্মের নরকে ডুবিয়াছে, সে সুখ, সে প্রেম, কিছুই সে পায় নাই। তাহার সাধের স্বপ্ন এখন ভাঙ্গিয়াছে। সমাজে তাহার এখন স্থান নাই, ধর্ম্মে তাহার এখন অধিকার নাই, স্বর্গ-সুখ তাহার এখন কল্পনার অতীত, সঙ্ক্ষেপতঃ, সে এখন পতিতা, ভ্রষ্টা, কালামুখী! মানুষের যাহা যাহা সুখ, যাহা যাহা আশা তাহার সে সকল এখন কিছুই নাই। এ সকলই সে জানিতেছে, এ সকলই সে বুঝিতেছে; সুতরাং তাহার ন্যায় দুঃখিনী আর কে আছে? এমন যাহার চিন্তা এবং এমন যাহার বোধ, তাহার দেহের শোভা, যৌবনের শ্রী কেমন করিয়া থাকিবে? কামিনীর দেহ দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, এ কামিনী সে কামিনী নহে?

রামচরণের সহিত কামিনীর আরও দুই একবার দেখা হইয়াছিল, কিন্তু কামিনীর যাহা অভিলাষ তাহা কি সফল হইয়াছিল? না—না। রামচরণ পাপ জানে, পাপ বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য সকল প্রকার দুষ্কর্ম্মই সে করিতে জানে। সে কেবল জানে না, কোন প্রকার কোমলতা; সুতরাং যে তাহার নিকট হইতে কোন প্রকার কোমলতা ভিক্ষা করে, তাহার বিড়ম্বনা।

কামিনী গৃহ মধ্যস্থ শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে এবং আপনার অবস্থা চিন্তা করিতেছে। কামিনীর পরিধান বস্ত্র মলিন, কেশরাশি অবিন্যস্ত, দেহ ভূষণ-শূন্য। শুইয়া

শুইয়া কামিনী বাম পদটী দুলাইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে এক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। ঘরের এক কোণে মিট্ মিট্ করিয়া একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে।

বাহির হইতে শব্দ হইল,—

"দরজা খোল।

কামিনী বুঝিল রামচরণ ডাক্তার আসিয়াছে। একবার ভাবিল, 'দরজা খুলিব না।' আবার ভাবিল, 'তাহাতে লাভ কি?' ধীরে ধীরে উঠিয়া কামিনী দরজা খুলিয়া দিল। রামচরণ ডাক্তার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিলেন—স্থির পদে নহে। তাঁহার অবস্থা ভাল নহে—পা টলিতেছে। তিনি আসিয়া ধপাস্ করিয়া শয্যায় বসিয়া পড়িলেন, এবং বলিলেন,—

"কামিনী! তোমাকে না দেখিয়া আমার প্রাণ হু হু করিয়া জ্বলিতেছে, তাই ভাই, তোমায় দেখ্‌তে এসেছি।"

কামিনীকে না দেখিলে রামচরণের কেমন করিয়া প্রাণ জ্বলে, তিনি তাহাকে কত ভাল বাসেন তাহা সকলই কামিনী জানে, সুতরাং এ আদর তাহার ভাল লাগিল না। সে কোন উত্তর দিল না।

রামচরণ আবার বলিলেন,—

"আমি মরতে মরতে তোমার কাছে ছুটে এলাম, তুমি একটী কথাও কহিলে না। ছিঃ কামিনী! আমি কি এতই ছোট লোক?"

কামিনী বলিল,—

"কথা আর কি বলিব? এলে ভালই—আমার সৌভাগ্য।"

কথাটা নিতান্ত ভাসা ভাসা, নিতান্ত না বলিলে নয় মত হইল। সুতরাং রামচরণের মনের মত হইল না। রামচরণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—

"তুমি চটেছ? বেশ করেছ! ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাইও। আসিয়াছি তাহা ভাগ্য বলিয়া মানা নাই, আবার রাগ! তোমার রাগ নিয়ে তুমি ধুয়ে খাও।"

কামিনী বলিল,—

"আমার আবার রাগ কি? রামচরণ! আমি অনাথিনী, দুঃখিনী, কষ্ট সহিতে আমার জন্ম। আমি যথেষ্ট কষ্ট সহিতে পারি। রাগ কি আমাদের মত লোকের শোভা পায়? তুমি দয়া করিয়া আসায় আমার বিশেষ কোন লাভ হইয়াছে এ কথা যদি তুমি মনে করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার ভুল হইয়াছে। তোমার ইচ্ছা হয় চলিয়া যাও, ইচ্ছা হয় বসিয়া থাক, আমার তাহাতে কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমি দুঃখিনী! আমার এত সহিয়াছে, তুমি আজি চলিয়া যাইবে, সে কষ্ট টুকু আর সহিবে না?"

রামচরণের বিরক্তি ভাব আর এক মাত্রা বাড়িয়া গেল। বলিল,—"ভাবিয়াছ কি কামিনী, তুমি ছাড়া আর মেয়ে মানুষ নাই? তোমার বড় অহঙ্কার বাড়িয়াছে। তোমাকে দাসীপনা করিয়া জীবন কাটাইতে হইবে, তাহা তুমি স্থির জানিও।"

কামিনী বলিল,—

"কাহার দাসীপনা? সরকারদের দরুণ কেনা বাড়ীতে তোমার যে নূতন রাণী আসিয়াছেন, তাঁহারই না কি?"

রামচরণ চমকিয়া উঠিল। থতমত খাইয়া বলিল,—

"সরকারদের দরুণ কেনা বাড়ী কি? কে আসিয়াছে? আমার নূতন রাণী কি? সে বাড়ীতে কেহ নাই তো। সেখানে কে আছে, তুমি কেমন করিয়া দেখিলে, তোমাকে বলিতে হইবে।"

উত্তরের জন্য রামচরণ অপেক্ষা করিল না। এখন রাগে তাহার শরীর কাঁপিতেছে। সে বলিল,—

"তোমার বড় আস্পর্দ্ধা হইয়াছে। আমার যাহা খুসি আমি তাহাই করিব। আমার কাছে কথা কহে এমন ক্ষমতা কাহার? জানিও তোমার অনেক দুর্গতি আছে, আমার হাতে তোমার অনেক শাস্তি আছে।"

হাঃ হাঃ শব্দে কামিনী হাসিয়া বলিল,—

"শাস্তি! আবার কি শাস্তি রামচরণ? আমি যে শাস্তি ভোগ করিতেছি ইহার চেয়েও কি আর শাস্তি আছে? আর কতদিন এমন করিয়া চলিবে রামচরণ? তোমার কাজে আমার কথা কহিবার ক্ষমতা নাই বটে, কিন্তু দশ আছে, ধর্ম্ম আছে। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তোমার সর্ব্বনাশ অতি নিকট।"

এখন কামিনী জানিত, সরকারদের দরুণ বাড়ীটা রামচরণ ডাক্তার ক্রয় করিয়াছে। রামচরণ তাহা কিনিয়াছে বটে, কিন্তু কখন তাহা ব্যবহার করে না। সর্ব্বদা তাহাতে চাবি বন্ধ থাকে। এ কথা কামিনী জানিত যে, প্রায়ই প্রতিদিন রামচরণ একবার করিয়া সেই বাটীতে যায়। এজন্য কামিনী মনে করিয়াছিল যে, সেই বাটীতে একটা কি কাণ্ড কারখানা আছে। সে সেই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া রামচরণের নিকট সে কথার উল্লেখ করিল। রামচরণের প্রথমতঃ ভয়, তাহার পর ক্রোধ এবং তাহার কথাবার্ত্তার ভাব দেখিয়া, কামিনী বুঝিল, বস্তুতই তবে ঐ বাটীতে একটা কি কাণ্ড কারখানা আছে বটে। এদিকে রামচরণ প্রথমতঃ ঐ বাটীর উল্লেখ, দ্বিতীয়তঃ রাণীর উল্লেখ, তৃতীয়তঃ সর্ব্বনাশের উল্লেখ শুনিয়া মনে করিল, এ তিনেরই মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে এবং কামিনী তাহা জানে। অতএব কামিনীর নিকট হইতে সে কথা আদায় করিতেই হইবে। এই ভাবিয়া বলিল,—

"কি! আমার সর্ব্বনাশ! কাহার সাধ্য এ কথা বলে? কামিনি, যদি ভাল চাও, তবে বল কিসে আমার সর্ব্বনাশ হইবে—কে আমার সর্ব্বনাশ করিবে? যদি না বল, তবে জানিও তোমার সর্ব্বনাশ আমার হাতে।"

কামিনী বলিল,—

"আমার সর্ব্বনাশ তুমি যতদূর করিবার তাহা তো করিয়াছ, বাকি তো কিছুই নাই, কিন্তু তোমার সর্ব্বনাশের এখনও অনেক বাকি। তার আর দেরি নাই। এই কামিনীর হাতেই তোমার সর্ব্বনাশের ষোল কলা পূর্ণ হইবে।"

তখন রামচরণ,

"কি, এত বড় সাহস, আমারই অন্ন খাইয়া আমারই বিপক্ষে চক্রান্ত!"

এই বলিয়া কামিনীর বক্ষে প্রচণ্ড পদাঘাত করিল। কামিনী দূরে গিয়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রত্যুষে কামিনী ঘরের দেয়াল্ হেলান দিয়া বসিয়া আছে। সমস্ত রাত্রি কামিনী ঘুমায় নাই। কামিনীর চক্ষু রক্তবর্ণ, কামিনীর মূর্ত্তি ভয়ানক। তাহার ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি চারিদিক দিয়া বিশৃঙ্খল ভাবে ঝুলিতেছে, তাহার ললাটে সতেজ শিরা দেখা যাইতেছে, তাহার দৃষ্টিতে স্থির-প্রতিজ্ঞার চিহ্ন প্রকটিত রহিয়াছে। কামিনী আজি অসাধ্য-সাধন সংকল্প করিয়াছে, সে আজি

বিষয় চিন্তায় মনকে নিযুক্ত করিয়াছে! রাম-চরণের অসহ্য উৎপীড়নে কাতর হইয়া কামিনী প্রথমতঃ আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালার শেষ করিব বলিয়া স্থির করে। কিন্তু তাহাতে হইবে কি? রামচরণ—দুরাচার, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, নরপ্রেত রামচরণের তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? সে যে কামিনীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে—কামি-নীর ইহকাল ও পরকাল উভয়ই নষ্ট করি-য়াছে, কামিনীর সকল সুখের—সকল আশার পথে কাঁটা দিয়াছে,—কামিনীকে মর্ম্মান্তিক জ্বালা দিয়া হাড়ে নাড়ে জ্বালাইয়াছে তাহার শাস্তি কই? কামিনী মরিলে তাহার শাস্তি কি হইল? কামিনী প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি-চরিতার্থ না করিয়া মরিতে চাহে না—পারে না। প্রতি-হিংসা—সকল জ্বালার শেষ, সকল অপমান, সকল মনস্তাপের অবসান না করিয়া কামিনী আত্মহত্যা করিতে অসমর্থ। কামিনী এইরূপ আলোচনা করিয়া এক্ষণে আত্মহত্যার বাসনা বিসর্জ্জন দিয়াছে। এক্ষণে তাহার একমাত্র বাসনা—রামচরণের পাপের অনুরূপ দণ্ড-বিধান, তাহার পর মৃত্যু।

এখন কামিনী ভাবিতেছে—'বাসনা সিদ্ধির উপায় কি?' কিন্তু উপায় কিছুই কামি-নীর ভাল বলিয়া মনে লাগিল না। তাহার পর ভাবিল,—'সরকারদের দরুণ কেনা বাড়ী—সেখানে নিশ্চয়ই রামচরণের কোন গুপ্ত লীলা আছে। তাহার অনুসন্ধান করিলে, হয় তো আমার বাসনা-সিদ্ধির কোন উপায় হইতে পারে। দেখাই কেন যাউক না।'

কামিনী যখন এইরূপ আলোচনা করি-তেছে, সেই সময় কাশিতে কাশিতে, বাহির হইতে কণ্ঠধ্বনি করিতে করিতে, একজন লোক সেই স্থানে উপস্থিত হইল। কামিনী তাহাকে দেখিয়া মুখের চুল সরাইয়া এবং বাহ্য ভাব অপেক্ষাকৃত সহজ করিতে সচেষ্ট হইল। লোকটী আসিয়াই কাপড়ের কোণ হইতে কয়েকটী টাকা ও পয়সা বাহির করিয়া কামিনীর নিকট রাখিয়া দিল এবং বলিল,—

"টাকা দশটী এবং সুদ পাঁচ আনা দিতে আসিয়া ছিলাম।"

তাহার পর লোকটী প্রস্থান করিবার উপ-ক্রম করিতে লাগিল।

তখন কামিনী বলিল,—

"রাধারমণ, যাইও না, একটা কথা আছে।"

লোকটী আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত রাধারমণ। কামিনীর কয়েকটী টাকা ছিল, সে তাহা সুদে খাটাইত। রাধারমণ, মধ্যে ঘর মেরামত করিবার সময় অপ্রতুল হওয়ায়, কামিনীর নিকট হইতে দশটী টাকা ধার লইয়াছিল। আজি রাধারমণ সেই ঋণ পরিশোধ করিতে আসিয়াছে। কামিনী তাহাকে কি কথা বলিবে, কেন যাইতে বারণ করিল, তাহা ভাবিয়া রাধারমণ স্থির করিতে পারিল না। ধীরে ধীরে রাধারমণ দাবার এক প্রান্তে বসিল। তখন কামিনী বলিল,—

"রামচরণ ডাক্তার তোমার প্রতি যে অত্যাচার করেছিল, তুমি যেই ভাল মানুষ তাই সহ্য করিয়াছিলে।"

রাধারমণ বলিল,—"মানুষ মানুষের কি করিতে পারে মা? ভগবানই সকল কাজের বিচারক।"

কামিনী বলিল,—

"মানুষ কি না পারে রাধারমণ? মনে করিলে মানুষ সবই পারে। ভগবান্ দুর্ব্বলের বল। রামচরণ আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, পাপে মজাইয়া আমার মাথা খাইয়াছে, এখন আমি তাহার গলগ্রহ হইয়াছি। রামচরণ সোহাগীর সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কতই ছলা-

চলি না করিয়াছে? তাহা তুমি সকলই জান। তুমি কি মনে কর, রামচণের এ সকল পাপের শাস্তি মানুষ দিতে পারে না—দিবে না? হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় রামচরণকে একটু সাজা দিয়াছেন—একটু মাত্র। অবশ্যই কোন না কোন দিন, কোন না কোন লোকের হাতে রামচরণ বিশেষ সাজা পাইবে। তাহার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে।"

তখন রাধারমণ বলিল,—"ডাক্তার বাবু যে মহাপাপী তাহার ভুল নাই। পাপের ফল আছেই মা।"

তাহার পর রাধারমণ যে কারণে যেরূপে রূপনগরে গিয়াছিল, সোহাগের মুখে শরৎ-কুমারীর যে বৃত্তান্ত সে জানিতে পারিয়াছিল, উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু, শরতের পীড়া, সুলোচনার নিরুদ্দেশ ইত্যাদি বৃত্তান্ত সমস্তই বর্ণনা করিয়া বলিল,—

"মা বলিব কি, কেহ কেহ বলে সুলোচনা যে নিরুদ্দেশ, সেও হয় তো ডাক্তার বাবুর একটা লীলাখেলা।"

তখন কামিনী অনেকক্ষণ কি ভাবিল। ভাবিয়া বলিল,—

"এই গ্রামে সরকারদের কেনা বাড়ীতে ডাক্তারের নিশ্চয়ই বিশেষ গোপনীয় কোন কাণ্ড আছে। তুমি যে গল্প বলিলে, হয় তো তাহার সহিত আর ঐ গোপনীয় ব্যাপারের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে। রাধারমণ আমি স্ত্রীলোক, আমি একলা কি করিতে পারি? তুমি যদি আমার সহায় হও, তুমি যদি আমাকে পরামর্শ দেও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই সরকারদের বাটির লুকান কাণ্ডের খবর লইতে পারি; আর হয় তো তাহা হইতে তোমার গল্পের পর পর ঘটনাও প্রকাশ হইতে পারে। কে জানে, রামচরণের পেটে কত কীর্ত্তি আছে। রাধারমণ, তুমি আমার সাহায্য করিতে স্বীকার কর।"

রাধারমণ, অনেকক্ষণ নানা চিন্তা করিল। সে ভাবিল, 'দোষ কি? যাহাই হউক, ইহাতে কাহার না কাহার, কোন না কোন উপকার হইতে পারে—ভালই তো? আর কামিনী যেমন বলিতেছে, যদি এই সন্ধানে সুলো-চনার দৈবাৎ কোনও সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইলেতো পরম লাভ। প্রথম লাভ শরৎ কুমারীর দুঃখ দূর হইবে; দ্বিতীয় লাভ—রাজা বাবু (দেবেন্দ্রনারায়ণ) শরৎকুমারীর ভাবনা বিশেষ ভাবেন। যদি আমার দ্বারা এ সন্ধান হয়, তাহা হইলে আমার উপর তাঁহার বিশেষ অনু-গ্রহ হইবে; তৃতীয় লাভ—ধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে; চতুর্থ লাভ—রামচরণ জব্দ হইবে।"

কামিনী রাধারমণের সহানুভূতি উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত প্রথম হইতে অনুরোধ করিতে-ছিল। এক্ষণে ক্রমশঃ রাধারমণের মনে সহানুভূতি ও উদ্দেশ্যের একতা ঘটাইবার নিমিত্ত স্বার্থ, ধর্ম্ম ইত্যাদি কারণও আসিয়া জুটিল। কার্য্যতঃ উভয়ের লক্ষ্য ক্রমশঃ এক হইয়া পড়িল।

তখন রাধারমণ বলিল,—

"আমি সামান্য লোক, ডাক্তার বাবু বড় লোক। কিন্তু আমি সে ভয় করি না। আমার বাবুরা সুখে থাকুন—তাঁহারা আমার সর্ব্বদা সহায়। আমার দ্বারা যতদূর হইতে পারে, আমি ততদূর সাহায্য করিতে স্বীকার করিলাম। এখন কিরূপে সন্ধান লইবেন, বলুন।"

তখন কামিনী নানাপ্রকার পরামর্শ ব্যক্ত করিল, অনেক কাঁদিল এবং আপনার বর্ত্তমান অবস্থার অনেক বর্ণনা করিল। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর রাধারমণ চলিয়া গেল।

তাহার পর রাধারমণ বাটী আসিতে আসিতে অগ্রপশ্চাৎ অনেক ভাবিতে লাগিল। তাহার চিন্তা, 'কামিনী যে এত থা বলিল, তাহা মিথ্যা নয় তো? আমাকে কাঁদাইবার মতলব নাই তো? কিন্তু রাধারমণ সিদ্ধান্ত করিল, 'না, কামিনীর কথার ভাবে মিথ্যার ভাব কিছুই বুঝা যায় না; কামিনীর রাগ সত্য বটে।' তাহার পর আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিল,—'কামিনীর রাগ যথার্থ, কামিনীর রাগের কারণ আছে, কামিনীর কথাও সত্য; কিন্তু আমি তাহাতে যোগ দিই কেন? রামচরণ আমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল বটে, কিন্তু হেমেন্দ্র বাবু তাহাকে অনুরূপ সাজা দিয়াছেন। সে কথা এখনও আমার মনে থাকা ভাল নহে তো। তবে আমি কামিনীর প্রার্থনায় তাহার সহায়তা করিতে স্বীকার করি কেন? আবার আপনিই উত্তর করিল, 'স্বীকার কেন করিব না? কামিনীর প্রতি রামচরণ অনেক অত্যাচার করিয়াছে। কামিনী যতই মন্দ হউক, সে যে এখন নিতান্ত অনাথা, যার পর নাই দুঃখিনী তাহার ভুল নাই। এরূপ দুঃখিনীর সাহায্য করায় দোষ কি? রামচরণ কতই পাপ করিয়াছে, কতই করিতেছে, আরও কতই করিবে। হেমেন্দ্র বাবু তাহার যে শাস্তি দিয়াছেন, তাহাতেও সে জব্দ হয় নাই তো। যদি তাহাকে একটু ভাল করিয়া চৈতন্য দেওয়া যায়, তাহাতে ক্ষতি কি? তাহার পর সরকারদের বাটীতে অবশ্যই একটা বিশেষ কারখানা আছে। যদি তাহা জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে হয় তো না জানি কত লোকের কতই উপকার হইয়া যাইতে পারে। সেও তো মন্দ নহে।' তাহার পর রাধারমণ স্থির করিল, 'এ সরকারদের বাটীরকাণ্ডের সহিত শরতের মার নিরুদ্দেশের কোন সম্বন্ধ আছে বোধ হয় না। থাকুক আর নাই থাকুক, এ বিষয়ে যাহা মনে করিয়াছি তাহাতে ক্ষতি নাই। তবে রামচরণের কোন অনিষ্ট চেষ্টা আমি সাধ্যমতে করিব না, ইহা স্থির।

তীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

সরকারদের বাটির ভূতপূর্ব্ব অধিকারী জনার্দ্দন সরকার রামচরণ ডাক্তারের কিছু টাকা ধারিত। দেনার জন্য ঐ বাটী বিক্রয় হইয়া যায়; এক্ষণে উহা রামচরণের সম্পত্তি হইয়াছে। একবার ওলাউঠা রোগের বড় প্রাদুর্ভাব হয়। সেই সময়ে জনার্দ্দন সরকার সেই রোগের হস্তে সপরিবারে কালগ্রাসে পতিত হয়। শেষে যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহারা ঘরেই মরিয়া পড়িয়া থাকে। তাহাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার লোকও ছিল না। এই ব্যাপারের পর হইতে সরকারদের বাটীতে বড় ভূতের ভয় বলিয়া জনরব উঠিয়াছে। বিশেষতঃ রামচরণ ডাক্তার বলিয়াছেন যে, তিনি একদিন হঠাৎ ঐ সরকারদের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পান যে, বৃদ্ধ জনার্দ্দন সরকার ঘরের দাবায় বসিয়া পাটের দড়ি কাটিতেছে। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র জনার্দ্দন সরকারের ঐ প্রেত-মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। রামচরণ ডাক্তার এ কথা সকলের নিকট বিশেষ মাত্রা চড়াইয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এরূপ স্থলে সরকার বাটীর ভূতের ব্যাপারে বিশ্বাস করে না এমন লোক তো

কল্যাণপুরে নাই, নিকটস্থ দুই পাঁচ খানি গ্রামেও নাই। সরকার বাটীর ভূত যে কেবল রামচরণ ডাক্তারকেই দেখা দিয়া চুপ করিয়া ছিল এমন নহে। হলা খুড়ো নামক একজন বয়োজ্যেষ্ঠ কৃষক একদিন দুরদৃষ্ট ক্রমে মাঠ হইতে ফিরিতে রাত্রি করিয়া ফেলিয়াছিল। আহা! গরিব বেচারা, পথটা সোজা হইবে মনে করিয়া, সাহসভরে সরকারদের বাটীর পার্শ্ব দিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া আসিতেছিল। এখন বলিলে না প্রত্যয় যাইবে, হলা খুড়ো দিব্য চক্ষে দেখিল, সরকারদের ঘরের মট্‌কায় একটা ভূত বসিয়া রহিয়াছে। হলা খুড়ো যেই দেখিল ভূত, অমনই ত্রাহি মধুসূদন শব্দে ছুটিতে আরম্ভ করিল। ভূতও অমনই মট্‌কা হইতে এক লম্ফে মাটিতে পড়িল এবং হলা খুড়োর পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিল। হলা খুড়োও ছুটে, ভূতও ছুটে—ধরে আর কি! তখন হলা খুড়ো বুদ্ধির কাজ করিয়া অতি দূর হইতে 'রাম দা, রাম দা,' বলিয়া পথ-পার্শ্বস্থ এক কৈবর্ত্ত-ব্রাহ্মণকে ডাকিতে ডাকিতে দৌড়িতে লাগিল। এই ডাকাডাকিতেই ভূতের দৌড় কমিয়া আসিল। এদিকে রাম দা 'কেরে হলা নাকি?' বলিয়া যেমন বাহিরে আসিল, অমনই হলাখুড়ো দৌড়িতে দৌড়িতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। এখন রাম দা উপবীতধারী ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার তাঁহার নাম রাম, সুতরাং সেখানে ভূতের দন্তস্ফুট করিবার সাধ্য নাই। কাজেই ভূতকে ক্ষুণ্ণমনে ফিরিতে হইল। সরকারদের বাটীতে যে কেবল ভূতই থাকে তাহা নহে, প্রেতিনীও আছে! নবার মা নামে এক জাহাবাজ জেলেনী স্বচক্ষে প্রেতিনী দেখিয়াছে—কেবল দেখিয়াছে নয়—তাহার সহিত ঝগড়াও করিয়াছে! নবার মা একদিন শেষরাত্রে বাজারহাটে মাছ লইয়া যাইতেছিল। কেমন তাহার কুগ্রহ, সে সেদিন অন্যমনস্ক ভাবে সরকারদের বাটীর পার্শ্বস্থ পথ দিয়াই যাইতেছিল। এখন যেমন সে সরকারদের বাটীর কাছে গিয়াছে, অমনই এক ভয়ানক প্রেতিনী নেকড়া ঝাড়িতে ঝাড়িতে তাহার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল এবং বিকট নাকিস্বরে বলিতে লাগিল, "মাছ দে, মাছ দে, ঘাড় মট্‌কে দেব—মাছ দে।" নবার মার বড় সাহস। তাহার কোমরে আবার লোহার চাবি ছিল। সে সেই চাবিতে হাত দিয়া বলিল, 'আমার কাছে লোহা আছে; আমার ভয় কি? পথ ছাড়্।' প্রেতিনী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কেবলই বলিতে লাগিল, 'মাছ দে।' তখন নবার মা জোর করিয়া বলিল,—'আরে লো পথ ছাড় বল্‌ছি—না হইলে আঁইস বটি দিয়া নাক কাটিয়া দিব।' তবু কি প্রেতিনী পথ ছাড়ে! সে কেবলই বলে,—'ঘাড় মট্‌কে দেব—মাছ দে।' তখন নিরুপায় হইয়া নবার মা বলিল,—

"ভূত আমার পুত শাঁখ্‌নি আমার ঝি,
রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে কর্‌বি আমার কি?"

রাম লক্ষ্মণের নাম যেমন করা, অমনি প্রেতিনী কোথায় যে গেল তাহা আর বুঝা গেল না। কিন্তু পাঁচ পা যাইতে না যাইতে আবার প্রেতিনী আসিয়া পথ আগুলিয়া মাছ চাহিতে লাগিল এবং নবার মা আবার ঐ মন্ত্র বলিয়া প্রেতিনী তাড়াইল। দুই ক্রোশ পথ একবার করিয়া প্রেতিনী আইসে, আবার নবার মার মন্ত্রের জোরে পলাইয়া যায়—ক্রমাগত এইরূপ চলিতে লাগিল। প্রেতিনী ও নবার মা ঝগড়া করিতে করিতে রূপনগরে আসিয়া পৌছিল, এদিকে ফরসাও হইয়া আসিল। কাজেই প্রেতিনীকে হতাশ হইয়া

কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া আসিতে হইল। নবার মার সাহসের জন্য গ্রামস্থ লোক ধন্য ধন্য করে। নবার মা যাহা করিয়াছে তাহার গল্প করিতে হইলেই লোকের গা ডোল হইয়া উঠে। নবার মা বলিয়াছে যে, সে ভাল করিয়া দেখিয়াছে, প্রেত্নীর পা দুখানা একেবারে উল্টা। যাহা হউক, এত বলবান্ প্রমাণ সত্বে সরকারদের বাটির ভূতে লোক কোন্ সাহসে অবিশ্বাস করিবে? ভূতে অবিশ্বাস করা দূরে থাকুক, যদি দৈবাৎ কোথাও সরকারদের বাটীর নাম উঠে, অমনই নিকটস্থ লোক বলে,—'রাম রাম রাম বল ভাই, ও কথায় কাজ কি?" রাত্রি দূরে থাকুক, দিনমানেও কেহ সরকারদের বাটীর নিকটস্থ হইতে সাহস করে না। ইদানীং যে কেহ কখন নিতান্ত কার্য্যানুরোধে সরকারদের বাটীর কাছ দিয়া যাতায়াত করিয়াছে, সেই বলিয়াছে যে সরকারদের ঘরের মধ্যে মানুষের কোঁথানির শব্দ, অথবা নাকিসুরে ক্রন্দনের শব্দ, স্পষ্ট শুনা গিয়াছে। এ নিশ্চয়ই প্রেত্নীর কার্য্য।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, চারিদিকে নিতান্ত অন্ধকার। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। দুইটা লোক এইরূপ সময়ে এই নিদারুণ সরকার বাটীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। লোক দুইটীর এক জন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোক। তাহারা অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিল। সেই সময় সরকারদের ঘরের ভিতর হইতে কাতর ভাবে ও ক্ষীণস্বরে শব্দ হইল,—"মাগো।"

শব্দ শুনিয়া পুরুষটি বলিল,—

"এ নিশ্চয়ই মানুষের আওয়াজ।"

স্ত্রীলোকটি বলিল,—

"মানুষই হউক আর ভূতই হউক, আমি ইহার তত্ত্ব না লইয়া ছাড়িব না।"

"বড় শক্ত কথা। তত্ত্ব লইবার উপায় কি?"

স্ত্রীলোকটি উত্তর দিল,—

"শক্ত কেন? ঘরের এদিকে জানালা আছে জান? সেই জানালা দিয়া খোঁজ লইব।"

"জানালা তো আছে, উঠিবে কেমন করিয়া? যে অন্ধকার; কিছুই দেখা যায় না'; জানালা কোথায় তাহা তো বুঝা যাইতেছে না।"

"উঠিব? পার্শ্বের বেড়া হইতে দুই বাঁশ তুলিয়া আনি দাঁড়াও। তাহা দিয়া উঠা যাইবে। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ হইতেছে, সেই আলোকে জায়গা ঠিক করিয়া লইব।"

পুরুষ আর কথা কহিল না। সে বুঝিল, তাহার অপেক্ষা এ নারীর উৎসাহ অনেক অধিক। স্ত্রীলোক যাহা বলিল, তাহা করিল। সে অনেক যত্নে, অনেক কষ্টে, দুইখানি বাঁশ সংগ্রহ করিয়া আনিল। তখন পুরুষ আবার বলিল,—

"ইহাতেই বা উঠিবে কিরূপে? চাঁচা বাঁশ, পা দিবে কোথায়?"

স্ত্রীলোক বলিল,—

"তা বটে। তাহারও একটা উপায় করিতেছি।"

এই বলিয়া স্ত্রীলোক আবার প্রস্থান করিল। অনতিবিলম্বে বেড়া হইতে চারি পাঁচ খানি কাঠের কচা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বলিল,—

"এই লও, ইহাতে উঠিবার উপায় হইবে।"

এখন ঘরের মধ্য হইতে আবার শব্দ হইল,-

"ভগবান্! আর কত দিন এমন করিয়া যন্ত্রণা সহিব? গৃহ মধ্যস্থ বক্তা মানবই হউক, প্রেতাত্মাই হউক, তাহার স্বর কাতরতা ও ক্ষীণতায় পরিপূর্ণ। স্ত্রীলোক গৃহ মধ্যস্থ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—

"ভয় নাই, তোমার দুঃখের শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমরা আত্মীয়।"

গৃহমধ্যস্থ লোক অতি কষ্টে বলিল,—

"কি শুনিলাম? তোমরা মানুষ! মানুষে এমনই করিয়া কথা কহে বটে।"

স্ত্রীলোক বলিল,—

"আমরা মানুষই বটে। তোমার অত কষ্ট করিয়া চেঁচাইয়া কথা কহিতে হইবে না। আমরা তোমার কাছে যাইবার চেষ্টা করিতেছি।"

তাহার পর পুরুষের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—

"দেখিতেছ কি? বাঁধ—কাঠ গুলা শীঘ্র বাঁশের সঙ্গে বাঁধ। কথার স্বর শুনিয়া বুঝিতেছি, ঘরের মধ্যে স্ত্রীলোক। রামচরণ—নরাধম, তার সর্ব্বনাশের আর দেরি নাই। বাঁধ, বাঁধ. শীঘ্র বাঁধ।"

পুরুষ বলিল,—

"বাঁধিব কেমন করিয়া? কি দিয়া বাঁধি?"

স্ত্রীলোক বলিল,—

"তাইত!"

এই বলিয়া পুরুষের স্কন্ধ হইতে তাহার চাদর খানি তুলিয়া লইল এবং বিনা বাক্যে তাহার মাঝ খানে লম্বালম্বি ছিঁড়িয়া ফেলিল। সেই ছিন্ন অংশদ্বয় পুরুষের হস্তে দিয়া বলিল,—

"বাঁধ, বাঁধ—এই দিয়া বাঁধ। আরও দিতেছি।"

তাহার পর স্ত্রীলোক আপনার বস্ত্রের উভয় দিকের পাইড় ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং তাহা পুরুষের হস্তে দিয়া বলিল,—

"কেমন ইহাতে হইবে তো?"

পুরুষ বলিল,—

"যথেষ্ট।"

বাঁশের সহিত কাঠ একত্র করিয়া বাঁধা হইল। তাহার পর উভয়ে মিলিয়া তাহা ধরাধরি করিয়া যথাস্থানে লাগাইল। তাহার পর স্ত্রীলোকটী তাহার উপর দিয়া উঠিয়া জানালার সমীপস্থ হইল। জানালা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল; বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক কৌশল করিয়া তাহা খুলিয়া ফেলিল। প্রায় এক ঘণ্টা কাল স্ত্রীলোক সেই বাঁশের উপর দাঁড়াইয়া গৃহমধ্যস্থা স্ত্রীলোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিল। সে সময়ে সময়ে বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন মার্জ্জন করিতে লাগিল এবং তাহার কণ্ঠস্বরে অকৃত্রিম সহানুভূতি পরিব্যক্ত হইতে লাগিল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে স্ত্রীলোক গৃহমধ্যস্থা কামিনীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। আসিবার সময় সে বলিয়া আসিল,—

"মা, আজি হইতে তিন দিবসের মধ্যে তোমার মুক্তি নিশ্চিত জানিবে।"

তাহার পর স্ত্রীলোক নীচে নামিয়া, পুরুষের সাহায্যে বাঁশ কাঠ ইত্যাদি সরাইয়া ফেলিল। সে সমস্ত বিদূরিত হইলে পুরুষ ও স্ত্রীলোক ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

বলা বাহুল্য যে এই পুরুষ রাধারমণ, এই স্ত্রীলোক কামিনী।

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।

মা ও মেয়ে।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।
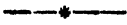
যে বৃহৎ ভবন-দ্বারে শরৎকুমারী মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন এবং যেখানে দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের শুশ্রূষায় তাঁহার চৈতন্যের পুনরাবির্ভাব হইয়াছিল, সেই সুদূরবিস্তৃত সৌধের অন্তঃপুর মধ্যস্থিত একতম প্রকোষ্ঠে শরৎকুমারী বসিয়া আছেন। যে প্রকোষ্ঠে শরৎকুমারী উপবিষ্টা, তাহার আয়তন বৃহৎ এবং তাহা সুন্দররূপে সজ্জিত। তাহার জানালা ও দরজার সারসীর গায় নানা বর্ণের নানাপ্রকার সুন্দর ফুল অঙ্কিত। তাহার বারান্দায় দেশী ও বিলাতী পাতার গাছ। ঘরের ভিতর বৃহৎ তৈলবর্ণে দেশীয় চিত্রকর দ্বারা চিত্রিত নানাপ্রকার হিন্দু দেব-দেবীর চিত্র লম্বিত। গৃহ মধ্যে দুগ্ধফেন-নিভ শয্যা-সমাচ্ছাদিত অতি সুন্দর খট্টা। একটি আলমারিতে কতকগুলি পুস্তক, একখানি টেবিলের উপর নানাবিধ কাগজ কলম ইত্যাদি এবং কয়েক খানি গদি আঁটা চেয়ার ঘরের শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছে। ভিত্তিগাত্রে একটি সুন্দর ঘড়ি অবিশ্রান্ত ভাবে স্বকার্য্য সাধনে নিযুক্ত রহিয়াছে। এই ঘরের মধ্যে শরৎকুমারী বসিয়া আছেন।

শরৎকুমারী সেই মূর্চ্ছার পর হইতেই এই বাটিতেই আছেন। এখানে কেন? এখানে না থাকিয়া শরৎ আর কোথায় যাইবে? রূপনগরের দীননাথের বাটী তাহার একমাত্র আশ্রয় স্থান। কিন্তু সেখানে শরৎ আর যাইবে না; শরতের জন্য তাঁহারা যে জন-সমাজে ঘৃণিত হইয়া থাকিবেন, ইহা শরৎ প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারিবে না। এই তো প্রধান কথা। তাহার পর গৃহস্বামী হেমেন্দ্র-নারায়ণ রায় জমিদার মহাশয়ের যত্ন, তাঁহার পত্নীর স্নেহ এবং সর্ব্বোপরি দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের অনুরোধ শরৎ ছাড়ায় কেমন করিয়া? শরৎ এখানেই থাকিল—তাহাকে থাকিতেই হইল। আগ্রহে ও অনুপায়ে তাহাকে এই স্থানেই থাকিতে হইল। আর শরৎ থাকিল,-যে দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়কে তাহার আত্মা স্বর্গের দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতে শিখিয়াছে, সেই দেবেন্দ্রনারায়ণকে সর্ব্বদা দেখিতে পাইবে বলিয়া এ লোভ, এ আশা বালিকা কেমন করিয়া ত্যাগ করিবে? বালিকা এখানেই থাকিয়া গেল। এক মাস, দুই মাস তিন মাস করিতে করিতে ক্রমে আট মাস কাটিয়া গেল।

বালিকা শরতের মূর্চ্ছার পর যখন প্রথমে জ্ঞানোদয় হইল এবং যখন দেবেন্দ্রনারায়ণ

রায় প্রভৃতি সকলে তাহার এবংবিধ অবস্থায় হঠাৎ এ স্থানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন বালিকা কোন কথাই প্রচ্ছন্ন করিল না। প্রচ্ছন্ন করিতে সে জানে না, সে তাহা করিল না। সমস্ত কথা বলিয়া পিতৃ-মাতৃ স্থানীয় দীননাথ ও করুণাময়ীর জন্য কাঁদিতে লাগিল। হেমেন্দ্রনারায়ণ তখনই লোক পাঠাইয়া, দীননাথকে শরতের বর্ত্তমান অবস্থা জানাইয়া পাঠাইলেন। সেই রাত্রে দীননাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শরতকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু হেমেন্দ্রনারায়ণ কোন মতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন যে, অতি সৎপাত্রে বালিকার বিবাহ দিয়া, তাহাকে রূপনগরে পাঠাইবেন।

বালিকা বর্ত্তমান অবস্থায় বড় সুখে আছে। দীননাথের সহিত প্রতিদিনই সাক্ষাৎ হয় এবং করুণাময়ীর সহিতও প্রায়ই সাক্ষাৎ ঘটে, সুতরাং সে সম্বন্ধে তাহার আর উদ্বেগ নাই। তাহার পর সকল সুখের উপর সুখ—দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়। সেই স্বর্গের দেবতা তাহাকে বড় আদর করেন, বড় স্নেহ করেন, বড় দয়া করেন, বড় অনুগ্রহ করেন। বালিকার হৃদয়ে এ সুখ, এ আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। সেই দেবতা তাহার জন্য সতত ব্যস্ত! অপার আনন্দ হেতু তাহার দেহ ও মন স্ফূর্ত্তিযুক্ত, তাহার লোচন-যুগল উৎফুল্ল, তাহার বদন-মণ্ডল প্রদীপ্ত, তাহার সর্ব্ব শরীর লাবণ্যে ঢলঢলিত। পিতার মৃত্যুর পর, বালিকা এত সুখ আর কখন দেখিতে পায় নাই।

শরৎকুমারী সেই গৃহ মধ্যস্থ এক খানি চেয়ারে স্বর্গ-কন্যার ন্যায় বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার পরিধান সুচিক্কণ শুভ্র বস্ত্র, তাঁহার হস্তে স্বর্ণচূড়, কণ্ঠে সৌবর্ণ্য চিক, কর্ণে হৈম দুল। যৌবনোন্মুখী, বিকসিতাঙ্গী শরৎকুমারীকে সাক্ষাৎ স্বর্গকন্যা বলিয়াই মনে হইতেছে।

শরৎকুমারী নিষ্কর্ম্মভাবে বসিয়া নহেন। তাঁহার হস্ত ও মন একটি মখমলের টুপির উপর নানাবর্ণের রেশমি সূতার ফুল তৈয়ারী করিতে নিযুক্ত। আজি চারিদিন হইল দেবেন্দ্রনারায়ণ কলিকাতা হইতে একটি মখমলের টুপি আনাইয়াছেন। ঐ টুপিতে রেশমি সূতার নানা প্রকার ফুলকাটা ছিল। টুপিটী দেখিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণ বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং পুনঃ পুনঃ শিল্পীর যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। শরৎকুমারী তাহা শুনিয়াছিল। সে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শিল্পকার্য্য-যুক্ত টুপি তৈয়ার করিবার অভিপ্রায়ে, দেবেন্দ্রনারায়ণের অজ্ঞাতসারে, তাঁহারই একটি সাদা টুপি লইয়া, নানা বর্ণের রেশমি সূতা সংগ্রহ করিয়া, দেবেন্দ্রনারায়ণের নামযুক্ত ফুল আরম্ভ করিয়াছে। কাজ প্রায় অর্দ্ধাধিক সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। শরৎ তদ্গত চিত্তে এই কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছে।

ধীরে ধীরে দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র শরতের চিত্ত টুপি, ফুল, সূতা ইত্যাদির কথা একেবারে ভুলিয়া গেল। টুপিটির কার্য্য সমাপ্ত হইলে, দেবেন্দ্রনারায়ণকে শিল্পীর পরিচয় না দিয়া, তাহা দেখাইতে হইবে বলিয়া যে সঙ্কল্প ছিল, তাহাও সে ভুলিয়া গেল। তাহার হাতের টুপি হাতেই রহিল। সে মহানন্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। দেবেন্দ্রনারায়ণ তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—

"দেখি, তোমার হাতে কি? বাঃ এ বেশ যে! দেখি দেখি।"

তখন শরৎ বুঝিল যে টুপিটা লুকান হয়

নাই। বলিল,—"ও কিছুই নয়—দিন; ও দেখ্‌তে হবে না।"

দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন,—

"একি তোমার হাতের ফুল? কি চমৎকার! তুমি সূচীকর্ম্মে এত নিপুণা! কলিকাতা হইতে যে টুপি আনাইয়াছি, ইহার সঙ্গে তো তাহার তুলনাই হয় না।"

শরৎকুমারী বদন বিনত করিয়া বলিল,—

"আপনাকে দেখাইবার জন্য আমি উহা করি নাই, আপনার উহা দেখিতে হইবে না। আপনি এখানে এখন কেন আসিলেন?"

হাসিতে হাসিতে দেবেন্দ্র বলিলেন,—

"আমি আসিয়াছি বলিয়া তুমি রাগ করিতেছ, আচ্ছা আমি চলিয়া যাইতেছি।"

এই বলিয়া দেবেন্দ্র বাবু পশ্চাদ্দিকে দুই পদ সরিয়া আসিলেন।।

বালিকা ধীরে ধীরে বলিল,—

"আচ্ছা—যান।"

তখন দেবেন্দ্রনারায়ণ আবার শরতের নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—

"তুমি আমাকে যাইতে বলিলে বটে, কিন্তু আমি যাইব না; আমি জোর করিয়া থাকিব। যদি বড় রাগ করিয়া থাক, তবে আমাকে তাড়াইয়া দিতে পার তো তাড়াইয়া দেও।"

এই বলিয়া তিনি একখানি চেয়ার টানিয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন। শরৎও আনন্দোৎফুল্ল অথচ বিনম্র বদনে উপবেশন করিলেন। ভাষা অপূর্ণ, ক্ষীণ ও সীমাবদ্ধ। ভাষার সাহায্যে তাঁহাদের সেই পূর্ণ হৃদয়ের পূর্ণ, অসীম ও অনন্ত ভাব সমূহ কখনই ব্যক্ত হইতে পারে না। তাঁহারা উপবেশন করিলেন, কিন্তু কথা কহিতে সাহস হইল না। কি জানি কি বলিতে বলিব? কি জানি, বলিতে গিয়া যদি মনের প্রকৃত বক্তব্য বলিয়া উঠিতে না পারি, এই বিষম আশঙ্কা। উভয়েই নীরব। বহুক্ষণ পরে দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন,—

"শরৎ, বিশেষ প্রয়োজন হেতু আমাকে কল্য কলিকাতা যাইতে হইবে। আমার চারি দিন বিলম্ব হইবে। এ চারিদিন তুমি আমাকে মনে করিবে তো?"

শরৎ বলিল,—

"মনে করিব কি না জানি না, কিন্তু আপনি কলিকাতায় যাইতে পাইবেন না।"

দেবেন্দ্রনারায়ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,

"তুমি যদি আমাকে মনেই না কর, তবে আমি যাইতে পাইব না কেন?"

শরৎ গম্ভীর ভাবে বলিল,—

"প্রায় এক বৎসর আমি এখানে আছি। আপনি ইহার মধ্যে একদিনও কোথায় যান নাই তো, তবে আজি কেন যাইবেন? আমি দুঃখিনী, আমি অভাগিনী। আপনি আমাকে সে সকল ভুলাইয়া দিয়াছেন। আমি এখন আপনার কৃপায় পরম সুখী। আপনি আমার সাহস বাড়াইয়াছেন। সেই সাহসে আমি বলিতেছি, আপনি যাইতে পাইবেন না।"

শরৎকুমারীর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। তখন দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন,—

"না শরৎ, আমি যাইব না। কি জানি কেন, তোমাকে দেখিতে পাইব না এ চিন্তা আমার অসহ্য! তোমার জন্য আমার যত ভাবনা, তোমার ভাবনা তাহার অনুরূপ কি না, তাহা দেখিবার জন্যই এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলাম। আমি যাইব না স্থির করিলাম। আমার যে প্রয়োজন তাহা পত্রে লিখিয়া দিলেও চলিবে। আমি তাহাই করিব।"

শরতের বদন-মণ্ডল প্রফুল্ল হইল। দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন,—

"শরত, আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

শরৎ বলিল,—

"এত শীঘ্রই যদি যাইবেন, তবে আসিলেন কেন?"

দেবেন্দ্র বলিলেন,—

"আমি যে একটু অবসর পাইলেই এখানে ধাবিত হই কেন, তাহার উত্তর কি জানি না। যাহা হউক, তুমি সারাদিনই এই ঘরটীতে বসিয়া থাকিবে—শরীর খারাপ হইবে যে। চল মার কাছে যাই।"

শরৎ বলিল,—

"আমি টুপিটা না সারিয়া যাইব না।"

দেবেন্দ্র বলিলেন,—

"টুপি অন্য সময়ে করিও। নিয়ত এক কর্ম্ম করা ভাল নয়। চল, মার কাছে যাই।"

শরৎ ও দেবেন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—•—

পরদিন বেলা চারিটার সময়, শরৎকুমারী পূর্ব্ব বর্ণিত প্রকোষ্ঠ মধ্যে, সেই খট্টার উপর অধোবদনে শয়ন করিয়া রোদন করিতেছে! শরৎকুমারী রোদন করিতেছে কেন? তাহার সুখময় জীবনে কি বিষাদমেঘ সহসা সমুদিত হইল। বিষাদ শরতের রোদনের কারণ নহে। আপনার প্রমত্ত হৃদয়বেগ সংযত করিতে না পারিয়া, বালিকা রোদন করিতেছে; দুরাশা সাগরে ঝাঁপ দিয়াছে বলিয়া বালিকা কাঁদি- ; উচ্চ—উচ্চ—অতিউচ্চ দেবেন্দ্রনারায়ণকে সে কোন্ সাহসে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে ভাবিয়া কাঁদিতেছে! বালিকা হৃদয়কে বুঝাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছে। নির্ব্বোধ! তাহা কি আর হয়? সে সাবধানতার সময় অনেক দিন গিয়াছে। শরৎ এখন বুঝিয়াছে যে, সে এখন এই প্রেমের সম্পূর্ণ অধীন হইয়াছে এবং তাহার জীবন ও মরণ এই প্রেমের পরিণামের উপর নির্ভর করিতেছে। তাই বালিকা কাঁদিতেছে।

দেবেন্দ্রনারায়ণ প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু বালিকার মন বড়ই চিন্তামগ্ন, সে তাঁহার আগমন জানিতে বা বুঝিতে পারিল না। দেবেন্দ্রনারায়ণ ক্রমে আসিয়া খট্টার সমীপে দাঁড়াইলেন। তখনও বালিকা কিছুই জানিতে পারিল না। দেবেন্দ্রনারায়ণ বুঝিলেন, শরৎ ক্রন্দন করিতেছে। সভয়ে বলিলেন,—

"শরৎ, একি?"

শরৎ ব্যস্ততাসহ উঠিয়া বসিল! সে যে ক্রন্দন করিতে ছিল, তাহা লুকাইবার আর সময় বা সম্ভাবনা াই। সে, তাহা না পারিয়া, দেবেন্দ্রনারায়ণের মুখের প্রতি চাহিল এবং সেই দেবকান্তি নয়নে পড়িবামাত্র আরও অধিক কাঁদিয়া ফেলিল। বালিকা দুই হস্তে বদন ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার সেই নবনীত তুল্য কোমল অঙ্গুলি গুলির মধ্য দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু-প্রবাহ বহিতে লাগিল। দেবেন্দ্র নিতান্ত কাতর ভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—

"বল শরৎ, কি হইয়াছে—কেন কাঁদিতেছ—বল?"

তখন শরতের হৃদয়ের উত্তেজিত ভাব সহিষ্ণুতার সীমা ছাড়াইয়া উঠিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বেগে আসিয়া দেবেন্দ্র-

নারায়ণের পাদমূলে নিপতিতা হইল এবং বলিল,—

"আমাকে ক্ষমা করুন। আমি দুঃখিনী, আমি নিরাশ্রয়া, আপনি আমাকে দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছেন। আমি আপনার সহিত তাহার মত ব্যবহার করিতে পারি নাই। আমাকে ক্ষমা করুন—আমার দোষ গ্রহণ করিবেন না।

দেবেন্দ্রনারায়ণ বিস্ময়াবিষ্ট হইতে লাগিলেন। অতি যত্নে সন্তর্পণে ধীরে ধীরে শরৎকুমারীকে উঠাইয়া বলিলেন,—

"শরৎ তোমার দোষ? তোমার কোন কার্য্যেই তো আমি দোষ দেখিতে পাই না। তোমার ব্যবহার অপূর্ব্ব মধুরতায় মাখা, স্বর্গীয় পবিত্রতায় পরিপূর্ণ। কেন শরৎ, কেন তুমি কাঁদিতেছ? তোমার মনে আজি কি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে? বল আমাকে,আমি প্রতিকারের চেষ্টা করি। দোষের কথা বলিও না। তোমার চরিত্রে দোষ—সম্ভাবনার অতীত কথা!"

শরৎ বলিল,—

"এবার আমার দোষ ঘটিয়াছে; হে হৃদয় দেবতা, আজি তোমার নিকট আমি অপরাধিনী হইয়াছি। দেবেন্দ্র বাবু, হৃদয়-সর্ব্বস্ব, আমি আপনাকে প্রাণের প্রাণ হইতে ভাল বাসিয়াছি! এ পিতৃমাতৃ-হীনা, নিরাশ্রয়া অভাগিনীর এ দুরাশা অমার্জ্জনীয়। করুণাময় দেবেন্দ্র বাবু, আপনি আমাকে অনেক অনুগ্রহ করিয়াছেন, আজি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন! আমি যথাসাধ্য যত্নে হৃদয়কে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, সে তাহা বুঝে নাই; আমি প্রাণকে বারংবার এ দুরাশার পথ হইতে ফিরিতে বলিয়াছি, কিন্তু কেহই আমার কথা শুনে নাই। আমি ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছি, আর ফিরিবার উপায় নাই—আর ফিরিতে সাধ্য নাই। আমার বিষম অপরাধ হইয়াছে বটে, কিন্তু লুকান অপরাধ বড় ভয়ানক জানিয়া, হে করুণাময়, আজি মুক্তকণ্ঠে আমার অপরাধের বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলাম। দুঃখিনীর আশ্রয়, বিপন্নবান্ধব দেবেন্দ্র বাবু, আমি আপনাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছি; ভাবিবেন না যে আমি আপনার নিকট হইতে সমান পরিমাণ ভালবাসার আশা করি। না না দেবেন্দ্র বাবু, আমার উন্মত্ত হৃদয় তত কাণ্ডজ্ঞানহীন নহে। আমার আশা নিতান্ত সীমাবদ্ধ—নিতান্ত অল্পে সন্তুষ্ট। আপনাকে দেখিতে পাইলেই আমার আশার পূর্ণ তৃপ্তি। দেবেন্দ্র বাবু, আপনি বিবাহ করিয়া সুখের সংসার পরমসুখে কাটাইতে থাকিবেন; আমি দুঃখিনী কেবল নিকটে থাকিয়া আপনাকে দেখিব, আপনার সুখময় জীবন দেখিব। তাহাতেই আমার আশার চরম তৃপ্তি হইবে। তাহার অপেক্ষা অধিকতর সুখ, আমি আর জানি না—চাহি না। দেবেন্দ্র বাবু, দয়াময়, আমার যাহা অপরাধ তাহা আপনাকে জানাইলাম। আপনার চরণে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতেছি—আমাকে গৃহ-বহিষ্কৃতা করিয়া দিবেন না, আমাকে ক্ষমা করুন।"

আবার বালিকা দেবেন্দ্রনারায়ণের চরণ ধারণ করিল। দেবেন্দ্রনারায়ণ নীরবে সমস্ত কথা শুনিতে ছিলেন; তাঁহাতে তখন তিনি নাই। তিনি কল্পনায় শরৎকুমারীর প্রণয়লাভ করিয়া যে যে সুখময় বিষয়ের ধ্যান ও চিন্তন করিয়াছিলেন যে, শরৎকুমারীকে স্বীয় হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী করিয়া তিনি প্রতিনিয়ত প্রেমার্চ্চনা করিয়া আসিতেছেন, এবং আপনাকে অত্যন্ত হীন ও শরৎকুমারীকে নিতান্ত উচ্চ জ্ঞানে যিনি শরতের সম্মুখে কদাচ প্রেমের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে সাহসী হন নাই,

আজি সেই শরৎকুমারী, সংসারের সার সম্পত্তি শরৎকুমারী, তাঁহারই পদ নিম্নে—তাঁহার প্রেমার্থিনী। কি সৌভাগ্য! দেবেন্দ্র তাহাই ভাবিতেছেন। শরতের বদন-বিনির্গত এক একটী কথা তাঁহাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর সুখময় রাজ্যে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি সে সুখের লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া দেবেন্দ্রনারায়ণ সেই আশার অগোচর, অজ্ঞাতপূর্ব্ব সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। শরৎকুমারীর কথা সমাপ্ত হইল, তখন দেবেন্দ্রের চৈতন্য হইল। তখন তিনি সযত্নে শরৎকুমারীকে তুলিয়া হৃদয়ে লইলেন। বলিলেন—

"শরৎকুমারি, হৃদয়েশ্বরি! তুমি আমার পদনিম্নে! আমি শয়নে, স্বপ্নে, ভ্রমণে ও বিরামে নিয়ত তোমাকে বই আর জানি না। দিবারাত্রি কেবল তোমার চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা আমার চিত্ত অধিকার করিতে পারে না। কেমন করিয়া তোমাকে পাইব, কিসে তুমি সন্তুষ্ট হইবে, কি উপায়ে তুমি আমাকে অধিক ভাল বাসিবে, এই আলোচনায় আমি নিরন্তর নিযুক্ত। সেই আমার হৃদয়ের দেবী, চিন্তার আশ্রয়, কল্পনার বিষয় শরৎকুমারী অদ্য অতুল প্রেম-পূর্ণ হৃদয় লইয়া আমার নিকট—আমার পদনিম্নে! প্রিয়তমে, আমার হৃদয় সুখে ও আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, কথায় আম হৃদয়-ভাব ব্যক্ত করিতে অক্ষম—"

এই বলিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণ স্বীয় বক্ষমধ্যস্থ শরৎকুমারীর বদনের প্রতি চাহিলেন। দেখিলেন, সেই মুদিত-নয়না সুন্দরীর নয়ন-প্রান্ত হইতে অবিরল অশ্রু বহিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসাইতেছে। শরৎ কাঁদিতেছে—আনন্দে। এত সুখ, এত আনন্দ, সে তো আশা করে নাই। আশার অনেক অতীত—আকাঙ্ক্ষার অনেক অধিক সুখ তাহার আয়ত্ত। আজি সেই সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বগুণাধার দেবেন্দ্রনারায়ণ তাহাকে—সেই দুঃখিনী, অভাগিনীকে হৃদয় ভরিয়া ভাল বাসিয়াছেন। যে হৃদয়ের কণিকামাত্র স্থানও সে প্রার্থনা করিতে সাহস করে নাই, সেই আজি সে হৃদয়ের রাজ্ঞী হইতেছে, আজি সেই দেবহৃদয়ে তাহারই পূর্ণ অধিকার।

দেবেন্দ্রনারায়ণ আবার বলিলেন,—"দেবি! হৃদয়েশ্বরি! আমি মানব—অতি ক্ষুদ্র, সামান্য, অকিঞ্চিৎকর মানব; তোমার সহিত আমার তুলনা কদাচ সম্ভব নহে। তবে কেমন করিয়া শরৎ তোমার দয়ার—তোমার অনুগ্রহের পরিশোধ করিব? আমার হৃদয় আমি তোমারই উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছি—কিন্তু তাহা তো কদাচ তোমার গুণের অনুরূপ পুরস্কার নহে। হৃদয় দান করাই তো যথেষ্ট নহে। শরৎ, আমি তোমাকে অর্চ্চনা করিয়া সুখী হই। এ ক্ষুদ্র দেহ, মন, প্রাণ শরৎকুমারি, তোমারই হস্তে অর্পণ করিলাম, তোমার উদ্দেশে উৎসর্গ করিলাম।"

শরতের চিত্ত তখন অপার্থিব সুখ-চিন্তায় নিমগ্ন। তাহার হৃদয়ে তখন কুসুমের সৌরভ, বসন্তের বায়ু, স্বর্গের জ্যোতিঃ, সাগরের গাম্ভীর্য্য, শূন্যের অসীমতা, ভাবের নিস্তব্ধতা, কল্পনার সূক্ষ্মতা, তাড়িতের ক্ষিপ্রতা, এবং হিমাদ্রির উচ্চতা সকলই সমভাবে বিরাজ করিতেছে! এই সর্ব্ববিধ ব্যাপারের সংমিশ্রণে সে হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় শান্তির আবির্ভাব হইয়াছে। চতুর্দ্দিক্ হইতে সমশক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইলে, পদার্থ যেমন একস্থানে স্থির হইয়া থাকে, শরৎকুমারীর হৃদয় অধুনা সেই-

রূপ স্থির ও নিশ্চল। দেবেন্দ্রনারায়ণ আবার বলিলেন,--

"বল দেবি, আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়কে তুমি ঘৃণা করিবে না? শরৎকুমারি, স্বর্গবালা, তোমার হৃদয়ে স্থান পাইতে আমার সাহস নাই। তুমি দয়া করিয়া এই অনুপযুক্ত পাত্রে হৃদয় দিবে কি?

মুদিতনয়না শরৎকুমারী একবার নয়ন মেলিয়া চাহিল। সেই চক্ষুতে কত কথা, কত হাস্য, কত আনন্দই ব্যক্ত করিল! ভাষার সাহায্যে, কথা দ্বারা দিয়া, তাহার অপেক্ষা অধিক ভাব ব্যক্ত হইতে পারিত কি?

সেই দিন, সেই স্থানে, এই যুবক যুবতী হৃদয়ের বিনিময় করিলেন এবং পরস্পরের নিকট আত্মোৎসর্গের বিধান করিলেন। সংক্ষেপতঃ সেই দিন তাঁহাদের হৃদয়ের বিবাহ হইয়া গেল। সমাজে যাহাকে বিবাহ বলে, তাহা দেহের বিবাহ। হৃদয়ের বিবাহ এ সমাজে নিতান্ত দুর্লভ সামগ্রী। এ স্থলে সেই আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইল।

বালিকে, শরৎকুমারি! আজি বহু কাল পরে তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছি, বল দেখি, এ সংসার সুখের, কি দুঃখের রাজ্য? আজি আর তোমার মরিতে সাধ যায় কি? এ সংসারকে বিষাদের পুরী বলিয়া এখন তোমার মনে হয় কি? তোমাকে তখনও বলিয়াছিলাম, এখনও আবার বলিতেছি, এ বিপদ-ব্যাধি-বিদলিত জীবনে ধৈর্য্যই একমাত্র ঔষধ।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বেলা আটটা। সুবৃহৎ রায়ভবনের একতম নিভৃত প্রকোষ্ঠে হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় ও একজন সন্ন্যাসী বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। হেমেন্দ্র বাবুর প্রশস্ত ললাট, বিশাল উরঃ ও সুতীক্ষ্ণ নয়নদ্বয় দেখিলেই তাঁহাকে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তির আধার বলিয়া বোধ হয়। হেমেন্দ্রের বয়স যতই ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ সীমার নিকট হইতেছে, ততই স্বভাবতঃ বিষয় স্পৃহাশূন্য হেমেন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মালোচনার অধিকতর নিবিষ্টমনা হইয়া উঠিতেছেন। বিশেষতঃ তাঁহার উপযুক্ত পুত্র বিষয়ব্যাপার এরূপ সুনির্ব্বাহিত করিতে সক্ষম হইয়া উঠিয়াছেন যে, তাঁহার এক্ষণে তৎসংক্রান্ত চিন্তার কোনই প্রয়োজন নাই।

যে সন্ন্যাসী গৃহমধ্যে বসিয়া আছেন, হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। হেমেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাকে বড় ভাল বাসেন বলিয়া সন্ন্যাসী, সময় সময়ে এ অঞ্চলে আসিলেই, হেমেন্দ্রনারায়ণের ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকেন। আজি চারি দিন হইল তিনি ঐরূপ উপলক্ষে এস্থলে সমাগত হইয়াছেন। এ কয় দিন সন্ন্যাসীর সহিত নিরন্তর নানাবিধ সামাজিক, পারত্রিক ও আধ্যাত্মিক আলোচনায় হেমেন্দ্রনারায়ণ পরমানন্দে কাল কাটাইতেছেন।

তাঁহারা উক্তরূপ প্রসঙ্গ বিশেষের আলোচনায় রত রহিয়াছেন, এমন সময় ধীরে ধীরে দেবেন্দ্রনারায়ণ সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র হেমেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন,—

"আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহ ?"

দেবেন্দ্রনারায়ণ বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, —"আজ্ঞে না ?"

তাহার পর দেবেন্দ্রনারায়ণ ভক্তিভাবে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া সন্নিহিত আসন বিশেষে উপবেশন করিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে স্নেহময় ভাবে আপ্যায়িত করিলেন।

তাহার পর হেমেন্দ্রনারায়ণ সেই সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসিলেন,—

হাঁ—তাহার পর ! আপনি বলিতেছিলেন সমাজ যাহা পাপ বলিয়া মনে করে, তাহা পাপ বলিয়া ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। বেশ কথা। কিন্তু সকল ঘটনায় এ কথা কিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে ? যে স্থানে যুক্তি দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সমাজ না জানিয়া কোন ব্যক্তিকে পাপী বলিয়া স্থির করিতেছে, সে স্থলে সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সেই নিষ্পাপ ব্যক্তিকে পুনরায় গ্রহণ করা উচিত নহে কি ?

সন্ন্যাসী বলিলেন,—

"সমাজ যদি ভ্রান্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি দূর করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতে পারেন। কিন্তু যদি এমন হয় যে সমাজ কিছুতেই বুঝিবে না, তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই সমাজের সেই মতেই চলিতে বাধ্য।"

হেমেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন,—

"আপনাকে একটী দৃষ্টান্ত দেখাই। আমার এই বাটীতে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা ও রূপবতী একটী বালিকা আছে। ঐ বালিকার বিধবা মাতা বহুদিন হইতে নিরুদ্দেশ। লোকে অনুমান করে সে ব্যভিচারিণী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে। এ কথার কোনই প্রমাণ নাই। আপনি কি বলেন, এই অমূলক কথার জন্য ঐ চিরদিন সমাজে পতিতা থাকিবে ?"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—

"অবশ্যই থাকিবে। সামাজিক নিয়ম নিতান্ত কঠোর হইলেও, তাহার অন্যথাচরণ করা পাপ।"

হেমেন্দ্রনারায়ণ আবার বলিলেন,—

"ঐ কন্যা যেরূপ বিদ্যাবতী, গুণবতী তাহাতে তাঁহাকে পুত্রবধূ করিতে পাইলে আমি আপনাকে ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করি। আমি যদি তাহাই করি, তাহাতে দোষ কি ?"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—

"তাহাতে মহাদোষ। আপনার সামাজিক শাসনের অন্যথাচরণ করা যাইতেছে।

হেমেন্দ্র। আমি যদি চেষ্টা করিয়া সামাজকে বুঝাইয়া দিই যে, এবিষয়ে সমাজ যাহা স্থির করিয়াছে তাহা ভুল ?"

সন্ন্যাসী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

"তাহা হইলে পাপ নাই। আমার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যে সমাজে বাস করিতে হইবে তাহার নিয়মাদি, সঙ্গত বা অসঙ্গত হইলেও, অবশ্য প্রতিপাল্য। সমাজ মধ্যে যদি এমন ব্যক্তি থাকেন, যে ইচ্ছা মতে তিনি সমাজের নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন, সেই ব্যক্তিকে সে সমাজের নেতা বলিতে হইবে। সে ব্যক্তি সৎ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া যে কার্য্য করেন, তাহা নিন্দনীয় বা পাপ নহে।"

হেমেন্দ্রনারায়ণ চুপ করিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী আবার বলিতে লাগিলেন,—

"কিন্তু ঐ রূপ সামাজিক নেতা অসাধারণ গুণবান্ হওয়া আবশ্যক। কেবল সম্পত্তিশালী বা প্রতাপান্বিত হওয়ায়, লোকে যদি তাঁহাকে ভয় প্রযুক্ত মান্য করে, তাহা হইলে তাদৃশ ব্যক্তির নেতৃত্বে সমাজের ঘোর অনিষ্টের সম্ভাবনা। যথেষ্ট জ্ঞান, বিদ্যা ও ভূয়ো-

দর্শন—সে ব্যক্তির এ সকলই থাকা আবশ্যক। নচেৎ তিনি জোর করিয়া নানাবিধ স্বেচ্ছানুগত জঘন্য ব্যবহার সমাজ মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন এবং সে জন্য সমাজের অধঃপতন অপরিহার্য্য। সম্প্রতি ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী কতকগুলি অদূরদর্শী সংস্কারক নামধারী মহাপুরুষের দৌরাত্ম্যে আমাদের সমাজ নিতান্ত কাতর ও উৎপীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। সমাজের নেতা হওয়া নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। মহাশয়ের ন্যায় ব্যক্তিই সমাজের নেতা হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কিন্তু এরূপ লোক তো সচরাচর মিলিবার কথা নহে।"

তাঁহারা যখন এবংবিধ বিচারে নিমগ্ন সেই সময় দ্বার-সমীপে একজন ভৃত্য আসিয়া উঁকি দিল। তাহাকে দেখিয়া হেমেন্দ্রনারায়ণ জিজ্ঞাসিলেন,—

"কাহাকে ডাক ?"

ভৃত্য বলিল,—

"আজ্ঞে—রাজা বাবুকে।"

তখন দেবেন্দ্রনারায়ণ, সন্ন্যাসীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, প্রস্থান করিলেন। তাঁহার হৃদয় আনন্দে উন্মত্ত। তিনি সন্ন্যাসীর সহিত পিতার কথাবার্ত্তা স্পষ্টই বুঝিলেন যে, শরতের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, ইহা তাঁহার পিতার নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। সেই দেবী—যাঁহাকে তিনি হৃদয়বেদীতে বসাইয়া অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই দেবী তাঁহার পিতার ইচ্ছাক্রমে তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইবেন, এ অচিন্তিত পূর্ব্ব সৌভাগ্য এত সহজে—এত শীঘ্র উপস্থিত হইবে, তাহা তিনি একবারও মনে করে নাই। তিনি শরৎকুমারীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া, এই মহানন্দের সংবাদ তাঁহার গোচর করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইলেন।

সেই ভৃত্য দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল,—

"কলিকাতা হইতে বড় জরুরি পত্র আসিয়াছে, দেওয়ানজি আপনাকে জানাইতে বলিলেন "

দেবেন্দ্র উত্তর দিলেন,—

"আমি শীঘ্রই যাইতেছি !"

আবার ব্যাঘাত—সম্মুখে রাধারমণ প্রণাম করিয়া করযোড়ে উপস্থিত। দেবেন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন,—

"রাধারমণ ! কি সংবাদ ? ভাল আছতো ?"

রাধারমণ বলিল,—

"সংবাদ অনেক ! দয়া করিয়া শুনুন্।"

দেবেন্দ্র বলিলেন,—

"একটু পরে। আমি এখন বড় ব্যস্ত আছি। এখনই আসিতেছি।"

রাধারমণ বলিল,—

"আজ্ঞে আমার কথা—সর্ব্বনাশের কথা—জীবন মরণের কথা। এখনই শুনিলে ভাল হয়।"

দেবেন্দ্র বলিলেন,—

"বটে ? সর্ব্বনাশের কথা ! তবে তো তোমার কথা অগ্রেই শুনিতে হইতেছে। বল, কি বলিবে।"

এই বলিয়া পার্শ্বস্থ একটী প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাধারমণ তাঁহার অনুগমন করিল।

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত।

মা ও মেয়ে।

ষষ্ঠ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ

—*—

বেলা ৩টা হইবে, এমন সময়ে রামচরণ ডাক্তার ধীরে ধীরে পূর্ব্ববর্ণিত সরকারদের বাটির দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সতর্কভাবে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর হস্তস্থিত চাবি দ্বারা দরজার তালা খুলিয়া ফেলিল এবং দ্বার খুলিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। রামচরণ ভিতরে প্রবেশ করিয়া আবার সাবধানে ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। তাহার পর সে ঘরের নিকটস্থ হইয়া দাঁড়াইল, এবং ঘরের ভিতর কোন শব্দ হইতেছে কি না উৎকর্ণ হইয়া শুনিল। তাহার পর হস্তস্থিত আর একটী চাবি দ্বারা ঘরের দরজা খুলিল। ঘরের ভিতর হইতে ক্ষীণস্বরে, ক্ষীণপ্রাণে শব্দ হইল,—

"আসিয়াছ? রামচরণ, আসিয়াছ? এখনও মরি নাই। এমন করিয়া কত দিনে মরিব?"

রামচরণ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ও গম্ভীরভাবে থাকিয়া তাহার পর বলিয়া উঠিল,—

"কতদিনে মরিবে তাহা জানি না, কিন্তু তুমি না মরিলেও আমার মন কোন মতেই স্থির হইতেছে না।"

রুগ্না আবার উত্তর দিল,—

"কেন রামচরণ—কেন আমাকে এমন গলগ্রহ করিয়া রাখিয়াছ? আমাকে ছাড়িয়া দেও, আমি চলিয়া যাই। আমার অনাথিনী কন্যা।"—

সে কণ্ঠ হইতে আর কথা বাহিরিল না। শোকোচ্ছ্বাসে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। রামচরণ বলিল,—

"কেন তোমাকে রাখিয়াছি তাহা কি জান না? কতদিন তো তোমাকে সে কথা বলিয়াছি। তোমাকে আনিয়াছিলাম তোমার রূপ দেখিয়া তোমার যৌবন দেখিয়া। তোমাকে আনিয়া এখানে তোমার ভাব দেখিয়া আমার সে প্রবৃত্তি হরিয়া গেল; আমার সে বাসনা লুকাইল। দেখিলাম, তুমি কন্যার বিচ্ছেদে পাগলিনী, আর দেখিলাম, তিন দিনের মধ্যেই তোমার সেই অপূর্ব্ব শ্রী নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তোমাকে যে জন্য আনিয়াছিলাম সে ইচ্ছা একটুও হইল না। কিন্তু তখন তোমাকে ছাড়িয়া দেওয়াও মহা দায়। তোমাকে ছাড়িয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্ব্বনাশ। তুমি যে স্বাধীন হইলে যেখানে সেখানে আমার অত্যাচারের কথা না বলিয়া চুপ্ করিয়া থাকিবে, এ কথা আমি কোন ক্রমেই বিশ্বাস

করি না। কাজেই আমাকে এই পাপের বোঝা ঘাড়ে করিয়া বহিতে হইতেছে। এক্ষণে তুমি না মরিলে আমার নিষ্কৃতি নাই।"

গৃহমধ্যস্থা স্ত্রীলোক বলিল,—

"আমাকে ছাড়িয়া দেও, রামচরণ, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এ কথা ইহজগতে কাহারও সাক্ষাতে কখন বলিব না।"

রামচরণ বলিল,—

"তোমাকে বিশ্বাস কি? তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমি কি প্রাণে মারা যাইব মনে করিয়াছ?"

স্ত্রীলোক আবার বলিল,—

"তবে কি হইবে রামচরণ? মরণ তো ইচ্ছায়ত্ত নহে। আমি তো এ যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারি না। আমাকে কেন অকারণ এত কষ্ট দিতেছ? যদি আমাকে ছাড়িয়া না দেও, তবে দয়া করিয়া কোন উপায়ে আমাকে মারিয়া ফেল। তাহাতে তোমারও উপকার হইবে, আমারও সকল যন্ত্রণার শেষ হইবে।"

পাষণ্ড রামচরণ অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল,—

"কাজেই আমাকে তাহাই করিতে হইবে। এত উপবাস করিয়া, এত কষ্ট ভুগিয়াও যে তোমার কাঠপ্রাণ বাহির হইবে না, তাহা আমি ভাবি নাই। এ দগ্ধানি আমি আর সহ্য করিতে পারি না। এমন কঠোর প্রাণও কোথায় দেখি নাই। বুঝিলাম, তুমি আপনা আপনি মরিবে না। এখন কাজেই তোমাকে জোর করিয়া মারিয়া না ফেলিলে আমার নিস্তার নাই।"

স্ত্রীলোক বলিল,—

"তাহাই কর, আমাকে কাটিয়া ফেল। আমি তাহাতে একটুও দুঃখিত বা কাতর নহি। কিন্তু রামচরণ, তোমাকে একটা কথা বলি শুন। ভাবিও না যে, আমি প্রাণের মায়ায় বা মৃত্যুর ভয়ে এ কথা বলিতেছি। প্রাণ তো আমার দেহ হইতে যাওয়াই সুখ, মৃত্যুই তো এখন আমার পরম সুখ। সেজন্য নহে। রামচরণ. ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা কখন একবারও ভাবিয়াছ কি? নরকের কথা একবারও মনে করিয়াছ কি? মাথার উপর সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বর রহিয়াছেন তাহা জান কি রামচরণ? এখানে তুমি যাহা যাহা করিলে পরকালে তাহার প্রত্যেকটির বিচার হইবে, তাহা শুনিয়াছ কি পাষণ্ড? তোমার সন্তোষ বা ক্রোধ, অনুগ্রহ বা নিগ্রহ আমার পক্ষে এখন উভয়ই সমান। আমি আজি যদি তোমার হস্তে নাও মরি, দুইচারি দিন পরে যে মরিব তাহার ভুল নাই। মরণান্তে যদি আত্মায় আত্মায় সাক্ষাৎ হয় তখন দেখিব পাপি তোমার পাপ আত্মা নিশ্চয়ই অগ্নিরাশির মধ্যে বিকট চীৎকার করিতে করিতে অনন্তকালের নিমিত্ত দগ্ধ হইতেছে। সেদিন, সে অবস্থা, রামচরণ, একবার স্মরণ কর।"

স্ত্রীলোক নীরব হইল। দুর্ব্বল শরীরে বহুক্ষণ কথা কহিয়া সে কাতর হইয়া পড়িল! রামচরণও নীরব। তাহার চিত্তের তখন ভয়ানক অবস্থা। একদিকে ইহলোকে ভয়ানক বিপদের সম্ভাবনা, আর একদিকে স্ত্রীলোক পরলোকের যে চিত্র দেখাইল, তাহা ভয়ানকের ভয়ানক। রামচরণের চিত্ত যার পর নাই অস্থির। স্ত্রীলোক আবার বলিল,—

"পাপিষ্ঠ রামচরণ, কি ভাবিতেছ? অসীম ভাবনাস্রোতেও তোমার এ পাপ-পর্ব্বত ধৌত হইবার নহে। ভাবিয়া দেখ রামচরণ, আমি একজন দুঃখিনী বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যা। আমি তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছি যে তুমি আমাকে

এই দুঃসহ যাতনা দিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে আমার জীবননাশ করিতেছ? ইহার কি উত্তর দিবে নরাধম? আমার সেই নিরাশ্রয়া দুঃখিনী 'মা, মা' বলিয়া যত আর্ত্তনাদ করিতেছে, ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া তাহার চক্ষু হইতে যত বিন্দু জল পড়িতেছে, জানিও, সে সমস্তই ভগবানের পুস্তকে লিখিত হইতেছে, তোমাকে তাহার জবাব দিতে হইবে। ভাবিয়া দেখ রামচরণ, তখন তোমার অবস্থা ভয়ানক হইয়া পড়িবে!"

স্ত্রীলোক আবার নীরব। স্ত্রীলোক-বিচিত্র চিত্র রামচরণের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল। সে-তুই একবার শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সে পাষাণ-হৃদয়ে স্থায়ীরূপে অঙ্কপাত করা অসম্ভব। রামচরণের হৃদয় তখনই অন্য পথে পরিচালিত হইল। সে বলিল,—

"আমার ভাবনা তোমায় ভাবিতে হইবে না। তোমার অদৃষ্টে আপাততঃ কি আছে তাহাই ভাবিয়া দেখ।

স্ত্রীলোক বলিল,—

আমার অদৃষ্টে আর কি আছে রামচরণ? মৃত্যু—তাহা তো নূতন নহে। কিন্তু আমাকে মারিলেই যে তুমি ইহজগতে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে মনে করিয়াছ, জানিও কখনই তাহা ঘটিবে না। আজি হউক বা কালি হউক, এ কথা প্রচার হইবেই হইবে, তখন তোমার অদৃষ্টে কি হইবে?"

রামচরণ বলিল,—

"সে ভয় আমাকে দেখাইতে হইবে না। তোমাকে আমি যেরূপ সাবধানে লুকাইয়া রাখিয়াছি, তাহাতে কাহারও সাধ্য নাই একথা জানিতে পারে।"

স্ত্রীলোক একটু হাসির সহিত মিশাইয়া বলিল,—

"কিন্তু ঈশ্বরের নিকট লুকাইবার ক্ষমতা কাহারও নাই জানিবে। সেই অনাথনাথ ভগবান্ আমার এই দশা জানেন। তিনি অনুগ্রহ করিয়া এই অবরোধের মধ্যেও আমার বন্ধু জুটাইয়া দিয়াছেন। আজি যদি আমি মরি রামচরণ, জানিও, কালি আমার সেই ঈশ্বরপ্রেরিত বন্ধুগণ তোমার সর্ব্বনাশ না করিয়া ছাড়িবেন না। অতএব রামচরণ, তোমার নিষ্কৃতি নাই। আমি মরি বা বাঁচি, তোমার সর্ব্বনাশ সম্মুখে।"

রামচরণ অনেকক্ষণ কি ভাবিল। ভাবিয়া বুঝিল যে, স্ত্রীলোকের কথা নিতান্ত অবিশ্বাস্য। সে ভয় দেখাইবার জন্য এ কথা বলিতেছে। বলিল,—

"রামচরণ কাঁচা ছেলে নহে যে, তোমার ঐ কথা সত্য বলিয়া মনে করিবে। আমাকে ভয় দেখাইয়া কাজ আদায় হইবে না।"

স্ত্রীলোক বলিল,—

"তোমাকে ভয় দেখাইয়া কাজ আদায় করিতে চাহি না। যে মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছে, তাহার কোন কাজেই দরকার নাই তো। ধর্ম্ম আমার বন্ধুরূপে উপস্থিত হইয়াছেন, এ কথা মিথ্যা নহে। বিশ্বাস না হয় এই দেখ,"—এই বলিয়া স্ত্রীলোক একটা মিঠাই ফেলিয়া দিয়া বলিল,—"এই সামগ্রী এখানে কেমন করিয়া আসিল?"

রামচরণের মাথা ঘুরিয়া গেল। ভাবিল, তবে তো সত্যই অপর লোকে ইহার সন্ধান পাইয়াছে! ক্রোধে সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল। সে স্থির করিল, এই সর্ব্বনাশ-স্বরূপিণী স্ত্রীলোককে এখনই বিনাশ করিতে হইবে। তাহার পর উহার শব এমনি করিয়া লুকাইতে হইবে যে, ইহজগতে কেহই তাহার সন্ধানও পাইবে না। ইহাকে আর

বাঁচিতে দিলে আরও সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে। রামচরণ বলিল,—

"সুলোচনা, আর রক্ষা নাই। তুই যখন আমার সর্ব্বনাশের পথ করিতেছিস্ তখন তোকে আর এক মুহূর্ত্তকালও থাকিতে হইবে না। আজি এক লাঠিতে তোর মাথা ফাটাইয়া অন্য কথা কহিব। দেখি, তোর কোন্ বন্ধু রক্ষা করে।"

এই বলিয়া রামচরণ ঘরের চাল হইতে বাঁশ ভাঙ্গিতে গেল এবং যখন প্রকাণ্ড এক বাঁশ হস্তে সুলোচনার মস্তক চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে গৃহপ্রবেশ করিবে, এমন সময় দেখিল সম্মুখে আলুলায়িতকুন্তলা উন্মাদিনী-প্রায় এক স্ত্রীলোক! রামচরণ প্রথমে অবাক্ হইল, তাহার পর চিনিল, সে স্ত্রীলোক কামিনী। সে কামিনীর অসম্ভাবিত উপায়ে এস্থানে আগমনে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া, তাহার প্রতি অত্যাচার প্রদর্শন করিবে মনে করিতেছে, এমন সময়ে কামিনী বলিল,—

"রামচরণ, আজি সেই পদ-বিদলিতা বেশ্যা সম্মুখে উপস্থিত। সে অনেক সহিয়াছে, সে অনেক ভুগিয়াছে, আজি সকল কষ্টের অবসান করিতে সে এখানে আসিয়াছে। ভাবিয়াছ কি ডাক্তার বাবু, হস্তের বাঁশ দিয়া আমার মাথা ভাঙ্গিয়া দিবে? হা হা, আর তুমি তাহা পারিতেছ না। অনেক পদাঘাত করিয়াছ, অনেক দুর্ব্বাক্য বলিয়াছ, আজি কিন্তু আর সে সব কিছু হইবে না। মনে করিয়াছ কি, ঐ স্ত্রীলোককে মারিয়া ফেলিয়া তোমার কলঙ্ক লুকাইয়া রাখিবে? না না, ডাক্তার মহাশয়, তাহা আর হইবার নহে। তোমার যে পাপ—তোমার যে কলঙ্ক, তাহা আর লুকাইবার নহে।"

কামিনী নীরব হইল। ক্রোধে ডাক্তারের আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার সুলোচনাকে নিপাত করার কথা ভুলিয়া গিয়া হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা কামিনীর মস্তক বিচূর্ণ করিবার সংকল্প করিল। নিমেষের মধ্যে কামিনী রামচরণের নিকটস্থ হইল এবং তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—

"দেখ দেখি, ডাক্তার বাবু, হৃদয়ে আঘাত লাগে কি না! দেখ দেখি, ও পাষাণহৃদয় বিদ্ধ হয় কি না!"

সঙ্গে সঙ্গে কামিনী কটিদেশ হইতে এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা নিষ্কাশিত করিয়া রামচরণের হৃদয়ে প্রোথিত করিয়া দিল। রামচরণ 'মাগো' শব্দে ভূমিতলে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

তখন কামিনী বিকট চীৎকার করিয়া বলিল,—

"কি দেখিতেছ—বাহিরে আইস, আজি সকল জ্বালার শেষ করিয়া দিয়াছি।"

ধীরে ধীরে অতি কাতরভাবে এক অস্থি-চর্ম্মাবশেষ রমণী-মূর্ত্তি ঘরের দ্বার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল! যাহারা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছে তাহারাও দেখিয়া অনুমান করিতে পারে না যে, এই সেই সুলোচনা। সুলোচনা দেখিয়া অবাক্!

তখন আর কোন কথা না কহিয়া, বা আর কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া রামচরণের যাতনাক্লিষ্ট বক্ষ হইতে কামিনী বিদ্ধ ছুরিকা খুলিয়া লইল এবং বলিল,—

"রামচরণ, প্রাণেশ্বর, হৃদয়দেবতা! ভাবিও না তোমার এই চরণাশ্রিতা দাসী সুখে থাকিবে। দাসী তোমার চরণ ভিন্ন জানে না। ইহজগতে তোমার চরণে স্থান পাইবার আশা নাই দেখিয়া সে আজি এই উপায় অবলম্বন করিয়াছে। তোমার চরণাশ্রিতা

দাসীও তোমার চরণছায়ার অনুবর্ত্তিনী হইল।”

এই বলিয়া কামিনী সেই শোণিতাক্ত ছুরিকা স্বীয় বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল এবং হাসিতে হাসিতে রামচরণের দেহের উপর পড়িয়া গেল।

সুলোচনা বাক্যহীনা, সংজ্ঞাহীনা বলিলেও হয়। এ সকল স্বপ্ন না প্রকৃত ঘটনা!

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

——*——

এদিকের যখন এই অবস্থা, ঠিক সেই সময়ে সেই স্থানে হেমেন্দ্রনারায়ণ রায়, দেবেন্দ্রনারায়ণ, রাধারমণ এবং তাঁহাদের সমভিব্যাহারী আরও কয়েকজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাধারমণ অত্র প্রাতে সুলোচনাসম্বন্ধীয় সংবাদ দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের কর্ণগোচর করে। তিনি সেই অচিন্তিত পূর্ব্ব শুভসংবাদ পিতার কর্ণগোচর করেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া লোকজন লইয়া এতদ্বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ করিতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন —ভয়ানক ব্যাপার! রামচরণ ডাক্তার শোণিতাক্ত কলেবরে ভূপৃষ্ঠে নিপতিত, তাহার বক্ষোপরে সমদশাপন্না এক স্ত্রীলোক। তখন সুলোচনার প্রসঙ্গ গিয়া হেমেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন,—

“দেখ দেখি দেবেন্দ্র, ইহারা বাঁচিতে পারে কি না?”

দেবেন্দ্রনারায়ণ অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—

“ইহাদের উভয়েরই আঘাত গুরুতর হইয়াছে। বাঁচিবার কোন সম্ভবনা নাই। বোধ হইতেছে, এই স্ত্রীলোকটা পুরুষটাকে মারিয়া স্বয়ং আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছে। যাহা হউক ইহাদের মুখে জলটল দিয়া একটু শুশ্রূষা করিয়া দেখা মন্দ নহে।”

তখন রাধারমণ জল সংগ্রহ করিয়া আনিল। ধীরে ধীরে বায়ু ও জল প্রয়োগ করিতে করিতে প্রথমে রামচণের, পরে কামিনীর জ্ঞানোদয়ের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল। রামচরণ একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল—তখনই আবার চক্ষু মুদিত করিল। তাহার পর নিতান্ত কাতরভাবে বলিল,—

“ওঃ নরক!—কি ভয়ানক—কামিনি—প্রাণেশ্বরি—প্রাণ যায় যে!”

কামিনীও চক্ষু মেলিল। চক্ষে চক্ষে সে অন্তিমকালে মিলন ঘটিল। রামচরণ আবার বলিতে লাগিল,—

“কামিনি—প্রিয়তমে—ওঃ—হায় আগে কেন জ্ঞান হয় নাই!—প্রাণ যে—নরক! কি হইবে—কামিনি প্রাণেশ্বরি—আমাকে ক্ষমা কর। দেখ—আমার বক্ষ দেখ—সেখানে আর কিছুই নাই—কেবল তুমি। হা প্রিয়ে—কামিনি—এখন উপায়—ওঃ মরি—কোথায় তুমি? তোমাকে ছাড়িয়া—ওঃ কোথায় চলিলাম?”

রামচরণ নীরব হইল। কামিনীর চক্ষু দিয়া তখন জল পড়িতেছে। সমবেত লোক সকলের নয়নও জলভারাকুল। সুলোচনার নয়ন দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে।

কামিনী বলিল,—

রামচরণ—প্রাণেশ্বর, হৃদয়দেবতা—জীবনসর্ব্বস্ব, আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? তুমি কি মনে করিতেছ, তুমি চলিয়া গেলেও

দাসী এখানে পড়িয়া থাকিবে ? দাসী তোমার সঙ্গেই যাইতেছে—প্রাণনাথ।”

তখন রামচরণ বলিল,—

“কামিনি—প্রিয়ে—তোমাকে কত কষ্টই দিয়াছি—তোমার দেবদুর্ল্লভ—আহা—স্বর্গীয় প্রেমের কতই অবজ্ঞা করিয়াছি—কামিনি—প্রিয়তমে—আমি ক্ষমার যোগ্য নহি—তথাপি—ওঃ—আমাকে ক্ষমা—”

কামিনী নীরব। তখন রামচরণ একে একে উপস্থিত সকলের প্রতি নেত্রপাত করিল। ক্রমে তাহার দৃষ্টি সুলোচনার সেই ক্ষীণ মূর্ত্তির উপর পড়িল। সে নিতান্ত কাতর ও বিপন্ন হইয়া উঠিল। অত্যন্ত ভীতভাবে বলিল,—

“ওঃ নরক—নরক—নরক ! কি করিব ?—নরক—নরক—নরক ! সুলোচনা—মা আমার—তোমার এ অধম পাপিষ্ঠ সন্তানের—গতি—না—গতি নাই—নরক। ওঃ—সুলোচনা—মা—আমাকে—ক্ষমা—না—অসম্ভব—আমার নরক। আগে বুঝি নাই—পাপ ভাবি নাই—দুষ্কর্ম্মে ডরাই নাই। নরক—নরক—নরক ! কিন্তু মা সুলোচনা—আমি তোমার সন্তান—আমি তোমার দেহে—ওঃ—তোমার দেহে—জ্ঞানতঃ কি অজ্ঞানতঃ কখন হাত—নাই। তুমি সতী—সাবিত্রী—তোমার আশীর্ব্বাদে—তোমার প্রার্থনায় অনেক ফল। কিন্তু আর বলিতে পারি না। ওঃ মরি যে—একটু জল দিতে পার ?”

দেবেন্দ্রনারায়ণ রামচরণের বদনে একটু জল দিলেন। সে আবার বলিল,—

“কিন্তু তুমি আমার জন্য প্রার্থনা করিবে কেন ? আমি তোমাকে—ওঃ ভাবিলে ভয় হয়—কত কষ্ট দিয়াছি—এমন অধমকে তুমি—ওঃ আশীর্ব্বাদ করিবে কেন ? কিন্তু মা—আমি যতই মন্দ হই—আমি তোমার সন্তান। সন্তানকে অন্তিম কালে ক্ষমা—ওঃ—যাই যে—ওঃ ক্ষমা কর মা !”

ক্ষীণ ও কাতর স্বরে, অশ্রুসমাকুল লোচনে, সুলোচনা বলিলেন,—

“রামচরণ ! বুদ্ধির দোষে তুমি আমাকে কষ্ট দিয়াছ সত্য, কিন্তু আমার দেহ যে তোমার দ্বারা কলঙ্কিত হয় নাই, ইহা আমি পরম লাভ বলিয়া মনে করিতেছি। আমি যে কষ্ট পাইয়াছি সে জন্য আমি এখন একটুও কাতর নহি জানিবে। তুমি আমাকে মাতৃসম্বোধন করিয়াছ ; আমিও, জননীর ন্যায় তোমার সকল দোষ ক্ষমা করিয়া, পূর্ণ হৃদয়ে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি !”

তখন রামচরণ আবার বলিল,—

“তবে—ওঃ—তবে আইস মা. আমার মস্তকে চরণ—ধূলি দেও মা।”

এই বলিয়া রামচরণ হস্ত বিস্তার করিয়া সুলোচনার পাদ-স্পর্শ করিল এবং সেই চরণরেণু স্বীয় মস্তকে সংস্থাপিত করিল। তাহার পর রামচরণ রাধারমণের নিকট সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। রাধারমণ তাহাকে সরল হৃদয়ে ক্ষমার আশ্বাস দিল। তাহার পর রামচরণ করযোড়ে হেমেন্দ্র-নারায়ণ রায়ের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল,—

“আমার কিঞ্চিৎ সম্পত্তি আছে। তাহা সম্পূর্ণ কি বলিব—ওঃ—সৎপথে অর্জ্জিত হইলে—প্রিয় ভগ্নী শরৎকুমারীকে—দিতাম। তাহাতে কাজ নাই—ঐ সম্পত্তি—মহাশয়—কোন হিতকর কার্য্যে—ব্যয় করিবেন।”

তিনি অনুরোধ পালন করিতে স্বীকৃত হইলেন। তাহার পর রামচরণ বলিল,—

“কই—প্রিয়ে—কামিনি—প্রাণেশ্বরি—

কোথায় তুমি? আইস—কাল ফুরাইয়া আসিয়াছে।”

কামিনীর তখন বাক্য কথনের ক্ষমতা ছিল না! সে উত্তর দিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু উত্তর বাহিরিল না, একবার মস্তকান্দোলন করিল মাত্র। তখনই সে মস্তক রামচরণের বক্ষ চ্যুত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেল। তাহার যন্ত্রণাক্লিষ্ট, চিরদুঃখময় জীবনের অবসান হইল। অবিলম্বে রামচরণের বদনে মৃত্যু- চিহ্ন সমস্ত প্রকাশিত হইল। দেখিতে দেখিতে তাহার দেহ ও আত্মার চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল! নারকী রামচরণের পাপপ্রাণ ইহ লোক হইতে প্রস্থান করিল। ভব রঙ্গভূমে সে যে সকল লীলা দেখাইতে আসিয়াছিল, অদ্য এই স্থানেই তাহা পরিসমাপ্ত হইয়া গেল। পাপেই তাহার বিলাস, পাপেই তাহার তৃপ্তি, পাপেই তাহার পূর্ণতা ছিল,—অদ্য পাপেই তাহার পতন ঘটিল। এরূপ পাপ-পঙ্কিল প্রাণ পরকালে কিরূপ ফলভোগ করিবে, তাহার আলোচনা করিতে মানবের অধিকার নাই। কিন্তু ইহ জন্মে সে যে সুখের আশায়, তৃপ্তির লালসায় ছুটাছুটী করিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই।

রামচরণ যতই পাষণ্ড হউক, তাহার মৃত্যু নিতান্ত অনৈসর্গিক ও ভয়ানক। পাপ-পরায়ণ রামচরণ ও কলঙ্কিনী কামিনীর এতাদৃশ মরণে সমবেত ব্যক্তিবর্গ নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। হায়, অন্তিম কালে রামচরণের হৃদয়ে কামিনীর প্রতি যে উচ্চ ভাব প্রতিভাত হইয়াছিল, পূর্ব্বে কেন তাহা হয় নাই? তাহা হইলে, এই যুগল জীবন নিশ্চয়ই সুখে ও শান্তিতে অতি-বাহিত হইত এবং কখনই এবংবিধ ভয়াবহ পরিণামে উপস্থিত হইত না। তাহা হইলে নিশ্চয়ই রামচরণের পাপ-ভারাবনত আত্মা বহুলাংশে নিষ্পাপ থাকিতে পারিত এবং সমাজ তাহার অত্যাচারে যাদৃশ প্রপীড়িত হইয়াছিল, কখনই সেরূপ হইত না। অন্তিম কালে রামচরণ হৃদয়কে যেরূপ প্রশস্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল, জীবনকালে কেন তাহার মনে কখনও সেরূপ প্রশস্ততা স্থান পায় নাই!

ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত।

শেষ।

যাহা দেখাইবার জন্য বর্ত্তমান উপন্যাস আরম্ভ করা হইয়াছিল, তাহার সমাপ্তি এখনও হয় নাই। পুণ্যের জয় ও পাপের পতন বিবৃত করাই এই আখ্যায়িকার প্রধান লক্ষ্য। যত দূর বর্ণিত হইয়াছে, তাহার তিন বৎসর পরে এক দিনের একটী ঘটনা-চিত্র পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে পারিলেই লেখকের অভিপ্রায় সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

রূপনগরের যে স্থানে উমাচরণের বাস বাটী ছিল, তথায় এক্ষণে একটী রমণীয় সৌধ বিনির্ম্মিত হইয়াছে। একদিন ফাল্গুন মাসের বৈকালে, সেই সৌধের দ্বিতল বারান্দায়, একটী বিধবা প্রৌঢ়া রমণী এক ভুবনমোহন শিশু পুত্র ক্রোড়ে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঐ রমণী সুলোচনা। সুলোচনার পরিধান শ্বেত কার্পাস-বস্ত্র। তাঁহার দেহ ও বদন পবিত্রতায় পরিপূর্ণ। আয়ত লোচন-যুগল আনন্দের উজ্জ্বলতায় বিভাসিত। ক্রোড়স্থ সুন্দর শিশু সুলোচনাকে নিতান্ত ব্যস্ত করিতেছে। শিশু কখন বা স্বীয় সুন্দর অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া সুলোচনার কেশকলাপ আকর্ষণ করিতেছে, কখন বা তত্রত্য আধারস্থিত নানাপ্রকার পুষ্প লইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে। সুলোচনার তাহাকে পুষ্প সংগ্রহ করিয়া দিতেছেন, কিন্তু শিশু তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আবার "উ উ" করিয়া পুষ্প দেখাইয়া দিতেছে। সুলোচনা বলিলেন,—

"দুষ্ট ছেলে! মা'র খাইবি।"

এই বলিয়া অঙ্গুলির দ্বারা বালকের গণ্ডে ধীরে ধীরে আদরের সহিত আঘাত করিলেন। অভিমানী বালকের ওষ্ঠাধর তখনই স্ফুরিত হইয়া উঠিল এবং সে সুলোচনার প্রতি চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুলোচনা তাহাকে 'না না—কাঁদিতে হইবে না' বলিয়া আদরে বক্ষে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন।

সেই সময়ে, পশ্চাতের দ্বার দিয়া, এক ভুবনমোহিনী যুবতী সেই বারান্দায় প্রবেশ করিলেন। যুবতীর সৌন্দর্য্য স্বর্গীয়। তাঁহার স্বর্ণ-কান্তি স্থানে স্থানে হীরক-খচিত স্বর্ণ-ভূষণে বিভূষিত। তাঁহার গাত্রাবরণ জামা ও পরিধান বস্ত্র মহামূল্যবান্। যুবতীর কেশ-কলাপ অবেণী-সম্বদ্ধ। যুবতী ব্যস্ততা সহকারে তথায় সমাগতা হইলেন। তাঁহার অঞ্চল ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তিনি আসিয়াই জিজ্ঞাসিলেন,—

"মা, নরেন কাঁদিতেছিল?"

সুলোচনা বলিলেন,—

"হাঁ, তোর ছেলে যে দুষ্ট—আমি উহাকে রাখিতে পারি না। নে তুই তোর ছেলে।"

বলা বাহুল্য যে এই সুন্দরী শরৎকুমারী। শরৎকুমারী নিকটস্থ হইয়া হস্ত বিস্তার করিবামাত্র শিশু "মাঃ মাঃ" বলিয়া শরতের ক্রোড়ে লাফাইয়া গেল। শরৎ ক্রোড়স্থ সন্তানকে আদর করিয়া বলিলেন,—

"দুষ্ট! দিদির সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছিস? দেখিস্ দিদি আর কখনও কোলে লইবেন না।"

শিশু অপাঙ্গে সুলোচনার প্রতি চাহিতে লাগিল। সুলোচনা বলিলেন,—

"এস, দাদা আমার—চাঁদ আমার এস!

শিশু হাসিতে হাসিতে তাঁহার ক্রোড়ে আসিল। সুলোচনা বারংবার তাহার বদন চুম্বন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে পদশব্দ হইল। সুলোচনা বলিলেন—

"দেবেন্দ্র আসিতেছেন বুঝি। শরৎ, তোর ছেলে নে—আমি যাই।"

নরেন্দ্র আবার জননীর ক্রোড়ে আসিল; তখন সুলোচনা প্রস্থান করিলেন। তখনই দেবেন্দ্রনারায়ণ, হাসিতে হাসিতে, আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শরতের উজ্জ্বল নয়ন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহার হৃদয়ের কথা নয়ন বুঝাইয়া দিল। দেবেন্দ্র বলিলেন,—

"ছেলে লইয়া সমস্ত দিন যে ব্যস্ত, ও হৃদয়ে এ অধমের জন্য আর একটুও স্থান আছে কি?"

শরৎকুমারী বলিলেন,—

"এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার বটে; কারণ এটা অনেক ভাবিয়া বুঝিবারই বিষয়।"

তখন দেবেন্দ্রনারায়ণ শরৎকুমারীর বদনে প্রেমপূর্ণ চুম্বন করিলেন এবং খোকাকে ক্রোড়ে লইবার জন্য হস্ত বিস্তার করিলেন। নরেন্ কিন্তু তাঁহার কোলে গেল না। জননীর মুখের প্রতি চাহিয়া মধুর হাসি হাসিল! শরৎকুমারী অঞ্চলে বদন আবৃত করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"কেমন জব্দ! যেও না, খোকা বাবু।"

দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন,—

"আমার প্রতি এ সকল কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা কেন? আমার অপরাধ?"

শরৎকুমারী মনে মনে ভাবিলেন—"গুণময়! তোমার আবার অপরাধ? তোমার গুণের তুলনা নাই; তুমিতো নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র—স্বর্গের দেবতা।" প্রকাশ্যে বলিলেন,—

"অপরাধ নহে কেন? নরেন্ কি তাহা জানে না? প্রাতঃকালে এখনই আসিতেছি বলিয়া বিদায় হইয়া, যিনি বারো ঘণ্টার পরে সন্ধ্যার সময়ে আসিলেন, তাঁহার আবার অপরাধ নয়? যাইও না, খোকা বাবু!"

দেবেন্দ্র বলিলেন,—

"আমার অপরাধ হইয়াছে সত্য। কিন্তু এরূপ অপরাধ আমার আজি নূতন নহে। কার্য্যসূত্রে আমার বহুবার এ সম্বন্ধে কথার অন্যথা ঘটিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য বারের অপেক্ষা এবার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা কেন?"

শরৎকুমারী মনে মনে বলিলেন,—"তোমাকে শাস্তি? এ প্রাণ তোমার ঐ দেবচরণে সমস্ত দিন লুঠিয়া বেড়ায়। তোমাকে শাস্তি!" প্রকাশ্যে বলিলেন,—

"অপরাধ যতই বারে অধিক হয়, ততই তাহার শাস্তি গুরুতর হয়, একথা, যিনি এত জানেন, তিনি কি জানেন না?"

দেবেন্দ্রনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন,—

"খোকা বাবু, তুমি কাহারও কথা শুনিও না। এস—সোণা ছেলে, লক্ষ্মী ছেলে, এস তো।"

খোকা বাবু পিতার সোহাগপূর্ণ ক্রোড়ে যাইবার জন্য অভিলাষী হইল। শরৎ, 'না যায় না—যাইতে নাই' ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া তাহাকে নিবৃত্তি করিতে চেষ্টিত রহিলেন! দেবেন্দ্রনারায়ণও নানা প্রকার মধুর সম্ভাষণে খোকাকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন। অবশেষে দেবেন্দ্রনারায়ণেরই জয় হইল। খোকা দেবেন্দ্রের ক্রোড়ে গমন করিল। তখন শরৎকুমারী ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন,—

"আচ্ছা, থাক তুমি—তোমাদের সহিত আমার আড়ি।"

শিশুর অস্থির চিত্ত তখনই চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে আবার মাতার ক্রোড়ে আসিবার নিমিত্ত ব্যস্ততা দেখাইতে লাগিল। কিন্তু শরৎ বলিলেন,—

"কেন? সাধ করিয়া যাহার কোলে যাইলে সেখানেই থাক। আমি পর, আবার আমার কোলে কেন?"

শিশু যাইবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইল। দেবেন্দ্রনারায়ণ তাহাকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থির করিয়া রাখিতে পারিলেন না। তখন অগত্যা শরৎকুমারী খোকাকে কোলে না লইয়া থাকিতে পারিলেন না। হাসিতে হাসিতে খোকা কোলে আসিল, সঙ্গে সঙ্গে সকল বিবাদের শেষ হইয়া গেল।

তাহার পর তাঁহারা তত্রত্য আসনে উপবেশন করিল। নবনীত-পুত্তলী নরেন্দ্রনারায়ণ একবার পিতার ও একবার মাতার ক্রোড়ে যাতায়াত করিয়া খেলা করিতে লাগিল! সুস্নিগ্ধ বসন্ত বায়ু ধীরে ধীরে তাঁহাদের দেহ স্পর্শ করিতে লাগিত। প্রস্ফুটিত কুসুমাবলীর সুগন্ধ তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিল। খোকার স্বর্গীয় শব্দ তাঁহাদের কর্ণ-কুহর পবিত্র করিতে লাগিল। প্রেমিকের পার্শ্বে প্রেমিকা এবং প্রেমিকার পার্শ্বে প্রেমিক, উভয়ের মধ্যে প্রেম-বন্ধন—নবনীতপুত্তলী, নয়নানন্দ সন্তান। তাঁহাদের সংসার প্রেমময়, আনন্দময় ও সুখময়!

দম্পতী যখন বাহিরে এই ভাবে উপবিষ্ট, তখন প্রকোষ্ঠ মধ্যে সুলোচনা এক বাতায়ন মুখে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছেন। এত সুখ, এত সৌভাগ্য, এত আনন্দ! সকলই আশার অতীত, সকলই কল্পনার অগোচর! তাঁহার লোচনে দুই বিন্দু জল—আনন্দের জন্য। সুলোচনা সেই আনন্দের মধ্যে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"কোথায় প্রাণেশ্বর, এমন দিনে হৃদয়েশ, তুমি কোথায় রহিলে?" সুলোচনার নয়নে দুই বিন্দু জল—বিষাদের জন্য।

ইতি গ্রন্থ সমাপ্ত।

সোদর-প্রতিম আত্মীয় এবং অভিন্ন-হৃদয়

বান্ধব

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষের

চিরপ্রেমময় নাম

এই গ্রন্থ-শিরে অতি সমাদরে সংযোজিত হইল

এবং

অকপট প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ ইহা

তাঁহারই উদ্দেশে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

উৎসর্গীকৃত হইল।

দুই ভগ্না।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যুগল।

"Sight hateful ! sight tormenting ! thus these two
Imparadis't in one another's arms,
The happier Eden shall enjoy their fill
Of bliss ;—"
—Pardise Lost.

হাসিতে হাসিতে, দুলিতে দুলিতে চন্দ্রমা আকাশসমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে কে জানে কোথায় যাইতেছে; অসংখ্য তারকা-রাজি প্রস্ফুটিত প্রসূন সমূহের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে ধাইতেছে। সরস বসন্ত-বায়ু নাচিতে নাচিতে নাচাইতে নাচাইতে ছুটাছুটি করিতেছে। রজনী শুভ্রা। পৃথিবী, আর্য্য-বিধবা পৌরকামিনীর ন্যায়, শুক্লাম্বর বিশোভিতা।

এইরূপ সময়ে যুবক-যুবতী এক পরম রমণীয় উদ্যান-মধ্যস্থ সরোবর-তীরে বসিয়া আছেন। সরোবর-তীরে মর্ম্মর প্রস্তরের অতি মনোহর সোপানাবলী; সেই সোপানে যুবক-যুবতী উপবিষ্ট—তাঁহাদের পদ-নিম্নে সরসীর সুনির্ম্মল বারিরাশি। সরসী-বক্ষে চন্দ্রমা হাসিতে হাসিতে ডুবিতেছে, ভাসিতেছে, দৌড়িতেছে, আবার স্থির হইতেছে। বালক খেলিতে খেলিতে, ক্লান্ত হইয়া যেমন এক একবার স্থির হয়, স্থির হইয়া সঙ্গীদের প্রতি যেমন এক একবার চাহে, চন্দ্রমা যেন সেইরূপ স্থির হইয়া সেইরূপ চাহিতেছে। উদ্যানস্থ প্রস্ফুটিত কুসুমসমূহ, দাতার সম্পত্তির ন্যায়, স্ব স্ব সুরভিরাশি অকাতরে বিলাইতেছে। বায়ু পুষ্পরাশি লইয়া বড় রঙ্গ করিতেছে। একটি বিকসিত গোলাপকে শাখাসহ অবনত করিয়া, পার্শ্বস্থ অপর গোলাপের গায়ে ফেলিয়া দিতেছে। গোলাপদ্বয়, যেন "ছিঃ! কর কি?" বলিয়া, সলাজ হাসির সহিত বিপরীত দিকে সরিয়া যাইতেছে। বায়ু সকলেরই আত্মীয়; নীচ বা মহৎ, বায়ু কাহাকেও উপেক্ষা করে না। বায়ু কখন দরিদ্রের কুটীরে গিয়া তাহার ঝাঁপ নাড়িতেছে, বা তাহার ছিন্ন কন্থা দুলাইতেছে; কখন বা ধনীর প্রাসাদে গিয়া তাঁহার ঝাড়ের কলম বাজাইতেছে, বা তাঁহার সাসীর কবাট ঠেলিয়া ভিতরে উঁকি মারিতেছে; কখন বা পুস্তকরাশি-পরিবৃত লেখকের প্রকোষ্ঠে গিয়া, তাহার লিখিত কাগজ-স্তূপ একটি একটি করিয়া

চুরি করিতেছে, বা তাঁহার অধীতমান পুস্তকের পাতা উল্‌টাইয়া দিতেছে; কখন বা ধীরে ধীরে পুর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া, চিন্তা-মগ্না নবীনার অলক-দাম নাচাইতেছে, বা তাঁহার বস্ত্রাদি স্থানভ্রষ্ট করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে। অগ্য সুরসিক বায়ু, মনোহর চন্দ্র-রশ্মিতে গা ঢালিয়া হাসিয়া হাসিয়া বেড়াইতেছে। যে স্থানে যুবক-যুবতী বসিয়া আছেন, বায়ু তথায় গিয়া একের বস্ত্র অপরের সহিত মিশাইয়া দিতেছে, নবীনার আলুলায়িত কুন্তলরাশি যুবকের পৃষ্ঠে ফেলিতেছে এবং উভয়ের বস্ত্র সরসীজলে ফেলিয়া ভিজাইয়া দিতেছে। যুবক-যুবতী কথোপকথনে বিনিবিষ্ট; কিন্তু, কি জানি কেন, সহসা তাঁহাদের কথা-বার্ত্তা ক্ষান্ত হইল। অনেক ক্ষণ পরে যুবতী জিজ্ঞাসিলেন,—

"মানুষ মরিলে কি হয় যোগেন্দ্র ?"

যোগেন্দ্র সবিস্ময়ে কহিলেন,—

"এ কথা কেন বিনোদিনী ?"

বিনোদিনী ধীরে ধীরে নভোমণ্ডলের প্রতি নেত্রপাত করিয়া কহিলেন—

"আমি যদি মরি ?"

"কেন বিনোদ! তোমার মনে এ দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইল কেন ?"

"কি জানি, অদৃষ্টের কথা ত কিছু বলা যায় না। যদিই মরি, তাহা হইলে কি হইবে, তাহাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"তুমি একা মরিতে পার না, তোমার মৃত্যুর সহিত আর এক জনের মৃত্যু দৃঢ়-সংবদ্ধ। তুমি মরিলে সেও মরিবে, পরে উভয়ে অনন্ত জীবন লাভ করিয়া অক্ষয়-স্বর্গ ভোগ করিবে।"

বিনোদিনী ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন,—

"কে সে জন ?"

"সে কে তুমি জান না ? সে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তোমার সম্মুখেই উপস্থিত।"

বিনোদিনী মুখে কাপড় দিয়া খল্ খল্ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"তুমি!!!"

"কেন, আমাকে তোমার বিশ্বাস হয় না ?"

"না, তুমি বড় দুষ্ট। দেখ দেখি তোমার কি অন্যায় কথা। তুমি সেবার যখন কলিকাতায় যাও, আমায় সঙ্গে লও নাই। আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া খুন। সপ্তাহ পরে স্বয়ং আসিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলে। তাহার পর হইতে আমরা একবারও কাছ ছাড়া হই নাই। আজ আবার তুমি আমায় ফেলিয়া যাইবার কথা বলিতেছ। যাও, কিন্তু আমার শাপ লাগিবে; যেন তিন দিনের মধ্যে তোমাকে অধীর হইয়া ছুটিয়া আসিতে হয়।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"বিনোদ তুমি সঙ্গে থাকা কি আমার অসাধ ? কিন্তু তুমি জানত এবার আমার শেষ পরীক্ষা—"

বিনোদ বাধা দিয়া কহিলেন,—

"এ পাপ পরীক্ষায় তোমার প্রয়োজন ? যাহারা চাকরি বা অর্থের জন্য বিদ্যাশিক্ষা করে, পরীক্ষা বা উপাধি তাহাদের আবশ্যক। মনের আনন্দ ও সংসারের উপকারার্থে যাহারা বিদ্যা শিখে, পরীক্ষায় তাহাদের কোনই প্রয়োজন নাই।"

"তোমার কথা মিথ্যা নহে। কিন্তু আমি যে উদ্দেশ্যে চিকিৎসা শাস্ত্র আলোচনা করিতেছি, তাহাতে উপাধির বিশেষ আবশ্যকতা আছে।"

"আমি কোনই দরকার দেখিতেছি না। টাকা বা চাকরী, ঈশ্বরেচ্ছায়, তোমার অহ-

সন্ধান করিতে হইবে না। তুমিই বলিয়া থাক 'লোকের উপকার করা অপেক্ষা পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। ঔষধ ও চিকিৎসা দ্বারা আসন্ন মৃত্যু হইতে পীড়িত ব্যক্তিকে রক্ষা করা উপকারের পরাকাষ্ঠা।' সেই উদ্দেশ্যেই তুমি এ কঠোর পরিশ্রম, স্বাস্থ্যভঙ্গ ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া কলিকাতায় থাকিয়া চিকিৎসা শিখিতেছ। কিন্তু আজ তোমার কথায় বোধ হইতেছে, তোমার যেন আরও কি উদ্দেশ্য আছে।"

যোগেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—

"তুমি যাহা বলিলে তদ্ব্যতীত আমার আর কোনই উদ্দেশ্য নাই। তবে পরীক্ষার প্রয়োজন কি, তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। চিকিৎসকের প্রতি ও তাঁহার ঔষধের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকা আরোগ্যের একটা প্রধান কারণ। চিকিৎসক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, তাঁহার প্রতি সাধারণের বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ় হয়। পরীক্ষার এই এক প্রয়োজন, আর এক প্রয়োজন, যে কার্য্য করা গিয়াছে, অন্নের জন্য তাহার শেষ রাখা ভাল নয়।"

বিনোদিনী চুপ করিয়া রহিলেন; কথাটা বুঝি তাঁহার মনে লাগিল। যোগেন্দ্র আবার বলিলেন,—

"বিনোদ, তাহা না হইলে, তোমায় ছাড়িয়া আমি কি যাইতে পারি? তোমায় ছাড়িয়া থাকিতে আমার যে যাতনা, বোধ করি তাহার সিকিও তোমার হয় না।"

বিনোদিনী বলিলেন,—

"তুমি বড় মিথ্যাবাদী।"

"কেন বিনোদ?"

"কে কবে ইচ্ছা করিয়া যাতনা সহে? আমায় সঙ্গে লইয়া যাইতে দোষ কি?"

যোগেন্দ্র কহিলেন,—

"এবার আমাকে পড়া শুনায় এত বিব্রত থাকিতে হইবে যে, হয় তো তোমাকে লইয়া আমায় বিপদাপন্ন হইতে হইবে।"

বিনোদিনী ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—

"পড়া শুনার মুখে আগুন!"

যোগেন্দ্র বিনোদিনীকে আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহে কহিলেন,—

"তুমি পাগল!

এই সময়ে তাঁহাদের পশ্চাতে এক ভুবন-মোহিনী সুন্দরী আসিয়া দাঁড়াইলেন। যুবক যুবতী কেহই তাহা জানিতে পারিলেন না। নবাগতা সুন্দরীর বয়স অনুমান অষ্টাদশ বৎসর। তাঁহার দেহ নিরাভরণ! বিধাতা তাঁহাকে যে রূপ-রাশি প্রদান করিয়াছেন, অলঙ্কারে তাহার কি বাড়াইবে? সুন্দরী বিধবা। তিনি অনেকক্ষণ সমভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাঁহার বদনে ঘৃণা ও বিরক্তি-চিহ্ন ব্যক্ত হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে বোধ হয়, তাঁহার যাতনা অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,—

"ভালা মেয়ে যা হোক!"

যুবক-যুবতী চমকিয়া উঠিলেন। বিনোদিনী সলজ্জ ভাবে কহিলেন,—

"কেও—দিদি—তবু রক্ষা!"

দিদি কহিলেন,—

"বিনি! তোর কি একটুও লজ্জা নাই?"

বিনোদ মস্তকে কাপড় দিয়া যোগেন্দ্রের নিকট হইতে অনেক দূরে সরিয়া বসিলেন। যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"ঠাকুরঝি! তোমার সাক্ষাতে আবার লজ্জা কি?"

ঠাকুরঝি কমলিনী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বিনোদিনীকে কহিলেন,—

"বিনি! মা তোকে সেই অবধি ডাক্‌ছেন। ঝিরা কোথাও তোর দেখা পেলে না। মাষ্টার মহাশয় দুবার তোর খোঁজ করেছেন।"

বিনোদিনী বিনা বাক্য-ব্যয়ে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুরাশা।

"Me Miserable!——"
Paradise Lost.

বিনোদিনী প্রস্থান করিলে কমলিনী সেই শ্বেত-প্রস্তর বিনির্ম্মিত সরসীসোপানে রাজ-রাজ-মোহিনীরূপে উপবেশন করিলেন। শুভ্র চন্দ্র-রশ্মি, ক্রীড়াশীল বসন্ত বায়ু, প্রস্ফুটিত কুসুমাবলী, প্রশান্ত সরসী-বারি, শোভাময়ী প্রকৃতি, কমলিনীর আগমনে যেন সকলই সমধিক সমুজ্জ্বল হইল। সেই শোভাই শোভা, যাহা নিজগুণে পরের শোভা সংবর্দ্ধন করিতে সমর্থ; সেই শ্রীই শ্রী, যাহা অচেষ্টিত ভাবে সন্নিহিত পদার্থের শ্রী-সম্বিধান করে; সেই সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য, যাহা আপনি না মাতিয়া পরকে মাতাইতে সক্ষম। কমলিনী সেই স্থানে চিন্তিত, ব্যথিত ও কথঞ্চিৎ ক্রুদ্ধভাবে উপবেশন করিলেন। তাঁহার হৃদয়ের ভাব যাহাই হউক, প্রকৃতি তাঁহার আগমনে প্রফুল্ল হইল।

যোগেন্দ্র যেখানে বসিয়াছিলেন সেই স্থানেই রহিলেন, কমলিনী কয়েক স্তর ঊর্দ্ধ সোপানে উপবেশন করিলেন। তিনি যেন যোগেন্দ্রকে কি বলিবেন মনে করিতে লাগিলেন; কিন্তু কি জানি কেন, পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়-গগনে, কি তাড়িত-প্রবাহ ছুটিতেছিল কে বলিতে পারে? কে জানে বিধবা কি ভাবিতেছিলেন!

যোগেন্দ্র বহুক্ষণ অন্য দিকে মুখ করিয়া অন্য মনে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে সুন্দরীর মুখের সে পরুষভাব তিরোহিত হইল। যোগেন্দ্র উঠিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"কমল! তুমি কি এখানে বসিবে?"

কমল কোন উত্তর না দিয়া যোগেন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিলেন। দেখিলেন, কৈ যোগেন্দ্রের মুখে তাঁহার মত ভাবনার চিহ্ন নাই ত! অবনত মস্তকে কহিলেন,—

"না, বইস—এক সঙ্গে যাইব।"

যোগেন্দ্র বসিলেন,—জিজ্ঞাসিলেন,—

"কমল, কি ভাবিতেছ?"

কমল যেন কি বলিতে গেলেন; আবার সাবধান হইয়া বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন,—

"না"—

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"তুমি বল বা নাই বল, আমি বেশ বুঝিতে পারি, ইদানীং কিছু কাল হইতে তুমি কি ভাবিয়া থাক। তুমি বালবিধবা। আমাদের সমাজে বিধবার ন্যায় ক্লেশ আর কাহার? এই ভাবিয়া দুই বৎসর পূর্ব্বে তোমার বিবাহের জন্য আমি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলাম। তুমি তখন সর্ব্বদা হাসিতে—আনন্দ তোমার সর্ব্বাঙ্গে মাখা থাকিত। তুমি কোন ক্রমেই বিবাহে সম্মত হইলে না। আমিও ভাবিলাম, বিধবার বিবাহের প্রধান প্রয়োজন, তাহার ক্লেশ নিবারণ; যাহার ক্লেশ নাই, তাহার বিবাহ না হইলেও চলে। কিন্তু এবার বাটী আসিয়া অবধি দেখিতেছি, তোমার মনের শান্তি, তোমার আনন্দ, আর তেমন

নাই। কিন্তু কমলিনি! তোমার ক্লেশের কথা শুনিতে আমার কি কোন অধিকার নাই?”

কমলিনী নীরব। একবার যোগেন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিলেন, আবার মস্তক বিনত করিলেন। যোগেন্দ্র দেখিতে পাইলেন না — কমলিনীর চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রু সমাবিষ্ট হইল। যোগেন্দ্র আবার বলিলেন,—

কিন্তু “আমার বোধ হয়, তোমার ক্লেশ সামান্য না হইবে। যাহাই হউক, কমলিনী! আমার দ্বারা তোমার ক্লেশ কি কোন ক্রমেই বিদূরিত হয় না?”

কমলিনী ধীরে ধীরে বলিলেন,—

“হয়; তুমি—”

কথার শেষ ভাগ যোগেন্দ্র শুনিতে পাইলেন না। তিনি কহিলেন,—

“তবে বল কমল, আমাকে তোমার মনোবেদনা জানিতে দেও।” কমলিনী বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া রোদনবিজড়িত স্বরে বলিলেন,- “আমি কেন মরিলাম না?”

যোগেন্দ্র বুঝিলেন, কমলিনী রোদন করিতেছেন। নিকটস্থ হইয়া কাতরভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—

“কমল, তুমি কাঁদিতেছ কেন?”

কমল মুখ তুলিলেন। দেখিলেন, যোগেন্দ্রের বদনে যথার্থ সহানুভূতির চিহ্ন প্রকটিত। চক্ষের জল বন্ধ হইল। কি বলিবেন মনে করিলেন, কিন্তু বলিতে পারিলেন না; আবার মস্তক বিনত করিলেন। যোগেন্দ্র পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—

“বল কমল, কি করিলে তোমার এ যাতনার অবসান হয়?”

সহসা কমলিনী পাগলিনীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঘোর মর্ম্ম-বিদারক স্বরে কহিলেন,—

“হায়! এ পাপ দুরাশা কেন হইল?”

যোগেন্দ্র সবিস্ময়ে সুন্দরীর বদনের প্রতি চাহিলেন, কথা শেষ হইবামাত্র কমলিনী বেগে ভবনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। যোগেন্দ্র বহুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস সহ বলিলেন,—

“কমল কি পাগল হইল?”

তিনি ঘোর চিন্তিতের ন্যায় সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন।

উপস্থিত উপাখ্যান মধ্যে আর অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে, তৎসংক্রান্ত প্রধান ব্যক্তিগণের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা বিধেয়। আমরা এক্ষণে তাহাতেই প্রবৃত্ত হইতেছি।

বীরগ্রামে রামনারায়ণ রায় নামক একজন অতুল সম্পত্তিশালী লোক বাস করিতেন। তাঁহার দুই কন্যা; কমলিনী ও বিনোদিনী। কমলিনী যখন অষ্টম বর্ষ বয়স্কা তখন কলিকাতার রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় নামক এক সমৃদ্ধিশালী সচ্চরিত্র যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের বৎসরদ্বয় পরে রাধাগোবিন্দ কাল-কবলিত হন। দশম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে শরদেন্দুনিভাননা কমলিনী দারুণ বৈধব্য-চক্রে নিবদ্ধা হইলেন। রাধাগোবিন্দের যথেষ্ট স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি ছিল। তাঁহার জীবনান্ত সহ, কমলিনী তৎসমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন। কিন্তু কমলিনী ধনবান্ তনয়া; সুতরাং তিনি তাঁহার স্বামীর অর্জ্জিত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলেও, তাহা গ্রহণ ও অধিকার করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। কমলিনীর পিতা রামনারায়ণ রায়ও সে সম্বন্ধে মনোযোগী ছিলেন না। রাধাগোবিন্দের জীবন-বিয়োগ কালে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ রাধাসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের একটি এক বৎসর বয়স্ক পুত্র ছিল। সেই পুত্র এবং তাহার সম্ভাবিত ভ্রাতৃগণ এই সম্পত্তির

উত্তরাধিকারী হইবে, ইহাই সকলের অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু কাহারও মুখ হইতে সে অভিপ্রায় স্ফূর্ত্তি পায় নাই। এই সকল কারণে বিধবা হইয়াও রাধাগোবিন্দের স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণের সহিত কমলিনীর যথেষ্ট আত্মীয়তা ছিল। কমলিনীর মাতা, আপনার সন্তানেরা সম্পত্তি পাইতে পারে এমন আশা করিতেন। সেই কারণেই হউক, বা অন্য যে কারণেই হউক, তিনি মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত যত্ন করিয়া কমলিনীকে আনিয়া কলিকাতায় রাখিতেন এবং কখন কখন তাঁহার পুত্র নীলরতনকে কমলিনীর নিকট থাকিবার নিমিত্ত বীরগ্রামে পাঠাইয়া দিতেন।

কমলিনীর বিবাহের সমসময়েই রামনারায়ণ রায়, বিনোদিনীর সহিত বিবাহ দিবার নিমিত্ত, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক পিতৃ-মাতৃ-হীন, নিরাশ্রয় কুলীন সন্তানকে নিজগৃহে রাখিয়া প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করেন। বিনোদিনী তখন পাঁচ বছরের এবং যোগেন্দ্র বারো বছরের। উভয়ে এক স্থানে অবস্থান করায় ও একত্র প্রতিপালিত হওয়ায়, পরিণামে এই বিবাহ বড় সুখের হইয়া উঠিল। বিনোদিনীর বয়স যখন আট বৎসর, তখন যোগেন্দ্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। যোগেন্দ্র বৃদ্ধ রামনারায়ণ রায় ও তাঁহার গৃহিণীর পুত্রাধিক যত্নের সামাগ্রী হইলেন, কমলিনীর পরম সুহৃৎ হইলেন এবং বিনোদিনীর হৃদয়ের সখা, মনের আনন্দ এবং হাসির ভাণ্ডার হইলেন। যোগেন্দ্র বিদ্যাও যথেষ্ট অর্জ্জন করিলেন; কিন্তু তাঁহার অদম্য জ্ঞান-তৃষ্ণা কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নহে। ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষালাভ করিয়া তিনি পরহিত-সাধনোদ্দেশে ও চিকিৎসা বিদ্যায় জ্ঞান-লাভ করিয়া অতুল আনন্দ সম্ভোগ বাসনায়, কলিকাতার মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। যোগেন্দ্র মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, রামনারায়ণ রায় মানবলীলা সংবরণ করেন। হরগোবিন্দ বাবু নামক একজন সচ্চরিত্র, সুশিক্ষিত ব্যক্তি রামনারায়ণের সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি এই সংসারে চির প্রতিপালিত, যথেষ্ট বিশ্বাসভাজন ও পরিবার-ভুক্ত ছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ, কমলিনী ও বিনোদিনীর কোন নূতন পুস্তক পাঠ-কালে, কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইলে, হরগোবিন্দ বাবুর নিকট হইতে সে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতে হইত। জমিদারী নির্ব্বাহ করা যদিও হরগোবিন্দের কার্য্য, তথাপি তাঁহার মাষ্টার মহাশয় এই উপাধিটাই প্রচার ছিল। আমাদের এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকায় এই কয় নর-নারীই প্রধান পাত্র। এতদ্ভিন্ন আর যে দুই এক জন এই গ্রন্থ-কলেবরে অভিনয়ার্থ উপস্থিত হইবেন, তাঁহাদের বিবরণ তত্তৎস্থানেই সন্নিবিষ্ট হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

---*---

ফাঁদ।

"I under fair pretence of Ifriendly ends
With well plac'd words, of glowing courtesy.
Baited with reasons not unplausible.
Wind me into the easy-hearted man
And hug him into snares"

——Comus.

যে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি তাহার তলে কি রত্ন আছে অবশ্যই দেখিব; যে লোভ হৃদয়ে

পোষণ করিয়াছি তাহার সফলতা করিবই করিব; যে আশা-লতা এত দিনের যত্নে লালিত হইয়াছে তাহার ফল-ভোগ করিবই করিব। এ দুর্দ্দমনীয় আশা ত্যাগ করা যায় না তো! এ লোভ ত্যাগ করিতে পারিব না; ইহা এ জীবনে ত্যাগ করিব না। লোকে নিন্দা করিবে—করুক; সকলে ঘৃণা করিবে—করুক; পরকালে নরক-বাস হইবে—হউক; বিনোদিনীকে অসুখের সাগরে ভাসান হইবে—কি করিব? বিনোদ আমার সুখের পথে কণ্টক—বিনোদ আমার বাসনার অন্তরায়—সে আমার পরম শত্রু। তাহার যাহাই হউক না কেন আমি মনের সাধ মিটাইব।

বেলা দ্বিপ্রহর কালে, একান্তে, একটি প্রকোষ্ঠ মধ্যে বসিয়া, কমলিনী উক্তরূপ আলোচনা করিতেছেন। এমন সময় হাসিতে হাসিতে, হেলিতে দুলিতে, মাধী নাম্নী ঝি সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। মাধীর বয়স যেন যৌবনের শেষ সীমা ছাড়াইয়াছে বোধ হয়, কিন্তু মনের উত্তাল বেগ কিছুই কমে নাই। মাধীর বয়স যতই হউক, তাহাকে দেখিলে সময়ে সময়ে যুবতী বলিয়া ভ্রম হয়। তাহার পরিষ্কার লাল-পেড়ে সাটী, হাতের বালা ও লাল বেলোয়ারি চুড়ি দেখিয়া কে বলিবে মাধীর যৌবন নাই? তাহার বাহুর স্বর্ণময় তাগা, কপালের ক্ষুদ্র টিপ্, অধরোষ্ঠের সহাস্য ভাব ও পানের রং, মার্জ্জিত চুলের মোহিনী কবরী এবং সর্ব্বোপরি তাহার বিলাসময়ী গতি—তুমি মাধীকে যুবতী নয় বলিয়া সন্দেহ করিলে, তোমার সহিত দারুণ বিবাদ করিবে এবং সম্ভবতঃ তোমাকে পরাজয় স্বীকার করাইয়া ছাড়িবে। হিংসা-পরবশ প্রতিবেশিগণ মাধীর চরিত্র সম্বন্ধে নানা কথা কহে, কিন্তু মাধী নানাবিধ কারণ দর্শাইয়া বলে, লোকেরা সব মিথ্যাবাদী। ফলতঃ কলহ-দ্বন্দ্বে মাধী যেরূপ নিপুণা, তাহাতে তাহার অপ্রীতিকর কোন কথাই না বলা ভাল।

মাধীর বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। যেখানে ছুই না চলে মাধী সেখানে বেটে চালাইতে পারে বলিয়া খ্যাতি আছে। মাধী বীরগ্রামের রায়দের বাড়ীর ঝি। সাধারণ ঝি সকলের শ্রেণীতে মাধীর স্থান নহে। তাহাকে অত্যন্ত কর্ম্মিষ্ঠা, বিশ্বাসিনী ও চতুরা বলিয়া বাটীর সকলেই সমাদর করে। মাধীর সহিত বিনোদিনীর বিশেষ সৌহৃদ্য, কারণ তাঁহার নিত্য এক খান, দুই খান করিয়া কলিকাতায় যোগেন্দ্র বাবুর নিকট যে চিঠি লিখিতে হয়, মাধী তাহা চিরকাল সুনিয়মে ডাকঘরে পৌঁছাইয়া দেয় এবং কলিকাতা হইতে তাঁহার যে সমস্ত চিঠি আইসে, মাধী তাহা গ্রাম্য ডাকবাবুর নিকট হইতে যথাকালে আনিয়া হাজির করে। সাদামাটা ঝিরা এ কার্য্য এমন করিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে না। কমলিনীর সহিত মাধীর আজি কালি বিশেষ ভাব দেখা যাইতেছে; কেন যে এরূপ ঘটিয়াছে, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। মাধীকে আসিতে দেখিয়া কমলিনী জিজ্ঞাসিলেন,—

"হাসি যে?"

"আবার চিঠি আসিয়াছে।"

"বিনীর হাতে?

"মাধী থাকিতে?

"কই?"

মাধী বস্ত্র মধ্য হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া দিল। পত্রখানি বিনোদিনীর নামে লিখিত। কমলিনী ব্যস্ততাসহ পত্র খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন,—

"প্রিয়তমে!

"তোমার কি হইয়াছে, কিছুই বুঝিতে

পারিতেছি না। "এখানে আসিয়া অবধি তোমাকে ছয় খানি পত্র লিখিয়াছি, "কিন্তু কোনই উত্তর পাই নাই। তোমার চিন্তায় আমার পড়া শুনা বন্ধ হইয়াছে। এই পত্রের উত্তরার্থে দুই দিন অপেক্ষা করিব, এই সময় মধ্যে সংবাদ না পাইলে আমার সমস্ত কর্ম্ম ফেলিয়া তোমার নিকট যাইতে হইবে। চিন্তায় আমি মৃতপ্রায় হইয়াছি; যদি আমাকে বাঁচাইতে বাসনা থাকে, ত্বরায় সংবাদ দিবে।—ইতি তাং—সন ১২—সাল।

কলিকাতা, তোমারই
২২ নং শান্তসিংহের লেন। "যোগেন্দ্র"।

মাধী পত্র শুনিয়া বলিল,—

"ভালই হইয়াছে, আমিও ঐরূপ চাই।"

কমলিনী বলিলেন,—

"আসিলে কি করবি?"

"আসিলে এমন কল পাতিব যে ওদের মুখ দেখাদেখি থাকিবে না।"

কমলিনী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন,—

"তাহাতে আমার কি উপকার?"

"কলসীতে জল বোঝাই থাকিলে আর জল ধরে না, তা জান? সে জল ফেলিয়া দিলে তবে তাহাতে অন্য জলের স্থান হইবে। বড় দিদি! যাহাতে ওদের ইএ ভালবাসা একবারে ভাসিয়া যায়, সেই মতলবে এখন সব কাজ করিতে হইবে। এমন অগাধ ভালবাসা থাকিতে কিছুই হবে না। আগে এ গুড়ে বালি দিয়ে তার পর অন্য চেষ্টা।"

"আমার এ রাজকার্য্যে তুমিই মন্ত্রী। দেখো ভাই, যেন মন্ত্রণার দোষে সব না যায়।"

"সে ভাবনা আমার।"

"পত্র খানি কি করিব?"

"সে ছয় খানিরও যে দশা, এ খানিরও স দশা—আমাকে দাও।'

কমলিনী মাধীর হস্তে পত্র দিলেন। মাধী পত্র লইয়া বলিল,—

"একবার দেখে আসি, ছোট দিদি কি কচ্চেন।"

"চুপ চুপ্। বিনী বুঝি ঐ আসচে।"

অতি ধীরে ধীরে, নিতান্ত বিষণ্ণবদনে বিনোদিনী তথায় আগমন করিলেন। তাহাকে দেখিয়া কমলিনী জিজ্ঞাসিলেন,—

"বিনোদ! তোকে এত ম্লান দেখাচ্চে কেন?"

বিনোদিনীর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, তিনি এ প্রশ্নের কোনই উত্তর দিতে পারিলেন না। কমলিনী পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—

"যোগীনের সংবাদ পেয়েছিস্ তো?"

বিনোদিনী 'না' বলিয়া বালিবার ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। কমলিনী বলিলেন,—

"এর জন্য এত চিন্তা কেন? বোধ হয় কোন কার্য্যের গতিকে যোগেন্দ্র সংবাদ দিতে পারেন নাই। না হয় দশ দিন পরেই সংবাদ পাওয়া যাবে।"

বিনোদিনী মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—

"প্রতিদিন এক খানা, কখন বা দুই খানা পত্র পাই; এবার তাঁহার কি হইল?"

কমলিনী বলিলেন,—

"বোধ হয় পরীক্ষার গোলে পত্র লেখা হয় নাই।"

বিনোদিনী নয়ন পরিষ্কার করিয়া কহিলেন,—

"হাজার গোলেও এমন হইবার কথা নয়তো দিদি!"

মাধী ঈষৎ হাস্য করিয়া পরিহাস-স্বরে কহিল,—

"ছোট দদি, তুমি এখনও ছেলে মানুষ।

আর একটু বয়স হইলে বুঝিতে পারিবে, পুরুষ মানুষকে অত বিশ্বাস করা ভাল নয়।”

বিনোদিনী সবিস্ময়ে কহিলেন,—

“সে কি কথা?”

মাধী সেইরূপ স্বরে বলিল,—

“সে কলিকাতা সহর; সেখানে তোমার মতন বিনোদিনীর ছড়াছড়ি আছে দিদি! জামাই বাবু নূতন বিনোদিনী পেয়েছেন হয়তো।”

বিনোদিনী ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন,—

“ছিঃ তাও কি হয়? তাঁহার চরিত্রে এরূপ দোষ হওয়া অসম্ভব।”

মাধী হাসিতে হাসিতে বলিল,—

“সম্ভব কি অসম্ভব তা ও বয়সে বুঝা যায় না। তুমি যাহাই ভাব, আমি দেখছি জামাই-বাবু শিকলি কেটেছেন।”

কমলিনী কপট ক্রোধ সহ বলিলেন,—

“তোর এক কথা!”

“কেন, কি অন্যায়?”

“না—হ’লে ও দোষ পুরুষে সহজেই হতে পারে বটে। তবে যোগেন্দ্রের যেমন স্বভাব তাহাতে ও সন্দেহ হয় না।”

“স্বভাব যেমনই হউক বড় দিদি, তিনি এবারে ছোট দিদিকে সঙ্গে না লওয়াতে সব সন্দেহ হয়।”

কমলিনী যেন অত্যন্ত চিন্তার সহিত বলিলেন,—

“তাইতো মাধি, যোগীন বিনীকে ছেড়ে এক দিনও থাকিতে পারে না, তা এবার সঙ্গে লইয়া গেল না,—আশ্চর্য্য!”

“তাতেই তো সন্দেহ হচ্চে দিদি ঠাকুরাণী—জামাই বাবুর স্বভাব মন্দ হয়েছে। ছোট দিদি সঙ্গে থাকিলে সুবিধা হয় না বলিয়া এবার রাখিয়া গিয়াছেন।”

“কে জানে ভাই, কাহার মনে কি আছে?”

সত্য হউক, মিথ্যা হউক, সম্ভব হউক, অসম্ভব হউক, কথা শুনিয়া বিনোদিনীর হৃদয় ফাটিয়া গেল। তিনি একটা কার্য্যের ছলনা করিয়া মন খুলিয়া ভাবিবার নিমিত্ত সে প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া গেলেন। বিনোদিনী চলিয়া গেলে মাধী ও কমলিনী খুব খানিকটা হাসিলেন।

মাধী বলিল,—

“এইরূপেই ঔষধ ধরে।”

কমলিনী বলিলেন,—

“যাই বল, বিনীর কষ্ট দেখিয়া আমার বড় যাতনা হয়।”

মাধী উদাস ভাবে বলিল,—

“তবে কাজ কি?”

কমলিনী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

“কাজ কি? আমি বিশেষ বুঝিতেছি, কাজ ভাল হইতেছে না; কে যেন বলিতেছে, ইহাতে সর্ব্বনাশ ঘটিবে। উঃ! তথাপি এ সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে পারিতেছি না তো! বিনোদিনীর যাহা হয় হউক, অদৃষ্টে যাহা থাকে হউক, আমি এ সঙ্কল্প কখন ত্যাগ করিব না! এ বাসনা আমাকে যেরূপে হউক মিটাইতে হইবে।”

সহসা বাটীর মধ্যে একটা গোল উঠিল। ব্যস্ততা সহ একজন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল,—

“ছোট দিদি ঠাকুরাণীর মূর্চ্ছা হইয়াছে।”

মাধী ও কমলিনী সেই দিকে দৌড়িলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—— * ——

স্ত্রীদেবতা।

"Peace brother, be not over exquisite
—To cast the fashion of uncertain evils!
For grant they be so, while they rest unknown,
What need a man forestall his date of grief,
And run to meet what he would most avoid?"
——Comus,

সন্ধ্যার সময়ে কলিকাতা রাজধানী চমৎকার শোভা ধারণ করিল। প্রশস্ত রাজ-পথ-সমূহে প্রদীপ্ত গ্যাসালোক প্রজ্বলিত হইল। মূল্যবান্ রমণীয় অশ্বযান-সমূহ বিলাসী আরোহী লইয়া সজোরে ছুটিতে লাগিল। দলে দলে মুটিয়ারা ইলিস মাছ লইয়া বাটী ফিরিতে লাগিল। সাহেবগণ বাঙ্গালি কেরাণীর পক্ষে বড় সদয় নহেন, নচেৎ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, এখনও চাপ-কান ঢাকা, কোঁচাওয়ালা, অদ্ভুত বেশধারী কেরাণীবাবুরা, কেহ বা একটা ওল, কেহ বা মাছ, কেহ রুমালে করিয়া আলু পটল লইয়া অবনত বদনে বাটী ফিরিতেছেন কেন? চীনাবাজারের দোকানদার চাবির গোছা হাতে করিয়া লাভালাভ চিন্তা করিতে করিতে বাটী ফিরিতেছেন। "চাই বরফ," "সরিফের নকলদানা," চ্যানাচুর্ গরমাগরম" প্রভৃতি নৈশ ফিরিওয়ালাগণ সহরের রাস্তায় মধুবর্ষণ করিতেছে। লোক ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ। কেহ ব্যস্ত ক্ষুধার জ্বালায়, কেহ ব্যস্ত কাজের খাতিরে, কেহ ব্যস্ত ফাকি দিবার জন্য, কেহ ব্যস্ত সভ্যতার দায়ে, আর ঐ যে চসমা চোখে বাবু ধীরে ধীরে গজেন্দ্রগমনে চলিতেছেন, উনি ব্যস্ত ভণ্ডামির অনুরোধে! এইরূপ ভাল মন্দ ব্যস্ততায় লোকগুলা ব্যতিব্যস্ত। ফলতঃ নির্লিপ্ত ভাবে, সন্ধ্যা-সময়ে কলিকাতার জন-প্রবাহ দেখিতে পারিলে, সাংসারিক অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়।

এরূপ সময়ে গোলদিঘির পার্শ্বস্থ পথে দুই ব্যক্তি পরিভ্রমণ করিতেছেন। দারুণ গ্রীষ্ম হেতু তাঁহাদের ললাট হইতে ঘর্ম্মবারি বিগলিত হইতেছে। যুবকদ্বয়ের একজন আমাদের পরিচিত—যোগেন্দ্র; অপর যোগে-ন্দ্রের সহাধ্যায়ী সুরেশ। অন্যান্য কথার পর যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"কি আশ্চর্য্য সুরেশ! আমি এখানে আসিয়া অবধি একে একে বিনোদিনীকে ছয় খানি পত্র লিখিয়াছি, কিন্তু তাহার এক খানিরও উত্তর পাইলাম না।"

সুরেশ নিশ্চিন্ত ভাবে বলিলেন,—"এর আর আশ্চর্য্য কি?"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"বল কি? যে আমাকে প্রতিদিন পত্র লিখিয়া থাকে, আমার পত্র না পাইলে যে অধীরা হইয়া উঠে, দুই সপ্তাহ মধ্যে তাহার কোনই সংবাদ নাই। ইহা অপেক্ষা ভয়ানক কাণ্ড আর কি হইতে পারে?"

সুরেশ হাসিয়া বলিলেন,—

"তিনি হয় ত তোমার পত্র পান নাই।"

"কোন পত্রই পান নাই ইহা অসম্ভব।"

"পাইয়াও হয় ত উত্তর দেন নাই।"

যোগেন্দ্র ঘৃণাসূচক হাসির সহিত বলি-লেন,—

"তুমি পাগলের মত কথা বলিতেছ। বিনোদিনী আমার পত্র পাইয়াও উত্তর দেন নাই, ইহার মত অসম্ভব আর কিছুই নাই।"

সুরেশ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"তুমি অতিশয় স্ত্রৈণ।"

যোগেন্দ্র গর্ব্বিত ভাবে বলিলেন,—

"তোমার অদৃষ্ট মন্দ; বিনোদিনীর ন্যায় স্ত্রীর স্বামী হইয়া স্ত্রৈণ অপবাদ কত সুখের, তাহা তুমি কি বুঝিবে?"

"ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, যেন আমার তাহা বুঝিতেও না হয়। তোমরা স্ত্রীদেবতার উপাসক—তোমরা ওকথা বলিতে পার, কিন্তু আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, সংসারে জঘন্যতার যদি কিছু আকর থাকে, তাহা স্ত্রীলোক।"

যোগেন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—

"সুরেশ, তোমার অধিকাংশ মতামত আমি অতি সারবান্ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি, কিন্তু স্ত্রী-চরিত্রে তোমার যে অযথা বিদ্বেষ, ইহাতে আমার একটুও সহানুভূতি নাই। তুমি যাই বল, বিনোদিনীর চিন্তায় আমার আহার নিদ্রা বন্ধ হইতেছে। সম্মুখে পরীক্ষা উপস্থিত, কিন্তু আমার পরীক্ষা দেওয়া হইতেছে না। আমি কল্যই বাটী যাইব।"

"যাও, গিয়া দেখিবে বিনোদিনী সুস্থ শরীরে হাসিয়া বেড়াইতেছেন।"

"ভাল—তাহাই হউক।"

সুরেশ আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন,—

"এই দুষ্ট স্ত্রীলোকগুলা—ইহারাই সকল অনর্থের মূল। ইহাদের এমনি আশ্চর্য্য মোহমন্ত্র যে, লোকে ইহাদের দোষ দেখিয়াও দেখিতে পায় না!"

যোগেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—

"সুরেশ, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, তোমারই মতিভ্রম হইয়াছে।"

"তা হউক; কিন্তু তুমি এই ভয়ানক জাতিকে চেন না। বিনোদিনীকে যখন জিজ্ঞাসা করিবে, বিনোদ, পত্র লেখ নাই কেন? বিনোদ উত্তর করিবেন, অমুকের ছেলের জন্য এক যোড়া মোজা তৈয়ার করিয়া দিতে বড় ব্যস্ত ছিলাম' অথবা বলিবেন, সূর্পণখা নাটক পড়িতে বড় ব্যস্ত ছিলাম, কিম্বা বলিবেন, "আমার মার সঙ্গে সুটোর পিসি কদিন ধরে যে ঝগড়া কল্লে, তাতে পাড়ায় কাণ পাতবার যো ছিল না" পত্র লিখি কি করে?" ভাই! ওঁরা না পারেন এমন কর্ম্মই নাই। ওঁদের উপর অত বিশ্বাস করো না।"

যোগেন্দ্র কিছু বিরক্তির সহিত বলিলেন,—

"ছিঃ সুরেশ!"

সু। "আচ্ছা; এখন আমার ডিউটি পড়িবে, আমি চলিলাম, তোমার সঙ্গে এ সম্বন্ধে সময়ান্তরে আবার তর্ক করিব। তুমি কালি বাটী যাইবে, সত্য না কি?"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"বোধ হয়—বোধ হয় কেন—নিশ্চয়ই যাইব।"

"তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা কর। তবে এই মাত্র বলিতেছি যে, কেন অকারণ অধীর হইয়া একটা বৎসর বৃথা নষ্ট করিবে?"

এই বলিয়া সুরেশ প্রস্থান করিলেন। যোগেন্দ্র একাকী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দারুণ চিন্তা হেতু সুশীতল সমীর সেবন করিয়াও চিত্তের শান্তি হইল না। তিনি মনে মনে বলিলেন—"সুরেশ যেরূপ বলিলেন, বিনোদ কি সেইরূপ? ছি! বিনোদ চিঠি লিখেন না কেন?—বিনোদের অসুখ হইয়াছে—তাহাই ঠিক।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যোগেন্দ্র বাসায় ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন। তিনি অত্যাবর্ত্তন কালে দেখিলেন,

একটা বৃদ্ধা অতিশয় কাতর ভাবে রোদন ক' করিতে পথ দিয়া যাইতেছে। বৃদ্ধার ' ' ও কাতরতা দেখিয়া সদয় স্বভাব যোগেন্দ্রের হৃদয় বিগলিত হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"বাছা কাঁদিতেছ কেন?"

বৃদ্ধা এই প্রশ্নে আরও কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বিকৃত স্বরে বলিল,—

"আমার পোড়া কপাল পুড়েছে গো বাবু"

আবার উচ্চ ক্রন্দন।—ক্রমে চারি দি ক লোক জমিয়া গেল। বৃদ্ধা আবার বলিল,—

"একে একে যম আমার সব খেয়েছে. আমার এক ঘর ছেলে মেয়ে ছিল, আমি অভাগী তাদের সব যমের মুখে দিয়ে অমর হয়ে বসে আছি।"

বৃদ্ধার কাতরতা ও তাহার মলিন বেশ দেখিয়া যোগেন্দ্রের চক্ষু জলভরাক্রান্ত হইল বৃদ্ধা আবার বলিল,—

"একটি নাতি ছিল তাও পোড়া যমের স ' না গো বাবা।"

এই বলিয়া বৃদ্ধা তথায় আছড়াইয়া পড়িল। ক্রমে জনতার বৃদ্ধি হইল। স জনতা—তামাসা দেখিতে। কলিকাতা অর্থে জন্য, অর্জ্জনের জন্য, প্রতারণার জন্য, ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য; ইহা স্বার্থপরতা শিক্ষার স্থান, কুনীতির আকর এবং স্বর্গীয় মনোবৃত্তি সক' বধ্যভূমি। সুতরাং বৃদ্ধার পার্শ্ব বেষ্টন ক' ' যে নিষ্কর্ম্মা মানব-সমূহ দণ্ডায়মান হই' তাহারা এই ব্যাপারকে স্বতন্ত্র নয়নে দে' লাগিল। এক জন দর্শক বলিল,—"চল কাজে যাই, কার দুঃখ কে দেখে?" অপর জন বলিল,—"হয় ত জুয়াচুরি।" তৃতীয় ব্যক্তি বলিল,—"ভিক্ষার এই উপায়।" এ' জন নবাগত দর্শক কৌতূহল সহ নিকটস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসিল,—"ব্যাপারটা কি ভাই?" ' স ব্যক্তি সংক্ষেপে সমস্ত কথা বলিল। শুনিয়া জিজ্ঞাসাকারী বলিল,—"ওঃ এই কথা—তবু রক্ষা!" যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তোমার নাতির কি হইয়াছে বাছা?"

ব্যারাম—এতক্ষণ—ওরে আমার কি হবে রে বাবা!"

"তুমি কোথায় থাক?"

"বাগ্‌বাজার।"

"এখানে কেন আসিয়াছিলে?"

বৃদ্ধা বলিল,—

"শুনেছি এই ডাক্তারখানায় অমনি ওষুধ দেয়, তাই মরে গরে এতদূর এসেছি। তা বাবা, কেহ এ দুখিনীর কথা শুনিল না। আহা! এক ফোটা ওষুধও বাছার পেটে পড়িল না।"

বৃদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। যোগেন্দ্র বুঝিলেন, রোগী সঙ্গে নাই—ঔষধ দিবে কেন? পথ দিয়া এক খানি খালি গাড়ি যাইতেছিল, যোগেন্দ্র তাহার চালককে গাড়ি থামাইতে বলিলেন। গাড়ি থামিল। যোগেন্দ্র বৃদ্ধাকে বলিলেন,—

"এই গাড়িতে উঠ, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি। আমি ডাক্তারি জানি—তোমার কোন ভাবনা নাই।"

বৃদ্ধা দাঁড়াইয়া বলিল,—

"বাবা তুমি রাজ্যেশ্বর হও; কিন্তু বাবা গাড়িভাড়ার পয়সা ত আমার নাই।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন,—

"সে জন্য কোন চিন্তা নাই। ঔষধ বা গাড়িভাড়ার কিছুরই জন্য তোমার ভাবিতে হইবে না।"

বৃদ্ধা হাতে স্বর্গ পাইল। অনবরত আশীর্বাদ করিতে করিতে গাড়িতে উঠিল। যোগেন্দ্রও সেই গাড়িতে উঠিয়া বাগ্‌বাজারে চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—•—

শরীর ও মন।

"But O as to embrace me she inclin'd,
I wak'd. She fled, and day brought back
ms night."
——Milton—on his deceased
Wife.

পর দিন বেলা দ্বিপ্রহর কালে যোগেন্দ্র বাসায় ফিরিলেন। বিনোদিনীর জন্ত উৎকণ্ঠায় তিনি যৎপরোনাস্তি কাতর ছিলেন, আবার এই বৃদ্ধার বাটিতে সমস্ত রাত্রি অনাহার ও জাগরণ এবং অগ্ন দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত স্নানাহার বন্ধ করিয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করায়, যোগেন্দ্রের শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া আসিল। রোগী তাহার অপরিমেয় যত্নে নির্ব্বিঘ্ন হইল। তাহার পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া ও তন্নির্ব্বাহার্থ বৃদ্ধার নিকট কিছু অর্থ দিয়া, যোগেন্দ্রনাথ গাড়িতে উঠিলেন। গাড়ি বাসার দ্বারে লাগিল; গাড়ি হইতে নামিয়া বাসায় যাওয়া যোগেন্দ্রের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন যে, অগ্নই তাঁহার কোন কঠিন পীড়া জন্মিবে। অতি কষ্টে উপরে উঠিয়া, যেমন ছিলেন সেইরূপ অবস্থায় তিনি শয্যায় পড়িলেন। কতক্ষণ তিনি এরূপে থাকিলেন তাহা তিনি জানিলেন না। বাসায় একজন ভৃত্য ও একজন পাচক ব্যতীত আর কেহ ছিল না। তাহারা আসিয়া সময়ে সময়ে যোগেন্দ্র বাবুর সংবাদ লইতে লাগিল। বুঝিল, বাবু বড় ঘুমাইতেছেন—এখন ডাকিলে হয় ত রাগ করিবেন। অতএব আর অপেক্ষা করা অনাবশ্যক ভাবিয়া, তাহারা আহারাদি সমাপন করিল।

বেলা চারিটার সময় যোগেন্দ্রের চেতনা হইল। তিনি বুঝিলেন, জ্বর হইয়াছে। মনে করিলেন, মানসিক উদ্বেগ ও শারীরিক শ্রমই এই জ্বরের কারণ। আবার যোগেন্দ্রনাথ নিদ্রাভিভূত হইলেন। তাঁহার ভৃত্য আসিয়াও বুঝিল, বাবুর জ্বর হইয়াছে। সে গিয়া ঠাকুর মহাশয়কে সংবাদ জানাইল। ঠাকুর মহাশয়ের মনে বিশ্বাস ছিল যে, নাড়ী পরীক্ষা করিতে তিনি অদ্বিতীয়। সে সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান যেমনই হউক, ইহা আমরা বেশ জানি যে, তিনি তরকারিতে কখনই ঠিক লবণ দিতে পারিতেন না। ঠাকুর মহাশয় যোগেন্দ্রের হাত দেখিয়া ভৃত্য সাধুচরণকে আসিয়া বলিলেন,—

"বাবুর নাড়ী কুপিত বটে, বায়ুর কোপই অধিক। অগ্ন লঙ্ঘন ব্যবস্থা। কল্য অন্ত ব্যবস্থা করা যাইবে।

ভৃত্য বলিল,—

"আমি বাবুকে ব্যারামের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কথা কহিলেন না—বোধ হয় কিছুই নয়।"

ঠাকুর মহাশয় বলিলেন,—

"তা বই কি? তুমি রাত্রের আহারের যোগাড় কর।"

যোগেন্দ্র বাবুর নিয়োজিত ব্যক্তিদ্বয় তাঁহার ব্যাধ সম্বন্ধে এইরূপ মীমাংসা করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। যোগেন্দ্রনাথ সেই গৃহে একাকী রহিলেন। নিদ্রিতাবস্থায় বহুবিধ স্বপ্ন ও বিভীষিকা তাঁহাকে নিরন্তর অবসন্ন করিতে লাগিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে যোগেন্দ্রনাথের নিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং তিনি বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্নসকলের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। জ্বর

কমে নাই। জ্বর বড় তেজের নয় বটে, কিন্তু যোগেন্দ্র বুঝিলেন, এই কয় ঘণ্টার জ্বরে তাঁহাকে মুমূর্ষু রোগীর ন্যায় দুর্ব্বল ও ক্ষীণ করিয়াছে। মাথা ঘুরিতেছে, পৃথিবী ঘুরিতেছে, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারময়, চিন্তার শ্রেণী নাই, সম্মুখে যেন ভয়ানক বিপদ। তিনি বুঝিলেন, জ্বরটা সহজ নয়। ডাকিলেন,—

"সাধুচরণ!"

তাঁহার ক্ষীণস্বর নিম্নতলস্থ সাধুচরণের কর্ণে প্রবেশ করিল না। ক্ষণেক পরে আবার ডাকিলেন—কোনই উত্তর নাই। তৃতীয় বারে সাধুচরণ চক্ষু মর্দ্দন করিতে করিতে আসিয়া বলিল,—

"আমাকে ডাকিতেছেন?"

কি জন্য যোগেন্দ্র সাধুচরণকে ডাকিতেছিলেন তাহা আর মনে হইল না। তিনি নীরবে রহিলেন। সাধুচরণ আবার জিজ্ঞাসিলেন,—

"আমাকে কি বলিতেছিলেন?"

যোগেন্দ্র চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। বলিলেন,—

"ওঃ—তুমি একবার বিনোদিনীকে ডাক। তিনি কোথায়।"

বিনোদিনী কে তাহা সাধুচরণ জানে না। ভাবিল—"একি—বাবুর উপর উপরকার দৃষ্টি পড়িয়াছে নাকি?" সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—

"আমাকে কি বলিলেন, বুঝিতে পারিলাম না।"

যোগেন্দ্র আবার চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। বলিলেন,—

"আঃ—সুরেশ বাবু—"

সাধু এবারও বিশেষ কিছু বুঝিল না। কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করিল না।

সে মন্ত্রিবর ঠাকুর মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিতে গেল। কিন্তু ঠাকুর মহাশয় তখন যেরূপ নিবিষ্ট মনে নাক ডাকাইতেছেন, তাহাতে তাহার সহিত কোনই পরামর্শ হওয়া সম্ভাবিত নহে; তাহা হইলও না। প্রাতে ঠাকুর মহাশয় নাসিকাধ্বনির ডিউটী হইতে নিস্কৃতি লাভ করিলে সাধুচরণ তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ জানাইল। তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—

"হয়েছে—বাবুর রীত বিগ্‌ড়েছে।"

"কিসে বুঝ্‌লে ঠাকুর মহাশয়? বাবু তো সে রকম মানুষ নয়।"

ঠাকুর মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,

"দূর পাগল—মানুষ কে কি রকম তা কি কেউ বল্‌তে পারে? দেখছিস্ না ইদানীং বাবুর আর কিছুতেই মন নাই। কোনখানে কিছু নাই, পরশু বিকাল থেকে দিন রাত কাটাইয়া কা'ল দুপুর বেলা বাসায় ফিরে এলেন। এ সকল কুরীত। জ্বরে আবোল তাবোল বকিতে বকিতেও মেয়ে মানসের নাম করছেন। নিশ্চয় বাবুর রীত বিগ্‌ড়েছে। আমি এমন ঢের দেখেছি।"

সাধুচরণ চক্ষু বিস্তৃত করিয়া কহিল,—

"উপায়?

"তোমার মাথা, আর আমার মুণ্ড।"

এই দুইজন মনীষী বসিয়া যখন এবংবিধ পরামর্শ করিতেছেন, সেই সময় সুরেশ বাবু তথায় আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"বাবু বাড়ী গিয়াছেন?"

সাধুচরণ উত্তর দিল,—

"আজ্ঞে না, তাঁহার জ্বর হইয়াছে।"

"জ্বর হইয়াছে?"

"আজ্ঞে।"

আর কিছু না বলিয়া সুরেশ রোগীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া সুরেশ মাথায় হাত দিয়া বসি-

লেন। যোগেন্দ্রের জ্বর সহজ নয়। যোগেন্দ্র ধীরে ধীরে ক্লিষ্টস্বরে বলিলেন,—

'সুরেশ! দেখিলে কি ভাই? জ্বরতো সহজ নয়। বোধ হয়, আর এ জীবনে, বিনোদিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। আমি কালি সমস্ত রাত্রি স্বপ্ন দেখিয়াছি, বিনোদিনী আকাশের মধ্যে নক্ষত্র সম্বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, আমি নীচে বসিয়া তাঁহাকে উচ্চ শব্দে ডাকিতেছি। বলিতেছি 'বিনোদ! আমাকে ফেলিয়া কোথায় গেলে?' বহুক্ষণ পরে আমার প্রতি বিনোদিনীর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি পড়িল। তিনি বলিলেন,—'আগে কেন বল নাই, আগে কেন বুঝ নাই। তোমাকে দেখাইবার জন্তই তো এতদূর আসিয়াছি। কিন্তু আর তো এখান হইতে ফিরিবার উপায় নাই। যোগেন্দ্র! তোমার সহিত আর ইহ-জন্মে সাক্ষাতের আশা নাই।' আমি পাগলের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলাম। বিনোদ আবার বলিলেন,—'কাঁদিলে কি হইবে? পার যদি এখানে আইস।" আমি পারিলাম না। বিনোদ আবার বলিলেন—'ছিঃ যোগিন্! দাঁড়াও তুমি—আমি তোমার কাছে একবার দুটি কথা বলিতে যাইতেছি। বিনোদ আসিলেন। আমি বাহু প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে ধরিতে গেলে তিনি হাসিয়া বলিলেন—'যোগিন্! আমাকে ধরা এক্ষণে তোমার অসাধ্য।' আমি তাঁহাকে ধরিতে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম তিনিও ততই পশ্চাতে চলিতে লাগিলেন। অবশেষে এক দুস্তর সমুদ্র বিনোদের পশ্চাতে পড়িল আমি ভাবিলাম বিনোদ আর কোথায় পালাইবেন। কিন্তু বিনোদ হাসিতে হাসিতে সেই জলরাশির উপর দিয়া চলিয়া গেলেন, আমি অভাগা পারিলাম না। তীরে বসিয়া মিনতি করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। বিনোদ মধ্যসমুদ্র হইতে হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিলেন—'ফিরিয়া যাও আর চেষ্টা করিও না।' অবশেষে বিনোদ সমুদ্রের অপর পারে পৌছিলেন। তখনও তাঁহার মূর্ত্তি অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাইতে লাগিল। তিনি সেখানেও স্থির হইলেন না। অনবরত চলিতে লাগিলেন এবং হস্তান্দোলনে আমাকে ফিরিতে বলিতে থাকিলেন। তার পর ক্রমে তিনি এত দূর গিয়া পড়িলেন যে, আর তাঁহাকে দেখা গেল না। ঘোর যন্ত্রণায় আমি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলাম। এমন সময়ে তোমার আগ-মনে আমার নিদ্রাভঙ্গ ও তৎসঙ্গে এই যাতনার অবসান হইল। সুরেশ! একি দুঃস্বপ্ন ভাই? আমার কি হইবে?"

সুরেশ দেখিলেন, বিনোদিনীর চিন্তাতেই যোগেন্দ্রের এই কঠিন পীড়া জন্মিয়াছে, এখনও সে চিন্তা হইতে অবসর না পাইলে, জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। বলিলেন,—

"চিন্তা কি? আমি বিনোদিনীকে আসিতে লিখি।"

"আসিতে লিখিবে? সে আমার পত্রের উত্তর দিতে পারে না।—সে ভাল নাই—সে আসিতে পারিবে না। কি হইবে ভাই?"

সুরেশ বুঝিলেন, এই চিন্তা-স্রোত যতদূর সম্ভব বর্দ্ধিত হইয়াছে। বলিলেন,—

"আমি রেজেষ্টরি করিয়া পত্র লিখিতেছি। যদি বিনোদ সুস্থথাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই পত্র পাঠ মাত্র এখানে আসিবেন।"

"যদি তিনি ভাল না থাকেন?"

"তাহা হইলেও তোমার পীড়ার সংবাদ পাইয়া কেহ না কেহ আসিবে।"

"যদি বিনোদ ভাল থাকিয়াও না আসেন?"

"তাহা হইলে—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে,

বিনোদ পাপীয়সী। চিন্তা দূরে থাকুক, তুমি তাহার নামও করিও না।"

যোগেন্দ্র মুদ্রিত নয়নে ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"আচ্ছা। পরশ্ব বুঝিব, বিনোদ মানুষ কি পাষাণ।"

সুরেশ ব্যস্ততা সহ পত্র লিখিলেন। যাহা লিখিলেন তাহাতে তাঁহার প্রত্যয় হইল যে, বিনোদ যদি সুস্থ থাকেন তাহা হইলে, অবশ্যই পত্র পাঠ এখানে চলিয়া আসিবেন।

সাধুচরণ আদেশ ক্রমে পত্র ডাকে দিয়া রেজেষ্টরি রসিদ সুরেশের হস্তে দিল। তিনি যোগেন্দ্রকে রসিদ দেখ ইয়া বলিলেন,—

"এই দেখ রসিদ। তুমি চিন্তা ত্যাগ কর। পরশ্ব লোকজনের সহিত বিনোদিনীর পাল্কী তোমার বাসার দ্বারে লাগিবে। এক্ষণে তুমি স্থির হও, আমি চিকিৎসার উপায় করি।"

সুরেশ ব্যস্ততা সহ কলেজে গিয়া অধ্যক্ষ সাহেবকে গলদশ্রু লোচনে সমস্ত বলিলেন। ডাক্তার সাহেব অবিলম্বে সুরেশকে সঙ্গে লইয়া যোগেন্দ্রের বাসায় আসিলেন এবং যথারীতি চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। সুরেশ অনন্যকর্ম্ম হইয়া ব্যাধি-ক্লিষ্ট সুহৃদের শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া নিয়ত শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কুপথ্য।

"——hath the power to soften and tame
Severest temper, smooth the rugged'st brow,
Enerve,andwith voluptuous hope dissolve,
Draw out with credulous desire, and lead
At will the manliest, resolutest breast.
As the magnetic hardest iron draws."

——Paradi

দেখিতে দেখিতে ছয় দিন অতীত হইয়া গেল—যোগেন্দ্র রুগ্ন-শয্যায় শয়ান আছেন। চল পাঠক, তাঁহার সংবাদ লওয়া যাউক।

বড় গ্রীষ্ম; বেলা ৩টা। যোগেন্দ্র সেই প্রকোষ্ঠে সেই শয্যায় শয়ান। রোগী চক্ষু মুদিয়া আছেন। শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া এক জগন্মোহিনী সুন্দরী ধীরে ধীরে রোগীর শরীরে বায়ু সঞ্চালন করিতেছেন—সেই সুন্দরী কমলিনী। তাঁহার সমীপে, পর্য্যঙ্কনিম্নে, আর এক কামিনী উপবিষ্টা—সে মাধী। প্রকোষ্ঠে আর কেহ নাই। পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে এক খান চেয়ারে বসিয়া সুরেশ ঘুমাইতেছেন। সেই ঘরে সুরেশের সন্নিকটে আর এক খানি চেয়ারে একটী বালক উপবিষ্ট। সে বালক নীলরতন—কমলিনীর ভাসুর পো।

ভবন-দ্বারের ছায়ায় একখানি পাল্‌কি পড়িয়া আছে। পাল্‌কির সঙ্গী দ্বারবান্ চৌবে [illegible], দরজার ছায়ায় বসিয়া, থাম হেলান দিয়া, নাক ডাকাইতেছেন। উড়িষ্যার আমদানি অলকাতিলকা-বিশোভিত বাহক মহা-

শয়েরা রাস্তার অপর পারে, ঘরের ছায়ায় কাপড় বিছাইয়া, ঘুমাইতেছেন; কেবল এক জন বসিয়া তামাকড় খাইতেছেন।

যোগেন্দ্র একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন—কমলিনীর পরম রমণীয় বদন তাঁহার নেত্র-পথে পতিত হইল। কমল বলিলেন,—

"যোগিন্!"

যোগিন তখন আবার নয়ন মুদ্রিত করিয়াছেন। হয়তো কমলিনীর সম্বোধন তাঁহার কর্ণগোচর হইল না। কিন্তু অল্প বিলম্বেই যোগেন্দ্র আবার চাহিলেন। চাহিয়া বলিলেন,—

"কমল! তুমি?"

কমলিনী বলিলেন,

"তোমার পীড়ার সংবাদ পাইয়া আসিয়াছি।"

যোগেন্দ্র। "বিনোদ?"

কমলিনী। "বিনোদ ভাল আছে।"

যোগেন্দ্র। "আমার পত্র?"

মাসী কমলিনীর গা টিপিল। কমলিনী বলিলেন,—

"তোমার পত্র বিনোদিনীকে দেওয়া হয় নাই। বিনোদ অন্তঃসত্ত্বা, এ কুসংবাদ তাহাকে দেওয়া ভাল নয়।"

এত যাতনা সত্ত্বেও যোগেন্দ্রের মুখে হাসি আসিল। মায়া! তোমার প্রভুত্ব অসীম! বলিলেন,—

"বেশ করিয়াছ।"

কমলিনী ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"পত্র আমার হাতে পড়িলে দেখিলাম, লেখাটা আর এক হাতের। পাঠ করিলাম। চিন্তায় আমার নিদ্রা হইল না। কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভাত হইল। প্রত্যুষে সকলকে বলিলাম, আমার ভাসুর-পোর সম্বন্ধে বড় দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি, আমি অদ্যই তাহাকে দেখিতে যাইব। কেহই আপত্তি করিল না—আমি চলিয়া আসিলাম।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কলিকাতায় কমলের শ্বশুরালয়—তিনি সেই সূত্রে সময়ে সময়ে কলিকাতায় যাওয়া আসা করিতেন। এবারেও সেই ছলনায় আসিলেন।

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"কমল! তোমার গুণের সীমা নাই! তোমার নিকট আমি যে ঋণে বদ্ধ, কখনও তাহার পরিশোধ হয় না।"

কমলিনী বলিলেন,—

"যোগেন্দ্র! তোমার জন্য আমার যে কষ্ট তাহার কি বলিব? ভগবান্ তোমাকে নীরোগ করুন, সুখে রাখুন, সেই আমার পরম লাভ।"

কমলিনীর নয়ন-কোণে দুই বিন্দু অশ্রু আবির্ভূত হইল। যোগেন্দ্র তাহা দেখিতে পাইলেন না; কারণ তিনি ক্লান্তি হেতু পুনরায় চক্ষু মুদিয়াছেন।

কমলিনী যোগেন্দ্রের মস্তকে হস্ত মর্দ্দন করিতে করিতে অতৃপ্ত নয়নে তাঁহার বদনশ্রী সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন,—

"শরীর রক্ত মাংসে গঠিত। হৃদয়—মানব-হৃদয়ের হীন বৃত্তিসমূহে পূর্ণ। তবে কেমন করিয়া আমি এ লোভ সংবরণ করিব? জগতে কোন্ রমণী এ লোভ দমন করিতে পারিয়াছে? যদি কেহ পারিয়া থাকে, সে দেবী। কিন্তু আমি সে দেবত্ব প্রার্থনা করি না। আমি এ অদম্য আকাঙ্ক্ষা কখন নিবারণ করিতে পারিব না। লোকে ইচ্ছা হয় আমাকে পিশাচী বলুক, যদি এ পাপে অনন্তকাল আমার নরক ভোগ করিতে হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি এ লোভ ত্যাগ করা আমার অসাধ্য। বিনোদিনীর

সর্ব্বনাশ হইবে। তাহাতে কি? এ জগতে কে কবে পরের সর্ব্বনাশ না করিয়া আত্মসুখ সংস্থান করিয়াছে? কোন্ নরপতি মানব-শোণিতে পদ-প্রক্ষালন না করিয়া মুকুটে মস্তক শোভিত করিয়াছেন? কিন্তু বিনোদ তো আমার পর নহে। বিনোদ পর নহে বটে, কিন্তু যোগেন্দ্রের সহিত তাহার চির-বিচ্ছেদ না ঘটলে আমার আশা মিটে কই? তাহাতে আমার কি দোষ? কত বাদশাহ, কত নরপতি, পিতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা, পুত্রহত্যা করিয়া রাজপদ লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা যদি সামান্য রাজপদ লোভে সেই সকল দুষ্কর্ম্ম করিতে পারিয়া থাকেন, তবে আমি এই অতুলনীয় সম্পদ হইতে আমার ভগ্নীকে কেন বঞ্চিত করিতে পারিব না?"

সুরেশ রুদ্ধদ্বার সমীপস্থ হইয়া বলিলেন—

"ঔষধ খাওয়াইবার সময় হইয়াছে। মাথার কাছে সিসি আছে, তাহা হইতে এক দাগ ঔষধ খাওয়াইয়া দিউন।"

কমলিনী তাহার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

—*—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নূতন ব্যাধি।

"Out of my sight, thou serpent!"
—Paradise Lost.

কলেজের সাহেবের সুচিকিৎসায় এবং সুরেশ ও কমলিনীর যত্নে ক্রমশঃ যোগেন্দ্র রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। এক মাস পরে অদ্য আমাদের তাঁহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটিতেছে। এই এক মাসে তাঁহার এমনই পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, তিনি যেন এক্ষণে আর সে যোগেন্দ্র নহেন। তাঁহার সে কান্তি, সে রূপ সকলই যেন রোগের কঠোর আক্রমণে বিনষ্ট হইয়াছে।

যোগেন্দ্র একাকী বসিয়া আছেন, এইরূপ সময়ে মাধী তথায় আগমন করিল। যোগেন্দ্র মাধীকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসিলেন,—

"কি সংবাদ?"

"বড় দিদি এখনই আসিবেন; আমাকে আগে সংবাদ দিতে পাঠাইলেন।

"তোমার বড় দিদির গুণের সীমা নাই। কিন্তু তোমার ছোট দিদিতো আমায় একেবারে চরণে ঠেলেছেন।"

মাধী ঈষৎ হাসির সহিত বলিল,—

"সে কি কথা! মাথার জিনিষ কেউ কি চরণে ঠেলিতে পারে গা?"

"তাইতো দেখছি।"

"কেন জামাই বাবু?"

"তিনি আর আমার খবরটিও লয়েন না। ভাল, অন্তঃসত্ত্বা যেন হয়েছেন—তাকি আমার খবরটাও নিতে নাই?"

কথা শুনিয়া মাধী যেন আকাশ হইতে পড়িল। বিস্মিতের ন্যায় চক্ষু স্থির করিয়া বলিল,—

"অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন? কে বলিল?"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"বাঃ—তোমার বড় দিদি।"

মাধী পূর্ব্বের ন্যায় চক্ষু স্থির করিয়া বলিল,—

"কি জানি বাবু! বাড়ীর কোন কথা তো আমার ছাপা নাই। তা এত বড় খবরটা শুনলেম না—তা হবে।"

"বল কি"

"আমি তো বেশ জানি, ছোট দিদি পায়াতি নন। কেন—আসিবার আগের দিনও তো ছোটদিদি ঠাকুরুণ তোমার পত্র হাতে করে এসে বড় দিদির সঙ্গে এক যুগ রে কথা কইলেন, তা এ কথার তো কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না।"

যোগেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—

"আমার পত্র কি তোমার ছোটদিদি পেয়েছেন ?"

মাধী বলিল,—

"ওমা, এ আবার কি কথা ! এ যে আমার ঘাড়ে দোষ পড়ে দেখ্‌চি। পত্র সকলই তো আমিই তাঁকে হাতে ক'রে দিইছি ! পাবেন না কেন গা।

যোগেন্দ্র অস্থির হইয়া উঠিলেন। এ ব্যাপারের কোন্ কথা সত্য তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। ভাবিলেন মাধীর কথাই মিথ্যা। তাঁহার হৃদয়ে একটু ক্রোধের আবির্ভাব হইল। কহিলেন,—

"মাধি ! তুই কি আমার সহিত পরিহাস করিতেছিস্ ?" মাধী সঙ্কুচিত ভাবে বলিল,—

"সে কি কথা জামাই বাবু ? এমন কথা নিয়ে তোমার সঙ্গে কি পরিহাস করা যায় ?"

যোগেন্দ্রের আরও ক্রোধ হইল তিনি কহিলেন,—

"তবে কি তোমার বড়দিদি মিথ্যাবাদিনী ?"

"কেমন করে কি বলি ?"

যোগেন্দ্রের ক্রোধ সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিল। তিনি কহিলেন,—

"মিথ্যাবাদিনি ! আমার সম্মুখ হইতে দূর হ।"

মাধী কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল,—

"আমার কি দোষ ? আমায় না জিজ্ঞাসা করিলে আমি কিছুই বল্‌তেম না। আমি যা জানি তাই বলেছি, এতে আমার অপরাধ কি ?"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"তুমি পিশাচী, তুমি রাক্ষসী, তুমি সর্ব্বনাশিনী। তুমি এখনই আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও।"

মাধী কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অস্ফুট স্বরে কাঁদিতে লাগিল। সে শব্দও যোগেন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন,—

"স্ত্রী-রসনা সমস্ত অনিষ্টের মূল।"

এই চেষ্টা-জনিত ক্লেশে যোগেন্দ্র কাতর হইলেন। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাথায় হাত দিয়া শয়ন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—*—

বকার।

"Is this the Love, is this the recompense,
Of mine to thee, ingrateful Eve ?"
——Paradise Lost .

প্রায় এক ঘণ্টা পরে কমলিনী ও নীলরতন যোগেন্দ্রের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যোগেন্দ্রের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কমলিনীর সহিত মাধীর সাক্ষাৎ হইল। মাধী অস্ফুট স্বরে কহিল,—

"রোগ ধরিয়াছে।"

"ঔষধ ?"

"এখন কেন—বাড়ুক।"

"আপনি বাড়িবে?"

"কুপথ্য চাই—আমি কিছু দিয়াছি, তুমি কিছু দেওগে।"

"কি রকম?"

"যেমন যেমন কথা আছে। কিন্তু দেখ দিদি, তোমার জন্য আমি বুঝি মারা যাই। আমার উপর জামাই বাবুর বড় রাগ। যত দুর হয়েছে ভাই সেই ভাল, এখন আমি গরীব সরে দাঁড়াই—তোমরা যা জান তাই কর।"

"ভাবনা কি? পেটে খেলেই পিটে সয়।"

"তোমার হাতে বিচার।"

যখন কমলিনী মাধীর সহিত কথাবার্ত্তায় নিযুক্তা ছিলেন, নীলরতন তখন উপরে গিয়া যোগেন্দ্রবাবুর সহিত কথা কহিতেছিল। এক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—

"খুড়ি মা! আজ আবার যোগেন্দ্র বাবুর অসুখ হইয়াছে।"

কমলিনী ত্বরায় উপরে উঠিলেন।

যোগেন্দ্র বাবুর দুইটা বিলাতী কুকুর ছিল; নীলরতন তাহার শিকল খুলিয়া দিয়া খেলায় মত্ত হইল।

উপরে উঠিয়া কমলিনী দেখিলেন, যোগেন্দ্র শয্যায় নয়ন মুদিয়া শয়ন করিয়া আছেন।

ডাকিলেন,—"যোগিন্!"

যোগেন্দ্র উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু কোনও কথা কহিলেন না। কি বলিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। কমলিনী জিজ্ঞাসিলেন,—

"যোগিন্! তোমার কি আজ অসুখ হইয়াছে?"

"হাঁ।"

"কেন এরূপ হইল?"

যোগেন্দ্র উদ্ধত ভাবে বলিলেন,—

"মাধী—তুমি জান না—মাধী সর্ব্বনাশিনী মাধী অক্লেশে তোমার গলায় ছুরি দিতে পারে। তুমি এখনই তাহার সংস্রব ত্যাগ কর।"

কমলিনী বিস্মিতের ন্যায় বলিলেন,—

"কেন যোগেন্দ্র, মাধী কি করেছে?"

তখন যোগেন্দ্র একে একে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। শুনিয়া কমলিনী বলিলেন,—

"অতি অন্যায়! মাধী চাকরাণী—সে দাসীর মত থাকিবে। সত্য হউক মিথ্যা হউক, আমাদের ঘরাও কথায় তাহার থাকিবার কি দরকার? আমি এ জন্য এখনই মাধীকে তাড়াইয়া দিব। কি ভয়ানক! বিনোদের কথায় মাধীর কি কাজ?"

যোগেন্দ্র কিছু চঞ্চল হইলেন। ভাবিলেন, ইহার মধ্যে কি একটা কথা আছে—কমলিনী তাহা গোপন করিতেছেন। বলিলেন,—

"হয়তো মাধী আমার সহিত পরিহাস করিয়াছে। তুমি এখন আমাকে ঠিক কথা বুঝাইয়া দেও।"

"এরূপ কথা বলিয়া তাহার পরিহাস করা অন্যায়। পরিহাসের কি অন্য কথা ছিল না? যাহা বলিবার নহে তাহা সে বলিল কেন?"

যোগেন্দ্রের মন আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি ধীরতা সহকারে বলিলেন,—

"তবে কি তাহার কথা সত্য—সে যদি সত্য বলিয়া থাকে তবে তাহার দোষ কি?"

কমলিনী রাগতস্বরে বলিলেন,—

"দোষ কি?—সত্য হউক মিথ্যা হউক, তাহাতে তাহার কি? বিনোদিনী ছেলে মানুষ, তাহার যদি কোন দোষ হইয়া থাকে তাহা তোমাকে জানাইবার মাধীর কি দরকার ছিল? আমি আর মাধীর মুখ দেখিব না, তাহাকে এখনই তাড়াইয়া দিব।"

যোগেন্দ্রের চিত্ত যার-পর-নাই বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন যে, বিনোদের

সম্বন্ধে কোন ভয়ানক কথা কমলিনী জানিয়া— বলিতেছেন না। নিতান্ত ব্যাকুল ভাবে তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—

"বল কমলিনী, তোমার পায়ে পড়ি বল, ইহার মধ্যে কি কথা আছে ?"

"কি বলিব যোগেন্দ্র ?"

"বিনোদিনী অন্তঃসত্ত্বা কি না ?"

"দেখ যোগেন্দ্র, বিনোদিনী বালিকা ; ন্যায়ান্যায় বিবেচনা করিবার ক্ষমতা তাহার আজিও হয় নাই। তাহার কার্য্যে তোমার এখন মনোযোগ দেওয়া উচিত নহে।

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"আহাঃ, সে অন্তঃসত্ত্বা কি না এ সুসংবাদ জানাও কি আমার উচিত নহে ?"

কমলিনী আবার পূর্ব্বের ন্যায় অন্য কথায় প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর গোপন করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—

"বিনোদ আমার ভগ্নী—আমি তাহাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছি। আমার কে আছে ? আমি তাহাকে প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসি। তাহার যাহা দোষ অপরাধ তাহা আমি কিছুতেই বলিব না। আমার গলায় ছুরি দিলেও আমি বিনোদের বিরুদ্ধ কথা ব্যক্ত করিব না।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কমলিনীর নয়ন-কোণে অশ্রুর আবির্ভাব হইল। যোগেন্দ্রের সন্দেহ, বিশ্বাস, কৌতূহল এতই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে, তিনি যেন ক্ষণে ক্ষণে আত্মহৃদয়ের উপর প্রভুতা হারাইতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, বিনোদের সম্বন্ধে এমন কোন দোষের কথা আছে, যাহা আমার নিকট ব্যক্ত করিলে বিনোদের অনিষ্ট হইতে পারে! কি ভয়ানক ! অতি কাতর ভাবে বলিলেন,—

"কমলিনী ! বিনোদিনী তোম অত্যন্ত [illegible] [illegible] [illegible]ত্রী তাহা কি আমি জানি না ? কিন্তু [illegible] কি তোমার পর ? যে স্নেহবলে [illegible] তোমার আপনার, সে স্নেহে কি আমা-ও [illegible] নাই ? মাধীর মুখে আমি যাহা [illegible] তাহাতে প্রকৃত কথা না জানিলে সন্দেহের যাতনায় আমার মৃত্যু হইবে ; তুমি কি তাহা বুঝিতেছ না ? তাহা বুঝিয়াও যদি আমাকে ভিতরকার কথা না বল, তাহা হইলে কেমন করিয়া বলিব যে তুমি আমাকে স্নেহ কর ? যদি আমাকে এরূপ কষ্টে ফেলিয়া তুমি থাকিতে পার তবে, কেন তুমি আমার পীড়ার সংবাদ পাইয়া আসিয়াছিলে ? কেন আমাকে এত যত্ন করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচাইলে ? তোমার স্নেহ কি কেবল মৌখিক ? তুমি এত পাষাণহৃদয়া তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না ! স্ত্রী-চরিত্র এতাদৃশ দুরবগম্য তাহা কে জানিত ?"

কমলিনীর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন,—

"যোগেন্দ্র ! তুমি আমার উপর অভিমান করিতে পার। তোমার প্রতি আমার যে কত ভালবাসা বা—স্নেহ তাহা কি বলিয়া বুঝাইব ? যোগেন্দ্র ! আমার হৃদয়ে যে—যে—যে—ভালবাসা আছে তাহা তুমি কখনই বুঝিতে পার না। তাহা পার না—সেই জন্যই আমার দুঃ। যোগিন্! তুমি আমার আপন হই-লেও আপন। আমি বিনোদিনীকে দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া দিতে পারি, কিন্তু তোমার [illegible] কুশাঙ্কুর বিঁধিলে তাহাও সহ্য করিতে পারি না। যোগিন্! আমাকে গালি দিও না। জগৎ নির্দ্দয়—তুমি নিষ্ঠুর—তুমি—"

কমলিনী আর বলিলেন না—বলিতে [illegible]রিলেনও না। মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

দুঃখের বিষয়, সকল মানবের মনের গতি

সমান নহে। কমলিনী যে কারণে ও যে প্রবৃত্তির উত্তেজনায় এত কথা বলিলেন, যোগেন্দ্রের মনের গতি অন্যবিধ হওয়ায়, তিনি তাহার অন্যবিধ অর্থ করিয়া লইলেন। তিনি বুঝিলেন যে, কমলিনীর ন্যায় উদারস্বভাবা, স্নেহ-পরায়ণা কামিনীকে পাষাণী বলিয়া দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করায়, তাঁহার মর্ম্মে আঘাত লাগিয়াছে; সেই জন্য তিনি কাঁদিয়াছেন এবং আমাকে নিষ্ঠুর বলিয়াছেন। ভাবিলেন কথাটা ভাল হয় নাই। বলিলেন,—

"কমলিনি! আমার উপর রাগ করিও না, বিনোদিনী তোমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা তাহা আমি জানি। তাহার নিন্দাসূচক কোন কথা বলিতে তোমার অনেক কষ্ট হয় সন্দেহ কি? কিন্তু আমি তাহা জানিবার জন্য যেরূপ ব্যাকুল হইয়াছি তাহা তোমায় বলিয়া কি বুঝাইব? সেই জন্যই যদি একটা রূঢ় কথা মুখ হইতে বাহির হইয়া থাকে, তবে আমাকে ক্ষমা কর। তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমি অত্যন্ত কষ্ট পাই। আমাকে সমস্ত কথা বলিয়া এ যাতনা হইতে নিষ্কৃতি দেও।"

কমলিনী মনে মনে বলিলেন,—

"পাপ বিনোদিনী! বিনোদিনীর চিন্তায় তুমি ব্যাকুল হইয়াছ। বিনোদিনীকে না ভুলিলে—সে তোমার চক্ষে বিষ না হইলে, আমার আশা নাই। তাহাই করিব। আমার বাসনা পূর্ণ না হয় সেও ভাল, তথাপি তোমাকে আমি বিনোদিনীর থাকিতে দিব না।"

প্রকাশ্যে বলিলেন,—

যোগেন্দ্র! তুমি অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছ, তাহা আমি বুঝিতেছি। তোমাকে এ কষ্ট হইতে উদ্ধার করিতেছি, কিন্তু তুমি বল যে বিনোদিনীর কোন দোষ গ্রহণ করিবে না।"

যোগেন্দ্র জানিতেন না যে কিরূপ ঘটনার প্রাবল্যে কিরূপ মানসিক প্রবৃত্তি কিরূপ পরিবর্ত্তন পরিগ্রহ করে। এই জন্যই বলিলেন,—

"এ বিষয়ে তোমার অনুরোধ করা বাহুল্য। বিনোদিনী সহস্র অপরাধে অপরাধিনী হইলেও আমার মার্জ্জনীয়া। আমার চক্ষে বিনোদ সততই অমৃতের আগার।"

কমলিনী মনে মনে বলিলেন,—

"যতক্ষণ সে বিষ না হয়, ততক্ষণ আমিই কোন্ ছাড়িব?"

প্রকাশ্যে বলিলেন,

"ভগবানের কাছে প্রার্থনা, যেন তাহার প্রতি তোমার এইরূপ স্নেহই চিরদিন থাকে। সে বালিকা—তাহার কোন দোষ হইলে তোমার মার্জ্জনা করা উচিত। কোন্ সংবাদ তোমার প্রয়োজনীয় বল।"

"বল বিনোদ অন্তর্বত্নী কি না।"

"না।"

যোগেন্দ্র চমকিয়া বলিলেন,—

"তবে তুমি আমায় তাহা বলিয়াছিলেন কেন

"তোমারই জন্য;—একটা ওরূপ কথা না বলিলে তখন তোমার চিন্তা যায় না, সুতরাং রোগও সারে না।"

"বিনোদিনী ভাল আছে?"

"আছে।"

"আমার পত্র তাহার হস্তগত হইয়াছে?

"আমি তো দেখিয়াছি, সে তোমার কয় খানি পত্র পাইয়াছে।"

যোগেন্দ্র কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—

"তাহার উত্তর দে নাই কেন, বলিতে পার?"

"জানি না। আমি এ কথা তাহাকে বার বার বলিয়াছি, কিন্তু কি জানি সে আজি কালি কি এক রকম হইয়াছে।"

"যোগেন্দ্র অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—

"দেখ কমলিনী, আমি অদ্য যাহা হইবার নহে, তাহাই শুনিতেছি। অন্যে এরূপ কথা বলিলে, আমার তাহা বিশ্বাসই হইত না। কিন্তু তুমি নিতান্ত অনিচ্ছায়, আমার বার বার অনুরোধে এ কথা বলিতেছ। আমার বোধ হয় বিনোদ বা পাগল হইয়াছে।"

কমলিনী মনে মনে বলিলেন,—

"বিনোদ! এ জগতে তুইই সুখী। তোর প্রতি যোগেন্দ্রের ভালবাসার পরিমাণ নাই। কিন্তু আমি তাহা থাকিতে দিব না। কখনই না।"

প্রকাশ্যে বলিলেন,—

"তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব? বিনোদ সাংসারিক কোন কার্য্যে ভুল করে না, কখন একটীও অসংলগ্ন কথা বলে না, হাস্য কৌতুকে তাহার বিরাম নাই, তবে কেমন করিয়া বলি বিনোদ পাগল হইয়াছে? তোমায় বলিতে কি যোগেন্দ্র, আমি বিনোদিনীর চিন্তায় অস্থির হইয়াছি। সুযোগমতে, সময়ক্রমে তোমার সহিত এ বিষয়ের পরামর্শ করিব ভাবিয়াছিলাম, অদ্য ঘটনাক্রমে তাহা তুমি জানিতে পারিলে ভালই হইল। এক্ষণে শান্ত মনে, তাহার দোষ গ্রহণ না করিয়া, সুপরামর্শ স্থির কর। আর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না। আমি আর কিছু জানি না—আর কিছু বলিবও না।"

যোগেন্দ্র হতাশের ন্যায় বলিলেন,—

"আমার আর কিছু জানিবার প্রয়োজন নাই। মাধীর দোষ নাই; আমি তাহার প্রতি অকারণ কটুক্তি করিয়াছি। তুমি তাহাকে আর কিছু বলিও না।"

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া আবার বলিলেন,—

"আরও দুই একটী কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিব।"

"বিনোদের সম্বন্ধে?"

"হাঁ।"

"আর কেন? ভাই, রাগ করিও না। বিনোদ বালিকা।"

"কেন কমলিনি, আমিতো বলিয়াছি বিনোদের দোষ গ্রহণ করিব না। বিনোদ আমার পীড়ার সংবাদ পাইয়াছিল কি?"

"মাথা মুণ্ড তোমায় কি বলিব? তুমি কিই বা শুনিবে? আমি তখনই জানি, অভাগী বিনীর সর্ব্বনাশ শিয়রে। এখন দেখিতেছি, তোমার অনুরোধে পড়িয়া আমি পোড়াকপালী তাহার সর্ব্বনাশ শীঘ্র ডাকিয়া আনিতেছি। যোগেন্দ্র! আমি যখন তোমাকে এত বলিয়াছি, তখন আরও যাহা জিজ্ঞাসিবে তাহাও বলিতেছি—কিন্তু তোমার এত অনুরোধ শুনিলাম, তুমি আমার একটী অনুরোধ শুনিও। তুমি বুদ্ধিমান, বিদ্বান্ ও ধীর। বিনোদ বালিকা। আমার মাথা খাও যোগেন্দ্র, আমার মরা মুখ দেখ, যদি তুমি তাহার প্রতি সহসা রাগ কর, কি তাহার প্রতি কঠিন বিচার কর। আমি জন্মদুঃখিনী—আমার মুখ তাকাইয়া ভাই বিনোদের প্রতি রাগ করিও না।"

কমলিনীর চক্ষে জল আসিল। তিনি বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন মার্জ্জন করিলেন। মানবহৃদয় কতদূর সহিতে পারে তাহা কমলিনী জানিতেন।

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"তাহাই হইবে—এক্ষণে বল, বিনোদ আমার পীড়ার সংবাদ পাইয়াছিল কি না?"

"সেই তো আমাকে রেজেষ্টরি পত্র দেখাইয়া বলিল,—"দিদি! এই সংবাদ আসিয়াছে. কি করা যায়? কলিকাতার বাসায় যাওয়া সুবিধা নহে! বিশেষ আমার শরীরটা এক্ষণে বড় ভাল নয়। তিনি তিলকে তাল করেন; হয়তো একটু অসুখ হইয়াছে, আপনিই সারিয়া যাইবে—আমি গিয়া কি করিব?" তাহার

কথা শুনিয়া আমি অবাক্ হইলাম। বলিলাম 'বিনি! তোর মতিচ্ছন্ন হইয়াছে।' তার পর আমি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।'

যোগেন্দ্র অনেকক্ষণ কপোলে কর বিন্যাস করিয়া বসিয়া রহিলেন। সংসার অনন্ত সমুদ্রবৎ বোধ হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, এই অনন্ত সমুদ্র মধ্যে তিনিই একমাত্র জীব, প্রতি মুহূর্ত্তেই তরঙ্গে তরঙ্গে আন্দোলিত, বিচলিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া দূর-দূরান্তরে গিয়া পড়িতেছেন। অনবরতই দেখিতেছেন, এই অনন্তরূপ সংসারে আশ্রয় নাই—অবলম্বন নাই, বিপদের সীমা নাই—সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে অগণ্য হিংস্র-বিকট প্রাণী বদন ব্যাদান করিয়া গ্রাসিতে আসিতেছে।

কমলিনী ভাবিতে লাগিলেন,—"কুপথ্য যথেষ্ট হইল বটে, কিন্তু এও তো হইল না; একটা বিরেচক দিলেই তো এ দোষ কাটিয়া যাইবে। আরও চাই।"

প্রকাশ্যে বলিলেন,—

"এখন ও কথায় আর কাজ নাই, অন্য কথা কহ।" গম্ভীর স্বরে যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"পাষাণ নহি। এ প্রসঙ্গ জীবনে ছাড়িব না। তোমাকে আবার জিজ্ঞাসা করি, এখানে আসার পর বিনোদ তোমাকে পত্র লিখিয়াছে?"

কমলিনী যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় বলিলেন,—

"চিঠি—হাঁ—তা—দুই চারি খানা লিখেছে বৈ কি?"

"তোমার সঙ্গে আছে?

"কেমন করিয়া থাকিবে?"।

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

"এখানে আসিবার সময় যখন গাড়িতে উঠিয়াছি, তখন নীলরতন একখানি পত্র দিয়াছিল। সে খানা ভাল করে পড়াও হয় নাই। তাহাই কেবল সঙ্গে আছে।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"আমাকে সেখানি দাও।"

কমলিনী বলিলেন,—

"তুমি তাহার কি দেখিবে? আমি তাহা দিব না।"

যোগেন্দ্র চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কুপিতস্বরে বলিলেন,—

"আমাকে তাহা দিতেই হইবে।"

কমলিনী পত্র বাহির করিয়া বলিলেন,—

"তোমায় পত্র দিব না। আমি ইহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতেছি।"

যোগেন্দ্র ব্যস্ততা সহ কমলিনীর হস্ত হইতে পত্র কাড়িয়া লইলেন। দেখিলেন, সেই হস্তাক্ষর—সেই চিরপরিচিত হস্তাক্ষর! পত্র পাঠ করিলেন,—

(গোপনীয়)

"দিদি! তুমি আর আমায় যোগেন্দ্রের সংবাদ দিও না। যদি তাঁহার কাছে আমার কথা বলিতে হয় তবে বলিও আমি সুখে আছি। তিনি যেন আমার সুখের ব্যাঘাত না করেন। আমার কোন কথা তাঁহাকে না বলাই ভাল। ইতি

"বিনোদিনী।"

"পুঃ। তুমি কবে আসিবে?"

যোগেন্দ্র একবার পত্র পাঠ করিলেন। ভাবিলেন অসম্ভব! দ্বিতীয় বার পাঠ সময়ে হাত হইতে পত্র পড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন,-

"কমলিনি! তোমার সংবাদ শুভ। আমি যে প্রতারণা-জালে জড়িত ছিলাম, তাহা হইতে অদ্য তুমি আমায় মুক্ত করিলে। কে জানিত যে, পৃথিবীতে এত পাপ থাকিতে পারে।"

যোগেন্দ্র অচেতনবৎ শয্যায় পড়িয়া গেলেন
কমলিনী মনে মনে বলিলেন,—
"এতক্ষণে সম্পূর্ণ বিকার উপস্থিত।"

নবম পরিচ্ছেদ।

—*—

আর এক দিক।

"Heav'n and Earth are colour'd with my woe."
—Passion.

এই সময়ে একবার বিনোদিনীর তত্ত্ব লওয়া আবশ্যক। তাঁহার অন্তরের কি অবস্থা, তাহা একবার জানা উচিত নয় কি?

বীরগ্রামের সেই ভবনের এক প্রকোষ্ঠে বিনোদিনী শয়ন করিয়া আছেন। প্রকোষ্ঠের দ্বারাদি সমস্ত উন্মুক্ত। হর্ম্ম্যসংলগ্ন সেই মনোহর উদ্যান বিনোদিনীর নেত্রপথে পতিত—কিন্তু তিনি উদ্যানের কিছুই দেখিতেছেন না। বিনোদিনী বিবর্ণা—ঘোর উৎকণ্ঠায় তাঁহাকে যার পর নাই কাতর করিয়াছে। তাঁহার শরীর রোগীর ন্যায় দুর্ব্বল। তাঁহার দেহে লাবণ্য নাই, অঙ্গে ভূষণ নাই, কেশের পরিপাট্য নাই। সময়ে সময়ে এক এক বিন্দু অশ্রু তাঁহার নয়ন-কোণে দেখা দিতেছে। বহুক্ষণ সমভাবে থাকিয়া বিনোদিনী 'হা জগদীশ্বর! তোমার মনে কি এই ছিল?' বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ক্ষণেক, সমস্ত ভুলিবেন স্থির করিয়া সেই উদ্যানের প্রতি নিবিষ্টভাবে চাহিলেন। দেখিলেন—সরসী হৃদয়ে অমল ধবল মরালমালা, বিকসিত প্রসূনের ন্যায় ভাসিতেছে। একটী পানিকৌড়ি, বাতিকাশ্রিত ব্যক্তির ন্যায়, অনবরত জলে ডুবিতেছে ও উঠিতেছে। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ বক তটে উপবেশন করিয়া আয়ত্তাগত নিরীহ মৎস্য-জীবন নাশের উপায় অন্বেষণ করিতেছে। সরোবর পার্শ্বস্থ অশোক বৃক্ষের শাখা হইতে সহসা এক মৎস্যরঙ্গ জলে আসিয়া পড়িল। এবং তৎক্ষণাৎ একটী জীবন্ত সফরী চঞ্চুপুটে ধারণ করিয়া প্রস্থান করিল। সরোবরের চতুঃপার্শ্বে নানাবিধ ফুলের গাছ পর্য্যায়ক্রমে স্থাপিত; তৎসমস্তের পুষ্পসমস্ত বিবিধবর্ণসম্পন্ন। কাহারও পুষ্প প্রস্ফুটিত, কাহারও বা মুকুলিত, কাহারও বা দলরাজিচ্যুত হইয়া ভূপতিত। স্থানে স্থানে মনোহর লতাসমস্ত নিকুঞ্জাকারে পরিণত। বিনোদিনী দেখিলেন, একটী নিকুঞ্জ মধ্যে দুইটী বুল্‌বুল্ প্রবেশ করিল। একটী বুল্‌বুল্ পার্শ্বস্থ লতিকায় যে লোহিত ফল লম্বিত ছিল তাহা ঠোক্‌রাইল, অপরটীও তদ্রূপ করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু সে যেখানে ছিল সেস্থান হইতে তাহার চঞ্চু ফলসংলগ্ন হওয়া সম্ভাবিত নহে। সে ব্যর্থ-প্রযত্ন হইয়া নিরস্ত হইল, অমনি প্রথম বুল্‌বুলটি সরিয়া গিয়া দ্বিতীয়টীকে স্বীয় স্থান প্রদান করিল। দ্বিতীয়টী ফল না ঠোকরাইয়া প্রথমটীর চঞ্চু সহ স্বীয় চঞ্চু ঘর্ষণ করিল। প্রথম বুল্‌বুল্ 'পিক্‌ড়ু পিক্‌ড়ু' শব্দ করিল। সে শব্দের অর্থ কে বলিতে পারে? বুল্‌বুল্ কি বলিল,—

"কি বলে বুঝাবরে প্রাণ, তোমায় কত ভালবাসি?" হইবে!! মানব প্রকৃতির উচ্চ মনোবৃত্তি কি বিহঙ্গম হৃদয়েও প্রবেশ করি-[illegible]? তাহা যদি হয়, তাহা হইলে ভবি-[illegible] হয়তো কোন বুল্‌বুল্‌দম্পতী রোমিও এবং জুলিয়েট, বা ওথেলো এবং দেসদিমোনা

অথবা দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার স্থলাভিষিক্ত হইয়া কোন কাব্য বিশেষের নায়কনায়িকা রূপে জগতে অমরতা লাভ করিতে পারে।

বিনোদিনী সমস্তই প্রত্যক্ষ করিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে অগ্নি জ্বলিতেছিল, কিছুতেই তাহার শান্তি হইল না। তিনি সে দিক হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া উঠিয়া বসিলেন। বালিশের নীচে হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া পাঠ করিলেন,—

"প্রিয় ভগ্নি, "ক্রমশই তোমার পত্র পাইতেছি ও তাহার উত্তরও "লিখিতেছি। তুমি যে কষ্টে পড়িয়াছ তাহা আমি সবই "বুঝিতেছি। কথাটা বড়ই কষ্টের কথা বটে। কিন্তু ভগ্নি "যৌবনে পুরুষের এ দোষ না হয় এমন নয়; আর, এক বার এ দোষ হইলে যে আর সারে না," এমনও নয়। "আমার ভরসা আছে যে, আমি যেরূপ যত্ন করিতেছি "তাহাতে যোগেন্দ্রের এ দোষ ক্রমে সারিয়া যাইবে। তবে "সম্প্রতি যোগেন্দ্রের যে প্রকার মনের গতি, তাহাতে তিনি "যেন সেই বারনারীর দাসবৎ। এ জগতে তিনি যেন "তাহার ভিন্ন আর কাহারও নহেন। শুনিতেছি, সম্প্রতি "এক আইন হইয়াছে, তাহাতে বেশ্যারাও ইচ্ছা করিলে বিবাহ করিতে পারে। সেই আইনের বলে, যোগেন্দ্র "বাবু না কি সেই দুশ্চরিত্রাকে বিবাহ করিবেন! পোড়া "কপাল!! আমি একবার সেই পাপিষ্ঠাকে দেখিতে পাই "তো এক কিলে তাহার নাক ভাঙ্গিয়া দেই। তুমি এ "জন্ম ভাবিও না। আমার বোধ হয়, এরূপ নেশা অধিক "দিন থাকিবে না। তোমার শেষ পত্র যোগেন্দ্রকে দেখাইয়াছিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'উত্তম।' বোধ হয় আমি শীঘ্রই বাটী যাইব। যদি পারি তবে যোগেন্দ্রকে "সঙ্গে লইয়া যাইব। প্রধান অসুবিধা—প্রায়ই তাঁহার "সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। যখন যেমন হয় লিখিব। তুমি "সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে। তোমার চিন্তায় আমি বড়ই "অস্থির আছি। ইতি

"কমলিনী।"

বিনোদিনী পত্র পাঠ করিয়া বহুক্ষণ নীরবে রোদন করিলেন। ভাবিলেন,—

"কামিনীই ধন্যা! এজগতে সেই পুণ্যবতী, তাহারই জন্ম সার্থক; সে যোগেন্দ্রের অক্ষয় প্রেম লাভ করিয়াছে। আর আমি? আমি মন্দভাগিনী—আমাতে এমন কি গুণ আছে, যাহাতে সেই অমূল্য হৃদয়-রাজ্যে আমি আধিপত্য লাভ করিতে পারি? প্রাণেশ্বর! তুমি বর্ত্তমান পদবিতে সুখে আছ। থাক; পাপ হউক, তাপ হউক, নাথ! ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, জগতে তোমার সুখ যেন অব্যাহত হয়। কিন্তু আমার দশা! আমার এ যাতনা সহে না যে। আমি কি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিই নাথ? স্বর্গ হইতে নরকে পড়িয়া বাঁচিব কেন? হৃদয়েশ, কিন্তু বাঁচিয়াই বা কাজ কি? যোগীন্ সুখে আছেন বুঝিয়া মরিব—ইহার অপেক্ষা সুখের মরণ আর কি আছে? মরিবই স্থির; কিন্তু প্রাণেশ্বর! তোমার চরণ আর একবার না দেখিয়া মরিতেও পারি না তো।"

একজন ঝি আসিয়া বলিল,—

"মাষ্টার মহাশয় আসিয়াছেন।"

বিনোদিনী বলিলেন,—

"তাঁহাকে আসিতে বল।"

অনতিবিলম্বে হরগোবিন্দ বাবু মাষ্টার মহাশয় সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি বিনোদিনীর অবস্থা দেখিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন,

"এ কি মা! তোমার একি অবস্থা হয়েছে?"

বিনোদিনী কোন উত্তর দিতে পারিলেন না,

কেবল অবনত মস্তকে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

হরগোবিন্দ বাবু আবার জিজ্ঞাসিলেন,—

"কেন বিনোদ, কাঁদিতেছ কেন মা? তোমার কি হইয়াছে তাহা তো আমি কিছুই জানি না। যোগেন্দ্র ভাল আছেন তো?"

শেষ প্রশ্ন শুনিয়া বিনোদিনী আরও কাঁদিতে লাগিলেন।

মাষ্টার মহাশয় কহিলেন,—

"সে কি! আমাকে কি কেবল তোমার কান্না দেখিতে ডাকিয়াছ?"

বিনোদিনী বালিশের নীচে হইতে এক তাড়া চিঠি বাহির করিয়া হরগোবিন্দের হস্তে দিয়া অধোবদনে শয়ন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হরগোবিন্দ বাবু একে একে ছয় খানি পত্র পাঠ করিলেন। দেখিলেন, পত্র-গুলি কমলিনীর হস্ত-লিখিত। বলিলেন,—

"তা—ই—ত।"

ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিলেন,—

"বিশ্বাস হয় না—কমলিনীর জানিবার ভুল।"

রোদন-বিজড়িত স্বরে বিনোদিনী বলিলেন,—

"তিনি আমাকে একখানিও পত্র লেখেন নাই কেন?"

"এবার তুমি তাঁহার একখানিও পত্র পাও নাই?"

"না। দিদির কাছেও তিনি আমার নাম করেন নাই। তিনি আমাকে এমন পর করিলেন কেন?"

আবার বিনোদিনী কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার কাতরতায় মাষ্টার মহাশয়ের চক্ষেও জল আসিল। তিনি আবার ধীরে ধীরে কহিলেন,—

"তা—ই—ত।"

বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া হরগোবিন্দ বাবু তাঁহার অর্দ্ধধবল কেশরাশি একবার উভয় হস্ত দ্বারা আন্দোলন করিয়া বলিলেন,—

"আমি স্বয়ং ইহার অনুসন্ধান না লইয়া কোন কথা বলিতে পারিতেছি না।"

বিনোদিনী বলিলেন,—

"এ কথা ব্যক্ত করিবার নহে, কাহাকেও বলিবার নহে। সদুপায় ও সৎপরামর্শের জন্যই আপনাকে বলিলাম। তিনি এবং আমি, আমরা উভয়েই আপনার সন্তান বলিলে হয়। এ বিপদ হইতে আপনি আমায় রক্ষা করুন। আমার কি হইবে?"

কাঁদিতে কাঁদিতে বিনোদিনী মাষ্টার মহাশয়ের পদস্পর্শ করিলেন।

"হরগোবিন্দ তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন।"

"বাছা! কি বলিব বল? আজি যাহা শুনিতেছি, তাহা যার পর নাই অসম্ভব। আমি শীঘ্রই সমস্ত জানিতে পারিব। পত্র কয় খানি আমার নিকট থাকুক। এ সব আমার বোধ হয় কিছুই নয়—কমলিনীর ভুল। কাঁদিও না—চিন্তা করিও না। আমি এখনই ইহার অনুসন্ধান করিতেছি"

মাষ্টার মহাশয় চলিয়া গেলেন। বিনো-দিনী কপালে হাত দিয়া ভূমিতলে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার অবিন্যস্ত কেশরাশি ভূমি-তলে লুটাইয়া রহিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

---*---

অনেক দূর।

——now the thought
Both of lost happiness, and lasting pain
Torments him: round he throws his,
baleful eyes.
That witness'd huge afliction and dismay
Mix'd with obdurate pride and steadfast
hate.
Paradite Lost.

বেলা ৩টার সময় কমলিনী ও মাধী যোগেন্দ্রের বাসায় আসিলেন। যোগেন্দ্রের চিত্তের অবস্থা বড়ই ভয়ানক! দারুণ সন্দেহে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ। সেই বিনোদিনী—যাহার জীবনে তাঁহার জীবন, তাঁহার জীবনে যাহার জীবন—সে আজি এমন! ইহার অপেক্ষা ভয়ানক কথা আর কি আছে? যোগেন্দ্র কমলিনীকে দেখিয়া বলিলেন,—

"এমন হইবার পূর্ব্বে, এত কথা শুনিবার পূর্ব্বে, কেন মরি নাই?"

কমলিনী বলিলেন,—

"যোগেন্দ্র! সর্ব্বদাই ঐ আলোচনা—ইহাতে শরীর থাকিবে কেন?"

নিতান্ত উদাসীনের ন্যায় যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"শরীরে প্রয়োজন?"

"সে কি যোগিন্? তুমি বার বার বলিয়াছ, কিছুতেই তাহার দোষ লইবে না। তবে এ ভাব কেন?"

যোগেন্দ্র কাতরতার সহিত বলিলেন,—

কমলিনি! এ জগতে আমার আর কি সুখ আছে? আমি তাহার দোষ গ্রহণ করিতেছি না সত্য, কিন্তু আমার হৃদয় তো শূন্য। আমি কি বলিয়া মনকে বুঝাইব?"

কমলিনী বলিলেন,—

"একটী বালিকার ব্যবহারে কেন যোগেন্দ্র, তুমি আত্মসুখ শান্তি নষ্ট করিতেছ? আমার অনুরোধ যোগেন্দ্র, তুমি এ সকল ভুলিয়া যাও। আমি তোমাকে বড় ভালবাসি, তোমাকে কাতর দেখিলে আমি যে কষ্ট পাই, তোমাকে কি বলিয়া বুঝাইব? যোগেন্দ্র! আমার কি অপরাধ? কেন তুমি এমন করিয়া আমাকে কষ্ট দিতেছ? তুমি জান না, তোমার জন্য এ হৃদয় কত দূর সহ্য করে। যোগেন্দ্র! তোমার হাতে ধরি—আমাকে উপেক্ষা করিও না—"

কমলিনী উন্মত্তার ন্যায় বলিতেছিলেন, কিন্তু মাধী তাঁহার গা টিপিল, নচেৎ এই বাক্যস্রোত কোথায় গিয়া থামিত, তাহা কে বলিতে পারে? যোগেন্দ্র অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

"তাহাই হইবে। তোমার যাহাতে কষ্ট হয়, তাহা করিব না! তোমার সুখের কামনায় এ ব্যাপার যতদূর পারি, ভুলিতে চেষ্টা করিব।"

কমলিনীর অধর-প্রান্তে একটু হাসি দেখা দিল। ভাবিলেন, তাঁহার বাসনার পথ ক্রমেই সহজ হইয়া আসিতেছে। বলিলেন,—

"আমি তো কালি বাটী যাইব, তুমি কবে যাইবে বল।"

যোগেন্দ্র চমকিয়া বলিলেন,—

"আমি বাটী?—এ জীবনে না।"

আবার সেই অমৃতময় স্বরে কমলিনী বলিলেন,—

"সে কি কথা যোগেন্দ্র? এই তো তুমি বলিলে, আমার যাহাতে কষ্ট হয় তাহা করিবে না। তোমার অদর্শনে আমি কি কষ্ট পাইব না? যোগেন্দ্র! জগতে আমার প্রধান দুঃখ যে, তুমি আমার চিত্ত বুঝিলে না"।

কমলিনী মস্তক বিনত করিলেন যোগেন্দ্র অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,--

"তাহাও স্বীকার। বাটী যাইব। কিছু দিন বিলম্বে। একবার স্বচক্ষে দেখিয়া আসিব, আমাকে ভুলিয়া বিনোদিনী কেমন করিয়া আছে। ওঃ—"

"বেশ।"

কমলিনী অনেকক্ষণ মস্তক বিনত করিয়া চিন্তা করিলেন। পরে কহিলেন,—

"তবে যোগিন্ আমাদের বিদায় দাও।"

তাঁহার চক্ষে জল আসিল। গলদশ্রু-লোচনে আবার বলিলেন,—

"তোমার সহিত সদ্ভাব যেন চিরদিন থাকে। এই অনুরাগ যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হয়। তুমি যেন—"

আর কথা কমলিনী বলিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে সে প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন। যোগেন্দ্র ভাবিলেন, কমলিনী দেবী। আমার প্রতি তাঁহার কি অতুল ও অকৃত্রিম স্নেহ! কমলিনী চলিয়া গেলে মাধী যোগেন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বলিল,—

"জামাই বাবু দোষ অপরাধ নিও না; কি বল্‌তে কি বলেছি।"

যোগেন্দ্র যেন কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—

"আর সে কথা কেন? আমরাই বুঝিবার ভুল।"

"তবে আসি গা জামাই বাবু?"

"না, তুমি আর একটু থেকে যাও। তোমার দিদি ঠাকুরাণীকে যেতে বল। তুমি একটু পরে যেও।"

মাধী বাহিরে আসিল। দেখিল দিদি ঠাকুরাণী একটী গৃহ-প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরাইয়া রোদন করিতেছেন। কমলিনী রোদন করিতেছেন কেন?

"যে আগুণ জ্বালিলাম, কে জানে তাহা কোথায় গিয়া থামিবে? কে জানে অদৃষ্টে কি আছে? আমি তো চলিলাম—বিনোদিনীর মাথা যতদূর খাইতে পারা যায়, খাইলাম। কিন্তু তাহার দোষ কি? সে সরলা বালিকা, স্নেহ তাহার জীবন, ভালবাসা তাহার সর্ব্বস্ব, তাহাকে তো অসুখের সাগরে ভাসাইলাম। সে তো আমার পর নয়। যাহার প্রতি মমতা আপনি হয়, যাহাকে না ভাল বাসিয়া থাকা যায় না, তাহার প্রতি এ অত্যাচার কেন? আমি যে তাহার সর্ব্বনাশ করিতেছি, সে কি তা জানে? জানিলে—ওঃ—জানিলে ছিল ভাল। হায়! কেন এ পাপমতি হইল। এখন—এখন করি কি। জগদীশ্বর! না, এ পাপ হৃদয়ে, এ পাপকার্য্যে তোমার নামে কাজ নাই। জগদীশ্বরে কাজ নাই, তোমাকে ডাকিব না, তুমি এ কার্য্য দেখিও না। কি যাতনা! ওঃ কি করিব? তবে কি ফিরিব? অসম্ভব—এতদূর আসিয়া ফেরা অসম্ভব। সম্ভাবনা থাকিলেও কি ফিরিতে পারি? না—না—না। স্নেহ—ধর্ম্ম—সমাজ কিসের জন্য? আমি এ সুখের আশা ত্যাগ করিতে পারিব না। কি—কিন্তু ওঃ কি হইবে। যদি এ আগুণ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া সব ভস্ম করিয়া ফেলে! তবে? এত করিয়াও যদি আশা না মিটে! তবে? যদি—ওঃ—ওঃ এ চিন্তা আগে হয় নাই কেন? কি করি? না, তাহা হইবে না—তাহা হইতে দিব না—এ বাসনা সফল করিতেই হইবে?—ওঃ জগ—

আঃ—আবার কেন?—সে নাম আবার কেন? তবে কাহাকে ডাকিব? কে এ বিপদে আমার সহায় হইবে?”

কমলিনী এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রোদন করিতেছেন, এমন সময় মাধী তাঁহার সমীপস্থ হইয়া, একটু থাকিয়া যাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিল। কমলিনী তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন,—

“মাধি! আমায় এ মৃত্যু-যাতনা হইতে কর। আমার কি হইবে? আমি কি করিতে কি করিলাম? এ যাতনা সহে না আর মাধি!”

“এত দূর আসিয়া এ বিবেচনা মন্দ নয়।”

“যত দূর হইয়াছে সেই ভাল আর না।”

“যতদূর হইয়াছে তাহাতে তোমার সাধ মিটে কই? তবে তুমি নিরস্ত হও।”

কমলিনী ক্ষণেক চিন্তা করিলেন! তাঁহার উজ্জল চক্ষু দিয়া যেন অগ্নি বাহিরিতে লাগিল। কহিলেন,—

“নিরস্ত হইব? তুই কি পাগল? নিরস্ত হইব—জীবন থাকিতে? না—না—না। ঐ আশা—ঐ ধ্যান—ঐ জ্ঞান। জীবন মরণের সহিত ও বাসনার সম্বন্ধ।”

“তবে এখনও কল পাতিতে হইবে। এখনও ঠিক হয় নাই—আরও বুদ্ধি খরচ করিতে হইবে।”

তখন শোণিতপিপাসু ভৈরবীর ন্যায় চক্ষু বিকট করিয়া, উন্মাদিনীর ন্যায় বিকৃত স্বরে কমলিনী বলিলেন,—

“তাহাই কর—অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে—তাহাই কর। ডুবিয়াছি তো পাতাল কতদূর দেখিব; বিনোদ আমার শত্রু, তাহার হাড়ে হাড়ে আগুণ জ্বালাইয়া দেও—কিসের মায়া?”

আর কথা কমলিনী বলিলেন না, ব্যস্ততা সহ গাড়িতে আসিয়া উঠিলেন। মাধী গাড়ি পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আসিল। বলিল—

“তুমি যাও দিদি ঠাক্‌রুণ, আমি একটু পরে যাব।”

দ্বারবান্ কোচম্যানকে গাড়ি চালাইতে বলিল। গাড়ি ক্রমে অদৃশ্য হইল।

—*—

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ঃও

“——high winds
Began to rise: high passions anger, hate,
Mistrust, suspicion, discord; and shook sore
Their inward state of mind, calm region once
And full of peace, now tost and turbulent,
For understanding rul'd not, and the will
Heard not her lore.”

Paradise Lost.

মাধী আসিয়া দেখিল, যোগেন্দ্র বাবু এক খানি চেয়ারে বসিয়া আছেন। জিজ্ঞাসিল,—

“আমাকে কি বলিতেছেন?”

যোগেন্দ্র একটু হাসিয়া বলিলেন,—

“মাধি! বল্ দেখি সুখ কিসে হয়?”

মাধীও একটু হাসিয়া উত্তর দিল,—

“সুখ? অনেক টাকা কড়ি, ভাল ঘর বাড়ি যথেষ্ট সোণা রূপা থাকিলে সুখ হয়।”

“তোর কি কি আছে?”

“আমার? আমি গরিব মানুষ, আমার কি থাক্‌বে? এক খানি খড়ের ঘর, দুই এক খানা কুচো গয়না, আর দু দশ টাকা নগদ আছে। তোমাদের চরণ ধরে আছি, তোমরা মনে করলে সবই হয়।”

"কত টাকা হলে তোর পাকা বাড়ী হয়?"

"রামজান মিস্ত্রীকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে বলে, দেড় হাজার টাকা হ'লে কোঠা বাড়ী হয়। তা কোথায় পাব জামাই বাবু? সে সুখ আর এ ফেরায় হ'লো না।"

"তোরে আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তুই যদি তার ঠিক জবাব দিস্, তবে আমি তোর কোঠা করে দেই।"

"তা আর বল্‌বো না জামাই বাবু? কোঠা না করে দিলেই কি ঠিক কথা বল্‌বো না গা? সে কি কথা?"

মাধী মনে মনে ভাবিল, তার কপালটা পাতা চাপা। একটু জোর হাওয়া লেগে পাতাটা হঠাৎ সরে গিয়েছে। বড় দিদি বলেছেন, বড়মানুষ করে দেবেন; আর জামাই বাবু বল্‌ছেন কোঠা করে দেব। মন্দ নয়। জামাই বাবুও আমার কেহ নন, বড় দিদিও কেহ নন। আমার কোন রকমে কিছু হলেই হলো। তাঁহাদের যাহাই কেন হউক না—আমার তাহাতে কি? যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন,—

"আচ্ছা বিনোদিনী কেন আমাকে পত্র লেখে না, কেন আমার নাম করে না, বলিতে পারিস্?"

মাধী বলিল,—

"তা—তা—তা—আমি কি জানি?"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"মাধি! আমি সব বুঝিতে পারি। কেন যে বিনোদিনী এমন হইয়াছে তাহা তোমার দিদিও জানেন, তুমিও জান। তোমার দিদি, বিবেচনা কর, ভগ্নীর কথা বলিবেন কেন? কিন্তু তোমার বলিতে দোষ কি?"

মাধী মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল,—

"তা বাবু—তা কি বলিব?"

"যা জানিস্ তাই বল্। দেড় হাজার টাকার কোঠা হচ্ছে আর কি?"

"বড় ঘরের বড় [illegible]। জামাই বাবু। আমি [illegible]রিব,—"

"তোর [illegible] নাই—তুই বল্।"

"[illegible] শক্ত! না বাবু আমার কোঠায় [illegible] ই—তোমার [illegible] কাজ নাই।"

"না মাধি, বল্। আমি রাগ করিব না।"

"পোড়া লোকে কত কথা কয়—সব কি শুনতে হয়?"

"তোমার ছোট দিদির কথা—কি বলে বলো।"

"তা বাবু আমি বলিতে পারিব না। আমি যাই, বড় দিদি আবার রাগ করিবেন।"

মাধীর এইরূপ কৃত্রিম সংগোপন-চেষ্টায় যোগেন্দ্র নাথের সন্দেহ ও কৌতূহল চরম সীমায় উঠিল। তিনি তখন বলিলেন,—

"মাধি! তুই আমার নিকট যাহা চাহিবি, তোকে তাহাই দিব। তুই কি জানিস্ বল্।"

"না বাবু, আমি যাই—"

মাধী পা বাড়াইল। যোগেন্দ্র তখন অধীর হইয়াছেন। তিনি ব্যস্ততা সহ মাধীর সমীপস্থ হইয়া বলিলেন,—

"মাধি! তোর পায়ে পড়ি, তুই যাহা বলিবি তাই দিব, তোর কোন ভয় নাই, তুই বল্।"

তখন মাধী বলিল,—

"কি আর বলিব মাথা মুণ্ড? লোকে বলে ছোট দিদি—"

মাধী চুপ করিল। তখন যোগেন্দ্রনাথের শরীর কাঁপিতেছে; তিনি চক্ষু বিস্তৃত করিয়া মাধীর কথার শেষ অংশ শুনিবার নিমিত্ত

ব্যাকুল হইয়া আছেন। মাধী চুপ করিল দেখিয়া তিনি বলিলেন,—

"কি কি, লোকে কি বলে? বল, ভয় কি?"

"লোকে বলে ছোট দিদির স্বভাব ভাল নাই।"

কথা যোগেন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি প্রথমেই চমকিয়া উঠিলেন। সহসা সেই প্রকোষ্ঠে বজ্র পড়িলে, বা সহসা গলদেশে হলাহলধারী ভুজঙ্গম দেখিলেও যোগেন্দ্রনাথ তাদৃশ চমকিত হইতেন না। সেই শব্দ তাঁহার হৃৎপিণ্ড কাঁপাইয়া দিল। তাড়িত-প্রবাহের ন্যায় সেই কথা তাঁহার সমস্ত শিরায় প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিকম্পিত করিল—সংসার অন্ধকার দেখিলেন। বোধ হইল, যেন অনন্ত অন্ধকার-ময় শূন্যরাজ্যে তিনি রহিয়াছেন। বোধ হইল, তাঁহার দেহে শোণিত নাই, অস্থি নাই, মজ্জা নাই, চর্ম্ম নাই, কিছুই নাই; কিন্তু তিনি আছেন। তাহার পর সংজ্ঞা। সংজ্ঞার প্রথম চিহ্ন—যাতনা। সে যাতনা—তাহার তুলনা নাই। শত সহস্র বৃশ্চিক, শত সহস্র ভুজঙ্গম, এক-কালে দংশন করিলে, বা শত সহস্র শাণিত অসি সহসা শরীরে বিদ্ধ হইলে, সে যাতনার সমান হয় না। বহুক্ষণ পরে যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"তুমি যাও। আমার কথা হইয়াছে।"

মাধী চলিয়া গেল। কোঠার কথা বলিতে তাহার তখন সাহস হইল না। ভাবিল সময়ান্তরে সে প্রস্তাব করা যাইবে। কি মনে হইল, যোগেন্দ্র উঠিয়া আবার চীৎকার করিতে লাগিলেন,—

"মাধি মাধি!

মাধী আবার আসিল।

যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন,—

"তাঁহার দোষের প্রমাণ দেখাইতে পার?"

"তা বাবু-চেষ্টা করে দেখিলে বলা যায়। কেমন করিয়া বলি?"

"কে এই কুলটার হৃদয়বল্লভ জান?"

"কি জানি বাবু?" লোকে বলে, হ-গোবিন্দ বাবু, মাষ্টার মহাশয়।"

যোগেন্দ্র, বক্ষের উপর হস্ত, তাহার উপর আর এক হস্ত দিয়া উন্মাদের ন্যায় সেই গৃহের চতুর্দ্দিকে অনেকক্ষণ ঘুরিলেন। মাধী সভয়ে দেখিল, তাঁহার লোচন-যুগল রক্তবর্ণ, পল্লব-শূন্য, তাঁহার মূর্ত্তি চিত্রিত পটের ন্যায়। ভাবিল কি সর্ব্বনাশ! বলিল,—

"আমি চলিলাম জামাই বাবু।"

যোগেন্দ্র কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার তখন কথা কহিবার শক্তি নাই, হৃদয়ে হৃদয় নাই। মাধী চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। যোগেন্দ্র সেই-রূপ ভাবেই রহিয়াছেন। সাধু আসিয়া একটী সেজ জ্বালিয়া দিয়া গেল। আলোক দর্শনে যোগেন্দ্রের মনে বাহ্য জগতের অস্তিত্বের উপ-লব্ধি হইল। তখন তিনি গৃহ মধ্যস্থ পর্য্যঙ্কে অধোবদনে শয়ন করিলেন—নিদ্রার জন্য নহে, আরামের জন্য নহে, অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত যদি হৃদয় একটুও শান্ত হয়, সেই প্রত্যাশায়। ভ্রান্ত! শান্তি আর তোমার নিকট আসিবে না। তুমি যে চক্রে নিবদ্ধ হইয়া আবর্ত্তিত হইতেছ, কে জানে, আহা কোথায় গিয়া থামিবে। এ জগৎ সুখের স্থান নহে। ইহা পাপ, তাপ, দুষ্প্রবৃত্তি ও যাতনার আকর। কেন বৃথা শান্তির অন্বেষণ করিতেছ? এ জীবনে সে আশা করিও না। ভাঙ্গিতে সকলেই পারে, কিন্তু হায়! গঠন করা মানব-সাধ্যের অতীত। সুতরাং যোগেন্দ্র! যাহা গিয়াছে তাহা আর আসিবে

না, তাহা আর হইবে না। তবে কেন ভাই কষ্ট পাও? এ কথা কে বুঝে? যোগেন্দ্র সেইরূপ শয়ন করিয়া আছেন। সাধু আসিয়া জিজ্ঞাসিল,—

'রাত্রে কি আহার হইবে?"

উত্তর,—

"কিছুই না।"

ক্রমে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইল। কলিকাতা নিস্তব্ধ, জীবনের চিহ্ন যেন নগরী হইতে বিদূরিত হইয়াছে। মৃত্যু আসিয়া যেন সমস্ত নগরীকে গ্রাস করিয়াছে বোধ হইতে লাগিল। দূরস্থিত কল সকলের বিকট শব্দ যেন সেই বোধের আরও সহায়তা করিতে লাগিল। যোগেন্দ্র শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। কি করিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। সামান্য পরিবর্ত্তনেও হয়ত চিত্ত একটু স্থির হইবে ভাবিয়া, যোগেন্দ্র পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেই প্রকোষ্ঠে এক খানি টেবেল। সেই টেবিলের উপর একটী আলোক জ্বলিতেছে ও কতকগুলি পুস্তক বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে! প্রকোষ্ঠের চতুর্দ্দিকে ভিত্তিসমীপে চারিটী আলমারি। তাহার একটীতে কতকগুলি ঔষধ; একটীতে কতকগুলি চিকিৎসকের অস্ত্র ও যন্ত্র, একটা বাক্স প্রভৃতি এবং অপর দুইটা নানাবিধ পুস্তকে পরিপূর্ণ। টেবিলের এক দিকে এক খানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠফলকের উপর একটী মানবকঙ্কাল দাঁড়াইয়া জগতের নশ্বরতার সাক্ষ দিতেছে, মৃত্যুর পরাক্রমকে উপহাস করিতেছে এবং মানবের অবস্থাকে বিদ্রূপ করিতেছে। টেবিলের অপর তিন দিকে তিন খানি চেয়ার পড়িয়া আছে। যোগেন্দ্র একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। দুই হস্ত দিয়া মস্তকের চুলগুলা একবার আন্দোলন করিলেন। দীর্ঘ নিশ্বাস সহ বলিয়া উঠিলেন, 'ওঃ'। একে একে গৃহ মধ্যস্থ সমস্ত দ্রব্যের প্রতি চাহিতে লাগিলেন—যদি কোন দ্রব্য ক্ষণেকের নিমিত্তও তাঁহার নেত্রকে শান্তি দিতে পারে—তাঁহার মনকে ভুলাইতে পারে। কোথাও তাহা হইল না। অবশেষে তাঁহার চক্ষু সেই সংজ্ঞাশূন্য, চেতনাহীন, শূন্যগর্ভ মানব-কঙ্কালের প্রতি স্থির ভাবে চাহিল। তিনি তখন উন্মাদের ন্যায় বিকৃত স্বরে কহিলেন,—

"কঙ্কাল! এ জগতে তুমিই সুখী! তোমার অবস্থা এক্ষণে আমার প্রার্থনীয়। তোমার অভিজ্ঞতা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তুমি জগতের কি না দেখিয়াছ? যে জগতে পাপ, তাপ, কপটতা বাস করে, সেই জগতে ভুগিয়া সে সকল পদদলিত করিতে শিখিয়াছ। বলিয়া দেও, হে দেব, হে প্রভো! বলিয়া দেও, আমি কি উপায়ে, কি কৌশলে, এই যাতনাসমুদ্র পার হইতে পারি। তুমি যাহাকে তোমার আত্মার আত্মা জানিয়া ভাল বাসিয়াছ, সে হয়তো ধীরে ধীরে অলক্ষিত ভাবে তোমার হৃদয়ে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। বল সর্ব্বজ্ঞ! তুমি কি উপায়ে সে যাতনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া এ জগতে বাস করিয়াছিলে? অথবা হে ভাগ্যবন্! হয়তো তোমার সুপ্রসন্ন অদৃষ্টে এ যম-যন্ত্রণা দেখা দেয় নাই। তবে হে মহান্! বলিয়া দেও, কি করিলে এ সংসারে ঐ সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। বল বন্ধো! তুমি এ জগতে রমণীর অপেক্ষা কোন অধিকতর ঘৃণিত জীব দেখিয়াছিলে কি না? হে সর্ব্বদর্শিন্! জগতে নারী অপেক্ষা অধিকতর কালকুটময় পদার্থ দেখিয়াছিলে কি? রমণী-প্রেমের ন্যায় অসার—ক্ষণস্থায়ী আর কোন পদার্থ এ জগতে আছে কি? হে নির্ব্বাক্! একবার—তোমার চরণে ধরি, একবার এই বিপন্ন মানবের ক্লেশ

নিবারনার্থ দুই একটা উপদেশ দেও। বলিয়া দেও, মরণে কি সুখ? বল, মরিলে কি হয়? যদি কিছুই না বল, হে সুহৃদ্! আমাকে তোমার সহচর কর; আমাকে তোমার অবস্থায় লইয়া যাও। হে প্রেত! হে ভয়ানক! হে অবশেষ! আমি আজি তোমার অবস্থায় উপস্থিত হইয়া সংসারকে উপেক্ষা করিতে বাসনা করি, তোমার মত রূপান্তর গ্রহণ করিয়া মানবহৃদয়ের দুর্ব্বলতা ও কাতরতা দেখিয়া হাসিতে অভিলাষ করি, তোমার মত সম্পর্কশূন্য সামগ্রী হইয়া নিস্তব্ধ ভাবে, অবিলিপ্ত অবস্থায় মানব-মনের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে নিতান্ত সাধ করি। হে অতীত! আমাকে তোমার অবস্থায় যাইবার উপায় বলিয়া দেও, আমাকে তোমার সঙ্গী করিয়া লও।"

বলিতে বলিতে যোগেন্দ্র চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া কঙ্কালসন্নিধানে গমন করিলেন। বলিলেন,—

"বল নির্দ্দয়! আমাকে তোমার সঙ্গী হইবার উপায় বল। তোমার হস্ত ধারণ করিয়া অনুরোধ করি, আমাকে মরণের উপায় বলিয়া দেও।"

যোগেন্দ্র ব্যগ্রতার সহিত কঙ্কালের হস্ত ধারণ করিলেন, কঙ্কাল খট্ খট্ শব্দ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সেই শব্দে যোগেন্দ্রের চৈতন্য হইল। তিনি হতাশ ভাবে পুনরায় আসিয়া চেয়ারে পড়িলেন।

সূর্য্যদেব ক্রমশঃ পূর্ব্বাকাশের নিম্নভাগে দেখা দিলেন। উষার সম্মোহন সমীরণ জগতকে নূতন জীবন দিতে আসিল এমন সময় এক ব্যক্তি ব্যস্ততা সহ সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সে ব্যক্তি সুরেশ।

যোগেন্দ্র ব্যস্ততা সহ তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—

"ভাই! তোমার কথাই সত্য—স্ত্রীলোকই সকল সর্ব্বনাশের মূল।"

সুরেশ যোগেন্দ্রের মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—

"উঃ!!!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রেমের পুরস্কার।

Out, out Hyaena! these are thy wonted arts,
And arts of every woman are false like thee,
To break all faith, all vows deceive, betray-,

Samson and Agonistes.

এক দিন, দুই দিন, তিন দিন করিয়া পনের দিবস অতীত হইল, বিনোদিনী সেই দুঃখের পাথারে ভাসিতেছেন। কমলিনী আসিয়াছেন, মাধী আসিয়াছে। তাহাদের কথায় সরল-হৃদয়া বিনোদিনীর হৃদয় একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা যেরূপ অকাট্য প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া যোগেন্দ্রনাথের চরিত্রের কলঙ্ক প্রতিপন্ন করিয়াছে, কাহার সাধ্য আর তাহা না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারে? যে, বিনোদিনী যোগেন্দ্রনাথকে অপ্রাকৃত মানব বলিয়া জানেন, তিনিও এখন বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার যোগেন্দ্র আর তাঁহার নাই। ইহার অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে?

অদ্য যোগেন্দ্র বাটী আসিয়াছেন। তাহাতে বিনোদের কি? তিনি ত এখন বিনোদের কেহ নহেন— তিনি এখন পরের ধন। যোগেন্দ্র বাটী আসিয়াছেন, কিন্তু পুর-মধ্যে প্রবেশ করেন নাই! পুরমধ্যে তাঁহার কে আছে? কাহাকে তিনি পুরমধ্যে দেখিতে যাইবেন? কেন বিনোদ? ওঃ—যোগেন্দ্রের সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে—তাঁহার কোমল কুসুমে এখন ভুজগ বাস করিয়াছে—তাঁহার চন্দনতরু এখন বিষবৃক্ষ হইয়াছে। তবে কেন?

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বিনোদিনী মলিন বেশে ভূশয্যায় শুইয়া কাঁদিতেছেন। ভাবিতেছেন—জগতে কি বিচার নাই? কি দোষে—হে গুণধাম! কি দোষে আমায় এত শাস্তি দিতেছ? কবে কোন্ দোষে এ অভাগিনী তোমার চরণে অপরাধিনী? অপ-রাধ যদি হইয়া থাকে—একবার আমায় মার্জ্জনা কর—একবার আমায় বলিয়া দেও, আমি সাবধান হই। আমি জানি হৃদয়েশ! তোমার ন্যায় ন্যায়বান্ ব্যক্তি এ জগতে আর নাই। কিন্তু নাথ! আমার পোড়াকপালের দোষে তোমার সে অতুল ন্যায়পরতা এখন কোথায় গেল? আমি বেশ জানি যে, এ দাসী তোমার চরণ-ধূলিরও যোগ্যা নহে। তোমার মনোরঞ্জন করা কি এ মন্দভাগিনীর সাধ্য? তুমি এই ক্ষুদ্র সেবিকাকে পরিত্যাগ করিয়াছ—ভালই করিয়াছ। যদিও তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া বাঁচা আমার সম্ভব হয়, কিন্তু তোমাকে কলঙ্কিত দেখিয়া আমি কোন্ প্রাণে বাঁচিব? তোমার কথা লোকে হাসিতে হাসিতে আন্দোলন করিবে, তাহা কেমন করিয়া সহিব? তুমি যোগেন্দ্রনাথ, তুমি আমার হৃদয়-রত্ন, তুমি স্বর্গের দেবতা, তুমি সততার আদর্শ, সেই তুমি আজ পতিত, ভ্রষ্ট, সামান্য ব্যক্তির ন্যায় ইন্দ্রিয়াসক্ত। তোমার এই কলঙ্ক– হে হৃদয়-নাথ! তোমার এই ভয়ানক অধঃপতন দেখিয়াও কি অভাগিনীর বাঁচিতে হইবে?"

তখন সেই পতিগত-প্রাণা, বিশুদ্ধ-হৃদয়া বিনোদিনী মুখ লুকাইয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল। কাঁদিয়া বলিল,—

"আমার নামও ত তোমার হৃদয়ে আর নাই, কিন্তু তুমিত আমার হৃদয়ের দেবতা। তুমি আমার মুখ না দেখ না দেখিবে, কিন্তু তুমি একবার বাটীর ভিতরে আইস, আমি অন্তরাল হইতে তোমার হৃদয়হারী মুখ খানি একবার দেখি।"

বিনোদিনী যখন ভূ-শয্যায় শয়ন করিয়া এইরূপ রোদন করিতে করিতে অশ্রুধারায় ধরণী সিক্ত করিতেছেন, সেই সময়ে সেই প্রকোষ্ঠে হরগোবিন্দ বাবু প্রবেশ করিলেন। তখন রাত্রি প্রায় দশটা। হরগোবিন্দ বাবু আসিয়া বলিলেন, "বাছা! এত কাঁদিলে কি হইবে?"

বিনোদিনী ব্যস্ততা সহ উঠিয়া বলিলেন,— "কি করিলেন?"

"এখনও কিছু হয় নাই।"

তখন বিনোদিনী বিষণ্ণভাবে বলিলেন,— "তবে আমার কাঁদা ভিন্ন কি গতি?"

"বাছা! কাঁদিলেই তো ফল হয় না। কাঁদিবার সময় আছে—এখন পরামর্শের প্রয়োজন।"

"আমি আপনাকে কি পরামর্শ দিব?"

"আর কাহার নিকট, তবে এ গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া পরামর্শ চাহিব? তুমিই পরামর্শ দিবে। আমি যোগেন্দ্র আসার খানিক পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিয়া-ছিলাম, কিন্তু তিনি শরীর খারাপ ওজর করিয়া আমার সহিত দেখা করিলেন না! যোগেন্দ্র

শরীর খারাপ বলিয়া আমার সহিত দেখা করিলেন না, ইহাতে আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি! আমার বোধ হয়, যোগেন্দ্র সংসারের উপর কিছু বিরক্ত হইয়াছেন, সেই জন্যই হয়তো যাহারা পরম আত্মীয় তাহাদিগেরও সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন না।"

"তবে এখন কি করিবেন?"

"কল্য যেমন করিয়া হউক যোগেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিব।'

"তাহার পর।"

"তাহার পর তাহাকে কাণ ধরিয়া তোমার নিকট আনিয়া দিব। যোগেন্দ্র কখন মন্দ হইতে পারে না। আমি দেখিলেও তাহা বিশ্বাস করি না। তাহার মনের মধ্যে নিশ্চয় একটা গোল হইয়াছে। সেটা আমি, তাহার সহিত একটা কথা কহিলেই বুঝিতে পারিব এবং তখনই সব কলহ মিটাইয়া দিব।

আশা আনন্দ ও যন্ত্রণা সম্মিলিত হইয়া বিনোদিনীর হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব করিল।

তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে মাষ্টার মহাশয়ের পদপ্রান্তে পড়িয়া কহিলেন,—

সে আপনার গুণ। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে আপনি আমাকে আবার জীবন দিবেন। আপনি আমায় রক্ষা করুন। এ কষ্ট আমি আর সহিতে পারি না।"

হরগোবিন্দ বাবু বিনোদিনীর হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন,—

"মা! এত কাতর হইও না। এ সংসারে আমার স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, কন্যা নাই। তুমি আমার সন্তানের অপেক্ষাও অধিক। বাছা! তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমি বড়ই কষ্ট পাই। শান্ত হও! ভয় কি মা?"

এই বলিয়া হরগোবিন্দ বাবু বিনোদিনীর বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা তাঁহার নেত্র মার্জ্জনা করিয়া দিতে লাগিলেন।

যখন গৃহাভ্যন্তরে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখন একটী মনুষ্য বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া সার্সির মধ্য দিয়া সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। তিনি গৃহাভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিদ্বয়ের কার্য্য সমস্তই দেখিতেছিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের কথোপকথনের এক বর্ণও শুনিতে পাইতেছিলেন না। সেই ব্যক্তি যোগেন্দ্র। যোগেন্দ্র দন্তে দন্তে নিপীড়ন করিতে করিতে ভাবিলেন,—

"আর কেন? যথেষ্ট!"

হরগোবিন্দ বাবু বলিলেন,—

"এখন তবে আসি মা? কালি প্রাতে আমি তোমায় সুসংবাদ আনিয়া দিব।"

হরগোবিন্দ প্রস্থান করিলেন। বিনোদিনী ধীরে ধীরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বিনোদ যখন সিঁড়ির নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন দূর হইতে দেখিলেন, যোগেন্দ্র আসিতেছেন। আহ্লাদে হৃদয় উৎফুল্ল হইল। ভাবিলেন,"একবার উহাঁর চরণ ধরিয়া কাঁদিব।"এই ভাবিয়া বিনোদ সিঁড়ির রেল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। যোগেন্দ্র নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, বিনোদিনী। তাঁহার শরীর কাঁপিয়া উঠিল, হৃদয় বিচলিত হইল এবং বদনে দারুণ ক্রোধের চিহ্ন প্রকটিত হইল। বিনোদ তখন আহ্লাদে শোকে, আশায় এবং নৈরাশ্যে অবসন্না। তিনি সংজ্ঞাহীনার ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে "হৃদয়েশ" বলিয়া যোগেন্দ্রের পাদমূলে পড়িয়া গেলেন।

তখন যোগেন্দ্র

"যাও—দূর হও—! তুমি আমার কেহ নও—আমিও তোমার কেহ নহি!"

বলিয়া সজোরে বিনোদিনীকে পদাঘাত করিয়া চলিয়া গেলেন। বিনোদিনী মূর্চ্ছিতা সেই স্থানেই পড়িয়া রহিলেন। যখন মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, তখন বিনোদিনী কপালে করবিন্যাস করিয়া কহিলেন,—

"এখন মরণের উপায় কি?"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সাহস।

"Hence vain deluding Joys,
The brood of folly without father bred,
How little you bested.
Or fill the fixed mind with all your toys;
Dwell in some idle brain
And fancies fond with gaudy shapes possess
As thick and numberless
As the gay motes that people the sun beams
Or likest hovering dreams,
The fickle pensioners of Morpheus'train."
H Penaeroso.

রাত্রি ১টা বাজিয়াছে। যোগেন্দ্রনাথ শয়ন করেন নাই—নিদ্রার ইচ্ছাও হয় নাই, গৃহ মধ্যে পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছেন। সেই গৃহ মধ্যে একটি উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে; সেই আলোকে যোগেন্দ্রের ছায়া এক বার গৃহের পূর্ব্ব ভিত্তিতে আর একবার পশ্চিম ভিত্তিতে অঙ্কিত করিতেছে। তাঁহার চিত্তের অবস্থা ভয়ানক, সংকল্প-শূন্য, উন্মাদের ন্যা অব্যবস্থিত! যখন মন উত্তাল ভাবসাগরে ভাসিতে থাকে, তখন কি স্থির সংকল্পের উপকূল প্রাপ্ত হওয়া যায়? সে এটু শান্তিসাপেক্ষ। এখন সে শান্তি কোথায়? রাত্রিতে যোগেন্দ্র আহার করেন নাই। বারণ করিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহাকে কেহ কোন কথা না বলে, বা কেহই তাঁহার সহিত দেখা করিতে না আইসে। তাঁহার ভয়ে কেহই তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সাহস করে নাই।

অন্তঃপুর মধ্যে একটি ক্ষুদ্রকায়া কামিনী একটি গৃহ মধ্যে বসিয়া নীরবে রোদন করিতেছেন। সে কামিনী বিনোদিনী। সেই গৃহে একটি ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছে। সেই আলোক-সম্মুখে মর্ম্মপীড়িতা সরল-স্বভাবা বিনোদিনী বসিয়া বস্ত্রমধ্যে মুখ লুকাইয়া রোদন করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে একজন ঝি ঘুমাইতেছে। বিনোদ ভাবিতেছেন,—"আর কি জন্য এ প্রাণ? যাঁহার জন্য আমি, তিনি যদি আর আমাকে না চাহেন, তবে আমাতে প্রয়োজন? হে দীনবন্ধো! এই ক্ষুদ্র রমণীকে কেন এই অতুল প্রেমার্ণবে ডুবাইয়াছিলে? এত রত্ন প্রবাল আমি দেখিলাম কিন্তু কিছুই লইতে পারিলাম না তো। হে প্রভো! কেন আমাকে এই অতুল ভাণ্ডার দেখাইলে? যদি দেখাইলে কেন আমাকে তাহা ভোগ করিতে দিলে না? কেন আমাকে সেখানে থাকিতে দিলে না—কেন আমাকে তখনই দূর হইয়া যাইতে আজ্ঞা দিলে না—কেন দয়াময়! আমাকে এ লোভে মজাইলে—কেন আমার হৃদয়ে এ অগ্নি জ্বালিলে? যদি জানিতে যে আমাকে ইহা ভোগ করিতে দিবে না—আমাকে এখানে থাকিতে দিবে না,—তবে কেন আমাকে ইহা দেখাইলে? আমি ক্ষণেক

মাত্র—অনাথনাথ! এই রত্ন কণ্ঠে ধারণ করিয়াছি, এখনও তাহার উজ্জ্বল জ্যোতিতে আমার নয়ন মন অস্থির রহিয়াছে—আমি এখনও তাহার প্রতি ভাল করিয়া চাহিতে পারি নাই, ইহার মধ্যে—হে জগদীশ! কেন তাহা আমার কণ্ঠ হইতে কাড়িয়া লইতেছ?"

তখন বিনোদিনী আবার কাঁদিতে লাগিলেন। আবার বস্ত্রে বদন আবৃত করিলেন। বহুক্ষণ পরে আবার ভাবিলেন,—

"দয়াময়! যাহা ভাল বুঝিলে তাহা তো করিলে, এক্ষণে এই কর, কালি যেন আমি নির্ব্বিঘ্নে এ পৃথিবী হইতে প্রস্থান করিতে পারি—কালি যেন এ অভাগিনীর মুখ লোকে না দেখে।"

বিনোদিনী আবার ভাবিতে লাগিলেন,—

"মরিবই তো স্থির, কিন্তু আর একবার—মৃত্যুর পূর্ব্বে আর একবার তাঁহাকে দেখিতে পাইব না—তাঁহার কথা শুনিতে পাইব না?"

কিয়ৎকাল পরে বিনোদিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড় ধীরে ধীরে ডাকিলেন,—

"গুণো!—গুণো।"

গুণো তখন অকাতরে ঘুমাইতেছিল—উত্তর পাওয়া গেল না। তাহার পরে বিনোদিনী ধীরে ধীরে দ্বারের নিকট আসিয়া ধীরে ধীরে দ্বার খুলিলেন। ক্ষণেক বিহ্বলার ন্যায় দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর স্থির করিলেন,—

"ভয় কেন? তিনতো আমায় দেখিতে পাইবেন না, তাঁহাকে আমি দেখিব বইত না—তবে ভয় কি?"

ধীরে ধীরে বিনোদিনী গৃহের বাহিরে আসিলেন। একটী, দুইটী, তিনটী করিয়া গৃহ পার হইয়া ক্রমে প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। যে গৃহে যোগেন্দ্র অবস্থান করিতেছিলেন, তাহার আলোক বাতায়ন ভেদ করিয়া বিনোদিনীর নেত্রে আসিয়া লাগিল! তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন। ক্ষণেক গমনের শক্তি তিরোহিত হইয়া গেল। দুঃখিনী বিনোদিনী তখন সেই ধূলিময় প্রাঙ্গণে বসিয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, "হৃদয়েশ! সেই তুমি সেই আমি, কিন্তু আজি আমরা পর হইতেও পর। যে তোমার নাম শুনিলে নাচিয়া উঠিত, আজি সে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভয়ে অবসন্ন হইতেছে। ভয় কি অপমানের জন্য—ভয় কি অনাদরের জন্য? তাহা নহে নাথ! তোমার নিকট আমার মান নাই, অপমান নাই, অনাদর নাই—তোমার সন্তোষই আমার জীবনের ব্রত। ভয়—পাছে তুমি আমাকে দেখিতে পাও, দেখিলে তোমার সন্তোষ জন্মিবে না তো! আমি তো আর তোমার সে আনন্দ-প্রদীপ নহি। আমি এক্ষণে—তোমার ক্লেশের কারণ। সেই জন্যইতো প্রাণনাথ! সঙ্কল্প করিয়াছি, এজীবন রাখিব না। আমার জীবনের ব্রত সমাপ্ত হইয়াছে, আর কেন?"

আবার বিনোদিনী দাঁড়াইলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে সাহসে ভর দিয়া অগ্রসর হইলেন। ক্রমে বারান্দায় উঠিলেন। আর এক পদ বাড়াইলে, বাতায়ন দিয়া যোগেন্দ্রকে দেখা যায়। ভাবিলেন,—

"যাহাকে হৃদয়ের উপর রাখিয়াও পলকে পলকে হারাইতাম, আজি তাঁহার সহিত এই সম্বন্ধ? তাঁহাকে আজি চোরের ন্যায় দেখিতে আসিতেছি।"

সাহসে ভর করিয়া বিনোদিনী আর এক পদ বাড়াইলেন। বাতায়নের ফাঁক দিয়া গৃহমধ্যে নেত্রপাত করিলেন। দেখিলেন, সেই হৃদয়হারী মূর্ত্তি—সেই যোগেন্দ্র। তখন বিনো-

দিনীর সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি সেই বাতায়ন ধরিয়া সেই খানে বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া থাকাও অসম্ভব হইল—বিনোদিনী সেই ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। বহুক্ষণ পরে মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত স্থির হইলে, মনে মনে বলিলেন,—

"এই দেখাই শেষ। আর তোমার সহিত ইহজন্মে সাক্ষাৎ হইবে না। মরণ এক্ষণে আমার পক্ষে দুঃখের বিষয় নহে। তবে দুঃখ এই হৃদয়নাথ! এ অন্তিমে তোমার সহিত একটা কথা কহিয়া প্রাণ জুড়াইতে পারিলাম না তাহা তো হইবে না; যাহাতে তুমি অসুখী হও তাহা তো করিব না। প্রাণেশ্বর! তোমার চরণে যেন জন্মজন্মান্তরে স্থান পাই।"

আবার বিনোদিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আবার সেই বাতায়ন দিয়া প্রকোষ্ঠমধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন; আবার দেখিলেন সেই যোগেন্দ্র—তাঁহার সেই যোগেন্দ্র। মনে মনে ভাবিলেন,—

"ভগবান্ এ অতুলনীয় রত্ন তোমারই সৃষ্ট! কে বলিবে তুমি নির্দ্দয়? এক দিনও তো এই রত্ন আমার ছিল, ইহাই কি সামান্য সৌভাগ্য! ইচ্ছাময়! এ জীবনে দুঃখিনীর সমস্ত সাধই তো ফুরাইল! যেন জন্মজন্মান্তরে ঐ চরণে আমার স্থান হয়। অগতির গতি! তোমার চরণে মন্দভাগিনীর এই শেষ প্রার্থনা।"

এই সময়ে একবার যোগেন্দ্রনাথ চিত্তের অস্থিরতা হেতু শান্তির অন্বেষণে বাহিরের বারান্দায় আসিলেন। বিনোদিনী যে স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন, বারান্দার প্রান্তভাগে আসিলে সে স্থান দেখা যায়। একবার বিনোদিনী ভাবিলেন, "একবার—এই অন্তিমে একবার—চরণে পড়ি, একটা কথা কহি।" আবার ভাবিলেন, "ও হৃদয়ে তো আমার নামও নাই, তবে কেন উহাঁকে ত্যক্ত করিব? উনি ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি; আমাকে দেখিলে উহাঁর কেবল কষ্ট! এ জীবনে উহাঁকে কষ্ট দিব না।" আবার ভাবিলেন, "যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ কেন এই খানেই বসিয়া থাকি না; এ সুখ ছাড়ি কেন?" আবার ভাবিলেন "যদি উনি এ দিকে আইসেন তবে তো আমাকে দেখিতে পাইবেন! না—লোভ ত্যাগ করাই ভাল।"

তখন বিনোদিনী করযোড়ে ঊর্দ্ধনেত্রে মনে মনে কহিলেন,—

"হে অনাথনাথ! হে ইচ্ছাময়! আমার জীবলীলা তো সাঙ্গ হইতে চলিল; আমার সুখদুঃখ তো অচিরে ফুরাইবে। কিন্তু দয়াময়! ঐ ব্যক্তি দুঃখিনীর ঐ সর্ব্বস্বধন, অভাগিনীর ঐ জীবনসর্ব্বস্ব, উহাঁর চরণে যেন কুশাঙ্কুরও না বিঁধে, উহাঁকে যেন একবারও দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিতে হয়, উহাঁর সুখ যেন অব্যাহত থাকে। যে দুঃখিনী এখনই তোমার শান্তিময় চরণে আশ্রয় লইবে তাহার প্রার্থনা, হে জগদীশ! অবহেলা করিও না।"

তাহার পর যোগেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কহিলেন—

"হৃদয়েশ! সুখে থাক; কখন এ অভাগীর নাম মনে করিয়া অনুতাপ করিও না। আমি নিজ কর্ম্মোচিত ফল ভোগ করিতেছি, তাহাতে তোমার দোষ কি? জন্মান্তরে চরণে স্থান দিও।

এই সময়ে যোগেন্দ্রনাথ আবার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে আবার দেখিয়া বিনোদিনী মনে করিলেন,—

ভ্রান্ত মন! ও মূর্ত্তি দেখিয়া কি দেখার সাধ মিটাইতে পারবি? তবে কেন? আর না।"

তখন অবিরল অশ্রু-জলের স্রোতে বিনোদিনীর বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি পাগলিনীর ন্যায় বেগে সেদিক হইতে ফিরিলেন এবং পাগলিনীর ন্যায় অস্থিরতা সহ চলিতে লাগিলেন। আবার সেই প্রাঙ্গণের মধ্যে উপস্থিত হইলেন, তখন আবার ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, সেই পথ দিয়া সেই আলোক! তখন বিনোদিনী ধৈর্য্য হারাইয়া, মর্ম্ম-বিদারক স্বরে বলিলেন,—

ভগবন্!"

কথাটা যোগেন্দ্রের কাণে গেল। তাহা যে চির-পরিচিত বিনোদের কণ্ঠস্বর তাহা তিনি বুঝিলেন। কিন্তু ভাবিয়া সেই দিকের জানালার নিকটস্থ হইলেন, কিন্তু তখন বিনোদিনী প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সুতরাং যোগেন্দ্র কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি ভাবিলেন, সকলই তাঁহার অস্থির মনের উদ্ভাবনা। তিনি সে দিক হইতে ফিরিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাখ্যান।

"My love how could'st that hope—"
Samson and Agonistes.

যোগেন্দ্রনাথ অস্থির! কি করিবেন—কি করিলে এ গুরু যাতনার উপশম হইবে, কি করিলে এ অসীম চিত্তবেগ শান্ত হয়, কি উপায়ে এ দারুণ বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ হয়, তাহা তাঁহাকে কে বলিয়া দিবে? কে এমন চিকিৎসক আছে যে, এই সকল দুর্দ্দমনীয় ব্যাধির ঔষধ ব্যবস্থা করিতে পারে? আমরা জানি মৃত্যুই এ প্রকার ব্যাধির এক মাত্র চিকিৎসক। যোগেন্দ্র এ যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের নিমিত্ত কি উপায় স্থির করিতেছেন তাহা আমরা জানি না; কিন্তু ইহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে চিতার অনল ভিন্ন অন্য কোথাও ইহার প্রকৃত শান্তি নাই। যে প্রতারণা-সাগরে তিনি ডুবিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার উঠিবার ক্ষমতা নাই; প্রকৃত ঘটনার আলোকে হৃদয়স্থ অবিশ্বাস-অন্ধকার দূর হইবার আর সম্ভাবনা নাই; যে উচ্চে তিনি উঠিয়াছেন তাহা হইতে আর তাঁহার নামিবার শক্তি নাই—সুতরাং যতক্ষণ তাঁহার দেহে শোণিত-প্রবাহ থাকিবে, ততক্ষণ তাঁহার যন্ত্রণার সীমা নাই। তুমি, মৃত্যু ভিন্ন এরূপ দুর্ভাগ্য ব্যক্তিকে আর কি সৎপরামর্শ দিতে পার? দুইটী "বিষকুম্ভ পয়োমুখ" রমণী, স্বার্থ-সিদ্ধির বাসনায়, তাঁহার শরীরের প্রত্যেক স্থানে সুকৌশলে ও অলক্ষিত ভাবে বিষ ঢালিয়া দিয়াছে; তাঁহার জীবনকে গরলধারী ভুজঙ্গ অপেক্ষাও ভয়ানক বলিয়া প্রমাণ করাইয়াছে; তাঁহার আনন্দময়ী প্রকৃতি, শান্তিময় স্বভাব ও প্রেমময় জীবন সকলই ক্রোধ, অবিশ্বাস, ও ঘৃণার মাদকতায় বিকৃত করিয়াছে; তাঁহার হাস্যময় বদনে শোকের গুরুভার চাপাইয়াছে, তাঁহার প্রফুল্ল ললাটক্ষেত্রে চিন্তার অঙ্কপাত করাইয়াছে, তাঁহার প্রশান্ত নয়ন শোণিত-লিপ্সু জীবের ন্যায় উগ্র করিয়া তুলিয়াছে এবং সর্ব্বোপরি, তাঁহার চিরসহায় জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে দুষ্ট বুদ্ধির অধীন করিয়াছে। তবে তাঁহার আছে কি? কি সুখে তাঁহার জীবন? তুমি আমাকে নিষ্ঠুর বলিলেও, আমি বলিব, যোগেন্দ্রনাথের এ ভারভূত জীবন বহন করা অপেক্ষা মরণ

অবশ্য শ্রেয়ঃ। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ হয় তো তাহা ভাবিতেছেন না। তিনি হয় তো ভাবিতেছেন, অগ্রে বিশ্বাসঘাতিনীর দণ্ড—পরে মরণ।

রাত্রি ৩টা বাজিয়া গিয়াছে, বসুন্ধরা নিস্তব্ধা; নিদ্রার শক্তি প্রভাবে বাহ্য ও অন্ত জগৎ স্থির। কিন্তু যোগেন্দ্রের পক্ষে অন্যরূপ; তিনি এখনও জাগরিত। যোগেন্দ্র সেই গৃহ মধ্যস্থ শয্যায় পড়িয়া আছেন। শয্যার শরণাপন্ন হইয়াছেন—নিদ্রার আশায় নহে। যদি ক্ষণেকও চিত্তের শান্তি হয়! কোথায় শান্তি? শান্তি তাঁহার নিকট আসিল না। যোগেন্দ্র শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং পার্শ্বস্থ আলমারি খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে একখানি ছোরা বাহির করিলেন। যে টেবিলে আলোক জ্বলিতেছিল, তাহার পার্শ্বে এক খানি চেয়ার পড়িয়াছিল, সেই চেয়ারে সেই ছোরা হস্তে উপবেশন করিলেন। ব্যস্ততা সহ আবরণ মধ্য হইতে ছোরা বাহির করিলেন। উজ্জ্বল আলোকের আভা লাগিয়া মার্জ্জিত লৌহ-খণ্ড ঝলসিতে লাগিল। তখন যোগেন্দ্র একবার তাহার সূক্ষ্ম অগ্রভাগ হস্ত দ্বারা পরীক্ষা করিলেন। তখনই আবার টেবিলের উপর ছোরা ফেলিয়া হস্তের উপর হস্ত, তদুপরি মস্তক রাখিয়া কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। আবার দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দুইবার, চারিবার সেই গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিলেন। আবার আসিয়া সেই ছোরা হস্তে লইলেন আবার তাহার উজ্জ্বলতা ও তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিলেন। আবার চেয়ারে বসিলেন। তাহার পর দুই হস্ত দিয়া মস্তকের কেশগুলা আন্দোলন করিলেন। তাহার পর—তাহার পর সেই তীক্ষ্ণধার ছোরার সূক্ষ্ম অগ্রভাগ স্বীয় বক্ষে স্থাপন করিলেন। এমন সময় তাহার পশ্চাদ্দিকস্থ উন্মুক্ত দ্বার দিয়া বেগে এক সুন্দরী আসিয়া যোগেন্দ্রের উভয় হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—

"একি! একি! যোগেন্দ্র! একি?"

সুন্দরী কম্পান্বিতা। তাহার নেত্র দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল ঝরিতেছে। যোগেন্দ্র সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন,—কমলিনী।

যোগেন্দ্র কি জন্য ছোরা বাহির করিয়াছিলেন এবং কেন তাহা বক্ষে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা যদিও আমরা ঠিক করিয়া বলিতে না পারি, তথাপি ইহা আমরা বেশ জানি, তাঁহার মনে আত্মহত্যার ইচ্ছা নাই। এখন প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিই তাঁহার হৃদয়ে বলবতী। যোগেন্দ্র কমলিনীকে দেখিয়া স্থির করিলেন তাঁহার হৃদয়ের বেগ এখন যে দিকে যাইতেছে তাহা যদি কমলিনীকে জানিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে হয়তো বাসনা-সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে। তিনি হাসিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"এ রাত্রে তুমি কোথা হইতে?"

যোগেন্দ্র হাসিলেন? কি ভয়ানক! যে ব্যক্তির অবস্থা ও যাতনার পরিমাণ আলোচনা করিয়া আমরা তাহার নিমিত্ত মৃত্যুর ব্যবস্থা করিতেছিলাম, সে আবার তখনই হাসিয়া কথা কহিতেছে? হাসি কান্নার কারণ বুঝি সকলের পক্ষে সমান না হইবে। অথবা হয়তো যোগেন্দ্র তাহার ক্লেশ-রাশির মধ্য হইতে এমন কোন সূক্ষ্ম রহস্য স্থির করিয়াছেন, যাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ধারণা করিতে অসমর্থ। যাহা হউক তিনি মধুর হাসির সহিত জিজ্ঞাসিলেন,—

"এত রাত্রে তুমি কোথা হইতে?"

কমল ভাবিলেন "সাধিলেই সিদ্ধি" এ কথা কখনই মিথ্যা নহে। যোগেন্দ্র যখন দারুণ

মনস্তাপে পুড়িতেছেন এবং আত্মহত্যার উদ্যোগ করিতেছেন, তখনই যে আমাকে দেখিয়া ক্ষণেকের মধ্যে ভূতপূর্ব্ব সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন, ইহাত নিশ্চয়ই প্রেমের লক্ষণ। আবার ইহার উপর হাসি? এতদিনে—এতদিনে ভগবান্ বুঝি আমার প্রতি সদয় হইলেন। তিনি স্থির করিলেন, যখন স্রোত আপনিই ফিরিতেছে, তখন আর একটু জোর হাওয়া হইলে নৌকা শীঘ্রই ঘাটে আসিবে। অতএব আমি আর একটু চাপাইয়া চলি। যোগেন্দ্রের বদনে একবার তীক্ষ্ণ, বিলাসময়ী দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—

যোগিন্! তুমি ত বালক নহ, তোমার একি ব্যবহার? একটা বালিকা—একটা তুচ্ছ বালিকার জন্য তুমি আত্ম-প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছ?"

যোগেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—

"সে কথায় কাজ নাই। আমি একটা তুচ্ছ বালিকার জন্য কাতর তোমায় কে বলিল? রাধাকৃষ্ণ! কেন? আমার আরও অনেক সুখ, অনেক আশা আছে। আমি কেন আত্মহত্যা করিব?"

কমলিনী বলিলেন,—

"তবে তুমি ছোরা লইয়া কি করিতেছিল?

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"ছোরাখানা লইয়া দেখিতেছিলাম। যদি আমার মরিবার বাসনা থাকিত, তাহা হইলে অনেকক্ষণ পূর্ব্বে মরিতে পারিতাম, সে বাসনা আমার নাই। ছোরার কথা বলিতেছ? ছোরা এই লও—ছোরা ফেলিয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া যোগেন্দ্র ছোরা লইয়া সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তখন কমলিনী বলিলেন,—

"যোগেন্দ্র! বিনীর কথা আমি সব শুনিয়াছি। যাহা কেহ কখনও ভাবিতে পারে না, সে তাহা করিয়াছে। তুমি সব জানিয়াছ বলিয়াই আমি এখন তোমার নিকট এ কথা উপস্থিত করিতেছি। কিন্তু যোগেন্দ্র, তুমি সে ব্যাপার মনে করিয়া আপনার জীবনকে যাতনায় ডুবাইও না। তোমার এই নবীন বয়স, তোমার এই ভুবনমোহন রূপ, তোমার এই দেবদুর্ল্লভ গুণ, তোমার এই সকল ব্যবহার, ইহাতে তোমার নিকট জগৎ বশ। তুমি মনে করিলে কত রমণী তোমার চরণে বিক্রীত হইবে।"

কথা সাঙ্গ করিয়াই কমলিনী স্বীয় উজ্জ্বল আরক্ত লোচনদ্বয় হইতে কতকটা উল্লাসকারী সুধা যোগেন্দ্রের নেত্রপথ দিয়া তাঁহার হৃদয়-ভাণ্ডারে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সে সুধা সেবনে যোগেন্দ্রের হৃদয়ে সন্তোষ জন্মিল কি না আমরা বলিতে অক্ষম। যোগেন্দ্র কমলিনীর কথার কোন বাচনিক উত্তর দিলেন না। কেবল কমলিনীর নয়নে নয়ন মিশাইয়া একটু হাসিলেন। সে হাসি হইতে কমলিনী আরও আশা পাইলেন। তাঁহার মনে হইল, যোগেন্দ্র গলিতেছেন। আবার সেই আবেশময়ী দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া বলিলেন,—

"যোগেন্দ্র! এ সংসার সুখের জন্য। শত সহস্র দুঃখ উপস্থিত হইলেও কাতর হইবার প্রয়োজন নাই। যাহাতে দুঃখ আছে, তাহা হইতে দূরে সরিয়া, যাহাতে সুখ আছে তাহার নিকট যাও।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"তাহা আর বলিতে? আমি তোমার হস্তে আমার সুখ দুঃখ সমস্ত সমর্পণ করিলাম। তুমি আমাকে যে পথে চলিতে বলিবে আমি সেই পথেই চলিব"

হাসির সহিত মিশাইয়া যোগেন্দ্র ঐ কয়েকটী কথা বলিলেন। সেই হাসির সহিত ঐ কথা কমলিনীর হৃদয়ে গিয়া আঘাত করিল। তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, বাসনা তো সিদ্ধ—যোগেন্দ্র তো আমারই। বলিলেন,-

"যোগেন্দ্র! কেহ যদি কাহাকে ভাল বাসে, কিন্তু সে তাহাকে ভাল বাসে কি না জানিতে না পারে, অথবা সমাজের দায়ে মনের আগুণ মনেই চাপিয়া রাখে, তাহা হইলে তাহার যে কষ্ট তাহা তুমি অনুমান করিতে পার কি?

যোগেন্দ্র ভাবিলেন, কমলিনীকে যে ইদানীং কেমন কেমন মত দেখিতে পাই, এইরূপ কোন ঘটনাই তাহার কারণ হওয়া সম্ভব! যাহা এত দিন কমলিনী বলিতে সাহস করেন নাই, আজি দেখিতেছি তাহাই বলিবার অনুষ্ঠান করিতেছেন। ভালই হইতেছে। দেখি, যদি এই অসময়েও আমার দ্বারা তাঁহার কোন উপকার হয়। বলিলেন,—

"ভালবাসা অনেক রকম। কমলিনি! ভালবাসা বলিলেই ভালবাসা হয় না। যে ভালবাসায় নরককে স্বর্গ করে, পাপকে পুণ্য করে, নির্ধনকে ধনী করে, শোককে সুখ করে, যে ভালবাসায় নিজের জ্ঞান যায়, বুদ্ধি যায়, বিবেচনা-শক্তি যায়, সেইরূপ ভালবাসাই ভালবাসা। তুমি যে ভালবাসার কথা বলিতেছ, সে কেমন ভালবাসা?"

কমলিনীর চক্ষু উজ্জ্বল হইল। তিনি বলিলেন,—

এ ভালবাসা—তোমাকে কি বলিয়া বুঝাইব? এ ভালবাসা কেমন? জগতে তেমন ভালবাসা কোথাও নাই, তবে কিসের সঙ্গে তুলনা দিয়া বুঝাইব?"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"হইতে পারে, সে ভালবাসা অত্যন্ত উচ্চ দরের। কিন্তু সেইরূপ দৃঢ়তা উভয় পক্ষেই আছে কি?"

কমলিনী ক্ষণেক নীরব থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস সহ কহিলেন,—

"সেই তো দুঃখ। তাহাই জানিতে পারা যায় না, এই তো যন্ত্রণা!"

সুন্দরী দারুণ উৎকণ্ঠিত ভাবে মস্তক অবনত করিলেন। যোগেন্দ্র বুঝিলেন, দারুণ অবক্তব্য প্রণয়ে পড়িয়া কমলিনী যার পর নাই কষ্ট পাইতেছেন। একটু আশ্বস্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন,—

"হইতে পারে অপর পক্ষেও সমান ভালবাসা আছে; কিন্তু সেও হয় তো সমাজের দায়ে বলিতে পারে না,—"

কমলিনী উৎসাহের সহিত বলিলেন,—

"তাহা হইতে পারে কি যোগেন্দ্র? তাহা হইতে পারে কি? তাহা হইলে যোগেন্দ্র, তাহার তখন কি কর্ত্তব্য?"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"তাহার তখন প্রেমাস্পদের হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। সর্ব্বাগ্রে দেখা আবশ্যক সে ভদ্রলোক কি না?"

কমলিনী বলিলেন,—

"সে ভদ্রলোক, সে দেবতা, সে মানুষ নয়।"

তখন যোগেন্দ্র চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে ক্ষণেক চিন্তা করিলেন। পরে কমলিনীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—

"তাহা হইলে তাঁহাকে এ কথা জানান মন্দ নয়।"

আবার যোগেন্দ্র বেড়াইতে লাগিলেন। কমলিনী বহুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর বেগে যোগেন্দ্রের চরণে পড়িয়া কহিলেন,—

"যোগেন্দ্র! যোগেন্দ্র! সে প্রণয়াস্পদ তুমি। তুমিই সেই প্রণয়াস্পদ। আমি তোমার জন্য"—আর কথা কমলিনী বলিতে পারিলেন না।

তখন সেই মন্দভাগিনী, সর্ব্বনাশসাধিনী, প্রেমাভিভূতা, রূপের লতিকা কমলিনী যোগেন্দ্রের চরণ ধরিয়া পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া যোগেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। সহসা দারুণ ভূমিকম্পে সেই গৃহ যদি বিচূর্ণ হইয়া যাইত, তাহা হইলেও তিনি তাদৃশ চমকিত হইতেন না। ভিত্তির উপর হস্ত স্থাপন করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা একবার আলোচনা করিলেন। কমলিনীর নেত্র-নিঃসৃত তপ্ত অশ্রু-বারি তখন তাঁহার চরণ সিক্ত করিতে ছিল। তিনি তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—

"কমলিনি, যাও! তুমি অপাত্রে প্রণয় স্থাপন করিয়াছ। তোমার আশা কখনই সফল হইবে না। হৃদয়কে শান্ত করিতে অভ্যাস কর। আমার চরণ ছাড়িয়া দাও।"

কমলিনী চরণ ছাড়িয়া দিলেন না। তখন যোগেন্দ্র কমলিনীর হস্ত হইতে স্বীয় চরণ ছাড়াইবার প্রযত্ন করিলেন। কিন্তু কি ভয়ানক—দেখিলেন, কমলিনীর চৈতন্য নাই! তখন তিনি কষ্টে তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, একবার ভাবিলেন, উহার ঐ মূর্চ্ছাই যদি চিরস্থায়ী হয় তাহা হইলেই ভাল হয়। আবার ভাবিলেন, তাহা কেন? এ জীবনে উহার আরও কতই বাসনা থাকিতে পারে। তখন জল সেচনাশয়ে কমলিনীর নিকটস্থ হইলেন, দেখিলেন আপনিই কমলিনীর চৈতন্যের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। অমনি তিনি সরিয়া আসিয়া সেই গৃহের অপর সীমায় যে একখানি কৌচ ছিল, তাহার উপর বসিয়া পড়িলেন। কমলিনীর চৈতন্য হইল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে সে প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে গমন করিলেন।

বাহিরে আর একটী স্ত্রীলোক তাঁহার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছিল। সে মাধী। কমলিনী মাধীর নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—

"মাধি! আশা তো ফুরাইল। আর বাঁচিয়া কি ফল? মাধী বলিল,—

"ভয় কি দিদি ঠাকুরাণি—আশা কি ফুরায়? মাধী যতক্ষণ আছে, আশাও ততক্ষণ আছে।"

"আর কি উপায়?"

"উপায় আছে, এইবার শেষ উপায়। সে কথা তোমায় কালই বলিব।"

মাধী কমলিনীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

---*---

চৈতন্য।

"Be frustrate all ye stratagems of Hell,
And devilish machinations come to
nought
Paradise Regained."

প্রত্যূষে যোগেন্দ্র ভবন-সংলগ্ন রাজপথে ভ্রমণ করিতেছেন। সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা ছিল না। চক্ষু রক্ত বর্ণ, উন্মত্তের ন্যায় স্থির, শরীর বলহীন ও কৃশ; বদন কালিমা-যুক্ত। তিনি চিন্তা করিতেছেন—ভয়ানক! "হরগোবিন্দকে খুন করিব।" আবার ভাবিতেছেন, "হরগোবিন্দকে কেন? বিনী বিশ্বাসঘাতিনী,

তাহাকেই নিপাত করিব।" আবার ভাবিতেছেন, "মানব-শোণিতে যদি হস্তকে রঞ্জিত করিতে হয়, তবে উভয়কেই বধ করিব।" আবার ভাবিতেছেন, "উহারা পাপী, কিন্তু আমি উহাদের দণ্ড দিবার কে? উহাদের পাপোচিত শাস্তির অন্য ব্যবস্থা আছে, তাহাতে আমার কোনই অধিকার নাই। তবে আমি কেন কলঙ্কিত হই? আমি কেন এ সংসার ছাড়িয়া যাই না? এ সংসার আমার সুখের জন্য নহে। তবে কেন নরহত্যা করিয়া আমার নাম অনন্ত কালের নিমিত্ত নরঘাতীদিগের সহিত এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া রাখি?" আবার ভাবিতেছেন, "এ যাতনা যায় কিসে? সংসার ত্যাগ করিব; এ স্মৃতি তাহাতেও যাইবে না তো। মৃত্যুই আমার নিষ্কৃতির উপায়। মরিব—না মরিলে এ অনল নিবিবে না।" আবার ভাবিতেছেন, "মরিব বটে, কিন্তু এই যে চিন্তা—আমি যাহাকে—ওঃ—না, সে কথায় কাজ নাই—সে যে আমাকে প্রতারিত করিয়া পর—না—উঃ—উঃ—এ—চিন্তা মৃত্যুর পরও আমার আত্মার সঙ্গে থাকিবে। না, তাহা হইবে না। উহারা বর্ত্তমান থাকিলে মরণেও আমার সুখ নাই। উহাদের না মারিয়া আমি মরিব না। কি জানি যদি বিঘ্ন ঘটে—অগ্ৰই। দুই জন—দুই জনকেই এক সঙ্গে। বিলম্বে কাজ নাই।—আজিই।" ভাবিতে ভাবিতে যোগেন্দ্রনাথের রক্তবর্ণ চক্ষু আরও রক্ত বর্ণ হইয়া উঠিল, যেন স্থান ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, শরীর কণ্টকিত হইল, কেশ সকল উচ্চ হইয়া উঠিল। হত্যা, মৃত্যু, পাপ প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তি যেন মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার চারি দিকে বেষ্টন করিয়া নাচিতে লাগিল; তাঁহার শূন্যহস্তে কে যেন তীক্ষ্ণধার অসি দিয়া গেল কতকগুলি বীভৎস, দেহহীন আকৃতি যেন তাঁহার পার্শ্বে ঘুরিতে ঘুরিতে খল্ খল্ হাসিতে লাগিল, এবং কোন উজ্জ্বল মূর্ত্তি যেন দূরে দাঁড়াইয়া বার বার বিনোদিনী ও হরগোবিন্দের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল।

যোগেন্দ্র যখন এইরূপ উন্মাদ, সেই সময়ে একটি লোক ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটস্থ হইয়া ডাকিল;—

"যোগেন্দ্র!"

উত্তর নাই। আগন্তুক পুনরায় ডাকিল,—

"যোগেন্দ্র!"

যোগেন্দ্রের জাগ্রত স্বপ্ন ভাঙ্গিল। তিনি সম্বোধনকারীর প্রতি চাহিলেন—দেখিলেন হরগোবিন্দ বাবু! যোগেন্দ্রের মূর্ত্তি দেখিয়া হরগোবিন্দ বাবু শিহরিয়া উঠিলেন। যোগেন্দ্র নিরুত্তর। হরগোবিন্দ বাবু বলিলেন,—

"এ কি যোগেন্দ্র? তোমার এমন অবস্থা কেন।"

তখন যোগেন্দ্র উন্মাদের ন্যায় ক্ষণেক হরগোবিন্দের বদনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সহসা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—

"যাও আমার নিকট হইতে সরিয়া যাও, মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত হও, কুলটা বিনোদিনীকেও প্রস্তুত হইতে বল।"

হরগোবিন্দ শিহরিলেন। দন্তে রসনা কাটিয়া বলিলেন,—

"ছিঃ! ছিঃ! যোগেন্দ্র! তুমি পাগল হইলে? তোমার মুখে এ কি কথা? বিনোদিনী—ছিঃ!"

তখন যোগেন্দ্র বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন,—

"সরিয়া যাও—মৃত্যু সম্মুখে—দূর হও!

হরগোবিন্দ অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। ভাবিলেন, এ কি? যোগেন্দ্র তো উন্মাদ! এখন বোধ হইতেছে বিনোদিনীর চরিত্র সম্বন্ধে

যোগেন্দ্রের সন্দেহ জন্মিয়াছে। কিন্তু আমার উপর ক্রোধ কেন? এখন তো অধিক কথারও সময় নহে। বলিলেন,—

"আমি তোমাকে একটী কথা বলিতে আসিয়াছিলাম, তাহা যদি তুমি না শুন, অন্ততঃ এই চিঠিগুলা পড়িও।"

কমলিনী বিনোদিনীকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্রের তাড়াটা মাষ্টার মহাশয় যোগেন্দ্রের হস্তে দিলেন। যোগেন্দ্র পত্র লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। হরগোবিন্দ বিবেচনা করিলেন, এক্ষণে বাদানুবাদ করিতে গেলে অশুভ ভিন্ন শুভ ঘটিবে না। ইনি তো উন্মাদ। এ কথা এখনও বাটীর কেহ জানিতে পারে নাই, জানিলে কেহ না কেহ সঙ্গে থাকিত এবং আমিও সংবাদ পাইতাম। এখন এ কথা আমিও কাহাকে জানাইব না। জানাইলে কেবল গোলের বৃদ্ধি হইবে। ইহাঁকে ছাড়িয়া যাওয়াও ভাল নয়, আবার আমি সম্মুখে থাকাও ভাল নয়। এইরূপ ভাবিয়া মাষ্টার মহাশয় যোগেন্দ্রনাথের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেলেন। যোগেন্দ্র তাঁহার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন না।

যোগেন্দ্রনাথের পশ্চাতে একটী প্রাচীর ছিল, হরগোবিন্দ বাবু সেই প্রাচীরের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইলেন। সেই প্রাচীরের একটি গবাক্ষ ছিল, সেই পথ দিয়া যোগেন্দ্রের ভাব দেখিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ পরে যোগেন্দ্র পশ্চাতে চাহিলেন। দেখিলেন, পথ জনশূন্য। তখন যোগেন্দ্র মস্তকে হাত দিয়া বহুক্ষণ এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইলেন। যেখানে চিঠিগুলা পড়িয়াছিল, তাহার পাশ দিয়া যোগেন্দ্র দশ বার যাতায়াত করিলেন। ভাবিলেন,—"এ গুলা কি, দেখিলাম না কেন? ইহার মধ্যে বিনোদিনীর কথা নাও থাকিতে পারে—হয় তো আমি ইহা দেখিলে কাহারও কোন উপকার হইতে পারে। আরও দোষ, হয়তো, না দেখিলে কাহারও অনিষ্ট হইতে পারে।" ধীরে ধীরে যোগেন্দ্র চিঠি সকল হাতে করিয়া পড়ি কি না পড়ি ভাবিতে লাগিলেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, তাহার হস্ত যেন অজ্ঞাতসারে চিঠিগুলা খুলিয়া ফেলিল। তখন যোগেন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে সেই চিঠির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। "যোগেন্দ্র" এই কথাটি তাঁহার নেত্রে পড়িল। দেখিলেন চিঠি সকল কমলিনীর হস্তলিখিত। চিঠি না পড়িয়া থাকা অসম্ভব হইল। একখানি চিঠি পড়িতে লাগিলেন।

"বিনোদিনি—

"আমি কলিকাতায় আসিয়াই যোগেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহাকে বাসায় দেখিতে পাইলাম না। তাহার বাসায় একজন ঝির সহিত কথাবার্ত্তা হইল। তিনি যে এবার কেন তোমায় এক খানিও পত্র লেখেন নাই তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি। যাহা যাহা শুনিলাম তাহাতে যোগেন্দ্রের চরিত্র মন্দ হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। যোগেন্দ্রের প্রতি তোমার যেরূপ মায়া তোমার প্রতি যেন যোগেন্দ্রের আর তেমন মায়া নাই। তুমি এজন্য চিন্তা করিও না। তুমি কাতর হইবে ভাবিয়া আমি তোমাকে এ সংবাদ জানাইব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু শেষে ভাবিয়া দেখিলাম যে, হয়তো তোমার দ্বারা ইহার কোন প্রতিবিধান হইতে পারে। যাহা হউক, ভয় নাই। আমি শীঘ্রই যোগেন্দ্রকে বাটী লইয়া যাইবার উপায় করিতেছি। * * * * * * * * * * * * ইতি

"কমলিনী।"

যোগেন্দ্রনাথের মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, চি

সকল তাঁহার হস্তভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া গেল। তিনি সেই স্থানে হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িলেন। আকাশের প্রতি চাহিয়া করযোড়ে কহিলেন,—

"দয়াময়! তোমার সৃষ্ট অপরিসাম জগৎ মধ্যে আমি একটি ক্ষুদ্র বালুকাকণা মাত্র। বিধাতঃ! তুমিই জান, আমার শান্তি বিধ্বংসিত করিতে কতই কাণ্ড হইতেছে। বল জগদীশ! আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—কি উপায়ে চিত্তকে স্থির রাখিয়া এই ভীষণ সমুদ্র অতিক্রম করিয়া যাইব? কৃপাময়! আমাকে বল দেও, বুদ্ধি দেও, আমাকে এই ব্যাপারের রহস্যো ভেদ করিতে ক্ষমতা দেও।"

আবার যোগেন্দ্র স্থির হইয়া আর এক খানি পত্র খুলিলেন এবং পড়িলেন,—

"প্রিয় ভগ্নি—

"তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যোগেন্দ্রনাথের স্বভাব মন্দ হইয়াছে। তিনি একটি কলঙ্কিনী কামিনীর কুহকে পড়িয়া সকলই ভুলিয়াছেন। পড়া শুনা নাম মাত্র, কলেজে প্রায় যান না। বাসা কেবল লোক জানাইবার জন্য, সেখানে প্রায় থাকেন না। শুনিলাম "তাঁহার সেই নূতন রাণী কুৎসিতার একশেষ। তুমি এজন্য চিন্তা করিও না, কত লোক এমন হয়, আবার শেষে ভাল হইয়া । যোগেন্দ্রকে বাটী লইয়া "যাওয়ার কি হয় তাহা তোমায় পরে লিখিব **** ইতি।

"কমলিনী।"

তখন যোগেন্দ্র উন্মাদের ন্যায় দাঁড়াইলেন। বলিলেন—

"কে জানিত?—কে জানিত, পরের সর্ব্বনাশ সাধিতে মানব এতই করিতে পারে? কমলিনী—কলঙ্কিনী—সর্ব্বনাশিনী কমলিনী তোমার এই কাজ? ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির বশবর্ত্তিনী হইয়া তুমি সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছ? দুই-জন—দুইজন কেন—তিনজন নিরপরাধ ব্যক্তির শান্তি, সুখ, আশা, জীবন ধ্বংস করিতেছ। ভগবন্! তোমার সৃষ্টির মর্ম্ম কে বুঝে? কমলিনীর ন্যায় সর্পীর সৃষ্টি করিয়া কি লাভ জগদীশ?

যোগেন্দ্রনাথ আবার ভাবিলেন, "হর-গোবিন্দ—হরগোবিন্দের ব্যাপারটা কি? তাহাকে যে কল্য রাত্রে নির্জ্জনে বিনোদিনীর সহিত আলাপ করিতে স্বচক্ষে দেখিলাম, তাহার মীমাংসা কই? যে আমাকে এই ব্যাপার বুঝাইয়া দিতে পারিবে, তাহার নিকট আমার জীবনের স্বাধীনতা বিক্রয় করিতেও স্বীকার।"

আবার আর একখান পত্র পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন,—

"বিনোদ,—

"কল্য বৈকালে যোগীনের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়—দেখিলাম তিনি মদ খাইতে শিখিয়াছেন।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"কি ভয়ানক—আমি মদ্যপ!"

আবার পড়িতে লাগিলেন—

"আমার সহিত যখন দেখা হইল তখন তাঁহার নেশা ছিল। তোমার পত্রের কথা মাধী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমিও জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি তোমার সমস্ত পত্রই তো পাইয়াছেন, বলিলেন, উত্তর দিতে সময় হয় নাই।"

আবার যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"ধন্য তোমার উদ্ভাবনী শক্তি! ধন্য তোমার কৌশল! বিনোদ তবে আমাকে পত্র লিখিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহা পাই

নাই। কেন?—সেও কমলিনী ও মাধীর কৌশল।”

আবার, পড়িতে লাগিলেন,—

“বাটী যাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম, তাঁহার যাইতে মন নাই। তোমার চিন্তা নাই। আমি তাঁহাকে না লইয়া বাটী যাইব না। * * * * * ইতি।

“কমলিনী।”

তখন যোগেন্দ্র বুঝিলেন বিনোদিনী তাঁহাকে নিয়ম মত পত্র লিখিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাহা পান নাই; তিনিও বিনোদিনীকে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, বিনোদিনীও তাহা পান নাই। কমলিনী ও মাধীই তাহার কারণ। সুতরাং কমলিনী ও মাধী যাহা বলিয়াছে, সে সমস্তই অলীক অথবা অবিশ্বাস্য। তখন আহ্লাদ, দুঃখ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি বৃত্তিসমস্ত মিলিয়া যোগেন্দ্রনাথের হৃদয়ে তুমুল ঝটিকা উত্থাপিত করিল। তিনি পত্রসমস্ত দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার বদনের তীব্র ভাব অনেক কমিয়া গেল। হরগোবিন্দ বাবু এই সকল ব্যাপার অন্তরাল হইতে দেখিলেন। তিনি ধীরে ধীরে আবার যোগেন্দ্রনাথের সমীপে আসিতে লাগিলেন। যোগেন্দ্র তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া ব্যস্ততা সহ তাঁহার নিকটস্থ হইলেন এবং বালকের ন্যায় সরল ভাবে বলিলেন,—

“মাষ্টার মহাশয়—আপনি শিক্ষক, আপনি প্রধান সুহৃদ, আপনি প্রবীণ, আপনি আমার পিতৃ-স্থানীয়। আমি জানি না, আমি বুঝিতে পারিতেছি না, আমার বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্র হইয়াছে। আপনি আমায় পরামর্শ দিন। আমার সাধ্য নাই যে আমি এই ব্যাপারের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারি। আপনি আমাকে বাঁচাইয়া দিন। আমায় রক্ষা করুন।”

হরগোবিন্দ বাবু যোগেন্দ্রনাথের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—“কি হইয়াছে?”

তখন যোগেন্দ্র তাঁহাকে আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। কলিকাতা গমন—বিনোদিনীর সংবাদ অভাবে দারুণ উদ্বেগ—পীড়া—কমলিনী ও মাধীর আগমন—হরগোবিন্দ ও বিনোদিনীকে রাত্রিকালে একত্র দর্শন—বিনোদিনীকে পদাঘাত—কমলিনীর প্রেমের কথা—অদ্য এই সমস্ত পত্র পাঠ, সমস্ত ব্যাপার যোগেন্দ্র বিনা সঙ্কোচে মাষ্টার মহাশয়ের গোচর করিলেন। সমস্ত শুনিয়া মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—

“যোগেন্দ্র! তুমি নির্ব্বোধ নহ; এখন আর কি বুঝিতে বাকি থাকিতে পারে? মাধী চিরকাল বিনোদিনীর পত্র ডাকে দেয় এবং তোমার পত্র ডাক-ঘর হইতে আনিয়া বিনোদিনীর নিকটে দিয়া থাকে। মাধী ও কমলিনী এক যোগ বুঝিতে পারিতেছ? সুতরাং তোমার পত্র কেন বিনোদ পায় নাই এবং বিনোদিনীর পত্র কেন তুমি পাও নাই তাহা সংক্ষেই বুঝা যাইতেছে কমলিনীর অদম্য কদর্য্য স্পৃহাই সমস্ত অনিষ্টের মূল বলিয়া বুঝা যাইতেছে। তোমার চক্ষে বিনোদকে বিষ করিয়া না তুলিলে অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া, সে মাধীর সহিত চক্রান্ত করিয়া বিনোদের সম্বন্ধে নানাবিধ ঘৃণিত সংবাদ রটনা করিয়াছে। বুঝিতেছ না যে, সে সমস্তই অলীক কথা! বিনোদ যখন তোমার সংবাদ না পাইয়া অধীরা, সেই সময় কমল তাহাকে কলিকাতা হইতে সংবাদ পাঠাইলেন যে তোমার চরিত্র মন্দ হইয়াছে। তুমি বুঝিতেছ, এ সংবাদে বিনোদিনীর কি যন্ত্রণা জন্মিতে পারে। এই সংবাদক্রমাগত নানারূপে আসিতে লাগিল। সে

সকল লিখিবার এমনই ভঙ্গী যে, তাহা আর বিশ্বাস না করিয়া চলে না; তখন সেই ক্ষুদ্র বালিকা অনন্যোপায় হইয়া আমাকে সমস্ত জানাইল এবং আমার চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। এ সকল পত্র বিনোদিনীই আমাকে দিয়াছে। আমি কোন ক্রমেই পত্র সকলের সংবাদ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। যোগেন্দ্র, আমিতো তোমার ন্যায় বালক নহি যে, দুইটা প্রমাণ উপস্থিত করিয়া একটা কথা বলিলেই, সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা না করিয়া একেবারেই তাহা বিশ্বাস করিব!

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"আপনি আমায় তিরস্কার করিতে পারেন, কিন্তু যেরূপে কমলিনী ও মাধী আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহাতে বিশ্বাস না করা অসম্ভব।"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—

"তাহার পর আমি বিনোদিনীকে অনেক আশ্বাস দিলাম। বলিলাম শীঘ্রই তাহাকে প্রকৃত সংবাদ আনিয়া দিব। সে আজি পনর দিন হইল। বিনোদিনী কেবল আমার কথার ভরসাতেই বাঁচিয়া আছে, নচেৎ তুমি তাহাকে এতদিন দেখিতেও পাইতে না; তাহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, সে কেবল কাঁদিয়া দিন কাটাইতেছে।"

তখন যোগেন্দ্রের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাষ্টার মহাশয় বলিতে লাগিলেন,—

"তাহার পর কল্য তুমি বাটী আসিয়াছ, কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাৎ কর নাই। ভাবিয়া দেখ যোগেন্দ্র, তাহাতে তাহার কি কষ্ট হইয়াছে। সে যখন দেখিল, রাত্রি দশটা বাজিল তথাপি তুমি তাহার নিকট আসিলে না, তখন সে আমায় ডাকিয়া পাঠাইল। তাহার সে মূর্ত্তি, তাহার সে রোদন, পাষাণকেও দ্রব করিতে পারে।"

বলিতে বলিতে মাষ্টার মহাশয়ের চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিল। যোগেন্দ্রেরও নেত্র দিয়া অনর্গল জল পড়িতে লাগিল। হরগোবিন্দ বাবু বলিতে লাগিলেন,—

"আমি তাহাকে অনেক ভরসা দিলাম। আজি প্রাতে তাহাকে সুসংবাদ দিব বলিয়াছি। সুসংবাদ আর কি দিব? চল যোগেন্দ্র, তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই।"

তখন যোগেন্দ্র মাষ্টার মহাশয়ের চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন,—"আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমি অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহার প্রতিশোধ হইতে পারে না। আপনি আমার বিনোদকে এত দিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন—নচেৎ বিনোদ এই কষ্ট সহিয়া কখনই এত দিন বাঁচিত না।"

মাষ্টার মহাশয় যোগেন্দ্রের হাত ধরিয়া উঠাইলেন এবং বলিলেন,—"তোমারই বা দোষ কি? তোমাকে যে যে কথা বলিয়াছে, তাহাতে কাজেই তোমার মনে সন্দেহ হইতে পারে। যাহা হউক এখন আইস।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"চলুন। আমার মনে কিন্তু বড় আশঙ্কা হইতেছে। কল্য আমি বিনোদের সহিত যার পর নাই দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে অভিমানিনী বিনোদিনী নিশ্চয়ই অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন। কি জানি অদৃষ্টে কি আছে।"

উভয়ে দ্রুত চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"মাষ্টার মহাশয়! আমি অদ্যকার এই শুভদিন চিরস্মরণীয় করিবার জন্য পাঁচটী জলহীন স্থানে পাঁচটী সরোবর খনন করাইব—

তাহার নাম রাখিব "বিনোদবাপী"; কলিকাতার মধ্যে সাধারণের ব্যবহারার্থ এক রম্য কানন সংস্থাপন করিব—তাহার নাম রাখিব 'আনন্দ কানন' এবং বর্ষে বর্ষে এই দিনে এই প্রদেশের দীন হীন দম্পতী সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া নব বস্ত্র পরিধান করাইয়া নানা উপচারে আহার করাইব এবং সমস্ত দিন তাহাদিগকে আনন্দে নিমগ্ন রাখিব। সেই মহোৎসবের নাম রাখিব "মিলন মহোৎসব।"

মাষ্টার মহাশয় মনে মনে বলিলেন,—

"এমন যোগেন্দ্রও কি কখন মন্দ হইতে পারে?"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—*—

বিষ না অমৃত।

"her rash hand in evil hour
Forth reaching to the Fruit, she plucked
she eat."
Paradise Lost.

সেই প্রত্যূষে অন্তঃপুরের একটী প্রকোষ্ঠ মধ্যে আর এক প্রকার কার্য্য চলিতেছিল। বিনোদিনী সেই প্রত্যূষে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে বসিয়া একখানি পত্র লিখিতেছিলেন; এমন সময় তথায় মাধী আসিল। তাহাকে দেখিয়া বিনোদিনী পত্র লেখা বন্ধ করিলেন। ভাবিলেন, ভালই হইল, মাধীর দ্বারাই কার্য্য উদ্ধার করিতে হইবে। জিজ্ঞাসিলেন,—

"মাধী যে এত ভোরে?"

মাধী বলিল,—

"ভোরে না আসিলে সব কাজ হয় কই? তুমি কি ঘুমাও নাই? ও কি, তোমার চোখ অত লাল কেন?"

বিনোদিনী বলিলেন,—

"ঘুম কি আছে?"

তখন মাধী বলিল,—

"এখন দেখিলে দিদি, আমি তো আগেই বলেছিলাম যে, জামাই বাবু এবার আর এক বিনোদিনী জুটাইয়াছেন। কাঙ্গালের কথা বাসী হলে মিষ্ট লাগে।"

বিনোদিনী একটু বিষন্ন হাসির সহিত বলিলেন,—

"তা বেশ তো।"

"কিন্তু তুমি যাই বল দিদি, স্বামীর সোহাগ ছাড়া হওয়ার চেয়ে মেয়ে মানুষের আর অধিক দুঃখ কিছু নাই। তোমাকে দিয়েই তার সাক্ষী দেখা যাচ্চে। যারা সারা দিন দেখ্‌ছে তারা ছাড়া আর কার সাধ্য এখন তোমাকে চিন্‌তে পারে! ও সোজা কথা কি গা? বল কি? আহা এই দুঃখেই যার চাটুর্য্যেদের মেজো বউটা বিষ খেয়ে মলো! আহা! সোণার প্রতিমা! বয়স কি! এই তোমার বয়স। কেন তুমি তো তাকে দেখেছ?"

"হ্যাঁ—শুনেছি বটে—বিষ খেয়ে মলো, অ্যাঁ?"

"হ্যাঁ—কাকেও বলা নেই, কহা নেই—বিষ এনে খেয়ে বসে আছে। তার পর যখন পড়ে গেল, তখন সব লোকে জানিতে পারিল। তখন আর হাত কি? তা সে ব'লে কেন, কত জন এমনি করে আত্মহত্যা করেছে।"

বিনোদিনী ভাবিলেন—তাঁহার উদ্দেশ্যের অনুকূল কথাটাই উঠিয়াছে। আত্ম-অভিসন্ধি গোপন করিয়া বলিলেন,—

"তাদের কিন্তু ধন্য সাহস। স্বামী না হয় মন্দই হলো, তা মরে কি হবে ?"

মাধী মনে মনে বলিল,—'তা বটেই তো ? তুমি ত দুধের মেয়ে, তুমি এত চালাক ! মাধী মনে মনে জানিত যে, স্বামি-প্রেমের মহিমা যদি কেহ বুঝে, সে বিনোদিনী। তদভাবে যে বিনোদিনী এক দিনও বাঁচিতে পারে না, তাহাও সে বুঝিত। প্রকাশ্যে বলিল,—

"কে জানে ভাই !"

বিনোদিনী বিস্মিতের ন্যায় বলিলেন,—

"আচ্ছা, তারা এ সব বিষ টিস পায় কোথা ? সর্ব্বনাশ !"

মাধী মনে মনে ভাবিল, 'আর কতক্ষণ চাতুরী ! বিষ মাধী দিতে পারে।" প্রকাশ্যে বলিল,—

"তা আ৷ কেমন করিয়া বলিব ? শুনেছি চাঁড়াল বাড়ী পয়সা দিলে পাওয়া যায়।"

"চাঁড়ালদের তো ভাবি অন্যায়। বিষ বেচা নিষেধ। থানার লোক জানিতে পারিলে তাহাদের খুব সাজা দিয়ে দেয়।"

মাধী হাসিয়া বলিল,—

"তাদের কি ভয় নাই দিদি ? লোকে জানিতে না পারে এমনি সাবধান হয়েই তারা কাজ করে।"

বিনোদিনী বলিলেন,—

"যার হাত দিয়া লোকে বিষ আনায় সে ক্রমে গল্প ক'রে এ কথা প্রকাশ ক'রে দিতে পারে।"

"যারা বিষ আনায় তারা তেমনি লোকের হাতেই আনায়।"

"আমাদের যেমন মাধী।"

মাধী বলিল,—

আমি তেমন বিশ্বাসী বটি, কিন্তু ও রকম কাজে যেন আমায় থাকিতে না হয়।"

"কিন্তু মাধী, আমার একটু বিষ রাখিতে ইচ্ছা আছে।"

"ছিঃ ওকি রাখিতে আছে ?—না।"

"রাখিলে উপকার হইতে পারে। এক দিন না একদিন তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিবেনই করিবেন। আমি তাঁহাকে সেই বিষ দেখাইয়া বলিব যে, তুমি যদি আর এমন করিয়া আমাকে জ্বালাও তাহা হইলে আমি বিষ খাইয়া মরিব। তিনি হাজার মন্দ হউন, আমি জানি তিনি বড় ভীত লোক। মনে ইচ্ছা থাকিলেও তিনি এই ভয়ে মন্দ স্বভাব ছেড়ে দিবেন।"

মাধী খানিকটা ভাবিয়া বলিল,—

"পরামর্শ করেছ ভাল ; কিন্তু ও জিনিস রাখিতে নাই। কি জানি মন না মতি।"

"তুই কি পাগল ? আমি তেমন লোক নই। মাধি, তুই মনে করিলে আমায় একটু বিষ এনে দিতে পারিস্।"

"না ভাই, সে আমার কর্ম্ম নয়।"

"তোর কোনও ভয় নাই ; আমি তোকে দশ খানা সোণার গহনা দিব। এমন সুযোগ কি ছাড়িতে আছে ?"

"তা বটে—কিন্তু আমি গরিব মানুষ।"

বিনোদিনী বলিলেন,—

"মাধী, ওজর করিস না। এমন সদুপায় আর কিছুই নাই। একটু বিষ আমার হস্তগত হইলে, আমার সকল দুঃখই দূর হয়। এমন কাজে ওজর করা মাধি, তোর কি উচিত ?"

"তোমার জন্য দিদি আমি সব করিতে পারি। তুমি যেরূপ ব'লচো তাতে জলে

ডুব্‌তে বলিলেও আমাকে ডুব্‌তে হয়। তা—আমি নাকি—”

বিনোদিনী বাধা দিয়া বলিলেন,—

“তুই যা—তুই—যা—।”

এই বলিয়া বিনোদিনী মাধীর হস্তে একটী টাকা গুঁজিয়া দিলেন। মাধী ”তা—দেখি—তা” বলিয়া চলিয়া গেল। তখন বিনোদিনী সজল নয়নে করযোড় করিয়া কহিলেন,

“হে করুণাময়! মাধী যেন নিষ্ফল হইয়া না আসে। এজগতে মন্দভাগিনীর সমস্ত শান্তি বিষেই আছে। দয়াময়, সে শান্তিতে যেন বঞ্চিত না হই—”

বিষ আনিতে মাধীর চাঁড়াল বাড়ীতেও যাইতে হয় নাই। কোন চেষ্টাও করিতে হয় নাই। সে এদিক ওদিক খানিকটা ঘুরিয়া আধ ঘণ্টা পরে আসিল। তাহাকে দেখিয়া বিনোদিনী সমুৎসাহে তাহার নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

“কই মাধী, কই?”

তখন মাধী চারি দিকে চাহিয়া, ধীরে ধীরে কাপড়ের মধ্য হইতে একটা কলার পাত-মণ্ডিত মৃৎপাত্র বিনোদিনীর হস্তে দিয়া কহিল,—

“কত কষ্টে যে এনেছি, তা আর কি ব’লবো? তোমার জন্য বলেই এত করেছি; তা না হলে কি এমন কাজ করি? কিন্তু দেখো দিদি—সাবধান, যেন আমায় মজাইও না।”

বিনোদিনী অতুল সম্পত্তি ভাবিয়া সেই পাত্র হস্তে লইলেন এবং বলিলেন,—

“ভয় কি? তুই কি পাগল?”

তাহার পর বাক্স খুলিয়া তাহার মধ্যে অতি যত্নে সেই বিষপাত্র স্থাপিত করিলেন এবং সাবধানতা সহ বাক্সের চাবি বন্ধ করিয়া যত্নে সেই চাবি বস্ত্রাগ্রে বাঁধিলেন।

তখন মাধী বলিল,—

“কাকেও কি দেয়? যে কষ্ট করে এনেছি তা আর কি বলবো?”

বিনোদিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

“মাধি যত্ন করিলেই রত্ন মিলে।”

এই বলিয়া বিনোদিনী আপনার অলঙ্কারের বাক্স আনিলেন এবং তাহার চাবি খুলিয়া বলিলেন,—

“মাধী, কি লইবি?”

মাধী সেই সমস্ত উজ্জ্বল অলঙ্কারের শোভা দেখিয়া লোভে অস্থির হইল। বলিল,—

“কি লইব?”

“যাহা ইচ্ছা।”

এই বলিয়া বিনোদিনী মাধীর সম্মুখে সেই বাক্স খুলিয়া ধরিলেন! তখন মাধীর ইচ্ছা যে, সে বাক্সটা সমেত সব লয়, কিন্তু লইয়া যায় কেমন করিয়া? ছোট দিদি এক বাক্স গহনা দিয়াছেন বলিলে কেহ তো বিশ্বাস করিবে না। অতএব যাহা লুকাইয়া চলে তাহাই লওয়া ভাল ভাবিয়া, মাধী বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি অলঙ্কার লইল। সে এক এক বার বিনোদিনীর মুখের প্রতি চাহিতে লাগিল। ভাবিল, তিনি বুঝি বিরক্ত হইতেছেন। বিনোদিনী বলিলেন,—“আরও লও না।”

মাধী বলিল,—

“না দিদি। আমি গরিব মানুষ আমার আর কেন?”

তখন মাধী প্রায় দেড় সহস্র টাকার অলকার আত্মসাৎ করিয়াছে। কিন্তু লোভ এখনও সম্পূর্ণ প্রবল, লওয়াও অসম্ভব। দীর্ঘনিশ্বাস সহ কহিল,—

“আর না—আমার কোন পুরুষে এত সোণা দেখে নাই।”

মাধী হাত তুলিল। বাক্সটার প্রতি

একবার সতৃষ্ণ নয়নে চাহিল। এক পদ পিছাইয়া গেল। চার দিকে একবার সভয়ে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর বলিল,—

"তবে এখন আসি দিদি? বিষটুকু সাবধানে রেখো। খুব সাবধান!"

বিনোদিনী বলিলেন,—

"তা আর বল্‌তে? খুব যত্নে রাখিব।"

মাধী চলিয়া গেল। সে জানিত, তাহার বিষ কি কাজে লাগিবে। সে যাহা ভাবিয়া প্রত্যুষে বিনোদিনীর ঘরে আসিয়াছিল, তাহাতে তাহার জয় হইল। যত দূর তাহাকে দেখা যায়, ততদূর তাহাকে বিনোদিনী নয়ন দ্বারা অনুসরণ করিলেন। সে অদৃশ্য হইলে বলিলেন,—

"মাধী যে উপকার করিল, অলঙ্কারে তাহার কি প্রতিশোধ হয়।"

তখন বিনোদিনী বাক্স খুলিয়া সেই বিষপাত্র বাহির করিলেন, ভূতলে জানু পাতিয়া বসিলেন এবং বিষপাত্র হস্তে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া বলিলেন,—

"জগদীশ! এ ক্ষুদ্র প্রদীপ আমি স্বেচ্ছায় নিবাইতেছি—ইহাতে কাহারও দোষ নাই। দয়াময়! তোমার দয়ার সীমা নাই। তুমি যেমন মানব জীবন অনন্ত যাতনায় ডুবাইয়াছ—তেমনি যখন ইচ্ছা তখনই শেষ করিবার উপায়ও মনুষ্যের হস্তে দিয়াছ। তবে কেন মানব যন্ত্রণার সময় এই সর্ব্ব-সন্তাপনাশক মহৌষধ সেবন করিবে না? যোগেন্দ্র! দুঃখিনীর হৃদয়-রত্ন! তুমি কি ভাবিয়াছ, আমি তোমাতে বঞ্চিত হইয়াও জীবন ধারণ করিতে পারিব? চন্দ্র সূর্য্য নিবিয়া যাউক, পৃথিবী কক্ষভ্রষ্ট হউক, মহাসমুদ্র আসিয়া জনস্থান অধিকার করুক, তথাপি হয়তো এ প্রাণ থাকিবে! কিন্তু তোমার অদর্শনেও কি বিনোদিনী বাঁচিয়া থাকিবে? কি দায়? কেন?"

তাহার পর সেই কুন্দ-কুসুমাঙ্গী নবীনা বালা অমৃতের ন্যায় সমাদরে সেই পাত্রস্থ বিষ গলাধঃ করিলেন!!! সমস্ত পান করিয়া ভাবিলেন,—"কতটুকু বিষ খাইলে মানুষ মরে, তাহাতো জানি না—"তখন আবার গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া করযোড়ে কহিলেন,—"কৃপাময় জগদীশ, এই কর যেন অভাগিনীর উদরে গিয়া বিষেরও বিষত্ব না যায়।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

চক্রীর পরিণাম।

"Deservedly thou greivs't eompo'sd of lies
From the beginning, and in lies wilt end;"
——Paradise Regained.

যখন হরগোবিন্দ বাবু ও যোগেন্দ্রনাথ খিড়কী দ্বার দিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন সেই দ্বার দিয়া মাধী বাহিরে আসিতেছিল। এজগতে পাপের ভার বৃদ্ধি করিতেই মাধীর ন্যায় জীবের জন্ম। যদিও পাপ মাত্রই তাহার অভ্যস্ত বিদ্যা, তথাপি সে এখনই যে কার্য্য করিয়া আসিতেছে, তাহা পাপের কাষ্ঠা। পাপে পাপে যদিও তাহার হৃদয় পাষাণবৎ হইয়া গিয়াছে, তথাপি যে ব্যক্তি পরের সুখ ও ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত স্বহস্তে জানিয়া শুনিয়া অপর এক জনের জন্য বিষ আনিয়া দিতে পারে, সে না পারে কি?

মাধী এখনই বিনোদিনীর নিমিত্ত বিষ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার প্রদত্ত অলঙ্কারগুলি সাবধানে ঢাকিয়া লইয়া বাটী যাইতেছে; সেই জন্তই তাহার মনটা একটু আশঙ্কিত হইয়াছে। তাহার গতি সেই জন্তই অনিয়মিত, বদন সেই জন্ত বিমর্ষ, দৃষ্টি সেই জন্তই সঙ্কুচিত, সর্ব্বাবয়বের সেই জন্তই ভীত ভাব। তাহাকে দর্শন মাত্র যোগেন্দ্রনাথের ক্রোধ নবীন ভাবে জলিয়া উঠিল। তিনি তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—

"মাধী, তোর মৃত্যু নিকট।"

মাধী চমকিয়া উঠিল। কোন উত্তর করিল না। যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"তুই জানিস কি সর্ব্বনাশ করিয়াছিস।"

মাধী ভাবিল, কি সর্ব্বনাশ! তবেতো সব জানিয়াছে! সাহসে ভর করিয়া বলিল,—

"আমি কি করিয়াছি?"

যোগেন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন,—

"আমি কি করিয়াছি? মিথ্যাবাদিনি, সর্ব্বনাশিনি, তুমি কি করিয়াছ? তুমি কি করিয়াছ তাহা তোমায় দেখাইতেছি! তুমি স্ত্রীলোক বলিয়া তোমায় ক্ষমা করিব না।"

মাধী ভয়ে অবসন্ন হইল। বুঝিল, সমস্তইতো জানিয়াছে। যখন জানিয়াছে তখন সবই করিতে পারে। চাপ্‌টা একটু পাতলাইয়া দিবার আশায় বলিল,—

"আমার কি দোষ? আমি কি জানি?"

তখন যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"তোর মিথ্যা কথার আদি নাই, অন্ত নাই। তুই কিছুই জানিস্ না? বিনোদ আমাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, সে সকল আমি পাই নাই কেন, তুই জানিস্ না? তুই জানিস্ কি না তাহা যখন তোর হাড় গুঁড়া করিয়া বুঝাইয়া দিব, তখন বুঝিতে পারিবি।"

মাধী প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—

"আমি কি ইচ্ছায় করিয়াছি? বড় দিদি—"

যোগেন্দ্র আরও ক্রোধের সহিত বলিলেন,

"আবার মিথ্যা কথা? আরও মিথ্যা কথা? এত দুষ্টবুদ্ধি তোমার বড় দিদির নাই। আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিব তবে ছাড়িব।"

তখন মাধী কাঁদিয়া ফেলিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—

"আমি তখনই জানি, কারও কিছু হবে না; মারা যেতে আমি গরিব মারা যাব।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"তোমার মত ভয়ানক লোক এ পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। তুই—তুই আমাকে নিজ মুখে বলিয়াছিস্ বিনোদিনী অসতী, আর এই মাষ্টার মহাশয় তাঁহার প্রাণবল্লভ। তোর ঐ মুখ আমি খণ্ড খণ্ড করিব; তোকে কুকুর দিয়া খাওয়াইব।"

তখন হরগোবিন্দ বাবু বলিলেন;—

"মাধী জগতে এমন কোন শাস্তি নাই যাহা তোর উপযুক্ত।"

তখন মাধী দেখিল, তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত বটে; সকল কথাইতো উহারা জানিয়াছে। এমন কোন উপায় তখন মাধীর মনে আসিল না, যাহাতে তাহার নিষ্কৃতি হয়। তাহার হিতাহিত বুদ্ধির লোপ হইল। বলিল,—

"সকলই সত্য, কিন্তু সকলই বড় দিদির জন্ত। তোমরা আমায় ক্ষমা—কর আমার কোন দোষ নাই। বড় দিদি জামাই বাবুর জন্ত পাগল, আমি কি করিব?"

এই বলিয়া মাধী কাঁদিতে কাঁদিতে মাষ্টার মহাশয়ের চরণে পড়িল। কাপড়ের মধ্যে যে সকল গহনা ছিল, তাহার কথা মাধীর মনে হইল না; গহনাগুলা বাহির হইয়া পড়িল।

যোগেন্দ্র দেখিয়াই বুঝিলেন, এ সকল বিনোদিনীর। ব্যস্ততা সহ জিজ্ঞাসিলেন,—

"এ আবার কি মাধী? এ আবার কি সর্ব্বনাশের কল?"

তখন মাধী বুঝিল, তাহার কপাল একেবারেই পুড়িয়াছে। অলঙ্কার আমার হাতে কেন আসিল সন্ধান করিলেই জানিবে, ছোট দিদি দিয়াছেন। ছোট দিদি কেন দিলেন খোঁজ করিলেই জানিতে পারিবে, আমি তাঁহাকে বিষ আনিয়া দিয়াছি। তখন সে মাষ্টার মহাশয়ের পা ছাড়িয়া দিয়া উঠিল এবং বলিল,—

"আমার পাপের সীমা নাই। আমার কপাল পুড়িয়াছে। তোমরা যা খুসি কর।"

এই সময়ে বাটীর মধ্যে একটা তুমুল ক্রন্দন-ধ্বনি উঠিল। সেই গোল শুনিয়া হরগোবিন্দ বাবু ও যোগেন্দ্র বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মাধী অলঙ্কার গুলা সেই স্থানে ফেলিয়া চলিয়া গেল। সেই দিন সন্ধ্যাকালে প্রতিবেশীরা দেখিল, মাধীর মৃতদেহ রায়দের পুষ্করিণীর জলে ভাসিতেছে।

—*—

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

অপূর্ব্ব মিলন।

"I with thee have fix't my lot,
Certain to undergo like doom; if death
Consort with thee, death is to me as life;
So forcible within my heart I feel
The bond of nature draw me to my own
My own in thee for what thou art is mine;
Our state cannot be severed, we are one
One flesh, to loose were, to lose myself.'
Paradise Lost.

মাষ্টার মহাশয় ও যোগেন্দ্র বাবু বাটির মধ্যে প্রবেশিয়া দেখিলেন, বিনোদিনীর প্রকোষ্ঠ হইতে অতি ভীষণ ক্রন্দন-ধ্বনি উঠিতেছে। মাষ্টার মহাশয় সভয়ে বলিলেন,—

"কি সর্ব্বনাশ!"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"বিনোদ বুঝি আমায় ফাঁকি দিয়া পলাইতেছেন? নির্ব্বোধ! কোথায় যাইবে?

তাঁহারা সংজ্ঞা-শূন্যের ন্যায় ভাবে বিনোদিনীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন কি সর্ব্বনাশ! বিনোদিনী ভূশয্যায় শয়ানা। তাহাকে বেষ্টন করিয়া তাহার মাতা ও পুরনারীগণ আর্ত্তনাদ করিতেছেন। তাঁহারা তথায় প্রবেশ করায় সেই ক্রন্দন-ধ্বনি শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। বিনোদিনীর মাতা আছড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন,—

"যোগি! বাবা! বিনী আমার বিষ খাইয়াছে।"

তখন যোগেন্দ্রের চক্ষে জল-বিন্দুও নাই। তাঁহার মূর্ত্তি চৈতন্যহীন মনুষ্যের ন্যায় বিকল। তাঁহার নেত্র স্থির, উজ্জ্বল ও আয়ত। যোগেন্দ্রের নাম বিনোদিনীর কর্ণে প্রবেশ করিল। বিনোদিনী গৃহের চতুর্দ্দিকে একবার ফিরিয়া চাহিলেন। তখন যোগেন্দ্রনাথ যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় ধীরে ধীরে গিয়া বিনোদিনীর শিয়রে বসিলেন। তখন বিনোদিনীর সেই মুকুলিত নেত্রের সহিত যোগেন্দ্রনাথের সেই স্থির নেত্রের মিলন হইল। তখন বিনোদিনী হস্তদ্বয় বিস্তার করিয়া যোগেন্দ্রের পদদ্বয়

ধারণ করিলেন। তখন সেই মৃত্যুপীড়িত বদনে হাস্যের জ্যোতিঃ দেখা দিল!!!

মাষ্টার মহাশয় বিনোদিনীর মাতার হস্ত ধারণ করিয়া বাহিরে আনিলেন এবং পুর-নারীগণকে বাহিরে আসিতে বলিলেন। সকলকেই গোল করিতে বারণ করিলেন।

তখন বিনোদিনী বলিলেন,—

"আমাকে ক্ষমা কর।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন,—

"পাগলিনি! এ দুর্ম্মতি কেন? আমাকে ফেলিয়া যাইবার কি যো আছে?"

বিনোদিনী নয়ন মুদিয়া বলিলেন,—

"ছিঃ, তোমরা বড় প্রতারক!"

তখন যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"না, তোমার যোগেন্দ্র প্রতারক নহে।"

যোগেন্দ্রনাথ সমস্ত ঘটনা অতি সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন। শুনিয়া বিনোদিনীর চক্ষে জল পড়িতে লাগিল।

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"কাঁদিতেছ কেন?"

বিনোদিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—

"এক ঘণ্টা আগে কেহ যদি আমাকে এই কথা এমনি করিয়া বলিত, তাহা হইলে আমার এ রত্ন ছাড়িতে হইত না। কিন্তু এখন তো আর বাঁচিবার উপায় নাই।"

"ছাড়িবে কেন বিনোদ? যদি তোমার বাঁচিবার উপায় না থাকে, আমারও তো মরিবার উপায় আছে।"

তখন বিনোদ সজল নয়নে যোগেন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—

"ছিঃ! তাহা মনেও করিও না। তুমি বাঁচিয়া থাকিলে সংসারের অনেক উপকার।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"তাহাতে আমার কি?"

তখন বিনোদিনী বলিলেন,—

"যোগেন্দ্র! আর তো আমার বিলম্ব নাই। আমার যোগিন আমারই আছেন জানিয়া মরণ এখন বড় সুখের বটে, কিন্তু আগে যদি আমি ইহা একটুও বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে, যোগিন! আমি মরিবার কথা একবার মনেও করিতাম না। জগদীশ্বর!"

সুন্দরী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে আবার কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—

"আমার এখন কথা কহিতে বড় কষ্ট হইতেছে। আমার যোগেন্দ্রের সহিত আমি আর কথা কহিতে পাইব না। ওঃ! যোগেন্দ্র!"

তখন যোগেন্দ্রনাথ বিনোদিনীর মস্তক আপন উরুর উপর স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার শীতল ওষ্ঠ চুম্বন করিয়া কহিলেন,—

"দুঃখ কি? জীবন কতক্ষণের? এবার যে জীবনে প্রবেশ করিতেছ তাহার শেষ নাই। সংসার দেখিলে তো—ইহা পাপের পুরী। এখানে আত্ম নাই, পর নাই, কেবল স্বার্থই লক্ষ্য। এবার যে রাজ্যে যাইবে তথায়, হিংসা নাই, শত্রুতা নাই। তবে ভয় কি?"

তখন বিনোদিনী ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—

"পরমেশ্বর! যাহাদের জন্য আমাদের এই বিচ্ছেদ তাহাদের যেন এজন্য পাপ না স্পর্শে।"

বিনোদিনী চুপ করিলেন। তিনি যোগেন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নেত্র দিয়া জল পড়িয়া যোগেন্দ্রের উরু ভাসাইতে লাগিল। যোগেন্দ্রের চক্ষে এখনও জল নাই। সেই বিনোদিনী—তাঁহার সেই বিনোদিনী তাঁহার ক্রোড়ে পড়িয়া কাঁদিতেছেন, মৃত্যু আসিয়া সেই নবীনার জীবন প্রায় গ্রাস করিয়াছে; যোগেন্দ্রনাথ সমস্তই

বুঝিতেছেন, কিন্তু কাঁদিতেছেন না, বা কাতরতা প্রকাশ করিতেছেন না। কিন্তু ওঃ! তাঁহার মূর্ত্তি কি ভয়ানক!!! তাঁহাকে দেখিলে ভয় হয়, বোধ হয় যেন প্রাণহীন দেহ বসিয়া আছে! তাঁহার নেত্র শবের ন্যায় শ্বেত অথচ নিষ্প্রভ, তাঁহার বদন শবের ন্যায় কঠিন ও অবশ!

যোগেন্দ্র দেখিলেন, বিনোদিনীর জীবলীলা অবসান হইতে আর বিলম্ব নাই। বিনোদিনী একবার কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ভাল করিয়া কথা মুখ দিয়া বাহিরিল না। তখন তিনি স্বীয় শক্তিশূন্য হস্ত ধীরে ধীরে উঠাইলেন। সেই হস্ত যোগেন্দ্রের কণ্ঠে পড়িল। তখন যোগেন্দ্র হস্ত দ্বারা বিনোদিনীকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার বক্ষের উপর পড়িয়া গেলেন। তখন বিনোদিনীর বদনে মৃত্যু-চিহ্ন সকল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে বদন দিয়া একটী অস্ফুট বাক্য বাহিরিল। সে বাক্য,—

"যো—গি—"

এ জগতে সেই পতি-গত-প্রাণা, সাধ্বী বিনোদিনী আর কথা কহিতে পাইল না!

মৃতার বক্ষঃস্থলস্থ ব্যক্তি একবার মাত্র স্বীয় মস্তক আন্দোলন করিয়া একটা কথা বলিতে প্রযত্ন করিলেন, কিন্তু কথা বাহিরিল না। একটি অপরিস্ফুট ধ্বনি মাত্র বুঝা গেল।

এ জগতে আর সেই নিষ্কলঙ্ক দেহে সংজ্ঞা আসিল না!

অচিরে হরগোবিন্দ বাবু সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন কি? দেখিলেন—সেই দুই প্রেমময় পক্ষী পলাইয়া গিয়াছে! তাহাদের সেই নবীন দেহ-পিঞ্জর মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। সংসারের প্রবল ঝটিকায় সেই দুইটী সুকুমার কুসুম বৃন্তচ্যুত হইয়া শুকাইয়া গিয়াছে। তখন হরগোবিন্দ বাবু সেই দুই প্রেমপুত্তলীর সমীপে বসিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পরে তথায় আলুলায়িত-কুন্তলা কমলিনী উন্মাদিনীর ন্যায় বেগে প্রবেশ করিল। কিয়ৎকাল এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই কালামুখী আপনার কীর্ত্তি দেখিল। সহসা উচ্চরবে হাস্য করিয়া করতালি দিতে দিতে কহিল,—

"বেশ! বেশ! বেশ!"

তাহার পর? তাহার পর রায়েদের এই সোণার সংসার ছাই হইয়া গেল!

সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

—*—

হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান্ ব্যক্তিবৃন্দকে বিনোদিত করিবার অভিপ্রায়ে, এই গ্রন্থ লিখিত হইল সনাতন হিন্দুধর্ম্মে ও সুপবিত্র আর্য্য শাস্ত্রোক্তি সমূহে যাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাদৃশ বিজ্ঞজনেরা এ গ্রন্থ পাঠ না করিলেই সুখী হইব।

এই গ্রন্থের প্রথমার্দ্ধ 'প্রচার' নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎকালে শরীরিক ও মানসিক বহুবিধ অসুস্থতা হেতু, আমি ইহা সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম হই নাই। তজ্জন্য অনেকের নিকট আমি এতাবৎ কাল নিরতিশয় লজ্জিত ছিলাম। অধুনা ভগবৎ কৃপায় আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত হইল।

শ্রীদামোদর দেবশর্ম্মা।

মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ন সন্তোষধীঃ।
মধুনক্ত মৃতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্ নো বনস্পতিমধুমা অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

—ঋগ্বেদ সংহিতা।

(স্বাস্থ্যকর বায়ু প্রবাহিত হউক, নদীসমূহ হইতে অমৃত নিঃসৃত হউক, ওষধিসমূহ সুস্বাদ হউক, রাত্রি ও উষা স্বাস্থ্যপ্রদ হউক, পার্থিব রজঃপুঞ্জ স্বাস্থ্যজনক হউক, আমাদের পিতৃস্বরূপ দ্যুলোক সুখময় হউক, আমাদের বনস্পতিসমূহ ফলবান্ হউক, সূর্য্য আনন্দপ্রদ কিরণ বর্ষণ করুন, আমাদের গাভীসকল পয়স্বিনী হউক।)

—*—

বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশের সুবিমল শশধর,

স্বদেশ-বৎসলগণের গৌরবস্থল

কবি-কুল-পুঙ্গব,

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মহাশয়ের

সুপবিত্র ও সমাদৃত নামে,

তদীয় একান্ত গুণপক্ষপাতী

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক,

আন্তরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতির

নিদর্শন স্বরূপে,

এই গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত হইল।

শান্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দিন যায়। একটি দুইটি করিয়া জীবনের কত দিনই চলিয়া গিয়াছে—আজিকার দিনও যায়। দিন যায়, আবার দিন আইসে; কিন্তু যে দিনটি যায় সেটি আর আইসে কি? সেটি আর আইসে না; এ কথা কে না বুঝে, কে না জানে? কিন্তু বল দেখি প্রতিদিন সূর্য্য-দেবের অস্তগমন দেখিয়া সংসারের কয় জন ইহা মনে করে? দিন তো যায়—আজিকার দিনও চলিল; কিন্তু বল দেখি প্রতিদিন যাইবার সময়ে, আমাদিগকে কি বলিয়া যায়? স্বায়ংকালের বিহঙ্গম কূজন, অস্তোন্মুখ দিবা-করের আরক্ত লোচন, তামসী নিশার অগ্রদূতী-গণের অপাঙ্গ দৃষ্টি, আমাদের বলিয়া দেয় না কি,—'হে মানব! এ ভব-রঙ্গ-ভূমিতে তুমি যে কয়দিনের জন্য লীলা খেলা করিতে আসিয়াছ, তাহার একটি দিন অদ্য কমিয়া গেল।' এ চৈতন্য—এ অবশ্যম্ভাবী সহজ জ্ঞান যদি মানবের থাকিত, প্রকৃতির এই দৈনন্দিন উপদেশ যদি মানব প্রণিধান করিত, তাহা হইলে মানুষ এতদিনে দেবত্ব লাভ করিত এবং সংসার শান্তি ও পুণ্যের নিকেতন হইত।

আমরা বলিতে বসিয়াছি, দিন যায়। পুণ্য-সলিলা ভাগীরথীর বিশাল বক্ষঃ ভেদ করিয়া, দেশ বিদেশের কতই নৌকা চলিতেছে। হেলিতে দুলিতে, ছোট বড় কতই তরণী গঙ্গাবক্ষে ভাসিতেছে। সন্ধ্যা হইলে নৌকায় নৌকায় প্রদীপ জ্বলিল। সেই আলোকের প্রতিবিম্ব জলে পড়িয়া জলমধ্যে প্রকাণ্ড আলোকরেখা বিরচিত হইল। নৌকা ছুটিতেছে—জলমধ্যে সঙ্গে সঙ্গে তাহার আলোকাভাও ছুটিতেছে। জল মধ্যে অগ্নি খেলিতেছে, কাঁপিতেছে, দুলিতেছে ও ছুটিতেছে। দুই বিধর্ম্মী জড়ের অদ্ভুত মিলন! ঝির ঝির করিয়া বারি-কণা-সুস্নিগ্ধ নির্ম্মল বসন্ত-বায়ু বহিতেছে। অদ্য পূর্ণিমা। আকাশে তারাদল-সংবেষ্টিত শশধর, পারিষদ ও অনুচর পরিবৃত নরপতির ন্যায়, সগৌরবে বিরাজিত। সন্নিহিত গ্রামের দেবালয় হইতে সান্ধ্য দেবারতির বাদ্য-ধ্বনি সমুত্থিত ও নিবৃত্ত হইল। এমন সময়ে, সুদূরস্থিত এক নৌকা হইতে, দুইজন মাঝি সমস্বরে গীত ধরিল—

" ও যে চন্দন কাঠের না,
ডুবেও ডোবে না,
ও সে হাল ধরে রয়েছে রে তার পরমা
গোয়ালা ।"

কি মধুর, কি অপূর্ব্ব, কি হৃদয়দ্রবকর ! সেই স্বর্গীত-ধ্বনি, জাহ্নবীর পবিত্র বক্ষে নাচিতে নাচিতে, সেই সুস্নিগ্ধ মৃদু মন্দ বায়ু হিল্লোলের সহিত খেলিতে খেলিতে, সে চন্দ্রমার সুনির্ম্মল কররাশির সহিত মিশিতে মিশিতে, তথায় অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সংগঠিত করিল। সেই ক্ষেত্রে তখন সুন্দরে সুন্দরে সৌন্দর্য্য সমষ্টির সুন্দর সম্মিলন হইল। সুন্দর শশধর, সুন্দর নাবিক-সঙ্গীত, সুন্দর জাহ্নবীজল, সুন্দর ল। বিধাতা সকলকে এই সকল সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিবার সমান ক্ষমতা দেন নাই। যে ভাগ্যবান্ তাহা ভোগ করিতে সক্ষম, তিনি আপনার চিত্ত সেই মোহকর রাজ্যে ছাড়িয়া দিয়া, অবাক্ হইয়া রহিলেন।

পণ্য-ভার-সমাকুলিত নৌকাসমূহ গর্ব্বিণী নারীর ন্যায়, মন্থর গতিতে চলিতেছে। এ জগতে যাহার বোঝাই হাল্কা, তাহার চালচলনও হাল্কা। হাল্কা নৌকা সকল ফর ফর করিয়া চলিতেছে। কিন্তু সকল নৌকার কথায় আমাদের কাজ কি ? সম্মুখে ঐ যে নৌকাখানি ধীরে ধীরে যাইতেছে, তাহাতে যে পুরুষ ও স্ত্রী বসিয়া আছেন, তাঁহাদের কথাই আমরা এক্ষণে বলিব। সেই নৌকার আরোহী রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার পত্নী সুকুমারী দেবী। রমাপতির বয়স ২৩।২৪ এবং সুকুমারীর বয়স অষ্টাদশ অতিক্রম করিয়াছে বোধ হয় না। কাটোয়া নামক গ্রামে রমাপতি মাসিক পঁচিশটি টাকা মাত্র বেতনে স্কুল মাষ্টারি করেন। এরূপ অবস্থার লোকে পরিবার লইয়া কর্ম্মস্থানে থাকে না। কিন্তু কোন দিকে আর কেহ আপনার লোক না থাকায়, সুকুমারীকে ফেলিয়া, রমাপতি বিদেশে যাইতে অক্ষম। যুগলে বিধাতার অপূর্ব্ব সম্মিলন কৌশল অপূর্ব্বরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। পুরুষ রমাপতি পৌরুষ শোভার আদর্শ এবং নারী সুকুমারী কামিনী-কুল-কমলিনী। ক্ষুদ্র নৌকা এই দুই সৌন্দর্য্যসার বক্ষে লইয়া, বুক ফুলাইয়া ভাসিতেছে। সুকুমারী নিরাভরণা, তাঁহার প্রকোষ্ঠে কালো হাড়ের চুড়ি ভিন্ন অন্য ভূষণ নাই। কিন্তু কি সুন্দর ! সেই সুগোল হস্তে— সেই স্বর্ণবর্ণ সুকুমারীর সুকুমার প্রকোষ্ঠে, সেই কৃষ্ণভূষণ কি সুন্দরই দেখাইতেছে ! আর রমাপতি ? তাঁহার সেই বিশাল বক্ষে অতি শুভ্র যজ্ঞোপবীত হেলিয়া দুলিয়া কত শোভাই পাইতেছে। ভূষণ নামে বর্ত্তমানকালে যে সকল সামগ্রী ব্যবহৃত হয়, তাহাতে এমন অপার্থিব সৌন্দর্য্য বাড়ায় কি কমায় তাহা বিশেষ বিচার্য্য কথা। ভূষণশোভাও সৌন্দর্য্যের সহায়তা করে। যাহার যাহা নাই তাহারই তাহা পাইবার জন্য সহায়তার আবশ্যক হয়। যাহাদের রূপ নাই, অথবা রূপের অভাব আছে বলিয়া যাহারা জানে, অলঙ্কার তাহাদের সহায়। কিন্তু এস্থলে— যেখানে রূপ পূর্ণিমার চাঁদের মত পূর্ণ মাত্রায় প্রস্ফুটিত, সেখানে ছার ভূষণের প্রয়োজন ?

রমাপতি দরিদ্র ; তাঁহার সাত রাজার ধন সুকুমারীকে লইয়া তিনি আনন্দে আপনার জন্মভূমি—পিতৃপিতামহাদির নিবাসস্থান হুগলিতে ফিরিতেছেন। নৌকামধ্যে একটী কাঠের বাক্স, দুইটী কাপড়ের মোট, কয়েকখানি লেপ ও তোষক, দুইটী বালিশ এবং কিছু পিত্তল ও কাংস্যপাত্র রমাপতি ও সুকুমারীর বিষয়-বিভবের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

সুকুমারী জিজ্ঞাসিলেন,—

"উপর হইতে যে আরতির বাজনা শুনিতেছি, ও কোন্ গ্রাম?

রমাপতি উত্তর দিলেন,—

"শান্তিপুরের নাম কখন শুনিয়াছ কি? মেয়ে মানুষ শান্তিপুরের বড় ভক্ত; কারণ শান্তিপুর তাহাদের জন্য পুরুষ ভুলাইবার ফাঁদ তৈয়ার করিয়া দেয়। শান্তিপুরের উলঙ্গিনী সাড়ী নামেও যা, কাজেও তা। যাঁহারা কাপড় পরিয়াও উলঙ্গ থাকিতে চাহে, তাহারা, এখানকার তাঁতিদের আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে, উলঙ্গিনী সাড়ী পরিয়া রূপের বাঁধন খুলিয়া দেয়। এই সেই শান্তিপুর। এখন তোমার জন্য সেই হাবুডুবু খাওয়ান, মন-মজান সাড়ী একখানি সংগ্রহ করিতে হইবে কি?"

সুকুমারী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা কর। যদি তোমার হাবুডুবু খাওয়ার এখনও বাকী থাকে, যদি তোমার মন এখনও পুরাপূরি না মজিয়া থাকে, তাহা হইলে কাজেই সে জন্য কল-কৌশল সন্ধান করিতে হইবে। কিন্তু কাপড়ে তাহার কি করিবে? কাপড়, অলঙ্কার প্রভৃতি সামগ্রী বাহিরের শোভা বাড়ায়। কেবল বাহিরের শোভাতে কেবল বাহিরই মজে। সে মজা, সে হাবুডুবু কেবল নেশাখোরের নেশা। দুদিনেই তাহার শেষ হয়।"

রামপতি জিজ্ঞাসিলেন,—

"তবে তুমি চাও কি?"

সুকুমারী সগর্ব্বে উত্তর দিলেন-

"আমি যাহা পাইয়াছি।"

রমাপতি প্রীতিপূর্ণ হাসির সহিত বলিলেন,

"তুমি পাইয়াছ কি? আমি তো দেখি তুমি কেবল সংসারের ক্লেশ ভুগিতে আসিয়াছ, মনের সাধে তাহাই ভোগ করিতেছ। আর আমার ভালবাসা? সত্য কথা বলিব নাকি? তুমি ছাড়া আর সকলকেই আমি খুব ভালবাসি।"

সুকুমারী বলিলেন,—

"আমার উপরে জন্ম-জন্মান্তরেও যেন তোমার এমনই নিগ্রহ থাকে। আমি জানি, তোমার যে ভালবাসার আমি অধিকারিণী, জগতে নারীজন্ম লাভ করিয়া, আর কখনই কেহ তেমন প্রেম ভোগ করিতে পায় নাই। কত শত রাজরাণীর দশা দেখিয়া আমি হাসিয়া মরি। তাহারা সংসারে আসিয়া কতকগুলা সোণার ঢেলা গায়ে জড়াইয়া হাসিয়া বেড়ায়। কিন্তু যে অমূল্য সোণার শিকলে ইহলোক ও পরলোক বাঁধা আছে, তাহা তাহারা দেখিতেও পায় না। আমার কষ্টের কথা বলিতেছ? হে মধুসূদন! তোমার পাদপদ্মে দাসীর এই প্রার্থনা যে, যতবার আমাকে এই মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হইবে, তত বারই যেন আমি এইরূপ কষ্টই পাই।"

সুকুমারীর চক্ষু জলভারাকুল হইল। রমাপতি মনে মনে বলিলেন,—"হে ভগবন্! আমি কি তপস্যার বলে, কোন্ সুকৃতির ফলে এই দেবীকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছি? সার্থক আমার জন্ম! আমি তো ঐ দেবীর দাস।"

সুকুমারী আবার বলিলেন,—

"আর তোমার ভালবাসার কথা তুমি নিজে কি বুঝিবে? যে যাহা ভোগ করে সেই তাহা বুঝে। তোমার ভালবাসা বুঝাইয়া বলিবার কথা নহে। আমার রক্ত মাংস, মন প্রাণ তোমার ভালবাসায় ডুবিয়া রহিয়াছে। হে নারায়ণ! কি পুণ্যে আমার এ সুখ? এ অধম নারীর প্রতি তোমার একি অতুল কৃপা?"

নৌকা চলিতে লাগিল। মাঝিরা চাকদহের নীচে রাত্রের মত নৌকা লাগাইয়া রাখিবে স্থির করিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

সহসা পশ্চিম গগনে একটু কালো মেঘ দেখা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু ঝড়ও উঠিল। রমাপতি মাঝিদিগকে নৌকা না চালাইয়া বাঁধিয়া রাখিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু তাহারা সামান্য ঝড় বুঝিয়া, নৌকা লাগাইয়া রাখিবার কোনই দরকার মনে করিল না। চাকদহের এদিকে নৌকা লাগাইতে তাহাদের ইচ্ছাও ছিল না। সুতরাং তাহারা রমাপতির কথা না শুনিয়া, নৌকা চালাইতে লাগিল।

সুকুমারী বলিলেন,—

"ঝড়ও উঠিয়াছে, মেঘও হইয়াছে। চাকদহ পর্য্যন্ত যাইতে যাইতে যদি ঝড় খুব বাড়িয়া উঠে, তাহা হইলে কি হইবে ?

রমাপতি বলিলেন,—

"তাহা হইলে নৌকা ডুবিয়া যাইবে, সেটা বড়ই ভয়ের কথা নাকি ?"

সুকুমারী বলিলেন,—

"ভয়ের কথা নহে সত্য। কারণ তোমার সাক্ষাতে তোমাকে ভাবিতে ভাবিতে মরিব, তাহার অপেক্ষা ভাগ্য আর কি আছে ? কিন্তু মরণের পর তোমার কাছে তো আর থাকিতে পাইব না।"

রমাপতি কহিলেন,—

"তোমার যদি মরণ হয়, তাহা হইলে আমারই কি জীবন থাকিবে পাগলিনি ? আজিকার ঝড়ে যদি নৌকা ডুবিয়া যায়, তাহা হইলে তোমারও যে গতি, আমারও সেই গতি। আমরা জীবনে ও মরণে একই থাকিব। আজি যদি দেবতা আমাদের নৌকা ডুবাইয়া দিয়া সন্তুষ্ট হন, তাহাতে আমাদের কোনই আপত্তি করিবার অধিকার নাই। কিন্তু এটুকু তুমি স্থির জানিও যে, আমরা উভয়ে একসঙ্গে ডুবিব, একসঙ্গে যাতনা ভোগ করিব, একসঙ্গে এই ধূলার দেহ ছাড়িব, উভয়ে একসঙ্গে ইহার অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ দেহ ধরিব, তাহার পর উভয়ে একসঙ্গে এই যন্ত্রণার রাজ্য ছাড়িয়া, পরম আনন্দরাজ্যে বেড়াইব ও সকল আনন্দের যিনি মূল এবং সকল প্রেমের যিনি নিদান, উভয়ে একসঙ্গে সেই সর্ব্বফলদাতার গুণ-গান করিব। অতএব মরণে আমাদের দুঃখের কথা কি আছে ?"

সুকুমারী কোন উত্তর দিলেন না; কিন্তু রমাপতির নিকটে আর একটু সরিয়া আসিলেন। ক্রমে ঝড় আরও উগ্র-মূর্ত্তি ধারণ করিল; মেঘে সমস্ত গগন ছাইয়া গেল; সেই শোভাময় চন্দ্রতারা কোথায় লুকাইল এবং প্রকৃতি অতি বিকট বেশে সাজিয়া দাঁড়াইল। রণরঙ্গিণী প্রকৃতি ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ ছড়াইয়া অট্টহাসি হাসিতে লাগিল। প্রবল বাত্যার শাঁ শাঁ শব্দে এবং মেঘের তীব্র গর্জ্জনে সেই রণোন্মাদিনী হুঙ্কারিতে লাগিল। মাঝিরা নৌকা স্থির রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু বিফল সে চেষ্টা। নদীবক্ষে বড় বড় ঢেউ উঠিল; সেই সকল তরঙ্গের জল নৌকার উপরেও উঠিতে লাগিল। মাঝিরা আগে কথা শুনে নাই, এখন নৌকা তীরে আনিবার জন্য কত চেষ্টাই করিতে

লাগিল। কিন্তু নৌকাচালনা তাহাদের পক্ষে অনায়ত্ত হইয়া উঠিল। রমাপতি সকলই জানিতেছেন ও বুঝিতেছেন। তিনি মাঝিদের জিজ্ঞাসিলেন,—

"গতিক কি ?"

প্রধান মাঝি বলিল,—

"ঠাকুর, গতিক বড় মন্দ। এখন যা হয় কর।"

সুকুমারীর চক্ষু বহিয়া তখন ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে। তিনি তখন দুই কর উর্দ্ধদিকে তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—

"হে অনাথনাথ! হে দীনবন্ধু! আমি মরি তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু দয়াময়! এই কর, যেন আমার ঐ দেবতা, ঐ গুরুর গুরুর কোন বিপদ না ঘটে। আমার মত একটা ক্ষুদ্র পিপীলিকার মরা বাঁচায় সংসারের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না; কিন্তু ভক্তবৎসল দয়াময়! আমার ঐ দেবতা,অসময়ে সংসার ত্যাগ করিলে, তোমার রাজ্যের অনেক ক্ষতি হইবে। হে মধুসূদন! প্রেমে যাহার হৃদয় পূর্ণ তিনি যদি সংসারে থাকিতে না পান, তবে আর থাকিবে কে? হে বিপন্নবান্ধব! এ অধমনারী তোমার চরণে আর কখন কোন ভিক্ষা চাহে নাই। তুমি কাতরের সহায়; আজি তুমি এ অধম নারীকে এ ভিক্ষা দিবে না দয়াময়? দিবে, দিবে, দিবে, অবশ্যই দিবে।"

তাহার পর রমাপতির দিকে ফিরিয়া, সুকুমারী তাঁহার চরণরেণু মস্তকে গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—

"আমার সর্ব্বস্ব! তুমি তো মরিতে পাইবে না। যিনি এই ভবনদীর প্রধান কর্ণধার, আমি সেই হরির চরণ ধরিয়া কাঁদিয়াছি। তিনি তোমাকে রাখিবেনই রাখিবেন। আমাকে তুমি যত ভালবাস তাহা স্মরণ করিয়া দেখ। আমার কোন্ প্রার্থনা তুমি কবে না শুনিয়াছ? এই অন্তিমকালে, হে স্বামিদেব! তোমার চরণে আমার এক প্রার্থনা আছে। তুমি তাহা রক্ষা করিবে জানিলে, আমি হাসিতে হাসিতে মরি। আমি মরিয়া যাওয়ার পর তোমাকে আবার বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে হইবে।"

রমাপতি, তখন সুকুমারীকে সস্নেহে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিয়া, বলিলেন,—

"চল সুকুমারি! নৌকার ছাতের উপর গিয়া, যাহা বলিতে হয় বলিব, শুনিও।"

তাহার পর উভয়ে, আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া, বাহিরে আসিলেন। তখন রমাপতি বলিলেন,

"শুন দেবি! তোমাকে চিরদিন দেবী জানিয়া কায়মনোবাক্যে তোমার উপাসনা করিয়াছি। আজি যদি তোমারই মরণ হয়, তাহা হইলে আমি তোমাকে ছাড়িয়া বাঁচিতে পারিব কেন? এই তোমাকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। যদি এখনই নৌকা ডুবে, তাহা হইলে জানিও, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার দেহে নিঃশ্বাস বহিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাকে বাঁচাইতে যত্ন করিব। কিন্তু তাহাতেও যদি তোমাকে বাঁচাইয়া উঠিতে না পারি, তাহা হইলে জানিবে তোমারও যে গতি আমারও সেই গতি।"

সুকুমারী একটা উত্তর দিবার ইচ্ছা করিলেন কিন্তু তখনই একটা অতি ভয়ানক ব্যাত্যা আসিয়া নৌকা ডুবাইয়া দিল। সুকুমারীর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

নৌকা তো ডুবিয়া গেল, কিন্তু কোথায় রমাপতি—কোথায় সুকুমারী? ঐ যে—ঐ যে রমাপতি, সেই তরঙ্গায়িত জাহ্নবী বক্ষে, সুকুমারীকে পৃষ্ঠে লইয়া সাঁতার দিতেছেন। কখন জল তাঁহাদের উপর দিয়া চলিতেছে, কখন তাঁহারা জলের উপর দিয়া চলিতেছেন।

নিবিড় অন্ধকারে চারিদিক্ ছাইয়া ফেলিয়াছে। কোথায়—কোন্ দিকে যাইতেছেন তাহা রমাপতি জানেন না। প্রবল ঝড়ে ও খর-স্রোতে কখন বা তাঁহাদিগকে ডুবাইয়া দিতেছে কখন বা ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। অনবরত জলোচ্ছ্বাস তাঁহাদের মুখে আসিয়া লাগিতেছে ও উদরস্থ হইতেছে। তথাপি রমাপতি, পূর্ণ উদ্যমে, সকল বিঘ্নের সহিত, ঘোর যুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠে যে ভার রহিয়াছে, তাহার কল্যাণ-কামনায়, তিনি কোন বিপদকেই বিপদ বলিয়া মনে করিতেছেন না। কিন্তু সকল বিষয়েরই সীমা আছে। মানবদেহের ক্ষমতাদিরও একটা সীমা আছে সন্দেহ নাই। বহুক্ষণ এইরূপ বিজাতীয় শ্রমে, রমাপতি নিরতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। সুকুমারী তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—

"আমাকে ছাড়িয়া দাও, হয় ত আমিও সাঁতার দিতে পারিব।"

হাঁফাইতে হাঁফাইতে কাতর স্বরে রমাপতি বলিলেন,—

"কাহাকে ছাড়িয়া দিব?—তোমার ঐ শরীর?—মরণের পর।"

কিন্তু ক্রমশঃই রমাপতি অধিকতর ক্লান্ত ও অক্ষম হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তখন সুকুমারী অন্য উপায়াভাবে কৌশল করিয়া রমাপতির পৃষ্ঠাশ্রয় ত্যাগ করিলেন এবং তখনই ডুবিয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ রুদ্ধশ্বাস রমাপতি "সুকুমারী, সুকুমারী!" শব্দে চীৎকার করিয়া সেই স্থলে ডুবিয়া গেলেন। অচিরকাল মধ্যে সুকুমারীকে লইয়া রমাপতি পুনরায় ভাসিয়া উঠিলেন এবং পাছে সুকুমারী আবার ফাঁকি দেন, এই আশঙ্কায়, তাঁহার প্রকোষ্ঠ আপনার দন্ত মধ্যে কঠিনরূপে ধারণ করিলেন। কোমলাঙ্গীর হস্ত দন্তাঘাতে কাটিয়া গেল এবং সেই ক্ষতমুখ হইতে অবিরল ধারায় রুধির প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথীর নীরে মিশিতে লাগিল। সুকুমারী, রমাপতির পৃষ্ঠ ত্যাগ করিবার জন্য, কোন প্রকার বল প্রয়োগ করিলেন না। তিনি বুঝিতেন, এ সময়ে জোর করিলে, রমাপতির জীবনের এখনও যদি কোন আশা থাকে, তাহাও আর থাকিবে না। রমাপতি ক্রমে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন এবং সময়ে সময়ে সুকুমারীর সহিত ডুবিয়া পড়িতে লাগিলেন। শরীর আর বহে না, হাত আর উঠে না, পা আর নড়ে না, নিশ্বাস আর চলে না। তিনি বুঝিলেন, আর রক্ষা নাই! তখন তিনি বলিলেন,—

"সুকুমারি! আর বাঁচাইতে পারিব না। তোমারও যে গতি, আমারও—" তিনি যেই কথা কহিতে গেলেন, সেই তাঁহার দন্তমধ্য হইতে সুকুমারীর হস্ত খুলিয়া গেল। তখনই সুকুমারী আবার জলে ডুবিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে রমাপতি এক সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস গ্রহণ করিয়া জলে ডুব দিলেন।

এদিকে ঝড় একটু থামিল; ক্রমে ক্রমে মেঘ উড়িয়া যাওয়ায়, আকাশ-মণ্ডল আবার পরিষ্কৃত হইতে লাগিল। ক্রমে চন্দ্র ও তারা, উঁকি দিতে দিতে, বাহির হইয়া পড়িলেন এবং জাহ্নবীর-বক্ষ আবার চন্দ্রকরোজ্জ্বল হইয়া হাসিতে লাগিল। পরিবর্ত্তশীলা প্রকৃতি দেবী আবার শোভাময়ী সুন্দরীর বেশ ধারণ করিলেন। আকাশ বেশ খোলসা হইয়াছে এবং আর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই দেখিয়া দুই এক খানি নৌকাও লগী উঠাইয়া, কাছি খুলিয়া, গা ভাসাইয়া দিল।

রমাপতি ভাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু কোথায়

সুকুমারী? রমাপতি সাধ্যমত উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—

"সুকুমারী, সুকুমারী!"

কিন্তু কোথায় সুকুমারী?

আবার রমাপতি ডুবিলেন এবং আবার উঠিয়া ডাকিলেন,—

"সুকুমারী, সুকুমারী!"

কিন্তু কোথায় সুকুমারী?

তখন শ্রান্ত, ক্লান্ত, মর্ম্মাহত, রুদ্ধশ্বাস রমাপতির চৈতন্য তিরোহিত হইল এবং তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস শ্বাসনালী ত্যাগ করিল।

কিছু দূরে একখানি নৌকা আসিতেছিল। তদুপরিস্থিত লোকেরা রমাপতির শব্দ শুনিয়া স্থির করিল, এই ঝড়ে যাহাদের নৌকা ডুবিয়াছে, তাহার মধ্যে তিনিও একজন। তাহারা দ্রুত আসিয়া তাঁহাকে আপনাদের নৌকায় তুলিল এবং বহু কৌশলে ও শুশ্রূষায় তাঁহাকে আবার চেতন করিল। চৈতন্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে রমাপতি চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—

"সুকুমারী, সুকুমারী!"

কিন্তু কোথায় সুকুমারী?

তখন রমাপতি একে একে নৌকার তাবৎ লোকের মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, তাহাদের মধ্যে সুকুমারী নাই। তখন কেহ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বেই তিনি গঙ্গা-প্রবাহে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুইজন নাবিকও জলে পড়িল এবং শীঘ্রই তাঁহাকে উঠাইয়া আনিল। এবার নৌকার লোকেরা তাঁহাকে ধরিয়া রহিল। তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন।

"সুকুমারী, সুকুমারী!"

কিন্তু কোথায় সুকুমারী?

সুকুমারীকে হারাইয়াও, রমাপতির মরা হইল না। তাঁহার যে অবস্থা তাহাতে বাঁচিয়া থাকা কেবল বিড়ম্বনা এবং মৃত্যু তাহার তুলনায় পরম সুখ। অনেক শত্রু মিলিয়া তাঁহাকে সে সুখ ভোগ করিতে দিল না। যেখানে মৃত্যুর নামে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, মৃত্যু সে স্থলে অগ্রেই উপস্থিত। যেখানে, মৃত্যু দেখা দিলে, আত্মীয়বর্গ শোকে আকুল হইবে, রোদনে ও আর্ত্তনাদে বসুধা প্লাবিত হইবে, জীবিত স্বজনগণ যাতনায় অবসন্ন হইবে, সেখানে মৃত্যু, তস্করের ন্যায়, অলক্ষিত ভাবে, সমাগত হইয়া সর্ব্বনাশ সাধনে তৎপর আর যেখানে মানব মৃত্যুকে শান্তি-নিকেতন বলিয়া জ্ঞান করে, মৃত্যুর নিমিত্ত লালায়িত হয়, সেখানে শত সাধনাতেও মৃত্যুর দেখা নাই। মৃত্যুর নিমিত্ত লালায়িত রমাপতি মরিতে পাইলেন না। সুকুমারীকে হারাইয়াও, তাঁহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইল। অনেক শত্রু আত্মীয়তা করিয়া, যাতনা-ক্লিষ্ট রমাপতিকে মরিতে দিল না।

যে নৌকা আসিয়া রমাপতিকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিল, তাহাতে রাধানাথ চট্টোপাধ্যায় নামে এক প্রভূতধন-সম্পন্ন অতি অমায়িক স্বভাব ব্যক্তি, আপনার দলবল সহ, আরোহী ছিলেন। সেই রাধানাথ বাবু ও তাঁহার অনুগত জনেরা রমাপতিকে দুঃসহ যাতনার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে দিলেন না। তাঁহারা অতি যত্নে রমাপতিকে সঙ্গে লইয়া হালিসহরে আসিলেন। সেখানে রাধানাথের অতি প্রকাণ্ড বাসভবনে রমাপতি অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ ও বিনোদিত করিবার নিমিত্ত, রাধানাথ নানা সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহার স্বভাবের কোমলতা, অবস্থার নিতান্ত হীনতা, বিপদের যৎপরোনাস্তি প্রগাঢ়তা, সংসারে স্বজন-বিহী-

নতা প্রভৃতি তাঁহার প্রতি রাধানাথের অমিত স্নেহ আকর্ষণ করিল। রাধানাথ তাঁহাকে পুত্র বাৎসল্যে পালন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অপরিসীম শোক কথঞ্চিৎ মন্দীভূত ও প্রশমিত হইলে তাঁহাকে পুনরায় বিবাহিত করিয়া সংসারি করিয়া দিবেন সঙ্কল্প করিলেন। নিয়ত তাঁহার সঙ্গে সমবয়স্ক সদালাপী লোক এবং শরীর-রক্ষার্থ দ্বারবান ফিরিতে লাগিল; রাধানাথ ও তাঁহার ব্রাহ্মণী, রমাপতি না খাইলে আপনারা অন্নজল ত্যাগ করিবেন ভয় দেখাইয়া, তাঁহাকে যথাসময়ে আহার করাইতে লাগিলেন; অধ্যয়নে তাঁহার অনুরাগ ছিল জানিয়া, রাশি রাশি নূতন পুস্তক তাঁহার জন্য সমানীত হইতে লাগিল; সঙ্গীতে মানবমন মুগ্ধ হয় বিশ্বাসে, তাহারও বিশেষ ব্যবস্থা করা হইল; সংক্ষেপতঃ একদিনে, একবারে মরিতে না দিয়া, তাঁহার নিত্যমৃত্যুর বিশেষ আয়োজন করা হইল। সুকুমারী হারা হইয়াও, রমাপতি বাঁচিয়া রহিলেন।

কিন্তু তোমরা যাহাই বল, সকল কাণ্ডেই বিধাতার অতি আশ্চর্য্য বিধি আছে। শোক, যতই কেন কঠোর হউক না, তাহার নিবারণ সম্বন্ধে সময় অমোঘ মহৌষধ। তীব্র শোক—অপরিসীম প্রেমাস্পদের বিয়োগজনিত দুঃসহ জ্বালা হৃদয়ে যে অনপনেয় অঙ্কপাত করে, তাহার বিলোপ করিতে কালের সাধ্য নাই। কিন্তু শোকের পরুষতা, দিনে না হউক মাসে, মাসে না হউক বৎসরে, অবশ্যই মন্দীভূত হইয়া আইসে। উপদেশ বা শিক্ষা সর্ব্বত্র শোকের প্রখরতা নষ্ট করিতে সক্ষম নহে। তাহা হইলে,

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥"*

স্বয়ং ভগবানের এই মহদুপদেশ বিদ্যমান থাকিতে, লোকে শোকে বিহ্বল হয় কেন?

দেখিতে দেখিতে বৎসর অতীত হইল। রমাপতি, সুকুমারী হারা হইয়াও, এই সুদীর্ঘ কাল অবিচ্ছেদে মৃত্যু-যাতনা সহিতে সহিতে জীবন বহিয়া আসিতেছেন।

তাঁহার ব্যবহার, তাঁহার সততা, তাঁহার বিদ্যা, তাঁহার শোক, তাঁহার রূপ, সকলই তাঁহাকে, তাঁহার আশ্রয়দাতার পরিবার মধ্যে, আত্মীয় হইতেও আত্মীয় করিয়া তুলিল। ক্রমে ক্রমে রমাপতি যেন সেই পরিবারের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। তাঁহার স্নেহ-বন্ধনে, সামান্য ভৃত্য হইতে গৃহস্বামী পর্য্যন্ত এবং সামান্যা দাসী হইতে গৃহিণী ঠাকুরাণী পর্য্যন্ত, সকলেই বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। সেই বিশালপুরীর সর্ব্ব-ভাগই তাঁহার নিমিত্ত উন্মুক্ত; সেই বিপুল বিভব তাঁহার সুখসংবিধানে নিয়োজিত; সেই অগণ্য দাসদাসী তাঁহার প্রীতি সমুৎপাদনে সচেষ্ট এবং সেই গৃহস্বামী তাঁহার সন্তোষ সংসাধনে ব্যতিব্যস্ত। দীনহীন রমাপতির একি অত্যদ্ভুত দশা-বিপর্য্যয়! বিশ্ববিধাতা মঙ্গলময় নারায়ণের বাসনায় কি না হইয়া থাকে; পরমপুরুষের কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। হে অনাথনাথ, ইচ্ছাময়, হরি! তোমার একি কৌশলময় ব্যবস্থা? তুমি এক-দিকে মারিতেছ, আর একদিকে রাখিতেছ এবং একদিকে ভাঙ্গিতেছ, আর একদিকে গড়িতেছ। হে নারায়ণ! তুমি রাখিলে তাহাকে মারে কে? তুমি মারিলে তাহাকে রাখে কে? হে সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম! এ সংসারে কেবল তুমিই সার ও সত্য। কবে সে দিন হইবে, যখন আমরা অমেয় শোকে বা বিপদে, অসীম সুখে বা আনন্দে তোমার নাম স্মরণ করিতে ভুলিব না? বিশ্বেশ্বরের

---

*শ্রীমদ্ভাগবদগীতা। সাংখ্যযোগ। ২৭ শ্লোক।

বাসনায় সুকুমারীকে হারাইয়াও রমাপতিকে বাঁচিয়া থাকিতে হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"পোড়ারমুখো পাখি! পড়িতে পারেন না, কিছু না, কেবল ক্যাঁ—ক্যাঁ—ক্যাঁ। ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিস্ তো ভাল, নহিলে তোকে আজি আর ছোলা দিব না।"

একটী ইন্দীবরাননা, দ্বাদশবর্ষীয়া, পরমাসুন্দরী বালিকা, আপনার সুবৃহৎ সমুজ্জল কাকাতুয়া পক্ষীর দাঁড় হাতে লইয়া, পাখীকে এইরূপে তিরস্কার করিতেছিলেন। পাখী এ তিরস্কারের মর্ম্ম বুঝিল কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু সে আবার চীৎকার করিয়া উঠিল,—ক্যাঁ—ক্যাঁ—ক্যাঁ।"

"মা গো, কাণ ঝালা পালা করিয়া দিল। থাক্ তুই। আমি চলিলাম।"

এই বলিয়া সে সুন্দরী, কাকাতুয়ার দাঁড় তাহার শিকে ঝুলাইয়া দিয়া, সে দিক্ হইতে যেমন ফিরিলেন অমনই এক দেব-কান্তি যুবক-মূর্ত্তি তাঁহার নয়নে পড়িল। যুবককে দর্শনমাত্র বালিকা আনন্দে উৎফুল্লা হইয়া তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিলেন। সুন্দরী বালিকাকে, যুবক জিজ্ঞাসিলেন,—

"সুরবালা! আজি আর তবে আমার সঙ্গে ঝগড়া হবে না বোধ হয়। আজিকার ঝগড়া কেবল পাখীর সঙ্গে—কেমন?"

সুরবালা উত্তর দিলেন,—

"তা বই কি? রমাপতি বাবু! আজি আপনার সঙ্গে ভারী ঝগড়া করিব ঠিক করিয়া আছি।

এই বলিয়া বালিকা অতি আদরের সহিত রমাপতি বাবুর হাত ধরিয়া, তত্রত্য এক খানি সুন্দর কৌচে বসাইলেন এবং আপনিও তাহার একদিকে বসিলেন।

এই স্থানে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, এই সুন্দরী বালিকা রাধানাথ বাবুর এক মাত্র সন্তান; তাঁহার বিপুল বিভব,এবং নানা সুখৈশ্বর্য্যের একমাত্র অধিকারিণী। সুরবালা অবিবাহিতা। রাধানাথ ও তাঁহার ব্রাহ্মণী যেরূপ পাত্র পাইলে কন্যার বিবাহ দিবেন স্থির করিয়া আছেন, তাহা সহজে মিলে না। পাত্র অতি রূপবান্, সুশীল, শান্ত ও বিদ্বান্ হওয়া চাই; নিস্ব, নিরাশ্রয়, ও নিরবলম্বন হওয়া চাই; তাহার আর কেহ আপনার লোক না থাকে এবং সুরবালাকে কখন পিতৃগৃহ হইতে আর কোথাও লইয়া যাইতে না চাহে, এমন পাত্র চাই। এরূপ অষ্টবজ্র সম্মিলন সহজ নহে সুতরাং বিবাহযোগ্য বয়স উত্তীর্ণ হইতেছে, তথাপি সুরবালার বিবাহ হইতেছে না।

আসনে উপবেশন করিয়া রমাপতি বাবু বলিলেন,—

"আজি আমার এমন কি দোষ হইয়াছে যে ভারী ঝগড়া না করিলে চলিবে না?"

সুরবালা বলিলেন,—

"দোষ আজি একটা নাকি? সারাদিন পরে বিকালে একবার দেখা দিয়া, জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এমন কি দোষ হইয়াছে? আজি এত দোষ হইয়াছে যে, উপরি উপরি তিন দিন ঝগড়া না করিলে চলিবে না।"

রমাপতি বলিলেন,—

"আরম্ভ কর তবে—দেরি কেন? যখন ঝগড়া না করিলে চলিবে না ঠিক করিয়াছ,

তখন আর দেরী করিয়া কাজ কি? আমি প্রস্তুত।"

বালিকা বলিলেন,—

"অমন করিয়া ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না—হ্যাঁ।"

রমাপতি বলিলেন,—

"তা কি চলে? তুমি আরম্ভ কর, আমি বাঁধন দিতেছি।"

বালিকা ঝগড়া করিতে পারিল না। এমন করিয়া কখন কি ঝগড়া করা যায় গা? ঝগড়া শাস্ত্রে সুরবালা সুপণ্ডিতা হইলে, যাহার সহিত ঝগড়া করিতে হইবে, তাহার সহিত এমন করিয়া পরামর্শ করিতে আসিতেন না। তখন সুরবালা, অতি চেষ্টায় মুখের সমস্ত হাসি লুকাইয়া, যতদূর সাধ্য গম্ভীর হইয়া, এবং কণ্ঠস্বর বিশেষ ভারি করিয়া, বলিলেন,—

"আচ্ছা—আচ্ছা—আজি হইতে আপনার সঙ্গে আমার আড়ি।"

বালিকা আড়ির প্রগাঢ়তা বুঝাইবার জন্য, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ আপনার চিবুকে স্পর্শ করাইয়া মুখ ফিরাইলেন। সুতরাং শাস্ত্রানুসারে আড়ি সাব্যস্ত হইয়া গেল।

পাকাপাকি রকম আড়ি হইল দেখিয়া রমাপতি বলিলেন,—

"আমি বাঁচিলাম। অনেক দিন না কাঁদিয়া আমার প্রাণ বড় অস্থির হইয়াছে। এখন তুমি যদি দুই তিনদিন কিছু না বল, তাহা হইলে আমি একটু কাঁদিয়া বাঁচি।

সুরবালা ফিরিয়া বসিলেন। ধীরে ধীরে তাহার বদন হইতে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য তিরোহিত হইল। তখন প্রকৃত গাম্ভীর্য্যের রেখাসমূহ সেই বালিকার বদনমণ্ডলে প্রকটিত হইল। ক্রমে তাঁহার চক্ষু ঈষৎ জলভারাকুল হইল। তখন তিনি বলিলেন—

"রমাপতিবাবু! চিরকালই কি কাঁদিতে হইবে? এ কাঁদার কি শেষ নাই? আপনার যতই কষ্ট হউক, আপনাকে আমি আর কখনও কাঁদিতে দিব না। আপনি যদি আর কাঁদেন দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমি এবার জলে ডুবিয়া মরিব।"

রমাপতি সস্নেহে বলিলেন,—

"ছি সুরো! ও কথা কি বলিতে আছে? তোমার কথায় আমি তো কান্না ছাড়িয়া দিয়াছি। আর আমি কখনই কাঁদিব না সুরো।"

সুরবালা বলিলেন,—

কাঁদিবেন না যেন; কিন্তু আমি দেখিতে পাই সারাদিনই আপনি বড়ই কাতর থাকেন। আপনি খান, কেবল আমাদের দায়ে; শয়ন করেন, কেবল আমাদের জ্বালায়; কথাবার্ত্তা কন, কেবল আমাদের দৌরাত্ম্যে; আমাকে পড়া বলিয়া দেন, ছাড়ি না বলিয়া। আমি সারাদিন দেখি আর ভাবি, দুঃখে আপনার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। আপনার সেই অবস্থা দেখিয়া আমি কতদিন লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদি।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বালিকার উজ্জ্বল আয়ত লোচনদ্বয় হইতে স্থূল অশ্রুবিন্দু সমূহ ঝরিতে লাগিল। সুরবালা অঞ্চলের কাপড় দিয়া বদন আবৃত করিলেন। ধন্য সে মানব, যে শোকে এরূপ সহানুভূতি পায়!

তখন অতি কোমলতার সহিত রমাপতি সুরবালার মুখের কাপড় খুলিয়া, তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিলেন এবং অতি প্রীতিময় স্বরে বলিলেন,—

"না সুরো না—আমি আগে যেমন ছিলাম এখন তো আর তেমন নাই। তোমার স্নেহ তোমার দয়া এখন আমাকে সকল দুঃখ

ভুলাইয়া দিতেছে। আমার এখন কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা কি তুমি দেখিতে পাও না? তোমার হাসি কান্না এখন আমাকে হাসাইতে কাঁদাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তোমার ভালবাসা ক্রমে আমাকে সকলই ভুলাইয়া দিতেছে।"

সুরবালার মুখে হাসি আসিল। তিনি অন্য কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সেই সুবিস্তৃত প্রকোষ্ঠ মধ্যে আর দুই ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন। সেই দুই জনের মধ্যে যিনি পুরুষ তিনিই রাধানাথ। উজ্জ্বল ও উন্নত ললাট, পরিপুষ্ট দেহ, আয়ত লোচন, গৌরবর্ণ, তাঁহার সুপরিণত কলেবরের শ্রী প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার বয়স চল্লিশ; কিন্তু মাথায় রজতসূত্রবৎ পক কেশের ঘটাটা খুব বেশী। সঙ্গে তাঁহার অন্ধের যষ্টি, অন্ধকারের আলো, ভবনদীর ভেলা, বুড়া বয়সের সম্বল, ভুবনেশ্বরী—রাধানাথের ব্রাহ্মণী। এই প্রৌঢ় প্রৌঢ়া দম্পতির সমাগমে ঘরের শ্রী ফিরিয়া গেল। যাহারা নবীন নবীনার শোভায় বিমোহিত, তাঁহারা হয় ত এ মন্দভাগ্য গ্রন্থকারকে নিতান্ত বৃদ্ধ বলিয়াই মনে করিবেন এবং যৎপরোনাস্তি অরসি বলিয়া গালি দিবেন। কিন্তু যাহা হউক আমি আবার বলিতেছি, সেই প্রৌঢ় প্রৌঢ়ার পূর্ণাঙ্গ সমূহের যে সুপরিণত শোভা তাহার তুলনাস্থল অতি বিরল।

রাধানাথ আসিয়াই জিজ্ঞাসিলেন—

"একি সুরো, তুমি কাঁদিতেছিলে নাকি?"

সুরবালা দৌড়িয়া পিতার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন—

"দেখ দেখি বাবা, রমাপতি বাবু আজিও কাঁদিতে চাহিতেছেন। মা! তুমি ত আর কিছু বল না। কেবল তোমার কথাই উনি শুনেন।"

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—

"তুই যেমন পাগ্‌লী, তোকে তেমনি ক্ষেপায়। রমাপতি কাঁদিবে কি দুঃখে? কেন বাবা! তুমি আবার কাঁদার কথা বল?"

রমাপতি বলিলেন,—

"না মা! আপনি সুরোর কথা শুনিবেন না।"

ভুবনেশ্বরী আবার বলিলেন,—

"আজি সারাদিনটা তোমাকে একবারও দেখিতে পাই নাই। কালি বৈকালে বড় মাথা ধরিয়াছিল বলিয়াছিলে; আজি কেমন আছ? তুমি এদিকে আসিয়াছ শুনিয়া তোমাকে দেখিতে আসিলাম।"

রাধানাথ বলিলেন,—

"আর আমি আসিলাম, সুরোকে এক খবর দিতে। সুরো যদি সন্দেশ খাওয়ায় তবে বলি।"

সুরো ব্যস্ত হইয়া বলিল,—

"কি বাবা, কি বাবা?"

রাধানাথ বলিলেন,—

"রমাপতি! সম্প্রতি তোমার, আমার, সুরোর এবং গৃহিণীর যে ছবি প্রস্তুত করিতে দিয়াছিলাম, তাহা আজি আসিয়া পৌঁছিয়াছে! তোমরা দেখিবে চল।"

সুরবালা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসিলেন,—

"কোথায় আছে বাবা?"

পিতা উত্তর দিলেন,—

"তোমার জন্যই আসিয়াছে, তোমারই ঘরে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

সুরবালা মহাহ্লাদে রমাপতির হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন।

ভুবনেশ্বরী দেবী একটু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"রমাপতি যদি আমাদের ছেলে হইত?"

রাধানাথ বলিলেন,—

"কেন রমাপতি কি এখনও আমাদের ছেলে হইতে পারে না?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আরও এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কার্ত্তিক মাস, বেলা সান্ধদ্বিপ্রহর। হালিসহরে রাধানাথ বাবুর রাজ-প্রাসাদ সদৃশ সুবিস্তৃত ভবনের একতম প্রকোষ্ঠে রমাপতি একাকী উপবিষ্ট। প্রকোষ্ঠ সুসজ্জিত। তলে সুন্দর গালিচা বিস্তৃত, তদুপরি সাটিনাবৃত নানাবিধ কৌচ ও চেয়ার এবং মর্ম্মর প্রস্তর ও কাষ্ঠ-নির্ম্মিত টেবিল আলমায়রা ইত্যাদি। আল-মায়রা সকল স্বর্ণবর্ণাবরণাবৃত গ্রন্থ-ভারে প্রপীড়িত; যেন রত্নব্যবসায়ীর বিপণি! ভিত্তি-গাত্রে মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহের সুরঞ্জিত চিত্রাবলী। ভবনের যে ভাগে এই বহুব্যয়ত প্রকোষ্ঠ সংস্থিত, ইচ্ছা করিলে বা আবশ্যক হইলে, পুরোমহিলারাও অপর লোকের অলক্ষিত ভাবে তাহাতে যাতায়াত করিতে পারেন। এই প্রকোষ্ঠ রমাপতি বাবুর পঠনালয়!

প্রকোষ্ঠ মধ্যস্থ একতম কৌচে রমাপতি বাবু অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় উপবিষ্ট। তাঁহার হস্তে একখানি স্বর্ণসীমাবদ্ধ ফটোগ্রাফ। সেই চিত্র এক নারী-মুর্ত্তির প্রতিকৃতি। রমাপতি এক একবার সেই আলেখ্য দর্শন করিতেছেন, আবার তাহা নয়ন হইতে অন্তরিত করিতেছেন। কাহার এ চিত্র? কোন্ নারীর প্রতিকৃতি আজি রমাপতির মন আকর্ষণ করিয়া বিরাজ করিতেছে? অবশ্যই সুকুমারীর। যে সুকুমারীর জন্য রমাপতি আত্মজীবন অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান করেন; যে সুকুমারীর কল্যাণার্থ রমাপতি ঘোর বিপদকেও বিপদ বলিয়া মনে করেন না; যে সুকুমারীর অভাবে রমাপতি মৃতকল্প হইয়া দুঃসহ যমযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন এবং যে সুকুমারীকে রমাপতি দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন; রমাপতির হস্তে অধুনা যে নারীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে, তাহা সেই সুকুমারীর প্রতিকৃতি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কিন্তু হায়! কি বলিয়া বলিব? কেমন করিয়া মানব মনের এতাদৃশ অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তনের কথা বুঝাইব? মানব হৃদয়ের এরূপ অচিন্তনীয় কথা কেই বা সহজে বিশ্বাস করিবে? রমাপতির হস্তে সুকুমারীর ফটোগ্রাফ নহে। সুকুমারী, সর্ব্ব সমক্ষে, বিপুল নীররাশির মধ্যে সমাহিত হইয়াছেন। তিনি যে সময়ে রমাপতির হৃদয়ের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন, রমাপতির তদানীন্তন অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এরূপ ব্যয়সাধ্য বিলাস তাঁহার সাধ্যায়ত্ত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে এ চিত্র কাহার? তাহাও কি ছাই আমার না বলিলে চলিবে না? এ চিত্র—এ চিত্র সুন্দরী শিরোমণি রাধানাথ-তনয়া সুরবালার প্রতিকৃতি।

সুকুমারি! আজি তুমি কোথায়? আইস, যদি সম্ভব হয়, তোমার সেই সলিল-সমাধি হইতে সমুত্থিত হইয়া, আজি একবার আইস। দেখ তোমার যিনি গুরুর গুরু, তোমার যিনি দেবতা, তিনি আজি তোমার কে? আর দেখ, যিনি তোমার মর্ম্মভেদী অনুরোধেও তোমা-ছাড়া হইয়া জীবনের অন্য গতি পরিগ্রহ করিতে সম্মত হন নাই, সেই তিনি আজি বিরলে বসিয়া, আর এক সুন্দরীর প্রতিকৃতি পর্য্যা-

লোচনা করিতেছেন। ধন্য কাল! ধন্য তোমার সর্ব্বস্মৃতি-বিলোপকারী মহৌষধ!

রমাপতি চিত্র দেখিতেছেন ও আবার তাহা নয়নসম্মুখ হইতে অপসারিত করিতেছেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত উৎকন্ঠিত ও কাতর। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। চিত্র সেই কৌচেই পড়িয়া রহিল। নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবে, সেই গৃহমধ্যে দুই তিনবার পরিভ্রমণ করিয়া তিনি আবার সেই কৌচের সমীপস্থ হইলেন এবং সেই চিত্র আবার হস্তে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার মনে, না জানি, তখন কি প্রবল ঝটিকা বহিতেছিল। মনের ভাব মনে মনে পোষণ করা যেন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। তিনি তখন অতি অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন,—

সুরবালা! এ দুরাশা আমার হৃদয়ে কেন স্থান পাইল? আমি অভাগা, আমি দীন-হীন। আমার হৃদয় কখনই তোমার উপযুক্ত আসন নহে। তাহা জানিয়াও কেন আমি এ দুরাশায় ঝাঁপ দিয়াছি? কেন আমি অন্তরে ও বাহিরে কেবল তোমাকেই দেখিতেছি?"

সেই চিত্র হস্তে করিয়াই, রমাপতি একবার সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া আসিলেন আবার সেই কৌচের সমীপস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

"কিন্তু না। তোমাকে পাওয়া যদি আমার পক্ষে কখন সম্ভব হয়, তাহা হইলেও আমি তোমাকে কখনই গ্রহণ করিব না। আমার হৃদয় বহ্ন্নির্বিত, আমার হৃদয় মরুভূমি। তুমি যে আদরের—যে সোহাগের সামগ্রী, তাহা আমি কোথায় পাইব? তোমাকে তাহা কেমন করিয়া দিব? তুমি দেবী। স্বর্গীয় সুখে তোমার অধিকার। এ অভাগা সে সুখের কণিকাও তোমাকে দিতে পারিবে না। তবে কেন, সুরবালা আমি তোমাকে দুঃখসাগরে ভাসাইব? না দেবী! তোমার, আমার হইয়া কাজ নাই।"

রমাপতি চিত্র ত্যাগ করিয়া আর একবার গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিলেন এবং আবার সেই কৌচের সমীপস্থ হইয়া চিত্র গ্রহণ করিলেন। তাহার পর আবার বলিতে লাগিলেন,—

কিন্তু সুরবালা! আমি চিরদিনই এমন ছিলাম না। একদিন জগতে আমার মত ভাগ্যবান্ আর কেহই ছিল কি না সন্দেহ। আমার এই হৃদয় তখন নন্দন-কাননের ন্যায় আনন্দধাম ছিল। সুখ ও শান্তি তখন এ হৃদয়ে বাসা বাঁধিয়া থাকিত, সন্তোষ ও সৌভাগ্য তখন এ হৃদয় ছাড়িত না। তখন এ হৃদয়ে এক দেবীর রাজসিংহাসন ছিল; কিন্তু সে দেবী আজি কোথায়? সুকুমারি! সুকুমারি! তুমি আজি কোথায়? তোমার জন্য, তোমার অভাবে, আজি আমার জীবন শুষ্ক, আজি আমি অভাগা। আইস আমার দেবী, আইস করুণাময়ী, আমাকে দেখা দিয়া বাঁচাও—আমাকে আবার ভাগ্যবান্ কর। দুই বৎসর—দুই সুদীর্ঘ বৎসর আমি তোমাছাড়া হইয়া রহিয়াছি। যদি নিতান্তই দেখা না দেও, যদি তুমি এমনই নিষ্ঠুর হইয়া থাক, যদি নিতান্তই আর না আইস, তবে আমাকেও তোমার সঙ্গী করিয়া লও।"

রমাপতি সেই কৌচের উপর বসিয়া পড়িলেন এবং বসনে বদনাবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন ধীরে ধীরে সেই প্রকোষ্ঠের পার্শ্বে একটী দ্বার খুলিয়া গেল। তখন সেই উন্মুক্ত দ্বার দিয়া নানা রত্নালঙ্কার-বিভূষিতা, সমুজ্জ্বল-স্বর্ণ-সূত্র-বিনির্ম্মিত-বসনাবৃতা, পরমশোভাময়ী সুরবালা সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করি-

লেন। তাঁহার অলঙ্কারশিঞ্জিত শ্রবণ করিয়া, রমাপতি ব্যস্ততাসহ সেই প্রতিকৃতি প্রচ্ছন্ন করিলেন। সুরবালা তাহা জানিতে বা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি রমাপতির সমীপস্থ হইয়া বলিলেন,—

"একি? একি রমাপতি বাবু! তুমি কাঁদিতেছ নাকি?"

তখন রমাপতি মুখের বসন অপসারিত করিয়া বলিলেন,—

"যাও দেবি, যাও সুরবালা, আমার নিকট তুমি আর আসিও না। আমি অধম, আমি অভাগা, আমি দীনহীন। আমার হৃদয় শুষ্ক, নীরস, মরুভূমি। তুমি দেবী, আমার নিকটে তোমার স্থান হইবে না।"

সুরবালা, রমাপতির কথা ধীরভাবে শ্রবণ করিয়া, অনেকক্ষণ অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিয়া উঠিলেন,—

"তোমার নিকট যদি আমার স্থান না হয়, রমাপতি! তবে ইহ জগতে আমার আর স্থান নাই। তুমিই আমার দেবতা, তুমিই আমার সুখ, তুমিই আমার সন্তোষ; যদি তোমার হৃদয় শুষ্ক ও মরুভূমি হয়, তাহা হইলে তাহাই আমার স্বর্গ। তোমাকে ছাড়িয়া আমি অন্য স্বর্গে যাইব না।"

এই বলিয়া বালিকা লজ্জায় অধোবদন হইল। তখন রমাপতি বলিলেন,—"কিন্তু দেবি! তোমাকে আমি কি দিব? তোমার এ অনুগ্রহের প্রতিশোধ আমি কি দিতে পারি? আমার কি আছে?"

সুরবালা, তাঁহাকে আর কথা বলিতে না দিয়া, স্বয়ং বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি আমাকে আর কি দিবে তাহা জানি না। তোমার কিছু আছে কি না তাহা আমার জানিবার কোন আবশ্যক নাই। আমি এই মাত্র জানি তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ, মনুষ্য মনুষ্যকে তাহা দিতে পারে না। তোমার মত স্নেহ, তোমার মত ভালবাসা, তোমার মত গুণ কোন্ মানুষের আছে? তুমি মানুষের মধ্যে দেবতা। আমি ক্ষুদ্র বালিকা, তোমার মত দেবতার কেমন করিয়া পূজা করিতে হয় তাহা আমি জানি না। কিন্তু তোমার দাসী হইয়া থাকিতে পাওয়ায় যে কত সুখ তাহা আমি বেশ জানি। আমি তোমার দাসী; দাসীকে তুমি পায়ে ঠেলিবে কেমন করিয়া? কিন্তু তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

"কাঁদিতেছি যে কেন তাহা তোমাকে কেমন করিয়া বলিব? কিন্তু তাহা না বলিয়াও আর থাকা যায় না। শুন সুরবালা, তুমি আমার আপন হইতেও আপন, তুমি আমার প্রাণের প্রাণ। এই দেখ সুরবালা আমি এই নির্জ্জনে তোমারই ছবি বুকে ধরিয়া বসিয়া আছি।"

রমাপতি ফটোগ্রাফ বাহির করিয়া দেখাইলেন। সুরবালার বদন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! রমাপতি বলিতে লাগিলেন,—

"সুরবালা! তুমি আমার অন্তরে ও বাহিরে; তুমিই আমার ধ্যান ও জ্ঞান। কিন্তু সুরবালা! তোমাকে আমি সকল কথাই জানাইব, কোন কথাই আমি লুকাইব না। আমি বড়ই অভাগা; কিন্তু আমি চিরদিন এমন অভাগা ছিলাম না। আমার এই হৃদয়ের এক রাণী ছিলেন। সে দেবী আজি নাই। আজি দুই বৎসর হইল আমার সেই দেবী আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। আমি সেই অবধি অভাগা ও দীন-হীন হইয়াছি। সত্য কথা তোমায় বলিব। সেই দেবীর স্মৃতিতে আমার হৃদয় পূর্ণ। আমার হৃদয় সেই দেবীর অভাবে মরুভূমি হইয়াছে। সুরবালা! তুমি স্বর্গের দেবতা। আমি তোমাকে লইয়া কোথায়

রাখিব ? আমার এ পোড়া হৃদয়ে আর তোমার আসন পাতিব না। তাই বলিতেছি দেবি, আমার নিকটে তোমার স্থান হইবে না।”

রমাপতি নীরব হইলেন। সুরবালা অনেক ক্ষণ কোন উত্তর দিলেন না। তাহার পর সহসা রমাপতির চরণদ্বয় উভয় বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া সেই চরণেই মুখ রাখিয়া বলিলেন,—

“তোমার এই গুণে, তোমার এই দেবত্ব দেখিয়া আমি তোমার দাসী হইয়াছি। তোমার এই যে সরলতা, তোমার এই যে ভালবাসার স্থায়িত্ব, বল দেবতা, তুমিই কি আর কোথায় এমন দেখিয়াছ ? তোমার এই গুণে জগৎ তোমার বশ, আমি তো কোন ছার কীট। তোমার চরণ আমি ছাড়িব না। দাসীকে তোমার চরণে স্থান দিতেই হইবে।”

রমাপতি অতি যত্নে সুরবালাকে উঠাইলেন এবং বলিলেন,—

“আমি যে আজিও বাঁচিয়া আছি, সুরবালা সে কেবল তোমারই কৃপায়। তোমার স্নেহ, তোমার মমতা, তোমার রূপ এবং তোমার গুণ আমাকে বড় দুরাশাসাগরে ভাসাইয়াছে। এখন যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে তোমাকে না পাইলে আর বাঁচিতে পারিব না। এ জীবন রাখিয়াছ তুমি—ইহা তোমারই সম্পত্তি। তুমিই আমার সুখের কেন্দ্র। তোমার সন্তোষের জন্যই এখন আমার জীবনে মায়া। তোমকে পাইলে আমার দগ্ধজীবন পুনর্জীবিত হইবে ; কিন্তু বল সুরবালা, আমাকে লইয়া তোমার কি হইবে ?

সুরবালা উত্তর দিলেন,—

“আমার যে কি হইবে, তাহা তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব ? তোমাকে যদি আমি সুখী করিতে পারি, তোমাকে যদি আমি হাসাইতে পারি, তোমাকে যদি আমি আনন্দিত করিতে পারি, তাহা হইলে আমার আশার পূর্ণ তৃপ্তি হইবে, আমার সুখের সীমা থাকিবে না। তোমার সুখেই আমার সুখ, তদ্ভিন্ন অন্য সুখের কামনা এ দাসীর নাই।”

তখন সস্নেহে রমাপতি সুরবালাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—

“ধন্য এ জীবন ! সুরবালা, যে অভাগা ছিল, সে এখন তোমার কৃপায় পরম ভাগ্যবান্ ! এ অধম আজি হইতে তোমারই দাস।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

———•—

বড়ই সমারোহে রমাপতি ও সুরবালার বিবাহ হইল। এমন সমারোহে, এত ধুমধাম ইহার পূর্ব্বে সে অঞ্চলের লোকেরা আর কখন দেখে নাই। নানাবিধ বাদ্য, নৃত্য, গীত, ভোজ, আলোক, দানাদি উৎসব ব্যাপারে কয়দিন নগর মহোল্লাসময় হইল। প্রায় লক্ষ মুদ্রা এই বিবাহকাণ্ডে ব্যয়িত হইল এবং সমস্ত নগর এক পক্ষ কাল মহানন্দে মগ্ন রহিল।

অদ্য ফুলশয্যা। যে প্রকোষ্ঠে নব দম্পতীর পুষ্পবাসর হইবে, তাহার শোভার সীমা নাই। তথায় নানাবিধ সুরম্য স্ফাটিক আধারে আলোক-মালা জ্বলিতেছে। সর্ব্ববিধ গন্ধময় পুষ্পরাশিতে সে গৃহ সুন্দররূপে সমাচ্ছন্ন। ভিত্তিগাত্রে মনোহর ফুলমালাসমূহ সুচারুরূপে সুসজ্জিত। দ্বার ও বাতায়ন-সমূহে পুষ্পের যবনিকা সমূহ বিলম্বিত। প্রকোষ্ঠের স্থানে স্থানে অপূর্ব্ব-পাত্রে সুদৃশ্য পুষ্প-গুচ্ছ-সমূহ সংস্থাপিত। প্রকোষ্ঠমধ্যে এক অতি শোভাময়

পর্য্যঙ্ক। তাহার উপর স্বর্ণসূত্র-সমন্বিতা শয্যা তাহার আস্তরণ-প্রান্তে মুক্তামালার ঝালর। সেই পর্য্যঙ্কে সর্ব্বভূষণ-সমাচ্ছন্নকায়া সুরবালা এবং রমাপতি সমাসীন।

বিধাতঃ! তোমার অচিন্ত্য লীলা রহস্যোদ্ভেদ করিবার ক্ষমতা ক্ষুদ্র মানবের নাই। তোমারই কৃপায়, যে রমাপতি নিতান্ত দীনহীন ছিল, সে আজি এই বিপুল বিভবের সর্ব্বেশ্বর। যে ব্যক্তি কিছু দিন পূর্ব্বে আপনাকে নিতান্ত দীনহীন বলিয়া মনে করিত, সে আজি আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ বলিয়া জ্ঞান করিতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে অতি সামান্য দাসত্ব যাহার জীবিকা ছিল, আজি শত জন তাঁহার আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছে; সে আজি অচিন্ত্যপূর্ব্ব সুখসৌভাগ্য সংবেষ্টিত। বিজ্ঞান আমাদিগকে শিখাইতেছে, যে স্থানে একদা সুবিস্তৃত সাগর-সলিল লহরী-লীলা বিকাশ করিত, তথায় এক্ষণে সমুন্নত, সুকঠিন, শুষ্ককায় গিরিরাজ দণ্ডায়মান। যে স্থান এককালে মকর কুম্ভীরাদি জীবের লীলা-ক্ষেত্র ছিল, তাহা এক্ষণে সিংহ, তরক্ষু, ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ-সঙ্কুল হইয়াছে। হে বিধাতঃ! এরূপ অচিন্তনীয় বিপর্য্যয় যদি তুমি ঘটাইয়া থাক, তাহা হইলে তোমার হস্তে মানবের এতাদৃশ দশাপরিবর্ত্তনে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। ভাগ্যবান্ রমাপতি আজি সর্ব্ব সৌভাগ্যের সম্পূর্ণ অধীশ্বর। আজি হইতে রাধানাথের বিপুল বিভব তাঁহার বাসনার অধীন। সর্ব্বোপরি আজি হইতে সুন্দরী-কুল-কমলিনী, সাক্ষাৎ প্রেমস্বরূপা রমাপতির প্রেমের কেন্দ্র, আনন্দের আধার, সুরবালা তাঁহার আপনার।

কিন্তু এ সময়ে, সুকুমারী, কোথায় তুমি? দেখ তোমার সেই রমাপতির আজি একি বিস্ময়াবহ পরিবর্ত্তন। দেখ, তোমার সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে আজি আর এক নবীনা অধিকার করিতেছেন।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল, কিন্তু নবদম্পতী এখনও নিদ্রার অধীনতা স্বীকার করেন নাই! এরূপ দিনে কে কোথায় তাহা করিয়াছে? যদি কেহ তাহা করিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহাদের বিবাহই হয় নাই। দম্পতী নিদ্রাগত হন নাই বটে, কিন্তু অলসিত ও অবসিত হইয়াছেন। প্রেমের অনর্থক বাক্য, এক কথার শত পুনরুক্তি, অকারণ আশ্বাস, আনন্দের অসীমতা, হৃদয়ের পূর্ণতা প্রভৃতি প্রেমারম্ভকালের যেমন যেমন বিধান আছে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার কোনই ত্রুটি হয় নাই। তবে এতক্ষণ কথাবার্ত্তা যেরূপ খরস্রোতে ও সমুৎসাহে চলিতে ছিল, তাহা এখন অনেক মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। শেষ রাত্রিকালে পক্ষীকূজনের যেমন এক নূতনবিধ ধ্বনি হয়, এখন তাহাই হইতেছে। গৃহমধ্যস্থ আলোকসমূহ কেমন সাদা সাদা হইয়া পড়িয়াছে! এইরূপ সময়ে সুরবালার একটু নিদ্রাবেশ হইল।

তখন রমাপতি ভাবিতে লাগিলেন "হায়! কি করিলাম? ইচ্ছা করিয়া এ সাধের শিকল কেন পায়ে পরিলাম? আজি আমি কাহার জিনিষ কাহাকে দিলাম? ইহাতে কি আমি সুখী হইব?" ক্ষণেক চিন্তা করিয়া আবার মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"সুখী হইব যে তাহার আর সন্দেহ কি! আজি আমার যে সুখ, জগতে এমন সুখ আর কাহার আছে? আমি তো আজ ধন্য হইলাম। সুরবালা যাহার স্ত্রী হইল, ইহজগতে সে তো স্বর্গসুখ ভোগ করিবে। এতরূপ, এত গুণ, এত ভালবাসা আর কোথায় কেহ দেখিয়াছে কি? সেই সুরবালা আজি হইতে

আমার !” আবার কিছুকাল চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—“কিন্তু আমার যে ছিল, সে আজি কোথায়? আমার সে সুকুমারী কোথায় গেল? আমি তো তাহাকে ভিন্ন জানিতাম না, তাহাকেই তো প্রাণ লুটাইয়া ভালবাসিয়াছিলাম। এ দেহ, এ প্রাণ তো তাহারই। তাহার সে ভালবাসার আদি নাই, অন্ত নাই। তখন একে একে আমূল পূর্ব্বকথা মনে পড়িতে লাগিল। সুকুমারীর সহিত বিবাহ; বিবাহের পর ফুলবাসরে সুকুমারীর সহিত প্রথম পরিচয়; তাঁহার হৃদয়ের অপার্থিব উদারতা, তাঁহার প্রেমের অমেয় গভীরতা, তাঁহার পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য, সকল কথাই ক্রমে ক্রমে মনে পড়িল। আর মনে পড়িল, তাঁহার সেই দুরবস্থার কথা। ছিন্নকন্থাবিস্তৃত তৈলাক্ত মলিন উপাধানযুক্ত শয্যায় তাঁহারা শয়ন করিতেন; সুকুমারী রন্ধন করিতেন, ঘর ঝাঁইট দিতেন, বাসন মাজিতেন, কুয়া হইতে কলসী করিয়া জল তুলিতেন; পরিতে হইবে বলিয়া ছিন্ন বস্ত্র সেলাই করিতেন; না করিতেন কি? স্বর্ণ ও রৌপ্যভূষণ কখন সুকুমারীর অঙ্গে উঠে নাই, ছিন্নভিন্ন কার্পাসবস্ত্র কথঞ্চিৎ রূপে তাঁহার দেহাবরণ করিত মাত্র। আর আজি? আজ যে নবীনা সুকুমারীর স্থান অধিকার করিয়াছে, তাঁহার দেহের সর্ব্বত্র মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কার; গৃহকর্ম্ম স্বহস্তে সম্পন্ন করা দূরে থাকুক; কিরূপ প্রণালীতে তাহা নিষ্পন্ন হয়, তাহাও তিনি জানেন না। সুকুমারীর শত বস্ত্রের মূল্য একত্রিত হইলে যত হয়, তদপেক্ষাও তাঁহার পরিধানবস্ত্র অধিক মূল্যবান। দশজন দাসী তাঁহার আজ্ঞাপালনে ব্যস্ত, অতুল ঐশ্বর্য্য তাঁহার সুখসংবিধানে নিযুক্ত! তখন রমাপতি ভাবিতে লাগিলেন,—‘আমার সেই সুকুমারী, আমার সেই দুঃখিনী সুকুমারী আর নাই। এত কাঁদিয়া, এত দেহপাত করিয়াও আর তাঁহার দেখা পাইলাম না। সে আর ইহজগতে নাই! ইহ জগতে নাই, কিন্তু আর কোথাও সে নাই কি? আত্মার তো ধ্বংস নাই! তাহার দেহলয়ের সহিত তাহার আত্মার লয় কখনই হয় নাই। তবে সুকুমারী দেবি! তুমি দেখিতেছ কি, ঐ স্বর্গধাম, তোমার বাসস্থান, ঐ স্বর্গধাম হইতে দেখিতেছ কি, তোমার সেই রমাপতি কেমন শঠ, কেমন প্রবঞ্চক, কেমন বিশ্বাসঘাতক?’’

সহসা সেই প্রকোষ্ঠমধ্য নিষ্প্রভ আলোকে রমাপতি দেখিলেন যেন গৃহের ভিত্তিতে একটী অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তির ছায়া পড়িল। সেই সুরক্ষিত পুরীর রুদ্ধদ্বার প্রকোষ্ঠে অপর মনুষ্যের ছায়া! রমাপতি মনে করিলেন, হয় ত কোন দাসী, যাহারা পরিহাস করিতে পারে এমন কোন পরিচারিকা গৃহমধ্যে আসিয়া থাকিবে। তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং চীৎকার করিয়া কহিলেন,—

“কে? কে ওখানে?”

কেহ উত্তর দিল না। তাঁহার নেত্রসমুখস্থ ছায়া সরিয়া গেল না, কেবল একটু নড়িল মাত্র। সুরবালার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। বলিয়া উঠিলেন—

“কি কি? ভয় পাইয়াছ নাকি?

রমাপতি বলিলেন,—

“ভয় নহে, ঐ দেখ কাহার ছায়া।”

সুরবালা বলিলেন,—

“কই, কই?”

ছায়া এবার সরিতে লাগিল। যে ছায়া গৃহগাত্রে লাগিয়াছিল, তাহা ক্রমে হর্ম্মতলসংলগ্ন হইল।

“রমাপতি বলিলেন,—

"এই যে! ঐ যায়!"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রমাপতি শয্যা-ত্যাগ করিলেন এবং যে দিকে লোক থাকিলে সেরূপ ছায়াপাত হইতে পারে সেই দিকে চলিলেন। এই প্রকোষ্ঠের পার্শ্বে আর একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ছিল। সেই প্রকোষ্ঠে একটী সুবৃহৎ সমুজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল। উভয় প্রকোষ্ঠের মধ্যবর্ত্তী দ্বার উন্মুক্ত ছিল। সেই দিকেই মনুষ্য থাকা সম্ভব মনে করিয়া রমাপতি সেই দিকেই আসিলেন। কিন্তু কিয়দ্দুর মাত্র অগ্রসর না হইতে, সংজ্ঞা তিরোহিত হইয়া গেল। তিনি "সুকুমারি সুকুমারি" শব্দে চীৎ-কার করিয়া সেই হর্ম্ম্যতলে পতিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুরবালাও আসিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু কিছুই দেখিতে বা বুঝিতে পারিলেন না। তখন অতি যত্নে তিনি রমাপতির শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

অচিরে রমাপতি সংজ্ঞালাভ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"সুকুমারি, সুকুমারি! এত দিন পরে আমার কথা তোমার মনে পড়িল? না না, তুমি সুরবালা। সুরবালা, সুরবালা, আমার সুকুমারী কোথায় গেল?"

সুরবালা বলিলেন,—

"তুমি কি বলিতে? সুকুমারী তো আমার দিদির নাম। তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ, এ কথা কি সম্ভব?"

রমাপতি বলিলেন,

"তাহা আর বলিতে? তুমি আমার সম্মুখে রহিয়াছ তাহা যেমন সত্য, আমার সুকুমারীকে দেখাও তেমনই সত্য। কিন্তু কোথায় সুকু-মারী? সুরবালা, সন্ধান কর, বিলম্বে বিঘ্ন ঘটিবে, দেখ কোথায় সুকুমারী।"

সেই রাত্রিশেষে সেই সুবিস্তৃত ভবনের সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল। যাহা হইবার নহে তাহা হইল না, সুকুমারীর কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না! কেবল দেখা গেল, সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের একটি দ্বার উন্মুক্ত আছে। সে পথ দিয়া কেহ আসিয়া ছিল বলিয়া কেহই মনে করিল না, সকলই রমাপতির মনের বিকার বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

তখন সুরবালা রমাপতিকে বলিলেন,—

"তুমি সারাদিন সারারাত দিদির কথাই ভাব। রাত্রে শুইয়া শুইয়াও হয় তো তাই ভাবিতেছিলে; তাহাতেই হয় তো এ ভ্রম হইয়া থাকিবে।"

রমাপতি এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু প্রাতে সকলে দেখিল রমাপতি বাবুর মূর্ত্তির ভয়ানক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাধানাথ বাবুর সুবিস্তৃত সৌধমালার অনতিদূরে একটি পুষ্করিণী ছিল। সেই সরো-বরে কোন সময়ে দুইটী বালক বালিকা ডুবিয়া মরিয়াছিল। সেই শোকাবহ ঘটনার পর হইতে, লোকে ইহাকে 'মরার পুকুর' নাম দিয়াছে। নাম যাহাই হউক, এই দুর্ঘটনার পর হইতে সন্নিহিত জনসাধারণের মনে একটা বড় ভীতি সঞ্চারিত হইয়াছিল এবং পরম্পরা-গত স্ত্রী রসনাসৃষ্ট বিবিধ ভয়াবহ কাহিনী সেই ভীতি আরও সংবর্দ্ধিত করিয়াছিল। এ

জন্য সেই পুষ্করিণীতে মনুষ্য যাতায়াত করিত না। কাজেই একদা যাহা পরম শোভাময় ও নয়নরঞ্জন ছিল, তাহা এক্ষণে পরিত্যক্ত; সুতরাং শ্রীভ্রষ্ট ও বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। পুষ্করিণীর সোপানাবলী এক্ষণে ভগ্ন, তাহার চারিদিক নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তরুগুল্মে পরিপূর্ণ। সেই সকল বৃক্ষের শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া পুষ্করিণীর ভূরিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। তীরের কোন কোন লতা মুখ বাড়াইতে বাড়াইতে ক্রমে জলের উপর অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বকালে যাহাই থাকুক, বর্ত্তমান কালে যে এই পুষ্করিণীর অবস্থা বিশেষ ভীতিজনক তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই পুষ্করিণীতে লোক জন আসিত না। কিন্তু আজি এই সন্ধ্যার প্রাক্কালে, এই জনহীন ও ভয়সমাকুল সরোবরের মধ্যভাগে অবগাহন করিয়া এক শ্যামাঙ্গী যুবতী গাত্র ধৌত করিতেছে। যুবতীর বয়স ২৪।২৫ হইতে পারে। তাহার বদনে উৎসাহ ও দৃঢ়তার রেখা সমূহ সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত। তাহার দেহ মাংসল কিন্তু কোমলতা বর্জ্জিত। তাহার নেত্রদ্বয় উজ্জ্বল ও পাপবাসনা-ব্যঞ্জক! যুবতী নানা ভঙ্গীতে অঙ্গমার্জ্জনী লইয়া দেহের সর্ব্বস্থান সযত্নে সজ্ঘর্ষণ করিতেছে। অবিশ্রান্ত ঘর্ষণেও যে দেহের কৃষ্ণত্ব বিদূরিত হইবার নহে, একথা হয় তো যুবতী বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না। আশ্চর্য্য ভীতিহীনতার সহিত যুবতী বহুক্ষণ বিবিধ-বিধানে আপনার শ্যামকায়া ও পরিধানবস্ত্র তত্রত্য সলিলে বিধৌত করিল। তাহার পর তীরসন্নিধানে আসিয়া তথায় যে পিত্তল কলস পড়িয়া ছিল, তাহা উত্তমরূপে মার্জ্জিত করিল। পরে আবার জলে অবতরণ করিয়া তাহা জলপূর্ণ করিল। তাহার পর বামকক্ষে কলস গ্রহণ করিয়া এবং আপনার পরিধানের নিম্নভাগ সুবিন্যস্ত করিয়া দিয়া যুবতী ধীরে ধীরে সেই ভগ্ন সোপানে সাবধানতার সহিত আরোহণ করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পর কিয়ৎকাল যেরূপ গাঢ় ও মলিন অন্ধকার দেখা দেয় এখন তাহা দেখা দিয়াছে। সর্ব্বাশঙ্কা-বিরহিতা যুবতী, অন্ধকার, জনহীনতা, বন, ভয়জনক কিংবদন্তী সকলই উপেক্ষা করিয়া, কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে, এক মনুষ্যমূর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং বলিল,—

"কেও, রামলাল? কতক্ষণ?"

পুরুষ বলিল,—

"আধ ঘণ্টারও উপর। বাপরে, এমন গা ধোয়ার ঘটা কখন দেখি নাই; তোমার যে রূপের নেশায় এ গোলাম পাগল, তা আর অমন করিয়া ঘসিয়া মাজিয়া বাড়াইও না ভাই; তোমার পায়ে পড়ি।"

যুবতী বলিল,—

"পাগল এখনও হও নাই বলিয়া আমার এমন ঘসা মাজা করিতে হইতেছে। ছিঃ, তোমার কেবল কথা!"

রামলাল বলিল,—

"কালি, এততেও তোমার মন পাইলাম না! হয় তো তোমার পায়ে প্রাণ না দিলে, তুমি বুঝিবে না আমি তোমার জন্য কেমন পাগল। ভাল এবার তাহাই করিয়া দেখাইব।"

যুবতীর নাম কালীমতি, কি কালীতারা, কি কালিদাসী, কি এমনই একটা কিছু হইবে। আমরা তাহার নিগূঢ় সংবাদ জানি না।

কালী বলিল,—

"কেমন করিয়া তোমার কথা শুনিব? যে কাজটা চোখ কাণ বুজিয়া একবার সারিয়া ফেলিতে পারিলে, আমাদের সুখের পথে আর

কাঁটা থাকে না, আমাদের আর এমন করিয়া অন্ধকার বনে প্রাণ হাতে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না, তাহার জন্য তোমাকে এত দিন বলিতেছি, কিন্তু তুমি আজিও তাহার উপায় করিয়া উঠিতে পারিলে না। কেমন করিয়া বলিব তুমি আমার জন্য পাগল? পাগল অনেক দূরের কথা, তুমি যদি আমাকে একটুও ভাল বাসিতে, তাহা হইলে কোন্ দিন সে কাজ শেষ করিয়া ফেলিতে।"

"তুমি বুঝিতেছ না, কালি, কাজটা বড় শক্ত। একটা মানুষ নিকাশ করা আজিকার দিনে সোজা কথা নয়। ঐ শত্রুটাকে সরাইয়া না দিলে যে আমাদের মঙ্গল নাই, তা আমি বেশ জানি, কিন্তু করি কি বল দেখি?"

কালী নিতান্ত রাগতস্বরে বলিল,—

"করিবে তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু। আমি বুঝিয়াছি তুমি কোন কর্ম্মের নও। আমি যদি তোমার মত পুরুষ মানুষ হইতাম, তাহা হইলে, কোন্ কালে সকল কাজ শেষ করিয়া দিতাম। কি বলিব, আমি মেয়ে মানুষ, তাতেই তোমাকে এত সাধাসাধি। বুঝিয়াছি তোমাকে দিয়া কোন কাজ হইবে না; এখন তোমাকে আমি দেখাইব, তোমার মত পুরুষের চেয়ে মেয়ে মানুষও ঢের ভাল। এ জ্বালা আমার আর সহে না। আমি আজিই এদিক ওদিক যা হয় একটা করিয়া ফেলিব স্থির করিয়াছি। সকল কাজই আমি করিব, কেবল সময় কালে তুমি একটু সাহায্য করিবে কি না, তাই আমি জানিতে চাই। তাও বোধ করি, তোমাকে দিয়া হইয়া উঠিবে না—কেমন?"

রামলাল একটু থতমত খাইয়া বলিল,—

"তা—তা আর পারিব না? আমাকে যা করিতে বলিবে, আমি তাই করিব। বালাইটাকে যেমন করিয়া হউক দূর করিতে পারিলেই বাঁচা যায়। কিন্তু আমি বলিতেছিলাম কি—বলি এত তাড়াতাড়ি না করিয়া একটু দেরি করিলে চলে না কি?"

কালী অতিশয় বিরক্তির সহিত বলিল,—

"না, তা চলে না। তুমি ভেড়াকান্ত, তাই এখনও এ কথা বলিতেছ। দেরি—এ কাজে আবার দেরি? এখনই যদি সুযোগ হয়, তা হলে আমি এখনই কাজ সারিতে রাজি আছি। কিছু দেরি নয়; আজি রাত্রেই আমি যেমন করিয়া পারি কাজ ফরসা করিব। আমি নিজে সব করিব, তোমাকে কেবল কাজ শেষ হওয়ার পর আমার একটু সাহায্য করিতে হইবে। তাও কি ছাই তোমাকে দিয়া হবে না? তোমার যদি এত টুকু ভরসা নাই, তবে তুমি এ কাজে নামিয়াছিলে কেন? আর আমাকেই বা এমন করিয়া মজাইলে কেন?"

রামলাল বলিল,—

"তা তুমি যা বলিবে, তাই আমি শুনিব। তুমি আমাকে যে দিকে চালাইবে, আমি সেই দিকেই চলিব; তাতে আমার অদৃষ্টে যা হয় হউক। তা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম কি, বলি বিষ টিষ খাওয়াইয়া কাজ শেষ করা হবে তো?

কালী অতি ক্রোধের সহিত বলিল,—

"তোমার মাথা, আহাম্মক, ভেড়োকান্ত। সে ভাবনা তোমায় ভাবিতে হইবে না। এখন যা যা বলি শুন। ঠিক সেই রকম কাজ চাই। না যদি পার, ভাই, তা হলে তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত।"

রামলাল বলিল,—

"কেন ভাই, এত শক্ত কথা বলিতেছ? বল কি বলিবে। য বলিলে, তাই আমি করিব।

তখন কালী ও রামলাল খুব কাছাকাছি হইয়া ফুসফুস করিয়া অনেক কথা কহিল। তাহার পর রামলাল বলিল,—

"তোমার ভিজে কাপড় গায়ে শুকাইয়া গেল, এখন বাড়ী যাও। আমি ঠিক সময়ে হাজির হইব।"

কালী বলিল,—

"দেখিও সাবধান। একটু এদিক ওদিক হয় না যেন।"

রামলাল বলিল,—

"সে জন্য ভয় নাই! আমি ঠিক সময়ে আসিব।"

তাহার পর একদিকে রামলাল ও অপর দিকে কালী প্রস্থান করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—*—

শশী ভট্টাচার্য্য যাজক ব্রাহ্মণ। লোকটীর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। দেখিতে কৃষ্ণকায়, উচ্চদন্ত, ক্ষুদ্রনেত্র, সুতরাং সুপুরুষ নহেন। ব্রাহ্মণের শাস্ত্রাদি কিছু দেখা শুনা আছে; বিশেষতঃ দশকর্ম্মে তিনি বিশেষ নিপুণ। তাঁহার অবস্থা বড় মন্দ। বাসগৃহ একখানি সামান্য খড়ের ঘর, ঘরের সম্মুখে একটু ছোট উঠান, সেই উঠানের এদিকে ওদিকে কয়েকটী লাউ কুমড়ার গাছ, তাহার চারিদিকে কঞ্চির বেড়া। অবস্থা মন্দ হইলেও, গ্রামের লোকেরা ব্রাহ্মণকে বড় শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে। তাঁহার স্বভাব চরিত্র বড় ভাল। তাঁহার কোন দোষের কথা কেহ কখন শুনে নাই ও বলে নাই। কালী নাম্নী যে যুবতী স্ত্রীলোকের কথা এখনই হইতেছিল, সে এই ব্রাহ্মণের স্ত্রী। ব্রাহ্মণের ফাটা পা, গুম্ফহীন বদন, শিখাশোভিত শির, নস্যপূর্ণ নাসা, পুণ্ড্রযুক্ত ললাট ইত্যাদি কুলক্ষণে কালী বড় নারাজ ছিল। এ সকল কুলক্ষণ ছাড়া, তাঁহার আরও কিছু মহৎ দোষ ছিল। তিনি বড় ধার্ম্মিক এবং নিয়ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন। এ মহৎ দোষ কালী মোটেই পছন্দ করিত না। কাজেই সতত ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর মনান্তর চলিত। ব্রাহ্মণ বড় ধর্ম্মনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ; এজন্য তিনি আপনার পত্নীকেও ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্য-পরায়ণা দেখিতে ইচ্ছা করিতেন। কালী এরূপ ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের কোন ধার ধারিত না; সুতরাং সময়ে সময়ে]চার্য্য মহাশয় কালীর উপর নিতান্ত বিরক্ত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। কালীরও বড় বাড়াবাড়ি ছিল। কালী বেলা ৪টার সময় ঘাটে যাইত, রাত্রি নয়টা বাজাইয়া বাটী ফিরিত। কালী, সময় নাই, অসময় নাই, ঘরকন্নার কাজ নাই, অকাজ নাই, যখন তখন বাহিরে যাইত এবং দুই তিন ঘণ্টা কাটাইয়া আসিত। ব্রাহ্মণ এ সকল কারণে সদাই খিট্‌ খিট্‌ করিতেন। কালী তাহাতে বড় জ্বালাতন হইত এবং ক[illegible] মাথা কুটিয়া কখন বা কাঁদিয়া জিতিত।

আজি কালী সন্ধ্যার অনেক আগে গা ধুইবার ওজরে বাহির হইয়াছে, এত রাত্রি হইল, এখনও বাটী ফিরিল না। ভট্টাচার্য্য চটিয়া লাল হইয়া বসিয়া, ঘন ঘন নস্য লইতেছেন। তিনি মনে মনে ঠিক করিয়াছেন যে, আজি কালীরই একদিন কি তাঁহারই একদিন। আজি ব্রাহ্মণ কালীকে বিলক্ষণ শিক্ষা না দিয়া ছাড়িবেন না। কপালে যাই থাকুক, তিনি আজি কালীর খাতির রাখিবেন না। কিন্তু এ

স্থলে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক; কালী যতই অন্যায় কাজ করুক এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয় কালীর উপর যতই রাগ করুন, তিনি কালীকে বেজায় ভাল বাসিতেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। সেটা কালী মোটেই গণনায় আনিত না; ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজেও অনেক সময়ে তাহা বুঝিতে পারিতেন না। কিসে কালী সুখে থাকিবে, কিসে কালীর খাওয়া পরার কষ্ট হইবে না, কিসে কালীর গায়ে দুই একখানা সোণা রূপার অলঙ্কার উঠিবে, কিসে নিজের পাতের মাছখানা না খাইয়া, কালীর জন্য রাখিয়া যাইবেন, কিসে যজমানের বাড়ী ফলাহারে না বসিয়া, নিজে না খাইয়াও, বিলক্ষণ এক পাত্র কালীর জন্য আনিতে পারিবেন, ইত্যাদি ভাবনা তিনি সর্ব্বদাই ভাবিতেন। তিনি জানিতেন এরূপ ব্যবহার না করিয়া তিনি থাকিতে পারেন না বলিয়াই করেন। ইহার মূলে যে বিলক্ষণ ভালবাসা আছে, তাহা তিনি বড় একটা মনে করিতেন না। কালী ভাবিত, "হতভাগা, মড়িপোড়া, পোড়ারমুখো বামুন, ওর আবার ভালবাসা। আমার পোড়া কপাল তাই ওর হাতে পড়েছি।"

রাত্রি ঢের হইয়া গিয়াছে। তখন হেলিতে দুলিতে, ঘড়ার জল থকাস্ থকাস্ করিয়া নাচাইতে নাচাইতে ভট্টাচার্য্য-সীমন্তিনী গৃহাগতা হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শশি ঠাকুরের অপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। তিনি বলিলেন,—

"বেরো কালামুখী, বেরো আমার বাড়ী থেকে।"

অন্য দিন হইলে, কালী বিলক্ষণ মাত্রা চড়াইয়া, কাপ্তিনি মহাজনদের হিসাবে সুদ ও কমিশন সমেত হিসাব করিয়া, জবাব দিয়া তবে ছাড়িত। কিন্তু আজি, ভট্টাচার্য্যের কোন অজ্ঞাত পুণ্যফলে, কালী বিলক্ষণ দয়া করিয়া উত্তর দিল,—

"এত রাগ করা কেন? সারাদিন ঘরের কাজ কর্ম্ম করিয়া একবার বাহিরে যাই; দুটা মেয়ে ছেলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়, কাজেই দুটা কথা কহিতে দেরি হইয়া যায়।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অবাক্ হইলেন। কালীর মুখে এমন উত্তর! তিনি রাগভরে শাসন করিবার জন্য খড়ম দেখাইলে, যে কালী সত্য সত্যই খেংরা বাহির করে, দুটা তিরস্কার করিলে, যে কালী তাঁহার সটীক শিরে লাথি মারিতে আইসে, সেই কালীর মুখে আজি এই উত্তর শুনিয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয় একেবারে অবাক্ হইলেন। ভাবিলেন এতদিনে মধুসূদন আমার পানে মুখ তুলিয়া চাহিলেন, এতদিনে দীনবন্ধু আমার এই দুঃখের সংসার সুখের করিয়া দিলেন। ভগবানের ইচ্ছা না হইলে কালীর মতি গতি এমন ফিরিবে কেন? তিনি না পারেন কি? কালীর উত্তর সত্য ও সম্ভব কি না, ব্রাহ্মণ আহ্লাদে সে বিচার করিতে ভুলিয়া গেলেন। তিনি স্নেহস্বরে বলিলেন,—

"ব্রাহ্মণি, তা তো হতেই পারে! সারাদিন সংসারের কাজকর্ম্ম বন্ধ করাইয়া, যদি তোমাকে কখন সুখী করিতে পারি, তবেই তো আমার জীবন সার্থক। তোমার উপর রাগ করিয়া আমি কি সুখ পাই? তোমাকে দুটা রাগের কথা বলিলে আমার যে কষ্ট হয়, তাহা আর কি বলিয়া বুঝাইব? তবে মানুষের নাকি শত্রু অনেক, এই জন্যই সকল কাজে সাবধান হওয়া আবশ্যক। তুমি ছেলে মানুষ, পাছে সকল কথা সকল সময়ে ভাল করিয়া বুঝিতে না পার, এই জন্য দুই একটা সাবধানের কথা, সময়ে সময়ে, তোমাকে বলিয়া দিতে হয়। তা তুমি এখন কাপড় ছাড়। দেখ দেখি

সন্ধ্যার আগে তুমি গা ধুইয়াছ, সেই ভিজে কাপড় এখনও তোমার গায়ে রহিয়াছে; এতে অসুখ হবারই কথা। এ কথা যদি তোমাকে আমি না বুঝাই, তবে কে বুঝাইবে বল?"

কালী, তখন দড়ী দ্বারা লম্বিত এক বাঁশের আল্‌না হইতে, এক খানি কাপড় হাতে লইয়া একটু অভিমানের হাসি হাসিয়া বলিল,—

"আমি কি তোমার মত পণ্ডিত যে, তুমি যেমন বুঝাইবে, আমিও তেমনই বুঝিব? তোমার মত পণ্ডিত আমাদের এদেশে আর কেহ নাই। আমি যেখানে যাই সেখানেই আমাকে ভট্টাচার্য্য ঠাকুরুণ বলিয়া লোকে কত মান্য করে। তোমার মত পণ্ডিতের হাতে পড়িয়া, কোন কথা বুঝিতে হইলে, আমাকে কি রান্না হাড়ির কাছে যাইতে হইবে?"

ভট্টাচার্য্য ভাবিলেন, কি সৌভাগ্য! আমার কালীর এমনই দেব প্রকৃতিই বটে; তবে ছেলে মানুষ; এতদিন সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। ভগবান্ কৃপা করিয়া এত দিনে আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন, ইহা আমার অশেষ ভাগ্য। বলিলেন,—

"লোকে আমকে মান্য করে সত্য, কিন্তু লোকে আপন আপন পরিবারকে যেমন করিয়া খাওয়ায় পরায়, যেমন করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে রাখে, আমি যে তোমাকে কিছুই করিতে পারি না, এ দুঃখ আমার মরিলেও যাইবে না।"

সত্যই ব্রাহ্মণের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। তখন কালী বলিল,—

ছিঃ ছিঃ! এজন্য তুমি মনে দুঃখ করিতেছ! তোমার স্ত্রী হইতে পাওয়ায় আমার যে সুখ, বোধ করি, রাজরাণীরও তাহা নাই। দেশের মধ্যে তোমার মত ধার্ম্মিক, তোমার মত মানী আর কে আছে? অনেক সুকৃতিফলে এ জন্মে তোমাকে পাইয়াছি; নারায়ণ করুন, যেন জন্মে জন্মে তোমাকেই পাই।"

এবার ব্রাহ্মণ সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল। সুখের আশায় কালীর সহিত ঘর পাতিয়া অবধি, ভট্টাচার্য্যের কপালে এমন সুখ একদিনও ঘটে নাই। তাঁহার চক্ষে জল দেখিয়া, কালী ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিল এবং আপনার বস্ত্রাঞ্চল দিয়া অতি যত্নে তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিল,—

"রাত্রি অনেক হইল খাওয়া দাওয়া কর। আজি মল্লিকদের বাড়ী থেকে, ফলারের জন্য, দই চিড়া সন্দেশ, দিয়া গিয়াছে। তুমি খাবে বলিয়া তুলিয়া রাখিয়াছি। ওঠ এখন, বেশী রাত্রে খাওয়া তোমার অভ্যাস নয়, আর দেরি করিলে অসুখ হইবে।"

কালী উঠিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আহারের উদ্যোগ করিতে গেল। উদ্যোগ ঠিক হইলে, কালী ভট্টাচার্য্যকে উঠিয়া আসিবার জন্য সাদরে ডাকিল। ভট্টাচার্য্য পিঁড়িতে বসিয়া আহারে নিযুক্ত হইলেন। চিরদিনই তো তিনি দধি চিপিটক আহার করিয়া থাকেন, কিন্তু আজি কি মিষ্ট! আজি তাঁহার ঘরের ক্ষীণ প্রদীপ কি উজ্জ্বল, আজি তাঁহার পর্ণকুটীর কিরূপ সর্ব্বসুখময়, আজি তাঁহার গৃহসজ্জা কি চমৎকার, আজি তিনি নিজে কি আনন্দময় এবং সর্ব্বোপরি আজি তাঁহার ব্রাহ্মণী কি সুন্দরী মধুরভাষিণী এবং লক্ষ্মীস্বরূপা। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, যাহার গৃহে এমন ধন, সে আবার দরিদ্র কিসে?"

আহারাদি শেষ হইলে, তাঁহার সাধের ব্রাহ্মণী তাঁহাকে একটা পান দিলেন। তিনি কালীকে আহার করিতে অনুরোধ করিয়া, শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলেন। কালী স্বামীর

পাত্রাবশিষ্ট ভোজন করিয়া ও আবশ্যক কর্ম্ম সমস্ত শেষ করিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে শয়ন করিল। সে রাত্রে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যেমন নিদ্রা হইল, তেমন সুখে, তেমন সুনিদ্রা তাঁহার জীবনে আর কখন হয় নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—*—

বড় ভয়ানক কাণ্ড! শশী ভট্টাচার্য্য রাত্রে কাটা পড়িয়াছেন। প্রাতে তাঁহার কুটীরের চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। পুলিসের ইনিস্পেক্টর, হেড্ কনষ্টবল ও কনষ্টবল গস্ গস্ করিতেছে। কুটীর-প্রাঙ্গণের অদূরে একটা বনের অন্তরালে, লাস পড়িয়া আছে। লাস একখানি কাপড় দিয়া ঢাকা। ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে রক্তের ঢেউ খেলিতেছে। ঘর হইতে আরম্ভ করিয়া, যেখানে লাস পড়িয়া আছে সে পর্য্যন্ত, রক্তের ধারা রহিয়াছে। লাসের দুই দিকে দুই জন কনষ্টবল দাঁড়াইয়া আছে।

দূরে এক স্থানে, পাঁচ জন কনষ্টবল বেষ্টিত হইয়া, কালী ও রামলাল বসিয়া আছে। তাহাদের উভয়েরই হাতে হাতকড়ি। কালীর ললাট কুঞ্চিত, ভ্রূযুগল স্ফীত, চক্ষু রক্তবর্ণ, এবং তাহার ভাব নিতান্ত ভীতিশূন্য। রামলাল নিতান্ত কাতর ও অবসন্ন। বহু ক্রন্দন হেতু তাহার চক্ষু লাল। সে অধোমুখ। উভয়েরই পরিধান বস্ত্র রক্তাক্ত। রামলালের বস্ত্রাপেক্ষা, কালীর বস্ত্র অধিক রক্তাক্ত।

অদূরে, একটী বৃক্ষতলে, ইনিস্পেক্টর বাবু, একজন প্রতিবেশী-প্রদত্ত, একটী মোড়ায় বসিয়া হাসিতে হাসিতে হুঁকায় পাতার নল লাগাইয়া, তামাকু খাইতেছেন। তাঁহার সম্মুখে রক্তরঞ্জিত এক দা। তাঁহার নিকটে কয়েকজন কনষ্টবল দণ্ডায়মান।

সকল স্থানেই লোক—ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ—লোকের আর সীমা নাই। স্ত্রীলোকেরা ভিড়ের বড় নিকটে যাইতে পারিতেছে না; দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে ও শুনিতেছে। তাহাদের দেখিলে পোড়ারমুখো পুরুষগুলার মন ঠিক থাকিবে না বলিয়া যে সকল যুবতী ও অর্দ্ধবয়সী নারীর বিশ্বাস আছে, তাহারা, গাছের আড়ালে ও অবগুণ্ঠনের অন্তরালে থাকিয়া, নিতান্ত ঔৎসুক্যের সহিত চাহিয়া আছে। প্রাচীনারা লোকদের জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিতেছে এবং তাহাই আবার দশগুণ বাড়াইয়া হাত মুখ নাড়িতে নাড়িতে, নবীনাদের নিকটে আসিয়া গল্প করিতেছে; ছেলেরা ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছে। তাহাদের মা, বা পিসী, বা মাসী, তাড়া দিয়া, যাইতে বারণ করিতেছে। দুই একটা দুষ্ট ছেলে, তাড়া ও চখ্‌রাঙ্গাণীতে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া, লোকের পায়ের ফাঁক দিয়া, গুড়ি গুড়ি আসিয়া যাহা দেখিবার তাহা দেখিতেছে। দুই একজন বৃদ্ধ আপনার যুবক পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, বা ভাগিনেয়কে সাক্ষী দিতে হইবে বলিয়া ভয় দেখাইয়া, গোলের নিকটে যাইতে নিষেধ করিতেছে; কিন্তু যুবকেরা সে উপদেশে বড় একটা কর্ণপাত করিতেছে না।

ভট্টাচার্য্যের কুটীরের দ্বার হইতে উঁকি দিয়া যাহারা ভিতরে দৃষ্টিপাত করিতেছে, তাহারা সেখানকার রক্তগঙ্গা কাণ্ড দেখিয়া চমকিত হইতেছে। তক্তপোষের উপর হইতে রক্ত গড়াইয়া পড়িয়া ঘর ভাসিয়া গিয়াছে; সুতরাং তক্তপোষের উপরে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়

যখন নিদ্রিত ছিলেন, তখনই যে তাঁহাকে কাটিয়াছে তাহার আর ভুল নাই। তাহার পর সেই রক্তের উপর পায়ের দাগ এবং মৃত ব্যক্তিকে হেঁচড়াইয়া আনার দাগ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

যেখানে লাস, সেখানে লোকে কেবল হায় হায় করিতেছে। দুই এক জনের চক্ষু ছল ছল করিতেছে। দুই এক জন সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলিয়াছে। শশী ভট্টাচার্য্য নিতান্ত নিরীহ ও শান্ত ব্যক্তি। গ্রামের তাবৎ লোকেই তাঁহাকে ভাল বাসে ও আত্মীয় জ্ঞান করে। তাঁহার এইরূপ অপমৃত্যুতে সকলেই অত্যন্ত ব্যথিত। কিরূপে কাটিয়াছে, কোথায় কিরূপে আঘাত করিয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য অনেকে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। লাস কাপড় ঢাকা থাকায় তাহাদের সে ইচ্ছা সফল হওয়ার কোনই সুযোগ হইতেছে না। তাহারা, কৌতূহল-নিবৃত্তির অন্য উপায় না দেখিয়া, কখন বা কনষ্টবলদের পীড়াপীড়ি করিতেছে, কখন তাহাদিগকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিতেছে। কনষ্টবল মহাশয়েরা কৃপা করিয়া দুই একটা কথা বলিতেছেন। যাহা বলিতেছেন তাহাতে বুঝা যাইতেছে, লাসের সর্ব্বাঙ্গে, পঁচিশ ত্রিশ স্থানে সাংঘাতিক আঘাত আছে; তাহার মধ্যে ঠিক গলার নিকট হইতে বুকের উপর পর্য্যন্ত যে এক প্রকাণ্ড আঘাত, তাহা দেখিতে যেমন ভয়ানক তেমনই গুরুতর।

যেখানে কালী ও রামলাল প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছে, সেখানে অনেক লোক। তাহাদের দেখিয়া অনেকেই নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নানা কথা বলিতেছে। একজন ইয়ার যুবা বলিয়া ফেলিল,—

"ফাঁসির কাঠে ঝুলিতে ঝুলিতে ইয়ারকির চূড়ান্ত হইবে বাবা।"

কালী এ কথায় একটুকও বিচলিত হইল না। কিন্তু রামলাল কাঁদিয়া ফেলিল। আর এক উদ্ধত ব্যক্তি নিতান্ত ঘৃণার সহিত বলিল,—

"ডালকুত্তা দিয়া ইহাদের খাওয়ায় না?"

এবার কালী কুপিত ব্যাঘ্রের ন্যায় দৃষ্টিতে বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। এক বৃদ্ধা কোন প্রকারে ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। সে কালীর মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—

"কালামুখী, ধিক্‌জীবনী! তোর গলায় দড়ি।"

কালী এবারেও ভ্রূকুটী করিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। আর এক প্রবীণ লোক বৃদ্ধার কথার-উত্তরে বলিল,—

"সে কথা আর তোমার বলিয়া দুঃখ পাইতে হইবে না। আর বড় জোর মাস খানেকের মধ্যে গলায় দড়িই হইবে।"

যেখানে শ্রীল শ্রীযুক্ত ইনিস্পেক্টর বাবু বসিয়া আছেন সেখানে, তাঁহার শ্রী-বদনার-বিন্দ-বিনির্গত বাক্য-সুধালালসায় অনেকে নিতান্ত উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতেছে; তিনি কিন্তু বাক্য-বিতরণে নিতান্ত কৃপণ। তাঁহার তদারক সংক্রান্ত লেখাপড়া ও অন্যান্য সমুদায় কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি লাস চালান দিবার জন্য, একখানি গরুর গাড়ি আনিতে কনষ্টবল পাঠাইয়া, অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। তিনি বড়লোক জ্ঞানে, লোকে তাঁহাকে, সাহস করিয়া, সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছে না। দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে। তিনি দিন-দুনিয়ার মালিকভাবে, প্রশ্নের সিকি খানা, কদাচিৎ আধ খানা উত্তর দিয়া কাজ সারিতেছেন।

কিন্তু কিরূপে এ কাণ্ড পুলিসের গোচর হইল তাহা এখনও বলা হয় নাই। ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর অনতিদূরে সদানন্দ দাস নামে এক কৈবর্ত্তের কুটীর। সদানন্দ কোন কার্য্য উপলক্ষে গ্রামান্তর যাইবে বলিয়া, সে রাত্রি ভাল করিয়া ঘুমায় নাই। রাত্রি যখন একটা তখন সদানন্দ হাত মুখ ধুইবার জন্য ঘটি হাতে করিয়া বাহিরে আইসে। বাহির হইয়াই সে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঘর হইতে ধপাস্ করিয়া এক শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে এক বিকট 'মাগো' শব্দ তাহার কাণে যায়। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক ছট্‌ফট্, গোঁ গোঁ, ধপাস্ ধপাস্ দুম্-দাম্ শব্দ শুনিতে পায়। ভট্টাচার্য্য-পত্নীর স্বভাব চরিত্রের কথা এবং ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর মনান্তরের কথা পাড়া প্রতিবেশী সকলেই জানিত। ভট্টাচার্য্যের ঘরের মধ্যে তখন আলো জ্বলিতেছিল। সদানন্দ ঘরের আরও নিকটে আসিয়া শুনিতে পাইল, ঘরের মধ্যে দুইজন লোক ফুস্ ফুস্ করিয়া কথা কহিতেছে। গত বর্ষায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঘরের এক দিকের দেয়াল পড়িয়া গিয়াছিল। সে দিকে এখনও নূতন দেয়াল দেওয়া ঘটে নাই, দরমার বেড়া দেওয়া আছে মাত্র। সদানন্দ অতি সাবধানে, সেই বেড়ার নিকটে আসিয়া, একটা ছিদ্র দিয়া ভিতরকার ব্যাপার দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যতদূর সে দেখিতে পাইল, তাহাতে তাহার পেটের পীলে চমকাইয়া গেল। সে কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া এবং আপনার প্রয়োজন সমস্ত ভুলিয়া গিয়া ঘটি হাতে থানায় উপস্থিত হইল। সে যাহা দেখিয়াছে, শুনিয়াছে ও বুঝিয়াছে সমস্তই সে সেখানে অকপটে ব্যক্ত করিল। তখনই পুলিসের লোকেরা তাহার সঙ্গে আসিল। রাত্রি তখন প্রায় ৪টা। এই পর্য্যন্ত কথা সদানন্দ দাসের জবানবন্দীতে ব্যক্ত হইয়া ইনিস্পেক্টর বাবুর কলমের গুণে কাগজজাত হইয়াছে। তাহার পর যাহা হইয়াছিল, তাহা পুলিস স্বচক্ষে দেখিয়াছে।

পুলিস আসিয়া দেখিল, কালী ও রামলাল শশী ভট্টাচার্য্যের মৃতদেহ টানাটানি করিয়া বনের দিকে লইয়া যাইতেছে। সে সময়টা জ্যোৎস্না থাকায় তাহাদের দেখার বিশেষ অসুবিধা হইল না। তাহারা নিকটস্থ হইয়া কালী ও রামলালকে ধরিয়া ফেলিল। রামলাল প্রথমে পলাইবার, পরে আত্মহত্যা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও, কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। সে তখন অকপটে সমস্ত অপরাধ কাঁদিতে কাঁদিতে, স্বীকার করিল। কালীর বিশেষ উত্তেজনায় এবং আপনার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় সে এ কাজে লিপ্ত হইয়াছিল, কালীর সহায়তা ভিন্ন সে আর কিছুই করে নাই, এবং ভট্টাচার্য্যের শরীরে সে স্বহস্তে একটীও অস্ত্রাঘাত করে নাই, একথা সে বিশেষ করিয়া বলিল। কালীও অকাতরে সমস্ত পাপ ব্যক্ত করিল। ভট্টাচার্য্য তাহার সুখের পথে কণ্টক; সুতরাং তাঁহাকে মারিয়া ফেলা আবশ্যক মনে করিয়া সে স্বহস্তে দা দিয়া, বারংবার আঘাত করিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করিয়াছে, এ কথা সে নির্ভীকভাবে স্বীকার করিল। রামলাল স্বেচ্ছায় কোন কাজ করে নাই। কালীর বিশেষ অনুরোধে পড়িয়া, সে সামান্য সাহায্য করিয়াছে মাত্র এবং সে না থাকিলেও, কালী একাই সব কাজ শেষ করিত, এমন কথা পর্য্যন্ত কালী বলিল।

বেলা যখন ১০টা তখন গাড়ী আসিল। ইনিস্পেক্টর বাবু গাড়িতে লাস উঠাইয়া, সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়ি-বদ্ধ কালী ও রামলালকে চালান দিয়া এবং অন্যান্য বিষয়ের আবশ্যক মত ব্যবস্থা করিয়া, প্রস্থান করিলেন।

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়িল। ক্রমে ক্রমে সেখানকার লোকের ভিড় কমিতে লাগিল এবং কেহ বা কালীকে গালি দিতে দিতে, কেহ বা শশী ভট্টাচার্য্যের জন্য আক্ষেপ করিতে করিতে, কেহ কেহ বা নিতান্ত দার্শনিক ভাবে মানব-চিত্রের এতাদৃশ দুর্জ্ঞেয়তার কথা আলোচনা করিতে করিতে এবং কেহ কেহ বা কালী ও রামলালের কাহার কিরূপ সাজা হইবে তাহার বিচার করিতে করিতে, বাটী ফিরিল। কিন্তু কয়েক দিন প্রতিবেশী নরনারীগণ নিরন্তর বিবিধ সঙ্গীতে এই কাণ্ডের আলোচনা করিতে ভুলিল না।

নবম পরিচ্ছেদ।

—*—

যে রাত্রে শশী ভট্টাচার্য্য হত হন, তাহার মাসাধিক কাল পরে, এক দিন সন্ধ্যার অনতি-কাল পূর্ব্বে রাধানাথ রায়ের বহ্বায়ত ভবনের অন্তঃপুর-মধ্যস্থ এক সুবৃহৎ ছাতের উপর, রমাপতি পরিভ্রমণ করিতেছেন। রমাপতি একাকী নহেন। তাঁহার বাম করের মধ্যা-ঙ্গুলি ধারণ করিয়া, এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বালিকা সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছে। স্তবকে স্তবকে ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি বালিকার কপালে, গ্রীবায়, কর্ণমূলে ও আস্যে আসিয়া নিপতিত হইয়াছে। বালিকার বয়স চারি বৎসর। তাঁহার আকর্ণ বিস্তৃত, সুল-সূক্ষ্ম ভ্রূযুগ-তলস্থ আয়ত, সমুজ্জ্বল লোচন, তাহার দেহের অপূর্ব্ব গৌরকান্তি ও লাবণ্যজ্যোতিঃ, তাহার কোমল রক্তাভ বিম্বো-ষ্ঠের হসিত ভাব এবং তাহার অস্ফুট ও ভঙ্গ, মৃদু ও মধুর, আনন্দ ও হাস্যময় বাক্যা-বলী যে দেখিয়াছে ও শুনিয়াছে, সে তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া কখনই থাকিতে পারে নাই। এই বালিকার নাম মাধুরী। পাঁচ বৎসর হইল রমাপতি ও সুরবালা বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছেন। বিধাতা, তাঁহাদের প্রগাঢ় প্রণয়-বন্ধন দৃঢ়তর করিবার অভিপ্রায়ে, প্রথমে এই কন্যাসন্তান, এবং তাহার দুই বৎসর পরে একটী সুকুমার পুত্রসন্তান প্রদান করিয়া, তাঁহাদিগের প্রতি কৃপার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। জগতে যে যে পদার্থ মানবের সুখ-সংবিধানে সমর্থ, তাহার সকলই তাঁহাদের আয়ত্ত। ধনই অনেক স্থলে, ভোগ-বিলাসানুরত বা পরোপকার-প্রবণ-হৃদয় মানবের আশা-নিবৃত্তির অনন্যসাধন এবং তৃপ্তির সর্ব্বপ্রধান উপাদান। সে ধন, প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রমাণে, তাঁহাদের করায়ত্ত দাম্পত্য প্রণয়, সৎস্বভাব-সম্পন্ন যুবক যুবতীর পক্ষে, সর্ব্বসুখ-বিধায়ক সামগ্রী। ভগবৎ কৃপায় এই সৌভাগ্যবান্ যুগল তাদৃশ প্রণয়ের আদর্শ স্থলাভিষিক্ত হইবার উপযোগী। এই সকল দুর্লভ সুখ ও শিশু-কণ্ঠোত্থিত অস্ফুট আধ আধ স্বরের সহিত বিজড়িত না থাকিলে, মধ্যমণিহীনা রত্নহারের ন্যায়, সতীত্ব-সম্পত্তি-শূন্যা সুন্দরীর ন্যায়, কপর্দ্দক-মাত্র-বিহীন দাতার ন্যায় এবং সুরভি-কুসুম-পরিশূন্য কণ্ট-কাকীর্ণ উদ্যানের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল বলিয়া অনেকে বোধ করেন কিন্তু অনুকূল বিধাতৃ-অনুকম্পায় তাঁহাদের সে অভাবও নাই। সুতরাং তাঁহারা সৌভাগ্যশালিগণের শীর্ষ-স্থানীয়।

কিন্তু জগতে অব্যাহত সুখ-সম্ভোগ প্রায় কাহারও অদৃষ্টে সংঘটিত হয় না। তাঁহারা বড় দাগা পাইয়াছেন—বড় ঝড় তাঁহাদের মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে।

রাধানাথ ও তাঁহার ব্রাহ্মণী উভয়েই ইহ-লোক হইতে পলায়ন করিয়াছেন। রমাপতির পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার অনতিকাল পরে, রাধানাথ রায় লীলা সম্বরণ করেন। সেই দারুণ দুর্ঘটনার তিন মাস পরে, সেই দুর্দ্দমনীয় শোক কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইবার পূর্ব্বেই, সুরবালার জননী পতিপরিগৃহীত-পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যে দুই সুমহৎ তরুর সুশীতল ছায়াতলে নিরুদ্বেগে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহা আর তাঁহাদের নাই। যে দুই জীবন সংসারের কঠোর সংঘর্ষণ হইতে অন্তরিত থাকিয়া, আনন্দ ও সৌভাগ্য সম্ভোগমাত্র লক্ষ্য করিয়া, সুখে অতিবাহিত হইতেছিল, তাঁহা-দের অতঃপর সংসারের সম্মুখে বুক পাতিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। যে পর্ব্বতের অন্তরালে তাঁহারা অবস্থিত ছিলেন, তাহা চূর্ণীকৃত হইয়াছে। তাঁহাদের সুখ ও সন্তোষ, আনন্দ ও প্রীতি, ভোগ ও বিলাস বিধায়ক ব্যবস্থা করা যাঁহাদের জীবনের ব্রত ছিল, তাঁহারা আর নাই। রাধানাথ ভব-রঙ্গভূমি হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, এক উইল পত্র দ্বারা, স্বীয় বিপুল বিভবাদির বিহিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই উইল অনুসারে তাঁহার জামাতা রমাপতি সমস্ত সম্পত্তির এক মাত্র উত্তরাধিকারিত্ব ও সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছেন।

রমাপতি মাধুরীর সঙ্গে বেড়াইতেছেন। মাধুরী তাঁহাকে চালাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে বলিলেই হয়; কারণ সে কখন জোরে চলিয়া পিতার হাত ধরিয়া টানিয়া যাইতেছে, কখন বা পশ্চাতের পার্শ্বের পদার্থবিশেষে লক্ষ্যবদ্ধ করিয়া, পা ফেলিতে ভুলিয়া যাইতেছে; সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে রমাপতি বাবুও থামিতে-ছেন। আর যে তাহার গজর গজর বকুনি, তাহার কথা আর কি বলিব। বেদ কোরা-ণের বহির্ভূত অনেক গল্প সে করিতেছে। ভাষার উচ্চারণ-বিধির মস্তকে পদাঘাত করিয়া, পদস্থাপনের রীতি ও পদ্ধতি উপেক্ষা করিয়া, এবং প্রসঙ্গের মধ্যে নিঃসঙ্কোচে প্রসঙ্গান্তর অবতারিত করিয়া, মাধুরী ব্যাকরণ ও ন্যায় শাস্ত্রের যৎপরোনাস্তি অবমাননা করিতেছে। কিন্তু তাহার সেই অসম্বন্ধ ও অযথাব্যক্ত বাক্যাবলী তাহার পিতার কর্ণে অজস্র ধারায় মধুবর্ষণ করিতেছে। স্বভাব-সঞ্জাত অপত্য-স্নেহ, তনয়ার তাদৃশ অপরিস্ফুট বচন-বিন্যাস মধুময় করিবার প্রধানতম হেতু হইলেও, মাধুরীর সুস্বরবিজড়িত ভঙ্গ ভাষা নিতান্ত নির্লিপ্ত শ্রোতৃবৃন্দের অন্তরকেও মোহিত করিতে সমর্থ।

পিতা ও পুত্রী যখন এইরূপ আলাপে নিযুক্ত, সেই সময়ে সুন্দরী-শিরোমণি-স্বরূপা সুরবালা সেইস্থানে সমাগতা হইলেন। তাঁহার অঙ্কে এক নির্ম্মলকান্তি নিরুপম নয়নানন্দ নন্দন। সেই ভুবনমোহন পুত্র দূর হইতে রমাপতি ও মাধুরীকে দেখিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে, মধুরস্বরে, মধুময় হাস্যের সহিত, "ধু—ধু—বা—বা" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। শিশুর নিতান্ত নবীন বাগ্‌যন্ত্র মাধুরীর নাম উচ্চারণ করিতে পারিত না। সে সেই জন্য স্বকৃত অত্যদ্ভুত ব্যাকরণের সহায়তায়, সেই কঠোর শব্দের ভূরিভাগ 'ইৎ' করিয়া, কেবল ধু টুকু বজায় রাখিয়াছিল। শিশুর সেই অমৃতময় বাক্য কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র, রমাপতি ও মাধুরী ব্যস্ততাসহ সেই দিকে ফিরিলেন। রমাপতি দেখিলেন, অপূর্ব্ব দর্শন! সেই রবি-কর-পরিশূন্য, স্নিগ্ধ-ছায়া-রাশি-পরিবৃত, সমুচ্চসৌধশিরে; সেই নীড়গামী, নানাদিগ্‌বিহারী, বহুভাষী, বিবিধ

স্বাতীয় বিহঙ্গমবেষ্টিত দৃশ্য মধ্যে ; সেই প্রীতিপ্রদ, প্রবহমাণ, সুস্নিগ্ধ, সুশীতল, বসন্তানিলসাগরে, রমাপতি দেখিলেন, সুরবালা, তাঁহার সুরনায়কতুল্য সুকুমার শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, দাঁড়াইয়া! মৃদুমন্দ বায়ুহিল্লোলে শিশুর কেশের গুচ্ছ নাচিয়া নাচিয়া উড়িতেছে এবং সুরবালার প্রলম্বিত অঞ্চল কেতনবৎ উড্ডীয়মান হইতেছে। বালিকা এখন যুবতী হইয়াছেন। যৌবনসমাগমে এখন সেই অপার্থিব সৌন্দর্য্য পূর্ণোজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত হইয়াছে। রমাপতি অতৃপ্ত নয়নে সেই লাবণ্যময়ীর স্বর্ণকান্তি সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন মাধুরী, "বাবা! ডেক ডেক, ঐ মা" বলিয়া সেই দিকে প্রধাবিত হইল। তখন রাজরাজমোহিনী সুরবালা, মাধুরীর হস্তধারণ করিয়া, অগ্রসর হইলেন। রমাপতিও কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া মধ্যপথে সুরবালার সমীপাগত হইলেন এবং বলিলেন,—

"এই বুঝি তোমার শীঘ্র আসা? আঠারো মাসে তোমার বৎসর?"

সুরবালা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"তা আমি জানি। এতক্ষণ তোমার হুকুম তামিল করিতে না পারায়, অবশ্যই দাসীর অপরাধ হইয়াছে। আমি আসিতেছি এমন সময়ে পুটের মা ছেলের জন্য জ্বরের ঔষধ চাহিতে আসিল। তাহার ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতে দেরি হইল। তা যাই হউক, দাসী গলায় কাপড় দিয়া হাতযোড় করিয়া, মানভিক্ষা করিতেছে। যদি নিতান্তই হুজুর তাহাকে ক্ষমা না করেন, তাহা হইলে দাসী শেষে এমন কল খাটাইবে যে, হুজুরের তখন নাকালের সীমা থাকিবে না।"

কিন্তু রমাপতি তখন উত্তর দিবেন কি? সেই রূপসীর মধুর বাক্য, মধুর ভাব, এবং মধু[illegible] তাঁহাকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। কথায় কি ছাই তখন প্রাণের কথা বাহির হয়? কটা কথা লইয়াই বা ভাষা, কটা ভাবই বা তাহাতে ব্যক্ত হয়! রমাপতি, সে কথার উত্তর দিবার কোন প্রয়াস না করিয়া, খোকাকে কোলে লইবার জন্য হাত পাতিলেন। খোকা সানন্দে লাফাইয়া আসিয়া তাঁহার কোলে পড়িল। রমাপতি বারংবার তাহার বদন চুম্বন করিলেন। তখনই কয়েক জন ঝি তাঁহাদের কোন আদেশ আছে কি না জানিবার নিমিত্ত, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রমাপতি, মাধুরী ও খোকাকে লইয়া, ছাতে ছাতে বেড়াইতে আদেশ করিলেন। তখন সুরবালা আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"মানীর মান কি ভাঙ্গিয়াছে? না শেষে মানের দায়ে নিজে নাকে কাঁদিতে সাধ আছে?"

রমাপতি বলিলেন,—

"সাধ যাহা আছে তাহা দেখিতে পাইবে এখনই। 'অতি দর্পে হতা লঙ্কা' জানতো? দোষ করিলে নিজে, নাকে কাঁদাইতে চাও আমাকে। তোমার মত লোক বিচারক হইলে দেশে সুবিচারের স্রোত বহিয়া যাইবে।"

সুরবালা রমাপতির হাত ধরিয়া, অন্য এক ছাতে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতে লাগিলেন,—

"আমি বিচারক হইলে এই কপট পুরুষগুলাকে বিলক্ষণ জব্দ করিয়া তবে ছাড়ি।"

রমাপতি জিজ্ঞাসিলেন,—

"সকলের প্রতিই কি তাহা হইলে ধর্ম্মাবতার সমান বিচার করিবেন? কেহই কি আপনার ন্যায়-দণ্ডের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবে না?"

সুরবালা, মুখের হাসি অঞ্চলে চাপিয়া, বলিলেন,—

"কেহ না। যাহাদের মধ্যে সকলেই কপট তাহাদের আবার ছাড়াছাড়ি কি? সকলেরই সাজা।"

রমাপতি বলিলেন,—

"পুরুষ যে অত্যন্ত কপট তাহার আর সন্দেহ কি! তাহা যদি না হইবে, তাহা হইলে শশী ভট্টাচার্য্য কখন কি কালীকে এত ভাল বাসিত?"

সুরবালা কালীর নামোচ্চারিত হইবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, তোমরা—তোমরা দেবতা—আমরা সামান্য মেয়ে মানুষ—আমরা তোমাদের মহিমা কি বুঝিব? তোমরা আমাদের মত ক্ষুদ্র কীটকে পদে দলিত না করিয়া, হৃদয়ে স্থান দেও, এ তোমাদের আশ্চর্য্য দেবত্ব। বলিলেন,—

"জানি না কোন্ স্বর্গে শশী ভট্টাচার্য্যের স্থান হইবে। স্বর্গ যদি থাকে এবং স্বর্গে যদি শ্রেণী থাকে, তাহা হইলে শশী ভট্টাচার্য্য অবশ্যই সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে স্থান পাইবেন। আর কালী? নরকেও কি নরক নাই? সে কেন মানবদেহ পাইয়াছিল? বিধাতঃ! তোমার রাজ্যে তাহার জন্য কি শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছ?"

রমাপতি দেখিলেন, ক্রোধে ও হৃদয়ের যাতনায় সুন্দরীর বদন অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। লোচনযুগল উজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান্! যে হস্ত হইতে কালীর ন্যায় পিশাচীর সৃষ্টি, এই দেবীও কি সেই হস্তেরই ফল? সুরবালা আবার বলিতে লাগিলেন,—

"কিন্তু মানবরাজ্যে কালীর ঘোর দুষ্কৃতির কি শাস্তি হইল তাহা আমি জানিতে পাই নাই। তাহার পাপ আত্মা আজিও কি সেই দেহে আছে?"

রমাপতি বলিলেন,—

"বিচারে কালীর ফাঁসি ও রামলালের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের হুকুম হইয়াছে। বোধ হয় আর পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই কালীর ফাঁসি হইয়া যাইবে।"

সুরবালা চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—

"ফাঁসি হইবে! ফাঁসিই কি তাহার যথেষ্ট শাস্তি? কিন্তু সে কথায় আমাদের কাজ কি! যাহা হইবার তাহাই হউক।"

অনেকক্ষণ আর কেহই কোন কথা কহিলেন না। তাহার পর সুরবালা বলিলেন,—

"তোমার সহিত আমার এবার ভারি ঝগড়া হইবে।"

রমাপতি বলিলেন,—

"অপরাধ?"

সুরবালা মুখ ভার করিয়া বলিলেন,—

"মোকদ্দমার জন্য তুমি কলিকাতায় যাইবে বলিতেছ; সেখানে দশ পনর দিন দেরি হইবে তাহাও বলিতেছ; কিন্তু একবারও আমাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়ার কথাটী বলিতেছ না। বেশ, যাও তুমি, আমি ইহার এমন শোধ তুলিব যে, তোমাকে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখিতে হইবে!"

রমাপতি বলিলেন,—

"কেন তোমাকে লইয়া যাইব? আমার কি আর কেহ নাই? মনে কর আমার সুকুমারীর সহিত দেখা হইবে।"

সুরবালা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"এমন দিন কি হইবে? ভগবান যেন তাহাই করেন।"

রমাপতি বলিলেন,—

"এমন দিন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই জ্ঞান বলিয়া এ কথা বলিতেছ। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমরা যাহাই মনে কর, সুকুমারী বাঁচিয়া আছেন। মনে কর যদিই কলিকাতায় গিয়া সুকুমারীকে পাই, তাহা হইলে তুমি কি কর ?

সুরবালা নীরব। তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর। তাঁহার হৃদয় ভাবে পূর্ণ। অনেকক্ষণ পরে তিনি উত্তর দিলেন।

"কি যে করি তাহা কেমন করিয়া বলিব ? সেই দেবী, সেই প্রেমময়ী, সেই শক্তিময়ীকে আমার মন প্রতিদিন অবনত মস্তকে বার বার প্রণাম করিয়া থাকে। সেই দেবীকে যদি সম্মুখে দেখিতে পাই—আহা বিধাতঃ ! তুমি সকলই ঘটাইতে পার, এ অধীনার এ প্রার্থনা কি তুমি পূরণ করিতে পার না ?—সেই দেবীকে যদি সম্মুখে দেখিতে পাই, যাঁহাকে প্রতিদিন ধ্যান করি—কল্পনায় যাঁহার মূর্ত্তি গঠিত করিয়া প্রতিদিন পূজা করি—আমার সেই দিদিকে যদি সম্মুখে দেখিতে পাই, তাহা হইলে—অভীষ্ট দেবীকে সম্মুখে দেখিলে, ভক্ত যাহা করে, আমিও তাহাই করি। তাহা হইলে স্বর্ণসিংহাসন পাতিয়া তাঁহাকে আমার এই দেবতার পার্শ্বে বসাই, স্বহস্তে এই দেবযুগলের চরণ ধৌত করিয়া এই কেশরাশি দ্বারা তাহা মার্জ্জিত করি, এবং ভক্তি গদগদ হৃদয়ে দূরে দাঁড়াইয়া সেই দেবযুগলের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করি। কিন্তু সে সৌভাগ্য কি কখন আমার কপালে ঘটিবে ?"

রমাপতি মুগ্ধভাবে সুরবালার কথা শুনিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, "সত্যই কি সুরবালা মানবী ? অস্থি, মাংস, বসা, চর্ম্মধারী মানবশরীর কখনই এবম্বিধ মহোচ্চ মনোবৃত্তির আধার হইতে পারে না। এই দেবীর বদনের ভাব, কথার প্রণালী, বাক্যের শক্তি, আলোচনা করিয়া কে বলিবে যে এ সকল উক্তিতে বিন্দুমাত্র কপটতা আছে ? কে বলিবে এই সকল ভাব এই দেবীর অন্তরের অন্তর হইতে সমুদ্ভূত নহে ?" তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—

"তোমার যে এই দেবভাব, সুরবালা, মনুষ্যলোকে ইহার আর তুলনা নাই। মনুষ্য শরীর লইয়া তোমার এরূপ ভাব কেন হইল, বহু আলোচনাতেও তাহা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি না !"

সুরবালা বলিলেন,—

"হৃদয়দেব ! আমার এভাবে আমি বিস্ময়ের কারণ কিছুই দেখি না। দেবভাব কাহাকে বলে তাহা এ অধম নারী বুঝিতেও অক্ষম। আমার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই দিকে প্রধাবিত। যখন হইতে তুমি আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিফলে আমার চক্ষে পড়িয়াছ, যখন তোমার পত্নীবিয়োগে বিজাতীয় কাতরতা আমি দেখিয়াছি, যখন তোমার সেই দারুণ দুর্বিপাক সময়ের কাহিনী সমস্ত তোমার মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তখনই তোমাকে দেবতা বলিয়া আমার ভক্তি জন্মিয়াছে। সেই ভক্তি, তোমার দয়া, সরলতা, কোমলতা, বিদ্যা ও রূপ দেখিয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া এমন ভাবে উপনীত হইয়াছে যে, আমার হৃদয়ে তাহার আর স্থান হয় না। তখন হইতে কিসে তোমাকে সুখী করিতে পারিব, কিসে তোমার কাতর হৃদয়কে প্রফুল্ল করিতে পারিব, কিসে তোমার হৃদয়কে আনন্দময় করিতে পারিব, ইহাই আমার জীবনের চেষ্টা, লক্ষ্য, বাসনা এবং প্রতিজ্ঞা হইয়াছে। অন্য সাধ আমার জীবনে নাই। তোমার সুখ ভিন্ন, তোমার আনন্দ ভিন্ন, আমার প্রাণের আর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই।

তুমি দেবতা; আমি দেবসেবায় আমার দেহ, মন, প্রাণ সমর্পণ করিয়া আছি। আমার আর স্বতন্ত্রতা নাই। সার্থক আমার জীবন, সার্থক আমার জন্ম। আমার দেবতা আমার পূজায় পরিতুষ্ট হইয়াছেন। আমার প্রাণের প্রাণের বিরস বদনে এখন হাস্যের জ্যোতিঃ দেখা যায়, আনন্দ তথায় এখন খেলা করে এবং সুখ তথায় এখন বিচরণ করে।”

তখন সুরবালা সেই নিশানাথবিরাজিত হৈমকরোজ্জ্বল গগনতলে অশ্রুময় নয়নে সেই স্থানে উপবেশন করিয়া, উভয় বাহুতে রমাপতির পদদ্বয় ধারণ করিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—

“আমার ভক্তি ও মুক্তি, সুখ ও স্বর্গ, আশা ও সম্পদ সকলই তুমি। আমি তোমারই দয়ায়, তোমারই চরণ-প্রসাদে ধন্য হইয়াছি। আমার দ্বারা—তোমার এই সামান্যা দাসীর সামান্য সেবায়, তোমার প্রাণে আবার আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। এ অধমা দাসীর পক্ষে ইহার অপেক্ষা আর কিছু প্রার্থনীয় আছে কি? তাই বলিতেছি, তোমারই চরণাশীর্বাদে তোমার এ দাসী ধন্যা হইয়াছে।”

তখন রমাপতি সেই স্থানে সুরবালার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার লোচন দিয়া তখন অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিতেছে। কোথায় এমন লোক আছে যে, এমন অপার্থিব প্রেমের অধিকারী? এমন প্রেম স্বর্গেও আছে কি? এ সংসারে রমাপতি তুমিই ভাগ্যবান্! সুরবালা আবার বলিতে লাগিলেন,—

“আমার যাহা ব্রত তাহার শেষ নাই—সীমা নাই। তোমাকে সুখী করাই আমার যোগ ও সাধনা। কিন্তু সুখের তো সীমা নাই। তোমাকে সুখী করিতেছি বটে, কিন্তু সুখের সর্ব্বোচ্চ সোপানে না উঠিতে পারিলে তোমার এ সেবিকার পরিতৃপ্তি নাই। যদি কখন দিদির সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে তোমাকে আরও সুখী করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা তো হইবার নহে। যদি নিজ প্রাণের বিনিময়েও সেই ভাগ্যবতীর সাক্ষাৎলাভ ঘটিত, তাহা হইলে তোমার দাসী এখনই তাহা সম্পন্ন করিত।”

তখন রমাপতি বলিলেন,—

“সুরবালা, তোমার কামনা অতুলনীয়। জগতে এমন প্রেমের তুলনা নাই। তোমারই কৃপায়, যে অভাগা ছিল সে এখন পরম ভাগ্যবান্। একদা এ হৃদয় সুকুমারীময় ছিল সন্দেহ নাই; এখনও হৃদয় যে সুকুমারীর স্মৃতি বিসর্জ্জন দিয়াছে, এমন নহে এবং কখন স্মৃতি হইতে যে মূর্ত্তি বিলুপ্ত হইবে, এমনও বোধ হয় না। কিন্তু সুরবালা, এখন তুমিই আমার জীবন ও মরণ, আশা ও নিরাশা, সম্পদ ও বিপদ সকলই। এ জীবন তোমারই চেষ্টায়, তোমারই কৃপায়, তোমারই জন্য রক্ষিত। সুরবালা! যদি তুমি আমার এ শুষ্কহৃদয়ে অজস্র ধারে শান্তিসুধা না সেচন করিতে, যদি তুমি এ দগ্ধ তরুতে প্রেমের কুসুম না ফুটাইতে, যদি তুমি এ অন্তরপ্রান্তরে আনন্দের নদী না বহাইতে, তাহা হইলে এতদিন আমার কি দুর্গতি হইত? যে দেবী আমার ন্যায় হীনজনের প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহাকে সুখসাগরে ভাসাইয়াছেন, তিনিই তাহাতে সকল প্রবৃত্তি সজীব রাখিয়াছেন। সুকুমারী মৃত্যু-কবলিত হইলেও আমার হৃদয়ে তিনি যে এখনও বাঁচিয়া আছেন, সে কেবল তোমারই যত্নে এবং তোমারই বাসনায়। আমি এখন যে প্রেমের অধিকারী, আমার সৌভাগ্যক্রমে যে আনন্দসাগরে আমি এখন ভাসিতেছি, মানবজন্ম লাভ করিয়া কেহ কখন কোথায়ও তাহা পায়

নাই। এমন প্রেমে যে মত্ত, এমন সুখে যে ভাসমান, আর কোন স্মৃতিই তাহার থাকা সম্ভব নহে। তথাপি তাহা তোমারই চেষ্টায় এখনও আমার হৃদয় ত্যাগ করে নাই। কিন্তু সুরবালা, তুমি ভিন্ন এখন আমার গতি নাই। আমার হৃদয়ে যে সুকুমারী মূর্ত্তি আছেন তাহা তোমার দ্বারাই অণুপ্রাণিত,তোমার তেজে তাহা তেজোময়, তোমার প্রেমে তাহা প্রেমময়। এখন আমার সুকুমারী স্বতন্ত্র সুকুমারী নহে। এখন আমার সুরবালা ও সুকুমারী অভিন্ন ও এক। এখন সুরবালা যদি সুকুমারী না হয়, তাহা লইয়া আমার একদিনও চলিবে না এবং যদি আমার সুকুমারী সুরবালাময়ী না হয়, তাহা হইলে তাহা লইয়াও আমি একদিনও থাকিব না। অতএব দেবি, তোমার কৃপায় আমি আমার হারাধন সুকুমারীকে অনেক দিন পাইয়াছি। যাহার স্বতন্ত্রতা নাই, তাহা স্বতন্ত্র-রূপে পাইবার বাসনা কখন এ ভাগ্যবান মানবের মনেও হয় না।”

সেদিন আর যে সকল কথা হইল তাহা লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। এই স্বর্গীয় প্রেমের আদর্শ দম্পতী বহুক্ষণ প্রাণে প্রাণে মিশাইয়া সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন।

—*—

দশম পরিচ্ছেদ।

অদ্য কালীর ফাঁসি। পূর্ব্ব দিবসেই আলিপুর জেলখানার প্রাঙ্গণে এই ভয়ানক ব্যাপার সংসাধনোপযোগী সমুদয় আয়োজন হইয়াছে। সেই জীবনান্তক, প্রকাণ্ড-রূপে মানব প্রাণবিনাশক ভয়ানক যন্ত্র, সদর্পে আপনার নিকট বাহু উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সর্ব্বলোক সমক্ষে মনুষ্যঘাতক, অধম জীবিকাবলম্বিত, হৃদয়হীন জল্লাদ বুক ফুলাইয়া বেড়াইতেছে। স্বয়ং জজ ও মাজিষ্ট্রেট বাহাদুরেরা সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত। আর উপস্থিত পুলিসের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইনস্পেক্টর, সব ইনস্পেক্টর, কয়েকজন হেড কনষ্টবল এবং অনেক কনষ্টবল। লোকের জীবনরক্ষার জন্য চিকিৎসকের প্রয়োজন; কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দণ্ডিত ব্যক্তির জীবনান্ত সংঘটিত হইয়াছে কি না, তাহারই সমর্থন করিবার নিমিত্ত,স্বয়ং ডাক্তার সাহেব উপস্থিত। সুতরাং ফাঁসির ঘটা খুব।

চারিদিকে অনেক লোক। লোকে প্রায় তাবৎ প্রাঙ্গণ ছাইয়া গিয়াছে। অনেক লোক এই ঘটনাস্থলে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে না পাইয়া, বাহিরে গাছের উপর ও অট্টালিকার চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের আগ্রহই বা কত। যেন আজি এখানে কি উৎসবই হইবে এবং তাহা দেখিতে না পাইলে, তাহাদের জীবন ও জন্মই বিফলে যাইবে। ধন্য মানবের অদম্য কৌতূহল! যে ব্যাপার স্মরণে শরীর শিহরে, যে লোমহর্ষণকাণ্ড মনে করিলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, এবং যাহার ।করিলে প্রাণ ব্যাকুল হয়, সেই বিকটদৃশ্য দেখিবার জন্য, এত লোকসমারোহ হইয়াছে; একজন মানব—সজীব সচল এবং সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত মানব, রাজকীয় শক্তির বিরোধে প্রতিকূল চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল হইবে জানিয়া, যৎপরোনাস্তি অনিচ্ছা স্বত্বেও অবনত মস্তকে, ইহলোক হইতে প্রস্থান করিবে; এই অচিন্তনীয় দৃশ্য দেখিবার জন্য তথায় লোকে লোকারণ্য। এরূপ বিসদৃশ

দৃশ্য দর্শনে হৃদয়ের কোমলতা বিধ্বংসিত এবং পরুষতা সংবর্দ্ধিত হয়, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। তবে জগতের কিছুই নিরবচ্ছিন্ন অকল্যাণকর নহে। নিপাতকারী হলাহলেরও রোগাপনোদনের শক্তি আছে। তাদৃশ চক্ষে এ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে অনুমিত হইতে পারে যে, এতাদৃশ ব্যাপার সম্বন্ধে কৌতূহল নিবারণ করিলে, দর্শকের হৃদয়ে উপস্থিত দৃশ্য নিতান্ত বদ্ধমূল হইয়া স্থায়ী অঙ্কপাত করে এবং তাহাতে সমাজের প্রকৃত হিত সংসাধিত হয়। কিন্তু যাহারা, এই জন্য প্রস্তুত হইয়া, যাতায়াত ক্লেশ স্বীকার করিয়া, হয় ত কিঞ্চিৎ অর্থব্যয়, সময়নাশ ও কার্য্যক্ষতি করিয়া, এই কাণ্ড দেখিতে যায়, তাহাদের কেহই, ইহার ফলস্বরূপে পরিণামে সমাজের হিত সাধিত হইবে, বা হৃদয়ে স্থায়ী অঙ্কপাত হওয়া আবশ্যক ভাবিয়া কখনই যায় না। সুতরাং নিতান্ত জঘন্য কৌতূহল-নিবৃত্তি ভিন্ন ইহার অন্য কোন কারণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। মনুষ্য যে পশুরই রূপান্তর এবং মানব-হৃদয় যে এখনও পাশব প্রবৃত্তির নিতান্ত বশীভূত, এইরূপ নিষ্ঠুরতায় উৎসাহ তাহার এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

আর অল্পকাল পরেই কালীকে ঐ সম্মুখস্থ মরণযন্ত্রে লম্বিত হইয়া, জীবন ত্যাগ করিতে হইবে। রোগ বা কোন নৈসর্গিক নিয়মানুসারে তাহার দেহ ও আত্মার চিরবিচ্ছেদ ঘটিবে না। মানব আত্মকৃত ব্যবস্থাবলে, প্রকাশ্য রূপে বলপূর্ব্বক তাহাকে হত্যা করিবে। যে অত্যুৎকট অচিন্তনীয় পাপে তাহার হস্ত কলঙ্কিত হইয়াছে, যে নৃশংস কার্য্য সমাধা করিয়া সে সমাজের বিরুদ্ধে ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছে, মানব-সমাজ, তাহার শাস্তিস্বরূপে, এই দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, সমাজ সংস্থিতির জন্য পাপীর শাস্তি-বিধান নিতান্তই আবশ্যক। সংসারের পাপ-স্রোত মন্দীভূত করিবার জন্য, পাপাসক্তের বিহিত দণ্ড সতত ও সর্ব্বত্র প্রয়োজনীয়। কালীর পাপানুরূপ শাস্তি প্রয়োগের অভিপ্রায়েই আজি তাহাকে বিগতজীব করিবার আয়োজন করা হইয়াছে। মানবকৃত বিধিব্যবস্থায় ইহাই তাদৃশ মহাপাপীর চূড়ান্ত শাস্তি বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া আছে।

কেহ কেহ এস্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এইরূপে প্রাণনাশ করিলেই কি এতাদৃশ ঘোর পাপীর পাপোচিত শাস্তি হইয়া থাকে? তাঁহারা বলেন, ভোগের পরিমাণানুসারে শাস্তির গুরুতা ও লঘুতা স্থিরীকৃত হওয়া উচিত। কালীর ন্যায় পাপীয়সীর বহুকাল ধরিয়া শাস্তি ভোগ করা আবশ্যক এবং সে শাস্তির জ্বালা তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে ও হাড়ে হাড়ে মিশিয়া যাওয়া বিধেয়। যতদিন সে বাঁচিবে ততদিন কদাচ যাহাতে এ শাস্তির কথা, এ যন্ত্রণার স্মৃতি, সে একবারও ভুলিতে না পারে, এমন কোন সাজা, তাহার ন্যায় পাতকীর জন্য নির্দ্ধারিত ও অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। অধুনা তাহার নিমিত্ত যে শাস্তির ব্যবস্থা হইতেছে, বলিতে গেলে তাহা কেবল দুই মিনিটের শাস্তি। কয়েক দিন— সত্যই কয়েকটা দিনমাত্র, দণ্ডিত ব্যক্তি একটা দুরন্ত বিভীষিকায় উৎপীড়িত হয় বটে; কিন্তু তাহার পর দুই মিনিটে—কেবল ক্ষুদ্র দুই মিনিটের মধ্যে তাহার সকল বিভীষিকা ও শাস্তির অবসান হইয়া যায়। এত বড় অপরাধী, কেবল দুই মিনিটের শাস্তি ভোগের পর, সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করে এবং তখন সে মানব সমাজের তিরস্কার ও পুরস্কার, আনন্দ ও বিষাদ, সম্পদ ও বিপদ, সুখ ও দুঃখ, জ্বালা ও শান্তি, হাস্য ও রোদন সকল ব্যাপারেরই হাত ছাড়াইয়া যায়। এরূপ দুষ্কৃতির সহিত

তুলনা করিলে তস্কর, দস্যু, প্রবঞ্চক প্রভৃতির অপরাধ নিতান্তই লঘু বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহাদেরও বহুকাল ধরিয়া অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হয়; অথচ এমন ভয়ানক পাপী, কয়েক দিনের ভয় ও দুই মিনিটের যাতনা ভোগ করিয়া আমাদের হাত হইতে পার পাইয়া যায়, ইহা বস্তুতঃই নিতান্ত হাস্যজনক অব্যবস্থা।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কালী যে পাপ করিয়াছে তাহার জন্য তাহাকে দুই মিনিটের বেশী শাস্তি ভোগ করিতে হইল না সত্য, কিন্তু সে মানব-হৃদয়ে যে ভয়ের সঞ্চার করিয়া রাখিয়া গেল, লোকসমূহকে যে শিক্ষা দিয়া গেল, তাহার জন্য চিরদিনই সমাজের প্রভূত কল্যাণ হইবে। কথাটা অবশ্যই স্বীকার্য্য; কারণ মরণের অপেক্ষা মরণের ভয়টা বড়ই ভয়ানক। কালী মরিয়া নিজে যত যাতনা ভোগ করুক না করুক, তাহার এইরূপ মৃত্যু দেখিয়া লোকের মনে, এইরূপ কার্য্যের এই ফল বলিয়া যে এক ভয় ও সাবধানতা জন্মিবে, সমাজের পক্ষে তাহা বড়ই কল্যাণকর। কিন্তু তাহাতে কালীর কি? তোমার কল্যাণ বা অকল্যাণ কালী তো আর দেখিতে আসিবে না; তাহার এত বড় পাপে, তোমরা যে দুই মিনিটের শাস্তি দিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতেছ, তাহার যুক্তি কোথায়? কেন, তাহার অপরাধের অনুরূপ সাজা কি তোমরা দিতে জান না? একটা বেগুন চুরি করিলে তোমরা তাহার নাকে দড়ি দিয়া ঘানিতে ঘুরাইতে পার, আর এই-রূপ পতিহন্ত্রীকে দুই মিনিটের বেশী সাজা দিতে পার না? পরকালে কি হইবে, তাহা ভাবিয়া সাজার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে তোমার কোন অধিকার নাই; কারণ পরকালে কি হইবে তাহা জানিতে তোমার হাইকোর্টের জজদেরও কোন ক্ষমতা নাই। যাহা কেহ জানে না ও বুঝে না, তাহা হিসাবে ধরা যায় না। সুতরাং পরকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি, ফাঁসির পূর্ব্বে কয়-দিনের ভয়ই ইহকালে কালীর দণ্ডের প্রধান অংশ। কিন্তু এই কি সাজার চূড়ান্ত? ইহার চেয়ে কঠিন সাজা কি আর হইতে পারে না? অবশ্যই কঠিনতর সাজা উদ্ভাবিত হইতে না পারে এমন নহে। যেমন অপরাধ তাহার তেমনই দণ্ড হইলে, লোকশিক্ষারও ব্যাঘাত হইবে না এবং ন্যায়েরও সম্মান রক্ষিত হইবে।

কেহ কেহ ইহার অপেক্ষা আরও এক শক্ত কথা বলেন। তাঁহারা বলেন, যাহা তুমি দিতে পার না, তাহা লইবার তুমি কে বাপু? তোমার শত শত জজ, শত শত আদালত, শত শত পার্লেমেণ্ট এবং শত শত রাজারাণী মিলিয়া, শত শত বৎসর ভাবিলেও, একটা মানুষ তৈয়ার করিবার আইন করিতে পারেন কি? তাহা পারেন না। যাহা গড়িবার তোমাদের ক্ষমতা নাই তাহা ভাঙ্গিতে তোমরা এমন তৎপর কেন? এমন করিয়া আইনের দোহাই দিয়া, নিয়ত মানুষ খুন করিতে তোমাদের অধিকার কি?

কেহ কেহ আরও একটা গুরুতর কথা উত্থাপন করেন। তাঁহারা বলেন, যাহারা একবার পাপ করিয়াছে তাহারা কি আর কখন ভাল হইতে পারে না? একবার যাহার পদস্খলন হইয়াছে, আবার কি সে সাবধান হইয়া চলিতে পারে না? যদি তাহা সম্ভব হয়, তাহা হইলে, ভাবিয়া দেখ, এরূপ অন্যায় নরহত্যায় জগতের যে কত সর্ব্বনাশই ঘটিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। হয়ত সেই মহাপাপী,

বাঁচিয়া থাকিলে, হৃদয়ের এমন উন্নতি করিতে পারিত, হয়ত সে সংসারের জ্ঞান ও সৌভাগ্য বৃদ্ধির এমন সহায় হইত যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তুমি তাহার অপরাধানুরূপ ভাল শাস্তি দিতে পারিলে না, অথচ তাহার আত্মোন্নতি-সাধনের কোন সুযোগ করিতে দিলে না, তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে তাহাকে অবসর দিলে না এবং তাহার দ্বারা জগতের কোন হিত সঙ্ঘটিত হইতে পারিত, তাহাও হইতে দিলে না। ইহার নাম বিচার না বিচারের ব্যভিচার?

কিন্তু আমরা অপ্রাসঙ্গিক কথায় বহুস্থান ব্যয় করিয়াছি। ফাঁসি বিধেয় হউক না হউক, কালীর আজি ফাঁসি। সব প্রস্তুত, নির্দ্ধারিত সময়ও প্রায় উপস্থিত। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর একবার পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন; তাহার পর জেলখানার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন কারাগারের লৌহদ্বারের মধ্য হইতে বহু কনষ্টেবল এক অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোককে বেষ্টন করিয়া লইয়া আসিতেছে। সকলের দৃষ্টি সেই দিকে সঞ্চালিত হইল। চারিদিক হইতে, 'আসিতেছে, ঐ আসিতেছে,' শব্দ উঠিল। ক্রমে পশ্চাদ্দিকে হাত কড়ি দ্বারা নিবদ্ধহস্ত আসামী, কনষ্টেবল বেষ্টিত হইয়া, বধ্যভূমির নিকটস্থ হইল। অতি নির্ভীক পাদবিক্ষেপে, সেই লোক-সমুদ্র-মধ্যে, অবগুণ্ঠনবতী অগ্রসর হইতে লাগিল। সে যথাস্থানে উপস্থিত হইলে, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"আইন অনুসারে এখনই তোমার ফাঁসি হইবে তাহা তুমি জান। এখন তুমি কিছু বলিতে চাহ কি?"

কনষ্টেবলগণ চারিদিকের কোলাহল নিবারণের জন্য চুপ চুপ শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। সমাগত লোক সকল রুদ্ধনিশ্বাসে হত্যাকারিণী কালীর উত্তর শুনিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। তখন কালী অতি মধুর কোমল ও ভীতিশূন্য স্বরে উত্তর দিল,—

"আমার অঙ্গে করস্পর্শ না হয়—এইরূপ ভাবে একবার আমার মুখের কাপড় খুলিয়া দিতে আজ্ঞা করুন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসামীর বাসনানুযায়ী আদেশ করিলে, একজন কনষ্টেবল সাবধানতা সহকারে, তাহার মুখের কাপড় খুলিয়া দিল। কিন্তু একি! সাক্ষাৎ স্বর্গকন্যা! ম্যাজিষ্ট্রেট সেই কামিনীর মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিত হইলেন। রমণী সুন্দরীর শিরো[illegible]। সুন্দরী ধীরে ধীরে চারিদিকে মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার নিষ্পাপ বদন-শ্রী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও অপার্থিব সৌকুমার্য্য দেখিয়া দর্শকগণ অবাক্ হইল। সেই সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বলতায় সেই ঘৃণিত বধ্যভূমিও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সকলেই ঘোর বিস্ময়াকুল! তখন জজ সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাণে কাণে বলিলেন,—

"একি এ? আমি যে আসামীর উপর ফাঁসির হুকুম দিয়াছি, এ কখনই সে নহে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—

"তাইত, আমি যে আসামীকে দায়রা সোপরদ্দ করিয়াছি, এ কখনই সে নহে।"

পুলিস সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলিলেন,

"আমি যে আসামীকে দুই তিন দিন হাজতে দেখিয়াছি, এ কখনই সে নহে!"

ইনিস্পেক্টর বলিলেন,—

"আমি যে আসামীর জবানবন্দী লইয়া গ্রেপ্তার করিয়াছি এবং বার বার যাহাকে দেখিয়াছি, এ কখনই সে নহে!"

ম্যাজিষ্ট্রেট নিতান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন,—

"তাহা হইলে নিশ্চয়ই একটা বিষম ব্যাপার ঘটিয়াছে। এখন উপায়?"

জজ সাহেব বলিলেন,—

"আপাততঃ ফাঁসি বন্ধ রাখিয়া, তদারক করা আবশ্যক।"

তখন সুন্দরী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেন, "আমি এখন ফাঁসিকাঠে উঠিব কি?"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন,—

"না, তোমাকে ফাঁসিতে উঠিতে হইবে না। তুমি যে এ মোকদ্দমার আসামী কালী নহ তাহা স্থির। কালী কোথায় এবং তাহার কি হইয়াছে, তাহা তুমি অবশ্যই জান। তুমি কালীকে বাঁচাইবার জন্য যে পথ অবলম্বন করিয়াছ, তাহাতে আইনের চক্ষে, তোমার অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ ঘটিয়াছে। এখনই তোমার অপরাধের যথাবিহিত তদারক হইবে। তাহার পর তোমার বিচার হইয়া শাস্তি হইবে। আপাততঃ কনষ্টবলেরা, তুমি যেখানে ছিলে, সেই খানেই তোমাকে রাখিয়া আসুক।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এইরূপ আদেশ দিলে, কনষ্টবলগণ আবার সেই সুন্দরীকে সঙ্গে লইয়া জেলে ফিরিল, তাহার সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, পুলিস সাহেব এবং ইনিস্পেক্টর বাবুও চলিলেন।

ফাঁসি বন্ধ হইয়া গেল। যাহারা বড় সাধ করিয়া ফাঁসি দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা বড় দুঃখিত হইয়া বাড়ী ফিরিল। বাটী ফিরিবার সময় লোকে নানারূপ জল্পনা করিতে লাগিল। কেহ বলিল,—'কালী অনেক তন্ত্র মন্ত্র জানিত। সে মন্ত্রের জোরে চেহারা বদলাইয়া, ফাঁসি হইতে বাঁচিয়া গেল।' কেহ মহাবিজ্ঞের মত বলিল,—"আরে নাহে না তাকে ফাঁসি দেওয়া ইংরেজ কোম্পানির ক্ষমতা নয়। দেখিলে, এক নজরায় সকলের মুণ্ডু ঘুরাইয়া দিল।" আর একজন বলিল,— এ সকলই দেবতার কৃপা। দেবতা নহিলে এমন করিয়া বাঁচাইতে পারে কে? দেখিলে না মেয়েটার চেহারা? মানুষের কি কখন এমন চেহারা হয়? কেহ বলিল--'দাদা, ঐ যে পুলিস, ওদের পায়ে নমস্কার। এ সকলই জানিবে পুলিসের খেলা। পুলিস টাকা খাইয়া এই বিভ্রাট বাধাইয়াছে। তাহা না হইলে যেখানে মাছিটি পর্য্যন্তও যাইবার যো নাই, সেই জেলখানার ভিতরে এমন কাণ্ড ঘটায় কে?' মীমাংসা নানারূপ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

---*---

সে দিন কালীর ফাঁসি হইবার কথা, তাহার চারিদিন পূর্ব্ব হইতে, একটা গুরুতর বৈষয়িক মোকদ্দমা উপলক্ষে রমাপতি বাবু কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন। চৌরঙ্গিতে তাঁহাদের এক প্রকাণ্ড বাড়ী আছে; তিনি বহু লোকজন সঙ্গে লইয়া সেই বাটীতে বাস করিতেছেন। আলিপুর ও কলিকাতার উচ্চপদস্থ বিস্তর সাহেব ও বড় লোকের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। বিশেষতঃ আলিপুরের তখনকার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত তাঁহার সম্প্রীতি ছিল। কালীর ফাঁসি হইবার দিন, সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রমাপতি বাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রমাপতি তাঁহাকে বিশিষ্ট সমাদর-

সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া স্বাস্থ্যাদি বিষয়ক শিষ্টাচার সূচক জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, সমুচিত শিষ্টাচার প্রকাশ করিয়া যে উদ্দেশে তিনি আসিয়াছেন তাহা ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন—

"আপনার দেশের কালীর ফাঁসি উপলক্ষে যে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়াছে তাহা বোধ হয় আপনি শুনিয়াছেন।"

রমাপতি বাবু সে সকল ব্যাপারের কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না। তিনি সাহেবকে সেইরূপ বলিলে, সাহেব সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিলেন। সমস্ত কথা শুনিয়া, রমাপতি বাবু নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং সেই স্ত্রীলোককে দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত কৌতূহল প্রকাশ করিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—

"আমি তাহাই আপনাকে বলিতে আসিয়াছি; এই অল্প সময়ের মধ্যে যতদূর সম্ভব, তদারকের কোন ত্রুটি করা হয় নাই। আমি স্বয়ং এবং পুলিস নিয়ত ইহার তদন্তে নিযুক্ত রহিয়াছি, কিন্তু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমার বোধ হয়, আপনার দেশের কোন লোক ইহাতে লিপ্ত আছে; এজন্য আপনি একবার দেখিলে হয় ত সহজেই সকল কথা বাহির হইয়া পড়িবে; নিতান্ত পক্ষে তদন্তের সুবিধা জনক অনেক কথা ব্যক্ত হইবে বলিয়া আমার ভরসা আছে।"

রমাপতি বলিলেন,—

"বেশ কথা। একবার কেন, আবশ্যক হইলে, আমি বহুবার তথায় যাইতে প্রস্তুত আছি। আমি জেলখানায় যাইলে যাহাতে সেই স্ত্রীলোকের কামরায় যাইতে পারি এবং তাহার সহিত আবশ্যক মত কথাবার্তা কহিতে পারি, আপনি দয়া করিয়া জেলর সাহেবকে তাহার বিহিত উপদেশ দিবেন। আমি কল্য প্রাতেই সেখানে যাইব।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—

"আপনি এ জেলার একজন অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট, এবং সর্ব্ববিধ রাজকীয় অনুষ্ঠানের ও সাধারণ-হিতকর কার্য্যের প্রধান উদ্যোগী, সুতরাং আবশ্যক ও ইচ্ছা হইলে, জেল পরিদর্শন করিতে আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তথাপি এ সম্বন্ধে অদ্য রাত্রেই জেলরকে এক বিশেষ পত্র দ্বারা আমি উপদেশ প্রদান করিব। তা ছাড়া আপনি আমার এই কার্ডখানি রাখিয়া দিউন। ইহার পৃষ্ঠে আমি স্বতন্ত্ররূপ আদেশ লিখিয়া দিতেছি। ইহা আপনার নিকটেই থাকিবে। আবশ্যক হইলে, এই কার্ড হাতে দিয়া, আপনি অপর কোন ব্যক্তিকেও সেখানে পাঠাইতে পারিবেন।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পেন্‌সিল দ্বারা কার্ড পৃষ্ঠে স্বীয় আদেশ লিখিয়া তাহা রমাপতি বাবুর হস্তে প্রদান করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—

"আপনার অনুসন্ধানের ফল জানিবার নিমিত্ত আমি উৎসুক থাকিব। হয়ত কালি প্রাতে আমিও জেলখানায় যাইতে পারি।"

রমাপতি বাবু বলিলেন,—

"আপনার যাওয়া হয় ত ভালই; না হইলে আমি জেলখানা হইতে ফিরিবার সময় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিব।"

তাহার পর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, বিহিত বিধানে বিদায় গ্রহণ করিয়া, প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রাতে বেলা আটটার সময় রমাপতির অশ্বদ্বয়-বাহিত-ব্রুহাম আসিয়া জেলখানার দ্বারে উপস্থিত হইল। তিনি গাড়ি হইতে নামিবার পূর্ব্বেই জেলর সাহেব, ছুটিয়া আসিয়া, তাঁহার সমীপস্থ হইলেন এবং বিশেষ

সম্মান সহকারে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। রমাপতি বাবু পকেট হইতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব-প্রদত্ত কার্ডখানি বাহির করিয়া, জেলরের হস্তে দিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিয়া উঠিলেন,—

"থাকিতে দিন—উহা আপনার নিকটেই থাকিতে দিন। যদি মহাশয় অন্য কোন লোক পাঠান, তাহা হইলে তাহার হস্তে ঐ কার্ডখানি থাকা আবশ্যক হইবে। এ সম্বন্ধে কল্য রাত্রে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পত্র দ্বারা আমাকে তাহার আদেশ জানাইয়াছেন। এক্ষণে আমি মহাশয়ের আজ্ঞার অধীন। আপনি একাকী, কি অপর লোক সঙ্গে লইয়া, আসামীর ঘরে যাইবেন আজ্ঞা করুন।

রমাপতি বাবু বলিলেন,—

"আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে, আমার অনেক কথা জিজ্ঞাস্য আছে। আপনি প্রথমে আমাকে বলুন, সে স্ত্রীলোক সারাদিন কি করে।"

জেলর বলিলেন,—

"তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। কারণ সে যেরূপ লজ্জাশীলা ও কোমল স্বভাবা তাহাতে তাহাকে কোন ভাল ঘরের মেয়ে বলিয়াই আমার বোধ হইয়াছে। এজন্য সারাদিন তাহার ঘরে উঁকি দিয়া দেখা আমার নিষেধ আছে। বোধ হয় সে সারাদিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।"

রমাপতি বলিলেন,—

"ভাল, দুই চারিদিনের মধ্যে জেলখানার নিকটে কোন নূতন লোক দেখা গিয়াছে কি?"

জেলর একটু চিন্তার পর বলিলেন,—

"আজি চারি পাঁচ দিন হইতে একজন সন্ন্যাসী জেলখানার বাহিরে বটগাছ তলায় বাসা করিয়া আছে দেখিতেছি। আর কোন বিশেষ লোক আমরা লক্ষ্য করি নাই।"

রমাপতি আবার জিজ্ঞাসিলেন,—

"সন্ন্যাসী এ কয়দিন এখানে বাসা করিয়া আছে, আপনি তাহার সহিত কোন দিন কোন কথা কহিয়াছেন কি?"

জেলর বলিলেন,—

"না। আমি তাহার সহিত এ কয় দিন কোন কথা কহিবার আবশ্যকতা অনুভব করি নাই; অদ্যও কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। কারণ সে ব্যক্তির সহিত এ ব্যাপারের কোন সম্পর্ক থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

রমাপতি বলিলেন,—

"তাহাতো আমিও বুঝিতেছি; তথাপি আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে সন্ন্যাসী এতদিন কোথায় থাকিত, তাহা আপনি জানেন কি?"

জেলর বলিলেন,—

"আমি রামদীন নামে পাহারাওলার নিকটে তাহার অনেক সন্ধান লইয়াছি। শুনিয়াছি সে সন্ন্যাসী নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। সে কোন স্থানে স্থির হইয়া থাকে না। হয় তো সে আবার আজিই এখান হইতে চলিয়া যাইতে পারে।"

রমাপতি আবার জিজ্ঞাসিলেন,—

"তাহা যায় যাউক; কিন্তু এত দেশ থাকিতে, সে এই জেলখানার নিকটেই আড্ডা গাড়িয়া বসিল কেন, তাহার কোন সন্ধান আপনি বলিতে পারেন?"

তাহা ঠিক জানি না। বোধ হয় এ স্থানটা, অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন বলিয়া, সে এখানেই বাসা করিয়াছে।"

"সে সারাদিন কি করে জানেন কি?"

"সারাদিন তাহার কাছে বিস্তর লোক থাকে দেখি, শুনিয়াছি সে অনেক আশ্চর্য্য ঔষধ জানে; সে লোকদের দেয়।"

"তাহাই যদি তাহার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে লোকালয়ের আরও নিকটে তাহার থাকা উচিত ছিল। এরূপ এক প্রান্তে থাকিয়া ঔষধ বিতরণ বিশেষ সুবিধাজনক বোধ হয় না। সে যাহা হউক, আসামী কালী যখন জেলে ছিল, তখন কেহ কোন দিন তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল কি?"

"হাঁ, একদিন তাহার খুড়া একা, আর এক দিন সে তাহার এক কন্যাকে সঙ্গে লইয়া, কালীকে দেখিতে আসিয়াছিল।"

আবার রমাপতি বাবু জিজ্ঞাসিলেন,—

"সেই খুড়া ও তাহার কন্যা যখন কালীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল, তখন আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন কি?"

"আমি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলাম।"

"সেই কন্যা ঘোমটা দিয়া আসিয়াছিল, কি তাহার মুখ খোলা ছিল?"

"ঘোমটা দেওয়াই ছিল।"

"আপনি একবারও তাহার মুখ দেখিতে পান নাই?"

"না, বরাবরই তাহার মুখ ঢাকা ছিল।"

"তবে সে কি জন্য দেখা করিতে আসিয়াছিল? সে যদি একবারও মুখ না খুলিল তবে তাহার আসিবার কি দরকার ছিল? সে কথা যাউক, কালী কি সারাদিন মুখ ঢাকিয়া থাকিত, না মুখ খুলিয়া থাকিত?"

"প্রায়ই মুখ ঢাকিয়া থাকিত।"

"ফাঁসির কয়দিন পূর্ব্বে খুড়া ও তাহার কন্যা কালীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল?"

"আগের দিন।"

"ঠিক কথা!"

"তাহারা কখন আসিয়াছিল?"

"সন্ধ্যার একটু আগে।"

"ঠিক ঠিক!"

"কেন, আপনি ইহা হইতে কি মীমাংসা করিতেছেন?"

"কেন আপনি কি দেখিতেছেন না, আপনাদের চক্ষের উপরেই মানুষ বদল হইয়াছে! তাহা হউক। কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যে স্ত্রীলোক কালীর বদলে এখন জেলে আছে, সে যদিই কালীর আপনার খুড়তুতো ভগ্নী হয়, তাহা হইলেও একজনের জন্য, ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণ দিতে যাওয়া সোজা কথা নয়। অতএব হয় সে দেবতা, না হয় পাগল।"

জেলর বলিলেন—

"এরূপ ঘটনা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু আপনি যেরূপ ভাবে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন, আমরা সেরূপ সম্ভাবনা একবারও মনে করি নাই। হয় ত আপনিই কৃতকার্য্য হইবেন।"

রমাপতি বাবু বলিলেন,—

"আপনি বিশেষ সাবধান হইয়া জেলখানার বাহিরের গাছতলায় যে সন্ন্যাসী বাস করিয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই এ কাণ্ডের মধ্যে লিপ্ত আছে। সাবধান, সে যেন পলাইতে না পারে।"

"বলেন কি? সে নেংটা সন্ন্যাসীর সহিত এ কাণ্ডের কোনই সম্পর্ক থাকা সম্ভব বলিয়া আমার তো বোধহয় না।"

"কোন সম্পর্ক থাকা সম্ভব কি না, তাহা আপনি পরে বুঝিতে পারিবেন। আপাততঃ আমি স্বয়ং আসামীর ঘরের চাবি খুলিয়া একাকী তাহার মধ্যে প্রবেশ করিব। আর কেহ আমার সঙ্গে যাইবার বা থাকিবার দরকার নাই। আপনি আমাকে নিঃশব্দে দূর হইতে সেই ঘরটি দেখাইয়া দিলে বাধিত হইব।"

রমাপতি গাড়ি হইতে অবতরণ করি-

জেলরের সঙ্গে সঙ্গে জেলখানায় প্রবেশ করিলেন। সেই পাপীর নিকেতন, অধম ও পতিতগণের বাসভূমি এবং দণ্ডবিধির লীলাক্ষেত্রের মধ্যে, রমাপতি, কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, চলিতে লাগিলেন। নারীবিভাগে উপনীত হওয়ার পর, জেলর সাহেব, রমাপতি বাবুর হস্তে একটি চাবি দিয়া, দূর হইতে একটি প্রকোষ্ঠ দেখাইয়া দিলেন। রমাপতি, ধীরে ধীরে সেই প্রকোষ্ঠসমীপস্থ হইয়া, ধীরে ধীরে সেই চাবি খুলিলেন। ধীরে ধীরে সেই প্রকাণ্ড কবাট খুলিয়া গেল। তখন রমাপতি দেখিলেন—অপূর্ব্ব দর্শন!

দেখিলেন, সেই দ্বারের দিকে সম্মুখ করিয়া, আগুল্‌ফলম্বিত-জটা-ভার-সমন্বিতা, বিভূতি-বিলেপিত কায়া, আয়ত-প্রদীপ্ত-লোচন-শালিনী, শান্তি-সৌন্দর্য্য-সৌকুমার্য্য-জ্যোতির্ম্ময়ী, ত্রিশূলধারিণী এক ভুবনমোহিনী ভৈরবী। কোথায় কালী? কোথায় ম্যাজিষ্ট্রেটবর্ণিত সেই সুন্দরী? রমাপতিকে সম্মুখে দেখিবামাত্র ভৈরবী চমকিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার বদন হইতে একটি অপরিস্ফুট মৃদুধ্বনি বাহির হইয়া পড়িল।

সেই সুকুমার-কায়া সুন্দরী সন্ন্যাসিনী সন্দর্শনে রমাপতিও নিতান্ত বিচলিত-চিত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু কি করিতে সেখানে আসিয়াছেন, তাহা তিনি ভুলিয়া গেলেন। কে এ নবীনা সন্ন্যাসিনী? রমাপতির মনে হইতে লাগিল হয় তো, কোথায় যেন তিনি এই ভৈরবীকে দেখিয়াছেন। যেন এই জটাজুটধারিণী সন্ন্যাসিনীর সহিত তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই আলাপ ছিল। যেন এই বিভূতিসমাবৃতবদনা সন্ন্যাসিনীর মুখ-মণ্ডল তাঁহার চিরপরিচিত। কিন্তু কে এ নবীনা সন্ন্যাসিনী? এরূপ ভৈরবীর সহিত পূর্ব্বপরিচয় নিতান্ত অসম্ভব বোধে রমাপতি, ধীরে ধীরে আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধিকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিয়া অতি সঙ্কোচ সহকারে জিজ্ঞাসিলেন,—

"আপনি—আপনি—কালীকে জানেন কি?"

সংক্ষুদ্ধস্বরে সন্ন্যাসিনী উত্তর দিলেন,—

"তাঁহার নাম শুনিয়াছি, কিন্তু আলাপ নাই।"

কিন্তু তাঁহার উত্তরের মর্ম্ম তখন কে প্রণিধান করিবে? তাঁহার সেই কণ্ঠস্বর রমাপতিকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিল। এ কি কণ্ঠস্বর! এইরূপ স্বর—প্রায় এইরূপ কোমল বীণা-ধ্বনিবৎ মধুর স্বর, রমাপতির প্রাণের নিভৃত কোণে এখনও থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া থাকে। তবে এ সন্ন্যাসিনী? আবার রমাপতি নিজের উপর প্রভুতা হারাইয়া, কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন। আবার কিয়ৎকাল পরে সযত্নে চিত্তকে কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া, তিনি আবার জিজ্ঞাসিলেন,—

"আপনি কি আমাকে কখন দেখিয়াছেন?"

যুবতী কথার কোন উত্তর দিলেন না। তিনি অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রমাপতির ব্যাকুল চিত্ত নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিল। তখন তিনি উন্মত্তবৎ নিতান্ত অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কিন্তু বল তুমি, ভৈরবীই হও আর যেই হও, বল, বল, তুমি আমার কে?"

রমাপতি প্রশ্নের কোন উত্তর পাইলেন না, কিন্তু তিনি দেখিলেন, লোচন প্রবাহিত জলে সেই সন্ন্যাসিনীর সুগোল গৌর গণ্ডের বিভূতি বিধৌত হইতেছে। তখন তাঁহার প্রাণ মাতিয়া উঠিল। তখন নিতান্ত উন্মাদের ন্যায় উভয় বাহু প্রসারণ করিয়া, 'সুকুমারী, সুকুমারী'

শব্দে চীৎকার করিতে করিতে, তিনি সেই সন্ন্যাসিনীকে আলিঙ্গন করিবার অভিপ্রায়ে, প্রধাবিত হইলেন। তখন সেই নবীনা কয়েক পদ পশ্চাতে সরিয়া আসিয়া, সহসা ছিন্নমূল তরুর ন্যায়, ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন এবং উভয় হস্তে রমাপতির চরণদ্বয় স্পর্শ করিয়া, রোদন বিজড়িত স্বরে বলিতে লাগিলেন,—

"আপনি আমার দেবতা, আপনি আমার শ্রেষ্ঠ গুরু। আমি আপনার দাসীর দাসী! কিন্তু প্রেমাবতার প্রভো! আমার এ দেহে এখন আর আমার বা আপনার কোনই অধিকার নাই। অতএব আমাকে আর স্পর্শ করিবেন না।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বেলা সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর কালে, রমাপতি বাবুর ব্রুহাম সবেগে আসিয়া তাঁহার চৌরঙ্গিস্থ ভবনের গাড়ি-বারান্দায় উপনীত হইতে না হইতে, তিনি বালকের ন্যায় অস্থির ভাবে শকট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং দৌড়িতে দৌড়িতে পুরোমধ্য সুরবালার সমীপস্থ হইয়া, ব্যস্ততা সহ বলিলেন,—

"সুরবালা, সুরবালা! যাহা হইবার নহে তাহাও হইয়াছে। এত দিনে সুকুমারীর সাক্ষাৎ পাইয়াছি। এবার স্বপ্ন বলিতে পারিবে না; ঘুমের ঘোর বলিতে পারিবে না। সুকুমারী এবার সশরীরে দেখা দিয়াছেন।"

সুরবালা সবিস্ময়ে বলিলেন,—

"এবার বুঝি তুমি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছ; নয় তো তোমার মাথার ঠিক নাই।"

রমাপতি বলিলেন,—

"না না সুরবালা, আমি দিব্যজ্ঞানে, সম্পূর্ণরূপ জাগ্রত থাকিয়া, তোমার সহিত কথা কহিতেছি। অসম্ভব হইলেও, আমার কথা মিথ্যা নহে। আমি এখনই সুকুমারীকে দেখিয়া, তাঁহার সহিত কথা কহিয়া আসিতেছি।"

এই বলিয়া রমাপতি বাবু, কালীর ফাঁসির উপলক্ষে এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্তই সুরবালাকে জানাইলেন। তাহার পর পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন,—

"এই দেখ সুরবালা, আমার হাতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পরোয়ানা। আমি সুকুমারীকে কয়েদ হইতে খালাস করিবার জন্য,জামিননামায় নাম সহি করিয়াছি। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই পরোয়ানা দিয়াছেন; ইহা দেখাইলেই জেলের সাহেব সুকুমারীকে ছাড়িয়া দিবেন। আমি, এই পরোয়ানা লইয়া, জেলখানা হইতে সুকুমারীকে আনিতে যাইতেছি। তুমি আর এক ঘণ্টা অপেক্ষা কর; এখনই সুকুমারীকে তোমার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিব।"

"বল কি? এবার যেন তোমার কথা অনেকটা সত্য বলিয়াই বোধ হইতেছে। এরূপ সম্ভাবনার অতীত শুভ দৃষ্ট যখন ঘটিয়াছে তখন দয়াময়! তোমার এই দাসী তোমার চরণে একটি ভিক্ষা না চাহিয়া থাকিতে পারিতেছে না; তুমি তাহাকে তাহা দিবে না কি? এমন শুভদিনে যাচকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করিলে, কর্ম্মের গৌরব হইবে কিসে?"

তখন রমাপতি সাদরে সুরবালার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—

"পাগলিনি! তোমাকে দেওয়া হয় নাই, এমন বস্তু আমার আর কি আছে? এখন বল, কি তোমার হুকুম।"

সুরবালা বলিলেন,—

"রাগ করিও না—দিদিকে আনিবার জন্য আমি নিজ জেলখানায় যাইব। সেই অতি কদর্য্য স্থানে আমাকে যাইতে হইলে, কাজেই বহুলোকের সমক্ষে পড়িতে হইবে। কিন্তু যাহাই কেন হউক না, আমি সেই জেলখানায় না গিয়া ছাড়িব না। যখন সেই পুণ্যবতীর পদরজ সেইখানে পতিত হইয়াছে, তখন সে স্থানের আর অপবিত্রতা নাই। আর লোকের চক্ষে পড়িলে যদি কোন ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি লোকেরই হইবে, আমার তাহাতে কি? তবে কেন আমাকে যাইতে দিবে না?"

রমাপতি বলিলেন,—

"কে বলিয়াছে, তোমায় যাইতে দিব না? কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি যখন আর এক ঘণ্টার মধ্যেই ঘরে বসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, তখন নানা অসুবিধার মধ্যে, সেখানে তোমার নিজে যাওয়ার প্রয়োজন কি?"

সুরবালা বলিলেন,—

"প্রয়োজন যে কি, তাহা কেবল আমার প্রাণ জানে, আমি তাহা বলিয়া বুঝাইতে অক্ষম। রাজভক্তি কি তাহা জান তো? রাজার সহিত প্রজার কোন জ্ঞাতিত্ব, কুটুম্বিতা থাকে কি? তাহা থাকে না। তথাপি সেই প্রজারা, আবশ্যক হইলে, রাজার জন্য অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত দেয় কেন? কেবল ভক্তিই তাহার কারণ। যে দেবী এখন কারাগারে, তিনি আমার কে? লোকে বলিবে তিনি আমার কোন আপনার লোক হওয়া দূরে থাকুক, বরং আমার [illegible]ন্তু এ সকল লোকের কথা, আমার প্রাণ আমাকে মন্ত্ররূপ উপদেশ দিয়াছে। আমার প্রাণ জানে ও বুঝে তিনি আমার রাজার রাজা। যিনি আমার রাজা, এ দাসীর জীবন মরণ যাহার ইচ্ছার অধীন, যাঁহার চরণে এ প্রাণ দিবারাত্রি লুটিয়া বেড়ায়, তাঁহার হৃদয়-রাজ্যে যাঁহার রাজত্ব, আমার সেই রাজার রাজা, সুদীর্ঘ বনবাসের পর, আবার তাঁহার রাজ্যে ফিরিয়া আসিবেন। তবে বল দেবতা, এমন শুভদিনে আমি রাজরাজেশ্বরীকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া না আনিয়া থাকিতে পারি কি? অতএব আমি আজি এ বিষয়ে কোন আপত্তি শুনিব না। তুমি কোচম্যানকে আর একখানি গাড়ী জুতিতে বল, আমি আবশ্যকমত লোক-জন সঙ্গে লইয়া শীঘ্রই বাহিরে যাইতেছি। দেখিও এক তিলও বিলম্ব হয় না যেন।"

সুরবালা, আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করিলেন। তখন রমাপতি সেইস্থানে দাঁড়াইয়া, বহুদিন যাহা বার বার ভাবিয়াছিলেন, আজি আর একবার তাহাই ভাবিলেন।—'সুরবালা দেবী, না মানবী?'

সুরবালার বাসনানুযায়ী আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত হইলে তিনি, মাধুরী ও খোকা বাবুকে সঙ্গে লইয়া, রমাপতি বাবুর সহিত, ব্রুহামে উঠিলেন। দুইজন ঝি ও কয়েকজন দ্বারবান্ স্বতন্ত্র গাড়িতে উঠিল। তখন রমাপতি বলিলেন,—

"মাধুরী ও খোকাকে রাখিয়া গেলে হইত না?"

সুরবালা বলিলেন,—

"কাহার জিনিষ আমি রাখিয়া যাইব? উহারা তাঁহারই। যদি তাঁহাকে ঘরে আনিতে পারা যায় তোমার আমার যত্নে তাহা হইবে না। ভগবানের কৃপায় যদি আমার মনের সাধ

পূর্ণ হয়, সে জানিবে মাধু ও খোকার দ্বারাই হইবে।"

সুরবালা আজি নিরলঙ্কৃতা। তাঁহার পরিধান একখানি সামান্য বস্ত্র এবং অঙ্গ ভূষণ-বর্জ্জিত। কেবল বাম হস্তে, সধবা নারীর সকল ভূষণের সার ভূষণ, এক 'নোয়া, শোভা পাইতেছে। রমাপতির হৃদয়ে আজি দুর্ব্বিষহ ঝড় বহিতেছে; যাহা কখন মানব অদৃষ্টে ঘটে নাই, তাহাই তাঁহার আজি ঘটিতেছে; তাহার ভাগ্যগুণে মরা মানুষ আজি আবার দেখা দিয়াছে, তাই রমাপতি আজি উন্মাদ। তাই তিনি এতক্ষণ সুরবালার বেশভূষার প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। এক্ষণে সহসা সেই মণি-মাণিক্যালঙ্কার-বিভূষিত-কায়ার এই বেশ দেখিলেন;—

"একি সুরবালা, তোমার আজি এ ভিখারিণীর ন্যায় সাজ কেন?"

সুরবালা বলিলেন,—

"আমি যাঁহার দাসী, তিনি আজি ভিখারিণী। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার না পরাইলে, তাঁহার দাসীর দেহে অলঙ্কার সাজিবে কেন?

"সুকুমার! আমি হীন ও অধম বলিয়া যদি আমার প্রতি তোমার কৃপা না হয়, কিন্তু এই সুরবালার মায়া তুমি কেমন করিয়া কাটাইবে?"

গাড়ী ত্বরিত চলিয়া জেলখানার দ্বারে উপনীত হইলে, রমাপতি বাবু তাহা হইতে সত্বর নামিয়া পড়িলেন। জেলর সাহেব তৎক্ষণাৎ সমীপাগত হইলে, রমাপতি বাবু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব-প্রদত্ত পরোয়ানা তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলেন,—

"পাঠ করুন।"

জেলর সাহেব আ পাঠ করিয়া বলিলেন,—

"এজন্য আপনার এত কষ্ট করিয়া না আসিলেও চলিত। এই পরোয়ানা পাঠাইয়া দিলেই, আমি স্বয়ং অথবা উপযুক্ত লোক সঙ্গে দিয়া, আসামীকে আজ্ঞামত স্থানে পাঠাইয়া দিতাম।"

"তাহা আমি জানি; তথাপি যে কেন আসিয়াছি তাহা আপনি ক্রমশঃ জানিতে পারিবেন। আমি একা আসি নাই। এই গাড়ীতে আমার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাও আছেন। তাঁহারা সকলেই আসামীকে জেলখানা লইতে মুক্ত করিয়া সঙ্গে লইয়া আসিতে চাহেন। অন্য কোন লোক জন সে দিকে না থাকে। আমার স্ত্রী, দুইজন দাসী আমি স্বয়ং আর আপনি থাকিলেই হইবে।"

জেলর বলিলেন,—

"যদি বলেন, তাহা হইলে আমিও সঙ্গে না থাকিতে পারি।"

রমাপতি বাবু বলিলেন,—

"আপনি সঙ্গে থাকায়, আমার বা আমার স্ত্রীর কোন আপত্তি নাই। আপনি এ ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা বিশেষ আবশ্যক।"

জেলর বলিলেন,—

"তাহাই হউক। আমি সেদিক হইতে অন্য লোক জন সরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া আসি।"

তিনি, একজন ওয়ার্ডারকে ডাকিয়া শীঘ্র নির্দ্দিষ্ট কামরার চাবি আনিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন এবং একজন কনষ্টেবলকে ডাকিয়া সেদিকে যাহাতে কোন লোক না থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে বলিয়া দিলেন। উভয়ে সাহেবকে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল। কনষ্টেবল তখনই ফিরিয়া আসিয়া আজ্ঞামত ব্যবস্থা করা হইয়াছে জানাইয়া গেল। কিন্তু ওয়ার্ডার এখনও ফিরিল না। রমাপতি নিতান্ত

ব্যস্ততা প্রকাশ করায়, জেলর সাহেব স্বয়ং চাবির জন্য ধাবিত হইলেন, কিন্তু অবিলম্বে বিমর্ষবদনে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—

"সর্ব্বনাশ হইয়াছে! চাবির ঘরে হুকে ঝুলান, সারি সারি চাবি রহিয়াছে, কিন্তু ঐ নম্বরের চাবিটি নাই!"

রমাপতি বাবু চমকিয়া বলিলেন,—

"বলেন কি? চাবি নাই? কি হইল? নিশ্চয়ই ওয়ার্ডার কোন ভুল করিয়াছে—নিশ্চয়ই আর কোথায় চাবি রাখিয়াছে।"

জেলর বলিলেন,—

"এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক; কারণ ওয়ার্ডার পঁচিশ বৎসর এই কর্ম্ম করিতেছে, কখন তাহার কোন ভুল দেখা যায় নাই!"

রমাপতি বলিলেন—

"কখন কোন ভুল হয় নাই বলিয়া, কখন যে কোন ভুল হইবে না তাহা স্থির নহে। আপনি আবার দেখুন।"

জেলর আবার গমন করিলেন এবং ত্বরায় ফিরিয়া আসিয়া, নিতান্ত হতাশ ভাবে বলিলেন,—

"কোন আশা নাই—নিশ্চয়ই চাবি চুরি গিয়াছে। চাবি চুরি যাউক, কিন্তু খবর পাইলাম সে ঘর এখনও খোলা হয় নাই। দরজা এখনও চাবি বন্ধই রহিয়াছে। অতএব চাবি ভাঙ্গিয়া আসামীকে এখনই বাহির করা যাইতে পারে।"

"তাহাই হউক। জেলখানার যে মিস্ত্রী আছে, তাহাকে শীঘ্রই ডাকিয়া লউন, সেও সঙ্গে থাকুক।"

সাহেব, শীঘ্র মিস্ত্রীকে তালা ভাঙ্গিবার যন্ত্র লইয়া আসিতে আজ্ঞা করিলেন। তখন রমাপতির মুখের ভাব উন্মাদের ন্যায়। তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—

"সে সন্ন্যাসীর সংবাদ কি?"

"তাহার আর কি সংবাদ? সে বোধ হয় সেই গাছতলাতেই পড়িয়া আছে।"

"বোধ হয় বলিলে চলিবে না, আপনি শীঘ্র তাহার সংবাদ আনিতে লোক পাঠান।"

জেলর সাহেব একজন কনষ্টেবলকে সন্ন্যাসীর সংবাদ আনিতে বলিলে, সে বলিল,—

"এখনই আমি বাহির হইতে আসিতেছি, দেখিলাম সে গাছতলা ফাঁক; সেখানে সন্ন্যাসীও নাই, লোকজনও কেহ নাই। সন্ন্যাসী কখন চলিয়া গিয়াছেন কেহ জানে না; বোধ হয় বেলা ১টা হইতে তিনি অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। তিনি যে ফিরিয়া আসিবেন এমন বোধ হয় না। কারণ তিনি তাঁহার হাঁড়ি-কুড়ি ও উনান ভাঙ্গিয়া গিয়াছেন।"

এদিকে দরজা ভাঙ্গিবার জন্য মিস্ত্রী আসিয়াছে দেখিয়া, সাহেব বলিলেন,—

"মহাশয়, মিস্ত্রী উপস্থিত। চলুন তবে।"

রমাপতি বাবু হতাশভাবে বলিলেন,—

"চলুন; কিন্তু দরজাই ভাঙ্গুন, আর যাই করুন, দেখিবেন ঘরে আসামী নাই।"

"সেকি মহাশয়! তাহা কি কখন হইতে পারে? আপনি সন্ন্যাসীকে এ সঙ্গে জড়াইতেছেন কেন? সন্ন্যাসীই হউক, ভোজবিদ্যাশালীই হউক, আর দেবতাই হউক, দিনমানে দ্বিপ্রহর কালে, চারিদিকে প্রহরীবেষ্টিত, এই জেলের মাঝখান হইতে অসামী লইয়া যাওয়া সম্পূর্ণই অসম্ভব। এ ও কি কথা! আপনি আসুন।"

রমাপতি বাবু দীর্ঘনিশ্বাস সহ বলিলেন,—

"চলুন।"

তিনি সুরবালার হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইলেন, ঝিরা মাধুরী ও খোকাকে কোলে লইল। প্রথমে মন্ত্রী, তাহার পশ্চাতে জেলর

সাহেব, তাঁহার পশ্চাতে রমাপতি ও সুরবালা, তৎপশ্চাতে ঝিরা এবং সর্ব্বশেষে দুইজন দ্বারবান সারি বাঁধিয়া জেলখানায় প্রবেশ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠের নিকটস্থ হইয়া জেলর সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"দেখুন দেখি, ঘর যেমন তেমনই বন্ধ রহিয়াছে, ইহার মধ্য হইতে আসামী পলাইবে কোথায়? বাবু আপনাদের দেশে পূর্ব্বে যেরূপ মন্ত্র তন্ত্র চলিত, এখন আর তাহা চলে না। আসামী তো মানুষ—এখান হইতে বাহির হওয়া দেবতারও সাধ্য নহে।"

রমাপতি সে কথায় কর্ণপাতও না করিয়া বলিলেন,—

"আপনাদের আসামী আর এ ঘরে নাই। হায়! কি ভুলই হইয়াছে! আমি যদি চলিয়া না যাইতাম! কিন্তু এখন আর উপায় নাই। ভাঙ্গ, মিস্ত্রী দরজা ভাঙ্গ,। সাহেবকে দেখাও তাঁহার বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক। সেই সন্ন্যাসী—কোথায় তিনি? হায়! হায়, আপনি কেন সেখানে পাহারা রাখেন নাই?"

অতি সহজেই মিস্ত্রী চাবি খুলিয়া ফেলিল। সাহেব দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু একি! ঘর যে ফাঁক! তখন তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে রমাপতি, সুরবালা ও ঝিরাও প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু হায়! যাহার সন্ধানের জন্য সকলের এত উদ্বেগ, সে কোথায়? ঘরে তাহার চিহ্নও নাই! জেলর সাহেব অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার বিপদের সীমা নাই। তিনি স্থির বুঝিলেন, অদ্যই তাঁহার চাকুরীর শেষ দিন। রমাপতি তখন সংজ্ঞাশূন্য। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া, মাধুরী সভয়ে ডাকিল,—

"বাবা! বাবা!"

তিনি চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—

"চল সকলে।"

রমাপতি সুরবালার হাত ধরিয়া বেগে গাড়ীতে উঠিলেন। ঝি খোকাকে কোলে দিতে গেলে, রমাপতি তাহাকে 'আঃ' বলিয়া তাড়া দিলেন। অবশেষে ঝি খোকাকে সুরবালার কোলে ফেলিয়া দিল। মাধুরীকে আর এক ঝি কোল হইতে নামাইয়া দিলে, একজন দ্বারবান তাহার হাত ধরিয়া সাবধানতার সহিত গাড়ীতে উঠাইয়া যত্ন করিতে লাগিল। মাধুরীর গাড়ীতে উঠা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই, রমাপতি বাবু কেন কোচম্যান দেরি করিতেছে বলিয়া এমন কদর্য্য গালি দিলেন যে, তাঁহার মুখ হইতে তেমন কটূক্তি আর কেহ কখন শুনে নাই।

সে বলিল,—

"হুজুর দিদি বাবু এখনও গাড়ীতে উঠেন নাই।"

তখন রামপতি বাবু অত্যন্ত বিরক্তির সহিত এমন জোরে মাধুরীর হাত ধরিয়া গাড়ীতে টানিয়া লইলেন যে, বোধ হয় তাহার বড়ই আঘাত লাগিল। সে কিন্তু ভাব গতিক দেখিয়া কাঁদিতে সাহস করিল না। জেলর সাহেব বিনীত-ভাবে রমাপতি বাবুকে সেলাম করিয়া বলিলেন,—

"আমি শীঘ্রই মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমাকে রক্ষা করিবেন। আমার বিপদের সীমা নাই।"

রমাপতি বাবু তাঁহার সম্মানের কোন প্রতি শোধও দিলেন না। তাঁহাতে তখন তিনি নাই।

সুরবালা এতক্ষণ মুখে অঞ্চল চাপিয়া ছিলেন। গাড়ী বেগে চলিতে আরম্ভ হইলে তিনি মুখের কাপড় খুলিয়া ফেলিলেন। রম

পতি দেখিলেন,—বহু রোদন হেতু সুরবালার চক্ষু রক্তবর্ণ, নয়নজলে তাঁহার মুখ ভাসিতেছে।

পিতার এই ভাব ও মাতার এই অবস্থা দেখিয়া মাধুরী কিছু না বুঝিয়াও কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া, খোকা বাবু সুর চড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বালক বালিকার ক্রন্দনে পিতা মাতা কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন রমাপতি দীর্ঘনিশ্বাসসহ উর্দ্ধদিকে হস্ত বিস্তার করিয়া বলিলেন,—

"সুরবালা! ঐ স্বর্গ, ঐ স্বর্গ ভিন্ন আমরা আর কোথাও হয় তো তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব না।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চৌরঙ্গির সেই প্রকাণ্ড ভবনের একতম বৈঠকখানায় রমাপতি বাবু নিতান্ত কাতরভাবে অধোমুখে এক শয্যায় পড়িয়া আছেন। প্রকোষ্ঠ নানাবিধ সুরম্য ও বহুমূল্য শোভনসামগ্রী সমূহে পূর্ণ। বাহির হইতে একজন ভৃত্য গৃহমধ্যস্থ টানাপাখা ধীরে ধীরে টানিতেছে। নিতান্ত আবশ্যক উপস্থিত না হইলে, কোন লোকজন নিকটে না আইসে, ইহাই রমাপতি বাবুর বিশেষ আদেশ ছিল। এজন্য তাঁহার নিকটে তখন একটিও লোক নাই। কিন্তু তাঁহার প্রকোষ্ঠের বাহিরে দুইজন ভৃত্য উৎকর্ণভাবে তাঁহার আজ্ঞার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। আর এক সুন্দরী, পার্শ্বের এক প্রকোষ্ঠে, যবনিকার অন্তরালে রুদ্ধ নিশ্বাসে উপবিষ্টা। সেই সুন্দরী, সুরবালা। কোথায় মাধুরী? কোথায় খোকা বাবু? তাহা সুরবালার মনেও নাই। যে ব্যক্তির সুখের জন্য তাহার জীবন, তাঁহার চরণের নখাগ্র হইতে মস্তকের কেশাগ্র পর্য্যন্ত সকলই তন্ময়। সুতরাং সেই ভাবনা ব্যতীত সে দেহ ও সে মনে অন্য ভাবনার আর স্থান নাই। সুরবালার অঙ্গ আভরণশূন্য; কেশরাশি অবেণীসম্বদ্ধ ও ধূসরিত; পরিচ্ছদ মলিন ও পারিপাট্য পরিশূন্য; দেহ শীর্ণ ও কাতর; লোচনদ্বয় বিষণ্ণ ও রক্তাভ এবং বদনমণ্ডল অবসন্ন ও শঙ্কাকুল! সুরবালার আহার নাই, নিদ্রা নাই, সংসারিক কোন বিষয়েই মনঃসংযোগ নাই। যে দেবতার পদাশ্রয় সুরবালার একমাত্র অবলম্বন, তাঁহার চিন্তা ভিন্ন, সুরবালার অন্তরে অন্য কোন চিন্তার অবসর নাই।

সেই নিরাশায় আশা প্রতিষ্ঠা করিয়া হতাশ হওয়ার পর, সেই দিন বিগত অতুল্যনিধি করতলগত হইয়া হস্তভ্রষ্ট হওয়ার পর, সংক্ষেপতঃ সেই দিন কারাগারে সজীব সুকুমারীকে সন্দর্শন করিয়াও তল্লাভে বঞ্চিত হওয়ার পর হইতে রমাপতি নিতান্ত বিকলিত চিত্ত হইয়াছেন। সুকুমারী হারা হইয়া, তিনি যাহা যাহা লইয়া অধুনা সুখ সন্তোষময় সংসার সংগঠন করিয়াছেন, তাহার কোন পদার্থেরই অভাব ঘটে নাই তো। সেই সুন্দরীশিরোমণি পুণ্যময়ী সুরবালা তাঁহার অবিশ্রান্ত সহচরী; সেই প্রেম-পুত্তলি সারল্য-প্রতিমা মাধুরী ও খোকার মধুর কণ্ঠস্বরে তাঁহার গৃহ দ্বার পরিপূরিত; সেই প্রয়োজনাতিরিক্ত দাসদাসী নিয়ত তাঁহার সেবা ও আদেশ পালনে নিযুক্ত; সেই অতুল সম্পত্তিরাশি ও সুখসংসাধক সামগ্রীসমূহ তাঁহার পদানত; তথাপি রমাপতি কাতর ও মর্ম্মাহত। অপ্রাপ্য পদার্থের প্রাপ্তি সম্ভাবনা বড়ই উন্মাদকারী। এবার রমা-

পতির হৃদয়ে বড়ই কঠিন আঘাত লাগিয়াছে। তাঁহার প্রাণ মন নিতান্ত উদাস হইয়াছে, সুখ সন্তোষে তাঁহার আর স্পৃহা নাই, তিনি অনন্যমনে, নিরন্তর হৃদয়গত নবীভূত যাতনার সেবায় নিযুক্ত আছেন। কেহ তাঁহার সম্মুখে আইসে না, কর্ম্মচারিগণ বিষয় কর্ম্মের কোন সংবাদ তাঁহার গোচর করিতে পায় না, কোন বিষয়েই তিনি আদেশ ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন না। প্রেমময়ী সুরবালার কোন সংবাদ লন না; হৃদয়ানন্দ সন্তানের বার্ত্তা তাঁহার মনে নাই; তিনি কদাচিৎ সামান্য মাত্র আহার করেন; নিদ্রা প্রায় তাঁহার নিকটস্থ হয় না; তিনি উন্মাদের ন্যায় বিকলিত-চিত্ত। সুরবালা নিকটে আসিলে তিনি বিরক্ত হন; মাধুরী ও খোকা তাহাকে দেখিলে ভয় পায়।

কি করিলে স্বামীর এই দুরন্ত মনস্তাপ নিবারিত হইবে, কি উপায়ে রমাপতি বাবু আবার প্রকৃতিস্থ হইবেন, সুরবালা নিরন্তর সেই চিন্তায় নিমগ্না। এ ব্যাধির যে ঔষধ, এ ঘোর মানসিক অবসাদের যাহা একমাত্র প্রতিষেধক, তাহা তাঁহার অবিজ্ঞাত নাই। কিন্তু সে সুকুমারীকে কোথায় পাওয়া যাইবে? কে সে সন্ধান বলিয়া দিবে? যদি আত্ম-জীবনের বিনিময়ে, যদি সর্ব্বস্ব সম্প্রদান করিলেও, সুকুমারীকে পুনরায় পাওয়া যাইতে পারে, সুরবালা এখনই তাহাতে সম্মত। কিন্তু সে আশা ক্রমেই ক্ষীণ ও ক্ষীণতর হইতেছে। পুলিস সুকুমারীর সন্ধানের জন্য প্রাণপাত করিতেছে, সুরবালাও বহু অর্থ ব্যয়ে ও নানা বিধ উপায়ে সন্ধানের কোন ত্রুটি করেন নাই। কেবল আশাভঙ্গজনিত ক্লেশের বৃদ্ধিই হইতেছে।

কিন্তু কারাগারে রমাপতি বাবু যে ভৈরবীকে দর্শন করিয়াছিলেন, তিনিই যে সুকুমারী এ কথা কে বলিল? তাঁহাকে আর কেহই দেখেন নাই, আর কেহ তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই, তিনি যে কে তাহা স্থির করিবার, রমাপতি বাবু ভিন্ন, অন্য উপায় নাই। জেলখানায় কালীর পরিবর্ত্তে অন্য এক স্ত্রীলোক আসিয়াছে, এ কথা অনেকেই জানেন এবং সে স্ত্রীলোককে বহুলোকেই দেখিয়াছেন। কিন্তু রমাপতি বাবু কারাগারে যে ভৈরবী দর্শন করিয়াছেন, তাহার বৃত্তান্ত আর কেহই জানে না। জেলর, ম্যাজিষ্ট্রেট, ওয়ার্ডার, পাহারাওয়ালা, ডাক্তার বা অন্য কেহই জেলখানায় কোন ভৈরবী দেখেন নাই—সকলেই একজন নিরাভরণা গৃহস্থসুন্দরী মাত্র দেখিয়াছেন। কেবল রমাপতি বাবুই ভৈরবী দেখিয়াছেন এবং কেবল তিনিই সেই ভৈরবীকে সুকুমারী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। হইতে পারে রমাপতি বাবুর সম্পূর্ণ ভ্রম ঘটিয়াছে। হইতে পারে, সেই সুন্দরীর সহিত কিঞ্চিন্মাত্র আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিয়া রমাপতি উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাঁহার সবিশেষ বিচার ও আলোচনার শক্তি তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। সুকুমারীর মৃত্যু সম্বন্ধে কোন সন্দেহের কারণ নাই। তিনি সন্তরণে অক্ষম ছিলেন। ঘোর ক্লান্ত ও শ্রান্ত অবস্থায়, রমাপতি বাবুর সমক্ষেই তিনি অগাধ জলে নিমজ্জিত হইয়াছেন। সেরূপ অবস্থা হইতে তাঁহার জীবন লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। এ কথা অন্যেও যেমন বুঝেন রমাপতি বাবুও তেমনিই বুঝেন; তবে দৈবাৎ এক ভৈরবী দেখিয়া তিনি সুকুমারীভ্রমে এতাদৃশ উন্মত্ত হইলেন কেন? বিশেষতঃ যদিই সুকুমারী কোন অলৌকিক উপায়ে জীবনলাভ করিয়াছেন স্বীকার করা যায়,

তথাপি তিনি এরূপ কাণ্ডের মধ্যে কি প্রকারে লিপ্ত হইয়া, এতাদৃশ অসমসাহসিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, তাহারও কোন সঙ্গত মীমাংসা স্থির করা যায় না। সুকুমারীর পূর্ব্ব প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে এরূপ ব্যাপার তাঁহার পক্ষে সর্ব্বথা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার স্থায় লজ্জাশীলা কোমলস্বভাবা, সঙ্কুচিতা নারীর পক্ষে এতাদৃশ কঠোর ও লোমহর্ষণ কাণ্ডের নায়িকারূপে অবতীর্ণ হইয়া দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দকে ভয়ে চমকিত এবং বিস্ময়ে পরিপ্লুত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব কথা। যুক্তি ও তর্কের পথানুসরণ করিলে, রমাপতি বাবুর সুকুমারী সন্দর্শন যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক কথা, তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ থাকে না। কিন্তু সে কথা, অন্যে বুঝিলেও তিনি বুঝেন কই? আর তিনি যদি তাহা বুঝিলেন, তাহা হইলে ফল কি হইল? সেই ভৈরবী যে সুকুমারী তৎপক্ষে রমাপতি বাবুর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। স্থায় ও তর্ক শাস্ত্রের সমস্ত ব্যবস্থাই তাঁহার প্রতিকূলে মস্তক উত্তোলন করিলেও, তিনি কোন দিকে দৃক্‌পাত, বা কিছুতেই কর্ণপাত করিবেন না। অতএব তাঁহাকে বুঝাইবে কে?

এখন উপায় কি? তাহা সুরবালা নিরন্তর চিন্তা করিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না। তবে কি ধীরে ধীরে চিন্তাচর্ব্বিত রমাপতির প্রাণান্ত হইবে? এরূপ দুঃসহযন্ত্রণা আর কিছুকাল থাকিলে মানব প্রাণ অবশ্যই অপগত হইবে। তাহাই কি রমাপতির এ অবস্থার শেষ পরিণাম? যখন যাতনা খর্ব্বীকৃত করিবার কোনই পন্থা নাই, তখন ধীর ভাবে অবশ্যম্ভাবী চরমকালের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করা ভিন্ন আর কি ব্যবস্থা আছে?

সারলা প্রতিমা সুরবালা বিরলে বসিয়া সকল কথাই বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়াছেন, তিনি স্থির করিয়াছেন, যখন রমাপতি বাবুর জীবন রক্ষা করিবার অন্য কোন উপায় নাই, তখন অতঃপর আত্ম জীবন রাখিবার আর কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। সেই নিদারুণ দুর্ঘটনার সম্ভাবনামাত্র স্মরণ ও মনন করিলে যখন হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাহার আগমন দর্শন করিবার জন্য অপেক্ষা করিবে কে? সুরবালা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে পারেন কি? আত্ম-হত্যা দ্বারা জীবন বিধ্বংসিত করা ভিন্ন সুরবালার বাসনাসিদ্ধির উপায়ান্তর নাই। তিনি তাহাতেই কৃতসঙ্কল্প। আত্ম-হত্যা মহাপাপ, এ জ্ঞান তাঁহার এক্ষণে নাই; আত্ম-হত্যা পরম সুখের সোপান বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছে।

বহুক্ষণ যবনিকার অন্তরালে অবস্থিতি করিয়া, ধীরে ধীরে সুরবালা তাহা অপসারিত করিলেন এবং ধীরে ধীরে রমাপতি বাবুর গৃহে প্রবেশ করিয়া, ধীরে ধীরে তাঁহার শয্যা-প্রান্তে উপবেশন করিলেন। রমাপতি তাঁহার আগমন বুঝিতে পারিলেন বটে, কিন্তু কোনই কথা কহিলেন না—একবার ঘাড়টী তুলিয়া ফিরিয়াও চাহিলেন না! সুরবালা বহুক্ষণ সেই স্থানে অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"আমি তোমাকে কোন প্রকার প্রবোধ দিয়া বিরক্ত করিতে আসি নাই। দুইটা কথা বলিব মনে করিয়াছি, শুনিবে কি?"

রমাপতি একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন,—

"সুকুমারী নাই, আমার ভ্রম হইয়াছে, এরূপ কাণ্ড সম্পূর্ণ অসম্ভব, এ সকল কথা তোমার মুখে দশ হাজার বার শুনিয়াছি; তাহাই কোন রূপান্তর করিয়া এখন আবার বলিবে বোধ হয়। আমি সেরূপ কথা কর্ণে

ঠাঁই দিব না জান, তথাপি এ প্রকারে আমাকে কষ্ট দেওয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরতা।"

সুরবালা নিতান্ত বিনীত ভাবে বলিলেন,—

"তোমার মনের এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তোমার সহিত এ সময়ে কোন কথা কহিয়া, তোমাকে ত্যক্ত করাই নিষ্ঠুরতা। কিন্তু আমি তোমাকে দিদির সম্বন্ধে আজ কোন কথাই বলিব না। আজি আমি তোমাকে নিজের দুইটা কথা বলিব, কৃপা করিয়া যদি শুন।"

রমাপতি বলিলেন,—"তোমার নিজের কথা! তোমার এমন কি কথা আছে যে, এখনই না শুনিলে চলিবে না? কৃপা করিয়া আজ আমাকে ক্ষমা কর, যাহা বলিবে দুদিন পরে বলিও।"

সুরবালা নীরব। এ কথার পর তিনি কি বলিবেন? যে দেবচরণে তিনি প্রাণ উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন, সেই দেবতার আজি এই ভাব!

তাঁহার চক্ষে জল আসে আসে হইল, কিন্তু আসিল না। কণ্ঠস্বর কিছু বিকৃত হইয়া উঠিল। তিনি সেই স্থূল স্বরে আবার বলিলেন,—

"দুই দিন পরে আমার আর তোমার সহিত সাক্ষাতের সময় হইতে না পারে।"

সুরবালার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই রমাপতি মুখ ফিরাইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। বোধ করি সুরবালার কণ্ঠস্বর তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিল। তিনি বলিলেন,—

"সময় হইবে না—সে কি কথা সুরবালা?"

এতক্ষণে সুরবালার চক্ষু হইতে অজস্র ধারে অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল। তিনি, কাঁদিতে কাঁদিতে উভয় বাহু দ্বারা রমাপতির পদদ্বয় বেষ্টন করিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন,—

"অদ্যকার সাক্ষাৎই আমাদের ইহ জীবনের শেষ সাক্ষাৎ। তোমার প্রেমময় হৃদয়ের এ অসহনীয় যাতনা তোমার এ দাসী আর এক দিনও দেখিবে না। তোমার দাসী হইয়াও যখন তোমাকে সুখী করিতে পারিলাম না, তোমার তীব্র শোকের কোন প্রতিবিধান করিতে পারিলাম না, তখন বাঁচিয়া থাকিয়া কি লাভ? দয়াময়! তোমার দাসী তাই আজি এত আগ্রহ সহকারে তোমার চরণে চির বিদায় প্রার্থনা করিতেছে।"

কথাটা রমাপতি বাবুর হৃদয়ে বাজিল বুঝি। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। সুরবালা তখনও তাহার চরণে পতিতা! তিনি সাবধানে সুরবালাকে উঠাইলেন। তিনি জানিতেন, সুরবালা কখন মিথ্যা কথা কহেন না এবং তাঁহার হৃদয় কপটতার বার্ত্তা জানে না। তখন রমাপতি বলিলেন,—

"সুরবালা! তুমি সত্যই কি প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছ?"

সুরবালা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"বল দেবতা আমার আর কি উপায় আছে? তোমার প্রসাদ সম্ভোগ, তোমার আনন্দ সন্দর্শন, তোমার সুখ ও সন্তৃপ্তি আমার জীবনের মূল্য। তাহা আর তোমাতে নাই; অতএব আমার জীবনের আর কোনই মূল্য নাই। যাহাতে তোমাকে আনন্দময়, সুখময় ও প্রসাদময় করা যাইবে বুঝিতেছি তাহা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। অনেক সন্ধান করিলাম, অনেক যত্ন করিলাম, দিদির সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। অতএব তোমার চিত্তে শান্তি-সঞ্চারের আর উপায় নাই। এইরূপ কাতর ভাবে, এইরূপ অনাহারে ও অনিদ্রায় কালাতিপাত করিতে হইলে, তোমার জীবন যে আর সপ্তাহ কালও টিকিবে না,

এহা আমি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি। তুমিও কি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না? তবে বল দেবতা, বল সর্ব্বস্বধন, আমি জীবন রাখি কোন সাহসে? মি আমাকে বড় ভাল বাস জানি। তুমিই বল, তোমার সেই নিশ্চিত বিষাদময় পরিণামের পূর্ব্বে, আমার চির-পলায়ন নিতান্তই আবশ্যক নয় কি?"

রমাপতি বহুক্ষণ অধোমুখে চিন্তা করিলেন, তাহার পর বলিলেন,—

"সুরবালা, আমার জীবন যদি থাকে সে তোমারই জন্য থাকিবে, আর যদি যায় সে তোমারই জন্য যাইবে। মনে করিয়া দেখ সুরবালা, এ জীবন রাখিয়াছে কে? তুমি মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জান; সেই মন্ত্র-বলে তোমার এ মন্ত্র-মুগ্ধ অনুগত মরিলেও আবার বাঁচিয়া উঠিবে। তুমি আমাকে বাঁচাইয়া দেও দেবী— এ যাতনা আমি আর সহিতে পারি না।"

এই বলিয়া রমাপতি উভয় বাহু দ্বারা সুরবালাকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। সুরবালা মনে মনে বলিলেন—"আমার প্রাণের প্রাণ, তোমার দাসী তোমার জন্য প্রাণপাত করিয়াও যে সুখ পায়, তাহারই কি তুলনা আছে? হায়! আজি যদি প্রাণ দিলেও দিদিকে দেখিতে পাইতাম।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

উত্তরোত্তর রমাপতি বাবুর অবস্থা মন্দ হইতে মন্দতর হইতে থাকিল। সংসারে মন নাই, বিষয়-কর্ম্মে আস্থা নাই, হৃদয়ে উৎসাহ নাই, শরীরে বল নাই। দেহ অবসন্ন, কাতর ও বহুবিধ ব্যাধিগ্রস্ত। প্রথমতঃ মস্তিষ্কের কাতরতা, তাহা হইতে অবসাদ, তদনন্তর অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ, তদনন্তর অত্যধিক দুর্ব্বলতা ও রক্তহীনতা জন্মিয়াছে। অন্তরে অণুমাত্র প্রসন্নতা নাই, কোন কারণেই আনন্দ নাই; কিছুতেই যত্ন নাই।

তবে আছে কি? আছে কেবল কর্ত্তব্য-জ্ঞান। সেই কর্ত্তব্য-জ্ঞানের প্রবল শাসন তাঁহাকে এখনও অধীন করিয়া রাখিয়াছে। সেই কর্ত্তব্য জ্ঞানের প্রভাবে তিনি বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার জীবনে তাঁহার কোন প্রয়োজন না থাকিলেও তাহাতে সুরবালার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। তিনি বুঝিয়াছেন, সুকুমারী তাঁহার অতীতের স্মৃতি, মেঘাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের বিদ্যুৎক্রীড়া, মরুভূমির মরীচিকা, মোহকর স্বপ্ন-বিকাশ, কিন্তু সুরবালা তাঁহার বর্ত্তমানের আনন্দোৎস, সুনির্ম্মল আকাশের স্নিগ্ধোজ্জ্বল ধ্রুবতারা, প্রতপ্ত জ্বালাজনক বালুকাপুঞ্জ পূর্ণ-ক্ষেত্রমধ্যস্থ শীতলাশ্রয় এবং জাগ্রত কালের প্রত্যক্ষ সুখ! সুকুমারীর স্মৃতি অপরিহার্য্য। তদীয় পুনদর্শনলাভ, অবিচ্ছেদ্য কামনার বিষয় হইলেও, তজ্জন্য দারুণ দুশ্চিন্তায় দেহপাত করিয়া, সুরবালার সর্ব্বপ্রকার সুখ বিধ্বংস ও সর্ব্বনাশ সাধন করা একান্ত অবৈধ অব্যবস্থা। তিনি সুকুমারীর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, তিনি তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়াছেন, তিনি তাঁহার চরণ ধরিয়া রোদন করিয়াছেন, তথাপি সুকুমারী আর তাঁহার সঙ্গিনী হইতে সম্মত হন নাই। আর সুরবালা, রোদন দূরে থাকুক, তাঁহাকে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে দেখিলে, প্রাণ ফাটিয়া মরে; সঙ্গিনী হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার সেবিকা হইতে পাইলেই চরিতার্থ হয়। সেই সুকুমারীর জন্য এই সুরবালার মর্ম্মপীড়া

উৎপাদন করিতে রমাপতি অশক্ত। তিনি বুঝিয়াছেন, সুকুমারী আর তাঁহার কেহ নহেন—সুরবালাই সর্ব্বস্ব। জীবিতা বা মৃতা-সুকুমারী উভয়ই তাঁহার কাছে এখন তুল্য মূল্য।

কিন্তু এত বুঝিয়াও রমাপতি মনকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিতেছেন না; এ ভয়ানক দুর্ব্বলতা তিনি পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। সুরবালা সতত তাঁহার সমীপে থাকিয়া এবং প্রতিনিয়ত কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে বিনোদিত করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিয়াও, তাঁহার কোনরূপ দৈহিক উন্নতি সাধিত করিতে পারিতেছেন না। আয়ুর্ব্বেদ এলোপ্যাথি, এবং হোমিওপ্যাথি সম্মত রাশি রাশি ঔষধ সুরবালা তাঁহাকে গিলাইতেছেন, কিন্তু সকলই ভস্মাহুতি হইতেছে। কবিরাজ ও ডাক্তার প্রতিদিন রাশি রাশি টাকা দর্শনী লইয়া বিদায় হইতেছে, কিন্তু ফল কিছুই হইতেছে না। ক্রমে ব্যাপার বড় ভয়ানক হইয়া উঠিল। চিকিৎসকেরা রমাপতি বাবুর জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইলেন। আত্মীয়জনেরা মুখ-ভার করিয়া চুপি চুপি কথা কহিতে আরম্ভ করিল। অধীনস্থ লোকেরা বিষণ্ণ বদন হইল। সকলেই বুঝিল যে, এ যাত্রা রমাপতি বাবু যেন রক্ষা পাইবেন না। কেবল বুঝিল না এক জন, সুরবালার মনে এ দুশ্চিন্তা একদিনও হইল না। তিনি আশায় বুক বাঁধিয়া, অনন্যমনে পতি-সেবায় নিযুক্তা রহিলেন।

প্রাণের মাধুরী আর খোকার কথা তখন আর সুরবালার মনে নাই। তাহারা ঝিদের কাছেই থাকে। জননী তাহাদের কথা ভাবেন কি না সন্দেহ। তাহারা মাতৃস্নেহের অভাবে ম্রিয়মাণ ও বিশুষ্ক হইতে থাকিল। সুরবালার স্নান নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, তিনি নিরন্তর স্বামী-সেবায় নিবিষ্টচিত্ত। সুরবালার সে মূর্ত্তি নাই, সে শোভা নাই। এখন সুরবালাকে দেখিলে, বলিয়া দিলেও চেনা ভার।

শয্যাগত রমাপতি সকলই বুঝিতেছেন। ব্যাধির হস্ত হইতে আরোগ্য লাভ করা নিতান্ত অসম্ভব তাহা তিনি স্পষ্টই বুঝিয়াছেন। সুরবালার এইরূপ পরিবর্ত্তনও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। এই ব্যাপারের পরিণাম চিন্তা করিয়া প্রেম-প্রবণ-প্রাণ রমাপতি নিতান্ত ব্যাকুল-চিত্ত হইয়া রহিলেন। ব্যাধিজনিত যাতনা তাঁহার চিত্তকে অভিভূত করিতে সক্ষম হইল না। কিন্তু সুরবালার কি হইবে—তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তদ্গতপ্রাণা সুরবালার কি হইবে, ইহাই তাঁহার যাতনার প্রধান কারণ। যে সুরবালার তিনি সর্ব্বস্ব, যে সুরবালা তাঁহাকে হৃদয়ের হৃদয় হইতে ভাল বাসেন, তাঁহার প্রাণান্ত ঘটিলে, সেই সুরবালার কি দশা হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া, সেই ব্যাধিক্লিষ্ট রমাপতি সততই যার পর-নাই যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। অবশেষে রমাপতি এ সকল কথা সুরবালাকে ভাল করিয়া বুঝাইতে সঙ্কল্প করিলেন।

এইরূপ অভিপ্রায় স্থির করিয়া, একদিন মধ্যাহ্নকালে রমাপতি, ক্রমশঃই অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইয়া আসিতেছে জানিয়া, সুরবালাকে বলিলেন,—

"মনুষ্যের শরীর কখনই চিরস্থায়ী নয়। আজি হউক, বা দশদিন পরে হউক, সকলকেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হইবে। আমাদের পিতা মাতা ছিলেন; তাঁহারা এখন নাই। তোমার এই অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের আধার স্বরূপ শরীরও কোন সময়ে ধ্বংস হইবে। সুরবালা! আমার সেই অপরিহার্য্য মৃত্যুকাল সম্প্রতি প্রায় উপস্থিত হইয়াছে।

আমি মরিয়া গেলে, সুরবালা তুমি কি করিবে তাহা কখন ভাবিয়াছ কি?

সুরবালা বলিলেন,—

"তাহা আমি বলিব না। মৃত্যু যে ধীরে ধীরে তোমাকে গ্রাস করিতে আসিয়াছে, তাহা আমি জানি। কিন্তু সে জন্য আমার কোন ভয় বা ভাবনা নাই। তোমাকে বাঁচাইতে পারা আমার প্রধান কামনা। যদি তাহাতে আমি কৃতকার্য্য না হই, তাহা হইলেও, ভাবনার কারণ কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।"

সুরবালার চক্ষে জল নাই। হৃদয়ে কি আছে, ভগবান জানেন, কিন্তু বাহ্যতঃ সেই মলিনা ও কৃশকায়া সুন্দরীর বদনে বিশেষ উদ্বেগের কোন লক্ষণ নাই। এরূপ ভাব দেখিয়া রমাপতি বাবু কিছু আশ্বস্ত হইলেন কি? না। তিনি, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"সুরবালা! তোমার সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে, মনুষ্য বহুবিধ কর্ত্তব্যের অধীন হইয়া সংসারে থাকে। তোমার স্কন্ধেও নানাবিধ গুরুভার অর্পিত আছে। আমার অবর্ত্তমানে তোমাকে একাকিনী জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সেই সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে হইবে। কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দৃষ্টিশূন্য হওয়া নিতান্ত অব্যবস্থা। অতএব সে সম্বন্ধে তুমি কি স্থির করিয়াছ?"

সুরবালা বলিলেন,—

"আমার যাহা সাধ্য তাহা আমি অবশ্যই করিব। যাহা আমার অসাধ্য তাহা আমি করিব কি করিয়া?"

রমাপতি বলিলেন,—

"তুমি স্বীকার না করিলেও, আমি বুঝিয়াছি, আমার প্রাণান্ত হইলে, তোমারও প্রাণান্ত হইবে। কিন্তু মনে করিয়া দেখ, অন্য সকল কর্ত্তব্য উপেক্ষা করিলেও মাধুরী ও খোকার ভাবনা ভাবিতে তুমি অবশ্যই বাধ্য। ভাবিয়া দেখ তাহাদের কে রক্ষা করিবে?"

"ঈশ্বর।"

রমাপতি আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু সুরবালা আবার বলিলেন,—

"কিন্তু তোমাকে বাঁচাইতে পারা আমার নিতান্তই আবশ্যক। এখনও তোমার সেবা করিয়া আমার হৃদয় একটুও তৃপ্ত হয় নাই। হায়! এ সময়ে দিদিকে যদি একবার ধরিতে পারিতাম।"

"তোমার দিদিকে ধরিতে পারিলেই যে আমাকে আর বাঁচাইতে পারিবে এমন আমার বোধ হয় না। তোমার দিদির অভাবজনিত যে যাতনা, অনেক দিন হইতেই তাহা আমার ছিল না; সে অভাব তোমার কৃপায় আবশ্যকের অধিক সম্পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু যাহার জীবন নাই বলিয়া মনে বিশ্বাস করিয়াছিলাম, ইহ জীবনে যাহার সহিত আর কখন সাক্ষাৎ ঘটিবে না বলিয়া জানিতাম, সেই সুকুমারীকে, সহসা অসম্ভব স্থানে, সম্পূর্ণ অচিন্তিত-পূর্ব্ব মূর্ত্তিতে দর্শন করিয়া আমার হৃদয় নিতান্ত আলোড়িত ও বিচলিত হইয়াছে। তাহার পর, সুকুমারীর তৎসময়ের কার্য্যাদি বিবেচনা করিয়া, আমার মনে হয়, নিশ্চয়ই তিনি অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। তৎকাল হইতে আমার চিত্ত অতিশয় অভিভূত হয়। সেই সকল চিন্তা হইতে আমার বর্ত্তমান পীড়ার উৎপত্তি হইলেও, ক্রমশঃ নানাপ্রকার পীড়া আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, এবং অধুনা আমি সম্পূর্ণরূপে সুকুমারীর চিন্তা পরিত্যাগ করিতে পারিলেও, অন্যান্য পীড়ার হস্ত হইতে আমার

নিস্তারের কোনই সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মরণের পূর্ব্বে, একবার সেই ভৈরবীকে দেখিতে পাইলে, আমার বড়ই আনন্দোদয় হইত এবং আমি আরোগ্য লাভ না করিলেও আমার যে বিশেষ সন্তোষ জন্মিত তাহার কোনই সন্দেহই নাই।"

তখন সুরবালা বলিলেন,—

"হায়! কি করিলে সেই দেবীর সাক্ষাৎ পাইব? যদি সর্ব্বস্ব দিলে সেই দেবীকে একবার এই স্থানে আনিতে পারিতাম! তিনি যদি অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া থাকেন—যদি তাঁহার দেবত্বই হইয়া থাকে তাহা হইলে, তিনি এই দুঃখিনীর মর্ম্মপীড়ার কথা বুঝিতে পারিতেছেন না কি? এই অন্তিম শয্যাশায়ী ব্যক্তির বাসনার কথা জানিতে পারিতেছেন না কি? হায় কোথায় তিনি!"

সঙ্গে সঙ্গে, বীণাবিনিন্দিত সুকোমল স্বরে, প্রকোষ্ঠের প্রান্তদেশ হইতে, শব্দ হইল,—

"এই যে!"

রমাপতি ও সুরবালা চমকিত হইয়া সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন কি?

দেখিলেন সেই সুবিস্তৃত কক্ষের ভিত্তিতে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া, এক ঈষদ্ধাস্যমুখী ভুবন-মোহিনী সুন্দরী দণ্ডায়মানা। রমাপতি চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—

"সুকুমারী! আসিয়াছ? এই অন্তিম সময়ে দয়া করিয়া, আমাকে দেখা দিতে আসিয়াছ? সুরবালা, ঐ সেই সুকুমারী। যখন আমাদের নৌকা ডুবিয়াছিল, তখন তোমার যে বেশ ছিল, আজি, সুকুমারি, তুমি সেই বেশে, এ অধীনকে দেখা দিয়া ভালই করিয়াছ।"

তখন সুরবালা "দিদি! দিদি!" শব্দে চীৎকার করিতে করিতে সেই সুন্দরীর নিকটস্থা হইলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মেদিনীপুর হইতে ময়ূরভঞ্জ যাইবার পথের পাশে বড়ই বন। সহর হইতে পশ্চিম দিকে কয়েক ক্রোশ মাত্র গমন করিলেই বনের আরম্ভ দেখা যায়; ক্রমশঃ সেই বন নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইয়াছে। অধুনা যে ক্ষুদ্র পল্লী ও বাঁধ গোপ নামে পরিচিত, শুনা যায় পূর্ব্বকালে তাহা বিরাটের গো-গৃহ ছিল। সেই গোপ-পল্লী অতিক্রম করিয়া, আরও কয়েক ক্রোশ পশ্চিমাভিমুখী হইলে বনের সূত্রপাত দেখা যায়। মেদিনীপুরের কাছারি হইতে এবং অট্টালিকাদির উপর হইতে,এই সুদূরব্যাপি ঘনারণ্যের দূরাগত শোভা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই বনকে বিভিন্ন করিয়া, ময়ূরভঞ্জাভিমুখে মনোহর রাজবর্ত্ম চলিয়া গিয়াছে। পথের উভয় পার্শ্বে দুর্ভেদ্য অরণ্য।

সেই অরণ্যের এক ঘনতম প্রদেশে প্রস্তর-বিনির্ম্মিত এক সুবিস্তৃত অট্টালিকা পরিস্থাপিত আছে। রাজপথ হইতে সেই সুবৃহৎ ভবনের কোন অংশই পরিদৃষ্ট হয় না এবং তাহার বিদ্যমানতাও কেহ অনুমান করিতে পারে না। তথায় গমনাগমনের কোন পথ দেখা যায় না; সুতরাং লোকে কখন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহও করে না।

কিন্তু সেই সুরম্য অট্টালিকা জনহীন নহে। তাহা বহুতর নরনারীর আবাসস্থল। তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দ সেই নিবিড় অরণ্য মধ্যে কেন থাকে, সেই বাঘ-ভালুক-বেষ্টিত বনে তাহারা কেন বাস করে, সেখানে তাহারা কি খায় ইত্যাদি বিবরণ নিরতিশয় কৌতূহলজনক। আসুন পাঠক, আমরা সাহসে ভর করিয়া, সেই বনমধ্যস্থপুরীর অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করি।

রজনী গভীরা। দিবাভাগেও যে বনভূমি দারুণ তমসাচ্ছন্ন, এই ঘোর নিশাকালে, তথায় অন্ধকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু সেই বিশাল ভবনের কোন কক্ষ হইতে আলোকজ্যোতিঃ দেখা যাইতেছে। পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, যে কক্ষে সমুজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে, তথায় উপস্থিত হইলে, দেখা যায় যে, তাহা একটী দেবালয়। আহা কি মনোহর! কি ভুবনমোহন! কক্ষমধ্যে রজতমঞ্চে শিখিপুচ্ছচূড়াধারী, বংশীবদন, হাস্যমুখ স্মেরোৎফুল্ল-লোচন, অপরূপ বঙ্কিমরূপ শ্যাম সুন্দর মূর্ত্তি বিরাজিত; বামে অতসীকুসুম-সঙ্কাশা, বিকসিতাননা, প্রেমপ্রদীপ্তলোচনা

প্রেমময়ীর মোহিনী মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। বিগ্রহদ্বয়ের যেখানে যে অলঙ্কার সাজে, সেখানে তাহাই অর্পিত হইয়াছে। মস্তকোপরি স্বর্ণ-সূত্র-বিনির্ম্মিত এবং মুক্তাঝালর-সমন্বিত এক চমৎকার ঝালর। হরি হরি! কি শোভা! সর্ব্বরূপের কেন্দ্র ও সর্ব্বশোভার উৎপাদক, নহিলে, এত শোভা আর কাহাতে সম্ভবে? হায় হায়! বিগ্রহ যেন সজীব ও বাঙ্ময়। যিনি সর্ব্বব্যাপী, ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার লোমকূপে, তিনি যে এখানেও আছেন, তাহার সন্দেহ কি? কিন্তু এরূপ যুক্তি ভক্তের বড়ই কর্ণজ্বালাকর। ঐ মূর্ত্তিই তিনি, ঐ মূর্ত্তিই সাক্ষাৎ ভগবান্, এই কথাই ভক্ত ভাল বাসে এবং ইহাই জানে।

সেই কক্ষে এক কৃষ্ণকায়া, রক্ষকেশা, ধর্ম্ম-তেজোদ্দীপ্তা, অলৌকিক-শ্রীসম্পন্না নারী বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে মুখ তুলিয়া হাস্যমুখে সেই মঞ্চাসীন নারায়ণ মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। এইরূপে বহুবার দেবদর্শন করার পর, সেই পুণ্যতেজঃ-প্রদীপ্তা সুন্দরী, বিগ্রহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—

"আজি তুমি বড়ই দুষ্ট হইয়াছ! আমার কথা তুমি আজি শুনিতেছ না। আমি সন্ধ্যা হইতে আহার করিবার জন্য, তোমাকে সাধাসাধি করিতেছি, তুমি তাহা শুনিতেছ না। দেখ দেখি রাত্রি কত হইল এখনও তোমার খাওয়া হইল না। আচ্ছা, থাক তুমি। আসুন আগে শান্তিদেবী। তাহার পর তোমাকে মজা দেখাইব এখন।"

কিয়ৎকাল পরে আবার বলিলেন,—

"দুষ্ট! কথা না শুনিয়া আবার হাসি! তোমার বড়ই নষ্টামি হইয়াছে।"

পরে, শ্রীরাধিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—

"আর তুমিই বা কেমন মেয়ে গা? দুষ্ট ছেলে না খায় না খাবে, তুমিই বা কেন খাওনা বাছা?"

এইরূপ সময়ে এক অপার্থিব রূপ-প্রভা-সম্পন্না, মূর্ত্তিমতী পুণ্যস্বরূপা, শোভাময়ী সুন্দরী সেই স্থানে সমাগতা হইলেন। তাঁহার আগমনে সমস্ত গৃহ যেন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি আসিয়াই সেই কৃষ্ণকায়া সুন্দরীকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"কি হইতেছে সুরমে? ছেলে মেয়ের সহিত ঝগড়া বুঝি?"

সুরমা বলিলেন,—

"শান্তি আসিয়াছ? দেখ দেখি মা, এত রাত্রি হইল, এখনও ছেলে মেয়ে খাইতে চাহে না। আমি যত বলিতেছি, ততই আমার কথা বেবল হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছে। বড়ই দুষ্ট হইয়াছে। তুমি আসিলেই উহারা জব্দ হইবে বলিয়াছি। এখন তুমি আসিয়াছ মা, উহাদের যা বলিতে হয় বল।"

শান্তি বলিলেন,—

"তোমার ছেলে মেয়ে আজি নূতন করিয়া দুষ্ট হন নাই; চিরদিনই এইরূপ দুষ্ট। খাওয়ার কথা আমি বলিতে পারি না; কিন্তু দুষ্টামির আমি এখনই প্রতিকার করিতে পারি। কেমন প্রভো! আবারও জব্দ হইবার সাধ আছে কি?

তাহার পর সুরমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—

"না, আর তোমার ছেলে দুষ্টামি করিবে না। আমি এখন আসি। হরি! আমাকে যে কাজে নিযুক্ত করিয়াছ, আমি এখনও তাহা শেষ করিয়া উঠিতে পারি নাই। তোমার কৃপা

নহিলে তাহা শেষ হইবে না। তুমিই জান, কতদিনে তাহা শেষ করাইবে। সুরমে! আমি এখন গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি! তোমার ছেলে মেয়ে ঘুমাইলে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও; তোমার সহিত আমার অনেক কথা আছে।"

এই বলিয়া সেই সুকুমার-কায়া সুরসুন্দরী হাস্যমুখে সেই দেবচরণে প্রণাম করিলেন এবং ঈষদ্ধাস্য সহকারে, দেব দম্পতীকে একটি ছোট কিল দেখাইয়া, সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। সেই সুবৃহৎ ভবনের পার্শ্বে, চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত স্বতন্ত্র ও ক্ষুদ্র একটি যোগমঠ ছিল। তথায় নিবিড় অন্ধকার মধ্যে এক ধ্যানমগ্ন পুরুষ উপবিষ্ট। তাঁহার সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে। সেই অগ্নির জ্যোতিঃ তাঁহার তেজঃ-পুঞ্জ কলেবরে ও শ্মশ্রু সমাবৃত বদনে নিপতিত হইতেছে। তিনি কৌপীনধারী। তাঁহার বয়স কত তাহা দেহ দেখিয়া অনুমান করা অসাধ্য। পঞ্চাশের অধিক হইবে না বলিয়া বোধ হয়। চুল একটিও পাকে নাই। শরীর শীর্ণ অথচ উজ্জ্বল এবং পেশল। দেহ দীর্ঘাকার।

বহুক্ষণ ধ্যানস্থ থাকার পর, সেই যোগীর ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিবামাত্র আমাদের পূর্ব্বদৃষ্টা শান্তি নাম্নী সেই সুন্দরী তাঁহার চরণে প্রণতা হইলেন। সন্ন্যাসী তাঁহার প্রতি নেত্রপাত করিয়া কহিলেন,—

"শান্তি! কতক্ষণ আসিয়াছ? কোন বিঘ্ন ঘটে নাই তো?"

"প্রভো! কিয়ৎকাল পূর্ব্বেই আসিয়াছি। প্রথমে হরিমন্দিরে গিয়া শ্যামসুন্দরকে সমস্ত সংবাদ জানাইয়াছি, তাহার পরই প্রভুর নিকট আসিয়াছি। বিঘ্ন কাহাকে বলে তাহা তো জানি না প্রভু! জানি কেবল ঐ শ্যামসুন্দর ঠাকুর, আর এই জ্ঞানানন্দ ঠাকুর। যেখানেই যাই, আর যাহাই করি, সততই বুঝিতে পারি, ঐ শ্যামসুন্দর আর এই জ্ঞানানন্দ আমার সঙ্গেই আছেন। তবে আর বিঘ্ন করিবে কে? হৃদয় যদি বা কখন একটু দুর্ব্বল বোধ হয়, তাহা হইলে যেই একবার চক্ষু মুদিয়া প্রভুকে ভাবি, অমনই সকল সাহস ও বলই পাই; অমনই দেখি এক পার্শ্বে শ্যামসুন্দর আর এক পার্শ্বে জ্ঞানানন্দ। তবে প্রভো! আমার বিঘ্নের আশঙ্কা করিতেছেন কেন?"

জ্ঞানানন্দ বলিলেন,—

"বৎসে! শ্যামসুন্দর যাহাকে আপনার বলিয়া জানেন এবং যে শ্যামসুন্দরকে আপন বলিয়া জানে, তাহার কদাপি কোন আশঙ্কা থাকে না। এ পাপ ধরায় তোমার ন্যায় জীবের আবির্ভাব ভগবানের লীলা প্রকাশের উপায়মাত্র। পীড়িত সুস্থ হইয়াছেন?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"কি কি উপায় অবলম্বন করিলে?"

"আমাকে দর্শনমাত্র পীড়িত বিশেষ উৎসাহিত হইলেন এবং তাঁহার দেবীর ন্যায় পত্নী, আন্তরিক উৎসাহ-সহকারে আমার নিকটস্থ হইয়া, আমার হস্তধারণ করিলেন। আমাকে তিনি তাঁহার স্বামীর শয্যাসমীপে লইয়া গেলেন। তথায় উভয়ে, নানাপ্রকার প্রীতি ও অনুরাগের কথা বলিয়া, আমাকে বিমোহিত করিবার চেষ্টা করিতে থাকিলেন।

কারাগারে তাঁহার কথা শুনিয়া, আমি, একবার সহসা জ্ঞানশূন্যা হইয়া, কিয়ৎকালের জন্য, বিমোহিত হইয়াছিলাম এবং সে ত্রুটির কথা প্রভুর চরণে নিবেদন করিয়াছিলাম। এবার পাছে সেইরূপ কোন মতিভ্রম ঘটে এই আশঙ্কায়, তাঁহারা যখন কথা কহিতে থাকিলেন, তখন, আমি নিরন্তর প্রভুর চরণ ধ্যান করিতে থাকিলাম। ভাগ্যবলে এবার আর কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটিল না।"

"তার পর?"

"তার পর প্রভুর উপদেশানুসারে, কায়মনোবাক্যে প্রভুকে স্মরণ করিয়া, পীড়িত ব্যক্তির শরীরে বল সঞ্চারের প্রার্থনা করিলাম। শ্যামসুন্দর দাসীর প্রার্থনা পূরণ করিলেন। পীড়িত বলিলেন,—'তাঁহার আর কোন দুর্ব্বলতা নাই।' তদনন্তর তিনি আহারে অপ্রবৃত্তি জানাইলে, আমি তাঁহার জন্য খাদ্য আনিতে বলিলাম। তিনি স্বচ্ছন্দে প্রচুর প্রমাণ খাদ্য উদরস্থ করিলেন। তাহার পর, স্বামীস্ত্রীতে, আমাকে তাঁহাদের গৃহবাসী করিবার নিমিত্ত বহুতর প্রযত্ন করিলেন; কিন্তু আমি স্বীকার হইলাম না। ভাল মন্দ জানি না, কিন্তু আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের দেখা দিতে স্বীকার করিয়া আসিয়াছি। আর প্রভুর অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহাদিগকে তীর্থযাত্রার পরামর্শ দিয়াছি।"

"বেশ করিয়াছ। যেরূপে হউক, এই সাধুযুগলকে আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত করিতে হইবে; সেজন্য তোমার মধ্যে মধ্যে যাতায়াত রাখা আবশ্যক হইবে। আবার কবে যাইবে স্থির করিয়াছ?"

"প্রভু যে দিন আজ্ঞা করিবেন। সপ্তাহ মধ্যে দর্শন দিব বলিয়াছি। এক্ষণে প্রভুর ইচ্ছা।"

"তাহাই হইবে। তোমার অনুপস্থিত কালে তোমার এই শান্তিনিকেতনে আর দুইটি নিতান্ত উগ্রস্বভাব ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। তাহাদের সহিত তোমার পরিচয় হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। নচেৎ তাহাদের উন্নতির উপায়ান্তর নাই।"

অবনত মস্তকে শান্তি বলিলেন,—

"তাহাদের স্বভাব কি নিতান্ত কলুষিত? তাঁহারা কি নিতান্তই উচ্ছৃঙ্খল?"

"যৎপরোনাস্তি। সে জন্য তাহাদের সহিত পরিচয় করিতে তুমি কি ভয় পাইতেছ?"

"কিসের ভয় প্রভো? প্রভুর উপদেশ যদি শুনিয়া থাকি তাহা হইলে ভয়ের সম্ভাবনা ইহ জগতের কোথায়ও নাই। সুখ-দুঃখ, মানাপমান, কার্য্যাকার্য্য, আত্মপর, সকল বোধই বর্জ্জন করিতে প্রভুর নিকট উপদেশ পাইয়াছি। কার্য্য করি প্রভুর আজ্ঞায়, কার্য্য করি না প্রভুর আজ্ঞায়। ফলাফল প্রভুর চরণে নিবেদন করি। সে কার্য্যে লাভালাভ কি, তাহা প্রভুই জানেন। কখনই তাহা জানিতে আমার কামনা নাই। সে দুই ব্যক্তি কোথায় আছে?"

"অদীক্ষিতগণ প্রথমে যেখানে থাকে, তাহারা এখন সেই অংশেই আছে।"

"প্রভুর এক্ষণে আর কোন আজ্ঞা নাই?"

"না মা।"

"তবে এখন আসি দয়াময়?"

"এস বাছা।"

শান্তি পশ্চাদাবর্ত্তন করিলে, জ্ঞানানন্দ মনে মনে বলিলেন,—

"ইহ সংসারে যদি কেহ কখন নিষ্কাম ধর্ম্ম শিখিয়া থাকে, সে তুমি। সার্থক আমার যোগ-চর্চ্চা ও সার্থক আমার সাধনা। শ্যামসুন্দর জীবের প্রতি নিতান্ত করুণা-পরবশ

হইয়াই তোমার ন্যায় দেবীকে সময়ে সময়ে ধরাধামে প্রেরণ করেন। তুমি আমার শিষ্যা হইলেও, আমি তোমার শিষ্য হইবারও যোগ্য নহি। তোমার সাহস, তোমার ধীরতা, তোমার সদ্বিবেচনা, তোমার পবিত্রতা, তোমার ধর্ম্মময়তা সকল সদ্গুণেরই প্রচুর পরীক্ষা হইয়াছে। বৎসে! আজি তোমাকে যে ভার দিয়াছি, তাহাতেই তোমার তেজের পরীক্ষা হইবে। যোগপথে এত দিন পর্য্যটন করিয়া, যদি কিছুমাত্র ঐশ্বর্য্য * সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইয়া থাকি, সে উন্নতি, আমার কামাবসায়িতা হেতু, তোমারই দেহকে আশ্রয় করিয়াছে; অতএব বৎসে! তোমার পরীক্ষায় আমার আত্মপরীক্ষা হইবে।"

শান্তি গুরুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বিয়দ্দূর আগমন করিতে না করিতে, হরিমন্দিরে মঙ্গলারতি-সূচক বাদ্যধ্বনি উঠিল।

* যোগবলে অষ্টৈশ্বর্য্যের অধিকারী হওয়া যায়। সেই অষ্টৈশ্বর্য্যের কথা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে পরিস্ফুট আছে,—

"অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তি প্রাকাম্যং মহিমেশিতা।
বশিকামাবসায়িত্বে ঐশ্বর্যমষ্টধা স্মৃতম্॥"

অর্থাৎ অণিমা (আবশ্যকানুসারে দেহকে সঙ্কুচিত করিবার ও সূক্ষ্ম করিবার শক্তি), লঘিমা (দেহ লঘু করিবার শক্তি), ব্যাপ্তি (সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান থাকিবার শক্তি), প্রাকাম্য (ভোগবাসনা পূরণ শক্তি), মহিমা (দেহ সংবর্দ্ধিত করিবার শক্তি), ঈশিতা (শাসন করিবার শক্তি), বশী (বশীভূত করিবার শক্তি), কামাবসায়িত্ব (কামনা পূরণ শক্তি) এই আট প্রকার ঐশ্বর্য্য।

ইহারই নাম অষ্টসিদ্ধি। সকল যোগীই যে উল্লিখিত অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন এমন নহে। কদাচিৎ সাধুবিশেষে একাধিক ঐশ্বর্য্যের অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। ঐশ্বর্য্য-বিশেষ তাদৃশ সিদ্ধ সাধু, মহাপুরুষ-নামে সমাজ মধ্যে সম্পূজিত হইয়া থাকেন।

সেই বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া, শান্তি সর্ব্বাগ্রে হরিমন্দিরে গমন করিলেন।

তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেই বিগ্রহযুগলের পুরোবাসে গল-লগ্নীকৃত-বাসে এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অনেক নরনারী দণ্ডায়মান। সকলেই সমান বেশধর ও প্রশান্ত মূর্ত্তি। নরনারী তাবতেরই দেহ সমস্থূল, গৈরিক-রাগরঞ্জিত বসনাবৃত। সম্মুখে এক বিপ্র রজত-পঞ্চপ্রদীপ লইয়া, দেবারতি করিতেছেন। শান্তি সেই জনতার পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মানা হইলেন। তৎকালে সকলেই আরতি দর্শনে নিবিষ্টচিত্ত; সুতরাং তাঁহাকে কেহই লক্ষ্য করিল না। আরতি সমাপ্ত হইল। সমবেত নরনারীগণ ভক্তিভাবে ভূলুণ্ঠিত হইয়া, দেবচরণে প্রণাম করিতে থাকিল। সেই সময়ে সমুচ্চ ও অপ্সর-বিনিন্দিত সুমিষ্ট স্বরে অপূর্ব্ব সঙ্গীত-ধ্বনি সমুত্থিত হইয়া সমবেত সকলের হৃদয়-মন অপার্থিব আনন্দ রসে পরিপ্লুত করিয়া তুলিল। শান্তি গায়িতেছেন,—

"নিদমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন
মুনিজনমানসহংস।
কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন
যদুকুলনলিনদিনেশ।
মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন
সুরকুলকেলিনিদান।
অমলকমলদললোচন ভবমোচন
ত্রিভুবনভবননিদান॥
জনকসুতকৃতভূষণ জিতদূষণ
সমরশমিতদশকণ্ঠ।
অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর
শ্রীমুখচন্দ্রচকোর॥"

সঙ্গীত-ধ্বনি শ্রবণ করিবামাত্র সকলেই বুঝিল যে, গায়িকা শান্তি ভিন্ন আর কেহই

নহেন। তখন তাবতেই সসম্ভ্রমে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সঙ্গীত ক্ষান্ত হইলে, সকলে ভক্তি-সহকারে শান্তিদেবীকে প্রণাম করিল; "শ্যামসুন্দর তোমাদিগের সকলকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্টচিত্ত করুন, বলিয়া শান্তি আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রণামকারিগণের মধ্যে শান্তির অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ নরনারী অনেকেই ছিলেন। তাঁহারা সকলে যখন শান্তি দেবীকে প্রণাম করিতেন, তখন তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে গুরুদেবকে স্মরণ করিতেন এবং প্রণামকারিগণকে উল্লিখিতরূপ আশীর্ব্বাদ করিতেন।

উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ একে একে শান্তির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। শান্তি, সকলের সহিতই ধর্ম্মোন্নতি বিষয়ক বাক্যালাপ করিয়া, প্রীতি বিকসিতাননে প্রত্যেক্‌কে বিদায় দিলেন। সেই দেবী তখন পুণ্যশীলা সুরমার সমীপস্থ হইলেন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই শান্তি নিকেতনে উষার সঞ্চার হইল। সেই নিবিড়ারণ্য মধ্যে সম্মোহন বালারুণদ্যুতিঃ বিভাসিত হইল। পাদপাশ্রিত বিহঙ্গমকুল মধুর কূজনে উষা সমাগম সংঘোষিত করিল। দলে দলে শিখি-শিখিনী শান্তিনিকেতনে আহারান্বেষণ কামনায় প্রবেশ করিল এবং ভয়চকিত হরিণগণও সেই হিংসা-দ্বেষ-বিরহিত পুণ্যপুরীর সমীপদেশে উপস্থিত হইল। সেই পুরবাসী দেবদেবীগণ, সূর্য্যোদয়ের বহুপূর্ব্বেই, ভক্তি সহকারে হরিনামোচ্চারণ করিতে করিতে, স্ব স্ব অজিন শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, গাত্রোত্থান করিলেন এবং ললিত বিভাষরাগে মধুর স্বরে শ্যামসুন্দরের স্তোত্র পাঠ করিয়া, নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে মনোনিবেশ করিলেন।

এই সুবিশাল পুরীর অধিবাসিবৃন্দ কেহই ক্রিয়াহীন ও অলস নহেন। আশ্চর্য্য নিয়মাধীনতা সহকারে, তত্রত্য তাবতেই সমস্তদিন নিরন্তর ক্রিয়ানিরত। অপূর্ব্ব সুব্যবস্থার বশবর্ত্তী হইয়া, কেহ বা হরিণ ও পক্ষিগণকে আহার প্রদান করিতেছেন, কেহ বা পুষ্পচয়ন করিতেছেন, কেহ বা হবিষ্যের আয়োজন করিতেছেন, কেহ বা কাষ্ঠাহরণ করিতেছেন, কেহ বা পাকের আয়োজন করিতেছেন, কেহ বা পূজার আয়োজন করিতেছেন, ইত্যাকার ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন লোক নিযুক্ত। কার্য্যের গুরুতা বিবেচনায় কোন কোন কার্য্যের দায়িত্ব একাধিক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত। কাহারও কার্য্যের সহিত কাহারও সংঘর্ষণ নাই; কাহারও সহিত কাহারও কথান্তর নাই; সকলেরই বদনে প্রীতিপূর্ণ মনোহর হাস্যছটা। শান্তি ও আনন্দ সকলেরই সর্ব্বাঙ্গে মাখা। পুরুষ ও স্ত্রী সমভাবে ও ঘনিষ্ঠরূপে নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপালনে নিযুক্ত। কিন্তু কাহারও হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দুষ্প্রবৃত্তি নাই, কাহারও বদনে বিন্দুমাত্র অপবিত্রতা নাই, এবং কাহারও নয়নে তিলমাত্র লালসা নাই। সকলেই পর-দুঃখ-শ্রবণ-হৃদয়, হরিভক্তি-পরায়ণ এবং অসচ্চিন্তা বিবর্জ্জিত। অহো! কে বসুন্ধরায় এ স্বর্গধাম প্রতিষ্ঠা করিল? স্বর্গে ইহার অপেক্ষা অধিকতর সুখকর আর কিছু আছে কি না জানি না।

সেই পুণ্যধামের সর্ব্বত্র এতাদৃশ বিমলানন্দ বিদ্যমান নাই। তত্রত্য যে নিভৃত অংশ আমরা অধুনা দর্শন করিবার বাসনা করিতেছি, তাহা

সম্প্রতি দুঃখ ও অসভ্যতার আলয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তথায় দুইটি অতি পরুষ-মূর্ত্তি পুরুষ বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে। দেহের গঠন বিবেচনায়, তাহাদিগকে বিশেষ বলশালী বলিয়াই বোধ হয়। তাহারা কৃষ্ণকায়, আরক্তলোচন এবং তাহাদের বাক্যালাপ শুনিয়া, অনুমান হয় যে, তাহারা যৎপরোনাস্তি মূর্খ, অসভ্য এবং কলুষিত-স্বভাব। তাহাদের কথাবার্ত্তার কিয়দংশ পাঠককে শুনাইতে ইচ্ছা আছে। একজন বলিতেছে,—

"মাইরি রামা, এ ত বড় জ্বালার জ্বালা হলো"

রামা বলিল,—

"কি করা যায় বল্ দেখি ভাই?"

"দূর শালা! তাই যদি বল্‌তে পারব, তা হ'লে এত ভাবনাই কিসের?"

"বড় মুস্কিলেই পড়া গেল যেদো। খাসা ঘর, সম্মুখে ঢের যায়গা, কিন্তু বাবা চারিদিকে উঁচু দেওয়াল। হেঁচড়ে মেচড়ে যে পালাব তাহারও যো নেই, কোন দিকে অন্ধি সন্ধি নেই। এক-দিকে একটা দরজা আছে বটে, তাও লোহার; আবার আর এক দিক থেকে বন্ধ। হাজার ধাক্কা মার, ভাঙ্গিবে না বাবা। এমন দায়ে তো কখন ঠেকিনি রামা।"

রামা বলিল,—

"কে আন্‌লে, কেন আন্‌লে, কোথা দিয়ে আন্‌লে, তা কিছুই বুঝতে পারলেম না। দাদা! শেষটা কি ভূতে ধরলে? কি জানি বাবা। কিন্তু যাই বল দাদা, এর আশপাশে আরও বাড়ী ঘর আছে, আর মেয়ে মানুষও ঢের আছে। দেখ্‌তে পাস্‌নে, এক একবার মিঠে গলায় উড়ো আওয়াজ এসে কাণে লাগে। বাবা, নির্ঘাত মেয়ে মানুষ আছে।"

যেদো বলিল,—

"ভালো তারও যদি একটা আদ্‌ধা ছুটকে আসে, তা হলেও যে দিনটা কাটে যা হোক ক'রে। এ বাবা, মদ টুকু নাই, গাঁজা টুকু নাই, মেয়ে মানুষ টুকু নাই, কি করে থাকি বল দেখি।"

এইরূপ সময়ে সেই লৌহ দ্বার নিঃশব্দে উন্মুক্ত হইল এবং ধীরে ধীরে শান্তিদেবী সেই পথ মধ্য হইতে দেখা দিলেন। তাঁহাকে দর্শন-মাত্র রামা যেদোর গা টিপিয়া বলিল—

"ঐ রে! মা সরস্বতী আমাদের দুঃখ জান্‌তে পেরেছেন। কেয়াবাত কেয়াবাত, দেখেছিস্ একবার চেহারাখানা। এখন এক বোতল মাল পেলেই বশ—আছে।"

যেদো বলিল,—

"মা যখন দয়া করে মেয়ে মানুষ যুটিয়ে দিয়েছেন, তখন অব্যিশি মদও দেবেনই দেবেন। ছিঃ ভাই মেয়ে মানুষ, ওখানে থম্‌কে দাঁড়ালে কেন বাবা? এলে যদি ভাই দয়া করে, তো এই দিকে এগিয়ে এস।"

শান্তিদেবী নির্ভীকভাবে ধীরে ধীরে অগ্র-সর হইতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রেমো অস্ফুট স্বরে যেদোর কাণে কাণে বলিল,—

"না রে, কিছু বলিস্‌নে! দেখ্‌ছিস্ না, কেমন ঠাকুর দেবতার মত রকম সকম? কি জানি ভাই কি কর্ত্তে কি হবে! দেখ্ না চেহারা! মানুষের কি কখন অমন চেহারা হয়?"

যেদো ক্রুদ্ধস্বরে বলিল,—

"তুই যেমন মুখ্য তেমনি তোর কথা। দেবতা বসে তোর জন্যে। দেখ্‌না, দুশো ইয়ারকি দেবে এখন।"

পরে সেই দেবীর দিকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিল,—

"এস প্রাণ, এগিয়ে এস। ভয় কি ভাই, তোমাকে অযত্ন করতে আমাদের বাবারও সাধ্যি নাই।"

শান্তিদেবী ক্রমশঃ বর্ব্বরদ্বয়ের অতি নিকটাগতা হইলেন। তখন রামা ও যেদো কথা ভুলিয়া গেল, কামনা ভুলিয়া গেল এবং অভিসন্ধি ভুলিয়া গেল। তাহারা নির্নিমেষ লোচনে সেই অপার্থিব শ্রী, সেই অলৌকিক শোভা, সেই ভুবন-দুর্লভ তেজঃপ্রভা সন্দর্শন করিতে লাগিল। শান্তিদেবী আরও নিকটস্থা হইলেন এবং যেদোর মস্তকে আপনার নিষ্পাপ কর-কমল প্রদান করিয়া, সস্নেহ জিজ্ঞাসিলেন,—

"এরূপে থাকিতে বড়ই কষ্ট হইতেছে কি বাছা?"

হায় হায় এমন আওয়াজও কি কখন মানুষের হয়! আনন্দ-সংযুক্ত করুণা সেই দেবীর সর্ব্বাঙ্গে মাথা। হরি হরি যেদো অবাক্! রামা হা করিয়া বহুক্ষণ সেই বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিল। তাহার পর, গলবস্ত্র হইয়া সেই দেবীর চরণে প্রণাম করিয়া বলিল,—

"মা! তোমার ছেলের অপরাধ মাপ কর মা।"

শান্তিদেবী পরমাদরে তাহার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,—

"ভয় কি বাবা শ্যামসুন্দর অবশ্যই তোমাকে ক্ষমা করিবেন।"

কিন্তু যেদো এখনও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। সে এখনও নির্নিমেষলোচনে সেই কলুষশূন্য অপরূপ শ্রী-সন্দর্শন করিতেছে। রামা তাহাকে ধাক্কা মারিয়া বলিল,—

"দেখ্‌ছিস্ না যেদো, স্বগ্‌গে থেকে মা ভগবতী নেমে এয়েছেন।"

তখন শান্তি বলিলেন,—

"না বাবা, আমি ভগবতী নহি। আমি তোমাদেরই মত মানুষ।"

এতক্ষণে যেদোর কথা কহিবার ক্ষমতা হইল। সে বলিল,—

"আমার মাথায় একটু পায়ের ধুলো দিয়ে আমাকে উদ্ধার কর মা।"

এই বলিয়া সে দেবীর পদস্পর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন,—

"না বাবা, আমার পদধূলি লইয়া কোন ফল নাই। স্বয়ং শ্যামসুন্দর তোমাকে এখনই উদ্ধার করিবেন।"

তখন যেদো বলিল,—

"কিন্তু মা আমি যে বড় পাপী। আমি কত মানুষের বুকে ছুরি মারিয়াছি; কত সতী সাবিত্রীর ধর্ম্মনষ্ট করিয়াছি; কত চুরি করিয়াছি। মা, আমার পাপের তো সীমা নাই; আমার উপর কি তোমার দয়া হবে?"

শান্তিদেবী কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই রামা বলিল,—

"তা হউক মা, আমি যেদোর চেয়েও পাপী। আমার কোনই উপায় নাই। আমি টাকার লোভে সহোদর ভাইকে মারিয়াও ফেলিয়াছি। আমার হিসাবে যেদো দেবতা। মাগো আমার কি উপায় হইবে?"

তখন শান্তিদেবী বলিলেন,—

"ভয় কি বাবা, শ্যামসুন্দর তোমাদের দুজনের উপরই দয়া করিবেন। তোমাদের কোন ভয় নাই। তিনি দয়া করিয়াছেন বলিয়াই তোমরা আপন আপন পাপের কথা এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছ। আর তোমাদের কোন ভয় নাই। এখন তোমাদের ভাল হবে।"

যেদো জিজ্ঞাসিল,—

"আমরা কি করিব? কোন উপায়ে আমাদের মঙ্গল হবে?"

শান্তি জিজ্ঞাসিলেন,—

"তোমরা কখন শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ দেখিয়াছ ?"

উভয়েই উত্তর দিল,—

"ঢের—ঢের।"

শান্তি বলিলেন,—

"বেশ। সেই মূর্ত্তি তোমরা এখন ভাবনা করিতে থাক। শিখি-পুচ্ছ-চূড়াধারী ত্রিভঙ্গিমঠাম শ্রীকৃষ্ণের রূপ তোমরা চিন্তা কর। যে যত অনন্যমনে সেই মূর্ত্তির চিন্তা করিতে পারিবে, তাহাকে ভগবান্ তত শীঘ্র উদ্ধার করিবেন। তোমরা তিন ঘণ্টাকাল এইরূপে চিন্তা কর। তাহার পর আবার আমি তোমাদের সহিত দেখা করিতে আসিব। তোমাদের যাহা যাহা আবশ্যক তাহা তোমরা তখন পাইবে।"

রামা বলিল,—

"যে আজ্ঞা।"

যেদো বলিল,—

"কিন্তু মা, তুমি যদি আসিতে ভুলিয়া যাও। আমরা যে বড় অভাগা।"

শান্তি বলিল,—

"না বাছা, তোমাদের কাছছাড়া হইলেও, আমি কেবল তোমাদেরই কথা ভাবিব। তোমাদের কোন ভয় নাই; কোন ভাবনা নাই।"

যেদো বলিল,—

"তবে একটু পায়ের ধূলো দিয়ে যাও মা।"

শান্তি বলিলেন,—

"যদি তাহাতেই তোমাদের তৃপ্তি হয়, তাহা হইলে লইতে পার।"

রামা বলিল,—

"খুব তৃপ্তি; মা, আমরা আর কিছুই চাই না।"

তখন শান্তিদেবী উভয় হস্ত বক্ষে স্থাপন করিয়া বলিলেন,—

"শ্যামসুন্দর তোমাদের মতি ভাল করুন।"

তাহারা ভক্তিসহকারে দেবীর পদরজ লইয়া মস্তকে, ললাটে ও রসনায় সংলগ্ন করিল। ধীরে ধীরে শান্তিদেবী প্রস্থান করিলেন। সেই লৌহদ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন রামা বলিল,—

"ভাই, কি এ ?"

যেদো বলিল,—

"দেবতা আর কি ? দেখছিস্ না জায়গাটা যেন জ্বলে উঠেছিল, আর এখন একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল।"

তাহারা সবিস্ময়ে উভয়ে এই কাণ্ডের অনেক আলোচনা করিল, কিন্তু কোন মীমাংসা হইল না। তাহার পর রামা বলিল,—

"যাই হোক্ বাবা, শেষ পর্য্যন্ত দেখা চাই।"

যেদো বলিল,—

"তবে যে রকম ভাবিতে বলিল, তাই ভাবিতে আরম্ভ কর।"

উভয়ে নয়ন মুদ্রিত করিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল।—অল্প কাল পরেই, যেদো কি করিতেছে দেখিবার জন্য, রামা চক্ষু মেলিল। যেদোও সেই সময়ে, রামা কি করিতেছে দেখিবার জন্য চক্ষু মেলিয়া দেখিল, রামা চক্ষু মেলিয়া আছে। তখন যেদো বলিল,—

"দূর শালা, তুই বুঝি এই রকম করে ভাবছিস্ ?"

আবার উভয়ে পরামর্শ করিয়া, অধিকতর আগ্রহের সহিত ধ্যান করিতে বসিল। আবারও অনতিকাল মধ্যে তাহাদের ধ্যানভঙ্গ হইল। এইরূপ বারংবার চেষ্টার পর, তাহারা অপেক্ষাকৃত কৃতকার্য্য হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বৈকালে শান্তিধামের অপূর্ব্ব ভাব। তত্র দেবদেবীগণ, তখন পূর্ণানন্দিত মনে, ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন। সেই সুবিশাল পুরীর কোন-স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছে। পুণ্যতেজঃ-প্রদীপ্ত পাঠক, বেদীর উপর উপবেশন করিয়া, অনন্য মনে গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন; বহুতর দেবদেবী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া, তদ্গত চিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেছেন। কোথায় বা গীতার ব্যাখ্যা হইতেছে; কোথায় বা শ্যামসুন্দরের সেবার জন্য নানাবিধ আয়োজন হইতেছে; কোথায় বা ধর্ম্মসঙ্গীত হইতেছে; কোথায় বা মীমাংসাকারী ব্যক্তি-বিশেষের নিকট যাহার যে সন্দেহ আছে, তিনি তাহা বুঝিয়া লইতেছেন। সর্ব্বত্র আনন্দ, পবিত্রতা, সরলতা ও শান্তি বিরাজ করিতেছে। এই পাপ-তাপ পূর্ণ ধরাধামে এতাদৃশ শান্তি নিকেতনের আবির্ভাব বস্তুতই বিধাতার বিশেষ করুণার পরিচায়ক।

সেই শান্তিধামের অপর এক দিকে এক সুবিস্তৃত পুষ্পকানন ছিল। তথায় অগণ্য ফুলের গাছে, অগণ্য ফুল ফুটিয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। দেব দেবীগণ, ইচ্ছা হইলে, তথায় বিচরণ করেন; শ্যামসুন্দরের জন্য পুষ্পচয়ন করেন এবং তথায় কুঞ্জবিশেষে বা বেদী বিশেষে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যান ও চিন্তা করেন। সেই বহুদূরব্যাপী উদ্যান মধ্যে, স্থানে স্থানে বৃক্ষ-লতা-গুল্মাদির সংমিশ্রণে ঘনারণ্য রচিত হইয়াছে। সেই অরণ্যাভ্যন্তরে স্থানে স্থানে অতি সুপরিষ্কৃত ও সুরম্য স্থান আছে। আবশ্যক হইলে, তথায় সমুপবিষ্ট হইয়া, দেব-দেবীগণ একান্ত মনে অভীষ্ট দেবতার ধ্যান করিতে পারেন।

শান্তি-কাননের একতম নিভৃত কুঞ্জে সম্প্রতি জ্ঞানানন্দ যোগী উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার তেজঃপ্রভাবশালী সুদীর্ঘ কলেবর ও প্রশান্ত নয়ন-শ্রী সন্দর্শন করিলে, স্বতই হৃদয় হইতে তাঁহার প্রতি ভক্তি-স্রোত প্রবাহিত হইয়া, তদীয় চরণ ধৌত করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়াই বিশ্বাস হয়।

ধীরে ধীরে, তেজঃ ও জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে করিতে, শান্তিদেবী সেই স্থানে সমাগত হইলেন এবং আন্তরিক ভক্তি সহকারে সেই দেব-চরণে প্রণাম করিয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহাকে দর্শন মাত্র জ্ঞানানন্দ মনে মনে বলিলেন,—'প্রণাম করিলে, কর। তোমার প্রণাম গ্রহণ করিবার যোগ্য ব্যক্তি আমি নহি। তোমার তেজেরও যথেষ্ট পরীক্ষা হইয়াছে। কিন্তু আরও পরীক্ষা বাকী আছে। ক্রমশঃ তাহার ব্যবস্থা হইবে। আপাততঃ তোমাকে কি আশীর্ব্বাদ করিব? তোমার কি নাই? প্রকাশ্যে বলিলেন,—

"শ্যামসুন্দর তোমার মঙ্গল করুন। বৎসে! আমাকে সত্বর ভিক্ষায় যাত্রা করিতে হইবে! তোমাকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

শান্তি বলিলেন,—

"প্রভুর ইচ্ছা।"

"তবে, এখানে যদি তোমার কোন অসমাপিত কার্য্য থাকে, তাহা শেষ করিয়া রাখ।"

শান্তি হাসিয়া বলিলেন,—

"প্রভো! এ সংসারে আমার কার্য্য কিছুই নাই! যাহা কিছু আমাকে আপনি করান তাহাই আমি করি। সকলই প্রভুর কার্য্য। আর কার্য্য সমাপিত কিসে হয় তাহাও তো জানি না প্রভু। কার্য্য অনন্ত—সীমা-রহিত, তাহার আরম্ভ বা শেষ কোথায়? তবে ভগবান্! কার্য্য শেষ করিতে আদেশ করিতেছেন কেন?"

জ্ঞানানন্দ মনে মনে বলিলেন,—'কোন্ ভাগ্যবলে— পূর্ব্ব জন্মের কোন্ অসাধারণ

সুকৃতিফলে এরূপ শিষ্যাকে উপদেশ দিবার ভার আমার হস্তে অর্পিত হইয়াছিল? সার্থক আমার সাধনা।' প্রকাশ্যে বলিলেন,—

"যে দুই কলুষিত পুরুষের সহিত তোমাকে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিলাম, তাহা করিয়াছ কি?"

শান্তি বলিলেন,—

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তাহারা বোধ করি তোমার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছিল?"

শান্তি আবার হাসিয়া বলিলেন,—

"প্রভো! আমি কে যে তাহারা আমার উপর অত্যাচার করিবে। প্রভুর পাদপদ্ম চিন্তা করিতে যদি কখন আমার অক্ষমতা হয়, তখন হয় তো আমি কীটের অপেক্ষা হেয় ও সর্ব্ব লোকের পাদ-পেষণোপযোগী হইব। কিন্তু যতক্ষণ আমি অনন্য মনে প্রভুর ঐ চরণ যুগলের ধ্যান করিতে সমর্থ, ততক্ষণ আমার স্বতন্ত্রতা আমি অনুভব করি না, সুতরাং আমি থাকি না। তখন অত্যাচার ও শিষ্টাচার, তিরস্কার ও পুরস্কার পাপ ও পুণ্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, জ্ঞান ও অজ্ঞান, প্রেম ও হিংসা কিছুই আমি বুঝিতে পারি না। প্রভু, আপনি দেবতা ও ভগবান্, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বব্যাপী। যে ব্যক্তি ভাগ্যবলে আপনার শিষ্যত্ব লাভ করিয়া পুনর্জন্ম ও নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার হৃদ্‌ভাব ও অবস্থার কথা প্রভুর অপরিজ্ঞাত থাকা কদাপি সম্ভবপর নহে! তবে প্রভো! এরূপ আদেশ কেন করিতেছেন?"

জ্ঞানানন্দ বলিলেন,—

"তবে তাহারা কোন অত্যাচার করে নাই? ভাল ভাল। তাহাদের কোন হিত পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছে?"

শান্তি বলিলেন,—

"প্রভুর আজ্ঞা পাইলে, তাহাদিগকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করি।"

"এখনই?"

"যদি প্রভুর ইচ্ছা হয়।"

"আজি তোমার ইচ্ছায় তোমার গুরুর ইচ্ছা।"

শান্তি আবার হাসিয়া বলিলেন,—

"কিন্তু আমার ইচ্ছা করায় কে?"

শান্তি চলিয়া গেলেন। জ্ঞানানন্দ মনে মনে বলিলেন—'ধরা পবিত্র হইল। এ দেবী যখন বসুধায় বিচরণশীলা তখন ইহা পুণ্যভূমি। ঐ দেবীর প্রতিপদবিক্ষেপে ধরণীর কলেবর পুলকিত হইতেছে।' জ্ঞানানন্দ প্রেমাবেশে ধ্যান-মগ্ন হইলেন। তাঁহার দেহ তপ্তকাঞ্চন-সন্নিভ হইল; অপার্থিব শোভা তাঁহার সমস্ত কলেবর সমাচ্ছন্ন করিল; তাঁহার দেহ হইতে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

এইরূপ সময়ে রামা ও যেদোকে সঙ্গে লইয়া শান্তিদেবী পুনরায় সেই কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু একি ব্যাপার! রামা ও যেদো উভয়েরই নয়ন হইতে প্রেমবারি বিগলিত হইতেছে; উভয়েই আনন্দে পুলকিত। এইরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদ্বয়, সেই ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষের সম্মুখীন হইয়া এবং তদীয় অলৌকিক শ্রী দেখিয়া অবাক্ হইল। শান্তিদেবী তাহাদিগকে সঙ্কেতে সেই মহাপুরুষকে প্রণাম করিতে উপদেশ দিলেন। তাহারা উভয়ে ভূ-পতিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। প্রণামান্তে যখন তাহারা গাত্রোত্থান করিল, তখন তাহাদের আর এক ভাব হইল। তখন তাহাদের নয়নজল নিবারিত হইল, অভাব বিদূরিত হইল, সন্তোষে দেহ মন

পরিপূর্ণ হইল এবং তাহারা আনন্দে মগ্ন হইল।

সেই সময়ে সেই ধ্যান-নিরত সাধু নয়ন উন্মীলন করিলেন এবং সেই সর্ব্বদর্শী নয়নের প্রশান্ত দৃষ্টি সেই দুই ব্যক্তির উপর পতিত হইল। তখনই তাহাদের প্রাণের পূর্ণ তৃপ্তি হইল এবং তাহারা আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়া কৃতার্থ হইল। তখন মহাপুরুষ বলিলেন,—

"শুনিয়াছি তোমরা এই স্থানে আসিয়া নিতান্ত কাতর হইয়াছ এবং এখানে থাকা তোমরা অতিশয় কষ্টকর বলিয়া মনে করিয়াছ।"

ভাষা আর তখন তাহাদের ভাব প্রকাশের ব্যাঘাত করে না। রামা বলিল,—

"দেবতা, অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমরা যতক্ষণ স্বর্গসুখ জানিতে পারি নাই, ততক্ষণ ব্যাকুল ছিলাম।"

যেদো বলিল,—

"দয়াময়! আমাদের আর কোন কষ্ট নাই। আমরা এ স্বর্গ হইতে আর কোথাও যাইব না। আমরা এত দিন নরকে ছিলাম। এই মা আমাদের স্বর্গে আনিয়াছেন। ঐ চরণ হইতে আমরা আর কোথাও যাইব না।"

যেদো ক্ষান্ত হইলে, রামা শান্তির দিকে চাহিয়া বলিল,—

"মা! এ অধম ছেলেদের তুমি কি কাছে থাকিতে দিবে না? তোমার আশীর্ব্বাদবলে আমরা ধ্যান করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। ওঃ সে শোভার কথা কি বলিব? এখান হইতে যদি তুমি আমাদের তাড়াইয়া দেও, তবে আর আমরা তোমাকে দেখিতে পাইব না। তোমাকে না দেখিলে শ্রীকৃষ্ণও দেখা দিবেন না। তাহা হইলে আমাদের মরণ হইবে। আমরা তোমার কাছছাড়া হইয়া কোথাও যাইব না।"

যেদো বলিল,—

"মা, ইনিই কি নারায়ণ? আমরা যে দেবতাকে দেখিয়াছি, তাঁহার রূপ স্বতন্ত্র; কিন্তু শ্রী এমনই। মা, ইনি তো দয়াময়! তবে আমরা তোমার কাছে থাকিতে পাইব না কেন?"

তখন মহাপুরুষ বলিলেন,—

"বৎস! তোমাদের যিনি মা, উনি তোমাদেরও মা, আমারও মা উনিই এ স্বর্গধামের অধিষ্ঠাত্রী। উঁহাকে শান্তিদেবী বলে। এই — এই স্থানের নাম শান্তিনিকেতন। তোম— কায়মনোবাক্যে ঐ দেবীর চরণে মন স্থাপন করিয়া, উঁহার আজ্ঞার বশবর্ত্তী থাকিও, তাহা হইলেই তোমাদের সকল কামনা পূরণ হইবে। তোমরা অবশ্যই এখানে থাকিতে পাইবে। মার ছেলে কি মার কাছছাড়া হয়? এখন হইতে তোমাদের নূতন নাম হইবে।"

যতক্ষণ মহাপুরুষ এই সকল কথা বলিতেছিলেন, ততক্ষণ শান্তিদেবী নয়ন মুদিয়া কেবল প্রভুরই পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছিলেন।

অনন্তর মহাপুরুষ রামার হস্ত ধারণ করিয়া এবং তত্রত্য একটু মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া, তাহার কপালে তিলক করিয়া দিলেন এবং বলিলেন,—

"আজি হইতে তোমার নাম হইল, 'অভিরাম'।"

অনন্তর যেদোর হস্ত ধারণ করিয়া, সেইরূপ অনুষ্ঠানান্তে, বলিলেন,—

"আজি হইতে তোমার নাম হইল, 'নারায়ণ'।"

মহাপুরুষের করস্পর্শ হওয়ায়, অভিরাম ও নারায়ণের শরীর দিয়া অলৌকিক ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব তাড়িত-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকিল। তাহারা চলচ্ছক্তিহীন বাক্‌শক্তিহীন ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইল। মহাপুরুষ বলিলেন.—

"মা তোমার নূতন সন্তানদের লইয়া যাও। ইহাদের আশ্রম নির্দ্দেশ করিয়া দেও। অগ্র ভগবানের সহিত ইহাদের পরিচয় করাইয়া দিও।"

শান্তিদেবী, উভয় হস্তে উভয় সন্তানের হস্ত ধারণ করিয়া, ভক্তিসহকারে মহাপুরুষকে প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষ হাসিয়া বলিলেন,—

"শান্তিনিকেতনে মাও কখন কখন ছেলেকে প্রণাম করেন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা সময়ে শান্তি নিকেতনের আর এক ভাব। তত্রত্য দেবদেবীগণ তখন শ্যামসুন্দরের আরতির জন্য বড়ই ব্যস্ত। কেহ মালা গাঁথিতেছেন, কেহ পুষ্প সাজাইতেছেন, কেহ ভোগের আয়োজন করিতেছেন, কেহ চন্দন প্রস্তুত করিতেছেন, কেহ দেব-ব্যবহার্য্য রজত ও স্বর্ণপাত্র সমূহ পরিষ্কার করিতেছেন, কেহ নিকেতনের নির্দ্দিষ্ট স্থান সমূহে আলোক প্রদানের ব্যবস্থা করিতেছেন, কেহ দেবালয় মার্জ্জনা করিতেছেন ইত্যাদি নানাবিধ কার্য্যে সকলেই ব্যস্ত।

ক্রমে সায়ংকাল সমুপস্থিত হইল এবং আরতির সমস্ত আয়োজন হইল। তখন মধুর মৃদঙ্গ, দামামা ও করতালাদির বাগ্যারম্ভ হইল। সে বাগ্যধ্বনি ও তাহার প্রতিধ্বনিতে সেই সুপ্রশস্ত হর্ম্ম্য ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্য আমোদিত হইয়া উঠিল। আশ্রমবাসী নরনারীগণ যিনি যেখানে ছিলেন, সকলে আসিয়া দেবালয়ে সমবেত হইতে লাগিল।

তখন অগ্রে মহাপুরুষ জ্ঞানানন্দ, পশ্চাতে অভিরাম ও নারায়ণ এবং সর্ব্বশেষে শান্তিদেবী সেই দেবালয়ে আগমন করিলেন। মহাপুরুষকে দর্শনমাত্র তাবতেই ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণরজঃ মস্তকে ধারণ করিতে থাকিলেন। মহাপুরুষ নয়ন মুদ্রিত করিয়া, করযোড় করিয়া রহিলেন। মহাপুরুষের সমাগমে সকলের হৃদয় দিয়া আনন্দলহরী প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার প্রশান্ত সহাস্য বদন, তেজঃপ্রদীপ্ত কলেবর, অপরূপ শ্রী দর্শনে সকলেই পরম পুলকিত হইলেন।

শান্তি দেবীকেও সকলে আন্তরিক ভক্তির সহিত প্রণাম করিতে থাকিলেন। তিনিও মহাপুরুষের ন্যায় নয়ন মুদ্রিত করিয়া, প্রভুর পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন। আনন্দ ও শোভা বিলাইতে বিলাইতে তিনি মহাপুরুষের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। আর অভিরাম ও নারায়ণ কি করিলেন? তাঁহারা প্রথমে অবাক্ হইলেন। এত দেবদেবীর সুললিত পুণ্য-প্রদীপ্ত কলেবর দর্শন করিয়া, সুরভি কুসুম ও চন্দনাদির গন্ধ উপভোগ করিয়া, বাগ্যধ্বনির গাম্ভীর্য্য অনুভব করিয়া, ভক্তি ও আনন্দের অদ্ভুত বিকাশ দেখিয়া, পবিত্রতা ও পুণ্যের সমীরণ সম্ভোগ করিয়া, তাঁহাদের মনে হইল, তাঁহারা সশরীরে স্বর্গে আগমন করিয়াছেন। তখন তাঁহারা কিয়ৎকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় থাকার পর, উন্মত্ত ভাবে সেই সকল দেবদেবীর চরণমূলে নিপতিত হইতে লাগিলেন এবং তত্রত্য পবিত্র রজঃ স্ব স্ব কলেবরে সম্পৃক্ত করিতে থাকিলেন।

আরতি আরম্ভ হইল; মহাপুরুষ স্বয়ং সেই সুবৃহৎ পঞ্চ প্রদীপ হস্তে লইয়া দেবারতি করিতে আরম্ভ করিলেন। হুলুধ্বনি, আনন্দ-ধ্বনি ও বাদ্যধ্বনিতে দিগ্বলয় সম্পূরিত হইয়া উঠিল। আরতি সমাপ্ত হইলে, দেবদেবীগণ বিগ্রহমঞ্চ বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। অহো কি অপূর্ব্ব! কি সুললিত! কি অলৌকিক! আহা! সে নৃত্য—সে প্রেমোন্মাদপূর্ণ অপূর্ব্ব পাদবিক্ষেপ—সে সুপবিত্র অঙ্গভঙ্গী, তাহার কি বর্ণনা সম্ভবে? হরি হে! হে পুরুষোত্তম! কত দিনে বসুন্ধরার তাবতে এরূপ স্বর্গসুখ সম্ভোগের অধিকারী হইবে? কতদিনে মানব, ভক্তি মাহাত্ম্যে বিমোহিত হইয়া,তোমার জন্য এইরূপ উন্মত্ত হইবে? কত দিনে, হে জগন্নাথ! তোমার মহিমা হৃদগত করিয়া জীব ধন্য হইবে?

সেই নৃত্যামোদ ক্ষান্ত হইলে, দেবদেবীগণ সমস্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। সেই সঙ্গীত-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বভূত ধন্য হইতে লাগিল।

তাঁহারা গান করিতেছেন,—

"প্রলয়-পয়োধি-জলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্র চরিত্রমখেদং
কেশব ধৃতমীনশরীর
জয় জগদীশ হরে।

ক্ষিতিরতি বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণিধারণকিণচক্রগরিষ্ঠে
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর
জয় জগদীশ হরে।

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না
কেশব ধৃতশূকররূপ
জয় জগদীশ হরে।

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিত হিরণ্যকশিপুতনু-ভৃঙ্গং
কেশব ধৃতনরসিংহরূপ
জয় জগদীশ হরে।

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত বামন
পদনখনীরজনিতজনপাবন
কেশব ধৃতবামনরূপ
জয় জগদীশ হরে।

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগত পাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিত ভবতাপং
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ
জয় জগদীশ হরে।

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ং
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ং
কেশব ধৃতরামশরীর
জয় জগদীশ হরে।

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভং
কেশব ধৃতহলধররূপ
জয় জগদীশ হরে।

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে।

ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং
কেশব ধৃত কল্কিশরীর
জয় জগদীশ হরে।"

সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে মহাপুরুষ প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য দেবদেবীগণ, প্রথমতঃ সাষ্টাঙ্গে বিগ্রহ যুগলকে প্রণাম করিয়া, তদনন্তর শান্তিদেবীকে প্রণাম করিয়া, একে একে প্রস্থান

করিলেন। কেবল শান্তি, অভিরাম ও নারায়ণ হরিমন্দিরে অপেক্ষা করিয়া থাকিলেন।

অগ্র মহাপুরুষের আজ্ঞানুসারে, শান্তিদেবী অভিরাম ও নারায়ণকে শ্যামসুন্দরের সহিত পরিচিত করাইবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রমাপতি বাবু তীর্থযাত্রা করিবেন। আয়োজনের সীমা নাই। লোকজন দাসদাসী, অনেকেই যাইবে। আর যাইবেন, তাঁহার দেওয়ান বিহারীলাল মিত্র। দ্রব্য সামগ্রী প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে সঙ্গে যাইবে। বিহারী বাবু অতি বাল্যকাল হইতেই পিতৃ-মাতৃহীন এবং দয়াবান্ রাধানাথ বাবুর সংসারে প্রতিপালিত। প্রথমে তিনি রাধানাথ বাবুর জমিদারী সংক্রান্ত সামান্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং ক্রমশঃ, বিদ্যা বুদ্ধির আতিশয্য হেতু, জমিদারীর একজন অতি প্রয়োজনীয় কর্ম্মচারী হইয়া উঠেন। নৌকাডুবির পর, রমাপতি বাবু রাধানাথের আশ্রয়ে আসিলে, যে সকল ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিশেষ আত্মীয়তা হয়, তন্মধ্যে এই বিহারীলাল বাবু সর্ব্ব প্রধান। বিহারী সেই অবধি রমাপতির অভিন্নহৃদয় বান্ধব। এই বিপুল সম্পত্তি রমাপতি বাবুর হস্তগত হওয়ার পর হইতে, তিনি বিহারীর মন্ত্রণা ব্যতিরেকে কোন কর্ম্মই করেন না। পরিশেষে দেওয়ানের পদ শূন্য হইলে, তিনি বিহারী বাবুকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিহারীর কার্য্যদক্ষতা অসাধারণ। অতি যোগ্যতার সহিত তিনি কর্ত্তব্যপালন করিয়া আসিতেছেন।

বিহারী বাবু, দাসদাসী সকাশে, প্রভু পরিবারভুক্ত ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে সম্মানিত ও সমাদৃত। শিশুকাল হইতেই এই পরিবার মধ্যে অবস্থান করায়, সকলেই তাঁহাকে আপনার লোক বলিয়া বিশ্বাস করে। সুরবালা তাঁহাকে দাদা বলিয়া থাকেন। মাধুরী ও খোকা তাঁহাকে মামা বলিয়া ডাকে এবং রমাপতি তাঁহাকে ভাই বলেন। পুরমধ্যে কোন স্থানেই বিহারী বাবুর গমনাগমনের বাধা নাই। তাঁহার আজ্ঞা সর্ব্বত্র সম্মানিত। বিহারী বাবু বলিয়াছেন শুনিলে, কোন বিষয়ে সুরবালা আর প্রতিবাদ করেন না এবং রমাপতি বাবুও তাহাই মানিয়া লন।

কিন্তু মনুষ্যের মন বড়ই দুর্জ্ঞেয়। বহিরাবরণ দেখিয়া মনুষ্যের হৃদয়ের বিচার হয় না। কাজ দেখিয়া প্রাণের ভাব অনুমান করা যায় না। রমাপতির এই পরমাত্মীয় ও প্রাণের বন্ধু, অন্তরে তাঁহার প্রবল শত্রু। রমাপতি সম্প্রতি মরণাপন্ন হইয়াছিলেন এবং চিকিৎসকেরাও তাঁহার জীবনরক্ষার সম্বন্ধে হতাশ হইয়াছিলেন, তখন বাহ্যতঃ বিহারী বাবুর উদ্বেগের সীমা ছিল না সত্য; কিন্তু যদি কেহ তৎকালে তাঁহার অন্তর অনুসন্ধান করিতে পারিত, তাহা হইলে জানিতে পারিত যে, তাঁহার অন্তরে তৎসময়ে আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি কায়মনোবাক্যে তৎকালে রমাপতির মৃত্যু কামনা করিতেছিলেন। কেন তাঁহার চিত্ত এরূপ ভাবনাপন্ন, তাহা ক্রমশঃ পরীক্ষিতব্য।

আপাততঃ রমাপতি, সুরবালা, মাধুরী, খোকা, বিহারী বাবু ও আবশ্যকমত দাসদাসী মিলিত হইয়া তীর্থ পর্য্যটনে যাত্রা করিবেন।

আয়োজন সমস্তই ঠিক হইয়াছে। হাবড়া ষ্টেশনে গাড়িও রিজার্ভ করা হইয়াছে।

রমাপতি বাবু আর পূর্ব্বের মত অপ্রফুল্ল ও কাতর নহেন। তিনি তিন চারি বার সুকুমারীর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। সুকুমারীর সহিত তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছে। সেই দেবী আবারও তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ দর্শন দিবেন স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং রমাপতি ও সুরবালা সম্পূর্ণরূপে সুখী হইয়াছেন। যে দারুণ দুঃখভার তাঁহাদিগকে পোষিত করিতেছিল, তাহা অন্তরিত হইয়াছে। সুকুমারী যাহাতে তাঁহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আর কোথাও যাইতে না পারেন, তজ্জন্য রমাপতি ও সুরবালা বিশেষ প্রযত্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সে যত্ন সফল হয় নাই। সুকুমারী কোন ক্রমেই তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি মিনতি করিয়া, রমাপতি ও সুরবালাকে তৎসম্বন্ধে তাঁহার অক্ষমতার কথা জানাইয়াছেন। অতঃপর তিনি সতত তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন আশ্বাস দেওয়ায় অগত্যা তাঁহাদিগকে নিরস্ত হইতে হইয়াছে।

সুকুমারীর বর্ত্তমান নিবাস কোথায়, তাঁহার উপজীবিকা কি, তাঁহার রক্ষক কে, ইত্যাদি বিষয়ে সুরবালা ও রমাপতি বিশেষ কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এতাদৃশ প্রশ্নের উত্তরে, সুকুমারী কেবল ভগবানেরই নাম করিয়াছেন। সুরবালা স্থির করিয়াছেন, তাঁহার সেই সপত্নী, জলমগ্ন হওয়ার পর হইতে, কোন অনৈসর্গিক উপায়ে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন; নহিলে এত রূপ, এমন কথা, এত ক্ষমতা কি আর মানুষের হয়? সুতরাং দেব দর্শন হইয়াছে এবং দেবতার সহিত পরিচয় হইয়াছে মনে করিয়া, তাঁহার আনন্দ ও সন্তোষের সীমা নাই। রমাপতি বাবু স্থির করিয়াছেন, তাঁহার সেই পত্নী, কোন অসম্ভাবিত উপায়ে, অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি চিরকালই দেবতুল্য ছিল। অধুনা তাঁহার অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাঁহার যে সুকুমারী ছিলেন, তিনি লোকান্তরিত হইয়া, দেবক্ষমতা ও দেব-কান্তি লাভ করিয়াছেন এবং লীলা প্রকাশের নিমিত্ত পুনরায় ভূতলে আবির্ভূতা হইয়াছেন। যাহাই হউক, তাঁহারা সুখী হইয়াছেন।

এইরূপ অবস্থাপন্ন রমাপতি ও সুরবালা নিয়মিত দিনে পরমানন্দে রেল-যোগে তীর্থভ্রমণে যাত্রা করিলেন। বাষ্পীয় শকট এই সকল আনন্দপূর্ণ ব্যক্তিকে বহন করিয়া, বায়ুবেগে প্রধাবিত হইল। কত বন, কত কানন, কত জলাশয়, কত প্রান্তর, কত পল্লী, কত ধান্যক্ষেত্র তাঁহাদের নয়ন-সমক্ষে নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল। কতই জনতা, কতই ব্যস্ততা, কতই উৎসাহ তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। মাধুরী ও খোকা গজর গজর করিতে করিতে, কতই কি বকিতে থাকিল; আর সুরবালা, ঈষৎ হাসির সহিত মিশাইয়া, কত কথাই রমাপতি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সুরবালা বড়ই আনন্দ লাভ করিতেছেন জানিয়া, রমাপতি মনে করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার এ আয়োজন ও প্রযত্ন সম্পূর্ণরূপ সফল হইয়াছে।

গাড়ি বর্দ্ধমান ছাড়িয়া, ক্রমশঃ কর্ড লাইনে প্রবেশ করিল এবং উপন্যাসবর্ণিত দৈত্যের ন্যায় হুঙ্কার ত্যাগ করিতে করিতে, তরঙ্গায়িত বন্ধুর প্রদেশে ও পরমরমণীয় দৃশ্যাবলীর মধ্যে ধাবিত হইল। মেঘ-মালার ন্যায় পাহাড়-শ্রেণীর দূরাগত অপূর্ব্ব শ্রী এবং শাল ও পলাশ বনের অপরূপ শোভা রমাপতি ও সুরবালাকে বিনোদিত করিতে থাকিল। কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র,

অতি অল্প জলবিশিষ্ট, স্রোতস্বতী নদী, তাঁহাদিগের প্রীতি সঞ্চার করিতে লাগিল। কল্যাণেশ্বরী দর্শনার্থ তাঁহারা প্রথমে বরাকরে অবতীর্ণ হইলেন। বরাকর পাথুরিয়া কয়লার ধূলায় আবৃত, এজন্য গ্রাম হইতে কিঞ্চিদ্দূরে তাঁহাদের বাসা স্থির ছিল। তাঁহারা সেই বাসায় অধিষ্ঠিত হইয়া স্বচ্ছন্দে রাত্রিপাত করিলেন।

পরদিন প্রাতে সকলে মিলিয়া কল্যাণেশ্বরী দর্শনে যাত্রা করিলেন! সেই অরণ্য ও পাহাড়-বেষ্টিত দেবস্থানের গম্ভীর শ্রী সন্দর্শনে তাঁহাদের হৃদয় নিতান্ত পুলকিত হইল। তাঁহারা ভক্তিভাবে দেব-পূজা সমাপন করিয়া, সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আবাসে প্রত্যাগত হইলেন। প্রত্যাগমন কালে পঞ্চকোটের সুবিস্তৃত শৈলমালা তাঁহাদিগের নয়ন-মনকে বিমোহিত করিতে থাকিল।

কল্যাণেশ্বরী সন্নিহিত স্থান সমূহ রমাপতিকে এতই বিমোহিত করিয়াছিল যে, তিনি পুনরায় পরদিন তদ্দর্শনে যাত্রা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অদ্য তিনি সুরবালা, মাধুরী বা খোকাকে সঙ্গে লইলেন না; তাঁহারাও অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন বলিয়া, পুনরায় রমাপতির সহিত গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন না।

বিহারী বাবুও, শারীরিক অসুস্থতার কারণে, রমাপতির সঙ্গে যাইবেন না স্থির হইল। বিশেষতঃ সুরবালা যখন বাসায় থাকিতেছেন, তখন তাঁহার রক্ষক স্বরূপে বাসায় থাকা বিহারী বাবুর পক্ষে আবশ্যক বলিয়া স্থির হইল। কেবল একজন পাচক, দুইজন দাসী, বিহারী বাবু, সুরবালা ও তাঁহার সন্তানদ্বয় বাসায় থাকিলেন। দ্বারবান্ ভৃত্যাদি তাবতেই রমাপতি বাবুর সঙ্গে গেল। বাসায় যখন বিহারী বাবু থাকিলেন, তখন আর কাহারও থাকিবার বিশেষ প্রয়োজন কেহই অনুভব করিলেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দুই জন ঝি, মাধুরী ও খোকাকে লইয়া, সেই সুবৃহৎ বাসার পুষ্পোদ্যানে পরিভ্রমণ করিতেছে। বিহারী বাবু তাহাদের নিকটস্থ হইয়া মাধুরী ও খোকার সহিত অনেকক্ষণ নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুক করিলেন। তাহারাও মামা বাবুর সহিত ছুটাছুটি করিয়া অনেক খেলা করিল। সুরবালা তখন এক প্রকোষ্ঠের বাতায়ন সমীপে একখানি বই লইয়া উপবিষ্টা। পুস্তকে তাঁহার মন নাই; মাধুরী ও খোকা বিহারী বাবুর সঙ্গে যে অপূর্ব্ব খেলা করিতেছে, তাহাই দেখিতে তিনি নিবিষ্টচিত্ত। বিহারী বাবু, মাধুরী ও খোকার গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিয়া, ঝিদের বলিলেন,—

"তোরা আজি মাধু ও খোকাকে বরাকর নদীতে স্নান করাইয়া আন। এমন পরিষ্কার স্বাস্থ্যকর জল আর এদিকে নাই। উহাদের গায়ে অনেক ময়লা হইয়াছে। বেশ করিয়া স্নান করাইয়া আন দেখি। দূর তো বেশী নয়। যা, গিন্নিকে জিজ্ঞাসা করিয়া আয়।"

তাহারা মাধুরী ও খোকাকে লইয়া সুরবালার নিকটস্থ হইল। সুরবালা বিহারী বাবুর উপদেশ স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছেন; সুতরাং ঝিরা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন,—

"দাদা যখন বলিতেছেন, তখন আর আমি কি বলিব? তাই নিয়ে যাও।"

অনতিকাল মধ্যে, ফুলেল তেল, তোয়ালিয়া, সাবান, এবং কাপড় চোপড় লইয়া ঝিরা মাধুরী ও খোকাকে স্নান করাইতে চলিল। পাচক, দূরে পাকশালায় স্বকার্য্যে নিযুক্ত আছে। বলিতে গেলে বিহারী বাবু ও সুরবালা ভিন্ন, বাসায় আর কেহ থাকিল না।

তখন বিহারী বাবু মনে করিলেন,—'এমন সুযোগ আর কখনই হইবে না। দ্বাদশ বৎসর যে বাসনা আমাকে দগ্ধ করিতেছে, আজি তাহা মিটাইবার সুন্দর অবসর উপস্থিত। এমন সময় আর জীবনে পাইব না। অনেক চেষ্টা করিয়াছি, এ পাপ বাসনা নিবারণ করিতে পারি নাই। না, সে চেষ্টা অসম্ভব। যদি ইহা পাপ কার্য্য হয়, তাহা হইলে আমাকে পাপী হইতেই হইবে। পাপ হউক, দুষ্কর্ম্ম হউক, নরক হউক এ বাসনা দমিত হইবার নহে। অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে; আমি আজিই মনের বাসনা মিটাইব।"

তখন বিহারী বাবুর মূর্ত্তি অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল এবং মুখের ভাব করুণাশূন্য হইল। তিনি তখন ধীরে ধীরে সুরবালার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র সুরবালা ভয়-চকিত ভাবে বলিলেন,—

"দাদা! একি! তোমার চেহারা এমন হইয়াছে কেন? তোমার কি অসুখ হইয়াছে?

বিহারী বাবু বলিলেন,—

"অসুখ—ওঃ তাহার কথা আর কি বলিব! অতি ভয়ানক অসুখ! আমার মন প্রাণ দগ্ধ করিতেছে। তোমার করুণা ভিন্ন সে অসুখ নিবারণের আর কোনই ঔষধ নাই। আজি তুমি আমাকে রক্ষা কর—আমার প্রাণ যায়।"

তখন সেই সুরসুন্দরী যুবতী নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে, বলিলেন,—

"বল, বল দাদা, আমায় কি করিতে হইবে। তোমার অসুখ-শান্তির নিমিত্ত যাহা করা আবশ্যক আমি তাহাই করিব।"

বিহারী বলিলেন,—

"শুন সুরবালা! বাল্যকালের কথা তোমার মনে পড়ে কি? বাল্যকালে তোমাতে আমাতে একত্র খেলা করিতাম। তখন হইতে এ অভাগা নিরন্তর তোমার সঙ্গেই আছে। তখন হইতে তোমার এ দাস নিয়ত তোমার পূজা করিয়া আসিতেছে। আমি যদি ব্রাহ্মণ হইতাম, তোমার পিতা, তাহা হইলে, এই অধমের সহিতই তোমার বিবাহ দিতেন। কিন্তু আমার কপাল মন্দ, তাই আমার প্রাপ্যবস্তু অপরে লাভ করিয়াছে। কিন্তু সুরবালা! তুমি অপরের অঙ্কশায়িনীই হও, আর তোমার যেরূপ মনের ভাবই হউক, তোমার লোভ সম্বরণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি মনে করিয়াছিলাম, তোমাকে আমিও যেমন ভাল বাসি তুমিও আমাকে তেমনই ভাল বাস। অতএব তুমি যাহারই হও, তোমার প্রেম আমিই লাভ করিব। প্রকাশ্যরূপে না হইলেও গোপনে তোমার প্রেম আমিই ভোগ করিব কিন্তু আমার সে আশায় ছাই পড়িয়াছে। অতএব আমি এখন অসদুপায়ে তোমাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। সুন্দরি! এ লোভ আমার পক্ষে অসংবরণীয়; সুতরাং আমি জ্ঞান-শূন্য। আমি মরণাপন্ন। সুরবালা! তুমি আজি আমাকে রক্ষা কর।"

সুরবালার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। তিনি নিতান্ত ভীতভাবে বলিলেন,—

"দাদা! দাদা! সহসা তোমার একি মতিভ্রম হইল? যদি তুমি আমাকে এক তিলও ভাল বাসিতে, তাহা হইলে এরূপ চিন্তা কদাপি তোমার মনে উদিত হইত না। আমি তোমাকে সহোদর বলিয়াই জানি তোমার এ মতিভ্রমের কথা শুনিয়া, আমি মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইতেছি। যাও তুমি নির্জ্জনে বসিয়া ভগবানের ধ্যান কর গিয়া। তাহা হইলে, তোমার এ দুশ্চিন্তা দূর হইবে।"

তখন সে নর-প্রেত হাসিয়া বলিল,—

"ভগবান্ আমার প্রতি সদয় হইলে, তোমার মনও আমারই মত হইত। শুন সুরবালা! যদি তুমি সহজে আমার বাসনা নিবৃত্তির উপায় করিয়া না দেও, তাহা হইলে, আমি বল প্রয়োগ দ্বারা আমার বাসনা পূরণ করিব। যদি এখন স্বয়ং ভগবান্ স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া আমাকে নিরস্ত হইতে উপদেশ দেন, তাহাও আমি শুনিব না। বারো বৎসরের চেষ্টায় যে সুযোগ আজি আমি লাভ করিয়াছি, তাহা কদাপি পরিত্যাগ করিব না।"

এই বলিয়া সেই পশু তখন সুরবালার নিকটস্থ হইল। সুরবালা সভয়ে দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া, সে ব্যস্ততা সহ দ্বার রুদ্ধ করিল; তাহার পর বলিল,—

"এখনও বলিতেছি, সুরবালা, যদি তুমি স্বেচ্ছায় আমার এই লোলুপ হৃদয়কে শীতল করিতে সম্মত না হও, যদি তুমি আমার এই মত্ততা দেখিয়া দয়ার্দ্র না হও, তাহা হইলে আমি বলপূর্ব্বক তোমাকে আমার আয়ত্তাধীন করিব। আমার শরীরে এখন আসুরিক বল! কাহার সাধ্য আমাকে নিরস্ত করে?"

তখন রোষকষায়িত-লোচনা সুরবালা বলিলেন,—

'পাষণ্ড নরাধম তুই নিরাশ্রয় অবস্থা হইতে, আমার পিতৃ-অন্নে পালিত হইয়া আমার স্বামীর অকৃত্রিম বন্ধুরূপে পরিগণিত হইয়া আজি বিশ্বাসের এইরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিতেছিস্? ধর্ম্ম, লোকলজ্জা, কৃতজ্ঞতা সকলই তুই আজি বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছিস্। স্বামী ভিন্ন আমার আর দেবতা নাই; আমি স্বামী ভিন্ন অন্য দেবতার কখন পূজা করি নাই। সেই সাক্ষাৎ সজীব দেবতার চরণে যদি আমার একান্ত মতি থাকে, তাহা হইলেও তোর মত শত শত নর-প্রেত একত্র হইলেও আমাকে কলুষিত করিতে পারিবে না।"

সেই পতি-প্রেম-পরায়ণা সুন্দরী শিরোমণি ভিত্তিতে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া রহিলেন। তাঁহার তদানীন্তন শোভা দেখিয়া, সেই পাষণ্ড অধিকতর মুগ্ধ ও বিমোহিত হইয়া পড়িল এবং বলিল,—

"কে তোমাকে রক্ষা করে দেখি।"

বিহারী বাহুযুগলের দ্বারা সুরবালাকে বেষ্টন করিয়া ধরিবার উপক্রম করিলে, সেই সতী প্রায় সংজ্ঞাহীনা হইয়া, তথায় বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন,—

"কে কোথায় আছ, আমাকে রক্ষা কর।"

তখন সহসা সেই প্রকোষ্ঠ যেন ঝলসিয়া উঠিল। বিহারী চমকিত হইয়া দেখিল, তাহার সম্মুখে আগুল্‌ফ লম্বিতা, অপার্থিব রূপ-সম্পন্না, এক ত্রিশূলধারিণী সন্ন্যাসিনী আরক্ত নয়নে দণ্ডায়মানা। এই অভ্যাগত প্রতিবন্ধক দেখিয়া বিহারী নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বলিল,—

"কে তুই তুই এখানে কেন আসিলি? আমার হাতে তোর মৃত্যু আছে দেখিতেছি।"

এতক্ষণে সুরবালা চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। সেই স্বর্গ কন্যাকে সম্মুখে সন্দর্শন করিয়া, তিনি বলিলেন,—

"তুমি আমার দিদি নও? দিদি, আমার এই দেহ নরকের কীটে যেন স্পর্শ না করে।"

সেই সন্ন্যাসিনী মধুর স্বরে বলিলেন,—

"ভয় কি বহিন্!"

ইত্যবসরে বিহারী, গৃহমধ্যস্থ একগাছি যষ্টি লইয়া সেই সন্ন্যাসিনীর শরীরে প্রচণ্ড আঘাত করিল। সন্ন্যাসিনী হাসিয়া বলিলেন,—

"রে ভ্রান্ত! তুই এখনই না বলের গর্ব্ব করিতেছিলি? দেখি তোর দেহে কত বল।"

এই বলিয়া সেই কুসুম-সুকুমারী বাম হস্ত দ্বারা বিহারীর দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিলেন। বিহারী তাঁহার হাত ছাড়াইবার জন্য বহুবিধ প্রযত্ন করিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। সেই কৃষকায়া সুন্দরীর দেহের শক্তি অনুভব করিয়া, সে বিস্মিত হইল এবং কোন উপায়ে তাঁহাকে নিপাত করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

তখন সেই সন্ন্যাসিনী কহিলেন,—

"তোমার কোন চেষ্টাই সফল হইবে না। তোমার জন্য জীবন্ত নরকের ব্যবস্থা হইবে।"

তদনন্তর সুরবালার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—

"উঠ দিদি আর কোন ভয় নাই।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সেই পবিত্রতাপূর্ণ শান্তিনিকেতনের একতম সুরম্য কক্ষে সুরবালা, মাধুরী ও খোকা বসিয়া আছেন। সেই কক্ষ কুসুমমালায় সজ্জিত, গন্ধ দ্রব্যের সুরভি রাশিতে আমোদিত এবং দীপমালায় উজ্জ্বলিত। শান্তি নিকেতন-বাসিনী পুণ্যশীলা নারীগণ, সুরবালাকে বেষ্টন করিয়া, বহুবিধ বিশ্রম্ভালাপে তাঁহাকে বিনোদিত করিতেছেন। তথায় তাঁহার কোনই অভাব নাই; কোন কারণেই অণুমাত্র অসুখ নাই। সেই দেবীগণের বদন হইতে যে সকল বাক্য বিনির্গত হইতেছে, তাঁহারা মধুর ভাবে অপার্থিব কোমলতা সহকারে, যে যে কথোপকথন করিতেছেন, তৎসমস্ত সুরবালার হৃদয় মনকে নিতান্ত আর্দ্র ও প্রশান্ত করিতেছে। তিনি কোথায় আসিয়াছেন, কে, কি জন্য তাঁহাকে এখানে আনিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিছুই তাঁহার মনে নাই। তিনি মনে করিতেছেন, যেন কোন পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে, নরদেহ ধারণ করিয়াও তিনি এই দিব্যলোকে আগমন করিয়াছেন। তিনি অপরিসীম সুখে নিমগ্নচিত্ত থাকিলেও এক অভাব তাঁহার প্রাণকে সময়ে সময়ে ব্যাকুলিত করিতেছে। কোথায় রমাপতি? সুরবালার পরম দেবতা, অনন্য উপাস্য, সর্ব্বগুণময় স্বামী এখন কোথায়? সেই নর-দেবতা সঙ্গে না থাকিলে, স্বর্গও সুরবালার পক্ষে নরক—স্বর্গও সুখশূন্য। সুরবালা দেবীগণের সংসর্গে অলৌকিক সুখসম্ভোগ করিলেও সেই গুণময়ের অভাবজনিত ব্যাকুলতা হেতু, মধ্যে মধ্যে তত্রত্য দেবীগণকে তদ্বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তাঁহারা তাঁহাকে প্রীতিপ্রদ আশ্বাসবাক্যে পরিতুষ্ট করিতেছেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। তখন সেই শান্তিনিকেতনের একজন দেবী, সুরবালাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"আপনি ক্লান্ত আছেন—রাত্রিও অধিক

হইয়াছে। এক্ষণে বিশ্রাম করুন। আর কোন প্রয়োজন থাকিলে, আজ্ঞা করুন।"

সুরাবালা বলিলেন,—

"ক্লান্ত যথেষ্টই হইয়া ছিলাম সত্য; কিন্তু এ স্বর্গধামে আমার সকল কষ্টই অপগত হইয়াছে। তথাপি আমার চিত্ত অস্থির রহিয়াছে। আমার সেই সর্ব্বগুণাধার, দেবতুল্য স্বামী উপস্থিত না থাকিলে, স্বর্গও আমার চক্ষে নিতান্ত অসম্পূর্ণ।"

সেই দেবী আবার বলিলেন,—

"স্বামীকে দেখিতে পাইলেই আপনার সকল অন্তর-বেদনাই অন্তর্হিত হয় কি?"

সুরবালা বিষাদ বিমিশ্রিত হাস্যের সহিত বলিলেন,—

"দেবি! আপনারা নিশ্চয়ই অন্তর্যামী। আমার প্রাণের কথা কখনই আপনাদের অগোচর নাই। আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন না কি, ইহ সংসারে সেই স্বামী-দেবতার চরণই আমার সার সম্পত্তি; সেই দেবতার সেবা ও বিনোদন আমার জীবনের একমাত্র ব্রত; সেই গুণময়ই আমার একমাত্র অভীষ্ট দেবতা। তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে, মৃত্যুই আমার অবলম্বনীয়। আপনারা আশ্বাস না দিলে, তাঁহাকে না দেখিয়া, আমি এতক্ষণ কখনই থাকিতে পারিতাম না। আপনারা সর্ব্বশক্তিসম্পন্না। আপনারা কৃপা করিয়া আমার এ যন্ত্রণা বিদূরিত করিতে পারেন না কি?"

সেই দেবী উত্তর দিলেন,—

"মা! তবে এখনই তোমার স্বামীর সহিত মিলন হউক।"

এই বলিয়া তিনি আর এক দেবীকে পার্শ্বের দ্বার খুলিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। দ্বার উন্মুক্ত হইল। সুরবালার সম্মুখে সেই দেবকান্তি রমাপতি দণ্ডায়মান। তখন সুরবালা বেগে গিয়া সেই বিশালোরস্ক পুরুষের বক্ষে মস্তক স্থাপন করিলেন; তখন সেই পুরুষবর অগ্রসর হইয়া, উভয় হস্তে সেই সুর সুন্দরীকে আলিঙ্গন করিলেন। দেবীগণ এই অবকাশে প্রস্থান করিলেন।

প্রেমিকযুগল তখন তত্রত্য আসনে উপবেশন করিলেন। রমাপতি নিদ্রিত খোকা ও মাধুরীর অঙ্গে প্রেমপুলকিতান্তঃকরণে হস্তাবমর্ষণ করিয়া, সুরবালাকে কত প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সুরবালাও একটা কথার উত্তর দিতে দিতে আবার সাতটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলেন। তাঁহাদের সে প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইলে, আমাদের স্থান সঙ্কুলান হয় না; সুতরাং সংক্ষিপ্ততার অনুরোধে, আমরা তাঁহাদের বাক্যাবলীর মর্ম্ম নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

সুরবালার কথাই আগে বলি। তিনি একাকিনী বসিয়া যেরূপে মাধু ও খোকার খেলা দেখিতেছিলেন, বিহারী যেরূপে তাহাদের সহিত খেলা করিতেছিল, তাহার পর, যেরূপ কৌশল করিয়া ঝিদের ও ছেলেদের বাসা হইতে সরাইয়া দেয়, যেরূপ উগ্রমূর্ত্তিতে সে তাঁহার সন্নিধানে আগমন করিল, তাহার পর, যে জঘন্য প্রস্তাব করিল, যেরূপে তাঁহার দয়ার সে প্রার্থী হইল, তাহার পর যে প্রকার ভয় দেখাইল, তদনন্তর যে প্রকার বল প্রয়োগে উদ্যত হইল, তখন তাঁহার অবস্থা যেরূপ হইল, রক্ষার কোন উপায় নাই দেখিয়া তিনি যেরূপ ব্যাকুল হইলেন, সে তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিবার উপক্রম করিলে, তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া যেরূপে বসিয়া পড়িলেন, তদনন্তর সহসা সেই রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে সন্ন্যাসিনী বেশে যেন স্বর্গ হইতে তাঁহার দিদি যেরূপে অবতীর্ণা হইলেন,

সেই দয়াময়ীকে বিহারী যেরূপ প্রহার করেন এবং তিনি যেরূপে বিহারীর হস্তধারণ করিলেন, ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত তিনি বর্ণনা করিলেন।

এই সকল ব্যাপার উত্তীর্ণ হইলে, বিহারীর এই দুর্ব্যবহার হেতু দারুণ মনস্তাপে এবং বিজাতীয় উৎকণ্ঠায় তাঁহার সংজ্ঞা তাঁহাকে ত্যাগ করে। তিনি মূর্চ্ছিত হওয়ার পর তাহার কি হইল, তাহা তাঁহার মনে হয় না। সেই সংজ্ঞাহীনতা কতক্ষণ স্থায়ী হয়, তাহাও তাহার মনে নাই। মধ্যে এক দিন, কি দুই দিন, কি পাঁচ দিন অতীত হইয়াছে, তাহাও তিনি জানেন না। পুনরায় যখন পূর্ণভাবে তাঁহার সংজ্ঞা আসিল, তখন তিনি পুত্রকন্যা সহ এই স্বর্গধামে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন বুঝিতে পারিলেন। কি উপায়ে তিনি এখানে আসিলেন, মাধুরী ও খোকাকেই বা কে তাঁহার সঙ্গে আনিল, বিহারীর কি হইল, ঝিরা কোথায় থাকিল, কিছুই তিনি ভাল করিয়া বলিতে পারিলেন না।

এস্থান কোথায়—ইহা কি পৃথিবীর অন্তর্গত কোন স্থান, অথবা স্বর্গরাজ্য, তাহা তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই। এখানে যে সকল দেবী বাস করেন, তাঁহাদের আকৃতি, বেশভূষা ও ব্যবহারাদি আলোচনা করিলে ইহা স্বর্গ ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না।

তাহার পর রমাপতির কথা। রমাপতি সায়ংকালে বাসায় ফিরিয়া দেখিলেন—ভবন শূন্য,—তথায় সুরবালা নাই, খোকা নাই, মাধুরী নাই, বিহারী নাই।—পাচক ও ইন্ধন ঝি অধোবদনে বসিয়া আছে। তাহারা অন্যান্য বৃত্তান্ত কিছুই বলিতে পারিল না। কেবল বলিল যে, তাহারা ঠাকুরাণীকে পীড়িতা দেখিয়াছিল। একজন সন্ন্যাসিনী তাহার নিকটে বসিয়াছিলেন, আর বিহারী বাবু শৃঙ্খলাবদ্ধ দশায় দূরে পড়িয়াছিলেন। তাহার পর তাহারা সেই সন্ন্যাসিনীর আদেশ ক্রমে, একজন জল গরম করিতে যায়, একজন নদী হইতে জল আনিতে যায় এবং একজন বাজার হইতে ধুনা আনিতে যায়। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া দেখে বাটীতে কেহই নাই। ঠাকুরাণী ও তাঁহার সন্তান, বিহারী বা সেই সন্ন্যাসিনী কেহই নাই। তাহারা দারুণ উদ্বেগে সমস্ত দিন সেই অপরিচিত প্রদেশের চতুর্দ্দিকে তাঁহাদের সন্ধান করে; কিন্তু কোনই ফল হয় না। অবশেষে তাহারা, অনাহারে ও উৎকণ্ঠায় নিতান্ত কাতর হইয়া, মৃতকল্প অবস্থায় পড়িয়া আছে।

এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রমাপতি নিতান্ত ব্যাকুল ভাবে একাকী গৃহনিষ্ক্রান্ত হন এবং কোথায় যাইলে কি হইবে তাহার কিছুই মীমাংসা না করিয়া, উন্মত্তবৎ একদিকে প্রধাবিত হইতে থাকেন দ্বারবানাদি তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে দেখিয়া তিনি বিরক্তি সহকারে তাহাদের প্রতিনিবৃত্ত হইতে আজ্ঞা করেন। তাহারা চলিয়া গেলে, তিনি দামোদর অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ অরণ্য-পথে চলিতে চলিতে, বড়তড়ে নামক ক্ষুদ্র গ্রামের সন্নিকটে উপস্থিত হন। তথায় বিজাতীয় উৎকণ্ঠায় ও যৎপরোনাস্তি দৈহিক কাতরতায়, তিনি অবসন্ন হইয়া পড়েন এবং ক্রমশঃ চেতনাবিহীন হন। তদনন্তর কি ঘটিয়াছে তাহা তাঁহার মনে নাই। যখন তাঁহার চৈতন্য উদয় হইল, তখন তিনি দেখিলেন, এই অপরিচিত স্থানে ভূর্লোকদুর্লভ এক তর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন। তিনি সংজ্ঞালাভ সহকারে "সুরবালা" "সুরবালা" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিলে, তাঁহারা তাঁহাকে এই কক্ষে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন।

এই সময়ে গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, সুরবালা বলিলেন,—

"আহা! সে দেবীরা এখন কোথায় গেলেন? তুমি তাঁহাদের দেখিতে পাইলে না! প্রাণেশ্বর! সত্যই কি আমরা স্বর্গে আসিয়াছি?"

রমাপতি বলিলেন,—

"আমিও তো এখানে আসিয়া অনেক দেবদেবীর সাক্ষাৎ পাইয়াছি। এ স্থান স্বর্গ বলিয়াই আমারও মনে হইতেছে। ইহাই কি সেই সুকুমারীর লীলাস্থল?

তাঁহারা যখন বিস্ময় সহকারে এবংবিধ আলোচনায় নিযুক্ত এবং অপার আনন্দে নিমগ্ন, তখন সেই স্থানে এক কৃষ্ণাঙ্গী, জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি, বিবিধ আহার্য্য পূর্ণ স্বর্ণ পাত্র হস্তে লইয়া, সমাগত হইলেন। ভূপৃষ্ঠে সে পদ অতি সন্তর্পণে পতিত হইতেছে, বসুধা যেন সে পাদ বিক্ষেপ জানিতেও পারিতেছেন না। তাঁহাকে দর্শনমাত্র দম্পতী সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি বলিলেন,—

"আপনারা বড়ই ক্লান্ত হইয়াছেন; এক্ষণে কিছু আহার করিয়া বিশ্রাম করুন।"

রমাপতি সবিনয়ে জিজ্ঞাসিলেন,—

"আমরা ভাগ্যবলে অমর লোকে আসিয়াছি। আমাদের আর ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই। আপনিই কি এখানকার অধিষ্ঠাত্রী?"

সেই দেবী মধুর হাস্য সহকারে বলিলেন,—

"না না, শান্তিদেবী এই পুণ্য নিকেতনের অধিষ্ঠাত্রী। এ পাপীয়সী তাঁহার দাসী।"

কি সুকণ্ঠ! কি মধুময় ভাষা! রমাপতি আবার জিজ্ঞাসিলেন,—

"তবে আপনি কে?"

দেবী উত্তর দিলেন,—

"সুরমা।"

নবম পরিচ্ছেদ।

—•—

আমরা এ পর্য্যন্ত একে একে শান্তিনিকেতনে দেবমন্দির, যোগমঠ, পুষ্পবাটিকা, কারাগার প্রভৃতি নানা স্থান দর্শন করিয়াছি। কিন্তু সকল অংশ এখনও আমাদের নেত্র-পথবর্ত্তী হয় নাই। এই সুবিশাল পুরীর এক স্বতন্ত্র অংশের নাম শাসনপুরী। তথায় যে যে ব্যাপার নির্ব্বাহিত হয়, তাহা আলোচনা করিলে, সে স্থানকে নরক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই শাসনপুরীর সহিত শান্তিনিকেতনের পরাপর অংশের নানাবিধ উপায়ে সংযোগ ও সম্বন্ধ আছে। কিন্তু সেই সকল সংযোগের ব্যবস্থা এতাদৃশ সুকৌশল-সম্পন্ন যে, সাধারণ দৃষ্টিতে তাহার নির্ণয় হওয়া সম্পূর্ণরূপ অসম্ভব। উক্ত শাসনপুরী মূল শান্তিধাম হইতে বহুদূরে অবস্থিত হইলেও, তথায় অলক্ষিত ভাবে যাতায়াতের নানাবিধ সহজ উপায় আছে এবং তত্রত্য ব্যাপার সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিবার বহুতর ব্যবস্থা আছে।

ঐ শাসনপুরী কৃষ্ণ প্রস্তর বিনির্ম্মিত ভূগর্ভান্তরগত সুবিস্তৃত ভবন। যদিও তাহা সতত ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন; তথাপি আবশ্যক হইলে, সহজেই তন্মধ্যে আলোক প্রবেশের উপায় আছে। সেই পুরী বহুদূর ব্যাপিয়া অবস্থিত এবং তাহার একাংশে যাহা সংঘটিত হয়, অপরাংশে তাহার প্রচার হয় না। সেই পুরীর নানা স্থানে নানাবিধ দণ্ড প্রয়োজনোপযোগী আয়োজন আছে।

সেই নিবিড়, অন্ধকারময় পুরের একতম কক্ষে, এক শৃঙ্খল-বদ্ধ পুরুষ অধোবদনে ভূ-পৃষ্ঠে

শায়িত আছে। তাহার কণ্ঠদেশ, বাহুদ্বয়, চরণযুগল এবং কটিদেশ লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সে ব্যক্তি শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া, মুক্তিলাভের জন্য বিস্তর বিফল প্রযত্ন করিয়াছে। অবশেষে হতাশ ও অবসন্ন হইয়া প্রায় চেতনাহীন অবস্থায় পড়িয়া আছে। বহুক্ষণ এইরূপ মৃতকল্প ভাবে পড়িয়া থাকার পর, সে একবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের প্রয়াসী হইল, কিন্তু দেহকে বিন্দুমাত্র স্থানান্তরিত করিতে সাধ্য হইল না। তখন সে নিতান্ত কাতর স্বরে বলিল,—

"মাগো! এ যাতনা আর সহে না। ইহার অপেক্ষা মরণই ভাল।"

তখন সহসা সেই সুবৃহৎ পুরী বিকম্পিত করিয়া, বজ্রগম্ভীর স্বরে প্রশ্ন হইল,—

"রে নরাধম! এখন তুই নিজ দুষ্কৃতির জন্য অনুতাপ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিস্ কি? অতঃপর তুই আপনার মনকে ধর্ম্মপথে চালিত করিতে সম্মত আছিস্ কি?"

কাহার এ অত্যুৎকট ভৈরবধ্বনি? মনুষ্য কণ্ঠ হইতে এতাদৃশ রব বিনির্গত হওয়া সম্ভবপর নহে। তখন সেই শায়িত ব্যক্তি বলিল,—

"যতক্ষণ এ দেহে জীবন থাকিবে ততক্ষণ আমি সুরবালা লাভের বাসনা পরিত্যাগ করিব না। তুমি আমার যন্ত্রণা-দায়ক। তুমি দেবতাই হও, বা প্রেতই হও, বা মানবই হও, কেন তুমি আমাকে বারংবার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করিতেছ? আমি সর্ব্ববিষয়ে ধর্ম্মপথে মনকে চালিত করিতে সম্মত আছি। কিন্তু সুরবালার আশা ত্যাগ করিতে আমার সাধ্য নাই। আমি আজীবন জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি তজ্জন্য চিরকাল অনুতাপ করিতে সম্মত আছি; কিন্তু সুরবালার লোভে আমি যাহা করিয়াছি, তাহা দুষ্কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় না। যদি আবশ্যক ও সুযোগ হয় তাহা হইলে তদপেক্ষা বহুগুণে অধিকতর দুষ্কর্ম্ম আমি মহানন্দে আবার সম্পন্ন করিব।"

সেই গম্ভীর স্বরে পুনরায় শব্দ হইল,—

"রে কৃতঘ্ন দুর্ব্বৃত্ত বিহারি, যদি এখনও তুই সাবধান হইতে না পারিস্, তাহা হইলে তোর প্রাণদণ্ড হইবে।"

বিহারী বলিল,—

"প্রাণদণ্ড! তুমি যেই হও, তুমি আমার পরম মিত্র। যদি সুরবালাকে লাভ করিতে না পারি তাহা হইলে প্রাণদণ্ডই আমার পক্ষে অতি প্রার্থনীয় সুব্যবস্থা। কিন্তু যদি যাবজ্জীবন এইরূপে থাকিলে, এক দিনও সুরবালাকে লাভ করিতে পারি, তাহাতেও আমি সম্মত আছি।"

সেই অত্যুৎকট শব্দে উত্তর হইল,—

"এখনই তোর ন্যায় নরাধমের প্রাণদণ্ড করিলে তোর প্রতি করুণা প্রকাশ করা হয়। এবার তোর জন্য যে শাস্তির ব্যবস্থা করিতেছি, তাহা সহ্য করা কাহারও সাধ্য নহে।"

বিহারী বলিল,—

"দেও, যে শাস্তি ইচ্ছা দেও। প্রাণ থাকিলে কখন না কখন সুরবালাকে লাভ করিতে পারিব, এই আশায় সকল শাস্তিই আমি সহ্য করিতে সক্ষম।"

তখন বিকট শব্দে আদেশ ব্যক্ত হইল,—

"দূতগণ! এই নরাধমকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর।"

তৎক্ষণাৎ ছয়জন কৃষ্ণকায় বিকটমূর্ত্তি পুরুষ আবির্ভূত হইল। তাহারা এরূপ ভাবে আগমন করিল, যেন তাহারা ভূতল ভেদ করিয়া উত্থিত হইল, অথবা ভিত্তি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। যাহা হউক, তাহারা আসিয়া, বিহারী যে সকল শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল, তাহার অপর প্রান্ত গুলি খুলিয়া ফেলিল। বিহারী

সেই সুযোগে একবার মুক্ত হইবার চেষ্টা করিলে, একজন এরূপ বজ্রমুষ্টিতে তাহার হস্ত ধারণ করিল যে, বিহারী নিশ্চয় বুঝিল এরূপ দৈত্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা অসম্ভব।

অতঃপর দূতগণ শৃঙ্খলাবদ্ধ বিহারীকে লইয়া চলিল। বহুদূর যাইতে যাইতে ক্রমে উত্তপ্ত বায়ু বিহারীর অঙ্গস্পর্শ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ সেই উত্তাপ উগ্রতর হইতে লাগিল। তখন দূতেরা পার্শ্বস্থ এক কক্ষের দ্বার খুলিয়া ফেলিল। তথাকার বায়ু অতিশয় উত্তপ্ত। দূতেরা বিহারীকে সেই কক্ষের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া, দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

দারুণ উত্তাপে বিহারী ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। তাহার দেহ উত্তাপে অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে কিয়ৎক্ষণ ব্যাকুলতা সহকারে আর্ত্তনাদ করিয়া, শেষে নিশ্চেষ্ট হইল।

তখন সেই বজ্রগম্ভীর নির্ঘোষে পুনরায় প্রশ্ন হইল,—

"রে হতভাগা, এখনও পাপপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিস্ কি?"

নিতান্ত বিরক্তির সহিত অবসন্ন বিহারী বলিল,—

"তুমি যেই হও, তুমি মূর্খের একশেষ। তুমি কেন বারংবার আমার সহিত পরিহাস করিতেছ? যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ ঐ বাসনা পরিত্যাগ করিতে আমার সাধ্য নাই।"

সেই বিকট শব্দে পুনরায় আদেশ হইল,—

অতঃপর তোর যে শাস্তি হইবে, তাহা মনে করিলেও শরীর শিহরিতে থাকে। দেখ্ পাপাত্মন্। এখনও অনুতাপ করিতে প্রবৃত্ত হ।"

বিহারী বলিল,—

"কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া কেহ কদাপি অনুতাপ করে না। আমার যে অপরাধে তোমরা আমাকে এইরূপে শাস্তি দিতেছ, তাহা আমার পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য। একবার কেন, সুযোগ উপস্থিত হইলে, যতক্ষণ বাসনা নিবৃত্তি না হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ আমি সেইরূপ, বা তদপেক্ষা গুরুতররূপ ব্যবহার করি। অনুতাপ! রে মূঢ় অনুতাপ কিসের?"

সেই অত্যুৎকট শব্দে আদেশ ব্যক্ত হইল,—

"দূতগণ! ইহাকে কণ্টকারণ্যে নিক্ষেপ কর!"

তৎক্ষণাৎ সেই কৃষ্ণকায় বিকটমূর্ত্তি ছয় জন দূত বিহারীকে সেই প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে আনিল এবং পূর্ব্ববৎ বহুদূর বহন করিয়া লইয়া চলিল। তাহার পর, পার্শ্বস্থ এক প্রকোষ্ঠের দ্বার মুক্ত করিয়া, তন্মধ্যে বিহারীকে ফেলিয়া দিল। সেই প্রকোষ্ঠের সর্ব্বত্র অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্মাগ্র লৌহ-শলাকা সংলগ্ন। কাতর ও দুর্ব্বল বিহারীকে সেই প্রকোষ্ঠে ফেলিয়া দিলে, তাহার পদদ্বয় অসংখ্য স্থানে বিদ্ধ হওয়ায়, সে নিতান্ত ব্যথিত হইল এবং তাড়াতাড়ি হাতে ভর দিয়া পা উঠাইতে গেল। হস্তেও তদ্বৎ যাতনা হওয়ায় সে পড়িয়া গেল। দেহের এক পার্শ্বে অসহনীয় জ্বালা হওয়ায়, সে অপর পার্শ্বে ফিরিল। হায়! অভাগা পাপীর কোথাও নিস্তার নাই। বিহারীর সর্ব্বাঙ্গ দিয়া রুধির প্রবাহিত হইতে থাকিল। সে মরণাপন্ন হইয়া পড়িয়া রহিল। কিয়ৎকাল পরে অসহ্য জ্বালায় অভিভূত হইয়া বিহারী বলিল,—

"কোথায় তুমি অদৃষ্টচর পুরুষ! আমার প্রাণ যায়—আমাকে রক্ষা কর!"

তৎক্ষণাৎ সেই বিকট স্বরে প্রশ্ন হইল,—

"এতক্ষণে, রে নরাধম! তোর হিতাহিত বোধের আবির্ভাব হইয়াছে কি? তুই অনুতাপ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিস্ কি?"

তখন কাতর বিহারী বলিল,—

"অনুতাপ করিতে পারি। কিন্তু সুরবালা লাভের বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। না না, তাহা আমার অসাধ্য। প্রাণ যায়। তুমি আমাকে রক্ষা কর।"

সেই স্বরে উত্তর হইল,—

"রে পিশাচ! এখনও তোর অদৃষ্টে আরও কঠিনতর শাস্তি আছে। এখনও তুই নিজ অপরাধ প্রণিধান করিয়া অনুতাপ করিতে প্রস্তুত নহিস্? দেখি কতক্ষণ তুই এই ভাবে চলিতে পারিস্!"

বিহারী সরোদনে বলিল,—

"না না, তুমি যেই হও, তোমার চরণে ধরি, তুমি আমাকে আর শাস্তি দিও না। তোমার বাধ্য হইতে আমার অনিচ্ছা নাই। কিন্তু তুমি অসাধ্য প্রস্তাব করিলে আমি কিরূপে পালন করি?"

সেই স্বরে আবার আদেশ ব্যক্ত হইল,—

"দূতগণ!—

বিহারী বাধা দিয়া বলিল,—

"না না—তোমার দূতগণকে আর ডাকিও না। বল আমি কি করিব আমার প্রাণ যায়। দেখিতেছি, তুমি সর্ব্বশক্তিমান—তোমার বিরুদ্ধাচারী হওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য। তুমি সুরবালার লোভ আমাকে ত্যাগ করিতে বলিও না। আর যাহা বলিবে, তাহাই আমি শুনিতে প্রস্তুত আছি।"

পুনরায় সেই স্বরে শব্দ হইল,—

"রে নরাধম! তোর অদৃষ্টের ভোগ এখনও ফুরায় নাই। তোকে আরও কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। দূতগণ! এই হত-ভাগাকে আলোকালয়ে লইয়া যাও।"

তৎক্ষণাৎ সেই বিকটাকার দূতগণ, বিহারীর রুধিরাক্ত দেহ সেই প্রকোষ্ঠ হইতে, ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

সেই শাসনপুরীর এক আলোকিত অংশে বিহারী মৃতকল্প অবস্থায় শায়িত রহিয়াছে। এক সুগঠিত কলেবর পুরুষ বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছেন। সেই পুরুষ রমাপতি। বিহারী অচেতন; সুতরাং সে জানিতে পারে নাই, কে তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত।

রমাপতি বাবু বহুক্ষণ ধরিয়া নানাপ্রকার যত্ন করিলে পর, বিহারীর দেহে চৈতন্যের আবির্ভাব হইল। সে তখন রমাপতিকে দেখিতে ও চিনিতে পারিল। রমাপতি বলিলেন,—

"ভাই! তোমার এই অবস্থা দেখিয়া আমি বড়ই কাতর হইয়াছি। কি করিলে তোমার যাতনা শান্তি হয় তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। তোমার কি এখন বড়ই কষ্ট হইতেছে ভাই?"

বিহারী বলিল,—

"কে তুমি? তুমি কি রমাপতি? তুমি কি আমার এই দুরবস্থার সময় পরিহাস করিতে আসিয়াছ? যাও তুমি! তুমি আমার পরম শত্রু। তোমার জন্য, আমি আমার চিরদিনের বাসনা সফল করিতে পাইলাম না। তুমি আসিয়া না জুটিলে; তুমি জলে ডুবিয়া আবার বাঁচিয়া না উঠিলে সুরবালার অন্য কাহারও

সহিত বিবাহ হইত। তাহা হইলে আমি, প্রকাশ্যে না হউক অপ্রকাশ্যেও সেই সুন্দরীর প্রেম উপভোগ করিতে পাইতাম। তুমি আমার পরম শত্রু। তুমি মরণাপন্ন হইয়াছিলে, আমি মনে করিয়াছিলাম, এত দিন পরে ভগবান্ কৃপা করিয়া, আমার কণ্টক দূর করিয়া দিবেন। কিন্তু কি ভয়ানক! আমাকে চিরদিন জ্বালাইবার জন্য, তুমি সে অবস্থা হইতেও বাঁচিয়া উঠিয়াছ! তোমার কি মৃত্যু নাই? তুমি আমার প্রভু, তুমি আমার প্রতিপালক, তথাপি আমি তোমার প্রবল শত্রু। যাও তুমি। তুমি এখানে মজা দেখিতে আসিয়াছ? তুমি সুখী, তুমি ভাগ্যবান্। সুরবালা তোমার আপনার। যে এত সুখী সে কি কখন দুঃখীর বেদনা জানিতে পারে? যাও ভাগ্যবান্ পুরুষ! এই হতভাগা যতক্ষণ জীবিত আছে, ততক্ষণ তোমার ভয়ানক শত্রু বর্ত্তমান। এ শত্রুর নিকট হইতে তুমি তোমার সুরবালার নিকট যাও। যে দিন তোমাকে নিপাত করিয়া সুরবালাকে অধিকার করিতে পারিব, সেই দিন আমার যন্ত্রণার শান্তি হইবে। যাও তুমি—আমার সম্মুখ হইতে পলায়ন কর।"

রমাপতি বলিলেন,—

"ভাই বিহারি! তোমার যন্ত্রণার কথা শুনিয়া আমি আন্তরিক দুঃখিত হইতেছি। বুদ্ধির দোষে তোমার এইরূপ ক্ষণিক মতিভ্রম হইয়াছে বুঝিয়া, আমি তোমার উপর বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক বরং যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইতেছি। এরূপ মতিভ্রম একটুও অস্বাভাবিক নহে। সকলেরই এরূপ পদস্খলন সম্ভব। তাহা না হইলে, তোমার ন্যায় সর্ব্বগুণে গুণান্বিত ব্যক্তিরই বা এরূপ মন হইবে কেন? তুমি আমাকে শত্রু বলিয়া মনে করিলেও, আমি তোমাকে এখনও অকৃত্রিম সুহৃদ বলিয়া মনে বিশ্বাস করি এবং তোমাকে সহোদরাধিক আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করি। তুমি সম্প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছ, লোকে তাহা অতিশয় দুষ্কর্ম্ম বলিয়া মনে করিলেও, আমি তাহা সামান্য মতিভ্রম, ক্ষণিক মোহ, এবং নগণ্য মনশ্চাঞ্চল্য বলিয়াই মনে করিতেছি। ভাই! সে ব্যবহার আমার মনেও নাই এবং কখন মনে থাকিবেও না। এক্ষণে কিসে তুমি সত্বর স্বাস্থ্যলাভ করিতে সক্ষম হইবে, ইহাই আমার একমাত্র চিন্তার বিষয়।"

বিহারী বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল,—

"রমাপতি! তোমাকে অনেক সময় লোকে দেবতা বলে। তোমার প্রকৃতি দেখিয়া তোমাকে দেবতা বলিয়াই মানিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তুমি সুরবালার স্বামী; এইজন্য আমার চক্ষে তোমার অপরাধ অমার্জ্জনীয়। আমার সহিত তোমার মিত্রতা অসম্ভব। তুমি দেব; এজন্য দেবী লাভ করিয়া সুখী হইয়াছ। আমি নারকী—দিনেকের নিমিত্ত সেই দেবী লাভের আশা করিয়া এই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। তুমি যাও, তোমার ন্যায় দেবতার এ নারকীর নিকট থাকিবার প্রয়োজন নাই।"

রমাপতি বলিলেন,—

কেন ভাই এরূপ মনে করিতেছ? কিসে তুমি নারকী, আর আমি দেবতা? তোমার শরীরে কোন গুণ নাই ভাই? তুমি কেন অকারণ কাতর হইতেছ? আমি অপরিসীম ভাগ্যবলে সুরবালার স্বামী হইয়াছি সত্য; কিন্তু ভাই তুমিও তো অপরিমান সুকৃতিবলে সেই দেবীর ভাই হইয়াছ। উভয়েরই সম্বন্ধ অতি পবিত্র—অতি নিকট। যদি তুমি সুরবালাকে যথার্থই ভাল বাস, তাহা হইলে ভ্রাতৃভাবে তাঁহাকে আদর করিয়া, তাঁহাকে যত্ন করিয়া, তাঁহাকে ভাল বাসিয়া তোমার

প্রাণের কি তৃপ্তি হয় না ভাই? তবে তোমার কিসের ভালবাসা বিহারি? সুরবালা যাহার ভগিনী, সুরবালা যাহাকে সহোদর তুল্য ভাল-বাসে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবান তুমি ভাবিয়া দেখ ভাই, যদি সুরবালা সুখে থাকে, তাহা হইলে সে সুখে তোমারও যেমন আনন্দ, আমারও তেমনই আনন্দ। সুরবালার স্বামী যদি দেবতা হয়, সুরবালার ভ্রাতাও দেবতা সন্দেহ নাই। কেন ভাই, তবে তুমি কাতর হইতেছ?"

বিহারী, অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া, বলিল,—

"ভাই রমাপতি! আমি তো মরণাপন্ন। আমার যে অবস্থা হইয়াছে, বোধ হয় আমি আর অধিকক্ষণ বাঁচিব না। তুমি আমাকে বিশ্বাস করিয়া, আমার এই মরণকালে একবার সুরবালাকে দেখাইতে পার না কি? আমার আর সামর্থ্য নাই, কোন প্রকার অত্যাচার করিতে আমি অক্ষম। এ অবস্থাতেও তুমি আমাকে বিশ্বাস করিতে পার না কি?"

রমাপতি ঈষদ্ধাস্য সহকারে বলিলেন,—

"অবশ্যই পারি—এখনই সুরবালা এখানে আসিবেন। তুমি যদি সুস্থ ও সবল থাকিতে, তাহা হইলেও তোমার প্রস্তাবে আমি একটু আপত্তি করিতাম না। তুমি সুরবালার ভাই, তুমি আমার অভিন্ন-হৃদয় বান্ধব। তোমাকে আমার এতই বিশ্বাস যে, সুরবালা যখন তোমার নিকট থাকিবেন, তখন আমরা কেহই এখানে থাকিব না। তোমার সেই ভগিনী, একাকিনী তোমার নিকট অবস্থিতি করিয়া, তোমার শুশ্রূষা করিবেন।"

এতক্ষণে বিহারীর চক্ষে জল পড়িল। সে বলিল,—

"যথার্থই রমাপতি স্বর্গের দেবতা। ধিক্ আমাকে! আমি এই দেবতার বিরুদ্ধে অত্যা-চার করিয়াছি।"

তখন সহসা শাসনপুরীর সেই অংশ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সুরবালাকে বেষ্টন করিয়া বহুতর জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তথায় আগমন করিলেন। বিহারী এই সকল দেব-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বলিল,—

"আমি যদি মহাপাপী না হইতাম, তাহা হইলে মনে করিতাম, আমার মরণকালে স্বর্গের দেবীগণ দর্শন দানে আমাকে ধন্য করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু কোথায় সে দেবী? আমার কৃপাময়ী ভগিনী সুরবালা কোথায়?"

সুরবালা অগ্রসর হইয়া বলিলেন,

"এই যে দাদা। দাদা! তোমার এত কষ্ট হইয়াছে?"

বিহারী দেখিল, তাহার সম্মুখে সেই অপাপ-বিদ্ধা, পবিত্রতাময়ী সুন্দরী সাশ্রুনয়নে দণ্ডায়-মানা।

রমাপতি বলিলেন,—

"সুরবালা! তুমি তোমার দাদার শুশ্রূষা করিতে থাক। আমরা আসি এখন।"

সুরবালার সঙ্গিনীগণ ও রমাপতি পশ্চাদা-বর্ত্তন করিবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া, বিহারী বলিলেন,—

"না না, আপনারা যাইবেন না। দয়া করিয়া এ অপবিত্র অধমের নিকটে আর একটু থাকিয়া যান।"

তাহার পর সুরবালার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—

"সুরবালা! তুমি আমার আশ্রয়-দাতার কন্যা, আমার প্রভুপত্নী। তুমি তোমার এ অন্নভোজী দাসকে চিরদিন সহোদর তুল্য স্নেহ করিয়া থাক। আমি, দারুণ দুষ্প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া তোমার প্রতি যে অত্যাচার

করিয়াছি, তাহা প্রায়শ্চিত্তাতীত এবং ক্ষমার অযোগ্য। অনন্তকাল নরক নিবাসে বা চিরদিনের অনুতাপেও আমার সে কলঙ্ক অপনীত হইবার নহে; এক্ষণে আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। দেবি! ভগিনি! জননি! আমার এ দুঃসময়ে তুমি যদি আমাকে ক্ষমা কর, তাহা হইলে আমি কথঞ্চিৎ প্রবোধ লাভ করিয়া মরিতে পারি। দিদি আমার। এরূপ অধমকে ক্ষমা করিতে তোমার প্রবৃত্তি হইবে কি?"

তখন গলদশ্রুনয়না সুরবালা বলিলেন,—

"দাদা! আমাদের ছাড়িয়া তুমি কোথায় যাইবে? আমি সেবা করিয়া যেমন করিয়া পারি তোমাকে ভাল করিব। না দাদা, তুমি ওকথা আর মুখে আনিও না। তুমি কি করিয়াছ যে, তোমাকে ক্ষমা করিতে হইবে? তোমার কোন দোষের কথা আমার মনেও নাই!

তখন সেই শয্যাশায়ী বিহারী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—

"রে নরাধম! তুই এই দেবীকে কলুষিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলি! চিরনরকই তোমার একমাত্র উপযুক্ত শাস্তি। সুরবালা, তবে দিদি, আমার মাথায় তোমার চরণ-ধূলা দেও; আমার পাপ-কলুষিত দেহ-মন পবিত্র হউক। তুমি, ব্রাহ্মণ-কন্যা, আমি কায়স্থ। আমার এমন সামর্থ্য নাই যে আমি উঠিয়া তোমার পদধূলি গ্রহণ করি।"

তখন বজ্রগম্ভীর স্বরে, সমস্ত পুরী বিকম্পিত করিয়া, শব্দ হইল,—

"সামর্থ্য আছে—তুমি যাতনা মুক্ত হইয়াছ। এ পুরী আর তোমার যোগ্য স্থান নহে। তুমি এক্ষণে শান্তিনিকেতনে গমন কর।"

বিহারী অনায়াসে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং অতীব ভক্তি সহকারে সুরবালার সমীপস্থ হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর নিরতিশয় প্রীত মনে তাহা স্বকীয় মস্তকে ও দেহের অন্যান্য ভাগে বিলেপিত করিতে থাকিলেন।

তখন তত্রত্য তাবৎ ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—

"জয় শ্যামসুন্দরের জয়!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রমাপতি ও সুরবালা শান্তিনিকেতনের সেই নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট আছেন। শান্তিনিকেতনের আর কোন অংশই তাঁহারা দেখিতে পান নাই। তাঁহাদের এই নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠ, আর শাসনপুরীর একাংশ মাত্র তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। কিন্তু কি ভয়ানক ব্যাপার! কি অলৌকিক কাণ্ড! কি স্বর্গীয় ভাব! বিহারী বাবুর নিকটস্থ হইয়া তাঁহারা যে যে ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রতীতি হইয়াছে যে, নরলোকে এতাদৃশ বিসদৃশ কাণ্ডের অভিনয় হওয়া নিতান্ত বিচিত্র কথা। বিহারীর সেই ভয়ানক শাস্তি, সুরবালার সহিত তাঁহার দর্শনেচ্ছা হইবা মাত্র সুরবালার তথায় গমন, সুরবালার সঙ্গিনীগণের অপরূপ কান্তি, অশ্রুতপূর্ব্ব ভয়ানক স্বরে বিহারীর প্রতি আদেশ, বিহারীর কাতর ও মরণাপন্ন দেহে সহসা সম্পূর্ণ শক্তিসঞ্চার প্রভৃতি ব্যাপার

সমূহ তাঁহাদিগকে যৎপরোনাস্তি অভিভূত করিয়াছে। এ স্থান যদি স্বর্গ বা স্বর্গের অংশ বিশেষ না হয়, তাহা হইলেও তত্রত্য অধিবাসিবর্গ যে দেবশক্তিসম্পন্ন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের কোনই সন্দেহ নাই। দিব্যকান্তি-বিশিষ্ট অনেক মূর্ত্তি তাঁহাদের দেখা দিয়াছেন, কিন্তু দুই এক জন ব্যতিরেকে আর কাহারও সহিত তাঁহাদের বিশেষ কথাবার্ত্তা হয় নাই। এই স্থান সংক্রান্ত কোন রহস্য-জালই তাঁহারা ছিন্ন করিতে পারেন নাই। কে এখানকার রাজা, কে পালক ও নিয়ন্তা কিছুই তাঁহারা জানেন না। তাঁহারা শুনিয়াছেন, শান্তি-দেবী এই স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রী। কিন্তু কে তিনি?

কোন বিষয়েই তাঁহাদের কোনই অসুবিধা নাই। নিয়মিত সময়ে স্নান, আহারাদির বিশেষ সুব্যবস্থা। মাধুরী ও খোকার খেলার যথেষ্ট আয়োজন। তাঁহাদের ভোগ-বিলাস-সাধনোপযোগী সামগ্রীরও অভাব নাই। কে এ সকল দেয়, কেনই বা দেয়, কোথা হইতে এ সকল সংগৃহীত হয়, এ সকল সংবাদ কিছুই জানিতে না পারিয়া, তাঁহারা নিতান্ত কৌতূহলাবিষ্ট ও বিস্ময়াকুল হইয়াছেন।

তাহার পর, তাঁহাদের বিস্ময়ের প্রধান কারণ, সুরমা দেবীর ব্যবহার। বহুক্ষণ তাঁহারা এই কথা আলোচনা করিয়া রমাপতি বলিলেন,—

"যেন ঐ দেবীর মূর্ত্তি পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া আমার এক একবার মনে হয়।"

সুরবালা বলিলেন,—

"আমারও মনে হয়, যেন আমি ঐ দেবীকে আর কোথায়ও দেখিয়া থাকিব; কিন্তু অনেক ভাবিয়াও কিছুই আমার মনে পড়িতেছে না। সংসারে এরূপ অপার্থিব রূপ-গুণ সম্পন্না দেবীর দর্শন পাওয়া নিতান্তই অসম্ভব; সুতরাং আমাদের ভ্রম হইয়াছে ভিন্ন আর কিছুই মীমাংসা হয় না।"

এইরূপ সময়ে কালোরূপে দশদিক আলো করিয়া সুরমা দেবী সেই স্থলে সমাগতা হইলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র রমাপতি ও সুরবালা ভক্তি সহকারে তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। তখন সেই দেবী, নয়ন মুদিয়া শ্যামসুন্দরকে ধ্যান করিতে করিতে বলিলেন,—

"শ্যামসুন্দর আপনাদিগকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করুন।"

তখন রমাপতি বলিলেন,—

"দেবি! আপনাদের কৃপায় আমরা এখানে সকল প্রকার সুখভোগ করিতেছি সত্য; কিন্তু আমাদের চিত্ত এই ভূর্লোকদুর্লভ স্থানের অশেষ রহস্যজাল বিচ্ছিন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া উত্তরোত্তর বড়ই অস্থির হইতেছে। আপনি কৃপা করিয়া আমাদের এই অস্থিরতা বিদূরিত করুন।"

মধুমাখা কোমল স্বরে সুরমা বলিলেন,—

"এখানে রহস্য কিছুই নাই। ইহা শান্তি-দেবীর নিকেতন। সেই দেবী সরলার একশেষ। আপনারা ক্রমশঃ জানিতে পারিবেন, শান্তি-দেবীর অলৌকিক শক্তিতে এ স্থানের সকল কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।"

সুরবালা বলিলেন,—

"কিন্তু দেবি, অন্য কথা দূরে থাকুক, আমাদের চক্ষে আপনিই যেন অশেষ রহস্য-জালজড়িতা। আপনাকে যেন আমরা কোথায় কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়; অথচ কিছুই স্মরণ করিতে আমাদের সাধ্য নাই।"

সুরমা বলিলেন,—

"এক সময়ে আমি আপনাদের বিশেষ পরিচিতা ছিলাম; আমার কথা মনে পড়া বিচিত্র নহে। শাস্তিদেবীর চরণ-ধূলায় আমার পুনর্জন্ম হইয়াছে। আমার পূর্ব্ব আকৃতির ছায়া অপগত হয় নাই। এখানে যত লোক আছেন, সকলেরই পুনর্জন্ম হইয়াছে।"

রমাপতি বলিলেন,—

"আপনি আমাদের বিশেষ পরিচিতা ছিলেন! কিন্তু দেবি! আমরা তো কিছুই মনে করিতে পারিতেছি না। এরূপ দিব্য-জ্যোতিঃ কোন মানুষের শরীরে হয় কি? না দেবি! আপনার সহিত পূর্ব্বপরিচয় নিতান্ত অসম্ভব।"

সুরমা বলিলেন,—

"আপনার দেশে, শশি ভট্টাচার্য্য নামে এক নিরীহ ব্রাহ্মণ ছিলেন মনে আছে? তাঁহার ব্যভিচারিণী পত্নী তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল মনে পড়ে? আমিই পূর্ব্ব জন্মে সেই ব্যভিচারিণী পতিহন্ত্রী ছিলাম।"

সুরবালা সবিস্ময়ে বলিলেন,—

"তবে—তবে আপনিই কি কালী?"

"কালীর মৃত্যু হইয়াছে। আমি সুরমা।"

"কিন্তু এরূপ জ্যোতিষ্মান্ পুণ্যপ্রদীপ্ত কলেবর কেমন করিয়া হইল? আপনার পূর্ব্বাকৃতির ছায়াও আপনার বর্ত্তমান দেহে আছে কি না সন্দেহ।"

সুরমা বলিলেন,—

"শ্যামসুন্দর আর শাস্তিদেবী জানেন।"

রমাপতি জিজ্ঞাসিলেন,—

"কিন্তু আপনি সেই প্রহরী-পরিবেষ্টিত কারাগার হইতে মুক্ত হইলেন কিরূপে?

সুরমা উত্তর দিলেন;—

"শাস্তিদেবীর অসাধ্য কিছুই নাই। তাঁহার কৃপা হইলে, সকলই সম্ভব।"

সুরবালা বলিলেন,—

"বস্তুতই আপনি দেবত্ব লাভ করিয়াছেন এবং বস্তুতই আপনাকে দর্শন করিয়া আমাদের দেবদর্শনের ফল হইয়াছে। কিন্তু দেবি! কিরূপে আপনার এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল?"

সুরমা বলিলেন,—

"শাস্তিদেবীর এই রাজ্যে বিচিত্র ব্যবস্থা। এখানে কাহারও বা আগমনমাত্র পুনর্জন্ম হয়; কাহারও বা তাঁহাকে দর্শনমাত্র পুনর্জন্ম হয়; কাহারও বা শাসন-পুরীতে বিহারীর ন্যায় শাস্তি ভোগ করার পর, পুনর্জন্ম হয়। পুনর্জন্ম হইবার পূর্ব্বে, কালীকে শাসনপুরীতে বহুদিন বাস করিতে হইয়াছিল। শাস্তিদেবী কৃপা করিয়া কালীকে বিনষ্ট করিয়াছেন; তাহার অন্তরাত্মা ধৌত করিয়াছেন।"

রমাপতি জিজ্ঞাসিলেন,—

"আমরা শাসন-পুরীতে যে বজ্র গম্ভীর শব্দে অলৌকিক আদেশ শ্রবণ করিয়াছি, সে শব্দ কাহার?"

সুরমা ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া বলিলেন,

"তিনি ভগবান্। শাস্তিদেবীর কর্ম্মে ভগবান্ সহায়।"

তখন সুরবালা বলিলেন,—

"কিন্তু দেবি! আমাদের ভাগ্যে কি শাস্তি-দেবীর দর্শনলাভ ঘটিবে না? কোন্ পুণ্য ফলে সেই ভগবতীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতে পারে?"

সুরমা বলিলেন,—

"অবশ্য ঘটিবে। যে পুণ্যফলে শাস্তিদেবীর সহিত সম্মিলন হয়, তাহা আপনাদের প্রচুর প্রমাণে আছে।"

সুরবালা বলিলেন,—

"তবে কোথায় তিনি? কোথায় গেলে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব?"

সুরমা বলিলেন,—

"এই যে।"

তখন সেই কক্ষমধ্যে অনন্ত আলোক-প্রভা, হৈমময়ী, হসন্মুখী, শান্তিদেবীর আবির্ভাব হইল। তখন সুরবালা গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—

"কোন্ পুণ্যবলে, আমার সশরীরে ভগবতী সন্দর্শন ঘটিয়াছে। যাহার দিদি ভগবতী, না জানি তাহার কি অপরিসীম সুকৃতি!"

রমাপতি কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—

"সুকুমারি। তুমি যে দেবত্ব লাভ করিয়াছ তাহা আমি অনেক দিন জানিতে পারিয়াছি। যে অধম এই ভগবতীকে এক সময়ে আমার বলিয়াছে, তাহার কি অপরিসীম পুণ্য? সুকুমারি! আমরা স্বর্গে আসিয়াছি; আর যেন এ স্বর্গ হইতে নরকে যাইতে না হয়; আর যেন আমাদের তোমার সম্মুখ হইতে কোথায় যাইতে না হয়।"

বহুক্ষণ নয়ন মুদিয়া গুরু-চরণ চিন্তা করার পর, শান্তি বলিলেন,—

"সুকুমারী বারো বৎসর পূর্ব্বে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। আমি শান্তি। আপনাদেরই। যদি আমার সান্নিধ্যে আপনারা সুখী হন, তাহা হইলে ভগবান্ অবশ্যই আপনাদের সম্বন্ধে সুবিচার করিবেন। আপনারা দেব দেবী। দেবসেবাই এই স্থানের ব্যবস্থা। শান্তি আপনাদের দাসী।"

তখন মাধুরী ও খোকা খেলা ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল এবং দুইজনে, কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া শান্তিদেবীর দুই হস্ত ধারণ করিল। তদনন্তর সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহারা সেই পবিত্রতাপূর্ণ সৌন্দর্য্যসার বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মঞ্জুল হাস্য সহকারে সেই দেবী তাহাদের প্রতি প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তখন খোকা বলিল—

"ধূ—ধূ! ঠাকুল—নয়?"

মাধুরী উত্তর দিল,—

"না রে, এ এক রকম দুগ্‌গা।"

খোকা তখন সুরবালার সমীপে আসিয়া বলিল,—

"মা মা, ডুগ্‌গা—জেন্ট—নলে!"

সুরবালা বলিলেন,—

"প্রণাম কর বাবা!"।

খোকা প্রণাম না করিয়াই আবার সেই দেবীর নিকট আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিল এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল,—

"টুমি ডুগ্‌গা টাকুল?"

তখন প্রেমময়ী শান্তিদেবী, হাস্যমুখে মাধুরী ও খোকাকে উভয় অঙ্কে গ্রহণ করিয়া, বলিলেন,—

"না বাবা আমি তোমাদের আর একটা মা।"

যখন শান্তিদেবী উভয় অঙ্কে এই ভুবনমোহন শিশুদ্বয়কে গ্রহণ করিলেন, তখন আর শোভার সীমা থাকিল না। প্রেমে সকলের কলেবর পুলকিত হইল। প্রেমময়ীর প্রেমলীলার তখন অভিনয় কি না!

তখন সুরমা বলিলেন,

"ভগবতি! অনুমতি কর, আমার ছেলে মেয়েকে এই সুসংবাদ দিতে যাই!"

শান্তি বলিলেন,

"চল সুরমে, আমরা সকলেই শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিতে যাই।"

তখন খোকা ও মাধুরীকে বক্ষে ধারণ করিয়া শান্তিদেবী অগ্রসর হইলেন! তাঁহার একদিকে রমাপতি ও অপর দিকে সুরবালা চলিলেন। সর্ব্বশেষে সুরমা দেবী। সকলেরই দেহ কণ্টকিত—নয়নে প্রেমাশ্রু।

এইরূপে তাঁহারা সেই অতি সুবিস্তৃত ভবনের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণপ্রদেশে অবতীর্ণ হইলে, হরিমন্দিরে দামামা বাজিয়া উঠিল এবং আনন্দ কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত হইতে লাগিল। তখন দিব্যমূর্ত্তিধারী বহুতর দেবদেবী, বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত হইয়া, শান্তিদেবীর পথাবরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। তখন শান্তিদেবী সেই শিশুদ্বয়কে অঙ্কে ধারণ করিয়া, মুদ্রিত নয়নে একান্ত মনে গুরুচরণারবিন্দ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন সেই পুণ্যশ্লোক নরনারীগণ, শান্তি দেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, অপূর্ব্ব স্বরসংযোগে ভগবতীর স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দেবদেবীগণের স্তোত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানানন্দ যোগী সেই স্থলে সমাগত হইলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র দেবদেবীগণ, আন্তরিক ভক্তি সহকারে ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়া, প্রণাম করিলেন। শিশুদ্বয়কে ক্রোড়ে লইয়াই শান্তিদেবী প্রণতা হইলেন এবং রমাপতি ও সুরবালা, ভগবান্ সম্মুখস্থ হইয়াছেন ভাবিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

"শ্যামসুন্দর তোমাদের মঙ্গল করুন।"

এই বলিয়া জ্ঞানানন্দ সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তাহার পর, অঙ্গুলি-সঙ্কেতে রমাপতিকে দেখাইয়া, শান্তিদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"মা! এই পুরুষ তোমার কে?"

শান্তি বলিলেন,—

"প্রভো! এই পুরুষ আমার কেহই নহেন।"

তাহার পর সুরবালাকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"মা! এই নারী তোমার কে?"

"প্রভো! এই নারী আমার কেহই নহেন।"

তাহার পর মহাপুরুষ আবার জিজ্ঞাসিলেন,

"মা! তোমার ক্রোড়স্থ শিশুদ্বয় তোমার কে?

"প্রভো! এই শিশুদ্বয় আমার কেহই নহে।"

আবার মহাপুরুষ জিজ্ঞাসিলেন,—

"মা! এই পুরুষ তোমার কে?"

"প্রভো! এই পুরুষ আমার সর্ব্বস্ব।"

"মা! এই নারী তোমার কে?"

"প্রভো! এই নারী আমার সর্ব্বস্ব।"

"মা! ঐ শিশুদ্বয় তোমার কে?"

"প্রভো! ঐ শিশুদ্বয় আমার সর্ব্বস্ব।"

মহাপুরুষ আবার জিজ্ঞাসিলেন,—

"তবে মা! বল শ্যামসুন্দর তোমার কে?"

শান্তি বলিলেন,—

"বুঝাইয়া বলিতে পারি না, কে? স্বতন্ত্র-রূপে চিন্তা করিতে না পারিলে, স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি হয় না। শ্যামসুন্দর বুঝি আমার সকলই অথবা স্নেহই নহেন।"

মহাপুরুষ বলিলেন,—

"বৎসে! এ অসার সংসারে তুমিই সার। এ সংসারে যে তোমাকে চিনিয়াছে, সে সকলই চিনিয়াছে।

"ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা।
লজ্জাপুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ॥"

তখন রমাপতি, মহাপুরুষের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিলেন,—

"ভগবন্! এই শান্তি-নিকেতনে এ অধমদের স্থান হইবে তো?"

মহাপুরুষ বলিলেন,—

"তোমরা দেবতা। তোমাদের নিষিদ্ধ স্থান কোথায়ও নাই। কিন্তু তোমাদের কর্ত্তব্য এখনও অসমাপ্ত। অতএব বৎস, তোমাদের জন্ম আপাততঃ অনুরূপ ব্যবস্থা হইবে।"

সুরবালা, শান্তিদেবীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, নীরবে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেছিলেন।

মহাপুরুষ বলিলেন,—

"চল সকলে হরিমন্দিরে যাই।"

তখন মৃদঙ্গ, দামামা, করতাল, তূরী, ভেরী প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজিয়া উঠিল এবং 'জয় শ্যামসুন্দরের জয়।' শব্দে দশদিক্ নির্ঘোষিত হইয়া উঠিল।

অগ্রে জ্ঞানানন্দ, তৎপশ্চাতে শান্তি, তৎপশ্চাতে রমাপতি ও সুরবালা এবং উভয় পার্শ্বে দেবদেবীগণ মিলিত হইয়া, সেই হরিমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্যামসুন্দরের অপরূপ রূপ দেখিয়া, রমাপতি ও সুরবালা বিমোহিত হইলেন।

তখন সেই মহাপুরুষ করযোড়ে অলৌকিক সুস্বরে গান করিলেন,—

"পীতাম্বরং ঘনশ্যামং দ্বিভুজং বনমালিনম্।
বর্হিবর্হাকৃতাপীড়ং শশিকোটিনিভাননম্॥
ঘূর্ণায়মাননয়নং কর্ণিকারাবতংসিনম্।
অভিতশ্চন্দনেনাথ মধ্যে কুঙ্কুমবিন্দুনা॥
রচিতং তিলকং ভালে বিভ্রতং মণ্ডলাকৃতম্।
তরুণাদিত্যসঙ্কাশং কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতম্॥
ঘর্ম্মাম্বুকণিকারাজদ্দর্পণাভ কপোলকম্।
প্রিয়ামুখার্পিতাপাঙ্গ লীলয়াচোন্নতভ্রুবম্॥
অগ্রভাগন্যস্তমুক্ত স্ফুরদুচ্চসুনাসিকম্।
দশনজ্যোৎস্নয়া রাজৎপকবিম্বফলাধরম্॥"

সেই মৃদুগম্ভীর সঙ্গীতধ্বনি সর্ব্বত্র আনন্দ ও পবিত্রতা বিকীরণ করিতে করিতে শূন্যে মিশিয়া গেল। যে সৌভাগ্যবানের কর্ণকুহরে সে অপার্থিব ধ্বনি প্রবেশ করিল সে মহানন্দে মগ্ন হইল।

সঙ্গীত সমাপ্ত হইবামাত্র জ্ঞানানন্দ, করতালি দিতে দিতে, নৃত্য আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মানবের অক্ষম লেখনী শোভার পূর্ণচিত্র প্রদান করিতে অশক্ত। একে একে অন্যান্য দেবদেবীগণ, রমাপতি সুরবালা, এবং মাধুরী ও খোকাও সেই নৃত্যে যোগ দিলেন। অহো! কি রমণীয়! কি হৃদয়োন্মাদকর! তখন নয়নজলে রমাপতি ও সুরবালার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। নবজীবন প্রাপ্ত বিহারী, অভিরাম ও নারায়ণ, অলক্ষিত ভাবে সেই জনতার মধ্যাগত হইয়া, উভয় হস্তে তত্রত্য রজঃপুঞ্জ স্ব স্ব কলেবরে প্রলেপিত করিতে-

ছেন। সেই মহাপুরুষ তখন প্রেমপূর্ণ স্বরে ডাকিলেন,—

"রমাপতি!"

রমাপতি উত্তর দিলেন,—

"দয়াময়!"

"তোমার প্রথমা স্ত্রী কোথায়?"

"আমার সর্ব্বাঙ্গে। আমার হৃদয়, মন, দেহ, আত্মা সকলই শান্তিময়। সুকুমারী এখন শান্তিরূপে আমার প্রাণ শীতল করিতেছেন।"

"আর তাঁহার বিরহে তুমি কাতর নহ?"

"প্রভো! তাঁহার নিকটেই থাকি বা দূরেই থাকি, তাঁহার সহিত আর বিরহ হইবার নহে। এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সম্মিলন আমাদের কখন ছিল না। ভগবন্! আপনার কৃপায় আজি আমরা ধন্য হইয়াছি।"

তখন মহাপুরুষ বলিলেন,—

"তবে আইস শান্তি! আমরা কায়মনোবাক্যে তোমার পূজা করি। এ পাপ-তাপ-পূর্ণ বসুন্ধরায় কেবল তুমিই একমাত্র নিষ্কাম ও উপাস্য। তোমার করুণা লাভ করিলে, জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না; ব্যাধি ও বৈকল্য থাকে না; জরা মরণ থাকে না। তুমিই আশ্রয়, তুমিই সুখ, তুমিই স্বর্গ। তুমি চিরদিনই সুকুমারী—তুমি চিরদিনই রমাপতির হৃদয়-রত্ন—তুমি চিরদিনই সুরবালার আনন্দধাম। প্রেমময়ি! কবে তোমার প্রেমে বিমোহিত হইয়া, বসুন্ধরার তাবল্লোক তোমার শান্তি-নিকেতনে আশ্রয় গ্রহণ করিবে?"

"যথা নিত্যো হি ভগবান্ নিত্যা ভগবতী তথা।
স্বমায়য়া তিরোভূতা তত্রেশে প্রাকৃতে লয়ে॥
আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং সর্ব্বং মিথ্যৈবং কৃত্রিমম্।
দুর্গা সত্য স্বরূপা সা প্রকৃতির্ভগবান্ যথা॥
সিদ্ধৈশ্বর্য্যাদিকং সর্ব্বং যস্যামস্তি যুগে যুগে।
সিদ্ধ্যাদিকে ভগো জ্ঞেয়স্তেন ভগবতী স্মৃতা॥"

অতঃপর আমরা ব্রহ্মবাক্যে গ্রন্থ সমাপ্ত করি—

ইয়ং যা পরমেষ্ঠিনী বাগ্দেবী ব্রহ্মসংশিতা।
যয়ৈব সসৃজে ঘোরং তয়ৈব শান্তিরস্তু নঃ॥
ইদং যৎ পরমেষ্ঠিনং মনো বা ব্রহ্মসংশিতম্।
যেনৈব সসৃজে ঘোরং তেনৈব শান্তিরস্তু নঃ॥
ইমানি যানি পঞ্চেন্দ্রিয়াণি মনঃ ষষ্ঠানি
মে হৃদি ব্রহ্মণা সংশিতানি।
যৈরেব সসৃজে ঘোরং তৈরেব শান্তিরস্তু নঃ॥
—অথর্ব্ববেদ সংহিতা।

(পরব্রহ্ম সম্পাদিতা এই যে পরমেষ্ঠিনী বাগ্দেবী, যাঁহার দ্বারা বিপদেরই সৃষ্টি করিয়া থাকি তাঁহারই দ্বারা আমাদের শান্তি হউক।

পরব্রহ্ম সম্পাদিত এই যে পরমেষ্ঠী মন, যাহার দ্বারা বিপদেরই সৃষ্টি করিয়া থাকি, তাহারই দ্বারা আমাদের শান্তি হউক।

পরব্রহ্ম সম্পাদিত এই যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও ষষ্ঠ মন, যাহাদের দ্বারা বিপদেরই সৃষ্টি করিয়া থাকি, তাহাদেরই দ্বারা আমাদের শান্তি হউক।)

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

পাঠকগণের অবিদিত নাই যে প্রথিতনামা শ্রীযুক্ত উইল্কি কলিন্স্ প্রণীত 'উমান্ ইন্ হোয়'ইট্' নামক উপন্যাস অবলম্বনে 'শুক্লবসনা সুন্দরী' লিখিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের জীবিত উপন্যাস-লেখকগণের মধ্যে কলিন্সের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট। তাঁহার উপন্যাস সমূহ অত্যদ্ভুত রহস্য-জালে জড়িত। পাঠক যাহা ভাবেন নাই, একবারও যাহা মনে করেন নাই, চতুর-চূড়ামণি কলিন্স্ স্বীয় উপন্যাসে তাদৃশ অচিন্তিতপূর্ব্ব ফলাফলের অবতারণা করিয়া, পাঠক-পাঠিকাকে বিস্ময়-সংবলিত আনন্দ রসে পরিপ্লাবিত করিয়া দিতে বিশেষ নিপুণ। এতাদৃশ অদ্ভুত রহস্য সৃষ্টি করিতে একাগ্রচিত্ত থাকিয়াও, মহাত্মা কলিন্স্ কুত্রাপি উপন্যাসোচিত শিক্ষা ও সুনীতি সম্বন্ধে হীন-যত্ন হন নাই; প্রত্যুত ইহা সামান্য গৌরবের কথা নহে।

কলিন্সের যাবতীয় উপন্যাসই হৃদয়-উন্মাদকারী রহস্যের ভাণ্ডার। বিশেষতঃ তাঁহার 'উমান্ ইন্ হোয়াইট্' আমার চক্ষে বড়ই প্রীতিপ্রদ। এরূপ আশ্চর্য্য কৌতূহল-জনক গ্রন্থ, বঙ্গভাষার কথা দূরে থাকুক, উপন্যাসের সমুদ্র-স্বরূপ ইংরাজি ভাষাতেও নাই। ইংলণ্ডের ইদানীন্তন কালের সর্ব্ব-প্রধান সাহিত্য-বিশারদ শ্রীযুক্ত হেন্‌রি মর্লি, স্বপ্রণীত 'ইংলিস্ লিটরেচর ইন্ দি রেন্ অব ভিক্টোরিয়া' নামক বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য-সমালোচন গ্রন্থে, লিখিয়াছেন যে, "Wilkie Collins" 'Womanin White' remains perhaps the most famous example of that skill in the construction of a peculiar form of plot which excited at last the emulation of Charles Dickens and he was in 'Edwin Drood' a follower of his friend Wilkie Collins."

উপন্যাসজগতের রাজা, অপরিসীম যশঃ-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন এবং অতুলনীয় ক্ষমতাশালী মহাত্মা চার্লস ডিকেন্সও স্বীয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত উইল্কি কলিন্সের পদাঙ্কানুসরণের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, ইহার অপেক্ষা গৌরবের কথা আর কি হইতে পারে?

কলিন্সের এই পুস্তকের ও অন্যান্য কোন কোন পুস্তকের প্রণালী সম্পূর্ণ নূতনবিধ। পাত্র-পাত্রীর নিজ নিজ উক্তিতেই এ উপন্যাস পরিপুষ্ট। আমাদের শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'রজনী' উপন্যাসে এই প্রণালীর অনুকরণ করিয়াছেন।

ভাষার শ্রী-বৃদ্ধি সাধনার্থ, এবংবিধ অত্যুপাদেয় পুস্তকের অনুবাদ নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য বিবেচনায়, আমি এই গুরুভার স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছি। এই গ্রন্থ ভাষান্তরিত করিবার সময়ে আমাকে সর্ব্বত্র বড়ই স্বাধীনতা প্রকাশ করিতে হইয়াছে। বিজ্ঞব্যক্তিগণ আমার তাদৃশ স্বাধীনতায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।

উদার-চিত্ত উইল্কি কলিন্স্ মহাশয়কে প্রকাশ্যরূপে ধন্যবাদ প্রদান করিতে আমি বাধ্য এবং এই তাহার সুন্দর সুযোগ। তাঁহার গ্রন্থানুবাদ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, তিনি আমাকে যে উত্তর প্রেরণ করিয়াছিলেন নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল—

90, GLOUCESTER PLACE,
Portman Spuare, W.

LONDON, Friday 16th November, 1883.

DEAR SIR,—I should be insensible indeed if I have not read your welcome let'er with feelings of pride and pleasure. With perfect sincerity I can say that I regard your proposal to translate my works in to the Bengali language as confer-ring on me one of the greatest distinctions of my literary life. The course of your labours will be followed by me with true interest—and any assistance which it may be within my power to render to you is offered with all my heart.

Let me next thank you for the presentation copies of your works of fiction, and for the opinions of the Press. Your novels are placed in a bookcase, side by side with my copies of my own works. I cannot doubt that I gain a special advanatge by Possessing a translator who is also a literary colleague.

With esteem and regard,
Believe me.

DEAR SIR,
Faithfully yours
(Sd.) WILKIE COLLINS.

To
DAMODAR MUKERJI Esqr.
&c. &c. &c.

এরূপ উদারভাবে আমাকে পত্র লেখায় আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। বিনয় ও শীলতা, জ্ঞান ও বুদ্ধির চিরসহচর।

শ্রীদামোদর দেবশর্ম্মা

শুক্লবসনা সুন্দরী।

প্রথম ভাগ।

দেবেন্দ্রনাথ বসুর কথা।

(বয়স—২৫ বৎসর। ব্যবসায়—শিক্ষকতা।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বৈশাখ মাস শেষ হয় হয় হইয়াছে। ওঃ! কি প্রচণ্ড গ্রীষ্ম বৃষ্টির নাম নাই। পৃথিবী যেন শুষ্ক, আমার শরীরও শুষ্ক, আর বলিতে কি আমার হাতও শুষ্ক—হাতে একটীও পয়সা নাই।

এক খানি বই খুলিয়া বসিয়াছিলাম। পড়িব কি মাথা মুণ্ড—শরীরেও সুখ নাই, মনেও সুখ নাই। বই বন্ধ করিয়া সন্ধ্যার সময় উঠিলাম। ভাবিলাম কলিকাতার জনাকীর্ণ রাস্তায় দুই দণ্ড বেড়াইয়া আসি।

এখানে বলা আবশ্যক, এ পৃথিবীতে আমার আপনার বলিতে কেহই নাই। মা বাপ অনেক দিন পৃথিবীর সম্বন্ধ ছাড়িয়া গিয়াছেন, ভাই ভগ্নী কেহই নাই, কাজেই আমি একা। কেবল এক ব্যক্তি অকৃত্রিম প্রণয়-ডোরে আমাকে বাঁধিয়া ছিলেন। তাঁহার নাম রমেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পূর্ব্ব বঙ্গে তাঁহার নিবাস। তিনি আমার ন্যায় নিতান্ত বেকার বা দুরবস্থাপন্ন নহেন। দুই একটী ভদ্র লোকের বাটীতে শিক্ষকতা করিয়া তিনি দশ টাকা উপায় করেন। তাহাতেই তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। লোকটী অতি সরল, অতি আমোদী এবং অতি পরোপকারী। একবার তিনি বড় বিপদাপন্ন হইয়াছিলেন; তাঁহার প্রাণ যায় যায় হইয়াছিল। আমি সেই সময় যথাসম্ভব যত্নে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলাম। এই ক্ষুদ্র ঘটনা স্মরণ করিয়া, তিনি নিয়ত আমার প্রতি বড়ই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। আর উভয়ের উপজীবিকাও প্রায় এক রকম। সেজন্যও পরস্পরের হৃদয়ে সহানুভূতি ছিল। অদ্য পথে বাহির হইয়া কিয়দ্দুর যাইতে না যাইতেই রমেশের সহিত সাক্ষাৎ হইল। দেখিলাম তিনি ব্যস্ত হইয়া চলিয়া আসিতেছেন। আমাকে দেখিবামাত্র তাড়াতাড়ি আসিয়া তিনি আমার গলা জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন—"ভাই দেবেন্! বড় সু-খবর—বড় সু-খবর।"

আমি বলিলাম,—"কর কি রাস্তার মাঝখানে? গলা ছাড়! কি সু-খবর?"

রমেশ বলিলেন,—"ধন্য জগদীশ্বর! তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ তাহার সীমা

নাই। আমি হতভাগ্য তোমার কোন উপকারেই লাগি না।”

আমি বলিলাম,—“তুমি অনাবশ্যক গৌরচন্দ্রিকা ছাড়িয়া দিয়া কাজের কথা বল দেখি।”

রমেশ বলিলেন,—“তাই ত বলিতেছি। আমি যদি তোমার সামান্য মাত্র কাজেও লাগি, সেও আমার পরম আনন্দ। আমি যে খবর দিতেছি,—”

আমি বাধা দিয়া বলিলাম,—“খবর দিতেছ কই? কেবল বৃথা বকামি করিতেছ। তোমার খবর মিছা কথা। চল, বেড়াইয়া আসি।”

রমেশ বলিলেন,—“কি? খবর মিছা কথা? খবরের প্রমাণ আমার পকেটে।”

এই বলিয়া রমেশ পকেট হইতে একখানি কাগজ টানিয়া বাহির করিলেন এবং বলিলেন,—“খবর মিছা কথা? খবরের প্রমাণ আমার হাতে। আমি যে খবর দিতেছি, তাহা বিশেষ ভাল বল বা নাই বল, আমি বলি সে খবর খুব সু-খবর। সেই জন্যই আমার পরম আনন্দ। আমার দ্বারা সে কাজটি ঘটিতেছে, ইহাতে আমার আরও আনন্দ।”

আমি বলিলাম,—“তুমি এতও বকিতে পার। তোমার দ্বারা কিছুই ঘটে নাই। যে এত বকা তাহার দ্বারা কি কোন কাজ হয়?”

রমেশ বলিলেন,—“কি! হয় না? এই দেখ।”

এই কথা বলিয়া রমেশ হস্তস্থিত পত্র আমার হস্তে প্রদান করিলেন। আমি পত্র খুলিয়া পাঠ করিলাম,—

“এতদ্দ্বারা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে, খোরাকী ও বাসা খরচ বাদে, মাসিক ১০০৲ একশত টাকা বেতনে আমার বাটীতে থাকিয়া বালিকাগণের শিক্ষকতা ও তদনুরূপ অন্যান্য কার্য্য করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিলাম।

“তিনি শীঘ্র আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করেন ইহাই অনুরোধ। ইতি।

“শ্রীরাধিকাপ্রসাদ রায়।
‘আনন্দধাম’—শক্তিপুর।”

আমি পত্র পাঠ করিয়া অবাক্ হইলাম—ব্যাপারটা কি বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম,—“কাণ্ডটা কি রমেশ?”

রমেশ বলিলেন,—“সামান্য কথা। তোমার যেরূপ গুণ, যেরূপ ক্ষমতা, তাহাতে একার্য্য তোমার পক্ষে অতি সামান্য। সামান্যই হউক, আর বড়ই হউক, আমার যত্নে তোমার যে একটুও উপকার হইল, ইহা আমার বড় আহ্লাদ।”

আমি বলিলাম,—“তা বেশ। এখন এ ব্যাপারটা কি আমাকে বল।”

রমেশ বলিলেন,—“ব্যাপার তো তুমি নিজ চক্ষেই দেখিলে। তবে কখন শক্তিপুর যাইবে বল।”

আমি বলিলাম,—“না জানিয়া শুনিয়া যাইব কিনা কেমন করিয়া বলি?”

রমেশ চক্ষু বিস্তৃত করিয়া বলিলেন,—“সে কি? জানিবে কি? শক্তিপুরের সুবিখ্যাত জমিদার, ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী, সুপ্রতিষ্ঠিত রাধিকাপ্রসাদ রায়ের কথা কে না জানে?”

আমি বলিলাম,—“আমি রাধিকাপ্রসাদ রায়ের নাম জানি, তিনি একজন বড় জমিদার তাহাও আমি শুনিয়াছি এবং তাঁহারা সপরিবারে যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তাহাও আমার অবিদিত নাই। আমি তোমাকে সে সব কথা জিজ্ঞাসিতেছি না। কেমন করিয়া এ পত্র তোমার হস্তগত হইল, কিরূপে এ কাজ যোগাড় হইল, তাহাই বল।”

রমেশ বলিলেন,—"যোগাড়—যোগাড়ের কথা কও কেন? বলি শুন। জানত তুমি, আমি কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম পরিবার ঘোষ মহাশয়দিগের বাটীতে বালক-বালিকার শিক্ষকতা করি।"

আমি বলিলাম,—"জানি, তার পর বল।"

তিনি বলিতে লাগিলেন,—"একদিন ঘোষ মহাশয়ের দুইটী অবিবাহিতা কন্যাকে আমি তদ্গত চিত্তে 'মেঘনাদ বধ কাব্য' পাড়াইতেছি। যেখানে,—

'বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারি-রাশি দুই পাশে; তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন লো সরমে।'

বলিয়া সীতা সরমার সমীপে পঞ্চবটী বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছেন, সেই স্থানে আমাদের পড়া চলিতেছে। আমি ঘোষ মহাশয়ের বালিকাদ্বয়ের সমক্ষে কখন শিখি-শিখিনী নাচাইতেছি, করভ করভী, মৃগ-শিশু প্রভৃতির আতিথ্য-সৎকার করিতেছি এবং তরুসহ নব লতিকার বিবাহ দিতেছি, আর কখন বা

'————তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী.
নব নিশাকান্ত-কান্তি————

কেমন করিয়া দেখা যায় বুঝাইতেছি। পড়া খুব চলিতেছে। এমন সময় আমাদের ঘোষ মহাশয় বলিলেন,—'রমেশ বাবু, একটা কথা আছে।' আমরা হঠাৎ তাঁহার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম, তিনি যে কখন সেখানে আসিয়াছেন, তাহা আমরা কেহই জানিতে পারি নাই। তিনি আপনি বলিলেন,—'আমি অনেকক্ষণ আসিয়াছি। পাছে আপনার ব্যাখ্যার ব্যাঘাত জন্মে বলিয়া এতক্ষণ শব্দ করি নাই।' আমি বলিলাম,—'আমাকে কি বলিবেন? উঠিব কি?' তিনি বলিলেন,—'শক্তিপুরে আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয় তাঁহার বাটীর দুইটী মেয়ের জন্যএকজন সুযোগ্য সৎস্বভাবাপন্ন শিক্ষক পাঠাইয়া দিতে বলিয়াছেন। আপনার সন্ধানে এরূপ কোন লোক আছে কি?' বলা বাহুল্য যে, তোমার কথা আমার মনে গাঁথাই ছিল। আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম। বলিলাম,—'অতি সচ্চরিত্র সুযোগ্য লোক আমার সন্ধানে আছেন।' তিনি আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন,—'আপনি আমাকে একটা বিশেষ উৎকণ্ঠা হইতে নিষ্কৃতি দিলেন দেখিতেছি। লোকের জন্য আমি কয় দিন বড় চিন্তা করিতেছি। পূর্ব্বে আপনাকে বলিলে হয়ত এতদিন লোক স্থির করিয়া পাঠান পর্য্যন্ত হইয়া যাইত। আপনি যখন শিক্ষক মহাশয়কে বিশেষ সচ্চরিত্র এবং সুযোগ্য লোক বলিয়া জানেন, তখন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই তবে পরের কাজ এবং আমাকে দায়ী থাকিতে হইতেছে, সুতরাং একটু বিশেষ করিয়া জানা মন্দ নয়। আপনি যে লোকের কথা বলিতেছেন তাঁহার কোন প্রশংসা পত্র আছে?' আমি বলিলাম, 'রাশি রাশি' তিনি বলিলেন,—'আপনি যদি দয়া করিয়া তাঁহার দুই এক খানি প্রশংসা পত্র আমাকে দেখান তাহা হইলে বড় উপকৃত হইব। কল্য আসিবার সময় লইয়া আসিবেন কি?' আমি বলিলাম,—'কল্য কেন, আমি অদ্যই আপনাকে তাহা দেখাইয়া দিব।' ঘোষ মহাশয় বলিলেন,—'তাহা হইলে তো আরও ভাল হয়। বিদেশে যাইতে তাঁহার মত আছে তো?' আমি বলিলাম,—'তিনি আমার বিশেষ বন্ধু। তাঁহার মতামত আমি সব জানি। বিদেশে যাইতে অথবা এ কর্ম্ম

করিতে তাঁহার কোন অমত হইবে না, তাহা বেশ জানি।' তিনি বলিলেন,—'শিক্ষক মহাশয় যখন আপনার বিশেষ বন্ধু, সুযোগ্য ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি তখন তাঁহার এ কর্ম্ম হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা।' ঘোষ মহাশয় চলিয়া গেলেন এবং আমিও চলিয়া আসিলাম—পড়িতো উঠি না। তোমার প্রশংসা পত্র আমার কাছে সবই ছিল। তখনই লইয়া গিয়া ঘোষ মহাশয়ের কাছে ধরিয়া দিলাম। ঘোষ মহাশয় দেখিয়া বলিলেন,—'আপনার বন্ধু মহাশয় অতি সুযোগ্য লোক দেখিতেছি। ইনিই কর্ম্ম পাইবেন। এত প্রশংসা পত্রের প্রয়োজন নাই। আমি দুই খানি মাত্র প্রশংসা পত্রসহ এখনই রাধিকা বাবুকে পত্র লিখিতেছি। অন্যান্য সমস্ত বৃত্তান্তও পত্রে লিখিয়া দিব। দুই দিন পরে পত্রোত্তর আসিবে; তখন সংবাদ জানিতে পারিবেন। আপনার বন্ধু দেবেন্দ্র বাবু, যখন বলা যাইবে তখনই, শক্তিপুর যাইতে পারিবেন তো?' আমি বলিলাম,—'তখনই।' ঘোষ মহাশয় পত্র লিখিতে গমন করিলেন, আমিও চলিয়া আসিলাম।

"দুই দিন উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তৃতীয় দিন আমি যখন পড়াইতে গিয়াছি তখন ঘোষ মহাশয় আসিয়া আমাকে রাধিকা বাবুর এই পত্র পাঠ করিতে দিলেন। আনন্দে আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি বলিলাম,—'আপনি আমাকে প্রতিপালন করিতেছেন, তাহাতে আমি যত উপকৃত, অদ্য আপনি আমার এই পরম বন্ধুর জীবিকার সংস্থান করিয়া দিয়া, আমাকে তদপেক্ষা অধিকতর উপকৃত করিলেন। অদ্য হইতে আপনি আমাকে কিনিয়া রাখিলেন।' ঘোষ মহাশয় শিষ্টাচার বাক্যে আমাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন,—'কল্য প্রাতে আপনার বন্ধুকে একবার সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবেন আমি তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া সুখী হইব।' আমি, 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বিদায় হইলাম। দৌড়িতে দৌড়িতে তোমার বাসায় ছুটিতেছি। পথেই তোমার সহিত সাক্ষাৎ।"

এতক্ষণে রমেশের সুদীর্ঘ বক্তৃতা শেষ হইল। রমেশের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব আমাকে মোহিত করিল। আমি বলিলাম,—"ভাই, আমি কি বলিয়া তোমাকে মনের কথা জানাইব? এ জগতে তোমার ন্যায় বন্ধু দেব-দুর্লভ সামগ্রী। তোমার বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া আমার যত আনন্দ হইতেছে, কর্ম্ম হইয়াছে বলিয়া তত আনন্দ হইতেছে না।"

রমেশ বলিলেন,—"তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ, দেবেন্, তাহার তুলনায় এ কিছুই নহে।"

কথা কহিতে কহিতে আমরা বাসায় ফিরিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে রমেশ বাবু ও আমি ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে গমন করিলাম। ঘোষ মহাশয় আমাকে যথেষ্ট আদর অপেক্ষা করিয়া প্রীত করিলেন এবং আমার পাথেয় ও অন্যান্য ব্যয়ের জন্য অর্থ ও বিহিত উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন।

আমার জুতা, বস্ত্র, প্রভৃতি যাহা যাহা কিনিবার প্রয়োজন ছিল, তৎসমস্ত ক্রয় করিবার নিমিত্ত রমেশ বাবু ভার গ্রহণ করিলেন। আমি বাসায় আসিয়া অন্যান্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম।

বেলা ২ টার সময় রমেশ বাবু আমার জিনিষ পত্র আনিয়া দিলেন এবং সে রাত্রে আমাকে তাঁহার বাসায় আহার করিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন।

আমি, বেলা ৫ টার মধ্যে জিনিষ পত্র বাঁধিয়া রাখিয়া, অন্যান্য বিষয়ের বিহিত ব্যবস্থা করিয়া এবং যাঁহার যাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আবশ্যক তাঁহাদের সহিত দেখা করিয়া, রমেশের বাসায় আহার করিতে যাত্রা করিলাম।

প্রথমতঃ সেখানে আহার করিতে, তাহার পর বহুদিনের জন্য রমেশের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে রাত্রি অনেক হইয়া পড়িল। ১২ টা বাজিয়া গেল। তখন আমি বাসায় ফিরিবার জন্য বাহির হইলাম। মনটা বড়ই উচাটন ছিল। এই চিরপরিচিত আত্মীয়-গণকে ছাড়িয়া চলিতে হইতেছে—যাঁহাদের নিকট যাইতেছি তাঁহারা কেমন লোক তাহা জানি না, আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করি-বেন, তাহাই বা কে বলিবে; যাঁহাদের শিক্ষ-কতা করিতে হইবে তাঁহারা কেমন প্রকৃতির ছাত্রী তাহাই বা কে জানে; জানি না অদৃষ্টে কি আছে! বোধ হইতেছে যেন এই ঘটনার সহিত আমার সমস্ত জীবন বাঁধা থাকিবে, যেন এই ঘটনা আজীবন কাল আমার সঙ্গ ছাড়িবে না। কি জানি মন কেন এমন করি-তেছে। জানি না জানি, বুঝি না বুঝি মনটা বড়ই উদাস হইয়াছে। এমন বাঞ্ছনীয় সৌভাগ্য উপস্থিত, সাংসারিক ক্লেশ হইতে—এই ঘোর পয়সার টানাটানি হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায় এখন করতল-গত, তথাপি মন এমন হইল কেন? কেমন করিয়া বলিব? জানি না মনের ভাব এমন কেন হইয়াছে।

পথে বাহির হইয়া ইচ্ছা হইল সোজা পথে না ফিরিয়া একটু ঘুরিয়া যাই। হয়ত তাহাতে মন অপেক্ষাকৃত শান্ত হইতে পারে। এই ভাবিয়া আমি বেড়াইতে বেড়াইতে সকুলার রোডে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

তখন সুবিমল-চন্দ্র-কিরণে ধরণী সমুজ্জল। সকুলার রোড জনহীন—নিস্তব্ধ। চন্দ্রালোকে সম্মুখে ও পশ্চাতে বহুদূর পরিষ্কার রূপ দেখা যাইতেছে। কোথাও একখানি গাড়ী নাই—একটী মানুষ নাই। কেবল স্থানে স্থানে এক একজন পাহারাওয়ালা, হয় গাছ হেলান দিয়া, না হয় কোন দোকানদারের পাটাতনে বসিয়া, না হয় কোন বাটীর বারান্দায় আশ্রয় লইয়া ঘুমাইতেছে। সারি সারি—পরে পরে রমণীয় গ্যাসালোক দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে; বোধ হইতেছে যেন কলিকাতার কণ্ঠে হীরকমালিকা সাজাইয়া দিয়াছে। ধীরে ধীরে আমি চলিতে লাগি-লাম। প্রকৃতির প্রশান্ত মাধুর্য্য উপভোগ করিতে করিতে আমি গন্তব্যপথে গমন করি-লাম। ক্রমশঃ আমি মাণিকতলা ষ্ট্রীটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নূতন পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কেমন ভাবে চলিব, ছাত্রীগণের সহিত কেমন ব্যবহার করিব, ছাত্রীরাও সম্ভবতঃ আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন, গৃহস্বামী জমিদার মহাশয় আমার সহিত কেমন ভাবে ব্যবহার করিবেন, আমিই তাঁহাকে কিরূপ সম্মান করিব, ছাত্রীগুলি দেখিতে কেমন, তাঁহাদের সহিত আমার মনের ঐক্য ঘটিবে কি না, এই সকল বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনায় আমার মন নিবিষ্ট। তখন সহসা কে যেন ধীরে আমার পৃষ্ঠদেশ কোমল করে স্পর্শ করিল। আমার সমস্ত চিন্তা-গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া গেল; আমি অতীব বিস্ময় সহকারে করস্থ যষ্টি সজোরে ধারণ করিয়া ফিরিয়া চাহিলাম,—দেখিলাম কি?

দেখিলাম সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বল, গ্যাসালোক-প্রদী্ত সুবিস্তৃত পথিমধ্যে শুক্লবসনা সুন্দরী! সুন্দরী গম্ভীর ও অনুসন্ধিৎসু ভাবে আমার বদনের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন,—তাঁহার ঊর্দ্ধোত্তোলিত হস্ত পার্শ্বস্থ পথাভিমুখে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। কামিনী কি স্বর্গের সুস্নিগ্ধ নিকেতন হইতে এস্থলে ধীরে ধীরে অবতারিত হইলেন, অথবা সহসা ভূপৃষ্ঠ বিদার করিয়া এস্থানে উপস্থিত হইলেন?

আমার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল। এরূপ অজ্ঞাতপূর্ব্ব ভাবে, এমন জনহীন স্থানে এমন গভীর রাত্রিকালে সহসা সেই বিস্ময়জনক নারী-মূর্ত্তি দেখিয়া আমি অবাক্ হইলাম; কি বলিতে হইবে, কি করিতে হইবে, তাহা আমার মনে হইল না। সুন্দরী প্রথমেই কথা কহিলেন। তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "পাথুরিয়াঘাটা যাইবার পথ কি এই?"

প্রশ্নকারিণীর বদনমণ্ডল আমি একবার বিশেষ রূপে দেখিলাম। দেখিলাম তাঁহার বর্ণ পাণ্ডু, বদন যৌবন শ্রীতে পূর্ণ—কিছু লম্বাকৃতি—বড় ক্ষীণতাযুক্ত। নয়নদ্বয় আয়ত, গম্ভীর, স্থির। অধরোষ্ঠ চঞ্চল। মস্তকে ঘন কৃষ্ণ নিবিড় কেশ-কলাপ। যুবতীর ব্যবহারে কোন প্রকার বিসদৃশ অথবা হীন জনোচিত ভাব পরিলক্ষিত হইল না। তাঁহাকে শান্ত ও স্থির প্রকৃতির লোক বলিয়াই মনে হইল। বোধ হইল তিনি বিষাদ ভারে নিপীড়িত এবং নিতান্ত সন্দিগ্ধচিত্ত। তাঁহার সহিত আমার অধিক কথাবার্ত্তা হয় নাই। যাহা শুনিয়াছি তাহাতে বুঝিলাম, তাঁহার কথা কিছু দ্রুত তাঁহার এক হস্তে একটী ক্ষুদ্র পুঁটুলি। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র এবং গাত্রাবরণী জামা পরিষ্কার ও শুক্লবর্ণ। কে এ রমণী এবং কেনই বা এই গভীর রাত্রিকালে রাজপথে আসিয়া অপরিচিত পুরুষ সমীপে উপনীত হইলেন তাহা আমি অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলাম না। কিন্তু ইহা আমি নিঃসংশয়িতরূপে মীমাংসা করিলাম যে, এই ঘোর রাত্রিকালে ও এতাদৃশ নির্জ্জন প্রদেশে এই রমণীর সহিত কথোপকথন করিয়া নিরতিশয় ইতর স্বভাব মনুষ্যের মনেও কদাচ কোন দুরভিসন্ধি স্থান পাইতে পারে না, অথবা তাঁহার বাক্যের কোন বিরুদ্ধ অভিপ্রায় কল্পিত হইতে পারে না। যুবতী পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি শুনিলেন কি? আমি জিজ্ঞাসিতেছিলাম, পাথুরিয়াঘাটা যাইবার কি এই পথ?"

আমি উত্তর দিলাম,—"হাঁ, এই পথ দিয়া যাইলে পাথুরিয়াঘাটা যাইতে পারে। আমি প্রথমেই আপনার কথার উত্তর দিই নাই বলিয়া আমার দোষ গ্রহণ করিবেন না; আমি সহসা আপনাকে এস্থানে দেখিয়া কিয়ৎপরিমাণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখনও আমি আপনার এ সময়ে, এস্থানে আগমনের কোনই কারণ স্থির করিতে পারি নাই।"

"আমি কোন মন্দ কার্য্য করিয়াছি বলিয়া আপনি সন্দেহ করিতেছেন কি?" আমিতো কোনই অন্যায় কার্য্য করি নাই। সম্প্রতি আমার কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। এ অসময়ে এস্থানে আমাকে নিতান্ত দুর্ভাগ্য প্রযুক্তই আসিতে হইয়াছে। কিন্তু আপনি আমাকে সন্দেহ করিতেছেন কেন?"

প্রয়োজনাতিরিক্ত অনুনয় ও উদ্বেগ সহকারে যুবতী কথা কয়টী বলিয়া সভয়ে আমার নিকট হইতে কিয়দ্দূর পিছাইয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে নিরুদ্বিগ্ন ও প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিলাম। বলিলাম,—"আপনার সম্বন্ধে সন্দেহ সূচক কোন ভাবই আমার মনে নাই, এবং যতদূর সম্ভব আপনার সাহায্য

করিবার ইচ্ছা ব্যতীত আমার অন্য কোন প্রকার বাসনাও নাই। আপনি আমার চক্ষুগোচর হইবার পূর্ব্বে এই রাজপথ সম্পূর্ণরূপ জনহীন ছিল; তাহার পর হঠাৎ আপনাকে দেখায় আমার কিছু আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে এবং তাহাই আমি ব্যক্ত করিয়াছি। সন্দেহের কথা আপনি মনেও স্থান দিবেন না।"

যুবতী সন্নিহিত একটী বৃক্ষ দেখাইয়া বলিলেন,—"আমি আপনার পদ-শব্দ শুনিয়া ঐ বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া দেখিতেছিলাম, লোক ভদ্রলোক কি না,—তাঁহার সহিত কথা কহিতে সাহস করা যায় কি না। যতক্ষণ আপনি আমার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া না গেলেন, ততক্ষণ মনে কতই ভয় ও কতই সন্দেহ হইতে লাগিল। তাহার পর অলক্ষিত ভাবে আপনাকে স্পর্শ করিলাম।"

আমি ভাবিলাম, লুকাইয়া আসিয়া স্পর্শ করা কেন? ডাকিলে কি দোষ হইত? কি জানি? এ স্ত্রীলোকের সকলই আশ্চর্য্য!

সুন্দরী আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারি কি না জানি না; আমি সম্প্রতি কোন দুর্ঘটনায় পড়িয়াছিলাম, কিন্তু সে জন্য সন্দেহের কোনই কারণ নাই।"

তাহার পর তিনি, যেন কি বলিতে হইবে বা কি করিতে হইবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, কিছু অস্থির হইয়া উঠিলেন। হস্তস্থিত পুঁটুলি এক হস্ত হইতে অপর হস্তে গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং বারংবার সুগভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

এই সহায়হীনা বিপন্না স্ত্রীলোকের অবস্থা আমার হৃদয়ে আঘাত করিল; তাঁহাকে সাহায্য করিবার এবং বিপন্মুক্ত করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আমার সর্ব্ব প্রকার বিচারশক্তি, সাবধানতা প্রভৃতির অপেক্ষা বলবতী হইয়া উঠিল। বলিলাম,—"নির্দ্দোষ কার্য্যে আপনি অনায়াসে আমাকে বিশ্বাস করিতে পারেন। আপনার বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় ব্যক্ত করিতে যদি কষ্ট হয়, তাহা হইলে সে প্রসঙ্গ আর মনেও করিবেন না। আপনার সমস্ত বিষয় জানিতে চেষ্টা করা আমার অধিকারের বহির্ভূত। এক্ষণে কি কার্য্যে আপনার সাহায্য করিতে পারি তাহা বলুন; যদি তাহা আমার সাধ্য হয়, তাহা হইলে আমি অবশ্যই তাহা সম্পন্ন করিব।

"আপনি বড়ই দয়ালু। আপনাকে দেখিতে পাইয়াছি ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। আমি আর একবার মাত্র কলিকাতায় আসিয়াছিলাম, কিন্তু এখানকার কিছুই জানি না। রাত্রি কি অনেক হইয়াছে? নিকটে কোথাও কি গাড়ি পাওয়া যায় না? আমিতো কিছুই জানি না। কলিকাতায় আমার এক আত্মীয় আছেন, তাঁহার নিকট যাইলে আমি সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিব। কোথায় গাড়ি পাওয়া যায় আপনি যদি আমাকে দেখাইয়া দিতেন এবং প্রতিজ্ঞা করিতেন, আমার যেখানে যখন ইচ্ছা আমি চলিয়া যাইব, তাহাতে আপনি কোন বাধা দিবেন না—আর কিছুই চাই না—আপনি এ প্রতিজ্ঞা করিবেন কি?"

অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে সুন্দরী সম্মুখ ও পশ্চাদ্দিকে বার বার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। হস্তস্থিত পুঁটুলি বারংবার হস্তান্তরিত করিতে থাকিলেন এবং বারংবার সভয় ও সানুনয় দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আপনি এ প্রতিজ্ঞা করিবেন?"

আমি করি কি? আশ্রয়হীনা, বিপন্না, অপরিচিতা এক স্ত্রীলোক অশ্রু আমার করুণা প্রার্থনায় সম্মুখে দণ্ডায়মান। নিকটে কোন

চেনা লোকের বাটী নাই, পথ দিয়াও কেহ যাইতেছে না যে কাহার সহিত একটা পরামর্শ করি। জানি না এ স্ত্রীলোকের কি অভিপ্রায়, জানিলেও তাঁহার কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে আমার কোনই অধিকার নাই। ভবিষ্যৎ ঘটনার ছায়া, যে কাগজে লিখিতেছি তাহাও যেন অন্ধকার করিয়া তুলিতেছে; কাজেই এই কয় পংক্তিতে আত্মাবিশ্বাসের রেখা দেখা যাইতেছে। তথাপি বল দেখি পাঠক! আমি এ অবস্থায় করি কি? অন্ততঃ যে উত্তর দিব তাহা ভাবিবার জন্য একটু সময় চাই। একটু সময় পাইবার জন্য সুন্দরীকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনি নিশ্চিত জানেন, এই গভীর রাত্রে আপনার কলিকাতাস্থ আত্মীয় আপনাকে সমাদর সহকারে স্থান দিবেন?"

"তাহাতে কোনই সংশয় নাই। আপনি কেবল বলুন যে, যখন যেরূপে ইচ্ছা আমাকে চলিয়া যাইতে দিবেন—আমার কার্য্যে কোন বাধা দিবেন না। আপনি কি এ প্রতিজ্ঞা করিবেন?"

তৃতীয় বার প্রতিজ্ঞার কথা বলিবার সময় সুন্দরী আমার সমীপস্থ হইলেন এবং সহসা আমার অজ্ঞাতসারে তাঁহার কৃশ হস্ত আমার বক্ষদেশে স্থাপিত করিলেন! ভাবিয়া দেখ পাঠক, একজন স্ত্রীলোক—বিপন্না, আশ্রয়-হীনা, কাতর স্ত্রীলোক আমাকে বার বার সকরুণ ভাবে জিজ্ঞাসিতেছেন,—"আপনি কি এ প্রতিজ্ঞা করিবেন।"

"হাঁ।" আমার মুখ হইতে উত্তর বাহির হইল। কি ভয়ানক! এই একটী সতত ব্যবহৃত, সর্ব্বজন রসনাস্থ ক্ষুদ্র বাক্য আমাকে দারুণ সত্য—বন্ধনে বদ্ধ করিল। ওঃ! এখনও লিখিতে লিখিতে কাঁপিয়া উঠিতেছি!

তাহার পর আমরা সিমলার অভিমুখে চলিলাম। যে রমণী আমার সঙ্গে চলিলেন তাঁহার নাম, বৃত্তান্ত, জীবনের উদ্দেশ্য, সকল কথাই আমার পক্ষে অপরিমেয় রহস্যপূর্ণ। সকলই যেন স্বপ্নের ন্যায়। আমি সেই দেবেন্দ্রনাথ বসু বটি তো? এই সেই বীডন ষ্ট্রীট বটে তো? আমি নিস্তব্ধ অবাক্—অসীম চিন্তাসাগরে ভাসমান। যুবতীর বাক্যে আবার আমাদের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল।

"আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কলিকাতার অনেক লোককে চেনেন কি?"

"হাঁ অনেককে চিনি।"

যুবতী বড়ই সন্দিগ্ধ ভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"অনেক ধনবান্ বড় লোককে চেনেন কি?"

আমি কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলাম,—"কাহাকে কাহাকে চিনি।"

"রাজা উপাধিধারী অনেক লোককে চেনেন?" প্রশ্নসহ যুবতী আমার বদনের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন।

আমি উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

"আমি ভরসা করি আপনি একজন রাজাকে জানেন না।" তাঁহার নাম বলিবেন কি?"

সুন্দরী মুষ্টিবদ্ধ হস্তদ্বয় উর্দ্ধোত্তোলিত করিয়া নাড়িতে নাড়িতে উচ্চৈঃস্বরে পরুষভাবে বলিলেন,—"আমি পারি না—সে নাম উচ্চারণ করিতে হইলে আমি আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়ি।" তাহার পর সুন্দরী অনতিবিলম্বে প্রকৃতিস্থ হইয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—"বলুন আপনি কোন্ রাজাকে জানেন না?"

এই সামান্য বিষয়ে তাঁহাকে সন্তুষ্ট না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি তিন

জন রাজার নাম করিলাম। একজন রাজার পুস্তকালয়ের আমি কিছুদিন অধ্যক্ষ ছিলাম, আর একজনের একটী পুত্রকে কিছু দিন পাঠ বলিয়া দিতাম, আর একজনকে সংবাদ পত্র পড়িয়া শুনাইবার জন্ম কিছুকাল নিযুক্ত ছিলাম।

সুন্দরী চিন্তিত ভাবে বলিলেন,—"আঃ! তবে আপনি তাহাকে জানেন না! কিন্তু আপনি নিজেও কি একজন বড় জমিদার?"

"আমি একজন সামান্য শিক্ষক মাত্র।"

আমার মুখ হইতে এই উত্তর নির্গত হইবামাত্র যুবতী, তাঁহার স্বভাবসুলভ সরলতা সহকারে, আমার হস্ত ধারণ করিলেন এবং আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন,—"বড় জমিদার নহেন—ধন্য জগদীশ্বর! আমি তবে আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারি।"

এতক্ষণ আমি ক্রমাগত আমার প্রবর্দ্ধমান কৌতূহল দমন করিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু অতঃপর আর তাহা পারিলাম না। জিজ্ঞাসিলাম,—"আমার বোধ হইতেছে, কোন বিশেষ বিখ্যাত জমিদারের উপর বিরক্ত হইবার আপনার গুরুতর কারণ আছে। আমার আশঙ্কা হইতেছে, আপনি যে জমিদারের নাম পর্য্যন্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না, তিনি হয় ত আপনার প্রতি কোন কঠিন অত্যাচার করিয়া থাকিবেন। সেই ব্যক্তির জন্যই কি আপনাকে এই অসময়ে এরূপ স্থলে আসিতে হইয়াছে?"

তিনি উত্তর দিলেন—"আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না, আমাকে আর সে কথা বলিতে বলিবেন না। আমি নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার সহ করিয়াছি। এক্ষণে আর কোন কথা না কহিয়া আপনি যদি দয়া করিয়া একটু দ্রুত চলেন, তাহা হইলে আমি যৎপরোনাস্তি অনুগৃহীত হইব।"

আবার আমরা দ্রুতপাদবিক্ষেপে চলিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ কাহারও মুখ দিয়া একটীও কথা বাহির হইল না। অলক্ষিত ভাবে আমি এক একবার তাঁহার বদনের প্রতি চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। বদনের সেই ভাব। ওষ্ঠাধর সংলগ্ন; ললাটের ক্রুদ্ধ ভাব; নেত্রদ্বয়ের সতেজ অথচ উদ্দেশ্যবিহীন সম্মুখদৃষ্টি। আমরা প্রায় হেদোর স্কুলের নিকটস্থ হইয়াছি, এমন সময় তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কি কলিকাতাতেই থাকেন?"

আমি বলিলাম,—'হাঁ।' কিন্তু তখনই মনে হইল, কি জানি সুন্দরী যদি আমার নিকট কোন সহায়তা প্রার্থনা করেন, অথবা উপদেশ জিজ্ঞাসার অভিপ্রায় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার ভবন ত্যাগ হেতু তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে; এজন্য অগ্রেই তাঁহার আশাভঙ্গের সম্ভাবনা তিরোহিত করিয়া দেওয়া শ্রেয়ঃ। এই ভাবিয়া বলিলাম,—"কিন্তু কল্য হইতে এখন কিছু দিনের জন্য কলিকাতা ত্যাগ করিতেছি। আমি বিদেশে যাইতেছি।"

তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"কোথায়? উত্তর অঞ্চলে, কি দক্ষিণ অঞ্চলে?"

আমি বলিলাম,—"এখান হইতে উত্তরে—শক্তিপুরে।"

তিনি সাদরে বলিলেন,—"শক্তিপুর! আহা! আমিও এখনই আপনার সঙ্গে সেখানে যাইতে পারিতাম। এক সময়ে আমি শক্তিপুরে বড়ই সুখে ছিলাম।"

এই সূত্রে সুন্দরীর অপরিজ্ঞাত কাহিনীর কিয়দংশ জানিতে চেষ্টা করিবার জন্য আবার আমার কৌতূহল জন্মিল। বলিলাম,—"বোধ হয় সুন্দর স্বাস্থ্যপ্রদ শক্তিপুর প্রদেশেই আপনার জন্ম হইয়াছিল?"

তিনি উত্তর দিলেন,—"না হুগলী জেলা আমার জন্মভূমি। আমি অত্যল্প কাল শক্তি-পুরে থাকিয়া সেখানকার বালিকা-বিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলাম। সুন্দর—স্বাস্থ্যপ্রদ হইতেও পারে; কিন্তু আমি সে খোঁজ রাখি না। সেখানকার কেবল আনন্দধামনামক পল্লী, আর আনন্দধামনামক বাটী দেখিতে আমার সাধ করে।"

আমি স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম। আমার মনের তখন ঘোর কৌতূহলাকুল অবস্থা, তাহার উপর এই অপরিজ্ঞেয়া রহস্যপূর্ণা সঙ্গিনী, আমাকে নিয়তি যে রাধিকা বাবুর বাটীতে লইয়া যাইতেছে, সেই রাধিকা বাবুর সেই বাটীর নাম এবং সেই পল্লীর নাম উচ্চারণ করিয়া বিস্ময়ে আমাকে অভিভূত করিয়া তুলিল!

আমি দাঁড়াইবামাত্র সুন্দরী সভয়ে চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেহ কি পশ্চাৎ হইতে আমাদের ডাকিতেছে?"

"না, না, কেহ ডাকে নাই—কোন ভয় নাই। কয়েক দিবস পূর্ব্বে একজন লোকের মুখে আমি আনন্দধামের নাম শুনিয়াছিলাম—আজি আবার আপনার মুখে সেই নাম শুনিয়া আমার আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল।"

সুন্দরী দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে বলিলেন,—"শ্রীমতী বরদেশ্বরী দেবীর স্বর্গ-লাভ হইয়াছে, তাঁহার স্বামীও জীবিত নাই। হয়ত তাঁহাদের ক্ষুদ্র কন্যাটির এতদিন বিবাহ হইয়া গিয়াছে। জানি না, এখন কে আনন্দ-ধামে আছেন। যদি সে বংশের এখনও কেহ কেহ সেখানে থাকেন, আমি বরদেশ্বরীর মায়ায়, তাঁহাদিগকেও নিশ্চয়ই অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিব না।"

যুবতী আরও কিছু বলিতেন, কিন্তু পার্শ্বে, অনতিদূরে, একজন পাহারাওয়ালাকে দেখিয়া তিনি নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িলেন এবং সভয়ে আমার বাহু ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন—'আমাদিগকে দেখিতে পাইয়াছে কি?"

পাহারাওয়ালা একটা রেলের উপর মাথা রাখিয়া নিদ্রা দিতেছিল; আমাদিগকে দেখিতে পাইল না। কিন্তু যুবতী বড়ই ব্যাকুল ও কাতর হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—গাড়ি দেখিতে পাইতেছেন কি? আমি বড় ক্লান্ত ও ভীত হইয়াছি। আমি গাড়ির ভিতর দরজা বন্ধ করিয়া যাইতে ইচ্ছা করি।"

আমি বলিলাম,—"হেদোর ধারে যে গাড়ির আড্ডা ছিল, তাহা আমরা ছাড়াইয়া আসিয়াছি, সেখানে একখানিও গাড়ি ছিল না। এখন হয় সম্মুখস্থ বীডনস্কোয়ারে গাড়ির আড্ডা পর্য্যন্ত যাওয়া, না হয় কোন চল্‌তি গাড়ি পাওয়া ভিন্ন উপায় নাই।"

আবার আমি শক্তিপুর সম্বন্ধীয় কথা উত্থা-পন করিলাম। বৃথা চেষ্টা। গাড়ির ভিতর দরজা বন্ধ করিয়া যাইবার জন্য তাঁহার এক্ষণে এমন ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে যে, আর কোন কথাই তাঁহার মনে স্থান পাইল না। সৌভাগ্য ক্রমে আমরা যেখান দিয়া যাইতেছিলাম তাহারই অনতিদূরে একটী বাটীর দ্বারে এক-খানি গাড়ি আসিয়া লাগিল। গাড়ি হইতে একটী লোক নামিয়া গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। আমি তখনই সেই গাড়ির নিকটস্থ হইয়া গাড়োয়ানকে যাইবার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল,—"যদি আপনারা গঙ্গার ধারের দিকে যান তবে লইতে পারি। আমার সেই দিকে আস্তাবল। অন্য দিকে আমি যাইতে পারিব না। আমার ঘোড়া মারা যাইবে।

সুন্দরী বলিলেন,—"তাহা হইলেই চলিবে। তাই চল।"

তিনি গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, গাড়োয়ান নেশাখোর নহে, নিতান্ত অভদ্র বলিয়াও বোধ হইতেছে না। আমি সঙ্গে গিয়া তাঁহাকে যথাস্থানে নির্ব্বিঘ্নে] পৌঁছাইয়া দিবার নিমিত্ত শেষ অনুরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন,—"না, না, না। আমি বেশ নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছি—স্বচ্ছন্দ হইয়াছি। আপনি যদি ভদ্রলোক হন, তাহা হইলে আপনার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করুন। গাড়োয়ানকে যতক্ষণ আমি থামিতে না বলি, ততক্ষণ চলিতে বলিয়া দিউন। আমি বিদায় হই। আপনাকে শত শত ধন্যবাদ।"

গাড়ির দরজায় আমার হাত ছিল। তিনি উভয় হস্তে আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"আমি দুঃখিনী। আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনাকে শত ধন্যবাদ।"

তাহার পর তিনি আমার হস্ত সরাইয়া দিলেন। গাড়ি চলিল। জানি না কেন, আমি গাড়ির পশ্চাতে একটু ছুটিলাম; ভাবিলাম গাড়ি থামাই, আবার পাছে তিনি ভীত হন ভাবিয়া অগ্র পশ্চাৎ করিতে লাগিলাম। একবার অনুচ্চস্বরে ডাকিলাম, কিন্তু সে স্বর শকট চালকের কর্ণে প্রবেশ করিল না। ক্রমশঃ শকটের চক্রধ্বনি মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল—ক্রমে ক্রমে গাড়ি অন্ধকারে মিলাইয়া গেল—শুক্লবসনা সুন্দরী চলিয়া গেলেন!

প্রায় দশ মিনিট অতীত হইল, আমি পথের সেই পার্শ্বেই রহিয়াছি। এক একবার যন্ত্র-পুত্তলীর ন্যায় দুই চারি পদ অগ্রসর হইতেছি, আবার তখনই স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছি; এখনই যে সকল ঘটনা ঘটিল, সে সকলই যেন স্বপ্ন, আবার যেন কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি ভাবিয়া মন নিতান্ত ত্যক্ত ও কাতর হইতে লাগিল, অথচ কি করিলে যে ভাল হইত তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। আমি তখন কোথায় যাইতেছি, কি বা করিব সকলই ভুলিয়া গেলাম; আমার চিত্তে, ঘোর চিন্তাজনিত বিশৃঙ্খল ভাব ব্যতীত, আর কিছুরই সংজ্ঞা ছিল না। এমন সময় আমার অব্যবহিত পশ্চাদাগত এক দ্রুতগামী শকটের চক্রনির্ঘোষ শ্রবণে আমার সংজ্ঞার সঞ্চার হইল—আমার জাগ্রৎ নিদ্রা ভাঙ্গিল।

আমি বীডন গার্ডেনের উত্তর-পশ্চিম কোণে ফুটপাথের উপর দাঁড়াইলাম। স্থানটী অন্ধকার—আমাকে কেহ দেখিতে পাইল না। বিপরীত দিকে বারান্দার নিম্নে একজন পাহারাওয়ালা বসিয়াছিল। গাড়িখানি আমার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। গাড়িখানি বগী; তাহার উপর দুইজন লোক। একজন বলিল,—"থাম! ওখানে একজন পাহারাওয়ালা রহিয়াছে—উহাকে জিজ্ঞাসা করা যাউক।"

আমি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার অনতিদূরে গাড়ি থামিল। প্রথম বক্তা জিজ্ঞাসিল,—"পাহারাওয়ালা, এ পথ দিয়া একজন স্ত্রীলোক যাইতে দেখিয়াছ কি?"

"কেমন ধারা স্ত্রীলোক বাবু?"

"বাদামে রঙ্গের কাপড় পরা,"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল,—"না, না। আমরা তাহাকে যে কাপড় দিয়াছিলাম, তাহা তাহার বিছানায় পড়িয়াছিল। নিশ্চয়ই সে প্রথমে আমাদের নিকট যে কাপড় পরিয়া আসিয়াছিল, সেই কাপড় পরিয়া চলিয়া আসিয়াছে। পাহরাওয়ালা, সাদা কাপড় পরা—সাদা কাপড়-পরা মেয়ে মানুষ।"

"না বাবু, আমি দেখি নাই।",

"যদি তুমি, কিংবা পুলিসের কোন লোক

তাহাকে দেখিতে পাও, তাহা হইলে তাহাকে এই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবে। এই কাগজ লও, ইহাতে ঠিকানা লেখা আছে। আমি পাঠাইবার খরচা এবং উচিত মত বখসিস দিব।”

পাহারাওয়ালা সাগ্রহে কাগজ খানি গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসিল,—“কিজন্য তাহাকে গ্রেপ্তার করিব মহাশয়? সে করিয়াছে কি?”

“সে পাগল,—পলাইয়া আসিয়াছে। ভুলিও না। সাদা কাপড়পরা মেয়ে মানুষ। চল।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

“সে পাগল—পলাইয়া আসিয়াছে।” এই কয়েকটী কথা আমার জ্ঞানকে আর একদিকে লইয়া চলিল। এখন মনে হইতে লাগিল, তাঁহার কোনকার্য্যেই আমি বাধা দিব না, আমার এই প্রতিজ্ঞার পর তিনি আমাকে যে যে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, হয় স্ত্রীলোকটী স্বভাবতই চঞ্চল, না হয় লক্ষ্যশূন্য, না হয় ভূতপূর্ব্ব কোন ভীতিজনক দুর্ঘটনা হেতু তাঁহার মানসিক শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে বিচলিত। কিন্তু ইহা আমার বেশ বোধ হইতেছে যে, সম্পূর্ণ পাগলামির কোন চিহ্নই আমি তাঁহার ব্যবহারে দেখিতে পাই নাই।

আমি করিলাম কি? যাহা করিলাম তাহার দুই মীমাংসা সম্ভবে। এক, হয়ত আমি একজন অকারণ উৎপীড়িতা স্ত্রীলোকের নিষ্কৃতির সহায়তা করিলাম। আর না হয়ত, যে দুর্ভাগিনী উন্মাদিনীর কার্য্য আমার ধীর ভাবে সংযত করিবার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ছিল, তাহা না করিয়া তাহাকে এই জনাকীর্ণ কলিকাতার মাঝখানে ছাড়িয়াদিলাম। বড় শক্ত কথা! এ সকল কথা পূর্ব্বে কেন ভাবি নাই বলিয়া এখন আত্ম-গ্লানি উপস্থিত হইল।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিলাম। শয়নের চেষ্টা করা অনর্থক। সে অস্থির চিন্তা-সমাকুল চিত্তে কি ঘুম আইসে? আর কয়েক ঘণ্টা পরেই আমাকে শক্তিপুর যাত্রা করিতে হইবে। ভাবিলাম অধ্যয়ন করিলে হয়ত চিন্তার কতকটা শান্তি ঘটিবে। কিন্তু পুস্তকের পত্র ও আমার চক্ষু এতদুভয়ের মধ্যে সেই শুক্লবসনা সুন্দরী আসিয়া উপস্থিত হইল;—পড়া হইল না। আহা সে আশ্রয়-হীনা স্ত্রীলোকের কি কোন বিপদ ঘটিয়াছে? এ চিন্তা করিতে সাহস হইল না—সভয়ে এ চিন্তাকে মন হইতে দূর করিলাম। কিন্তু তথাপি তথাবিধ নানা প্রকার অপ্রীতিকর প্রশ্ন স্বতই মনে সমুদিত হইতে লাগিল। কোথায় তিনি গাড়ি থামাইয়াছেন? এখন তাঁহার কি অবস্থা? যাহারা বগী করিয়া যাইতেছিল, তাহারা কি তাঁহার সন্ধান পাইয়া ধরিতে পারিয়াছে? অথবা এখনও কি তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে? তিনি এবং আমি আমরা উভয়েই কি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথ দিয়া অপরিজ্ঞেয় ভবিষ্যতের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশে চলিতেছি? আবার কি সেই নির্দ্ধারিত স্থানে আমাদের পুনঃ সাক্ষাৎ ঘটিবে?

বাসার দরজা বন্ধ করিয়া কলিকাতার আমোদ, বন্ধু বান্ধব এবং এখানকার ছাত্রবর্গের মায়া ত্যাগ করিয়া যখন আমার প্রস্থান করিবার ও জীবন নাটকের এক নূতন অঙ্কে প্রবেশ করিবার সময় উপস্থিত হইল, তখন

যেন আমার চিন্তার কতকটা নিষ্কৃতি হইল। রেলওয়ে ষ্টেশনে মহা গোলমালে আমার চিত্ত আরও একটু প্রশমিত হইল।

গোল—উৎকণ্ঠা সঙ্গে সঙ্গে। তিনটী ষ্টেশন যাওয়ার পর গাড়ির কলখানি ভাঙ্গিয়া গেল। মহা বিপদ্? আমাকে অগত্যা সেই স্থানে নিরুপায় হইয়া কয়েক ঘণ্টা কাল বসিয়া থাকিতে হইল। যখন আর এক নূতন কল আসিয়া আমাকে শক্তিপুরে পৌঁছাইয়া দিল, তখন রাত্রি দশটা। অন্ধকার যাহার নাম। রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের গাড়ি আমার নিমিত্ত ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিল। সে অন্ধকারে গাড়ি কি ছাই দেখিতে পাওয়া যায়? অতিকষ্টে গাড়িতে উঠিলাম। আমার অত্যধিক বিলম্ব হওয়ায়, কোচম্যান আমার উপর নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিল; এজন্য আমার সহিত বড় একটা বাক্যালাপ করিল না। কোচম্যান কথা কহুক আর নাই কহুক, গাড়ি চলিতে লাগিল। রাত্রি যখন প্রায় বারো টা, তখন গাড়ি গিয়া রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের বাটীতে পৌঁছিল। একজন উচ্চশ্রেণীর চাকর আমাকে 'আসিতে আজ্ঞা হউক' বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলিল। আমি তাহার সহিত কথা বার্ত্তায় বুঝিলাম, বাটীর লোকজন সকলেই শয়ন করিয়াছেন, আজি রাত্রিতে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হওয়া দুর্ঘট। আমি সে জন্য বড় আগ্রহও করিলাম না। আমার আহার্য্য প্রস্তুত ছিল; যথাসাধ্য আহার করিলাম। তাহার পর লোকটী আমাকে শয়ন করিবার স্থানে লইয়া গেল। আমি কল্য রাত্রিতে নিদ্রা যাই নাই—অন্তও ক্লান্তি কিছু মন্দ হয় নাই। শয়ন করিলাম। এখন স্বপ্ন দেবী কত কি রঙ্গ দেখাইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। সেই শুক্লবসনা সুন্দরীর মূর্ত্তি আমার নিদ্রিত নয়ন ভেদ করিয়া আবার দেখা দিবেন নাকি? হয়ত এই আনন্দধামের ব্যক্তিগণের অপরিচিত আকৃতিই আমার নেত্র-সমক্ষে উপস্থিত হইবে। মনে হইল, এ বড় মন্দ নয়; যাহাদের কোন ব্যক্তির সহিত আমার চাক্ষুষ পরিচয় নাই, আমি তাহাদের বাটীতে আজি পরমাত্মীয় ভাবে নিদ্রা দিতেছি!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঘুম ভাঙ্গিতে একটা বেলা হইল। শয্যা-ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিবামাত্র পূর্ব্ব-পরিচিত লোকটী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আমার তখন যাহা প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিল। আমি, প্রাতঃকৃত্য সমস্ত সমাপন করিয়া, পুনরায় সেই ঘরে আসিবামাত্র, একজন প্রাচীনা স্ত্রীলোক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত দুই চারি কথা কহিয়া বুঝিলাম যে, তিনি আমার ভবিষ্যৎ ছাত্রীগণের অভিভাবিকা। তাঁহার নাম অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর মুখে শুনিলাম, আমার ছাত্রীদ্বয়ের মধ্যে একজনই অধ্যয়নানুরাগিণী, অপরা তাঁহার সঙ্গের সাথি মাত্র। যাঁহার অধ্যয়নে অনুরাগ আছে তাঁহার নাম লীলাবতী, তিনি রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী। রাধিকাপ্রসাদ রায় স্ত্রী-পুত্র-হীন; তাঁহার শরীরের অবস্থা নিতান্ত মন্দ; বয়সও নিতান্ত কম নহে। সুতরাং তাঁহার বিবাহ করিবার ও পুত্র হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কাজেই

লীলাবতী তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিণী। তদ্ভিন্ন লীলাবতীর যে স্বাধীন সম্পত্তি আছে এবং তাঁহার পিতা, বিবাহের পর কন্যা যে সম্পত্তির অধিকারিণী হইবেন বলিয়া উইলে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও প্রচুর সম্পত্তি। তাঁহার বয়স প্রায় সতের বৎসর। আমার দ্বিতীয়া ছাত্রীর নাম মনোরমা। তিনি লীলাবতীর মাসতুতো ভগ্নী। এ সংসারে মনোরমার আপনার বলিতে কিছুই নাই। তাঁহার পিতা নাই, মাতা নাই, সহোদর নাই, সহোদরা নাই। শক্তিপুরের রায়-পরিবার ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া বিবাহাদি বিষয়ে যেরূপ উদার নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, মনোরমার পিতামাতা খাটী হিন্দু ছিলেন বলিয়া, তাহা করেন নাই। সুতরাং তাঁহারা, গৌরিদানের ফললাভার্থ, আট বৎসর বয়সের মধ্যেই মনোরমার বিবাহ দিয়াছিলেন। এক্ষণে মনোরমার সে স্বামীও নাই—মনোরমা বিধবা। লীলাবতী বাল্যকালে ক্রমাগত মনোরমার সহিত একত্র থাকিতেন, খেলা করিতেন ও বেড়াইতেন। মনোরমার স্বামি-বিয়োগের পর হইতে লীলাবতী জেদ করিয়া তাঁহাকে এখানে আনিয়াছেন। মনোরমার বয়স প্রায় উনিশ। দুই ভগ্নীর একের প্রতি অপরের মমতা সহোদরার অপেক্ষাও অধিক। মনোরমা পড়িতে তত ভাল বাসিতেন না, কিন্তু লীলাবতী পড়াশুনা বড় ভাল বাসেন। স্নেহ-পরায়ণা মনোরমার সমস্ত বাসনা লীলাবতীর সুখের উদ্দেশে লক্ষিত। লীলাবতী পড়াশুনা করিলে সুখী হন; কাজেই মনোরমার পড়া শুনা করিতে হয়। লীলাবতী পিতৃ-মাতৃহীনা; রূপ খুল্লতাত তাঁহার একমাত্র অভিভাবক।

অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর মুখে এই সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া আমি বিস্তর উপকৃত হইলাম। যাঁহাদের সহিত সর্ব্বদা বাস করিতে হইবে তাঁহাদের বৃত্তান্ত যতদূর সম্ভব, পূর্ব্ব হইতেই জানা আবশ্যক। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের সহিত ও আমার ছাত্রীদিগের সহিত কোন্ সময়ে আমার আলাপ হইবে?"

অন্নপূর্ণা দেবী বলিলেন—"কর্ত্তার সহিত কখন দেখা হইবে তাহা বলা সহজ নয়। তিনি সর্ব্বদা শরীর ও ঔষধ লইয়া যেরূপ ব্যস্ত, তাহাতে তাঁহার সহিত দুই এক দিনের মধ্যে দেখা হইবে কি না বলিতে পারি না। আপনার আগমন সংবাদ তিনি পাইয়াছেন। হয়ত এখনই চাকর আপনাকে ডাকিতে আসিবে। তাঁহার ইচ্ছার কথা আর কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। আপনার ছাত্রীদের মধ্যে লীলাবতীর আজ সামান্য একটু অসুখ করিয়াছে; এজন্য বোধ হয় তিনি এ বেলা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না। মনোরমার সহিত আপনার এখনই সাক্ষাৎ হইবে, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী আমাকে সঙ্গে লইয়া এক সুবিস্তৃত ও সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। প্রকোষ্ঠ মূল্যবান্ ও সুদৃশ্য কোচ, চেয়ার, সোফা, আলমারি প্রভৃতিতে পূর্ণ। পদতলে অতি রমণীয় কার্পেট ঝলসিতেছে। একখানি পরম রমণীয় মেহগিনি টেবিলের উপর নানা প্রকার উৎকৃষ্ট কাগজ, নয়ন-বিনোদন লেখনী ও মস্যাধার সমূহ এবং কয়েক খানি পুস্তক পতিত রহিয়াছে। কক্ষের একদিকে একটী হারমোনিয়ম্, তাহারই বিপরীত দিকে একটী পিয়ানোফোর্ট রহিয়াছে। সুবিস্তৃত কক্ষমধ্যে দুই খানি টানা

পাখা ঝুলিতেছে। অন্নপূর্ণা দেবী সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"এইটী আপনার ছাত্রীগণের পড়িবার ঘর।"

একটী সুগঠিত দেহ-সম্পন্না যুবতী, বাতায়ন-মুখে দাঁড়াইয়া গৃহসংলগ্ন উদ্যান দর্শনে নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। অন্নপূর্ণার কথা শুনিয়া, সুন্দরী আমাদের দিকে ফিরিলে, আমি বুঝিলাম, যুবতীর দেহের গঠন যেরূপ সুপরিণত ও সুসম্বদ্ধ তাঁহার বদন-শ্রী তদনুরূপ নহে। যুবতী শ্যামাঙ্গী। তিনি নিকটস্থা হইয়া বলিলেন,—"কালি আপনার আসিতে অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। আমরা অনেক রাত্রি দেখিয়া, কালি আপনার আসা হইল না স্থির করিয়াছিলাম। আপনি হয়ত রাত্রে বাটীর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া মনে কত কি ভাবিয়াছেন। এত রাত্রিতে আপনি যে আসিবেন, তাহা আমরা কেহই ভাবি নাই। লোকজনকে আপনার আসিবার কথা বলা ছিল। রাত্রিতে আপনার কোন প্রকার অসুখ, কি অসুবিধা হয় নাই তো?"

আমি বলিলাম,—"না, আমার কোনই অসুবিধা হয় নাই। আমার আসিতে যেরূপ বিলম্ব হইয়াছিল, তাহাতে আমি যে ষ্টেশনে গাড়ি পাইব, অথবা এখানে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইব, তাহা প্রত্যাশা করি নাই।"

এই সময় অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী বলিলেন,—"ইহাঁরই নাম মনোরমা; ইনি আপনার এক জন ছাত্রী।"

এই বলিয়া তিনি আমাদের সকলকেই বসিতে বলিলেন। মনোরমা ও আমি দুই খানি চেয়ারে উপবেশন করিলাম। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী একখানি কোচের উপর বসিলেন। কল্য আসিতে কেন এত বিলম্ব ঘটিয়াছিল, মনোরমা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে সংক্ষেপে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলাম। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী, একবার লীলাবতীকে দেখিবার জন্য, প্রস্থান করিলেন। আমি মনোরমা ও লীলাবতীর সহিত কিরূপ ভাবে চলিব, তাঁহাদের সহিত কিরূপ আত্মীয়তা করিব এবং তাঁহাদের কি বলিয়া সম্বোধন করিব, তাহা মনে মনে আলোচনা করিলাম। স্থির করিলাম, তাঁহারা আমার ছাত্রী হইলেও, তাঁহাদের সহিত বিশেষ সম্মান-সূচক ব্যবহার করাই বিধেয়। আর তাঁহাদের সহিত আত্মীয়তা যথেষ্ট হইলেও, আমি কদাচ তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিব না। তাঁহাদের কল্যাণ ও উন্নতি সাধনে আমি প্রাণপণ যত্নবান্ হইব বটে, কিন্তু আমি কখন তাঁহাদের সহিত মিশিব না, তাঁহাদের কোন বিষয় স্বেচ্ছায় জানিতে চেষ্টা করিব না এবং যাহা আমার লক্ষ্যের মধ্যে নহে তাহার মধ্যে আমি থাকিব না। আমাকে নীরব দেখিয়া মনোরমা জিজ্ঞাসিলেন,—"এই নূতন স্থানে, নূতন লোকের সঙ্গে, কেমন করিয়া দিন কাটাইতে হইবে, তাহাই আপনি ভাবিতেছেন কি?"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম,—"না, সে চিন্তা আমার মনে একবারও উদয় হয় নাই।"

মনোরমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আপনি তাহা ভাবুন, আর নাই ভাবুন, আপনাকে এখানে কেমন করিয়া দিন কাটাইতে হইবে তাহা এই সময় বলিয়া দেওয়াই ভাল। এই ঘর আমাদের পড়ার ঘর। আপনি প্রাতঃকালে দয়া করিয়া এদিকে আসেন ভালই, না আসেন সেও ভাল। আমাদের পড়ার সময় বেলা ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত। এই টুকু সময় আমাদের জন্য আপনার কষ্ট করিতে

হইবে—আপনার জন্যও আমাদিগকে কষ্ট করিতে হইবে। এই অবুঝ মেয়ে মানুষের জাতিকে যাহা হইবার নহে তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা আপনার কষ্টের একশেষ—আর আমরা মেয়ে মানুষ, যাহার মর্ম্ম গ্রহণ করা আমাদের ক্ষমতার অতীত, তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করা আমাদেরও কষ্টের একশেষ। পড়াশুনায় আমার কোন বাতিক নাই, আমি উহার ধারও ধারি না। তবে লীলা পড়ার জন্য পাগল। সে যাহা এত ভাল বাসে, কাজেই আমাকেও তাহা একটু ভাল বাসিতে হয়। কারণ লীলার ইচ্ছায় আমার ইচ্ছা, লীলার ভালতে আমার ভাল, আমার জীবনের লীলাই সর্ব্বস্ব। দিনের মধ্যে আমাদের জন্য আপনার দুই ঘণ্টা মাত্র কষ্ট করিলেই যথেষ্ট হইবে। অবশিষ্ট সময় আপনি যাহা খুসী করিতে পারেন। ইচ্ছা হয়, আপনি আপনার নির্দ্দিষ্ট ঘরে বসিয়া লেখাপড়াও করিতে পারেন; ইচ্ছা হয়, এই বাগানে বেড়াইতে পারেন; ইচ্ছা হয়, কাকামহাশয় হয়ত আপনাকে যে দুই একটী কাজ দিবেন, তাহাও করিতে পারেন; আর ইচ্ছা হয়, দয়া করিয়া আমাদের ঘরে আসিয়া, গল্প-গুজব করিতেও পারেন; তাহাতে আমাদের উপকার বই অনুপকার নাই। বাটীর যিনি কর্ত্তা, তিনি শরীর লইয়া ব্যস্ত। তাঁহার শরীর যে কিসে থাকে, কিসে থাকে না, তাহা কেবল তিনিই বুঝেন। বোধ হয়, তাঁহার রোগ চিকিৎসাশাস্ত্রের বাহির, অথবা তাঁহার রোগ রোগই নহে। হয়ত তিনি আপনাকে আজি একবার ডাকিয়া পাঠাইবেন। আপনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, দুই চারি কথায়, তাঁহার রকম সকম দেখিয়া, তিনি যে কি ধাতুর লোক তাহা সহজেই বুঝিয়া লইতে পারিবেন। সুতরাং সে সম্বন্ধে আমার এক্ষণে আর কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। তাঁহার সহিত আপনার মাসের মধ্যে এক দিন করিয়াও সাক্ষাৎ ঘটিবে কি না সন্দেহ। কাজেই এখানে সমস্ত দিন আপনার বনবাস বলিয়া বোধ হইতে পারে। এই জন্যই বলিতেছি, যখন আপনার ইচ্ছা হইবে, তখনই আপনি দয়া করিয়া এই পড়িবার ঘরে আসিতে পারেন।"

আমি মনোরমার কথাগুলি কখন বা ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে ও হাসিতে হাসিতে এবং কখন বা গম্ভীর ভাবে শ্রবণ করিলাম। শুনিয়া বুঝিলাম যে, স্ত্রীলোকটী বড় বুদ্ধিমতী এবং বড়ই সরলা।

মনোরমা আবার বলিতে লাগিলেন,—"আপনি শিক্ষক আমরা ছাত্রী। সুতরাং আমাদের কার্য্যাদির বিচার করিতে আপনার অবশ্যই অধিকার আছে। কাজ হইয়া যাওয়ার পর ভর্ৎসনা করা বা উপদেশ দেওয়া, উভয়ই বৃথা। এই জন্যই আমরা সমস্ত দিন কেমন করিয়া কাটাইব তাহা এই সময়ে জানান আবশ্যক বোধ করিতেছি। সকালে উঠিয়া অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কখন বাগানে বেড়ান, কখন গল্প করা, কখন মাসিক পত্রাদি পাঠ, কখন সেলাই করা, মোজা বোনা ইত্যাদি রকম রকম কার্য্যে ও অকার্য্যে আমাদের দিন কাটে। সন্ধ্যার পর লীলা কোন দিন হারমোনিয়ম্, কোন দিন বা পিয়ানো বাজায়, আমরা সকলে শুনি। এইরূপে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত কাটিয়া গেলে, নিদ্রার আয়োজন করা হয়। লীলা বড় উত্তম বাজাইতে পারে। সে যাহা করে তাহাই আমার খুব ভাল বোধ হয়। লীলা ছেলে মানুষ—তাহার এত বুদ্ধি! আমি তাহার একটু অযত্ন করিয়াছি, এই জন্য এ বেলা আপনার সহিত সে দেখা করিতে

পারিল না। যদি ভাল থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে বৈকালে আপনার সহিত দেখা করিবে।"

আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত মনোরমার কথা শুনিলাম এবং মনে মনে তাঁহার সরলতা, লীলার প্রতি স্নেহ, প্রভৃতি সদ্‌গুণের যথেষ্ট প্রশংসা করিলাম।

মনোরমা আবার বলিলেন,—"মাষ্টার মহাশয়! লীলাবতী সুরঞ্জিত উজ্জ্বল বস্ত্র পরিতে ভালবাসে। কলিকাতার সম্প্রদায় বিশেষের ব্রাহ্মিকা ভগ্নীগণের ন্যায়, সে সতত শুক্লবসনা যোগিনী সাজিয়া থাকিতে ভালবাসে না। তাহার যাহা রুচি তাহা আপনাকে বলা ভাল। আপনি সে জন্য তাহাকে কখন অনুযোগ করিবেন না, ইহাই আমার অনুরোধ।"

এখন হঠাৎ মনোরমার বদন বিনির্গত 'শুক্লবসনা' কথাটা আমার চিন্তা তরঙ্গকে আর এক পথে লইয়া চলিল। সেই "শুক্লবসনা সুন্দরীর" আমূল বৃত্তান্ত ধীরে ধীরে মনে আসিল। একথাও মনে পড়িল যে, সেই "শুক্লবসনা সুন্দরী" এই আনন্দধামের স্বর্গীয়া কর্ত্রী শ্রীমতী বরদেশ্বরী দেবীর নিতান্ত অনুরাগিণী। তখন আমার ইচ্ছা হইল যে, যতদিন এ স্থানে থাকিতে হইবে তাহার মধ্যে, সেই অজ্ঞাত-কুলশীলা শুক্লবসনা সুন্দরীর সহিত বরদেশ্বরী দেবীর কি সম্বন্ধ ছিল তাহার সন্ধান করিতে হইবে। সে সন্ধান করিলে, হয়ত সেই শুক্লবসনা সুন্দরীর নাম এবং পরিচয়ও জানিতে পারা যাইবে।

আমি বলিলাম,—"কোন আত্মীয়া কামিনী শুক্লবসনা ধারণ করে, তাহা আর আমার ইচ্ছা নহে। আমি এখানে আসিবার পূর্ব্বেই এক শুক্লবসনা কামিনীর যে ব্যাপার দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা ইহ জীবনে আর ভুলিতে পারিব না।"

মনোরমা বলিলেন,—"বলেন কি? আমি কি সে ব্যাপার শুনিতে পারি না?"

আমি বলিলাম,—"সে তাহা শুনিতে আপনার বিশেষ অধিকার আছে। সে ব্যাপারের নায়িকা একটী অপরিচিতা স্ত্রীলোক—হয়ত আপনিও তাঁহাকে জানেন না। জানুন বা নাই জানুন, তিনি কিন্তু আন্তরিক ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্বর্গীয়া শ্রীমতী বরদেশ্বরী দেবীর নাম বার বার উচ্চারণ করিয়াছেন।"

"আমার মাসীমার নাম করিয়াছেন? কে তিনি? আপনি সমস্ত কথা বলুন।"

যেরূপ ঘটনায় আমার সহিত সেই শুক্লবসনা সুন্দরীর সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল তাহা আমি ব্যক্ত করিলাম। বিশেষতঃ যে যে স্থলে তিনি আনন্দধাম ও বরদেশ্বরী দেবীর কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, সে সকল স্থল বিশেষ করিয়া বলিলাম।

বিশেষ মনোযোগ সহকারে মনোরমা সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে নিরতিশয় বিস্ময় প্রকাশিত হইতে লাগিল। আমি তাঁহার ভাব দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, তিনিও আমার ন্যায় সেই শুক্লবসনা কামিনীর রহস্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা। মনোরমা জিজ্ঞাসিলেন,—"মাসীমার সম্বন্ধে ঐ সকল কথা তিনি বলিয়াছেন, আপনার ঠিক মনে আছে?"

আমি বলিলাম,—"ঠিক মনে আছে। তিনি যেই হউন, এক সময়ে তিনি এখানকার বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেন, বরদেশ্বরী দেবী তাঁহাকে বিশেষ যত্ন ও স্নেহ করিতেন এবং সেই অনুগ্রহ হেতু কৃতজ্ঞতা স্বরূপে, তিনি এই পরিবারভুক্ত তাবৎকে হৃদয়ের সহিত

ভক্তি করেন। তিনি জানেন যে, বরদেশ্বরী দেবী ও তাঁহার স্বামী কেহই এখন ইহ সংসারে নাই; আর তিনি যেরূপ ভাবে শ্রীমতী লীলাবতী দেবীর কথা বলিলেন, তাহাতে বোধ হয় তাঁহাদের বাল্যকালে পরস্পরের পরিচয় ছিল।"

"তিনি যে এখানকার কেহ নহেন, তাহা বলিয়াছেন?"

"তিনি এখানকার কেহ নহেন, কিন্তু এখানে আসিয়াছিলেন।"

"আপনি কোনরূপেই তাঁহার নাম জানিতে পারিলেন না?"

"কোন রূপেই না।"

"আশ্চর্য্য বটে। আপনি তাঁহাকে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে দিয়া ভালই করিয়াছেন। কারণ তিনি আপনার সমক্ষে এমন কোনই ব্যবহার করেন নাই, যাহাতে তাঁহাকে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার নামটা কি জানিবার জন্য যদি আপনি আর একটু যত্ন করিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত। যেমন করিয়া হউক, এ সন্ধান করিতেই হইবে আমি বলি কি, আপনি কাকা মহাশয় বা লীলাবতী দুজনের কাহাকেও এ বিষয় এখন জানাইবেন না। তাহাতে কাজ কিছুই হইবে না, কেবল তাঁহারা অকারণ ব্যাকুল হইবেন মাত্র। আমি তো কৌতূহলে অস্থির হইয়া উঠিয়াছি। আজি হইতে এই বিষয়ের সন্ধান করা আমি প্রধান কার্য্য বলিয়া গণ্য করিলাম। যখন মাসীমা প্রথমে এখানে বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন আমি এখানে থাকিতাম না। সে বিদ্যালয় এখনও আছে বটে, কিন্তু এখন তাহার সে সকল প্রাচীন শিক্ষকের কেহ বা মরিয়াছেন, কেহ বা স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সে দিকে সন্ধানের কোনই সুযোগ নাই। আর একটী উপায়—"

এই সময় একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল,—"কাল রাত্রে যে বাবু আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত কর্ত্তা দেখা করিতে চাহেন।"

মনোরমা বলিলেন,—"তুমি বাহিরে দাঁড়াও, বাবু যাইতেছেন। আমি বলিতেছিলাম কি —লীলাবতীর এবং আমার নিকট, মাসীমার অনেকগুলি হস্ত-লিখিত পত্র আছে। ঐ সকল পত্র আমার মাসীমা আমার মা ঠাকুরাণীকে এবং লীলাবতীর পিতাকে লিখিয়াছিলেন। যতদিন সন্ধানের অন্য উপায় না পাওয়া যায়, ততদিন সেই চিঠিগুলি আমি দেখিব। লীলার পিতা সহরে থাকিতে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি যখন বাটীতে না থাকিতেন, সেই সময় মাসীমা তাঁহাকে সতত পত্র লিখিতেন। সেই সকল পত্রে আনন্দধামের নানা বিবরণ থাকিত; বিদ্যালয়টী তাঁহার প্রিয় পদার্থ ছিল, এজন্য বিদ্যালয়ের বিবরণ তাহাতে বিশেষ করিয়া লেখা থাকিত। এখনই আমি চিঠির সন্ধান করিতেছি। এক্ষণে আপনি কাকা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন; হয়ত বেলা ৩টা অর্থাৎ আমাদের পড়িবার সময়ের আর দেখা ঘটিতেছে না। সেই সময় র সহিত পরিচয় হইবে এবং এ সম্বন্ধেও যাহা হয় জানিতে পারিবেন।"

মনোরমা সে প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া গেলেন। আমি প্রকোষ্ঠান্তরে আসিয়া চাকরের সঙ্গে শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে চলিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভৃত্য আমাকে সঙ্গে করিয়া একটী প্রকোষ্ঠের মধ্যে গিয়া বলিল,—"এই ঘরে আপনি বসিয়া নিজের কাজ-কর্ম্ম, পড়া-শুনা করিবেন, আর এই বিছানায় আপনি রাত্রিতে ঘুমাইবেন। আপনার জন্য এই ঘর স্থির করা হইয়াছে। এ ঘর, আর এখানকার সব জিনিষ পত্র পছন্দ মত হইয়াছে কি না, জানিবার জন্য কর্ত্তা মহাশয় ইহা আপনাকে দেখাইতে বলিয়াছেন।"

আমি দেখিয়া বুঝিলাম, সে ঘর এবং তন্মধ্যস্থ দ্রব্য-সামগ্রী যদি আমার মনোমত না হয়, তাহা হইলে সুরলোকও আমার মনে ধরিবে কিনা সন্দেহ। দেখিলাম ঘরটী অতি প্রশস্ত, উচ্চ, পরিষ্কার এবং আলোকময়। তাহার জানালা ও দরজা অনেক এবং সকলগুলিই বড় বড়। জানালার ভিতর দিয়া নিম্নস্থ কুসুমকানন নেত্র-পথে পতিত হইতেছে। তথায় অগণ্য সুরভি-কুসুম বাতাসের সহিত খেলা করিতেছে। ঘরের এক দিকে এক খানি পরিস্কৃত খট্টায় অতি পরিষ্কার শয্যা রহিয়াছে। আর এক দিকে দুই খানি অতি সুন্দর টেবিল। তাহার এক খানির উপর কতকগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় পুস্তক—পুস্তকগুলি সুন্দররূপে বাঁধান। আর একখানি টেবিলের উপর অতি সুন্দর দোয়াত, কলম, পেন্সিল, ছুরি, কাঁচি, রকম রকম ডাকের কাগজ, ব্লটিং কাগজ, চিঠির খাম প্রভৃতি পদার্থ যত্নসহকারে বিন্যস্ত রহিয়াছে। টেবিলের সম্মুখে একখানি গদি আঁটা চেয়ার এবং জানলার সমীপে একখানি ইজি চেয়ার রহিয়াছে। দেওয়ালের গায়ে সুবৃহৎ চিত্র সকল বিলম্বিত। সংক্ষেপতঃ ঘরটীতে, অতি যত্নসহকারে, আমার প্রয়োজনীয় ও মনোরম পদার্থ সমস্ত সংগৃহীত রহিয়াছে। আমি ঘর দেখিয়া যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলাম এবং সানন্দে বার বার তত্রস্থ সমস্ত সামগ্রীর প্রশংসা করিতে লাগিলাম। আমার প্রশংসা-স্রোত থামিয়া গেলে, ভৃত্য আবার আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিল। এক, দুই, তিন, চারি করিয়া কত প্রকোষ্ঠই ছাড়াইয়া চলিলাম। দুই তিনটা মহল আমরা পার হইলাম; দুই তিনটা ছোট ছোট ফুলের বাগানও ছাড়াইয়া চলিলাম। তাহার পর চারিদিকে নবদূর্ব্বাদল সমাচ্ছন্ন, সুশ্যামল, নাতিবিস্তৃত ক্ষেত্র-মধ্যে একটী অনতিবৃহৎ অতি চমৎকার ভবন-সম্মুখে আমরা উপস্থিত হইলাম। সমস্ত বাটীর মধ্যস্থ থাকিয়াও, যেন ইহা সকলের সহিত সম্পর্ক-শূন্য ও স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হইল। চাকর আমাকে উপরে উঠিতে ইঙ্গিত করিল। আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে আরোহণ করিয়া প্রকোষ্ঠ-মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রকোষ্ঠের সাজ গোজ বড়ই জাঁকাল। সে প্রকোষ্ঠ হইতে আমরা প্রকোষ্ঠান্তরে চলিলাম। এই প্রকোষ্ঠের দ্বার ও জানালা সমূহে নীলবর্ণের পর্দ্দা লম্বিত ছিল। চাকর ধীরেধীরে একটী পর্দ্দা উঠাইয়া আমাকে প্রকোষ্ঠ-মধ্যে প্রবেশ করিবার পথ করিয়া দিল। আমি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলে, সে ধীরে ধীরে অস্ফুট স্বরে বলিল,—"মাষ্টার মহাশয় আসিয়াছেন।"

আমি দেখিলাম ঘরটী অতি মনোহর ভাবে সজ্জীকৃত। অতি মূল্যবান্ সুদৃশ্য সামগ্রী সমূহ তথায় সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরের একদিকে মেহগ্নি কাষ্ঠের মহার্ঘ টেবিল, চেয়ার আলমারি আদি শোভা পাইতেছে; অপর দিকে অতি

উৎকৃষ্ট ফরাশ পাতা রহিয়াছে। সেই ফরাশের উপরে, বালিশ বেষ্টিত হইয়া, এক পুরুষ বসিয়া আছেন। ঘরের সমস্ত জানালাতেই নীলবর্ণের পর্দা দেওয়া ছিল; সুতরাং ঘরে বিশেষ আলোক ছিল না। যতটুকু আলো ছিল তাহাতে বুঝিতে পারিলাম যে, উপবিষ্ট পুরুষের বয়স পঞ্চাশের কম নহে; তাঁহার কলেবর ক্ষীণ, চক্ষু উজ্জ্বল, বর্ণ পাণ্ডু এবং শরীর দুর্ব্বল। তিনিই রাধিকাপ্রসাদ রায়। রায় মহাশয় আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, —"দেবেন্দ্র বাবু আসিয়াছেন? আসুন। বসুন। এখানেই বসুন—না চেয়ারে বসিতে ভাল বাসেন? তাই বসুন। ঐ চেয়ার একখানি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই দিকে সরাইয়া বসুন। আমি বড় রুগ্ন—মরণাপন্ন—বুঝিলেন? চিররুগ্ন। আমাকে ম-প করিবেন। আপনি—ওঃ—এক সঙ্গে অনেক কথা কহিয়া বড় মাথা ধরিয়া উঠিল। একটু ঔষধ খাইতে হইল—কিছু মনে করিবেন না।"

বাস্তবিক লোকটা ঔষধ খাইল! কি ানভয়ক! এই কয়টা কথা কহিয়া যাঁহার অসহ্য মাথা ধরে, ঔষধ খাইতে হয়, তাঁহার শরীরের অবস্থা তো বড়ই শোচনীয়। আমার বড়ই কষ্ট হইল। রাধিকাপ্রসাদ রায় দেশমধ্যে এক জন বিখ্যাত ধনবান্ এবং বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি। তাঁহার এ অবস্থা বড়ই কষ্টের কথা। আমার কষ্ট হইল বটে, কিন্তু একটু সন্দেহও হইল। ভাবিলাম, রোগটা কতকটা মানসিক নহে তো?

আমি চেয়ারে না বসিয়া তাঁহার ফরাশের এক পার্শ্বেই উপবেশন করিলাম। দেখিলাম তাঁহার বালিশের এপাশে ওপাশে দুই এক খানি কেতাব রহিয়াছে। একখানি, পুস্তক খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। বোধ হইল, সেই খানিই তিনি তখন পড়িতেছিলেন। তিনি আবার নাকি সুরে বলিলেন,—"আপনাকে পাইয়া বড় সুখী হইলাম। সময়ে সময়ে, আর কিছু হয় না হয়, এক একটা কথা কহিয়াও বাঁচিব। আপনার ঘরটা দেখিয়াছেন কি? পছন্দ হইয়াছে তো?"

আমি বলিলাম,—"আমি এখনই সে ঘর হইতে আসিতেছি। আমার তাহা সম্পূর্ণ—"

কথাটা শেষ করা হইল না। দেখিলাম, হঠাৎ রায় মহাশয় চক্ষু বুঁজিয়া, কপাল জড় করিয়া এবং কাণে অঙ্গুলি দিয়া বড় কাতরবৎ ভাব প্রকাশ করিলেন। কাজেই আমাকে থামিতে হইল। তিনি বলিলেন,—"ওঃ—ওঃ! ক্ষমা করিবেন। মহাশয়, আমার পোড়া অদৃষ্ট। লোকে চেঁচাইয়া একটী কথা কহিলেও আমার সহ্য হয় না; কেবল সহ্য হয় না নয়—প্রাণ যেন বাহির হইয়া যায়। আপনি দয়া করিয়া যদি একটু আস্তে কথা কহিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে আমি বড়ই বাধিত হই। দোষ লইবেন না। আমার পাপ রোগ—পোড়া শরীর, সকল অনর্থের মূল।"

এতক্ষণে আমি বুঝিলাম, ইহাঁর রোগ মিছা কথা, মনের কল্পনা, অথবা সখের বিষয়। যাহাই হউক, অপেক্ষাকৃত আস্তে বলিলাম, —"ঘরটি অতি ভাল হইয়াছে।"

রায় মহাশয় বলিলেন,—"ভাল, ভাল। আপনি জানিবেন, আমার সংসারে জমিদারী চাইল নাই। আমি তাহা অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। আপনি এখানে আমাদের সহিত সমান ভাবেই থাকিবেন—কোন ভিন্ন, বা অধীন ভাব একবারও মনে করিবেন না। আপনি দয়া করিয়া ঐ আলমারি হইতে ঐ সাঙ্খ্য দর্শন পুস্তক খানা আমাকে দিবেন কি? আমার যে শরীর—নড়িলে মূর্চ্ছা হইবার সম্ভাবনা।"

সে জন্যই বলিতেছি—ওঃ আমার মাথা বড় গরম হইয়া উঠিয়াছে! আমি মাথায় একটু গোলাপ জল দিব। কিছু মনে করিবেন না।"

তাঁহার ফরাশের উপরই নানা প্রকার শিশি, বোতল, গ্লাস, বাক্স সাজান ছিল, তিনি একটা হইতে একটু গোলাপ জল লইয়া মাথায় দিয়া বলিলেন,—"আঃ!"

আমি আলমারি হইতে পুস্তক বাহির করিয়া আনিলাম। রায় মহাশয়ের এতাদৃশ ব্যবহারে একটুও বিরক্ত হইলাম না, বরং তাঁহার এবংবিধ ভাব দেখিয়া আমার আমোদ জন্মিল। পুস্তক খানি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলে, তিনি বলিলেন,—"হাঁ—ঠিক বটে। সাঙ্খ্য দর্শন আপনার পড়া আছে তো দেবেন্দ্র বাবু? কেমন আপনার ইহা ভাল লাগিয়াছে তো? আচ্ছা বলুন দেখি, এই নিরীশ্বরবাদের মধ্যেও, কেমন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুকূল সুন্দর অদ্বৈতবাদের ছায়া স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়।"

আমি বলিলাম,—"তাহার সন্দেহ কি? 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' বলিয়াও ক্রমশঃ গ্রন্থকারকে ঐশ্বরিক শক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইয়াছে।"

রায় মহাশয় বলিলেন,—"ঠিক ঠিক। আপনি কোন্ বিষয় পড়িতে ভাল বাসেন? আচ্ছা, এখন থাক্, পরে স্থির করিয়া বলিবেন; আমি সেই বিষয়ের পুস্তক আপনার ঘরে পাঠাইয়া দিব। আর কি—আর কি কথা আপনাকে বলিব?—আঃ মনে পড়িতেছে না—হাঁ—নাঃ। কত কথাই বলিব মনে করিয়া রাখিয়াছি। তাইত—যে মাথার দশা হইয়াছে। আপনি দয়া করিয়া ঐ জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া আস্তে আস্তে একটা চাকরকে যদি ডাকেন; আস্তে আস্তে—চেঁচাইলে আমি মারা যাইব। একটু খানি পর্দা ফাক করিবেন। রৌদ্র কি অধিক আলো ঘরে ঢুকিলে আমার বড় কষ্ট হইবে—মূর্চ্ছা হইতেও পারে।"

আমি কষ্টে হাস্যসংবরণ করিয়া একজন চাকরকে উপরে আসিতে বলিলাম। একজন হিন্দুস্থানী খানসামা নিঃশব্দে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। রায় মহাশয় তখন নয়ন মুদিয়া, বালিশের উপর পড়িয়া, কপালে একটা তৈলবৎ পদার্থ লেপন করিতেছেন। অনেকক্ষণ পরে নয়ন উন্মীলন করিয়া বলিলেন,—"দেবেন্দ্র বাবু, এ ছাইয়ের শরীর লইয়া মহা বিড়ম্বনা। একটু আলোক চক্ষে লাগিয়াছিল—মূর্চ্ছা হয় হয় হইয়াছিল। এই হিমসাগর তৈলটা এরূপ সময়ে বড় উপকারী; তাহাই কপালে মাখিতেছিলাম। কেও, রামদীন? রামদীন, আজি সকালে যে কাগজটায় আজিকার কাজের ফর্দ্দ ধরিয়াছিলাম, সেই কাগজটা খুঁজিয়া বাহির কর তো বাপু।"

রামদীন একখানা উত্তমরূপ বাঁধান খাতা আনিয়া উপস্থিত করিল। খাতাখানি আনিয়া সে রায় মহাশয়ের হস্তে দিতে গেল। রায় মহাশয় পুনরায় চক্ষু বুঁজিলেন এবং নিতান্ত কাতর ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"কি দুর্ভাগ্য! হায় হায়! আমার এই শরীর—আমার উপর সকলেরই দয়া হওয়া উচিত। দেখিয়াছেন দেবেন্দ্র বাবু, চাকরটা কি নিষ্ঠুর—কি মূর্খ—অক্লেশে পুস্তকখানি আমার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইল! কি সর্ব্বনাশ! আমার এই মরণাপন্ন অবস্থা—আমি কি মহাশয়, খাতা খুলিয়া, কোন্ পাতায় কাজের ফর্দ্দ ধরিয়াছি, তাহা বাহির করিতে পারি? অসাধ্য—অসাধ্য—অসম্ভব! দেবেন্দ্র বাবু, আমাদের দেশের ইতর লোকদের অবস্থা কি শোচনীয়! তাহারা

জ্ঞানহীন, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন। হায় হায়! কত দিনে ইহাদের অবস্থা উন্নত হইবে? রামদীন, বই খানির সেই পাতাটা বাহির করিয়া আমার সম্মুখে খুলিয়া ধরা তোমার উচিত ছিল। যাহা হউক, এখন সে পাতাটা বাহির কর এবং ভবিষ্যতে আর কখন এরূপ অত্যাচার করিও না। কিন্তু একি—বড় মাথা ধরিয়া উঠিল যে। রামদীন, গোলাপজল—গোলাপজল—শীঘ্র।"

রামদীন তাড়াতাড়ি করিয়া গোলাপজলের বোতল আগাইয়া দিল।

আবার রায় মহাশয় বলিলেন,—হায় হায়! কি নিষ্ঠুর, কি নিষ্ঠুর! আমি মাথার জ্বালায় মারা যাইতেছি; রামদীন, তুমি কি একটু জল আমার মাথায় ছড়াইয়া দিতে পার না? ওঃ কি কষ্ট!"

রামদীন একটু জল তাঁহার মাথায় আস্তে আস্তে হাত দিয়া থাপড়াইয়া দিল; কিন্তু রায় মহাশয় আবার চক্ষু বুঁজিয়া,হাত ছড়াইয়া, ছট্ ফট্ করিতে করিতে বলিলেন,—"রামদীন ক্ষমা কর, ক্ষমা কর—আমার প্রাণ যায়। ওরে বাপরে! এমন করিয়া জোরে মাথায় কি কখন হাত দিতে আছে? ওঃ মরিয়াছিলাম আর কি! ঈশ্বর হে! কত কষ্টই আমার অদৃষ্টে লিখিয়াছ!"

অনেকক্ষণ হা হুতাশ করিয়া, রায় মহাশয় ক্রমে ঠাণ্ডা হইলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম, ইঁহার নিকট হইতে বিদায় হইতে পারিলে বাঁচি। এমন গ্রহতেও মানুষ পড়ে?

রায় মহাশয় শান্ত হইলে, রামদীন তাঁহার সম্মুখে, পুস্তকের নির্দ্ধারিত পাতা খুলিয়া, দাঁড়াইল। রায় মহাশয় খাতা দেখিতে দেখিতে বলিলেন,—"হাঁ—তাই বলিতেছিলাম। অতি —হাঁ অতি প্রাচীন একখানি হস্ত লিখিত পুঁথি আমি সংগ্রহ করিয়াছি। বৈষ্ণব কবিদিগের প্রাচীন গ্রন্থ। আপনাকে অনুগ্রহ করিয়া সেই পুস্তক খানির মধ্যে যে সকল ব্রজবুলি আছে তাহার টীকা ও সদর্থ স্থির করিতে হইবে। বই খান আমি ছাপাইব। আহা! কি মিষ্ট! কি চমৎকার! আপনি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা ভাল বাসেন বোধ হয়। তা বাসেন বই কি? আহা! কি মধুর। তাহার টীকা প্রস্তুত করিতে হইলে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। অবশ্যই হইবেন। কি সুন্দর!"

আমি বলিলাম,—"চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবিদিগের গ্রন্থ আমি যত্ন সহকারে আলোচনা করিয়াছি এবং আমি তৎসমস্তের নিতান্ত অনুরাগী। যদি বর্ত্তমান পুস্তক সেইরূপ কোন প্রাচীন গ্রন্থ হয়, তাহা হইলে আমি বিশেষ আনন্দের সহিত ইহার আলোচনা করিব এবং ইহার টীকা প্রস্তুত করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিব।

রায় মহাশয় কহিলেন,—"বড় আনন্দিত হইলাম—নিশ্চিন্ত হইলাম। যদি আপনার সাহায্যে আমি বঙ্গদেশের একটী গুপ্ত মহারত্নের পুনরুদ্ধার করিতে পারি, তাহা হইলে সন্তোষের সীমা থাকিবে না।" বলিতে বলিতে তিনি নিতান্ত ভয়চকিত ভাবে জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। আমি ভাবিলাম, না জানি আবার কি উপসর্গ উপস্থিত! রায় মহাশয় আবার বলিলেন,—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে! দেবেন্দ্র বাবু প্রাণ বাঁচান দায়। নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন ভৃত্যগণ নীচের বারান্দায় গোল করিতেছে। তাহাদের কর্কশ কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। বলুন দেখি মহাশয়, এমন অত্যাচারে কি এই কাতর শরীর এক [illegible] নও থাকে?"

আমি বলিলাম—"কই মহাশয়, আমি তো কিছুই শুনিতে পাইতেছি না।"

তিনি বলিলেন,—"আপনি একটু দয়া করিয়া ঐ জানালাটা খুলিয়া শুনুন দেখি; এখনই জানিতে পারিবেন। দেখিবেন, যেন আলো না আইসে।"

আমি অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে উঠিয়া জানালার নিকটে গমন করিলাম। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—দেখিবেন, সাবধান। আর বারকার মত অধিক আলো না আইসে। খুব সাবধান।

আমি খুব সাবধান হইয়াই পরদার এক কোণ তুলিয়া, ঘাড় বাড়াইয়া, বাহিরে উঁকি দিলাম। আলো আসিল না। তথাপি রায় মহাশয়কে, চক্ষু বুঁজিয়া কপালে হিমসাগর তৈল লাগাইতে হইল। এই সকল মহাব্যাপার শেষ হইলে আমি বলিলাম,—"কই কিছুই তো শুনিলাম না।"

তিনি বলিলেন,—"ভাল ভাল! না হইলেই বাঁচি। আমার যে শরীর।"

তাহার পর রামদীনকে একখানি পুস্তক আনিয়া দিবার জন্য উপদেশ দিলেন। রামদীন, উত্তম রেশমী রুমালে বাঁধা, একখানি পুঁথি আনিয়া উপস্থিত করিল। রায় মহাশয় বলিলেন,—"দেখুন, মহাশয় একবার খানিকটা পড়িয়া দেখুন। ওঃ কি দুর্গন্ধ—যাই যে, কি সের দুর্গন্ধ? হাঁ—হাঁ এই পচা পুঁথি খানারই এই গন্ধ। কি ভয়ানক! রামদীন,—আতর আতর, শীঘ্র—শীঘ্র। দেবেন্দ্র বাবু পুঁথি খানি আপনি আপনার ঘরে লইয়া যান। দেখিয়াছেন, কি অসহ্য গন্ধ?"

আমার দুর্ভাগ্যই বল, বা সৌভাগ্যই বল, আমি দুর্গন্ধ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি ভাবিলাম মন্দ নয়। যাহাই হউক, কোন উপায়ে এখন ইহাঁর নিকট হইতে প্রস্থান করিলে বাঁচি। বলিলাম,—"আমি যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছি তাহার কোনই কথা এখনও হয় নাই।"

তিনি বলিলেন,—"আমি রুগ্ন—কাতর। আমার প্রতি আপনিও নিষ্ঠুরতা করিবেন না। কাজের কথা—কি ভয়ানক! আমার এই শরীরে কি কোন প্রকার কাজের কথা সম্ভব? দেবেন্দ্র বাবু, আমার প্রতি নির্দ্দয় হইবেন না। আপনি যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছেন, তাহা আপনি বুঝিয়াই করিবেন। আপনি ভদ্রলোক—আপনাকে বলিব কি? আমার অবস্থা দেখিতেছেন তো? আমি বলিতে, দেখিতে, শুনিতে কিছুই করিতে পারিব না। শুনিয়াছি লীলা পড়িতে বড় ভাল বাসে—তাহাকে আপনি পড়াইবেন। মনোরমা যদি পড়িতে চাহে, তবে তাহাকেও পড়াইবেন। আর আমার এই পুঁথিগুলির টীকা প্রস্তুত করিয়া দিবেন। আর আমি কি বলিব? কাজের কথা বলা বা আলোচনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। দেবেন্দ্র বাবু, তবে আপনি পুঁথি খানি লইয়া আপনার ঘরে যান; আমি গন্ধে মারা যাই।

আমি উঠিলাম। তিনি আবার বলিলেন—"বই খানি বড় ভারী। দেখিবেন পড়ে না যেন। লইয়া যাইতে পারিবেন তো?"

ক্ষুদ্র একখানি পুঁথি লইয়া যাইতে পারিব না সন্দেহে, আমার হাসি আসিল। বলিলাম,—"তা লইয়া যাইতে পারিব।"

রায় মহাশয় বলিলেন,—"তবে দেখিতেছি আপনার শক্তি আছে। আহা! দেহে শক্তি থাকা কি সুখের বিষয়; ভগবান্ আমাকে সে সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন।"

আমি আর অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম, যত দিন আনন্দধামে থাকিতে হইবে, ততদিন যেন আর রায় মহাশয়ের সহিত পুনঃ পুনঃ সাক্ষাৎ না ঘটে। আমার সংস্কার হইল, লোকটী নিতান্ত নির্ব্বোধ ও ভণ্ড। তাঁহার ঘ্রাণশক্তি, শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি সকলই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, তাঁহার শরীর নিতান্ত কোমল ও কাতর এবং সাধারণের অপেক্ষা এত যত্নে ও সন্তর্পণে তিনি জীবনপাত করিয়া থাকেন যে, কষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, অন্যে যাহা বুঝিতেও পারে না, তিনি তাহাতে বিজাতীয় ক্লিষ্ট হইয়া পড়েন। বলা বাহুল্য লোকটীর উপর আমার শ্রদ্ধা হইল না।

আমার নির্দ্দিষ্ট ঘরে টেবিলের উপর পুথি খানি রাখিয়া চেয়ারে বসিয়া ক্ষণেক ইতিকর্ত্তব্য আলোচনা করিলাম। একজন চাকর সংবাদ দিল, স্নানাহারের সময় উপস্থিত। আমি ভৃত্যের সঙ্গে গিয়া স্নানার্থে প্রস্তুত হইলাম। পুষ্করিণীতে স্নান করিতে আমার সমধিক অনুরাগ হওয়ায়, ভৃত্য আমাকে সঙ্গে করিয়া সরোবরে লইয়া চলিল। আমার পরিধেয় বস্ত্র, জুতা, জামা সকলই সে লইয়া চলিল। আমি তৃপ্তি সহকারে আনন্দধামের 'আনন্দ-সরোবর' নামক সুবিস্তীর্ণ, অতি পরিষ্কার, উদ্যান-বেষ্টিত সরোবরে অবগাহন করিয়া স্নান করিলাম। স্নানান্তে গৃহাগত হইয়া আহারাদি সমাপ্ত করিলাম। অতি পরিষ্কার পাত্রস্থ, অতি পরিষ্কার অন্ন-ব্যঞ্জন ও নানা প্রকার উপকরণ, পরিষ্কার প্রকোষ্ঠ মধ্যস্থ, পরিষ্কার আসনে বসিয়া আহার করিলাম। আহার কার্য্যও সম্পূর্ণ তৃপ্তিজনক হইল। তাহার পর নিজের নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠাগত হইয়া বিশ্রামার্থ খট্টোপরে শয়ন করিলাম। বেলা তখন ১২টা। মনে নানা প্রকার চিন্তার আবির্ভাব হইতে লাগিল। শক্তিপুরের আনন্দধামে আসিয়া যাহা যাহা দেখিলাম, তন্মধ্যে রাধিকা বাবুর কথা ছাড়িয়া দিলে, বাকী সকলই সম্পূর্ণরূপ প্রীতিপদ। রাধিকা বাবু লোকটা বেজায় বেতর; কিন্তু মনোরমা বড় উত্তম লোক। চাকর বাকর সকলে বড়ই ভাল। বাড়ীটা তো স্বর্গ।

অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীও বেশ মানুষ। যত্নের কোনই ত্রুটী নাই। এমন স্থানে অবশ্যই সুখী হওয়া সম্ভব। কিন্তু এখনও আমার লীলাবতীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, না জানি তিনি কেমন লোক। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের কাল ক্রমেই নিকট হইয়া আসিতেছে। তিনি যদি লোক ভাল হন, তবেই তো আমার শক্তিপুরে বাস সুখেরই হয়। যাহা হয় ক্রমেই বুঝিতে পারিব। কিন্তু সেই যে শুক্লবসনা সুন্দরী তাহার সহিত আনন্দ-ধামের কি সম্বন্ধ? সে তো এ স্থানের, বিশেষতঃ রায়-পরিবারের, বড়ই অনুরাগী, অথচ মনোরমা তাহার কথা কিছুই জানেন না, কখন কিছু শুনেনও নাই। ব্যাপারটা কি? অবশ্যই এ ব্যাপারের মধ্যে কোন রহস্য আছে। দেখা যাউক, এখানে থাকিতে থাকিতে, তাহার কোন সন্ধান হয় কি না। মনোরমা কতকগুলি পত্র দেখিবেন বলিয়াছেন, হয়ত তাহার মধ্য হইতে কোন সন্ধান বাহির হইতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, বেলা ক্রমে ৩টা বাজিল। আমার পাঠাগারে উপস্থিত হইবার সময় হইয়া আসিল। এখনই লীলাবতীর সহিত আমার সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইবে। হয়ত মনোরমাও শুক্লবসনা সুন্দরীর কোন পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া থাকিবেন। ব্যাকুলতায় পরিপূর্ণ হইয়া প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

---*---

পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মনোরমা আলমারির নিকটে দাঁড়াইয়া কি একটা জিনিষ পরিষ্কার করিতেছেন, আর অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী একদিকে বসিয়া ঢুলিতেছেন। আমার অপরা ছাত্রী লীলাবতীকে তখনও দেখিতে পাইলাম না। আমি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র মনোরমা যে কার্য্যে নিযুক্তা ছিলেন, তাহা ত্যাগ করিলেন এবং অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীও উভয় চক্ষু রগড়াইয়া ঘুমের ঝোঁক কাটাইবার চেষ্টা করিলেন। মনোরমা তাহার পর আমার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"আপনি ঠিক আসিয়াছেন। আমরা এমনই সময়ে পড়ি বটে। আমাকে পড়ার তাগাদা করিবেন না, একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি। উহাতে আমার বিশেষ মন নাই। আমি যত টুকু শিখিয়াছি তাহাই যথেষ্ট।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"আপনি যে পড়িবেন না, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিয়াছি। এক্ষণে আমার যে ছাত্রী পড়িতে ভাল বাসেন তাঁহাকে তো দেখিতে পাইতেছি না। তাঁহার যে অসুখ হইয়াছিল, তাহা সারিয়াছে তো?"

মনোরমা বলিলেন,—"তাঁহার অসুখ সারিয়াছে বটে, কিন্তু আজিও তিনি পড়িবেন না। তবে যদি আপনি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমার সঙ্গে আসুন।"

আমি অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীকে বলিলাম,—"আপনি সমস্ত দিন বসিয়াই থাকিবেন না কি? দুই পা না নড়া চড়া করিলে ঘুমের ঝোঁক যাইবে না তো।"

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"চল বাবা, তোমাদের সঙ্গে লীলার কাছে যাই। বুড়া হইলেই, ঘুম কিছু অধিক হয়। তোমাদেরও, আমার মত বয়স হইলে, এমনই করিয়া ঘুমের জ্বালায় অস্থির হইতে হইবে।"

মনোরমা বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল—কি দেখিলেন? তাঁহার অসুখের ঘটা যথেষ্টই দেখিয়াছেন বোধ হয়?"

আমি চুপ করিয়া থাকিলাম। কেমন করিয়া তাঁহাদের পরমাত্মীয়, সেই গৃহের গৃহস্বামী মহাশয়ের নিন্দাবাদ ব্যক্ত করিব? কাজেই আমাকে নির্ব্বাক্ থাকিতে হইল।

মনোরমা বলিলেন,—বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি আপনাকে আর বলিতে হইবে না। খুড়া মহাশয়ের স্বভাবের কিছুই আপনার জানিতে বাকি নাই; একবার দেখিলেই আপনি সব বুঝিতে পারিবেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই জানিতাম। আপনাকে জিজ্ঞাসা করা বাড়ার ভাগ। সে যাহা হউক, বাটীর সকলের সহিতই তো আপনার পরিচয় হইল। কেবল লীলার সঙ্গে পরিচয় বাকি। আসুন, লীলার সঙ্গে আপনার আলাপ করাইয়া দিব।"

এই বলিয়া মনোরমা অগ্রসর হইলেন। আমি অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীকে বলিলাম,—"আসুন।"

তিনিও আমাদের সঙ্গে চলিলেন। আমরা গৃহের দক্ষিণ দিকের সরোবর-সমন্বিত সুবিস্তীর্ণ বাগানে আসিয়া অবতরণ করিলাম। অতি বৃহৎ পুষ্পবাটিকা। কেমন লাল টক্ টকে পথগুলি, কেমন সব গাছ ও লতায় জড়িত কৃত্রিম নিকুঞ্জগুলি, কেমন সমশীর্ষ ঘাসাচ্ছাদিত সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রগুলি! বাগানে কত জাতীয়, কতই মনোহর গাছ—লতার গাছ—ফুলের গাছ, আর পাতা—কত

বর্ণের, কত রকমের। সেই সুন্দর বাগানের অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বাগানের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড সরোবর—অতি পরিষ্কার—অতি সুশ্রী। সেই সরোবরের চারিদিকে বাঁধা ঘাট। প্রত্যেক বাঁধা ঘাটের উপর একটী করিয়া অতি সুন্দর হর্ম্ম্য। সেই সকল হর্ম্ম্যমধ্যে অতি মসৃণ মার্ব্বল-প্রস্তরাচ্ছাদিত উপবেশনোপযোগী নানাবিধ স্থান। আমরা একতম হর্ম্ম্যের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তথায় গিয়া দেখিলাম কি? দেখিলাম এক ভুবনমোহিনী সুন্দরী, তত্রত্য মর্ম্মর-প্রস্তরাসনে সমাসীন হইয়া, একখানি সাময়িক পত্র পাঠ করিতেছেন। এই কামিনী লীলাবতী।

কেমন করিয়া বলিব—কেমন করিয়া বুঝাইব—লীলাবতী দেখিতে কেমন? পরাগত ঘটনা সকলের সহিত লীলাবতীর ও আমার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সে সকল ঘটনা বিস্মৃত হইয়া, কি ভাবে লীলাবতীর রূপের বর্ণনা করিব? লীলাবতীর অগাধরূপরাশি, আমি যে ভাবে তাঁহাকে প্রথমে দেখিলাম, সেই ভাবে না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। কিন্তু লীলাবতীর রূপ-চিত্র উপস্থিত করা আমার পক্ষে এক্ষণে অসাধ্য। যে সজীব মূর্ত্তি আমার অন্তরে ও বাহিরে দেবী রূপে বিরাজ করিতেছে, এক্ষণে আমার চিন্তা ও কার্য্য দ্বারা তাঁহার স্বতন্ত্র বর্ণনা কিরূপে সম্ভবে? ভাষার অপূর্ণ শক্তি, ক্ষমতার একান্ত অভাব এবং বর্ণনীয় বিষয়ের নিতান্ত উচ্চতা সকলই বর্ণন-চেষ্টার বিরোধী। কবির লেখনী বা চিত্রকরের তুলিকা পাইলেও সে রূপরাশি—সে স্বর্গীয় সুকান্তির কিছুই বুঝাইতে পারিতাম না। তথাপি পাঠকগণের সন্তোষের জন্য একটু চেষ্টা করিয়া দেখি, যদি মোটামুটী ঠিক বুঝাইতে পারি।

দেখিলাম লীলাবতী কৃশাঙ্গী, অথচ সুগোল ও সুকুমারকায়া। তাঁহার পরিচ্ছদ শ্বে[illegible] বর্ণ। তাঁহার মস্তকে ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি। কর্ণে উজ্জ্বল হীরকখণ্ড-সংযুক্ত দুল্ বিলম্বিত। তাঁহার ভ্রূযুগল সুবিস্তৃত, স্থূল-মধ্য ও সূক্ষ্মাগ্র। নয়নদ্বয় কবিবর্ণিত সফরী সদৃশ; তাঁহার অপূর্ব্ব ভাব—কেমন ভাসা ভাসা, কেমন উজ্জ্বল এবং কেমন সুন্দর! নাসিকা সূক্ষ্ম। গণ্ডদ্বয় পূর্ণায়ত ও নিটোল। হাসিলে গণ্ডদ্বয়ের মধ্যে অতি সুন্দর দুইটী গহ্বরের আবির্ভাব হয়। ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ; পরস্পর-সম্মিলিত এবং যেন রস-স্ফীত সুপক্ব ফলের ন্যায় সুন্দর। চিবুক সূক্ষ্ম। মুখ খানি কিছু লম্বাটে। সুন্দরী নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল গৌর।

যাহা বলিলাম তাহাতেই কি লীলাবতীর রূপবর্ণনা করা হইল? সাধ্য কি! এই লোক-ললামভূতা রমণীরত্নকে দেখিয়া আমার হৃদয় তন্ত্রী যেরূপ ভাবে বাজিয়া উঠিল, সহস্র ধমনীতে শোণিতের বেগ যেরূপে সংবর্দ্ধিত হইল, তাঁহার সেই সরলতা পূর্ণ, কৃষ্ণতারাযুক্ত অতুলনীয় নয়নের অতুলনীয় দৃষ্টি যেরূপে আমার দৃষ্টির সহিত মিলিত হইল, এবং তাঁহা[র] সেই বীণা-বিনিন্দিত মধুর ধ্বনি যেরূপ অপূ[র্ব্ব] ভাবে আমার কর্ণে ধ্বনিত হইল, যদি [সে] সকলের বর্ণনা করা আমার সাধ্যায়ত্ত হইত তাহা হইলে, পাঠক! আমি লীলাবতীর রূ[প] হয়ত বুঝাইতে পারিতাম।

তাঁহার সেই অপূর্ব্ব কান্তি, মধুর কোমলতা স্বভাবের মিষ্টতা আমার চিত্তে অঙ্কিত হইল কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার চিত্তে একটী অনিশ্চিত, অজ্ঞাত, কেমন এক রকম ভাবে[র] আবির্ভাব হইল। এক বার মনে হইতে লাগিল, যেন তাঁহার কি অপূর্ণতা আছে, যে[ন] তাঁহার কি নাই। আবার নহইতে লাগি[ল]

না আমারই হয়ত কি অভাব আছে এবং সেই জন্যই আমি যথোপযুক্তরূপে লীলাবতীকে প্রণিধান করিতে অক্ষম। যখনই লীলাবতী পূর্ণ ও সরল ভাবে আমার প্রতি চাহিলেন, তখনই এই অপূর্ণতার কথা আমার মনে আরও প্রবল ভাবে আঘাত করিল। বুঝিতে পারি না কেন মন এমন হয়, জানি না কি সে অপূর্ণতা, দেখিতে পাই না কোথায় সে অভাব, তথাপি মনের এই ভাব। যেন কি নাই। আশ্চর্য্য!

প্রথম সাক্ষাৎ-কালে এই অপূর্ণতার কথা আমার মনকে এতই বিচলিত করিয়া তুলিল যে, আমি লীলাবতীর সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার হিতৈষিণী মনোরমা আমাকে উপস্থিত বিপদ হইতে নিষ্কৃতির উপায় করিয়া দিলেন। তিনিই প্রথমে কথা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন,—"দেখিয়াছেন মাষ্টার মহাশয়, আপনার ছাত্রীর পড়ায় কত মন। তিনি, বাগানের মধ্যে হাওয়া খাইতে বসিয়াও পড়া লইয়া ব্যস্ত। আপনি কলিকাতার আজ কালিকার কতকগুলি ভণ্ড দেশহিতৈষী পণ্ডিতের দলভুক্ত কি না জানি না। শুনিয়াছি এই সকল পণ্ডিত নাটক, নবেল, কাব্য ইত্যাদির আলোচনা নিতান্ত অনর্থক বলিয়া চীৎকার করেন এবং যে সকল লোক তাহা পড়ে, বা যে হতভাগ্যেরা তাহা রচনা করে, তাহাদের সকলকে, যমদূতের ন্যায় ধরিয়া, নরকস্থ করিবার চেষ্টা করেন। জানি না তাঁহারা কেমন পণ্ডিত; কিন্তু আমার যেন বোধ হয়, তাঁহারা মূর্খ-চূড়ামণি। যাহাই হউক, লীলাবতীকে সে দোষ দিতে পারিবেন না; কারণ লীলা এখন 'বান্ধব' পড়িতেছেন। যদি বলেন, 'বান্ধবও' তো কয়েক বৎসর হইতে উপন্যাস বক্ষে ধারণ করিয়া কলঙ্কিত পতিত হইয়া গিয়াছে; তাহার উত্তরে আমার নিবেদন যে, 'বান্ধব' এই ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে বটে, কিন্তু লীলা নিশ্চয়ই সে কলঙ্কে হস্ত না দিয়া, অন্য কোন প্রবন্ধের আলোচনা করিতেছেন। আমি লীলার মুখ দেখিয়াই একথা বলিয়া দিতেছি। কেমন লীলা, তুমি এখন কালীপ্রসন্ন বাবুর লেখা পড়িতেছ না?"

সেই অপূর্ব্ব বদনে, অপূর্ব্ব হাসির সহিত লীলাবতী বলিলেন,—"হাঁ, আমি এখন কালীপ্রসন্ন বাবুর শব্দ-যোজনার মাধুর্য্যই দেখিতেছিলাম বটে; কিন্তু আমি যে কখন উপন্যাস পড়ি না, এ কথা বলি কেমন করিয়া। মাষ্টার মহাশয় হয়ত শুনিয়া বিরক্ত হইবেন যে, আমি সময়ে সময়ে নিতান্ত আগ্রহের সহিত কোন কোন উপন্যাস পাঠ করি। যদি মাষ্টার মহাশয় তাহা দোষ বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে আর কখন আমি সেরূপ কার্য্য করিব না।"

এই সরলতাপূর্ণ, শান্তিমাখা কথাগুলি শুনিয়া আমার বড়ই প্রীতি জন্মিল। আমি ইহার একটা সদুত্তর স্থির করিতেছিলাম, এমন সময় মনোরমা আবার বলিলেন,—"তোমার মতামত মাষ্টার মহাশয়কে জানাইলে না তো। কেবল বলিলে এইরূপ আমি করি বটে, কিন্তু মাষ্টার মহাশয় নিষেধ করিলে আর করিব না। কেন যে তুমি তাহা কর, সে কথা মাষ্টার মহাশয়কে বলা আবশ্যক। তোমার কথা খণ্ডন করিয়া, যদি মাষ্টার মহাশয় সে কার্য্যের দোষ বুঝাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে অবশ্যই তামাকে সে জন্য মাষ্টার মহাশয়ের আজ্ঞা পালন করিতে হইবে। তুমি যে কেন আগ্রহ সহকারে উপন্যাস ও কাব্য পড়িয়া থাক তাহা বুঝাইয়া দেও নাই তো। আমি আমার মত বলিয়াছি, তুমি তোমার মত বল। তাহার

পর দুইজন দুই দিক হইতে এমনই তর্ক বাধাইয়া দিব যে, মাষ্টার মহাশয়ের মত না থাকিলেও, আমাদের মতে মত দিতেই হইবে এবং অবশেষে, অব্যাহতি পাইবার জন্য, হয়ত আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রচুর প্রশংসা করিতে হইবে।"

লীলাবতী বলিলেন,—"মাষ্টার মহাশয় ওরূপ দায়ে পড়িয়া যেন কখন আমাদের প্রশংসা না করেন।"

আমি বলিলাম,—"কেন ?"

লীলাবতী বলিলেন,—"কারণ, সত্য হউক মিথ্যা হউক, আপনার সমস্ত কথাই আমি বিশ্বাস করিব।"

এই এক কথায় লীলাবতীর চরিত্রের পূর্ণ-চিত্র আমি দেখিতে পাইলাম। বুঝিলাম, তাঁহার স্বকীয় সত্যপ্রিয়তা ও বাঙ্‌নিষ্ঠা তাঁহাকে ক্রমশঃ পরকীয় বাক্যে পূর্ণ মাত্রায় আস্থা প্রদান করিতে অভ্যস্ত করিয়াছে। সেই দিবস আমি যাহা অনুমান করিয়াছিলাম, এখন আমি তাহা কার্য্য দ্বারা প্রতিনিয়ত জানিতে পারিতেছি।

তাহার পর আমরা পুনরায় পঠনালয়ে ফিরিয়া আসিলাম। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী আমাকে জল খাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। আমি তাহাতে অস্বীকার করিলাম না। তিনি তাহার উদ্যোগ করিতে গেলেন। কিয়ৎকাল পরে একজন দাসী প্রচুর মিষ্টান্ন, আর একজন উপাদেয় ফল-মূলে রৌপ্যপাত্র পূর্ণ করিয়া লইয়া আসিল; অন্নপূর্ণা স্বয়ং রজত গ্ল্যাসে করিয়া পানীয় জল আনিলেন। মনোরমা পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে স্বহস্তে স্থান মার্জ্জনা করিয়া দিলেন এবং লীলাবতী আসন বিস্তার করিলেন। যেরূপ আহার হইল তাহাতে বুঝিলাম যে, রাত্রিতে আর আহারের প্রয়োজন হইবে না। ঠাকুরাণীকে তাহা বুঝাইয়া দিলে, তিনি একজন ঝির দ্বারা সরকারকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, মাষ্টার বাবু রাত্রিতে আহার করিবেন না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, লীলাবতী ও মনোরমা বেলা ১০টার সময় আহার করেন, তাহার পর বেলা ২টার সময় কিঞ্চিৎ জলযোগ করেন এবং রাত্রিতে শয়নের অব্যবহিত পূর্ব্বে ইচ্ছামত আহার করেন। তাঁহারা উভয়ে একত্র আহার করেন, সমস্ত দিন একত্র থাকেন এবং রাত্রিতে একত্র শয়ন করেন। তাঁহারা যে প্রকোষ্ঠে শয়ন করেন, তাহারই পার্শ্বস্থ এক প্রকোষ্ঠে অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী এবং এক ঝি শয়ন করেন।

আমি আহার সমাপ্তির পর উঠিয়া আসিলাম। নানাপ্রকার গল্প চলিতে লাগিল। সমালোচকদের কথা, মাসিক পত্র সকলের প্রসঙ্গ, কেন মাসিক পত্র সকল এরূপ অনিয়মিত তাহার কথা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের কথা, অক্ষয় বাবুর ভাষার কথা, বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের বিচার, প্রভৃতি কত কথাই যে হইল তাহার আর সীমা নাই। আপাততঃ কোন্ কোন্ পুস্তক তাঁহাদের পড়িতে ইচ্ছা তাহার মীমাংসা করিবার ভার তাঁহাদের হস্তেই রাখিয়া দিলাম। সন্ধ্যা হইয়া গেল। দাসী দুইটী সেজ আনিয়া একটী টেবিলের উপর, আর একটী হারমোনিয়মের উপর রাখিয়া দিল।

মনোরমা বলিলেন,—"লীলা, মাষ্টার মহাশয় হয়ত কলিকাতায় কত উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম্ বাজান শুনিয়াছেন। তুমি যে হারমোনিয়ম্ বাজাইতে শিখিয়াছ তাহা কতদূর শ্রবণযোগ্য হইয়াছে, মাষ্টার মহাশয়ের কাছে তাহার পরিচয় দিলে মন্দ হয় না;

অতএব তুমি একটু বাজ্‌না মাষ্টার মহাশয়কে শুনাইয়া দেও না কেন।"

লীলা বলিলেন,—"মাষ্টার মহাশয় যদি দয়া করিয়া আমার বাজ্‌না শুনিতে স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমি বড়ই আহ্লাদিত হইব।"

আমি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। তখন লীলা, হারমোনিয়ম্ সমীপস্থ হইয়া, বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। মধু—মধু—মধুবৃষ্টি হইতে লাগিল। সে শিক্ষা—সে অভ্যাস—সে নিপুণতার কথা কি বলিব? এ জগতে লীলা ঈশ্বরের অপূর্ব্ব সৃষ্টি! তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই কার্য্য। আমার মনপ্রাণ একত্রিত হইয়া কর্ণ-কুহর দিয়া সেই অপূর্ব্ব বাদ্য-সুধা পান করিতে লাগিল। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী এক খানি কোচে বসিয়া বাদ্য শুনিতে শুনিতে নিদ্রিতা হইয়া পড়িলেন। মনোরমা, এক তাড়া চিঠি লইয়া, টেবিলের নিকট বসিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া বাজ্‌না চলিল। তাহার পর লীলা যন্ত্র ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং বলিলেন,—"বড়ই গ্রীষ্ম বোধ হইতেছে। আমি এই খোলা ছাতে একটু বেড়াই।"

কেহই এ প্রস্তাবে আপত্তি করিল না। তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন—আমার দৃষ্টিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী দিব্য ঘুম ঘুমাইতেছেন, মনোরমা চিঠির তাড়া লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন, লীলাবতী খোলা ছাতে বেড়াইতেছেন—এক একবার অনেক দূরে যাইতেছেন, আবার অত্যন্ত নিকটে আসিতেছেন; আমার চক্ষু কেবল তাঁহারই অনুসরণ করিতেছে। এমন সময় মনোরমা বলিলেন,—"মাষ্টার মহাশয় শুনুন।" আমি উঠিয়া গিয়া টেবিলের বিপরীত দিকে দাঁড়াইলাম। মনোরমা বলিলেন,—"এই চিঠিখানির শেষ ভাগটা আমি পড়িতেছি, আপনি শুনুন দেখি। বোধ করি, কলিকাতার পথের বৃত্তান্ত ইহাতে মীমাংসিত হইতে পারে। মাসী মা ১১। ১২ বৎসর পূর্ব্বে, মেসো মহাশয়কে এই পত্র লিখিয়াছিলেন। মাসী মা এবং লীলাবতী সে সময়ে এই আনন্দধামেই ছিলেন, মেসো মহাশয় তৎকালে প্রায়ই পশ্চিমে থাকিতেন। আমি সে সময়টাতে কোন কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতার ঘোষ বাবু মহাশয়দিগের বাটীতে গিয়াছিলাম।"

একবার বাহিরের ছাতে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম বিমল চন্দ্রালোকে বহির্ভাগ আলোকিত। শ্বেতবস্ত্রাবৃতা লীলাবতী, সেই সুন্দর আলোকে, ছাতের উপর পরিভ্রমণ করিতেছেন। কি সুন্দর দেখাইতেছে!

মনোরমা পত্রের শেষভাগ পড়িতে লাগিলেন,—"তুমি ক্রমাগত আমার স্কুলের এবং ছাত্রীগণের বিবরণ শুনিতে শুনিতে হয়ত ত্যক্ত হইয়া উঠিতেছ। কিন্তু প্রাণেশ্বর, সে জন্য যদি কাহাকেও দোষ দিতে হয়, তাহা হইলে সে দোষ আমাকে না দিয়া এই উপলক্ষ-রহিত, কার্য্যান্তরহীন আনন্দধামকেই দোষী করা উচিত। এবার তোমাকে একটী নূতন ছাত্রীর বস্তুতই অতি আশ্চর্য্য বিবরণ জানাইব।'"

"'কমলা নাম্নী আমাদের পল্লিবাসিনী সেই প্রাচীনা কায়স্থ-কামিনীর কথা তোমার মনে আছে তো? কয়েক বৎসর রোগভোগ করার পর, তাঁহার অন্তিমকাল নিকটস্থ হইয়া আসিতেছে—কবিরাজ জবাব দিয়াছেন। হুগলী জেলায় হরিমতি নাম্নী তাঁহার এক ভগ্নী থাকিতেন। দিদির সেবা-শুশ্রূষা করিবার জন্য, হরিমতি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; তাঁহার সঙ্গে তাঁহার মেয়েটীও আসি-

। মেয়েটী আমাদের জীবিতাধিক লীলার চেয়ে প্রায় এক বৎসরের বড়।' ”

আর অধিক দূর পড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে, লীলাবতী আমাদের নিকটস্থ দ্বার পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু তখনই তিনি আবার চলিয়া গেলেন। মনোরমা আবার পড়িতে লাগিলেন,—“হরিমতির চাইল চলন” রীতি প্রকৃতি মন্দ নহে। মেয়ে মানুষটী অর্দ্ধবয়সী—দেখিতেও নিতান্ত মন্দ নহে। বয়সকালে যাহাই হউক, এখনও দেখিলে নিতান্ত বিশ্রী বোধ হয় না—মাঝামাঝি গোছের সুন্দরী বলিলেও বলা যায়। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে কেমন একটী চাপা রকম ভাব আছে, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এমনই চাপা যে, তাঁহাকে দেখিলে সহজেই বোধ হয়, যেন কিছু গোপন করিতেছেন। আর তাঁহার মুখের রকম দেখিয়া বোধ হয়, যেন তাঁহার মনেও কি আছে। স্ত্রীলোকটীর জীবন নিতান্ত রহস্যপূর্ণ বলিয়া আমার মনে হয়। আমার নিকট তিনি একটী সামান্য কার্য্যের জন্য আসিয়াছিলেন। কমলা হয়ত সপ্তাহ মধ্যেই কাল-কবলিত হইতে পারেন, না হয় তো কিছু দিন গড়াইতেও পারেন। যাহাই হউক, যতদিন হরিমতিকে এখানে থাকিতে হইবে, ততদিন তাঁহার মেয়েটী যাহাতে আমার স্কুলে লেখা পড়া করিতে পারে, তাহাই তাঁহার প্রার্থনা। সর্ত্ত এই যে, কমলার মৃত্যুর পর যখন হরিমতি বাটী ফিরিয়া যাইবেন, তখনই তাঁহার মেয়েকে সঙ্গে ফিরিয়া যাইতে দিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, আমি সন্তোষ সহকারে এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়াছি এবং সেই দিনই লীলা ও আমি এই মেয়েটীকে সঙ্গে করিয়া স্কুলে আনিয়াছি। মেয়েটীর বয়স ঠিক এগার বৎসর।' ”

আবার লীলার পরিষ্কার শ্বেত-বর্ণাচ্ছাদিত দেহ আমাদের সমীপাগত হইল। আবার মনোরমা চুপ করিলেন। আবার লীলাবতী দূরবর্ত্তিনী হইলে, মনোরমা পড়িতে লাগিলেন,—“ 'হৃদয়নাথ, আমি এই মেয়েটীকে বড়ই ভাল বাসি। কেন যে তাহাকে এত ভাল বাসি তাহা অগ্রে ব্যক্ত করিয়া তোমার কৌতূহল কমাইয়া দিব না—সকলের শেষে সে কথা বলিব। হরিমতি আমাকে কন্যার সম্বন্ধে আর কোন কথা বলেন নাই, কিন্তু আমি সেই দিনই পড়া বলিয়া দিবার সময় বুঝিতে পারিলাম, মেয়েটির বুদ্ধি, সে বয়সে যেরূপ হওয়া উচিত, সেরূপ পরিণত হয় নাই। সেই দিনই তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাটী লইয়া আসিলাম এবং গোপনে ডাক্তার ডাকাইয়া তাহাকে পরীক্ষা করিতে বলিলাম। ডাক্তার বলিলেন, বয়স হইলে হয়ত ওদোষ সারিয়া যাইবে। তিনি কিন্তু যথেষ্ট যত্নসহকারে তাহাকে পাঠ অভ্যাস করাইতে বলিলেন। তিনি বলেন, বালিকার মর্ম্মগ্রহণ শক্তি যেমন কম, ধারণা শক্তি তেমনই অধিক। একবার যাহা উহার হৃদয়স্থ হইবে, ইহ জীবনে তাহা আর ভুলিবে না। না বুঝিয়া অমনই ভাবিও না যে, আমি একটা পাগলের মায়ায় পড়িয়াছি। না প্রাণেশ্বর, বালিকা মুক্তকেশীর বড়ই মিষ্ট-স্বভাব, কৃতজ্ঞ-হৃদয় এবং সে সহসা মাঝামাঝী ভীত, বা বিস্মিত ভাবে, এমন এক একটি কেমন এক রকম মিষ্ট কথা বলে, তাহা বড়ই ভাল লাগে। এক দিনের কথা বলি শুন। বালিকাটি বেশ পরিষ্কার রঙ্গ চঙ্গে কাপড় পরিয়া থাকে। জানইত তুমি, আমি ছেলে পিলেকে সাদা কাপড় পরাইতে বড় ভালবাসি। আমি তাহাকে লীলার একখানি বাসি করা সাদা ঢাকাইওধে পরিতে দিয়া বলিলাম, তোম

বয়সের মেয়েরা এইরূপ কাপড় পরিলে ভাল দেখায়। মেয়েটি প্রথমে একটু থতমত খাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর, বলিব কি প্রাণনাথ, সে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আকুলভাবে বলিল,—'এখন হইতে আমি সর্ব্বক্ষণই সাদা কাপড় পরিব মা। যখন আমি তোমার কাছে থাকিব না। এবং তোমাকে দেখিতে পাইব না, তখনও সাদা কাপড় পরিলে তোমাকে সন্তুষ্ট করা হইতেছে বলিয়া আমার মনে আনন্দ হইবে মা।' এমনই মিষ্ট করিয়া, এমনই ভাবে কথাগুলি বলিল যে, তাহা এখনও আমার হৃদয়ে বাজিতেছে। আমি তাহার জন্য রকম রকম সাদা কাপড় ক্রয় করিব।' ”

মনোরমা বলিলেন,—"আপনার সহিত পথে যে স্ত্রীলোকটির সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাঁহার বয়স এখন তেইস বৎসর হইতে পারে বলিয়া আপনার মনে হয় কি?"

আমি বলিলাম,—"হাঁ ঐ রকমই বটে।"

"তাঁহার গায়ের কাপড় সকলই সাদা?"

"সকল সাদা।"

তৃতীয় বার আবার লীলাবতী সেই দ্বারের নিকটস্থা হইলেন। এবার তিনি আর চলিয়া গেলেন না; আমাদের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া ছাতের আলিসায় ভর দিয়া, বাগান দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই শুক্ল-পরিচ্ছদাবৃত দেহ পূর্ণ-চন্দ্রালোকে শোভা পাইতে লাগিল। আমার বুক কেমন ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। কি যেন মনে হইতে হইতে আবার চলিয়া গেল। কে জানে মনের মধ্যে কেমন একটা ভাবের আবির্ভাব হইল!

মনোরমা বলিলেন,—"সকলই সাদা। চমৎকার বটে। আপনি যে স্ত্রীলোক দেখিয়াছেন, তাঁহার এবং মাসীমার ছাত্রীর পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আশ্চর্য্য একতা। এরূপ একতা ঘটিবার সম্ভাবনাও অনেক থাকিতে পারে।"

আমি মনোরমার কথা বড় মনোযোগ সহকারে শুনিলাম না। আমি তখন কেবল তদ্গতভাবে লীলাবতীর শ্বেত পরিচ্ছেদের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছি।

মনোরমা কহিলেন,—"এক্ষণে পত্রের শেষাংশ শ্রবণ করুন্। এই অংশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং নিতান্ত বিস্ময়জনক।"

যখন মনোরমা এই কথা বলিলেন, তখন লীলাবতী বেড়াইতে বেড়াইতে আমাদের নিকটস্থ দ্বার-সমীপে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি সন্দিগ্ধভাবে একবার উর্দ্ধে, একবার পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিলেন; তাহার পরে আমাদের দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন।

মনোরমা পত্রের শেষ অংশ পাঠ করিলেন, —"প্রাণেশ্বর! আমার সুদীর্ঘ পত্র শেষ হইয়া আসিতেছে; কেন যে আমি মুক্তকেশীকে এত ভালবাসি, তাহার প্রকৃত কারণ তোমাকে এখন জানাইব; শুনিলে তুমি বিস্ময়াবিষ্ট হইবে। প্রকৃতির আশ্চর্য্য কৌশল! আকৃতির অদ্ভুত সাদৃশ্য! ঐ মুক্তকেশীর চুল, বর্ণ, চক্ষুর ভাব, মুখের আকৃতি—"

মনোরমার কথার শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়াই, আমি চমকিয়া উঠিলাম। সেই নির্জ্জন কলিকাতার রাজপথে, অজ্ঞাত-করস্পর্শে আমার যে ভাব হইয়াছিল, এখন আবার আমার সেই ভাব জন্মিল। লীলাবতী সেই চন্দ্রালোকপূর্ণ স্থানে সেই ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার ভঙ্গী, তাঁহার গ্রীবার পার্শ্বনত ভাব,তাঁহার বর্ণ, তাঁহার মুখের আকৃতি ইত্যাদি এই দূর হইতে দেখিয়া আমার স্পষ্টই মনে হইতে লাগিল,তিনি সেই শুক্লবসনা সুন্দরীর সজীব প্রতিমূর্ত্তি। যে নিদারুণ সন্দেহ বিগত কয়েক ঘণ্টা আমাকে

নিয়ত উৎপীড়ন করিতেছিল, একমুহূর্ত্ত মধ্যে, তাহার, মীমাংসা হইয়া গেল। প্রথম সাক্ষাৎ কালে, সেই যে 'কি যেন নাই' বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল, এখন বুঝিলাম তাহা আর কিছুই নহে, সেই পলাতকা উন্মাদিনীর সহিত আনন্দধামস্থ আমার এই ছাত্রীর অদ্ভুত সাদৃশ্য!

মনোরমা পত্র ফেলিয়া দিয়া, আমার মুখের প্রতি চাহিয়া, বলিলেন,—"আপনি বুঝিতে পারিতেছেন? এগার বৎসর পূর্ব্বে মাসীমা যে সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়াছিলেন, আপনিও এখন সেই সাদৃশ্য বুঝিতে পারিতেছেন?"

আমি বলিলাম,—"কি বলিব? আমার মনের নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, আমি স্পষ্টই সাদৃশ্য দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু সাদৃশ্য হেতু সেই সহায়-হীনা, অপরিচিতা, আশ্রয়-হীনা স্ত্রীলোকের সহিত ঐ বিকাসিতাননা নারীর তুলনার উল্লেখ করিলেও যেন উঁহার ভবিষ্যৎ-জীবনে বিষাদের কালিমা লেপন করা হয়। অতএব এ ভাব চিত্ত হইতে শীঘ্রই অন্তরিত করা আবশ্যক। আপনি অনুগ্রহ করিয়া লীলাবতী দেবীকে ঘরের ভিতর ডাকুন—ওখানে আর থাকিয়া কাজ নাই।

মনোরমা বলিলেন,—"মাষ্টার মহাশয়, আপনার কথা শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছি। স্ত্রীলোকের কথা ছাড়িয়া দিউন, কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, আপনার এরূপ ভ্রান্ত সন্দেহ নিতান্ত আশ্চর্য্যের কথা বটে!"

আমি বলিলাম,—"যাহাই হউক, আপনি লীলাবতী দেবীকে ডাকুন।"

"চুপ করুন, লীলা আপনিই আসিতেছে। এখন লীলাকে, বা আর কাহাকেও এ সকল কথা জানাইয়া কাজ নাই। লীলা এ দিকে এস। ঠাকুরাণীর ঘুম তো ভাঙ্গে না দেখছি; তুমি চেষ্টা কর দেখি, যদি ভাঙ্গাইতে পার।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এইরূপে আনন্দধামে আমার প্রথম দিন কাটিয়া গেল। মনোরমা ও আমি এ রহস্য আর ভাঙ্গিলাম না। সাদৃশ্য সম্বন্ধীয় রহস্য ব্যতীত, আর কোন রহস্যও জানিতে পারা গেল না। একদিন সুযোগক্রমে মনোরমা অতি সতর্কতা সহকারে লীলাবতীর নিকট মুক্তকেশীর কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে একটী বালিকার সহিত লীলার আকৃতিগত সাদৃশ্য ছিল, এ কথা লীলাবতীর মনে পড়িয়াছিল মাত্র কিন্তু আর কিছু বিশেষ বৃত্তান্ত তিনি বলিতে পারেন নাই। ইহা তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, ঐ বালিকার নাম মুক্তকেশী। সে কয়েক মাস মাত্র আনন্দধামে ছিল, তাহার পর হুগলী চলিয়া যায়। তাহার মা ও সে আর কখন এখানে আসিয়াছিল কি না, তাহা তাঁহার মনে নাই। তাহাদের নাম তিনি আর কখন শুনেন নাই। মনোরমা, অবশিষ্ট পত্রাদি পাঠ করিয়াও আর কোন নূতন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। যতটুকু বিবরণ সংগ্রহ করা হইল, তাহাতে বুঝা গেল যে, কলিকাতার পথে যাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, সে এবং মুক্তকেশী একই স্ত্রীলোক। আরও বুঝা গেল, মুক্তকেশীর বাল্যকালে যে চিত্তচাঞ্চল্য ছিল, যৌবনেও তাহা তেমনই আছে। এ সন্ধানের এ স্থানেই আপাততঃ শেষ।

দিনের পর দিন এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলিয়া যাইতে লাগিল। সুখে—আনন্দে সময় কাটিতে থাকিল। কিন্তু যে সকল সুখ, যে সকল আনন্দ তৎকালে অজস্র-ধারায় আমার

হৃদয়-ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়াছিল, এখন ভাবিয়া দেখিতেছি তাহার কয়টা সারবান্—কয়টা মূল্যবান্! বিগত জীবন আলোচনা করিয়া কেবল নিজের অপূর্ণতার, ত্রুটির এবং জ্ঞান-হীনতারই পরিচয় পাইতেছি।

আমার এই জ্ঞানহীনতার ও ত্রুটির কথা ব্যক্ত করিতে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না; কারণ সে কথা পূর্ব্বেই অজ্ঞাতসারে আমি একরূপ বলিয়া ফেলিয়াছি। যখন আমি লীলাবতীর রূপ-বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারি নাই, যখন ভাষা আমার সহায়তা করিতে একটুও অগ্রসর হয় নাই, তখন কি সুচতুর পাঠক, সে কথা বুঝিতে পার নাই? যদি না পারিয়া থাক, তাহা হইলে এখন মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি,—আমি তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছি।

না জানি কত জনই আমার এই কথা শুনিয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিবেন। কিন্তু আমি করিব কি? যদি কোন করুণ-হৃদয়া সুন্দরী আমার এইকথা পাঠ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করেন, আমার দীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহার সহিত মিলিত হইবে। আর যদি কোন কঠিন-হৃদয় পুরুষ, পরিহাসের হাসি হাসিয়া, আমার কথা উড়াইয়া দেন, আমি অগত্যা তাহা নীরবে সহ্য করিব। আমাকে ঘৃণাই কর, অথবা দয়া করিয়া আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ কর, আমি সত্যের অপলাপ করিতে পারিব না। আমি তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছি।

কিন্তু আমার দোষ স্খালন করিবার কি কোনই যুক্তি নাই? আমি আনন্দধামে যেরূপ ভাবে কাল কাটাইতাম, তাহা শুনিলে অবশ্যই তাহার মধ্য হইতে আমার নির্দ্দোষতার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, পাঠক, কিরূপ ভাবে আমাকে এই আনন্দধামে কালাতিপাত করিতে হইত। প্রাতঃকাল হইতে বেলা ১০ টা পর্য্যন্ত আমি নিয়ত রায় মহাশয়ের সেই প্রাচীন পুঁথির আলোচনা করিতাম। সে গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় কি? প্রেম, সৌন্দর্য্য ও শোভা। সেই সকল উচ্চ-কল্পনা-সম্ভূত, সদ্ভাব-পূর্ণ, প্রেম-চিত্র দর্শন করিতে করিতে, আমার মন স্বতই নিতান্ত প্রেম-প্রবণ হইয়া উঠিত; সেই গ্রন্থোক্ত মনোহর সৌন্দর্য্য-বর্ণন পাঠ করিতে করিতে অন্তরে স্বভাবতঃ লীলাবতীর অপূর্ব্ব মাধুরীর সহিত গ্রন্থবর্ণিত সৌন্দর্য্যের তুলনা করিতে প্রবৃত্তি হইত। তুলনায় কি বুঝিতাম? বুঝিতাম কবির কল্পনা যে সৌন্দর্য্য সংগঠনে সক্ষম, তাহা বাস্তব লীলাবতীর সৌন্দর্য্যের সমীপস্থ হইতেও সমর্থ নহে। গ্রন্থে পরম শোভাময় দৃশ্য মধ্যে পরমা-সুন্দরী তরুণীর বিবরণ পাঠ করিয়া, মনে হইত, সে কবি কখনই আনন্দ উদ্যানের মনোহর নিকুঞ্জ মধ্যস্থ লীলাবতী সুন্দরীকে দেখেন নাই; তাহা দেখিলে তাঁহার কল্পনা তাদৃশ অঙ্গহীন অপূর্ণ-চিত্র পাঠক সমক্ষে উপস্থিত করিয়া কদাচ গৌরব-প্রার্থী হইত না। এইরূপ চিন্তায়, এইরূপ আলোচনায়, স্নানাহার সমাপ্ত করিয়া, বিশ্রামার্থ উপবিষ্ট হইলেও এবংবিধ চিন্তা ও তর্কের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতাম না। তাহার পর সমস্ত বৈকালটা সেই ভুবনমোহিনীর নয়ন-সমক্ষে আমি থাকিতাম এবং আমার নয়ন-সমক্ষে তিনি থাকিতেন। মনোরমার পরম রমণীয় সরলতা এবং লীলাবতীর অপরিমেয় সৌন্দর্য্য, অদৃষ্ট-পূর্ব্ব কোমলতা এবং অসাধারণ মধুরতা আমাকে সমস্ত অপরাহ্ণ মাতাইয়া রাখিত। লীলাবতী কবিতা রচনা করিতেন, এক এক দিন তাহা আমাকে শুনাইতেন। কেমন মধুর ভাবে, সুন্দর স্বরে, সুন্দর গ্রীবা সুন্দররূপে আন্দোলন করিতে

করিতে, সেই সকল কবিতা আমাদের সমক্ষে পাঠ করিতেন! কেমন করিয়া বলিব যে, সে ভাব, সে কবিতা, সে অধ্যয়ন আমার হৃদয়ে আঘাত করিত না! তাহার পর আরও বলি, হস্তাক্ষরের উন্নতি করিতে লীলার বড় অনুরাগ ছিল। তিনি চেয়ারে বসিয়া, টেবিলে কাগজ রাখিয়া লিখিতেন; আমাকে হয় তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, না হয় তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া, অনেক সময় লেখার দোষ, গুণ বিচার করিতে হইত এবং কখন কখন কি হইলে লেখা আরও ভাল হয়, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আমাকে নত হইয়া, তাঁহার লেখার পার্শ্বে লিখিতে হইত। তখন আমার বদন লীলাবতীর বদন-কমলের সমীপস্থ হইত, লীলাবতীর সুরভি নিশ্বাস আমার নাসা-রন্ধ্রে প্রবেশ করিত,আমার গণ্ডে তাঁহার গণ্ড মিলিত হয় হয় হইত! কি জানি তখন কি অপূর্ব্ব ভাবে আমার হৃদয় শিহরিয়া উঠিত, প্রাণের ভিতর কেমন ঝন ঝনা বাজিয়া উঠিত। এইরূপ বিভিন্ন ভাবে দিন কাটিত। কত সময় কত কথায়, তাঁহার মধুর অধরে মধুর হাসি দেখা দিত, কত সময় তাঁহার এক একটী কথা কেমন অলক্ষিত ভাবে, আমার হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিত, আর কত সময় মনোরমা এবং অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর কথা আমার চিত্তের এই আবেগময় ভাব আরও পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিত। হয়ত কোন।,সময় মনোরমা বলিতেন,—'মাষ্টার মহাশয় আর লীলাবতী দুজনের একই রকম। দুজনেরই দিবারাত্রি কেবল পড়া আর লেখা, লেখা আর পড়া!' অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী কখন হয়ত বলিতেন,—দেবেন্দ্র বাবুর মত সুশ্রী পুরুষ এবং লীলাবতীর মত সুন্দরী মেয়ে আমার চক্ষে আর কখন পড়ে নাই।' এ সকল কথা তাঁহারা সরলভাবে ও সরল বিশ্বাসের বশে বলিতেন; কিন্তু আমার উন্মত্ত হৃদয় সে সকল কথার অন্তরূপ অর্থ কল্পনা করিয়া সুখী হইত। এই সকল নানা কারণে, আমি ক্রমশঃ এই দুরাশা সাগরে ডুবিয়াছি। ভাল বল, মন্দ বল, আমি তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছি!

তাহার পর তোমরা বলিতে পার, স্বীয় পদ ও অবস্থা স্মরণ করিয়া আমার পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। কথা ঠিক বটে! কিন্তু সত্য কথা বলিলে তোমরা বিশ্বাস করিবে কি? আমি কি পূর্ব্ব হইতে জানিতাম যে, আমার হৃদয়ের এইরূপ পতন হইবে? কত সময়, কত দিন, আমি তো কতই ভদ্র ও সুন্দরী মহিলামণ্ডলীর মধ্যে বিচরণ করিয়াছি, কত সুন্দরী নারীর সহিত পুনঃ পুনঃ কতই আলাপ করিয়াছি, কতই কথাবার্ত্তা কহিয়াছি কিন্তু কখনই আমার মনের এরূপ ভাব— এমন হৃৎকম্প হয় নাই তো? তবে হৃদয়কে অবিশ্বাস করিব কেন? আমার হৃদয় পরীক্ষিত, সাবধান এবং নিতান্ত দীন বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল। সে হৃদয় এরূপে ভগ্ন হইবে, তাহার এতাদৃশ পতন ঘটিবে, অথবা তাহা এরূপ স্পর্দ্ধিত হইবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর কথা। যখন বুঝিলাম, আমার হৃদয়ের পূর্ব্ব ভাব আর নাই, সে সাবধানতা, সে আত্মাবস্থাজ্ঞান সে মনোবৃত্তির নিরতিশয় অধীনতা আর নাই, তখনই আমি হৃদয়বেগ মন্দীভূত করিয়া দিয়া, তাহার গতি ভিন্ন পথাবলম্বী করিয়া দেওয়া বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে করিলাম। তখনই হৃদয়কে বুঝাইতে, বিহিত বিধানে সাবধান করিতে উদ্যত হইলাম, কিন্তু বুঝিলাম যে, আমার হৃদয় আর আমার নহে। আর তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করা বৃথা! সে এখন সম্পূর্ণরূপে শাসনের বাহিরে গিয়াছে। বুঝিলাম, আমার হৃদয় পূর্ণমাত্রায়

লীলাবতীকে ভাল বাসিয়াছে; সেখানে আর প্রবোধ বা উপদেশ, শাসন বা সান্ত্বনার স্থান নাই।

কিন্তু এ কথা এতদিন কেন বুঝি নাই? বরও পূর্ব্ব হইতে কেন সাবধান হইবার চেষ্টা করি নাই? মনের গতি কেন আগেই অনুভব করি নাই? যখন শত সহস্র কার্য্যে প্রতি হৃৎস্পন্দনে, প্রতি চিন্তার মধ্য হইতে, হৃদয়ের এই ভাব ও এই গতি ধরিলে ধরা যাইত, তখন কেন ধরি নাই? তাহারও একই উত্তর। যে অন্ধতা আমাকে অগ্র-পশ্চাৎ কিছুই দেখিতে না দিয়া, একই পথে লইয়া গিয়াছিল, সেই অন্ধতাই আমাকে মূলে হৃদয়ের ভাব দেখিতে না দিয়া, এই বিষম দুরাশা সাগরে আনিয়া মজাইয়াছে।

এই অবস্থায় দিন কাটিতে লাগিল! এক দিন, দুই দিন করিতে করিতে ক্রমে তিন মাস অতীত হইয়া গেল। ভূত ভবিষ্যৎ আমার তখন মনে নাই—নিজের অবস্থা জ্ঞান নাই; চিত্ত একমাত্র সুখময়ী কল্পনায়—একমাত্র বিষম ধ্যানে মগ্ন। সহসা এক দিন, এক মুহূর্ত্তে, আমার অবস্থা বিষয়ক জ্ঞান জন্মিল,—আমার কল্পনার ঘোর ভাঙ্গিল।

এক দিন প্রাতে—ওঃ কি বিষম দিন! এক দিন প্রাতে দেখিলাম লীলার বদন-কমল ভাবান্তরিত। কল্য বৈকালে যে লীলা দেখিয়াছি, আজি আর সে লীলা নহেন। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া, তাঁহার নয়নের বিষাদময় দৃষ্টি দেখিয়া, আমি তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে যে কোন গুরুতর বিষাদের অঙ্কপাত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম। বুঝিতে পারিলাম সে দৃষ্টি—সে ভাব তাঁহার নিজের জন্যও কাতর—আমার জন্যও ব্যথিত। তাঁহার পবিত্র হৃদয়-মধ্যে প্রবেশ করিতে, তথাকার ভাব বর্ণনা করিতে আমার কোনই অধিকার বা ক্ষমতা নাই। তথাপি তাঁহার ভাব দেখিয়া আমার বোধ হইল, তিনি কেবল আমার জন্যই কাতর নহেন, তাঁহার নিজের জন্যও কাতরতার অভাব নাই।

আর দেখিলাম মনোরমার বদন-মণ্ডলও প্রফুল্লতা পরিশূন্য—দারুণ চিন্তায় সমাচ্ছন্ন। আমি বুঝিলাম, আমার দুরাশা—আমার প্রগল্ভতা—আমায় আত্মাবস্থা অতিক্রম করিয়া এই অত্যুচ্চ আকাঙ্ক্ষা লীলাবতী ও মনোরমার এই কাতরতার কারণ। মন বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কি করিলে—কি উপায়ে সকলের হৃদয়ে পুনরায় পূর্ব্ববৎ শান্তির আবির্ভাব হইবে, ইহাই আমার চিত্তের প্রধান আলোচ্য হইয়া উঠিল। চিন্তা যথেষ্ট করিলাম, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। কোনই মীমাংসা আমার দ্বারা সম্ভাবিত নহে—আমি কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। অবশেষে এক দিন মনোরমার স্পষ্টভাষিতা, সরলতা এবং উদরতা আমার এই দারুণ দুরবস্থার শেষ করিয়া দিল; কটুকষায় হইলেও উপযুক্ত ঔষধ দ্বারা, তিনি আমার এই বিষম ব্যাধির চিকিৎসা করিলেন এবং আমাকে ও সঙ্গে সঙ্গে এই আনন্দধামের আরও কাহাকে কাহাকে বিজাতীয় বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সে দিন শুক্রবার। আমি প্রাতঃকালে বেলা অনুমান আটটার সময়, একটী বিশেষ প্রয়োজন হেতু, পাঠাগারে প্রবেশ করিলাম।

দেখিলাম ঘরে কেহই নাই। চারিদিকে ফুলের সুদৃশ্য টবপূর্ণ বাহিরের বারান্দায় লীলাবতী ধীরে ধীরে পরিক্রমণ করিতেছেন দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম তাঁহার বদনের সেই বিষাদময় ভাব। তিনি আমাকে দেখিবামাত্র একটু হাস্য করিলেন, কিন্তু সে হাস্য শুষ্ক—নীরস—অস্বাভাবিক। তিনি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন না। হায়! সপ্তাহদ্বয় পূর্ব্বে আমাদের এমন সঙ্কুচিত ভাব ছিল না তো? তখন লীলাবতী আমার নিকট আসিতে একটুও সঙ্কুচিতা হইতেন না তো? তখন আমাকে দেখিলে তাঁহার মুখে এমন শুষ্ক হাসি পরিদৃষ্ট হইত না তো? হায়! সে দিন কোথায় গেল? সে দিন কি আর ফিরাইবার উপায় নাই?

তখনই মনোরমা সেই স্থানে আগমন করিলেন। তিনি আসিবামাত্র লীলাবতী ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিলেন। মনোরমা বলিলেন,—"মাষ্টার মহাশয়! কতক্ষণ আসিয়াছেন? আমাদের কাহাকেও এখানে না দেখিয়া আপনি হয়ত বিরক্ত হইয়াছেন!"

আমি বলিলাম,—আপনার সহিত এক্ষণে দেখা করিবার আমাদের প্রয়োজন ছিল না। আর এরূপ সময়ে আপনারা এখানে থাকিবেন, আমি তাহা প্রত্যাশাও করি নাই।"

মনোরমা তাহার পর লীলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, যেন দুইবার—তিনবার চেষ্টার পর বলিলেন,—লীলা, আমি কাকা মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়াছিলাম। হোরিঘরটাই ঠিক করিয়া রাখা তাঁহার ইচ্ছা। আর আমি যাহা বলিয়াছিলাম তিনিও তাহাই বলিলেন—মঙ্গলবার নহে তো—সোমবার।"

এ সকল কথার অর্থ আমি কিছুই বুঝিলাম না; কিন্তু লীলাবতীর বড়ই উৎকণ্ঠিত, ব্যাকুল, কাতর ও অবসন্ন ভাব লক্ষিত হইল। আমার বোধ হয়, মনোরমাও সে ভাবান্তর বুঝিতে পারিলেন। তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; লীলাবতী তাঁহাকে গমনোদ্যতা দেখিয়া অগ্রেই গৃহ-ত্যাগ করিলেন। গমন কালে তাঁহার সেই বিষাদ-ভারাবনত কাতর নয়ন আমার নয়নের সহিত মিলিত হইল। হায়! কেন আনন্দধামে শিক্ষকতা করিতে আসিয়াছিলাম?

লীলাবতী চলিয়া গেলে, মনোরমা বলিলেন,—"মাষ্টার মহাশয়, এক্ষণে আপনার বিশেষ কাজ আছে কি? আপনার সহিত দুইটা কথা ছিল। বোধ হয় বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে তাহা শুনিতে আপনার কষ্ট না হইতে পারে।"

আমি বলিলাম,—"চলুন। আমার এক্ষণে কোনই বিশেষ কাজ নাই।"

আমরা নীচে নামিবামাত্র দেখিলাম বাগানের ছোক্‌রা মালী একখানি পত্র লইয়া আসিতেছে। মনোরমা জিজ্ঞাসিলেন,—"কাহার পত্র? আমার নাকি?"

মালী বলিল,—"না দিদি বাবু—চিঠি ছোট দিদি বাবুর।"

মনোরমা পত্র লইয়া তাহার শিরোনাম পাঠ করিয়া দেখিলেন, তাহা অপরিচিত হস্তে লিখিত। জিজ্ঞাসিলেন, -"কে এ পত্র দিল?"

মালী বলিল,—"একটা মেয়েমানুষ আমাকে এ চিঠি দিয়াছে।"

মনোরমা জিজ্ঞাসিলেন,—"কি রকম মেয়েমানুষ?"

"ওঃ বড় বুড়ো!"

"বুড়ো? তাকে তুমি চেন?"

"আজ্ঞে না—আমি চিনি না।"

"কোন্ দিকে সে মেয়েমানুষ গেল?"

বালক অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, হাত নাড়িয়া, দক্ষিণ দিক দেখাইয়া দিল।

মনোরমা বলিলেন,—"হয়ত কাহার ভিক্ষার পত্র।"

তাহার পর বালকের হস্তে পত্র ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন,—"বাটীর ভিতর গিয়া, কোন ঝির দ্বারা ছোটদিদির কাছে পত্র পাঠাইয়া দেও।" বালক পত্র লইয়া প্রস্থান করিল। তাহার পর মনোরমা আমাকে বলিলেন,—"এখন মাষ্টার মহাশয়, যদি আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে এই দিকে আসুন।"

যে স্থানে আমার সহিত লীলাবতীর প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে মনোরমা আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে উপনীত হইলেন। বলিলেন,—"আমার যাহা বক্তব্য আছে, এই স্থানেই তাহা বলিব।"

এই বলিয়া তিনি এক আসনে উপবেশন করিলেন এবং আমাকে অপর এক আসনে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তিনি যাহা বলিলেন তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিলাম। তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন,—মাষ্টার মহাশয়, অনর্থক বাগাড়ম্বর আমি ভাল বাসি না, ঘোর ফের করিয়া কথা বলিতেও আমার অভ্যাস নাই; অতএব আপনাকে আজি যাহা বলিব, তাহা স্পষ্ট ও সরল ভাবেই বলিব। এতদিন একত্র অবস্থান করিয়া আপনার স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে আমার যেরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহাতে আমি হৃদয়ের সহিত আপনাকে প্রকৃত বন্ধু বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। কলিকাতার পথে, ঘোর রাত্রিকালে, নিঃসহায়া, দুঃখিনীর বিপদ উদ্ধারের নিমিত্ত আপনি যে যত্ন করিয়াছিলেন, তাহার সকরুণ প্রার্থনা সমস্ত যেরূপ পূরণ করিয়াছিলেন, তাহার দুঃখে যেরূপ আন্তরিক দুঃখী হইয়াছিলেন, সেই বৃত্তান্ত যে দিন আপনি আমার সমক্ষে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই আপনার প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। ক্রমে ব্যবহার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছি, আমার শ্রদ্ধা অপাত্রে অর্পিত হয় নাই—আপনি প্রকৃতই শ্রদ্ধার পাত্র।"

মনোরমা একটু চুপ করিলেন। বহুকাল পরে আজি আব'র সেই শুক্লবসনা কামিনীর উল্লেখ হইল। মনোরমার কথায় সেই দুঃখিনীর সমস্ত বৃত্তান্ত স্মৃতি-পথারূঢ় হইল এবং চিত্ত-মধ্যে জাগরূক রহিল; অচিরে তাহার ফলও ফলিল।

মনোরমা বলিলেন,—"দেবেন্দ্র বাবু, আপনার হৃদয়স্থ রহস্য আমার অবিদিত নাই। জানিবেন, কেহ আমাকে তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলে নাই, ইঙ্গিত বা আভাসও দেয় নাই, তথাপি আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি। মাষ্টার মহাশয়, আপনি ভবিষ্যতের ভাবনা না ভাবিয়া, অগ্র পশ্চাৎ না দেখিয়া, আমার ভগ্নী লীলাবতীর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ হৃদয়-মধ্যে স্থান দিয়াছেন। আমি আপনাকে তাহা স্বীকার করাইয়া ক্লিষ্ট করিতে বাসনা করি না; মহাশয়ের ন্যায় ভদ্রলোক যে তাহা অস্বীকার করিতে অক্ষম ত'হা আমি বিশেষ জানি। আমি আপনাকে সে জন্য নিন্দা করিতেছি না—আপনি এই নিষ্ফল প্রেমে হৃদয় সমর্পণ করিয়াছেন বলিয়া আমি দুঃখ করিতেছি মাত্র। আপনি কখন আমার ভগ্নীর সহিত গোপনে কথাবার্ত্তা কহেন নাই; সুতরাং আপনাকে দোষী করিবার কোনই কারণ নাই। এ বিষয়ে আপনার দোষ—আপনি স্বীয় অবস্থা ও স্বার্থ ভুলিয়া দুরাশা-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আর কোন অংশেই আপনাকে দোষী করা যায় না। যদি আপনার ব্যবহার ভদ্রতার

পথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত বলিয়া বোধ হইত, তাহা হইলে ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া, আপনাকে তখনই আমি আনন্দধাম হইতে বিদূরিত করিবার অনুজ্ঞা প্রচার করিতাম এবং অপর কাহারও সহিত কথা কহিতেও আপনাকে সময় দিতাম না—অপর কাহারও মতের অপেক্ষাও করিতাম না। ঈশ্বরেচ্ছায় সেরূপ ব্যবহার হয় নাই, এজন্যই আজি আমি কেবল আপনার বিবেচনার নিন্দা করিতেছি। মাষ্টার মহাশয়, আমার উপর রাগ করিবেন না। আমি আপনাকে কষ্ট দিয়াছি—আরও কষ্ট দিব। আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমাকে আত্মীয় বলিয়া জানিবেন।"

আমি মনোরমার এই সরলতা পূর্ণ, আত্মীয়তা-পূর্ণ, কথা শুনিয়া মোহিত হইলাম। নানাবিধ ভাব-তরঙ্গ আমার হৃদয়-সাগরে প্রবল ঝটিকা উত্থাপিত করি আমাকে দিশাহারা করিয়া তুলিল। আমি কি বলিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কথা মুখ হইয়া বাহির হইল না।

মনোরমা আবার বলিতে লাগিলেন,—"দেবেন্দ্র বাবু, আমি এক্ষণে যাহা বলিব, ভাবিবেন না যে ধন-সম্পত্তির, বা অবস্থার বৈষম্য হেতু তাহা বলিতেছি। মাষ্টার মহাশয়, আরও অধিক অনিষ্ট ঘটিবার পূর্ব্বেই, আপনাকে আনন্দধাম ত্যাগ করিতে হইবে। কর্ত্তব্যানুরোধে আপনাকে এই কঠোর কথা বলিতে হইল। আবশ্যক হইলে—এইরূপ ঘটনা আর কখন ঘটিলে, বঙ্গ দেশের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পদ-প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন-বংশ-সম্ভূত কোন ব্যক্তি হইলেও, তাঁহাকেও হয়ত কর্ত্তব্যানুরোধে অবিকল এই কথা বলিতে হইবে। অতএব মাষ্টার মহাশয়, ঐশ্বর্য্যের অভাব, পদের হীনতা, বা তথাবিধ কারণে আমি এ সকল কথা বলিতেছি এরূপ মনে করিবেন না। আমি যাহা বলিতেছি, তাহার অন্য কারণ আছে———"

মনোরমা নীরব হইলেন এবং আমার কর দ্বয় স্বীয় করে ধারণ করিয়া নয়নে নয়নে সম্মিলিত করিয়া বলিলেন,—"তাহার অন্য কারণ আছে। লীলাবতীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া রহিয়াছে।"

আমূল ছুরিকা আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল! বাহ্যজ্ঞান আমাকে ত্যাগ করিল। যে কর-যুগল আমার কর-দ্বয় ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাহার স্পর্শ আমার বোধাতীত হইয়া গেল। পার্শ্বে ও পশ্চাতে শুষ্ক বৃক্ষপত্র সমূহ বায়ু-ভরে যেরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,এখন আমার উন্মাদ আকাঙ্ক্ষার সেই দশা। সম্বন্ধ স্থির থাকুক না থাকুক, আমার পক্ষে সকলই সমান দুরাশা। হা বিধাতঃ!

যন্ত্রণার প্রথম বেগ অতীত হইয়া গেল। বুঝিতে পারিলাম, মনোরমা তখনও আমার হস্ত ধারণ করিয়া আছেন। আমি মুখ তুলিলাম! দেখিলাম মনোরমা সুতীক্ষ্ণ নয়নে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া আছেন।

মনোরমা বলিলেন,—"চূর্ণ করিয়া ফেলুন। দেবেন্দ্র বাবু, যে স্থানে তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছিলেন, সেই স্থানেই এ দুরাশা চূর্ণ করিয়া ফেলুন; অধম স্ত্রীলোকের ন্যায় কাতর হইবেন না। আপনি পুরুষ—পুরুষের ন্যায় দৃঢ়তা সহকারে হৃদয় হইতে বাসনা উন্মূলিত করিয়া ফেলুন—পদ-বিদলিত করিয়া দূর করিয়া দিউন।"

মনোরমার বাক্যর তেজ, তাঁহার দৃঢ়তা, তাঁহার সৎপরামর্শ ও তাঁহার সদুদ্দেশ্য সমস্ত আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল এবং অনতিকাল মধ্যে আমি অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইলাম

বটে। আমি আত্ম-চিত্তের উপর কিয়ৎপরিমাণে প্রভুতা লাভ করিয়া মনোরমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম এবং ভবিষ্যতে আমি তাঁহারই উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিব বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম।

মনোরমা বলিলেন,—আমার ভগ্নীর আজ্ঞাতসারে তাঁহার মনের যে ভাব আমি জানিতে পারিয়াছি, তাহাও আপনার নিকট হইতে গোপন করিতে চাহি না। আপনাদের উভয়ের মঙ্গলের জন্য আমি বলিতেছি যে, আপনি এস্থান ত্যাগ করুন। আপনার বাঞ্ছনীয় সঙ্গ এবং নির্দ্দোষ আত্মীয়তা পরম স্পৃহণীয় হইলেও, তাহাতে লীলার চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটিয়াছে এবং সে নিতান্ত অসুখী হইয়া পড়িয়াছে। আমি তাহাকে প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভালবাসি এবং অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে আমার যেমন অচল বিশ্বাস, আমি লীলার উদার, পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হৃদয়কে তেমনই বিশ্বাস করিয়া থাকি। আমি জানিতে পারিতেছি, মাষ্টার মহাশয় লীলার হৃদয়ে তাহার স্থিরীকৃত বিবাহের বিরোধী ভাবের আবির্ভাব হওয়ায়, তাহার কি অসহনীয় আত্ম-গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, লীলার যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া আছে, তাহা তাহার হৃদয় কখনই অধিকার করে নাই। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে লীলার ভাবান্তর জন্মিবে কেন? লীলার পিতা মৃত্যু-কালে এই বিবাহ স্থির করিয়া যান; লীলার প্রণয় বা অনুরাগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সে সম্বন্ধ স্থির করা হয় নাই। পিতার আদেশ পালন করিতে লীলা বাধ্য; সুতরাং লীলা এ সম্বন্ধে অ-মত করে নাই— করিতে তাহার সাধ্যও নাই। আপনি যতদিন এখানে না আসিয়াছিলেন, ততদিন লীলার মনে কোনই বিরুদ্ধ ভাব ছিল না। আমার বোধ হয়, আপনি যদি হৃদয়-বেগ সংযত করিতে পারেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, এই নবীন ভাব লীলার হৃদয়ে এখনও বদ্ধ-মূল হয় নাই। আপনি নয়নান্তরালে থাকিলে, আমার বোধ হয়, লীলার এই ভাব ক্রমশঃ মন্দীভূত হইবে এবং সম্ভবতঃ সময়ে সকল অমঙ্গল সম্ভাবনা বিদূরিত হইয়া যাইবে। আর আপনাকে কি বলিব? কলিকাতার সেই জনহীন পথে নিশাকালে সেই অপরিচিতা অসহায়া স্ত্রীলোক আপনার শরণাগত হইয়া আশাতিরিক্ত করুণা লাভ করিয়াছিলেন; প্রার্থনা করি, অদ্য আপনি আপনার ছাত্রীর মঙ্গলার্থ, সেইরূপ সদ্ব্যবহার ও অপরিসীম ত্যাগস্বীকার করিবেন।”

আবার এস্থলে দৈবাৎ সেই শুক্লবসনা সুন্দরীর উল্লেখ! কি জানি; তাহার কথা বাদ দিয়া লীলাবতী ও আমার কথা কি চলিবার উপায় নাই? কি জানি, নিয়তির কি লেখা!

আমি বলিলাম,—“বলুন আমাকে, আমি এখন কি উপায়ে রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব? তিনি বিদায় দিলে, কোন্ সময়ে আমার চলিয়া যাওয়া আবশ্যক? আমি অতঃপর, সর্ব্বপ্রকারে আপনার উপদেশাপেক্ষী হইয়া চলিব।”

মনোরমা বলিলেন,—“সময়ের কথাই কথা। আপনার মনে আছে বোধ হয়, আমি লীলাকে সোমবার এবং হোরিঘরের কথা বলিতেছিলাম। সোমবারে যিনি আসিবেন তিনিই—”

আবারও কি বলিতে হইবে? এখনও কি বুঝিতে বাকী আছে যে, সোমবারে যিনি আসিবেন তিনিই লীলাবতীর ভবিষ্যৎ স্বামী। আমি মনোরমার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম,

—"আমি আজিই যাই না কেন? যত শীঘ্র যাওয়া ঘটে, ততই মঙ্গল।"

মনোরমা বলিলেন,—"না, তাহা হইবে না। আপনি জানেন কাকা মহাশয় কেমন লোক। তিনি যদি বুঝিতে পারেন, আপনি বিশেষ কারণ ব্যতীত যাইতেছেন, তাহা হইলে আপনার যাওয়া ভার হইয়া উঠিবে। কল্য ডাক আসিবার সময়ের পর আপনি তাঁহার নিকট বিদায়ের প্রস্তাব করিলে, তিনি মনে করিতে পারেন যে, হয়ত আপনার যাওয়ার জন্য বিশেষ কোন পত্র আসিয়াছে; সুতরাং মত দিতে পারেন। আপনি কিন্তু ইহারই মধ্যে আর সব ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া রাখিয়া দিবেন, তাহা হইলে আপনার যাওয়ার কোন ব্যাঘাত হইবে না বোধ হয়। কি দুঃখের বিষয় দেবেন্দ্র বাবু নির্দ্দোষ কার্য্যের জন্যও আমাদিগকে কপটতা অবলম্বন করিতে হইতেছে।"

তাঁহার কথামত কার্য্য করিব এই কথা বলিতে যাইতেছি, এমন সময়ে মনুষ্যের পদ-শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। না জানি কে? লীলাবতী না হইলেই বাঁচি! কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন! যে লীলাবতী আমার হৃদয়ের আরাধ্যা দেবী, আজ আর তাঁহাকে দেখিতেও সাহস নাই! বাঁচা গেল—যে আসিতেছে সে লীলাবতী নহে, লীলাবতীর একজন দাসী। দাসী মনোরমাকে বাহিরে আসিতে সঙ্কেত করিল। তিনি তাহার সহিত চলিয়া গেলেন।

আমি একাকী বসিয়া কতই চিন্তা করিতে লাগিলাম। কিন্তু এ কি উৎপাত! আবার সেই শুক্লবসনা কামিনীর কথা ক্রমে ক্রমে মনে আসিয়া উপস্থিত হইল। কি দায়! সকল চিন্তা, সকল কথা, সকল বিষয়ের মধ্যেই কি সে আসিবে? তাহার সহিত আবার কখন কি আমার সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা আছে? কিছু না। কলিকাতায় আমি থাকি তাহা কি সে জানে? জানে বই কি? তাহাকে আমি একথা বলিয়াছিলাম। রাজা উপাধিধারী কোন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ আছে কি না, এই অদ্ভুত প্রশ্নের পূর্ব্বেই হউক, কি পরেই হউক, একথা তাহাকে আমি বলিয়াছিলাম।

অত্যল্পকাল পরেই মনোরমা ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার বদনের কিছু ব্যাকুল ভাব। তিনি বলিলেন,—"দেবেন্দ্র বাবু আমাদের পরামর্শ সমস্তই স্থির হইয়াছে, এক্ষণে চলুন আমরা বাটীর ভিতর যাই। আমি লীলার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়াছি। ঝি বলিল, লীলা একখানি পত্র পাইয়া বড় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে—নিশ্চয়ই সে মালী আমাদিগকে যে পত্র দেখাইতেছিল সেই পত্র।"

আমরা ব্যস্ততা সহ চলিলাম। মনোরমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু আমার এখনও বলিবার অনেক কথা রহিয়াছে। লীলার স্বামী আসিবেন; তিনি কেমন লোক তাহা জানিবার জন্য আমার হৃদয় প্রবল কৌতূহল ও ঈর্ষাময় আগ্রহে পূর্ণ হইয়াছে। হয়ত ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার অন্য সুযোগ উপস্থিত না হইতে পারে; অতএব এই সময়ে জিজ্ঞাসা করাই সুবিধা।

আমি বলিলাম,—"আপনি বুঝিয়াছেন বোধ হয়, আমি হৃদয়কে যথেষ্ট সহিষ্ণু করিয়াছি এবং অতঃপর আপনার বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেই সঙ্কল্প করিয়াছি। এক্ষণে আপনি আমাকে বলিবেন কি, যাঁহার সহিত লীলাবতীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে তিনি কে?"

মনোরমা অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন,—"হুগলি জেলার এক জন মহাধনবান্ ব্যক্তি।"

হুগলী জেলা। মুক্তকেশীর জন্মভূমি। কি বিপদ গা! সকল কথাতেই সেই শুক্লবসনা সুন্দরী!

আবার জিজ্ঞাসিলাম, "তাঁহার নাম কি?"

"রাজা প্রমোদরঞ্জন।"

"রাজা প্রমোদরঞ্জন! এইত আবার সেই মুক্তকেশীর প্রশ্ন—রাজা উপাধিধারী লোক!"

নবম পরিচ্ছেদ।

আর বাক্যব্যয় না করিয়া আমরা বাটীতে প্রবেশ করিলাম। মনোরমা লীলার গৃহাভিমুখে গমন করিলেন, আমি নিজের নির্দ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করিলাম। কত শত ভয়ানক ভয়ানক দুশ্চিন্তা আজি আমাকে উৎপীড়িত করিতেছে, তাহা কি বলিয়া শেষ করা যায়? সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর চিন্তা, হুগলীনিবাসী এক মহা ধনবান্ রাজার সহিত লীলাবতীর বিবাহ হইবে। বেশত! তাহাতে চিন্তার বিষয় কি? কি জানি কি। সেই শুক্লবসনা কামিনীই চিন্তার মূল। তাহার নিবাস হুগলী এবং সে অত্যন্ত ভীতভাবে রাজা উপাধিধারী কোন লোকের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তাহাতে ক্ষতি কি? ক্ষতি কি জানি না—কিন্তু মন কোন মতেই স্থির হইতেছে না। লীলাবতীর সহিত সেই অসহায়া কামিনীর বিষম সাদৃশ্য অনুভব করার পর হইতে, আমার মনের কেমন গতি হইয়া পড়িয়াছে। যেন মনে হইতেছে, যাহা মুক্তকেশীর পক্ষে ভয়ানক ও বিপজ্জনক, তাহা লীলাবতীর পক্ষেও ভয়ানক ও বিপজ্জনক। কি জানি যেন কতই বিপদ—যেন কতই ভয়ানক ঘটনা আমার সমক্ষে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত বহুদূর হইতে চেষ্টা করিতেছে। কি বলিতে পারি, কি হইবে।

এইরূপ চিন্তাকুল অবস্থায়, নিয়মিত সময়ের মধ্যে রায় মহাশয়ের কার্য্যাদি সমস্ত শেষ করিয়া দিবার নিমিত্ত, উপবেশন করিলাম। কার্য্যাদি প্রায় শেষ হইয়াছিল; একবার দেখিয়া শুনিয়া সব ঠিক করিয়া দিলাম মাত্র। তাহার পর স্নানাহার সমাপিত হইলে, সেই খট্টোপরি শয়ন করিয়া অসীম দুরাশার জন্য আপনাকে আপনি বারবার ধিক্কার দিতে লাগিলাম।

এমন সময়ে আমার ঘরের দ্বারে মনোরমা ডাকিলেন,—"মাষ্টার মহাশয় ঘরে আছেন?"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম,—"আছি, আসুন।"

আমি উঠিয়া চেয়ারে গিয়া বসিলাম। মনোরমার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তিনি বড়ই উত্ত্যক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি নিকটস্থ এক চেয়ারে বসিয়া বলিলেন,—"দেবেন্দ্র বাবু, মনে করিয়াছিলাম সর্ব্ব প্রকার অপ্রীতিজনক কথাবার্ত্তা বুঝি অন্যকার মত অবসান হইয়া গেল। এখন দেখিতেছি, তাহা হইবার নহে। আমার ভগ্নীকে, তাহার আগতপ্রায় বিবাহ সম্বন্ধে ভয় জন্মাইয়া দিবার নিমিত্ত, গুপ্তচক্রী নিযুক্ত হইয়াছে। আজি প্রাতে মালী লীলার নামে একখানি অপরিচিত হস্তাক্ষরযুক্ত পত্র আনিয়াছিল জানেন?"

"জানি বই কি?"

"সেই চিঠিখানি বেনামী। তাহা আর কিছু নহে, কেবল লীলার চক্ষে রাজা প্রমোদরঞ্জনকে একটা জঘন্য-মনুষ্য রূপে প্রতীয়মান করাইবার অতি ঘৃণিত চেষ্টা!" লীলা সেই পত্র পাঠ করিয়া

নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। আমি অতি কষ্টে তাহার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছি—সে কি আসিতে দেয়? মাষ্টার মহাশয়, এসকল পারিবারিক প্রসঙ্গে আপনার সহিত পরামর্শ করা আমার পক্ষে বিধেয় নহে এবং হয়ত আপনারও এরূপ বিষয়ে কোনই অনুরাগ—”

আমি বলিলাম,—আপনি অন্যায় বলিতেছেন। যে কোন বিষয়ের সহিত আপনার, বা লীলাবতী দেবীর ইষ্টানিষ্টের সম্বন্ধ আছে, আমি তাহাতে কেমন করিয়া উদাসীন থাকিব?”

মনোরমা বলিলেন,—“আপনার কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। এ বাটীতে আপনি ছাড়া এমন একটী লোক নাই, তাহার সহিত একটা পরামর্শ করা যায়। বাটীর যিনি কর্ত্তা তাঁহার নিকট এরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপন করাই অসম্ভব, পরামর্শ ত দূরের কথা। এক্ষণে আমি করি কি, আপনি তাহারই পরমর্শ দিয়া বাধিত করুন। এখন কে এ পত্র লিখিয়াছে তাহারই অনুসন্ধানে আমি প্রবৃত্ত হইব, অথবা যথাকর্ত্তব্য করিবার জন্য কলিকাতাস্থ আমাদিগের উকিলের নিকট ইহা পাঠাইয়া দিব? আপনার সহিত এই তিন মাসে যেরূপ ঘনিষ্ট আত্মীয়তা জন্মিয়াছে, তাহাতে আপনার নিকট এরূপ পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। আপনি বলিয়া দিন, এখন কি করা কর্ত্তব্য। এই সে পত্র পাঠ করুন।”

তিনি আমার হস্তে পত্র প্রদান করিলেন। পত্রে পাঠাপাঠ কিছুই নাই। আমি তাহা এস্থলে অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি,—

আপনি কি স্বপ্ন বিশ্বাস করেন? না করিবেন কেন? স্বপ্নে বিশ্বাস করা ভাল।

“লীলাবতী দেবি! আমি গতরাত্রে আপনাকে স্বপ্ন দেখিয়াছি। এক বৃহৎ বাটীর সুসজ্জিত ও আলোকমালা শোভিত অঙ্গনে আমি দাঁড়াইয়া আছি—তথায় বিবাহের আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত। পুরোহিত, লোক জন দানসামগ্রী, বর-কন্যা সমস্তই রহিয়াছে। দেখিলাম সে কন্যা আপনি। আপনার সুন্দর বর্ণ, হরিদ্রা সংযোগে, আরও চমৎকার দেখাইতেছে; আমার বোধ হইল আপনার সৌন্দর্য্য স্বর্গীয়! আপনার পরিধান রক্তবর্ণ বারাণসী সাটী—অঙ্গের সর্ব্বত্র মূল্যবান্ প্রস্তর খচিত অলঙ্কার। আপনাকে দেখিয়া আমার চক্ষু হইতে অশ্রু-প্রবাহ প্রবাহিত হইল।

“আমার সে অশ্রু সহানুভূতির উৎস হইতে নিঃসৃত। কিন্তু মনুষ্যের নয়ন হইতে যেরূপ অশ্রু প্রবাহিত হয়, এ অশ্রু সেরূপ নহে। আমার এ অশ্রু, নয়নদ্বয় হইতে দুইটী উজ্জল আলোকধারারূপে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে বরের সমীপস্থ হইল এবং তাঁহার বক্ষদেশ স্পর্শ করিল। তাহার পর সেই আলোকরূপী অশ্রু-প্রবাহ ধনুকের ন্যায় অর্দ্ধ-মণ্ডলাকারে অবস্থিত হইল। আমি সেই অর্দ্ধ-মণ্ডলমধ্য দিয়া বরের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম।

“বরের বাহ্যাকৃতি দেখিতে মন্দ নহে। মধ্যমাকার, গৌর বর্ণ, কর্ম্মিষ্ঠ দেহ—বয়স বোধ হয় পঁয়তাল্লিশ বৎসর হইতে পারে। কেশ সমুদায়ই কৃষ্ণবর্ণ, মস্তকের সম্মুখদিকে খানিকটা টাক। চক্ষু অতি উজ্জল, কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একটা কাটা দাগ। কেমন আমি ঠিক স্বপ্ন দেখিয়াছি, না স্বপ্ন আমাকে প্রতারিত করিয়াছে?

সেই ধনুকাকার আলোক-মালার মধ্য দিয়া আমি সেই বরের মর্ম্মস্থল দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম সে হৃদয় কৃষ্ণবর্ণ—নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ।

তাহার উপর জলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, এ হৃদয়ে দয়া নাই, মায়া নাই। এ ব্যক্তি কত লোকের জীবন চির-বিষাদময় করিয়া দিয়াছে, আবার পার্শ্ববর্ত্তী যুবতীর জীবনও সেইরূপ করিয়া দিবে।' আমি তাহা পাঠ করিলাম। তাহার পর সেই বক্র আলোক স্থলভ্রষ্ট হইয়া ঐ বরের স্কন্ধদেশে সংযুক্ত হইল। দেখিলাম, বরের পশ্চাৎ হইতে এক পিশাচ হাসিতে হাসিতে উঁকি দিতেছে। তাহার পর সেই ধনুকাকার আলোক স্থানত্যাগ করিয়া কন্যার স্কন্ধ-দেশে অবস্থিত হইল। দেখিলাম, আপনার পশ্চাতে এক দেবী অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। তাহার পর সেই আলোক-প্রবাহ আবার একবার স্থান ত্যাগ করিয়া আপনার ও বরের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিল। সেই আলোক ক্রমশঃ আপনাদিগকে অন্তরিত করিয়া দিতে লাগিল। বিবাহ ঘটিয়া উঠিল না। আমার মহানন্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। লীলাবতী দেবি! আমি স্বপ্ন বিশ্বাস করি।

"আপনাকে বড় ভাল বাসি বলিয়া এত কথা লিখিয়া সাবধান করিয়া দিলাম। আমার নিজের এ বিষয়ে কোন স্বার্থ নাই, তাহা স্থির জানিবেন। আপনার জননীর দুহিতা আমার বড় ভালবাসার ধন; কারণ এ জগতে আপনার জননীই আমার এক মাত্র পরমাত্মীয়া ছিলেন।"

এই আশ্চর্য্য পত্র এইরূপে সমাপ্ত হইল। হস্তাক্ষর দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইল, ইহা স্ত্রীলোকের লিখিত।

মনোরমা বলিলেন,—"নিশ্চয়ই এ পত্র মূর্খ লোকের লেখা নহে। কিন্তু আশ্চর্য্য! লেখিকা এমন সুন্দর লিখিতে জানে, অথচ ব্রাহ্মদিগের বিবাহ-পদ্ধতি কিছুই জানে না।"

আমি বলিলাম,—"ইহা স্ত্রীলোকের লেখা নিশ্চয়ই। তবে সে স্ত্রীলোক যেন—"

মনোরমা বলিলেন,—"যেন অস্থির বুদ্ধি। পত্র পাঠ করিয়া প্রথমেই আমার মনে এই সংস্কার হইয়াছে।"

আমি কোন উত্তর দিলাম না। আমার নয়ন-মন তখন পত্রের শেষাংশে, যে অংশে লিখিত রহিয়াছে—'আপনার জননীর দুহিতা আমার বড় ভালবাসার ধন; কারণ এ জগতে আপনার জননী আমার একমাত্র পরমাত্মীয়া ছিলেন।' সেই অংশ পাঠে নিযুক্ত ছিল! বলিতে সাহস হয় না, এই কথা অবলম্বন করিয়া মন ক্রমে সেই ভয়ানক স্থানে উপনীত হইয়া বর্ত্তমান ঘটনার কারণ নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কি বিপদ! বলা দূরে থাকুক, ইহা ভাবিতেও সাহস হয় না।

পত্র খানি মনোরমার হস্তে ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম,—"পত্র যে লিখিয়াছে তাহাকে সন্ধান করিতে হইলে, কালবিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে—এখনই সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। আমার বিবেচনায়, প্রথমেই সেই মালীকে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করা; তাহার পর গ্রামস্থ অপরাপর লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করা উচিত। হাঁ, আপনি কলিকাতার উকিলের নিকট কল্য পত্র লিখিবেন বলিতেছিলেন, আজি লিখিলে দোষ কি?"

মনোরমা বলিলেন,—"কয়েকটি কারণে আজি পত্র লেখা সঙ্গত হইতেছে না। রাজা প্রমোদরঞ্জন এখানে সোমবারে আসিতেছেন। তাঁহার সোমবারে আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য, বিবাহের দিন স্থির করা। বিবাহ স্থির হইয়া আছে বটে, কিন্তু দিন এখনও স্থির হয় নাই। রাজা দিনস্থির করিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন।

আমি বলিলাম,—"রাজা যে এই উদ্দেশে আসিতেছেন, লীলাবতী দেবী তাহা জানেন ?'

মনোরমা দেবী বলিলেন,—"বিন্দু-বিসর্গও না! আমি তাঁহাকে এ সকল কথা বলিতে পারিব না। কাকা মহাশয় তাঁহার অভিভাবক, তিনিই যাহা হয় বলিবেন। এ দিকে বিবাহের দিনস্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লীলাবতীর বিষয সম্পত্তির বিশেষ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। আপনি জানেন বোধ হয়, লীলার কিছু নিজ-সম্পত্তি আছে। কাকা মহাশয় আমাদের উকীল কলিকাতাস্থিত শ্রীযুক্ত উমেশ বাবুকে পত্র লিখিয়াছেন। সম্ভবতঃ উমেশ বাবু কল্যই এখানে অসিবেন এবং বিহিত ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত কয়েক দিন এখানে থাকিবেন রাজা প্রমোদরঞ্জন যদি আলোচ্য প্রসঙ্গের সন্তোষজনক উত্তর দিতে সক্ষম হন যদি লীলার নিজ সম্পত্তি বিষয়ক সুব্যবস্থা হইয়া যায়, তাহা হইলে।ববাহের দিনস্থির হইয়া যাইবে। এই জন্যই আমি একটু অপেক্ষা করিব বলিতেছি। উমেশ বাবু আমাদের হিতৈষী বন্ধু; তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে কোন হানি নাই।"

বিবাহের কথা স্থির! কথাটী কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র আমার হৃদয় কেমন এক প্রকার ঈর্ষাপূর্ণ হতাশভাবে অভিভূত হইয়া গেল এবং আমার উচ্চাভিলাষ ও মহত্তর বুদ্ধি যেন তিরোহিত হইল। যে ভয়ানক কাহিনী আমি এক্ষণে ব্যক্ত করিতে বসিয়াছি, মূল হইতে শেষ পর্য্যন্ত, তাহার এক বর্ণও আমি প্রচ্ছন্ন করিব না। সেই লেখকের নামবিহীন পত্রে রাজা প্রমোদরঞ্জন-সংক্রান্ত যে সকল ভয়ানক কথা লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্তের সম্পূর্ণ সত্যতার জন্য আমার মনে প্রবল ঘৃণিত আশার আবির্ভাব হইল। যদি সেই সকল ভয়ানক কথা সত্যমূলক হয় এবং বিবাহের কথা স্থির হইবার পূর্ব্বে যদি সেই সকল সত্য সপ্রমাণিত হইয়া যায়, তাহা হইলে কি হইবে? এখন বুঝিয়া দেখিতেছি যে, তৎকালে আমার চিত্তের যে ভাব জন্মিয়াছিল, তাহা লীলাবতী দেবীর কল্যাণ-কামনা মূলক ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহা হউক, লীলাবতীর বিবাহার্থী ব্যক্তির প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষে আমার হৃদয়ে এই ভাব আরব্ধ ও পরিপুষ্ট হইল। এই নবীন ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া আমি বলিলাম,—'যদি অনুসন্ধান করিতে হয়, তাহা হইলে আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করা বিধেয় নহে! আমি আবার বলিতেছি, আমাদের এখনই প্রথমে মালীকে জিজ্ঞাসা, তাহার পর গ্রামমধ্যে সন্ধান করা কর্ত্তব্য।"

মনোরমা বলিলেন,—"বোধ হয় এ সম্বন্ধে আমিও আপনার সহায়তা করিতে পারি। চলুন তবে, দেরি করিয়া কাজ নাই।"

যাত্রার পূর্ব্বে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঐ লেখকের নামহীন পত্রের একস্থানে খানিকটা আকৃতিগত বর্ণনা আছে। পত্রে রাজা প্রমোদরঞ্জনের নাম উল্লেখ নাই। কিন্তু ঐ বর্ণনার সহিত তাঁহার আকৃতির সাদৃশ্য আছে কি ?

"ঠিক সাদৃশ্য। এমন কি পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ঠিক—

পয়তাল্লিশ বৎসর! এদিকে লীলা এখন এই নব যৌবনে অবতীর্ণা! তাহাতে ক্ষতি কি? এরূপ বয়স বৈষম্যে তো কতই বিবাহ ঘটিতেছে এবং দেখা যাইতেছে, সে সকল স্থলে দম্পতি সুখেই আছেন। তথাপি রাজার বয়স ও লীলার বয়সের বৈষম্য মনে করিয়া আমার রাজার উপর ঘৃণা ও অবিশ্বাস আরও একটু বাড়িয়া গেল।

মনোরমা বলিতে লাগিলেন—"এমন কি পশ্চিম-ভ্রমণ কালে তাঁহার হাতে, দৈবাৎ একটা আঘাত লাগায় যে একটা দাগ রহিয়া গিয়াছে, তাহাও ঠিক লিখিয়াছে। পত্র-লেখক যে তাঁহাকে খুব ভাল রকমে জানে তাহার কোনই ভুল নাই।

"আচ্ছা, তাঁহার চরিত্র-সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ কথা কখনই কেহ বলে না কি?

"সে কি মাষ্টার মহাশয়! এই জঘন্য পত্র পাঠে আপনিও কি বিচলিত হইয়াছেন?"

আমি বড় লজ্জিত হইয়া উঠিলাম! কথা ঠিক—পত্রখানা আমাকে বিচলিত করিয়াছে সত্য। বলিলাম,—"না—না—যাহা হউক, এ কথা আমার জিজ্ঞাসা করা ভালই হয় নাই।"

মনোরমা বলিলেন,—'আপনি এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় দুঃখিত হই নাই! আমি রাজা প্রমোদরঞ্জনের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত প্রশংসার সমর্থন করিতেছি। তাঁহার বিরুদ্ধে বিন্দুবিসর্গও গ্লানি-সূচক কথা কখন আমাদের কাহারও কর্ণে প্রবেশ করে নাই। রাজা কলিকাতার মিউনিসিপাল করপোরেশনের এক জন কমিশনর এবং জষ্টিস্ অব্ দি পিস্। তাঁহার সচ্চরিত্রতার বোধ হয় ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ।"

কোন উত্তর না দিয়া আমারা গৃহনিক্রান্ত হইলাম। তাঁহার কথা বিশেষ প্রামাণ্য বলিয়া আমার বোধ হইল না। স্বর্গের দেবতা আসিয়া যদি আমাকে রাজার সচ্চরিত্রতা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন, তাহাও বোধ হয়, আমি তখন বুঝিতাম না।

আমরা বাহিরে গিয়া দেখিলাম, মালী নিজ-কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। নানারূপে জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহার নিকট হইতে বিশেষ সংবাদ কিছুই পাওয়া গেল না। সে বলিল একটী প্রাচীনা স্ত্রীলোক এই পত্র দিয়া গিয়াছে। তাহার সহিত সে কোন কথাই কহে নাই। চিঠি দিয়াই, স্ত্রীলোকটী কিছু ব্যস্ত ভাবে, এই দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়া গ্রামের মধ্যে যাওয়া যায়। আমরাও সেই দিকে চলিলাম।

দশম পরিচ্ছেদ।

আনন্দপুরের মধ্যে নানা প্রকার অনুসন্ধান করা হইল; কিন্তু বিশেষ ফল কিছুই হইল না। যাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায় সেই বলে, এরূপ স্ত্রীলোক দেখি নাই। কেবল দুই তিন জন 'দেখিয়াছি' বলিল বটে; কিন্তু সে দেখিতে কেমন ও সে কোন দিকে গেল ইহা তাহারা কেহই ঠিক বলিতে পারিল না। ক্রমে সন্ধান করিতে করিতে, আমরা বরদেশ্বরী দেবীর সংস্থাপিত শিশু-বিদ্যালয়ের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বিদ্যালয় ভবন ছাড়াইয়া যাই যাই সময়ে আমি বলিলাম,—"এ গ্রামের অন্যান্য সকল লোকের অপেক্ষা, বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয় অবশ্যই অধিক বিজ্ঞ ও বিদ্বান্। এতই সন্ধান করা গেল, একবার শিক্ষক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া গেলেও হইত।"

মনোরমা বলিলেন,—"আমার বোধ হয়, স্ত্রীলোক যখন যাতায়াত করিয়াছিল, তখন পণ্ডিত মহাশয় হয়ত আপন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। যাহা হউক, সন্ধান করায় হানি নাই।"

আমরা বিদ্যালয়ের ভিতর প্রবেশ করিলাম। গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, আমরা জানালা দিয়া দেখিতে পাইলাম, পণ্ডিত মহাশয়কে বেষ্টন করিয়া বালকগণ দাঁড়াইয়া আছে, তিনি তাহাদিগকে কি উপদেশ দিতেছেন। কেবল একটী বালক, জনহীন দ্বীপে দ্বীপান্তরিত ব্যক্তির ন্যায়, এক কোণে একখানি টুলের উপর অধোবদনে দাঁড়াইয়া আছে।

আমরা দ্বার সমীপস্থ হইয়া শুনিতে পাইলাম, পণ্ডিত মহাশয় বলিতেছেন,—"বালকগণ! সাবধান! ভূত-প্রেতিনীর কথা যদি তোমরা কেহ কখন বল, তাহা হইলে তোমাদের বিষম শাস্তি হইবে। আমি বলিতেছি, ভূত-প্রেতিনী মিথ্যা কথা; সংসারে তাহার কিছুই নাই। তোমরা দেখিতেছ, রামধনের কেমন অপমান হইয়াছে! রামধন যদি এখনও প্রেতিনী মিছা কথা, ইহা না বুঝিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি বেতের আগায় তাহার প্রেতিনী ছাড়াইয়া দিব। আর তোমরাও যদি ঐরূপ কথা বিশ্বাস কর, তাহা হইলে, আমি লাঠিবাজি করিয়া সকলেরই ভূত ছাড়াইয়া দিব।"

বক্তৃতার অবসান সময়ে আমরা গৃহে প্রবেশ করিলাম। গৃহ-প্রবেশ কালে মনোরমা বলিলেন,—"আমরা বড় অসময়ে আসিয়া পড়িয়াছি।"

আমরা গৃহাগত হইলে, পণ্ডিত মহাশয় আমাদিগকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন এবং ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"যাও, তোমাদের সকলেরই এখন জলখাবারের ছুটী; কেবল রামধন যাইতে পাইবে না। দেখা যাউক, প্রেতিনীটি উহার খাবার আনিয়া দেয় কি না।"

রামধন চক্ষু মর্দ্দন করিতে করিতে কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

মনোরমা বলিলেন,—"আমরা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, কিন্তু আপনি যে এখন ভূত ছাড়াইতে নিযুক্ত আছেন তাহা আমরা জানিতাম না। যাহা হউক, ব্যাপারটা কি? এত গোল কেন?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—"বলিব কি আপনাকে, এই দুষ্ট বালকটা কল্য রাত্রে একটা প্রেতিনী দেখিয়াছে বলিয়া গল্প করিয়া, বিদ্যালয়ের সমস্ত বালককে ভয় দেখাইতেছে। উহার গল্প যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহা ও কিছুতেই বুঝিবে না।"

মনোরমা বলিলেন,—"এখনকার ছেলেরা এত ভূতের ভয় করে ইহা আশ্চর্য্য বটে।"

তাহার পর তিনি যে কথা সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, পণ্ডিত মহাশয়কেও তাহা জিজ্ঞাসিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ও সে সম্বন্ধে কোনই সন্ধান দিতে পারিলেন না। তাহার পর, আমাকে লক্ষ্য করিয়া মনোরমা বলিলেন, —"চলুন তবে, বাটী ফিরিয়া যাই। আমরা যে সংবাদের সন্ধান করিতেছি, তাহা আর পাওয়া যাইবে না।"

তিনি বিদায় সময়ে, অপমানিত রামধনকে দুই একটা সান্ত্বনা বাক্য বলিবেন ইচ্ছা করিলেন। তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"দুষ্ট ছেলে, পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে ক্ষমা চাও। ভূতের কথা আর কখন মুখেও আনিও না।"

রামধন হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং বলিল,—"অ্যাঁ—অ্যাঁ—আমি সত্যি পেত্নী দেখিছি—অ্যাঁ।"

মনোরমা বলিলেন,—"মিছা কথা; তুমি কখন পেত্নী দেখ নাই। পেত্নী কি রকম—"

পণ্ডিত মহাশয় যেন একটু উৎকণ্ঠিত ভাবে বাধা দিয়া বলিলেন,—"মূর্খ বালককে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। হয়ত না বুঝিয়া,—"

পণ্ডিত মহাশয় চুপ করিলেন। মনোরমা ত্বরিত জিজ্ঞাসিলেন,—"না বুঝিয়া কি ?"

পণ্ডিত বলিলেন,—"না বুঝিয়া, হয়ত আপনার অপ্রীতিকর কোন কথা ও বলিয়া ফেলিতেও পারে।"

মনোরমা বলিলেন,—"আমি কি এমনই পাগল যে এই দুগ্ধপোষ্য বালকের কথায় অপ্রীত হইব ?"

তাহার পর বালকের নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"তোমার ভূতের গল্প আমি শুনিব। বল তুমি, কোথায় ভূত দেখিয়াছিলে ?"

রামধন বলিল,—"ভূত নয় পেত্নী। কা'ল রাত্তিরে—জ্যোৎছনার সময়।"

"পেত্নী ! আচ্ছা তোমার দেখিতে কেমন ?

বালক বিজ্ঞভাবে বলিল,—"পেত্নীতে যেমন শাদা কাপড় পরে, তেমনই ; তার আগা গোড়া গায়ে শাদা কাপড়।"

"কোথায় দেখিয়াছ ?"

"কেন ? রায় মোশাইদের বাগানে—যে রকম জায়গায় পেত্নী থাকে।"

মনোরমা বলিলেন,"—ভূত পেত্নী কেমন কাপড় পরে, কোথায় থাকে, সকল কথাই তুমি জান দেখিতেছি। যেন তাহারা তোমার চিরকালের আলাপী। যেরূপ তোমার ভাব দেখিতেছি, তাহাতে হয়ত কে মরিয়া পেত্নী হইয়াছে তাহাও তুমি বলিতে পার।"

ঘাড় নাড়িয়া রামধন বলিল,—"তাতো পারি।"

পণ্ডিত মহাশয় অনেকবার বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফল হন নাই। এবার তিনি জোর করিয়া বলিলেন—"বালককে অনর্থক এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া উহাকে বিষম প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে।"

মনোরমা বলিলেন,—"আর একটী কথা।'

বালককে জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি দেখিয়াছ সে পেত্নী কে ?"

রামধন ভয়ে ভয়ে অস্ফুটস্বরে বলিল,—"বরদেশ্বরী ঠাকুরাণী।

পণ্ডিত মহাশয় যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই যথার্থ হইল ; বালকের উত্তর শুনিয়া মনোরমা দেবী নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ ভাবে বালককে কি বলিবেন মনে করিলেন। বালক তাঁহার বদনের নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও উত্যক্ত ভাব দেখিয়া, আবার কাঁদিয়া ফেলিল ! তাহার পর মনোরমা, পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি চাহিয়া, বলিলেন,—"এ ক্ষুদ্র বালককে তিরস্কার করিয়া কি কাজ ? নিশ্চয়ই অপর কোন ব্যক্তি, বালকের সম্মুখে, এরূপ গল্প করিয়াছে ! এই আনন্দধামে, আমার মাসীমার নাম এরূপ ভাবে আলোচনা করে, এমন লোক যে যে আছে, তাহাদের যাহাতে বিহিত শাস্তি হয়, তাহার উপায় আমি করিবই করিব !'

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—"দেবি ! আপনার ভুল হইতেছে। বিষয়টা আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত কেবল ছেলে মানুষের ছেলেমি। কালি রাত্রে বালক যখন বাগানের পাশ দিয়া যাইতেছিল, হয়ত সেই সময়ে তথায় কোন শুক্লবাসনা স্ত্রীলোক দেখিয়া থাকিবে, অথবা আর কিছু দেখিয়া মনে সেইরূপ ভাবিয়া থাকিবে। সেই কল্পিত বা বাস্তব মূর্ত্তি বরদেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি-সন্নিধানে দাঁড়াইয়াছিল। ঐ শ্বেত প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির পার্শ্বে ঐ নারী মূর্ত্তি দেখিয়া, বালক আপনার

বিরাগজনক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, বোধ হয়।”

তথাপি মনোরমার মন প্রকৃতিস্থ হইল না! তিনি অন্য কোন উত্তর না দিয়া বিদ্যালয় হইতে চলিয়া আসিলেন। আমি স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া সমস্ত কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিতেছিলাম। এক্ষণে বাহিরে আসিয়া, বর্ত্তমান ব্যাপারে আমার কি মত মনোরমা দেবী তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলেন।

আমি বলিলাম,—“আমার ধারণা হইয়াছে যে, বালকের কাহিনীর মূলে নিশ্চয় কোন সত্য আছে। আমি এখনই বরদেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে যাইব এবং তাহার পার্শ্বের জমি ভাল করিয়া দেখিব।”

মনোরমা কিয়ৎকাল অন্যমনস্ক ভাবে চিন্তা করিয়া আবার বলিলেন,—‘বিদ্যালয় গৃহের ঘটনা আমাকে এত চঞ্চলচিত্ত করিয়াছে যে, আমি পত্রের কথা এককালে ভুলিয়া গিয়াছি। তবে কি আমরা এখন পত্র-লেখকের সন্ধান আর করিব না? উমেশ আসিয়া যাহা হয় করিবেন ভাবিয়া, এখন কি আমরা চুপ করিয়া থাকিব?”

“কখনই না। বিদ্যালয় গৃহে যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে অনুসন্ধানে আমি আরও উৎসাহিত হইয়াছি।”

“কেন?’

“কারণ, আপনি আমাকে যখন প্রথমে পত্র পাঠ করিতে দেন, তখন আমার মনে যে সন্দেহ হইয়াছিল, সেই সন্দেহ এই ঘটনায় আরও বদ্ধমূল হইতেছে।

“সে সন্দেহ আমার নিকট গোপন করা আবশ্যক কি?

“সে সন্দেহের অধিক আলোচনা করিতে আমার সাহস হয় না। সে সন্দেহ প্রথমে নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার ও আমার দুষ্টবুদ্ধির ফল মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আর সেরূপ করিতে পারিতেছি না। বালকের কথাবার্ত্তায় এবং তাহার সামঞ্জস্য করিবার কালে, দৈবাৎ পণ্ডিত মহাশয়ের মুখ হইতে যে একটি উক্তি বাহির হইয়াছিল, তদুভয়ই এক্ষণে আমার সেই সন্দেহকে সতেজ করিয়া দিয়াছে। হয়ত ভবিষ্যতে আমার সন্দেহ নিতান্ত অমূলক হইয়া দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু আপাততঃ আমার চিত্তে তাহার আধিপত্য নিতান্ত প্রবল। আমার বিশ্বাস, বাগানের কল্পিত প্রেতিনী এবং ঐ নামহীন পত্রের লেখক একই ব্যক্তি।”

“কে সে ব্যক্তি?”

“না জানিয়া ও না বুঝিয়া, পণ্ডিত মহাশয় বলিয়া ফেলিয়াছেন। যখন তিনি বালক-দৃষ্ট মূর্ত্তির কথা বলিতেছিলেন, তখন তিনি তাহা কোন শুক্লবসনা স্ত্রীলোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।

“তবে কি সে মুক্তকেশী?”

মনোরমা বলিলেন—“জানিনা কেন, আপনার সন্দেহ আমাকে এখন চমকিত ও বিচঞ্চল করিয়া তুলিল। আমার বোধ হয়—”

তিনি চুপ করিলেন এবং কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার যত্ন করিলেন। তাহার পর আবার বলিলেন,—“দেবেন্দ্র বাবু, আপনাকে মাসীমার প্রতিমূর্ত্তি দেখাইয়া দিয়া এখন আমি বাটী ফিরিয়া যাই। লীলা অনেক ক্ষণ একা আছে। তাহাকে এরূপে একা রাখা ভাল নয়।”

কথা কহিতে কহিতে আমার বাগানের নির্দ্দিষ্ট স্থানের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই সুন্দর সুবিস্তৃত উদ্যানের এক-

দেশে স্বর্গীয়া বরদেশ্বরী দেবীর পাষাণময়ী প্রতিমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। ভাস্করের অত্যদ্ভুত নিপুণতা হেতু, দূর হইতে যেন প্রতিমূর্ত্তি সজীব বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রতিমূর্ত্তির গম্ভীর বদন-শ্রী দেখিয়া স্বর্গীয়া দেবী যে বিশিষ্ট বুদ্ধিমতী ও সৎস্বভাব-সম্পন্না ছিলেন তাহা সহজেই অনুমিত হইতেছে। অতি সুন্দর মর্ম্মর-প্রস্তর-বেদিকায় ঐ প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত। স্থানটী নিতান্ত নির্জ্জন। উদ্যানের সে দিকে কেহই কখন বেড়াইতে আইসে না এবং তত্রত্য বৃক্ষাবলী বৃহৎকায়, এজন্য মালীদিগকেও সে স্থানে সতত গমন করিতে হয় না। এই উদ্যা-নের প্রান্তদেশ দিয়া পথ চলিয়া গিয়াছে। বাগানের আবর্জ্জনা সমস্ত বাহিরে ফেলিবার নিমিত্ত, সেই পথের উপর একটী ক্ষুদ্র দ্বার আছে। জীর্ণ হইয়া সেই দ্বারের এক খানি কপাট পড়িয়া গিয়াছে।

মনোরমা বলিলেন,—"আপনার সহিত আমার আর অধিক দূর যাইবার আবশ্যকতা নই। যদি আপনি কোন সন্ধান জানিতে পারেন, তাহা হইলে আমাকে বলিবেন। আমি যাই।"

তিনি চলিয়া গেলেন। আমিও ধীরে ধীরে প্রতিমূর্ত্তি-সন্নিধানে গমন করিতে লাগিলাম। প্রতিমূর্ত্তি যে ভূমির উপরে অবস্থিত, তাহার চারিদিকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাস এবং তত্রত্য ভূমি নিতান্ত কঠিন। সুতরাং তথায় কোন প্রকার পদ-চিহ্ন লক্ষিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যে মর্ম্মর প্রস্তর খণ্ডের উপর প্রতিমূর্ত্তির চরণদ্বয় সংস্থিত, তাহা বৃষ্টি ও অন্যান্য নানা কারণে মলিনতা যুক্ত। সেই মলিন প্রস্তর খণ্ডের এক পার্শ্ব বিশেষ শুভ্র ও নূতনের ন্যায় পরিষ্কার বোধ হওয়ায়, আমার কৌতূহল প্রচুর পরিমাণে উদ্রিক্ত লইহ একং আমি সে অংশ পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত হইলাম। সে অংশ যে অত্যল্পকাল পূর্ব্বে মানব-হস্ত দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সুন্দররূপ বুঝা যাইতেছে। প্রস্তর খণ্ড আংশিক পরিষ্কৃত হইয়াছে, অপরাংশ পরিষ্কৃত হয় নাই। কে এই মর্ম্মর প্রস্তর পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং অবশেষে আরব্ধ কার্য্য অর্দ্ধ-সমাপিত অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছে?

কেমন করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর পাইব, বা মীমাংসা করিব তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে বাগা-নের চারি দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোনই ফল হইল না—কোন দিকে কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলাম না। বাগানের কার্য্যে যাহারা লিপ্ত, তাহাদের নিকটে চলিয়া আসি-লাম এবং একেএকে সকলকে সুকৌশলে বরদে-শ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তির অপরিষ্কৃততার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; যাহাদের জিজ্ঞাসিলাম, বুঝিলাম তাহারা কেহই পরিষ্কার করণে হস্তক্ষেপ করে নাই। তবে কে এ কার্য্য করিল? স্থির মীমাংসা করিলাম, এ কোন বাহিরের লোকের কার্য্য। ভূতের গল্প শুনিয়া, তাহার পর প্রতি-মূর্ত্তির নিকটেও এই চিহ্ন দেখিতে পাইয়া, স্থির প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, সেই রাত্রিতে সন্নিহিত কোন স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া, প্রতিমূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিব। মীমাংসা করিলাম, যে ব্যক্তি পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে আরব্ধ অর্দ্ধ-সমাপিত কার্য্য নিশ্চয়ই অদ্য সম্পূর্ণ করিতে আসিবে।

ভবনাগত হইয়া মনোরমা দেবীকে আমার অভিসন্ধি জানাইলাম। তিনি শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, কিন্তু আমার অভিপ্রায়ে কোন বাধা দিলেন না; বরং তিনি আমার চেষ্টার সফলতার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে ধীর ও স্থির ভাবে লীলাবতী দেবীর

স্বাস্থ্য বিষয়ক সংবাদ জিজ্ঞাসিলাম। শুনিলাম, তিনি ভাল আছেন এবং হয়ত বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইবেন।

আমি স্বীয় প্রকোষ্ঠে বসিয়া অসম্পূর্ণ কার্য্য সমূহ সম্পূর্ণ করিতে নিযুক্ত হইলাম এবং মধ্যে মধ্যে, কতক্ষণে দিবা অবসান হইবে জানিবার নিমিত্ত, জানালা দিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। একবার দেখিতে পাইলাম, নিম্নে বাগানে একটী স্ত্রীমূর্ত্তি পরিক্রমণ করিতেছে। সে মূর্ত্তি লীলাবতী দেবীর।

অদ্য প্রাতে একবার তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, আর সমস্ত দিন পরে এই দেখিলাম। আর এক দিনমাত্র আমি এখানে আছি এবং, এই একদিন হইয়া গেলে, হয়ত ইহ জীবনে আর তাঁহার সহিত কখন সাক্ষাৎ হইবে না। এই চিন্তার উদয় হওয়ায়, আমি জানালার সমীপে আসিয়া দাঁড়াইলাম এবং, সাবধানতা সহকারে জানালার খড় খড়ে ফাঁক করিয়া, যতদূর সম্ভব ততদূর, তাঁহাকে নয়ন দ্বারা অনুসরণ করিতে লাগিলাম।

অতি নির্ম্মল পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া লীলাবতী উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন; শুষ্ক বৃক্ষপত্র সকল তাঁহার পদনিম্নে ও চতুর্দ্দিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে; কখন বা গায়ে আসিয়া উড়িয়া পড়িতেছে। ফুলের শোভা, বায়ুর কোমলতা কিছুতেই তাঁহার লক্ষ্য নাই। তাঁহাকে নিতান্ত অন্যমনস্ক বলিয়া বোধ হইল। আমার নয়ন তাঁহাকে দর্শন করিয়া সুখী হইতেছিল, সে সুখও তিরোহিত হইল। লীলাবতী দেবী চলিয়া গেলেন।

আমার হস্তস্থিত কার্য্য সমাপ্ত হইল; এ দিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সন্ধ্যার পর আমি, কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া, বাটী হইতে বাহির হইলাম এবং, ধীরে ধীরে আসিয়া, বরদেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তির সমীপে উপস্থিত হইলাম। তথায় জীবসমাবেশের চিহ্নও নাই। স্থানটী, এক্ষণে দিনের অপেক্ষা, অধিকতর প্রশান্ত ও নির্জ্জন হইয়াছে। আমি একটী নির্জ্জন স্থানে বসিয়া, নির্ণিমেষ নয়নে, বরদেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিলাম।

কতক্ষণই অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু কই কোথাও তো কিছু চিহ্ন নাই। বায়ু কেবল সময়ে সময়ে শাঁ শাঁ করিতেছে, কোথায়ও এক একটী শুষ্ক পত্র উড়িতেছে, কদাচিৎ কোন পক্ষী ধ্বনি করিতেছে। এই জনহীন স্থানে—এই রাত্রিকালে আর একাকী বসিয়া থাকিতে যেন কষ্ট হইতে লাগিল।

এখনও জ্যোৎস্না আছে। এমন সময়ে সহসা কোমল পদশব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। সে পদশব্দ নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকের। অতি অস্ফুট কথার শব্দও শুনিতে পাইলাম। শুনিলাম একজন বলিতেছে,—"ভয় করিও না। আমি সে পত্র নির্ব্বিঘ্নে বালকের হস্তে দিয়াছি; বালক আমাকে একটী কথাও জিজ্ঞাসা করে নাই। সে পত্র লইয়া চলিয়া গেল, আমিও চলিয়া আসিলাম। নিশ্চয়ই কেহই আমার অনুসরণ করে নাই।"

এই কয়টী অস্ফুট শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করায়, আমার কৌতূহল এতই বাড়িয়া উঠিল যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম যে, আগন্তুকেরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। অবিলম্বে দুইটী স্ত্রীমূর্ত্তি আমার নেত্রপথে উপস্থিত হইল। তাহারা প্রতিমূর্ত্তির অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। স্ত্রীলোক দ্বয়ের একজনের পরিচ্ছদ সাধারণবৎ, অপরার পরিচ্ছদ সর্ব্বত্র পরিষ্কার শুক্ল। আমার শিরায় রক্তের গতি বর্দ্ধিত হইল এবং হস্ত-পদাদি যেন

কম্পিত হইয়া উঠিল। স্ত্রীলোকদ্বয় প্রতিমূর্ত্তির সমীপদেশে উপস্থিত হইয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইলেন। এক জনের বদন আমি দেখিতে পাইলাম, কিন্তু শুক্লবসনা স্ত্রীলোকের বদন আমার নয়নগোচর হইল না।

যে স্বরে প্রথমে কথা শুনিয়াছিলাম, সেই স্বর আবার বলিল,—"মোটা কাপড়টা গায়ে থাকে যেন। তারামণি বলিয়াছিলেন, তোমাকে সম্পূর্ণ শাদা কাপড়ে যেন কেমন এক রকম দেখাইতেছে। আমি নিকটেই থাকিতেছি। তুমি যাহা করিতে আসিয়াছ তাহা শীঘ্র শেষ করিয়া লও। মনে থাকে যেন, আমাদের রাতারাতি ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

এই বলিয়া সেই স্ত্রীমূর্ত্তি চলিয়া আসিলেন। নিকটস্থ হইলে আমি বুঝিলাম, স্ত্রীলোক প্রবীণা এবং তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া, তাঁহাকে কোনক্রমেই অসৎ লোক বলিয়া বোধ হয় না।

তিনি যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন,—"এক রকম—কেমন এক রকম—চিরকাল দেখিতেছি, এই রকম। কিন্তু বড় ঠাণ্ডা—নিতান্ত গোবেচারা।"

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, সভয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, স্ত্রীলোক চলিয়া গেলেন।

এই স্ত্রীলোকের অনুসরণ করিয়া, ইহার সহিত কোন প্রকার কথাবার্ত্তা কহা উচিত কি না, তাহা আমি স্থির করিতে পারিলাম না। প্রবীণার সঙ্গিনীর সহিত কথোপকথন করাই আমি অধিক আবশ্যক বলিয়া মনে করিলাম যে পত্র দিয়া গিয়াছে তাহাকে কি প্রয়োজন? যে লিখিয়াছে রহস্যের মূলাধারই সে। আমার বিশ্বাস, সেই পত্র-লেখিকা এখন আমার সম্মুখে উপস্থিত।

যখন আমি এই সকল আলোচনায় নিযুক্ত, সেই সময়ে শুক্লবসনা স্ত্রীলোক, প্রতিমূর্ত্তির পাদদেশে উপস্থিত হইয়া, কিয়ৎকাল ভক্তিপূর্ণভাবে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তদনন্তর বস্ত্রমধ্য হইতে একখানি রুমাল বাহির করিলেন এবং ভক্তিসহকারে প্রতিমূর্ত্তির পদনিম্নে মস্তক স্থাপন করিয়া প্রণাম করিলেন। তাহার পর, পাষাণখণ্ড পরিষ্কার করিতে নিযুক্ত হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ধীরে ধীরে ও সাবধানতা সহকারে আমি বিপরীত দিক দিয়া প্রতিমূর্ত্তির নিকটস্থ হইলাম। কিন্তু রমণী স্বীয় কার্য্যে এতই নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন যে, আমার আগমন লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। আমি প্রতিমূর্ত্তির ঠিক বিপরীত দিকে উপস্থিত হইলে, তিনি আমাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি দর্শন মাত্র চমকিত হইয়া ভীতিব্যঞ্জক ধ্বনি সহকারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ভয়চকিত ও স্পন্দহীনভাবে, আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম,—"ভীত হইবেন না; আপনি আমাকে জানেন; মনে করিয়া দেখুন।"

আর অগ্রসর হইলাম না। কিয়ৎকাল পরে আবার ধীরে ধীরে কয়েক পদ অগ্রসর হইলাম। এইরূপে ক্রমে ক্রমে যুবতীর নিকটবর্ত্তী হইলাম। মনে এতক্ষণ যদি বা কিছু সন্দেহ

ছিল, এখন তাহা তিরোহিত হইয়া গেল কলিকাতার নির্জ্জন পথে মধ্যরাত্রে যে যুবতী আমার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, অ এই বিসদৃশ স্থানে, বরদেশ্বরী দেবীর প্রতি-মূর্ত্তির অন্তরাল হইতে, সেই ভয়চকিতা যুবতী আমার সম্মুখে আবার দণ্ডায়মানা।

আমি বলিলাম,—"আপনি আমাকে মনে করিতে পারিতেছেন না? অল্পদিন পূর্ব্বে রাত্রিকালে আমি আপনাকে কলিকাতায় পথ দেখাইয়া দিয়াছিলাম। বোধ হয়, আপনি সে ঘটনা এখনও বিস্মৃত হন নাই।"

এতক্ষণে যুবতীর ভীত ভাব একটু কমিয়া গেল এবং তিনি যেন আশ্বস্তভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। দারুণ ভয়ে তাঁহার বদনের যে মরণাপন্নবৎ ভাব হইয়াছিল, দেখিলাম ক্রমশঃ পূর্ব্বপরিচয় স্মৃতিপথে আবির্ভূত হওয়ায়, সে ভাব তিরোহিত হইতেছে। আমি আবার বলিলাম,—"এখনই কথা কহিতে চেষ্টা করিবেন না। ভাবিয়া দেখুন—মনে করিয়া দেখুন, আমি আপনার হিতৈষী।"

অস্ফুটস্বরে যুবতী বলিলেন,—"আপনি আমার প্রতি বড়ই কৃপাবান্। তখনও আপ নাকে যেমন সদয় দেখিয়াছি, এখনও আপ-নাকে সেইরূপ সদয় দেখিতেছি।"

উভয়েই কিয়ৎকালের নিমিত্ত নির্ব্বাক্। স্থান, কাল, ঘটনা প্রভৃতি স্মরণ করিয়া আমার চিত্তও সম্পূর্ণরূপ স্থির ছিল এ কথা বলিতে পারি না। জ্যোৎস্নাস্নাত প্রকৃতির মধ্যে, আবার সেই স্ত্রীলোক ও আমি; মধ্যে এক পরলোকগতা রমণীর প্রতিমূর্ত্তি। রাত্রিকাল—চতুর্দ্দিক নির্জ্জন—প্রশান্ত। মনে হইতে লাগিল, এখন যদি এই স্ত্রীলোক, আমাকে বিশ্বাস করিয়া, তাঁহার পত্রলিখিত বিবরণের সমর্থন-সূচক প্রমাণের উল্লেখ করেন, তবেই আমার বহু যত্নের সফলতা হয়। এক্ষণে এই স্ত্রীলোকের কথার উপর লীলার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ ও শান্তি নির্ভর করি-তেছে। অনেকক্ষণ স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া বলিলাম,—"বোধ হয়, আপনি এক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। আমাকে হিতৈষী জানিয়া, আপনি নির্ভয়-চিত্তে আমার সহিত কথোপ-কথন করুন।"

আমি যাহা বলিলাম, তাহাতে মনঃ-সংযোগ না করিয়া, তিনি বলিলেন,—"আপনি এখানে কেমন করিয়া আসিলেন?"

"আপনার ক মনে নাই, গত সাক্ষাৎ কালে আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, আমি শক্তিপুরে যাইতেছি। আমি সেই অবধি এই স্থানে, এই আনন্দধামেই আছি।"

তাহার পাণ্ডুগণ্ডও আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—"আনন্দধামে আপনি কত সুখেই আছেন!"

এই নবভাবের প্রাবল্যে তাঁহার বদন-শ্রী অপেক্ষাকৃত সংবর্দ্ধিত হইল। সেই নির্ম্মল চন্দ্রালোকে এই নবীনার প্রতি চাহিলাম। এক দিন এইরূপ চন্দ্রালোকে বারান্দায় যে সুন্দরীর মুখ দেখিয়া মুক্তকেশীর মুখ মনে পড়িয়াছিল, অদ্য মুক্তকেশীর মুখ দেখিয়া সেই সুন্দরীর বদন মনে আসিল। লীলাবতী এবং মুক্তকেশী উভ-য়ের দৈহিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আজি সুন্দররূপ প্রণিধান করিতে সমর্থ হইলাম। দেখিলাম মোটামুটী মুখের গঠন, বদনের দৈর্ঘ্য-বিস্তার, কেশের উজ্জ্বল মসৃণতা, সমস্ত দেহের উচ্চতা ও আয়তন, গ্রীবার ঈষৎ বক্রভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে উভয়েরই বিস্ময়জনক সাদৃশ্য। উভয়ের আকৃতিগত যে এত সাদৃশ্য আছে, তাহা আমি পূর্ব্বে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আর দেখি-লাম, লীলার ন্যায় মুক্তকেশীর উজ্জ্বলবর্ণ নাই;

নয়নের সেরূপ পরিষ্কার ভাব, ত্বকের তাদৃশ মসৃণতা, অধরোষ্ঠের সুপক্ক বিম্বের ন্যায় সে শোভা এই কাতর ও ক্লিষ্ট নারীর নাই। মনে এক বিষাদময় ভাবের আবির্ভাব হইল। মনে হইল, যদি কখনও লীলার ভবিষ্যৎ জীবন দুঃখের কঠিন-পেষণে নিষ্পেষিত হয়,তাহা হইলে উভয়ের আকৃতিগত এই যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বৈষম্য, তাহা আর থাকিবে না। যদি কখন লীলাবতী দেবী বিষাদ বা ক্লেশের পরুষ আক্রমণে আক্রান্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার যৌবন-শ্রী ও বদন-শোভা মুক্তকেশীর অনুরূপ হইয়া উঠিবে এবং তখন এই উভয় কামিনী যমজ সহোদরার ন্যায় একরূপ হইবে; তখন উভয়েই উভয়ের সজীব প্রতিমূর্ত্তিরূপে পরিণত হইবে। এই ভয়ানক চিন্তার প্রাবল্যে আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম। অন্ধকার—অপরিজ্ঞেয় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কতই বিকট ভাবনা হৃদয়ে আবির্ভূত হইল। সহসা আমার অজ্ঞাতসারে মুক্তকেশীর হস্ত আমার হস্তে মিলিত হওয়ায়, আমার চৈতন্য হইল। প্রথম সাক্ষাৎকালে যেরূপ অজ্ঞাতসারে তিনি আমার হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন, অদ্যও আবার সেইরূপ করিলেন। যুবতী তাঁহার স্বভাব—সঙ্গত দ্রুতভাবে বলিলেন,—"আপনি আমাকে দেখিতেছেন, আর কি ভাবিতেছেন?"

আমি বলিলাম,—"অসঙ্গত কোন ভাবনাই ভাবিতেছি না। আপনি কেমন করিয়া এখানে আসিলেন ভাবিয়া, আমি বিস্মিত হইতেছি।

"আমি একটী আত্মীয় স্ত্রীলোকের সঙ্গে আসিয়াছি। তিনি আমাকে বড় ভাল বাসেন। আমি এখানে দুই দিন আছি।"

"কল্যও আপনি এখানে আসিয়াছিলেন?

"আপনি কেমন করিয়া জানিলেন"

"আমি অনুমান করিতেছি মাত্র।"

আবার তিনি বরদেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তির চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"এখানে না আসিয়া আর কোথায় যাইব? যিনি ইহজগতে আমার জননীর অপেক্ষাও স্নেহময়ী ছিলেন, তাঁহাকে দেখিতেই আমার আসা। তাঁহার প্রতি মূর্ত্তির মলিনভাব দেখিয়া আমার হৃদয়ে ব্যথা লাগিয়াছে। কল্য আমি তাহা পরিষ্কার করিতে আসিয়াছিলাম, অদ্য তাহা শেষ করিতে আসিয়াছি। ইহাতে আমার কি কোন দোষ হইয়াছে? না—স্বর্গীয়া বরদেশ্বরী দেবীর নিমিত্ত যাহা কিছু করি, তাহাতে দোষ হয় না।"

দেখিলাম এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে সেই বাল্য কৃতজ্ঞতার ভাব এখনও সম্পূর্ণ প্রবল। বুঝিলাম এই নারীর চিত্তে পবিত্রতা ও সততার ভাব সমূহ নিতান্ত বলবান্ এবং সে হৃদয়ে অন্য কোন প্রকার দুষ্ট ভাব কখনও উন্মেষিত হয় নাই। আমি তাঁহাকে তাঁহার আবদ্ধ কার্য্যে উৎসাহিত করিলাম। তিনি পুনরায় প্রতিমূর্ত্তির পাদদেশ পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। সম্ভাবিত প্রশ্নের পথ পরিষ্কার করিবার অভিপ্রায়ে, আমি তাঁহাকে সাবধানতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনাকে এস্থানে দেখিয়া আমি বড় আনন্দিত হইলাম। আপনি সে দিন আমার নিকট হইতে বিদায় হইয়া গেলে, আমি আপনার জন্য বড়ই চিন্তাকুল হইয়াছিলাম।"

তিনি নিতান্ত সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"চিন্তাকুল! কেন?"

"আপনি চলিয়া গেলে, আর একটী কাণ্ড ঘটিয়াছিল। আমি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম তাহারই নিকটে গাড়ি করিয়া দুইটী লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা আমাকে দেখিতে পায় নাই। পাহারাওয়ালার সহিত কথা কহিয়া তাহারা চলিয়া গেল।"

তখনই তাঁহার হস্তের কার্য্য বন্ধ হইয়া

গেল। যে রুমালের দ্বারা তিনি কার্য্য করিতে-ছিলেন, তাহা হস্তভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া গেল। ধীরে ধীরে তিনি পূর্ব্বের ন্যায় ভীত ভাবে, আমার প্রতি চাহিলেন। আমি দেখিলাম, যখন একথা আরম্ভ করা হইয়াছে তখন ইহা শেষ করাই সঙ্গত। এজন্য বলিতে লাগিলাম—"তাহারা পাহারাওয়ালাকে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিল। পাহারাওয়ালা আপনাকে দেখে নাই বলিল। তাহার পর ঐ দুইজনের একজন বলিল, আপনি পলাইয়া আসিয়াছেন।"

তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন—যেন অনুসরণ-কারীরা এখানেও তাঁহাকে ধরিতে আসি-তেছে।

আমি বলিলাম—"শুনুন, শেষ পর্য্যন্ত শুনুন। আমি সে স্থলেও আপনার উপকার করিয়াছি। আমি অনায়াসে তাহাদিগকে সন্ধান বলিয়া দিতে পারিতাম—কিন্তু কোন কথাই কহি নাই। আমি আপনার পলায়নের সহায়তা করিয়াছিলাম, যাহাতে সে পলায়ন নির্ব্বিঘ্ন হয়, তাহাও আমি করিয়াছি। যাহা আমি বলিতেছি তাহা আপনি বুঝিয়া দেখুন।"

যেন আমার ভাব ও বাক্য তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইল। প্রথম সাক্ষাৎ সময়ে, তিনি হস্তস্থিত ক্ষুদ্র পুঁটুলি যেমন বারংবার এক হস্ত হইতে অপর হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এখনও রুমালখানি লইয়া সেইরূপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার বদনের স্বাভাবিক ভাব আবির্ভূত হইল এবং তিনি কৌতূহলপূর্ণ নয়নে আমার মুখের প্রতি চাহিলেন। জিজ্ঞাসিলেন,—"আমাকে বাতুলরূপে আটকাইয়া রাখা উচিত বলিয়া আপনি মনে করেন না, কেমন?"

"কখনই না। আপনি যে নিষ্কৃতি পাইয়া-ছেন এবং আমি যে তাহার সহায়তা করি-য়াছি, এজন্য আমি পরমানন্দিত।"

"আপনি আমাকে কঠিন স্থলেই সাহায্য করিয়াছিলেন। পলায়ন করা সহজ কিন্তু কলি-কাতায় ঠিকানা খুঁজিয়া লওয়াই কঠিন কার্য্য। আপনার নিকট সে জন্য আমি নিতান্ত কৃতজ্ঞ। আমাকে পুনরায় বদ্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক বলিয়া আপনি মনে করেন না, কেমন?"

আমি বলিলাম,—"আপনাকে কখনই আবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত নয়, ইহা আমার স্থির বিশ্বাস। আপনি যে নির্ব্বিঘ্নে পলাইয়া আসিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত আহ্লা-দিত। আপনি বলিয়াছিলেন, কলিকাতায় কোন আত্মীয়ের নিকটে যাইবেন। তাঁহার দেখা পাইয়াছিলেন তো?"

"হাঁ দেখা পাইয়াছিলাম। তাঁহার নাম রোহিণী ঠাকুরাণী। তিনি আমাকে বড় দয়া করেন; তবে বরদেশ্বরী দেবীর মত নহেন। তেমন আর কেহ হয় না।"

"রোহিণী ঠাকুরাণীর সহিত কি আপনার অনেক দিনের পরিচয়?"

"তিনি আমাদের প্রতিবেশিনী ছিলেন। আমি যখন বালিকা, তখন হইতে তিনি আমাকে বড় ভাল বাসেন—বড় দয়া করেন। তিনি যখন নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আইসেন, তখন আমাকে বলিয়াছিলেন, 'মুক্ত! তোর যদি কখন কষ্ট হয় তাহা হইলে আমার কাছে আসিস্। আমার স্বামী পুত্র নাই, আমি তোকে পাইলে সুখী হইব।' বড় দয়ার কথা নয়? দয়ার কথা বলিয়া ইহা আমার মনে আছে।"

"আপনার কি পিতা মাতা নাই?"

"পিতা? কই আমি তো কখন তাঁহাকে দেখি নাই; মাতার মুখেও কখন তাঁহার কথা

শুনি নাই তো। পিতা! আহা! হয়তো তিনি অনেক দিন মরিয়া গিয়াছেন।”

“আর আপনার মাতা?

“তাঁহার সহিত আমার মনের মিল নাই। আমরা পরস্পর পরস্পরের জ্বালা!,

জ্বালা! মনে সন্দেহ হইল, তবে কি ইহার মাতা ইহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার মূল?

তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—“মার কথা বলিলেন না। রোহিণী ঠাকুরাণীর কথা বলুন। আপনি আমাকে যেমন দয়া করেন, রোহিণী ঠাকুরাণীও আমাকে সেইরূপ দয়া করেন। আমি কয়েদে থাকি ইহা তিনিও উচিত মনে করেন না। আমি পলাইয়া আসায় তিনি বড় সন্তুষ্ট! আমার দুঃখ দেখিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলেন। আমার দুর্ভাগ্যের কথা তিনি কাহাকেও জানিতে দেন না।”

“দুর্ভাগ্যের কথা? তাহার অর্থ কি? স্ত্রীলোকের দুর্ভাগ্য অনেক প্রকার হইতে পারে। বর্ত্তমান দুর্ভাগ্য কি প্রকার? জিজ্ঞাসিলাম,—“কি দুর্ভাগ্য?

তিনি সবিস্ময়ে উত্তর দিলেন,—“এই আবদ্ধ থাকার দুর্ভাগ্য, আর কি দুর্ভাগ্য হইতে পারে?”

আমি আবার ধীরে ধীরে বলিলাম,—“স্ত্রীলোকের জীবনে আরও এক প্রকার দুর্ভাগ্য হইতে পারে। সেরূপ দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইলে যাবজ্জীবন লজ্জা ও মনস্তাপ ভোগ করিতে হয়।

তিনি ব্যগ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসিলেন,— “কি সে দুর্ভাগ্য?”

আমি বলিলাম,—“প্রণয়াস্পদের চরিত্রে অত্যধিক বিশ্বাস স্থাপন করিলে সেরূপ দুর্ভাগ্য ঘটিতে পারে।”

স্ত্রীলোক যেরূপ সরলতা পূর্ণ, পবিত্রতা পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহাতে আমি বুঝিলাম, যাঁহার সেরূপ দৃষ্টি তাঁহার চরিত্রে কোন প্রকার লজ্জাজনক কার্য্য বা কলঙ্কিত ব্যবহার প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে না। শত বাক্যে যাহা বুঝাইতে পারিত না, এক দৃষ্টিতে তাহা বুঝাইয়া দিল। ইহা আমি স্থির বুঝিয়াছিলাম যে, মুক্তকেশী পত্রমধ্যে রাজা প্রমোদরঞ্জনকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু প্রমোদরঞ্জন ইঁহার চরিত্র কলঙ্কিত করেন নাই, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। তবে কেন তাঁহাকে লীলাবতী দেবীর চক্ষে ঘৃণিত বর্ণে রঞ্জিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে? অবশ্যই তাহার বিশেষ কারণ আছে? সে কারণ কি?

আমি আবার জিজ্ঞাসিলাম,—“আপনি কলিকাতায় রোহিণী ঠাকুরাণীর সহিত কতদিন ছিলেন? তাহার পর এখানে কেমন করিয়া আসিলেন?”

তিনি বলিলেন,—“এখানে দুই দিন আসিয়াছি। এখানে আসিবার পূর্ব্বে বরাবর সেই খানেই ছিলাম।”

আমি বলিলাম,—“আপনি তবে এই গ্রামেই রহিয়াছেন? কি আশ্চর্য্য, আপনি এখানে দুই দিন আছেন, কিন্তু আমি আপনার সংবাদ পাই নাই।”

“না, না, আমি এখানে থাকি না। এখান হইতে ক্রোশ খানেক দূরে একটা খামার-বাড়ি আছে, আপনি জানেন কি? তারার খামার।”

স্থানটী আমার পরিচিত। আমি তাহার নিকট দিয়া অনেকবার যাতায়াত করিয়াছি।

তিনি আবার বলিতে লাগিলেন— “খামারের মালিক তারামণি; তিনি রোহিণী ঠাকুরাণীর বিশেষ আত্মীয়। রোহিণী ঠাকু-

রাণীকে একবার তাঁহাদের বাটী আসিবার নিমিত্ত তারামণি বড় অনুরোধ ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি আসিবার সময় আমাকেও সঙ্গে লইয়া আসিবার প্রস্তাব করিলেন। শক্তিপুরের নিকট খামার শুনিয়া, আমি মহানন্দে তাঁহার সঙ্গে আসিতে সম্মত হইলাম। এখানকার পূর্ব্ব-পরিচিত স্থান সকলের উপর দিয়া বেড়াইব—কি আনন্দ! খামারের লোকগুলি বেশ! বোধ হয়, আমি এখানে অনেক দিন থাকিব। এক বিষয়ে রোহিণী ও তারামণি আমাকে বড় জ্বালাতন করেন—"

"কি বিষয়?"

"আমার এই ধপ্‌ধপে সাদা কাপড় পরার জন্য তাঁহারা আমাকে বড় ত্যক্ত করেন। তাঁহারা জানিবেন কি? বরদেশ্বরী দেবী জানতেন; তিনি সাদা কাপড় বড় ভাল বাসিতেন—আমাকেও সাদা কাপড় পরাইয়া সুখী হইতেন। সেই জন্যই তো আমি যত্ন করিয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি আরও সাদা করিয়া দিতেছি তাঁহার ছোট কন্যাকেও তিনি সাদা কাপড়ে সাজাইতেন। মহাশয়, লীলাবতী দেবী সুখে আছেন ভাল আছেন তো? তিনি বালিকাকালে মেমে সাদা কাপড় পরিতেন, এখনও তেমনই পরেন কি?"

আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম,—"আজি প্রাতঃকাল হইতে তিনি একটু অসুখে আছেন।"

কেন যে লীলাবতী দেবী আজি অসুস্থ হইয়াছেন, বোধ হইল, তাহা মুক্তকেশীর অগোচর নাই। তিনি অস্ফুট স্বরে আপনা আপনি কি বলিতে লাগিলেন। আমি অবসর বুঝিয়া প্রশ্ন করিলাম,—"কেন লীলাবতী দেবী অসুখী হইয়াছেন তাহা কি আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

তিনি ব্যস্ততাসহ উত্তর দিলেন,—"না, তাহা আমি আপনাকে একবারও জিজ্ঞাসা করি নাই।"

আমি বলিলাম,—"আপনি জিজ্ঞাসা না করিলেও আমি আপনাকে তাহা বলিতেছি। তিনি আপনার পত্র পাইয়াছেন।"

আমার বাক্যের প্রথমাংশ শুনিয়াই তিনি চমকিত হইলেন। বাক্য সমাপ্ত হইলে তিনি প্রস্তরবৎ অচল ও নিস্পন্দ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার হস্তস্থিত বস্ত্রখণ্ড ভূপতিত হইয়া গেল, ওষ্ঠাধর উন্মুক্ত হইয়া পড়িল, বদন বিজাতীয় পাণ্ডুত্ব প্রাপ্ত হইল।

ক্ষীণস্বরে তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি কেমন করিয়া জানিলেন? কে আপনাকে তাহার কথা বলিল?"

আবার ক্রমশঃ তাঁহার বদনের স্বাভাবিক বর্ণ আবির্ভূত হইতে লাগিল। তিনি হতাশভাবে সভয়ে হস্তে হস্ত মিলাইয়া আবার বলিলেন,—"আমি তো তাহা লিখি নাই—আমি তাহার কিছুই জানি না।"

আমি বলিলাম,—"হাঁ, আপনি তাহা লিখিয়াছেন, আপনি তাহা জানেন। এরূপ ভাবে পত্র প্রেরণ করা ও লীলাবতী দেবীকে ভয় প্রদর্শন করা নিতান্ত অন্যায় কার্য্য। আপনার বক্তব্য যদি তাঁহার শ্রবণ করা আবশ্যক বলিয়া আপনি জানিতেন, তাহা হইলে স্বয়ং আনন্দধামে উপস্থিত হইয়া, নিজমুখে লীলাবতী দেবীর সমক্ষে সমস্ত কথা ব্যক্ত করা আপনার উচিত ছিল।

তিনি নির্ব্বাক্‌ভাবে তথায় বসিয়া পড়িলেন। আমি আবার বলিলাম,—তাঁহার জননী আপনার প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার

করিতেন, লীলাবতী দেবীও, আপনার অভি-সন্ধি ভাল হইলে, অবশ্যই আপনার সহিত সেইরূপ সদয় ব্যবহার করিবেন। সমস্ত বিষয় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, যাহাতে আপনার কোন অনিষ্ট না হয় লীলাবতী দেবী অবশ্যই তাহা করিবেন। আপনি তাঁহার সহিত খামারে দেখা করিবেন কি? অথবা আনন্দ-ধামের উদ্যানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি-বেন কি?"

তিনি আমার কথায় কোন উত্তর না দিয়া বরদেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তির প্রতি কাতর ভাবে চাহিয়া বলিলেন,—"মাগো, তুমিই জান, আমি তোমার কন্যাকে কত ভালবাসি। বলিয়া দেও দেবী, তাঁহাকে বর্ত্তমান বিপদ হইতে কি উপায়ে রক্ষা করিতে হইবে। বল মা, কি করিলে ভাল হইবে!"

এই বলিয়া তিনি সেই প্রতিমূর্ত্তির পদ-নিম্নে মস্তক স্থাপন করিলেন এবং বারংবার সেই পাষাণময় চরণ-যুগল চুম্বন করিতে লাগি-লেন। এ দৃশ্য আমাকেও বিচলিত করিল। আমি তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিবার প্রযত্ন করিতে লাগিলাম; কিন্তু কোনই ফল হইল না। তাঁহাকে অন্যমনস্ক না করিলে নহে বুঝিয়া বলিলাম,—"শান্ত হউন, স্থির হউন। নচেৎ আমিও হয়ত বুঝিব, আপনাকে লোকে নিতান্ত অকারণে আবদ্ধ—"

কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে তিনি তীব্র-বেগে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তাঁহার বদন ঘৃণা ও ভয়ে বিষম ভাব ধারণ করিল। তাঁহার মূর্ত্তি বস্তুতই উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়া উঠিল। যে বস্ত্রখণ্ড তাঁহার হস্ত-ভ্রষ্ট হইয়াছিল তাহা তিনি তুলিয়া লইলেন এবং বারংবার সজোরে তাহা পেষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে অতি অস্ফুটস্বরে মুক্তকেশী বলিলেন,—"অন্য কথা বলুন। ও প্রসঙ্গ আমার অসহ্য।"

আমি বুঝিলাম বরদেশ্বরী দেবীর প্রতি কৃতজ্ঞতাই এই যুবতীর হৃদয়ের একমাত্র বদ্ধমূল ভাব নহে। যে ব্যক্তি ইহাঁকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার প্রতি বৈরনির্যাতন প্রবৃত্তিও ইহাঁর হৃদয়ে বিলক্ষণ প্রবল। এ অবৈধ অত্যাচার কে করিয়াছিল? ইহা কি যুবতীর জননীর কার্য্য? আমার উদ্দেশ্যানুযায়ী প্রশ্ন করা আবশ্যক হইলেও, যুবতীর ভাব দেখিয়া তাহা বলিতে ইচ্ছা হইল না। আমি করুণ ভাবে বলিলাম,—"আপনার যাহাতে কষ্ট হয়, এমন কথা আর বলিব না।"

তিনি বলিলেন,—"আপনার কোন দরকারী কথা আছে বোধ হইতেছে। কি কথা বলুন।"

"আপনি সুস্থির হইয়া আমি যাহা বলিয়াছি তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন।"

তিনি স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল পাক দিতে দিতে অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন,—"বলিয়াছেন? কৈ কি বলিয়াছেন? আমার তো মনে হয় না। আমাকে মনে করাইয়া দিন।"

আমি বলিলাম,—"আমি আপনাকে কল্য প্রাতে লীলাবতী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিতেছিলাম।"

"আঃ লীলাবতী দেবী—বরদেশ্বরী দেবীর কন্যা! বরদেশ্বরী—"

তাঁহার বদনমণ্ডল ক্রমশঃ সুস্থির ভাব ধারণ করিল। আমি বলিতে লাগিলাম,—"আপনার কোন ভয় নাই। পত্রের কথা লইয়া কোনই গোল ঘটিবে না; লীলাবতী দেবী সে সম্বন্ধে অনেক সংবাদ জানেন। তাঁহার নিকট সে কথা লুকাইবার কোনই দরকার নাই। আপনি পত্রে কোন নামের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু লীলাবতী দেবী

জানেন, আপনি যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার নাম রাজা প্রমোদরঞ্জন।"

নাম শেষ হইতে না হইতে তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন এবং বিকট চীৎকার করিলেন। তাঁহার বদন পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে অধিক কাতর ও উত্ত্যক্ত ভাব ধারণ করিল। নাম শ্রবণে তাঁহার দারুণ ঘৃণা ও ভীত ভাব স্পষ্টই বুঝা গেল। আর কোনই সন্দেহ থাকিল না। তাঁহাকে অবরোধ করার সম্বন্ধে তাঁহার জননীর কোন দোষ নাই। এক ব্যক্তি তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল—সে ব্যক্তি প্রমোদরঞ্জন।

তাঁহার চীৎকার ধ্বনি অন্য কর্ণেও প্রবেশ করিয়াছিল। শুনিতে পাইলাম রোহিণী বলিতেছেন,—"যাই, যাই—ভয় কি ?"

অবিলম্বে তাঁহার সঙ্গিনী প্রবীণা ঠাকুরাণী তথায় উপস্থিত হইলেন এবং রুক্ষভাবে আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"কে তুমি? কোন সাহসে তুমি এই নিঃসহায় স্ত্রীলোককে ভয় দেখাইতেছ ?"

মুক্তকেশীকে রোহিণী আপনার ক্রোড়ের দিকে টানিয়া লইলেন এবং সযত্নে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। তাহার পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি হইয়াছে মা? এ ব্যক্তি তোমার কি করিয়াছে ?"

মুক্তকেশী উত্তর দিলেন,—"কিছু না—কিছু করেন নাই। আমি শুধুই ভয় পাইয়াছি।"

রোহিণী রাগতভাবে আমার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন।

আমি বলিলাম,—"রাগ করিবেন না—রাগ করিবার মত কোন কাজ আমি করি নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার অনিচ্ছাতেও উনি চমকিয়া উঠিয়াছেন। উঁহার সহিত আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ নহে। আপনি উঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন, জানিতে পারিবেন যে ইচ্ছাপূর্ব্বক উঁহার বা অন্য কোন স্ত্রীলোকের কোন প্রকার ক্ষতি করিবার লোক আমি নহি।"

মুক্তকেশী যাহাতে আমার কথা ও অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন, আমি তাহাই লক্ষ্য করিয়া বাক্যগুলি পরিষ্কার করিয়া বলিলাম। দেখিলাম, আমার উদ্দেশ্য সফলিত হইয়াছে। মুক্তকেশী বলিলেন,—"হাঁ ঠিক কথা। উনি একবার আমাকে বড় দয়া করিয়াছিলেন। উনি আমাকে—"

অবশিষ্ট কথা মুক্তকেশী রোহিণীর কাণে কাণে বলিলেন।

রোহিণী বলিলেন,—"তাই ত। আপনার সহিত কর্কশ ভাবে কথা বলা আমার অন্যায় হইয়াছে। কিন্তু আমি আগে তো কিছু জানিতাম না। যাহা হউক, মুক্তকেশীকে এরূপ স্থানে একাকী থাকিতে দেওয়াই আমার ভাল হয় নাই। যাহা হইয়াছে তাহার হাত নাই। এখন এস মা, আমরা বাড়ী যাই।"

আমার বোধ হইল যেন রোহিণীর ফিরিয়া যাইতে আশঙ্কা উপস্থিত হইল। আমি তাঁহাদের সঙ্গে যাইয়া তাঁহাদের বাসস্থানে রাখিয়া আসিবার প্রস্তাব করিলাম। কিন্তু ঠাকুরাণী সে উপকার গ্রহণে স্বীকার করিলেন না।

যখন তাঁহারা প্রস্থানের উপক্রম করিলেন, তখন আমি মুক্তকেশীকে কাতর ভাবে বলিলাম,—"আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

মুক্তকেশী বলিলেন,—"তাহা করিব। কিন্তু দেখিতেছি, আপনি আমার সম্বন্ধে এত অধিক সংবাদ জানেন যে, আপনি আমাকে যখন তখন ভয় দেখাইতে পারিবেন।"

রোহিণী আমার প্রতি কাতরভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং বলিলেন,—"আপনি উঁহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক ভয় দেখান নাই। যাহা হউক, আপনি যদি উঁহাকে ভয় না দেখাইয়া,

আমাকে ভয় দেখাইতেন, তাহা হইলে হানি ছিল না।”

কিয়দ্দূর মাত্র অগ্রসর হইয়া মুক্তকেশী আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং বরদেশ্বরী দেবীর সেই প্রতিমূর্ত্তির পাদদেশে মস্তক স্থাপন করিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। তাহার পর গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—“এখন মনটা অনেক সুস্থ হইল। আমি আপনাকে ক্ষমা করিলাম।”

তাঁহারা চলিয়া গেলেন। যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, ততদূর আমি নিমেষশূন্য নয়নে মুক্তকেশীকে দেখিতে লাগিলাম। মুক্তকেশীর মূর্ত্তি ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গেল। আমার হৃদয়, কি জানি কেন, অবসন্ন হইয়া পড়িল। যেন বোধ হইল, ইহ জগতে এই শুক্লবসনা সুন্দরীর সহিত আমার এই শেষ সাক্ষাৎ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আধ ঘণ্টার মধ্যে বাটী ফিরিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত মনোরমা দেবীকে জানাইলাম। নিঃশব্দে ও সম্পূর্ণ মনোযোগ সহকারে তিনি সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—“ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার মনে বড়ই আশঙ্কা হইতেছে।”

আমি বলিলাম,—“বর্ত্তমানের ব্যবহারের উপর ভবিষ্যতের ফলাফল নির্ভর করিয়া থাকে। আমার বোধ হয়, মুক্তকেশী আমাকে যেরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা বলিয়াছে, কোন স্ত্রীলোকের সমক্ষে, তদপেক্ষা নিঃসঙ্কোচে মনের কথা ব্যক্ত করিতে পারে। যদি লীলাবতী দেবী—”

মনোরমা দেবী বাধা দিয়া বলিলেন,—“না—না, সে কথা মনেও করিবেন না।”

আমি বলিলাম,—“তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে আপনি মুক্তকেশীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার মনের কথা জানিবার নিমিত্ত যতদূর সম্ভব যত্ন করুন। আমার কথায় সে একবার বড় ভয় পাইয়াছে। সে নিরপরাধা স্ত্রীলোককে আবার একবার ভয় দেখাইতে আমার বাসনা নাই। আমার সহিত কালি খামার বাড়িতে যাইতে আপনার কোন আপত্তি আছে কি?”

“কিছু না। লীলার হিতার্থে যে কোন স্থানে যাইতে, অথবা যে কোন কার্য্য করিতে আমি প্রস্তুত আছি। যে স্থানে তাঁহারা আছেন, তাহার কি নাম বলিলেন?”

“আপনি সে স্থান বেশ জানেন। তাহার নাম তারার খামার।”

আমি সে স্থান বেশ জানি। তাহা রায় মহাশয়ের জমিদারি ভুক্ত। সেখানকার খামার—ওয়ালার একটী মেয়ে আমাদের বাটীতে চাকরাণী আছে। দাঁড়ান, আমি দেখিয়া আসি, সে এখন আছে কি না। তাঁহার নিকট হইতে অনেক সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে।”

মনোরমা দেবী তাহার সন্ধানে গমন করিলেন, কিন্তু সে বাটী চলিয়া যাওয়ায়, তাহার সহিত দেখা হইল না। তিনি শুনিয়া আসিলেন, সে দুইদিন কামাইয়ের পর আজি আসিয়াছিল এবং অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু আগেই চলিয়া গিয়াছে।

মনোরমা দেবী বলিলেন—“আচ্ছা, কল্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই হইবে। আপাততঃ মুক্তকেশীর সহিত কথাবার্ত্তায় কিকি ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে, তাহা বুঝা আবশ্যক। যে ব্যক্তি তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল সে

যে রাজা প্রমোদরঞ্জন, এ সম্বন্ধে কি আপনার কোনই সন্দেহ নাই ?"

আমি বলিলাম,—"এক বিন্দুও না। এ সম্বন্ধে কেবল একমাত্র রহস্য আছে। তাহাকে এরূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার অভিপ্রায় কি ? রাজার ও এই দরিদ্র নারীর অবস্থার বৈষম্য দেখিয়া স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে ইঁহাদের পরস্পর কোনই সম্পর্ক থাকা সম্ভব নহে। এরূপ স্থলে রাজা ইহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার ভার কেন গ্রহণ করিলেন, তাহা নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়।"

মনোরমা বলিলেন,—"কোথায় আবদ্ধ করিয়াছিলেন ? সাধারণ-বাতুলালয়ে কি ? সেখানকার খরচপত্র কে দিত ?"

আমি উত্তর দিলাম,—"ব্যয়ভার সমস্তই রাজা বহন করিতেন। এরূপ বহুব্যয় স্বীকার করিয়া উহাকে আটকাইয়া রাখায় তাঁহার কি স্বার্থ তাহা কিছুতেই বুঝা যাইতেছে না।"

মনোরমা বলিলেন,—"বুঝিয়াছি, সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। কালি মুক্তকেশীর সহিত দেখা হয় ভালই, না হইলেও, এ রহস্য কখনই অজ্ঞাত থাকিবে না। এ বিষয়ের সদুত্তর দিয়া আমাকে ও উমেশ বাবুকে রাজার সন্তুষ্ট করিতে হইবে। তাহা না হইলে তিনি এখানে থাকিতেও পাইবেন না এবং এ বিবাহ-সম্বন্ধও ভাঙ্গিয়া দিব।"

সে রাত্রিতে এই পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা হইল। পর দিন প্রাতে খামার বাড়ীতে যাইবার পূর্ব্বে অন্য এক বিষম কর্ত্তব্যচিন্তা আমার মনে উদিত হইল। অদ্য আমার আনন্দধামে অবস্থানের শেষ দিন। এক্ষণে যত শীঘ্র সম্ভব রায় মহাশয়ের নিকট বিদায় লওয়া আবশ্যক। কোন্ সময়ে একটু বিশেষ প্রয়োজন হেতু আমি একবার সহি সাক্ষাৎ করিতে পারিব, তাহা জানিবার নিমিত্ত একজন ভৃত্যকে রায় মহাশয়ের প্রকোষ্ঠে পাঠাইয়া দিলাম।

রায় মহাশয় সহজে অনুমতি দিউন বা না দিউন, আমি যে চলিয়া যাইব তাহা স্থির। লীলাবতী দেবীর নিকট হইতে অবিলম্বে অন্তরিত হওয়াই আমার স্থির সংকল্প। এই সংকল্প সাধনার্থ আমার চিত্ত এতই চিন্তাকুল যে, তথায় অন্য মানাপমান চিন্তার অবসর ছিল না ; সুতরাং রায় মহাশয় আমার প্রার্থনা কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিবেন, তাহা একবারও আমার মনে হইল না। অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, রায় মহাশয়ের শরীরের অবস্থা নিতান্ত মন্দ, বিশেষতঃ অদ্য তাঁহার যেরূপ অবস্থা তাহাতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অতুলানন্দ লাভ করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। এজন্য তিনি সবিনয়ে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন এবং আমার বক্তব্য তাঁহাকে পত্র দ্বারা জানাইবার অনুরোধ করিয়াছেন। এই তিন মাস কালের মধ্যে, রায় মহাশয়ের সহিত আমার সেই প্রথমে একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল—আর হয় নাই। তাঁহার নিয়ত অসুখ, তিনি সতত সাক্ষাতে অশক্ত। কিন্তু লোক-মুখে আপ্যায়িতের কখনই ত্রুটি নাই। রকম রকম মিষ্ট বচনে তিনি আমাকে তুষ্ট করিয়া আসিতেছেন এবং আমার কৃত প্রাচীন পুঁথির টীকা দেখিয়া বিশেষ বিধানে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার শরীরের যে অবস্থা তাহাতে দেখা করা অসম্ভব বলিয়া তিনি সততই দুঃখই জানাইয়াছেন। আমি, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায়, কখনই দুঃখিত বা নারাজ ছিলাম না ; আজিও হইলাম না। আমি তাঁহার সমীপে নিতান্ত বিনীত ভাবে ও সংক্ষেপে

বিদায় প্রার্থনা জানাইলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে রায় মহাশয়ের উত্তর আসিল। সুন্দর কাগজে, বেগুণে কালীতে, শৃঙ্খলাবদ্ধ অক্ষরে রায় মহাশয় আঁকাইয়া পত্র লিখিয়াছেন। চিঠিতে অনেক দুঃখের রোদন, শরীরের জন্য অনেক খেদ, তাঁহাকে এরূপে উত্ত্যক্ত করার জন্য অনেক অভিমান, লোকের হৃদয়-হীনতা স্মরণ করিয়া অনেক আক্ষেপোক্তি লিখিত ছিল। উপসংহারকালে তিনি আমাকে বিদায় দিতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার পত্র পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। তিনি যে আমার ব্যবহারে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা মনে করিয়া তাঁহার উপর রাগ করিতে আমার সময় ছিল না, ইচ্ছাও হইল না। আমি তাঁহার পত্র প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের সঙ্গে রাখিয়া, মনোরমা দেবীর উদ্দেশে বাহিরে আসিলাম। তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া আমরা তারার খামারের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। খামারের নিকটস্থ হইয়া আমি বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, মনোরমা দেবী ভিতরে প্রবেশ করিলেন। শীঘ্রই তিনি ফিরিয়া আসিলেন। এত শীঘ্র তিনি ফিরিয়া আসিলেন দেখিয়া, আমি সবিস্ময়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম,—"মুক্তকেশী কি আপনার সহিত সাক্ষাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন?"

মনোরমা দেবী উত্তর দিলেন,—"মুক্তকেশী চলিয়া গিয়াছেন।"

"চলিয়া গিয়াছেন?"

"আজি প্রাতে ৮টার সময় রোহিণীর সহিত মুক্তকেশী চলিয়া গিয়াছেন।"

আমি নির্ব্বাক্। বুঝিলাম রহস্য প্রকাশের যে শেষ আশা ছিল, তাহাও আর থাকিল না।

মনোরমা দেবী বলিলেন,—"তারামণি তাহার এই অতিথিগণের বৃত্তান্ত যতদূর জানে, আমি তাহা জানিয়াছি। কিন্তু তাহা হইতে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। রাত্রিতে, আমাদের বাগানে আপনার সহিত সাক্ষাতের পর, তাহারা এখানে ফিরিয়া আইসে এবং স্বচ্ছন্দে থাকে। দিনে একজন রেলযাত্রীর গাড়ী এই খামারের নিকট কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়াছিল। গাড়ীর বাবু একখানি নিষ্প্রয়োজনীয় বাঙ্গালা খবরের কাগজ ফেলিয়া দিয়াছিলেন। তারামণির ছোট মেয়েটী সেই কাগজখানা তুলিয়া আনিয়াছিল। সেই কাগজখানা মুক্তকেশীর চক্ষে পড়ে এবং সে সেই কাগজের কিয়দংশ পাঠ করিয়া অত্যন্ত কাতর ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।"

আমি বলিলাম,—"কাগজখানা আপনি একবার দেখিলেন না কেন?

তিনি উত্তর দিলেন,—"আমি তাহা দেখিয়াছি। দেখিলাম, কাগজের অকর্ম্মণ্য সম্পাদক রাজা প্রমোদরঞ্জনের সহিত আমার ভগ্নীর বিবাহ-সম্বন্ধের সংবাদ আপনার সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রথমেই প্রকটিত করিয়াছেন। বুঝিলাম, এই সংবাদই মুক্তকেশীর মূর্চ্ছার কারণ এবং এই বিবাহ সম্বন্ধই মুক্তকেশীর নামহীন পত্রের মূল।"

আমি আবার জিজ্ঞাসিলাম,—"তাহার পর?"

তিনি বলিতে লাগিলেন,—"মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে মুক্তকেশী আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া সকলের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। সে সময়ে তারামণির যে বড় মেয়েটি আমাদের বাটিতে কাজ করে, সেও গৃহে ছিল। সকলের সহিত কথা কহিতে কহিতে, মুক্তকেশী বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল এবং তাহার আবার হঠাৎ

ভয়ানক মূর্চ্ছা হইল। কেহই এ মূর্চ্ছার কোন কারণ স্থির করিতে পারিল না। অনেক যত্নে তাহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল; তখন রোহিণী, তারামণিকে ডাকিয়া, বলিলেন, তাঁহাদের আর থাকা হইতেছে না, তাঁহারা তখনই যে রেলের গাড়ী যায় তাহাতেই চলিয়া যাইবেন। কেন যে তাঁহারা এরূপ মত করিলেন তাহা জানিবার জন্য তারামণি অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু রোহিণী সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলিলেন না। তারামণি দুঃখিত হইল, বিরক্তও হইল। রোহিণী কেবল বলিলেন,—"বিশেষ কোন কথা নহে। যে কারণে আমরা যাইতেছি, তাহার সহিত আপনাদের কোন সম্পর্ক নাই। সে কারণ, কোন ক্রমেই ব্যক্ত করিবার নহে। তারামণি আর কি করিবে? তাহার পর মুক্তকেশী ও রোহিণী বেলা ৯॥০ টার সময় যে ট্রেণ যায় সেই ট্রেণে যাইবার জন্য এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন—কি বৃত্তান্ত, কেহই জানে না। এইতো ব্যাপার মাষ্টার মহাশয়। এখন আপনি বুঝিয়া দেখুন, ইহা হইতে কি মীমাংসা করা সঙ্গত।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"যে সময়ে মুক্তকেশীর মূর্চ্ছা হয়, তখন তথায় কি গল্প হইতেছিল, তাহা আপনি জানিতে চেষ্টা করিয়াছেন কি?"

তিনি বলিলেন,—"করিয়াছি বটে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। কারণ সে সময়ে কোন নির্দ্দিষ্ট কথা চলিতেছিল না, সুতরাং কেহ বিশেষ কিছু বলিতে পারিল না।"

আমি বলিলাম,—"তারামণির বড় মেয়ে হয়ত বিশেষ বৃত্তান্ত মনে করিয়া বলিলেও বলিতে পারে। চলুন, বাটী গিয়া অগ্রে তাহার নিকট সন্ধান করা যাউক।

বাটী ফিরিয়া আসিয়া আমরা উভয়েই তারার কন্যার নিকটে গমন করিলাম। মনোরমা দেবী প্রথমে নানারূপ অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্ত্তার দ্বারা তাহার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া, তাহার পর সুকৌশলে জিজ্ঞাসিলেন—"কালি তোমাকে এখানে দেখিতে পাই নাই। বাটী ছিলে বুঝি?"

তারার মেয়ে উত্তর দিল,—"হাঁ দিদি ঠাকুরাণি, কালি আমাদের বাটীতে দুইটী বিদেশী মেয়ে মানুষ ছিলেন। তাহার মধ্যে একজনের বারবার মূর্চ্ছা হইয়াছিল; সেই জন্যই আমার বেলা হইয়া গেল বলিয়া, কালি আসা হয় নাই।"

মনোরমা দেবী জিজ্ঞাসিলেন,—মূর্চ্ছা হইতে লাগিল! কেন? তোমরা বুঝি তাহাকে কোন ভয়ের কথা বলিয়াছিলে?

সে উত্তর দিল,—"না দিদি, আমরা সোজাসুজি গল্প করিতেছিলাম। আমি এখানে সারাদিন থাকি, এখানকারই অনেক গল্প আমি করিতেছিলাম।"

মনোরমা দেবী জিজ্ঞাসিলেন,—"এখানকার গল্প! এখানকার আবার গল্প কি?

সে বলিল,—"রাজা প্রমোদারঞ্জন কেন এখানে শীঘ্র আসিবেন সেই কথা, বিবাহের জন্য কত উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে তাহার কথা, এই সব রকম কথা বলিতেছিলাম।"

আর কথা শুনিবার প্রয়োজন হইল না। উভয়ে বাহিরে চলিয়া আসিয়া আমরা কিয়ৎকাল পরস্পরের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"দেবি, এখনও কি আপনার মনে কোন প্রকার সন্দেহ আছে?"

মনোরমা বলিলেন,—"রাজা প্রমোদরঞ্জন এ সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন ভালই নচেৎ লীলা কখনই তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইতে পাইবে না, ইহা স্থির।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

মনোরমা দেবী ও আমি বাহিরে আসিতে না আসিতে দেখিলাম গাড়ি-বারান্দায় একখানি গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। মনোরমা দেবী গাড়ির আরোহীকে দেখিবামাত্র বাহিরে আসিলেন। গাড়ি হইতে একটী প্রবীণ ব্যক্তি অবতরণ করিলেন। তিনিই উমেশ বাবু—উকীল।

এই বয়স্ক ব্যবহারজীবীর সহিত আমার পরিচয় হইলে আমার চিত্তে অনেক চিন্তার আবির্ভাব হইল। ভাবিলাম আমি প্রস্থান করিলে ইনি কিছুদিন এখানে থাকিবেন এবং রাজা প্রমোদরঞ্জন আত্মচরিত্র সমর্থনার্থ যে সকল প্রমাণ উপস্থিত করিবেন, ইনিই তাহার বিচার করিবেন, আর অতঃপর ইনিই এ সম্বন্ধে মনোরমা দেবীকে বিহিত মীমাংসা করার সহায়তা করিবেন। বিবাহবিষয়ক সমস্ত কথাবার্ত্তা স্থির হওয়া পর্য্যন্ত ইনিই এস্থানে অপেক্ষা করিবেন এবং বিবাহ স্থির হইলে লীলাবতীর সম্পত্তি সংক্রান্ত লেখা পড়া এবং ব্রাহ্ম-বিবাহবিধি অনুসারে কাগজপত্র ইনিই প্রস্তুত করিবেন। ইহারই দ্বারা বিবাহ-বন্ধন চিরকালের নিমিত্ত অবিচ্ছেদ্য ভাবে নিবদ্ধ হইবে। এই সকল কারণে লোকটির প্রতি আমার তৎকালে বড়ই অনুরাগ জন্মিল।

দেখিতে শুনিতে উমেশ বাবু লোকটী বেশ। তাঁহার পরিচ্ছদ শুভ্র, কেশ প্রায় ধবল, কথাবার্ত্তা অতি মিষ্ট, মুখখানি হাসি মাখা, মানুষটী ছোট খাট, চেহারাটি বেশ বুদ্ধিমান লোকের মত। সংক্ষেপতঃ, অল্প আলাপের পরই এই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবীর প্রতি আমার ভক্তি জন্মিল।

বৃদ্ধ উমেশ বাবু ও মনোরমা দেবী কথা কহিতে কহিতে গৃহাভ্যন্তরে গমন করিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গী হইলাম না।

আনন্দধামে আমার অবস্থান কাল ক্রমশই শেষ হইয়া আসিতেছে। কল্য প্রাতে আমি প্রস্থান করিব, ইহার আর অন্যথা নাই আমার জীবনের এই নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী সুখস্বপ্ন এখনই ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমার প্রণয়-লীলার এই স্থানেই অনন্ত অবসান।

চিত্তের অযথা চাঞ্চল্য হেতু আমি অত্রত্য উদ্যানে ও পূর্ব্বপরিচিত দৃশ্যসমূহের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে মনস্থ করিলাম। কিন্তু যেখানে যাই, যাহা দেখি, কিছুই তো সে মর্ম্মমন্থনকারী স্মৃতি-বিবর্জ্জিত নহে। কোথায় বসিয়া তাঁহাকে পাঠ বলিয়া দিই নাই? কোথায় বসিয়া তাঁহার সহিত নানা সাংসারিক বিষয়ের বাক্যালাপ করি নাই? কোথায় তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তত্রত্য শোভার প্রশংসা করি নাই? তবে আজি কোথায় গিয়া হৃদয় জুড়াইব? কোথায় গিয়া ক্ষণেকের নিমিত্ত সে ভ্রান্তি-সম্ভাবনা-বিরহিত স্মৃতি ভুলিব?

বেড়াইতে বেড়াইতে দূরে উমেশ বাবুকে দেখিতে পাইলাম। বুঝিলাম, তিনি আমাকেই অন্বেষণ করিতেছেন। মনের এরূপ অবস্থায় তাদৃশ অল্প পরিচিত ব্যক্তির সহিত কথোপকথন অসম্ভব হইলেও, অধুনা তাহা অপরিহার্য্য। নিকটস্থ হইলে তিনি বলিলেন,—"মহাশয়,

আপনাকেই খুঁজিতেছিলাম। আপনার সহিত আমার গোটা দুই কথা আছে। যে কার্য্যের জন্ম আমি এখানে আসিয়াছি, মনোরমা দেবীর সহিত তৎসংক্রান্ত কথোপকথনকালে একখানি নামহীন পত্রের বিষয় জানিতে পারিলাম। আপনি তাহার তত্ত্বানুসন্ধানার্থ যে বিহিত যত্ন করিয়াছেন তাহাও শুনিতে পাইলাম। আপনার সন্তোষের নিমিত্ত আপনাকে জানাইতেছি যে, আপনি আপাততঃ যে সন্ধান ত্যাগ করিতেছেন, অতঃপর সে সন্ধানের ভার আমার হস্তেই পড়িতেছে। আমি সে বিষয়ে ত্রুটি করিব না।”

আমি বলিলাম, —“উমেশ বাবু, এ কার্য্যে আপনি আমার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি সন্দেহ নাই। অতঃপর মহাশয় এ বিষয়ে কি প্রণালী অবলম্বন করিবেন, তাহা জানিতে আমার অধিকার আছে কি?”

উমেশ বাবু উত্তর দিলেন,—“আপাততঃ এই নামহীন পত্রের একটা নকল ও ইহার অন্যান্য বৃত্তান্ত আমি কলিকাতায় রাজা প্রমোদরঞ্জনের উকীলের নিকট পাঠাইব স্থির করিয়াছি। আসল পত্র আমার নিকটেই থাকিবে এবং রাজা আসিবামাত্র তাহা তাঁহাকে দেখাইব। ইতিমধ্যেই ঐ দুই স্ত্রীলোকের সন্ধানের জন্ম আমি এক জন লোক পাঠাইয়া দিয়াছি। সে ব্যক্তি প্রথমে রেলষ্টেশনে, তাহার পর কোন সন্ধান পাইলে, যেখানে স্ত্রীলোকেরা গিয়াছে, সেখানেও যাইবে। তাহাকে আবশ্যক মত অর্থ ও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আগামী সোমবারে রাজা এখানে আসিবেন। যতক্ষণ তিনি না আসিতেছেন, ততক্ষণ যাহা করা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট মনে করিতে হইতেছে। আমার বিশ্বাস, রাজা এ সম্বন্ধে সহজেই সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিবেন। রাজা প্রমোদরঞ্জন অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; তাঁহার দ্বারা কোন অন্যায় কার্য্য ঘটে নাই, ইহা এক প্রকার স্থির।”

এতদ্বিষয়ক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উমেশ বাবুর যতটা স্থির বিশ্বাস আমার ততটা ছিল না; তথাপি আমি আপাততঃ কোন উচ্চ বাচ্য করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিলাম না। এ সম্বন্ধের কথাবার্ত্তা ত্যাগ করিয়া আমরা অন্যান্য প্রসঙ্গের কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিলাম। আমার মনের অবস্থা তৎকালে উমেশ বাবুর সহিত কোন অংশেই সমান ছিল না। যত শীঘ্র সম্ভব বিদায় গ্রহণ করিয়া শক্তিপুর ত্যাগ করাই আমার সংকল্প। যখন যাইতেই হইতেছে তখন আর কালব্যাজ কেন? শীঘ্রই উদ্যোগায়োজন করিয়া প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। আমি উমেশ বাবুর নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া স্বকীয় নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। পথে মনোরমা দেবীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমার ব্যস্ততা ও বিচলিত ভাব দেখিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ হইল। আমি তাঁহাকে আমার অভিপ্রায় জানাইলাম।

তিনি শুনিয়া বলিলেন,—“তাহা হইবে না, মাষ্টার মহাশয়; এরূপ অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায়, অবন্ধু ভাবে আপনার যাওয়া হইবে না। আপনি যাইবার পূর্ব্বে আবার একদিন পূর্ব্বকালের ন্যায় ব্যবহার—আমোদ, প্রমোদ, খাওয়া দাওয়া না করিলে আপনাকে যাইতে দিতে পারি না! দেবেন্দ্র বাবু, এ অনুরোধ আমার—অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর—আর—”

মনোরমা নীরব। ক্ষণেক পরে আবার বলিলেন,—“আর লীলারও এই অনুরোধ জানিবেন।”

আমি থাকিতে স্বীকার করিলাম। তাঁহাদের কাহাকেও দুঃখিত করিতে আমার এক বিন্দুও ইচ্ছা ছিল না। যতক্ষণ আহারের সময় না হয়, ততক্ষণ নিজগৃহে আমি অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আজি সমস্ত দিন আমি লীলাবতী দেবীর সহিত কথাবার্ত্তা কহি নাই—দেখাও হয় নাই। আহারের সময় তাঁহার সহিত দেখা হইবার কথা। বড় কঠিন সমস্যা—উভয়ের চিত্তের বিষম পরীক্ষা স্থল। আহারের সময় উপস্থিত হইল—আমি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, পূর্ব্ব স্মৃতি—পূর্ব্ব সদ্ভাব, পূর্ব্ব আনন্দ সজীব করিতে আজি সকলেরই যত্ন। দেখিলাম, যে পরিচ্ছদ পরিধান করিলে ভাল দেখাইত বলিয়া আমি প্রশংসা করিতাম, লীলাবতী দেবী অদ্য সেই পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন। আমি গৃহপ্রবেশ করিবামাত্র তিনি আগ্রহ সহকারে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। দেখিলাম, তাঁহার সমস্ত চেষ্টা বিফল করিয়া, তাঁহার সমস্ত আনন্দ দমন করিয়া, তাঁহার মুখে বিষাদের অঙ্ক পরিদৃষ্ট হইতেছে। সে স্থানে উমেশ বাবু উপস্থিত ছিলেন; তাঁহার ও আমার উভয়েরই আহারের স্থান হইয়াছিল। আমরা উভয়ে আহারে বসিলাম। গল্পে উমেশ বাবু খুব পণ্ডিত; তিনি অবিশ্রান্ত গল্প চালাইতে লাগিলেন। আমিও যতদুর সাধ্য তাঁহার সহিত যোগ দিতে লাগিলাম। আহার সমাপ্ত হইলে, লীলা ও মনোরমা পাঠাগারে গমন করিলেন। উমেশ বাবুর তামাক খাওয়া বড় অভ্যাস। তিনি তামাক খাইয়া সেখানে যাইবেন স্থির করিলেন। আমিও কাজেই তাঁহার কাছে বসিয়া রহিলাম। উমেশ বাবু তামাক টানিতেছেন, এমন সময় একজন লোক তথায় প্রবেশ করিল। উমেশ বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি সন্ধান পাইলে?"

লোক উত্তর দিল,—"সন্ধান পাইলাম, উভয় স্ত্রীলোক এখান হইতে বৰ্দ্ধমানের টিকিট লইয়া যাত্রা করিয়াছেন।"

"তুমিও বৰ্দ্ধমান গিয়াছিলে?"

"আজ্ঞে হঁা।—কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখানে আর কোন সন্ধান হইল না।"

"তুমি রেলওয়েতে খোঁজ করিয়াছিলে?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আর যেখানে যেখানে সন্ধান করা আবশ্যক তাহা করিয়াছিলে?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তাহার পর, পুলিশে যেরূপ লিখিয়া দিতে বলিয়াছিলাম তাহা দিয়াছ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আচ্ছা, তোমার যাহা কার্য্য তাহা তুমি ঠিকই করিয়াছ; আপাততঃ এ বিষয়ের এই স্থানেই শেষ। তবে চলুন, মাষ্টার বাবু, মেয়েদের পাঠের ঘরে গিয়া লীলার বাজনা শুনা যাউক। আপনি তো কালি প্রাতেই যাইতেছেন। যতক্ষণ এখানে আছেন, ততক্ষণ আপনার সহিত আমোদ-প্রমোদে থাকাই আবশ্যক।"

আমরা সেই চিরপরিচিত পাঠাগারে প্রবেশ করিলাম। যে পাঠাগারে কতই আনন্দে—কতই স্ফুর্ত্তি ও প্রফুল্লতা সহকারে জীবনের কতদিনই সুখে অতিবাহিত করিয়াছি, অদ্য সেই পাঠাগারে, বিদায়ের দিনে, শেষ প্রবেশ করিলাম।

অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কৌচে আসীনা—নিদ্রিতা বলিলেও হয়। মনোরমা একখানি ঈজি চেয়ারে উপবেশন করিয়া আছেন। আর লীলা পিয়ানোর নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন। উমেশ বাবু দুই এক

কথায় মজলিস্ গরম করিয়া লইলেন এবং জানালার নিকটে একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন। এমন দিন ছিল, যখন আমি গৃহাগত হইয়াই, বিনা বাক্যব্যয়ে, লীলার নিকটস্থ হইতাম এবং তাঁহাকে ইচ্ছামত বাদ্য বাজাইতে অনুরোধ করিতাম। কিন্তু আজি আর তাহা পারিলাম না। এখন কি করি কি করি ভাবিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। এমন সময়ে লীলা স্বয়ং আমার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"মাষ্টার মহাশয়, আপনি ভৈরবী রাগিণীর আলাপ বড় ভাল বাসেন, তাই কি এখন বাজাইব?"

আমি তাঁহার এতাদৃশ অনুগ্রহসূচক বাক্যের সমুচিত উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, তিনি পিয়ানোর নিকটস্থা হইলেন। তিনি যে সময় বাদ্য বাজাইতেন সেই সময় তাঁহার সন্নিধানে যে চেয়ারে আমি উপবেশন করিতাম, আজি তাহা অনধিকৃত। লীলা একটু বাজাইয়া একবার আমার প্রতি চাহিলেন, অচিরে আবার দৃষ্টি অপসারিত করিয়া বাদ্যে মনোনিবেশ করিলেন। তাহার পর, সহসা অনুচ্চস্বরে বলিলেন,—আপনি কি অদ্য আপনার সেই পূর্ব্ব স্থান গ্রহণ করিবেন না?"

আমি উত্তর দিলাম,—"শেষ দিনে আমি তাহা গ্রহণ করিলেও করিতে পারি।"

তিনি কোন উত্তর না দিয়া বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন। আমি সেই স্থান অধিকার করিয়া দেখিলাম, তাঁহার বদনমণ্ডল পাণ্ডু হইয়া গেল এবং তাঁহার বিশেষ ভাবান্তর হইল। তিনি বলিলেন,—"আপনি যাইতেছেন বলিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত।"

তাঁহার কণ্ঠস্বর নিতান্ত অস্ফুট, ; শব্দ সকল প্রায় অপরের অশ্রাব্য। তাঁহার অঙ্গুলি পিয়ানোর উপর অত্যন্ত দ্রুত ও অস্বাভাবিক ভাবে প্রধাবিত হইতে লাগিল।

আমি বলিলাম,—"লীলাবতী দেবি, আপনার এই অসীম দয়া আমি চিরকাল স্মরণ করিব। কল্য প্রস্থান করিতে হইবে; সুতরাং অদ্যই সাক্ষাতের শেষ হইলেও, এ অনুগ্রহ আমি কখনও ভুলিব না।"

তাঁহার বদন আরও ভাবান্তরিত হইল এবং তিনি আমার বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"না, না কালিকার কথা আজি আর তুলিবেন না—অদ্য যেমন আনন্দে যাইতেছে, তেমনই যাউক।"

কথা সমাপ্তি সহকারে তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। যে বাদ্য তাঁহার চিরাভ্যস্ত তাহাতেও তাঁহার ভুল হইতে লাগিল। তিনি বিরক্তি সহকারে বাদ্য ত্যাগ করিলেন; সকলেই তাহা বুঝিতে পারিলেন। মনোরমা ও উমেশ বাবু সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী ঢুলিতেছিলেন; তাঁহারও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

মনোরমা দেবী আমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"মাষ্টার মহাশয় দেখিয়াছেন পূর্ণ চন্দ্রালোকে বাগানের কি সুন্দর শোভা হইয়াছে?"

আমি তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলাম এবং স্বীয় আসন ত্যাগ করিয়া মনোরমা দেবীর নিকটস্থ হইলাম। লীলাবতী দেবী অস্ফুট স্বরে আপন মনে বলিলেন,—"আমি উহা বাজাইব। আজি শেষ দিনে আমাকে উহা বাজাইতেই হইবে।"

বাস্তবিক চন্দ্রালোকে বাগানের বড়ই শোভা হইয়াছিল। আমরা অনেকক্ষণ, নানাপ্রকার সমালোচনা সহকারে, তাহা সন্দর্শন করিলাম। লীলা নিজ স্থানে বসিয়া পিয়ানো

বাজাইতে লাগিলেন। বাদ্য অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু যেরূপ মধু-স্রোত চিরদিন তাঁহার হস্তনিঃসৃত হইয়া থাকে, আজি তাহা একবারও হইল না। রাত্রি অনেক হইয়াছে বুঝিয়া, আমরা সকলে স্ব স্ব গৃহে বিশ্রামার্থ গমন করা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিলাম। আমরা তদভিপ্রায়ে গাত্রোত্থান করিলে, লীলাবতী দেবীও বাদ্য ত্যাগ করিয়া উত্থিত হইলেন। আমি প্রথমতঃ অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলাম।

তিনি বলিলেন,—"হয়ত তোমাকে আর কখন দেখিতে পাইব না। তুমি আমার সঙ্গে এতদিন বড়ই সদ্ব্যবহার করিয়াছ ; আমার মত প্রবীণ বয়সের লোক সদ্ব্যবহারের বড়ই পক্ষপাতী। যাও বাবা—যেখানে থাক, সুখে থাক, ইহাই আমার আশীর্ব্বাদ।"

তাহার পর উমেশ বাবু অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"কলিকাতায় আবার আমার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইবে। যে কার্য্য আপনি অর্দ্ধ সমাপিত করিয়া গেলেন তাহা আমার দ্বারা সুসম্পন্ন হইবে। আপাততঃ নির্ব্বিঘ্নে যথাগমন করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

তাহার পর মনোরমা দেবী আমার নিকটস্থা হইয়া বলিলেন,—"কালি প্রাতে ৭॥০ টায় যাওয়ার সময় বুঝি ?" নিতান্ত মৃদু স্বরে আবার বলিলেন,—"আজি আপনার সমস্ত ব্যবহার আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং সে সমস্ত ব্যবহার আমাকে চিরকালের নিমিত্ত আপনার আত্মীয় করিয়াছে।"

তাহার পর লীলাবতী দেবী আসিলেন। তাঁহার মুখের প্রতি চাহিতে আমার ভরসা ও সাহস হইল না। আমি বলিলাম—"অতি প্রত্যুষেই আমি প্রস্থান করিব। সম্ভবতঃ আপনি শয্যা-ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই আমি চলিয়া—"

তিনি তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়া কহিলেন,—"না, না, তাহা হইবে না। নিশ্চয়ই আমি তাহার পূর্ব্বে উঠিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমি এত অকৃতজ্ঞ নহি—গত তিন মাসের ব্যাপার এতদূর বিস্মৃত হই নাই—"

তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল—আরব্ধ বাক্য সমাপিত হইল না। আমি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই, তিনি প্রস্থান করিলেন। আমিও আমার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম।

উষার আলোক অচিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আমার আনন্দধামে অবস্থান কালেরও অবসান হইয়া আসিল এবং অপরিহার্য্য প্রস্থান কাল সমুপস্থিত হইল। প্রায় ৭টার সময়ে আমি পাঠাগারে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, তথায় লীলা এবং মনোরমা উভয়েই আমার সহিত শেষ সাক্ষাতের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। বুঝিলাম, এ কঠোর ক্ষেত্রে চিত্তের স্থৈর্য্যরক্ষা করা সকলের পক্ষেই সুকঠিন। আমি বিদায় প্রার্থনা করিলাম। কোন উত্তর না দিয়া, লীলাবতী দেবী ব্যস্ততা সহ সে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

মনোরমা দেবী বলিলেন,—"ভালই হইল। উঁহার পক্ষেও ভাল—আপনার পক্ষেও ভাল।"

আমি ক্ষণেক নির্ব্বাক্ রহিলাম। এ শেষ বিদায় সময়ে তাঁহার সহিত একটা কথা না কহা, একবার প্রস্থান-কালে তাঁহার মূর্ত্তি না দেখিয়া যাওয়া বড় ক্লেশকর বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু কি করিব ? হৃদয়-বেগ শান্ত করিয়া আমি মনোরমা দেবীকে সমুচিত ভাবে বিদায় কালোচিত বাক্য বলিলাম। কিন্তু যত

কথা বলিব, যত ভাব ব্যক্ত করিব ভাবিয়াছিলাম তাহা হৃদয়েই বিলীন হইয়া গেল; কেবল একটী বাক্য মুখ হইতে বাহিরিল। বলিলাম,—"সময়ে সময়ে পত্র দ্বারা আপনি আমাকে আপনাদের সংবাদ জানাইবেন, এরূপ প্রগলভ আশা হৃদয়ে স্থান দিব কি ?"

"অবশ্যই আপনার আশা সফল হইবে। আপনি সদ্ব্যবহার দ্বারা আপনার চরিত্রের যেরূপ উচ্চতা দেখাইয়াছেন, তাহার প্রতিদান স্বরূপে, যতকাল আপনার ও আমার জীবন থাকিবে, ততকাল আমার দ্বারা আপনার যে কিছু হিত সম্ভবে, তাহা সম্পন্ন করিব সংকল্প করিয়াছি। এদিকের বিষয় যখন যেমন দাঁড়াইবে, তাহা তখনই আপনাকে জানাইব।"

"আর দেবি, আমার এই উন্মত্ততা ও প্রগলভতা বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া যাওয়ায় বহুকাল পরেও, যদি কখন আমার দ্বারা আপনার কোন সহায়তা হইতে পারে—"

আর কথা আমি কহিতে পারিলাম না। শত চেষ্টা উপেক্ষা করিয়াও আমার চক্ষু জলভারাকুল হইল। মনোরমা তখন অতীব স্নেহময় ভাবে আমার উভয় হস্ত ধারণ করিলেন। দেখিলাম, তাঁহার নেত্রদ্বয় সমুজ্জ্বল এবং তাঁহার বদনমণ্ডলে আন্তরিক উদারতা ও করুণাময়তা প্রকটিত। তিনি বলিলেন,—"যদি সময় উপস্থিত হয়, তখন আপনাকেই বিশ্বাস করিব। আপনাকে তখন আমার বন্ধু এবং লীলার বন্ধু, আমার ভ্রাতা এবং লীলার ভ্রাতা বলিয়া পূর্ণ বিশ্বাস করিব।" তাহার পর এই স্নেহময়ী কামিনী আমাকে আমার নাম ধরিয়া বলিলেন,—"দেবেন্দ্র, এইস্থানে ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া স্থির হও। আমাদের উভয়েরই মঙ্গলের নিমিত্ত, আমি এখন প্রস্থান করিতেছি। উপরের গবাক্ষ হইতে আমি তোমাকে গমন কালে দেখিব।"

তিনি চলিয়া গেলেন। আমি একবার নয়ন মার্জ্জন করিয়া, চিরকালের নিমিত্ত এ প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে অতি ধীরে দ্বার উদ্ঘাটন শব্দ শুনিয়া, আমি সেই দিকে ফিরিয়া দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, ধীরে ধীরে লীলাবতী দেবী প্রকোষ্ঠ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমার হৃদয়ে সজোরে শোণিত প্রবাবিত হইতে লাগিল। লীলাবতী আমাকে একাকী দেখিয়া একবার সঙ্কুচিত হইলেন; কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম তাঁহার দেহ যেন বলহীন, শরীর ঈষৎ বিকম্পিত। তিনি দেহকে আশ্রয় দিবার জন্য সন্নিহিত টেবিলে হস্তার্পণ করিলেন। অপর হস্তে তিনি যেন কি পদার্থ-বিশেষ অঞ্চলে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। তিনি বলিলেন,—"আমি এই খাতাখানির সন্ধানে গিয়াছিলাম। ইহা দেখিয়া সময়ে সময়ে আপনার এস্থানের এবং এখানকার বন্ধুগণের কথা মনে পড়িতে পারে। আপনি বলিয়াছেন যে, আমার অনেক উন্নতি হইয়াছে—হয় তো এ গুলি আপনার ভাল লাগিতে—"

তিনি কথা শেষ না করিয়া বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইলেন, এবং সেইরূপ অবস্থায়, হাত বাড়াইয়া সেই খাতা আমাকে দিলেন। তিনি ইদানীং অবকাশ কালে প্রাকৃতিক বর্ণনা-পূর্ণ যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই এই পুস্তকে সংগৃহীত ছিল। খাতা তাঁহার হস্তে কম্পিত হইতে লাগিল। আমিও বিকম্পিত হস্তে তাহা গ্রহণ করিলাম। হৃদয় যাহা বলিতে চাহিল, তাহা বলিতে সাহস

হইল না। কেবল বলিলাম,—"যতদিন বাঁচিব, ততদিন ইহা অতুলনীয় সম্পত্তির ন্যায় সযত্নে রক্ষা করিব। আর আপনাকে কি বলিব? আপনাকে বিদায় কালে না দেখিয়া যাইতে হইলে মনে বড় কষ্ট হইত; আপনি যে দয়া করিয়া এ সময়ে দেখা দিলেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।"

তিনি বলিলেন —"এতদিন, এত আনন্দে, একত্র অবস্থানের পর, কেমন করিয়া আপনাকে সহজে বিদায় দিতে পারি?"

আমি বলিলাম,—"লীলাবতী দেবি, এরূপ দিন হয় ত আর কখন ফিরিবে না; কারণ আপনার ও আমার জীবনের গতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিন্তু দেবি, যদি কখন এমন সময় উপস্থিত হয়, যখন আমার প্রাণপণ চেষ্টাতে আপনার এক মুহূর্ত্তেরও সন্তোষ জন্মিতে পারে, বা এক মুহূর্ত্তের দুঃখও বিদূরিত হইতে পারে, তখন কি দেবি, আপনি দয়া করিয়া এ দীনহীন শিক্ষককে স্মরণ করিবেন? মনোরমা দেবী আমাকে মনে করিবেন, স্বীকার করিয়াছেন।"

দেখিলাম তাঁহার নয়ন জলভারাকুল। তিনি বলিলেন,—"আমিও সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত তাহা স্বীকার করিলাম।"

আমি আবার বলিলাম,—"আপনার অনেক আত্মীয় আছেন; আপনার ভবিষ্যতের সুখ-শান্তি তাঁহাদের প্রধান ভাবনা; দেবি, এই বিদায় কালে, আমাকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে অনুমতি করুন যে, এই অধম বন্ধুরও তাহাই প্রধান ও প্রিয় চিন্তা।"

তখন তাঁহার নবনীত বিনির্ম্মিত গণ্ড বহিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিতেছে। তিনি, দাঁড়াইয়া থাকিতে অসমর্থ হইয়া, সন্নিচেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। উপবেশন কালে বলিলেন,—"আর না, মাষ্টার মহাশয়, দয়া করিয়া এ সাক্ষাতের শেষ করুন।"

তাঁহার হৃদয়ের ভাব এই কয় কথায় স্পষ্টই বুঝা গেল। তাহার পর আর কি বলিব? আমার তো কোন কথা বলিতে—তাঁহার বাক্যের কোন উত্তর দিতে আর অধিকার নাই। অশ্রু আসিয়া আমার নয়নকে অন্ধ করিয়া দিল। আর এক মুহূর্ত্তও সে স্থানে অপেক্ষা করা অবৈধ। একবার দ্বার সন্নিহিত হইয়া, একবার মাত্র লীলাবতীর সেই দেবীমূর্ত্তি শেষ দেখা দেখিয়া লইলাম। তাহার পর সুদূর বিস্তৃত সমুদ্র উভয়ের মধ্যে ব্যবধান হইল—লীলাবতীর মূর্ত্তি তখন অতীতের স্মৃতিরূপে পরিণত হইল।

(দেবেন্দ্র বাবুর কথা সমাপ্ত।)

হাইকোর্টের উকীল

উমেশচন্দ্র সেনের কথা।

ওলড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বন্ধুবর বাবু দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অনুরোধে, আমাকে এই অংশ লিখিতে হইতেছে। দেবেন্দ্র বাবু চলিয়া আসার পর, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই ইহাতে বিবৃত হইবে। এরূপ পারিবারিক কথা প্রচার করা উচিত কি'না, তাহা একটা বিচারের

বিষয় বটে। কিন্তু সে সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব দেবেন্দ্র বাবু স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং আমার অপরাধ নাই। পরের ঘটনা দ্বারা সপ্রমাণিত হইবে যে, এরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে দেবেন্দ্র বাবুর যথেষ্ট অধিকার জন্মিয়াছে। তিনি এই অত্যদ্ভুত উপাখ্যান যেরূপ ভাবে সর্ব্ব সাধারণকে জানাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে ঘটনা-চক্রের মধ্যে যে যে স্থানে যে যে ব্যক্তি বিশেষ লিপ্ত ও সম্পর্কিত, তাঁহারই সেই সেই অংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। এই নিয়মানুসারে দেবেন্দ্র বাবু যে স্থান হইতে বর্ত্তমান কাহিনী পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার পর হইতে আমাকেই লিখিতে হইতেছে।

অগ্রহায়ণ মাসের ২রা আমি আসিয়া আনন্দধামে পৌঁছিলাম; সেদিন শুক্রবার। রাজা প্রমোদরঞ্জন রায় মহাশয়ের আগমন কাল পর্য্যন্ত আমাকে এস্থানে অপেক্ষা করিতে হইবে। তিনি আসিলে লীলাবতীর সহিত তাঁহার বিবাহের দিন স্থির হইবে। দিনস্থির হইলে আমাকে কলিকাতায় গিয়া বিবাহ সংক্রান্ত যাবতীয় লেখা পড়া ও ব্যবস্থা শেষ করিয়া ফেলিতে হইবে। এই জন্যই আমার এখানে আসা।

লীলাবতীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে দেখিলাম যে, তাঁহার শরীর ও মনের অবস্থা ভাল নহে। লীলাবতী বড় ভাল মেয়ে—তাঁহার কথাবার্ত্তা, ব্যবহার সমস্তই তাঁহার জননীর ন্যায় সুমিষ্ট ও সুন্দর। আকৃতিতে লীলা কিন্তু মাতার মত ছিলেন না; সে সম্বন্ধে তাঁহার পিতার সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল। লীলার নামে লেখকের নাম-হীন একখানি পত্র আসিয়াছিল। তাহার জন্য যাহা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইল তাহা শেষ করিলাম। শুক্রবারটা এইরূপে কাটিয়া গেল।

শনিবারের দিন, আমি শয্যাত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই, দেবেন্দ্র বাবু চলিয়া গিয়াছেন। দেবেন্দ্র বাবু লোকটা মন্দ নয়। সে দিন লীলার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ ঘটিল না—তিনি একবারও বাহিরে আসিলেন না। মনোরমার সঙ্গে দুই একবার সাক্ষাৎ হইল বটে, কিন্তু তাঁহাকে অন্যমনস্ক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

বেলা ২ টার সময় রাধিকা বাবুর সংবাদ পাইলাম। তাঁহার শরীর এখন একটু ভাল আছে; এ সময় আমি দেখা করিলে করিতে পারি। তাঁহাকে পূর্ব্বেও যেমন দেখিয়াছিলাম, আজিও তেমনই দেখিলাম। তাঁহার গল্প কেবল তাঁহার রোগের, তাঁহার দুর্ভাগ্যের তাঁহার পুস্তকের দুর্গন্ধের, লোকের গোল-মালের, আর সেই চিরকেলে মাথামুণ্ড ছাই ভস্মের। আমি যেই কাজের কথা পাড়িলাম, অমনই তিনি শিহরিয়া উঠিয়া নয়ন মুদিয়া বলিলেন,— "সর্ব্বনাশ!"

আমি কিন্তু রণে ভঙ্গ দিলাম না। বুঝিলাম, লীলার বিবাহ স্থির হইয়াই আছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা সম্বন্ধে, তাঁহার মত গ্রহণ না করিয়া, অগ্রে লীলার মত গ্রহণ করা আবশ্যক। লীলার মত জানা হইলে, আমি বিষয়ের যে সকল সংবাদ স্বয়ং জ্ঞাত আছি তাহার সহিত মিলাইয়া, যথারীতি কার্য্য করিব। রাধিকা বাবু লীলার অভিভাবক; তাঁহারও সম্মতি লওয়া আবশ্যক। সমস্ত স্থির করিয়া তাঁহাকে আমি বলিবামাত্র তিনি সম্মতি দিবেন, স্বীকার করিলেন। আমি বুঝিলাম, এ বৃথা মানুষের সাহায্যে কোনই কার্য্য হইবে না। কেন আর উঁহাকে দগ্ধান।

রবিবারে লিখিবার মত কোন ঘটনাই ঘটিল না। কলিকাতায় রাজা প্রমোদরঞ্জনের উকীল মহাশয়ের নিকট আমি সেই নামহীন পত্রের একটা নকল ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহার প্রাপ্তি স্বীকার পত্র অদ্য ডাকযোগে আমার হস্তে আসিয়া পৌঁছিল।

সোমবারে রাজা প্রমোদরঞ্জন আসিয়া পৌঁছিলেন। রাজাকে এই প্রথম দেখিলাম। লোকটির বয়স যত ভাবিয়াছিলাম, তাহার অপেক্ষাও কিছু অধিক বলিয়া বোধ হইল। চেহারাটি বেশ, দেখিলে শ্রদ্ধা হয়। মাথার চুল বড় পাকে নাই। রংটি বড় পরিষ্কার। মুখখানি যেন চিন্তাপূর্ণ। কথা-বার্ত্তায় রাজা বড় অমায়িক লোক। আমার সহিত প্রথম পরিচয়ে যেরূপ ভাবে আলাপ করিলেন, তাহাতে যেন কতকাল ধরিয়া তাঁহার সহিত আলাপ চলিতেছে বলিয়া বোধ হইল। মনোরমার সহিত তিনি অতি বিনম্র ভাবে শিষ্টাচার সঙ্গত কথাবার্ত্তা কহিলেন। লীলা তখন সেখানে ছিলেন না, অবিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার বিমর্ষ ও কাতর ভাব দেখিয়া নিতান্ত আগ্রহ ও আন্তরিক ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—লীলা যেন রাজার সাক্ষাতে সঙ্কুচিত ও অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং অচিরে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। রাজা কিন্তু লীলার এবংবিধ ভাব যেন লক্ষ্যই করিলেন না।

লীলা প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করার পরে, রাজা সেই নামহীন পত্রের কথা স্বয়ং উত্থাপন করিলেন। তিনি আসিবার কালে কলিকাতা হইয়া আসিয়াছিলেন এবং তথায় তাঁহার উকীলের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছেন। সমস্ত কথা শুনিয়া অবধি, এ সম্বন্ধে আমাদের সকলের সন্দেহ-ভঞ্জনের নিমিত্ত, তিনি যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়াছেন। তাঁহার কথা শুনিয়া, আমি মূল পত্র তাঁহার হস্তে দিলাম। তিনি না দেখিয়াই পত্রখানি আমাকে ফিরাইয়া দিলেন; বলিলেন যে, তিনি চিঠির নকল দেখিয়াছেন—আসল আমাদের নিকটে থাকা ভাল। তাহার পর যে সকল কথা তিনি বিবৃত করিলেন, তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই যেমন ভাবিয়াছিলাম,তেমনিই সরল ও সন্তোষজনক। হরিমতি নাম্নী একটী স্ত্রীলোক বহুকাল পূর্ব্বে, কোন কোন বিষয়ে রাজার নিজের এবং তাঁহার কয়েকজন আত্মীয়ের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিল। এই স্ত্রীলোকের অদৃষ্ট বড়ই মন্দ। তাহার স্বামী তাহাকে ফেলিয়া যে কোথায় গিয়াছে, তাহার কোনই সন্ধান নাই; অধিকন্তু তাহার একটি কন্যা সন্তান—সেটীও পাগল! একেতো এই স্ত্রীলোকের প্রতি রাজার কৃতজ্ঞ থাকিবার যথেষ্ট কারণ ছিল; বিশেষতঃ এই সকল দুর্ব্বিপাকে তাহার হৃদয়ের অসীম ধৈর্য্য দেখিয়া, তাহার প্রতি রাজার বড়ই শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। ক্রমে তাহার সেই কন্যার পীড়া বড়ই বৃদ্ধি পাইল, তখন তাহাকে কোন স্থানে আটকাইয়া না রাখিলে চলে না। কিন্তু অবস্থা যেমনই হউক, কন্যাকে নিরুপায় দরিদ্রের ন্যায়, সাধারণ বাতুলালয়ে রাখিতে হরিমতির কোনক্রমেই মত ছিল না—অথচ কিছু একটা উপায় না করিলেও চলে না। সেই সময় হরিমতি-কৃত উপকারের যৎসামান্য প্রতিদান স্বরূপে, স্বয়ং ব্যয়-ভার বহন করিয়া রাজা তাহার কন্যাকে কলিকাতায় দুইজন চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে আটকাইয়া রাখিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। হরিমতি কৃতজ্ঞতা সহকারে এ প্রস্তাবে ,সম্মতি প্রকাশ করিল। প্রস্তাব মত কার্য্যও করা হইল। অনধিক কাল

মধ্যে পাগলিনী মুক্তকেশী জানিতে পারিল যে, রাজাই তাহাকে আটকাইয়া রাখিবার প্রধান সহায়। বলা বাহুল্য, এই জ্ঞানের পর হইতে সে রাজার উপর হাড়ে চটিয়া গেল। বর্ত্তমান পত্রও সেই রাগের ফল মাত্র। যাহা হউক, সম্প্রতি সে তাহার আশ্রয় স্থান হইতে কেমন করিয়া পলাইয়া গিয়াছে। এ সংবাদ শুনিয়া তাহার মাতাও যেমন দুঃখিত, রাজাও তেমনই দুঃখিত। যে লোকের তত্ত্বাবধানে মুক্তকেশী কলিকাতায় থাকিত এবং যে দুইজন ডাক্তার তাহার চিকিৎসা করিতেন, রাজা তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা জানাইলেন। ইহাও রাজা নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করিলেন যে, যদি মনোরমা দেবী অথবা উমেশ বাবু তাঁহাদিগকে, প্রকৃত বিষয় জানিবার নিমিত্ত পত্র লেখেন, তাহা হইলে সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিবেন, মুক্ত-কেশী যাহাই ভাবুক, রাজা তাহার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য ব্যবহার করিয়াছেন এবং, সম্প্রতিও কলিকাতা হইতে আসিবার কালে, তিনি আপনার উকী-লকে যথাসম্ভব যত্ন সহকারে ঐ উন্মাদিনীর সন্ধান করিয়া, তাহাকে তাহার পূর্ব্ব আশ্রয়ে পুনঃ স্থাপনের জন্য উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কোন অংশে যদি লীলবতী দেবী, অথবা তাঁহার কোন আত্মীয়ের কোন সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে রাজা বিহিত প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা তাহা দূর করিয়া দিতে সম্মত আছেন।

আইনের অপার মহিমার আশ্রয় অবলম্বন করিয়া তর্ক করা যায় না এমন বিষয়ই নাই। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এরূপ মহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কথার উপর সেরূপ কোন তর্ক উত্থাপন করি-বার আবশ্যক ছিল না। তাঁহার কথায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম। মনোরমাও সন্তোষ প্রকাশ করিয়া উত্তর দিলেন বটে; কিন্তু সে সন্তোষ যেন তাঁহার মনের নয় বলিয়া বোধ হইল।

রাজা বলিতে লাগিলেন,—"যদি কেবল উমেশ বাবুকে বুঝাইলেই আমার কর্ত্তব্যের শেষ হইত, তাহা হইলে আমার আর কিছু বলিবার প্রয়োজন ছিল না। কারণ উমেশ বাবু পুরুষ মানুষ, সুতরাং তিনি সহজেই সকল বৃত্তান্ত বুঝিয়া আমার কথাতেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন, ইহা আমার ভরসা আছে। কিন্তু স্ত্রীলোককে বুঝান শক্ত কথা; প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত তাঁহাদের প্রতীতি হওয়া অসম্ভব। মনোরমা দেবি, আপনি প্রমাণ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও, আমি স্বয়ং তাহা দিতেছি। আপনি দয়া করিয়া এসম্বন্ধে সেই অভাগিনী হরিমতিকে একখানি পত্র লিখুন, তাহা হইলে সমস্তই জানিতে পারিবেন।"

মনোরমা দেবী কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—"ভরসা করি, আমি রাজার কথায় অবিশ্বাস করিতেছি ভাবিয়া, রাজা আমার প্রতি অবিচার করিতেছেন না।"

রাজা বলিলেন,—"কখনই না। আমি কেবল আপনাদের সন্তোষের জন্য এ প্রস্তাব করিতেছি। পত্র লিখিবার জন্য আমার বিশেষ অনুরোধ জানিবেন।"

এই বলিয়া, রাজা স্বয়ং উঠিয়া অন্য টেবিল হইতে কাগজ, কলম ও কালী আনিয়া মনোর-মার সমক্ষে উপস্থিত করিলেন এবং হরিমতির নিকট প্রকৃত বিষয় জানিবার জন্য, পত্র লিখিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন,—"অতি সহজ পত্র। স্পষ্ট করিয়া দুইটা কথা লিখিলেই কাজ মিটিবে। এক কথা, হরিমতির ইচ্ছামতে তাহার কন্যাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল কি না। দ্বিতীয় কথা; এ সম্বন্ধে আমি যাহা করিয়াছি, তজ্জন্য হরিমতির মনে আমার নিকট কৃতজ্ঞতা ভিন্ন অন্য কোন ভাব আছে কি না। আপনা রা

সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। একণে এই পত্র খানা লিখিত হইলে আমিও সন্তুষ্ট হই।"

মনোরমা বলিলেন,--"ইচ্ছা না থাকিলেও, আপনার অনুরোধ আমাকে রক্ষা করিতে হইতেছে।"

এই বলিয়া তিনি পত্র লিখিতে নিযুক্ত হইলেন। পত্র সমাপ্ত হইলে তিনি তাহা রাজার হস্তে প্রদান করিলেন। রাজা তাহা পাঠ না করিয়াই খামের ভিতর পূরিয়া, উপরে শিরোনাম লিখিয়া, মনোরমার হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং বলিলেন,—"আমি প্রার্থনা করিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহা এখনই ডাকে পাঠাইয়া দিউন। পত্র লেখা তো শেষ হইল, একণে উন্মাদিনীর সম্বন্ধে আমি আরও দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি। উমেশ বাবু সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া আমার উকীলকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা আমি দেখিয়াছি। সে পত্রে কোন কোন বিষয়ের উল্লেখ নাই। মুক্তকেশী কি লীলাবতী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল?"

মনোরমা উত্তর দিলেন,—"না।"

"আপনার সহিত সে দেখা করিয়াছিল কি?"

"না।"

"দেবেন্দ্র বাবু নামক একজন লোক ছাড়া আর কাহারও সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই?"

"না, কাহারও সহিত নহে।"

"দেবেন্দ্র বাবু বুঝি এখানে শিক্ষক রূপে নিযুক্ত ছিলেন? তিনি কি বেশ যোগ্য লোক?"

"হাঁ।"

তিনি ক্ষণেক মৌনভাবে কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মুক্তকেশী যখন এ দেশে আসিয়াছিল তখন সে কোথায় থাকিত, তাহা আপনি সন্ধান পাইয়াছেন কি?"

"হাঁ, নিকটে তারার খামার নামে একটা জায়গা আছে, সেখানেই সে থাকিত।"

রাজা বলিলেন,—"এই অভাগিনীর সন্ধান করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য। হয়ত যেখানে সে ছিল, সেখানে এমন কোন কথা বলিয়া থাকিবে যে, তাহা ধরিয়া তাহার সন্ধান হইতে পারে। যাহা হউক, এ বিষয়ে লীলাবতী দেবীকে আমি স্বয়ং কোন কথাই বলিতে পারিব না। এ জন্য মনোরমা দেবি, আপনাকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনার লিখিত পত্রের উত্তর আসিলে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া লীলাবতী দেবীর সন্দেহ ভঞ্জনার্থ যাহা বলিতে হয় বলিবেন।"

মনোরমা স্বীকার করিলেন। তাহার পর রাজা হাস্য মুখে, আমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, তাঁহার অবস্থানার্থ যে যে প্রকোষ্ঠ সজ্জিত ছিল, তদুদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

তিনি চলিয়া গেলে আমি বলিলাম,—"একটা মহা দুর্ভাবনা আজি বেশ শেষ হইয়া গেল; কি বল মনোরমা?"

মনোরমা বলিলেন,—"তাহার সন্দেহ কি? আপনি যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন ইহাই সুখের বিষয়।"

আমি বলিলাম,—"কেবল আমি কেন? তোমার হাতে যে পত্র রহিয়াছে, তাহাতে তোমারও সন্তুষ্ট হওয়া আবশ্যক।"

তিনি বলিলেন,—"তাতো বটেই। আমি জানিতাম এরূপ কাণ্ড কখনই ঘটিতে পারে না। যাহা হউক, যদি এ সময় দেবেন্দ্র বাবু এখানে থাকিয়া রাজার কথা শুনিতেন এবং

এই চিঠির প্রস্তাব জ্ঞাত হইতেন, তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত।”

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। বলিলাম,—“সেই নামহীন পত্রের সঙ্গে দেবেন্দ্র বাবুর কতকটা সম্বন্ধ জন্মিয়াছে সত্য। তিনি এবিষয়ে বিশেষ বিবেচনা ও দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি আজ এখানে উপস্থিত থাকিলে যে কি উপকার হইত, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।”

মনোরমা উদাস ভাবে বলিলেন,—“মনের কল্পনা মাত্র। এ সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতাই আমাদের প্রকৃষ্ট সহায়।”

সমস্ত ঝোঁক যে আমার ঘাড়ে চাপে তাহাও আমার ইচ্ছা নয়। বলিলাম,—“যদি এখনও মনে কোন সন্দেহ থাকে, তাহা স্পষ্ট করিয়া বল না কেন ?”

তিনি বলিলেন,—“কোনই সন্দেহ নাই।”

“রাজার কথার মধ্যে কোন অংশ অসংলগ্ন, বা অসম্ভব বলিয়া তোমার বোধ হইয়াছে কি ?”

“যখন তিনি এ বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ উপস্থিত করিতেছেন, তখন আর কি বলিবার আছে ? মুক্তকেশীর মাতার স্বাক্ষ্যের অপেক্ষা আর কি ভাল প্রমাণ হইতে পারে ?”

ইহার অপেক্ষা ভাল প্রমাণ আর কিছুই হইতে পারে না। যদি এই পত্রের উত্তর সন্তোষজনক হয়, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে রাজার সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ আর কি সন্দেহ করিতে পারেন, তাহা আমিতো বুঝিতেছি না।”

মনোরমা বলিলেন,—“তবে আমি চিঠি ডাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া আসি। যত দিন এ পত্রের কোন উত্তর না আইসে, তত দিন আর কোন কথায় কাজ নাই। আমার দোমনা ভাব দেখিয়া কিছু মনে করিবেন না, লীলার ভাবনায় এ কয় দিন আমি বড় উৎকণ্ঠিত আছি। উৎকণ্ঠা, জানেন তো আপনি, কঠিন হৃদয়কেও চঞ্চল করিয়া ফেলে।”

মনোরমা চলিয়া গেলেন। আশ্চর্য্য স্থির-বুদ্ধি স্ত্রীলোক! হাজারে এরূপ একজন স্ত্রীলোকও মিলে কি না সন্দেহ। যখন তিনি বালিকা, তখন হইতে আমি তাঁহাকে দেখিতেছি। কত পারিবারিক বিপদের সময় আমি তাঁহার বুদ্ধি ও ধৈর্য্যের পরীক্ষা দেখিয়াছি এবং প্রশংসা করিয়াছি। বর্ত্তমান ঘটনায় তাঁহার সঙ্কোচ ও সন্দিগ্ধ ভাব দেখিয়া আমারও কতকটা সন্দেহ জন্মিল। অন্য স্ত্রীলোক হইলে হয়ত কিছুই মনে হইত না। কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, তথাপি মন একটু ব্যাকুল হইল। ধীরে ধীরে বাগানে বেড়াইতে বাহির হইলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৈকালে আমরা সকলে মিলিত হইলাম। প্রাতে রাজা প্রমোদরঞ্জনকে যেরূপ ঠাণ্ডা লোক দেখিয়াছিলাম, এ বেলা সেরূপ দেখিলাম না রাজার কণ্ঠস্বর যেন উচ্চ—তাঁহার গল্পের বিরাম নাই। কিন্তু এদিকে যাহাই হউক, লীলাবতীর প্রতি তাঁহার মনোযোগের ত্রুটি নাই। তাঁহার সহিত কথোপকোথন কালে রাজা যতদূর সম্ভব প্রেমপূর্ণ কোমল স্বরে কথা কহিতেছেন। লীলা কিন্তু রাজার এ সকল সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইতেছেন বলিয়া আমার বোধ হইল না। আমার বোধ হইল রাজা পদ,

উপাধি, সম্পত্তি ও প্রেম অকাতরে লীলার চরণে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত; লীলা যেন কিছুতেই রাজি নহেন। এ বড় আশ্চর্য্য কথা!

পরদিন মঙ্গলবারে রাজা ঘোড়ায় চড়িয়া, লোক সঙ্গে লইয়া, তাঁহার খামারে গমন করিলেন। পরে শুনিলাম, সেখানে তাঁহার সন্ধানে কোন ফল হয় নাই। রাজা ফিরিয়া আসিয়া রাধিকাপ্রসাদ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। সে দিন আর কোন বিশেষ ঘটনা ঘটিল না।

বুধবারের ডাকে হরিমতির প্রত্যুত্তর লিপি আসিল। আমি তাহার নকল রাখিয়াছিলাম। চিঠি খানি নিম্নে লিখিয়া দিতেছি;—

"নিবেদন—আমার কন্যা মুক্তকেশীকে আমার ইচ্ছামতে চিকিৎসকের অধীনে রাখা হইয়াছে কি না, এবং তৎপক্ষে রাজা প্রমোদ-রঞ্জন যে সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে পারেন কি না, ইহা জানিবার নিমিত্ত আপনি আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা আমি পাইয়াছি। এই উভয় প্রশ্নেই আমার সম্মতিসূচক উত্তর জানিবেন। ইতি।

" তি দাসী

চিঠি খানি বড় সংক্ষিপ্ত, যেন চাঁচা কথায় লেখা—কাজের কথা ছাড়া একটী কথাও নাই। কিন্তু প্রশ্নের অতি সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। রাজা বলিলেন,—"হরিমতি কথাবার্ত্তা বড় কম কহে; বড় সাদা স্বভাবের লোক। তাহার পত্রও তাহার স্বভাবের অনুরূপ।"

রাজা আস্তাবলে ঘোড়া দেখিতে গমন করিলেন। মনোরমাও লীলাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইতে গমন করিলেন; ক্ষণেক পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া আমার পার্শ্বস্থ চেয়ারে উপবেশন করিলেন এবং হরিমতির পত্র খানি এ হাত ও হাত করিতে করিতে বলিলেন,—"বস্তুতই কি এ সম্বন্ধে যাহা কিছু করা উচিত তাহা আমরা করিয়াছি?"

এখনও তাঁহার সন্দেহ দেখিয়া আমি একটু বিরক্ত ভাবে বলিলাম,—"যদি আমরা রাজার বন্ধু হই এবং রাজাকে বন্ধুর ন্যায় জ্ঞান ও বিশ্বাস করি, তাহা হইলে আমাদের সমস্তই, এমন কি আবশ্যকের অপেক্ষাও অধিক, করা হইয়াছে। কিন্তু যদি আমরা শত্রুর ন্যায় তাঁহাকে সন্দেহ করি—"

মনোরমা বাধা দিয়া বলিলেন,—"সে কথা মুখেও আনিবেন না; আমরা তাঁহার বন্ধু—আত্মীয়। আপনি জানেন, কল্য আমি রাজার সহিত বেড়াইতে গিয়াছিলাম।"

"তা জানি।"

"পথে আমরা প্রথমতঃ মুক্তকেশীর কথা এবং যেরূপ আশ্চর্য্য ভাবে তাহার সহিত দেবেন্দ্র বাবুর সাক্ষাৎ ঘটে তাহারই কথা কহিতে থাকি। সে কথা শেষ হইলে রাজা, অতি অমায়িক ভাবে, লীলার ভাবান্তরের কথা উল্লেখ করেন। লীলা যদি কোন কারণে মত পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে রাজা সম্পূর্ণ উদার ভাবে তাঁহার পাণি-গ্রহণ-আশা পরিত্যাগ করিতে সম্মত আছেন। কেবল পূর্ব্ব ঘটনা এবং যে যে অবস্থায় বর্ত্তমান বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়, তৎসমস্ত স্মরণ করিয়া লীলাবতী যেন আপনার মত ব্যক্ত করেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র অনুরোধ। সেই সকল বিগত বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া লীলাবতীর যে মত হইবে রাজা তাহা লীলার নিজ মুখ হইতে শুনিতে ইচ্ছা করেন। লীলার মত তাঁহার বাসনার প্রতিকূল হইলে, তিনি বিবা-

হের জন্য আর কোন উপরোধ করিবেন না এবং লীলার স্বাধীনতার কোন প্রতিবন্ধক হইবে না।”

আমি বলিলাম,—“অতি উত্তম কথা; রাজার পক্ষে ইহা ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা।”

মনোরমা আমার মুখের প্রতি কিয়ৎকাল বিপন্ন ভাবে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, —“আমি কোন সন্দেহও করিতেছি না, কাহাকে দোষীও করিতেছি না; কিন্তু লীলাকে এই বিবাহে সম্মত করাইবার ভার আমি কখনই লইব না।”

আমি বলিলাম,—“তোমাকেই তো রাজা এই ভার দিয়াছেন; কিন্তু লীলার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোন চেষ্টা করিতে তিনিও তো তোমাকে নিষেধ করিয়াছেন।”

“রাজার বক্তব্য লীলাকে জানাইলেই প্রকারান্তরে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ চেষ্টা ঘটিতেছে।”

“তাহার অর্থ কি?”

“উমেশ বাবু, আপনি লীলার প্রকৃতি একবার ভাবিয়া দেখুন। যে অবস্থায় বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়, যদি তাহা লীলাকে আলোচনা করিতে বলি, তাহা হইলে তাহার প্রকৃতির দুই শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তি—তাহার পিতৃভক্তি ও তাহার সত্য-প্রিয়তা উভয়কেই আঘাত করা হইবে। আপনি জানেন, লীলা জীবনে কখন কোন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নাই; আর জানেন, মেসো মহাশয়ের পীড়ার সূত্রপাতে এই বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং তিনি মৃত্যু-শয্যায় এই বিবাহে বড়ই অনুরাগ প্রকাশ করেন।”

বলিতে কি কথাগুলি শুনিয়া আমি একটু বিচলিত হইলাম। বলিলাম,—“যাহাই হউক মনোরমা বর্ত্তমান বিবাহ-সম্বন্ধে অমত প্রকাশ করার পূর্ব্বে, তোমার ভগ্নীর, সমস্ত বিষয় বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখা আবশ্যক এবং ইহাও মনে করা উচিত যে, বিবাহের জন্য অনুরোধ করিতে রাজার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যদি সেই নামহীন পত্র লীলার মনে রাজার সম্বন্ধে কোন কুসংস্কার জন্মাইয়া থাকে, তাহা হইলে এখনই লীলার নিকট যাও, এবং তাঁহাকে সমস্ত প্রমাণ স্বচক্ষে দেখিতে বল। তাঁহাকে আরও বল, এ সম্বন্ধে তোমার, অথবা আমার মনে কোনই সন্দেহ নাই। ইহার পরেও লীলা রাজার বিরুদ্ধে আর কি বলিবেন? দুই বৎসর পূর্ব্বে যে ব্যক্তিকে লীলা স্বামীরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, অতঃপর কি আপত্তিতে তিনি তাঁহাকে উপেক্ষা করিবেন?’

“যুক্তি এবং আইনের তর্কে নিশ্চয়ই কোন আপত্তি নাই। তথাপিও যদি লীলা সঙ্কোচ প্রকাশ করে, অথবা আমিই যদি করি, তাহা হইলে, আমাদের আশ্চর্য্য ব্যবহার দেখিয়া, আপনি নিশ্চয়ই আমাদের বুদ্ধির দোষ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করিবেন। অগত্যা আমাদিগকে সে অপবাদ সহ্য করিতে হইবে।”

এই বলিয়া মনোরমা ত্বরিত সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। যখন কোন বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক, প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর না দিয়া, বাজে কথায় তাহা ঢাকিয়া দিবার চেষ্টা করে, তখন প্রায়ই সে কোন কথা লুকাইয়া রাখে। আমার বিশেষ সন্দেহ হইল যে, বর্ত্তমান স্থলে লীলা ও মনোরমা রাজার ও আমার নিকট কোন কথা গোপন করিতেছেন।

বৈকালে যখন মনোরমার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল, তখন আমার সন্দেহ—প্রতীতি আরও বাড়িয়া গেল। লীলার সহিত তাঁহার সাক্ষাতে কি ফল হইল, তাহা আমার সমক্ষে ব্যক্ত করিতে, তিনি যেরূপ চাপিয়া চাপিয়া সংক্ষেপে কথা বলিতে লাগিলেন, তাহা বস্তুতই

সন্দেহজনক। লীলা বিহিত মনঃসংযোগ সহকারে পত্রের প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়াছেন। তাহার পর যখন বিবাহের দিন স্থিরের কথা উঠিয়াছে, তখন তিনি উত্তর দিবার জন্য আরও কিছু দিন সময় প্রার্থনা করিয়া, সমস্ত কথার শেষ করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে রাজা যদি অনুগ্রহ করিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে বর্ষ শেষ হইবার পূর্ব্বেই লীলা শেষ উত্তর দিবেন বলিয়াছেন। লীলা যেরূপ উৎকণ্ঠিত ও কাতর ভাবে সময় প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহাতে মনোরমা রাজাকে তৎসম্বন্ধে সম্মত করিবার নিমিত্ত বিহিত চেষ্টা করিতে স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। কাজেই লীলার আন্তরিক অনুরোধ হেতু, বিবাহের প্রসঙ্গ আপাততঃ স্থগিত থাকিতেছে।

বর্ত্তমান ব্যবস্থায় আমার কিছু অসুবিধা হইয়া পড়িল। অদ্য প্রাতে আমার শীঘ্র কলিকাতায় যাওয়ার আবশ্যক। একবার কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে আবার যে শীঘ্র অবকাশ পাইব এমন বোধ হয় না—হয়ত বৎসরের অবশিষ্ট কয়েক মাসের মধ্যে আমার আসা নাও ঘটিতে পারে। এদিকে ইতি মধ্যে যদি বিবাহের দিন স্থির হইয়া যায়, তাহা হইলে বৈষয়িক ব্যবস্থা সম্বন্ধে লীলার মত তাঁহার নিজ মুখ হইতে এই সময়েই জানিয়া লওয়া আমার আবশ্যক। রাজার কি অভিপ্রায় হয় তাহা না জানিয়া, আমি এ কথা উত্থাপন করিলাম না। জ্ঞাত হইলাম, রাজা লীলাবতীর প্রস্তাবানুসারে সন্তোষসহ নিরূপিত কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তখন আমি মনোরমাকে জানাইলাম যে, লীলার সহিত বৈষয়িক কথাবার্ত্তা এই সময়েই শেষ করা আমার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

পরদিন প্রাতে আমি লীলার সহিত সাক্ষাদাশয়ে তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। লীলার অস্থির মতিত্ব ও বিবেচনার ত্রুটী সম্বন্ধে আমি প্রথমেই বড় গোছ একটা উপদেশ দিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম; কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র, লীলা আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য, যেরূপ ভাবে অগ্রসর হইলেন তাহা দেখিয়া আমি সব ভুলিলাম। আমি উপবেশন করিলে লীলার পোষা কুকুরটি লাফাইয়া আমার ক্রোড়ের উপর উঠিতে লাগিল। আমি বলিলাম,—"তুমি যখন শিশু ছিলে, তখন এই কোলে তুমি বসিতে। আজি এই শূন্যসিংহাসন তোমার কুক্কুর দখল করিতে চাহিতেছে। তোমার হাতে ও কিসের খাতা?"

লীলার হাতে হস্তলিখিত একখানি সুন্দর খাতা ছিল। লীলাবতী খাতা খানি রাখিয়া দিয়া বলিলেন,—"ও কিছু নয়; কতক গুলি হিজিবিজি লেখা।"

দেখিলাম লীলার হাত এখনও সেই বালিকাকালের ন্যায় চঞ্চল, নিয়তই এটা ওটা নাড়িতে ভালবাসে। লীলা ব্যাকুল ভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। না জানি আমি কি প্রসঙ্গ উপস্থিত করিব ভাবিয়া, যেন তিনি অস্থির হইলেন। আমি, আর কাল-ব্যাজ না করিয়া, কাজের কথা পাড়িলাম। বলিলাম,—"আমি আজিই কলিকাতায় যাইব; এ স্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, তোমার সহিত তোমার নিজের বৈষয়িক দুই একটী কথাবার্ত্তা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।"

লীলা দীন ভাবে আমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"আপনি এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন, ইহা দুঃখের বিষয়। আপনাকে

এখানে দেখিতে পাইলে আমার সুখময় বাল্য কালের কথা মনে পড়ে।"

আমি বলিলাম,—"আমি হয়ত আর একবার আসিব; কিন্তু এ সম্বন্ধে এখনও একটু অস্থিরতা আছে বলিয়া, তোমার সঙ্গে যে যে কথার দরকার আছে, তাহা এখনই শেষ করিয়া রাখা আবশ্যক মনে করিয়াছি। আমি তোমাদের অনেক দিনের উকীল এবং তোমাদের অনেক দিনের বন্ধু। আমি যদি এখন রাজা প্রমোদরঞ্জনের সহিত তোমার বিবাহের কথা উত্থাপন করি তাহাতে দোষ গ্রহণ করিও না।"

লীলা সজোরে হস্তের খাতা পরিত্যাগ করিলেন—যেন তাহাতে বৃশ্চিক ছিল। বারংবার এক হস্তে অপর হস্ত ধারণ করিতে করিতে কহিলেন,—"বিবাহের কথা না তুলিলে কি চলিতে পারিবে না?"

আমি বলিলাম,—"একবার তোমার অভিপ্রায়টা আমার জানা দরকার। বিবাহ হইবে, কি হইবে না, তাহা জানিতে পারিলেই হইবে। যদি তোমার বিবাহ হয়, তাহা হইলে তোমার পিতৃকৃত উইল অনুসারে তোমার নিজ সম্পত্তির ব্যবস্থা অগ্রেই করা আবশ্যক। সে সম্বন্ধে তোমার ইচ্ছা কি তাহাও আমি জানিতে চাহি। ধরা যাউক তোমার বিবাহ হইবে। তাহা হইলে ভবিষ্যতে তোমার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে এবং বর্ত্তমানে তাহা কিরূপ আছে, তাহা তোমাকে বুঝাইতেছি।"

তাহার পর আমি তাঁহাকে তাঁহার নিজ বিষয় সংক্রান্ত সমস্ত কথা বুঝাইলাম। তাঁহার অতুল সম্পত্তির মধ্যে কতক তাঁহার সম্পূর্ণ নিজের, আর কতকের উপর তাঁহার জীবন স্বত্ব মাত্র। তাঁহার পিতৃব্যের মৃত্যুর পর কতক সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হইবে এবং তাঁহার পিতৃকৃত উইল অনুসারে বিবাহের পর কতক সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হইবে। সমস্ত বুঝাইয়া, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বিবাহ ঘটিলে, তোমার সম্পত্তি সম্বন্ধে তুমি তোমার ইচ্ছামত কোন সর্ত্ত রাখিতে চাহ কি না, তাহা আমি জানিতে চাহি।"

বড় অস্থির ভাবে লীলা এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি সহসা আমার মুখের প্রতি চাহিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন,—"যদিই তাহা ঘটে—যদিই আমার—"

তিনি কথা শেষ করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া, আমি বলিলাম,—"যদিই তোমার বিবাহ হয়—"

লীলা বলিলেন,—"তাহা হইলে মনোরমা দিদি যেন তফাত না হন। দিদি আমার সঙ্গে থাকিবেন, আপনি দয়া করিয়া ইহার পাকা বন্দোবস্ত করিয়া দিন।"

অন্য স্থান হইলে এ কথায় আমার হাসি আসিত। আমি সম্পত্তির বন্দোবস্তের জন্য এত বকাবকি করিলাম, কিন্তু ফলে এই হইল। কিন্তু এস্থলে লীলার মুখের ভাব, তাঁহার কণ্ঠস্বর ও কাতরতা দেখিয়া আমিও কাতর হইলাম। তাঁহার এই অল্প কথায় অতীতের প্রতি তাঁহার অত্যাসক্তি প্রকাশিত হইতেছে; ভবিষ্যতের পক্ষে ইহা শুভলক্ষণ নহে।"

আমি বলিলাম,—"মনোরমা তোমার সঙ্গে থাকার বন্দোবস্ত অতি সহজেই করা যাইতে পারিবে। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা হয়ত তুমি বুঝিতে পার নাই। আমি তোমার টাকার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। মনে কর তোমার যদি একটা উইল করিতে হয়, তুমি তাহা হইলে তোমার টাকা কাহাকে দিবে?"

স্নেহ-পরায়ণা বালিকা বলিলেন,—"দিদি আমার ভগ্নী এবং জননী দুইই। আমি কি আমার টাকা দিদিকে দিতে পারি না?"

আমি বলিলাম,—"অবশ্য পার। কিন্তু ভাবিয়া দেখ তোমার টাকা কত। এত টাকা সবই কি তুমি মনোরমাকে দিবে?"

লীলা যেন কি বলি বলি করিয়া বলিতে পারিলেন না; বালিকা বড় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—"সব নহে—দিদি ছাড়া আর একজনকে—"

বালিকা কথার শেষ করিলেন না। তাহার অঙ্গ সকল চঞ্চল হইল, মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। আমি বলিলাম,—"মনোরমা ছাড়া এই পরিবার-ভুক্ত অপর কোন লোককে তুমি লক্ষ্য করিয়াছ কি?"

আবার তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইল। তিনি সন্নিহিত পুস্তক সজোরে ধারণ করিয়া বলিলেন,—"আর এক জন আছেন,—তাঁহার জন্য যদি আমি কিছু রাখিয়া যাইতে পারি, বোধ হয়, তাহা তাঁহার কাজে আসিতে পারে। যদি আমার অগ্রে মৃত্যু হয়—"

আবার বালিকা নীরব। তাঁহার দেহ ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল, বদন পাণ্ডু হইল, ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। একবার বালিকা আমার মুখের প্রতি চাহিলেন, আবার পর ক্ষণেই বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইলেন। তাহার পর উভয় হস্তে বদন আবৃত করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। সংসার কি কঠোর স্থান। এই নিয়ত হাস্যমুখী বালিকা অধুনা সুখের যৌবনে উপস্থিত। কিন্তু হায়, সংসারের ঘর্ষণে তিনি আজি ক্লেশভারে নিপীড়িত! লীলার এবংবিধ অবস্থা দেখিয়া আমার এতই কষ্ট উপস্থিত হইল যে, অধুনা সময় উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য ঘটাইয়াছে, তাহা আর আমার মনে হইল না। আমি আমার চেয়ার তাঁহার নিকটে লইয়া গেলাম এবং তাঁহার মুখ হইতে হাত টানিয়া লইয়া বলিলাম,—কাঁদিও না মা!"

দশ বৎসর পূর্ব্বে যে লীলাবতী ছিলেন, তিনি যেন তাহাই আছেন মনে করিয়া আমি স্বহস্তে তাঁহার চক্ষের জল মোচন করিয়া দিলাম। ইহাতে উপকার হইল। লীলা আমার স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার বদনে, অশ্রু-বারি ভেদ করিয়া, একটু মৃদু হাসি দেখা দিল।

সরলা লীলা সরলতা সহ বলিলেন,—"আমার ভুল হইয়াছে—অন্যায় হইয়াছে। কয়দিন হইতে আমার শরীর ও মন বড় খারাপ যাইতেছে। আমি যখন তখন, কোন কারণ না থাকিলেও কাঁদিয়া ফেলি। এখন আমার শরীর অনেক ভাল হইয়াছে। আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসিবেন, তাহার উত্তর দেতেছি।"

আমি বলিলাম,—"না বাছা, এখন আর কাজ নাই; অন্য কোন সময়ে যাহা জানিবার আবশ্যক, তাহা জিজ্ঞাসা করিব। আপাততঃ যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতেই কাজ চলিবে।"

আমি অন্যান্য কথার অবতারণা করিলাম। দশ মিনিটের মধ্যে তিনি বেশ সুস্থ হইলেন। তখন আমি বিদায় প্রার্থনা করিয়া গাত্রোত্থান করিলাম।

লীলাবতী সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বিনীত ও কাতর ভাবে বলিলেন,—"আবার আসিবেন! আপনি আমাকে যেরূপ দয়া করেন, আবার যখন আসিবেন, তখন আমি সেই দয়ার অনুরূপ ব্যবহার করিব। আপনি আসিতে ভুলিবেন না।"

আমি বলিলাম,—"আবার যখন আসিব, ভরসা করি, তোমাকে তখন সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিতে পাইব।"

অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল আমি লীলাবতীর নিকটে ছিলাম। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে লীলা তাঁহার হৃদয়ের গূঢ় কথা কিছুই আমার নিকট ব্যক্ত করেন নাই এবং বর্ত্তমান বিবাহ বিষয়ে তাঁহার কাতরতার কারণ কি তাহাও আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। তথাপি আমি, কি জানি কেন, তাঁহার পক্ষাবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যখন লীলার প্রকোষ্ঠে আসিয়াছিলাম, তখন অনেকটা রাজার পক্ষ ছিলাম; যখন প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিলাম তখন মনে হইল, কোনরূপে এ বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেলে মন্দ হয় না।

আমার প্রস্থান-কাল ক্রমে নিকটস্থ হইল। রাধিকা বাবুর সহিত দেখা করা হইল না। লোক দ্বারা মুখে মুখে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লওয়া হইল। প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে মনোরমাকে বলিলাম যে, তাঁহার নিকট হইতে সংবাদ না পাইলে আমি কোন কার্য্যই করিব না।

রাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। তিনি জেদ করিয়া আমার গাড়ির দরজা পর্য্যন্ত আসিলেন। বলিলেন,—"যদি কখন দৈবাৎ আমার বাটীর দিকে যাওয়া হয়, তাহা হইলে দয়া করিয়া আমার বাটীতে পদধূলি দেওয়া হয় যেন। আমাকে আত্মীয় বলিয়া অনুগ্রহ রাখিবেন।"

রাজা লোকটা খুব ভদ্র—বড় মাটির মানুষ। গাড়ি ষ্টেশনাভিমুখে ছুটিল। আমি স্থির করিলাম, রাজার সহিত সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ আত্মীয়োচিত ব্যবহার করিব; কেবল এ বিবাহের বড় একটা সহায়তা করিব না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় আসিয়া সাত দিনের মধ্যে মনোরমার নিকট হইতে কোন সংবাদ পাইলাম না। অষ্টম দিনে মনোরমার হস্তলিখিত এক পত্র প্রাপ্ত হইলাম। পত্র পাঠে জানিলাম রাজা প্রমোদরঞ্জনের সহিত লীলার বিবাহ স্থির হইয়াছে—সম্ভবতঃ বিবাহ আগামী মাঘ মাসেই হইবে। তাঁহারা যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাতে আমার কথা কি আছে? তথাপি পত্রের সংবাদ জানিয়া মন বড় কাতর হইল। পত্রখানি বড় ক্ষুদ্র; সংবাদও আমার পক্ষে বড়ই অচিন্তিত-পূর্ব্ব। সে দিনটা আর কোন কাজ করিতে পারিলাম না। পত্রের প্রথম ছয় ছত্রে বিবাহ সংবাদ, তাহার পর তিন ছত্রে রাজা হুগলি চলিয়া গিয়াছেন এই সংবাদ, শেষ কয়েক ছত্রে লীলার শারীরিক অসুস্থতার সংবাদ এবং তাঁহারা শীঘ্রই বৈদ্যনাথে বেড়াইতে যাইবেন এই সংবাদ। আর কিছুই নাই। কোন বিষয়ের একটা কারণ লেখা নাই; হঠাৎ এক সপ্তাহ মধ্যে এরূপ আশ্চর্য্য মত-পরিবর্ত্তন কেন ঘটিল, তাহার কোন উল্লেখ নাই।

লীলার বিবাহ হইবে—বেশ কথা। আমার যাহা কর্ত্তব্য আমি তাহা করিতে নিযুক্ত হইলাম। লীলার সম্পত্তির ব্যবস্থা। লীলার সম্পত্তি দ্বিবিধ—১ সম্ভাবিত, ২ হস্তগত। পিতৃব্যের পরলোক-প্রাপ্তির পর লীলা যে বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইবেন, তাহাই তাঁহার সম্ভাবিত সম্পত্তি এবং পিতৃকৃত উইল অনুসারে তিনি,

বিবাহের পরই; যে দুই লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইবেন, তাহাই তাঁহার হস্তগত সম্পত্তি বলিতে পারা যায়। লীলার সম্ভাবিত সম্পত্তির সম্বন্ধে কোনই গোল নাই এবং তাহার জন্য কোন ব্যবস্থারও প্রয়োজন নাই। এতদ্ব্যতীত এক লক্ষ টাকার উপর লীলার জীবন স্বত্ব আছে এবং তাঁহার জীবনান্ত ঘটিলে, তাহা তাঁহার পিসী শ্রীমতী রঙ্গমতী দেবীর হস্তগত হইবে ব্যবস্থা আছে। এখানে পাঠক জিজ্ঞাসিতে পারেন, ভাইঝির মৃত্যু হইলে পিসী সম্পত্তি পাইবেন কি জন্য? রঙ্গমতী দেবী লীলার পিতা ৺প্রিয় প্রসাদের একমাত্র ভগ্নী। এই ভগ্নীর যতদিন বিবাহ না হইয়াছিল, ততদিন তাঁহার সহিত কাহারও সদ্ভাবের অভাব হয় নাই। কিন্তু তিনি সকল আত্মীয়ের বিরুদ্ধে, জোর করিয়া, পূর্ব্ব-বঙ্গ-নিবাসী এক ব্যক্তিকে বিবাহ করায়, প্রিয়প্রসাদ রায় ও রাধিকা প্রসাদ রায় যার-পর-নাই বিরক্ত হন এবং ভগ্নীর সহিত সর্ব্ব প্রকার সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন। যাঁহার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, তাঁহার নাম জগদীশ নাথ চৌধুরী। চৌধুরী মহাশয় নিঃস্ব, অথবা অযোগ্য ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয় না। তথাপি এই বিবাহ হেতু রঙ্গমতীর উপর তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় বিরক্ত হইলেন এবং তিনি পিতৃসম্পত্তির কিছুই পাইবেন না স্থির হইল। অনেক চেষ্টায়, বহুদিন পরে, তাঁহার প্রতি এই অনুগ্রহ হইল যে, লীলার জীবনান্ত হইলে রঙ্গমতী এক লক্ষ টাকা পাইবেন এবং লীলা সমস্ত জীবনকাল ঐ সম্পত্তির আয় স্বয়ং ভোগ করিবেন। নগদ দুই লক্ষ টাকা ও এই এক লক্ষ টাকার আয়, এই উভয় কথার বিহিত ব্যবস্থা এই সময় হওয়া আবশ্যক। যাহাতে এই সম্পত্তি অব্যবহিত রূপে লীলার অধিকারে থাকে, তাহাই আমার লক্ষ্য। আমি ব্যবস্থা করিলাম যে, এই দুই লক্ষ টাকা এরূপে আবদ্ধ থাকিবে যে, তাহার আয়ে তাঁহার স্বামীর কোন অধিকার থাকিবে না। লীলার পরলোক ঘটিলে তাঁহার স্বামী সেই আয় ভোগ করিবেন এবং ভবিষ্যতে মূল টাকা লীলার সন্তানাদি প্রাপ্ত হইবেন। যদি সন্তানাদি না থাকে, তাহা হইলে লীলা উইল দ্বারা তাঁহার মাসতুতো ভগ্নী মনোরমাকে, বা অপর যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহাকে, তাহা দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। আমার মনে লীলার সম্পত্তি সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা হইল। আমি সেই মত লেখা পড়া প্রস্তুত করিয়া, রাজা প্রমোদরঞ্জনের উকীলকে দেখিতে পাঠাইলাম। তাঁহার উকীল অন্যান্য সমস্ত কথায় সম্মতি দিলেন; কিন্তু যে স্থলে লীলার দুই লক্ষ টাকা, তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর, সন্তানাদি না থাকিলে, রাজা আয় ভোগ করিবেন, পরে লীলার ইচ্ছানুসারে অপরের হস্তগত হইবে, এই কথা লেখা ছিল, সেই স্থানে উকীল মহাশয় বিষম আপত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন,—"সন্তানাদি না থাকিলে, লীলাবতী দেবীর পরলোক প্রাপ্তির পর, ঐ দুই লক্ষ টাকা রাজার হইবে।"

কাজেই ঐ টাকার একটী পয়সাও যে মনোরমা, বা আর কেহ, প্রাপ্ত হইবেন তাহার সম্ভাবনা থাকিতেছে না। এ বড় অন্যায় ব্যবস্থা! সমস্ত টাকা রাজা পাইবেন কেন? আমি একথায় সম্পূর্ণ আপত্তি করিলাম; রাজার উকীলও আমার কথায় আপত্তি করিলেন। তখন যাঁহাদের বিষয় তাঁহারা যাহা বলেন তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল।

রাধিকাপ্রসাদ রায় লীলাবতীর অভিভাবক। আমি তাঁহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া

পত্র লিখিলাম। সম্প্রতি রাজার বড় অর্থের অভাব। দেখিতে তাঁহার যথেষ্ট বিষয় বটে, কিন্তু তিনি দেনায় ডুবিয়া আছেন। বর্ত্তমান বিবাহ কেবল টাকার জন্য; তাঁহার উকীলের প্রস্তাব কেবল স্বার্থপরতা-মূলক। আমি কোন কথাই লিখিতে বাকি রাখিলাম না। দুই দিনের মধ্যেই রাধিকা বাবুর উত্তর আসিল। তাহা পাঠ করিয়া আমি অবাক্ হইলাম। তাঁহার পত্রের মর্ম্ম এই যে, "কোন্ কালে কি হইবে তাহা ভাবিয়া এই পীড়িত ব্যক্তিকে কাতর করা কি উমেশ বাবুর উচিত? ষোল বৎসরের এক বালিকা ৪০ বৎসরের পুরুষের অগ্রে মরিবে, ইহা কি কখন সম্ভব? আর যদিই তাহা ঘটে, তাহা হইলে একটীও সন্তান থাকিবে না, এই বা কোন্ কথা? কোন্ কালে দুই লক্ষ টাকার কি হইবে তাহার ভাবনা অপেক্ষা, সংসারে শান্তি ও সুখই প্রধান দ্রষ্টব্য। হায় এ পাপ সংসারে উহা কি দুর্লভ!"

ঘোর বিরক্তির সহিত আমি তাঁহার পত্র দূরে নিক্ষেপ করিলাম। তখনই রাজা প্রমোদ-রঞ্জনের উকীল মণি বাবু আমার কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। মণি বাবু লোক বড় চতুর। হাসি হাসি মুখ—রহস্যময় কথাবার্ত্তা, কিন্তু কাজ ভুলিবার লোক নহেন। তাঁহার সহিত অনেক কথা হইল, হাস্য পরিহাস যথেষ্ট হইল, কিন্তু কাজের কথায় তিনি এক বিন্দুও নরম হইলেন না। তখন অগত্যা আমি স্বয়ং শক্তিপুর গিয়া, বাচনিক পরামর্শ স্থির করিবার অভিপ্রায়ে, মণিবাবুর নিকট আর এক সপ্তাহ সময় প্রার্থনা করিলাম। তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি প্রস্থান কালে জিজ্ঞাসিলেন,—"সেই নামহীন পত্র-লেখিকার আর কোন সংবাদ পাইয়াছেন কি?"

আমি বলিলাম,—"কিছু না। আপনারা কি কিছু জানিতে পারিয়াছেন?"

তিনি বলিলেন,—"না, তবে আমরা হতাশও হই নাই। রাজার বিশ্বাস, কোন লোক তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। আমরা সেই লোককে চখে চখে রাখিতেছি।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"যে তাহার সঙ্গে শক্তিপুর গিয়াছিল, সেই স্ত্রীলোকটা বুঝি?"

তিনি বলিলেন,—"না মহাশয়, স্ত্রীলোক নহে, এ পুরুষ। আমাদের বোধ হয়, পাগলী যখন প্রথমে পলায় তখনও এই লোকটা তাহার সাহায্য করিয়াছিল, সে লোকটা এখন কলিকাতাতেই আছে। রাজা তাহাকে স্পষ্ট করিয়া সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবেন মনে করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, তাহাতে কাজ নাই। দেখা যাউক সে কি করে, তাহাকে লক্ষ্য ছাড়া করা হইবে না। এখন আসি মহাশয়। গোলটা শীঘ্র মিটাইয়া দিবেন।"

মণি বাবু চলিয়া গেলেন। অন্য মক্কেল হইলে আমার এত ভাবিবার দরকার ছিল না। আমাকে যেমন উপদেশ দিত, আমি তেমনই কাজ করিতাম। কিন্তু লীলাবতীর বিষয়ে সেরূপ করা আমার অসাধ্য। লীলার পিতার সহিত আমার বড় আত্মীয়তা ছিল। তিনি আমার প্রধান মুরুব্বি ও বন্ধু ছিলেন। লীলাকে আমি চিরকাল নিতান্ত স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছি। আমি নিঃসন্তান; অপত্য-স্নেহের মর্ম্ম আমার কিছুই জানা নাই। কিন্তু আজি আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন বর্ত্তমান বৈষয়িক ব্যবস্থা আমার নিজ কন্যার ব্যবস্থা। সুতরাং এ ক্ষেত্রে উদাসীন ভাবে কার্য্য করা আমার অসাধ্য। রাধিকা বাবুকে পুনরায় পত্র লেখা নিতান্ত অনাবশ্যক। যদি তাঁহার দ্বারা কোন কার্য্য হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে

মুখোমুখি, জোর করিয়া না ধরিলে হইবে না। কল্য শনিবার। স্থির করিলাম, কল্য শক্তিপুর যাইব এবং যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিয়া দেখিব।

পরদিন শনিবার—শক্তিপুরে যাইবার জন্য রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গাড়ির একটু বিলম্ব দেখিয়া আমি প্লাটফরমে এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময় হঠাৎ একটী লোক, নিতান্ত ব্যস্ততা সহকারে, আমার নিকটস্থ হইল। লোকটী দেবেন্দ্র বাবু। দেবেন্দ্র বাবুর মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে চিনিবার উপায় নাই। তাঁহার পরিচ্ছদ নিতান্ত মলিন, আকৃতি অত্যন্ত ক্ষীণ, বদন বিবর্ণ ও কাতর। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি শক্তিপুর হইতে অনেক দিন আসিয়াছেন? আমি মনোরমা দেবীর এক পত্র পাইয়াছি। আমি জানি, পাগলিনীর সম্বন্ধে রাজা প্রমোদরঞ্জনের কথা আপনারা সন্তোষজনক বলিয়া মনে করিয়াছেন। আপনি জানেন কি উমেশ বাবু, বিবাহ কি শীঘ্রই হইবে?"

তিনি এত শীঘ্র শীঘ্র কথা কহিলেন যে, তাঁহার অনুসরণ করা অসম্ভব। এক সময়ে দৈবাৎ তাঁহার সহিত রায়-পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়াছিল বটে কিন্তু তাই বলিয়া পারিবারিক সমস্ত সংবাদ তাঁহাকে আমি জানাইব কেন? আমি বলিলাম,—"সময়ে সকলই জানিতে পারিবেন। সে বিবাহ লুকাইয়া হইবার নহে। দেবেন্দ্র বাবু, আপনাকে পূর্ব্বাপেক্ষা বিশ্রী দেখিতেছি কেন?

তাঁহার মুখের ভাবে হৃদয়-বেদনার চিহ্ন ব্যক্ত হইল। এইরূপ পরুষ ভাবে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ায়, আমার মনে কষ্ট হইল। তিনি ক্লিষ্ট ভাবে বলিলেন,—"বিবাহের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে আমার কোনই অধিকার নাই বটে—তা—তা—আচ্ছা।"

আমি একটা মিষ্ট কথা দ্বারা, আমার ত্রুটি স্বীকার করিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আমি দেশে থাকিতেছি না। কাজ কর্ম্মের চেষ্টায় অন্য দেশে যাইতেছি। মনোরমা দেবী আমার অনেক উপকার করিয়াছেন। অনেক দূরদেশে—কোথায় যাইতেছি, সেখানকার জল বায়ু কেমন—সে ভাবনা আমার নাই।"

কথা কহিতে কহিতে, সন্দিগ্ধ ভাবে চতুঃপার্শ্বে যে বহু লোক যাতায়াত করিতেছিল, তিনি তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, যেন কে তাঁহার প্রতি নজর রাখিয়াছে।

আমি বলিলাম,—"আপনি যেখানে যাইতেছেন, নির্ব্বিঘ্নে সেখানে যান এবং নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসুন, ইহাই আমার প্রার্থনা। আমি একটু প্রয়োজন হেতু আজি শক্তিপুর যাইতেছি। মনোরমা ও লীলাবতী বৈদ্যনাথ গিয়াছেন।"

তাঁহার বদনমণ্ডল প্রদীপ্ত হইল। তিনি কোন উত্তর না দিয়া হঠাৎ আমাকে নমস্কার করিয়া, জনকোলাহল মধ্যে মিশিয়া গেলেন। যদিও তাঁহার সহিত আমার পরিচয় অতি সামান্য মাত্র, তথাপি তাঁহার জন্য আমার মন কিছু ব্যাকুল হইল। আমার বোধ হইল, দেবেন্দ্র বাবুর ভবিষ্যৎ বড় অন্ধকারময়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বৈকালে গিয়া আমি শক্তিপুর পৌছিলাম। আনন্দধাম বড় ফাঁক; লীলা, মনোরমা, অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী কেহই নাই। আমি রাধিকা বাবুর নিকট সংবাদ পাঠাইলাম। সহসা আমার আসার খবর পাইয়া, তাঁহার শরীর নিতান্ত খারাপ হইয়া উঠিল, কাজেই আজি আর তাঁহার সঙ্গে কোন ক্রমেই সাক্ষাৎ হইতে পারে না—কল্য প্রাতে দেখা হইবে। চাকর বাকরেরা আমাকে যথেষ্ট যত্ন করিতে লাগিল।

পর দিন বেলা ১০টার সময় আমি রাধিকা প্রসাদ বাবুর নিকটস্থ হইলাম। দেখিলাম, তিনি চেয়ারে উপবিষ্ট; সম্মুখে তাঁহার খান-সামা এক প্রকাণ্ড ছবির বহি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর রায় মহাশয় চশমা চক্ষে লাগা-ইয়া সকল ছবির শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। বহি খানি এত বড় ও এমনি ভারি যে, খান-সামার মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, সে ব্যক্তি অবসন্ন হইয়া পড়িবার মত হইয়াছে। আমি রায় মহাশয়ের নিকটস্থ হইলে, তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই বলিলেন,—"প্রাণের বন্ধু উমেশ বাবু, তবে ভাল আছ তো? বেশ ভাল আছ?"

আমি ভাবিয়াছিলাম, আমি বসিলে, খানসামাকে প্রস্থান করিতে বলা হইবে। কিন্তু তাহার কোন লক্ষণই দেখিলাম না। সে যেমন বোঝা ধরিয়া ছিল, তেমনই খাড়া রহিল। আমি বলিলাম,—"আমি বিশেষ প্রয়োজনের জন্ম আসিয়াছি। আর কেহ এখানে না থাকিলে ভাল হয়।"

খানসামাটা কৃতজ্ঞ ভাবে আমার মুখের প্রতি চাহিল; ভাবিল এতক্ষণ পরে বুঝি তাহার এ যন্ত্রণার অবসান হইবে। রাধিকা বাবু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, বিস্মিত ভাবে বলি-লেন,—"আর কেহ না থাকিলে ভাল হয়!"

আমার এ সকল ছেলেমি ভাল লাগিল না। আমি দৃঢ় ভাবে বলিলাম,—"এই লোকটীকে স্থানান্তরে যাইতে বলিলে বাধিত হইব।"

রাধিকা বাবু নেত্র বিস্তার করিয়া, ঠোঁট ফুলাইয়া, রসিকতা করিয়া বলিলেন,—"লোক! ওকি একটা লোক নাকি? আধ ঘণ্টা পূর্ব্বেও একটা লোক ছিল বটে, আধ ঘণ্টা পরেও আবার লোক হইতে পারে বটে, এখন তো ও আমার কেতাব রাখা টেবিল। টেবিল এখানে থাকায় তোমার আপত্তি কি?"

"আমার আপত্তি আছে। রাধিকা বাবু, আমি আবার বলিতেছি, আমাদের এখানে আর কেহ না থাকে।"

আমি যেরূপ স্বরে ও যেরূপ ভাবে আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম, তাহাতে অন্য মত করা অসম্ভব। রাধিকা বাবু নিতান্ত বিরক্ত ভাবে খানসামাকে একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"রাখ—ছবির বহি ঐ চেয়ারে রাখ। খবরদার—পড়ে না যেন। পড়েনি তো? সাবধান। আতরের সিসি আমার কাছে রাখ। রাখি-য়াছ? তবে হতভাগা, এখনও দাঁড়াইয়া কেন?"

খানসামাটা বাহিরে গিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। রায় মহাশয় বার বার আতর শুঁকিতে লাগিলেন এবং একদৃষ্টিতে পার্শ্বস্থ আলমারির পুস্তকের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। রাগে আমার ব্রহ্মাণ্ডটা জ্বলিতে লাগিল!

আমি বলিলাম,—"আমি অনেক ক্ষতি ও কষ্ট স্বীকার করিয়া আপনাদের কার্য্যের জন্য আসিয়াছি। বোধ হয়, আমার কথায় আপনার মনঃসংযোগ করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক।"

তিনি বলিলেন,—"আমাকে বাক্য-যন্ত্রণা দিও না। আমি নিতান্ত কাতর—পীড়িত—অনুগ্রহের পাত্র।"

এই বলিয়া তিনি নয়ন মুদিয়া, মুখে রুমাল দিয়া, বসিলেন। আমি আজি লীলার হিতার্থে সকল অত্যাচারই সহ্য করিব স্থির করিয়াছি। বলিলাম,—"আমি আপনাকে বিনয় করিয়া অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি আমার পত্রের লিখিত বিষয় আর একবার বিচার করিয়া দেখুন এবং আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীর ন্যায়-সঙ্গত অধিকার ঠিক থাকিতে দিন। আমি আর একবার—এই শেষ বার আপনাকে সমস্ত ঘটনা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি।"

রায় মহাশয় অতি কাতর ভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ এবং বারংবার মস্তকান্দোলন করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"উমেশ বাবু, তুমি নিতান্ত হৃদয়হীন—ছি! যাহা হউক, কি তোমার কথা, বলিয়া যাও।"

আমি সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি আতরের সিসি নাকের নিকট রাখিয়া ও রুমালে মুখ ঢাকিয়া শুনিতে লাগিলেন। আমার বাক্য শেষ হইলে, তিনি ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিলেন। বলিলেন,—"ওঃ বাপরে! উমেশ বাবু বেশ তোমার যুক্তি! ওঃ!"

আমি বলিলাম,—"আমাকে একটা সাদা জবাব দিন। আমার বিশ্বাস, আপনি জোর করিলে রাজা প্রমোদরঞ্জনকে নরম হইতেই হইবে। লীলার টাকা লীলার নিজ সম্পত্তি—তাহাতে রাজার কোন দাওয়া নাই। লীলার সন্তান না থাকিলে, তাঁহার অবর্ত্তমানে, সে টাকা তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তিভুক্ত হওয়া উচিত, অথবা তিনি যেরূপ ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করেন তাহাই হওয়া উচিত। রাজা যদি জেদ্ না ছাড়েন, তবে নিশ্চয় জানিবেন তিনি কেবল অর্থলোভের বশবর্ত্তী হইয়া এ বিবাহ করিতেছেন এবং এ কথার উল্লেখ করিয়া আত্মীয়-স্বজন সকলেই তাঁহাকে নিন্দা করিবে।"

রায় মহাশয় ধীরে ধীরে রুমাল নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন,—

"বাপরে এত কথা! আস্তে কথা কহা বড় সুখের। সে সুখ, উমেশ বাবু, তুমি এখনও জানিতে পার নাই, বোধ হয়। উমেশ বাবু, তুমি তুলসীদাসের দোঁহা জান? তাহাতে বিস্তর সদুপদেশ আছে। আমি অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়াছি।"

আমি বলিলাম,—"আমার এই বিশেষ প্রয়োজনীয় কথার মীমাংসা অগ্রে আবশ্যক, তাহার পর অন্য কথা। আপনি যে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবেন সেই বলিবে, স্ত্রীলোকের টাকা অকারণে স্বামীর হস্তগত হইতে দেওয়া অন্যায়। আমিও আপনাকে বন্ধুভাবে সেই কথা জানাইতেছি।"

রায় মহাশয় বলিলেন,—"বটে! যাহাকে জিজ্ঞাসা করিব সেই এরূপ কথা বলিবে কি? তাহা যদি বলে, তাহা হইলে তখনই তাহাকে দ্বারবান্ দিয়া তাড়াইয়া তবে অন্য কথা।"

আমি বলিলাম,—"আমাকে উত্যক্ত করায় কোন ফল নাই। যেরূপ ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার জন্য ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ আপনিই দায়ী।"

তিনি বলিলেন,—"না, উমেশ বাবু, না। সমস্ত ঝোঁক আমার ঘাড়ে চাপাইও না। আমি তোমার সহিত তর্ক করিতাম, কিন্তু হায়! আমার শরীর! তুমি আমার—তোমার

নিজের—প্রমোদরঞ্জনের এবং লীলার মাথা খাইতে বসিয়াছ। এত করিতেছ কিসের জন্য? ইহ জগতে যাহা হইবার, বা ঘটিবার সম্ভাবনা অতি বিরল তাহারই জন্য। শান্তি ও সুখ বজায় রাখিতে চেষ্টা কর—এ কথা ছাড়িয়া দেও।”

আমি আসন ত্যাগ করিয়া বলিলাম,—“তবে আপনি চিঠিতে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাই আপনার মত?”

তিনি উত্তর দিলেন,—“হাঁ—হাঁ। এত তর্ক—এত বকাবকির পর আমার অভিপ্রায় তুমি বুঝিতে পারিয়াছ দেখিতেছি। ওঠ কেন? বইস।”

আমি তাঁহার অনুরোধ কর্ণেও ঠাঁই দিলাম না। দ্বারসন্নিহিত হইয়া ফিরিয়া বলিলাম,—“ভবিষ্যতে যাহাই কেন হউক না, মনে রাখিবেন আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়াছি। আমি আপনাদিগের বহুদিনের বন্ধু ও কর্ম্মচারী। বিদায় কালে আমি আবার বলিতেছি যে, আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীর সম্পত্তির যেরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন, আমি কখনই আমার কন্যার জন্য সেরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিতাম না।”

আমি বাহিরে আসিলাম, তিনি বলিতে লাগিলেন,—“খাওয়া দাওয়া না করিয়া যাইও না। বুঝিয়াছ, উমেশ বাবু, আহার করিয়া যাইও।”

আমি বিরক্তি হেতু তাঁহার কথার কোনই উত্তর দিলাম না। সেই দিনই বৈকালের ট্রেণে আমি কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম।

পূর্ব্বের লেখাপড়া বদলাইয়া ফেলিলাম। লীলা নিজ-মুখে যাহাদিগকে নিজ-সম্পত্তি দান করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার সফলতা হওয়ার কোনই সম্ভাবনা থাকিল না। আমি কি করিব? আমার ইচ্ছায় তো কাজ নহে। আমি না করিতাম, আর একজন উকীল লেখা পড়া করিয়া দিত।

আমার কথা ফুরাইল। অতঃপর এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের অবশিষ্টাংশ অন্যান্য লেখনী ব্যক্ত করিবে। দুঃখিত হৃদয়ে আমার কাহিনী আমি এই স্থানে সমাপ্ত করিলাম।

(উমেশ বাবুর কথা সমাপ্ত।)

শ্রীমতী মনোরমা দেবীর কথা।

মনোরমা দেবীর লিখিত দিনলিপি হইতে উদ্ধৃত

(দিনলিপির যে যে অংশের সহিত, বর্ত্তমান উপন্যাসের কোন সম্বন্ধ নাই তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

৮ই অগ্রহায়ণ। আজি প্রাতে উমেশ বাবু চলিয়া গেলেন। তিনি বলুন আর নাই বলুন, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, লীলার সহিত সাক্ষাতে তিনি দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছেন। আমার ভয় হইল, বুঝি বা লীলা সমস্ত রহস্য ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এই ভাবনা এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, আমি রাজার সহিত বেড়াইতে না গিয়া, লীলার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম।

দেখিলাম লীলা নিতান্ত অস্থির ভাবে ঘরের মধ্যে বেড়াইতেছে। আমাকে দেখিবা মাত্র লীলা আমার নিকটস্থ হইয়া বলিল,—

"আমি তোমাকেই মনে করিতেছিলাম। বইস দিদি, যাহা হয় একটা স্থির কর,—আমিতো এরূপে আর থাকিতে পারি না।"

তাহার কণ্ঠস্বর তাহার হৃদয়ের দৃঢ়তার পরিচয় দিল। আমি তাহার নিকটে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহার হস্ত হইতে দেবেন্দ্র বাবুর সেই পুস্তক খানি গ্রহণ করিলাম এবং তাহার অজ্ঞাতসারে তাহা তাহার চক্ষুগোচর স্থানে রক্ষা করিলাম। তাহার পর বলিলাম,—"বল দিদি, তোমার কি অভিপ্রায়? উমেশ বাবু কি তোমাকে কোন উপদেশ দিয়াছিলেন?"

লীলা মস্তকান্দোলন করিয়া বলিল,—"যে বিষয় আমি এক্ষণে ভাবিতেছি, সে সম্বন্ধে তিনি কোনই উপদেশ দেন নাই। তিনি আমার প্রতি নিতান্ত স্নেহময় ব্যবহার করিয়াছিলেন, আমি কিন্তু কাঁদিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলাম। যাহা হউক, দিদি, এমন করিয়া তো আর চলে না। হৃদয়কে বলবান্ করিয়া, এ বিষয়ের যাহা হয় মীমাংসা করিতে হইতেছে।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"বর্ত্তমান বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেওয়া কি তোমার অভিপ্রায়?"

লীলা উত্তর দিল,—"না দিদি, আমি সত্য কথা ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছি।"

এই বলিয়া সে উভয় হস্তে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং আমার স্কন্ধে স্বীয় মস্তক রক্ষা করিল। সম্মুখের দেওয়ালে তাহার পিতৃ-প্রতি-মূর্ত্তি বিলম্বিত ছিল, সে তাহাতে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বলিল,—"বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেওয়া আমার অসাধ্য। আমি দুর্ভাগিনী। আমার যতই কেন যন্ত্রণা হউক না, আমি কখনই পিতার অন্তিম আদেশ এবং আমার প্রতিজ্ঞা অন্যথা করিয়া জীবনকে চিরদিনের মত অনুতপ্ত ও দুঃখ-ভারগ্রস্ত করিব না, ইহা স্থির।

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"তবে তোমার অভিপ্রায় কি?"

লীলা উত্তর দিল,—"আমি রাজাকে নিজ মুখে সত্য কথা জানাইতে চাহি। সমস্ত কথা জানিয়া, আমি প্রার্থনা না করিলেও যদি তিনি আপনিই বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিতে স্বীকার হন উত্তম!"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,-"লীলা তুমি রাজাকে বলিবে কি?"

লীলা বলিল,—"আমি তাঁহাকে বলিতে চাহি যে, যদি অন্য এক—যদি অন্য এক—নূতন অনুরাগ আমার হৃদয় অধিকার না করিত, তাহা হইলে পিতৃ-দেবের আদেশ ক্রমে ও আমার সম্মতিতে যে বিষয় এত দিন স্থির হইয়াছিল, আমি তাহা সন্তুষ্ট চিত্তে পালন করিতে পারিতাম।"

আমি বলিলাম,—"না লীলা, এ নিগূঢ় কথা ব্যক্ত করিয়া তাঁহার নিকট কদাচ তোমাকে আমি হীন হইতে দিব না।"

লীলা বলিল,—"যাহা জানিতে তাঁহার অধিকার আছে, সেই কথা গোপন করিয়া অন্য কল্পিত বাক্যের সাহায্যে সত্য-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিলে, আমাকে প্রকৃত প্রস্তাবে ইহত্র ও পরত্র হীন হইতে হইবে।"

"তোমার হৃদয়ের কথা জানিতে তাঁহার কোনই অধিকার নাই।"

"অন্যায়—দিদি—অন্যায় কথা বলিতেছ। কাহারও সহিত আমি প্রতারণা করিতে চাহি না। বিশেষতঃ পিতৃদেব যাঁহাকে বরণ করিতে বলিয়াছেন এবং আমি স্বয়ংও যাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ করিতে স্বীকার করিয়াছি, তাঁহার নিকটে আমি কখনই প্রতারণা করিব না।"

তাহার পর আবার আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিল,—"দিদি, তোমার নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর, আমার যুক্তি ন্যায়-সঙ্গত কি না? তুমি যদি আমার অবস্থায় পড়িতে, তাহা হইলে কি হইত? রাজা আমার অভিপ্রায়ের যেরূপ ইচ্ছা অর্থ গ্রহণ করুন, তথাপি আমি কখন, মনে মনেও, তাঁহার নিকট অবিশ্বাসী থাকিব না।"

আমি জানিতাম আমার চিত্ত অনেকটা পুরুষের ন্যায় কঠিন এবং সঙ্কোচ-বিরহিত। আজি দেখিলাম আমি সঙ্কোচে পরিপূর্ণ, আর কোমলতাময়ী লীলার হৃদয় আজি সম্ভবাতীত স্থির ও দৃঢ়। আমি লীলার সেই বিশুষ্ক হতাশ বদনের প্রতি নেত্রপাত করিলাম। সেই প্রেমময় চক্ষে তাহার হৃদয়ের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা স্পষ্টই প্রতিভাত হইতে লাগিল। যে সকল সতর্কতাপূর্ণ অসার আপত্তি আমার রসনায় উদিত হইতেছিল, তাহা কোথায় বিলীন হইয়া গেল। আমি নীরবে মস্তক বিনত করিলাম।

লীলা আমার নিস্তব্ধতা বিরক্তি-সূচক মনে করিয়া বলিল,—"দিদি আমার উপর রাগ করিও না।"

আমি, কথায় কোন উত্তর না দিয়া, উভয় হস্তে লীলাকে বেষ্টন করিয়া ধরিলাম; কথা কহিলে পাছে কাঁদিয়া ফেলি ভয়ে, কথা কহিলাম না। পুরুষের ন্যায় আমারও সহজে রোদন আইসে না। কিন্তু আজি কান্না আটকান কঠিন বোধ হইতে লাগিল।

লীলা অঙ্গুলিতে আমার মাথার চুল জড়াইতে জড়াইতে বলিতে লাগিল,—"দিদি, এই কথা আমি অনেক দিন হইতে ভাবিতেছি। প্রগাঢ় রূপে এই বিষয় বিচার করিতেছি। যখন আমার বিবেক আমার যুক্তিকে সত্য বলিতেছে, তখন ইহা ব্যক্ত করিতে আমার সাহসের অভাব হইবে না। দিদি, কালি আমি তাঁহাকে, তোমার সমক্ষে, সমস্ত কথা জানাইব। যাহা অন্যায়, যাহাতে তোমাকে কি আমাকে লজ্জিত হইতে হয়, এমন কোন কথাই আমার মুখ হইতে বাহির হইবে না। যাহা হউক, ইহাতে এই ঘৃণিত গোপন চেষ্টার শেষ হইবে, সুতরাং হৃদয় শান্তি-লাভ করিবে। স্থির করিয়াছি তাঁহাকে সমস্ত কথা সরল ভাবে বলিব; তাহার পর, সমস্ত বিষয় শুনিয়া আমার সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবহার করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইবে, তিনি সেইরূপ করিবেন।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, লীলা আমার বক্ষে মস্তক স্থাপন করিল। এ যুক্তির শেষ কি দাঁড়াইবে তাহার চিন্তায় আমার মন বড় ব্যাকুল হইল; তথাপি লীলাকে তাহার ইচ্ছানুযায়ী সঙ্কল্প-সাধনে বাধা দিতে ইচ্ছা হইল না। অতঃপর আমরা উভয়েই এ প্রসঙ্গের আলোচনা পরিত্যাগ করিলাম। কিয়ৎকাল পরে আমি প্রস্থান করিলাম।

বৈকালে লীলা বাগানে বেড়াইতে আসিল। আমি তখন বাগানে পুষ্করিণী-তীরে দাঁড়াইয়া রাজার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম। লীলাকে দর্শনমাত্র আমরা উভয়েই সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। লীলা প্রাতে যে সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহা এখনও অবিচলিত আছে কি না, মনে মনে আমি তাহাই ভাবিতেছিলাম। অন্য নানা কথার পর, বিদায়ের সময়ে, লীলা রাজাকে জানাইল যে, কালি প্রাতে রাজাকে সে কোন বিশেষ কথা বলিতে ইচ্ছা করে। আমি বুঝিলাম, লীলার সঙ্কল্প এখনও স্থির রহিয়াছে। লীলার কথা শুনিয়া রাজার মুখের ভাবান্তর জন্মিল। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, কল্য প্রাতের সংবাদের

উপর, তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত ব্যবস্থা নির্ভর করিতেছে।

রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে আমি লীলার শয্যায় গমন করিলাম। দেখিলাম, শিশুকালে লীলা যেমন বালিশের নীচে প্রিয় ক্রীড়া-সামগ্রী সকল লুকাইয়া রাখিত, অদ্যও সেইরূপে মাথার বালিশের নীচে, দেবেন্দ্র বাবুর হস্ত-লিখিত পুস্তকখানি অর্দ্ধ লুক্কায়িত ভাবে রাখিয়া দিয়াছে। আমি বলিবার কোন কথা পাইলাম না; কেবল পুস্তকখানির দিকে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া মস্তকান্দোলন করিলাম। লীলা উভয় হস্তে আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল,—"দিদি, এক রাত্রি—আর এক রাত্রি মাত্র উহা ঐরূপে থাকিতে দেও। কালি—হয়ত এমন ঘটনা ঘটিবে যে, চিরজীবনের জন্য উহার সহিত আমার সম্পর্ক শেষ হইয়া যাইবে।"

পরদিন প্রাতের প্রথম ঘটনা বিশেষ সন্তোষজনক নহে। দেবেন্দ্র বাবুর নিকট হইতে আমার নামে এক পত্র আসিয়া পৌঁছিল। রাজা মুক্তকেশীর নামহীন পত্র সম্বন্ধে যেরূপে আত্ম-চরিত্রের সততা সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়া আমি পূর্ব্বে দেবেন্দ্র বাবুকে এক পত্র লিখিয়াছিলাম। অদ্য দেবেন্দ্র বাবুর যে পত্র পাইলাম, তাহা আমার সেই পূর্ব্ব পত্রের উত্তর। রাজার চরিত্র সমর্থন সম্বন্ধে দেবেন্দ্র বাবু অতি সামান্যই উল্লেখ করিয়াছেন এবং স্বীয় হীনাবস্থায় তাদৃশ উচ্চ ব্যক্তির চরিত্র আলোচনা, অনধিকার চেষ্টা বলিয়া সংক্ষেপে প্রসঙ্গ শেষ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার হৃদয় কেমন উদাস হইয়া গিয়াছে এবং কোন বিষয়-কর্ম্মেই তিনি মনঃ-সংযোগ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। নূতন ব্যক্তিবর্গের মধ্যগত হইলে হয়ত চিত্ত অপেক্ষা-কৃত প্রশান্ত হইতে পারে মনে করিয়া, তিনি আমাকে সানুনয়ে অনুরোধ করিয়াছেন যে, আমার চেষ্টায় পশ্চিমাঞ্চলে যদি তাঁহার কোন কর্ম্ম হয়, তাহা হইলে তিনি নিতান্ত অনুগৃহীত হইবেন। তাঁহার পত্রের শেষাংশ পাঠ করিয়া আমি ভীত হইলাম এবং তাঁহার অনুরোধানু-যায়ী চেষ্টা করিতে সংকল্প করিলাম। তিনি আর মুক্তকেশীকে দেখিতে, অথবা তাহার কোন সংবাদ শুনিতেও পান নাই। এই সংবাদ লিখিয়াই, নিতান্ত সন্দেহজনক ভাবে লিখিয়াছেন যে, কলিকাতায় ফিরিয়া আসা অবধি, অপরিচিত লোক অনবরত তাঁহার অনুসরণ করিতেছে এবং কদাচ তাঁহাকে চক্ষু ছাড়া হইতে দিতেছে না। এই বিষম সন্দেহ-জনক ব্যবহারের মূল কে তাহা নির্দ্দেশ করিতে তিনি অক্ষম; তথাপি দিবারাত্রির মধ্যে এ সন্দেহের কদাচ বিরাম নাই। এই সংবাদ যথার্থই আমাকে শঙ্কাকুল করিল। হয়ত নিরন্তর লীলার চিন্তায়, তাঁহার এই মনোবিকার জন্মিয়া থাকিবে। সঙ্গী এবং দৃশ্য পরিবর্ত্তনে তাঁহার বিশিষ্ট উপকার হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস হইল এবং সেই দিনই আমি আমার পিতৃদেবের কোন কোন পরিচিত বন্ধুকে, দেবেন্দ্র বাবুর জন্য, বিশেষ আগ্রহ সহকারে পত্র লিখিয়া, অনুরোধ করিব স্থির করিলাম।

এই সময়েই রাজাকে লীলা সমস্ত কথা জানাইবে স্থির ছিল। রাজা সংবাদ পাঠাই-লেন যে, অদ্য মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে লীলাবতী ও মনোরমা দেবীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করি-বার সুবিধা হইবে না।

মধ্যাহ্ন কালে, যখন লীলা ও আমি রাজার অপেক্ষায় বসিয়া আছি, তখন আমি লীলার মনের ভাব বুঝিবার জন্য, বার বার তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। লীলা আমার মনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিল,

—"দিদি, আমার জন্ত ভয় করিওনা। উমেশ বাবুর ন্যায় প্রাচীন বন্ধু, অথবা তোমার ন্যায় স্নেহময়ী ভগ্নীর সহিত কথোপকথন কালে আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভুলিয়া যাইতে পারি ; কিন্তু রাজা প্রমোদরঞ্জনের সমীপে সেরূপ ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা নাই।"

লীলার কথা আমি বিস্ময় সহকারে শ্রবণ করিলাম। তাহার হৃদয়ের যে এত বল, তাহা এত দিন একত্রাবস্থান, এত অভেদাত্মা আত্মীয়তা সত্ত্বেও আমি জানিতে পারি নাই। অধুনা প্রেম ও অন্তর্যাতনা লীলার সেই প্রচ্ছন্ন শক্তিকে পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছে।

ঠিক মধ্যাহ্ন কালে রাজা সমাগত হইলেন। তাঁহার বদনের নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাব। লীলা ও আমি নিকটস্থ হইয়া বসিলাম এবং রাজা সম্মুখস্থ টেবিলের পার্শ্বস্থ চেয়ারে উপবেশন করিলেন। লীলা এবং রাজা এতদুভয়ের মধ্যে রাজাকেই অধিকতর উৎকণ্ঠিত ও বিবর্ণ বলিয়া আমার বোধ হইল। সতত তিনি যেরূপ ভাব দেখাইয়া থাকেন, তদ্রূপ সরল ভাব বজায় রাখিবার নিমিত্ত তিনি প্রথমেই কয়েকটী অনাবশ্যক কথা কহিলেন। তাঁহার স্বরের বিকৃত ভাব এবং নয়নের অস্থির ভাব, স্পষ্টতঃ অনুভূত হইতে লাগিল। তিনি নিজেও আপনার অপ্রতিভ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, এমত নহে।

রাজার বাক্য সমাপ্ত হইলে, তথায় ঘোর নীরবতা উপস্থিত হইল। তাহার পর লীলা, বলিতে আরম্ভ করিল,—"রাজা আমাদের উভয়ের পক্ষেই বিশেষ প্রয়োজনীয় কোন কথা আপনাকে জানাইতে বাসনা করিয়াছি। আমার সহায়তার নিমিত্ত এ স্থলে আমার ভগ্নীরও উপস্থিত থাকা আবশ্যক। আমি এখন যাহা ব্যক্ত করিব তাহার এক বর্ণও আমার ভগ্নী আমাকে বলিয়া দেন নাই জানিবেন। আমি যাহা বলিতেছি তাহা কেবল মাত্র আমার আত্ম-চিন্তার ফল। প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিবার পূর্ব্বে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া এ সকল কথা বুঝিয়া রাখেন, ইহাই আমার উদ্দেশ্য।"

রাজা প্রমোদরঞ্জন সম্মতি-সূচক মস্তকান্দোলন করিলেন। লীলা আবার বলিতে লাগিল,—"আমি দিদির মুখে শুনিয়াছি, আমাদের সম্ভাবিত বিবাহ-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার নিমিত্ত, আমাকে আপনার নিকট কেবল প্রার্থনা করিলেই হইবে। রাজা, আপনার এই কথা বস্তুতই আপনার মহৎ মন ও উদার স্বভাবের পরিচায়ক। কিন্তু আমি সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, সহসা তাদৃশ প্রার্থনা করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই।"

রাজার বদন-মণ্ডলে একটু চিন্তা-মুক্তির চিহ্ন বুঝা গেল, লীলা আবার বলিতে লাগিল, "আমার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে আপনি যে আমার পিতৃদেবের সম্মতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা আমি বিস্মৃত হই নাই। আপনার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান কালে আমি যাহা বলিয়াছিলাম, বোধ হয়, আপনিও তাহা বিস্মৃত হন নাই। আমি বলিয়াছিলাম যে, আমার পিতার আজ্ঞা ও উপদেশ-বশবর্ত্তী হইয়াই আমি উপস্থিত প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইতেছি। পিতাকে আমি দেবতা জ্ঞান করিতাম। পিতা এক্ষণে নাই, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি আমার হৃদয়ে পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, আমার শুভাশুভ তিনি বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত ছিলেন এবং যাহাতে তাঁহার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহাতেই আমারও ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত।"

লীলার স্বর একটু বিকম্পিত হইল। আবার উভয়েই নীরব। কিয়ৎকাল পরে রাজা বলিলেন,—"দেবি, যে বিশ্বাস আমি এত-দিন সগৌরবে অধিকার করিয়া আসিতেছি, অধুনা আমি কি তাদৃশ অনুগ্রহের অযোগ্য হইয়াছি ?"

লীলা উত্তর দিল,—"আপনার চরিত্রে নিন্দার কার্য্য আমি কিছুই দেখি নাই। আপনি এতাবৎকাল আমার সহিত ধীর ও অনুগ্রহ-পূর্ণ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। আপনি সর্ব্ব প্রকারে আমার বিশ্বাসের উপযুক্ত পাত্র। আরও বিশেষ কথা, যে বিশ্বাস হইতে আমার বিশ্বাস সমুৎপন্ন, আপনি আমার পিতৃদেবের সেই বিশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন। আপনি এমন কিছুই করেন নাই, যাহা উপলক্ষ করিয়া আমি আপনার সহিত সম্ভাবিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারি। এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহা আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা। আপনার সদ্ব্যবহার, আমার পিতৃদেবের স্মৃতি, আমার স্বকীয় প্রতিজ্ঞা সকলই আমার পক্ষে বিবাহ-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করার বিরোধী। রাজা বিবাহ-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা সম্পূর্ণরূপে আপনার ইচ্ছাধীন—আমার তাহা আয়ত্ত নহে।"

রাজা। বলিলেন,—"আমার ইচ্ছাধীন ! বিবাহ-সম্বন্ধ আমি কেন বিচ্ছিন্ন করিব ?"

লীলার নিশ্বাস ঘনবেগে বহিতে লাগিল। তিনি উত্তর দিলেন,—"কেন তাহা ব্যক্ত করা বড় কঠিন ? রাজা ইতিমধ্যে আমার হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেই গুরুতর পরিবর্ত্তন হেতু, আপনার এবং আমার উভয়েরই পক্ষে সম্ভাবিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ।"

রাজার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি টেবিলে হস্তস্থাপন করিয়া অবনত বদনে ক্ষুব্ধ স্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি পরিবর্ত্তন ?"

লীলা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কম্পিত স্বরে বলিল,—"আমি শিক্ষা পাইয়াছি এবং আমি বিশ্বাস করি, নারী-হৃদয়ে স্বামীর প্রতি অবিচলিত প্রেম থাকা আবশ্যক। যখন এই সম্বন্ধের সূত্রপাত হয়, তখন আমার প্রেমের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা ছিল; আমাকে ক্ষমা করিবেন, অধুনা আমার সে অবস্থা নাই।"

লীলার চক্ষু জল-ভারাকুল হইল। রাজা উভয় হস্তে স্বীয় বদন আবরণ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে তৎকালে দুঃখ বা ক্রোধ কোন্ ভাবের উদয় হইল তাহা কে বলিবে ? তাঁহার মনের ভাব না বুঝিয়া ছাড়িব না স্থির করিয়া, আমি বলিলাম,—"রাজা, আমার ভগ্নী যাহা বলিবার সমস্তই বলিলেন, এখন আপনি কি বলিবেন বলুন।"

রাজা মুখের হাত না উঠাইয়া বলিলেন,—"মনোরমা দেবি, আমি তো এত কথা শুনিতে চাহি নাই।"

আমি বিহিত উত্তর দিবার উপক্রম করি-তেছি, এমন সময়ে লীলা বলিল,—"আপনি স্থির জানিবেন যে, আমি কোন স্বার্থ সাধনো-দেশে এত কথা বলি নাই। রাজা, আপনি আমার হৃদয়ের কথা জানিতে পারিয়াছেন; অতঃপর যদি আপনি আমার সহিত বিবাহ-কল্পনা পরিত্যাগ করেন—জানিবেন, তাহার পর আমি আর কোন ব্যক্তির সহধর্ম্মিণী হইব না; যাবজ্জীবন আমি কুমারী রহিব ইহা স্থির। আপনার সমীপে আমি মনে মনে অপরাধিনী হইয়াছি। মনের সীমা অতিক্রম করিয়া আমার অপরাধ এক পদও অগ্রসর হয় নাই।"

লীলা ক্ষণেক, স্থির হইয়া আবার বলিতে লাগিল,—"আপনার সমক্ষে প্রকারান্তরে স্নে

ব্যক্তির প্রসঙ্গ এই প্রথম ও এই শেষ উল্লেখ করা যাইতেছে. তাঁহার সহিত আমার, অথবা আমার সহিত তাঁহার এতৎসংক্রান্ত কোনই মনের কথা চলে নাই—কখন তাদৃশ কথা চলিবারও সম্ভাবনা নাই—ইহজগতে তাঁহার সহিত আমার পুনঃ সাক্ষাতের কোনই সুযোগ নাই। আমি অদ্য যাহা বলিতেছি তাহা সম্পূর্ণ সত্যমূলক, ইহা আপনি স্থির জানিবেন। আমার বাগ্‌দত্ত স্বামীর এই সকল আভ্যন্তরিক রহস্য জানিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে বলিয়া আমি বিবেচনা করি। তিনি নিজ ঔদারতা গুণে আমাকে ক্ষমা করিবেন এবং এই রহস্য প্রচ্ছন্ন রাখিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

রাজা বলিলেন,—"দেবীর বাসনানুযায়ী কার্য্য করিতে আমি সম্পূর্ণ বাধ্য।"

রাজা, আরও কথা শুনিবার নিমিত্ত, নীরবে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

লীলা বলিল,—"আমার যাহা বলিতে বাসনা ছিল, তাহা বলা হইয়াছে। যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই আপনার পক্ষে বিবাহ-সম্বন্ধ ভঙ্গ করা সম্বন্ধে যথেষ্ট কারণ।"

রাজা বলিল, —"সুন্দরি, আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিবাহ-সম্বন্ধ স্থায়ী করার পক্ষেই যথেষ্ট কারণ।"

এই বলিয়া তিনি আসন ত্যাগ করিলেন এবং লীলার দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আসিলেন।

লীলা চমকিয়া উঠিল এবং তাহার অজ্ঞাতসারে, একটা অনুচ্চ বিস্ময়-সূচক শব্দ মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার সরল ও উচ্চ হৃদয় আজি তাহাকে বিপন্ন করিল। আজি সে যত কথা বলিল, তাহাতে তাহার স্বভাবের পবিত্রতা ও সততা স্পষ্টই প্রকাশিত হইয়া পড়িল। রাজা সেই মহোচ্চ মনের মহোচ্চ ভাব সম্পূর্ণই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলেন, ইহা অসম্ভব নহে। তিনি বলিলেন, —"দেবি, আপনার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। অতঃপর বিবাহের আশা পরিত্যাগ করা না করা আমার ইচ্ছাধীন। কিন্তু সুন্দরি, আমি এতাদৃশ হৃদয়-হীন নহি যে, এখনই যে ভুবন-মোহিনীর হৃদয়-ভাব জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে নারী-জাতির অলঙ্কার বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, তাঁহাকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিব।"

লীলা অবনত বদন উত্তোলন করিয়া বলিল,—"না—না। সে যখন বিবাহ-হেতু আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিবে, অথচ হৃদয়ের ভালবাসা দিতে পারিবে না, তখন নিশ্চয়ই সে নারী-জাতির মধ্যে যার পর নাই অভাগিনী।"

রাজা বলিলেন,—"সেই প্রেম-রত্ন লাভ করাই যদি তাঁহার স্বামীর একমাত্র যত্ন হয়, তাহা হইলে এখনই না হউক, দশ দিন পরেও কি তিনি আপনার স্বামীকে সেই দুর্লভ সম্পত্তি কিয়ৎপরিমাণেও দান করিতে পারিবেন না?"

লীলা বলিল,—"কখনই না। যদি এখনও আপনি বিবাহের নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে স্থির জানিবেন, আমি আপনার বিশ্বস্তা ধর্ম্ম-পত্নী হইতে পারিব, কিন্তু আপনার প্রেমময়ী প্রণয়িনী আমি কখনই হইব না।"

সতেজে, দর্পিত ভাবে, লীলা এই কথা কয়টি বলিল। উৎসাহ হেতু তাহার স্বভাব সুকুমার কান্তি অধুনা পরম রমণীয় ভাব ধারণ করিল। সে পরম রমণীয় বদন-শ্রী দেখিয়া চিত্ত স্থির রাখিতে পারে এমন পুরুষ কে আছে?

রাজা বলিলেন,—"সুন্দরি, আমি আপনার বিশ্বাস ও ধর্ম্ম সম্ভোগ করিয়াই পরম পরিতৃপ্ত হইব। অন্য কোন কামিনীর নিকট হইতে তাহার পূর্ণ হৃদয়ের পূর্ণ প্রেম লাভ করা

অপেক্ষা, আপনার নিকট হইতে কণিকা মাত্র লাভ করাও, পরম ভাগ্যের কথা বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।”

লীলা সংজ্ঞাহীনের ন্যায় অধোবদনে বসিয়া রহিল। বাক্য সমাপ্তির পর, রাজা ধীরে ধীরে গৃহত্যাগ করিলেন। লীলার ভাব দেখিয়া তখন কোন কথা কহিতে আমার সাহস হইল না। আমি বাহু দ্বারা সেই দুঃখিনী মর্ম্ম-পীড়িতা বালিকাকে বেষ্টন করিয়া ধরিলাম। কতক্ষণ এইরূপেই রহিলাম। এ অবস্থা নিতান্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। তখন আমি ধীরে ধীরে লীলাকে সম্বোধন করিলাম; আমার কণ্ঠ-স্বর শুনিয়া লীলার সংজ্ঞা জন্মিল এবং সে যেন চমকিয়া উঠিল। ব্যস্ততা সহ দাঁড়াইয়া বলিল,—“দিদি! যাহা ঘটিবে, যথাসম্ভব যত্নে তাহার জন্য হৃদয়কে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। আমার জীবনের আগত-প্রায় পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত, আমাকে অনেক কঠোর কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে এবং অদ্যই তাহার একতম আরব্ধ হইবে।”

কথা—সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের উপর হস্তাক্ষর লিখিত যে যে পুস্তক পড়িয়াছিল, লীলা তৎসমস্ত সংগ্রহ করিয়া একটী পেটিকা-মধ্যে রক্ষা করিল এবং তাহার চাবি বন্ধ করিয়া, চাবিটা আমার হস্তে প্রদান করিয়া বলিল,—“যে কিছু দেখিলে তাঁহাকে মনে পড়ে, তৎসমস্তই আমি পরিত্যাগ করিব। যেখানে ইচ্ছা তুমি এই চাবি রাখিয়া দিও, আমি আর কখন ইহা চাহিব না।”

আমি কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, লীলা আলমারি হইতে দেবেন্দ্র বাবুর হস্ত-লিখিত একখানি অতি চমৎকার খাতা বাহির করিল। তাহার পর ধীরে ধীরে সেই খাতাখানি চুম্বন করিল। আমি তখন বিষণ্ণ ও কাতর স্বরে বলিলাম,—“লীলা, লীলা!”

লীলা নিতান্ত বিনীত ভাবে বলিল,—“দিদি, এই শেষ—এই স্মৃতি-চিহ্নের সহিত আজ হইতে আমার চির-বিচ্ছেদ।”

টেবিলের উপর খাতাখানি স্থাপন করিয়া, লীলা স্বীয় ঘন-কৃষ্ণ সুদীর্ঘ কেশরাজি উন্মুক্ত করিয়া দিল। সুচিক্কণ কেশমালা বিশৃঙ্খল ভাবে চারিদিকে পড়িয়া অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিল। তাহার পর লীলা সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ একগাছি কেশ বাছিয়া লইল এবং সযত্নে তাহা চ্ছেদন করিয়া, খাতার প্রথম পত্রে, গোল করিয়া, আল্‌পিন দ্বারা আঁটিয়া দিল। তাহার পর, অবিলম্বে সেই খাতা বন্ধ করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিয়া বলিল,—“দিদি, তুমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া থাক এবং তিনিও তোমাকে পত্র লিখিয়া থাকেন! আমি যত দিন জীবিত থাকিব, ততদিনের মধ্যে যদি কখন তিনি তোমাকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে লিখিও, যে আমি ভাল আছি; আমার দুঃখের কথা কখন তাঁহাকে লিখিও না। আমার জন্য—দিদি, আমার জন্য কখন তাঁহাকে ভাবনাগ্রস্ত করিও না। যদি অগ্রে আমার মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে আমার কেশ-সংযুক্ত এই খাতাখানি তাঁহাকে প্রদান করিও। ইহ-জগতে যখন আর আমি থাকিব না, তখন এই কেশ যে আমি স্বহস্তে এই পুস্তকে সংলগ্ন করিয়াছি, এ কথা তাঁহাকে বলিলে কোন দোষ হইবে না। আর দিদি, ইহজীবনে যে কথা আমি তাঁহাকে নিজ মুখে কখন জানাইতে পারি নাই, সে কথা তখন তাঁহাকে তুমি জানাইও। বলিও দিদি, আমার একান্ত অনু-রোধ, তখন তাঁহাকে বলিও, দিদি, যে, আমি

তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ হইতে ভাল বাসিতাম।”

নিতান্ত যন্ত্রণাগ্রস্ত রোগীর ন্যায় লীলা শয্যায় পড়িয়া গেল এবং উভয় হস্তে বদনাবৃত করিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার দেহ কাঁপিতে লাগিল, শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন বহিতে লাগিল। আমি তাহাকে শান্ত করিবার জন্য নানা প্রকার নিষ্ফল চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে বালিকার একটু নিদ্রা আসিল। আমি সেই অবসরে, খাতাখানি নিদ্রাভঙ্গের পর তাহার চক্ষে না পড়ে এমন করিয়া লুকাইয়া রাখিলাম। শীঘ্রই লীলার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। রাজার কথা অথবা দেবেন্দ্র বাবুর কথা সে দিন আর উল্লেখ করা হইল না।

১০ই। প্রাতে লীলাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া আমি এই ক্লেশ-প্রদ বিষয়ের পুনরায় অবতারণা করিলাম। আমি বলিলাম, রায় মহাশয়কে আমি জোর করিয়া ও স্পষ্ট করিয়া সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলি। আমার কথা শেষ হইতে না হইতে, লীলা বলিল,—“না দিদি, তাহাতে কাজ নাই। গত কল্য বুঝিবার ও বুঝাইবার সময় ছিল। এখন আর কোন মতেই পশ্চাৎ-পদ হওয়া হইবে না।”

বৈকালে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। অতি সাবধানে ও সতর্কভাবে তাঁহার সহিত কথা-বার্ত্তা কহিলাম। বুঝিলাম, লীলার পাণি-গ্রহণ লালসা তিনি কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। লীলা রাজার হস্তে আত্ম-সমর্পণ না করিয়া, যদি স্বয়ং জোর করিয়া আত্ম-অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিত, তাহা হইলে শুভ ফল ফলিত। কিন্তু তাহা লীলা পারে নাই—পারিবেও না। কাজেই রাজা হাতে পাইয়া বাসনা-সিদ্ধি না করিবেন কেন? আমার মনের যে অসহ্য জ্বালা তাহা রাজার সমক্ষে ব্যক্ত করিতে পারিলাম না।

রাত্রে, দেবেন্দ্র বাবুর কর্ম্মের নিমিত্ত, দুই খানি অনুরোধ পত্র দুই স্থানে লিখিয়া পাঠাইলাম। যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহার পর দেবেন্দ্র বাবুর ব্যবহার দেখিয়া, তাঁহার উপর আমার যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইয়াছে। দেবেন্দ্রবাবুর হিত চেষ্টা করিতে আমার মন নিতান্ত ব্যাকুল। আমার চেষ্টায় তাঁহার ভাল হইলে, পরম সুখী হইব।

১১ই। রাজা প্রমোদরঞ্জন রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। রায় মহাশয়ের নিকট হইতে আমারও তলব আসিয়াছে। আমি রায় মহাশয়ের প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া বুঝিলাম, এত দিনে ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে জানিয়া, তিনি বড়ই নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। এতক্ষণ আমি চুপ করিয়াই ছিলাম। তাহার পর যখন তিনি, রাজার কথানুসারে শীঘ্রই বিবাহের দিনটাও স্থির করিতে আদেশ করিলেন, তখন আমার বড় রাগ হইল এবং আমি বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলিলাম যে, লীলার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কখনই কোন বিষয় স্থির করা হইবে না! রাজা তৎক্ষণাৎ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। রায় মহাশয় নয়ন মুদিয়া শয়ন করিলেন। বলিলেন,—“বাপ্‌রে! এত কি মানুষে সহিতে পারে? ভাল ভাল, যাহা ভাল হয়, সকলে মিলিয়া বিবেচনা করিয়া কর।”

আমি বলিলাম,—“লীলা স্বয়ং এ প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিলে, আমি তাহাকে কোন কথাই বলিব না।”

রাজার মুখে বিষাদ-চিহ্ন দেখিলাম। রায় মহাশয় শুইয়া শুইয়া মাথা দুলাইতে লাগিলেন। আমি প্রস্থান করিলাম। গমন-কালে

রায় মহাশয় বলিলেন,—"সাবধান মনোরমা, যেন ঝনাৎ করিয়া দরজা ঠেলিও না।"

লীলার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। রায় মহাশয় যে আমাকে ডাকিয়াছিলেন, তাহা লীলা জানিতে পারিয়াছিল। আমাকে দেখিবা-মাত্র, কেন আমাকে রায় মহাশয় ডাকিয়াছিলেন, তাহা লীলা জিজ্ঞাসা করিল। আমি তাহাকে সমস্ত কথা জানাইলাম এবং আমার মনের যে ভাব তাহাও ব্যক্ত করিলাম। লীলার উত্তর শুনিয়া, আমি বিরক্ত ও অবাক্ হইলাম। যাহা স্বপ্নেও মনে করি নাই, লীলা তাহাই ব্যবস্থা করিল। লীলা বলিল,—"দিদি খুড়া মহাশয় ঠিক বলিয়াছেন। আমি তোমাকে এবং সম্পর্কীয় সমস্ত লোককেই অনেক জ্বালাতন করিয়াছি। আর জ্বালাতন করিয়া কাজ নাই। রাজা যাহা স্থির করিবেন তাহাই হউক।"

আমি বিশেষ আপত্তি করিলাম। কিন্তু কোন ফল হইল না; লীলা আত্মত্যাগ করিয়াছে—তাহার স্বাধীন ইচ্ছা সে বিসর্জ্জন করিয়াছে। সে বলিল,—"দিন পিছাইয়া দিলেই কি অশুভ কিছু কম হইবে দিদি? তবে কেন? আমার জীবন আমি বিসর্জ্জন দিয়াছি। কোন ব্যবস্থাতেই আমার আর ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই।"

তাহাকে এরূপ আশা-শূন্য, এরূপ ভগ্ন-মনোরথ এবং উৎসাহহীন দেখিয়া আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

১২ই। প্রাতে রাজা আমাকে, লীলার সম্বন্ধে, কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কাজেই তাঁহাকে সমস্ত কথা জানাইতে হইল। আমরা যখন কথা-বার্ত্তা কহিতেছি, সেই সময় লীলা তথায় আগমন করিল। বিবাহের দিন স্থির করিবার কথা উঠিলে, লীলা বলিল যে, এ সম্বন্ধে রাজার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাতেই সম্মত। রাজা দয়া করিয়া নিজের ইচ্ছা মনোরমা দিদিকে জানাইবেন। এই কথা বলিয়া, লীলা সে প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করিল, সুতরাং রাজারই জয় হইল। বর্ত্তমান বর্ষ মধ্যেই বিবাহ হওয়া রাজার অভিপ্রায়। রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কহিতে আমার কোনই অধিকার নাই। সেই দিন বৈকালের গাড়ীতে রাজা, বিবাহের উদ্যোগ ও আয়োজন করিবার নিমিত্ত, হুগলীর প্রাসাদে যাত্রা করিলেন। বলিব আর কি? আমার প্রাণ জ্বলিয়া যাইতেছে।

১৩ই। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। প্রাতে স্থির করিলাম, স্থানপরিবর্ত্তন করিলে হয়ত বিশেষ উপকার হইতে পারে। হয়ত অন্য স্থানে, নূতন দৃশ্য মধ্যে উপস্থিত হইলে, লীলার বর্ত্তমান মানসিক অবসাদ অনেক কমিয়া যাইতে পারে। বিবেচনা করিলাম বৈদ্যনাথ যাওয়াই ভাল। সেখানে পরিচিত লোকও কয়েকজন আছেন এবং জায়গাও ভাল। আমি বৈদ্যনাথে একজন পরম আত্মীয়ের সমীপে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলাম। পত্র সমাপ্ত হইলে, আমি তাহা যথাস্থানে প্রেরণ করিয়া, লীলাকে সমস্ত কথা জানাইলাম। ভাবিয়াছিলাম বুঝি লীলা ইহাতে আপত্তি করিবে। কোথায় আপত্তি! লীলা আপত্তি ও প্রতিবাদ এককালে ভুলিয়া গিয়াছে। বলিল,—"দিদি, তোমার সঙ্গে আমি সর্ব্বত্র যাইতে পারি। স্থান-পরিবর্ত্তনে নিশ্চয়ই আমার উপকার হইবে; তোমার যুক্তি ভাল।"

১৪ই। উমেশ বাবুর নিকট পত্র লিখিলাম। বিবাহ ঘটিবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তাঁহাকে জানাইলাম। স্থান পরিবর্ত্তনের কথাও লিখিলাম। বিশেষ কথা কিছুই লিখিলাম না।

১৫ই। ডাকে আমার নামে তিন খানি পত্র আসিয়াছে। একখানি বৈদ্যনাথস্থ আত্মীয়ের নিকট হইতে। তাহা আত্মীয়তা ও আনন্দে পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় পত্র, দেবেন্দ্র বাবুর কর্ম্মের জন্য যে দুই ব্যক্তিকে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহারই একজনের নিকট হইতে। তাঁহার যত্নে দেবেন্দ্র বাবুর একটি কর্ম্ম হইয়াছে। তৃতীয় পত্র দেবেন্দ বাবুর নিকট হইতে। তাঁহার জন্য অনুরোধ করায়, তিনি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। কাবুলের যুদ্ধের নিমিত্ত যে সৈন্যদল সজ্জিত হইতেছে, তাঁহাকে তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া, কলিকাতাস্থ কোন দৈনিক সংবাদ পত্রে যুদ্ধের প্রকৃত বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। সুতরাং তাঁহাকে ভারত-ভূমি ত্যাগ করিয়া বিদেশে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। ভয়ানক কর্ম্ম! তাঁহার সঙ্গে ছয় মাসের এগ্রিমেণ্ট হইয়াছে। তিনি যাত্রাকালে আমাকে আবার পত্র লিখিবেন বলিয়াছেন। কে জানে অদৃষ্টে কি আছে? তাঁহার জন্য এ প্রকার কর্ম্মের চেষ্টা করিয়া ভাল করিলাম কি মন্দ করিলাম, তাহা ভগবান্ ভিন্ন আর কে বলিতে পারে?

১৬ই। দ্বারে আসিয়া গাড়ি লাগিল। লীলা এবং আমি, আবশ্যকমত লোকজন সঙ্গে লইয়া, বৈদ্যনাথ যাত্রা করিলাম।

* * * *

দেওঘর (বৈদ্যনাথ)

২৩শে। নূতন স্থানে, পূর্ব্বপরিচিত কয়েকটি আত্মীয়ের সহিত একত্র অবস্থান হেতু, লীলার অনেক উপকার হইল; তথাপি, যত উপকার হইবে আশা করিয়াছিলাম, তত হইল না! আরও এক সপ্তাহ কাল এখানে থাকিব স্থির করিলাম। যত দিন ফিরিয়া যাইবার বিশেষ আবশ্যকতা উপস্থিত না হইবে, ততদিন শক্তিপুরে ফিরিব না সংকল্প করিলাম।

২৪শে। আজিকার ডাকে বড় দুঃখের সংবাদ পাইলাম। গত ২০শে কাবুল-যুদ্ধের লোক জন কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাত্রা করিয়াছে। কাজেই দেবেন্দ্র বাবুও দেশত্যাগ করিয়াছেন। এক জন যথার্থ আত্মীয় ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন হইলাম; এক জন প্রকৃত বন্ধুকে আজি হইতে আমরা কিছু দিনের জন্য হারাইলাম।

২৫শে। অদ্যকার সংবাদ বড় ভয়ানক। রাজা প্রমোদরঞ্জন, কাকা মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছেন এবং রায় মহাশয় লীলাকে ও আমাকে অবিলম্বে বাটী ফিরিবার নিমিত্ত পত্র লিখিয়াছেন। ইহার অর্থ কি? তবে কি আমাদের অনুপস্থিতির মধ্যে বিবাহের দিন-স্থির হইয়া গিয়াছে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—•✱✱—

আনন্দধাম।

আমার আশঙ্কা সত্য। আগামী ২২শে অগ্রহায়ণ বিবাহের দিন-স্থির হইয়াছে। রাজা প্রমোদরঞ্জন, আমরা বাটী হইতে চলিয়া যাওয়ার পর, রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার হুগলিস্থ বাটী মেরামত করিতে হইবে ও অন্যান্য নানা প্রকার প্রয়োজনীয় কার্য্য শেষ

করিতে হইবে। ঠিক্ কোন্ সময়ে বিবাহ ঘটিবে তাহা জানিতে না পারিলে, এ সকল কার্য্যের সুব্যবস্থা হইতে পারে না। এই পত্রের উত্তরে রায় মহাশয় রাজা-কেই বিবাহের দিন-স্থির করিতে অনুরোধ করেন এবং রাজা যে দিন স্থির করিবেন, যাহাতে লীলারও তাহাতেই মত হয়, সে পক্ষে রায় মহাশয়ও চেষ্টা করিবেন বলেন। পত্র প্রাপ্তি-মাত্র রাজা উত্তর লেখেন যে, অগ্রহায়ণের শেষ ভাগে—২২ শেই হউক বা ২৪শেই হউক, বা আর যে কোন দিন পাত্রী ও কন্যা-কর্ত্তা মহাশয় স্থির করিবেন, রাজা তাহা-তেই সম্মত। পাত্রী তো তথায় উপস্থিত নাই। রায় মহাশয় উত্তর লিখিলেন যে, শুভ কর্ম্ম যত শীঘ্র হইয়া যায় ততই মঙ্গল; অগ্রহায়ণের ২২শেই ভাল। রাজার নিকট এই কথা লিখিয়া, রায় মহাশয় আমাদিগকে বাটী ফিরিতে লিখিলেন।

আমরা বাটী ফিরিয়া আসার পর, রায় মহাশয় আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বিবাহের যে দিনস্থির হইয়াছে তাহাতে লীলাকে সম্মত করাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি দেখিলাম তাঁহার সহিত তর্ক করা বৃথা। আমি লীলাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইতে স্বীকৃত হইলাম, কিন্তু কোন ক্রমেই, তাহার ইচ্ছার বিরোধে, তাহাকে উপস্থিত প্রস্তাবে স্বীকৃত করাইতে আমি সম্মত হইলাম না।

অদ্য প্রাতে আমি লীলাকে সমস্ত কথা জানাইলাম। ইদানীং বিবাহ-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে লীলা যেরূপ আত্মত্যাগ-সূচক উদাসীনবৎ ভাব প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিল, আজি সেরূপ করিতে পারিল না। আজি বালিকা, সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া, থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল ও বিবর্ণ হইয়া পড়িল। বলিল,—"না, না—দিদি, এত শীঘ্র যেন না হয়।"

আমি তো তাহাই চাই। তাহার অভি-প্রায় জানিতে না পারায়, কোন কথায় আমি স্বয়ং জোর করিতে পারি না। তাহার একটা ইঙ্গিতই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি তৎক্ষণাৎ রায় মহাশয়ের নিকট যাইবার নিমিত্ত গাত্রো-থান করিলাম। কিন্তু লীলা আমার অঞ্চল চাপিয়া ধরিয়া প্রতিবন্ধক জন্মাইল।

আমি বলিলাম,—"ছাড়িয়া দেও! একি কথা? তোমার কাকা মহাশয় আর রাজা মিলিয়া যাহা স্থির করিবেন তাহাই কি করিতে হইবে? তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া না বলিলে আমার মনের জ্বালা ঘুচিবে না।"

লীলা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"না দিদি, কোন কথায় কাজ নাই—এখন অসময় হইয়া পড়িয়াছে। তুমি আর যাইও না।"

আমি বলিলাম,—"না—একটুও অসময় হয় নাই। দিনস্থিরের ভার আমাদের হস্তেই থাকা আবশ্যক। আমরা এ সম্বন্ধে কাহারও আদেশ শুনিতে বাধ্য নহি।"

এই বলিয়া আমি জোর করিয়া লীলার হস্ত হইতে অঞ্চল ছাড়াইয়া লইলাম। তখন লীলা উভয় হস্তে আমার কটি-বেষ্টন করিয়া বলিল,—"না দিদি,—তাহাতে আরও অনিষ্ট হইবে। তোমার সহিত খুড়া মহাশয়ের বিসংবাদ ঘটিবে এবং হয়ত সেই সংবাদ শুনিয়া রাজা আসিয়া উপস্থিত হইবেন।"

আমি বলিলাম,—"বেশ তো, আসুন না কেন রাজা—সে জন্য তুমি নিজের সব ত্যাগ করিবে কেন? আমাকে যাইতে দেও লীলা। এ জ্বালা অসহ!"

আমার চক্ষে জল আসিল। লীলা বলিল,—

"দিদি, তুমি কাঁদিতেছ? তোমার এত সাহস, এত হৃদয়ের বল, আর আজি তুমি কাঁদিতেছ? কেন দিদি, ব্যাকুল হইতেছ? ভাবিয়া দেখ, তুমি সহস্র প্রতিকূল চেষ্টা করিলেও, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই—কেবল দশ দিন অগ্র পশ্চাৎ মাত্র। তাহাতে কি ক্ষতি? কাকা মহাশয়ের যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক। আমার কষ্টে যদি সকলের কষ্ট বিদূরিত হয়, তবে তাহাই হইতে দাও। বল দিদি, বিবাহের পর তুমি আমাকে ত্যাগ করিবে না—আর আমি কিছু চাহি না।"

আমি অশ্রু সংবরণ করিয়া ধীর ভাবে লীলাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু লীলা আমার কোন যুক্তিই শুনিল না। বিবাহের পরও যে আমি তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিব না, এ সম্বন্ধে সে আমাকে বারংবার প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল। তাহার পর সহসা লীলা আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল, তাহাতে আমার সহানুভূতি ও দুঃখ আর এক নূতন পথে সঞ্চারিত হইল। লীলা জিজ্ঞাসিল,—"দিদি! আমরা যখন দেওঘরে গিয়াছিলাম, তখন তুমি এক খানি পত্র পাইয়াছিলে—"

বালিকা বাক্য শেষ করিতে পারিল না; সহসা সে আমার স্কন্ধে আপনার মুখ লুকাইল। তাহার প্রশ্ন কোন ব্যক্তির উদ্দেশে লক্ষিত তাহা, তাহার ভাব দেখাই, আমি বুঝিতে পারিলাম! ধীরে ধীরে বলিলাম,—"লীলা, আমি মনে করিয়াছিলাম, ইহ জীবনে তোমার আমার মধ্যে তাঁহার প্রসঙ্গ আর কখনই উঠিবে না।"

লীলা তথাপি জিজ্ঞাসিল,—"তুমি তাঁহার পত্র পাইয়াছিলে?"

আমি অগত্যা উত্তর দিলাম,—"হাঁ।"

"তুমি কি পুনরায় তাঁহাকে পত্র লিখিবে?"

কি উত্তর দিব? কোথায় তিনি? তিনি যে আমারই চেষ্টায় সুদূর-প্রদেশে প্রস্থান করিয়াছেন, এ কথা লীলাকে জানাইতে আমার সাহস হইল না। বলিলাম,—"মনে কর আমি তাঁহাকে উত্তর লিখিব।"

লীলার দেহ কাঁপিয়া উঠিল এবং সে সমধিক আগ্রহ সহকারে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল। তাহার পর নিতান্ত অস্ফুট স্বরে বলিল,—"তাঁহাকে আগামী ২২ শের কথা জানাইও না। আর দিদি, আমি তোমাকে অনুনয় করিতেছি, তুমি তাঁহাকে অতঃপর যত পত্র লিখিবে, তাহাতে আমার নামমাত্র ও উল্লেখ করিও না।"

আমি অগত্যা সম্মত হইলাম। ভগবান্ জানেন তখন আমার মনের কি অবস্থা। লীলা আমার নিকট হইতে উঠিয়া, একটা জানালা সন্নিধানে গমন করিয়া আমার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং সেইরূপ অবস্থাতেই বলিল,—"দিদি, তুমি কি এখন কাকা মহাশয়ের ঘরে যাইবে? তাঁহাকে বলিও যে, তাঁহারা যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন, আমি তাহাতেই সম্মত আছি।"

আমি প্রস্থান করিলাম। যদি প্রাকৃতিক নিয়মের উপর আমার বাসনার প্রভুতা থাকিত, তাহা হইলে আমি কাকা মহাশয়কে ও রাজাকে এই দণ্ডেই রসাতলে পাঠাইয়া দিতাম। ক্রোধে ও মনস্তাপে আমার মন জর্জ্জরীভূত। রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার আর ইচ্ছা হইল না। আমি ঘোর শব্দ সহকারে তাঁহার প্রকোষ্ঠ দ্বার খুলিয়া ফেলিলাম এবং সেই স্থান হইতেই চীৎকার করিয়া বলিলাম, ২২ শেতেই রাজি আছে।"

আবার সেইরূপ শব্দ-সহকারে দ্বার বন্ধ

করিলাম। বারংবার এই কঠোর শব্দ শুনিয়া বোধ করি, রায় মহাশয়ের মরণাপন্ন দশা উপস্থিত হইল! তা হউক।

২৮শে। প্রাতে উঠিয়া দেবেন্দ্র বাবুর শেষ পত্র গুলি আর একবার পাঠ করিলাম। লীলার নিকট দেবেন্দ্র বাবুর দেশত্যাগের সংবাদ ব্যক্ত করি নাই। অতএব চিঠিগুলি রাখিয়া কি ফল? এগুলি কেন নষ্ট করি না। কাজ কি রাখিয়া—যদিই ইহা কখন ঘটনাক্রমে অপর কাহারও হস্তে পড়ে। ইহাতে লীলার সম্বন্ধে যেরূপ উল্লেখ আছে, তাহা আর কখন কাহারও চক্ষে পড়া উচিত নহে। এ সকল পত্রে সেই বিষম অপরিজ্ঞেয় আশঙ্কা এবং সন্দেহেরও কথা আছে। সেই দুই জন অপরিচিত লোক নিয়ত দেবেন্দ্র বাবুর অনুসরণ করিতেছে এ কথারও উল্লেখ আছে। যে সময়ে তিনি বিদেশ যাত্রা করেন, সে সময়ে রেলষ্টেশনে, বহুজনতার মধ্যেও সেই অনুসরণকারী ব্যক্তিদ্বয়কে তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার পশ্চাৎ হইতে কোন ব্যক্তি মুক্তকেশীর নাম উচ্চারণ করিয়াছে, এ কথা তিনি স্পষ্টই শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"এ সকল ব্যাপারের অবশ্যই কোন অর্থ আছে এবং এ সকল কাণ্ড হইতে অবশ্যই কোন ফল পাওয়া যাইবে। মুক্তকেশী-সংক্রান্ত রহস্য এখনও প্রচ্ছন্ন। রহিয়াছে। ইহ জীবনে হয়ত সে কখন আর আমার নয়ন-পথবর্ত্তিনী না হইতে পারে। কিন্তু যদি সে কখন আপনার চক্ষে পড়ে, তাহা হইলে মনোরমা দেবি, আপনি সে সুযোগ কদাচ অবহেলা করিবেন না। আমি আন্তরিক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাকে এত কথা বলিতেছি। আপনাকে মিনতি করিতেছি, যাহা আপনাকে বলিতাম তাহা কখনও ভুলিবেন না।" এ সকল তাঁহার নিজ-হস্ত-লিখিত শব্দ। দেবেন্দ্র বাবুর কোন কথাই আমার ভুলিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং আমার হস্তে এ সকল পত্র থাকা না থাকা সমানই কথা। যদি আমার পীড়া হয়—যদি আমি মরিয়া যাই—তাহা হইলে এ পত্রগুলি হস্তান্তরে পড়িতে পারে; তাহাতে অনেক আশঙ্কা—অনেক অনিষ্ট। তবে এ সকল ভস্মীভূত করিয়া ফেলি।

পত্র ভস্ম হইয়া গেল! শেষ বিদায় লিপি ছাই হইয়া গৃহমধ্যে উড়িতে লাগিল। দেবেন্দ্র বাবুর বিষাদময় কাহিনীর কি এই স্থানেই অবসান হইল?

২৯শে। বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। অদ্য কলিকাতা হইতে জহরতওয়ালা নানাবিধ জড়াও অলঙ্কার দেখাইতে আসিয়াছিল। কতকগুলি নূতন গহনা লওয়া হইল বটে, কিন্তু লীলা তাহা দেখিলও না, তজ্জন্য আগ্রহও প্রকাশ করিল না। কিন্তু আজি যদি দেবেন্দ্র বাবু রাজার স্থানীয় হইতেন এবং তাঁহারই সহিত যদি বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া থাকিত, তাহা হইলে লীলা কতই আনন্দে উৎফুল্ল থাকিত এবং বসন-ভূষণের জ না জানি আজি কতই আয়োজন হইত।

৩০শে। প্রতিদিনই আমরা রাজার পত্র পাইতেছি। রাজার শেষ পত্রে জানিলাম, তাঁহার স্বীয় বাস-ভবন এখন মেরামত হইতেছে এবং অন্ততঃ ছয় মাসের পূর্ব্বে, তাহা সম্পন্ন ও ব্যবহারোপযোগী হইবে না। বিবাহের পর, যত দিন ভবন ব্যবহারোপযোগী না হয়, ততদিন রাজা কাজেই লীলাকে লইয়া হয় পশ্চিম-প্রদেশে নানা সুরম্য স্থানে বেড়াইতে যাইবেন, না হয় তো কলিকাতায় কোন বাটী ভাড়া করিয়া অবস্থান করিবেন।

এতদুভয়ের যাহাই হউক, অগত্যা বিবাহের পর কিছুকাল লীলার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটিতেছে। কারণ লীলা সুস্থির হইয়া স্বামী-ভবনে বাস করিতে আরম্ভ না করিলে, তাহার সঙ্গে আমার থাকা ঘটিবে না। দুইটী পরামর্শের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেয়ঃ তৎসম্বন্ধে রাজা আমার মত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি দেখিলাম, যখন কিছুদিনের জন্য লীলার সঙ্গে আমার থাকা হইবে না, তখন তাহার কলিকাতায় থাকার অপেক্ষা পশ্চিমে যাওয়াই ভাল। কারণ তাহাতে তাহার শরীরও ভাল হইবে এবং নানাবিধ মনোরম দৃশ্য সমূহ দেখিয়া, মনেরও প্রফুল্লতা জন্মিবে।

কি ভয়ানক! লীলার বিবাহ—তাহার সহিত বিচ্ছেদ, এ সকলই যেন স্থির হইয়া গিয়াছে! লোকে স্থির নিশ্চিত বিষয়ের যেরূপ ভাবে আলোচনা করে, আমি তেমনই ভাবে এ প্রসঙ্গ লিখিতে বসিয়াছি। কি নিদারুণ চিন্তা! আর এক মাস অতীত হইতে না হইতে লীলা পর হইয়া যাইবে—আমার লীলা রাজার হইবে। মনে বড় যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। কি জানি মনের কেন এ অবস্থা! এ বিবাহের আলোচনা, যেন লীলার মৃত্যুর আলোচনা!

১লা। বড় যাতনার দিন। ভয়-প্রযুক্ত বিবাহের পর পশ্চিম-প্রদেশে পর্য্যটনের প্রসঙ্গ, কল্য রাত্রে, লীলার নিকট ব্যক্ত করিতে পারি নাই—আজি তাহা বলিলাম। আমি তাহার সঙ্গে থাকিব মনে করিয়া, সরলা বালিকা প্রথমে এ প্রস্তাবে বড়ই আনন্দিত হইয়া উঠিল। তখন আমি তাহাকে ধীরে ধীরে ও সাবধানতা-সহকারে বুঝাইয়া দিলাম যে, বিবাহের পরই কিছুদিন নিয়ত আমি সঙ্গে থাকিলে, তাহার স্বামীর সুখের ও আনন্দের অবশ্যই ব্যাঘাত জন্মিবে; কারণ আমি লীলার যত আত্মীয় লীলার স্বামীর এখনও তত আত্মীয় নহি। সেরূপ আত্মীয়তা উভয়পক্ষের সদ্ভাব ও সময় সাপেক্ষ। এরূপ লোক স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যবর্ত্তী রূপে নিয়ত উপস্থিত থাকিলে, অবশ্যই নানাপ্রকারে সকল পক্ষেরই অসুবিধা ঘটিতে পারে। অতএব যাহাতে তাঁহার প্রেমের ও সন্তোষের ব্যাঘাত ঘটে, সে ব্যবস্থা এক্ষণে কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে; সুতরাং এ যাত্রায় আমার সঙ্গে থাকা ঘটিবে না। উত্তমরূপে লীলাকে এ কথার যুক্তি ও কারণ বুঝাইয়া দিলাম। নীরবে লীলা সকলই স্বীকার করিল।

২রা। রাজার বিষয়ে এ পর্য্যন্ত যত কথা বলিয়াছি, সকলই যেন অপ্রীতিকর ভাবে বলিয়াছি। রাজার সম্বন্ধে মনে কোন বিরুদ্ধ ভাব থাকা নিতান্ত অন্যায়। রাজার সম্বন্ধে পূর্ব্বকালে মনে এমন ভাব ছিল না তো। কেমন করিয়া এরূপ ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল তাহা এক্ষণে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাঁহার সহিত বিবাহ হওয়ায় লীলার মত ছিল না বলিয়াই কি এরূপ মনের ভাব জন্মিয়াছে? রাজার প্রতি দেবেন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধ সংস্কারই কি ইহার কারণ? মুক্তকেশী-সম্বন্ধে রাজার নির্দ্দোষতা বিষয়ক স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি; তথাপি সেই নামহীন পত্র কি এখনও আমার মনকে সন্দেহাকুল করিয়া রাখিয়াছে? জানি না কি। যাহাই হউক, ইহা স্থির, রাজাকে অন্যায় রূপে সন্দেহ করা এখন আমার পক্ষে নিতান্ত অকর্ত্তব্য কর্ম্ম। রাজার সম্বন্ধে এরূপ ভাব আর কখন লিপিবদ্ধ করিব না। ছিঃ, আমার এ নিতান্ত অন্যায় ব্যবহার!

১৬ই। দুই সপ্তাহ অতীত হইয়া গিয়াছে। লিখিবার মত বিশেষ কোন ঘটনাই ইতিমধ্যে

ঘটে নাই। বিবাহের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত রাজা কল্য আসিবেন এবং বিবাহ পর্য্যন্ত এখানেই অবস্থান করিবেন। লীলা সমস্ত দিনের মধ্যে আর এক মুহূর্ত্তও আমাকে ছাড়িতে চাহে না। গত রাত্রে আমাদের উভয়েরই ঘুম হয় নাই। লীলা মধ্য রাত্রে ধীরে ধীরে আমার শয্যায় উপস্থিত হইল এবং আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল,—

"দিদি, শীঘ্রই তো তোমার কাছ ছাড়া হইতে হইবে; যতক্ষণ সময় আছে, ততক্ষণ আর একবারও তোমার কাছ ছাড়া হইব না।"

১৭ই। রাজা আজি আসিয়া পৌছিলেন। আমি পূর্ব্বে যেমন মনে করিয়াছিলাম, তাঁহাকে সেইরূপই উদ্বিগ্ন ও কাতর বলিয়া বোধ হইল, তথাপি তিনি অতি প্রফুল্লচিত্তের ন্যায় হাস্যালাপ চালাইতে লাগিলেন। লীলা একবারও আমাকে ছাড়িয়া থাকিতেছে না। আজি দ্বিপ্রহর কালে, পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তন-সময়ে লীলা আমাকে বলিল,—"দিদি, আমাকে একা থাকিতে দিও না—আমাকে নিষ্কর্ম্মা রাখিও না। আমি যেন ভাবিতে সময় না পাই, ইহাই আমার অনুরোধ।"

আন্তরিক যাতনা হেতু লীলার ভাব-ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন, তাঁহার ভাবী স্বামীর চক্ষে অধিকতর সুন্দর ও সজীবতার লক্ষণ বলিয়া, প্রতীত হইতে লাগিল। লীলা, হৃদয়-ভাব বিধিমতে প্রচ্ছন্ন রাখিবার উদ্দেশে, নিয়ত হাস্য-পরিহাস ও অনবরত বাক্যালাপ করিতে লাগিল। রাজা এ সকল ব্যবহার হিত-পরিবর্ত্তনের সূচনা বলিয়া মনে করিলেন।

যাহাই হউক, লীলার ভবিষ্যৎ স্বামীর কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রবীণতা হইলেও, তিনি যে সুপুরুষ তাহাতে সংশয় করিবার কোনই কারণ নাই। রাজা দেখিতে শুনিতে লোকটী বেশ। আমাদের বিশ্বস্ত আত্মীয় উকীল উমেশ বাবুরও এই মত। দোষের মধ্যে রাজা সকল কার্য্যেই কিছু ব্যস্তবাগীশ, আর চাকর-বাকর-সম্বন্ধে কিছু অপ্রিয়-ভাষী। এরূপ সামান্য দোষ লক্ষ্য করিবারই যোগ্য নহে। আমি এ দোষ কদাচ লক্ষ্য করিব না। রাজা লোক ভাল, দেখিতেও বেশ। আমি আমার এই মত আজি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম।

১৮ই। শরীর ও মন বড় অবসন্ন বোধ হওয়ায়, আমি অদ্য দ্বিপ্রহর কালেই, বাটীর বাহিরে একবার বেড়াইতে বাহির হইলাম। যে পথ দিয়া তারার খামারে যাওয়া যায় সেই পথেই আমি চলিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে, আমি বিস্ময়-সহকারে দেখিতে পাইলাম, রাজা প্রমোদরঞ্জন, এই অসময়ে, তারার খামারের দিক হইতে, বেগে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে, চলিয়া আসিতেছেন। আমরা নিকটস্থ হইলে, আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই, তিনি বলিলেন, তাঁহার এখানে শেষ আগমনের পর, তারা মুক্তকেশীর আর কোন সন্ধান পাইয়াছে কি না, তাহাই জানিবার নিমিত্ত, তিনি তারার খামারে গমন করিয়াছিলেন।

আমি বলিলাম,—"তাহারা কিছুই জানিতে পারে নাই, বোধ হয়?"

তিনি বলিলেন,—"কিছুই না। আমার বড়ই ভয় হইতেছে, বুঝি বা আর তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে না।"

পরে আমার মুখের দিকে বিশেষ মনোযোগ সহকারে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"সেই মাষ্টার দেবেন্দ্র বাবুর নিকট কোন সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে কি?

আমি উত্তর দিলাম,—"শক্তিপুর হইতে

যাওয়ার পর তিনি মুক্তকেশীকে দেখিতেও পান নাই,তাহার কোন সংবাদও জানেন না।"

রাজা যেন হতাশ-জনিত দুঃখিত অথচ চিন্তা-বিদূরিত ভাবে বলিলেন,-"বড়ই দুঃখের বিষয়! না জানি অভাগিনী কতই কষ্ট পাইতেছে। তাহাকে যথাস্থানে পুনঃস্থাপিত করিবার জন্য আমি যত যত্ন করিতেছি সকলই নিষ্ফল হইল দেখিয়া, আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে।"

এবার তাঁহাকে বস্তুতই কাতর বলিয়া বোধ হইল। আমি তাঁহাকে দুই একটী সান্ত্বনার কথা বলিতে বলিতে বাটী ফিরিলাম। তাদৃকার ব্যবহার তাঁহার চরিত্রের একটী অপূর্ব্ব ভূষণ সন্দেহ কি? বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে, লীলার সহিত পরমানন্দে কালাতিবাহিত না করিয়া, দুঃখিনী মুক্তকেশীর সন্ধানার্থ কষ্ট স্বীকার করিয়া, তিনি তারার গ্রামার পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছেন, ইহা বিশেষ প্রশংসার কথা।

১৯শে। রাজার অক্ষয় গুণ-ভাণ্ডারস্থ আর একটী গুণ অদ্য আমার চক্ষে পড়িল। বিবাহের পর তাঁহারা পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসিলে, আমি তাঁহার স্ত্রীর সহিত তাঁহার ভবনে একত্রাবস্থান করিব, এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবা মাত্র, তিনি বলিলেন যে, তিনি যাহা ভাবিতেছিলেন আমি তাঁহাকে সেই কথাই বলিয়াছি। আমি যাহাতে তাঁহার স্ত্রীর সহিত একত্র থাকি, ইহাই তাঁহার অন্তরের বাসনা। তিনি নিতান্ত আগ্রহ-সহকারে, আমাকে অনুরোধ করিলেন যে, বিবাহের পূর্ব্বে আমি যেমন লীলার সঙ্গিনী ছিলাম, বিবাহের পরেও সেইরূপ থাকিলে, তিনি আমার নিকট অচ্ছেদ্য ঋণ-জালে আবদ্ধ থাকিবেন এবং অসীম উপকৃত ও আনন্দিত হইবেন। এ কথার এইরূপে অবসান হইলে, বিবাহের পর পশ্চিম পর্য্যটন কালে কোথায় কোথায় যাওয়া হইবে এবং কোন্ কোন্ লোকের সঙ্গে লীলার আলাপ ঘটিবে, তাহা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। রাজা অনেক বন্ধু-বান্ধবের নাম করিলেন, তন্মধ্যে এক ব্যক্তি ব্যতীত আর সকলেই প্রায় কলিকাতা অঞ্চলের লোক। সেই এক ব্যক্তি জগদীশনাথ চৌধুরী। চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার পত্নী রঙ্গমতী দেবীর সহিত লীলার সাক্ষাৎ ঘটিবে এবং তজ্জন্য হয়ত বহুদিনের পারিবারিক অকৌশলের অবসান হইয়া যাইবে মনে করিয়া, লীলায় বর্ত্তমান বিবাহ শুভ ঘটনা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। লীলা জীবিত থাকিতে, পিতৃকুলের সম্পত্তির কিঞ্চিন্মাত্র অংশলাভেও এই প্রকার হতাশ হইয়া,রঙ্গমতী দেবী, একাল পর্য্যন্ত, লীলার সহিত কদাচ আপনার লোকের ন্যায় ব্যবহার করেন নাই। অতঃপর বোধ হয়, আর সে ভাব থাকিবে না। রাজার সহিত চৌধুরী মহাশয়ের চিরকালের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব, সুতরাং তাঁহাদের পত্নীদ্বয়ের মধ্যেও ভদ্র-জনোচিত সদ্ভাবের অবশ্যই অসদ্ভাব ঘটিবে না। রঙ্গমতী দেবী কুমারীকালে বড়ই অহঙ্কৃতা, একজেদা ও দুষ্ট-স্বভাবা ছিলেন। এখন যদি তাঁহার স্বভাব ভাল হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহার স্বামী অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। চৌধুরী মহাশয় লোকটী কেমন জানিবার জন্য বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে। তিনি লীলার স্বামীর পরম বন্ধু। লীলা কিংবা আমি তাঁহাকে কখনই দেখি নাই। শুনিয়াছি রাজা একবার লাহোরে ডাকাইতের হস্তে পড়িয়া বড় বিপদাপন্ন হইয়াছিলেন। সেই সময় চৌধুরী মহাশয় হঠাৎ উপস্থিত হইয়া, রাজাকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। আর যখন স্বর্গীয় মেসো মহাশয় রঙ্গমতী

...বাহে অন্তায়রূপে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে অতি ধীর ভাবে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। লজ্জার কথা—সে পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই! এ ছাড়া চৌধুরী মহাশয়ের আর কোন সংবাদই আমি জানি না। এ দেশে তিনি কখন ফিরিয়া আসিবেন কি না এবং দেখা হইলে, তাঁহাকে ... করিতে পারিব কি না, কে বলিতে পারে?

যাহা হউক, লীলার স্বামী আমাকে লীলার সহিত একত্রাবস্থান-প্রসঙ্গে সততার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি আবার বলিতেছি, তিনি বড় ভাল লোক। কি আশ্চর্য্য; আমি ক্রমেই রাজার মহাস্তাবক হইয়া পড়িতেছি!

২০শে। আমি রাজাকে ঘৃণা করি। তিনি অতি মন্দস্বভাব, করুণা ও সততা-বিরহিত জঘন্য লোক বলিয়া আমি মনে করি। কল্য রাত্রিতে তিনি লীলার কাণে কাণে কি কথা বলিবামাত্র লীলা বিবর্ণ হইয়া গেল ও কাঁপিতে লাগিল। কথাটা কি লীলা তাহা আমাকে বলে নাই—কখন বলিবে কি না সন্দেহ। তাঁহার কথায় লীলার যে এত কষ্ট হইল, তাহাতে তিনি ভ্রুক্ষেপও করিলেন না। অসভ্য—মূর্খ! পূর্ব্বে তাঁহার সম্বন্ধে আমার যেমন শত্রুতা ভাব ছিল, আবার তেমনই হইয়া পড়িল দেখিতেছি। সংক্ষেপতঃ আমি তাঁহাকে ঘৃণা করি।

২১শে। এখন মনে হইতেছে, যেন কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়া, এ বিবাহ ঘটিতে দিবে না। কেন এ আশ্চর্য্য ধারণা জন্মিল তাহা কে জানে? লীলার ভবিষ্যতের আশঙ্কা হইতেই কি এ বিশ্বাসের উৎপত্তি? অথবা যতই বিবাহ নিকটস্থ হইতেছে, ততই রাজার ব্যস্ততা ও ক্রুদ্ধ ভাবের বৃদ্ধি দেখিয়া আমার মনের এরূপ ভাব জন্মিতেছে? কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কত চেষ্টাই করিতেছি; কিছুতেই এ ভাব অন্তরিত হইতেছে না। মনের অত্য বড়ই বিশৃঙ্খল ভাব। কি লিখিব? যাহা হয় লিখি। চুপ করিয়া ভাবা যায় না।

প্রাতে আমাদের হর্ষে বিষাদ ঘটিল। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী, এই বৃদ্ধ বয়সে, স্বহস্তে অতি পরিশ্রমে, লীলার বিবাহ-উপলক্ষে দিবার নিমিত্ত, একখানি কাপড়ে চমৎকার ফুল কাটিয়াছিলেন। প্রাতে তিনি সেই কাপড় লীলাকে পরিধান করিতে বলিলেন। লীলা, তাহা পরিধানান্তে, তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া, বালিকার ন্যায়, কাঁদিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, মাতৃহীনা লীলা অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর পরম স্নেহের ধন। ঠাকুরাণীও কাঁদিয়া আকুল হইলেন। আমি স্বয়ং নেত্র-মার্জ্জন করিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে যাইব, এমন সময়ে রায় মহাশয় আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

আমি রায় মহাশয়ের ঘরে গিয়া বসিলে, বিবাহের সময়, তিনি কেমন করিয়া শরীর ও মনকে সুস্থ রাখিবেন তাহারই ব্যবস্থা, বক্তৃতা ও ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি জ্বালাতনের একশেষ হইলাম। কথার মধ্যে সহস্র বার 'স্নেহের ধন লীলার' উল্লেখ; আর কেবল কেহ যেন না গোল করে, কেহ যেন না চীৎকার করে, কেহ যেন না কাঁদে, আর কোন সংবাদ কোন ক্রমে তাঁহার কাছে যেন না পৌঁছে, ইহাই তাঁহার অনুরোধ এবং প্রধান পরামর্শ।

দিনটা যে কি গোলে কাটিল তাহা আর কি বলিব? কলিকাতা হইতে আচার্য্য, গায়ক ও অন্যান্য লোক জন আসার গোল, জিনিষ পত্র আনা ও বুঝিয়া লওয়ার গোল, বিদেশ হইতে বন্ধু-বান্ধব আসার গোল ইত্যাদি সহস্র গোলে ভবন পরিপূর্ণ। রাজার ভাব বড় অস্থিরতাময়। তিনি তিলার্দ্ধ কালও এক কার্য্যে ও এক স্থানে থাকিতে পারিতেছেন না। তিনি কখন বাহিরে, কখন ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এই সকল গোলযোগের মধ্যে, লীলার ও আমার মনের যে অবক্তব্য যাতনাময় অবস্থা তাহার কথা আর কি বলিব! কল্য প্রাতে আমরা বিচ্ছিন্ন হইব; সর্ব্বোপরি এই বিবাহ আমাদের উভয়েরই চিরকালের ক্লেশের কারণ হইবে, এই অব্যক্ত চিন্তা আমাদের মনকে নিয়ত পেষিত করিতে লাগিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর একবার লীলার শয্যা-সন্নিধানে গমন করিলাম। সেই দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় বালিকা স্থির ভাবে পড়িয়া আছে। ক্ষীণ আলোক-জ্যোতিঃ তাহার বদন-মণ্ডল আলোকিত করিয়াছে। বালিকার মুদ্রিত নয়ন ভেদ করিয়া অশ্রু-কণা মুক্তা-ফলের ন্যায় লোচন-প্রান্তে সংলগ্ন রহিয়াছে। কতক্ষণ অতৃপ্ত নয়নে সেই স্নেহ-পুত্তলীকে দেখিলাম। দেখিলাম, তাহার হস্ত-সমীপে তাহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের সেই প্রতিমূর্ত্তি এবং আমার প্রদত্ত একটী পশমের ফুল রহিয়াছে। কতক্ষণই দেখিলাম—আর যেন দেখিতে পাইব না এই ভাবে, কত অপেক্ষাই করিলাম। তাহার পর ধীরে ধীরে স্বীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। ভাবিলাম, আমার প্রাণের লীলা! আজি তোমার অতুল সম্পত্তি, রূপরাশির রূপরাশি থাকিতেও, তুমি ইহ জগতে বান্ধব-বিহীন। যে এক ব্যক্তি তোমার কল্যাণের জন্য অকাতরে জীবন দান করিতে পারিত, হায় সে এক্ষণে কোথায়! সুদূরে, শত্রু-বেষ্টিত, অনভ্যস্ত, অপরিচিত যুদ্ধক্ষেত্রে। আর তোমার কে আছে? পিতা নাই, মাতা নাই, ভ্রাতা নাই—কেবল এই নিঃসহায়া বিধবা অবলা দিবা-রাত্রি তোমার ঐ মুখ চাহিয়া রহিয়াছে। ওঃ! কল্য প্রাতে ঐ ব্যক্তির হস্তে কি দেব-দুর্লভ রত্নই সমর্পিত হইবে! যদি সে তাহা ভুলিয়া যায়—যদি সে তাহার সদ্ব্যবহার না করে—যদি সে কখন তাহার কেশাগ্রও না করে—

২২শে অগ্রহায়ণ—বেলা ৮টা। লীলা প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়াছে। তাহার অন্তকার অবস্থা এ কয়দিনের অপেক্ষা ভাল। আজি সে পূর্ণ ভাবে আত্মত্যাগ করিয়াছে। বেলা ৫টার সময় বিবাহ। লোক জন আয়োজন করিতে ব্যতিব্যস্ত।

বেলা ১২টা। আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত বরকন্তা প্রস্তুত। আচার্য্য ও প্রচারব মহাশয়েরা উপস্থিত।

বেলা ৪টা। লীলাকে আমি চুম্বন করিলাম, সেও আমাকে চুম্বন করিল। অঞ্চলে তাহার নয়নের অশ্রু-চিহ্ন মুছাইয়া দিলাম এখনও আমার মনে হইতেছে, বুঝি বিবা হইবে না; অবশ্যই কোন প্রতিবন্ধক হইবে কি ভ্রান্তি—কি বাতুলতা! রাজা এত চঞ্চল এত অস্থির কেন? বিবাহ সুনির্ব্বাহিত হওয়া বিষয়ে তাঁহারও কি কোন সন্দেহ আছে? থাকিলে, নিশ্চয়ই তিনিও ভ্রান্ত। আর এব

ঘণ্টা পরে সকলেই স্ব স্ব ভ্রান্তি হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

বেলা ৬টা। সকল আশঙ্কার শেষ হইল। ব্রাহ্ম-মতে রাজা প্রমোদরঞ্জনের সহিত লীলাবতীর বিবাহ শেষ হইয়া গেল।

রাত্রি ৯টা। বর-কন্যা চলিয়া গেল। রোদনে আমি অন্ধ হইয়াছি—আর লিখিতে পারি না—

* * * *

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

শুক্লবসনা সুন্দরী।

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীমতী মনোরমা দেবীর দিনলিপির অপরাংশ।

* * * * * *

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কালিকাপুর হুগলী।

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৭। ছয় মাস—সুদীর্ঘ ছয় মাস কাল অতীত হইয়া গেল, লীলার চাঁদমুখ চক্ষে দেখি নাই। আর একটী দিন কাটিলে লীলাকে দেখিতে পাইব। ১২ই সকলে দেশে ফিরিবেন কথা আছে। আর একটী দিন—২৪ ঘণ্টা পরে সত্যই কি লীলাকে দেখিতে পাইব? কতক্ষণে এ দিনটা ফুরাইবে?

সমস্ত শীতটা লীলা ও তাঁহার স্বামী আগ্রা, দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি স্থানে অতিবাহিত করিয়াছেন। গ্রীষ্ম পড়িলে তাঁহারা সিমলা-শৈলে ছিলেন। এক্ষণে বাটি ফিরিতেছেন। তাঁহাদের সঙ্গে জগদীশনাথ চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার পত্নী রঙ্গমতী দেবীও আসিতেছেন। ইঁহারা কলিকাতা-সন্নিহিত কোন স্থানে অবস্থান করিবেন কথা আছে। যতদিন স্থান ও বাসা মনোনীত না হয়, ততদিন তাঁহারা রাজার কালিকাপুরস্থ ভবনে বাস করিবেন স্থির হইয়াছে। যাহার ইচ্ছা হয় আসুক—যত লোক ইচ্ছা সঙ্গে আনিয়া রাজা ভবন পরিপূর্ণ করুন, আমার তাহাতে ইষ্টাপত্তি নাই—কেবল লীলা নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিলে ও তাহার সঙ্গে আমি থাকিতে পাইলেই চরিতার্থ হই।

মুঙ্গের হইতে লিখিত লীলার পত্র পাইয়া, কল্য আমি শক্তিপুর ত্যাগ করিয়াছি। রাজা দেশে ফিরিয়া কলিকাতায় থাকিবেন কি বাটি

আসিবেন তাহা পূর্ব্বে স্থির ছিল না, এজন্য আমি পূর্ব্বে আসিতে পারি নাই। লীলার পত্র পাইয়া জানিলাম, দেশ-ভ্রমণে রাজার এত অধিক অর্থ ব্যয় ঘটিয়াছে যে, কলিকাতার ব্যয় নির্ব্বাহ করা তাঁহার পক্ষে দুর্ঘট হইবে। সুতরাং কলিকাতায় না গিয়া বাটিতে আসাই তিনি সৎপরামর্শ মনে করিয়াছেন। কলিকাতাতেই হউক, আর কালিকাপুরেই হউক লীলার সহিত শীঘ্রসাক্ষাৎ হইলেই হয়। নানা কারণে কলিকাপুরে পৌছিতে আমার রাত্রি হইয়া গিয়াছে। রাত্রিতে রাজার বাটি দেখিতে পাইলাম না; মোটামুটি বুঝিলাম, রাজবাটি ভাল নয়। প্রাসাদের চারিদিকে অসংখ্য বড় বড় গাছ বাটিকে ঢাকিয়া বায়ুর চলাচল বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যে দ্বারবান্ আমাকে দ্বার খুলিয়া দিল এবং যে দাসী আমাকে অভ্যর্থনা করিল তাহারা লোক মন্দ নহে। অন্যান্য দাস-দাসীর সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিল না। আমার জন্য যে ঘরটী নির্দ্ধারিত ছিল তাহা অতি সুন্দর।

শুনিলাম কালিকাপুরের রাজবাটি অতি প্রাচীন। তাহার একাংশ পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। এই রাজবাটি-সংলগ্ন একটী প্রাচীন বিল আছে। তাহার নাম কালিকাসাগর।

১১টা বাজিয়া গেল। চাকর বাকরের সাড়া শব্দ ক্রমে থামিয়া গেল; বোধ হয় তাহারা নিদ্রার সেবা করিতে আরম্ভ করিল। আমিও কি তাহাই করিব? না—ঘুমাইব? ঘুম কি মনে আছে? কালি লীলার মুখ খানি দেখিব, তাহার সেই মধুমাখা কথা শুনিব, এ আনন্দে ঘুম কি আসিতে পারে? যদি স্ত্রীলোক না হইতাম, তাহা হইলে রাজার অশ্বশালা হইতে অত্যুৎকৃষ্ট অশ্ব লইয়া ক্রমশঃ মুঙ্গেরের দিকে ছুটিতাম। কি করিব—অধম স্ত্রীলোক নিন্দার ভয়েই অবসন্ন—সুতরাং সকলই সহ্য করিতে বাধ্য। তবে এখন করিব কি? পড়িব। পুস্তকে মনঃসংযোগ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে লিখি—দেখি লিখিতে লিখিতে ক্লান্তি ও নিদ্রা আইসে কি না।

দেবেন্দ্র বসুর কথা আমার মনে সর্ব্বদাই জাগরূক। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ার পর, তাঁহার একপত্র পাইয়াছিলাম। সে পত্র অপেক্ষাকৃত সুস্থ মনে লিখিত। তাহার পর এ পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোন সংবাদ পাই নাই। মুক্তকেশীর বিবরণ সেইরূপই তমসাচ্ছন্ন। তাঁহার বা তাঁহার আত্মীয়া রোহিণী দেবীর কোন সংবাদ পাই নাই। তাঁহারা কোথায় আছেন, আছেন কি না আছেন, তাহা কে বলিবে?

আমাদের পরম বন্ধু উকীল উমেশ বাবু বড় পীড়িত। নিয়ত অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম হেতু তিনি বহু দিনাবধি শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন। চিকিৎসকেরা তাঁহাকে এক কালে শ্রম করিতে নিষেধ করেন। তিনি সে উপদেশ পালন করিতে পারেন নাই। অবশেষে নিদারুণ মূর্চ্ছা রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। তিনি এক্ষণে বায়ু পরিবর্ত্তন ও বিশ্রামের নিমিত্ত দার্জ্জিলিঙ্গে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার ব্যবসায়ের অংশিদার এক্ষণে তাঁহার কার্য্য-নির্ব্বাহ করিতেছেন। সুতরাং দৈব-নিগ্রহে আপাততঃ, এই একজন পরমাত্মীয়ের সহায়তায় আমরা বঞ্চিত হইয়াছি।

লীলা এবং আমি উভয়েই আনন্দধাম ত্যাগ করায়, অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীও অগত্যা সে স্থান ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে কলিকাতায়

চলিয়া আসিয়াছেন। কলিকাতায় তাঁহার এক ভগ্নী বাস করেন। ঠাকুরাণী সেই ভগ্নীর আলয়ে বাস করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। লীলাকে ঠাকুরাণী সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকেন। লীলা নির্ব্বিঘ্নে দেশে ফিরিয়া আসিতেছে, সুতরাং যখন ইচ্ছা আবার তিনি তাহাকে দেখিতে পাইবেন, এই আশায় তাঁহার আনন্দের সীমা নাই।

যিনি যাহাই বলুন, আমার বোধ হয় বাটি স্ত্রীলোকবিহীন হওয়ায়, রায় মহাশয় বড়ই খুসি। মুখে যতই দুঃখপ্রকাশ করুন, মনে মনে যে তিনি অপার আনন্দিত, ইহার কোন সন্দেহ নাই। তিনি সেই প্রাচীন পুস্তক সমূহ, চিত্রাবলী, গন্ধদ্রব্য ও বালিশ-বেষ্টিত হইয়া নির্জ্জন পুরীরে নিষ্কণ্টকে নিদ্রা দিতেছেন। আর কারণে ও অকারণে নিরীহ চাকর-চাকরাণীগুলাকে প্রাণপণে খাটাইয়া মারিতেছেন।

যাহার যাহার কথা আমার স্মৃতির প্রধান সংচর তাহা তো বলিলাম। কিন্তু যে আমার জীবনের জীবন, সেই লীলা এ ছয় মাস কেমন করিয়া কাটাইল তাহা একবার মনে করিয়া দেখি। এ ছয় মাস কাল লীলার অনেক পত্র পাইয়াছি; কিন্তু জ্ঞাতব্য কোন কথাই সে সকল পত্রে পরিস্ফুট হয় নাই। তিনি কি তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করেন? বিবাহের দিনে, বিদায় কালে তাহার যে ভাব দেখিয়াছিলাম, এখন কি সে তাহা অপেক্ষা সুখে আছে? আমার প্রত্যেক পত্রেই আমি নানা ভঙ্গিতে এই দুইটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু লীলা কোন পত্রেই ইহার উত্তর দেয় নাই; সে যাহা লিখিয়াছে তাহা কেবল স্বীয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে। ক্রমে এই বিবাহ যে তাহার মনের সহিত মিলিয়াছে, বিগত ২২শে অগ্রহায়ণের কথা মনে হইলে সে যে আর কাতর হয় না, এরূপ উক্তি তাহার কোন পত্রেই নাই। পত্র-মধ্যে যেখানে রাজার কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে, লীলা সেখানে তাঁহাকে মাননীয় বন্ধু রূপে উল্লেখ করিয়াছে; কুত্রাপি তাঁহাকে পরম প্রণয়াস্পদ হৃদয়েশ রূপে উল্লেখ করে নাই। বিবাহ হেতু লীলার কোন প্রকার মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিয়া আমার বোধ হইল না বিবাহের পূর্ব্বে যে লীলা ছিল, বিবাহের পরেও সেই লীলা রহিয়াছে। লীলার স্বামী ও তাঁহার হৃদয়-সখা চৌধুরী মহাশয় উভয়েরই স্বভাব-চরিত্র-সম্বন্ধে লীলা সমান নির্ব্বাক্। লীলা তাহার পিসী মা রঙ্গমতী দেবীর সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা লিখিয়াছে। পূর্ব্বকালে তিনি যেমন উগ্র-স্বভাব ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার প্রকৃতি তেমনই কোমল হইয়াছে। চৌধুরী মহাশয়ের চরিত্র লীলার দুর্জ্ঞেয় ও বুদ্ধির অতীত। যতক্ষণ তাঁহাকে আমি স্বয়ং দেখিয়া কোন মত স্থির না করিতেছি, ততক্ষণ লীলা আর তাঁহার চরিত্রের কোন বর্ণনা করিবে না বলিয়াছে। চৌধুরী মহাশয়ের সম্বন্ধে লীলার এই সকল উক্তি আমার বড় ভাল বলিয়া বোধ হইল না। লীলা আত্মীয় ও অনাত্মীয় নির্ব্বাচনে বিশেষ নিপুণা বলিয়া আমার জ্ঞান আছে। চৌধুরী মহাশয়ের প্রকৃতি নিশ্চয়ই লীলার সন্তোষজনক নহে। লীলার কথায়, স্বয়ং না দেখিয়াও, চৌধুরী মহাশয়ের সম্বন্ধে আমারও বড় ভাল অভিপ্রায় জন্মিল না। কিন্তু এখন ধৈর্য্যই সৎপরামর্শ। কল্য চক্ষুকর্ণের বিবাদের অবসান হইবে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে। একবার জানালা খুলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইলাম। চারিদিকে বড়বড় বৃক্ষশ্রেণী যেনপাহাড় শ্রেণীর

ন্যায় দেখাইতেছে। দিনে এ রাজ-ভবন না জানি কেমন দেখাইবে!

১২। আজিকার দিন ভাল। আশার অতীত অনেক নূতন কথা আজি জানিতে পারিলাম। প্রাতে উঠিয়াই রাজ-ভবন দেখিতে আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম বাটি বহুকালের এবং বহু বিস্তৃত। তাহার অনেক শাখা-প্রশাখা অনেক বৈঠকখানা, অনেক শয়ন-কক্ষ। ভবনের বহু অংশই অনধিকৃত—লোকবিহীন। একাংশ মাত্র সংপ্রতি নবীনা রাণীর অবস্থানের নিমিত্ত সংস্কৃত ও সুসজ্জিত রহিয়াছে। তাহারই মধ্যে দুইটী প্রকোষ্ঠ আমার নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে। রাজার দাস-দাসী ব্যতীত অন্য পরিজন নাই। সুতরাং এই সুবৃহৎ ভবনের অধিকাংশই জনশূন্য। রাজ-প্রাসাদের প্রাচীনত্ব ও বহু বিস্তৃতি ব্যতীত তাহার প্রশংসার অন্য কোন কারণ আমার উপলব্ধি হইল না। প্রাতে বাটির অভ্যন্তর ভাগ দর্শন করিলাম, বিকালে ভবন-সন্নিহিত উদ্যানাদি দেখিতে বাহির হইলাম। রাত্রে যাহা যাহা ভাবিয়াছিলাম দিনে দেখিলাম তাহা ঠিক—কালিকাপুরের রাজ-ভবনের চারিদিকে গাছের সংখ্যা বড় অধিক। গাছ-পালা ও বাগানের মধ্য দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে, একটা পথাবলম্বনে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, এক প্রকাণ্ড বৃক্ষাদি পরিশূন্য ভূখণ্ডে উপস্থিত হইলাম। এই ভূখণ্ডের মধ্যস্থলে একটী প্রায় শুষ্ক বিল—এই বিলের নাম কালিকাসাগর। সহজেই বুঝিতে পারিলাম, এই বিল পূর্ব্বকালে বহুদূর বিস্তৃত ছিল, কালে ক্রমে ক্রমে বুঁজিয়া গিয়া ক্ষুদ্র হইয়াছে। এই জনহীন স্থানে বহুসংখ্যক ইন্দুর ও ভেকের নিবাস। বিলের এক প্রান্তে একখানি ভগ্ন নৌকা কাৎ হইয়া পড়িয়া আছে—তাহার একদিকের ছায়ায় একটী সর্প, কুণ্ডলিত হইয়া রহিয়াছে। এক দিকে একটী ক্ষুদ্র ও জীর্ণ দারুময় গৃহ! তন্মধ্যে কয়েক খানি টুল ও একটী টেবিল পড়িয়া আছে। আমি এই ক্ষুদ্র গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্রামের জন্য একখানি টুলে উপবেশন করিলাম। তথায় কিয়ৎকাল মাত্র অবস্থান করিতে না করিতেই শুনিতে পাইলাম, আসনের নিম্নভাগ হইতে আমার নিশ্বাসের অবিকল প্রতিধ্বনি নির্গত হইতেছে। আমি কখনই সহজে ভীত হই না; কিন্তু অদ্য এই ব্যাপারে আমি নিতান্ত ভয়াকুল হইয়া 'কে? কে?' বলিয়া বারংবার চীৎকার করিলাম; কোনই উত্তর পাইলাম না। সাহসে ভর করিয়া আসনের নিম্নে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলাম। দেখিলাম আমার ভয়ের কারণ, একটী ছোট বিলাতী কুকুর, টুলের নিম্নে শুইয়া আছে। আমি তাহাকে বারবার আদর করিয়া ডাকিলাম, সে অব্যক্ত যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি ব্যক্ত করিতে লাগিল মাত্র। তখন আমি বিশেষ মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করিলাম, তাহার শরীরের এক স্থানে রক্ত লাগিয়া রহিয়াছে। নিরীহ ক্ষুদ্র প্রাণীর এই যাতনা দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইল। তখন আমি অঞ্চল বস্ত্র একত্রিত করিয়া সাবধানতা সহকারে কুকুরটিকে তাহার উপর স্থাপন করিলাম এবং যত্ন সহকারে তাহাকে লইয়া অবিলম্বে গৃহে ফিরিলাম। আমার নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া আমি দাসীকে ডাকিলাম। যে দাসী আমার আজ্ঞাপালন করিতে আসিল, সে নিতান্ত নির্ব্বোধ এবং তাহার দয়া প্রবৃত্তি বড়ই কম। তাহার দ্বারা কোন উপকার বা সাহায্যের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, আমি আর একজন দাসীর জন্য চীৎকার করিলাম। এবার প্রধানা দাসী, বিশেষ বিবেচনা সহকারে, একেবারে একটু দুগ্ধ ও

গরম জল লইয়া, উপস্থিত হইল। এই দাসী 'গিন্নি ঝি' নামে পরিচিতা। গিন্নি ঝি কুকুরটীকে দেখিবা মাত্র চমকিয়া উঠিল এবং বলিল, "গুরুদেব রক্ষা কর। একি ! এ যে হরিমতি ঠাকুরাণীর কুকুর দেখিতেছি।"

আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কাহার ?"

"হরিমতি ঠাকুরাণী--কেন আপনি তাঁহাকে জানেন না কি ?"

"প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই—তবে আমি তাঁহার কথা শুনিয়াছি বটে। তিনি কি নিকটেই বাস করেন ? তিনি তাঁহার কন্যার কোন সংবাদ পাইয়াছেন কি ?"

"না মা, তিনি এখানে সেই সংবাদই জানিতে আসিয়াছিলেন।"

"কবে ?"

"এই কালি। তিনি শুনিয়াছেন তাঁহার মেয়ের মত আকৃতি প্রকৃতির একটী স্ত্রীলোককে এ অঞ্চলে কোন কোন স্থানে কেহ কেহ দেখিয়াছে। আমরা এ সংবাদ কিছুই জানি না; গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করা গেল, তাহারাও কিছুই জানে না। সেই হরিমতি ঠাকুরাণীর সঙ্গে এই কুকুরটী আমি দেখিয়াছিলাম। বোধ করি কোন প্রকারে কুকুরটি তাঁহার কাছ ছাড়া হওয়ার পর, ঘটনাক্রমে কেহ ইহাকে মারিয়া থাকিবে। মা ঠাকুরুণ, আপনি একে কোথায় পাইলেন ?

"বিলের নিকট ভাঙ্গা কাঠের ঘরে।"

"আহা! বোধ করি কেহ উহাকে গুলি করার পর কষ্টে স্থষ্টে এ সেই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আপনি ইহাকে একটু দুধ খাওয়াইবার চেষ্টা করুন, আমি ইহার রক্ত ধুইয়া দিই। কিন্তু যাহাই করুন, এ বাঁচিবে না—তবু দেখা যাউক।"

"হরিমতি! নামটী এখনও আমার কাণে বাজিতেছে। কুকুরকে যখন বাঁচাইবার যত্ন করিতেছি, তখন দেবেন্দ্র বাবুর কথা আমার মনে পড়িল। দেবেন্দ্র বাবু লিখিয়াছিলেন, 'যদি কখন মুক্তকেশী আপনার নয়ন-পথ-বর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলে আপনি সে সুযোগ কদাচ অবহেলা করিবেন না।" কুকুরের ঘটনা উপলক্ষে হরিমতির এ স্থানে আগমন সংবাদ পাওয়া গেল, আবার সে ঘটনা হইতে হয়ত আরও কোন নূতন সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে। দেখা যাউক, কতদূর সংবাদ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। আমি জিজ্ঞাসিলাম "হরিমতি কি নিকটেই থাকেন ?"

গিন্নি ঝি উত্তর দিল,—"না মা, তাঁর বাড়ী রামনগর, এখান থেকে ১২।১৩ ক্রোশ দূর।"

"আমার বোধ হয় তুমি হরিমতিকে অনেক দিনাবধি দেখিতেছ।"

"না মা, আমি জীবনের মধ্যে কেবল কালি তাঁহাকে দেখিয়াছি। আমাদের রাজা দয়া করিয়া তাঁহার কন্যার জন্য অনেক যত্ন করিয়াছেন, এই উপলক্ষে আমি অনেক বার তাঁহার নাম শুনিয়াছি। হরিমতির আকৃতি ও প্রকৃতি বেশ ভদ্রলোকের মত। তাঁহার কন্যার এ দিকে আসার কোন সংবাদ আমরা দিতে না পারায় তিনি কেমন একরকম উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।"

এই প্রসঙ্গই চালাইবার অভিপ্রায়ে আমি বলিলাম,—"হরিমতির বিষয় জানিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। আমি যদি আর একটু অগ্রে আসিতাম তাহা হইলে তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম। তিনি এখানে অনেকক্ষণ ছিলেন ?"

গিন্নি ঝি বলিল,—"হাঁ খানিকক্ষণ ছিলেন বটে। রাজা কখন ফিরিবেন এই কথা জানিবার জন্ত অপর একটী ভদ্র লোক সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, তিনি তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। অনুরোধ করিলেন, তিনি যে এখানে আসিয়াছিলেন, রাজা যেন তাহা জানিতে না পারেন। এ অনুরোধের অর্থ কি তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।"

আমিও বুঝিতে পারিলাম না, তাঁহার আগমন সংবাদ লুকাইয়া রাখিবার তাৎপর্য্য কি। আমি বলিলাম,—"বোধ হয় তাঁহার আগমন সংবাদ পাইলে তাঁহার অভাগিনী কন্তার কথা মনে পড়ায়, রাজা হয়ত জ্বালাতন হইয়া উঠিবেন, এই ভয়ে তিনি এত সাবধান হইয়াছিলেন। তিনি কি তাঁহার কন্তার বিষয়ে অধিক কথা-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?"

গিন্নি ঝি উত্তর দিল,—"বড় অল্প। তিনি কেবলই রাজা কোথায় কোথায় বেড়াইতেছেন, রাণী মা দেখিতে কেমন ইত্যাদি রাজার কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কন্তার কোন সন্ধান না পাওয়ায় কাতর না হইয়া, তিনি যেন বড় বিরত হইয়া পড়িলেন। 'তাহার ভরসা আমি ত্যাগ করিয়াছি' কন্তার সম্বন্ধে এই মাত্র বলিয়া, তিনি রাজার ও রাণীর কথা আরম্ভ করিলেন। রাণীর সম্বন্ধে তিনি কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। দেখুন মা, কুকুরটীর শেষ হইয়া গেল।"

কুকুরটী সহসা মরিয়া গেল। এত শীঘ্র তার জীবলীলা ফুরাইবে এ কথা আমার মনে হয় নাই।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। রাত্রিটা বড়ই ক্লেশজনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। একাকী এই প্রকাণ্ড ভবনে কেবল অপরিচিত লোক-বেষ্টিত হইয়া থাকা বড় অসুখদায়ক। কতক্ষণে না জানি লীলা ফিরিবে। তাহাদের আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এখনও আসিতেছে না। রাত্রি তো আটটা বাজিয়া গেল। কি করি —আমার দিনলিপি পাঠ করি।

রাজভবনে আমার প্রথম দিনেই মৃত্যু দেখিতে না হইলেই ভাল হইত। কুকুরই হউক আর যাহাই হউক মৃত্যু তো বটেই।

রামনগরে হরিমতির নিবাস। হরিমতির চিঠিখানি এখনও আমার নিকটে রহিয়াছে। সময় ও সুবিধা হইলে আমি এক দিন হরিমতির পত্র সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইব। দেখিব তাঁহার সহিত সাক্ষাতে কি বুঝা যায়। তাঁহার এখানে আগমন সংবাদ রাজার নিকট লুকাইয়া রাখিবার তাৎপর্য্য কি তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহার কন্তা এ অঞ্চলে আইসে নাই বলিয়া গিন্নি ঝির যেরূপ বিশ্বাস আমার সেরূপ নয়। এসমস্তায় দেবেন্দ্র বাবু না জানি কি মীমাংসাই করিতেন? কোথায় দেবেন্দ্র, তোমার উপদেশ ও পরামর্শের অভাব আমি এখনই অনুভব করিতেছি।

এ কি শব্দ? কিসের গোল? এই যে অশ্বের পদধ্বনি—এই যে চাকার ঘর্ঘর শব্দ—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

১৫ই। ফিরিয়া আসার গোলযোগ থামি[illegible] গিয়াছে। জিনিষ-পত্র যেখানে যাহা থা[illegible] উচিত, তাহা ঠিকঠাক রাখা হইয়াছে। লো[illegible] জন সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। স্বচ্ছ[illegible]

ভাবে সকলের জীবন-প্রবাহ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি কয়দিন লিপি স্পর্শ করিতে সময় পাই নাই। আজি কয় দিনের কথা লিখিব স্থির করিয়াছি।

লীলার সহিত প্রথম সাক্ষাতে যে আনন্দ, লিখিয়া তাহার কি বুঝাইব? তখন কথার সময় নহে—কথা তখন হয় নাই। প্রথম আনন্দবেগ কথঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া গেলে তবে কথাবার্ত্তা হইল। আমি দেখিলাম লীলার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; লীলা দেখিল আমার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। লীলার পরিবর্ত্তন দ্বিবিধ; কতকটা শরীরগত, কতকটা চরিত্রগত। প্রথমে শরীরগত পরিবর্ত্তনের কথা বলি। লীলার আকৃতি অন্যের চক্ষে এখন হয়ত পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছে। তাহার উজ্জ্বল বর্ণ আরও উজ্জ্বল হইয়াছে—বদন-শ্রী বর্দ্ধিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? আমি তাহার বর্ত্তমান আকৃতিতে কি যেন নাই নাই দেখিতে লাগিলাম; কুমারী লীলার যাহা যাহা ছিল, রাণী লীলাবতীতে যেন তাহার কোন কোনটীর অভাব দেখিলাম। কুমারীকালে কি ছিল, আর এখনই বা কি নাই তাহা বুঝান যায় না—ধরাও যায় না; তথাপি আমার চক্ষু যেন বুঝিল লীলার আকৃতিগত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আকৃতির যে পরিবর্ত্তনই হউক, এই কয় মাস অদর্শনের পর আমার প্রাণের লীলা আমার চক্ষে আরও অপূর্ব্ব হইয়াছে।

লীলার চরিত্রগত পরিবর্ত্তনের কথা সহজেই বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিব। লীলা যত পত্র লিখিয়াছে কিছুতেই তাহার বর্ত্তমান অবস্থার কথা লিখে নাই। ভাবিয়াছিলাম, পত্রে যাহা লিখিতে ইচ্ছা করে নাই, সাক্ষাতে নিশ্চয়ই তাহা বলিবে। সাক্ষাৎ হইল, বিবাহের পর তাহার মানসিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে আমি তাহা জানিতে চাহিলাম, লীলা তাহা বলিল না। জীবনে লীলা কোন কথা বা কাজ আমাকে লুকাইতে জানিত না। এখন সে লুকাইতেছে, ইহা অবশ্যই তাহার চরিত্রগত পরিবর্ত্তন। ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সে পূর্ব্বকালের বালিকার ন্যায়, দুই হস্তে আমার মুখ চাপিয়া, বলিল,—"না দিদি, সে কথায় কোন প্রয়োজন নাই। যখন তুমি এবং আমি আবার মিলিত হইয়াছি, তখন আমরা উভয়েই সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিব সন্দেহ নাই। আমার বিবাহিত জীবনের প্রসঙ্গ যত উত্থাপিত না হয় ততই ভাল।" তাহার পর সাহসা হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিল,—"দিদি, বেশ বেশ! তোমার সঙ্গে অনেক পরিচিত বন্ধু আসিয়াছে দেখিতেছি তোমার সেই পুরাতন কাগজের মলাট লাগান সাদা কালো মিশান বইগুলি আসিয়াছে, তোমার সেই সাধের বার্ণিস করা তোড়ঙ্গটি আসিয়াছে, আর সর্ব্বোপরি তোমার সেই সোহাগ মাখা গোলগাল মুখখানি আবার সেই আগেকার মত আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। ঠিক যেন আমরা সেই বাটীতে সেই ভাবেই আছি। বেশ হইয়াছে।" তাহার পর বালিকা আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া আমার মুখের উপর মুখ রাখিয়া বলিল,—"বল দিদি, বল কখন আমাকে ছাড়িয়া যাইবে না।" বালিকা ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিল; তাহার পর উভয় হস্তে আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল,—"দিদি গত কয়েক মাসের মধ্যে তুমি অনেককে পত্র লিখিয়াছ ও অনেকের পত্র পাইয়াছ কি?" আমি বুঝিলাম লীলার অভিপ্রায় কি; কিন্তু এ প্রশ্নের সহসা উত্তর দিলে অন্যায় কার্য্যে প্রশ্রয়

দেওয়া বিবেচনায়, চুপ করিয়া থাকিতাম। লীলা আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি তাঁহার কোন সংবাদ পাইয়াছ কি?" বালিকা আমার হস্ত হইয়া আপনার বদন আবৃত করিল। তাহার পর আবার বলিল,—"তিনি ভাল আছেন, সুখে আছেন তো? তাঁহার কাজ কর্ম্ম আছে তো? এখন তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন কি? আমাকে তিনি ভুলিয়াছেন তো দিদি?"

এ সকল কথা লীলার জিজ্ঞাসা করা অন্যায়। যখন রাজা তাহার সহিত বিবাহের কৃতসঙ্কল্পতা ব্যক্ত করিলেন, তাহার পর লীলা দেবেন্দ্র বাবুর হস্ত-লিখিত পুস্তক আমার হস্তে প্রদানকালে যে সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহা তাহার স্মরণ করা উচিত ছিল। কিন্তু মানুষ কবে কোথায় চিরকাল সমান ভাবে স্বীয় সঙ্কল্প পালন করিতে পারিয়াছে? কবে কোন্ স্ত্রীলোক প্রকৃত প্রেম-তুলিকায় চিত্রিত হৃদয়-স্থিত চিত্র বিচ্ছিন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছে? পুস্তকে তাদৃশ অমানুষ-বৃত্তান্ত বর্ণিত দেখা যায় বটে, কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা, পুস্তকোক্তির কি উত্তর প্রদান করে?

আমি তাহাকে কোন রূপ তিরস্কার করিলাম না। এরূপ অবস্থায় কে সহজে জলন্ত হৃদয়ের ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া চলিতে পারে? আমি তাহাকে বলিলাম যে, আমি ইদানীং তাঁহাকে কোন পত্রও লিখি নাই, এবং তাঁহার কোন সংবাদও পাই নাই। অতঃপর আমি অন্যান্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিলাম। লীলার সহিত সাক্ষাতে আমি কিয়ৎ পরিমাণে মনস্তাপ পাইলাম। প্রথমতঃ যে লীলার আমার নিকট গোপন করিবার একাল পর্য্যন্ত কোন কথাই ছিল না, এখন তাহা হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ লীলা বলুক আর নাই বলুক, তাহার কথা-বার্ত্তার ভাবে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, স্ত্রীর সহিত স্বামীর যেরূপ সহানুভূতি হওয়া আবশ্যক এবং উভয়ের সদ্ভাবের যেরূপ গাঢ়তা হওয়া উচিত, তাহা এ ক্ষেত্রে হয় নাই; তৃতীয়তঃ যে ভাবেই হউক, সেই আশাহীন মূল প্রণয় লীলার হৃদয়ে এখনও বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। আমি তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি; আমার পক্ষে এ সকলই কষ্টজনক সংবাদ। কিন্তু যাহাই হউক লীলাকে দেখিতে পাইয়া, যে আনন্দ জন্মিয়াছে, কোন কষ্ট জনক বিষয়ই আর তাহা দূরীভূত করিতে পারিতেছে না। আমি পূর্ব্বাবস্থার ন্যায় আপনাকে সুখী বলিয়া মনে করিতেছি।

তাহার পর লীলার স্বামীর কথা। বাটি ফিরিয়া আসার পর হইতেই তাঁহাকে যেন সর্ব্বদাই কিছু ত্যক্ত ও বিরক্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমার বোধ হয়, তিনি কিছু কৃশ হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার ফিরিয়া আসার পর আমার সহিত প্রথম সাক্ষাতের আলাপটা বড় ভাঙ্গা ভাঙ্গা রকম বোধ হইল! তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন,—"কেও, মনোরমা দিদি! ভাল তো? বেশ বেশ।" আমার বোধ হয়, তাঁহার মনে যেন কি একটা বিরক্তিজনক কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহাই তাঁহার এতাদৃশ ব্যবহারের কারণ। বস্তুতঃ বহুকাল বিদেশে অবস্থানের পর, বাটিতে ফিরিবামাত্র বিরক্তির কোন কারণ ঘটিলে, প্রকৃতিকে স্থির রাখা বড়ই কঠিন কথা। রাজার পক্ষে এরূপ বিরক্তিজনক কারণ যখন ঘটিয়াছিল, তখন আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। রাজা বাটি আসিবামাত্র অন্যান্য দাস-দাসী ছাড়া গিন্নি ঝিও দ্বার-সমীপে রাজা ও রাণীকে অভ্যর্থনা করিতে গমন করিল। ইদানীং দুই দশ দিনের

মধ্যে কোন লোক তাঁহার সন্ধান করিতে আসিয়াছিল কি না, রাজা দাস-দাসীগণকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা কখন কোথায় আছেন এবং কোন্ সময় ফিরিবেন না ফিরিবেন, গিন্নি ঝি সমস্ত দাস-দাসীর মধ্যে বুদ্ধিমতী বলিয়া, তাহার নিকটেই এ সকল সংবাদ পাঠাইতেন। সুতরাং কেহ কোন বিষয় জানিতে আসিলে অন্য ভৃত্যবর্গ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া গিন্নি ঝির নিকট লইয়া যাইত। সুতরাং এক্ষণে সকলেই রাজার প্রশ্ন শুনিয়া গিন্নি ঝির মুখের দিকে চাহিল। গিন্নি ঝি রাজাকে জানাইল যে, এক ব্যক্তি রাজা কবে ফিরিয়া আসিবেন তাহা জানিতে আসিয়াছিল। রাজা সে ব্যক্তির নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সে নাম বলে নাই, সুতরাং গিন্নি ঝি তাহা বলিতে পারিল না। লোকটী কি ব্যবসায়ী? তাহাও সে বলে নাই। লোকটী দেখিতে কেমন? গিন্নি ঝি তাঁহার আকৃতি বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু যাহা বলিল তাহাতে রাজা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। রাজা বড়ই বিরক্ত হইলেন, মাটীতে বারংবার পদাঘাত করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন! এই সামান্য ঘটনায় কেন যে তিনি এত বিরক্ত হইলেন তাহা আমি বলিতে পারি না; কিন্তু তিনি যে বিশেষ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িলেন তাহার আর ভুল নাই। তাঁহার এই বিরক্তিভাব যত দিন বিদূরিত না হয়, ততদিন তাঁহার সম্বন্ধে কোন একটা পাকাপাকি মত স্থির না করাই ভাল এবং আমি তাহা করিব না।

তাহার পর তাঁহাদের দুইজন সঙ্গী—জগদীশনাথ চৌধুরী ও রঙ্গমতী দেবীর কথা। আগে রঙ্গমতী দেবীর কথাই বলি। লীলা যে বলিয়াছিল, তাঁহাকে দেখিলে তিনি যে, সেই তিনি ইহা আমি সহজে বুঝিতে পারিব না, এ কথা ঠিক। বিবাহ হেতু চৌধুরাণী ঠাকুরাণীর স্বভাবের যেমন পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কোন স্ত্রীলোকের স্বভাবের এমন পরিবর্ত্তন হইতে আমি আর কখন দেখি নাই।

রঙ্গমতী দেবীর অনেক বয়সে বিবাহ হইয়াছিল; বিবাহ হইয়াছেও অনেক দিন। এখন তাঁহার বয়স প্রায় ৩৬ বৎসর। যখন তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, তখন আমার বয়স নিতান্ত অল্প। বিবাহের পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে দুই চারি বার দেখিয়াছিলাম। তাঁহার সে সময়ের ভাব আমার অনেক মনে আছে, অন্যান্য লোকের নিকটেও অনেক শুনিয়াছি। তিনি সে সময় বড় ভয়ানক লোক ছিলেন; তাঁহাকে তখন কেহই ভালবাসিত না। রূপের গর্ব্বে ও ধনের গর্ব্বে তিনি তখন ফাটিয়া পড়িতেন। এখন তাঁহার আশ্চর্য্য স্বভাব দেখিলাম। শান্ত, শিষ্ট, নিরহঙ্কৃত—তিনি এখন একটি চমৎকার লোক। মানুষের যে এরূপ পরিবর্ত্তন সহজে হয় ইহা আমার কখনও জ্ঞান ছিল না। বিবাহের পর তাঁহার স্বামীর ক্ষমতায় রঙ্গমতী দেবীর এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন তাঁহার পরিচ্ছদের আড়ম্বর নাই। উগ্রতা, ঔদ্ধত্য, অবাধ্যতা সে সকল তো দূরের কথা—তিনি এখন সর্ব্বক্ষণ তদগতচিত্তে স্বামী-সেবায় নিরত। স্বামীর ইচ্ছা ও অভিপ্রায় ব্যক্ত না হইলেও তিনি স্বামীর প্রয়োজন বুঝিয়া কার্য্য করিতে নিযুক্ত। স্বামীর বস্ত্রাদি ঠিক করিয়া রাখা, সর্ব্বদা স্বামীর খাদ্য ও স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা তাঁহার ব্রত হইয়াছে। যখন কোন কার্য্য না থাকে, তখন তিনি নিরন্তর স্বামীর বদনের প্রতি চাহিয়া কালাতিবাহিত করেন। অন্য কথাবার্ত্তায় তাঁহাকে বড় মিশিতে

দেখি না। নিতান্ত হাস্যের অবসর উপস্থিত হইলে তাঁহার অধরের এক প্রান্ত একটু কুঞ্চিত হয় মাত্র। তাঁহার নয়নের ভাব সর্ব্বদাই প্রশান্ত, কিন্তু যখন তাঁহার স্বামী—কোন ঝিই হউক বা যে কেহ হউক—অন্য কোন স্ত্রীলোকের সহিত একটু ভাল মুখে বা হাসি মুখে কথা কহেন, তখন রঙ্গমতী দেবীর সেই প্রশান্ত নয়ন ঈর্ষায় বাঘিনীর ন্যায় ভাব ধারণ করে। ইহা ভিন্ন অন্য কোন সময়ে তাঁহার প্রশান্ত ভাবের কোন বিপর্য্যয় লক্ষ্য নাই। তাঁহার হৃদয়ভাব বুঝিয়া লওয়া অসাধ্য—তাঁহার মন সম্পূর্ণ দুর্ভেদ্য। দুই একবার বাক্য-কথন কালে তাঁহার স্বরের পরিবর্ত্তন আমি লক্ষ্য করিয়াছি এবং এক আধ বার তাঁহার ওষ্ঠাধরের একটু ভাবান্তর দেখিয়াছি। অনুমান করিয়াছি, হয়ত তাঁহার বাহ্য প্রশান্ত ভাব হৃদয়স্থিত দারুণ অসোয়াস্তের আবরণ মাত্র; হয়ত এই আবরণ মধ্যে সর্ব্বনাশসাধিনী মনোবৃত্তি লুকাইয়া আছে। যাহাই হউক বাহ্যতঃ যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর কিছু দিন পরীক্ষা করিলে অবশ্যই এই রমণীর চরিত্র সম্বন্ধে অধিকতর অভিজ্ঞতা জন্মিবে।

সেই যাদুকর—রঙ্গমতীর সেই বাঙ্গাল স্বামী, যিনি স্ত্রীকে এইরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া আনিয়াছেন তিনি কেমন লোক? তিনি অসাধারণ লোক। তিনি সকলকেই বশ করিতে সক্ষম। তিনি যদি কোন বাঘিনীকে বিবাহ করিতেন, তাহা হইলে সেও এমনই বশ হইত; যদি আমাকে বিবাহ করিতেন আমিও অমনই করিয়া তাঁহার তামাক সাজিতাম, তাঁহার মুখপানে চাহিয়া দিন কাটাইতাম এবং তাঁহার ইচ্ছার দাসী হইয়া থাকিতাম।

আমার এই গুপ্ত দিনলিপির পৃষ্ঠায় লিখিতেও শঙ্কা হইতেছে যে, চৌধুরী মহাশয়কে আমার ভাল লোক বলিয়া বোধ জন্মিয়াছে, তাঁহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হইয়াছে। দুইটি দিন মাত্র তাঁহাকে দেখিয়াছি, অথচ এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার সম্বন্ধে আমার অনুরাগ জন্মিয়াছে। কেমন করিয়া এ আশ্চর্য্য ভাব জন্মিল, তাহা আমার জ্ঞানের অগোচর।

বিস্ময়ের বিষয় আমি এখনও মনশ্চক্ষে চৌধুরী মহাশয়ের মূর্ত্তি সুন্দর রূপে দেখিতে পাইতেছি। লীলা ব্যতীত চক্ষু-সমক্ষে অনুপস্থিত আর কোন ব্যক্তির মূর্ত্তি এমন সুন্দর রূপে দেখিতে পাই না তো? রায় মহাশয় আছেন, দেবেন্দ্র বাবু আছেন, কাহারও মূর্ত্তি এমন ভাবে কল্পনা-সমক্ষে কখনই উপস্থিত হয় না তো? চৌধুরী মহাশয়ের কথা আমার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে; কল্য তাঁহার যে কথা শুনিয়াছি, আজি এখনও তাহা শুনিতেছি। কেমন করিয়া তাঁহার কথা বর্ণনা করিব? তাঁহার আকৃতিতে, তাঁহার ব্যবহারে, তাঁহার কথোপকথন ও হাস্য পরিহাসে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা অন্যের হইলে আমি বিশেষ রূপ নিন্দা ও বিদ্রূপ করিতাম। তাঁহার সম্বন্ধে সে সকল বিষয়ে আমি নিন্দা বা বিদ্রূপ করিতে পারিতেছি না কেন?

তিনি বেজায় মোটা। ইহার পূর্ব্বে চিরকাল আমি স্থূলকায় ব্যক্তিদিগকে বিশেষ অপ্রীতির চক্ষে দেখিতাম। আমার চিরকালের বিশ্বাস স্থূলকায় ব্যক্তি প্রায়ই নিষ্ঠুর, নীচাশয়, পাপাসক্ত এবং ঘৃণার্হ। এরূপ বিশ্বাস সত্ত্বেও আজি অতিস্থূল জগদীশনাথ চৌধুরীর মূর্ত্তি আমার চক্ষে বড়ই ভাল লাগিয়াছে। বস্তুতই ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। তাঁহার মুখ দেখিয়াই কি তাঁহার সম্বন্ধে আমার এরূপ মত জন্মিয়াছে? তাঁহার মুখ-শ্রী বড়ই সুন্দর বটে। এই

পঞ্চান্ন বর্ষ বয়সেও সে মুখে একটী কালিমা পড়ে নাই, একটী কেশ, একগাছি শুক্ষ সাদা হয় নাই—নবীন যুবকের ন্যায় সেই উজ্জল বদন শোভার সামগ্রী সন্দেহ নাই। কিন্তু সর্ব্বোপরি তাঁহার নয়নযুগলই পরম রমণীয়। তাহা অপরিজ্ঞেয় রহস্যের নিকেতন। আমি তাঁহার সেই নয়নের স্নিগ্ধোজ্জল জ্যোতিঃ চাহিয়া দেখিয়া থাকি এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়। তাঁহার বর্ণ, তাঁহার গঠন সকলই আশ্চর্য্য। আপাততঃ যতদূর বুঝিতে পারিতেছি তাহাতে তাঁহার নয়নদ্বয়ই অনন্যসাধারণ বলিয়া বোধ হইয়াছে, এবং হয়ত সেই জন্যই আমার চক্ষে তাঁহার মূর্ত্তি ভাল লাগিয়াছে।

তাঁহার কথাবার্ত্তায় পূর্ব্ব বঙ্গের গন্ধও নাই, ইহাও তাঁহার বিশেষ প্রশংসার কথা। স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার কোমলতাপূর্ণ ব্যবহার, বিনীত ভাব ও আগ্রহ সহকারে স্ত্রীলোকের কথায় কর্ণপাত করা সকলই বড়ই সুন্দর এবং নারীহৃদয়ে অনুরাগ উদ্দীপক।

চৌধুরী মহাশয়ের কার্য্যকলাপ অনেক স্থলেই বিস্ময়জনক। তিনি এত স্থূলকায় তথাপি তাঁহার গতিবিধি বালকের ন্যায় দ্রুত ও সহজ। তাঁহার সকল কার্য্যই কোমলতাপূর্ণ ও মধুরতাময়। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব জন্তুর বড়ই অনুরাগী। তাঁহার অনেকগুলি পালিত প্রাণী আছে; তাহার অধিকাংশই তিনি মুঙ্গেরে ফেলিয়া আসিয়াছেন—কেবল একটা কাকাতুয়া, এক খাঁচা মহুয়া ও কতকগুলা বিলাতী ইন্দুর তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে। এই সকল প্রাণীর সমস্ত সেবাশুশ্রূষা তিনি স্বহস্তেই করিয়া থাকেন। ইহারাও আশ্চর্য্য পোষ মানিয়াছে। কাকাতুয়াটা বড় দুষ্ট, কিন্তু দেখিলেই বুঝা যায় যে তাঁহাকে বড় ভাল বাসে। তিনি যখন তাহাকে ছাড়িয়া দেন, তখন সে তাঁহার গায়ে বসে, তাঁহার মুখে আপনার মুখ ঘসিতে থাকে এবং বড়ই প্রীতি প্রকাশ করে। যখন মহুয়ার খাঁচা খুলিয়া দেন, তখন তাহারা মহানন্দে তাঁহার সুবিস্তৃত দেহের উপর উড়িয়া আইসে এবং তিনি অঙ্গুলি বিস্তার করিয়া ধরিলে তাহারা একে একে সেই আঙ্গুলের উপর নাচিয়া বেড়ায়; তিনি আজ্ঞা করিলে তাহারা শব্দ করিতে থাকে এবং নিষেধ করিলে নিস্তব্ধ হয়। আশ্চর্য্য ক্ষমতা! তাঁহার ইন্দুরগুলি তাঁহার স্বহস্ত নির্ম্মিত সুরঞ্জিত অতি সুন্দর মন্দিরাকৃত এক তারের খাঁচায় বাস করে। ছাড়িয়া দিলে তাহারা তাঁহার জামার মধ্যে প্রবেশ করে এবং কখনও বা তাঁহার মাথায় আশ্রয় লয়। তিনি অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর অপেক্ষা এই ইন্দুরগুলিকে বেশী ভাল বাসেন। তাহাদিগকে চুম্বন করেন এবং সতত তাহাদিগকে নানা প্রকার আদরের কথা বলিয়া সোহাগ করেন। অন্য লোক হইলে হয়ত এ সকল কার্য্য নিতান্ত ছেলেমানুষি বলিয়া লজ্জিত হইত। কিন্তু চৌধুরী মহাশয় কাহারও বিদ্রূপ বা তিরস্কারে কর্ণপাত না করিয়া আপন মনে ইন্দুর ও পাখী গুলিকে সোহাগ করিয়া দিন কাটাইয়া আসিতেছেন।

পাখী ও ইন্দুর লইয়া যে চৌধুরী মহাশয় এত ব্যস্ত, কোন স্থানে আবশ্যক হইলে ও প্রসঙ্গ উঠিলে, তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেও সক্ষম। সংস্কৃত, ইংরাজী, বাঙ্গালা ও পারসী ভাষায় তাঁহার অপরিজ্ঞাত পুস্তক অতি বিরল। যাবতীয় সভ্য সমাজের প্রথা তাঁহার অভ্যস্ত এবং এই জন্যই সকল সভাতেই অনতিদীর্ঘ কাল মধ্যে তিনি স্বীয় আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম। রাজার মুখে শুনিয়াছি, এই পাখী যাদুকর, ইন্দুরবশকারক, খাঁচা-নির্ম্মাণকারী

ব্যক্তি রসায়ন শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত এবং তৎসম্বন্ধে নানা তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন। মৃত্যুর পর মানবদেহ অনন্ত কালের নিমিত্ত প্রস্তরবৎ কঠিন করিয়া রাখা ঐ সকল আবিষ্ক্রিয়ার অন্যতম। এই নারীজনোচিত কোমল ও কাতরস্বভাব ব্যক্তি অদ্য প্রাতে রাজার আস্তাবলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। রাজার একটী অতি দুর্দ্দান্ত পাহাড়ী কুকুর সেই আস্তাবলে সুদৃঢ় শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া তফাতে রাখা হইত। চৌধুরী মহাশয় যখন সেখানে গিয়াছিলেন, তখন আমি ও রঙ্গমতী দেবী সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কুকুর-রক্ষক বলিল,—"খবরদার মহাশয়! বড় কাছে যাইবেন না। কুকুরটা তাড়াইয়া কামড়ায়।" চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"লোকে ভয় করে বলিয়া ও ঐরূপ করে। দেখা যাক আমাকে তাড়াইয়া কামড়ায় কি না।" এই বলিয়া দশ মিনিট পূর্ব্বে যে আঙ্গুলের উপর মনুয়া পাখী নাচিতেছিল সেই অঙ্গুলি এই ব্যাঘ্রবৎ ভয়ানক পশুর মস্তকে স্থাপন করিলেন এবং তীক্ষ্ণ ভাবে তাঁহার চক্ষুর প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"হতভাগ্য কুকুর, যে তোমার ভয়ে ভীত, তাহারই কাছে তোমার যত বল বিক্রম। যে তোমার প্রকাণ্ড শরীর দেখিয়া, তোমার রক্ত-লোলুপ মুখ দেখিয়া, তোমার ভয়ানক দাঁত দেখিয়া বড় ভয় পায়, তুমি তাহারই সর্ব্বনাশ করিতে বড় মজবুত। কিন্তু আমি তোমাকে ভ্রূক্ষেপও করি না, এই জন্য তুমি আমার মুখের প্রতি চাহিতেও সাহস করিতেছ না। আমার এই মোটা গলায় একবার দাঁত ফুটাইয়া দেও না দেখি—হোঃ হোঃ তোমার পোড়ামুখ—ভীরু, কাপুরুষ। এই বলিয়া চৌধুরী মহাশয় সেই ভয়ানক বন্য ও অতি হিংস্র কুকুরের নিকট আপনার গলা পাতিয়া ধরিলেন! তাহার পর উঠিয়া বলিলেন,—"ওহো আমার ভাল জামাটায় হতভাগা কুকুরের মুখের লাল লাগিয়া গিয়াছে।" চৌধুরী নানা প্রকার কাপড় ও পরিচ্ছদের বড় অনুরাগী। ইহাও তাঁহার আর একটা ছেলে-মানুষির পরিচয়।

তিনি যতদিন এইখানে থাকিবেন, ততদিন যে আমাদের সহিত সদ্ভাব সহকারে কাল কাটাইবেন তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছি। লীলা আমাকে বলিয়াছিল যে, সে তাহাকে দেখিতে পারে না। চৌধুরী মহাশয় তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং ইহাও জানিতে পারিয়াছিলেন যে, লীলা বড় ফুল ভালবাসে। যখন লীলা একটা ফুলের তোড়ার সন্ধান করে, তখনই চৌধুরী মহাশয় তাহা হস্তে লইয়া উপস্থিত। আরও আশ্চর্য্য —তিনি যেমন তোড়াটী রাণীর হস্তে দেন, অবিকল সেইরূপ আর একটী তোড়া স্বীয় নির্ব্বাক্ অথচ হিংসা-জর্জ্জরিত পত্নীর হস্তে দিয়া তাঁহাকেও শান্ত করেন। এ সকলই সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকে। প্রকাশ্য রূপে তিনি তাঁহার পত্নীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন তাহা দেখিবার বিষয় বটে। তিনি সতত তাঁহাকে 'দেবি', 'প্রিয়তমে' বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন এবং বিহিত-বিধানে প্রেম ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। যে প্রতাপশালী লৌহদণ্ডের প্রভাবে এই দুর্দ্দমনীয়া রমণীকে তিনি এরূপ সুশাসনের অধীনে সংস্থাপিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহার কার্য্য-প্রণালী অবশ্যই সাধারণ নয়নের বহির্ভূত।

আমার সহিত তাঁহার ব্যবহার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তোষামোদের দ্বারা তিনি আমার মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহার সম্মুখে যখন আমি উপস্থিত না থাকি, তখন এ কথা

আমি বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু যেই আমি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হই, তখনই আবার তাঁহার সুমিষ্ট বাক্যজালে পড়ি—সকলই ভুলিয়া যাই। পাহাড়ী কুকুর, রঙ্গমতী দেবী, লীলা, রাজা সকলকেই তিনি যেমন চালাইয়া লইয়া বেড়ান, আমাকেও ঠিক তেমনই চালাইয়া থাকেন। রাজাকে তিনি নাম ধরিয়া ডাকেন। রাজা যতই ঠাট্টা বিদ্রূপ করেন সমস্তই তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দেন। "প্রমোদ! তোমার বুদ্ধির আমি প্রশংসা করি।" "প্রমোদ তোমার রহস্যে আমি সন্তুষ্ট।" এইরূপ বাক্যে সৎ-স্বভাব পিতা উচ্ছৃঙ্খল পুত্রের সহিত যেরূপ ভাবে ব্যবহার করেন, তিনি রাজার সহিত সেইরূপ ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

এই আশ্চর্য্য ব্যক্তির অতীত ইতিহাস জানিতে আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছিল, এজন্য আমি রাজাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। রাজা হয়ত বিশেষ সংবাদ জানেন না, হয়ত আমাকে সমস্ত কথা বলিলেন না। লাহোরে যেরূপে রাজার সহিত চৌধুরী মহাশয়ের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তাহার পর হইতে তাহারা উভয়ে নিরন্তর একত্র নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছেন; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে কখনই গমন করেন নাই। চৌধুরী মহাশয় স্বীয় নিবাস-ভূমির সীমায় প্রবেশ করিতেও নিতান্ত অনিচ্ছুক; জানি না ইহার কারণ কি। কিন্তু স্বকীয় প্রদেশস্থ লোক কোথায় কে আছে তাহা জানিতে এবং তাহার সন্ধান লইতে তিনি সততই ব্যস্ত। তিনি যে দিন প্রথমে আসিয়া পৌছিলেন, সে দিন আসিয়াই জিজ্ঞাসিলেন, গ্রামসন্নিধানে পূর্ব্ব বঙ্গের কোন লোক বাস করে কি না। তাহার জীবনে অবশ্যই কোন গুরুতর রহস্য নিহিত আছে। সে রহস্য কি তাহা আমার সম্পূর্ণ দুজ্ঞেয়।

চৌধুরী মহাশয়ের সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়াছি, মোট কথা, ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক, তাঁহাকে আমার কতকটা ভাল লাগিয়াছে। রাজার উপর তাঁহার যেরূপ আধিপত্য আমার উপরও তদ্রূপ। রাজা যত তামাসাই করুন আর শক্ত কথাই বলুন, তাহাকে মর্ম্মান্তিক বিরক্ত করিতে যে বিশেষ শঙ্কিত হন, তাহা আমি বেশ জানি। আমিও কোন অংশে কদাপি চৌধুরী মহাশয়কে শত্রু করিতে চাহি না। তাহাকে আমি ভয় করি, না ভাল বাসি বলিয়া আমার এ ভাব?—কে জানে।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ। এ কয়দিন কেবল নিজের মনের ভাব ভিন্ন আর কিছু লিখিবার ছিল না; আজি লিখিবার মত একটী ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটিয়াছে। রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আজি এক জন লোক আসিয়াছেন, তিনি লীলারও অপরিচিত, আমারও অপরিচিত এবং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, রাজা তাহার আসিবার কোন সংবাদ পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই। আমরা সকলে বসিয়া আছি, এমন সময় সরদার-খানসামা আসিয়া সংবাদ দিল,—"খোদাবন্দ, মণি বাবু আসিয়াছেন, তিনি এখনই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।"

রাজা চমকিয়া উঠিলেন এবং খানসামার মুখের দিকে যুগপৎ ক্রোধ ও ভীতি সহকৃত দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"কে? মণি বাবু?"

"হাঁ হুজুর, মণি বাবু—কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন।"

"কোথায় আছেন?"

"খোদাবন্দ, নীচে, কেতাবঘরে।"

শেষ উত্তর শুনিবামাত্র তিনি কাহাকে কোন কথা না বলিয়া এবং কাহার দিকে

লক্ষ্যও না করিয়া বেগে সেই দিকে প্রস্থান করিলেন।

লীলা সভয়ে ও আগ্রহের সহিত আমার মুখের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"মণি বাবু কে দিদি?"

আমি বলিলাম,—"আমি তাহার কিছুই তো জানি না।"

জগদীশনাথ চৌধুরী মহাশয় কোন দিকে মন না দিয়া ঘরের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া তাহার দুরন্ত কাকাতুয়ার সহিত খেলা করিতেছিলেন। কাকাতুয়াটা তাহার স্কন্ধদেশে বসিয়া তদীয় পরিপুষ্ট গ্রীবায় স্বীয় চঞ্চু বুলাইতেছিল। তিনি এইরূপ ভাবে আমাদের সমীপস্থ হইয়া প্রশান্ত ভাবে বলিলেন,—"মণি বাবু রাজার উকীল।"

লীলা যাহা জিজ্ঞাসা করিল তাহার উত্তর পাওয়া গেল বটে, কিন্তু উত্তরটা সন্তোষজনক হইল না। যদি উকীল মহাশয় মক্কেলের অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া এখানে আগমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই বটে, কিন্তু যদি তিনি বিনা আহ্বানে আপনার কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এতদুর আসিয়া থাকেন এবং তাহার আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া গৃহস্বামী যখন এতাদৃশ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন, তখন নিশ্চয় তিনি যে জন্ম আসিয়াছেন তাহা সহজ ও সামান্য কথা নহে। লীলা ও আমি উদ্বিগ্ন ভাবে বহুক্ষণ রাজার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় তথায় বসিয়া রহিলাম। রাজার প্রত্যাগমনের কোন লক্ষণই না দেখিতে পাইয়া, আমরা উভয়েই অগত্যা গাত্রোত্থান করিলাম। চৌধুরী মহাশয় তখন ঘরের অন্য দিকে দাঁড়াইয়া আপন মনে কাকাতুয়াকে ছোলা খাওয়াইতেছিলেন। আমরা গৃহত্যাগ করিতেছি বুঝিতে পারিয়া তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া ঘরের দরজা টানিয়া ধরিলেন। প্রথমে রঙ্গমতী ঠাকুরাণী ও লীলা বাহির হইলেন। আমিও বাহির হইবার উপক্রম করিতেছি এমন সময়ে চৌধুরী মহাশয় আমার মনের কথা টানিয়া লইয়া বলিলেন,—হাঁ, মনোরমা দেবি, নিশ্চয়ই কিছু ঘটিয়াছে।"

আমি মনে তাহাই ভাবিতেছিলাম বটে, কিন্তু মুখে তো কোন কথাই ব্যক্ত করি নাই! আমি চৌধুরী মহাশয়ের কথায় একটা উত্তর দিব মনে করিলাম, কিন্তু তখনই কাকাতুয়াটা এমনই বিকট ও কর্কশ ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল যে, আমার সর্ব্বাঙ্গশরীর হিলবিল করিয়া উঠিল এবং তাড়াতাড়ি সেখান হইতে পলাইয়া বাঁচিলাম এবং লীলার সহিত মিলিত হইলাম; তাহার মনের অবস্থা অবিকল আমারই মত। চৌধুরী মহাশয় আমার মনের ভাব টানিয়া যে যে কথা বলিয়াছিলেন, লীলাও এখন তাহারই প্রতিধ্বনি করিল। সেও আমাকে নির্জ্জনে বলিল যে, তাহার মনে আশঙ্কা হইতেছে যে নিশ্চয়ই কিছু ঘটিয়াছে। লীলা আপনার প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেল, আমি নিজের ঘরে বসিয়া রহিলাম। ঘণ্টা দুই পরে একবার বাগানে বেড়াইতে ইচ্ছা হওয়ায় একা বাহির হইলাম। সিঁড়ি হইতে নামিব এমন সময়ে রাজা এবং মণি বাবু কেতাবঘর হইতে বাহির হইলেন বুঝিতে পারিলাম। ভাবিলাম তাঁহারা অবশ্যই কোন গূঢ় পরামর্শে নিযুক্ত আছেন, এ সময়ে তাঁহাদের সম্মুখস্থ হইয়া বিরক্তি উৎপাদন করা ভাল নয়; অতএব তাঁহারা যতক্ষণ মাঝের কামরা হইতে চলিয়া না জান, ততক্ষণ আমি নামিব না। যদিও তাঁহারা বিশেষ সাবধান হইয়া কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন, তথাপি তাঁহাদের একটা

কথা বেশ স্পষ্টই আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি শুনিতে পাইলাম উকীল বলিতেছেন,—"আপনি মন ঠিক করুন রাজা। সমস্ত ব্যাপারই আপনার রাণীর উপর নির্ভর করিতেছে।"

আমি নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু একজন অপরিচিত ব্যক্তির মুখে রাজার রাণী সুতরাং লীলার উল্লেখ শুনিয়া আর নড়িতে পারিলাম না। আমি স্বীকার করি, এরূপে গোপনে অপরের কথোপকথন শ্রবণ করা নিতান্ত নিন্দনীয় কার্য্য। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমি কেন, সমগ্র নারীজাতির মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি সূক্ষ্ম ন্যায়ের প্ররোচনায় স্বীয় জীবন-সর্ব্বস্বের স্বার্থানুসন্ধানে অন্ধ হইয়া থাকিতে পারেন? অন্যে পারেন পারুন, আমি তাহা পারিলাম না, কখন পারিবও না এবং আবশ্যক হইলে এতদপেক্ষা অন্যায় উপায়েও এরূপ কথাবার্ত্তা না শুনিয়া ক্ষান্ত হইব না। উৎকর্ণ হইয়া সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। উকীল বলিতে লাগিলেন,—"বুঝিলেন রাজা, রাণীকে একজন,—আর আপনি যদি বিশেষ সতর্ক হইয়া কাজ করিতে চাহেন, তাহা হইলে না হয় দুইজন—স্বাক্ষীর সম্মুখে উঁহাতে নামসহি করিতে হইবে; আর তাহা যে তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। এক সপ্তাহের মধ্যে যদি আপনি ইহা করিতে পারেন তাহা হইলে সব ঠিক হইয়া যাইবে এবং ভাবনার আর কোনই কারণ থাকিবে না, কিন্তু যদি—"

রাজা রাগত স্বরে বাধা দিয়া বলিলেন,—"কিন্তু যদি কি? যদি ইহা করিতেই হয় তাহা হইলে অবশ্যই ইহা করা হইবে। তোমাকে এ কথা আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি মণি বাবু।"

উকীল বলিলেন,—"ঠিক কথা। তবে কি জানেন রাজা, সকল বিষয়েরই দুদিক আছে। আমরা উকীল মানুষ, আমরা কোন কথাই দুদিক বিচার না করিয়া ছাড়িতে পারি না। সেই জন্যই বলিতেছি যে, যদিই কোন বিশেষ কারণে এ ব্যবস্থামত কার্য্য না ঘটিয়া উঠে, তাহা হইলে বিশেষ চেষ্টা চরিত্র করিয়া আমি বড় জোর না হয় তিন মাস সময় লইতে পারিব। কিন্তু তাহার পর—সেই তিন মাস হইয়া গেলে—"

"আঃ কিসের তিন মাস! টাকা সংগ্রহ করার কেবল একই উপায়। আমি তোমাকে আবার বলিতেছি, ঠিক সেই উপায়েই টাকা সংগ্রহ করা হইবেই হইবে। সে কথা যাউক; এ বেলা খাওয়া দাওয়া না করিয়া যাওয়া হইবে না মণি বাবু।"

"না রাজা, আমাকে মাপ্ করিবেন। আমার আর এক মুহূর্ত্ত দেরি করিলে চলিবে না। এখনই না যাইলে আমি গাড়ি পাইব না। অতএব আমি আপাততঃ বিদায় হইতেছি। নমস্কার।"

"বটে, এত তাড়াতাড়ি! তবে অন্য গাড়ীতে না গিয়া বগিতে যাও।" এই বলিয়া তিনি শীঘ্র বগি তৈয়ার করিতে আদেশ করিলেন। বগি তৈয়ার হইলে মণি বাবু তাহাতে উঠিলেন। রাজা বলিলেন,—"দেখো তাড়াতাড়িতে বগি চালাইতে যেন ঠক্কর খাইয়া উল্টাইয়া পড়িয়া কৃষ্ণ লাভ করিও না" মণি বাবু চলিয়া গেলেন। রাজা আসিয়া পুনরায় পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিলেন।

আগাগোড়া সমস্ত কথা আমি শুনিতে পাই নাই বটে, তথাপি যতটুকু শুনিলাম তাহাতেই আমাকে বিশেষ উৎকণ্ঠিত করিল। নিশ্চয়ই কিছু ঘটিয়াছে বলিয়া যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম,

এখন বুঝিলাম যাহা ভয়ানক রকম একটা টাকার হাঙ্গামা এবং তাহা হইতে রাজার নিষ্কৃতির এক মাত্র উপায় লীলা। রাজার অর্থঘটিত হাঙ্গামার মধ্যে লীলাকে পড়িতে হইবে ভাবিয়া আমি বড় আকুল হইয়া উঠিলাম এবং রাজার প্রতি আমার বদ্ধ অবিশ্বাস হেতু সই ভীতি আরও বর্দ্ধিত হইল! বাহিরে বেড়াইতে না গিয়া আমি যাহা শুনিয়াছি তাহা বলিবার নিমিত্ত লীলার প্রকোষ্ঠে গমন করিলাম। লীলা এ সকল কুসংবাদ এতাদৃশ অবিচলিত ভাবে শ্রবণ করিল যে, আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। আমি সহজেই বুঝিলাম যে লীলা তাহার স্বামীর চরিত্র ও তাঁহার বৈষয়িক বিশৃঙ্খলার অনেক রহস্য সবিশেষ জ্ঞাত আছে। লীলা বলিল, "সেই ভদ্রলোক, আমরা আসার আগে যিনি এখানে আসিয়াছিলেন কিন্তু নাম বলিতে স্বীকার করেন নাই, তাঁহার বৃত্তান্ত যখন আমি শুনিয়াছিলাম, তখনই আমার মনে এই আশঙ্কাই হইয়াছিল।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"তবে কে সে ভদ্রলোক?"

লীলা উত্তর দিল, "কোন মহাজন—রাজার নিকট অনেক টাকা পাইবে। তাহারই জন্য আজি এখানে মণি বাবুর আগমন।"

"এই সকল দেনার কথা তুমি কিছু জান?"

"না, আমি বিশেষ কিছুই জানি না।"

"লীলা, তুমি স্বচক্ষে না পড়িয়া কিছুতে নামসহি করিবে না তো?"

"কখনই না দিদি। তোমার ও আমার সুখ ও শান্তির জন্য ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ আমি তাঁহার যে কিছু সাহায্য করিতে পারি তাহা অবশ্যই করিব। কিন্তু না জানিয়া, অথবা হয়ত যে জন্য ভবিষ্যতে আমাদিগকে অনুতাপ করিতে হইবে, এমন কোন কার্য্যই আমি করিব না। এখন আর এ বিষয়ে কোন কথায় কাজ নাই। তুমি আজি বেড়াইতে যাইবে না দিদি? চল বিলের দিকে বাগানে বেড়াইতে যাই।"

আমরা বাহির হইয়া কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে দেখিতে পাইলাম, চৌধুরী মহাশয় একটা গাছের নীচে লোহার চৌকিতে বসিয়া মৃদুস্বরে গান করিতেছেন। তাঁহার যে আজি বেশ-ভূষার ঘটা তাহার আর কি বলিব? নিতান্ত বিলাসী যুবকও তাঁহার নিকট আজি পোষাকে হারি মানিয়া যায়। যুবকের সাজে এই বৃদ্ধকে যেন বস্তুতই যুবকের ন্যায় দেখাইতেছে। তিনি দূর হইতে আমাদের দেখিতে পাইয়া বিশিষ্ট ইংরাজী কায়দায় সম্মান সহকারে মস্তকান্দোলন করিলেন। আমি বলিলাম,—"লীলা, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এই লোকটা রাজার টাকাকড়ি ঘটিত গোলমালের কথা অনেকটা জানেন।"

লীলা জিজ্ঞাসিল,—"কেন তুমি এরূপ মনে করিতেছ?"

আমি বলিলাম,—"তাহা না হইলে কেমন করিয়া উনি জানিলেন যে, মণি বাবু রাজার উকীল, আর মণি বাবু আসার পর যখন আমি তোমাদের পশ্চাতে বৈঠকখানা হইতে বাহির হইতেছিলাম, তখন আমি একটী কথাও জিজ্ঞাসা করি নাই, তথাপি উনি বলিলেন যে, নিশ্চয়ই কিছু ঘটিয়াছে। স্থির জানিও, ও লোকটা আমাদের অপেক্ষা অধিক খবর রাখে।"

জানুক আর যাই হউক, উঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না দিদি। আমাদের পরামর্শের ভিতরে উঁহাকে কদাচ আসিতে দিও না।"

"দেখিতেছি, উঁহার উপর তোমার বড়ই

বিরাগ। উনি এমন কি করিয়াছেন বা বলিয়াছেন যে তোমার এত বিরাগ ?”

“কিছু না দিদি। বরং যখন আমরা পশ্চিম হইতে বাটী ফিরিয়া আসি, তখন পথে উনি বড়ই সদয় ও শিষ্ট ব্যবহার করিয়া উপ-কৃত করিয়াছেন, আর সময়ে সময়ে আমার প্রতি রাজার অসঙ্গত ক্রোধ উনি থামাইয়া দিয়াছেন। বোধ হয়, আমার স্বামীর উপর আমার অপেক্ষা উহাঁর আধিপত্য বড় প্রবল, এই জন্যই বা আমি উহাঁর উপর বিরক্ত।”

আমরা বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিলাম; রাজা, চৌধুরী মহাশয়, পিসী মা ঠাকুরাণী, লীলা ও আমি নানা প্রকার গল্প গুজব করিয়া দিনটা কাটাইলাম মন্দ নহে; কেন ভগবান্ জানেন, রাজা কিন্তু আজি আমাদের সহিত বিশেষ সদ্ব্যবহার করিতেছেন। বিবা-হের পূর্ব্বে রাজা যখন আনন্দধামে যাইতেন, তখন আমাদের সহিত যেমন সদয় ও উদার ব্যবহার করিতেন, আজি যেন সেইরূপ ব্যব-হার করিতে লাগিলেন। কেন যে তাঁহার এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল তাহা আমি কতকটা অনুমান করিতে পারিলাম, আর আমার বোধ হয় লীলাও যেন কতকটা বুঝিতে পারিল। চৌধুরী মহাশয় যে এরূপ ব্যবহারের কারণ জ্ঞাত আছেন তাহা স্থির নিশ্চয়; কারণ আমি দেখিলাম, রাজা আমাদের প্রতি এইরূপ কোমল, সদয় ও উদার ব্যবহারের মধ্যে মধ্যে চৌধুরী মহাশয়ের মুখের দিকে, যেন তাঁহার অনুমোদনের নিমিত্ত, চাহিয়া দেখিতে-ছেন।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ। নানা ঘটনাপূর্ণ ভয়ানক দিন! লীলার নামসহি সংক্রান্ত কি যে কাণ্ডের কথা রাজার উকীল বলিয়া গিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত তাহার কোনই অনুষ্ঠান দেখিলাম না। লীলা ও আমি বিলের দিকে বেড়াইতে যাইব স্থির করিয়া চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার পত্নীর জন্য অপেক্ষা করিতেছি; কারণ তাঁহারাও বেড়াইতে যাইবেন কথা ছিল। এমন সময় রাজা, চৌধুরী মহাশয়ের সন্ধানার্থ, তথায় আগমন করিলেন। আমি বলিলাম,—“তিনি এখনই আসিতে পারেন, আমরা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।”

তখন রাজা কিছু চঞ্চলভাবে গৃহমধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন,—“কথাটা কি, একটা সামান্য কাজের জন্য জগদীশনাথ ও তাঁহার স্ত্রীকে পুস্তকাগারে একবার দরকার আছে। লীলা, তোমাকেও এক মুহূর্ত্তের জন্য সেখানে যাইতে হইবে।” তাহার পর তিনি হঠাৎ আমাদের পরিচ্ছদাদির ভাব দেখিয়া বলিলেন,—“কিন্তু তোমরা কি এখন বেড়া-ইতে যাইতেছ, না বেড়াইয়া ফিরিলে ?”

লীলা বলিল,—“আমরা সকলে বিলের দিকে যাইব মনে করিতেছি। কিন্তু তোমার যদি কোন কাজ থাকে—”

রাজা তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন,—“না না, এখন না হয়, আহারাদির পর সে কাজ শেষ করিলেই চলিবে। তবে সকলেই বিলের দিকে বেড়াইতে যাইতেছ ? বেশ বেশ, আমিও তোমাদের সঙ্গী হইব।

সেই গোপনীয় কাণ্ডের প্রসঙ্গ এতক্ষণে উত্থাপিত হইল। রাজার কার্য্যের অনুরোধে লীলা বেড়ান বন্ধ করিতে স্বীকার করিল, কিন্তু রাজা তাহাতে সম্মত হইলেন না। তবেই রাজা কোন সূত্র পাইয়া কাজটী পিছাইয়া দিতে পারিলে যেন বাঁচেন। আমার তো মনে বড়ই ভয়ের সঞ্চার হইল। না জানি কি কাণ্ড!

চৌধুরী মহাশয় ও চৌধুরাণী ঠাকুরাণী

আসিয়া জুটিলেন। চৌধুরী মহাশয় স্বহস্ত-নির্ম্মিত মন্দিরাকার ইন্দুর-ভবন তারের খাঁচা হাতে করিয়া আসিলেন। তিনি আসিয়া অতি মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"আপনাদের অনুমতিক্রমে আমি আমার এই নিরীহ পরিবারগণকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহি—আমার এ সাধের—সোহাগের ইঁদুরগুলি। বাটীতে অনেক বিড়াল। আমি কি আমার এই ছেলে মেয়েগুলিকে বিড়ালের হাতে সমর্পণ করিয়া যাইতে পারি?—কখনই না।"

তিনি খাঁচা খানি মুখের নিকট উঠাইয়া ইঁদুরদের সোহাগ করিতে লাগিলেন। আমরা সকলেই বেড়াইতে বাহির হইলাম। খানিক-দূর গিয়া রাজা বনের ফুল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে, গাছের গায় ছড়ি মারিতে মারিতে আর এক দিকে চলিয়া গেলেন। এটী তাঁহার স্বভাব। গাছের ফুল দেখিলেই তিনি ছিঁড়িতে বড় ভাল বাসেন। ছিঁড়িয়া এক বার হাতে করিয়া তুলেন, তাহার পরে তখনই ফেলিয়া দেন—আর তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও দেখেন না। ভাঙ্গা কাঠের ঘরে তিনি আবার আমাদের সঙ্গে মিলিলেন। ঘরের ভিতর আমাদের স্থান সংকুলান হইল—আমরা সকলে তথায় উপবেশন করিলাম। কেবল রাজা তাহার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া পকেট হইতে ক্ষুদ্র একখানি ছুরি বাহির করিলেন এবং তদ্দ্বারা সন্নিহিত একটী ডাল কাটিতে লাগিলেন। আমরা তিন জন স্ত্রীলোক এক খানি বেঞ্চের উপর উপবেশন করিলাম। চৌধুরী মহাশয় এক খানি অতি ক্ষুদ্রকায় টুলের উপর বসিয়া দুলিতে লাগিলেন। একবার কাঠের ঘরের দেওয়ালে তাঁহার পিঠের ভার লাগিতে থাকিল—তখন জীর্ণ ঘর মড় মড় করিতে লাগিল—আর একবার তিনি সম্মুখে অবনত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি খাঁচা আপনার ক্রোড়ের উপর লইয়া তাহার কবাট খুলিয়া দিলেন। তখন তন্মধ্যস্থ জীবগণ মহানন্দে বাহির হইয়া তাঁহার গায় হিলিবিলি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। মাগো! তাহা দেখিয়া আমার গা কেমন করিতে লাগিল। কৃমি-সংকুলিতাঙ্গ নরকবাসীর যে বিবরণ শুনিয়াছি, এ দৃশ্য দর্শনে আমার তাহাই মনে পড়িতে থাকিল।

এই সময়ে রাজা স্বহস্ত-কর্ত্তিত বৃক্ষ-শাখা ঘূর্ণিত করিয়া বলিলেন,—"কোন কোন লোক এই দৃশ্যকে পরম রমণীয় বলিয়া মনে করেন কিন্তু আমার বোধ হয় এ স্থানটী আমার সম্পত্তির মধ্যে কলঙ্ক। আমার প্রপিতামহের সময়ে বিলের জল এই পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর এখন ইহার অবস্থা দেখ। ইহা এক্ষণে কাদা ও বন জঙ্গলে পূর্ণ। ইহার কোথাও এক হাতের অধিক জল নাই। আমি যদি কোন সুযোগে এই জলটা বাহির করিতে পারি, তাহা হইলে এখানে আবাদ করিব ইচ্ছা আছে। আমার দেওয়ান এক জন নেহাৎ আহাম্মক সেকেলে লোক। সে বলে এ বিলের উপর দেবতাদের অভিসম্পাত আছে। জগদীশনাথ, তুমি কি বল? এ জায়গাটা ঠিক খুনের জায়গার মতই দেখায়—নয়?"

চৌধুরী মহাশয় তিরস্কারের স্বরে বলিলেন,—"প্রমোদ! তোমার দক্ষিণ-দেশী পাকা বুদ্ধি বুঝি ভাবিয়া এই স্থির করিল? এখানে জল অতি অল্প—লাস লুকান কঠিন। আর চারি দিকে বালি—তাহাতে হত্যাকারীর পায়ের দাগ পড়িবে। মোটের উপর খুনের পক্ষে ইহার অপেক্ষা অনুপযুক্ত জঘন্য স্থান আমি আর কোথাও দেখি নাই।"

রাজা হস্তস্থিত বৃক্ষ-শাখা দ্বারা সজোরে

ভূপৃষ্ঠে আঘাত করিয়া বলিলেন,—"আরে ছ্যাঃ! আমি যাহা বলিলাম তুমি ছাই তাহা বুঝিতেও পারিলে না। আমি বলিতেছি, এই ভয়ানক স্থান—এই নির্জ্জনতা—এখানকার সকলই হত্যাকার্য্যের অনুকূল। বুঝিয়াছ কি? না আরও খোলসা করিয়া বলিতে হইবে?"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"তোমার মত যদি আমারও বুদ্ধি সূক্ষ্ম হইত, তাহা হইলে, ঐ রকমই বুঝিতাম বটে। যদি কোন নির্ব্বোধ হত্যাকারীর চক্ষে এ বিল পড়ে, সে ইহা হত্যাকার্য্যের পক্ষে বড়ই সুবিধাজনক বলিয়া মনে করিবে; আর যদি কোন সুবোধ হত্যাকারী স্থান অন্বেষণ করে, তাহা হইলে তোমার এ বিল মোটেই উপযুক্ত স্থান নহে বলিয়া সে পিছাইয়া যাইবে। এই তোমাকে সার কথা বলিলাম। এ কথা বুঝিয়া দেখ।"

লীলা অত্যন্ত ঘৃণাসূচক দৃষ্টির সহিত চৌধুরী মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিল,—"এই বিল দর্শনে খুনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায় আমি বড় দুঃখিত হইতেছি। আর পিসে মহাশয় যদি হত্যাকারীদের শ্রেণী বিভাগ করিতেই ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এ স্থলে তাঁহার উদ্দেশ্য মোটেই সিদ্ধ হয় নাই। তাহাদের কেবল নির্ব্বোধ বলিয়া উল্লেখ করিলে তাহাদের প্রতি বড়ই উদারতা দেখান হয়, সেরূপ কৃপালাভ করিতে তাহাদের কোনই অধিকার নাই। আর তাহাদের সুবোধ বলিয়া উল্লেখ করিলে শব্দের যত দূর সম্ভব অপব্যবহার করা হয়। আমি চিরদিন শুনিয়াছি, যথার্থ সুবোধ লোকেরা যথার্থ ধর্ম্মভীত ও সৎস্বভাবাপন্ন হইয়া থাকেন।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"রাণি, আপনার কথাগুলি শুনিতে ভাল এবং আমি দেখিয়াছি শিশুদের পড়িবার পুঁথিতে ঐ রকম কথা লেখা থাকে।" তাহার পর একটা ইঁদুর হাতে তুলিয়া লইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমার আদরের ইন্দুর! তোর জন্য আজি ভারী একটা উপদেশ সংগ্রহ করিয়াছি। যে ইন্দুর যথার্থ সুবোধ সে ইন্দুর যথার্থই ধর্ম্ম-ভীত ও সৎস্বভাব। বুঝিয়াছিস্? এখন যা তোর সঙ্গীদের এই উপদেশ শিখাইয়া দে—আর খবরদার, যতদিন বাঁচিবি কখন খাঁচার তার কাটিবার চেষ্টা করিস্ না।"

নাছোড়বান্দা লীলা আবার বলিল,—"সকল কথাই তামাসা করিয়া উড়াইয়া দেওয়া সোজা কাজ, কিন্তু চৌধুরী মহাশয়, একজন যথার্থ সুবোধ ব্যক্তি মহাপাপানুরক্ত এরূপ একটা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দেওয়া তত সোজা কাজ নহে।"

চৌধুরী মহাশয় অতি প্রশান্ত ভাবে হাস্য করিয়া বলিলেন,—"ঠিক কথা! নির্ব্বোধের কৃত পাপই ধরা পড়ে, আর সুবোধের কৃত পাপ কখনই ধরা পড়ে না। সুতরাং যদিই আমি কোন দৃষ্টান্ত দেখাই তাহা হইলে সুবোধের দৃষ্টান্ত না হইয়া তাহা নির্ব্বোধেরই দৃষ্টান্ত হইবে। কেমন রাণি, আমি তর্কে হারিয়া গিয়াছি না?"

রাজা প্রবেশ-দ্বারে দাঁড়াইয়া কথা-বার্ত্তা শুনিতেছিলেন। তিনি এখন বলিয়া উঠিলেন,—"লীলা তুমি তোমার তোজদান বন্দুক লইয়া সাবধান হইয়া দাঁড়াও। তুমি বল, পাপ মাত্রেই ধরা পড়ে। একথাও পুঁথিতে লেখা থাকে জগদীশ। ছাড় কেন রাণী, তুমিও এই পুঁথির মন্ত্র ছাড়িয়া দেও। পাপ আপনি ধরা পড়ে—কি ঘৃণার কথা!"

লীলা ধীর ভাবে বলিল,—"আমি সে কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি।"

রাজা এমন বিকট হাস্য করিয়া উঠিলেন যে, সকলেই, বিশেষতঃ চৌধুরী মহাশয়, বড়ই চমকিয়া উঠিলেন। লীলার সহায়তা করিবার জন্য আমিও বলিয়া উঠিলাম,—"আমারও তাহাই বিশ্বাস।" লীলার কথায় রাজা যেমন বেজায় হাসিয়া উঠিয়াছিলেন, আমার কথায় তেমনই বিরক্ত হইয়া হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা বালুকা পৃষ্ঠে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন এবং সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"আহা রাগই প্রমোদ বেচারাকে খাইল! যাহা যাউক, মনোরমা দেবী এবং রাণী ঠাকুরাণী, আপনারা কি সত্যই বিশ্বাস করেন যে পাপ আপনি ধরা পড়ে?" তাহার পর আপনার স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"আর আমার হৃদয়েশ্বরি, তোমারও কি ঐ মত?"

লীলা এবং আমাকে অপমানিত করিবার অভিপ্রায়ে, রঙ্গমতী ঠাকুরাণী, বিশেষ ব্যঙ্গজনক স্বরে, উত্তর দিলেন,—"আমি সুপণ্ডিত লোকের সমক্ষে, কোন বিষয়ে মত ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে, স্বয়ং তাহা শিক্ষা করিতে চাহি।"

আমি বলিলাম,—"সত্য নাকি? কিন্তু যে সময়ে আপনি স্ত্রীলোকের মতের স্বাধীনতা ও স্ত্রীজাতির অধিকার বিষয়ে সমর্থন করিতেন, সে সময়ের কথা আমি ভুলি নাই।"

আমার কথায় বিন্দুমাত্র মনোযোগ না করিয়া তিনি বলিলেন,—"বল চৌধুরী, তোমার কি মত?"

চৌধুরী মহাশয় চিন্তিত ভাবে একটা ইন্দুরের গায়ে একটু টোকা মারিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"মনুষ্য সমাজ কেমন সুকৌশলে আপনার অক্ষমতার কথা চাপা দিয়া ঠাণ্ডা হইয়া থাকে। পাপ কার্য্য ধরিবার জন্য মনুষ্যেরা যে সকল কল খাড়া করিয়াছে তাহা কোন কর্ম্মেরই নহে; কিন্তু সমাজ, সে কথা কাহাকেও বুঝিতে না দিয়া, একটা অর্থহীন নীতিকাব্য বলিয়া, সকলের চক্ষে ধূলা দিতেছে। পাপ আপনি ধরা পড়ে, সত্য কি? আর একটা অর্থহীন নীতি কথা, হত্যাকাণ্ড কখন চাপা থাকে না। থাকে না কি? বড় বড় সহরে যাঁহারা হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান করেন, এ কথা সত্য কি না, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন দেখি রাণী ঠাকুরাণী। দেশের সব খবরের কাগজ পড়ুন দেখি মনোরমা দেবী। যে দুই চারিটা খুনের সংবাদ কাগজে স্থান পায়, তাহার মধ্যে লাস পাওয়া গিয়াছে. অথচ কে খুন করিয়াছে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, এমন খবর থাকে না কি? এখন ভাবিয়া দেখুন, সকল খুনের কথা কাগজে উঠে না এবং সকল লাসও পাওয়া যায় না। যে সকল খুনের কথা কাগজে উঠে এবং যে সকল খুনের লাস পাওয়া যায়,তাহার সহিত যে সকল হত্যাকাণ্ড খবরের কাগজে উঠে না ও যাহার লাস পাওয়া যায় না, তাহা মনে ঠিক দিয়া বলুন দেখি, কি মীমাংসা সঙ্গত? ইহার একই মীমাংসা; যাহারা বোকা খুনে তাহারাই ধরা পড়ে এবং যাহারা বিজ্ঞ খুনে তাহারা এড়াইয়া যায়। খুন লুকান এবং খুন ধরা পড়া ব্যাপার তো আর কিছুই নয়, কেবল এক দিকে পুলিশ এবং আর এক দিকে ব্যক্তিগত কৌশলের পরীক্ষা মাত্র। যে যে স্থলে হত্যাকারী মূর্খ, নির্ব্বোধ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন তাদৃশ দশ জায়গার মধ্যে নয় জায়গায় পুলিশেরই জয় হয়। কিন্তু যেখানে হত্যাকারী শিক্ষিত, সুবোধ ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ তেমন দশ জায়গার মধ্যে নয় জায়গায় পুলিশের হারি হয়। যখন পুলিশ জিতে, তখন আপনারা

তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিতে পান। কিন্তু যদি পুলিশ হারে, তাহা হইলে আপনারা তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারেন না। আপনারা এই নিতান্ত ভঙ্গুরভিত্তির উপর, পাপ মাত্রই আপনি প্রকাশিত হয়, এই সন্তোষপ্রদ নীতি-কথা সংগঠিত করিয়াছেন। যে সকল পাপের সংবাদ আপনারা জানিতে পারেন, তাহার পক্ষে এ কথা সত্য বটে; কিন্তু বাকীর কি ?"

কাঠের ঘরের দরজার নিকট হইতে একজন বলিয়া উঠিল,—"কথা ঠিক আর বলিয়াছও বেশ।" রাজা প্রমোদ, এতক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া, চৌধুরী মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিতেছিলেন; তিনিই এ বাক্যের বক্তা।

আমি বলিলাম,—"কতকটা ঠিক কথা হইতে পারে এবং সমস্তটাই বেশ বলা হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি না, কেন চৌধুরী মহাশয় এরূপ গৌরবের সহিত সমাজের উপর পাপীর বিজয়-ঘোষণা করিতেছেন এবং কেনই বা রাজা এই কার্য্যের জন্য উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার স্তুতিবাদ করিতেছেন।"

রাজা বলিলেন,—"শুনিলে জগদীশ ? আমার কথা শুন, তুমি তোমার শ্রোতাদের সঙ্গে ভাব করিয়া ফেল। তুমি তাঁহাদের বল, যে, ধর্ম্মটা ভারী উত্তম জিনিষ; তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তাঁহারা বড়ই খুসী হইবেন।"

চৌধুরী মহাশয় শব্দ না করিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। দুইটা সাদা ইন্দুর তাঁহার জামার ভিতর ঢুকিয়া গায়ের উপর বেড়াইতেছিল। চৌধুরী মহাশয়ের হাসির চোটে তাহারা না জানি কি মহাপ্রলয় উপস্থিত ভাবিয়া, তাড়াতাড়ি পলাইয়া আসিয়া খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"প্রমোদ, রমণীগণই আমাকে ধর্ম্মের কথা বলুন। আমার অপেক্ষা এ সম্বন্ধে তাঁহারাই বিশেষ অভিজ্ঞ। কারণ ধর্ম্মটা যে কি, তাহা তাঁহারাই জানেন ভাল; আমি তাহা বড় একটা বুঝি না।"

রাজা আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "শুনিলেন আপনারা ? ভয়ানক কথা নয় কি ?"

প্রশান্তভাবে চৌধুরী মহাশয় বলিতে লাগিলেন,—"আমি এই জীবনের মধ্যে অনেক দেশ বেড়াইয়াছি এবং নানা স্থানে নানা ধর্ম্ম দেখিয়া আমার মাথা এখন এমন বেঠিক হইয়া গিয়াছে যে, আমি এই বুড়া বয়সে, কোন্‌টা সত্য ধর্ম্ম, আর কোন্‌টা মিথ্যা ধর্ম্ম তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না। এই আমাদের বাঙ্গালি জাতির মধ্যে এক রকম ধর্ম্ম, আর ঐ মুসলমান জাতির মধ্যে আর এক রকম ধর্ম্ম। রামকৃষ্ণ শিরোমণি, নামাবলী গায়ে দিয়া, আর্কফলা নাড়িতে নাড়িতে বলিতেছেন, আমাদের ধর্ম্ম ঠিক। আবার ও দিকে হোসেন আলি মৌলভি, মাথায় টুপি দিয়া, দাড়ি নাড়িতে নাড়িতে বলিতেছেন, আমাদের ধর্ম্মই ঠিক। কাহাকে কি জবাব দিব তাহা তো আমার বুদ্ধিতে আইসে না। এখন বলতো আমার সোহাগের ইন্দুর গুলি, ধার্ম্মিক লোকের বিষয়ে তোমাদের মত কি ? তোমরা এখনই বলিবে, যে ব্যক্তি তোমাদের ভাল করিয়া রাখে, ভাল করিয়া খাইতে দেয়, সে-ই ধার্ম্মিক।' তোমাদের এ উত্তর মন্দ নয়। কারণ, আর কিছু হউক না হউক, তোমাদের কথাটার একটা মানে আছে।"

এই বলিয়া, কোন উত্তরের অপেক্ষা না

করিয়াই, খাঁচা হাতে লইয়া, তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। তাহার পর খাঁচার ইন্দুর গণিতে আরম্ভ করিলেন। "এক, দুই, তিন, চারি—অ্যা! কি হলো? আর একটা ইন্দুর কই? যেটী সকলের চেয়ে ছোট, সকলের চেয়ে ভাল, আমার সে সোণার যাদু, পদ্মলোচন ইন্দুরটী কোথা গেল?"

আজিকার কথাবার্ত্তায় চৌধুরী মহাশয়ের হৃদয়ের যে পরিচয় পাওয়া গেল, তাহাতে লীলা এবং আমি নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। সুতরাং তাঁহার ইন্দুর সম্বন্ধীয় রসিকতা শুনিয়া আমার একটুও আমোদ হইল না। তথাপি এই সুবিপুলকায় ব্যক্তির, একটা অতি ক্ষুদ্র মূষিকের জন্য, এরূপ কৌতুকজনক কাতরতা দেখিয়া, আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। সেই গৃহের সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিবার সুযোগ হইবে মনে করিয়া, রঙ্গমতী দেবী গাত্রোত্থান করিলে, আমরাও উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। দুই এক পদ আসিতে না আসিতে, আমরা যেখানে বসিয়াছিলাম, সেই বেঞ্চের নীচে চৌধুরী মহাশয় ইন্দুর দেখিতে পাইলেন। তিনি বেঞ্চ সর ইয়া ইন্দুর তুলিয়া লইলেন। তাহার পর সেই স্থানে জানু পাতিয়া, অবনত মস্তকে সম্মুখস্থ ভূমির প্রতি লক্ষ্য করিয়া, কি দেখিতে লাগিলেন। যখন তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার মুখ নিতান্ত বিবর্ণ এবং তাঁহার সর্ব্বশরীর এরূপ কম্পান্বিত যে তাঁহাকে অতি কষ্টে মূষিককে তাহার পিঞ্জরে আবদ্ধ করিতে হইল। তখন তিনি নিতান্ত অস্ফুট স্বরে ডাকিলেন,—"প্রমোদ, রাজা, এ দিকে আইস।"

রাজা, এতক্ষণ কোন দিকে মনোযোগ না দিয়া, ছড়ির অগ্রভাগ দ্বারা বালির উপর দাগ পাড়িতেছিলেন। তিনি চৌধুরী মহাশয়ের ডাক শুনিয়া, ঘরের দিকে আসিতে আসিতে বলিলেন,—"ব্যাপার কি?"

চৌধুরী মহাশয় এক হস্ত রাজার কাঁধে দিয়া এবং অপর হস্ত যে স্থানে ইন্দুর পাওয়া গিয়াছিল, সেই দিকে নির্দ্দেশ করিয়া, জিজ্ঞাসিলেন,—"দেখিতেছ না, ওখানে কি?"

রাজা বলিলেন,—"কতকগুলা ধূলা আর বালি, তাহার মধ্যে একটা ময়লা দাগ, এই তো।"

চৌধুরী মহাশয় তখন কাঁপিতে কাঁপিতে, উভয় হস্তে রাজাকে চাপিয়া ধরিয়া, নিতান্ত ভীতভাবে বলিলেন,—"না না, ময়লা দাগ নহে,—রক্ত!"

লীলা আমার পাশেই ছিল। সে, চৌধুরী মহাশয়ের এই কথা শুনিয়া, নিতান্ত ভয়-চকিত ভাবে আমার দিকে চাহিল। আমি বলিলাম, —"কি জ্বালা' ইহাতে ভয়ের কোনই কথা নাই। ওটা একটা বিলাতী কুকুরের রক্তের দাগ।"

তখন সকলেই কৌতূহলের সহিত আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং রাজাই প্রথমে জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি কেমন করিয়া জানিলেন?"

আমি উত্তর দিলাম,—যে দিন আপনারা সকলে বিদেশ হইতে বাটীতে ফিরিয়া আইসেন, সেই দিন আমি মরণাপন্ন একটা বিলাতী কুকুরকে এই স্থানে দেখিতে পাই। কেমন করিয়া কুকুরটা এই বিলের মধ্যে পলাইয়া আসিয়াছিল, তাহার পর আপনারই মালী তাহাকে গুলি করিয়াছিল।"

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—"কাহার সে কুকুর? আমাদের কোন কুকুর নয় তো?"

লীলা বিশেষ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসিল,

—"আহা! তুমি তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলে, নিশ্চয়ই তুমি তাহার জন্য যত্নের ত্রুটি কর নাই দিদি।"

আমি বলিলাম,—"আমি আর গিন্নি-ঝি তাহাকে বাঁচাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার আঘাত বড়ই সাংঘাতিক হইয়াছিল, কিছুতেই বাঁচিল না।"

রাজা একটু বিরক্তভাবে এবং একটু জোরে আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"কাহার সে কুকুর? আমার নয় তো?"

আমি বলিলাম,—"না, আপনার নয়।"

"তবে কাহার গিন্নি-ঝি জানে কি?"

আমি গিন্নি-ঝির মুখে শুনিয়াছিলাম, হরিমতির আগমন সংবাদ যাহাতে রাজার কর্ণগোচর না হয়, ইহাই তাহার বিশেষ অনুরোধ। সে কথা এখন আমার মনে পড়িল। কিন্তু সকলের ভয় দূর করিবার জন্য আমি এতদূর অগ্রসর হইয়াছি যে, এখন আর সে কথা চাপিয়া রাখিলে চলে না। কাজেই আমাকে বলিতে হইল,—"গিন্নি-ঝি জানে। সেই আমাকে বলিয়াছিল, সে কুকুর হরিমতির।"

এই কথা যেই আমার মুখ হইতে বাহির হওয়া, সেই রাজা তাড়াতাড়ি চৌধুরী মহাশয়কে অসভ্যভাবে ঠেলিয়া ফেলিয়া, আমার ঠিক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং রাগত দৃষ্টির সহিত আমার মুখের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"সেটা হরিমতির কুকুর, তাহা গিন্নি-ঝি জানিল কিরূপে?"

তাঁহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া বিরক্ত ও বিচলিত হইলেও, আমি ধীরভাবে উত্তর দিলাম,—"হরিমতি সেই কুকুর সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল, সেই জন্যই গিন্নি-ঝি তাহা জানে।"

"সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিল? কোথায় আসিয়াছিল?"

"এই বাটীতে।"

"এই বাটীতে হরিমতির কি ঘোড়ার ডিমের দরকার ছিল! সে এখানে কেন আসিয়াছিল?"

এই প্রশ্নের ভাষার অপেক্ষাও, ইহা বলিবার ভঙ্গী নিতান্ত কদর্য্য ও অতিশয় বিরক্তিজনক। আমি কোন উত্তর না দিয়া ঘৃণার সহিত সে দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া, অন্য দিকে গমন করিলাম। তখন চৌধুরী মহাশয়, রাজার পৃষ্ঠে ধীরে ধীরে থাবা দিতে দিতে, মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"ঠাণ্ডা ভাবে—ছি প্রমোদ, শান্তভাবে।"

রাজা নিতান্ত রাগতভাবে চৌধুরী মহাশয়ের মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। চৌধুরী মহাশয় একটু হাসির সহিত প্রশান্ত ভাবে আবার বলিলেন,—"ধীর ভাবে বল। ছি ছি।"

রাজা কিছু অপ্রতিভ হইয়া আমার পশ্চাতে কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন এবং আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আমাকে বিস্ময়াবিষ্ট করিলেন। তিনি বলিলেন,—"মনোরমা দেবি, ইদানীং আমার শরীর ও মনটা বড়ই মন্দ যাইতেছে; এজন্য আমি সময়ে সময়ে সামান্য কারণেও নিতান্ত বিরক্ত হইয়া পড়ি। সে জন্য আপনি কিছু মনে করিবেন না। যাহা হউক, হরিমতি এখানে কেন আসিয়াছিল আমি জানিতে চাহি। কখন সে আসিয়াছিল? গিন্নি-ঝি ছাড়া আর কেহই কি তাহাকে দেখে নাই?"

আমি বলিলাম,—"আমি যতদূর জানি, আর কেহই তাহাকে দেখে নাই।"

এই সময় চৌধুরী মহাশয় মধ্যস্থতা করিয়া বলিলেন,—"তবে সেই গিন্নি-ঝিকেই জিজ্ঞাসা কর না কেন? সংবাদের সেই মূল স্থানে গিয়া সব জান না কেন?"

রাজা বলিলেন,—"ঠিক বলিয়াছ। গিন্নি-ঝিকেই সকল কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক; এতক্ষণ এ কথা আমার মনে উদয় না হওয়াই আহাম্মুকী।"

এই বলিয়া তিনি প্রাসাদের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজা পশ্চাৎ ফিরিবামাত্র চৌধুরী মহাশয়ের মধ্যস্থতার কারণ বেশ বুঝিতে পারা গেল। হরিমতির বিষয়ে এবং তাহার এখানে আসিবার কারণ সম্বন্ধে তিনি তখন উপর্য্যুপরি অসংখ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাজার সমক্ষে এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার তাঁহার সুবিধা হইত না। মনের কথা তাঁহাকে জানাইয়া, তাঁহার সহিত কোন প্রকার আত্মীয়তা সংস্থাপন করিতে আমার বাসনা ছিল না। এজন্য আমি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলাম। লীলা কিন্তু না জানিয়া ও না বুঝিয়া, আপনার কৌতূহল নিবারণের জন্য, আমাকে হরিমতির সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কাজেই আমাকে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক কথা বলিতে হইল। ফল এই দাঁড়াইল যে, ১০ মিনিটের মধ্যে হরিমতি এবং তাহার কন্যা মুক্তকেশী সংক্রান্ত ঘটনাবলী ও তৎসহ দেবেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধ বিষয়ক ব্যাপারের আমি যাহা জানিতাম চৌধুরী মহাশয়ও তাহা জানিয়া ফেলিলেন। রাজার সহিত চৌধুরী মহাশয়ের যেরূপ প্রগাঢ় আত্মীয়তা এবং তাঁহার সর্ব্ববিধ গুপ্ত ব্যাপারে চৌধুরী মহাশয়ের যেরূপ অভিজ্ঞতা, তাহাতে মুক্তকেশী সংক্রান্ত রহস্য তাঁহার অপরিজ্ঞাত থাকা বস্তুতই নিতান্ত বিস্ময়জনক। জগতের মধ্যে যিনি রাজার প্রধানতম বন্ধু তাঁহাকেও যখন রাজা এ ব্যাপার জানান নাই, তখন এই অভাগিনী রমণী সংক্রান্ত রহস্য যৎপরোনাস্তি সন্দেহজনক বলিয়া আমার প্রতীতি হইল। চৌধুরী মহাশয় যে এ বিষয়ের কিছুই জানিতেন না, এ কথা তাঁহার মুখের ভাব ও আগ্রহের আতিশয্য দেখিয়া অতি সহজেই অনুমান করা গেল। এই প্রসঙ্গের কথাবার্তা কহিতে কহিতে আমরা ক্রমশঃ আবাদের মধ্য দিয়া প্রাসাদের অভিমুখে ফিরিতেছিলাম। আমরা বাটী ফিরিয়া প্রথমেই দেখিলাম, ঘোড়া জোতা রাজার এক টম টম গাড়ি তৈয়ারি অবস্থায় প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করিতেছে। বোধ হয় গিন্নি-ঝির নিকট রাজা যাহা যাহা শুনিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন, তাহারই সন্ধানের জন্য এই গাড়ি তৈয়ারি হইয়াছে। সহিস ঘোড়ার মুখ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চৌধুরী মহাশয় নিতান্ত আত্মীয়বৎ কোমল স্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"বাঃ বাঃ খাসা ঘোড়াটী! রাজা আজি কোন্ দিকে বেড়াইতে যাইবেন বাবা?"

সহিস বলিল,—"তাহা আমি এখনও জানিতে পাই নাই।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"এমন সুন্দর ঘোড়াটীকে বেশী খাটাইয়া মাটী না করিলেই ভাল হয়।"

সহিস বলিল,—"ধর্ম্মাবতার, এ ঘোড়াটা বড়ই ভাল। কিন্তু এ যেমন খাটিতে পারে, রাজার আস্তাবলে তেমন আর একটীও নাই। রাজার যে দিন দূরে যাইবার ইচ্ছা থাকে, সেই দিনই এই ঘোড়া গাড়িতে জোড়া হয়।"

চৌধুরী মহাশয় সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"ন্যায় শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত—রাজা তবে আজি দূরে যাইবেন। কি বলেন মনোরমা দেবী?"

আমি এ কথার কোন উত্তর দিলাম না। আমি যাহা জানিতাম ও যাহা দেখিলাম, তাহা

হইতে যে সিদ্ধান্ত সঙ্গত তাহা আমার ঠিক করিতে বাকী ছিল না। কিন্তু চৌধুরী মহাশয়কে মনের কথা বলিব কেন? আমি মনে বুঝিলাম, রাজা যখন আনন্দধামে ছিলেন, তখন মুক্তকেশীর কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য, তিনি বহুদূরে তারার খামার পর্য্যন্ত হাঁটিয়া গিয়াছিলেন। এখন তিনি এখানে। এখানেও কি তিনি সেই মুক্তকেশীর কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য দূর গ্রামান্তরে হরিমতির বাড়ী পর্য্যন্ত গাড়ি চালাইতেছেন না? আমরা ভবনে আরোহণ করিলাম। প্রথম প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করার পর, রাজা পাঠাগারের মধ্য হইতে আসিয়া, আমাদের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহাকে উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল-চিত্ত বোধ হইল। তাঁহার বর্ণ বড়ই পাণ্ডু। তাহা হইলেও তিনি বিশেষ বিনয়, শিষ্টাচার ও ভদ্রতার সহিত আমাদিগকে বলিলেন,—"একটা গুরুতর কাজের অনুরোধে আমাকে আপনাদের ছাড়িয়া আজি একবার গ্রামান্তরে যাইতে হইতেছে। আমি কালি ফিরিব। আপাততঃ আমি যাত্রা করার পূর্ব্বে, প্রাতে যে একটু কাজের জন্য বলিয়াছিলাম, সেই টুকু শেষ হইলে ভাল হয়। রাণি, তুমি একবার কেতাব ঘরে আইস—অতি সামান্য কাজ, এক মিনিটও লাগিবে না। পিসী মা, আপনিও একটু কষ্ট করিবেন কি? জগদীশ, তুমি এবং চৌধুরাণী একটা দস্তখতের সাক্ষী হওয়া আবশ্যক। আইস সকলে, কাজটা শেষ হইয়া যাউক।"

যতক্ষণ সকলে কেতাব ঘরে প্রবেশ না করিলেন, ততক্ষণ রাজা তাহার দরজা খুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সকলে গৃহ মধ্যস্থ হইলে তিনি ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করিয়া তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইলেন। আমি নিতান্ত দুর্ভাবনা-গ্রস্ত হইয়া কিয়ৎকাল সেখানে দাঁড়াইয়া থাকার পর, ধীরে ধীরে সিঁড়িতে উঠিয়া আপনার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ।—ঘরে গিয়া বসিবার পূর্ব্বেই শুনিতে পাইলাম, রাজা নীচে হইতে আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—"আপনাকে অনুগ্রহ করিয়া এক বার নীচে আসিতে হইতেছে। দোষ সম্পূর্ণই জগদীশের, তিনি তাঁহার স্ত্রীর সাক্ষী হওয়ার পক্ষে কতকগুলি অন্যায় আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন, কাজেই আপনাকে কষ্ট দিতে হইল।"

আমি পুস্তকাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, লীলা টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া নিতান্ত উদ্বিগ্নভাবে টেবিলের উপরিস্থিত একখানি পুস্তকের পাতা উল্টাইতেছে। রঙ্গমতী ঠাকুরাণী, তাহার নিকটে একখানি চেয়ারে বসিয়া, নিতান্ত প্রশংসা ও গৌরবের দৃষ্টিতে আপনার স্বামীর দিকে চাহিয়া আছেন। চৌধুরী মহাশয় জানালার নিকট দাঁড়াইয়া, সেখানে টবের উপর যে সকল ফুল গাছ ছিল তাহা হইতে শুষ্ক পাতা বাছিয়া ফেলিতেছিলেন। গৃহাগত হইবামাত্র তিনি আমার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"আপনাকে কষ্ট দিতে হইল বলিয়া আমি বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করি। কিন্তু জানেনই তো আপনি "বাঙ্গাল বড় হিঁয়াল।" আমিও একজন বাঙ্গাল, কাজেই আমিও হিঁয়াল। আমি হিঁয়াল বলিয়াই যে দলিলে আমি একজন

সাক্ষী তাহাতে আমার স্ত্রীরও সাক্ষী হওয়া বড় দোষের কথা বলিয়া আমার মনে হইতেছে।”

রাজা বলিলেন,—“এ কথার কোনই মানে নাই। আমি বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছি, স্বামী ও স্ত্রী এক দলিলের সাক্ষী হইলে কোন দোষ হয় না। তথাপি উনি বুঝিবেন না।”

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—“ঠিক কথা। কিন্তু আপন বুদ্ধিতে ফকির হওয়া ভাল, তবু পরের বুদ্ধিতে রাজা হওয়াও কিছু নয়। আমি একজেদা ইংলিশ বাঙ্গাল। যতক্ষণ আমার প্রাণ না বুঝিবে ততক্ষণ তোমার তর্ক যুক্তি কিছুই আমি শুনিব না। রাণী যে দলিলে এখনই নাম সহি করিবেন, তাহাতে কি আছে তাহা আমি জানি না, জানিতে আমার কোন বাসনাও নাই। আমার বক্তব্য এই যে, ভবিষ্যতে এমন সময় উপস্থিত হইতে পারে, যখন রাজার অথবা রাজার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির দস্তখতের সাক্ষী দুই জনের মত লইবার আবশ্যক হইবে। সেরূপ স্থলে সাক্ষী দুই জনের পরস্পর স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মত থাকা আবশ্যক। আমার স্ত্রী এবং আমি সাক্ষী হইলে সে উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যাইবে; কারণ আমাদের মধ্যে এক মত ভিন্ন দুই মত নাই, এবং সে মত আমারই। আমার স্ত্রী দায়ে পড়িয়া নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সাক্ষ্য প্রামাণ্য নহে, এরূপ আপত্তি ভবিষ্যতে জন্মিতে পারে। আমি তাহা শুনিতে চাহি না। রাজার ভালর জন্যই বলিতেছি যে, আমি স্বামীর আসন্ন বন্ধুরূপে সাক্ষী থাকি, আর মনোরমা দেবি, আপনি স্ত্রীর আসন্ন বন্ধুরূপে সাক্ষী থাকুন। আমি এই রকম বুঝিয়াছি। তা আপনারা যাহাই বলুন, আমি সহজে আমার বুদ্ধি ছাড়িব না।”

চৌধুরী মহাশয়ের এরূপ সাবধানতার কোন মানে থাকুক আর নাই থাকুক, আমার মনে কিন্তু বড়ই সন্দেহ জন্মিল এবং আমারও সাক্ষী হইতে নিতান্ত অনিচ্ছা হইল। কিন্তু লীলাকে ছাড়িয়া তো যাইতে পারিব না। ঘটনা কিরূপ দাঁড়ায় দেখিবার জন্য অপেক্ষায় রহিলাম এবং বলিলাম,—“আমি এখানেই থাকিতেছি; যদি কোন আপত্তি উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি সাক্ষী হইব।”

রাজা, আমাকে কিছু বলিবেন ভাবিয়া, আমার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু সেই সময়ে পিসী মা ঠাকুরাণী গাত্রোত্থান করায়, তাঁহাকে সেই দিকে মনোযোগী হইতে হইল। স্পষ্টই বুঝা গেল, চৌধুরী মহাশয় নয়নে নয়নে স্ত্রীর প্রতি গৃহত্যাগের আদেশ প্রচার করিয়াছেন। তিনি উঠিতেছেন দেখিয়া রাজা বলিলেন,—“আপনি যান কেন? থাকুন না।”

ঠাকুরাণী আবার স্বামীর মুখের প্রতি চাহিলেন এবং আবার আদেশ পাইলেন। তখন আমাদের কাজের সময় তাঁহার অনর্থক থাকিবার দরকার নাই বলিয়া, তিনি জেদ করিয়া চলিয়া গেলেন। চৌধুরী মহাশয় একটা পেন্‌সিলের আগা দিয়া জানালার নিকটস্থ ফুলের টবের মাটী খুঁড়িয়া দিতেছিলেন। উদ্বেগ ও সাবধানতার সীমা নাই--গাছের গোড়ায় যে পিপড়ে লাগিয়াছিল, তাহাদের গায়ে আঘাত না লাগে বা মরিয়া না যায়।

এ দিকে রাজা দেরাজের ভিতর হইতে একটী ছোট বাক্স বাহির করিয়া ছোট একটী রূপার চাবি দিয়া তাহা খুলিলেন। তাহার পর তাহার মধ্য হইতে অনেক ভাঁজ করা এক দলিল বাহির করিয়া তাহার শেষ ভাঁজটী মাত্র

খুলিলেন। সে ভাঁজটী সাদা, সুতরাং দলিলে যাহা লেখা আছে তাহার এক বর্ণও দেখা গেল না। লীলা এবং আমি পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। লীলা নিতান্ত চিন্তাকুল হইলেও ভয় এবং অস্থিরতার কোন চিহ্ন তাহার মুখে দেখিলাম না। রাজা কালিতে একটা কলম ডুবাইয়া আপনার স্ত্রীর হস্তে দিলেন এবং দলিলের সেই সাদা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"এই স্থানে তোমার নাম সহি কর। মনোরমা দেবী এবং জগদীশ, আপনারা এই এই স্থানে নাম সহি করিবেন। জগদীশ, একি ছেলে মানুষি নাকি?" এদিকে এস, দস্তখতের সাক্ষী হওয়া ইয়ারকির কর্ম্ম নহে।"

চৌধুরী মহাশয় তৎক্ষণাৎ পেন্‌সিল্‌টী পকেটে ফেলিয়া রাজার মুখের দিকে দৃষ্টি-পাত করিতে করিতে আমাদের নিকটস্থ হইলেন। লীলা কলম হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আবার দলিলের সেই স্থানটী দেখাইয়া বলিলেন,—"এইখানে সহি কর।"

লীলা ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার যাহাতে নাম সহি করিতে হইবে, সেটা কি?"

রাজা বলিলেন,—"আমার এখন বুঝাইয়া বলিবার সময় নাই। গাড়ি তৈয়ারি রহিয়াছে, আমাকে এখনই যাইতে হইবে। আর সময় থাকিলেও তুমি ইহা বুঝিতে পারিবে না, ইহা কেবল লম্বা লম্বা আইনের বাজে কথায় পূর্ণ। এস, এস, শীঘ্র নাম দস্তখত করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব কাজটা শেষ করিয়া দেও।"

লীলা বলিল,—"রাজা, যাহাতে আমার নাম সহি করিতে হইবে, দস্তখত করিবার পূর্ব্বে সেটা কি, একথা জানা আমার পক্ষে অবশ্যই আবশ্যক।"

"দূর কর ছাই! কাজের কথা জানিতে মেয়ে মানুষের কি দরকার? আমি তোমাকে আবার বলিতেছি তুমি ইহা বুঝিতে পারিবে না।"

"কিন্তু যাই হউক, আমার বুঝিতে চেষ্টা করাও তো আবশ্যক। যখন উমেশ বাবুর এইরূপ কোন কাজের দরকার উপস্থিত হইত, তখন তিনি প্রথমেই আমাকে তাহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। আমিও [বুঝিতে পারিতাম তো।"

"তিনি করিতেন, আমার কি তা? তিনি তোমার চাকর ছিলেন, তিনি তোমাকে বুঝাইয়া দিতে বাধ্য। আমি তোমার স্বামী, আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিতে বাধ্য নহি। আর কতক্ষণ তুমি আমাকে এখানে অনর্থক আট্‌কাইয়া রাখিবে? আমি তোমাকে আবার বলিতেছি, এখন আর বোঝাবুঝির সময় নাই, গাড়ি অপেক্ষা করিতেছে। সাদা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি সহি করিবে কি না?"

তথাপি লীলা কলম হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, সহি করিতে অগ্রসর হইল না। বলিল,—"যদি আমাকে সহি করিয়া কোন বিষয়ের জন্য বাধ্য হইতে হয় তাহা হইলে সেটা কি, তাহা জানিতে অবশ্যই আমার একটুও অধিকার আছে।"

রাজা সজোরে টেবিলে আঘাত করিয়া বিশেষ রাগের সহিত বলিলেন,—"অত কথা আমি শুনিতে চাহি না। এখানে তোমার দিদি আছেন, চৌধুরী মহাশয় আছেন বলিয়া আর লজ্জার কাজ নাই। সোজা কথা বল যে, তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর।"

চৌধুরী মহাশয় সেই সময়ে আস্তে আস্তে রাজার কাঁধের উপর হাত দিলেন। রাজা রাগের সহিত তাহা ঝাড়িয়া ফেলিলেন।

চৌধুরী মহাশয় প্রশান্ত ভাবে আবার রাজার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন,—"প্রমোদ, প্রমোদ, কর কি? অন্যায় রাগ দমন কর। এ ক্ষেত্রে রাণীই ঠিক।"

রাজা চীৎকার স্বরে বলিলেন,—রাণীই ঠিক! স্বামীকে অবিশ্বাস করা স্ত্রীর পক্ষে ঠিক কাজ!"

লীলা বলিল,—"আমি তোমাকে অবিশ্বাস করিতেছি বলিয়া অভিযোগ করা নিতান্ত অন্যায় ও অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা। দিদিকে জিজ্ঞাসা কর, সহি করিবার আগে ইহাতে কি আছে জানিতে ইচ্ছা করা ন্যায়সঙ্গত কি না।"

রাজা উদ্ধত ভাবে বলিলেন,—"দিদিকে জিজ্ঞাসা করিবার কোনই দরকার নাই। এ বিষয়ের সহিত তোমার দিদির কোন সম্পর্ক নাই।"

আমি এতক্ষণ কোন কথা কহি নাই, এখনও কোন কথা কহিতাম না। কিন্তু লীলার মুখের বিপন্ন ও কাতর ভাব দেখিয়া এবং তাহার স্বামীর অন্যায় অবিচার দেখিয়া আমার মত ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম,—"রাজা, আমার দোষ গ্রহণ করিবেন না। আমি যখন দস্তখতের একজন সাক্ষী, তখন আমি এ বিষয়ে নিতান্ত নিঃসম্পর্কিত নহি। আমার বিবেচনায় লীলার আপত্তি সম্পূর্ণই সঙ্গত। লীলা যাহাতে সহি করিবে, তাহাতে কি আছে তাহা সে অগ্রে না বুঝিলে, আমি তো সাক্ষীর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত নহি।"

রাজা বলিলেন,—"অতি উত্তম কথা! আবার যদি কখন, মনোরমা দেবি; আপনাকে কাহার বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে আমি উপদেশ দিতেছি, যে বিষয়ের জন্য আপনার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, সে বিষয়ে তাহার স্ত্রীর পক্ষ গ্রহণ করিয়া তাহার আশ্রিতপালন গুণের কদাচ এমন করিয়া প্রতিশোধ দিবেন না।"

তিনি আমাকে প্রহার করিলে আমার মনের যেরূপ ভাব হইত, একথা শুনিয়া আমার চিত্তের তেমনই ভাব হইল। যদি আমি পুরুষ হইতাম, তাহা হইলে তদ্দণ্ডে তাঁহারই ঘরে তাঁহাকে মারিয়া অচেতন করিয়া ছাড়িতাম এবং কোন কারণে কদাপি তাঁহার বাটীতে আর পদার্পণও করিতাম না, কিন্তু আমি স্ত্রীলোক এবং আমি তাঁহার স্ত্রীকে প্রাণের অপেক্ষাও ভালবাসি। সেই ভালবাসারই জন্য আমি একটীও কথা না কহিয়া স্থির রহিলাম। লীলা বুঝিল, কত কষ্টই আজি আমার হৃদয় সহিল এবং কত জ্বালাই তাহা চাপিয়া রাখিল। সে গলদশ্রুলোচনে আমার নিকটে দৌড়িয়া আসিল এবং উভয় হস্তে আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল,—"দিদি, দিদি, মা যদি আজি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তিনিও আমার জন্য এত সহ্য করিতেন না।"

রাজা আবার চীৎকার করিলেন,—"রাণি, এদিকে এস, শীঘ্র নাম সহি কর।"

লীলা আমার কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিল,—"সহি করিব কি? তুমি যদি বল তো করি।"

আমি বলিলাম,—"না। তুমি যাহা ধরিয়াছ তাহা সঙ্গত এবং সত্য। যতক্ষণ উহা পড়িতে না পাইবে ততক্ষণ উহাতে কখনই নাম সহি করিও না।"

রাজা ভয়ানক চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"এস, শীঘ্র সহি কর।"

লীলা ও আমার ভাব চৌধুরী মহাশয় বেশ করিয়া লক্ষ্য করিতেছিলেন, তিনি এক্ষণে আবার একবার মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন,—

"প্রমোদ, স্ত্রীলোকের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা আবশ্যক তাহা কি তুমি জান না। ছি ছি!"

রাজা অতিশয় রাগের সহিত তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। চৌধুরী মহাশয় ধীরে ধীরে রাজার স্কন্ধে হাত দিয়া বলিলেন,—"ছি ছি!"

উভয়েই পরস্পরের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। রাজা, ধীরে ধীরে চৌধুরী মহাশয়ের হাতের নীচে হইতে, আপনার কাঁধ সরাইয়া লইলেন। ধীরে ধীরে, চৌধুরী মহাশয়ের নয়ন-সম্মুখ হইতে, আপনার মুখ ফিরাইলেন। নিতান্ত স্বার্থময় ভাবে দলিল খানার প্রতি এক বার দৃষ্টিপাত করিলেন এবং শেষে নিতান্ত অনিচ্ছায়, যেন বাধ্য হইয়া বলিলেন,—"কাহাকেও গালি দেওয়া আমার অভিপ্রায় নহে, তবে আমার স্ত্রীর একগুঁয়েমিতে মুনি ঋষিরও ধৈর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। আমি বলিয়াছি, এ এক খানি সামান্য দলিল মাত্র। ইহার অপেক্ষা বেশী কথা তোমার আর জানিবার দরকার কি? তুমি যাহাই বল, জগদীশ, স্বামীর কার্য্যের এরূপ প্রতিবাদ করা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য নহে। সে যাহা হউক, রাণি, আমি তোমাকে আবার বলিতেছি—এই শেষবার—তুমি সহি করিবে কি না?"

লীলা টেবিলের নিকটস্থ হইল। আবার কলম হাতে তুলিল, তাহার পর বলিল—"আমি একটা দায়িত্বযুক্ত মানুষ ভাবিয়া যদি তুমি আমার সহিত ব্যবহার কর, তাহা হইলে আমি সন্তুষ্টচিত্তে নাম সহি করিব। আমার যতই কেন ক্ষতি হউক না, আমি সকলই সহ্য করিতে পারি, যদি আমার কৃতকার্য্যের জন্য আর কাহারও স্বার্থের হানি না হয় এবং কোন মন্দফল না ঘটে।"

রাজা আবার পূর্ব্বের মত রাগিয়া উঠিলেন, কিন্তু সে ভাব যথাসাধ্য প্রচ্ছন্ন করিয়া বলিলেন,—"তোমাকে ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে, এ কথা কে বলিল?"

লীলা আবার বলিল,—"আমার বলিবার অভিপ্রায় এই যে, আমার দ্বারা ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ যাহা কিছু হইতে পারে আমি সকলই করিতে সম্মত আছি। যদিই এ দলিলে আমার নাম সহি করিতে একটু সঙ্কোচ থাকে, আমি বুঝিতে পারিতেছি না, সে জন্য কেন তুমি আমার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতেছ। পিসী মা সাক্ষী হওয়ার সম্বন্ধে চৌধুরী মহাশয় সঙ্কোচ প্রকাশ করিলে তুমি কথাটিও কহিলে না, আর আমার বেলায় এত কঠোর ব্যবহার করিতেছ, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।"

এই কথা যেই বলা সেই রাজা ভয়ানক রাগিয়া উঠিলেন এবং নিতান্ত কর্কশ স্বরে বলিলেন,—"সঙ্কোচ! তোমার আবার সঙ্কোচ! সঙ্কোচের সময় অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে জান? আমি মনে করিয়াছিলাম, যখন তুমি দায়ে পড়িয়া আমাকে বিবাহ করিয়াছ, তখন হইতে তুমি, ও সকল ভাব একেবারে ত্যাগ করিয়াছ।"

কথাটী শুনিবামাত্র লীলা সজোরে হস্তের লেখনী ভূপৃষ্ঠে ফেলিয়া দিল এবং রাজার প্রতি এরূপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল যে, আমি জীবনে কখন, তেমন দৃষ্টি তাহার চক্ষে দেখি নাই। লীলা তখনই রাজার দিক হইতে ফিরিয়া, এস্থান হইতে প্রস্থানের উপক্রম করিল। রাজার কথাটা বড় মর্ম্মভেদী সত্য, কিন্তু এই কথার পর রাজার প্রতি লীলার এই বিজাতীয় ও ভয়ানক ঘৃণা এবং ক্রোধের ভাব দেখিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইল যে, নিশ্চয়ই এ কথার মধ্যে আরও কোন অতি ভয়ানক

অপমানের কথা প্রচ্ছন্ন আছে। আমি তাহার কিছুই জানি না, লীলা হয়ত আমার কষ্ট হইবে ভাবিয়া তাহা আমাকে বলে নাই। লীলার ভাব দেখিয়া আমার মনে যেমন সন্দেহ হইল, চৌধুরী মহাশয়ের মনেও বোধ করি তেমনই হইল। কারণ, আমি লীলার সঙ্গে সে গৃহ হইতে চলিয়া আসিবার সময় শুনিতে পাইলাম, তিনি রাজাকে নিতান্ত অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন,—"পাগল কোথাকার!"

লীলা ও আমি দ্বার সন্নিহিত হইলে রাজা বলিলেন,—"তবে কোন ক্রমেই তুমি নাম সহি করিবে না?" আপনার বেকুবিতে আপনি মাটী হইলে লোকের যেমন কণ্ঠস্বর হইয়া থাকে রাজার স্বরও তেমনই।

লীলা অবিচলিত ভাবে উত্তর দিল,—"তুমি এখনই যে কথা বলিয়াছ, তাহার পর ঐ দলিলের প্রথম অক্ষর হইতে শেষ অক্ষর পর্য্যন্ত না পড়িয়া, আমি কখনই উহাতে নাম স্বাক্ষর করিব না। এস দিদি, আমরা এখানে অনর্থক অনেক সময় নষ্ট করিয়াছি।"

রাজা কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই চৌধুরী মহাশয় মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন,—"এক মুহূর্ত্ত, রাণি, আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি আর এক মুহূর্ত্ত।"

লীলা তাঁহার কথায় ভ্রূক্ষেপও না করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। আমি তাহাকে থামাইয়া তাহার কাণে কাণে বলিলাম,—"চৌধুরী মহাশয়ের সহিত কখন শত্রুতা করিও না; আর যাই হউক, চৌধুরী মহাশয় যেন কখন আমাদের শত্রু না হন।" লীলা আমার কথা রাখিল।

তখন চৌধুরী মহাশয় বলিতে লাগিলেন,—"রাণী মাতা, আমাকে ক্ষমা করুন; আপনি এই গৃহের কর্ত্রী ও সর্ব্বেশ্বরী; আপনার প্রতি প্রভূত সম্মান ও শ্রদ্ধার বশবর্ত্তী হইয়া আমি এস্থলে একটী কথা বলিতে বাসনা করি।" তাহার পর রাজার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"রাজা, আজি উঁহাতে নাম সহি না হইলে কোন মতেই চলিতে পারে না কি?

রাজা গোঁ গোঁ করিয়া বলিলেন,—"আমার যেরূপ মতলব তাহাতে উহার আজিই দরকার আছে। কিন্তু দেখিলেই তো তুমি, আমার দরকারে রাণীর কিছুই যায় আসে না।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—আমার কথার সাদা উত্তর দেও। দস্তখত কালি পর্য্যন্ত না হইলে চলিবে কি না? হাঁ কি না বল।"

"হাঁ।"

"তবে তুমি অকারণ এখানে সময় নষ্ট করিতেছ কেন? কালি পর্য্যন্ত,—যতক্ষণ তুমি ফিরিয়া না আইস ততক্ষণ পর্য্যন্ত—উহা তবে থাকিতে দেও।"

রাজা, বিরক্তির সহিত চৌধুরীর মুখের দিকে চাহিয়া, বলিলেন,—"তুমি যেরূপ ভাবে আমার সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতেছ, আমার তাহা ভাল লাগিতেছে না। আমি অমন ভাবে কথা কাহারও নিকট হইতে শুনিতে চাহি না।"

চৌধুরী ঘৃণাব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন,—"তোমার ভালর জন্যই আমি বলিতেছি। এ উপায়ে তুমিও সময় পাইবে, রাণীও সময় পাইবেন। তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ, তোমার গাড়ি বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে? আমার কথা তোমার ভাল লাগিতেছে না, বটে? আমি তোমার মত কখন রাগিতে জানি না, কাজেই আমার কথা তোমার ভাল লাগিবে কেন? এ পর্য্যন্ত তোমাকে কতই সদুপদেশ দিয়াছি, কিন্তু বল

দেখি কখন কি আমি ভুল কথা বলিয়াছি? আর কথায় কাজ নাই। কি কাজে যাইতেছ, যাও এখন। তুমি ফিরিয়া আসার পর দস্তখতের কথা তুলিলেই হইবে। এখন উহা থাকিতে দেও।"

রাজা, কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া, একবার ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন। যে গুরুতর কাজের জন্য তিনি কাহাকেও উদ্দেশ্য না জানাইয়া কোথায় যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন তাহার চিন্তা, সঙ্গে সঙ্গে লীলার নাম স্বাক্ষরের জন্য চিন্তা, তাঁহাকে যেন কতকটা অস্থির করিয়া তুলিল। তিনি একটু চিন্তার পর চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিলেন,—"আমাকে কথায় হারাইয়া দেওয়া সোজা কাজ। আমার এখন জবাব দিবার সময় নাই। তোমার কথা মানি বা না মানি, শুনি বা না শুনি এখন তোমার উপদেশ মতই আমাকে কাজ করিতে হইতেছে। কারণ আর এখানে অপেক্ষা করিলে চলিতেছে না।" তাহার পর লীলার প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"কিন্তু শুন রাণি! কালি আমি ফিরিয়া আসার পর যদি নাম সহি না কর তাহা হইলে—" দেরাজ খুলিয়া তাহার মধ্যে দলিল রাখিবার শব্দে কথার শেষ অংশ ভাল শুনা গেল না।" তাহার পর তিনি বেগে বাহিরে গেলেন। যাইবার সময় তিনি আবার তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন,—"মনে থাকে যেন—কালি।"

রাজা চলিয়া গেলে চৌধুরী মহাশয় আমার ও লীলার নিকটে আসিয়া বলিলেন,—"মনোরমা দেবি, আজি আপনারা রাজার স্বভাবের চূড়ান্ত জঘন্যতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমি তাঁহার অনেক দিনের বন্ধু—তাঁহার এই কদর্য্য ব্যবহারের নিমিত্ত আমি নিতান্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হইতেছি। আমি অনেক দিনের প্রাচীন বন্ধু বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, কালি তিনি কখনই এরূপ লজ্জাজনক ব্যবহার করিতে পাইবেন না।"

লীলা আমার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চৌধুরী মহাশয়ের কথা সাঙ্গ হইলে সে আমার হাত টিপিল। বাস্তবিক স্ত্রীলোকের পক্ষে এতদপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি আছে? স্বামীর কোন মন্দ ব্যবহারের জন্য, নিজ বাটীতেই, স্বামীর একজন পুরুষবন্ধু উপস্থিত হইয়া, আহা উহু ও দুঃখ প্রকাশ করিলে স্ত্রীলোকের সকল গৌরবই নষ্ট হইয়া যায়। চৌধুরী মহাশয়ের সহিত একটু শিষ্টাচার করিয়া আমি লীলাকে টানিয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম। দুঃখ ও হীনতার কথা কি বলিব? রাজা যে কথা এখনই আমাকে বলিয়াছেন, অন্য হইলে সে কথার পর কি আর একদণ্ডও এখানে থাকিত? কিন্তু সে অভিমান, সে তেজ দূরে থাকুক, আমার এখন ভাবনা, পাছে আমি এখানে থাকিতে না পাই! কি সর্ব্বনাশের কথা! লীলার এই দুঃসময়ে আমি যদি তাহার কাছে থাকিতে না পাই! যেমন করিয়া হউক, আমার লীলার কাছে থাকিতেই হইবে। আমি বেশ বুঝিয়াছি, চৌধুরী মহাশয়ের সহায়তা না পাইলে, আমার এখানে থাকিতে পাওয়া অসম্ভব হইবে।

আমরা বাহিরে আসিয়া রাজার গাড়ির শব্দ শুনিতে পাইলাম। লীলা জিজ্ঞাসিল, —"দিদি রাজা কোথায় যাইতেছেন বোধ হয়? তাঁহার কার্য্য দেখিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার বড় ভয় হইতেছে।"

তাহার কোমল প্রাণ আজ অনেক কষ্ট সহিয়াছে; এজন্য তাহাকে আমার সন্দেহের কথা বলিতে ইচ্ছা না হওয়ায়, উত্তর দিলাম —"তা আমি কেমন্ করিয়া জানিব দিদি"

লীলা বলিল,—"গিন্নি-ঝি নিশ্চয়ই জানে।

আমি বলিলাম—"নিশ্চয়ই না; সেও আমাদের মত কিছুই জানে না।"

"তুমি গিন্নি-ঝির কাছে শুন নাই কি, মুক্তকেশীকে ইহার মধ্যে এ অঞ্চলে দেখা গিয়াছিল? তুমি বুঝিতেছ না কি, তিনি হয়ত তাহারই সন্ধানে যাইতেছেন?"

"যাহাই হউক লীলা, এখন আর সে ভাবনায় কাজ নাই। আমার ঘরে এস, দুই ভগ্নীতে একটু ঠাণ্ডা হইয়া বসি চল।"

আমরা দুই জনে জানালার কাছে বসিলাম। তখন লীলা বলিল,—"দিদি, আমার জন্য তোমাকে যে কষ্ট সহিতে হইয়াছে, তাহা আমার মনে হইতেছে, আর তোমার মুখের দিকে চাহিতে আমার লজ্জা হইতেছে; আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। কিন্তু দিদি, যেমন করিয়া হউক, তোমার মন যাহাতে আবার শান্ত হয় আমি তাহার চেষ্টা করিব।"

আমি বলিলাম,—"ছি দিদি, ও কথা ভাবিতেছ কেন? তোমার সুখ ও শান্তি যে ভয়ানক রূপে বিধ্বংসিত হইতেছে, তাহার তুলনায় আমার তুচ্ছ মানসিক ক্লেশ অতিশয় সামান্য।"

লীলা অতি দ্রুত ও সজোরে বলিতে লাগিল,—"শুনিলে তিনি আজ আমাকে কি বলিলেন? কিন্তু তুমি সে কথার ভাব কি জান না; কেন আমি কলম ফেলিয়া দিয়া তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিবার চেষ্টা করিলাম তাহা তুমি জান না। তুমি কাতর হইবে জানিয়া, দিদি, আমি তোমাকে সকল কথা বলি নাই। আজি রাজা আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহা দেখিয়াই বোধ হয় তোমার প্রাণ আমার দুঃখে ফাটিয়া যাইতেছে; সমস্ত কথা শুনিলে না জানি তোমার কি অসহ্য যাতনাই হইবে। তোমার যত কষ্টই হউক, তোমাকে সকল কথা না বলিলে আর চলিতেছে না। কিন্তু আমি এক্ষণে সে সকল কথা বলিতে অক্ষম। সমস্ত কথা মনে করিয়া আমার মাথা ঘুরিতেছে, আমি স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছি না, আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছি। সে কথায় আর কাজ নাই—অন্য কথা কহ। যে দস্তখতের জন্য আজি এত কাণ্ড হইল তাহা করিলেই হইত। কালি নাম সহি করিব কি? তুমি আমার পক্ষ হইয়া কথা কহিয়াছ, এখন যদি আমি স্বাক্ষর না করি, তাহা হইলে সমস্ত দোষ তোমারই ঘাড়ে পড়িবে। এখন করা যায় কি? হায়, এ অবস্থায় আমাদের বিহিত উপদেশ দিবার কোন একজন বিশ্বস্ত প্রকৃত আত্মীয় থাকিলে বড়ই ভাল হইত।"

লীলা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। সে যে এখন দেবেন্দ্র বাবুর কথাই ভাবিতেছে, তাহার মুখ দেখিয়া তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। লীলার কথার শেষ ভাগ শুনিয়া আমারও দেবেন্দ্র বাবুকে মনে পড়িল। দেবেন্দ্র বাবু বিদায় কালে, আমাদের যখন তাঁহার নিকট কোন সাহায্যের প্রয়োজন উপস্থিত হইবে কৃতার্থ হইয়া তখনই তাহা সম্পন্ন করিবেন বলিয়া যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, লীলার বিবাহের ছয় মাসের মধ্যেই সেই প্রস্তাবিত সাহায্যের আবশ্যকতা উপস্থিত!

আমি বলিলাম,—"আমাদের সাধ্যে যতদূর হইতে পারে তাহার ত্রুটি করা হইবে না। কি করিলে ভাল হয়, লীলা তাহাই এখন ধীর ভাবে স্থির কর।"

লীলা তাহার স্বামীর অর্থঘটিত যেরূপ অপ্রতুলতার কথা জানিত এবং রাজা ও উকীলের যে সকল পরামর্শ আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি,

তাহা মিলাইয়া আমরা স্থির করিলাম যে, সে দলিল নিশ্চয়ই টাকা ধার করিবার খত এবং তাহাতে লীলার নাম স্বাক্ষর থাকা রাজার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সম্পূর্ণই আবশ্যক। সে দলিলের মর্ম্ম কি এবং তদনুযায়ী সর্ত্তে লীলাকে কতদূর বাধ্য থাকিতে হইবে, এ সকল প্রশ্নের আমরা কোনই মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমার ধারণা নিশ্চয়ই সে দলিল নিতান্ত নীচ জনোচিত শঠতা ও প্রবঞ্চনায় পরিপূর্ণ। রাজা দলিল দেখাইতে চাহেন নাই, অথবা তাহার মর্ম্ম ব্যক্ত করেন নাই বলিয়াই যে আমার এরূপ ধারণা হইয়াছে এমন নহে। বিবাহের পূর্ব্বে তিনি যতবার আনন্দধামে গতিবিধি করিতেন, সে সকল সময়ে যেরূপ ভাবে লীলা ও অন্যান্য সকলের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেন, উকীল মণি বাবু আসার পর হইতে তাঁহার ব্যবহার সেইরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনই তাঁহার সততা সম্বন্ধে আমার মনে বিশেষ সন্দেহ জন্মাইয়াছে। লীলাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার উদ্দেশে তিনি আনন্দধামে নিরন্তর আপনাকে সম্পূর্ণ সততার আবরণে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, বিহিত-বিধানে আমাদের মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিতেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাঁহার বাসনা চরিতার্থ হইল, অমনই তাঁহার সেই অলীক আবরণ উন্মুক্ত হইল এবং তাঁহার প্রগাঢ় পাশব প্রকৃতি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সুতরাং তাঁহাকে আর বিশ্বাস করিতে মন যায় না। লীলার অদৃষ্ট যে কতই মন্দ, তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে। কিন্তু সে যাহাই হউক, না দেখিয়া লীলাকে কখনই আমি সে দলিলে নাম সহি করিতে দিব না। অতএব কালি যখন নাম সহি করিবার কথা উঠিবে, তখন এমন একটা আইনও ব্যবস্থা সঙ্গত আপত্তি উত্থাপন করিতে হইবে যে, রাজার সঙ্কল্প তাহাতে উল্টাইয়া যাইবে এবং তিনি বুঝিবেন যে, মেয়ে মানুষ হইলেও, আইন কানুন তিনিও যেমন বুঝেন আমরা দুইজনও তেমনই বুঝিয়া থাকি। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা আমাদের উকীলের নিকট সমস্ত কথা লিখিয়া তাঁহার পরামর্শ লওয়াই কর্ত্তব্য মনে করিলাম। আমাদের প্রধান আত্মীয় উমেশ বাবু, শারীরিক অসুস্থতার জন্য কর্ম্ম হইতে বিরত হওয়ায় করালী বাবু নামে আর এক জন উপযুক্ত ভদ্র উকীল তাঁহার কাজ নির্ব্বাহ করিতেছেন। কোন আবশ্যক উপস্থিত হইলে করালী বাবুকে আমরা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারি, একথা উমেশ বাবু আমাকে বলিয়া রাখিয়াছেন; সুতরাং সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। আমি করালী বাবুকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমে সকল কথা যথাযথ রূপে লিখিলাম। তাহার পর এরূপ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি তাহার উপদেশ চাহিলাম। বাজে কথা একটিও না লিখিয়া, যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে পত্র সমাপ্ত করিলাম। আমি যখন চিঠি শেষ করিয়া খামের উপর শিরোনাম লিখিতেছি তখন লীলা বলিল,—"কিন্তু কালি সময়ের মধ্যে উত্তর পাইবে কিরূপে? তোমার এ পত্র কালি প্রাতে কলিকাতায় পৌছিবে। তাহার পর কালই যদি ইহার উত্তর সেখানে ডাকে দেওয়া হয়, তাহা হইলে পরশ্ব সকালে তাহা আমাদের হাতে আসিতে পারে। তাহার উপায় কি?"

ঠিক কথা। এতক্ষণ একথা আমার মনে উদয় হয় নাই ইহাই আশ্চর্য্য। যদি কোন লোক ইহার উত্তর হাতে করিয়া লইয়া আইসে, তাহা হইলে আমরা সময়ের মধ্যে

উকীল বাবুর উপদেশ পাইতে পারি, নচেৎ অন্য উপায় নাই। পত্রে একটা পুনশ্চ নিবেদন বলিয়া লোকের দ্বারা উত্তর পাঠাইবার কথা লিখিয়া দিলাম এবং সে লোক যেন আমার হাত ছাড়া আর কাহারও হাতে পত্র না দেয়, একথাও লিখিলাম। তাহার পর লীলাকে বলিলাম,—"এ ব্যবস্থায় কালি বেলা ২টার সময়ে আমরা করালী বাবুর উত্তর পাইব সন্দেহ নাই। কিন্তু মনে কর, রাজা যদি ২টার পূর্ব্বেই বাটী ফিরিয়া আইসেন, তাহা হইলে আমরা কর্ত্তব্য বিষয়ে কোন উপদেশ পাইবার পূর্ব্বেই হয়ত দস্তখতের কথা তুলিবেন। তাহা হইলে আমাদের বিষম গোলে পড়িতে হইবে। অতএব কালি বেলা ১০টার পরই তুমি একখানি কেতাব হাতে করিয়া বিলের দিকে কাঠের ঘরে বসিয়া থাকিবে এবং ২টার আগে বাটি ফিরিবে না। এ দিকে আমি করালী বাবুর উত্তরের জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিব। তাহা হইলে তাহাতে আর কোন গোল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। চল এখন আমরা অন্য ঘরে যাই। এতক্ষণ আমরা দুই জনে এক ঘরে একত্র থাকিলে লোকের মনে সন্দেহ হইতে পারে।"

লীলা বলিল,—"সন্দেহ? রাজা তো বাটী নাই, তবে কাহার সন্দেহ? তুমি কি চৌধুরী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিতেছ?"

"মনে কর তাই।"

"তাহা হইলে তাঁহার উপর আমারও যেমন অশ্রদ্ধা, তোমারও দেখিতেছি ক্রমে সেইরূপ হইতেছে।"

"না, না, অশ্রদ্ধার কথা নহে। অশ্রদ্ধা বলিলে সঙ্গে সঙ্গে একটু ঘৃণার ভাব মিশিয়া থাকে। কিন্তু চৌধুরী মহাশয়কে ঘৃণা করিবার কোন কারণই আমি দেখিতে পাই না।"

"তা হউক. তুমি তাঁহাকে ভয় কর কি না বল।"

"তা বোধ হয় কতকটা করি।"

"তিনি আমাদের পক্ষ হইয়া আজি এত মধ্যস্থতা করিলেন, তবু তুমি তাঁকে ভয় কর?"

"হাঁ। রাজার ঔদ্ধত্য অপেক্ষা চৌধুরী মহাশয়ের মধ্যস্থতাকে আমি বেশী ভয় করি। আমি তোমাকে তখন যে কথা বলিয়াছি তাহা মনে করিয়া দেখ। লীলা, আর যাহাই কেন কর না, চৌধুরী মহাশয়কে কখন শত্রু করিও না।"

আমরা নীচে আসিলাম। লীলা অন্য এক ঘরে চলিয়া গেল; বারান্দায় যে চিঠির থলিয়া ঝুলান থাকে তাহারই মধ্যে আমি চিঠি খানি ফেলিয়া দিব বলিয়া সেই দিকে চলিলাম। যাইবার সময় দেখিতে পাইলাম চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী আমাকে দেখিতে দেখিতে কি কথা বলাবলি করিতেছেন। আমি নিকটস্থ হইলে রঙ্গমতী ঠাকুরাণী, তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসিয়া, আমাকে একটা গোপনীয় কথা শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ন্যায় লোকের মুখে এরূপ প্রার্থনা শুনিয়া আমি কিছু বিস্মিত হইলাম। তাহার পর থলিয়ায় আমার পত্র ফেলিয়া দিয়া, আমি তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন বিশেষ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের ভাবে আমার হাত ধরিয়া আমাকে ক্রমে ক্রমে, প্রাসাদ-পার্শ্বস্থ পুষ্করিণী-তীরে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। না জানি কি কথাই তিনি বলিবেন! তিনি বলিলেন, আজি রাজা আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তিনি তাঁহার স্বামীর নিকট শুনিয়াছেন। তিনি সে জন্য অত্যন্ত দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়াছেন এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,

আর কখন যদি এরূপ কাণ্ড ঘটে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি এখান হইতে চলিয়া যাইবেন। পিসী ঠাকুরাণীর ন্যায় চাপা লোকের পক্ষে, বিশেষতঃ আজি প্রাতে বিলের ঘরে একটু ঠোকামুকির পরও, তাঁহার এ ব্যবহার নিতান্তই আশ্চর্য্য সন্দেহ নাই। যাহা হউক শিষ্টাচারের উত্তরে শিষ্টাচার করাই সঙ্গত মনে করিয়া আমি উপযুক্ত ভাবে তাঁহার কথার উত্তর দিলাম। তাহার পর আমি চলিয়া আসিবার চেষ্টা করিলাম ; কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার কথা আজি আর ফুরায় না ; তিনি আজি আমাকে ছাড়িতে চাহেন না! নিতান্ত বন্ধুভাবে, আমার হাত ধরিয়া পুকুরের চারি দিকে বেড়াইতে বেড়াইতে, তিনি যে কত গল্পই করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহার আর কি বলিব? এই-রূপে অর্দ্ধ ঘণ্টাধিক কাল আমাকে আবদ্ধ রাখিয়া, তিনি একবার বাটীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার পর হঠাৎ যে তিনি সেই তিনি। কথা নাই, বার্ত্তা নাই! সহসা তিনি আমার হস্তত্যাগ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মূর্ত্তি চিরদিন যেমন গম্ভীর থাকে তেমনই গম্ভীর করিয়া তুলিলেন। আমি পলাইয়া আসিলাম। প্রাসাদে আসিয়া প্রথম প্রকোষ্ঠের দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই দেখিতে পাইলাম, চৌধুরী মহাশয় চিঠির থলিয়ার ভিতরে একখানি পত্র ফেলিয়া দিতেছেন। তিনি, চিঠির থলিয়া বন্ধ করিয়া, চৌধুরাণী ঠাকুরাণী কোথায় আছেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার কথার ভাব ও মুখের আকৃতি দেখিয়া আমার বোধ হইল, হয় তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়াছে, না হয় মনের বিশেষ ভাবান্তর জন্মিয়াছে। তিনি চলিয়া গেলে, কেন বলিতে পারি না, থলিয়ায় আমি যে চিঠি দিয়াছিলাম তাহা আবার বাহির করিয়া আমার দেখিতে ইচ্ছা হইল এবং তাহা দেখিয়া তাহার উপর গালার মোহর করিতে ইচ্ছা হইল। সকলেই জানেন স্ত্রী-প্রকৃতি দুর্জ্ঞেয়। হয়ত আমার তাদৃশ দুরবগম্য স্ত্রী-প্রকৃতিই এ ইচ্ছার কারণ। যাহা হউক, পত্র খানি লইয়া আমি নিজ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। খামের গায়ে যে আটা থাকে তাহাতেই জল দিয়া আমি চিঠি আঁটিয়াছিলাম। এখন মোহর করিতে গিয়া দেখি, সহজেই তাহা খুলিয়া গেল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে এরূপে চিঠি খুলিয়া যাওয়া বড় আশ্চর্য্য। হয়ত চিঠি ভাল করিয়া আঁটা হয় নাই ; অথবা হয়ত, আটাটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল ; অথবা হয়ত,—না না, সে সন্দেহ মনে করিতেও শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। সে সন্দেহ লিখিবারও অযোগ্য।

এখন কালি কি হইবে? কালিকার জন্য অনেক কৌশল চাই। দুইটী বিষয়ে আমাকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে প্রথম, চৌধুরী মহাশয়ের সহিত খুব বন্ধু ভাব বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে ; দ্বিতীয়, উকীলের আফিস হইতে যখন লোক আসিবে তখন আমাকে খুব সাবধান থাকিতে হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—*—

১৭ই জ্যৈষ্ঠ।—বিকালে চৌধুরী মহাশয় নানা প্রকার মিষ্ট গল্পে আমাদিগকে বড়ই আমোদিত করিলেন। নানা দেশের নানা

প্রকার লোকের, নিজের বালককালের নানা সরস বৃত্তান্ত তিনি. এমনই মিষ্ট ভাবে ও আমোদ সহকারে গল্প করিতে লাগিলেন যে আমরা আমোদিত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রায় এক ঘণ্টা কাল এইরূপ গল্প করার পর, তিনি পাঠ করিবার জন্য পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিলেন। লীলা তখন বিলের দিকে বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাব করিল। শিষ্টাচারের অনুরোধে আমরা পিসী মা ঠাকুরাণীকেও বেড়াইতে যাইবার জন্য বলিলাম। বোধ হয় তাঁহার স্বামীর নয়ন সম্মতিসূচক আদেশ প্রচার করে নাই, কাজেই তিনি একটা ওজর করিয়া যাইতে অস্বীকার করিলেন। তখন লীলা ও আমি বেড়াইতে চলিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কোন্ দিকে যাইতে হইবে ?"

লীলা উত্তর দিল,—"চল বিলের দিকেই যাওয়া যাউক।"

"লীলা, সেই ভয়ানক বিলটা তোমার বড় ভাল লাগে !"

"না দিদি, বিলটার চেয়ে তার চারিপাশের দৃশ্য আমার বড় ভাল লাগে। সেখানকার গাছ পালা দেখিয়া আমার আনন্দধামের কথা মনে পড়ে। কিন্তু তোমার যদি সে দিকে যাইতে মন না হয়, তবে চল অন্য দিকেই যাওয়া যাউক।"

"আমার পক্ষে সকল দিকই সমান। চল বিলের দিকেই যাই—সে দিকটা হয়ত একটু ঠাণ্ডা হইবে।"

আমরা আবাদের ভিতর দিয়া নিঃশব্দে বিলের দিকে চলিলাম এবং কাঠের ঘরে গিয়া বসিলাম। আকাশে বড় মেঘ হইয়া আসিল। সন্ধ্যারও অধিক বিলম্ব নাই। বোধ হইল সন্ধ্যার পর খুব বৃষ্টি হইবে।

লীলা বলিল—"এ স্থানটা নিতান্ত জনহীন ও ভয়ানক হইলেও এখানে আমাদের নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা কহিবার কোন ব্যাঘাত হইবে না। আমার বিবাহিত জীবনের প্রকৃত অবস্থা তোমাকে একদিন জানাইতে চাহিয়াছিলাম। দিদি, জীবনের মধ্যে তোমার কাছে কখন কিছু লুকাই নাই, কেবল এই বিষয়টা লুকাইয়াছিলাম। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আর কখন কোন কথা তোমার নিকট প্রচ্ছন্ন রাখিব না। তোমারই জন্য, কতকটা আমার নিজেরও জন্য, আমি এত দিন নির্ব্বাক ছিলাম। যাহার হস্তে জীবন সমর্পণ করা হইয়াছে সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করে না, একথা স্বীকার করা স্ত্রীলোকের পক্ষে বড়ই কঠিন। দিদি, যদি নিতান্ত অসময়ে তোমার স্বামীর মৃত্যু না হইত এবং যদি তাঁহার সহিত তোমার প্রাণের ভালবাসা থাকিত, তাহা হইলে তুমি আমার কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতে।"

আমি কি উত্তর দিব ? উভয় হস্তে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া আমি অতীব উদ্বেগের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। লীলা আবার বলিতে লাগিল,—"কত সময়েই তোমার নিজের নির্ধনতার কথা তোমার মুখে আমি শুনিয়াছি, কত সময়েই আমার ধন সম্পত্তির জন্য তোমাকে আনন্দ প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেও দিদি, যে নির্ধনতা হেতু তোমার স্বাধীনতা ধ্বংস হয় নাই এবং সম্পত্তির জন্য আমার অদৃষ্টে যে দুর্গতি হইয়াছে তাহা তোমার হয় নাই।"

নব বিবাহিতা কামিনীর মুখে এ কথা নিতান্তই বিষাদজনক সন্দেহ নাই। বিবাহের পর এই কয় দিন রাজবাটীতে একত্রাবস্থান করায়, তাহার স্বামী যে লোভে তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন, তাহা আর আমার বুঝিতে

বাকী ছিল না। লীলা বলিতে লাগিল,—"কত অল্প সময়ের মধ্যেই এবং কিরূপ ভাবে আমার যাতনা ও মর্ম্মব্যথা আরম্ভ হয় তাহা শুনিয়া তুমি কাতর হইও না দিদি। আগ্রা নগরে রাজার সহিত একত্রে আমি তাজমহল দেখিতে গিয়াছিলাম। পৃথিবীর মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ সৌধ স্ত্রীর স্মরণার্থ স্বামীর দ্বারা গঠিত হইয়াছে মনে হওয়ায়, আমারও নিজ স্বামীর প্রতি তখন বড় ভক্তি, মমতা ও প্রেমের উদ্রেক হইল। তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম, 'রাজা, আমার মরণের পর আমার স্মৃতির জন্য তুমিও একটা সৌধ নির্ম্মাণ করিবে না কি?' আমাদের বিবাহের পূর্ব্বে তুমি বলিতে আমাকে বড়ই ভালবাস। কিন্তু বিবাহের পর হইতে—'আমার' আর বলা হইল না। দিদি, বলিব কি তোমাকে, তিনি আমার দিকে চাহিয়াও ছিলেন না। আমার চক্ষের জল তিনি দেখিতে না পান ভাবিয়া আমি মুখে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলাম। আমার কথা তিনি শুনেন নাই মনে করিয়াছিলাম, তাহা নহে। তিনি সব শুনিয়াছিলেন, কারণ গাড়িতে উঠিয়া তিনি বলিলেন,—"যদিই তোমার স্মরণার্থ কোন চিহ্ন আমি স্থাপন করি, তাহা তোমার টাকাতেই করিব।" মমতাজ বিবির রোজা তাঁহার নিজের টাকায় হয় নাই বোধ হয়। কিন্তু আমি তখন কাঁদিতেছি, উত্তর দিব কি? তিনি বলিলেন,—,এই সব বই পড়া মেয়ে মানুষগুলা কেমন এক রকম। তুমি চাও কি? দুটা মিষ্ট কথা, দুটা উপন্যাসের মত প্রেমের আলাপ। মনে কর না কেন তাহাই হইল। সে জন্য গোল কিসের?' আমি আর কাঁদিলাম না। তখন হইতে দেবেন্দ্র বাবুর কথা মনে হইলে আমি আর সে চিন্তা হইতে কদাপি চিত্তকে বিরত করি নাই। যে সময়ে আমরা গোপনে উভয়ে উভয়কে ভালবাসিতাম সেই সময়ের স্মৃতি আসিয়া তখন হইতে আমার চিত্ত-বিনোদন করিতে লাগিল। আর এ হৃদয়-জ্বালা নিবারণের উপায় কি ছিল? তুমি যদি কাছে থাকিতে দিদি, তাহা হইলে, হয়ত চিত্ত কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিত। আমি জানি তাদৃশ চিন্তা ন্যায়-পথ-বিবর্জ্জিত। কিন্তু বল তুমি তখন আমি করি কি?"

আমি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলাম,—"আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না। তোমার প্রাণে যে জ্বালা হইয়াছে তাহা কি আমার হইয়াছে? তবে এ বিচারে আমার কি অধিকার?

লীলা বলিতে লাগিল,—"যখন রাজা নাচ তামাসা দেখিবার জন্য বেড়াইতে যাইতেন তখন আমি একা বসিয়া কেবল দেবেন্দ্র বাবুর কথাই ভাবিতাম। যদি ভগবান কৃপা করিয়া আমাকে এত ধন না দিতেন, যদি আমি দরিদ্র হইতাম, তাহা হইলে আমার অদৃষ্টে তাঁহার পত্নী হওয়া ঘটিত, আর তাহা হইলে আমার কি সুখই হইত। সেরূপ দরিদ্রের গৃহিণী হইলে আমার যেমন বসন-ভূষণ হইত,তাহা আমি মনে মনে কল্পনা করিতাম, আর ভাবিতাম যখন কঠোর পরিশ্রমের পর আমার দরিদ্র স্বামী আমাদের পর্ণকুটীরে ফিরিয়া আসিতেন, তখন কেমন করিয়া তাঁহার সেবা করিব, কেমন করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিব ও কেমন করিয়া তাঁহাকে আনন্দিত করিব, তাঁহার জন্য স্বহস্তে অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া তাঁহার সম্মুখে আনিয়া ধরিয়া দিব এবং তিনি যতক্ষণ আহার করিবেন ততক্ষণ কেমন করিয়া পাখা হাতে লইয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া থাকিব, ইত্যাদি মনে মনে আলোচনা করিতাম। ঈশ্বর করুন, তাঁহার জন্য আমার যত ভাবনা হয় এবং মনের চক্ষে সর্ব্বদা

তাঁহাকে আমি যেমন দেখিতে পাই,আমার জন্য তাঁহার যেন কখন তেমন না হয়।”

কথার সঙ্গে সঙ্গে লীলার বিলুপ্ত কোমলতা যেন আবার ফিরিয়া আসিল, যেন তাহার বিলুপ্ত সৌন্দর্য্য রেখা সকল আবার তাহার বদনে দেখা দিতে লাগিল। আবার তাহার দৃষ্টিতে যেন সেই ভূতপূর্ব্ব মধুরতার আবির্ভাব হইল। আমি বলিলাম,—“দেবেন্দ্রের কথা আর বলিও না; সে কথায় আর কাজ নাই লীলা।”

অতীব স্নেহের সহিত আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লীলা বলিল,—“তোমার যদি তাহাতে কষ্ট হয় তবে সে কথা আর কখনই বলিব না দিদি।”

আমি বলিলাম,—“তোমারই ভালর জন্য আমি তোমাকে সাবধান করিতেছি। মনে কর, যদি তোমার স্বামী তোমার এই কথা শুনিতে পান,—”

“তাহা হইলে তিনি একটুও বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন না।”

আমি চমকিত হইয়া বলিলাম,—“বল কি লীলা, তিনি বিস্মিত হইবেন না? তোমার কথা শুনিয়া আমার ভয় হইতেছে।”

লীলা বলিল,—“তাহাই তো তোমাকে বলিবার জন্য আজি এখানে আসিয়াছি। যখন আমি আনন্দধামে রাজার নিকট আমার মনের কথা ব্যক্ত করি, তখন কোন বিষয়ই তাঁহার নিকট লুকাই নাই, তাহা তো তুমি জান। কেবল নামটী তাঁহাকে বলি নাই, তাহাও তিনি জানিয়াছেন।”

তাহার কথা শুনিয়া আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। আমি কোন কথা কহিতে পারিলাম না। লীলা বলিতে লাগিল,—“বিবাহের পর যখন আমরা দিল্লী নগরে গিয়াছিলাম, তখন সেখানে একজন পূর্ব্ব পরিচিত বড় জমিদার সপরিবারে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর লেখা পড়ায় বিশেষ যত্ন এবং তিনি কবিতা লিখিতে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। তিনি স্বামীর সহিত সতত বাহিরে বেড়াইতেন এবং প্রকাশ্য রূপে লোক সমাজে কথাবার্ত্তা কহিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এক রাত্রে তাঁহাদের বাসায় রাজার ও আমার এবং আরও কোন কোন লোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। জমিদারনী, বিশেষ অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া, সেই সভায় স্বরচিত একটী কবিতা পাঠ করেন। আমি সে কবিতার বিশেষ প্রশংসা করি এবং তাঁহার সুশিক্ষাকে ধন্যবাদ দিই। তিনি পূর্ব্ব হইতেই আমাকে বড় ভাল বাসিতেন; সে দিন আমার প্রশংসা বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—‘ভগ্নি, আমার যদি কোন শিক্ষা হইয়া থাকে, সে জন্য আমার অপেক্ষা আমি যাঁহার নিকট শিক্ষা করিয়াছি তিনিই অধিকতর প্রশংসাভাজন। আমার উন্নতির জন্য তাঁহার যত্ন ও চেষ্টার সীমা ছিল না। তাঁহার বিদ্যা এবং শিক্ষা দিবার কৌশল যথেষ্ট। আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। তাঁহার নাম দেবেন্দ্রনাথ বসু। ভগ্নি, তোমার লেখা পড়ায় যেরূপ অনুরাগ এবং বুদ্ধির যেরূপ প্রাখর্য্য, তাহাতে তুমি কিছুকাল যদি তাঁহার নিকটে শিক্ষা করিতে পাও, তাহা হইলে তোমার যে কত উন্নতি হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।’ তাঁহার এই কথা শুনিয়া আমার চিত্তের যে ভাব হইল তাহা তোমাকে বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। যে দেবেন্দ্র বাবুকে আমি দেবতা জ্ঞান করি, একজন অপর স্ত্রীলোকের মুখে তাঁহারই প্রশংসা শুনিয়া আমার শত সহস্র চেষ্টা উপেক্ষা করিয়াও আমার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এবং আমি নিরুত্তরে অধোমুখ

হইয়া রহিলাম। আমার স্বামী নিকটেই ছিলেন। তিনি সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন এবং আমার ভাবান্তরও বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আমরা বাসায় ফিরিয়া আসার পর তিনি প্রথমেই আমাকে টানিয়া বিছানায় ফেলিয়া দিলেন এবং তাহার পর আমার গলায় হাত দিয়া বলিলেন, "এতদিনে তোমার গুপ্ত প্রণয়ী কে, তাহা জানিতে পারিয়াছি, যে দিন তুমি আনন্দধামে তোমার হৃদয়ের অন্য প্রেমিক আছে স্বীকার করিয়াছ, সেই দিন হইতে আমি নিরন্তর তোমার প্রাণবল্লভের নাম কি তাহা জানিবার চেষ্টা করিতেছি। এত দিন পরে আজি জানিতে পারিয়াছি; তোমার মাষ্টার দেবেন্দ্র বাবুই তোমার মনচোরা নাগর। কলিকাতায় তো ফিরিয়া যাই আগে, তাহার পর দেখিব তোমাকে ও তোমার সেই প্রাণবল্লভকে আজীবনকাল নাকে কাঁদিতে হয় কি না। এখন, আমার চাবুকের চোটে রক্তাক্ত কলেবর তোমার সেই মনচোরা মাষ্টারকে স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে নিদ্রা যাও।" সেই অবধি যখন তিনি আমার উপর বিরক্ত হন, তখনই ঐ উপলক্ষে আমাকে ভৎ'সনা বা তীব্র বিদ্রূপ না করিয়া ছাড়েন না। আজি যখন তিনি, তাঁহাকে আমি দায়ে পড়িয়া বিবাহ করিয়াছি বলিয়া, আমাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, তখন সে কথা শুনিয়া, দিদি, তুমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলে। কিন্তু দিদি, সেরূপ কথা আমার অঙ্গের আভরণ হইয়াছে। আমি যুক্তি, তর্ক, বিনয় প্রকাশ, সততার প্রমাণ প্রদর্শন এবং তাঁহার অনুরাগ লাভের চেষ্টা করিতে কোনরূপ ত্রুটি করি নাই। কিন্তু বলিব আর কি? আমার কপাল গুণে আমার প্রতি তিনি চিরদিনই বাম।"

হায় কি দুষ্কর্ম্মই আমি করিয়াছি! আমি যদি যথাকালে এ বিবাহের প্রতিকূলতা করিতাম, তাহা হইলে এ স্বর্ণলতার কখনই এ দুর্দ্দশা ঘটিত না। হায়, যে দিন আমি আনন্দধামে নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় দেবেন্দ্রকে এ বাসনা পরিত্যাগ করিতে বলিলাম, তখন তাঁহার সেই হতাশ বদনের কাতর ভাব এখনও আমার মনে উদয় হইয়া আমাকে নিতান্ত ক্লিষ্ট করিতে লাগিল। হায়, কেন আমি দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া লীলাকে তাহার প্রাণের প্রাণের বক্ষে তুলিয়া না দিয়া, ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে তাহার নিকট হইতে দূর হইতে দূরান্তরে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলাম? কাহার জন্য এ কার্য্য আমি করিয়াছি? রাজা প্রমোদের জন্য! ধিক্ আমাকে! অসহ্য মনস্তাপে তখন আমার হৃদয় ব্যথিত। লীলা আমাকে আমার দুষ্কৃতির জন্য শত ধিক্কার না দিয়া কোমল সস্নেহ বাক্যে আমাকে বিনোদিত এবং বারংবার আমাকে চুম্বন করিয়া প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অন্তর্জ্বালা কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইলে আমার গায়ে হাত দিয়া লীলা বলিল,—অনেক দেরি হইয়াছে। চল দিদি আরও দেরি হইলে অন্ধকার হইয়া পড়িবে।"

বস্তুতই তখন কতকটা অন্ধকার হইয়াছিল। দূরে বিলের ধারে বাষ্প ও শিশির মিলিয়া যেন ধোঁয়ার মত দেখাইতেছিল; তাহারই সহিত সন্ধ্যার অন্ধকার মিশিয়া কেমন এক রকম দেখাইতেছিল। আমি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম,—"চল তবে।"

লীলা অগ্রে ও আমি তাহার পশ্চাতে চলিলাম। দুই এক পদ অগ্রসর হইতে না হইতে লীলা ভয়ানক কাঁপিতে কাঁপিতে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল,—"দিদি, দিদি দেখ,—ওকি?"

আমি বলিলাম,—"কোথায় কি?"

লীলা 'ঐ যে, ঐ যে, বলিয়া, হাত দিয়া দেখাইয়া দিল। আমি দেখিলাম সেই ধূমাচ্ছন্ন প্রদেশে, আমাদের দিকে সম্মুখীন হইয়া, এক নিতান্ত অস্পষ্ট সজীব মনুষ্য মূর্ত্তি। সজীব, কারণ কিয়ৎকাল আমাদের দিকে সম্মুখীন হইয়া অবস্থিতি করার পর, মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে ও ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল এবং অবিলম্বে পার্শ্বস্থ বনান্তরালে অদৃশ্য হইল। আমরা কিয়ৎকাল দারুণ ভয়ে চলচ্ছক্তি-বিরহিত হইয়া; দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমরা ভবনোদ্দেশে চলিতে আরম্ভ করিলে, লীলা অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসিল,—"দিদি, মেয়ে মানুষ, না পুরুষ মানুষ?"

"ঠিক বুঝিতে পারি নাই।"

"যেন মেয়ে মানুষই মনে হইল।"

"আমার যেন বোধ হয় একটা লম্বা জ'মা গায়ে দেওয়া পুরুষ মানুষ।"

"তাই হবে। কিন্তু কিছুই ভাল করিয়া বুঝা গেল না। মনে কর দিদি, ঐ মূর্ত্তি যদি আমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে আইসে।"

"না লীলা, সে রকম ভয়ের কোনই কারণ নাই। নিকটের গ্রাম হইতে এ বিল তো অধিক দূর নহে, হয়ত গ্রাম হইতেই কোন লোক এদিকে আসিয়া থাকিবে। এতদিনের মধ্যে কখনও যে আমরা এদিকে লোকজন দেখি নাই ইহাই আশ্চর্য্য।"

আমরা তখন বিলের অঞ্চল ছাড়াইয়া আবাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। পথ বড় অন্ধকার। আমরা দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া যতদূর সাধ্য বেগে চলিতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধেক পথ আসার পর লীলা আপনিও থামিল এবং আমাকেও থামাইয়া বলিল,—"কথা কহিও না। দিদি, কিছু শুনিতে পাইতেছ কি?"

আমি তাহাকে সাহস দিবার জন্য বলিলাম—"ও কিছু নয়। বাতাসে শুক্‌না পাতা নড়ার শব্দ।

"না দিদি, ঐ শুন। বাতাসের নাম নাই, পাতা নড়িবে কেন?"

আমিও শুনিতে পাইলাম যেন আমাদের পশ্চাতে অতি মৃদু পাদবিক্ষেপের শব্দ হইতেছে। বলিলাম,—"যাহাই কেন হউক না, আর খানিকটা দূর গেলেই আমরা চীৎকার করিলে বাড়ীর লোক শুনিতে পাইবে। চল।"

আমরা বেগে দৌড়িতে লাগিলাম। লীলা প্রায় রুদ্ধশ্বাস হইয়া পড়িল, এ দিকে প্রাসাদের আলোকিত জানালাও দেখিতে পাওয়া গেল। লীলাকে একটু জিড়াইতে দিবার জন্য আমরা সেখানে এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিলাম। তখন লীলা আবার আমাকে কাণ পাতিয়া শুনিবার নিমিত্ত হস্ত দ্বারা সঙ্কেত করিল। তখন আমরা উভয়েই আমাদের পশ্চাতের বৃক্ষাবলীর মধ্য হইতে সুদীর্ঘ, কাতর দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ স্পষ্টরূপে শুনিতে পাইলাম। আমি সজোরে জিজ্ঞাসিলাম,—"কে ওখানে?"

কোন উত্তর নাই। আবার জিজ্ঞাসিলাম, —"কে ওখানে?"

কিয়ৎকাল কোনই শব্দ শুনা গেল না। তাহার পর যেন ধীরে ধীরে মৃদু পাদক্ষেপধ্বনি নিঃশব্দতার সহিত মিশিয়া গেল। আমরা আর কথাটীও না কহিয়া বেগে চলিতে লাগিলাম এবং অবিলম্বে প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে আলোকিত প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়া লীলা আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"দিদি, ভয়ে আমি মৃতপ্রায় হইয়াছি। এখন কে লোকটা অনুমান কর দেখি।"

আমি বলিলাম,—কালি তাহার বিচার

করিব। আপাততঃ এ কথা আর কাহাকেও বলিও না।”

“কেন ?”

“কারণ বোবার শত্রু নাই। আর এ বাটীতে আমাদের বিশেষ সাবধান থাকাই আবশ্যক।”

লীলাকে বিশ্রাম করিবার জন্য তাহার ঘরে পাঠাইয়া দিলাম এবং নিজে কিছুকাল সেখানে দাঁড়াইয়া ঠাণ্ডা হইলাম। তাহার পর এই বিষয়ে যতদূর সম্ভব সন্দেহ মিটাইবার জন্য একখানি পুস্তকের ওজরে কেতাব ঘরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম সেখানে চৌধুরী মহাশয় একখানি কোচের উপর অর্দ্ধ শায়িতাবস্থায় পড়িয়া আলবোলায় তামাক টানিতেছেন এবং নিতান্ত মনোযোগের সহিত এক খানি বই পড়িতেছেন। তাহার স্ত্রী পার্শ্বে একখানি চেয়ারে বসিয়া স্বামীর জন্য এক জোড়া মোজা বুনিতেছেন। তাঁহারা যে বাহিরে গিয়াছিলেন এবং এখনই ব্যস্ত ভাবে বাটী ফিরিয়াছেন, তাঁহাদের দেখিয়া এমন কোন লক্ষণই বোধ হইল না। আমাকে দেখিয়া চৌধুরী মহাশয় সন্নিহিত একখানি হাতপাখা টানিয়া লইয়া বাতাস খাইতে খাইতে বলিলেন,—“মনোরমা দেবি, মোটা মানুষ হওয়াটা কি বিড়ম্বনা! দেখুন দেখি গরমে আমার প্রাণ যায়, আর আমার স্ত্রীকে দেখুন এত গরমেও যেন পুকুরের মাছ।”

রঙ্গমতী ঠাকুরাণী হাসিতে হাসিতে সগৌরবে ও রসিকতার ভাবে বলিলেন,—“আমি কখনই গরম হই না।”

চৌধুরী মহাশয় আবার জিজ্ঞাসিলেন,—“মনোরমা দেবি, আপনি একটু বেড়াইতে গিয়াছিলেন কি ?”

প্রয়োজন না থাকিলেও আমি তখন উদ্দেশ্য ঠিক রাখিবার জন্য অলমারি হইতে একখানি বই খুঁজিতে খুঁজিতে উত্তর দিলাম,—“আজ্ঞে হাঁ, আমরা একটু হাওয়া খাইতে গিয়াছিলাম।”

“কোন্ দিকে ?”

“বিলের দিকে—কাঠের ঘর পর্য্যন্ত।”

“ওঃ! অতদূর ?”

অন্য সময় হইলে আমি তাঁহার এত জিজ্ঞাসায় মনে মনে বিরক্ত হইতাম, কিন্তু আজি বিরক্ত না হইয়া সন্তোষের সহিত মীমাংসা করিলাম যে, তিনি কিংবা তাঁহার স্ত্রী আমরা বিলের নিকট যে দৃশ্য দেখিয়াছি তাহার সহিত কোন ক্রমেই সংস্পৃষ্ট নহেন।

তিনি বলিতে লাগিলেন,—“আপনি সে দিকে গেলেই একটা কাণ্ড না দেখিয়া ফিরেন না। আজি আবার সেই আহত বিলাতী কুকুরের মত কোন কাণ্ড আপনার চক্ষে পড়ে নাই তো ?”

প্রশ্ন সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার দুরবগম্য, তীক্ষ্ণ, অস্থিরকারী দৃষ্টি আমার নয়নের সহিত সম্মিলিত করিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সে দৃষ্টিতে আমি নিতান্ত বিচলিত হই এবং তিনি আমার অন্তরের রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া আমার সন্দেহ হয়। অদ্যও তাহা হইল। আমি সংক্ষেপে উত্তর দিলাম,—“না—কোন কাণ্ডই তো ঘটে নাই।”

সে দিক হইতে নয়ন ফিরাইয়া আমি গৃহত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলাম। সেই সময়ে রঙ্গমতী ঠাকুরাণী কথা না কহিলে চৌধুরী মহাশয়ের সেই তীব্র দৃষ্টির সম্মুখ হইতে আমি সরিয়া যাইতে পারিতাম কি না সন্দেহ। চৌধুরাণী বলিলেন,—“বেশ মনোরমা, দাঁড়াইয়া রহিলে কেন ?”

চৌধুরী মহাশয় সেই কথায় তাঁহার স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরাইলেন ; আমিও সেই অবকাশে একটা ওজর করিয়া চলিয়া আসিলাম। লীলার নিকটে কিছুকাল বসিয়া থাকিতে থাকিতে লীলার একজন দাসী তথায় উপস্থিত হইল। তাহার কাছে যদি কোন সন্ধান পাওয়া যায় ভাবিয়া আমি এ কথা ও কথার পর তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম,—"ওঃ আজি কি গরম ! আমার প্রাণ যেন ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। তোমাদের নীচেকার ঘরে কেমন গরম ঝি ?"

"কই না ; বিশেষ কি গরম মাসি মা ?"

"তবে বুঝি তোমরা আবাদের দিকে বেড়াইতে গিয়াছিলে, তাই বেশী গরম টের পাও নাই।"

"আমরা কেহ কেহ তাই মনে করেছিলাম বটে, কিন্তু বামুন ঠাক্‌রুণ উঠানে মাদুর বিছাইয়া রূপকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, কাজেই সেখান হইতে কাহারও নড়া হইল না।"

এখন একবার গিন্নি-ঝির কাছে সন্ধান করিতে পারিলে এ দিকের সন্ধান শেষ হয় ভাবিয়া ঝিকে জিজ্ঞাসিলাম,—"গিন্নি-ঝি এতক্ষণ শুইয়াছেন কি ?"

ঝি হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল,—"শোওয়া দূরে থাক্‌, তিনি হয়ত এখন উঠিবার যোগাড় দেখিতেছেন।"

"কেন ? তিনি কি দিনেই ঘুমাইয়াছেন নাকি ?"

"না মাসি মা, তিনি সন্ধ্যার সময় হইতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, এখনও হয়ত ঘুমাইতেছেন।"

তবেই দাঁড়াইতেছে, বিলের নিকট লীলা ও আমি যে মূর্ত্তি দেখিয়াছি তাহা রঙ্গমতী দেবীর, তাঁহার স্বামীর, অথবা বাটীর কোন দাসীর মূর্ত্তি নহে। তবে সে কে ? স্থির করা এক প্রকার অসম্ভব। মূর্ত্তিটা পুরুষ কি স্ত্রীমূর্ত্তি তাহাই আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে অক্ষম। আমার যেন বোধ হয় তাহা স্ত্রীমূর্ত্তি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ।—রাত্রে শয়ন করার পর, লীলার সকল কষ্টের কারণ স্বরূপ বর্ত্তমান বিবাহের সহায়তা করায় বিষম আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। আমি নিতান্ত কাতর হৃদয়ে ভূতকালের ঘটনাবলী আলোচনা করিতে লাগিলাম। অনেক ভাবিয়া দেখিলাম আমার তৎকালীন কার্য্যের ফল যতই মন্দ হউক, আমি সকলই সৎ ও শুভাভিপ্রায়েই করিয়াছি। তখন এই অপ্রতিবিধেয় দুর্দ্দশার কথা বিচার করিতে করিতে আমি না কাঁদিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই ক্রন্দনে আমার বিশেষ উপকার হইল। স্থির প্রতিজ্ঞার সহিত গাত্রোত্থান করিলাম যে, রাজা যতই অপমান, বা তিরস্কার করুন আমি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপও করিব না। আমি লীলার জন্যই এখানে আছি, লীলার জন্যই থাকিব এবং তাহারই জন্য সকলই অকাতরে সহ্য করিব।

সকালে উঠিয়া কালিকার সেই মূর্ত্তি ও পদধ্বনির" বিষয় ভাবিব কি, লীলার এক ভয়ানক দুঃখের কারণ উপস্থিত হওয়ায় কিছুই হইল না। আমি লীলার বিবাহের সময় তাহাকে এক গাছি সোণার চিক দিয়াছিলাম। লীলা এই দরিদ্র-ভগ্নী-প্রদত্ত সেই চিক গাছটীকে প্রাণের মত ভাল বাসিত। তাহার

হীরা মতি খচিত কত রকমেরই জড়াও চিক ছিল, কিন্তু লীলা সে সকল উপেক্ষা করিয়া আমার এই চিক গাছটী সর্ব্বদা ব্যবহার করিত। সে গাছটী হারাইয়া যাওয়ায় লীলা বড়ই দুঃখিত হইল। আমরা অনুমান করিলাম, হয় কাঠের ঘরে না হয় আবাদের মধ্যের পথে তাহা পড়িয়া গিয়াছে। লোক জন পাঠাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু কেহই পাইল না। শেষ বেলা বারোটার সময় লীলা নিজে তাহার সন্ধান করিতে গেল। সে তাহা পায় না পায়, উকীলের পত্র আমার হস্তগত হইবার পূর্ব্বে তাহার এই ওজরে বাহিরে থাকা হইবে, সুতরাং রাজা ইহার মধ্যে ফিরিয়া আসিলেও তাহাকে দেখিতে পাইবেন না ভাবিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম।

একটা বাজিল। উকীলের লোক আসিবার সময় তো হইল। এখন তাহার অপেক্ষায়, আমি এখানেই থাকিব, কি প্রাসাদের ফটকের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিব। এ বাটীর সকলের উপরেই আমার যে প্রকার সন্দেহ, তাহাতে সকলের চক্ষু ছাড়াইয়া বাহিরে গিয়া অপেক্ষা করাই ভাল মনে হইল। চৌধুরী মহাশয় মনুয়া পাখী লইয়া খেলা করিতেছেন, তাহাদের সহিত সিস্ দিতেছেন, নাম ধরিয়া এক একটাকে ডাকিতেছেন, সে সকল শব্দ স্পষ্টই শুনা যাইতেছে, সুতরাং তাঁহার জন্য কোন ভয় নাই। আর দেখিলাম,—রঙ্গমতী ঠাকুরাণী ঘরে বসিয়া মোজা সেলাই করিতেছেন। এই উত্তম সুযোগ মনে করিয়া আমি নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

প্রাসাদ হইতে যে রাস্তা রেলওয়ে ষ্টেশনের দিকে বাহির হইয়াছে, কিয়দ্দূর সোজা আসার পর তাহা বাঁকিয়া গিয়াছে। যে স্থলে রাস্তা বাঁকিয়া গিয়াছে সে মোড়ের উপর একজন দ্বারবান্ থাকিবার জন্যএকটী ছোট কুঠরী ছিল। আমি সেই কুঠরীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উকীলের লোকের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। অনতিকাল মধ্যেই গাড়ীর শব্দ পাইয়া বুঝিলাম ষ্টেশনের দিক হইতে অবশ্যই কেহ আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে একখানি ভাড়াটিয়া ছক্কর আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। কোচম্যানকে থামিতে সঙ্কেত করিলাম। গাড়ী থামিলে একটী ভদ্রলোক, কেন হঠাৎ গাড়ী থামিল দেখিবার জন্য, মুখ বাহির করিলেন। আমি বলিলাম,—"মহাশয় বোধ হয় এই কৃষ্ণসরোবরের রাজবাটীতেই গমন করিতেছেন ?"

"হাঁ দেবী।"

"কাহারও জন্য কোন চিঠি লইয়া যাইতেছেন কি ?"

"শ্রীমতী মনোরমা দেবীর জন্য একখানি চিঠি লইয়া যাইতেছি।"

"আমিই মনোরমা, আপনি আমাকে পত্র দিতে পারেন।"

ভদ্রলোক বিনীতভাবে আমাকে নমস্কার করিয়া তৎক্ষণাৎ গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং আমার হস্তে পত্র প্রদান করিলেন। আমি পত্র প্রাপ্তি মাত্র খাম ছিঁড়িয়া পত্র পাঠে নিযুক্ত হইলাম। সাবধানতার অনুরোধে মূল পত্র নষ্ট করিয়া এস্থলে তাহার নকল রাখিলাম।

"বিহিত বিনয় সহকারে নিবেদন—

"অদ্য প্রাতে আপনার পত্র পাইয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলাম। যতদূর সম্ভব সরল ভাবে ও সংক্ষেপে আমি তাহার উত্তর দিতেছি।

"বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম রাণী লীলাবতী দেবীর যে দুই লক্ষ টাকার স্বাধীন সম্পত্তি আছে, তাহাই আবদ্ধ রাখিয়া কিছু টাকা ধার করিবার জন্য এই কাণ্ড হইতেছে। এক্ষণে সে সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে রাণীর অধীন। এজন্য তাঁহার স্বাক্ষর ব্যতীত তাহা আবদ্ধ

রাখা অসম্ভব। ইহাতে অন্য কোন অনিষ্ট না হইলেও রাণীর গর্ভে যে সকল কুমার জন্মিবে তাহাদের স্বার্থের বিশেষ হানি হওয়া সম্ভাবিত। তদ্ব্যতীত তাহাতে আপত্তির এবং আশঙ্কার আরও অনেক কারণ থাকিতে পারে।

"এই সকল গুরুতর কারণে প্রথমে দলিল আমাকে না দেখাইয়া এবং আমার সম্মতি না লইয়া রাণী যেন কদাপি তাহাতে নাম স্বাক্ষর না করেন। এ প্রস্তাবে কোনই আপত্তি উত্থাপিত হওয়া অসঙ্গত, কারণ দলিল যদি নির্দ্দোষ হয়, তাহা হইলে তাহা দেখাইতে কোনই সঙ্কোচ হইতে পারে না।

"এ বিষয়ে বা অন্য কোন বিষয়ে যখন যে পরামর্শ জিজ্ঞাসিবেন আমি তাহারই যথাসম্ভব সদ্যুক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে প্রদান করিব। ইতি—

"অনুগত

"শ্রীকরালী প্রসন্ন ঠাকুর।"

পত্র পাঠ করিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম। আর কিছু হউক না হউক, লীলাকে নাম সহি করিবার জন্য আবার জেদ করিলে একটা জবাব দিবার উপায় হইল। পত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে আমি পত্রবাহক মহাশয়কে বলিলাম,—"আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিবেন যে, পত্রের মর্ম্ম আমি প্রণিধান করিয়াছি এবং বড় বাধিত হইয়াছি। আপাততঃ অন্য উত্তরের প্রয়োজন নাই।"

যখন আমি সেই উন্মুক্ত পত্র হস্তে ধরিয়া ভদ্রলোকটীকে এই সকল কথা বলিতেছি, তখন রাস্তার মোড়ের দিক হইতে চৌধুরী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এরূপ সহসা তিনি উপস্থিত হইলেন যে, ভূপৃষ্ঠ বিদার করিয়া যেন তিনি সমাগত হইলেন বলিয়া আমার বোধ হইল। তাঁহার এরূপ অসম্ভাবিত ভাবে এরূপ স্থলে আবির্ভাব দেখিয়া আমি এতই বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম যে, লোকটী বিদায় হইয়া নমস্কারান্তে শকটে আরোহণ করিল, কিন্তু আমি তাহার সহিত সামান্য শিষ্টাচার ও সৌজন্যও প্রকাশ করিতে পারিলাম না। অন্য কোন লোক নহে—চৌধুরী মহাশয় আমার অভিসন্ধি নিশ্চয়ই জ্ঞাত হইয়াছেন, এ চিন্তা আমাকে পাষাণবৎ অচল ও সংজ্ঞাশূন্য করিয়া তুলিল।

অনুমাত্র বিস্ময় বা কৌতূহল প্রকাশ না করিয়া এবং সেই শকট বা তাহার আরোহীর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া চৌধুরী মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"মনোরমা দেবি, আপনি কি বাড়ীর দিকে ফিরিতেছেন ?"

আমি চিত্তকে যথাসাধ্য প্রকৃতিস্থ করিয়া সম্মতিসূচক মস্তকান্দোলন করিলাম। তিনি আবার বলিলেন,—"চলুন, আমিও ফিরিতেছি। আপনি আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইতেছেন নাকি ?"

আমি কি উত্তর দিব ভাবিতেছি। তাঁহার সহিত শত্রুতা করিব না ইহা স্থির। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমাকে দেখিয়া আপনি আশ্চর্য্য মনে করিতেছেন কেন ?"

আমি আমার বিকম্পিত কণ্ঠস্বর স্থির করিয়া উত্তর দিলাম,—"আমি এখনই শুনিয়া আসিলাম, আমনি আপনার পাখী লইয়া আমোদ করিতেছেন; তাহার পর কেমন করিয়া হঠাৎ এখানে আসিলেন তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না।"

তিনি উত্তর দিলেন,—"না আসিয়া থাকি কিরূপে ? দেখিলাম আপনি বাটীতে নাই। বুঝিলাম আপনি অবশ্যই কোন কাজের জন্য বাহিরে গিয়াছেন। আপনি একাকী বাহিরে আসিয়াছেন এবং কেহই আপনার সঙ্গে নাই

বুঝিয়া আমি স্থির থাকিতে পারি ক ? ম, তৎক্ষণাৎ কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া, আপনার সন্ধানে বাহির হইলাম। কিন্তু কোথাও আপনার সন্ধান না পাইয়া হতাশ ভাবে বাটী ফিরিতেছিলাম; এমন সময় বিধাতা পথের মধ্যে আপনাকে মিলাইয়া দিলেন।”

এইরূপে আমার সুখ্যাতি ও আমার প্রতি অযথা কৃপা ব্যক্ত করিতে করিতে তিনি এতই বক্তৃতা করিতে লাগিলেন যে, আমি কোন কথা বলিবারই অবসর পাইলাম না। এত কথা তিনি বলিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু এক বারও আমার হস্তে তখনও যে পত্র রহিয়াছে তাহার সম্বন্ধে কোনই কৌতূহল প্রকাশ বা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন না। এ সম্বন্ধে তাঁহার এতাদৃশ ধৈর্য্য দেখিয়া আমি স্পষ্টই অনুমান করিলাম যে, লীলার হিতার্থে, আমি উকীলের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলাম নিশ্চয়ই তাহার মর্ম্ম তিনি কোন অসদুপায়ে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। আর আমি উকীলের নিকট হইতে যে তাহার উত্তর পাইলাম ইহাও তিনি গোপনে অবস্থান করিয়া দেখিলেন; সুতরাং তাঁহার অভীষ্ট বিলক্ষণ সিদ্ধ হইয়াছে বলিতে হইবে। আমরা বাটীতে ফিরিয়া দেখিলাম সহিস্ আস্তাবলে টম্ টম্ ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছে। সুতরাং রাজা এখনই ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমাদের দেখিয়া রাজা ঘরের মধ্য হইতে বাহিরে আসিলেন। আর কিছু হউক, না হউক, তাঁহার নিতান্ত রুক্ষ ভাবটা যেন একটু কমিয়াছে বোধ হইল। তিনি বলিলেন,—“তোমরা দুই জনে ফিরিয়া আসিলে সেও ভাল। পালান বাড়ীর মত সকলেই বাড়ী ছাড়িয়া থাকার মানে কি ? রাণী কোথায় ?”

লীলার চিক হারাইয়া গিয়াছে এবং সে চিকের সন্ধানে স্বয়ং বিলের দিকে গিয়াছে, এ কথা আমি তাঁহাকে জানাইলে তিনি বিরক্ত ভাবে বলিলেন,—চিক ফিক্ আমি বুঝি না। আজি যে কাজের বন্দোবস্ত আছে তাহা যেন তিনি না ভুলেন। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে কাজের জন্য তাঁহাকে চাই।”

আমি অন্য কোন কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে সিঁড়িতে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। শুনিতে পাইলাম চৌধুরী মহাশয় রাজাকে বলিতেছেন,—“অনেক দূর গিয়াছিলে প্রমোদ ? দেখিলাম ঘোড়াটা আধমরা করিয়া আনিয়াছ।”

রাজা বলিলেন,—“ঘোড়ার কপালে আগুণ! আপাততঃ ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। আমি এখন আহার চাই।”

চৌধুরী মহাশয় সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন,—“আর আমি সর্ব্বাগ্রে তোমার সহিত পাঁচ মিনিট কথা কহিতে চাই। এইখানে দাঁড়াইয়া কেবল পাঁচ মিনিট কাল মাত্র ভাই।”

“কি বিষয়ে ?”

“তোমারই কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ে।”

কথার শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য আমি খুব দেরি করিয়া সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলাম। রাজা বলিলেন,—“যদি তুমি মিছা ফ্যাচ ফ্যাচ কর তাহা হইলে আমি শুনিতে চাহি না, এ কথা বলিয়া রাখিতেছি। আমার ক্ষুধায় নাড়ী জ্বলিতেছে।”

তাহার পর তাঁহাদের যে কথা হইল তাহার এক বর্ণও আমি শুনিতে পাইলাম না। কিন্তু শুনিতে পাই বা না পাই, কথাটা যে দলিলে নাম সহি সংক্রান্ত তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। ব্যাপারটা জানিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইল। কিন্তু উপায় কিছুই নাই তো।

আমি আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। উকীলের চিঠিখানা এখন লীলাকে দেখাইতে পারিলে বাঁচি। ইচ্ছা হইতেছে লীলার সন্ধানে বিলের ধারে কাঠের ঘরে যাই। বড় ক্লান্ত হইয়াছি। যাইতে পারিতেছি না। একটু শয়ন করিয়া বিশ্রাম করি। আমি শয়ন করিয়া বিশ্রামের উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় ধীরে ধীরে আমার ঘরের দরজা খুলিয়া গেল এবং চৌধুরী মহাশয় ভিতরে উঁকি দিয়া বলিলেন,—"মনোরমা দেবি, আমি আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করিতেছি বলিয়া আমার দোষ গ্রহণ করিবেন না। আমি শুভ সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছি, এজন্য ক্ষমার্হ! প্রমোদের মনের ভাব গতি আপনি জানেন তো। এখন তাহার মতলব বদলাইয়াছে। নাম স্বাক্ষরের ব্যাপার আপাততঃ বন্ধ থাকিল। আপনার মুখ দেখিয়া বুঝিতেছি, এ সংবাদে আপনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমার শুভাশীর্ব্বাদ সহ রাণী মাতাকে এই সংবাদ জানাইয়া তাঁহার উদ্বেগের শান্তি করিবেন।"

কথা সমাপ্ত হইবামাত্র এবং আমি কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তিনি প্রস্থান করিলেন। নিশ্চয়ই চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টায় এই অসম্ভব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কল্য আমি এজন্য উকীলকে পত্র লিখিয়াছি এবং অদ্য তাহার উত্তরও পাইয়াছি, এতদুভয় ঘটনাই তাঁহার জানা ছিল বলিয়া তিনি সহজেই রাজার মত পরিবর্ত্তনে সক্ষম হইয়াছেন। যাহা হউক, এই সংবাদ বহন করিয়া তখনই আমার লীলার নিকটে দৌড়িয়া যাইতে বাসনা হইল, কিন্তু শরীর বড় ক্লান্ত ও কাতর, এজন্য যাইতে পারিলাম না; সেই পালঙ্কেই পড়িয়া রহিলাম। এইরূপ অবস্থায় ক্রমে ক্রমে একটু তন্দ্রা আসিয়া আমাকে আচ্ছন্ন করিল এবং ধীরে ধীরে আমার সংজ্ঞা তিরোহিত হইয়া গেল। তখন মধ্যাহ্ন কালে, আমি নিদ্রার আবেশে স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, আমার সম্মুখে দেবেন্দ্রনাথ বসু। আমি আজি প্রাতে নিদ্রা ভঙ্গের পর হইতে এ পর্য্যন্ত একবারও তাঁহার কথা আলোচনা করি নাই; লীলাও বাক্যে বা ইঙ্গিতে তাঁহার কোনই প্রসঙ্গ করে নাই; তথাপি আমি স্বপ্নের মহিমায় সুস্পষ্ট-তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তিনি বহুলোকের সঙ্গে একটা সুবৃহৎ দেব-মন্দিরের সোপান সমীপে নিপতিত রহিয়াছেন। অগণ্য নানাজাতীয় সমুন্নত সুবিস্তৃত বৃক্ষাবলী সন্নিহিত প্রদেশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। নিদারুণ মহামারীর বীজ তত্রত্য বায়ুকে কলুষিত করিয়া রহিয়াছে। সেই বিষাক্ত বায়ু সেবন করিয়া একে একে দেবেন্দ্রের সঙ্গিগণ শমন-সদনে প্রয়াণ করিতেছে। তাহাদের এই দুরবস্থা দর্শনে দেবেন্দ্রের জন্য দারুণ ভয়ে অবসন্ন হইয়া আমি বলিয়া উঠিলাম,—"ফিরিয়া আইস, ফিরিয়া আইস! তাহার নিকট এবং আমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ তাহা স্মরণ কর। মহামারী তোমাকে স্পর্শ করিয়া তোমার সঙ্গিগণের ন্যায় জীবন বিহীন করিবার পূর্ব্বে তুমি আমাদের নিকট চলিয়া আইস।" স্বর্গীয় শান্তপূর্ণ বদনে তিনি আমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—অপেক্ষা করুন, আমি ফিরিয়া যাইব। সেই গভীর রজনী কালে যখন রাজপথে পথভ্রষ্টা কামিনীর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল তখন হইতে আমার জীবন অনাগত ভবিষ্যৎ গর্ভস্থ কোন রহস্য উদ্ভেদের যন্ত্র স্বরূপে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে এই বনভূমির মধ্যে লুক্কায়িতই বা থাকি, অথবা সেখানে আমার জন্মভূমির মধ্যেই বা অবস্থিত হই,

আমি আপনার পরম প্রেমাস্পদ ভগ্নীর সহিত অপরিজ্ঞেয় ন্যায়-বিচারের এবং অপরিহার্য্য পরিণামের উদ্দেশে তমসাচ্ছন্ন পথে পর্য্যটন করিতেছি। স্থির হইয়া দেখুন। যে মহামারী সকলকে ধ্বংস করিতেছে, আমাকে তাহা স্পর্শও করিবে না।”

আবার তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম। এখনও তিনি ঘোরারণ্য মধ্যে অবস্থিত এবং তাঁহার সঙ্গিগণ সংখ্যায় নিতান্ত হীন। এবার আর সেখানে দেব-মন্দির নাই। বহু সংখ্যক কদাকার, উগ্রপ্রকৃতি, তীর ও ধনুকধারী বর্ব্বর তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া অনবরত তীরাঘাতে তাঁহার সঙ্গিগণকে বিনষ্ট করিতেছে। আবার আমার দেবেন্দ্রের জন্য দারুণ ভয় জন্মিল এবং আমি তাঁহাকে সতর্ক করিবার জন্য আবার চীৎকার করিলাম। আবার তিনি সেই অপরিবর্ত্তনসহ শান্তিপূর্ণ বদনে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—“সেই তমসাচ্ছন্ন পথে আর একপদ অগ্রসর হওয়া গেল। স্থির হইয়া দেখুন। যে তীর, সকলকে বিনষ্ট করিতেছে, তাহা আমার নিকটস্থও হইবে না।”

তৃতীয় বার তাঁহাকে দেখিলাম। এবার তিনি ঘোর তরঙ্গমালাসঙ্কুল সাগর-বক্ষে বাত্যা-বিঘূর্ণিত এক মজ্জমান অর্ণবপোতে সমাসীন। অন্যান্য আরোহিগণ, পোতের বিপন্নদশা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র তরণীর আশ্রয়ে পলায়ন-পরায়ণ হইয়াছে। কেবল দেবেন্দ্র একাকী সেই দুস্তর সলিলরাশির গর্ভে সমাহিত হইবার জন্য উপবিষ্ট। আবার আমি ভয়-বিহ্বলভাবে চীৎকার করিয়া, যে কোন উপায়াবলম্বনে জীবন রক্ষার চেষ্টা করিতে উপদেশ দিলাম। আবার তিনি আমার দিকে অবিকৃত প্রশান্ত দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—“সেই দুর্জ্ঞেয় পথে আর এক পদ অগ্রসর হওয়া গেল, স্থির হইয়া দেখুন। যে উন্মত্ত সমুদ্র বদন-ব্যাদান করিয়া সকলকে গ্রাস করিতেছে, তাহা আমার কোনই অনিষ্ট করিবে না।”

শেষ বার তাঁহাকে দর্শন করিলাম। দেখিলাম তিনি ধবল মর্ম্মর প্রস্তর-বিনির্ম্মিত এক পরলোকগতা কামিনীর প্রতিমূর্ত্তিপার্শ্বে অবনত মস্তকে উপবিষ্ট। দেখিলাম সহসা সেই পাষাণনির্ম্মিত মূর্ত্তি সজীব হইল এবং এক অবগুণ্ঠনবতী নারীর আকার পরিগ্রহ করিয়া দেবেন্দ্রের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। দেবেন্দ্রের বদনমণ্ডল স্বর্গীয় শান্তি-শ্রী পরিত্যাগ করিয়া অপার্থিব বিষাদে সমাচ্ছন্ন হইল। তখন তিনি বলিলেন,—“এখনও অন্ধকার হইতে অধিকতর অন্ধকার এবং দূর হইতে অধিকতর দূর। মৃত্যু পুণ্যাত্মা, সুন্দর ও নবীনকে গ্রাস করিতেছে, কিন্তু আমাকে রক্ষা করিতেছে। যে দুর্জ্ঞেয় পথে পর্য্যটন করিতে করিতে আমি ক্রমশঃ পরিণাম ফলের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতেছি, ধ্বংসকারী মহামারী, জীবন্তকারী শত্রুর অস্ত্র, সর্ব্বগ্রাসী সমুদ্র এবং প্রেম ও আশার বিলোপকারী মৃত্যু দ্বারা তাহা স্থানে স্থানে আকীর্ণ।

অবক্তব্য ভয়ে আমার হৃদয় অবসন্ন হইল এবং অশ্রুহীন বিষাদে আমার হৃদয় মথিত হইল। সেই পাষাণ-মূর্ত্তির সমীপোবিষ্ট পর্য্যাটককে ক্রমে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল; সেই অবগুণ্ঠনবতী কামিনীকে ক্রমে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল; সেই স্বপ্নদর্শকারিকে ক্রমে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল। আর আমি কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাইলাম না।

আমার স্কন্ধদেশে কাহার করস্পর্শ হওয়ায় নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখিলাম লীলা আমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছে। তাহার মুখের ভাব

উত্তেজিত উৎসাহময় ও অস্থির। আমি তাহার এই ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসিলাম,—"একি? কি হইয়াছে? ব্যাপার কি?"

লীলা ঘরের চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিল; তাহার পর আমার কর্ণের নিকট বদন আনত করিয়া ফুস্ ফুস্ করিয়া বলিল,—"দিদি দিদি, বিলের ধারের সেই মূর্ত্তি—সেই পা ফেলার শব্দ—আমি তাহাকে এখনই দেখিয়াছি—তাহার সহিত কথা কহিয়াছি।"

"অ্যাঁ! বল কি? কে সে?

"মুক্তকেশী"

এই স্বপ্নের পর জাগরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লীলার এই ভাব, তাহার পর তাহার মুখে এই কথা শুনিয়া আমি বেগে শয্যা ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। কি করিব ও কি বলিব স্থির করিতে না পারিয়া রুদ্ধশ্বাসে লীলার বদনের প্রতি চাহিয়া সেই স্থানে স্থির হইয়া রহিলাম।

লীলা স্বয়ং এরূপ অভিভূত হইয়াছিল যে, তাহার কথায় আমার যে ভাবান্তর হইয়াছিল তাহা সে লক্ষ্য করিতে পারিল না। আমি তাহার কথা শুনিতে পাই-নাই মনে করিয়া সে আবার বলিল,—"আমি মুক্তকেশীকে দেখিয়াছি! আমি মুক্তকেশীর সহিত কথা কহিয়াছি। দিদি, কত কথাই তোমাকে বলিবার আছে! চল দিদি, এখানে হয়ত বাধা জন্মিতে পারে—চল আমার ঘরে যাই।"

এই বলিয়া সে আমার হাত ধরিয়া তাহার ঘরে লইয়া চলিল। সেখানে তাহার নিজের আলাহিদা ঝি ভিন্ন অন্য কাহারও আসিবার সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি লীলা, উত্তমরূপে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং দরজার ভিতরে যে ছিটের পর্দ্দা ছিল তাহাও টানিয়া দিল। আমার বিচলিত ভাব এখনও সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় নাই। আমি নিজে নিজে বলিলাম,—"মুক্তকেশী—অ্যাঁ মুক্তকেশী!"

লীলা আমাকে টানিয়া একখানি আসনে বসাইল এবং আপনার গলায় হাত দিয়া বলিল,—"দেখ।"

আমি দেখিলাম যে চিক হারাইয়া গিয়াছিল তাহাই আবার লীলার গলায় উঠিয়াছে। আমি এতক্ষণ পরে জিজ্ঞাসিলাম,—"তোমার এ চিক কোথায় পাইলে?

"সে-ই ইহা পাইয়াছিল দিদি।

"কোথায়?"

"কাঠের ঘরে। কেমন করিয়া তোমাকে সকল কথা বলিব, কোথা হইতে আরম্ভ করিব? তাহার কথাবার্ত্তা এমনই বিশৃঙ্খল—সে এমনই ভয়ানক কৃশ ও পীড়িত—সে এমনই সহসা চলিয়া গেল—!"

বলিতে বলিতে উৎসাহে লীলার স্বর উচ্চ হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম,—"আস্তে বল। জানালা খোলা রহিয়াছে, আর ঐ জানালার নীচে দিয়াই লোকজন যাওয়া আসার পথ! প্রথম হইতে বলিতে আরম্ভ কর। যে কথার পর যে কথা, আমাকে ঠিক করিয়া বল।"

"জানালা আগে বন্ধ করিব কি দিদি?"

"না, আস্তে বলিলেই হইবে। মনে থাকে যেন তোমার স্বামীর বাটীতে মুক্তকেশীর প্রসঙ্গ বড়ই বিপজ্জনক। তুমি তাহাকে প্রথমে কোথায় দেখিতে পাইলে?"

"কাঠের ঘরে দিদি। জানই তো তুমি আমি চিক খুঁজিতে গিয়াছিলাম। আবাদের মধ্য দিয়া যাইবার সময় পথ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে দেখিতে যাওয়ায় আমার কাঠের ঘরে পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইল। ঘরের ভিতরে গিয়া আমি মাটীতে বসিয়া ঘরের মেজে ও বেঞ্চের নীচে বেশ করিয়া দেখিতে লাগিলাম।

দ্বারের দিকে পিছন ফিরিয়া আমি এই-রূপে অনুসন্ধান করিতেছি, এমন সময় কে অপরিচিত স্বরে আমার পশ্চাদ্দিক হইতে ধীরে ধীরে ডাকিল,—লীলাবতি দেবি!" আমি চমকিত হইয়া সেই দিকে ফিরিয়া চাহিলাম। দেখিলাম দ্বারের নিকটে, আমার দিকে সম্মুখ ফিরিয়া, এক সম্পূর্ণ অপরিচিতা স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে।"

"তাহার গায়ে কি রকম কাপড় চোপড়?"

"তাহার গায়ের কাপড় চোপড় সাদা ও পরিষ্কার, কিন্তু বড় ছেঁড়া। আমি তাহার পরিচ্ছদের দিকে চাহিয়া আছি দেখিয়া সে বলিল,—"আমার সব সাদা কাপড়। সাদা ছাড়া আর কি কিছু আমি পরিতে পারি?" আমি আর কিছু বলিবার পূর্ব্বে সে হাত বাড়াইল, আমি দেখিলাম তাহার হাতে আমার চিক। আমার এমনই আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা হইল যে, আমি তাই বলিবার নিমিত্ত তাহার খুব নিকটে আসিলাম। সে বলিল,—"তুমি যদি আমাকে একটু কৃপা কর তাহা হইলে আমার বড় সন্তোষ হয়।" আমি বলিলাম,—'কি কৃপা বল। আমার সাধ্যে যাহা আছে তাহাই আমি সন্তুষ্ট চিত্তে করিব।' 'তবে তোমার গলায় এই চিক গাছটী পরাইয়া দিতে দেও।" এই আগ্রহের সহিত এবং এরূপ সহসা সে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিল যে, আমি কি করিব স্থির করিতে না পারিয়া পশ্চাতের দিকে এক পদ সরিয়া আসিলাম। তখন সে বলিল,—'হায়! তোমার মা হইলে আমাকে চিক গলায় পরাইয়া দিতে দিতেন।' তাহার কথা শুনিয়া এবং আমার জননীর উল্লেখ শুনিয়া আমি কিছু লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। তখন আমি তাহার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহা আমার গলায় উঠাইলাম। সে যখন আমাকে চিক পরাইয়া দিতেছে, তখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম,—"তুমি আমার মাকে জানিতে?" সে তখন চিকের ফাঁস লাগাইতেছিল, সে কার্য্য বন্ধ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"একদিন প্রাতে—তোমার মনে পড়ে না বোধ হয়—একদিন প্রাতে তোমার মাতৃদেবী পথে বেড়াইতেছিলেন, তাঁহার দুই দিকে দুইটী বালিকা। আমার তাহা বেশ মনে আছে। সেই দুই বালিকার একজন তুমি, আর একজন আমি। সুন্দরী, বুদ্ধিমতী লীলাবতী এবং বুদ্ধিহীনা, সামান্যা মুক্তকেশী এখন পরস্পর যেমন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তখন তেমন ছিল না।"

"এ সকল কথা যখন সে বলিল, তাহা শুনিয়া তোমার তাহাকে মনে পড়িল কি?"

"তুমি যে একবার আনন্দধামে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এবং সে দেখিতে যে আমারই মত ছিল বলিয়াছিলে, তাহা আমার মনে পড়িল।"

"কিসে এ কথা মনে পড়িল?"

"আমার খুব কাছাকাছি হওয়ার পর হঠাৎ আমার মনে হইল, আমরা দুই জনেই দেখিতে সমান। তাহার মুখ কিছু পাণ্ডু, চিন্তিত, ও ক্লিষ্ট; কিন্তু তাহার সেই মুখ দেখিয়া আমার মনে হইল, সুদীর্ঘ কালব্যাপী কঠিন পীড়া ভোগের পর আমি যেন দর্পণে নিজ মুখ দেখিতেছি, এইরূপ বোধের উদয় হওয়ায়, কেন বলিতে পারি না, আমি এমন কাতর হইয়া উঠিলাম যে, কিয়ৎকাল তাহার সহিত কোনই কথা বলিতে পারিলাম না।"

"তোমাকে এরূপ নির্ব্বাক্ দেখিয়া সে দুঃখিত হইল না?"

"আমার বোধ হয় সে দুঃখিত হইল। কারণ সে বলিল,—"তোমার মায়ের মত

তোমার মুখও নহে, তোমার মায়ের মত তোমার মনও নহে। তোমার মায়ের মুখ এত সুশ্রী ছিল না, কিন্তু লীলাবতী দেবি, দেবতার ন্যায় তাঁহার হৃদয় ছিল।”

আমি বলিলাম,—‘তোমার প্রতি আমারও বিশেষ প্রীতি জন্মিয়াছে ; তবে আমি কথায় তত ব্যক্ত করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কিন্তু তুমি আমাকে লীলাবতী বলিয়া ডাকিতেছ কেন, এখন তো সকলেই আমাকে রাণী বলে ? সে উগ্র ভাবে বলিয়া উঠিল,—‘তুমি যে জন্য রাণী হইয়াছ তাহা আমি অন্তরের সহিত—ঘৃণা করি। তাই তোম'কে তোমার পূর্ব্ব নামে ডাকিতেছি।’ এতক্ষণ তাহার কোন উন্মাদ লক্ষণ আমি দেখিতে পাই নাই, এখন তাহার চক্ষুর ভাব দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল। বলিলাম,—‘আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার যে বিবাহ হইয়াছে তাহা হয়ত তুমি জান না।’ সে বিষণ্ণ ভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—‘তোমার বিবাহ হইয়াছে, তাহা আমি জানি না। তোমার বিবাহ হইয়াছে বলিয়াই আমি এখানে আসিয়াছি। পরলোকে তোমার জননীর সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে, আমি তোমার নিকট আমার ত্রুটি সংশোধন করিতে বাসনা করি বলিয়া এখানে আসিয়াছি।’ সে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে সরিয়া গেল এবং সতর্ক ভাবে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কাণ পাতিয়া কিয়ৎ কাল কি শুনিল। যখন সে আবার কথা কহিবার জন্য ফিরিল, তখন সে পূর্ব্বে যেখানে ছিল ততদূর আর ফিরিয়া না আসিয়া দূর হইতেই জিজ্ঞাসিল,—‘কালি রাত্রে কি তুমি আমাকে দেখিয়াছিলে ? বনের মধ্যে তোমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে আমি গিয়াছিলাম, তাহা কি তুমি শুনিতে পাইয়াছিলে ? আমি কত দিনই তোমার সহিত নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। জগতে আমার একমাত্র অকৃত্রিম পরমাত্মীয়কেও আমি ছাড়িয়া আসিয়াছি—পুনরায় পাগলাগারদে আবদ্ধ হইবার ভয়ও আমি করি নাই—এ সকলই, লীলাবতী দেবি, তোমারই জন্য—কেবল তোম'রই জন্য—আমি করিয়াছি। তাহার কথা শুনিয়া আমার ভয় হইল দিদি। তথাপি তাহার আগ্রহের আতিশয্য দেখিয়া তাহার প্রতি কেমন একটু করুণা হইল। আমি তাহাকে ঘরের ভিতর আসিয়া আমার পাশে বসিতে অনুরোধ করিলাম।

“সে বসিল ?”

“না দিদি। সে ঘাড় নাড়িয়া, কোন তৃতীয় ব্যক্তি আমাদের কথা-বার্ত্তা শুনিতে না পায় এই অভিপ্রায়ে, সেই স্থানেই সতর্ক ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে চাহিল। তাহার পর হইতে সে বরাবরই সেই স্থানে দাঁড়াইয়া, কখন বা একটু নত হইতে হইতে, কখন বা সহসা একটু পিছাইয়া গিয়া সতর্ক ভাবে চারি দিকে লক্ষ্য করিতে করিতে বলিতে লাগিল,—“কালি অন্ধকার হইবার পূর্ব্বে এখানে আসিয়া তুমি আর একটি স্ত্রীলোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলে শুনিয়াছিলাম। তুমি তোমার স্বামীর কথা কহিতেছিলে। শুনিলাম তুমি বলিতেছিলে তোমার কথা তিনি শুনেন না, তোমাকে তিনি বিশ্বাসও করেন না। হায় ! কেন এ বিবাহ আমি ঘটিতে দিয়াছিলাম ! হায় ! আমার ভয়—আমার অকারণ, বিষম ভয়—‘সে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কি বলিতে লাগিল। আমার ভয় হইতে লাগিল, হয়ত তাহার ভয়ানক মানসিক বিকার উপস্থিত হইয়া, এখনই সর্ব্বনাশ ঘটিবে। আমি বলিলাম, ‘স্থির হও। বল আমাকে, কেমন করিয়া তুমি আমার

বিবাহ বন্ধ করিয়া রাখিতে পারিতে?' সে মুখের কাপড় খুলিয়া আমার মুখের দিকে শূন্য-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—"আমার সাহসের সহিত আনন্দধামে অপেক্ষা করা উচিত ছিল; তাঁহার আগমন সংবাদ শুনিয়া আমার তত ভীত হওয়া উচিত হয় নাই। কার্য্য শেষ হওয়ার পূর্ব্বে তোমাকে আমার সতর্ক করিয়া দেওয়া আবশ্যক ছিল। হায়! একখানি চিঠি লেখা ছাড়া অন্য কার্য্যে আমার সাহস হইল না কেন? তাহাতে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক হইল। হায় হায়! আমার বিষম ভয়ই সকল অনর্থের মূল।" সে বারংবার ঐ কথা বলিতে লাগিল এবং কাপড়ে মুখ ডাকিয়া রহিল। তাহার সে অবস্থা দেখা এবং তাহার এই সকল কথা শুনা বড়ই ভয়ানক।"

"তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে না, কেন ভয়ের কথা সে বারংবার উল্লেখ করিতেছে।"

"হাঁ, আমি তাহাই জিজ্ঞাসিলাম।"

"সে কি উত্তর দিল?"

"সে তাহার উত্তরে জিজ্ঞাসা করিল, 'যদি কেহ আমাকে গারদে পুরিয়া রাখে এবং সুযোগ পাইলে আবারও পুরিয়া রাখিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে আমি কি তাহাতে ভয় করি না?' আমি জিজ্ঞাসিলাম,—'তুমি কি এখনও ভয় করিতেছ? যদি তোমার এখনও সে ভয় থাকিত তাহা হইলে তুমি কখনই এখানে আসিতে না।' সে বলিল,—'না, আর আমার ভয় নাই।' আমি কারণ জিজ্ঞাসিলে সে বলিল,—'তুমি অনুমান করিতে পারিতেছ না?' আমি ঘাড় নাড়িলে সে আবার বলিল,—'আমার এই শরীরের প্রতি চাহিয়া দেখ।' আমি তাহার শরীরের কাতরতা ও কৃশতা হেতু দুঃখ প্রকাশ করিলে, সে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল,—'কৃশ? আমি মরিতে বসিয়াছি। এখন বুঝিয়া দেখ, কেন আমি তাঁহাকে ভয় করি না। আচ্ছা, তোমার কি বোধ হয়, তোমার জননীর সহিত স্বর্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটিবে? যদি সাক্ষাৎ হয় তাহা হইলে তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন কি?' আমি কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সে আবার বলিতে লাগিল,—"যতদিন আমি রোগে পড়িয়া আছি এবং তোমার স্বামীর কাছ হইতে লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়াইতেছি ততদিন কেবল ঐ কথাই ভাবিতেছি। আমার সেই চিন্তা আমাকে এখানে আনিয়াছে। আমি এখন যতদূর সম্ভব আমার ত্রুটি সংশোধন করিতে চাই। আমি তাহাকে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। সে আমার প্রতি স্থির ও শূন্যভাবে চাহিয়া সন্দিগ্ধ ভাবে জিজ্ঞাসিল,—'অনিষ্টের সংশোধন করিতে পারিব কি? তোমার পক্ষাবলম্বন করিবার উপযুক্ত বন্ধু বান্ধব আছেন। এখন যদি তুমি রাজার সেই গোপনীয় রহস্যটা জানিতে পাও, তাহা হইলেই তিনি তোমার কাছে ভয়ে জড়-সড় হইয়া থাকিবেন। আমার প্রতি তিনি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তোমার প্রতি কখনই সেরূপ করিতে পারিবেন না। তোমার বন্ধু বান্ধবের ভয়ে তোমার প্রতি তাঁহার ভাল ব্যবহার করিতেই হইবে। যদি তিনি তোমার প্রতি ভাল ব্যবহার করেন এবং যদি আমি বুঝিতে পারি যে আমারই যত্নে এ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—'আমি শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য হা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে এই পর্য্যন্ত বলিয়াই চুপ করিল।"

"তুমি তাহাকে কথা কহাইতে চেষ্টা করিলে?"

"করিলাম বই কি? কিন্তু সে একটু সরিয়া গিয়া বলিতে লাগিল,—'যেখানে তোমার

মাতার প্রতিমূর্ত্তি ও নাম লেখা আছে যদি তাহারই পাশে চিরদিনের জন্য আমারও একটা নাম লেখা থাকে তাহা হইলে সৌভাগ্যের আর সীমা থাকিবে না। কিন্তু আমার ন্যায় লোকের সে আশা কেন? আমি স্বহস্তে যে শ্বেত পাথর পরিষ্কার করিয়া দিয়াছি, তাহারই পাশে কি আমার নাম থাকা সম্ভব? না।' নিতান্ত কোমল স্বরে সে এই সকল কথা বলিতে লাগিল। তাহার পর উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল,—'এখনই কি বলিতেছিলাম?' আমি তাহাকে সমস্ত কথা মনে করাইয়া দিলে সে বলিল,—'হাঁ হাঁ, মন্দ স্বামীর হাতে পড়িয়া তুমি বড় কষ্টে আছ। হাঁ, আমি যে জন্য এখানে আসিয়াছি তাহাই এখন করিতে হইবে। উপযুক্ত সময়ে ভয়ে আমি যাহা করিতে পারি নাই, এখন তাহা করিব।' আমি জিজ্ঞাসিলাম,—'কি কথা তুমি আমাকে বলিবে বলিতেছিলে?' সে উত্তর দিল,—'একটা গোপনীয় কথা, শুনিলে তোমার স্বামী জড়সড় হইয়া থাকিবেন। আমি একবার সেই লুকান কথা বলিব বলিয়া তোমার স্বামীকে ভয় দেখাইয়াছিলাম। তিনি ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিলেন। তুমিও সেই কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইবে। আমার মা সে রহস্য জানেন। আমি বড় হইলে তিনি একদিন আমাকে দুই একটা কথা বলিয়াছিলেন। পর দিন তোমার স্বামী—' এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে আবার চুপ করিল।"

"আর কিছু বলিল না?"

"না, সে কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল। তাহার পর চলিতে চলিতে এবং হাত নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—চুপ, চুপ।' ক্রমে সে কাঠের ঘরের পার্শ্বে গিয়া অদৃশ্য হইল।"

"তুমিও উঠিয়া গেলে তো?"

"হাঁ, উদ্বেগ হেতু আমিও উঠিলাম। কিন্তু একটু যাইতে না যাইতেই সে ফিরিয়া আসিল। আমি ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসিলাম,—'সে গোপনীয় কথাটা কি? থাক একটু, কথাটা আমাকে বলিয়া যাও। সে আমার হাত চাপিয়া ধরিল এবং নিতান্ত ভীত ভাবে, আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—'এখন নহে—আমরা একা নহি—এখানে আরও লোক আছে। কালি এখানে আসিও —এই সময়ে—একা— মনে থাকে যেন—একা।' তাহার পর আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া সে চলিয়া গেল। আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।"

"লীলা, হায় হায়, আবার একটা সুযোগ হাতছাড়া হইয়া গেল! যদি আমি তোমার নিকট থাকিতাম তাহা হইলে সে কখনই এমন করিয়া হাত ছাড়াইয়া যাইতে পারিত না। কোন্ দিকে গিয়া সে চক্ষুছাড়া হইল?"

"বাম দিকে, যে দিকে খুব ঘন বন।"

"তুমি ছুটিয়া বাহির হইলে না কেন? তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলে না কেন?"

"ভয়ে আমার কথা কহিবার শক্তি ছিল না, করিব কি?"

"তখনই না হউক, যখন তুমি উঠিতে ও নড়িতে পারিলে তখন—"

"তখন তোমাকে সব কথা বলিবার জন্য আমি দৌড়িয়া আসিলাম।"

"আবাদের ওদিকে কাহাকেও দেখিতে, বা কাহারও আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছিলে কি?"

"কিছু না—যখন আমি তাহার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিলাম তখন সর্ব্বত্র নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ বলিয়াই বোধ হইল।"

আমি মনে মনে প্রশ্ন করিলাম, মুক্তকেশী তৃতীয় ব্যক্তির জন্য ভয় পাইয়াছিল; বাস্ত-

ঠিকই সেখানে কোন লোক গিয়াছিল, না তাহা তাহার উত্তেজিত মনের কল্পনা? স্থির করা অসম্ভব। যাহা হউক, মুক্তকেশী কালি যদি কথিত ও নির্দ্ধারিত সময়ে উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে রহস্যটা জানিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হওয়ার পরও, হয়ত চিরদিনের নিমিত্ত, তাহা আমাদের হাতছাড়া হইয়া গেল। আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"তুমি আমাকে সব কথা ঠিক করিয়া বলিয়াছ তো? কিছুই ভুল হয় নাই তো লীলা?"

লীলা বলিল,—"আমার তো আর কিছুই মনে হইতেছে না। তোমার মত আমার স্মরণ-শক্তি তীক্ষ্ণ নয় দিদি, কিন্তু এ বিষয় আমি এমনই মনোযোগ ও আগ্রহের সহিত শুনিয়াছি যে, কোন কাজের কথা ভুল হওয়া অসম্ভব।"

আমি বলিলাম,—"দেখ ভাই, মুক্তকেশী সংক্রান্ত অতি সামান্য কথাও অবহেলা করা উচিত নহে। আবার মনে করিয়া দেখ। আচ্ছা, সে এখন কোথায় থাকে প্রসঙ্গতঃ সে সম্বন্ধে কোন কথা হয় নাই তো?"

"আমার তো সেরূপ কোন কথা মনে হইতেছে না।"

"আচ্ছা, তা হউক, কোন আত্মীয়ের—রোহিণী কি অন্য কোন আত্মীয়ের—নাম সে কি একবারও উল্লেখ করে নাই?"

"হাঁ হাঁ, আমি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, রোহিণী তাহার সঙ্গে বিল পর্য্যন্ত আসিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং এ স্থলে তাহাকে একা আসিতে বার বার নিষেধ করিয়াছিলেন।"

"রোহিণীর সম্বন্ধে এ ছাড়া আর কিছু বলে নাই?"

"কই, আর কিছু বলে নাই বোধ হয়।"

"আচ্ছা, তাহার খামার ছাড়িয়া আসার পর তাহারা কোথায় ছিল, সে কথা কিছু বলিয়াছিল কি?"

"কই, না।"

"ভাল, কোথায় সে এতদিন ছিল, কিংবা তাহার কি পীড়া এরূপ বিষয়ের কোন কথা হইয়াছিল কি?"

"না দিদি, সে সব কোন কথা হয় নাই। এখন বল, তুমি এ সব শুনিয়া কি বুঝিলে। আমি তো কি করিব, কি হইবে কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না।"

"তোমাকে একটী কাজ করিতে হইবে ভাই। কালি ঠিক সময়ে তোমাকে কাঠের ঘরে উপস্থিত থাকিতে হইবে। তাহার সহিত দেখা হওয়ায় কত যে উপকার হইতে পারে তাহা বলা ভার। দ্বিতীয় সাক্ষাতের সময় তোমার একা থাকা হইবে না। আমি তোমার পশ্চাতে গিয়া খুব দূরে থাকিব, তোমরা কেহই আমাকে দেখিতে পাইবে না। মুক্তকেশী দেবেন্দ্রের হাত ছাড়াইয়াছে; তোমারও হাত ছাড়াইয়াছে; কিন্তু যাই হউক, সে কখনই আমার হাত ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না।"

লীলা বিশেষ আগ্রহের সহিত আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"আমার স্বামীর ভয়জনক এই রহস্যের বিষয়ে তোমার কি মনে হয় দিদি? মনে কর, ইহা কেবল মুক্তকেশীর উন্মত্ত কল্পনারই একটা কার্য্য। মনে কর, মুক্তকেশী কেবল পূর্ব্বস্মৃতির অনুরোধে আমার সহিত দেখা করিতে ও কথাবার্ত্তা কহিতে আসিয়াছিল। তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া আমার তাহার সম্বন্ধে সন্দেহ হইয়াছিল। তাহাকে কি বিশ্বাস করা যায়?"

"লীলা, আমি স্বয়ং তোমার স্বামীর যে সকল ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার সহিত

মুক্তকেশীর কথা মিলাইয়া আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি যে, মূলে নিশ্চয়ই একটা রহস্য আছে।"

আর কিছু না বলিয়া আমি গাত্রোত্থান করিলাম। যে নানাবিধ চিন্তা চিত্তকে বিব্রত করিতেছে, আর কিয়ৎকাল বসিয়া লীলার সহিত কথোপকথন করিলে, হয়ত তাহাকে সে সকল কথা বলিয়া ফেলিতাম, এবং হয়ত, তাহার পক্ষে তাহার ফল বড়ই ভয়ানক হইত। সেই অতি ভয়ানক স্বপ্ন ও সঙ্গে সঙ্গে লীলার এই কাহিনী আমার মনকে নিতান্ত ব্যাকুলিত করিয়াছে। আমার যেন বোধ হইতেছে, সেই বিভীষিকাময় ভবিষ্যৎ বড়ই নিকটস্থ হইয়া আমাকে দারুণ ভয়ে অভিভূত করিতেছে। বস্তুতই যেন কি দুরভিসন্ধি—যেন কি দুষ্ট মন্ত্রণা আমাদিগকে ক্রমশঃ বেষ্টন করিতেছে। এ বিপত্তিকালে কোথায় দেবেন্দ্র ?

মুক্তকেশী যেরূপ ভাবে এবং যে কারণে প্রস্থান করিয়াছে তাহা শুনিলাম। এক্ষণে চৌধুরী মহাশয় কি করিতেছেন জানিতে আমার বিশেষ ইচ্ছা হইল। চারিদিক সন্ধান করিয়া দেখিলাম, রাজা বা চৌধুরী কেহই বাড়ী নাই। শেষে রসময়ী ঠাকুরাণীর সহিত দেখা হইল। তিনি বলিলেন, 'চৌধুরী মহাশয় ও রাজা দুইজনে অনেক দূরে বেড়াইতে গিয়াছেন। অনেক দূরে বেড়াইতে গিয়াছেন! পায়ে হাঁটিয়া রৌদ্রে থাকিতে থাকিতে, দুইজনে মিলিয়া, অনেক দূরে বেড়াইতে গিয়াছেন।' আরত কখন এ দুইজনকে মিলিয়া এমন করিয়া বেড়াইতে দেখি নাই।

যখন আমি পুনরায় আসিয়া লীলার সহিত মিলিত হইলাম, তখন সে আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল,—"দিদি এতক্ষণ নিতান্ত অন্য-মনস্ক থাকায় একটা প্রধান কাজের কথাই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। সে দলিলে নাম সহি করার গোল এখনও উঠিল না কেন ?"

আমি বলিলাম,—'আপাততঃ সেজন্য কোন ভয় নাই। রাজার মতলব ফিরিয়া গিয়াছে। আপাততঃ সে কাজ বন্ধ থাকিল।"

নিতান্ত বিস্ময়ের সহিত লীলা বলিল,—"বন্ধ থাকিল ? এ কথা তোমায় কে বলিল ?"

"চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন। আমার বোধ হয়, তাঁহারই চেষ্টায় তোমার স্বামীর এরূপ মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে।"

"কিন্তু দিদি, কথাটা বড়ই অসম্ভব। রাজার ভয়ানক টাকার দরকারের জন্য যদি দলিলে নাম সহি আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা এখন বন্ধ থাকিবে কি প্রকারে ?"

"তোমার কি মনে নাই লীলা, যখন রাজার উকীল মণিবাবু এই টাকার জন্য রাজার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়া-ছিলেন যে, যদি নিতান্তই রাণীর নাম স্বাক্ষর এখন না ঘটিয়া উঠে তাহা হইলে, অতি কষ্টে, না হয় বড় জোর তিন মাস ঠেলিয়া রাখা যাইতে পারে, এখন সেই শেষ প্রস্তাব অনু-সারেই কাজ করা হইবে বোধ হইতেছে। অতএব, আপাততঃ তিন মাস কাল আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।"

"তোমার স্মরণ-শক্তি ভাল বলিয়া দিদি তুমি এত কথা মনে রাখিতে পারিয়াছ। কিন্তু দিদি, এটা এতই সুসংবাদ যে আমার সাহসা প্রত্যয় হইতেছে না।"

"আমার দিনলিপিতে সমস্ত কথাই লেখা থাকে। দাঁড়াও, আমি তোমাকে দিনলিপি আনিয়া দেখাইয়া দিতেছি।"

তখনই আমার দিনলিপি আনিয়া লীলার সন্দেহভঞ্জন করিয়া দিলাম। আমার কথার সঙ্গে দিনলিপির ঐক্য হওয়ায় আমাদের উভ-

য়েরই অনেকটা ভরসা হইল। উভয়েরই মনে হইল, যেন এ দিনলিপিও আমাদের একজন অসময়ের বন্ধু। আমরা এমনই বিপন্ন—এমনই নিঃসহায়! লীলা আপন ঘরে চলিয়া গেল—আমি দিনলিপি লিখিতে বসিলাম।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রাজা ও চৌধুরী মহাশয় ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রি হইল। বিশেষ কোন অনৈসর্গিক কাণ্ড দেখিলাম না বটে, কিন্তু রাজা ও চৌধুরী মহাশয়ের ব্যবহার দেখিয়া, মুক্তকেশীর সম্বন্ধে এবং না জানি কালি কি ঘটিবে তাহা ভাবিয়া আমার মনে বড় আশঙ্কা হইল। রাজার ব্যবহার, বিশেষতঃ তাঁহার শিষ্টাচার যে, ভয়ানক অলীক ও নিতান্ত শঠতাপূর্ণ তাহা আমি জানি। আজি বন্ধুর সহিত অনেক দূর বেড়াইয়া আসার পর হইতে সকলের প্রতিই বিশেষতঃ লীলার প্রতি, রাজার বড়ই উদার ব্যবহার দেখিতেছি! তিনি আজি লীলাকে নানা মিষ্ট কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তিনি লীলাকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন, সে তাহার কাকার কোন সংবাদ পাইয়াছে কি না তাহা জিজ্ঞাসিতেছেন, অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী কোন্ সময়ে এখানে বেড়াইতে আসিবেন তাহার সন্ধান করিতেছেন এবং আরও কত স্নেহানুরাগই দেখাইয়া সেই আনন্দধামে বিবাহের পূর্ব্বাবস্থা মনে করাইয়া দিতেছেন। নিশ্চয়ই এ বড় কুলক্ষণ। তিনি আহারের পরই পাশের ঘরে নিদ্রার ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিলেন, আমার মনে হইল ইহা আরও কুলক্ষণ; এ দিকে তাঁহার ধূর্ত্ত নয়ন, যেন আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ভাবিয়া, কেবল লীলা ও আমার গতিবিধি দেখিতে নিযুক্ত রহিল। কালি তিনি যখন একাকী গাড়ী করিয়া বেড়াইতে গিয়াছিলেন তখন যে তিনি মুক্তকেশীর মাতা হরিমতির নিবাসগ্রাম রাজপুরে তাহার নিকট তাহার কন্যার সংবাদ জানিতে গিয়াছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই। আজিও দুই জনে যে সেই তত্ত্বেই বাহির হইয়াছিলেন তাহাও স্থির। মুক্তকেশী কোথায় থাকে তাহা যদি আমি জানিতাম তাহা হইলে, কালি প্রাতে উঠিয়াই আমি সেখানে গিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিতাম। যাহা হউক, রাজা আজি রাত্রে যে মূর্ত্তিতে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহা আমার বেশ জানা আছে, সুতরাং আমার তাহাতে ঠকিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। কিন্তু চৌধুরী মহাশয় যে মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছেন, তাহা আমার পক্ষে সম্পূর্ণই নূতন। আজি তিনি অতি ভাবুক—মহাকবি! আজি তাঁহার প্রাণের প্রাণ হইতে যথার্থই ভাব উছলাইয়া পড়িতেছে। আজি তিনি অতি মনোহর বেশভূষায় সজ্জিত। আজি তিনি নিতান্ত অল্পভাষী—ভাবভরে আজি তাঁহার চক্ষু ও কণ্ঠস্বর অবসন্ন। তাঁহার ঈষৎ হাস্য আজি স্নেহ ও বাৎসল্যে পূর্ণ। আজি তিনি লীলাকে হারমোনিয়ম বাজাইয়া তাঁহার অদম্য সঙ্গীত লালসার পরিতৃপ্তি করিতে অনুরোধ করিলেন। লীলা সবিস্ময়ে তাঁহার অনুরোধ পালন করিল। তিনি হারমোনিয়মের সন্নিকটে উপবেশন করিলেন। ভাবভরে তাঁহার সুবিশাল মস্তক একদিকে নত হইয়া পড়িল। তিনি ধীরে ধীরে বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি আঘাত করিয়া তাল দিতে লাগিলেন। সায়ংকাল সমাগত হইলে তিনি তত্রত্য বাতায়ন ও দ্বারপথ-প্রবাহী মধুর, আনন্দময় ও পরম পবিত্র নৈসর্গিক আলোক-শোভিত প্রকোষ্ঠের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য কৃত্রিম আলোক দ্বারা বিধ্বংসিত করিতে মিনতি করিয়া নিষেধ করিলেন। আমি তাঁহার

সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকিবার জন্য, প্রান্তে এক গবাক্ষ সমীপে দাঁড়াইয়াছিলাম। তিনি তাঁহার অভ্যস্ত নিঃশব্দ পাদবিক্ষেপে আমার সমীপে আসিয়া আমাকে আলোক আনয়নের বিরুদ্ধে যোগ দিতে অনুরোধ করিলেন। যদি আলো আনিয়া তাঁহাকে পুড়াইবার কেহ ব্যবস্থা করিত, তাহা হইলেও, আমি নিজে নীচে হইতে আলো আনিয়া দিতাম। তিনি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"এই মৃদু মন্দ বিকম্পিত জ্যোৎস্নালোক অবশ্যই আপনি ভাল বাসেন। আহা! আমি ইহা বড়ই ভালবাসি! অন্ধকার স্নায় সুপবিত্র রজনীতে, স্বর্গীয় সুরভি-শোভিত, প্রত্যেক পদার্থই আমার চক্ষে পরম রমণীয়। নিঃসর্গ-সুন্দরী আমার চক্ষে চিরদিনই পরম শোভার নিকেতন, অক্ষয় মধুরতার ভাণ্ডার! আহা! দেখুন, দেখুন দেবি, কি অপূর্ব্ব শোভাময় আলোক ক্রমশঃ ঐ বৃক্ষচূড়া হইতে অপসারিত হইতেছে! এ দৃশ্য আমার হৃদয়-কন্দরে যে ভাবে নৃত্য করিতেছে, আপনার অন্তরেও সেইরূপ করিতেছে কি?"

তিনি নির্ব্বাক্ হইয়া কিয়ৎকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর হেলিতে দুলিতে নৈষধের সন্ধ্যা-বর্ণনার শ্লোকগুলি সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তাহার পর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"আমি একি পাগলামি করিয়া আপনাদিগের সকলকে উত্যক্ত করিতেছি। আসুন, আমরা হৃদয়ের গবাক্ষ সমূহ নিরুদ্ধ করিয়া কার্য্যময় জগতে প্রবেশ করি। আলো আন—আর আমি আপত্তি করিব না। রাণী, মনোরমা দেবি, প্রিয়ে রঙ্গমতী আমি এক বাজি তাস খেলিতে চাহি, আমার সঙ্গে কে খেলিতে সম্মত আছ বল।" তিনি আমাদের সকলকেই জিজ্ঞাসা করিলেন বটে, কিন্তু লীলার দিকেই চাহিয়া থাকিলেন।

লীলাও তাঁহাকে আমারই মত ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে তাহার সহিত বিন্তী খেলিতে সম্মত হইল। আমার চিত্তের তখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে তাঁহার সমীপে আমার বসিয়া থাকা অসম্ভব। আমার যেন বোধ হইতে লাগিল, তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সেই অত্যল্প আলোকেও আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ দেখিতে পাইতেছে। তাঁহার কণ্ঠস্বর যেন আমার সমস্ত শরীরকে অবসাদগ্রস্ত করিতেছে। সেই দিবাস্বপ্নের স্মৃতি সমস্ত দিন আমাকে নিতান্ত বিচলিত করিয়াছে, এখন যেন তাহা আগত-প্রায় বিপদের সূত্রপাত বলিয়া আমার অতিশয় ভয় হইতে লাগিল। আমি যেন স্বপ্নদৃষ্ট তাবৎ ঘটনাপুঞ্জ এখন সম্মুখে দেখিতে লাগিলাম। লীলা যখন আমার কাছ দিয়া খেলিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইল, তখন আমি তাহার হস্ত ধারণ করিয়া ঈষৎ পেষণ করিলাম এবং যেন এই সাক্ষাৎই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ বোধে তাহার বদন চুম্বন করিলাম। যখন সকলেই সবিস্ময়ে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, আমি তখন সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া নিম্নে অন্ধকারময় প্রাঙ্গণে পলায়ন করিলাম।

অনেক রাত্রিতে তাঁহাদের খেলা ভাঙ্গিল ও সকলে নিদ্রার জন্য স্ব স্ব শয্যায় গমন করা আবশ্যক মনে করিলেন। আমি তাহার পূর্ব্বেই চিত্তকে কথঞ্চিৎ প্রশান্ত করিয়া সেই প্রকোষ্ঠে পুনঃ প্রবেশ করিয়াছিলাম। সহসা তৎকালে বড় সতেজ ও শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। এই বায়ুর পরিবর্ত্তন আমরা সকলেই বেশ বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু সকলের আগে চৌধুরী মহাশয় বায়ুর এই পরি-

রত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে মৃদু স্বরে আমাকে বলিলেন,—"শুনুন, কালি একটা গোলমাল ঘটিবে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ। কল্যকার ঘটনাবলী আমাকে অন্য অধিকতর দুর্ঘটনার নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিতে সতর্ক করিয়া দিতেছে। এখনও অদ্যকার দিন অতিবাহিত হইয়া যায় নাই। ইহারই মধ্যে দারুণ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। লীলা এবং আমি দুইজনে মিলিয়া হিসাব করিয়া দেখিলাম, মুক্তকেশী কালি বেলা ২॥০ টার সময়ে কাঠের ঘরে আসিয়াছিল। এই জন্য স্থির করিলাম লীলা আজি একটু আগেই সেদিকে চলিয়া যাইবে; আমি বাড়ীতে থাকিয়া সকলের সন্দেহ ভঞ্জন করিব ও তাহার অনুপস্থিতি হেতু কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে বিহিত উত্তর দিব। তাহার পর, সময় বুঝিয়া, যত শীঘ্র সম্ভব তাহার অনুসরণ করিব।

কল্য রাত্রে যে ঝড় উঠিয়াছিল তাহা নিষ্ফল গেল না। প্রাতঃকাল হইতে ভারি বৃষ্টি আরম্ভ হইল; কিন্তু বেলা ১২টার সময় আকাশ বেশ খোলসা হইয়া গেল। সেই দারুণ বৃষ্টিতে, প্রাতঃকালে রাজা একাকী বেড়াইতে বাহির হইলেন। তিনি কোথায় যাইতেছেন, কখন বা ফিরিবেন সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়া গেলেন না। চৌধুরী মহাশয় বড় ধীর ভাবে বাড়ীতেই বসিয়া থাকিলেন। কখন বা পুস্তকালয় মধ্যে, কখন বা বাদ্যযন্ত্রের সহায়তায় তিনি সময় কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাবুকতা ও কবিত্ব যে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার স্কন্ধ ত্যাগ করিয়াছে এমন বোধ হইল না। এখনও তিনি নির্ব্বাক্‌ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন ও অল্পেই বিচলিত হইতেছেন।

লীলা যথাসময়ে চলিয়া গেল। আমারও এক সঙ্গে যাইবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হইল, কিন্তু তাহাতে সন্দেহ জন্মিতে পারে; আর তা ছাড়া, মুক্তকেশী যদি দেখে যে, লীলার সঙ্গে আর একজন তাহার অপরিচিত নূতন লোক আসিয়াছে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আমাদের উপর তাহার চিরদিনের মত অবিশ্বাস হইয়া যাইবে। কাজেই আমাকে সহিষ্ণুতার সহিত অপেক্ষা করিতে হইল। কিছুকাল পরে যখন আমি কাঠের ঘরের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম তখনও রাজা ফিরিয়া আইসেন নাই। আমি যাইবার সময় দেখিলাম দুষ্ট কাকাতুয়াটাকে লইয়া চৌধুরী মহাশয় খেলা করিতেছেন। আর রঙ্গমতী দেবী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্বামী ও পাখীর রঙ্গ এমনই তদ্গতভাবে দর্শন করিতেছেন, যেন এমন কাণ্ড তিনি জীবনে আর কখন দেখেন নাই। অতি সাবধানে আমি আবাদের মধ্য দিয়া চলিলাম। কেহ আমার অনুসরণ করিতেছে এমন বোধ হইল না। তখন তিন বাজিতে ১৫ মিনিট বাকী আছে।

বনের মধ্যে গিয়া আমি খুব বেগে চলিতে লাগিলাম। অর্দ্ধাধিক পথ দৌড়িয়া যাওয়ার পর আমি আবার আস্তে আস্তে চলিতে আরম্ভ করিলাম। কোথায়ও মানুষ দেখিলাম না, কোন মানুষেরও আওয়াজ পাইলাম না। ক্রমে কাঠের ঘরের কাছে পৌঁছিলাম, তখনও কোন শব্দ পাইলাম না। খুব নিকটে উপস্থিত হইলাম। ঘরের ভিতরে কেহ কথা কহিলে সেখান হইতে অবশ্যই শুনিতে পাইতাম। সমান নিস্তব্ধতা। কোথায় কোন মনুষ্যের চিহ্ন নাই।

আমি কোন দিকে কিছুই দেখিতে ও শুনিতে না পাইয়া শেষে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। সেখানেও কেহ নাই তো! প্রথমে মৃদু স্বরে, শেষে উচ্চস্বরে আমি ডাকিতে লাগিলাম,—"লীলা? লীলা!" কেহই দেখা দিল না; কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। আমি ছাড়া সেখানে আর দ্বিতীয় মনুষ্য মূর্ত্তি নাই! আমার বড় ভয় হইল। আমি হৃদয়কে বলবান্ করিয়া প্রথমে কাঠের ঘরের ভিতর, পরে তাহার সম্মুখস্থ ভূমিতে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে লাগিলাম। ঘরের ভিতরে কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু বাহিরে, বালির উপর, কতকগুলা পায়ের দাগ দেখিতে পাইলাম।

বালির উপর আমি দুই রকম পায়ের দাগ দেখিলাম। পুরুষ মানুষের মত বড় বড় পায়ের দাগ, আর মেয়ে মানুষের মত ছোট ছোট পায়ের দাগ। শেষের দাগের সঙ্গে আমার পায়ের সঙ্গে মিলাইয়া বুঝিলাম, সে দাগ নিশ্চয়ই লীলার পায়ের। কাঠের ঘরের সম্মুখস্থ ভূমি এইরূপ দ্বিবিধ পায়ের দাগে সমাচ্ছন্ন। ঘরের নিকটেই একটা ছোট গর্ত্ত দেখিতে পাইলাম। এ গর্ত্ত যে কেহ ইচ্ছা করিয়া করিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। তাহার পর পায়ের দাগের অনুসরণে যে দিকে যাওয়া যায় আমি সেই দিকে যাইতে সঙ্কল্প করিলাম। সকল স্থানে পদাঙ্ক ভাল করিয়া দেখিতে ও বুঝিতে পারা গেল না। দেখিলাম আবাদের মধ্য দিয়া যাতায়াতের যে পথ আছে সেখান দিয়া পায়ের দাগ দেখা যায় না, দাগ বনের ভিতর দিয়া পথ করিয়া গিয়াছে বোধ হইল। আমিও সেই দিক দিয়া চলিতে লাগিলাম। কোথায়ও বা পায়ের দাগ, কোথায়ও বা ভাঙ্গা ছোট গাছ কোথায়ও বা নতমুখ গুল্ম দেখিয়া আমি পথ করিয়া চলিলাম। কোথায় যাইতেছি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, তথাপি যাইতে লাগিলাম। একস্থানে একটা গাছের গায়ে একটু ছেঁড়া কাপড় দেখিতে পাইলাম। বিশেষ করিয়া দেখিলাম সে টুকু লীলারই কাপড় ছেঁড়া। যে স্থানে কাপড় ছেঁড়া দেখিলাম সেই স্থান হইতে যেই নিষ্ক্রান্ত হইলাম, সেই সম্মুখে প্রাসাদ দেখিতে পাইয়া মনে অনেক ভরসা হইল। সাহস হইল, লীলা হয়ত, কোন কারণে এই নূতন পথ দিয়া বাটী ফিরিয়াছে। আমিও তাড়াতাড়ি বাটিতে ফিরিলাম। প্রথমেই গিন্নি-ঝির সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম,—"তুমি জান কি, রাণী বাড়ী ফিরিয়াছেন কি?"

গিন্নি-ঝি বলিল,—"রাণী মা এখনই রাজার সহিত বাটী ফিরিয়াছেন। কিন্তু মা, আমার বোধ হয়, একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়াছে।"

আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। আমি কাতর ভাবে জিজ্ঞাসিলাম,—"কোন আঘাত লাগে নাই তো?"

"না না, ভগবানের কৃপায় সেরূপ কিছু ঘটে নাই। রাণী মা কাঁদিতে কাঁদিতে উপরে উঠিয়া গেলেন। আর রাণীর নিজের ঝি গিরিবালাকে রাজা জবাব দিয়া এখনই চলিয়া যাইতে হুকুম দিয়াছেন।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"গিরিবালা এখন কোথায়?"

"আমার ঘরে বসিয়া আছে। আহা! তাহার কান্নার আর সীমা নাই! আমি তাহাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া আমার ঘরে বসাইয়া রাখিয়াছি।"

আমি গিন্নি-ঝির ঘরে গিয়া দেখিলাম, গিরিবালা তাহার পেট্‌রা লইয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে। কেন হঠাৎ তাহার জবাব হইল তাহা সে বলিতে পারিল না। রাজা

তাহাকে জবাব দিবার সময় কোন কারণও ব্যক্ত করেন নাই, কোন দোষের কথাও বলেন নাই। রাণীর সঙ্গে পুনরায় দেখা করিতে, অথবা রাণীর নিকট কাজের জন্ত দরবার করিতেও তাহার হুকুম নাই। তাহাকে তখনই চলিয়া যাইতে হইবে, ইহাই রাজার হুকুম। আমি তাহাকে দুই চারিটা মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া, রাত্রিতে কোথায় থাকিবে তাহার সন্ধান লইলাম। সে বলিল, গ্রামের মধ্যে এক বৃদ্ধা আছে, এখানকার সকল লোক-জনকেই সে খুব যত্ন করে, তাহারই ঘরে রাত্রিটা কাটাইতে হইবে। কালি প্রাতে সে শক্তিপুর যাইয়া সেখানকার আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবে। কলিকাতায় সে যাইবে না, কারণ কলিকাতায় কাহাকেও সে জানে না। আমার মনে হইল নিশ্চয়ই গিরিবালার দ্বারা আনন্দধামে সংবাদ পাঠাই-বার আমাদের বেশ সুযোগ হইবে। আমি তাহাকে বলিলাম, হয় আমার নিকট হইতে, না হয় রাণীর নিকট হইতে সে রাত্রের মধ্যেই সংবাদ পাইবে, আর তাহার হিতার্থে আমা-দের যাহা সাধ্য আমরা তাহা করিব। এই বলিয়া আমি তাহার নিকট হইতে বিদায় হইয়া উপরে উঠিলাম।

লীলার ঘরের দ্বার-সন্নিধানে আসিয়া দেখিলাম তাহা ভিতর দিক হইতে বন্ধ। আমি তাহাতে আঘাত করিলে, সেই কদাকার, অসভ্য, দারুণ হৃদয়হীন ঝিটা—যাহার কুব্যবহারে আমি এখানে আসিয়া প্রথমেই জ্বালাতন হইয়া-ছিলাম—সেই ঝিটা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল! দ্বার খুলিয়াই সে চৌকাঠের উপর আসিয়া দাঁড়াইল এবং জিহ্বা বাহির করিতে করিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি বলিলাম,—"এখানে দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? বুঝিতেছ না, আমি ভিতরে যাইতে চাই?"

সে আবার প্রথমে হা করিয়া, পরে জিহ্বা বাহির করিয়া বলিল,—"কিন্তু তোমাকে তো কখনই ভিতরে যাইতে দিব না।"

"কোন্ সাহসে তুই আমার সহিত এমন করিয়া কথা কহিতেছিস? সরিয়া যা এখনই!"

সে তখন তাহার মোটা মোটা হাত দুখানি দুই দিকে বাহির করিয়া দরজা আট্‌কাইল এবং বিকট হা করিয়া বলিল,—"মুনিবের হুকুম।"

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। কিন্তু তাহার সহিত বিবাদে কি ফল? যাহা বলিতে হইবে তাহা তাহার মনিবকেই বলা আবশ্যক। আমি তৎক্ষণাৎ রাজার সন্ধানে নীচে আসিলাম। রাজার শত সহস্র দুর্ব্ব্যবহারেও আমি রাগ করিব না বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহা এক্ষণে একেবারেই ভুলিয়া গেলাম। পুস্তকালয়ে গিয়া রাজা, চৌধুরী মহাশয় ও রঙ্গমতী ঠাকুরাণীকে দেখিতে পাইলাম। রাজার হাতে একটু কাগজ। আমি নিকটস্থ হইবার পূর্ব্বে শুনিতে পাইলাম চৌধুরী মহাশয় রাজাকে বলিতেছেন,—"না—হাজারবার না।"

আমি বরাবর রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া এবং তাঁহার মুখে সতেজ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলাম,—"আমাকে কি বুঝিতে হইবে রাজা, যে আপনার স্ত্রীর ঘর এখন কারাগার এবং আপনার দাসী তাহার কারারক্ষিণী।"

তিনি উত্তর দিলেন,—"হাঁ, ঠিক তাহাই আপনাকে বুঝিতে হইবে। আর সাবধান থাকিবেন, যেন আমার কারারক্ষিণীর দুই কারাগার রক্ষা করিতে না হয়—দেখিবেন আপনার ঘরও যেন কারাগার না হইয়া পড়ে।"

অতিশয় ক্রোধের সহিত আমি বলিলাম,—"আর. আপনার স্ত্রীর প্রতি এই দুর্ব্যবহার এবং আমার প্রতি এই শাসনের কি ফল ফলে আপনি তাহার জন্য সাবধান থাকিবেন। এদেশে আইন আছে, আদালত আছে। লীলার মাথার এক গাছি চুলেও যদি আপনি আঘাত করেন, তাহা হইলে আপনার কি দশা ঘটাইব তাহা তখন জানিতে পারিবেন।"

আমার কথার কোন উত্তর না দিয়া তিনি চৌধুরী মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"কি বলিতেছিলাম? তুমি এখনই কি বলিলে?"

চৌধুরী মহাশয় উত্তর দিলেন,—"যা আগে বলিতেছিলাম—না।"

চৌধুরী মহাশয় প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার চাহিলেন। আমার এমন উত্তেজিত অবস্থাতেও সে দৃষ্টি অসহ্য হইল। তিনি তাহার পর উদ্দেশ্যপূর্ণ নয়নে তাঁহার পত্নীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। রঙ্গমতী ঠাকুরাণী তখনই আমার পাশে সরিয়া আসিলেন এবং সেইরূপে দাঁড়াইয়া, আর কেহ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"কৃপা করিয়া এক মুহূর্ত্ত আমার কথায় মনোযোগ করুন। আপনার বাটীতে এত দিন অবস্থান করিতেছি এজন্য রাজা, আমি অতিশয় কৃতজ্ঞ। কিন্তু আর আমার এখানে থাকা ঘটিতেছে না। আপনার পত্নী এবং মনোরমার প্রতি অদ্য আপনি যেরূপ মন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যে বাটীতে স্ত্রীলোকের প্রতি এতাদৃশ কুব্যবহার করা হয়, সেখানে আমি কখনই থাকিব না।"

রাজা এক পদ পিছাইয়া গিয়া নীরবে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। চৌধুরাণীর এই উক্তি যে তাঁহার স্বামীর অনুমোদিত তাহা রাজাও বুঝেন আমিও বুঝি। যাহা হউক, তাঁহার সতেজ উক্তি শুনিয়া রাজা যেন কিয়ৎকাল বিস্ময়ে পাষাণবৎ স্থির হইয়া রহিলেন। চৌধুরী মহাশয় অতিশয় প্রশংসাসূচক দৃষ্টিতে আপনার স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাহার পর স্বীয় পত্নীর দিকে একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"রঙ্গমতি, তুমি ধন্য! আমি তোমার সাহায্যার্থে সকলই করিব। আর মনোরমা দেবী যদি কৃপা করিয়া আমার সাহায্য গ্রহণ করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে, তাঁহার হিতার্থে আমার যাহা সাধ্য আমি সম্পন্ন করিতে সম্মত আছি।

এই বলিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীর হাত ধরিয়া দ্বারাভিমুখে চলিয়া গেলেন। তখন রাজা নিতান্ত বিরক্ত ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"তোমাদের রকমটা কি? তোমাদের মতলব কি?"

সেই দুর্জ্জেয় বাঙ্গাল তখন উত্তর দিলেন,—"অন্যান্য সময়ে আমি যাহা বলি, তাহাই আমার মতলব। এক্ষণে যাহা আমার স্ত্রী বলিতেছেন, তাহাই আমার মতলব জানিবে। আমরা আজি আমাদের পদের পরিবর্ত্তন করিয়াছি। আজি আমার স্ত্রীর যাহা মত, আমারও তাহাই মত।"

রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে রাজা হাতের সেই ছোট কাগজটুকু ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং বেগে গিয়া চৌধুরী দম্পতীকে ছাড়াইয়া দ্বার-সন্নিধানে দাঁড়াইলেন। গোঁ গোঁ করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—"যাহা তোমাদের ইচ্ছা হয় তাহাই কর। দেখিও তাহাতে কি ফল দাঁড়াইবে।" এই বলিয়া তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

চৌধুরাণী ঠাকুরাণী কৌতুহলের সহিত স্বামীর প্রতি চাহিলেন। তাহার পর

জিজ্ঞাসিলেন—"রাজা হঠাৎ চলিয়া গেলেন—ইহার মানে কি ?

চৌধুরী বলিলেন,—"ইহার মানে, তুমি ও আমি দুই জনে মিলিয়া আজি সমস্ত বাঙ্গালার মধ্যে একজন অতি দুরন্ত লোকের চৈতন্য জন্মাইয়া দিলাম। মনোরমা দেবী ও রাণী-মাতা আজি ভয়ানক অপমানের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। মনোরমা দেবি, অতি উপযুক্ত সময়ে আপনি যথেষ্ট সৎসাহস ও তেজস্বিতা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া আমি আপনার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি।"

সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরাণী যেন ঠাকুরটীর ভ্রম সংশোধন করিয়া বলিলেন,—"আন্তরিক প্রশংসা।"

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনির ন্যায় ঠাকুরটীও বলিলেন,—"আন্তরিক প্রশংসা।"

আমার রাগের প্রাবল্য এখন কমিয়া গিয়াছে। লীলার সহিত এখনও দেখা করিবার জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল। কাঠের ঘরে কি হইয়াছিল, কেনই বা এ কাণ্ড ঘটিল তাহা জানিবার জন্য আমি এখন অস্থির। চৌধুরী দম্পতীর সহিত দুইটা শিষ্টাচার করা আবশ্যক হইলেও আমি তাহা পারিয়া উঠিলাম না। চৌধুরী মহাশয়, বোধ হয়, আমার হৃদয়ের ভাব অনুমান করিতে পারিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। সেই সময়ে রাজা ধপ ধপ্ শব্দে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছেন শুনিতে পাইলাম; তাহার পর দুই বন্ধুতে ফুস্ ফুস্ করিয়া কি পরামর্শ করিতে লাগিলেন তাহাও বুঝিতে পারিলাম। চৌধুরাণী ঠাকুরাণী সেই সময়ে আমাকে নানারূপ মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতে-ছিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে চৌধুরী মহাশয় আবার ঘরের ভিতর উঁকি দিয়া বলিলেন,—মনোরমা দেবি, আমি সন্তোষের সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে, রাণী-মাতা আবার আপনার বাটীতে আপনি কর্ত্রী হইয়াছেন। আমি মনে করিলাম যে, এ সংবাদ আপনি আমার মুখে শুনিলে অধিক সন্তুষ্ট হইবেন, এ জন্য আমিই উহা বলিতে আসিলাম।"

আমি তাড়াতাড়ি লীলার সহিত সাক্ষাতের আশয়ে ধাবিত হইলাম। দেখিলাম রাজা বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে শুনিতে পাইলাম, রাজা চৌধুরী মহাশয়কে বলিতেছেন,—"ওখানে দাঁড়াইয়া কি করিতেছ ? এদিকে এস, আমি তোমাকে একটা কথা বলিতে চাহি।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"আর আমি একটু আপন মনে ভাবিতে চাহি। থাক না এখন ; পরে হইবে।"

আর কেহ কোন কথা বলিলেন না। আমি বেগে গিয়া লীলার ঘরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম লীলা টেবিলের উপর হাত ছড়াইয়া এবং মাথা রাখিয়া বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়াই সে আনন্দের ধ্বনি করিয়া লাফাইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসিল,—"তুমি এখানে আসিলে কি রূপে ? কে তোমাকে আসিতে দিল ? রাজা কখনই অনুমতি দেন নাই।"

লীলার বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য উদ্বেগের আতিশয্যে আমি তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কেবলই তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। লীলাও নীচে কি কি ঘটিয়াছে জানিবার নিমিত্ত অতিমাত্র আগ্রহে বার বার কে আমাকে আসিতে দিল তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তখন কাজেই আমাকে বলিতে হইল,—"চৌধুরী মহাশয়। এ বাটীতে তাঁহার তুল্য ক্ষমতা আর—?"

লীলা মহা বিরক্তি হেতু মুখ-বিকৃত করিয়া

আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বলিল,—"দিদি, তাঁহার কথা আর বলিও না। চৌধুরীর ন্যায় অধম নীচ লোক আর জগতে নাই। চৌধুরী অতি ঘৃণিত গুপ্তচর—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দ্বারে মৃদু শব্দ হইল। তখনই দ্বার খুলিয়া গেল। দেখিলাম চৌধুরাণী ঠাকুরাণী আমার টাকা পয়সা রাখিবার ছোট থলিয়াটি হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন,—"আপনি এটা নীচে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। ভাবিলাম এটা আপনাকে দিয়া আসি।"

তাঁহার স্বভাবতঃ পাণ্ডু বর্ণ এতই পাণ্ডু হইয়া গিয়াছে যে, আমি চমকিত হইলাম। আর দেখিলাম থলিয়াটি আমার হস্তে দিবার সময় তাঁহার হাত কাঁপিতেছে; আর তাঁহার চক্ষু বাঘিনীর মত আমার মুখ ছাড়িয়া লীলার দিকে ফিরিল। সর্ব্বনাশ হইয়াছে আর কি! এসব লক্ষণ বুঝিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করার পূর্ব্বে তিনি চৌধুরী মহাশয় সম্বন্ধীয় লীলার সমস্ত কথাই শুনিয়াছেন।

তিনি চলিয়া গেলে আমি দরজা বন্ধ করিয়া লীলাকে বলিলাম,—"চৌধুরী মহাশয়কে এই সকল কথা বলিয়া সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলিয়াছ।"

"আমি যাহা জানি তাহা যদি দিদি, তুমিও জানিতে তাহা হইলে তুমিও ঐ সকল কথা বলিতে। মুক্তকেশী ঠিক বলিয়াছিল। তৃতীয় এক ব্যক্তি কালি সেখানে লুকাইয়াছিল এবং সেই তৃতীয় ব্যক্তি—"

"তুমি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছ কি চৌধুরী?"

"তাহার আর সন্দেহ নাই। সে-ই রাজার গুপ্তচর, সে-ই রাজার ভদ্রদূত, তাহারই কথায় রাজা প্রাতঃকাল হইতে মুক্তকেশী ও আমার অপেক্ষায় সেখানে লুকাইয়া ছিলেন।"

"মুক্তকেশী কি ধরা পড়িয়াছে? তুমি কি তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিলে?"

"না। সে সেদিকে না আসিয়া বাঁচিয়া গিয়াছিল। আমি যখন সেখানে গেলাম তখন সেখানে কেহ ছিল না।"

"তার পর?"

"তার পর আমি ভিতরে গিয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলাম। অল্পক্ষণেই বড় অস্থির হইয়া পড়িলাম। তখন একটু নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইবার জন্য বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিবার সময় কাঠের ঘরের সম্মুখে বালির উপর কয়েকটা দাগ দেখিতে পাইলাম। ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিলাম, বালির উপর বড় বড় করিয়া 'দেখ' এই কথা লেখা রহিয়াছে।"

"তার পর তুমি সেখানকার বালি সরাইয়া গর্ত্ত করিয়া ফেলিলে?"

"তুমি জানিলে কিরূপে দিদি?"

"আমি তোমার পরেই যখন সেখানে গিয়াছিলাম তখন তাহা দেখিয়াছি। তার পর?"

"আমি বালি খুঁড়িয়া এক টুকরা কাগজ পাইলাম। সেই কাগজটুকু হাতের লেখায় পূর্ণ এবং সেই লেখার নীচে 'মু' লেখা।"

"কই সে কাগজ দেখি?"

"রাজা তাহা আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন।"

"কি তাহাতে লেখা ছিল মনে পড়ে কি? কথাগুলা মনে করিয়া বলিতে পার কি?"

"ভাবটা বলিতে পারি। খুব অল্প লেখা। তুমি হইলে তাহার সব কথা মনে করিয়া রাখিতে পারিতে।"

"আচ্ছা, অন্য কথার আগে, তাহার ভাবটা যতদূর পার বল দেখি।"

লীলা যাহা বলিল আমি এস্থলে ঠিক তাহা লিখিয়া রাখিতেছি ;—

"কালি যখন আপনার কাছে আসিয়াছিলাম, তখন এক মোটা লম্বা বুড়ামানুষ আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল এবং তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আমাকে দৌড়িয়া বাঁচিতে হইয়াছিল। সে লোকটা ভাল দৌড়িতে পারে না বলিয়া আমাকে ধরিতে পারে নাই। আজ আর সে সময়ে আসিতে আমার ভরসা হইতেছে না। তোমাকে এই সকল কথা জানাইবার জন্য অতি প্রত্যূষে সব বৃত্তান্ত কাগজে লিখিয়া বালির মধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম। আবার যখন আমরা তোমার অবস্থ স্বামীর গোপনীয় বৃত্তান্তের কথা কহিব, তখন সে কথা খুব গোপনে কহিতে হইবে। তেমন সুযোগ না হইলে সে কথা আর হইবে না। ধৈর্য্য অবলম্বন কর। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আবার শীঘ্রই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।—মু।"

"মোটা লম্বা বুড়ামানুষ" শুনিয়া কে সে গুপ্তচর তাহা বুঝিতে আর কোনই সন্দেহ থাকিল না। আমি কালি চৌধুরী মহাশয়ের সাক্ষাতে 'লীলা কাঠের ঘরে চিক খুঁজিতে গিয়াছে,' একথা বলিয়াছিলাম। এখন বোধ হইতেছে দলিলে আপাততঃ নাম সহি করিতে হইবে না, এই কথা বলিয়া লীলাকে নিশ্চিন্ত ও আপ্যায়িত করিয়া বাহবা লইবার জন্য তিনিও হয়ত কাঠের ঘরে গিয়াছিলেন। কাঠের ঘরের নিকটে যাওয়ার পরই হয়ত মুক্তকেশী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া পলায়ন করে। তাহাকে এরূপ সন্দেহজনক ভাবে পলায়ন করিতে দেখিয়া তিনি হয়ত তাহার অনুসরণ করেন। বোধ হয় তাহাদের কথাবার্ত্তার কিছুই তিনি শুনিতে পান নাই। আমি লীলাকে আবার জিজ্ঞাসিলাম,—"সে যাহা হউক, চিঠি তোমার হাতছাড়া হইল কি প্রকারে? বালির মধ্যে চিঠি পাওয়ার পর তুমি কি করিলে?"

সে উত্তর দিল,—"একবার তাহা পাঠ করার পর কাঠের ঘরের মধ্যে বসিয়া আবার তাহা পড়িতে লাগিলাম। যখন আমি তাহা পড়িতেছি তখন তাহার উপর একটা ছায়া পড়িল। আমি ফিরিয়া দেখিলাম ঘরের দরজার নিকট দাঁড়াইয়া রাজা আমার প্রতি চাহিয়া আছেন।"

"তুমি চিঠিখানি লুকাইবার চেষ্টা করিলে না?"

"করিলাম বই কি? কিন্তু রাজা আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—,'উহা লুকাইবার জন্য তোমার আর কষ্ট করিতে হইবে না। আমি উহা পড়িয়াছি।' আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না—কেবল কাতর ভাবে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন,—'বুঝিলে, আমি উহা পড়িয়াছি। দুই ঘণ্টা আগে আমি উহা বালি হইতে তুলিয়া পড়িয়াছি। তাহার পর আবার বালির মধ্যে পুঁতিয়া, তোমার হাতে পড়িবে বলিয়া, বালির উপরে যাহা লেখা ছিল তাহাই লিখিয়া রাখিয়াছি। আর মিছা কথা বলিয়া পার পাইবার উপায় নাই। মুক্তকেশীর সঙ্গে কালি তোমার গোপনে সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাহাকে এখনও আমি ধরিতে পারি নাই, কিন্তু তোমাকে ধরিয়াছি। আমাকে চিঠিখানি দেও। তখন আর উপায় কি?—আমি চিঠিখানি তাঁহাকে দিলাম।"

"চিঠি দেওয়ার পর তিনি কি বলিলেন?'

"কোন কথা না বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া ঘরের বাহিরে আনিলেন। তাহার পর

কোন দিকে কেহ আছে কি না, কেহ আমাদের দেখিতে বা আমাদের কথা শুনিতে পায় কি না, সন্ধান করিয়া অতি জোরে আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন,—কালি মুক্তকেশী তোমাকে কি বলিয়াছে বল।—গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক কথা বলিতে হইবে।"

"তুমি বলিলে?"

"আমি একা দিদি, আর তাঁহার হাতের চাপে আমার হাত যেন কাটিয়া যাইতেছে—আমি করিব কি?"

"তোমার হাতে সে দাগ আছে? আমাকে দেখাও।"

"কেন দিদি, তাহা দেখিতে চাহিতেছ?"

"তোমার সেই আঘাত চিহ্ন দেখিলে, এই অত্যাচারের বিহিত প্রতিকারার্থে আমার আর শক্তি ও তেজের অভাব হইবে না। সেই চিহ্নই তাঁহাকে দমন করিবার যন্ত্র হইবে। দেখাও আমাকে—হয়ত একথা আমাকে ভবিষ্যতে হলপ করিয়া বলিতে হইবে।"

"না দিদি, সে জন্য অত কাতর হইও না। আমার তো এখন আর বেদনা নাই।"

"আমাকে তাহা দেখাও।"

লীলা সেই সকল আঘাতের দাগ দেখাইল। আমার তখন শোক নাই, ক্রন্দন নাই, কাতরতা নাই। আমার অন্তরের যে তীব্র জ্বালা—বাক্যে তাহা ব্যক্ত হইবার নহে। সরলস্বভাব নিষ্পাপহৃদয় লীলা ভাবিতেছে দুঃখেই বুঝি আমার এমন ভাবান্তর হইয়াছে। ধিক্ দুঃখে ইহার পরেও আবার দুঃখ!

লীলা কাতরভাবে বলিল,—"এজন্য এ দুঃখ করিও না দিদি! আমার আর এখন কোন বেদনা নাই।"

"তোমারই অনুরোধে আমি এজন্য আর দুঃখ করিব না। আচ্ছা, তার পর মুক্তকেশীর কথা-বার্ত্তা আমাকে যেমন যেমন বলিলে তাঁহাকেও তেমনই সব বলিলে?"

"হাঁ সব। তিনি জেদ্ করিতে লাগিলেন। আমি একা, কিছুই লুকাইতে পারিলাম না।"

"তোমার কথা শুনিয়া তিনি কিছু বলিলেন কি?"

"তিনি আমার প্রতি চাহিয়া তীব্র পরিহাসের সহিত হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন,—'তোমার নিকট হইতে সব কথা শুনিতে চাই। শুনিতেছ কি? সব কথা।' আমি শপথ করিয়া বলিলাম,—'যাহা আমি জানিতাম সমস্তই বলিয়াছি।' তিনি বলিলেন,—'না—আরও কথা তুমি জান। বলিবে না তুমি? তোমাকে বলিতেই হইবে। এখানে তোমার নিকট তাহা আদায় করিতে পারিতেছি না, বাড়ী গিয়া তোমার নিকট সব কথা আদায় করিয়া তবে ছাড়িব।' আর কোন কথা না বলিয়া, তোমার সহিত বা কাহারও সহিত দেখা হইবার সম্ভাবনা শূন্য এক নূতন পথ দিয়া তিনি আমাকে টানিয়া আনিতে লাগিলেন। বাড়ীর নিকটস্থ হইয়া তিনি আবার বলিলেন,—'দেখ, এখনও দেখ। যদি ভাল চাও, তবে এখনও সব কথা বল।' আমি আগেও যাহা বলিয়াছিলাম এখনও তাহাই বলিলাম। তিনি আমাকে একগুঁয়েমির জন্য গালি দিতে দিতে বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। বলিলেন,—'তুমি আমাকে ঠকাইতে পারিবে না। তুমি নিশ্চয়ই আরও কথা জান। আমি সব কথা তোমার নিকট এবং তোমার ভগ্নীর নিকট শুনিয়া তবে ছাড়িব। তোমাদের দুই ভগ্নীর কু-মতলব, ফুস্‌ফুসানি সকলই আমি বন্ধ করিয়া দিব। যত দিন তুমি সত্য কথা না বলিবে, ততদিন মনোরমার সহিত আর তোমার দেখা হইবে

না। যত দিন সত্য কথা ব্যক্ত না করিবে, ততদিন নিয়ত তোমার উপর পাহারা থাকিবে।' আমার কোন কথা তিনি কাণেও ঠাঁই দিলেন না। বরাবর তিনি আমাকে ঘরে লইয়া আসিলেন। গিরিবালা সেখানে বসিয়া কি কাজ করিতেছিল। তিনি তাহাকে তখনই চলিয়া যাইতে হুকুম দিলেন। বলিলেন,—'এই চক্রান্তের মধ্যে তুইও যাহাতে না থাকিস্ আমি তাহার ব্যবস্থা করিতেছি। তোর আজিই এ বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। যদি তোর মুনিবনীর কোন আলাহিদা ঝির দরকার হয়, আমি তাহা ঠিক করিয়া দিব।' তাহার পর আমাকে ঘরের ভিতর ঠেলিয়া দিয়া তিনি তাহার দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং ঐ ভয়ানক ঝিটাকে আনিয়া পাহারা দিতে বসাইয়া দিলেন। বলিব কি তোমাকে দিদি, তাঁহাকে ঠিক পাগলের মত দেখাইতে লাগিল। তুমি হয়ত তাহা বুঝিতে পারিতেছ না।"

"লীলা, আমি সব বুঝিতে পারিয়াছি। পাপাসক্ত মনের স্বাভাবিক আশঙ্কায় তিনি বস্তুতই পাগল হইয়াছেন। তুমি যত কথা বলিতেছ ততই আমার দৃঢ় প্রতীতি হইতেছে যে, মুক্তকেশীর যদি আরও কিয়ৎকাল তোমার নিকট থাকা ঘটিত, তাহা হইলে এমন কথা সে ব্যক্ত করিত যে, তাহাতে তোমার দুরাত্মা স্বামীর সর্ব্বনাশ হইত। তিনি মনে করিতেছেন, সে কথা তুমি জানিতে পারিয়াছ। যাহাই বল বা যাহাই কর, তাঁহার পাপজনিত অবিশ্বাস কিছুতেই বিদূরিত হইবে না এবং তাঁহার মিথ্যাসক্ত প্রকৃতি তোমার সত্য কথা কদাপি বিশ্বাস করিবে না। সে কথা যাউক। এক্ষণে আমাদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করা আবশ্যক। চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টাতেই আজি তোমার কাছে আমি আসিতে পাইয়াছি; কে জানে কালি যদি তিনি এরূপ চেষ্টা আর না করেন। গিরিবালাকে রাজা জবাব দিয়াছেন; কারণ সে বড় চালাক চতুর এবং তোমার খুব অনুগত। যাহাকে তিনি তাহার কাজে বসাইয়াছেন, তোমার মঙ্গলামঙ্গলের সে ধারও ধারে না এবং সে এমনই নির্ব্বোধ যে তাহাকে জানোয়ার বলিলেও হয়। আমরা যদি শীঘ্র সাবধান হইয়া বিহিত ব্যবস্থা না করিতে পারি, তাহা হইলে তিনি যে আরও কঠিন উপায় অবলম্বন করিবেন না, তাহা কে বলিতে পারে?"

"কিন্তু দিদি, আমরা কি করিতে পারি? হায়! আর কখন আসিতে না হয় এমনই ভাবে যদি এ বাড়ী একেবারে ছাড়িয়া যাইতে পারা যাইত!"

আমি বলিলাম,—"ভাবিয়া দেখ, যতক্ষণ আমি তোমার কাছে আছি ততক্ষণ তুমি সম্পূর্ণ নিঃসহায় নও।"

"তাহা আমি জানি এবং ভাবি। দিদি, কেবল আমার ভাবনায় গিরিবালার ভাবনা তুমি ভুলিও না; তাহার একটা উপায় করিয়া দেও।"

"আমি তাহার কথা ভুলি নাই। তোমার কাছে আসিবার আগে আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছি, আর আজ রাত্রেও তাহার কাছে যাইবার ব্যবস্থা করিতেছি। এখানকার ডাকের থলিয়ায় চিঠি নিরাপদ নহে। আজি তোমার জন্য দুই খানি পত্র লিখিব, তাহা গিরিবালার হাতে দিয়াই যাইবে।"

"কাহাকে লিখিবে?"

"করালী বাবু, যে কোন বিষয়ে আবশ্যক হইলে, আমাদের সাহায্য করিবার আশ্বাস

দিয়াছেন ; তাই তাঁহাকে এক পত্র লিখিব। আইন কানুনের আমি কিছু জানি না বটে, কিন্তু ইহা আমার বিশ্বাস ঐ পাষণ্ড আজি তোমার উপর যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে, আইনের বলে স্ত্রীলোক সেরূপ আত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে। মুক্তকেশী সংক্রান্ত কোন বিশেষ কথা আমি লিখিব না ; কারণ সে সম্বন্ধে বিশেষ বৃত্তান্ত আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু আজি রাত্রে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে তোমার গায়ে যে সকল আঘাত লাগিয়াছে এবং তোমার উপর এই প্রকোষ্ঠে যে অত্যাচার করা হইয়াছে তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত উকীলকে না জানাইয়া আমি ছাড়িব না।”

“কিন্তু ভাবিয়া দেখ, দিদি,আইনের আশ্রয় লইতে গেলে বড় গোল হইবে নাকি ?”

“গোল হইবে, কিন্তু সে গোলে রাজারই ভীত হইবার কথা, আমাদের কি ? আর কিছুতে না হউক, এই গোলের ভয়েই তাঁহাকে আমাদের সহিত মিট্‌মাট্ করিয়া ফেলিতে হইবে।”

আমি উঠিলাম। কিন্তু লীলা ছাড়িতে চাহে না, কাজেই আবার বসিতে হইল।

লীলা বলিল,—“এ প্রকারে তুমি হয় ত তাঁহাকে কাণ্ডজ্ঞান শূন্য করিয়া তুলিবে ; তাহাতে আমাদের কষ্ট হয় ত দশগুণ বাড়িয়া যাইবে।”

কথাটা ঠিক বটে, কিন্তু লীলা ভীত হইবে বলিয়া আমি তাহার কাছে তাহা স্বীকার করিলাম না। সে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল মাত্র—কোন তর্ক করিল না। দ্বিতীয় পত্র কাহাকে লিখিতেছি, এ কথা সে জিজ্ঞাসা করিলে আমি উত্তর দিলাম,—“রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের নিকট। তিনি তোমার অতি নিকট আত্মীয় এবং তিনিই তোমার পিতৃকুলের মস্তক। তাঁহাকে অবশ্যই এ বিষয়ের মধ্যে মাথা দিতে হইবে।”

লীলা দুঃখিত ভাবে মস্তকান্দোলন করিল। আমি বলিলাম,—“সত্য বটে তোমার কাকা নিতান্ত দুর্ব্বলচিত্ত, স্বার্থপর ও মন্দ লোক ; কিন্তু তিনি রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়ও নহেন এবং তাঁহার জগদীশনাথ চৌধুরীর মত কোন বন্ধুও নাই। আমার প্রতি বা তোমার প্রতি তাঁহার মমতা বা স্নেহের জন্য কোন অনুগ্রহের প্রত্যাশা আমি করি না। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে কেমন করিয়া কাজ আদায় করিতে হয় তাহা আমি জানি। আমি তাঁহাকে বলিব, ‘এই সময়ে মনোযোগী ও সাবধান না হইলে, পরে তাঁহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইবে, অনেক ভোগ ভুগিতে হইবে এবং অনেক দায় তাঁহার ঘাড়ে পড়িবে।’ এ কথা তাঁহাকে যদি আমি বুঝাইয়া দিতে পারি তাহা হইলে তিনি যেরূপ আলস্যপ্রিয়, শান্তিপ্রিয়, ও স্বার্থপর, তাহাতে তাঁহার নিকট হইতে ইচ্ছামত কাজ পাওয়া নিতান্ত অসম্ভব হইবে না বোধ হয়।”

“আর কিছু হউক না হউক, যদি কিছু দিনের জন্য আমার আনন্দধামে থাকায় তাঁহার মত করিতে পার, আর যদি দিদি, সেখানে কয়েকদিন তোমার সহিত আবার নিরুদ্বেগে থাকিতে পাই, তাহা হইলে আমি বিবাহের পূর্ব্বে যেমন সুখী ছিলাম, আবার প্রায় তেমনই সুখী হই।”

এই কয়টী কথায় আমার চিত্তকে অন্য পথে লইয়া চলিল। রাজা হয় আইনের চক্রে পড়িয়া মহা গোলে হাবুডুবু খাউন, না হয় স্ত্রীকে কিছু দিনের জন্য বাপের বাড়ী যাওয়ার ওজরে তফাৎ হইতে দেন। শেষ প্রস্তাবে রাজা সহজে সম্মত হইবেন কি ? বড় সন্দেহ। যাই হউক, চেষ্টা করিয়া তো দেখা যাউক। লীলাকে বলি-

লাম,—"তুমি এখনই যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে তাহা তোমার কাকাকে জানাইব এবং এ সম্বন্ধে উকীলের মত কি তাহাও জিজ্ঞাসা করিব। আশা করি এ উপায়ে ভালই হইবে।"

আমি আবার উঠিলাম। লীলা আবার আমাকে বসাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—"মনের এরূপ অবস্থায় আমাকে ছাড়িয়া যাইও না দিদি। এখানেও তো লিখিবার সরঞ্জাম রহিয়াছে। যাহা লিখিতে হয় এখানে বসিয়া লেখ।"

তাহার নিজের কাজের জন্যও তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে আমার বড়ই কষ্ট হইল। কিন্তু আমরা অনেকক্ষণ একত্রে রহিয়াছি। আমাদের পুনরায় দেখা সাক্ষাৎ হওয়া না হওয়া, আমাদের নূতন সন্দেহ উৎপাদন করা না করার উপর নির্ভর করিতেছে। নীচে যে দুরাচারেরা বসিয়া এখন আমাদের কথাই কহিতেছে, এবং আমাদেরই ভাবনা ভাবিতেছে তাহাদের নিকট এক্ষণে নির্লিপ্ত ও অকাতর ভাবে আমার দেখা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আমি এ কথা লীলাকে বুঝাইয়া দিয়া বলিলাম,—"এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি ফিরিব দিদি। যতদূর হইবার তাহা আজি হইয়া গিয়াছে। এখন আর কোন ভয় নাই।"

"আমি কেন ভিতর দিক হইতে দরজা বন্ধ করিয়া থাকি না দিদি?"

"বেশ তো, তাই কর। আমি আবার ফিরিয়া আসিয়া না ডাকিলে কাহাকেও দরজা খুলিয়া দিও না।"

আমি বাহিরে আসিলে লীলা দরজা বন্ধ করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

——*——

১৯শে জ্যৈষ্ঠ।—খানিকটা দূর চলিয়া আসার পর, লীলার দরজা বন্ধ করার কথা মনে পড়ায়, আমারও আপনার ঘরের দরজায় চাবি দিয়া সেই চাবিটা সঙ্গে লইয়া আসিতে ইচ্ছা হইল। আমার দিনলিপি দেরাজের মধ্যেই চাবি দেওয়া ছিল, কেবল লিখিবার সাজ সরঞ্জামগুলা বাহিরে পড়িয়াছিল। ব্লটিং কাগজগুলা বাহিরে ছিল; কালি রাত্রে দিনলিপিতে যাহা লিখিয়াছি, তাহার শেষ কয়েক ছত্রের উল্টা ছাপ একখানি ব্লটিং কাগজে লাগিয়াছিল। আজি কালি সন্দেহটা আমার এতই প্রবল হইয়াছে যে, এই সকল সামান্য সামগ্রীও অসাবধানভাবে রাখিতে আমার আর মন সরিল না। এখন ঘরে আসিয়া দেখিলাম—যতক্ষণ আমি লীলার সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতেছিলাম, তাহার মধ্যে কেহ আমার ঘরে আসিয়াছিল এমন বোধ হইল না। লিখিবার জিনিষ পত্র টেবিলের উপর যেরূপভাবে ছড়ান থাকে, প্রায় তেমনই রহিয়াছে দেখিলাম। কেবল একটা বিশেষ দেখিলাম, আমার মোহরটা কলমদানের উপরে রহিয়াছে। কিন্তু আমি হাজার অসাবধান হইলেও কখন তাহা সেখানে রাখি না। যাহাই হউক, আজি সমস্ত দিন নানা কারণে এতই উদ্বিগ্ন আছি যে, আবার এই তুচ্ছ বিষয় মনে করিয়া সে উদ্বেগের ভার আর বাড়াইতে ইচ্ছা হইল না। দরজা বন্ধ করিয়া এবং চাবিটা আপনার সঙ্গে লইয়া নীচে আসিলাম।

নীচে বড় ঘরে রঙ্গমতী ঠাকুরাণী দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন,—"এখনও পড়িতেছে—বোধ হয় আজি আরও বৃষ্টি পড়িবে।"

দেখিলাম তাঁহার মুখ চখের স্বাভাবিক ভাব ও বর্ণ আবার ফিরিয়া আসিয়াছে বটে; কিন্তু তিনি যে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হইতে পারিয়াছেন! এমন বোধ হইল না।

তখন যে লীলা আমার নিকট চৌধুরী মহাশয়কে জঘন্য 'গুপ্তচর' বলিয়াছিল সে কথা নিশ্চয়ই চৌধুরাণী ঠাকুরাণী গোপনে শুনিয়াছিলেন। আচ্ছা, সে কথা কি তিনি তাঁহার স্বামীকে বলিয়া দিয়াছেন? নিশ্চয়ই বলিয়া দিয়াছেন। লীলা না থাকিলে তিনি, লীলার পিতার কৃত উইল অনুসারে, লক্ষ মুদ্রার উত্তরাধিকারিণী হইবেন। ইহাই তাঁহার চক্ষে লীলার অমার্জ্জনীয় অপরাধরূপে পরিগণিত; তাহার উপর আবার লীলার দুর্ব্বাক্য! এ সকল কথা আমার আজি মনে পড়িল এবং তিনি যে একজন লীলার প্রবল শত্রু তাহাও আমার মনে হইল। এমন স্থলে তিনি যে লীলার কটূক্তি তাঁহার স্বামীকে বলিয়া দেন নাই, ইহা অসম্ভব। অন্তরে যাহাই হউক, অন্ততঃ বাহ্য সদ্ভাব যতদূর সম্ভব বজায় রাখিয়া চলা বিশেষ আবশ্যক বোধে, আমি নিতান্ত বিনীতভাবে তাঁহাকে বলিলাম,—"একটা অতিশয় কষ্টকর প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি, আপনি কৃপা করিয়া তাহাতে কর্ণপাত করিবেন কি?"

অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, বিনা বাক্যে গম্ভীরভাবে মস্তক আন্দোলন করিয়া, তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

আমি বলিতে লাগিলাম,—"যখন আপনি কৃপা করিয়া আমার মুদ্রা ধার লইয়া গিয়াছেন, আমার আশঙ্কা হইতেছে, তখন আপনি লীলার মুখ হইতে এমন দুই একটা কথা শুনিয়াছিলেন, যাহা পুনরাবৃত্তির সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং সম্পূর্ণ প্রতিবাদার্হ। আমি ভরসা করিতেছি, নিতান্ত তুচ্ছ বোধে আপনি সে সকল কথা আপনার স্বামীর নিকট ব্যক্ত করেন নাই।"

তীব্র স্বরে তৎক্ষণাৎ তিনি উত্তর দিলেন,—"আমি তাহা অতিশয় তুচ্ছ বলিয়াই মনে করিয়াছি। কিন্তু অতি তুচ্ছ বিষয়ও আমি আমার স্বামীর নিকট হইতে প্রচ্ছন্ন করিতে জানি না। যখন তিনি আমার বদনের কাতর ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখনই আমাকে সকল কথা ব্যক্ত করিতে হইয়াছে।"

এ কথা আমি জানিতাম, তথাপি তাঁহার মুখে কথাটা শুনিয়া বড় ভয় হইল। আবার বলিলাম,—"আমি কাতর ভাবে আপনাকে এবং চৌধুরী মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি যে, আমার ভগ্নী অধুনা যেরূপ ক্লেশ সহ্য করিতেছে তাহা আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। সে যখন এ কথা বলিয়াছে তখন বিজাতীয় অপমান ও নিদারুণ মনস্তাপে তাহার হৃদয় জলিয়া যাইতেছিল। সদসৎ বিবেচনা-শক্তি তাহার তখন ছিল না। আমি ভরসা করিতেছি, এই সকল বিচার করিয়া, আপনারা উদারতা সহকারে তাহার অপরাধ ক্ষমা করিবেন!"

আমার পশ্চাদ্দিক হইতে স্থির গভীর শব্দে চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"নিশ্চয়ই।" তিনি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে পদসঞ্চারে আমার পশ্চাতে আসিয়া সমস্ত কথা শ্রবণ করিতেছিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"রাণী মা ঐ সকল কথা দ্বারা আমার প্রতি যে

অবিচার করিয়াছেন তাহার জন্য আমি দুঃখিত হইলেও, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিতেছি। মনোরমা দেবি, এই মুহূর্ত্ত হইতেই ও প্রসঙ্গ বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া যাউক; আর কদাপি উহার উল্লেখও না হয়!"

আমি বলিলাম,—"আপনি কৃপা করিয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি উৎকণ্ঠা—"আমি আর কথা বলিতে পারিলাম না। চৌধুরী মহাশয় তখন সর্ব্বভাবপ্রচ্ছন্নকারী, সর্ব্বনাশসাধক ঈষৎ হাস্যের সহিত এমনই প্রশান্ত মুখে আমার প্রতি চাহিলেন যে, আমি কি বলিতেছিলাম তাহা ভুলিয়া গেলেম। তাঁহার অপরিমেয় কপটতার জন্য তাঁহার প্রতি আমার ঘোর অবিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহার উপর আবার তাঁহার এবং তাঁহার পত্নীর মনস্তুষ্টির চেষ্টা করায়, আমার আপনাকে আপনি এতই হীন ও ইতর বোধ হইল যে, আমি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলাম এবং আর কোন কথা কহিতে না পারিয়া তথায় নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"মনোরমা দেবি, আমি করযোড়ে বলিতেছি, এ সম্বন্ধে আপনি আর কোন কথা বলিবেন না। এই তুচ্ছ বিষয় উপলক্ষ করিয়া আপনি এত কথা বলিতেছেন বলিয়া আমি নিতান্ত লজ্জিত ও কাতর হইতেছি।" এই বলিয়া তিনি উভয় হস্তে আমার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিলেন। তাঁহার এরূপ করিবার অভিপ্রায় কি তাহা ভগবানই বলিতে পারেন। ফলতঃ, যাহা মনে করিয়াই হউক এবং যে ভাবেই হউক, তিনি আমার হাত ধরিবামাত্র তাঁহার স্ত্রীর হৃদয় দারুণ ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিল এবং তাঁহার পাণ্ডু মুখও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি তখন সতেজে বলিয়া উঠিলেন,—"চৌধুরী! তোমার ও সব বাঙ্গালে শিষ্টাচার এদেশের মেয়ে মানুষে পছন্দ করে না।"

অমনই চৌধুরী মহাশয় আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া স্ত্রীর নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"তা করুক আর নাই করুক, আমার যে দেবী এদেশের সকল মেয়ে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনিই পছন্দ করেন।" কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি উভয় হস্তে আপনার স্ত্রীর হস্ত ধারণ করিলেন।

আমি এই সুযোগে চলিয়া আসিয়া নিজের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। চিঠি দুখানা এখনও লেখা হয় নাই। আমি আর কালব্যাজ না করিয়া পত্র লিখিতে বসিলাম। এ জগতে আমাদের পিতা নাই, মাতা নাই, ভ্রাতা নাই, তবে আর কাহাকে আমাদের বিপদের কথা জানাইব? কে আসিয়া আমাদের পক্ষাবলম্বন করিবে? কাজেই এ দারুণ দুঃসময়ে এই দুখানি পত্রের উপর আমাদের সকল আশা নির্ভর করিতেছে। ইহাতেই বা ফল কি হইবে তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু আর উপায় কি? যদি লীলা ও আমি এখান হইতে পলাইয়া যাই তাহা হইলে উপকার না হইয়া আমাদের অপকারই হইবে এবং তাহাতে ভবিষ্যতে আমাদিগকে বড়ই ঠকিতে হইবে। কঠোর শারীরিক অত্যাচারের সম্ভাবনা না হইলে সে কাজ কখনই কর্ত্তব্য নহে। আগে চিঠি দুখানি লিখিয়া দেখা যাউক। চিঠি লিখিলাম।

উকীলকে আমি মুক্তকেশীর কোন কথা লিখিলাম না, কারণ তাহার সহিত যে একটা রহস্য জড়িত আছে আমরা তাহার কথা এখনও কিছু জানি না। আমি কেবল তাঁহাকে জানাইলাম যে, রাণীর উপর রাজা অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। এরূপ স্থলে আমাদের

দিন কয়েকের জন্ত স্থানান্তরে যাওয়া বড়ই আবশ্যক হইয়াছে। যদিই রাজা আমাদের দিন কয়েকের জন্ত আনন্দধামে যাইতে না দেন, তাহা হইলে আমরা আইনের আশ্রয় অবলম্বন করিতে পারি কি না, এ কথাও তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম। যত শীঘ্র সম্ভব বিহিত উপদেশ দিবার জন্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়কে আমি খুব ভয় দেখাইয়া পত্র লিখিলাম। উকীলকে যে পত্র লিখিলাম তাহার একটা নকল রায় মহাশয়ের পত্র মধ্যে দিয়া লিখিলাম, দেখিবেন মামলা বড় কঠিন হইয়া দাঁড়াতেছে। এই সময়ে, তিনি মনোযোগী হইয়া দিন কয়েকের জন্ত আমাদিগকে আনন্দধামে লইয়া যাইতে না পারিলে, শেষে তাঁহাকে বড় কষ্ট পাইতে হইবে। লেখা শেষ হইলে খামের উপর শিরোনাম লিখিয়া এবং গালা মোহর করিয়া লীলাকে বলিবার জন্ত লীলার ঘরে চলিলাম।

লীলা আমাকে দ্বার খুলিয়া দিলে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম,—"কেহ তোমাকে ত্যক্ত করে নাই তো?"

সে বলিল,—"কেহ আমার দ্বারে আঘাত করে নাই বটে, কিন্তু পাশের ঘরে কে আসিয়াছিল।"

"পুরুষ মানুষ কি মেয়ে মানুষ?"

"মেয়ে মানুষই বোধ হয়। কারণ আমি চেলির কাপড়ের মত খস্ খস্ শব্দ শুনিতে পাইয়াছি।"

"তবেই চৌধুরাণী ঠাকুরাণী এদিকে আসিয়াছিলেন ভুল নাই। তিনি নিজে কোন অনিষ্ট করিতে পারুন আর নাই পারুন,—তিনি তাহার স্বামীর হাতের কল কি না,—সুতরাং কোন্ অনিষ্ট তাঁহার দ্বারা না ঘটিতে পারে?"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"তার পর সে খস্ খস্ শব্দের কি হইল? তোমার ঘরের দেওয়ালের পাশে সে শব্দ হইয়াছিল কি?"

"হাঁ দিদি, আমি চুপ করিয়া কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম।

"কোন্ দিকে শব্দটা গেল?'

"তোমার ঘরের দিকে।"

শব্দটা কিন্তু আমার কাণে যায় নাই। বোধ হয় আমি তখন চিঠি লিখিতে অন্তমনস্ক ছিলাম এবং লেখারও খস্ খস্ করিয়া শব্দ হইতেছিল। তাহাতেই বোধ হয় আমি কিছু শুনিতে পাই নাই, কিন্তু চৌধুরাণীর কাপড়ের শব্দ আমি শুনিতে না পাইলেও আমার লেখার শব্দ তাঁহার পাওয়ার খুব সম্ভাবনা। এত সন্দেহও যেখানে মনে হয় সেখানে কি কখন ডাকের থলিয়ার ভিতর চিঠি দেওয়া চলে?

পাঁচটা বাজিতে আর একটু দেরি আছে। গিরিবালা যেখানে আছে, গ্রামের ভিতর সে বুড়ীর বাড়ীতে এখন গিয়া আবার সাতটার মধ্যে অনায়াসে ফিরিয়া আসা যাইতে পারে। আরও বিলম্ব করিলে হয়ত কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হইতে পারে। লীলাকে বলিলাম,—"ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া রাখ; আমার জন্ত কোন ভয় করিও না। যদি কেহ আমার খোঁজ করে তাহা হইলে দরজা না খুলিয়া ভিতর হইতেই বলিও যে, আমি বেড়াইতে গিয়াছি।"

"কখন তুমি ফিরিবে?"

"সাতটার আগে নিশ্চয়ই ফিরিব। ভয় কি দিদি? কালি এমন সময়ে অতি বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ লোকের উপদেশ পাইবে। উমেশ বাবু এখন উপস্থিত নাই—এখন করালী বাবুই আমাদের প্রধান আত্মীয়।

নীচে আসিয়া পাখীর আওয়াজ এবং

তামাকের গন্ধ পাইয়া বুঝিলাম চৌধুরী মহাশয় পুস্তকালয়ে রহিয়াছেন। সেদিকে ফিরিয়া দেখিলাম তাঁহার পাখী সব কেমন পোষমানা তাহাই তিনি গিন্নি-ঝিকে দেখাইতেছেন। নিশ্চয়ই তিনি তাহাকে এই তামাসা দেখাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, নহিলে সে কি কখন ইচ্ছা করিয়া পুস্তকালয়ে আইসে? লোকটা যাহা কিছু করে তাহারই ভিতরে একটা না একটা মতব থাকে। এ কার্য্যে তাঁহার কি মতলব? কিন্তু এখন আর তাঁহার মতলব অনুসন্ধান করিবার সময় নাই। চৌধুরাণী ঠাকুরাণীর সন্ধান করিয়া দেখিলাম, তিনি কাজ না থাকিলে যেমন করেন, এখনও তেমনই, সেই ছোট পুকুরের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এখনই আমাকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহার ভয়ানক ঈর্ষার উদয় হইয়াছিল; আবার আমাকে দেখিয়া না জানি তাঁহার কি ভাব হইবে মনে করিয়া আমি ভীত হইলাম। দেখা হইলে বুঝিলাম তাঁহার স্বামী আবার তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছেন। তিনি সতত আমার সহিত যেরূপ সৌজন্য করিয়া থাকেন এবারও তেমনই করিলেন। তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়, যদি তাঁহার নিকট রাজার কোন সংবাদ জানা যায়। আমি সুকৌশলে সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম। ঠাকুরাণী নিতান্ত দায়ে পড়িয়া ব্যক্ত করিলেন, 'রাজা বাহিরে গিয়াছেন।' আমিও সঙ্গে সঙ্গে নিতান্ত উদাসীন ভাবে জিজ্ঞাসিলাম,—"রাজা কোন্ ঘোড়ায় চড়িয়া গিয়াছেন?"

ঠাকুরাণী উত্তর দিলেন,—"কোন ঘোড়াতেই নহে। ঘণ্টা দুই হইল তিনি হাঁটিয়া বেড়াইতে গিয়াছেন। আমার বোধ হয়, তিনি মুক্তকেশী নামে সেই স্ত্রীলোকের সন্ধানে গিয়াছেন। আচ্ছা, মনোরমা দেবি, জানেন কি আপনি, সে মুক্তকেশী কি ভয়ানক পাগল?

"না মা, আমি কিছুই জানি না।"

"এখন কি আপনি বাড়ীর মধ্যে যাইবেন?"

"হাঁ।"

আমরা উভয়ে একত্রে বাটির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। রঙ্গমতী ঠাকুরাণী বেড়াইতে বেড়াইতে পুস্তকালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিলেন। আমি মনে করিলাম গিরিবালার নিকট যাইবার এই উত্তম সুযোগ, অতএব আর এক মুহূর্ত্তও সময় নষ্ট করা অন্যায়। নিজের ঘর হইতে যাত্রার জন্য ঠিক্ ঠাক হইয়া নীচে আসিয়া দেখিলাম, সেখানে কেহই নাই। পুস্তকালয় হইতে চৌধুরী মহাশয়েরও আওয়াজ বন্ধ হইয়াছে। যাহাই হউক, কে কোথায় আছেন সে অনুসন্ধানে আমার এখন আর কাজ নাই। আমি পত্র দুইখানি সাবধানে লইয়া বাটী হইতে বাহির হইলাম। গ্রামে যাইতে যাইতে পথের মধ্যে রাজার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে। যদি তিনি একা থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে আমি একটুও ভয় করি না। যে স্ত্রীলোকের আপনার বিবেচনা শক্তি স্থির আছে সে, যে পুরুষের ধৈর্য্য নাই তাহার নিকটে অক্লেশে জিতিয়া যাইতে পারে। চৌধুরী মহাশয়কে আমি যতটা ভ[illegible] করি রাজাকে আমি ততটা ডরাই না। রাজা যে কাজের জন্য বাহিরে গিয়াছেন তাহা শুনিয়া আমি একটুও চঞ্চল হইলাম না। মুক্তকেশীর সন্ধান করাই এখন রাজার প্রধান চিন্তা; সুতরাং যতক্ষণ তাঁহার মনের এই গতি থাকিবে ততক্ষণ লীলা ও আমি তৎকৃত অভিনব অত্যাচারের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিব সন্দেহ নাই।

আমাদের স্বার্থের জন্য এবং মুক্তকেশীরও মঙ্গলের জন্য একণে আমার প্রার্থনা যেন শীঘ্র রাজা তাঁহার সন্ধান না পান। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, আমি খুব দ্রুত চলিতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে, কেহ আমার অনুসরণ করিতেছে কি না জানিবার জন্য, আমি একবার পিছন দিকে চাহিতে লাগিলাম। আমার পশ্চাতে কতকগুলা বস্তা বোঝাই একখানি গরুর গাড়ি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তাহার চাকার ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দে আমাকে নিতান্ত জ্বালাতন করিতে লাগিল। এজন্য গাড়িখানা আমাকে ছাড়াইয়া বহুদূর চলিয়া যাউক তাঁহার পর যাইব এরূপ অভিপ্রায় করিয়া, আমি পথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর গাড়িখানার দিকে অধিকতর মনোযোগের সহিত দৃষ্টিপাত করায় আমার যেন বোধ হইল, তাহার ঠিক পিছনে একটী মানুষ হাঁটিয়া আসিতেছে; আমি একবার গাড়ির ফাঁক দিয়া যেন তাহার পা দেখিতে পাইলাম। গাড়োয়ান গাড়ির সম্মুখে বসিয়া আছে। আমি রাস্তার যে জায়গায় দাঁড়াইয়াছি সে স্থানটা নিতান্ত সরু। গাড়ি যাইতে হইলে সেখানে রাস্তার দুই দিকে যে বেড়া আছে তাহাতে গাড়ি ঘেঁসিয়া যাইবে। অতএব গাড়ি চলিয়া গেলেই ঠিক বুঝিতে পারিব আমার সন্দেহ সত্য কি না। গাড়ি চলিয়া গেল, কিন্তু কই তাহার পিছনে তো মনুষ্যের চিহ্নও নাই। তবে নিশ্চয়ই আমার সন্দেহ অমূলক।

রাস্তায় কাহারও সহিত দেখা হইল না এবং অন্য কোন সন্দেহজনক ঘটনাও লক্ষিত হইল না। যে বৃদ্ধার বাটীতে গিরিবালা রাত্রি যাপন করিবে স্থির ছিল, আমি সেখানে উপনীত হইলাম। দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বৃদ্ধা গিরিবালাকে বড় যত্নে রাখিয়াছে। তাহার জন্য সে একটী স্বতন্ত্র ঘর ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহার শুইবার জন্য একটী মাদুর ও একটী পরিষ্কার বালিশ দিয়াছে এবং তাহার রাত্রের আহারেরও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। গিরিবালা আমাকে দেখিয়া আবার কাঁদিতে লাগিল আর বলিতে লাগিল, বিনা দোষে তাহাকে আশ্রয়হীন ও জীবিকাহীন হইতে হইল। তাহার যে কি দোষ তাহা সে তো নিজে জানেই না; তাহার প্রভু তাহাকে তাড়িত করিলেন বটে, কিন্তু তিনিও তাহা জানেন না। আহা! বেচারার কথাও যথার্থ এবং তাহার অবস্থাও বড় শোচনীয়!

আমি বলিলাম,—"বিধাতা যেরূপ ঘটাইবেন সেইরূপই ঘটিবে। গিরিবালা, সুতরাং সে জন্য আর আক্ষেপ করায় কোন ফল নাই! তোমার প্রভু-পত্নী এবং আমি আমরা উভয়ে তোমার যাহাতে কোন ক্ষতি না হয় তাহার ব্যবস্থা করিব। এখন আমার কথা শুন। আমার এখানে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিবার সময় নাই! আমি তোমার হাতে একটী অতিশয় বিশ্বাসের কাজ সমর্পণ করিতেছি। তুমি এই চিঠি দুইখানি বিশেষ যত্নের সহিত রাখিয়া দেও। যে চিঠিখানির উপর টিকিট দেওয়া আছে, সেখানি তোমাকে কালি কলিকাতা পৌঁছিয়াই ডাকের বাক্সে ফেলিয়া দিতে হইবে। অন্যখানি আনন্দধামে পৌঁছিয়াই তোমাকে স্বয়ং রাধিকা বাবুর হাতে দিতে হইবে। চিঠি দুইখানি অতিশয় সাবধানতার সহিত আপন আঁচলে বাঁধিয়া রাখ এবং আর কাহারও হাতে দিও না। ঐ চিঠি দুইখানির মধ্যে রাণীর যারপর-নাই দরকারী কথা আছে জানিবে।"

গিরিবালা পত্র দুইখানি পরিধান বস্ত্রের

কোলের খুঁটে বাঁধিয়া লইয়া বলিল,—"যতক্ষণ আপনার আজ্ঞামত কার্য্য করিবার সময় না আসিবে ততক্ষণ চিঠিখানি এখানেই থাকিবে।"

তাহার পর আমি বলিলাম,—"সাবধান, কালি তোমাকে খুব ভোরে ষ্টেশনে যাইতে হইবে, নহিলে গাড়ি পাইবে না। আনন্দ-ধামে গিয়া সেখানকার গিন্নি-ঝিকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইয়া বলিবে যে, যতদিন রাণী তোমাকে পুনরায় নিজ কর্ম্মে না নিযুক্ত করিতে পারেন, ততদিন তুমি আমার নিকট বেতন পাইয়া আনন্দধামে থাকিবে। শীঘ্রই আবার আমার সঙ্গে দেখা হইবে; সেজন্য দুঃখ করিও না। এখন আমি আসি।"

গিরিবালা বলিল,—"আপনার কথা শুনিয়া আমার প্রাণে আবার ভরসা হইল। আহা! না জানি আজি আমি কাছে না থাকায় রাণী-মার কতই অসুবিধা হইবে। কিন্তু কি করিব মা, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। আমি আপনারই দাসী; যেখানেই থাকি, আর যাই করি, যেন আপনাদের সেবা করিতে করিতেই আমার দিন যায়।"

আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। তাড়াতাড়ি বাটী ফিরিয়া লীলার ঘরে প্রবেশ করিলাম। লীলার কাণে কাণে অস্ফুট স্বরে বলিলাম,—"চিঠি গিরিবালার হাতে দেওয়া হইয়াছে। নীচে যাইতেছি, তুমি যাইবে কি।"

"না না—কোন ক্রমেই না।"

"কিছু হইয়াছে কি? কেহ এ দিকে আসিয়াছিল কি?"

"হাঁ—খানিকটা আগে রাজা—"

"তিনি ঘরের ভিতর আসিয়াছিলেন কি?"

"না। তিনি দরজায় ঘা মারিয়া আমাকে ভয় দেখাইয়াছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কে ওখানে?' তিনি বলিলেন, 'বুঝিতে পারিতেছ না কে? এখনও আমাকে বাকী কথা বলিবে কি না বল। তোমাকে বলিতেই হইবে। এখন না হয়, যখন হউক, সে সকল কথা তোমার নিকট আদায় করিয়া তবে ছাড়িব। মুক্তকেশী এখন কোথায় আছে, নিশ্চয় তাহা তুমি জান।' আমি বলিলাম,— 'আমি সত্য বলিতেছি, তাহা আমি জানি না।' তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'সে কথা আমি শুনিতে চাহি না, তুমি নিশ্চয়ই জান। মনে রাখিও, আমি তোমার এক-গুঁয়েমি ভাঙ্গিয়া দিবই দিব—তোমার নিকট হইতে সমস্ত রহস্য আদায় করিবই করিব।' এই কথা বলিয়া, দিদি, তিনি এই চলিয়া যাইতেছেন—এখনও পাঁচ মিনিটও হয় নাই।

তবেই বুঝা যাইতেছে রাজা এখনও মুক্ত-কেশীর সন্ধান পান নাই। সুতরাং আজি রাত্রিটা আমাদের নির্ব্বিঘ্নে কাটিবে সন্দেহ নাই।

লীলা জিজ্ঞাসিল,—"তুমি এখন নীচে যাইতেছ কি দিদি? যাও, কিন্তু শীঘ্র আসিও।"

"সন্ধ্যার একটু পরেই আমি আবার উপরে উঠিব। নিতান্ত শীঘ্র আসিলে সকলে রাগও করিতে পারে, তাহাদের মনে নানা সন্দেহও জন্মিতে পারে। দু দণ্ড বসিয়া তাহাদের সহিত কথা-বার্ত্তা না কহিলে ভাল দেখাইবে কেন? আমি শীঘ্রই আসিব, সে জন্য কোন ভয় নাই।"

নীচে আসিলাম। দেখিলাম পিসী ঠাকু-রাণী কেতাব ঘরে বসিয়া তাঁহার স্বামীর ব্যবহারের জন্য একখানি রুমালে রেশমের ফুল তুলিতেছেন। তাঁহার অনতিদূরে রাজা নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে একদৃষ্টে জানালার দিকে চাহিয়া আছেন। আর চৌধুরী মহাশয় বারান্দায়

রকিং চেয়ারে বসিয়া আস্তে আস্তে দুলিতেছেন। আমাকে দেখিবামাত্র রঙ্গমতী দেবী বলিয়া উঠিলেন,—"মনোরমা দেবী আসিয়াছেন—ভালই হইয়াছে। চলুন এ সন্ধ্যার সময়টা আর ঘরের ভিতরে বসিয়া কাজ নাই, বাহিরে বারান্দায় যাওয়া হউক।"

তাঁহার কথা শুনিয়া রাজা আমাদের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন এবং আমরা বাহিরে আসিতেছি দেখিয়া তিনিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। বাহিরে চৌধুরী মহাশয়ের নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, তিনি নিতান্ত ঘর্ম্মাক্ত এবং ক্লান্ত। আর প্রতিদিন বৈকালে তাঁহার যেরূপ পরিচ্ছদ-পারিপাট্য দেখা যায় আজি সেরূপ নাই। তবে কি তিনিও এতক্ষণ আমার মত দূরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন? কিম্বা, অন্য দিনের অপেক্ষা আজি তাঁহার অধিক গ্রীষ্ম বোধ হওয়ায় এরূপ হইয়াছে কি? সে যাহাই হউক, তাঁহাকে আজি বিশেষ উদ্বিগ্ন বলিয়া বোধ হইল। ছলনার অপরিমেয় উপায়াবলী তাঁহার আয়ত্তাধীন সত্য, তথাপি আজি তিনি তাঁহার ব্যাকুলিত ভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রচ্ছন্ন করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাঁহার মুখে আর রাজার মুখে আজি কথাটীও নাই বলিলেই হয়। আর চৌধুরী মহাশয় থাকিয়া থাকিয়া বিষম উদ্বেগের সহিত তাঁহার স্ত্রীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তাঁহার এরূপ ভাব আমি আর কখন দেখি নাই। তাঁহার যাহাই কেন হউক না, আমার প্রতি শিষ্টাচারে তিনি কখনই পরাঙ্মুখ ছিলেন না। এরূপ সৌজন্যের অভ্যন্তরে কি দুরভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা আমি এখনও নির্ণয় করিতে সক্ষম হই নাই। কিন্তু অভিসন্ধি যাহাই হউক, আমার সম্বন্ধে অযথা শিষ্ট ব্যবহার, লীলার সহিত সর্ব্বদা বিনীত ব্যবহার এবং যেরূপেই হউক, রাজার ঘৃণিত ও উদ্ধত ব্যবহারের নিরোধ, এই ত্রিবিধ উপায়, এই ভবনে পদার্পণ করার পর হইতে, তিনি স্বীয় মনোভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত সতত পালন করিয়া আসিতেছেন। যে দিন পুস্তকালয়ে প্রথমে দলিল বাহির করা হইয়াছিল সেই দিনে তাঁহার আমাদের পক্ষাবলম্বন দেখিয়া আমার মনে এ সন্দেহ জন্মিয়াছিল। এখন আমার সে সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে। আজি চৌধুরী মহাশয় ও রাজার যেরূপ ভাব তাহাতে কথাবার্ত্তার বিশেষ সম্ভাবনা নাই দেখিয়া আমি উঠিয়া যাইবার একটা ওজর খুঁজিতেছিলাম। এমন সময়ে রঙ্গমতী ঠাকুরাণী উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া আমিও সেই সঙ্গে যোগ দিলাম। আমরা উভয়ে প্রস্থানের নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিলে চৌধুরী মহাশয় উঠিলেন।

তখন রাজা বলিলেন,—"আরে জগদীশ! তুমি যাও কেন?"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"আমার শরীরটা খারাপ আছে, আমি আজি উঠি।"

রাজা বলিলেন,—"তোমার কপালে আগুণ! বইস এখানে—দুদণ্ড ঠাণ্ডা হইয়া গল্প করা যাউক।"

চৌধুরী বলিলেন,—"দুদণ্ড পরে আমি খুব রাজি আছি, কিন্তু এখন নয়, আর একটু পরে।"

রাজা অসভ্যভাবে বলিলেন,—"আচ্ছা! বেশ! এমন শিষ্টাচার কোথায় শিখিয়াছিলে?"

যতক্ষণ আমরা নির্ব্বাক্ ভাবে বসিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে রাজা অনেকবার চৌধুরী মহাশয়ের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন; চৌধুরী কিন্তু সযত্নে রাজার দৃষ্টির সহিত আপন দৃষ্টি একবারও মিলিত হইতে দেন নাই! এই ঘটনার এবং দু-দণ্ড কথাবার্ত্তা কহিতে রাজার

একান্ত ইচ্ছা ও অনুরোধ, অথচ চৌধুরী মহাশয়ের তাহাতে সম্পূর্ণ অসম্মতি আমাকে মনে করাইয়া দিল যে, রাজা আজি আরও একবার চৌধুরী মহাশয়কে পুস্তকালয় লইতে বাহিরে আসিয়া দুদণ্ড কথা কহিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তখনও সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। অতএব তাঁহাদের বক্তব্য বিষয় যাহাই হউক, রাজার আগ্রহ দেখিয়া আমার বোধ হয়, তাহা তাঁহার বিবেচনায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়, আর চৌধুরী মহাশয়ের অনিচ্ছা দেখিয়া বোধ হয়, তাঁহার বিবেচনায় তাহা বড় বিপজ্জনক বিষয়।

আমি এই সকল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে রঙ্গমতী দেবীর সহিত উপরে উঠিলাম এবং শিষ্টাচারের অনুরোধে তাঁহার সহিত তাঁহার প্রকোষ্ঠ প্রবেশ করিলাম। চৌধুরী মহাশয়ও আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম, রাজার অনিচ্ছায় চলিয়া আসার জন্য রাজা যে বিরক্তি ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, চৌধুরী মহাশয় তাহাতে একটু বিচলিত বা কাতর হন নাই। তিনি একটুখানি ঘরের মধ্যে থাকিয়া আবার বাহিরে আসিলেন এবং তখনই আবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"মনোরমা দেবি, ডাকের চিঠি সকল চলিয়া যাইতেছে। আপনার কোন চিঠি থাকেতো এই সময় দিতে পারেন।"

প্রতিদিন এইরূপ সময়ে রাজবাটী হইতে শেষবার চিঠির থলিয়া ষ্টেশনের ডাকঘরে পৌছিবার নিমিত্ত লোক যায় বটে।

চৌধুরী মহাশয়ের জন্য তাঁহার গৃহিণী এতক্ষণ পান তৈয়ার করিতেছিলেন। তখন আমি কি জবাব দিই তাহা শুনিবার জন্য তাঁহার হাত কর্ম্মে বিরত হইল।

আমি বলিলাম—"না চৌধুরী মহাশয়, আমার আজি কোনই পত্র নাই।"

তখন চৌধুরী মহাশয় ঘরের ভিতর আসিয়া পিয়ানোর নিকট বসিলেন এবং তাহার সহিত গলা মিলাইয়া একটা হিন্দি গান ধরিলেন। গান সমাপ্ত হইলে তাঁহার পত্নী ধীরে ধীরে সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। লীলার ঘরে না জানি আবার কি কাণ্ড ঘটিবে মনে করিয়া এবং চৌধুরী মহাশয়ের সহিত একাকী এক ঘরে থাকিতে আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা বলিয়া আমিও উঠিলাম। তখন চৌধুরী মহাশয় আমাকে সেজটা কৃপা করিয়া তাঁহার পিয়ানোর উপরে উঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। আমি তাঁহার অনুরোধ পালন করিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলে তিনি বলিলেন,—"মনোরমা দেবি, আপনার নিকট আমার এক নালিস আছে এবং আমার সম্পূর্ণ আশা আছে, আপনার নিকট তাহার যথাবিহিত সুবিচার হইবে।"

কাজেই তাঁহার নালিস শুনিবার জন্য আমাকে সেখানে অধোবদনে অপেক্ষা করিতে হইল। ভাবিলাম এ আবার কি নূতন ভাব! না জানি কি কথাই তিনি উত্থাপন করিবেন। তখন তিনি বলিলেন,—"দেবি! আমরা বাঙ্গাল। আপনারা বলিয়া থাকেন, 'বাঙ্গাল মনুষ্য নয়, উড়ে এক জন্তু, লাফ দিয়া গাছে উঠে লেজ নাই কিন্তু।' উড়েরা মানুষ কি না, এবং তাহাদের লেজ আছে কি না, তাহার বিচারে আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমি বাঙ্গাল—বাঙ্গালের মনুষ্যত্ব আছে কি না, তাহারই জন্য আমি আপনার মহামান্য আদালতে বিচার প্রার্থী। আমাদের যে লেজ নাই, ভরসা করি এ কথা আপনি জ্ঞাত আছেন এবং ইহার সমর্থনের জন্য আমাকে

কোন প্রমাণ প্রয়োগ করিতে আদেশ করিবেন না। লেজ নাই বটে, তথাপি মনুষ্য মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য নহি কেন, ইহাই এখানে আলোচ্য। আমাদের হস্ত পদাদি সকলই আপনাদের সমান এবং আহার ব্যবহার আপনাদের অনুরূপ। লাফ দিয়া আমরা যে গাছে উঠি না এবং তাদৃশ কার্য্যে আপনারা যেমন অশক্ত, আমরাও যে তেমনই অসমর্থ তাহা বোধ হয় আপনার অগোচর নাই। তথাপি, আমাদের কোন্ অপরাধ হেতু, আপনারা আমাদের মনুষ্যত্ব বিলোপ করিয়া থাকেন, তাহা নির্ণয় করা আমাদের সাধ্যাতীত। শুনিতে পাই, আপনারা আমাদিগকে বিদ্যা বুদ্ধিতে নিতান্ত নিকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান করেন এবং সেই জন্যই আমাদিগের প্রতি এইরূপ হীনতা আরোপিত করিয়া থাকেন। কিন্তু আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, আপনি ধর্ম্ম, ন্যায় ও সত্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলুন দেখি, আমরা কি বস্তুতই আপনাদের অপেক্ষা বিদ্যা বুদ্ধিতে নিতান্তই হীন? যদিই এ সম্বন্ধে আমাদের কোন হীনতা থাকে, সে হীনতা অতি সামান্য এবং তাদৃশ সামান্য বৈষম্য হেতু তাদৃশ অবজ্ঞা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, আমরা সঙ্গীতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং আমাদের দেশের কোন কবিই একাল পর্য্যন্ত কোনই উৎকৃষ্ট গীত রচনা করিতে সক্ষম হন নাই। একথার উত্তরে আমার বিনীত নিবেদন যে, সংপ্রতি আমাদের দেশের এক জন অতি শ্রদ্ধাস্পদ কবি যে এক গীত রচনা করিয়াছেন, তাহা আপনাকে শুনিতে হইবে এবং তাহা শুনিয়া যদি এতৎ প্রদেশীয় সকল কবির সকল গীতের অপেক্ষা তাহা শ্রেষ্ঠ, মধুর ললিত ও ভাবময় বলিয়া বোধ না হয়, তাহা হইলে, অদ্য হইতে আপনারা আমাদের পশু কেন, কীট বলিয়া সম্বোধন করিবেন, আমরা সে কলঙ্ক অবনত মস্তকে বহন করিব। অতএব দেবি! কৃপা করিয়া মনোযোগ সহকারে সে গীত শ্রবণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।'

একি ব্যাপার। একি ঢঙ! গীতে আমার কোনই আসক্তি নাই এবং কাব্য ও সঙ্গীতের বিচার ও আলোচনায় আমি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ইত্যাদি নানা ওজর উপস্থিত করিলাম, কিন্তু কে তখন আমার কথা শুনে? তিনি পিয়ানো বাজাইতে বাজাইতে গান ধরিয়া দিলেন। তাঁহার উৎসাহের সীমা নাই। ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে দেহ দুলাইতে দুলাইতে এবং তাল দেওয়ার জন্য সেই স্থূল চরণে ভূপৃষ্ঠে আঘাত করিতে করিতে তিনি জোরে গান চালাইতে চালাইতে ঘর তোলপাড় করিতে লাগিলেন। না জানি একি পৈশাচিক অনুষ্ঠানের সূচনা! এই অকারণ বক্তৃতা, আত্মকৃত সঙ্গীতে এতাদৃশ আনন্দ ও উৎসাহ অবশ্যই কোন ভয়ানক কাণ্ডের পূর্ব্বাভাষ। অনন্যোপায় হইয়া আমাকে সেখানে অপেক্ষা করিতে হইল। অবশেষে রাজা সেই স্থলে উপস্থিত হওয়ায় আমি এই ঘোর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিলাম। তিনি আসিয়াই বলিলেন,—"ব্যাপার কি? এ কিসের বিকট গোল?" চৌধুরী মহাশয় তৎক্ষণাৎ পিয়ানো ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন,—"যখন প্রমোদ এখানে আসিয়াছেন, তাল-মান-লয় সকলকেই এস্থান হইতে পলায়ন করিতে হইবে। তবে আর এ উৎসাহহীন স্থানে আমার অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন, অতএব আমি বারান্দায় বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে চলিলাম।" তিনি আর কোন কথাটী ও না বলিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। রাজা সঙ্গে সঙ্গে গিয়া 'এদিকে এস, এদিকে এস, বলিয়া

তাঁহাকে নীচে পুস্তকালয়ে লইয়া যাইবার জন্য ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, বারংবার তাঁহার সহিত নির্জ্জন কথা কহিবার জন্য রাজা যে এত চেষ্টা করিতেছেন, চৌধুরী মহাশয় এখনও তাহাতে অসম্মত।

চৌধুরাণী ঠাকুরাণী প্রস্থান করার পর, এইরূপে চৌধুরী মহাশয় আমাকে লইয়া সেই স্থানে অর্দ্ধ ঘণ্টাধিক কাল আটকাইয়া রাখিলেন! এতক্ষণ ঠাকুরাণী কোথায় আছেন এবং কি করিতেছেন, কে বলিতে পারে? যাহা হউক লীলা কিছু টের পাইয়াছে কি না জানিবার জন্য আমি উপরে উঠিলাম। লীলাকে জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, সে কিছুই শুনিতে পায় নাই; কেহ তাহাকে ত্যক্তও করে নাই, কাপড়ের কোন খস্‌খসানি শব্দও তাহার কাণে যায় নাই। আমি আমার ঘর হইতে দিনলিপির খাতাখানা লইয়া লীলার ঘরে আসিলাম এবং অন্যূন একঘণ্টা কাল সেখানে বসিয়া খানিক বা গল্প খানিক বা লিখিয়া কাটাইলাম। তাহার পর লীলাকে সাহস দিয়া ও উত্তমরূপে সুস্থ করিয়া আপনার ঘরে আসিলাম। লীলা ঘরের দরজা ভিতর হইতে ভাল করিয়া বন্ধ করিল। দেখিলাম রাজা, চৌধুরী মহাশয় ও চৌধুরাণী ঠাকুরাণী এক জায়গায় বসিয়া আছেন। রাজা এক খানা ইজি চেয়ারে বসিয়া আছেন, চৌধুরী মহাশয় আলোর নিকটে বসিয়া একখানা বহি পড়িতেছেন, আর ঠাকুরাণী একখানা পাখা হাতে করিয়া বাতাস খাইতেছেন। দারুণ গ্রীষ্মেও যাহার কখন একটু ঘাম বা কাতরতার লক্ষণ দেখিতে পাই নাই, আজি সবিস্ময়ে দেখিলাম, তিনি গ্রীষ্ম হেতু বড়ই কষ্ট পাইতেছেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম,—"আমার আশঙ্কা হইতেছে, পিসীমা আপনার হয়ত শরীর ভাল নাই।"

তিনি উত্তর দিলেন,—"ঠিক ঐ কথাই আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছি। তোমাকে আজি বড় বিবর্ণ দেখাইতেছে বাছা।"

'তোমাকে' আবার 'বাছা' এরূপ আদরের এবং আত্মীয়তার উক্তি মুখে আর কখন শুনি নাই। দেখিলাম, বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখে একটু স্নেহের হাসিও ছিল। আমি বলিলাম,—"আমি আজি মাথা ধরায় বড় কষ্ট পাইতেছি।"

তিনি অমনই বলিলেন,—"বটে? শারীরিক পরিশ্রমের অভাবই এরূপ ঘটিবার কারণ নয় কি? বৈকালে অনেকখানি করিয়া পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইতে পারিলে নিশ্চয়ই তোমার উপকার হয়।" 'বেড়াইতে' এই কথার উপর তিনি একটু বিশেষ জোর দিয়া আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। আমি যখন বাহিরে গিয়াছিলাম, তখন কি তিনি দেখিয়াছিলেন? দেখিয়া থাকেন দেখিয়াছেন, আমার চিঠি তো আমি নির্ব্বিঘ্নে গিরিবালার হাতে দিয়া আসিয়াছি।

এই সময় রাজা গাত্রোত্থান করিয়া চৌধুরী মহাশয়ের প্রতি পূর্ব্ববৎ ব্যাকুল দৃষ্টি সহকারে বলিলেন,—"এস জগদীশ, বারান্দায় বসিয়া তামাক খাওয়া যাউক।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"আমি তোমার মত অত তামাক ভক্ত নই যে, এক জায়গা হইতে উঠিয়া আর এক জায়গায় তামাক খাইতে যাইব।" তাহার পর আমাদের দেখাইয়া বলিলেন,—"ইহাদের সকলকে ফেলিয়া আমরা দুজনে এখান হইতে চলিয়া

যাইব, এ কোন্ দেশী কথা? এস এদিকে।"

এই সময়ে আমি বলিলাম,—"আমার যেরূপ মাথা ধরিয়াছে পিসী মা, নিদ্রাই তাহার ঔষধ। অতএব অনুমতি করেন তো আমি ঘুমাইতে যাই।"

ঠাকুরাণীর মুখে সেইরূপ তীব্র বিদ্রূপের হাসি। রাজা মনে করিয়াছিলেন চৌধুরাণী, ঠাকুরাণী অবশ্যই আমার সঙ্গে গাত্রোত্থান করিবেন। কিন্তু তিনি আদৌ তাহার উদ্যোগ করিতেছেন না দেখিয়া রাজা তাঁহার মুখের প্রতি চাহিলেন। চৌধুরী মহাশয় কেতাব মুখে দিয়া হাসিতে লাগিলেন। চৌধুরীর সহিত রাজার নির্জ্জনে আলাপের এখনও আবার বিলম্ব ঘটিল। এবারকার বিলম্বের কারণ চৌধুরাণী ঠাকুরাণী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ।—নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া অজকার ঘটনাবলীর যে অংশ লিখিতে বাকি ছিল তাহাই লিখিতে বসিলাম। প্রায় মিনিট দশেক কাল কলম হাতে লইয়া গত বারো ঘণ্টার ঘটনাবলী আলোচনা করিতে লাগিলাম। অবশেষে যখন স্থির হইয়া লিখিতে আরম্ভ করিব মনে করিলাম, তখনও কিছুতেই তাহাতে চিত্ত লাগাইতে পারিলাম না। কেবল রাজা ও চৌধুরী মহাশয়ের কথা, বিশেষতঃ রাত্রিকালে নির্জ্জন সময়ে তাঁহাদের প্রস্তাবিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের বিষয়, আমার চিত্তকে নিতান্ত অধিকৃত করিয়া ফেলিল। এরূপ অবস্থায় প্রাতঃকাল হইতে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা যথাযথরূপে মনে করা কখনই সম্ভব নহে; অগত্যা খাতা বন্ধ করিয়া গাত্রোত্থান করিলাম। শুইবার ঘর হইতে আমি বসিবার ঘরে আসিলাম। সে ঘর অন্ধকার। জানালার নিকটে আসিয়া আমি বাহ্য প্রকৃতির নিবিড় অন্ধকারময় বিকট মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলাম। কি ভয়ানক অন্ধকার! আকাশে একটী চন্দ্র তারা কিছুই নাই, বড় মেঘ হইয়াছে—বৃষ্টি পড়িতেছে নাকি? না, বৃষ্টির সূচনা বটে। পনর মিনিট কাল অন্যমনস্কভাবে আমি জানালা হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম। নিবিড় অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না, এবং নিম্নতলে কদাচিৎ দুই একজন ভৃত্যের কণ্ঠস্বর বা দ্বার রুদ্ধ করার শব্দ ভিন্ন আর কিছুই আমার কর্ণগোচর হইল না। কেবল দাঁড়াইয়া আর কতক্ষণ থাকিব? জানালার নিকট হইতে শুইবার ঘরে আসিবার নিমিত্ত যখন ফিরিতেছি তখন আমার নাসিকায় চুরুটের গন্ধ আসিল। আমি যেমন বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলাম অমনই দেখিতে পাইলাম দূর হইতে একটী ক্ষুদ্র অগ্নিবিন্দু সেই ভয়ানক অন্ধকার রাশির মধ্য দিয়া চলিয়া আসিতেছে। সেই অগ্নিবিন্দু নিকটস্থ হইল এবং আমি যে জানালায় দাঁড়াইয়া ছিলাম, তাহার নীচে দিয়া ক্রমে আমার শুইবার ঘরে জানালার নিম্নে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সে ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছিল। অগ্নিবিন্দু অত্যল্প কালমাত্র তথায় অপেক্ষা করিয়া যে দিক হইতে আসিয়াছিল, পুনরায় সেই দিকেই চলিতে আরম্ভ করিল। অগ্নিবিন্দু কোন্ দিকে যায় দেখি-

তেছি এমন সময়ে দেখিতে পাইলাম, দূর হইতে আর একটী বৃহত্তর অগ্নিবিন্দু সেই ক্ষুদ্র বিন্দুর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। দুই বিন্দু ক্রমে নিকটস্থ হইল। চুরুট মুখে দিয়া দুই ব্যক্তি এই অন্ধকার রাত্রে অঙ্গনে বাহির হইয়াছে তাহার কোনই সন্দেহ নাই। প্রথমে যে ক্ষুদ্র অগ্নিবিন্দু দেখা গিয়াছিল তাহা যে চৌধুরী মহাশয়ের মুখের চুরুট তাহার সংশয় নাই; কারণ তিনি সরু সরু ছোট ছোট চুরুটই খাইয়া থাকেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি নিশ্চয়ই রাজা; কারণ তিনি বড় বড় মোটা চুরুটই খাইয়া থাকেন। আমি তখন নিশ্চয় বুঝিলাম, এ ঘনান্ধকারে তাঁহারা কেহই আমাকে দেখিতে পাইতেছেন না। আমি নিঃশব্দে সেই জানালায় দাঁড়াইয়া থাকিলাম।

শুনিতে পাইলাম অস্ফুটস্বরে রাজা বলিতেছেন,—"ব্যাপারটা কি? চল ভিতরে গিয়া বসা যাউক।"

সেইরূপ অস্ফুট-স্বরে চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"দাঁড়াও, আগে মনোরমার ঘরের আলো নিবিয়া যাউক।"

"কেন ও আলোয় তোমার কি ক্ষতি করিতেছে?"

"উহাতে বুঝা যাইতেছে, মনোরমা এখনও শয়ন করে নাই। সে যেরূপ চালাক মেয়ে তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ তাহার মনে উদয় হওয়া বিচিত্র নহে এবং যেরূপ তাহার সাহস তাহাতে কৌশলে নীচে নামিয়া আসিয়া সমস্ত কথা শুনিয়া যাওয়াও বিচিত্র কথা নহে। সাবধান, প্রমোদ, সাবধান।"

"আরে যাও। তোমার কথার মধ্যে কেবলই সাবধান।"

"দাঁড়াও—আমি অল্পকালের মধ্যে তোমাকে অন্য কথাও শুনাইব। আপাততঃ ঘোরতর পারিবারিক অশান্তি-অগ্নি তোমাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে! এসময়ে যদি স্ত্রীলোকেরা আবার কোন সুযোগ পায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে সেই আগুনে পুড়িয়া মরিতে হইবে।"

"বল কি তুমি?"

"আমি যাহা বলি তাহা তোমাকে শীঘ্রই বুঝাইয়া দিব। আপাততঃ প্রথমে ঐ আলোটা নিবিয়া যাইতে দেও, তাহার পর আমি ভিতরে গিয়া সিঁড়ির দুই ধারের ঘর দুইটায় উঁকি দিয়া দেখিব, তাহার পর যাহা বলিবার বলিব।"

ধীরে ধীরে তাঁহারা চলিয়া গেলেন এবং তাঁহাদের কথা-বার্ত্তা আর বুঝা গেল না। তাহা যাউক আর নাই যাউক, যতটুকু কথা-বার্ত্তা আমার কর্ণগোচর হইয়াছে তাহাতেই আমার স্থির সংকল্প হইয়াছে যে, আমার চতুরতা ও সাহসের সম্বন্ধে চৌধুরী মহাশয় যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাকে তাহার যথার্থতা সপ্রমাণ করিতেই হইবে। স্থির করিলাম তাঁহারা যতই কেন সাবধান হউন না, আমাকে তাঁহাদের কথা-বার্ত্তা শুনিতেই হইবে। লীলার মান, লীলার সুখ, হয়ত লীলার জীবন পর্য্যন্ত, অদ্য রজনীর কাণ্ডে, আমার তীক্ষ্ণ শ্রুতি ও প্রখর স্মৃতির উপর নির্ভর করিতেছে।

চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন, কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তিনি একবার সিঁড়ির দুই দিকের ঘর দুইটা দেখিবেন। তবেই অনুমান করা যাইতেছে পুস্তকালয়ে বসিয়াই তাঁহারা কথোপকথন চালাইবেন। আমি তখনই তাঁহাদের সকল সাবধানতা সত্ত্বেও আদৌ নীচে না নামিয়া সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিবার উপায় স্থির করিলাম। সমস্ত বাড়ীটা

ঘেরিয়া একটা সরু কাঠের বারান্দা আছে। সে বারান্দার কখন কোন ব্যবাহার হয় না, এবং কেহ সেখানে কখন যাওয়া আসা করে না। সেটা কেবল শোভার জন্যই আছে। কিন্তু সেখানে যে যোটেই যাওয়া যায় না, এমন নহে। জানালার উপর দিয়া সেখানে যাইতে হয়; এজন্য সে বারান্দা ব্যবহারে আইসে না। এই ঘোরান্ধকার রাত্রিকালে, আমি সেই বারন্দায় যাইয়া পুস্তকালয়ের জানালার উপরে তাহার যে অংশ আছে, নিঃশব্দে সেই পর্য্যন্ত যাইবার সংকল্প করিলাম। আমি অনেক দিন দেখিয়াছি, রাজা ও চৌধুরী মহাশয় পুস্তকালয়ে বসিয়া কথা-বার্ত্তা কহিতে হইলেই প্রায়ই জানালার নিকটে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহেন। আজি যদি তাঁহারা পূর্ব্ববৎ জানালার নিকটে বসিয়া কথোপকথন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যতই কেন ফুস্ ফুস্ করিয়া কথা কহুন না, বারান্দার উপরে বসিয়া থাকিতে পারিলে, আমার তাহা কর্ণ-গোচর হইবেই হইবে। অধিকক্ষণ লোকে ফুস্ ফুস্ করিয়া কথাবার্ত্তা চালাইতে পারে না, ইহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু যদি তাঁহারা জানালার নিকটে না বসিয়া ঘরের মধ্যস্থলে বা অন্য কোন দিকে বইসেন তাহা হইলে তো আমি ছাইও শুনিতে পাইব না। তাহা হইলে কাজেই আমাকে সাহসে ভর করিয়া নীচে নামিতে হইবে। দেখি তো বারান্দা হইতে কি ফল হয়, তাহার পর অন্য বিবেচনা। এই মনে করিয়া আমি নিঃশব্দে আমার শয়ন ঘরে প্রবেশ করিলাম শরীরের কাপড় চোপড় যতদূর সম্ভব আঁটিয়া বাঁধিলাম। যদি দৈবাৎ কিছু পড়িয়া যায়, যদি দৈবাৎ কোন রকম শব্দ হইয়া পড়ে তবেই সর্ব্বনাশ। যা করেন ভগবান্। দিয়েশলাইয়ের বাক্স বাতির নিকটে রাখিয়া আলো নিভাইয়া দিলাম, এবং আস্তে আস্তে শুইবার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বসিবার ঘরে আসিলাম। এ ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া আমি নিঃশব্দে জানালা অতিক্রম করিয়া সেই সরু বারান্দায় পা দিলাম। পুস্তকালয়ের উপর পর্য্যন্ত যাইতে আমাকে পাঁচটী জানালার কাছ দিয়া যাইতে হইবে। প্রথম জানালাটা একটা খালি ঘরের, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জানালা লীলার ঘরের, চতুর্থ জানালা রাজার ঘরের, পঞ্চম জানালা রঙ্গমতী দেবীর ঘরের। আমি সাহসে বুক বাঁধিয়া সেই নিবিড় ঘনান্ধকার মধ্যে সন্তর্পণে পা বাড়াইতে লাগিলাম। এক দুই তিন চারি জানালা বিনা ব্যাঘাতে অতিক্রম করিলাম। কিন্তু পঞ্চম জানালার নিকটস্থ হইয়া বুঝিতে পারিলাম সে ঘরে এখনও আলো জ্বলিতেছে! তবেই তো চৌধুরাণী ঠাকুরাণী এখনও শয়ন করেন নাই! কি সর্ব্বনাশ! আর তো ফিরিয়া যাওয়া যায় না, এখানেও তো আর দাঁড়াইয়া থাকা যায় না। তখন লীলার মুখ মনে করিয়া অসম সাহসের সহিত আমি হামাগুড়ি দিয়া চলিতে লাগিলাম। ধর্ম্মে ধর্ম্মে সে জানালাও পার হইলাম। বুঝিতে পারিলাম চৌধুরাণী ঠাকুরাণী তখনও ঘরের মধ্যে বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন। সেইরূপ ভাবে যথাস্থানে সমুপস্থিত হইয়া ধীরে ধীরে বারান্দার রেলের উপর মাথা রাখিয়া বসিলাম।

কিয়ৎকাল মাত্র তথায় বসিয়া থাকার পর দরজা খোলার শব্দ আমার কর্ণগোচর হইল। বুঝিলাম চৌধুরী মহাশয় সিঁড়ির পাশের ঘর দেখিবেন বলিয়াছিলেন, তাহাই এখন শেষ হইল। তাহার পর দেখিলাম ক্ষুদ্র অগ্নিবিন্দুটা বাহিরে আসিল এবং আস্তে আস্তে আমার ঘরের নিম্নভাগে গিয়া কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া আবার ফিরিয়া আসিল। বুঝিলাম আমার

ঘরের আলো নিবিয়াছে কি না চৌধুরী মহাশয় তাহা দেখিয়া গেলেন।

শুনিতে পাইলাম, রাজা নিতান্ত কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"বড় জ্বালাতন করিলে যে দেখিতেছি। কখন এসে বসিবে বল দেখি?" শব্দটা ঠিক আমার নীচে হইতে আসিল।

চৌধুরী জোরে লম্বা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—"ওঃ কি গরম!" সঙ্গে সঙ্গে নীচে চেয়ার কঁ্যাচ কঁ্যাচ করিয়া উঠিল। বুঝিলাম চৌধুরী মহাশয় আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা জানালার নিকটেই বসিলেন সন্দেহ নাই। চৌধুরাণী ঠাকুরাণী এখনও শয্যা গ্রহণ করেন নাই বুঝিতে পারিলাম। কারণ তাঁহার ঘরে এখনও ছায়া নড়িতেছে এবং এক একটু পায়ের শব্দ হইতেছে।

এ দিকে রাজা এবং চৌধুরী মহাশয়ের কথা-বার্ত্তা আরম্ভ হইল। সময়ে সময়ে তাঁহারা অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু শুনা যায় না এমন একবারও হইল না। যেরূপ দুঃসাহসিক কাণ্ড আমি করিয়াছি তাহার জন্য ভাবনা, সামান্য অসাবধানতায় যেরূপ বিপদ ঘটিতে পারে তাহার চিন্তা এবং সর্ব্বোপরি চৌধুরাণী ঠাকুরাণী যদি দৈবাৎ জানালা খুলেন তাহা হইলে আমার কি দুর্গতি হইবে সে আশঙ্কা আমাকে এমন বিচলিত করিয়া রাখিল যে, আমি কিয়ৎকাল তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ করিতে সক্ষম হইলাম না। কেবল বুঝিলাম, চৌধুরী মহাশয় রাজাকে বুঝাইতেছেন যে এতক্ষণে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা কহিবার প্রকৃত সুযোগ হইয়াছে; আর কোন বিঘ্নের আশঙ্কা নাই। কিন্তু তিনি সমস্ত দিন রাজার কথায় আদৌ কর্ণপাত না করিয়া নানা ওজরে কাটাইয়াছিলেন বলিয়া রাজা তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"আমাদের অধুনা নিতান্ত বিপন্ন দশা। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদিগের এই সময় হইতেই অত্যন্ত সতর্ক থাকা আবশ্যক সন্দেহ নাই। কিন্তু তদ্বিষয়ে কোন পরামর্শ স্থির করিতে হইলে নিতান্ত গোপন ভাবে ও ভয়শূন্য অবস্থায় তাহা করা আবশ্যক। সমস্ত দিনের পর এখন সেইরূপ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। যে কথাবার্ত্তা থাকে এখন তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে।" চৌধুরী মহাশয়ের এই কথার পর হইতে আমি অবিচ্ছিন্ন মনঃসংযোগ সহকারে তাবৎ কথোপকথন শুনিতে লাগিলাম।

রাজা বলিলেন,—"বিপন্ন দশা! ওঃ তুমি তার জান কি? সমস্ত অবস্থা শুনিলে তুমি হতবুদ্ধি হইয়া যাইবে।"

চৌধুরী উত্তর দিলেন,—"তোমার গত দিন দুইয়ের ব্যবহার দেখিয়া আমারও তাহাই মনে হইয়াছে; কিন্তু থাম একটু। যাহা আমরা জানি না তদ্বিষয়ের আলোচনায় অধিক দূর অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বে যাহা আমরা ঠিক জানি তাহার একটু আলোচনা হওয়া আবশ্যক। ভবিষ্যতের চিন্তা করিবার পূর্ব্বে অতীতের চিন্তা করা বিধেয়। শুন প্রমোদ, আমাদের অবস্থা আমি যেমন বুঝিয়াছি তাহা তোমাকে বলিতেছি। সমস্ত কথা শুনিয়া আমার যদি কোন ভুল দেখ তাহা ধরিয়া দেও। তুমি এবং আমি নিতান্ত বিপদাপন্ন অবস্থায় পশ্চিম হইতে এখানে ফিরিয়া আসি।"

"আহা, অত কথায় কাজ কি? আমার কয়েক হাজার আর তোমার কয়েক শত টাকার অত্যন্ত দরকার উপস্থিত হইয়াছিল এবং সে টাকা না পাইলে আমাদের

উভয়েরই একসঙ্গে সর্ব্বনাশ হইবার কথা, এইতো আমাদের অবস্থা; এখন কি বলিতে চাহ বল।"

"বেশ কথা। এ গরিবের সামান্য কয়েক শত টাকা সমেত তোমার সেই দরকার মিটাইবার জন্য সমস্ত টাকা তোমার স্ত্রীর সাহায্য ব্যতীত হস্তগত হইবার আর কোনই উপায় ছিল না। পশ্চিম হইতে আসিবার সময় পথে তোমাকে তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধে আমি কি বলিয়াছিলাম? তার পর যখন এখানে আসিয়া স্বচক্ষে মনোরমা কিরূপ প্রকৃতির স্ত্রীলোক তাহা জানিতে পারিয়াছি তখন আবার তোমাকে সে সম্বন্ধে কি বলিয়াছি তাহা তোমার মনে আছে তো?"

"এত কথা আমি মনে করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি না। তোমার সারাদিনের বক্তৃতা মনে করিয়া রাখিতে হইলেই সর্ব্বনাশ আর কি!"

"ভাল তোমার যদি সে কথা মনে না থাকে তাহা হইলে আমি আবার তাহা বলিতেছি। আমি বলিয়াছিলাম ভাই এপর্য্যন্ত মানব-বুদ্ধি স্ত্রীলোককে বশীভূত রাখিবার নিমিত্ত কেবল মাত্র দ্বিবিধ উপায় অবধারণ করিয়াছে। এক উপায় তাহাকে নিরন্তর গলা টিপিয়া রাখা। নিম্ন শ্রেণীর পশু প্রকৃতি মানবেরা প্রায়ই এই উপায়ের পক্ষপাতী, কিন্তু সভ্য ও শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীভুক্ত জনগণ এ উপায়ের নিতান্ত বিরোধী। দ্বিতীয় উপায় বহুকাল সাপেক্ষ এবং অপেক্ষাকৃত কঠিন হইলেও সমানই ফলপ্রদ। সে উপায় আর কিছুই নহে, কদাচ স্ত্রীলোকের কথায় রাগ করিতে নাই। এই উপায়ে ইতর পশুকে, শিশুগণকে এবং শিশুরই বৰ্দ্ধিত রূপান্তর স্বরূপ স্ত্রীলোকগণকে বশীভূত করা যাইতে পারে। স্থির প্রকৃতির সাহায্যে পশু শিশু এবং স্ত্রী এ তিনকেই ফাঁদে ফেলা যায়। যদি তাহারা কখন তাহাদের প্রভুর স্থিরমতিত্ব বিচলিত করিতে পারে তাহা হইলেই ঘাড়ে চড়িয়া বসে। অর্থের জন্য যখন তোমার স্ত্রীর সাহায্য নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল, তখন তোমাকে এই সার কথা মনে রাখিবার জন্য আমি অনুরোধ করিয়াছিলাম। তোমাকে আরও বলিয়াছিলাম, তোমার স্ত্রীর ভগ্নী মনোরমার সমক্ষে একথা অধিকতর স্মরণে রাখিবে। তুমি কি তাহা মনে রাখিয়াছিলে? এবাটীতে আগমন করার পর এ পর্য্যন্ত আমাদের যত বিপদ ও গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার কোন সময়েই তুমি আমার এ উপদেশের অনুরূপ কার্য্য কর নাই। এইরূপ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তুমি দলিলে তোমার স্ত্রীর নাম সহি করাইতে পারিলে না, উপস্থিত টাকা তোমার হাত ছাড়া হইয়া গেল, এবং মনোরমা প্রথমবার উকীলের নিকট পত্র—"

"প্রথমবার পত্র কি? আবারও কোন পত্র লিখিয়াছে নাকি?"

"হাঁ, আজি আবার এক পত্র লিখিয়াছে।"

নীচে ধপাস্ করিয়া একটা শব্দ হইল; বোধ হইল যেন রাজা ক্রুদ্ধভাবে ভূমিতলে পদাঘাত করিলেন। আবার আমার চিঠির কথা ব্যক্ত হইয়াছে জানিয়া আমি এমনই চমকিয়া উঠিলাম যে,যে রেলটার উপর আমি মাথা রাখিয়াছিলাম সেটা একটু নড়িয়া উঠিল এবং সেই জন্য একটুকু শব্দও হইল। কিন্তু এ পত্রের কথা চৌধুরী মহাশয় জানিতে পারিলেন কি প্রকারে? তিনি কি আমার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন? অথবা ডাকের থলিয়ায় কোন চিঠি দেই নাই বলিয়া কি তিনি অনুমান করিয়াছেন যে, তবে অবশ্যই আমি গিরিবালার দ্বারা চিঠি পাঠাইয়াছি? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে চিঠি যখন আমার হাত হইতে

একেবারে গিরিবালার বস্ত্র মধ্যগত হইয়াছে, তখন চৌধুরী মহাশয়ের তাহা দেখিবার সম্ভাবনা কি আছে?

চৌধুরী মহাশয় আবার বলিতে লাগিলেন,—"তোমার অদৃষ্ট ভাল যে আমি এখানে আছি। তুমি অনিষ্ট করিতে যেমন নিপুণ আমি সঙ্গে সঙ্গে তাহা সংশোধন করিতে তেমনই তৎপর। তোমার অদৃষ্ট ভাল যে যখন তুমি মত্ত বুদ্ধির প্রাবল্যে তোমার স্ত্রীর ঘরে চাবি দিয়া মনোরমার ঘরেও চাবি দিতে চাহিয়াছিলে, তখন আমি তাহা করিতে দিই নাই। তোমার কি চক্ষু নাই? মনোরমাকে দেখিয়া তুমি কি বুঝিতে পার না যে, তাহার পুরুষের অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে সাহস ও সাবধানতা আছে? উঁহাকে যদি আমি সহায় পাই তাহা হইলে না করিতে পারি কি জানি না। আর ঐ স্ত্রীলোক যদি আমার শত্রু হয় তাহা হইলে আমি—তোমার দ্বারা শতাধিক বার সমর্থিত চতুর চূড়ামণি জগদীশ নাথ রায় চৌধুরী—আমাকেও বিপদ সাগরে হাবুডুবু খাইতে হয়। এই অত্যদ্ভুত স্ত্রীলোক, এই অতি সাহসসম্পন্না নারী, স্নেহের জন্য সাহসে নির্ভর করিয়া, একদিকে তাহার ক্ষীণ স্বভাবা ভগ্নী এবং অপর দিকে আমরা দুই জন এই উভয় পক্ষের মধ্যে বিরাট গিরির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। স্বার্থের অনুরোধে বটে, কিন্তু তুমি তাহাকে যেরূপ উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছ তাহাতে নিতান্ত বিষময় ফল ফলিবে এবং সে ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রমোদ, তোমার সমস্ত মন্ত্রণা ব্যর্থ হওয়াই উচিত এবং তাহাই হইতেছে।"

কিয়ৎকাল উভয় পক্ষই নীরবে থাকিলেন। এই দুরাত্মার মৎসম্বন্ধীয় এই সকল উক্তি আমাকে স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইতেছে। কি করি, যেরূপ ব্যাপার উপস্থিত, তাহাতে প্রত্যেক কথাই স্থায়ীরূপে লিখিত না থাকিলে, হয়ত ভবিষ্যতে সমস্ত ঘটনার অবিকল ধারা স্মরণে না আসিতে পারে।

রাজা বলিলেন,—"বল আমাকে, যত পার বল; মুখের কথা বলা খুবই সোজা কাজ। কেবলই যদি টাকার ভাবনা ছাড়া আর কোন গোলের কথা না থাকিত তাহা হইলে সকল কথাই মিষ্ট লাগিত। কিন্তু সকল কথা যদি জানিতে তাহা হইলে তুমিও স্ত্রীলোকদিগের উপর আমার মত কঠিন ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারিতে না।"

চৌধুরী বলিলেন,—"ভাল তোমার অপর গোলের বিষয় ক্রমশঃ আলোচনা করা যাইবে। আপাততঃ টাকার কথা উঠিয়াছে, তাহার মীমাংসা আগে শেষ হউক। তুমি নানা কথা সঙ্গে তুলিয়া যত গোল করিতে পার কর, আমি কিন্তু গোলে ভুলিবার ছেলে নই।"

রাজা বলিলেন,—"বুঝিলাম তুমি খুব পাকা লোক। বাজে কথা লইয়া বাহাদুরী করা খুব সোজা কথা, কিন্তু এরূপ স্থলে সদ্যুক্তি স্থির করা তত সোজা কথা নহে। বল দেখি, এখন কর্ত্তব্য কি?"

"কর্ত্তব্য? কর্ত্তব্য স্থির করার ভাবনা কি? আজি হইতে তুমি সমস্ত ভার আমার উপর দেও, দেখ আমি সব ঠিক করিতে পারি কি না।"

"ভাল, যদিই তোমার হাতে সব ভার সমর্পণ করা যায় তাহা হইলে তুমি প্রথমে কি করিবে বল?"

"আগে তুমি আমার কথার উত্তর দাও। আমার হাতে সমস্ত ভার দিলে? বল?"

"ভাল, তোমার হাতেই সব ভার দেওয়া গেল; তাহার পর?"

"আমি প্রথমে বর্ত্তমান ঘটনাবলী বেশ করিয়া জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া ও আলোচনা করিয়া তবে মতলব ঠিক করিব। একটুও সময় নষ্ট করা হইবে না। দেখ মনোরমা দেবী আজি আবার উকীলের নিকট পত্র লিখিয়াছেন, একথা তোমাকে আমি বলিয়াছি।"

"তুমি এ কথা জানিলে কিরূপে ? তাহাতে লিখিয়াছে কি ?"

"তাহা আমি জানিলাম কিরূপে তাহা তোমার জানিবার কোনই দরকার দেখিতেছি না। এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখ যে, আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি এবং সেই জন্য আমি সমস্ত দিন উদ্বিগ্ন আছি বলিয়া তোমার সহিত কোন কথাবার্ত্তা কহিতে সুযোগ পাই নাই। যাউক, এখন মূল প্রসঙ্গ ধরিয়া আলোচনা আরম্ভ করা যাউক। তোমার স্ত্রীর দস্তখত না পাইয়া, অগত্যা অন্য উপায়ে, তিন মাসের মুদ্দতে টাকা ধার করিয়া উপস্থিত দায় উদ্ধার করা হইয়াছে। সে ভয়ানক উপায়ের কথা মনে করিতে হইলেও আমার দরিদ্র দেহ ভয়ে কম্পান্বিত হয়। যাহাই হউক, সেই তিন মাস হইয়া গেলে কি হইবে ? বাস্তবিকই কি তোমার স্ত্রীর স্বাক্ষর ব্যতীত সে সময়ে সে টাকা পরিশোধের আর কোন উপায় নাই ?"

"কিছু না।"

"বল কি ? ব্যাঙ্কে কি তোমার কিছু টাকা জমা নাই ?"

"কয়েক শ মাত্র, কিন্তু আমার তত হাজারের দরকার।"

"বন্ধক দিয়া ধার করিবার মত কোন সম্পত্তিও নাই কি ?"

"এক টুকরাও নাই।"

"তোমার স্ত্রীর নিকট এখন আছে কি ?"

"কিছুই না; কেবল তার দুই লাখ টাকার সুদ, তাতেই কায়ক্লেশে আমাদের সংসার খরচ চলিতেছে।"

"স্ত্রীর নিকট হইতে পাইবার প্রত্যাশা কর কত ?"

"তার খুড়া মরিয়া গেলে বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকা পাইবার ব্যবস্থা আছে।"

"যথেষ্ট সম্পত্তি প্রমোদ ! সে খুড়া লোকটা কেমন ? খুব বুড়া কি ?"

"না—বুড়াও নয়, জোয়ানও নয়।"

"কি রকম স্বভাবের লোক ? বিবাহিত কি ? না না, আমার স্ত্রীর নিকট শুনিয়াছি যেন তিনি বিবাহ করেন নাই।"

"যদি সে বিবাহ করিত এবং তাহার সন্তান থাকিত তাহা হইলে আমার স্ত্রী কখনই তাহার উত্তরাধিকারিণী হইত না। সে একটা স্বার্থপর, পাগলাটে গোছের মানুষ, যে কেহ তাহার নিকট গেলেই সে আপনার শরীরের কথায় তাহাকে জ্বালাতন করিয়া মারে।"

"ঐ রকমের মানুষ কিন্তু অনেক দিন বাঁচে এবং জেদ্ করিয়া হঠাৎ বিবাহ করিয়াও বইসে। সে খুড়ার দরুণ ত্রিশ হাজার টাকার ভরসা এখন ছাড়িয়া দেও। তোমার স্ত্রীর নিকট হইতে আর কিছুই কি তোমার পাইবার সম্ভাবনা নাই ?"

"কিছু না।"

"আদবে কিছুই না ?"

"তার মৃত্যু পর্য্যন্ত আদবে কিছুই না।"

"ওহো ! বুঝিয়াছি।"

কিয়ৎকাল উভয়েই নীরব। চৌধুরী চেয়ার হইতে উঠিয়া বারান্দায় ঘুরিতে লাগিলেন; তাঁহার আওয়াজ শুনিয়া আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম, তিনি বলিলেন,—"বৃষ্টি আসিয়াছে, দেখিতেছি।" বাস্তবিক অনেকক্ষণ

অবধি বৃষ্টি পড়িতেছে, আমার কাপড় চোপড় ভিজিয়া কাদা হইয়া গিয়াছে। চৌধুরী মহাশয় আবার ফিরিয়া আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন, আবার তাঁহার ভারে কাষ্ঠাসন শব্দিত হইল। তিনি বলিলেন,—"তার পর প্রমোদ,—হাঁ—তোমার রাণীর মৃত্যুর পর কি পাইবে?"

"যদি সন্তান না থাকে—"

"থাকার সম্ভাবনা নয় কি?"

"মোটে না।"

"বটে? তাহা হইলে কিরূপ ব্যবস্থা?"

"আমি তাহা হইলে তাঁহার দুই লক্ষ টাকা পাইব।"

"নগদ টাকা—তখনই?"

"নগদ টাকা—তখনই।"

আবার তাঁহারা উভয়েই নীরব। তাঁহাদের কথা সমাপ্তির সঙ্গে এদিকে চৌধুরাণী ঠাকুরাণী জানালার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি তাঁহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। যদি তিনিও আমাকে দেখিতে পান? আমি তো প্রায় তাঁহার সম্মুখেই রহিয়াছি বলিলে হয়! ঘনান্ধকার এবং অত্যন্ত বৃষ্টির জন্যই তিনি আমাকে দেখিতে পাইলেন না বোধ হয়। সেই দারুণ বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে আমি রুদ্ধশ্বাস হইয়া বসিয়া রহিলাম। কিয়ৎকাল পরে তিনি জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন; আমিও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

এদিকে চৌধুরী মহাশয় আবার রাজাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"প্রমোদ! তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার বিশেষ মায়া আছে কি?"

"জগদীশ! তোমার এ কি রকম প্রশ্ন?"

"আমি যে রকম লোক। আমি আবারও ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

"কিন্তু ওকি? তুমি অমন করিয়া রাক্ষসের মত আমার মুখের প্রতি চাহিয়া আছ কেন?

"তবে তুমি আমার কথার উত্তর দিবে না? ভাল, মনে কর এই পূজার পূর্ব্বেই তোমার স্ত্রীর মৃত্যু হইবে।"

"জগদীশ! ও কথা ছাড়িয়া দেও।"

"মনে কর তোমার স্ত্রীর মৃত্যু হইবে—"

"আমি তোমাকে আবার বলিতেছি, ও কথায় এখন আর কাজ নাই।"

"তাহা হইলে তুমি দুই লক্ষ টাকা পাইবে, তোমার ক্ষতি হইবে—"

"বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকার আশা ছাড়িয়া দিতে হইবে।"

"বড় দূর আশা, প্রমোদ—নিতান্ত দূর আশা। তোমার এখনই টাকার দরকার এক্ষেত্রে তোমার লাভ নিশ্চিত, ক্ষতি অনিশ্চিত।"

"আমার সুবিধার কথা যেমন দেখিতেছি, তেমনই আপনার সুবিধার কথাও ভাবিয়া দেখ। টাকার জন্য আমার যে দরকার উপস্থিত হইয়াছে, তাহার অনেকাংশ তোমারই জন্য ধার করা হইয়াছিল, সে কথা মনে আছে তো? আর আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তোমার স্ত্রীও যে এক লক্ষ টাকার অধিকারিণী হইবেন, এ কথা তোমার মত ধূর্ত্ত লোক যে এককালে ভুলিয়া গিয়াছে এরূপ বোধ হয় না। ওকি! আবার এমন করিয়া চাহিতেছ কেন? আমার ও সব ভাল লাগে না। তোমার এরূপ দৃষ্টি দেখিয়া, আর ঐ সকল ভয়ানক প্রশ্ন শুনিয়া আমার শরীর কণ্টকিত হইতেছে।"

"তোমার শরীর কণ্টকিত হইতেছে! সত্য নাকি? তোমার স্ত্রীর মৃত্যু একটা সম্ভাবিত ঘটনা মাত্র, আমিও তাহাই বলিতেছি, তাহাতে ক্ষতি কি? যে সকল অতি গণ্যমান্য উকীল নিয়ত উইল ও অন্যান্য দলিল প্রস্তুত করেন, তাঁহারা তো সততই জীবন্ত মানুষের

মরার কথা আলোচনা করেন। তাহাতে কি তোমার শরীর কণ্টকিত হয়? তোমার অবস্থা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রণিধান করা আমার অন্ত রাত্রের প্রয়োজন। আমার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। যদি তোমার স্ত্রী বাঁচিয়া থাকেন, তাহা হইলে দলিলে তাঁহার নাম সহি করাইয়া লইয়া উপস্থিত দায় উদ্ধার করিতে হইবে। আর যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তোমার প্রাপ্য অর্থ হইতে সে দায় মিটাইতে হইবে।"

এই সময় রঙ্গমতী দেবীর ঘরের আলোক নির্ব্বাপিত হইল। তিনি এতক্ষণে শয়ন করিলেন বোধ হয়।

রাজা ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিলেন,—"বল! মুখের কথা বই তো নয়, যত পার বল! তোমার কথা।শুনিয়া বোধ হইতেছে যেন দলিলে আমার স্ত্রীর নাম সহি হইয়াই গিয়াছে।"

চৌধুরী বলিলেন,—"সে সকল ভার তুমি আমার হাতে ছাড়িয়া দিয়াছ, তবে আর কথা কহ কেন? এখনও আমার সম্মুখে দুই মাসের অধিক সময় আছে। যখন সেই সময় উপস্থিত হইবে, আমি কিছু করিয়া উঠিতে পারি কি না, তখন দেখাইব; সে কথা আপাততঃ যাইতে দেও। টাকার কথা এই স্থানে ছাড়িয়া দিয়া আমি এখন তোমার অপর গোলযোগের কথায় মনঃসংযোগ করিতে প্রস্তুত আছি। যে জন্য আজি কালি তোমার অত্যন্ত ভাবান্তর দেখা যাইতেছে, অতঃপর সে সম্বন্ধে যদি আমাকে তোমার কোন পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায় থাকে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পার।"

রাজা সহজ ও ভগ্ন স্বরে বলিলেন,—"জিজ্ঞাসা তো করিব, কিন্তু কোথা হইতে যে প্রসঙ্গ আরম্ভ করিব তাহাই ভাবিয়া স্থির করা ভার।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন—"আমি তোমার সহায়তা করিব। কি? তোমার এই গুপ্ত উদ্বেগের একটা নাম দেওয়া যাউক। এ ব্যাপারের নাম মুক্তকেশী হউক না কেন?"

"দেখ জগদীশ,আমাদের পরিচয় বহুদিনের। তুমি আমাকে দুই একটা বিপদে বিশেষ সাহায্য করিয়াছ সত্য, কিন্তু অর্থ দ্বারা যত দূর সম্ভব আমি তোমার প্রত্যুপকারের কোনই ত্রুটি করি নাই। আমরা উভয়েই উভয়ের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি; কিন্তু অবশ্যই আমাদের উভয়ের নিকট প্রচ্ছন্ন রাখিবার অনেক বিষয় আছে—নাই কি?"

"তোমার একটী বিষয় আমার অজ্ঞাত ছিল বটে; কিন্তু সংপ্রতি একটী কঙ্কাল মূর্ত্তি তোমার এই রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া, তুমি ছাড়া অন্য লোককেও, দেখা দিয়াছে জানিবে।"

"ভাল যদি তাহা হইয়া থাকে, তাহা হইলে যখন সে বিষয়ের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই, তখন সে জন্য তোমার কৌতূহল হইবার প্রয়োজন কি?"

"সে জন্য আমি কি কৌতূহলী হইয়াছি?"

"হাঁ, তা হইয়াছ বই কি।"

"বটে? তবে আমার মুখ এবার ধরা দিয়াছে দেখিতেছি। কি আশ্চর্য্য কথা! এত বুড়া বয়সেও মনের ভাব মুখের চেহারায় বাহির হইয়া পড়ে! ও কথা যাইতে দেও। শুন রাজা, আমাদের এখন অকপট চিত্তে কথা কহা আবশ্যক। আমি তোমার গুপ্ত বিষয়ের সন্ধান করি নাই, তোমার সেই গুপ্ত বিষয়ই আমার সন্ধান করিয়াছে। ভাল ধর, আমি সে জন্য কৌতূহলী হইয়াছি; কিন্তু আমি

তোমার প্রাচীন বন্ধু, একথা স্মরণ করিয়াও তুমি কি আমাকে তোমার রহস্য ও তজ্জনিত বিভ্রাট সম্পূর্ণরূপে তোমারই হস্তে রাখিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে অনুরোধ কর ?”

“হাঁ, ঠিক তাই আমার মনের ভাব।”

“তাহা হইলে এই মুহূর্ত্ত হইতে আমার কৌতূহলের অবসান ও মৃত্যু হইল জানিবে।”

“বাস্তবিকই কি তোমার মনের তাই সংকল্প ?”

“কেন তুমি আমাকে সন্দেহ করিতেছ ?”

“কারণ জগদীশ, তোমার রমক সকম ও ভাব-ভঙ্গী সম্বন্ধে আমার অনেক অভিজ্ঞতা আছে। তুমি যে কোন না কোন সময়ে আমার নিকট হইতে এ কথা বাহির না করিয়া লইয়া ছাড়িবে, এরূপ আমার বোধ হয় না।”

চেয়ার আবার শব্দিত হইল এবং বারান্দার থামটা কাঁপিয়া উঠিল। চৌধুরী বেগে গাত্রো-ত্থান করিয়া মহা রাগের সহিত থামের গায়ে মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছিলেন। তিনি কম্পিত ও ক্রুদ্ধ স্বরে বলিতে লাগিলেন,—“প্রমোদ ! তুমি কি সত্যই আমাকে কেবল ঐরূপ লোক বলি-য়াই জান ? আমার সম্বন্ধে তোমার এত অভি-জ্ঞতাতেও আমার স্বভাবের কিছুই কি তুমি দেখিতে পাও নাই ? সুযোগ সমুপস্থিত হইলে আমি অতি মহিমান্বিত পুণ্য কর্ম্ম সম্পাদনে সক্ষম তাহা কি তুমি জান না ? দুর্ভাগ্যের বিষয় আমার জীবনে তাদৃশ সুযোগ অতি অল্পই উপস্থিত হইয়াছে। আমার বন্ধুত্ব বোধ অতি উচ্চ ও গাঢ়। তোমার সেই রহস্য সংযুক্ত কঙ্কাল মূর্ত্তি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছে ; সেই জন্য আমার অপরাধ কি ? আমার কৌতূ-হলের কথা আমি স্বীকার করিলাম কেন ? আমি ইচ্ছা করিলে লোকে যেরূপ সহজে গাড়ু হইতে জল ঢালিয়া বাহির করে সেইরূপ ভাবে তোমার নিকট হইতে তোমার রহস্য বাহির করিয়া লইতে পারিতাম। বল তুমি, তাহা আমি পারিতাম কি না ? কিন্তু তুমি আমার বন্ধু এবং বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য সমূহ আমি পবিত্র ও পুণ্যময় বলিয়া বিশ্বাস করি। সেই জন্যই দেখ আমি ঘৃণার্হ কৌতূহলকে পদতলে বিদলিত করিলাম। প্রমোদ, আমার ন্যায় ব্যক্তিকে অবিশ্বাস করিয়া তুমি নিতান্ত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছ ; কিন্তু আমি বন্ধুকৃত, দুর্ব্যবহার কিরূপে ক্ষমা করিতে হয় তাহা জানি। আইস প্রমোদ, তোমার সমস্ত দুর্ব্যবহারের কথা ভুলিয়া তোমাকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া সুখী হই।”

চৌধুরী মহাশয়ের কথার শেষ ভাগের স্বর শুনিয়া বোধ হইল, বাস্তবিকই তাঁহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। রাজা থতমত খাইয়া আমতা আমতা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু চৌধুরী তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন,—“ছি! বন্ধুর নিকট বন্ধুর ক্ষমা প্রার্থনা উভয়ের পক্ষেই নিতান্ত ইতরতার চিহ্ন। ও সকল কথা যাইতে দেও। আমাকে সরল হৃদয়ে বল দেখি, আমার কোন সাহায্যে তোমার প্রয়োজন আছে কি না ?”

“অত্যন্ত প্রয়োজন আছে।”

“তাহা হইলে কোন্ স্থলে তাহার প্রয়োজন অকুণ্ঠিত চিত্তে তুমি তাহা ব্যক্ত করিতে পার।”

“আমি তোমাকে আজি বলিয়াছি যে মুক্ত-কেশীর সন্ধানের জন্য যতদূর সম্ভব চেষ্টা করি-য়াছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই।

“এ কথা তুমি আমাকে বলিয়াছ বটে।”

“জগদীশ ! যদি তাহার সন্ধান না পাওয়া যায় তাহা হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে।”

“বটে ? এটা তা হলে কি ভয়ানক কথা ?”

“একটু আলো বারান্দার নীচে ঘাসের উপর নড়িতে লাগিল। আমার বোধ

হইল, চৌধুরী মহাশয় রাজার মুখের ভাব সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য পুস্তকালয়ের মধ্যস্থলস্থিত আলোক বাহির করিয়া আনিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"হাঁ, তোমার মুখের ভাব দেখিয়া বিস্ময়টা যে নিতান্ত গুরুতর তাহা আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। অর্দ্ধ-ঘটিত ব্যাপারও যেমন ভয়ানক, ইহাও দেখিতেছি তেমনই।"

"অধিকতর ভয়ানক! তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, কোন ব্যাপারই এ ব্যাপারের তুল্য নহে।"

চৌধুরী আলোক যথাস্থানে রাখিয়া আসিলেন বোধ হইল। রাজা বলিলেন,—"মুক্তকেশী বালির মধ্যে আমার স্ত্রীর উদ্দেশে যে চিঠি লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা আমি তোমাকে দেখাইয়াছি। জগদীশ সে পত্রে কোন বৃথা জাঁকের কথা নাই; সুতরাং সহজেই অনুমান হইতেছে যে, সে নিশ্চয়ই আমার গুপ্ত রহস্য জানে।"

"আমাকে সে রহস্যের কথা জানাইয়া কাজ নাই। আমি কেবল জানিতে চাহি, সে কথা সে কোথা হইতে জানিল।"

"সে তাহার মাতার নিকট হইতে জানিয়াছে।"

"এঃ! বড় মন্দ সংবাদ! দুই জন স্ত্রীলোক একটা গুপ্ত কথা জানা ভাল নহে! দাঁড়াও, আর একটা কথা অগ্রে জিজ্ঞাসা করি। মুক্তকেশীকে পাগলা গারদে আট্কাইয়া রাখার অভিপ্রায় আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি; কিন্তু সে কেমন করিয়া সেখান হইতে পালাইল তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। যাহাদের উপর তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল তাহারা অপর কোন ব্যক্তির প্ররোচনায় ইচ্ছাপূর্ব্বক অসাবধান হইয়া মুক্তকেশীর পলায়নের সুযোগ করিয়া দিয়াছে এরূপ সন্দেহ তোমার মনে হয় কি?"

"না; তাহার কোন দৌরাত্ম্য ছিল না এবং রক্ষকেরা তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিত। সে যে পূরাপূরি পাগল এমন কথা বলা যায় না। পাগল বলিয়া তাহাকে আট্কাইয়া রাখা যাইতে পারে বটে, কিন্তু যদি স্বাধীনতা পায় তাহা হইলে সুবোধ মনুষ্যের মত সহজ কথায় সহজেই আমার সর্ব্বনাশ ঘটাইতে পারে।"

"বুঝিয়াছি। এ অবস্থায় তোমার বিপদের সম্ভাবনা কি আছে তাহা আমাকে অগ্রে বুঝাইয়া দেও, তাহার পর আমি কর্ত্তব্য স্থির করিব।"

"মুক্তকেশী নিকটেই আছে এবং রাণীর সহিত তাহার দেখা সাক্ষাৎ ও পত্র লেখালেখি চলিতেছে—আর বিপদের বাকী কি? আমার স্ত্রী যতই কেন অস্বীকার করুক না, বালিতে লুকান সেই পত্র পাঠ করিয়া কে বলিবে যে সে গুপ্ত কথা এখনও আমার স্ত্রী জানিতে পারে নাই?"

"দাঁড়াও, প্রমোদ! যদিই রাণী সে রহস্য জানিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন যে, সে কথা তোমার পক্ষে নিতান্ত হানিজনক। তিনি তোমার স্ত্রী, সে কথা তিনি কখনই ব্যক্ত করিবেন না।"

"বটে! সে কথাও তোমাকে বলিতেছি শুন। যদি আমার প্রতি তাহার কিছু মাত্র অনুরাগ থাকিত, তাহা হইলে আমার হানিজনক রহস্য প্রচ্ছন্ন রাখাই সে স্বার্থের অনুকূল বলিয়া জ্ঞান করিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি অপর একজনের পথের কণ্টক মাত্র। দেবেন্দ্র নামে একটা হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া মাষ্টারকে আমার সহিত বিবাহ হইবার পূর্ব্ব হইতে

সে ভাল বাসিত—এখনও তাহাকে ভাল বাসে।

"তাহা হইলই বা ভাই? ইহাতে ক্ষতিই বা কি? বিস্ময়ের কারণই বা কি? কে কোথায় স্ত্রী-হৃদয়ের প্রথম অধিকারী হইয়াছে! আমার এত বয়স হইল, সংসারের এত দেখিলাম শুনিলাম, কিন্তু কই, প্রথম সংখ্যক প্রেমিক আমি তো দেখি নাই? দুইয়ের নম্বর দুই একটা দেখিয়াছি বটে। তিনের, চারের, পাঁচের নম্বর অনেক দেখিয়াছি। একের নম্বর একজন করিয়া আছে বটে, কিন্তু আমি তো কখন তাহার দেখা পাই নাই।"

"থাম, আমার কথা এখনও শেষ হয় নাই। মুক্তকেশী যখন পলাইয়া যায় তখন কে তাহার সহায়তা করিয়া তাহাকে অনুসরণকারীদের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিল জান? আনন্দধামে মুক্তকেশীর সহিত কে আবার দেখা করিয়াছিল জান? ঐ দেবেন্দ্র। দুইবার সে একাকী তাহার সহিত কথা-বার্ত্তা কহিয়াছিল। এই নরাধম আমার স্ত্রীকে যেমন ভালবাসে, আমার স্ত্রীও তাহাকে তেমনই ভালবাসে। সেও এই গুপ্ত কথা জানে, আমার স্ত্রীও তাহা জানে। এই দুই জন একবার একত্র হইলেই, আপনাদের ইষ্টের জন্য, সেই গুপ্ত সংবাদের সহায়তায়, আমার সর্ব্বনাশ করিবে তাহার আর সন্দেহ কি?"

"এও কি হইতে পারে, প্রমোদ? রাণীর এত ধর্ম্ম জ্ঞান থাকিতে এমন কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্ভব কি?"

"রেখে দেও তোমার ধর্ম্মজ্ঞান? রাণীর টাকা ছাড়া কি আছে না আছে আমি জানি না। ব্যাপারটা কি তুমি দেখিতে পাইতেছ না? হইতে পারে রাণী নিজে খুব নিরীহ লোক, কিন্তু যদি রাণী এবং সেই হতভাগা দেবেন্দ্র—"

"হাঁ, হাঁ, আমি বুঝিয়াছি। কিন্তু দেবেন্দ্র এখন আছে কোথায়?"

"ওঃ, সে এখন বলিতে গেলে, এদেশেই নাই। যদি তাহার বাঁচিবার সাধ থাকে, তবে যেন সে শীঘ্র এদেশে না ফিরিয়া আইসে।"

"তুমি নিশ্চিত জান সে অনেক দূরে আছে?"

"নিশ্চয়। তাহার আনন্দধাম হইতে চলিয়া আসার পর হইতে, এদেশ হইতে প্রস্থান কাল পর্য্যন্ত নিয়ত তাহার পশ্চাতে আমি লোক লাগাইয়া রাখিয়াছিলাম। আমি সাবধানতার কোনই ত্রুটি করি নাই। মুক্তকেশী শক্তিপুরের নিকটেই একটা খামার বাড়ীতে ছিল। আমি তাহার সন্ধানে সেখানে নিজে গিয়াছিলাম। যাহাতে মুক্তকেশীকে আবদ্ধ রাখায়, দুরভিসন্ধির পরিবর্ত্তে আমার মহত্ত্বই ব্যক্ত হয়, এইরূপ ভাবে মনোরমা দেবীকে লিখিবার জন্য এক খানি পত্রের রচনা করিয়া মুক্তকেশীর মাতার নিকট রাখিয়া দিয়াছিলাম। তাহার সন্ধানের জন্য কতই যে অর্থব্যয় করিয়াছি তাহার আর কি বলিব? এত সাবধানতা সত্ত্বেও সে এখন আবার কোথা হইতে আসিয়া আমারই জমিদারীর মধ্যে বেড়াইতেছে! কেমন করিয়া জানিব, কত লোকের সঙ্গে হয়ত তাহার দেখা হইতেছে এবং কত লোকই হয়ত তাহার সহিত কথা কহিতেছে! সেই সর্ব্বনেশে দেবেন্দ্রটা হয়ত আমার অজ্ঞাত সারে আসিয়া পড়িতে পারে এবং কালিই মুক্তকেশীর সহিত মিলিয়া—"

"তাহার ক্ষমতায় তাহা আর হইতেছে না। যখন আমি এক্ষেত্রে উপস্থিত আছি এবং মুক্তকেশী এ অঞ্চলেই আছে, তখন যদিই দেবেন্দ্র

ফিরিয়া আইসে, তবুও তাহার আর কিছু করিতে হইবে না। এখন মুক্তকেশীকে খুঁজিয়া বাহির করাই আমাদের প্রথম আবশ্যক ; অন্যান্য বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তোমার স্ত্রী আমার মুঠার মধ্যেই আছেন ; মনোরমা দেবী কোন ক্রমেই তোমার স্ত্রীর কাছ ছাড়া হইবেন না; সুতরাং তিনিও তোমার মুঠার মধ্যেই আছেন ; আর দেবেন্দ্র বাবু তো বিদেশে। এখন কেবল এই অদৃশ্য মুক্তকেশীই আমাদের প্রধান ভাবনার বিষয়। তুমি এ বিষয়ে যতদূর সন্ধান করিবার সব করিয়াছ তো ?"

"হাঁ ! আমি তার মার কাছে গিয়াছি ; গ্রামে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছি—কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইয়াছে।"

"তার মা কি বিশ্বাস করিবার মত লোক ?

"হাঁ।"

"সে তো একবার গুপ্তকথা বলিয়া ফেলিয়াছে।"

"আর বলিবে না।"

"কেন ? একথা ব্যক্ত না করায় তার কোন স্বার্থ আছে কি ?"

"বিশেষ স্বার্থ আছে।"

"ভাল কথা। প্রমোদ, তুমি হতাশ হইও না। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি টাকার ভাবনা ভাবিবার এখনও দেরি আছে। আমি কালি হইতে মুক্তকেশীর সন্ধান করিব এবং তোমাদের অপেক্ষা কৃতকার্য্য হইব। এখন আর একটা জিজ্ঞাস্য আছে।"

"কি ?"

"আপাততঃ দলিলে নাম সহি করিতে হইবে না, এই সংবাদ রাণীকে দিবার জন্য যখন আমি কাঠের ঘরে যাই, তখন ঘটনাক্রমে দেখিতে পাই যে একটা স্ত্রীলোক, কেমন সন্দেহজনক ভাবে রাণীর নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া যাইতেছে। আমি তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই। মুক্তকেশীকে চিনিতে পারিব কিরূপে তাহা আমার জানা আবশ্যক ; সে দেখিতে কিরূপ ?"

"হাঃ হাঃ ! আমি এক কথায় তোমাকে তাহা বুঝাইয়া দিতেছি। সে আমার স্ত্রীর পীড়িত ও রুগ্ন রূপান্তর মাত্র।"

আবার চেয়ারের শব্দ হইল এবং আবার থাম কাঁপিয়া উঠিল। চৌধুরী মহাশয় বোধ হয় এবার সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। নিতান্ত আগ্রহের সহিত তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"বল কি ?"

রাজা উত্তর দিলেন,—"একটা কঠিন পীড়ার পরে আমার স্ত্রীর আকৃতি কিরূপ দাঁড়াইবে একবার কল্পনা কর ; সেই আকৃতিতে একটু মাথা পাগ্‌লা রকম যোগ কর, তাহা হইলে মুক্তকেশী কি ঠিক বুঝিতে পারিবে।"

"উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে কি ?"

"কিছু মাত্র না।"

"তথাপি এরূপ সাদৃশ্য ?"

"হাঁ, অদ্ভুত সাদৃশ্য। কিন্তু তুমি হাসিতেছ কেন ?"

কোন উত্তরও নাই, কোন শব্দও নাই। সময়ে সময়ে চৌধুরী মহাশয় যেরূপ নিঃশব্দে হাসিয়া থাকেন, বোধ হয় এখন সেইরূপেই হাসিতেছিলেন।

রাজা আবার সজোরে জিজ্ঞাসিলেন,—"ভাল, তুমি এত হাসিতেছ কেন ?"

"সে কথায় তোমার কাজ কি, বাবা ? আমি বাঙ্গাল—কখন হাসি, কখন কাঁদি তাহার তুমি কি বুঝিবে ? যাউক, মুক্তকেশী আমার চক্ষে পড়িলে আর তাহাকে আমার চিনিতে ভুল হইবে না। এখন যাও—নিশ্চিন্ত

মনে ঘুমাও গিয়া। দেখিও প্রাতে আমি কি করিয়া উঠি। আমার এই অতি প্রকাণ্ড মাথার মধ্যে অনেক মতলব আছে। তোমার টাকার গোলও মিটিয়া যাইবে, মুক্তকেশীকেও পাওয়া যাইবে, এ বিষয়ে আমি তোমাকে শপথ করিয়া আশ্বাস দিতেছি। এখন বল, আমার ন্যায় বন্ধু হৃদয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থানে সংস্থাপিত থাকিবার উপযুক্ত কি না? এখনই তুমি কৌশলে আমার টাকা ধারের কথা উল্লেখ করিয়াছ; এখন ভাবিয়া দেখ দেখি আমি তাহার যোগ্য কি না। আর যাহা কর প্রমোদ, আমাকে অকারণ আর কখন মনঃপীড়া দিও না। আইস, আমি তোমার সহিত কোলাকুলি করিয়া তোমাকে আবার ক্ষমা করিতেছি। যাও, এখন শয্যায় গিয়া শয়ন কর।"

আর কেহ কোন কথা কহিলেন না। তাঁহারা পুস্তকালয়ের দরজা বন্ধ করিলেন শুনিতে পাইলাম। এতক্ষণ কি বৃষ্টিই হইল, এখনও বৃষ্টি থামে নাই। ওঃ আমার হাতে পায়ে—সর্ব্বাঙ্গে কি ভয়ানক ঝিঁ ঝি ধরিয়াছে। একি দাঁড়াইতে পারি না যে। অনেকক্ষণ যত্ন করিয়া তবে দাঁড়াতে পারিলাম। কষ্টে সৃষ্টে ও সন্তর্পণে যখন নিজের ঘরে আসিয়া পৌঁছিলাম তখন রাত্রি প্রায় দেড়টা। আমার বারান্দা হইতে চলিয়া আসার সময়ে কেহ আমাকে দেখিতে পাইয়াছে, বা কিছু বুঝিতে পারিয়াছে এমন কোনই সন্দেহের কারণ আমি বুঝিতে পারিলাম না।

—*—

নবম পরিচ্ছেদ।

—*—

২৩শে জ্যৈষ্ঠ।—প্রাতঃকালে আকাশ বেশ খোলসা হইয়াছে। আমি সমস্ত রাত্রির মধ্যে একটি বারও বিছানার নিকটে যাই নাই, একটি বারও চক্ষু বুঝি নাই—মেজেতেই পড়িয়া আছি। কতক্ষণ সেখানে আছি তাহা ঠিক জানি না। বোধ হয় বারান্দা হইতে আসার পর এখানেই পড়িয়া আছি। সময়ের কোন বোধ আমার নাই। রাত্রি দেড়টার সময় আমি ঘরের মধ্যে আসিয়াছি, কিন্তু বোধ হইতেছে যেন কত সপ্তাহই আমি এই অবস্থায় পড়িয়া আছি। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে কি বেদনা! এ দারুণ গ্রীষ্মের দিনে একি শীত! আমার শরীরে যে আর তৃণেরও শক্তি নাই। একি, আমি কি সেই আমি?

রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত এইরূপে পড়িয়া থাকার পর আমার শরীরের বিশেষ ভাবান্তর হইতে আরম্ভ হইল। তখন শীতের পরিবর্ত্তে অতিশয় উত্তাপ বোধ হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীর ও মস্তিষ্কের শক্তিও পুনরায় ধীরে ধীরে দেখা দিল। তখন এ ভয়ানক স্থান হইতে যত শীঘ্র সম্ভব লীলাকে লইয়া পলায়ন করিবার সংকল্প করিলাম। এই দুই নরপ্রেতের নৈশ আলাপের সমস্ত কথা, এই সময়ে মনে জাগরূক থাকিতে থাকিতে, লিপিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত আমার বিশেষ আগ্রহ হইল। তাহার পর আমি অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া বাতি জ্বালিলাম এবং কাপড় ছাড়িয়া লিখিতে বসিলাম। এ পর্য্যন্ত আমার কথা বেশ মনে আছে। তাহার পর অবিশ্রান্ত, দ্রুত, সতেজ

ভাবে কলম চালাইতে থাকি। তখন ভোর হয় নাই, তখন বাটীর লোক জাগে নাই!

কিন্তু এখন এত বেলা পর্য্যন্ত, আমি এখানে বসিয়া কেন? এখনও আরও লিখিয়া কাতর মস্তিষ্ককে আরও ক্লান্ত করিতেছি কেন? কেন শয়ন করিয়া বিশ্রাম করি না? কেন নিদ্রার দ্বারা এ দাহনকারী জ্বরের উগ্রতা নষ্ট করি না?

সে চেষ্টা করিতে আমার সাহস হয় না। একটা অতি দুরন্ত ভয় আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। এই যে দারুণ উত্তাপে আমার শরীর পুড়াইয়া ফেলিতেছে, তাহার জন্য আমি ভীত বটি, আমার মাথার মধ্যে যে ভয়ানক যন্ত্রণা হইতেছে তাহার জন্য আমি ভীত নহি। কিন্তু এখন যদি আমি শয়ন করি তাহা হইলে হয়ত আর আমার উঠিবার মত শক্তি হইবে না, এই ভয়ই সকল ভয়ের অপেক্ষা প্রধান!

* * * *

বাজিল কটা—আটটা না নটা? নটা হবে হয়ত। এ কি, আবার আমার এমন কম্প আরম্ভ হইল কেন? ওঃ পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল যে! একি, এখানে এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছি নাকি? কি জানি বসিয়া বসিয়া কি করিতেছি। হে ভগবন্! আমাকে কঠিন পীড়াগ্রস্ত করিতেছ কি? এইরূপ দুঃসময়ে পীড়া।

এঃ মাথার মধ্যে কি হইল? মাথার জন্য যে বড় ভয় হইতেছে। এখনও লিখিতে পারি, কিন্তু ছত্রগুলা মিশিয়া যাইতেছে। লীলা——লীলার নামটা আমি লিখিয়াছি। লীলা। বাজিল কটা—আটটা, না নটা?

কি বৃষ্টি! ওঃ! আমার মাথার ভিতরে খট্ খট্ করিতেছে—

* * * *

মন্তব্য

[এই স্থান হইতে দিনলিপি আর পড়া যায় না। ইহার পরেও যে দুই তিন পঙ্‌ক্তি লিখিত আছে, তাহাতে সম্পূর্ণ কথা একটীও নাই। কথার অংশ বিশেষ লিখিত আছে মাত্র, তাহাও নিতান্ত অস্পষ্ট এবং কালী ও কলমের অনেক দাগ সংযুক্ত। শেষ কথাটী যেন লীলা বলিয়া বোধ হয়।

পর পৃষ্ঠায় এক অপরিচিতপূর্ব্ব লেখা দেখা যাইতেছে। লেখাটী বড় বড়, সমস্থূল ও সমশীর্ষ—যেন পুরুষের হস্তলিখিত এবং ২১শে জ্যৈষ্ঠ, এই তারিখ যুক্ত। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।]

একজন অকৃত্রিম বন্ধু লিখিত উপসংহার।

আমাদের গুণবতী মনোরমা দেবীর পীড়া হওয়ায় আমার এক অপূর্ব্ব মানসিক সুখ-সম্ভোগের সুযোগ সমুপস্থিত হইয়াছে। আমি এই সংপ্রতি অধীত মনোজ্ঞ দিনলিপির উল্লেখ করিতেছি। ইহা বহু শত পৃষ্ঠাত্মক। আমি হৃদয়ে হস্তার্পণ করিয়া অকপটচিত্তে ঘোষণা করিতে পারি যে, তন্মধ্যস্থ প্রতি পৃষ্ঠাই আমাকে মুগ্ধ, আনন্দিত ও পুলকিত করিয়াছে। প্রশংসনীয় রমণী! মনোরমা দেবীর কথা বলিতেছি। বিরাট কীর্ত্তি! দিনলিপির কথা বলিতেছি।

বস্তুতই এই সকল পৃষ্ঠা বিস্ময়জনক। ইহাতে যে কৌশল, বিচার-শক্তি, অসাধারণ সাহস, অনন্যসাধারণ স্মৃতিশক্তি, মানব-চরিত্র পর্য্যবেক্ষণের সুতীক্ষ্ণ ক্ষমতা, রচনার সরল সুন্দর ভঙ্গী, হৃদয়ভাবের স্ত্রীজনোচিত মুগ্ধকর উচ্ছ্বাস পরিদৃষ্ট হইতেছে, তৎসমস্তই আমাকে এই মহান্ মহাপ্রাণীর—এই অপার্থিব মনোরমা সুন্দরীর স্তাবক করিয়া তুলিয়াছে। তন্মধ্যে আমার যে চরিত্র বিবৃত হইয়াছে, তাহা অত্যদ্ভুত ক্ষমতার পরিচায়ক। আমার সেই চরিত্র যে সম্পূর্ণরূপ হইয়াছে, তৎপক্ষে আমার অন্তরে কোনই সন্দেহ নাই। আমি যখন এতাদৃশ সমুজ্জ্বল, মূল্যবান্ ও প্রকৃষ্ট বর্ণে বিচিত্রিত হইয়াছি তখন অবশ্যই আমি লেখিকার হৃদয়ে মৎসম্বন্ধে বিশদ স্থায়ীভাব সমুৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমি নিতান্ত বিষণ্ণ হৃদয়ে ব্যক্ত করিতেছি যে, নিদারুণ প্রয়োজনানুরোধে আমাদিগকে বিরুদ্ধ পথে স্বার্থান্বেষণ করিয়া পরস্পরের প্রতিকূলতাচরণ করিতে হইতেছে। অপেক্ষাকৃত সুখময় সময় সমুপস্থিত হইলে, আমি মনোরমা দেবীর না জানি কতই হৃদয়ানন্দ সংবৰ্দ্ধনে সমর্থ হইতাম—মনোরমা দেবীও না জানি আমার কতই হৃদয়ানন্দ বৰ্দ্ধনে সমর্থ হইতেন

যে অপূৰ্ব্ব ভাবে অধুনা আমার হৃদয় অনুপ্রাণিত তাহাতে অসত্যের স্থান থাকিতে পারে না; অতএব পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি তৎসমস্তই গভীর সত্যময়।

সেই অপূর্ব্ব ভাবের প্রাবল্যে আমার হৃদয়ে কোন ব্যক্তিগত শক্রতার অবকাশ নাই। আমি সংপ্রতি স্বার্থ চিন্তা বিসর্জন দিয়া অকপট হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, প্রমোদ এবং আমার গুপ্ত কথোপকথন শুনিবার নিমিত্ত এই অতুলনীয় কামিনী যে কৌশলাবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা নিরতিশয় প্রশংসার্হ এবং তাঁহার তৎসন্ধীয় লিখিত বৃত্তান্ত আমূল বর্ণে বর্ণে সত্য।

সেই অপূর্ব্ব ভাবের প্রাবল্যে, আমি মনোরমা দেবীর রোগ শান্তির নিমিত্ত, আমার রসায়ন শাস্ত্র সংক্রান্ত প্রগাঢ় জ্ঞান এবং চিকিৎসা ও তাড়িত চৌম্বকীয় শাস্ত্র মানবজাতির কল্যাণার্থে যে সমস্ত কৌশল আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছে আমার তৎসমূহের অভিজ্ঞতা দ্বারা নির্ব্বোধ চিকিৎসকের সহায়তা করিতে প্রস্তুত। দুর্ভাগ্য ডাক্তার এখন পর্য্যন্ত আমার উপদেশ গ্রহণে অনিচ্ছুক।

সেই অপূর্ব্ব ভাবের প্রাবল্যে আমি এই স্থলে এই কয় কৃতজ্ঞতাপূর্ণ, সহানুভূতিপূর্ণ এবং স্নেহপূর্ণ পঙ্ক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। দিনলিপি বন্ধ করিলাম। ন্যায় ও কর্ত্তব্য বোধের বশবর্ত্তী হইয়া এই পুস্তক আমি আমার পত্নীর দ্বারা লেখিকার টেবিলের উপর পুনঃস্থাপিত করাইয়া রাখিলাম। ঘটনাচক্র আমাকে সবেগে প্রধাবিত করাইতেছে। কৃত-কর্ম্মাবলী ভয়ানক পরিণাম সমূহ সমুৎপন্ন করিতেছে। সফলতার প্রভূত দৃশ্যাবলী আমার নেত্রসম্মুখে নিরন্তর উন্মুক্ত হইতেছে। আমি নিমিত্ত কারণরূপে ধীরভাবে বিধিলিপি সম্পন্ন করিতেছি মাত্র। কেবল প্রশংসাবর্ষণ ব্যতীত আর কিছুতেই আমার অধিকার নাই, আমি সম্মান ও স্নেহের সহিত তাহা মনোরমা দেবীর পাদপদ্মে সমর্পণ করিতেছি। প্রার্থনা করি তিনি শীঘ্র রোগ মুক্ত হউন।

মনোরমা দেবী ভগ্নির হিতকামনায় যে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তৎসমস্তের বিফলতা হেতু আমি নিতান্ত দুঃখিত। তাঁহার দিনলিপি দেখিতে পাওয়ায় তাঁহাকে বিফল-প্রযত্ন করিবার বিন্দুমাত্রও সুযোগ হইয়াছে, এ কথা যেন

তিনি কদাপি মনে না করেন, ইহাই আমার সানুনয় অনুরোধ। দিনলিপি পাঠের পূর্ব্বে আমি যে যে সংকল্প করিয়াছি, অধুনা তাহাই অধিকতর দৃঢ় হইয়াছে মাত্র।

জগদীশ।

শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের কথা। *

(নিবাস—আনন্দধাম। ব্যবসায় জমিদারী।)

কি জ্বালাতেই পড়িয়াছি গা! আমাকে কি কেহই একটু সুস্থির হইয়া থাকিতে দিবে না? কেন আমি কি কাহারও পাকা ধানে মই দিয়াছি? জ্ঞাতি কুটুম্ব, আত্মীয় বন্ধু, চেনা অচেনা যে যেখানে আছে, আমাকে জ্বালাতন করাই সকলের কাজ। কেন দুনিয়ার লোক আমার উপর এমন করিয়া লাগিয়াছে, কেহ বলিতে পার কি গা?

এ পর্য্যন্ত লোকে আমাকে যত প্রকারে জ্বালাতন করিয়াছে, তাহার চূড়ান্ত এইবার উপস্থিত। আমাকে বলে কি না, গল্প লিখিয়া দিতে হইবে! কি সর্ব্বনাশ! আমার মত দুর্ভাগা, চিররোগী লোক কি কখন গল্প লিখিতে পারে? সে কথা শুনে কে? তাহারা বলে আমার ভাইঝি সংক্রান্ত কতকগুলি গুরুতর ঘটনা আমার জ্ঞাতসারে ঘটিয়াছে; তাহার বৃত্তান্ত আমাকেই লিখিতে হইবে। যদি না লিখি তাহা হইলে তাহারা আমাকে যে ভয় দেখাইতেছে তাহা মনে করিতে হইলেও আমি অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি। এমন দায়ে কি কখন কেহ পড়ে? দেখি যতদূর পারি। আমার ছাইও মনে নাই। তবু ছাড়িবে না। কি বালাই গা?

সময় মনে করিব কেমন করিয়া? আমার জীবনে কখন সে কর্ম্ম আমার দ্বারা ঘটে নাই। আরম্ভ করিব কোথা হইতে? আমার চাকর মদীনকে জিজ্ঞাসা করিলাম। লোকটাকে যত গাধা মনে করিয়াছিলাম, সে তত গাধা নয় দেখিতেছি। ভাল ভাল, তাহার দ্বারা কতক সাহায্য পাইব বোধ হইতেছে। দেখি, দুই জনে মিলিয়া কতদূর কি করিয়া উঠিতে পারি।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসেই বোধ হয়, আমি একদিন তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া আমার প্রিয় কার্য্যের ভাবনা ভাবিতেছি, অর্থাৎ জগতের হিতের জন্য একখানি প্রাচীন পুঁথির টীকা করিবার উপায় চিন্তা করিতেছি। সেই গ্রন্থের টীকা প্রস্তুত হইলে মনুষ্যের জ্ঞান ও উন্নতির এক অত্যুৎকৃষ্ট অভিনব সোপান উন্মুক্ত হইবে তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই। হায় হায়! এইরূপে মানব জাতির প্রভূত হিতসাধন করা যাহার নিরন্তর চিন্তার বিষয়, তাহার শান্তি ও সুখের জন্য প্রতিনিয়ত ব্যাকুল না থাকিয়া, লোকে কিনা দিবারাত্রি তাহাকে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া মারে! অহো! মনুষ্য জাতি কি উন্নতির বিরোধী! তাহারা কি নির্ব্বোধ!

হাঁ—সেইরূপে একাকী বসিয়া আমি চিন্তামগ্ন রহিয়াছি, এমন সময় রামদীন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে ডাকি নাই, তখন তাহাকে আমার কোন দরকার নাই, তবু দেখ দেখি হতভাগা আসিয়া আমার সমস্ত চিন্তাগ্রন্থি ছিঁড়িয়া দিয়া তবে ছাড়িল! কি বালাই! আমি রাগত হইয়া

---

* রায় মহাশয়ের কথা এবং ইহার পশ্চাদ্বর্ত্তী আরও কয়েকটী কথা যেরূপ সংগৃহীত হইয়াছে তাহা পরে বিবৃত হইবে।

জিজ্ঞাসিলাম,—"তুই হতভাগা ! এখন মরিতে আইলি কেন ?" সে বুঝাইয়া দিল একজন স্ত্রীলোক আমার সহিত দেখা করিবার জন্য বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। কি গ্রহ ! সে স্ত্রীলোকের নাম গিরিবালা। আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"গিরিবালা লোকটা কে ?"

রামদীন উত্তর দিল,—"রাণী ঠাকুরাণীর দাসী !"

"রাণী ঠাকুরাণীর দাসী, তা আমার কাছে কেন ?"

"একখানি চিঠি—"

"নিয়ে এস।"

"হুজুরের হাতছাড়া আর কাহাকেও সে তাহা দিতে চাহে না।"

"কে সে চিঠি পাঠাইয়াছেন ?",

"আজ্ঞে, মনোরমা ঠাকুরাণী।"

তবেই সর্ব্বনাশ ! মনোরমাকে চটাইলে যে বেজায় গোলের বৃদ্ধি হইবে তাহা আমার বেশ জানা আছে, কাজেই মনোরমার কাজের উপর কথা চলে না। আমাকে বলিতে হইল,—"রাণী ঠাকুরাণীর দাসীকে আসিতে দেও। হাঁ, দাঁড়াও দাঁড়াও। সে দাসীর গায়ে কোন অলঙ্কার আছে কি ? তাহাদের হাতে প্রায়ই রূপার না বেলোয়ারের চুড়ী থাকে ; তাতে বড় শব্দ হয়।"

এ সকল কথা আগে জানিয়া সাবধান হওয়া ভাল ; কারণ ঐ সকল শব্দে আমার ভয়ানক মাথা ধরিয়া উঠে এবং সে মাথা ধরা সারাদিনে ছাড়ে না। রামদীন আমাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে দাসীর হাতে দুই গাছি সোণার বালা ছাড়া আর কোন অলঙ্কার নাই। তাহার পর রামদীন তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিল। বাঁচিলাম, চুড়ির হাতে চুড়ি ঠুং ঠুং করে না। আচ্ছা তোমরা কেহ বলিতে পার কি এই সব দাসীগুলা সুশ্রী হয় না কেন ? আমি স্বয়ং এ শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা করি নাই, এজন্য মীমাংসা করিতে অক্ষম। তোমরা কেহ কিছু জান কি ? আমি দাসীকে জিজ্ঞাসিলাম,—"তুমি মনোরমার কাছ থেকে চিঠি আনিয়াছ ? ঐ টেবিলের উপর চিঠিখানি রাখিয়া দেও। দেখিও সাবধান, কোন শব্দ না হয়, কোন সামগ্রী যেন না নড়ে চড়ে। মনোরমা কেমন আছেন ?"

"ভাল আছেন।"

"আর লীলাবতী রাণী ?"

আর উত্তর নাই। দেখিলাম তাহার মুখখানা কেমন বিকট হইয়া উঠিল এবং আমার বোধ হয় সে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। আমি তাহার চক্ষুর নিকটে তরল পদার্থ বিশেষ দেখিয়াছি সন্দেহ নাই। ঘাম না চক্ষের জল ? একবার রামদীনকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলে চক্ষের জল। তবে তাই। কিন্তু অশ্রু পদার্থটা কি ? বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেছে অশ্রু এক প্রকার দৈহিক রস। এই রস স্বাস্থ্য বা অস্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় হইতে পারে, এ কথা আমি বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু মনের ভাব বিশেষের জন্য অঙ্গ বিশেষ হইতে যে রস নিঃসৃত হয়, সে যে কি ব্যাপার তাহা আমি কিছুতে বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, রসের কথায় আর কাজ নাই। আমি তাহার রস উথলাইয়া উঠিল দেখিয়া চক্ষু বুঁজিয়া পড়িয়া রহিলাম এবং রামদীনকে বলিলাম,—"কাণ্ডটা কি বুঝিয়া লও।"

রামদীন কাণ্ড বুঝিতে গিয়া প্রকাণ্ড গোলের সৃষ্টি করিল, এও বুঝিতে পারে না, সেও বুঝাইতে পারে না। বলিব কি,

তাহাদের এই গোলমালে আমার অসুখ না বাড়িয়া, বড় আমোদ বোধ হইল। আমি অতঃপর যখন মানসিক অবসাদগ্রস্ত হইব, তখন এই তামাসা দেখিবার জন্য, তাহাদের উভয়কে ডাকিয়া পাঠাইব স্থির করিয়াছি। যাহা হউক, আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীর দাসী অশ্রুর যে কারণ রামদীনকে বুঝাইয়া দিল এবং রামদীন তাহা আমার নিকট যেরূপে ব্যাখ্যাত করিল সে সমস্ত লিপিবদ্ধ সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি নিজে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই এ স্থানে লিখিতে পারি। তোমরা তাহাতেই রাজি আছ তো? কৃপা করিয়া বল হাঁ, নচেৎ আমি মারা যাইব।

সে রামদীনের মারফতে আমাকে যাহা বলিল তাহাতে আমি বুঝিলাম, তাহার প্রভু তাহাকে কর্ম্ম হইতে জবাব দিয়াছেন। দেখ অন্যায় অত্যাচার! তাহার প্রভু তাহাকে কর্ম্ম হইতে জবাব দিয়াছেন, সে দোষ কি আমার? তবে আমাকে সে কথা বলিয়া ত্যক্ত করে কেন বাপু? এ তোমাদের কোন্ দেশী বিবেচনা? কর্ম্মে জবাব হওয়ার পর সে এক বৃদ্ধার বাটীতে রাত্রি যাপন করিয়াছে। সে কথা আমাকে বলিবার দরকার? আমি কি সেই বৃদ্ধা, না জবাবের পর সে কোথায় ছিল সেই ভাবনায় আমার রাত্রে ঘুম হয় না? পরদিন বেলা তিনটা কি চারিটার সময় মনোরমা তাহার তত্ত্ব লইতে আসিয়া তাহার কাছে দুই খানি পত্র দিয়া যান—এক খানি আমার জন্য, আর একখানি কলিকাতার একজন ভদ্রলোকের জন্য। আমার কি তা? আমি কি কলিকাতার একজন ভদ্রলোক? তবে সে কথা আমার শুনিবার দরকার কি? সে সযত্নে সেই পত্র দুইখানি আপনার কোল আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। দেখ দেখি বেয়াদবি? তাহার কোল আঁচলের খুঁটের খুঁজে আমার কোন আবশ্যক আছে কি? তবে সে কথা আমাকে বলিস্ কেন? মনোরমা চলিয়া গেলে সে নিতান্ত দুঃখিত হইল এবং কোন প্রকার আহারাদি করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। সেটাও কি ছাই আমার দোষ? তোমার যদি ক্ষুধা না হয়, খাইতে ভাল না লাগে, তার জন্যও কি ছাই আমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে? তাহার [illegible]র রাত্রি যাপন করিবার অভিপ্রায়ে সে শয়নের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে চৌধুরাণী ঠাকুরাণী তথায় উপস্থিত হইলেন। যাঁহাকে সগর্ব্বে চৌধুরাণী ঠাকুরাণী এই সম্মানিত পদবী দ্বারা সে বিভূষিত করিল। তিনি আমার সেই দুরন্ত ভগ্নী—যিনি স্বেচ্ছায় এক বাঙ্গালের সহিত বিবাহ করিয়া আমাদের সকলের মুখে চূণকালী দিয়াছেন। চৌধুরাণী ঠাকুরাণীকে দেখিয়া গিরিবালা অবাক্ হইল। তবে তো আমার বড়ই ক্ষতি!

কিন্তু তোমরা যাই বল, আমি খানিকটা বিশ্রাম না করিয়া আর কোন মতেই লিখিতে পারি না। আমি চক্ষু বুঁজিয়া খানিকটা পড়িয়া থাকিব এবং রামদীন আমার শ্রম-কাতর অবসন্ন মস্তকে একটু অডিকলোঁ দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া দিবে, তাহার পর আর লিখিতে পারি কিনা তাহার বিচার করিব।

চৌধুরাণী ঠাকুরাণী আসিয়াই—

উঃ—লিখিতে যদিও পারি, উঠিয়া বসিতে কোন মতেই পারিব না। কাজেই আমি পড়িয়া পড়িয়া বলিব মাত্র। রামদীন একটু একটু লিখিতে জানে। সে-ই কেন লিখুক না? বেশ ব্যবস্থা। আঃ বাঁচিলাম!

চৌধুরাণী ঠাকুরাণী আসিয়াই বলিলেন, যে, মনোরমা তাড়াতাড়িতে কয়েকটী কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, সেই কথা কয়টী

বলিয়া দিতে তিনি আসিয়াছেন। গিরিবালা কথা কয়টী শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিল। কিন্তু আমার একগুয়ে ভগ্নীর স্বভাব যাইবে কোথায়? তিনি বলিলেন, সে যতক্ষণ কিছু না খাইবে ততক্ষণ তিনি তাহাকে কোন কথা বলিবেন না। আমার ভগ্নী গিরিবালার উপর নিতান্ত বিস্ময়জনক দয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এ আবার তাঁহার কিরূপ স্বভাব? তিনি বলিলেন,—"ছিঃ গিরিবালা! চাকরি তালপাতের ছায়া। চিরদিনই কে কোথায় একস্থানে চাকরি করিয়াছে? চাকরি গেল বলিয়া শরীরকে কষ্ট দেওয়া বড়ই অন্যায় কর্ম্ম। খাও কিছু। তুমি কিছু না খাইলে আমি তোমাকে কোন কথাই বলিব না।" গিরিবালা খাইবে বলিয়া সেই বাড়ীওয়ালী বুড়ী একটু দুধ ও চারিটি চিড়া দিয়াছিল। আমার ভগ্নী আবার বলিলেন,—"আমি নিজ হাতে তোমার খাবার ঠিক করিয়া দিতেছি, দেখি তুমি কেমন করিয়া না খাও।" এই কথা বলিয়া আমার ভগ্নী স্বহস্তে তাহার দুধ চিড়া মিশাইয়া ফলার প্রস্তুত করিয়া দিলেন। বোধ হয় ভগ্নী ইদানীং একটু পাগল হইয়া থাকিবেন, নচেৎ এমন ব্যবহার আর কেহ কি করিতে পারে গা? গিরিবালা অনুরোধে বাধ্য হইয়া আহার সমাপ্ত করিল। কিন্তু আহার সমাপ্ত হইবার প্রায় পাঁচ মিনিট পরে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। রামদীন বলে, এই কথা বলিবার সময় তাহার চক্ষু দিয়া অতিশয় জল পড়িয়াছিল। হইবে! আমি তখন দায়-গ্রস্ত হইয়া চক্ষু বুঁজিয়া শুনিতেছিলাম মাত্র, চক্ষে দেখিতে তখন আমার সাধ্য ছিল না। কাজেই সে কথা কতদূর সত্য আমি স্বাক্ষ্য দিতে অক্ষম।

কি বলিতেছিলাম? হাঁ। ফলার করিয়াই গিরিবালার মূর্চ্ছা হইল। আমি তাহার কি করিতে পারি? যদি বিজ্ঞানবিৎ লোক হইতাম তাহা হইলে ফলারান্তে মূর্চ্ছা হওয়ায় ফলারের সহিত মূর্চ্ছার কি নিকট সম্বন্ধ আছে তাহার বিচার করিতে পারিতাম; আর যদি ডাক্তার হইতাম তাহা হইলে ফলারের পর মূর্চ্ছা হইলে কি ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক তাহার একটা প্রেস্কৃপসন্ লিখিয়া দিতে পারিতাম। আমি সে সকল কিছুই নই, তবে মাগী ফলারান্তে মূর্চ্ছার কথা আমার কাছে বলে কেন? সে তো ফলার করিয়া মূর্চ্ছা গিয়াছিল, সুতরাং তাহার মনকে প্রবোধ দিবার উপায় আছে, কিন্তু আমি যে বিনা আহারেও, দিনরাত্রি মূর্চ্ছিত থাকি, বলিলেই হয়। আমার দশা দেখে কে তার ঠিকানা নাই। যাহা হউক, আধ ঘণ্টা খানেক পরে তাহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে, সে দেখিল কেবল বাড়ীওয়ালী বুড়ী তাহার নিকটে বসিয়া আছে; আর চৌধুরাণী ঠাকু-রাণী তাহার মূর্চ্ছা সারিবার লক্ষণ দেখিয়া, অধিক ক্ষণ অপেক্ষা করিবার সুবিধা না থাকায় চলিয়া গিয়াছেন।

যেই গিরিবালার নিকট হইতে বুড়ী চলিয়া গেল, সেই সে আপনার কোল আঁচলে হাত দিল এবং দেখিল চিঠি দুইখানি সেই খানেই আছে; কিন্তু যেরূপে তাহা বাঁধা ছিল তাহা কেমন এলোমেলো মত হইয়া গিয়াছে। সমস্ত রাত্রেই তাহার মাথা ঘুরুণী ছিল, কিন্তু শেষ রাত্রে একটু নিদ্রা হওয়ায় তাহার শরীর বেশ সুস্থ হইয়া গেল এবং ভোর বেলা উঠিয়া সে আদেশ মত একখানি চিঠি ষ্টেশনে আসিয়া ডাকে ফেলিয়া দিল। অপর চিঠি-খানি সে আমার নিকট লইয়া আসিয়াছে এবং এখনই আমার হাতে দিয়া কর্ত্তব্য সমাপন করিয়াছে। এইতো তাহার কথার মর্ম্ম।

এখন কি করিতে হইবে, কি করিলে ভাল হইবে, কে দুইটা ভাল করিয়া বলিবে এই ভাবনায় সে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবহেলা হইয়াছে ভাবিয়া সে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছে। এই স্থলে তাহার রস আবার দেখা দিল। কিন্তু তাহার যাহাই হউক, আমার এই স্থলে বিলক্ষণ ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল এবং নয়ন উন্মীলন করিয়া বলিলাম—"এত কথার তাৎপর্য্য কি ?"

আমার ভাইঝির দাসী নির্ব্বাক্‌ভাবে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া রহিল। আমি বলিলাম,—"রামদীন দেখ দেখি, উহার মনের কি ভাব ! পার যদি উহার অভিপ্রায় আমাকে বুঝাইয়া দেও।"

আবার যে গণ্ডগোল সেই গণ্ডগোলই উপস্থিত হইল, তখন অগত্যা আমাকে সেই গোলে মাথা দিতে হইল। কিয়ৎকাল বিহিত-বিধানে চেষ্টা করিয়া আমি তাহার অভিপ্রায় কতকটা বুঝিতে পারিলাম। মনোরমা দেবী চৌধুরাণী ঠাকুরাণী দ্বারা তাহার নিকট যে সকল সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, দৈবদুর্ব্বিপাক হেতু তাহা জানিতে না পারায়, সে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছে। সে আশঙ্কা করিতেছে, হয়ত সে সকল সংবাদ না জানিতে পারায়, রাণীর বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে। রাজার ভয়ে তাহার আর সে রাত্রে রাজবাটীতে ফিরিয়া গিয়া সংবাদ জানিয়া আসিতে সাহস হয় নাই এবং মনোরমা তাহাকে বিশেষ করিয়া সকালের গাড়ীতে চলিয়া আসিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন বলিয়া, সে পরদিন আর বুড়ীর বাড়ীতে, সংবাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া, থাকিতেও ভরসা করে নাই। পাছে তাহার এই অনায়ত্ত অপরাধ হেতু রাণী তাহাকে অবাধ্য ও অমনোযোগী বলিয়া মনে করেন, ইহাই তাহার প্রধান ভাবনা। সে অতি কাতরভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"এখন আমি কি করিব ? আপনি দয়া করিয়া বলিয়া দিউন, আমার এখন কি করিলে ভাল হয়।"

আমার চিরন্তন স্বভাবানুসারে আমি তখনই উত্তর দিলাম,—"কেন ? ও সকল কথা লইয়া আর কোন আন্দোলনের দরকার নাই। যাহা যেমন হইয়াছে, তাহা তেমনই থাকুক। বুঝিয়াছ ? আমি কখন অনর্থক কোন বিষয়ে গোল বাধাইতে ভাল বাসি না। এই তো তোমার কথার শেষ ?"

সে বলিল,—"আমার ইচ্ছা হইতেছে, আমি সমস্ত কথা পত্র দ্বারা রাণী ও মনোরমা ঠাকুরাণীকে লিখিয়া জানাই এবং প্রার্থনা করি যে যদি নিতান্ত বিলম্ব না হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহারা দয়া করিয়া তাঁহাদের আদেশ এখনও লিখিয়া পাঠাইলে আমি তাহা শিরোধার্য্য করিয়া আজ্ঞামত কার্য্য শেষ করিয়া কৃতার্থ হই। আপনি এ বিষয়ে কি পরামর্শ দেন ?

এত বড় জ্বালা ! আমার যাহা বলিবার তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তবু সে ছাড়ে না কেন ? অনর্থক কথা কহিয়া ত্যক্ত করা নিম্নশ্রেণীর লোকের নিতান্ত কদভ্যাস। তাহার যাহা বলিবার তাহা তো শেষ হইয়াছে আমার যাহা বলিবার তাহাও বলিয়াছি নিতান্ত নিরুপায় হইয়া আমাকে বলিতে হইল,—"আমার এখন কাজ আছে। তুমি এখন যাও।"

একথার পরে আর মানুষকে জ্বালাতন করা কখনই চলে না। কাজেই সে আমাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল ; আমিও বাঁচিলাম তখন আমার শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে ; এজন্য আমি একটা নিদ্রা দিলাম

নিদ্রাভঙ্গ হইলে মনোরমার পত্র খানি আমার চক্ষে পড়িল। তাহাতে কি লেখা আছে তাহার বিন্দু বিসর্গও যদি আমার জানা থাকিত, তাহা হইলে কখনই তাহা দেখিবার চেষ্টাও করিতাম না। দুর্ভাগ্যক্রমে, মনে কোন সন্দেহ না থাকায়, আমি চিঠিখানি পাঠ করিলাম এবং সে জন্য সমস্ত দিন আমাকে অভিভূত হইয়া থাকিতে হইল। আমি নিতান্ত সরল প্রাণ লোক এবং আমার প্রকৃতি বড়ই কোমল; যে আমার উপর যতই অত্যাচার করুক না কেন, আমি সকলই অকাতরে সহ্য করিয়া থাকি। কিন্তু হাজার হউক, আমি মানুষ ছাড়া আর কিছু নই তো? মানুষের শরীরে আর কতই সহিবে বল দেখি? আজি মনোরমার পত্র পড়িয়া আমি বস্তুতই বড় বিরক্ত হইলাম। আমার অপরাধের মধ্যে আমি স্ত্রী-পুত্রবিহীন লোক। সংসারের চারিদিকে হাহাকার; দারুণ অন্নকষ্টে লোক ছট্‌ফট্ করিতেছে। যাহারা আছে তাহারাই অতি কষ্টে পেটের ভাত জুটাইতে পারে না। তোমরা বংশবৃদ্ধি করিয়া সংসারের সেই ক্লেশভার আরও বাড়াইয়া দিতেছ এবং মানুষের যত্নার্জ্জিত মুষ্টিমেয় অন্নের আরও বখরাদার তৈয়ার করিতেছ। আমার অপরাধ আমি আত্ম-সুখের জন্য সেরূপ কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই নাই। সন্তান হওয়ার কষ্টের কথা সকলের মুখেই শুনিতে পাইবে; তথাপি হতভাগ্যেরা সন্তান হইল না বলিয়া শোকে অধোমুখ ও নিতান্ত কাতর। ইহার অপেক্ষা নির্ব্বুদ্ধিতার কথা আর কি আছে তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। যাহা হউক, আমার দাদা বিবাহ করিলেন এবং কিছু কাল পরে তাহার এক কন্যা সন্তান হইল। বেশ কথা। কিছুদিন পরে দাদার মৃত্যুকাল উপস্থিত। তখন তিনি সেই মেয়ের ভার আমার ঘাড়ে চাপাইলেন। স্বীকার করি, তাঁহার সে মেয়ে বড় শিষ্ট, শান্ত, সুন্দরী। কিন্তু তাহার ভার গ্রহণ করা সোজা কথা কি? আমার যদি সন্তানাদি থাকিত তাহা হইলে তিনি কখনই আমার স্কন্ধে এ গুরুভার প্রদান করিতেন না; অবশ্যই তিনি স্বীয় সন্তানের জন্য ব্যবস্থান্তর করিয়া যাইতেন। আমার অপরাধ যে আমি তাঁহার মত বেকুবি করি নাই; এই জন্যই তাঁহার দায় আমাকে গ্রহণ করিতে হইল। যাহা হউক আমি যথাসাধ্য যত্নে তাহাকে মানুষ করিলাম; অনেক অনর্থক আড়ম্বর ও কষ্ট স্বীকার করিয়া দাদার মনোনীত পাত্রে তাহার বিবাহও দিলাম। তাহার পর স্বামী স্ত্রীতে বনিবনাও হইল না। এখন সে মনান্তরের জন্য আমি মারা যাই। আমার ভাইঝির এই দায়ের মধ্যে আমাকে এখন মাথা দিতেই হইবে। আমার নিজের ছেলে পিলে থাকিলে ভাইঝি হয়ত এ সময়ে অন্য উপায় দেখিতেন। কিন্তু আমার অপরাধ, নিজের কোন বোঝা নাই; কাজেই আমাকে অপরের বোঝা মাথায় করিয়া বহিতে হইবে।

মনোরমা পত্রে আমাকে যথেষ্ট ভয় দেখাইয়াছেন। সুযোগ পাইলে আমাকে ভয় দেখাইতে কে ছাড়ে? যদি এই আনন্দধামে আমি আমার ভাইঝি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সকল বিপদ, সকল দুঃখ, সকল মনস্তাপের বাসা বাঁধিয়া না দিই, তাহা হইলে যত প্রকার শাস্তি কল্পনা করা যাইতে পারে সকলই আমাকে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে; মনোরমার পত্রের এই ভাব। তা হউক, একটু না বুঝিয়া আমি হঠাৎ কিছু করিব না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি মনোরমার নাম শুনিলেই হাল ছাড়িয়া দিয়া বসি এবং তাহার কথার

বা কাজের কোন প্রতিবাদ করি না। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মনোরমার প্রস্তাব এতই অন্যায় যে আমাকে এবার ভাবিবার সময় লইতে হইল। যদিই আমি আনন্দধামে রাণীকে আসিতে দিই, তাহা হইলে রাজাও যে সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া, তাঁহার স্ত্রীকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে, আমার উপর মহারাগের সহিত চক্ষু রাঙ্গাইবেন না, তাহার প্রমাণ কি? আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, হঠাৎ একার্য্য করিয়া ফেলিলে অপরিসীম গোলের উদ্ভব হইবে। তখন অনন্যোপায় হইয়া, মনোরমাকে একবার এখানে আসিয়া সমস্ত বিষয় স্থির করিবার জন্য পত্র লিখিলাম। যদি মনোরমা আমার সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিতে পারেন, তাহা হইলে আদরের ধন লীলাকে অবশ্যই আনা হইবে নচেৎ নহে। একথাও আমার মনে হইল যে, আমার এই পত্র প্রাপ্তির পর মনোরমা ঘোর গর্জ্জন সহকারে আমার সহিত ঝগড়া করিতে আসিবে। যদি লীলাকে আসিতে বলা যায়, তাহা হইলে এদিকে আবার রাজা ঘোর তর্জ্জন গর্জ্জন সহকারে আমার সহিত ঝগড়া করিতে আসিবেন। এই উভয়বিধ তর্জ্জন গর্জ্জনের মধ্যে আমার পক্ষে মনোরমার তর্জ্জন গর্জ্জনই ভাল; কারণ আমার তাহা সহ্য করার অভ্যাস আছে। সুতরাং ফেরৎ ডাকে মনোরমাকে আসিতে পত্র লিখিয়া দিলাম। আর কিছু হউক না হউক, আপাততঃ দুদিন সময় তো পাওয়া যাইবে?

এরূপ কষ্টের পর ঠাণ্ডা হইতে অন্ততঃ তিন চারি দিন সময় পাওয়া আবশ্যক। আমি তিন দিন চুপ করিয়া বিশ্রাম করিব এবং শরীর ও মনকে সুস্থ করিব সংকল্প করিলাম। বিধাতা দেখিলেন, এমন অভাগাকে এ সামান্য সময়ও বিশ্রাম করিতে দিলে চলিবে কেন? তিনি আমাকে তাহাও দিলেন না। তৃতীয় দিনে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের এক পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটা আমাদের চিরবন্ধু বক্তৃতাবাগীশ উকীল উমেশ বাবুর বখরাদার বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ডাকযোগে মনোরমা দেবীর হস্তাক্ষরে শিরোনাম লিখিত এক পত্র তাঁহার হস্তগত হইয়াছে; কিন্তু পত্রের খাম খুলিয়া তিনি তাহার মধ্যে একখানি সাদা চিঠির কাগজ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান নাই। ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহার কূট তর্কপূর্ণ মস্তিষ্ক কল্পনা করিয়াছে যে, নিশ্চয়ই অপর কেহ পত্র খুলিয়া এইরূপে প্রতারণা করিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ মনোরমা দেবীকে এসম্বন্ধে পত্র লিখিয়াছেন, কিন্তু কোন উত্তর পান নাই। এঅবস্থায় তাঁহার ওকথা ছাড়িয়া দিয়া অন্য কাজের কথায় মনঃসংযোগ করাই সৎপরামর্শ। তাহা না করিয়া, আমি এ বিষয়ের কিছু জানি কি না, আমাকে তিনি তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়া জ্বালাতনের একশেষ করিয়া তুলিয়াছেন। আমি তাহার কি জানিতে পারি? তবে আমাকে এমন বেয়াদবি করিয়া কষ্ট দেও কেন? আমি রাগতভাবে তাঁহাকে তাহাই লিখিয়া দিলাম। সেই চিঠির পর হইতে উকীল বাবু বুঝিয়াছেন হয়ত, তাঁহার কাজটা ভাল হয় নাই; তিনি আর আমাকেপত্র লিখিয়া জ্বালাতন করেন নাই।

মনোরমার আর কোন পত্রও পাওয়া গেল না, এবং তাঁহার শীঘ্র এখানে আসিবার কোন লক্ষণও দেখা যাইতেছে না; এটা বড়ই বিস্ময়ের কথা সন্দেহ নাই। আমার সে পত্র পাইয়া একবারে এরূপ ভাবে চুপ করিয়া থাকিবার লোক মনোরমা নহেন। তবেই বোধ হইতেছে, হয়ত রাজা-রাণীর অকৌশলভাব

মিটিয়া গিয়াছে। আঃ বাঁচিলাম! চারিদিকে গণ্ডগোল ঠাণ্ডা হইয়া গেল, এখন আমি আবার প্রাচীন গ্রন্থালোচনায় মনঃসংযোগ করিয়া জগতের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হই। আমি প্রিয় গ্রন্থবিশেষ লইয়া তাহার আলোচনায় নিযুক্ত হইয়াছি এমন সময় রামদীন একখানি কার্ড হাতে করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম,—"আবার একজন ঝি আসিয়াছে বুঝি? তা আসুক, আমি কখনই তার সঙ্গে দেখা করিব না। বলগে, আমার সহিত দেখা হইবে না।"

"না হুজুর, এবার একজন ভারী বাবু।"

একজন বাবু শুনিয়া অবশ্যই অন্যমত করিতে হইল। রামদীনের হাত হইতে কার্ড লইয়া পাঠ করিলাম। কি সর্ব্বনাশ! আমার সেই দুষ্ট ভগ্নীর বাঙ্গাল স্বামী—জগদীশ নাথ চৌধুরী। বলা বাহুল্য যে কার্ড দেখিবামাত্র, যাহা সঙ্গত মীমাংসা তাহাই আমার মনে হইল,—আমি বুঝিলাম, আমার বাঙ্গাল ভগ্নীপতি মহাশয় নিশ্চয়ই আমার নিকট টাকা ধার করিতে আসিয়াছেন। আমি বলিলাম,—"রামদীন, তোমার বোধ হয় কি, দুই চারি টাকা পাইলে এ লোকটা অমনই অমনই চলিয়া যাইতে পারে কি?"

রামদীন অবাক্ হইয়া আমার দিকে চাহিল। তাহার কথা শুনিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। সে আমাকে বুঝাইয়া দিল, আমার বাঙ্গাল ভগ্নীপতি মহাশয়ের পরিচ্ছদ খুব জাঁকাল এবং তাঁহাকে দেখিলে সর্ব্ববিধ সুখ সৌভাগ্যের অধিকারী বলিয়া মনে হয়। এই সকল বর্ণনা শুনিয়া আমার পূর্ব্ব সংস্কার কিছু পরিবর্ত্তিত হইল। তখন আমি স্থির সিদ্ধান্ত করিলাম যে, চৌধুরীর নিশ্চয়ই কোন পারিবারিক অকৌশল উপস্থিত হইয়াছে এবং অন্যান্য সকলের ন্যায় তিনিও সকল জ্বালা আমার ঘাড়ে চাপাইতে আসিয়াছেন। জিজ্ঞাসিলাম,—"কি জন্য তিনি আসিয়াছেন তাহা বলিয়াছেন কি?"

"মনোরমা দেবী এখন রাজবাটী হইতে আসিতে পারিবেন না; এজন্য চৌধুরী মহাশয় আসিয়াছেন।"

আবার নূতন বিভ্রাট উপস্থিত। যদিও চৌধুরীর কোন হেঙ্গাম না হউক, মনোরমার তো বটেই। যে দিক দিয়া হউক, গোল ভোগ করিতেই হইবে। হায়! হায়! কি কপাল গা! তখন নিরুপায় হইয়া বলিলাম,—"তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস।"

চৌধুরী মহাশয়কে দর্শনমাত্র আমি চমকিয়া উঠিলাম! ওরে বাপরে! কি বৃহৎ দেহ! আমি বুঝিলাম তাঁহার পাদভরে ঘর কাঁপিয়া উঠিবে এবং জিনিষ পত্র ওলট পালট হইয়া পড়িবে! কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেরূপ কোন দুর্ঘটনা ঘটিল না। সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছেদে চৌধুরী মহাশয়ের দেহ সমাচ্ছন্ন। তিনি বড়ই হাস্যবদন এবং ধীর স্বভাব। ফলতঃ তাঁহাকে দেখিয়া আমি প্রীত হইলাম। পরিণামে যে যে ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে তাহা আলোচনা করিলে, প্রথম সাক্ষাতে চৌধুরীর প্রকৃতি বুঝিতে না পারায়, আমার মানব চরিত্র প্রণিধান ক্ষমতার বিশেষ দোষ দিতে হয়। কিন্তু আমি সরল প্রাণ লোক। আপনার দোষের কথা লুকাব কেন?

তিনি বলিলেন,—"আমি কৃষ্ণ সরোবরের রাজবাটী হইতে আসিতেছি এবং আমি মহাশয়ের ভগ্নী শ্রীমতী রঙ্গমতী দেবীর স্বামী; অতএব আমার সানুনয় অনুরোধ যে মহাশয় আমাকে নিঃসম্পর্কিত ও অপরিচিত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিবেন না। আপনার নড়িয়া

চড়িয়া কাজ নাই,—আমার জন্য একটুও ব্যস্ত হইবার দরকার নাই।"

আমি উত্তর দিলাম,—"আপনি বড়ই ভদ্রলোক। আমি বড়ই দুর্ব্বল, এজন্য উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিলাম না। আপনার আনন্দধামে আগমন ঘটনায় অতিশয় আনন্দিত হইলাম। বসুন—ঐ চেয়ারে বসুন।"

চৌধুরী বলিলেন,—"আমার আশঙ্কা হইতেছে, আপনার হয়ত বেশী অসুখ করিয়াছে।"

আমি বলিলাম,—"বারো মাসই আমার সমান। আপনাকে আর বলিব কি, আমি কেবল মরা মানুষ জানিবেন। আমার শরীরে কিছুই নাই।"

চৌধুরী বলিলেন,—"আমার এই জীবনে আমি বহু শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছি। অন্যান্য সর্ব্ববিষয়াপেক্ষা চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোচনায় আমি অধিক সময় ব্যয় করিয়াছি। আপনার অবস্থা দৃষ্টে দুই একটী অতি সামান্য, অথচ বিশেষ ফলপ্রদ, মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করিতে আমার বাসনা হইতেছে। আপনি অনুমতি করিলে গৃহ-মধ্যে যে স্থানে আপনি উপবেশন করেন তাহা আমি পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করি।"

"করুন—যাহা ভাল বুঝেন করুন। আমাকে রক্ষা করিবার যদি কোন উপায় থাকে দেখুন।

তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া জানালার নিকটে গমন করিলেন। আহা! কি সদ্বিবেচক! যাওয়া চলা ফেরা সকল বিষয়েই তাঁহার অসাধারণ সাবধানতা! তিনি জানালার নিকট হইতে অতি মৃদু, কোমল ও আশ্বাসপূর্ণ স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"বিশুদ্ধ বায়ু, বুঝিলেন রায় মহাশয়, বিশুদ্ধ বায়ু আপনার জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক সামগ্রী। সকল জীবনের পক্ষেই বায়ু বলবিধায়ক, পুষ্টিকারক, রক্ষাকারী সামগ্রী। বিশেষতঃ আপনার পক্ষে তাহার উপকারিতার সীমা নাই। দেখুন, একটা বৃক্ষও নিরবচ্ছিন্ন বায়ু-বিহীন স্থানে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয় না। মহাশয় গৃহের যে স্থানে উপবেশন করেন তথায় বিশুদ্ধ বায়ু গমনাগমনের সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। এই বাতায়ন-পথে গৃহ-মধ্যে যে দক্ষিণ বায়ু প্রবেশ করে তাহা সম্মুখস্থ দ্বার দিয়া বহির্গত হয়। সেই বায়ু-প্রবাহের সম্মুখে যদি মহাশয় সতত উপবেশনের আসন রক্ষা করেন, তাহা হইলে আপনার নিয়তই বিশুদ্ধ বায়ু সম্ভোগ ঘটিবে এবং তজ্জন্য অবশ্যই আপনার অপরিসীম শারীরিক উন্নতি সংঘটিত হইবে। অতএব আমার সানুনয় অনুরোধ যে, মহাশয়কে অতঃপর এই স্থানে উপবেশন করিতে হইবে। আপনি এই চির অপরিচিত, অথচ অতি নিকট কুটুম্বের এই অনুরোধ রক্ষা করিয়া অবশ্যই বিশেষ উপকৃত হইবেন।"

কথাটী আমার মনে বেশ ভাল বলিয়া বোধ হইল। লোকটার কথা ঠেলিবার যো নাই। বায়ুর কথা পর্য্যন্ত তো দেখিলাম, লোকটার কথা অবশ্য গ্রাহ্য। তাহার পর চৌধুরী পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে আসিতে আবার বলিতে লাগিলেন,—"রায় মহাশয়! আপনার সহিত পূর্ব্বে আমার পরিচয় ছিল না, তাহা আমি এক্ষণে সৌভাগ্য জ্ঞান করিতেছি।"

"সে কি! কেন বলুন দেখি?"

"কেন? ভারতবর্ষে আপনার ন্যায় সাহিত্যামোদী সুপণ্ডিত ব্যক্তি কে আছে বলুন দেখি? নিরন্তর আপনি স্বদেশীয়গণের জ্ঞানোন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নিযুক্ত। কিন্তু

হায়! বিধতার কি বিড়ম্বনা! আপনার ন্যায় মহদ্ব্যক্তি চিররুগ্ন অপ্রফুল্ল ও অবসন্ন। আপনার এই গৃহে আগমনাবধি আপনাকে দেখিয়া আমার হৃদয় দারুণ দুঃখে অভিভূত হইতেছে। সুতরাং মহাশয়ের নিকট অপরিচিত থাকাই আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য সন্দেহ কি? আমার হৃদয় সাধারণ জনগণের ন্যায় কঠিন ও অকৃতজ্ঞ নহে। আমি এক সঙ্গে আপনার অসাধারণ ব্যাধি-যাতনা এবং অসাধারণ গুণাবলী দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইতেছি।"

লোকটা যথার্থই আমার প্রকৃত অবস্থা সুন্দররূপ বুঝিয়াছে কি বলিব, আমার দেহে তৃণের ন্যায় শক্তিও নাই। যদি আমার শরীরে কিঞ্চিন্মাত্রও বল থাকিত তাহা হইলে আমি তখনই উঠিয়া চৌধুরী মহাশয়ের সহিত কোলাকুলি করিতাম। তাহা না পারিয়া আমি কেবল কৃতজ্ঞতা সূচক ঈষদ্ধাস্য করিলাম মাত্র। বোধ হয় চৌধুরী তাহাতেই আমার হৃদয়ভাব বুঝিতে পারিলেন। চৌধুরী আবার বলিতে লাগিলেন,—"আপনার এই অবস্থা দৃষ্টে, আপনাকে বিনোদিত করিবার উপায় অন্বেষণ না করিয়া, আমাকে আপনার নিকট নিদারুণ পারিবারিক অশান্তির সংবাদ সকল ব্যক্ত করিয়া, আপনাকে অধিকতর কাতর করিতে হইবে ভাবিয়া আমি নিরতিশয় সঙ্কুচিত হইতেছি।"

তখনই আমার মুণ্ড ঘুরিয়া গেল এবং আমি বুঝিলাম, এই রে! এতক্ষণ বাদে এ হতভাগাও জ্বালাতনের সূত্রপাত আরম্ভ করিল দেখিতেছি!

আমি বলিলাম,—"মহাশয়! সে সকল অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ উত্থাপন করা কি নিতান্তই আবশ্যক? ভাল, সে সকল কথা থাক না কেন?"

চৌধুরী নিতান্ত গম্ভীর ভাবে মস্তকান্দোলন করিলেন। আমি বুঝিলাম, নিতান্তই আমার কপাল পুড়িয়াছে,—এ লোকটাও জ্বালাতন না করিয়া কোন মতেই ছাড়িবে না। বলিলাম,—"তবে কি আমাকে সে সকল কথা শুনিতেই হইবে?"

চৌধুরী তখন তাঁহার প্রকাণ্ড মস্তক হেলাইয়া এতৎ প্রসঙ্গের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিলেন এবং আমার মুখের দিকে অপ্রীতিকর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তখন আমার প্রাণ বলিল, দেখিতেছ কি, চক্ষু বুজিয়া ফেল—আজি আর নিস্তার নাই। আমি তখন প্রাণের কথা শুনিয়া চক্ষু বুজিয়া বলিলাম—মহাশয়! তবে কৃপা করিয়া একটু কোমলতার সহিত আপনার কুসংবাদ ব্যক্ত করুন। কেহ মরিয়াছে কি?"

একটু বাঙ্গালে রাগ ও জোরের সহিত চৌধুরী বলিয়া উঠিলেন,—"মরিয়াছে! সে কি রায় মহাশয়, আমি এমন কি বলিয়াছি, বা এমন কি করিয়াছি যে আপনি আমাকে মৃত্যুর বার্ত্তাবহ বলিয়া মনে করিতেছেন?"

আমি উত্তর দিলাম,—"এজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি এরূপ স্থলে অতি মন্দ সন্দেহই মনে করিয়া থাকি; তাহাতে সংবাদের কঠোরতার একটু লাঘব হয়। যাহা হউক, কাহারও মৃত্যু হয় নাই শুনিয়া বড়ই নিরুদ্বিগ্ন হইলাম। কাহারও পীড়া হইয়াছে কি?"

এতক্ষণে আমি আবার চক্ষু মেলিয়া চাহিলাম। তখন দেখিলাম লোকটাকে অত্যন্ত পাণ্ডুবর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে। যখন তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন তখনও তাঁহার এমনই রং ছিল কি? না, আমি চক্ষু মুদিত করার পর হইতে তাঁহার রং বদলাইয়া

গিয়াছে? রামদীন যে ছাই এ সময়ে ঘরের মধ্যে ছিল না। তাহা হইলে তাহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। যাহা হউক, তিনি কোন উত্তর দিতেছেন না দেখিয়া আমি তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসিলাম,—"কাহারও পীড়া হইয়াছে কি।"

"আমার অপ্রীতিকর সংবাদের মধ্যে তাহাও আছে বটে। হাঁ রায় মহাশয়, কাহারও পীড়া হইয়াছে সত্য।"

"বটে? কাহার?"

"গভীর দুঃখের সহিত আমাকে জানাইতে হইতেছে যে, মনোরমা দেবী পীড়িত হইয়াছেন। বোধ হয় আপনিও এ আশঙ্কা করিয়া থাকিবেন। আপনার প্রস্তাবানুসারে যখন মনোরমা দেবী এখানে আসিয়া উপস্থিত হন নাই, সম্ভবতঃ আপনার স্নেহজনিত উদ্বেগ হেতু, আপনি তখনই তাঁহার পীড়ার আশঙ্কা করিয়াছেন।"

আমার স্নেহজনিত উদ্বেগ হেতু সেরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সে কথা এখন আমার মোটেই মনে পড়িল না। তথাপি কর্ত্তব্যানুরোধে আমি তাঁহার বাক্যের সমর্থন করিলাম। সংবাদটা শুনিয়া আমি বিচলিত হইলাম। মনোরমার ন্যায় সবল ও সুস্থকায় লোকের পীড়ার কথা জানিয়া আমি অনুমান করিলাম নিশ্চয়ই তাঁহার কোন প্রকার আঘাত লাগিয়া থাকিবে। হয়ত সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়াছেন, নয়ত অন্য কোন প্রকারে কোন আঘাত লাগিয়াছে, নয়ত হাত পা কাটিয়া গিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"পীড়া কি বড় কঠিন?"

চৌধুরী উত্তর দিলেন,—"কঠিন, তাহার কোন সন্দেহই নাই, কিন্তু ভয়ানক নহে, তৎপক্ষে আমার আশা ও বিশ্বাস আছে দুঃখের বিষয় মনোরমা দেবী একদিন অতিশয় বৃষ্টিতে ভিজিয়াছিলেন। সেই কারণে সেই রাত্রি হইতেই তাহার অত্যন্ত জ্বর হইয়াছে।"

আমি চক্ষু বিস্তারিত করিয়া বলিলাম,—"জ্বর! সংক্রামক নয় তো?"

চৌধুরী বলিলেন,—"না, না, এখন পর্য্যন্ত জ্বরের সেরূপ কোন সন্দেহজনক ভাব দেখা যায় নাই। অতএব সেরূপ আশঙ্কা করিবেন না।"

তিনি হাজার বলুন, আমার মনে বড় ভয় হইল। এই শরীরের উপর এত জ্বালাতন একে নিতান্তই অসহ্য ব্যাপার, তাহার উপর এই সংবাদের পরেও আবার কথা কহা বা শুনা আমার পক্ষে সম্পূর্ণই অসম্ভব। তখন আমি কাতর ভাবে বলিলাম,—"আমার অবস্থা দেখিতেছেন তো? আমি নিতান্ত দুর্ব্বল ও চিররোগী। অধিক ক্ষণ কথা-বার্ত্তা কহা আমার সাধ্যাতীত। এক্ষণে কি জন্য মহাশয়ের শুভাগমন ঘটিয়াছে তাহা ব্যক্ত করিয়া আমাকে শীঘ্র শীঘ্র ছুটি দিউন।"

আমি মনে করিয়াছিলাম একথার পর তিনি আর বেশী কথা কহিবেন না—দুই একটা শিষ্টাচারের কথা কহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবেন। ওমা! যাওয়া তো দূরের কথা তিনি চেয়ারের উপর আরও জাঁতিয়া বসিলেন। তিনি তাঁহার সেই রাক্ষসে হাতের বিকট দুইটা অঙ্গুলি উঁচু করিয়া তুলিলেন এবং আমার মুখের দিকে আর একবার সেইরূপ বিরক্তিজনক দৃষ্টিপাত করিয়া নিতান্ত গম্ভীর ও স্থির স্বরে কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। আমি তখন করিব কি? আমি নিতান্ত দুর্ব্বল ও ক্ষীণ লোক—সে পাহাড় পর্ব্বতের সহিত ঝগড়া করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার তদানীন্তন অবস্থা যদি ভাবিয়া বুঝিতে পার

তবে বুঝিয়া লও। তাহার সাহায্যে তাহার বর্ণনা করা সম্ভব কি? কখনই নহে।

কোন প্রকার প্রতিবন্ধকের দিকেই লক্ষ্য না করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আমার আগমনের অভিপ্রায় কয়টী তাহা আমার আঙ্গুল দেখিলেই জানিতে পারিবেন। দুই কারণে আমাকে আপনার নিকট আসিতে হইয়াছে। প্রথম, আপনি মনোরমা দেবীর পত্রে জ্ঞাত হইয়াছেন যে, রাজা প্রমোদরঞ্জন ও রাজ্ঞী লীলাবতী দেবীর মধ্যে ঘোর বিষাদজনক মনান্তর উদ্ভূত হইয়াছে; আমি নিরতিশয় শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তাহার সমর্থন করিতেছি। আমি রাজার অতি প্রাচীন বন্ধু; আমি রাণীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত; রাজবাটীতে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তৎসমস্ত আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই ত্রিবিধ কারণে আমার সকলই জানিবার ও বলিবার অধিকার আছে। আপনি এ পরিবারের মস্তক। মনোরমা দেবী এ সম্বন্ধে আপনাকে পত্র দ্বারা যাহা জানাইয়াছেন তাহার এক বর্ণও অতিরঞ্জিত নহে। এতদ্বিষয়ে তিনি যে ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাই অবলম্বন করিলে অধিকতর অপ্রীতিকর কলঙ্ক ও লোকাপবাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে। ফলতঃ, এ সময়ে কিয়ৎকালের জন্য স্বামিস্ত্রীর পরস্পর অন্তরিত থাকা নিতান্তই আবশ্যক। আমি ক্রমশঃ রাজাকে প্রকৃতিস্থ করিবার ভার গ্রহণ করিতেছি। রাণীর অপরাধ কিছুই নাই, অথচ তাঁহার এ অবস্থায় স্বামিভবন হইতে স্থানান্তরিত হইয়া বাস করা নিতান্ত সৎপরামর্শ। কিন্তু মহাশয়ের বাটী ব্যতীত অন্য কোন স্থানে বাস করা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত, সম্ভব ও বিধেয় নহে। অতএব আপনি তাঁহাকে অবিলম্বে এখানে আনাইবার ব্যবস্থা করুন।"

দেখ একবার কাণ্ডখানা! তাহাদের মধ্যে বিবাহবিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে, আমাকে বিনা অপরাধে, তাহার মধ্যে মাথা দিয়া তাহার অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। আমি এই কথা রাগের সহিত বলিব ভাবিতেছি কিন্তু শুনে কে? চৌধুরী কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সুবিশাল অঙ্গুলদ্বয়ের একটা নামাইয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার বাক্যের শকট আমার ঘাড়ের উপর দিয়া আবার চালাইতে লাগিলেন। কোচম্যান গাড়ি ঘাড়ের উপর দিয়া চালাইতে হইলেও একবার "হৈ হৈ" করিয়া চীৎকার করিয়া সাবধান করে; তিনি তাহাও করিলেন না।

তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আমার প্রথম অভিপ্রায় মহাশয়কে জানাইলাম। পীড়া হেতু মনোরমা দেবীর আগমনের ব্যাঘাত ঘটায়, তিনি স্বয়ং আসিয়া যে কার্য্য সম্পন্ন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, তাহাই সমাপিত করিতে আমাকে এখানে আসিতে হইয়াছে; ইহাই আমার আগমনের দ্বিতীয় কারণ। আমি প্রবীণ ও অভিজ্ঞ বলিয়া, রাজবাটীস্থ সকলেই সকল বিষয়ে আমার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। আপনি মনোরমা দেবীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। কেন যে আপনার ন্যায় সূক্ষ্মবুদ্ধি ব্যক্তি, অগ্রে মনোরমা দেবীর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া রাণীর আগমন বিষয়ে মত ব্যক্ত করেন নাই, তাহা আমি সহজেই বুঝিতে পারিলাম। রাজা, রাণীকে পুনঃপ্রাপ্তির জন্য কোন গোলমাল করিবেন কি না তাহার স্থির সংবাদ অগ্রে না জানিয়া, রাণীকে একস্থানে আশ্রয় দিতে ইতস্ততঃ করা

আপনার পক্ষে সম্পূর্ণই ন্যায়-সঙ্গত কথা তাহা আমি স্বীকার করি। আমি ইহাও স্বীকার করি যে, এরূপ প্রসঙ্গের বাদানুবাদ পত্রে নির্ব্বাহিত হইবার নহে। এই সকল কারণে, মনোরমা দেবীর অক্ষমতা হেতু, আমাকে নানা অসুবিধা ভোগ করিয়াও মহাশয়ের নিকটে আগমন করিতে হইয়াছে। আমি রাজার প্রকৃতি অন্য লোকের অপেক্ষা সমীচীনরূপে জ্ঞাত আছি। আমি আপনাকে নিঃসংশয়িতরূপে জানাইতেছি যে, যত দিন রাণী এখানে থাকিবেন সে সময়ের মধ্যে রাজা একবারও এ বাটীর নিকটেও আসিবেন না এবং এখানকার কোন লোকের সঙ্গে কোন প্রকার বাক্যালাপও রাখিবেন না। রাজার বৈষয়িক অবস্থা এক্ষণে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ নহে। রাণী স্থানান্তরিত হইলে তিনি স্বাধীন হইবেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি এ প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া দূর প্রদেশে চলিয়া যাইবেন, ইহার কোনই সন্দেহ নাই। বোধ করি, এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে আপনার হৃদ্‌গত হইয়াছে। এখন আপনার আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার কথা কিছু আছে কি? আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করুন—যত কথা মনে থাকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য বসিয়া আছি।”

যে লোক আমার অবস্থার দিকে আদৌ লক্ষ্য না করিয়া এত কথা কহিয়া ফেলিল, তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে আরও কত কথা বলিবে তাহার ঠিক কি? তাহাকে কি আমি ঘাঁটাইতে পারি? আমি কাতর ভাবে বলিলাম,—“আমি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। আমার এ অবস্থায় সকল কথাই স্বীকার করিয়া লওয়া আবশ্যক। আপনি কৃপা করিয়া এ ব্যাপারের মধ্যস্থতা গ্রহণ করায় আমি অত্যন্ত অনুগৃহীত হইয়াছি। যদি কখন শরীর ভাল হয় এবং আপনার সহিত পুনরায় ভাল করিয়া আলাপের সুযোগ উপস্থিত হয়—”

আমার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই চৌধুরী গাত্রোত্থান করিলেন। আমি ভাবিলাম, লোকটা বুঝি এবার প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছে। ও আমার কপাল! চলিয়া যাইতে তাহার দায় পড়িয়াছে। তিনি এখন দাঁড়াইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,—“মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করার পূর্ব্বে আর একটা কথা বলা আবশ্যক। রাণী মাতাকে এখানে আনিতে, মনোরমা দেবীর আরোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার কথা, আপনি একবারও ভাবিবেন না। মনোরমা দেবীর শুশ্রূষার জন্য ডাক্তার নিযুক্ত আছেন, রাজবাটীর ঝি-ঝি আছে, আর কলিকাতা হইতে একজন পাসকরা উপযুক্ত পরিচারিকা লইয়া যাওয়া হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার যত্নের কোনই ত্রুটি হইতেছে না, ইহা আপনি স্থির জানিবেন। তাঁহার পীড়ায় রাণীর হৃদয় এত শোকাকুল ও কাতর হইয়াছে যে, তাঁহার দ্বারা পীড়িতার পরিচর্য্যা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এদিকে রাজার সহিত তাঁহার অসদ্ভাব প্রতিদিনই বাড়িয়া উঠিতেছে। যদি তাঁহাকে আপনি রাজবাটীতে আরও কিছুদিন রাখেন, তাহা হইলে তাঁহার ভগ্নীর কোনই উপকার তো হইবে না; অধিকন্তু আপনার, আমার এবং আমাদের সকলকেই ঘোর বিরক্তিকর ও নিতান্ত অপমানজনক লোকনিন্দার ভয়ে শঙ্কিত থাকিতে হইবে। এই দারুণ দুর্দ্দৈবের দায়িত্ব হইতে আপনি সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত থাকিবেন বলিয়া আমি আপনাকে কায়মনোবাক্যে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি এখনই রাণী মাকে অবিলম্বে চলিয়া আসিবার নিমিত্ত পত্র

লিখুন। আপনি আপনার স্নেহ প্রণোদিত, মানজনক, অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য পালন করুন, তাহার পর ভবিষ্যতে যাহাই কেন ঘটুক না সে জন্য কেহই আপনাকে কোন প্রকারে অপরাধী করিতে পারিবে না। আমি আমার প্রগাঢ় দূরদর্শিতার প্রভাবে আপনাকে এই সুহৃদ্জনোচিত উপদেশ প্রদান করিতেছি। আপনি ইহা গ্রহণ করিলেন কি, বলুন ?"

আমি অবাক্ হইয়া লোকটার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর মনে করিলাম। রামদীনকে ডাকিয়া লোকটাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দেই। আশ্চর্য্য কাণ্ড! লোকটা আমার মুখ দেখিয়া আমার মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিল না। চৌধুরী আবার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন,—"আপনি এখনও অগ্র পশ্চাৎ চিন্তা করিতেছেন। আপনি মনে করিতেছেন রাণীর এখন শরীর ও মনের এরূপ অবস্থা নহে যে তিনি এই পথশ্রম সহ্য করিয়া এতদূর একাকিনী আসিতে পারেন। দেখুন আমার হৃদয়ের সহিত আপনার হৃদয়ের কেমন একতা! দেখুন, কেমন আশ্চর্য্যরূপে আমি আপনার হৃদয়-ভাব প্রণিধান করিতেছি। আপনি আরও মনে করিতেছেন, কলিকাতা দিয়া আসিতে হইলে রাণী কলিকাতার কোন্ স্থানে থাকিবেন তাহারও স্থির নাই। রাণীর পরিচারিকার জবাব হইয়াছে, রাজবাটীর গিন্নি-ঝি প্রভৃতি মনোরমা দেবীর পীড়ার জন্য ব্যস্ত, সুতরাং রাণীর সঙ্গে আসিবে কে ? এ সকল আপত্তি সম্পূর্ণ সঙ্গত হইলেও অখণ্ডনীয় নহে। যখন পশ্চিম হইতে আমি রাজার সহিত এদেশে আসি, তখনই আমার স্থির ছিল যে, আমি কলিকাতার কোন স্থানে বাস করিব। সংপ্রতি সেই অভিপ্রায়ে আমি কলিকাতার বড়বাজার পল্লীতে ছয়মাসের জন্য একটী সুন্দর বাটী ভাড়া করিয়াছি। মনে করুন, যদি আমি স্বয়ং যাইয়া রাণীকে ষ্টেশন হইতে আমার বাসায় লইয়া আসি, এবং সেখানে তাঁহার পিসীর সহিত আবশ্যক মত কাল থাকার পর, তাঁহাকে আবার সঙ্গে করিয়া ষ্টেশনে আনিয়া রেলে উঠাইয়া দিই এবং তিনি শক্তিপুর ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলে যদি গিরিবালা তাঁহাকে ষ্টেশন হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইসে, তাহা হইলে কোন অসুবিধা হইবে, এমন আমার বোধ হয় না। অতএব আপনি আর অন্যমত করিবেন না। এখনই আপনি রাণী মাতাকে এ সম্বন্ধে পত্র লিখিয়া আমাদের সকল উদ্বেগের অবসান করুন, ঘোর লোকাপবাদের হস্ত হইতে এ নিরপরাধ পরিবারকে রক্ষা করুন এবং সে দুঃখিনী বালিকার হৃদয়কে বিশ্রাম লাভ করিয়া, আশ্বস্ত হইতে দিউন। একার্য্য আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনি কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া পরিণামে পরিতাপ ভোগ করিবেন না।"

লোকটা যেন কোন সভামধ্যে বক্তৃতা করিতেছে। হাত নাড়া, পা নাড়া, ঘাড় ঘুরান, বুক ফুলানর ঘটা কি! তখন আমি দেখিলাম, ইহাকে শীঘ্র সরাইয়া দিতে না পারিলে আমার আর কোন ক্রমে ভদ্রস্থতা নাই। সেই সময়ে ভগবান্ কৃপা করিয়া আমাকে এক অতি আশ্চর্য্য বুদ্ধি প্রদান করিলেন; আমি তখনই চৌধুরীর প্রার্থনামত পত্র লিখিয়া দিয়া সকল যন্ত্রণার সমাপ্তি করিবার সংকল্প করিলাম। আমার পত্র পাইলেই লীলা আসিবে বলিয়া কোন ভয় নাই; কারণ মনোরমার পীড়া থাকিতে লীলা তাহাকে ছাড়িয়া আসিবে, এ কথা কখনই সম্ভব নহে। এ সোজা কথা চৌধুরীর মত চালাক লোক যে কেন বুঝিতে পারেন নাই, তাহা আমি ভাবিয়া

স্থির করিতে পারিলাম না। যাহাই হউক, তিনি একথা বুঝিতে পারার আগে পত্রখানা লিখিয়া তাঁহাকে বিদায় করিতে পারিলে সকল দিক রক্ষা হয়। তাঁহাকে এক বিন্দুও ভাবিবার সময় দিব না মনে করিয়া, আমি কষ্টে স্বষ্টে একটু সোজা হইয়া বসিলাম এবং যথার্থ কলম হাতে লইয়া লিখিতে বসিলাম। তাড়াতাড়ি করিয়া লিখিলাম,—"জীবিতাধিক লীলা,—যখন তোমার ইচ্ছা হইবে তখনই এখানে আসিবে। কলিকাতায় তোমার পিসীর বাটীতে রাত্রি যাপন করিও। মনোরমার পীড়ার কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম।" পত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়া তাহা চৌধুরী মহাশয়ের দিকে ফেলিয়া দিলাম এবং বলিলাম,—"আর না। আমাকে ক্ষমা করুন, আর কোন কথা বলিলে আমি তাহা শুনিতে পারিব না। আপনি বৈঠকখানা বাটীতে গিয়া বিশ্রাম ও আহারাদি করুন। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। আজ এই পর্য্যন্ত।" এই কথা বলিয়া নিতান্ত অবসন্নভাবে আমি শয্যায় পড়িলাম।

কিন্তু চৌধুরী তবুও আবার বকিতে আরম্ভ করিলেন। আমি তাঁহার কথা আর শুনিব না প্রতিজ্ঞা করিলেও অনেক কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমার ভগ্নীর এই বিরাট স্বামী আমাদের সাক্ষাতের জন্য অনেক আনন্দ প্রকাশ করিলেন; আমার শরীরের জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন; আমার গুণের অনেক সুখ্যাতি করিলেন; আমার জন্য একটা ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া দিতে চাহিলেন; বিশুদ্ধ বায়ুর কথা আবার আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং দুই তিন দিনের মধ্যেই আমি রাণীকে দেখিতে পাইব বলিয়া আশ্বাস দিলেন। তাহার পর নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। যখন আমি আবার চক্ষু মেলিয়া চাহিলাম তখন দেখিলাম চৌধুরী চলিয়া গিয়াছেন! আঃ বাঁচিয়াছি! লোকটার একটা প্রধান গুণ—বড় সাবধান। তিনি যে কখন ঘরের দরজা খুলিয়াছেন এবং বন্ধ করিয়াছেন তাহা আমি জানিতেও পারি নাই। কিছুকাল পরে রামদীন আসিলে আমি তাহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলাম, এই অতি বড় লোক যথার্থই চলিয়া গিয়াছেন? আঃ বাঁচাইয়াছেন। তাঁহার জয় হউক!

আমার আর কোন কথা বলিবার দরকার দেখিতেছি না; দরকার থাকিলেও আমি তাহাতে অক্ষম। পরে যে সকল ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছে, সৌভাগ্যক্রমে তাহার কিছুই আমার সমক্ষে হয় নাই। প্রার্থনা করি সে জন্য কেহই যেন নিন্দার ভাগ আমার ঘাড়ে না চাপান। আমি সকলই ভাল ভাবিয়া করিয়াছি! যে বিষাদময় দুর্ঘটনা পরে ঘটিয়াছে পূর্ব্বে তাহা জানিবার ও বুঝিবার কোনই উপায় ছিল না; সুতরাং সেজন্য আমি দায়ী হইতে পারি না। সেই দুর্ঘটনায় আমার শরীর ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে এবং সর্ব্বাপেক্ষা আমাকেই অধিকতর মনস্তাপ ভোগ করিতে হইয়াছে। রামদীন আমার বড় অনুগত ভৃত্য। সে বলে, এ কষ্টের ধাক্কা আমি সামলাইয়া উঠিতে পারিব না। সে দেখিতেছে, আমি এখনও চক্ষে রুমাল দিয়া তাহাকে লিখিতে বলিতেছি! আর কি বলিব?

রাজবাটীর গিন্নি-ঝি নিস্তারিণী ঠাকুরাণীর কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীমতী মাসী-মাতা ঠাকুরাণীর পীড়ার ক্রমশঃ কিরূপ অবস্থা হইতে লাগিল এবং

কিজন্য শ্রীমতী রাণীমাতাকে রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় যাইতে হইল, তাহার বিবরণ আমাকে লিখিতে হইবে। আমি ব্রাহ্মণকন্যা এবং একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের স্ত্রী। অদৃষ্টবশে বিধবা হওয়ায় আমাকে পরের দ্বারস্থ হইয়া জীবনপাত করিতে হইতেছে। তা আমি রাজবাটীতে ছিলাম ভালই বলিতে হইবে। সমস্ত চাকর চাকরাণী, রাঁধুনী প্রভৃতির কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা করাই আমার প্রধান কার্য্য। পূর্ব্ব হইতেই একটু লিখিতে পড়িতে জানিতাম; এজন্য আমার হাত দিয়া সংসারের যে খরচ হইত তাহার হিসাবও আমি রাখিতাম। নিজে রাঁধা বাড়া করিয়া যথা সময়ে একবার আহার করিতাম; কোন কথার মধ্যে থাকিতাম না। সকলেরই যাহাতে উপকার হয় তাহাই করিতাম। কেহই আমার উপর নারাজ ছিল না। সামান্য দাসীটী হইতে রাণী মাতা পর্য্যন্ত সকলেই আমাকে ভাল বাসিতেন। মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা কখন জানি না; সুতরাং যাহা লিখিব তাহার মধ্যে একবর্ণও অসত্য স্থান পাইবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ সকল কথা আমাকে ভবিষ্যতে লিখিতে হইবে এ কথা যদি তখন জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে তারিখ প্রভৃতি সব টুকিয়া রাখিতাম। তাহা রাখি নাই, সুতরাং সময়ের কথা কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া লিখিতে হইবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে—দশ কি পনর দিন থাকিতে—মনোরমা দেবীর কঠিন পীড়া আরম্ভ হয়। প্রায়ই দিবা ৯॥ টা বা ১০ টার সময়ে রাজাদের সকলের খাওয়া দাওয়া হইয়া থাকে। যে দিন তাঁহার পীড়ার আরম্ভ হইয়াছিল, সে দিন সামান্য দিনের মত তাঁহার, চৌধুরাণী ঠাকুরাণী ও রাণীমাতার আহারের স্থান প্রস্তুত করিয়া দাসী তাঁহাদের ডাকিতে গেল। প্রতিদিন তাঁহাদের খাইবার স্থান হওয়া হইতে আহারের শেষ পর্য্যন্ত আমি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতাম। সেদিনও সেইরূপ দাঁড়াইয়াছিলাম। এমন সময়ে দাসী অত্যন্ত ভীতভাবে দৌড়িয়া আসিল এবং বলিল,—"মাসীমা, ঠাকুরাণীর কি হইয়াছে।" আমি বেগে মাসীমা ঠাকুরাণীর ঘরে ছুটিলাম। দেখিলাম তাঁহার অতি ভয়ানক জ্বর হইয়াছে; তিনি একটা কলম হাতে করিয়া পাগলের মত ঘরের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার কোনই কথা, কহিবার শক্তি নাই। আমি সেখানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাণীমাতা সেখানে ছুটিয়া আসিলেন। তিনি ভগ্নীর অবস্থা দেখিয়া এমনই ভীত ও কাতর হইলেন যে তাঁহার দ্বারা তখন কোন কাজ হওয়াই সম্ভব নহে। তখনই চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চৌধুরাণী ঠাকুরাণী ও আমি রোগীকে ধীরে ধীরে বিছানায় শুয়াইয়া দিলাম; আর চৌধুরী মহাশয় পাশের ঘরে বসিয়া যতক্ষণ ডাক্তার আসিয়া না পৌঁছেন, ততক্ষণ রোগীকে যে যে ঔষধ দেওয়া আবশ্যক তাহার ব্যবস্থা করিলেন এবং রাজবাটীর খয়রাতি ঔষধ আনাইয়া স্বহস্তে মাথায় দিবার একটা জল এবং খাইবার একটা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। ঠাকুরাণী ও আমি মনোরমা দেবীর মাথায় সেই জলের পটি দিতে লাগিলাম। রাজা আসিয়াই, অবিলম্বে ডাক্তার ডাকা আবশ্যক বোধে নিকটস্থ রাজপুর হইতে, বিনোদ বাবু ডাক্তারকে ডাকিবার জন্য অশ্বপৃষ্ঠে এক জন দ্বারবানকে পাঠাইয়া দিলেন।

এক ঘণ্টার মধ্যেই বিনোদ বাবু আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। এদেশে বিনোদ বাবুর সম্ভ্রম যথেষ্ট। তিনি বয়েসে প্রবীণ এবং সুবিজ্ঞ। বিনোদ বাবু রোগীর অবস্থা দেখিয়া পীড়া বড় কঠিন বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। আমরা নিতান্ত ভয়াকুল হইলাম। চৌধুরী মহাশয় আসিয়া সরল ভাবে বিনোদ বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন এবং বর্ত্তমান পীড়া সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মত অকপটে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। চৌধুরী মহাশয় ডাক্তার কি না, বিনোদ বাবু তাহা জানিতে চাহিলে, চৌধুরী মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি চিকিৎসক নহেন। অমনই বিনোদ বাবু বলিলেন যে, তিনি সখের ডাক্তারের মতামত শুনিয়া কাজ করিতে প্রস্তুত নহেন। চৌধুরী মহাশয় একটুও রাগত না হইয়া, অতি ভদ্রতার সহিত ঈষৎ হাস্য করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন! চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে তিনি আমাকে বলিয়া গেলেন, তিনি সারাদিন কাঠের ঘরে থাকিবেন, যদি কোন দরকার পড়ে, তাঁহাকে সেখানে সন্ধান করিলেই পাওয়া যাইবে। সেখানে তিনি কেন গেলেন তাহা আমি বলিতে পারি না। বোধ, হয় এরূপ অবস্থায় বাটীতে খুব কম লোক থাকা ভাল ভাবিয়া তিনি অগ্রেই তাহার পথ দেখাইলেন। তাঁহার যেরূপ মহৎ মন তাহাতে তিনি সকলই করিতে পারেন। তিনি অতি সদাশয় ও বড় লোক।

রাত্রিতে মাসী-মাতা ঠাকুরাণীর পীড়া অত্যন্ত বাড়িল এবং যত ভোর হইতে লাগিল ততই জ্বর আরও বাড়িতে লাগিল। চৌধুরাণী ঠাকুরাণী ও আমি পালা করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। রাণীমাতা অকারণ জোর করিয়া আমাদের সহিত বসিয়া কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের শরীর অত্যন্ত কোমল, তাহাতে ভগ্নীর কঠিন পীড়ার চিন্তায় তিনি অত্যন্ত কাতর। এরূপ অবস্থায় শারীরিক অত্যাচারে তাঁহারও পীড়া হওয়া আশ্চর্য্য নহে। বিশেষতঃ সময়ে সময়ে তিনি কাঁদিয়া যেরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন তাহাতে রোগীর ঘরে তাঁহার থাকাই ভাল নহে। রাণীমার মত শান্ত, ভালমানুষ, স্নেহপরায়ণা স্ত্রীলোক আমি আর কখন দেখি নাই। রাজা ও চৌধুরী মহাশয় মাঝে মাঝে আসিয়া সংবাদ লইতে লাগিলেন। বোধ করি, রাণীর ব্যাকুলতা হেতু এবং মনোরমা দেবীর পীড়ার ভাবনায় রাজা যেন কিছু বিচলিত ও অস্থির হইয়াছেন। চৌধুরী মহাশয়ের কিন্তু সম্পূর্ণ স্থির ভাব। আমি শুনিতে পাইলাম তিনি একখানি কেতাব হাতে করিয়া রাজাকে বলিতেছেন,—"চল প্রমোদ, আমাদের পীড়ার সময় বাটীতে বসিয়া থাকিয়া গোল বাড়াইবার দরকার নাই। আমরা বাড়ীতে থাকিতে নানারূপ হেঙ্গাম আপনিই জুটিয়া উঠিবে। আমি কাঠের ঘরে বসিয়া পড়িব মনে করিয়াছি। আমি যখন পড়িতে বসি তখন আমার কাছে কেহ থাকা আমি ভালবাসি না। তোমার যদি আর কোন দিকে যাইবার ইচ্ছা হয় যাইতে পার। নিস্তারিণি! বাছা, খুব সাবধান থাকিবে; আমি আসি এখন।"

রাজা হয়ত উৎকণ্ঠা হেতু এমন ভদ্র ও উদার ভাবে আমার নিকট বিদায় লইলেন না। আমি ভদ্রলোকের মেয়ে, নিতান্ত দায়ে পড়িয়া আমাকে পর-প্রত্যাশী হইতে হইয়াছে; এ বাড়ীর মধ্যে কেবল চৌধুরী মহাশয়ই এ কথা বুঝিয়া আমার সহিত সতত বড় শিষ্ট ব্যব-

হার করিতেন। বাস্তবিকই তাঁহার শরীরে বড় লোকের সমস্ত লক্ষণই আছে। সকলের প্রতিই তিনি সুব্যবহার করিতেন। গিরিবালা নামে রাণীমার যে পরিচারিকা ছিল চৌধুরী মহাশয় তাহার পর্য্যন্ত ভাবনা ভাবিতেন। যখন রাজা তাহাকে জবাব দিয়া তাড়াইয়া দিলেন, তখন চৌধুরী মহাশয় আমাকে তাঁহার পাখী দেখাইতে দেখাইতে,গিরিবালা রাজবাটী হইতে গিয়া এখন কোথায় আছে, সে অতঃপর কি করিবে, ইত্যাদি কত কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এরূপ ব্যবহারই তো বড় লোকের লক্ষণ। আমি যে এ সকল কথা এখনই কেন তুলিলাম তাহা বলা আবশ্যক। শুনিয়াছি কোন কোন লোক চৌধুরী মহাশয়ের চরিত্র সম্বন্ধে নানা কথা কহিয়া থাকে। কিন্তু যে মহাত্মা দুরবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণকন্যার সম্মান করিতে জানেন, একটা সামান্য দাসীর জন্যও পিতৃ-বাৎসল্য প্রকাশ করিয়া উদ্বিগ্ন হন, তাঁহার স্বভাব যদি মন্দ হয়, তবে দিন রাত্রি সমস্তই মিথ্যা।

মাসী-মা ঠাকুরাণীর পীড়ার কিছুই ভাল দেখিতেছি না; বরং দ্বিতীয় রাত্রিতে প্রথম রাত্রির অপেক্ষা বৃদ্ধি। বিনোদ বাবুর যত্নের কোন ত্রুটী নাই; চৌধুরাণী ঠাকুরাণী এবং আমি সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রোগীর সেবা করিতেছি; আর রাণী-মাকে হাজার অনুরোধ করিয়া একবারও রোগীর নিকট হইতে সরাইতে পারিতেছি না। তাঁর কথা কেবল— 'আমার শরীর থাকুক আর যাউক, কিছুতেই আমি দিদির কাছ ছাড়া হইব না।"

দুপর বেলা, অন্যান্য সাংসারিক কাজের আমি একবার নীচে আসিয়াছিলাম। ঘণ্টা খানেক পরে, আবার রোগীর ঘরে যাইবার জন্য ফিরিবার সময় দেখিলাম চৌধুরী মহাশয় কিছু প্রফুল্ল ভাবে কোথা হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বাটীতে উঠিতেছেন। রাজা ঠিক সেই সময়ে কেতাবঘরের দরজার ভিতর হইতে উঁকি দিয়া চৌধুরী মহাশয়কে জিজ্ঞাসিলেন,— "ছুঁড়ী টাকে দেখিতে পাইয়াছ কি ?"

চৌধুরী মহাশয় কথায় কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু তাঁহার প্রকাণ্ড মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রাজা সেই সময়ে মুখ ফিরাইয়া দেখিতে পাইলেন আমি যাইতেছি, অমনই আমার প্রতি নিতান্ত অসভ্য ভাবে, বিরক্তির সহিত দৃষ্টিপাত করিয়া চৌধুরীকে বলিলেন,— "এদিকে আসিয়া সকল কথা আমাকে বল। বাড়ীতে যদি মেয়ে মানুষ থাকিল, তাহা হইলে নিশ্চয় দেখিবে, কখন তাহারা স্থির থাকিবে না —ওপর নীচে, এ ঘর সে ঘর, যাওয়া আসা করিবেই করিবে।"

চৌধুরী মহাশয় কোমল স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"প্রমোদ! নিস্তারিণীর কি এক কাজ ? দেখিতেছ না উহাকে কত দিক ঠেকাইতে হইতেছে ? নিস্তারিণি! এখন রোগীর অবস্থা কিরূপ ?"

"কই! ভাল তো কিছুই দেখিতেছি না।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"বড়ই ভাবনার বিষয়! কিন্তু নিস্তারিণি তোমাকে বড় শ্রান্ত ও কাতর দেখাইতেছে। এরূপ পরিশ্রম তোমাদের আর সহিবে কেন ? আমার বোধ হয়, তোমার ও আমার স্ত্রীর সাহায্যের জন্য কলিকাতা হইতে রোগীর শুশ্রূষার নিমিত্ত পাস করা যে স্ত্রীলোক ধাই পাওয়া যায়, তাহারই এক জনকে আনা আবশ্যক হইয়াছে। কোন বিশেষ কারণে আমার স্ত্রীকে কালি কি পরশ্ব একবার কলিকাতা যাইতে হইবে। তিনি প্রাতঃকালে যাইয়া সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিবেন। আমি এক জন অতি সৎ-স্বভাব পাস করা শুশ্রূষাকারিণীকে জানি। যদি সে

এখন কোথাও নিযুক্ত হইয়া না থাকে, তাহা হইলে তোমাদের সাহায্যের জন্য, তাহাকেই আমার স্ত্রী সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবেন। কিন্তু যতক্ষণ সে আসিয়া না পৌঁছে ততক্ষণ তাহার কথা ডাক্তারকে জানাইয়া কাজ নাই; কারণ আমার দেওয়া লোক শুনিলেই তিনি তাহার উপর নারাজ হইবেন। সে আসুক আগে, তাহার পর তাহার কার্য্য দেখিয়া, তিনি তাহাকে রাখিবার কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না, রাণী-মাতাও কোন অমত করিবেন না। রাণী-মা ভাল আছেন ত নিস্তারিণি? আহা! ভগ্নীর পীড়ায় তাঁহার কি ভয়ানক মনস্তাপই যাইতেছে! তাঁহাকে আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানাইও।"

আমি কৃতজ্ঞভাবে তাঁহার সদাশয়তার উল্লেখ করিতেছি এমন সময়ে চৌধুরী মহাশয়ের বিলম্ব হইতেছে বলিয়া রাজা একটা কটু কথা উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে ঘরের ভিতর আসিতে বলিলেন। ছিঃ ছিঃ! আমি উপরে উঠিলাম। হাজার হউক, আমি মেয়ে মানুষ। অপরের মনের ভাব বলিতে আমার কোন আবশ্যকতা ও অধিকার নাই সত্য, তথাপি রাজা চৌধুরী মহাশয়কে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহা মনে করিয়া আমার বড় কৌতূহল জন্মিল। তাঁহারা একটা স্ত্রীলোকের সন্ধানে আছেন তাহার সন্দেহ নাই। কে সে স্ত্রীলোক? তাহা কে জানে? কেন তাহাকে সন্ধান করা হইতেছে তাহাই বা কে বলিবে? চৌধুরী মহাশয় যেরূপ অপূর্ব্ব ধার্ম্মিক লোক তাহাতে তাঁহার দ্বারা কোন কলঙ্কজনক কর্ম্ম হওয়া অসম্ভব, এ কথা আমি বেশ জানি! কিন্তু আমার অত ভাবিয়া কাজ কি?

রাত্রি সেইরূপ ভাবেই কাটিল—রোগীর অবস্থা কিছুই ভাল বোধ হইল না। পরদিন প্রাতে আমি যত দূর জানি চৌধুরাণী ঠাকুরাণী কাহাকেও তাঁহার যাত্রার কারণ না জানাইয়া, কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। অতঃপর মনোরমা দেবীর সমস্ত ভার আমাকেই গ্রহণ করিতে হইল, আর ভগ্নীর নিকট হইতে একবারও সরিয়া না যাইতে রাণী-মাতার যে প্রকার জেদ তাহাতে হয়ত শীঘ্রই তাঁহারও শুশ্রূষার ভার আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

সেই দিন ডাক্তার বাবুর সহিত চৌধুরী মহাশয়ের দেখা হওয়ায় আবার অধিকতর অকৌশল জন্মিল। চৌধুরী মহাশয় দ্বিপ্রহর কালে পাশের ঘরে আমাকে ডাকিয়া রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। ডাক্তার বাবু ও রাণী সে সময়ে রোগীর নিকটে ছিলেন। আমি চৌধুরী মহাশয়ের কথার উত্তর দিতেছি এমন সময়ে ডাক্তার বাবু বাহিরে যাইবার অভিপ্রায়ে পাশের ঘরে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র চৌধুরী মহাশয় স্বভাবসিদ্ধ উদারতা ও মহত্ত্বের সহিত কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"নমস্কার ডাক্তার বাবু! আমার আশঙ্কা হইতেছে; আপনি রোগীর অবস্থার কোন উন্নতি দেখিতে পাইতেছেন না?"

"আমি আজি সমূহ উন্নতি দেখিতেছি।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"আপনি এই জ্বর রোগে এখনও আগেকার মত মৃদু ঔষধ চালাইতেছেন কি?"

বিনোদ বাবু বলিলেন,—"আমার অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালব্ধ জ্ঞান যাহা আমাকে সঙ্গত বলিয়া প্রতীত করাইয়াছে আমি সেই প্রণালীরই অনুসরণ করিতেছি ও করিব।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"আপনার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান আমার একটী

জিজ্ঞাস্য আছে, অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন। আমি কোন উপদেশ দিতেছি না, কেবল একটা অনুসন্ধান করিতেছি মাত্র। কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে আপনি অনেকটা দূরে বাস করেন, ইহা বোধ করি আপনি অস্বীকার করিবেন না। ঐ সকল স্থানে যে সকল সুশিক্ষিত, জ্ঞানবান্ অভিজ্ঞ, মহামহোপাধ্যায় চিকিৎসক বাস করেন, তাঁহারা এরূপ স্থলে কি প্রণালীতে চিকিৎসা করিয়া থাকেন তাহা আপনি শুনিয়াছেন কি?" তাহার পর কতকগুলি ইংরাজি ঔষধের নাম করিয়া বলিলেন,—"এরূপ রোগে এ সকল ঔষধের কিরূপ কার্য্যকারিতা তাহা আপনি জ্ঞাত আছেন কি?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"যদি আমাকে কোন ব্যবসায়ী লোক একথা জিজ্ঞাসা করেন, আমি তাঁহার উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি। আপনি ব্যবসায়ী নহেন, আপনার কথায় উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত নহি।" এই কথা বলিয়া বিনোদ বাবু প্রস্থানের জন্য অগ্রসর হইলেন। চৌধুরী মহাশয় একটুও অপ্রতিভ না হইয়া বলিলেন,—"নমস্কার বিনোদ বাবু, নমস্কার।"

রাত্রিতে চৌধুরাণী একজন শুশ্রূষাকারিণী সঙ্গে লইয়া বাটী ফিরিলেন। শুনিলাম তাহার নাম রমণী। তাহার চেহারা দেখিয়া এবং তাহার সহিত দুই একটা কথা কহিয়া জানিতে পারিলাম, সে বাঙ্গাল! রমণীর বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। দেখিতে বেঁটে, রোগা, কালো, কটা চক্ষুযুক্ত। তাহার পরিচ্ছদের খুব পারিপাট্য। হাতে সোণার বালা, গলায় হেলে হার, গায়ে বাহারে জামা, পরিধান সিমলার চওড়া কালা পেড়ে উৎকৃষ্ট সাটী। তাহার কথা-বার্ত্তা খুব কম এবং ব্যবহার যেন খুব চাপা রকম।

চৌধুরী মহাশয়ের অপূর্ব্ব উদারতা; এত মনান্তরের পরও তিনি ব্যবস্থা করিলেন, যতক্ষণ বিনোদ বাবু দেখিয়া মত না দিবেন, ততক্ষণ এই নূতন লোক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পাইবে না। আমি সমস্ত রাত্রি রোগীর পার্শ্বে বসিয়া কাটাইলাম। নূতন লোক রোগীর শুশ্রূষার ভার লয় ইহা রাণী-মাতার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা। সে বাঙ্গাল বলিয়াই কি তাঁহার এত বিদ্বেষ? রাণী মাতার ন্যায় সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের পক্ষে এরূপ অনুদারতা নিতান্ত বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই।

পরদিন প্রাতে ডাক্তারের অনুমোদনের জন্য রমণীকে দাসী মা ঠাকুরাণীর শয়ন গৃহের পাশের ঘরে বসাইয়া রাখা হইল। সে নিতান্ত অপরিচিত বলিয়া আমিও তাহার নিকটে থাকিলাম। বুঝিতে পারিলাম, বিনোদ বাবু তাহাকে নিযুক্ত করায় অমত করিবেন না, এরূপ কোন সন্দেহ তাহার মনে নাই। সে স্বচ্ছন্দভাবে ও নিশ্চিন্ত মনে জানালায় মুখ বাড়াইয়া হাওয়া খাইতে লাগিল। এ ব্যবহারে অন্য লোকে হয়ত অন্য অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু আমি ইহা তাহার অসাধারণ মানসিক শক্তির পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতেছি। ডাক্তার উপরে না আসিয়া আমাকে নীচে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি আসিলে তিনি আমাকে বলিলেন,—"এই নূতন লোকের কথা বলিবার জন্য আপনাকে ডাকাইয়াছি।"

"আপনি কি বলিতে চান?"

"ঐ যে মোটা বাঙ্গালটা সর্ব্বদা আমার কাজের ব্যাঘাত করিতে আইসে, উহারই স্ত্রী কলিকাতা হইতে এ লোকটাকে আনিয়াছে। নিস্তারিণী ঠাকুরাণী, ও মোটা বুড়াটা একটা হাতুড়ে।"

এরূপ করিয়া কথা বলা নিতান্তই অস-

ভ্যতা। আমি বলিলাম,—"আপনার মনে করা উচিত যে, উনি একজন খুব বড় লোক।"

"আরে রেখে দেও তোমার বড় লোক, আমি অমন ঢের দেখিয়াছি। সে যাহাই হউক, ঐ মেয়ে মানুষটার কথা স্থির করা যাউক। আমি তো তাহার থাকায় আপত্তি করিতেছিলাম।"

"তাহাকে না দেখিয়াই?"

হাঁ। সে যখন আমার আনীত লোক নয় তখন আর দেখিব কি? এ কাজের জন্য আজি কালি অনেক লোক পাওয়া যায় এবং আমিও অনেককে জানি। যখন রোগীর জীবন মরণের সমস্ত দায়িত্ব আমার স্কন্ধে এবং যখন এই স্ত্রীলোকের হাতেই ঔষধ খাওয়ান, রোগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করা, আমার অনুপস্থিত কালের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করা প্রভৃতি সমস্ত কাজের জন্য আমাকে নির্ভর করিতে হইবে তখন এ লোক আমার দ্বারা আনীত ও অনুমোদিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এ আপত্তি আমি রাজাকে জানাইয়াছি। রাজা বলেন, তাঁহার স্ত্রীর পিসী কষ্ট করিয়া কলিকাতা হইতে যে লোককে আনিয়াছেন তাহাকে এক বার কাজে না লাগাইয়াই বিদায় করিয়া দিলে তাঁহার মনে বিশেষ কষ্ট হইতে পারে। এ কথাটা কতকটা সঙ্গত বটে, এবং ইহার উপর কোন প্রতিবাদ চলে না। কিন্তু আমি স্বীকার করাইয়া লইয়াছি, যদি তাহার কোন অসন্তোষজনক কার্য্য দেখি তাহা হইলে তাহাকে তখনই তাড়াইয়া দিতে হইবে। রাজা তাহাতে রাজি হইয়াছেন। আমি আপনার উপর খুব নির্ভর করি। এই নূতন লোকের কাজ কর্ম্মের উপর আপনার প্রথম দুই একদিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দেখিতে হইবে, সে রোগীকে আমার ঔষধ ছাড়া আর কোন ঔষধ না খাওয়ায়। আপনার এই বাঙ্গাল বড় লোক রোগীকে তাহার হাতুড়ে ঔষধ খাওয়াইবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছে; তাহার স্ত্রীর আনীত লোক কতকটা তাহাদেরই পক্ষে হওয়া সম্ভব; বুঝিয়াছেন? চলুন এখন, উপরে যাওয়া যাউক। রমণী সেখানে আছে কি? তাহাকে দুই একটা কথা বলিতে চাহি।"

আমরা উপরে আসিয়া দেখিলাম, রমণী তখনও জানালায় দাঁড়াইয়া হাওয়া খাইতেছে। আমি ডাক্তারের নিকট তাহাকে পরিচিত করিয়া দিলে, ডাক্তারের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি এবং তাঁহার কঠোর প্রশ্ন তাহাকে একটু বিচলিত করিতে পারিল না। সে ধীর ভাবে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল এবং ডাক্তারের নানা বিরুদ্ধচেষ্টা সত্ত্বেও সে আপন কার্য্যে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতারই পরিচয় দিতে লাগিল। ইহা নিশ্চয়ই তাহার হৃদয়বল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। আমরা তিন জনেই রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলাম।

রমণী খুব যত্নের সহিত রোগীকে দেখিল; রাণী-মাতাকে প্রণাম করিল; দুই একটা সামগ্রী গুছাইয়া রাখিল; তাহার পর যতক্ষণ কোন দরকার না পড়ে ততক্ষণের জন্য, ঘরের এক কোণে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল, এই নূতন লোকের আগমনে রাণী ঠাকুরাণী কিছু ত্যক্ত ও বিচলিত হইলেন বোধ হইল। পাছে মনোরমা দেবীর ঘুম ভাঙ্গে এই ভয়ে কেহ কোন কথা কহিলেন না। কেবল ডাক্তার ফুস্ ফুস্ করিয়া রাত্রির খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। আমিও তাঁহাকে সেইরূপ ভাবে বলিলাম,—"সমানই।" তাহার পর ডাক্তার বাহিরে আসিলেন। রাণী-মাও, বোধ করি রমণীর কথা

বলিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। বাঙ্গাল হউক আর যাহাই হউক, আমি স্থির করিলাম রমণী বেশ কাজের লোক এবং সে যে কর্ম্মে আসিয়াছে,সে কর্ম্মের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

ডাক্তার বাবুর উপদেশ অনুসারে আমি প্রথম তিন চারি দিন অতিশয় সতর্কতার সহিত রমণীর কাজ কর্ম্ম দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু কোন সময়েই তাহার কোন সন্দেহজনক কার্য্য দেখিতে পাইলাম না। রাণী-মাও বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহার কর্ম্ম কাজ দেখিতেন; তিনিও কোন বিরুদ্ধ ব্যবহার দেখিতে পাইলেন না। সে চৌধুরী মহাশয়ের সহিত একটী কথাও কহিত না; ডাক্তার বাবুর দেওয়া ঔষধ ছাড়া আর কোন ঔষধ সে কখনই খাওয়াইত না, এবং রোগীর শুশ্রূষার জন্য যথাবিহিত যত্ন করিত। যে ভাল তাহাকে ভাল না বলিলে ধর্ম্মে ভার সহিবে কেন?

রমণী আসার বোধ হয় চারিদিন পরে কোন বিশেষ কাজের জন্য চৌধুরী মহাশয়কে কলিকাতা যাইতে হইল। গমনকালে তিনি রাণী-মাতাকে, আমার সমক্ষে বিশেষ উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন,—"যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আরও দুই চারি দিন বিনোদ বাবুকে বিশ্বাস করিতে পারেন। কিন্তু যদি ঐ সময়ের মধ্যে কোন বিশেষ উপকার না দেখা যায় তাহা হইলে কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনিতে হইবে। এ গাধা ডাক্তারকে তখন চটাইলে ক্ষতি নাই, মনোরমা দেবীর জীবন বড় না ডাক্তারের রাগ বড়? আমি আপনাকে নিতান্ত উদ্বেগের সহিত হৃদয়ের হৃদয় হইতে এই সকল কথা বলিয়া রাখিতেছি।"

রাণী-মাতা সভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন এবং চৌধুরী মহাশয়ের এত আত্মীয়তাপূর্ণ আন্তরিক উদ্বেগোক্তির একটা উত্তরও দিলেন না। বোধ করি ভগ্নীর পীড়ার চিন্তায় তাঁহার মনের ভাবান্তর হইয়াছে। চৌধুরী মহাশয় চলিয়া গেলে রাণী-মা আমাকে বলিলেন,—"বল দেখি নিস্তারিণি, এখন করি কি? আমার এমন কেহ আত্মীয় নাই যে এ বিপদে একটা উপদেশ দেয়। তোমার কি বোধ হয় বিনোদ বাবুর চিকিৎসা ভাল হইতেছে না? তিনি নিজে আমাকে আজি প্রাতে বলিয়াছেন, ভয়ের কোন কারণ নাই এবং অন্য ডাক্তার আনিবার কোন দরকার নাই।"

আমি বলিলাম,—"মা! আমাদের ডাক্তার বাবু যতই কেন ভাল হউন না, আমি কিন্তু এ অবস্থায় চৌধুরী মহাশয়ের উপদেশই ভাল মনে করি।"

রাণী-মাতা সহসা আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইলেন এবং কেন বলিতে পারি না, নিতান্ত হতাশভাবে আপন মনে বলিতে লাগিলেন,—"তাঁহার উপদেশ! ভগবান্ রক্ষা কর—তাঁহার উপদেশ!"

আমার যেন মনে হইতেছে চৌধুরী মহাশয় এক সপ্তাহ কাল ফিরিলেন না। তাঁহার অনুপস্থিতি সেতু রাজার নানা প্রকার ভাবান্তর দেখা যাইতে লাগিল। বাটীতে রোগ শোকের জ্বালায় তিনি কিছু অভিভূত হইয়াছেন বলিয়াও আমার বোধ হইল। সময়ে সময়ে তাঁহার ভাব নিতান্ত চঞ্চল বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। তিনি একবার বাটীতে আসিতেছেন, একবার বাহিরে যাইতেছেন, কখন বা আপন মনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। রাণীমাতার শরীর ক্রমেই খারাপ হইতেছিল, রাজা সেজন্য আন্তরিক দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন ছিলেন বোধ হয়। তিনি সততই বিশেষ

আগ্রহের সহিত মাসী-মা ও রাণী-মার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেন। আমার বোধ হয় তাঁহার কর্কশ ভাব অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং এখন তাঁহার মন অনেক কোমল হইয়াছে। কিন্তু চাকর বাকরের মুখে শুনা যায় যে তিনি ইদানীং কিছু বেশী মাত্রায় মদ খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহা হইলেও, চাকর বাকরের কখন এরূপ কথা বলা উচিত নহে এবং আমাদের সে সকল কথা ধর্ত্তব্যই নহে।

কয়েকদিনের মধ্যে মাসী-মার অবস্থা বেশ ভাল হইতে লাগিল বোধ হইল। বিনোদ বাবুর উপর আমাদের শ্রদ্ধা খুব বাড়িয়া উঠিল তিনিও মনে খুব ভরসা পাইলেন, রাণী-মাকেও তিনি বলিলেন যে, এ রোগের সম্বন্ধে তাঁহার মনে কখন ভয় ছিল না, এখন তো নাইই। যদি এখনও কোন প্রকারও আশঙ্কা মনে উদয় হয় তাহা হইলে তিনি নিজে তৎক্ষণাৎ কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনাইবার ব্যবস্থা করিবেন। যদিও এখন রমণীর জন্য অন্য কাহাকে রোগীর আর কোন ভারই লইতে হয় না, তথাপি চৌধুরাণী ঠাকুরাণী প্রায় সারাদিনই মাসী-মার কাছে থাকিতেন। তিনিই কেবল ডাক্তারের আশ্বাসবাক্যে এবং রোগীর অবস্থা দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি আমাকে একদিন গোপনে বলিলেন যে, যতক্ষণ তাঁহার স্বামী ফিরিয়া আসিয়া মত প্রকাশ না করিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার মনে কোন ভরসা হইতেছে না। আর তিন দিনের মধ্যে চৌধুরী মহাশয় ফিরিয়া আসিবেন লিখিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিদিন নিয়মিত রূপে চিঠি লেখালেখি চলে। চৌধুরী মহাশয় ও চৌধুরাণী ঠাকুরাণী বিবাহিত জীবনের আদর্শ স্থানীয়।

তৃতীয় দিনের রাত্রিতে আমি মাসী-মার অবস্থার মন্দ পরিবর্ত্তন দেখিয়া বড়ই ভয় পাইলাম। রমণীও সে পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিল। রাণী-মা তখন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া বসিবার ঘরে এক খানি সোফায় পড়িয়া ঘুমাইতেছিলেন। আমরা তাঁহাকে কোন কথা জানাইলাম না। বিনোদ বাবু নির্দ্দিষ্ট সময়ে রোগী দেখিতে আসিলেন। রোগীকে দেখিবা মাত্র তাঁহার মুখের ভাবান্তর হইল। তিনি সে ভাব লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহাকে দেখিয়া ভীত ও চিন্তিত বলিয়া বোধ হইল। তখনই তিনি লোক পাঠাইয়া বাটী হইতে ঔষধ আনাইলেন এবং তাঁহার আদেশক্রমে রাজবাটীতে তাঁহার শয়নের স্থান হইল। আমি তাঁহাকে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসিলাম,—"পীড়া কি নিতান্ত শক্ত হইয়াছে ?" তিনি বলিলেন—"আমার তো সেই ভয়ই হইতেছে। বোধ হয় যেন রোগটা ছেঁয়াচে ; কালি প্রাতেঠিক বুঝিতে পারিব।"

বিনোদ বাবুর উপদেশক্রমে সে রাত্রে রাণী-মাতাকে এ সকল সংবাদ কিছুই জানান হইল না। তাঁহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে বলিয়া ডাক্তার তাঁহাকে সে রাত্রে পীড়িতার ঘরে আসিতে নিষেধ করিলেন। তাহাতে রাণী-মা কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং ডাক্তারের কথা অবহেলা করিয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু শেষে তাঁহাকে ডাক্তারের কথাই শুনিতে হইল।

পরদিন প্রাতে বিনোদ বাবুর পত্র লইয়া একজন সরকার কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনিতে গেল। যত শীঘ্র সম্ভব সে ডাক্তার লইয়া ফিরিবার ভার লইল। সে লোক চলিয়া যাওয়ার আধ ঘণ্টা পরে চৌধুরী মহাশয়, এই সুদীর্ঘ অনুপস্থিতির পর কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পৌছিলেন। তখনই

চৌধুরী তাঁহাকে মাসী-মার নিকটে লইয়া আসিলেন। মাসী-মা তখন আর মানুষ চিনিতে পারেন না। বোধ হইল যেন পরমাত্মীয়কে তিনি শত্রু বলিয়া মনে করিতেছেন। কারণ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার শয্যার নিকটে আসিলে, মাসী-মার অস্থির ঘূর্ণায়মান নেত্র ক্রমে চৌধুরী মহাশয়ের মুখ স্থির হইয়া দেখিতে লাগিল; তখন সেই চক্ষুর এরূপ ভাব হইল যে, আমি জন্মে কখন তাহা ভুলিতে পারিব না। চৌধুরী মহাশয় মাসী-মার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার কপালে হাত দিয়া দেখিলেন, এবং অতি মনোযোগের সহিত তাঁহার প্রতি অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিলেন। তাহার পর সেখান হইতে উঠিয়া, যৎপরোনাস্তি ঘৃণা ও ক্রোধসূচক দৃষ্টির সহিত, ডাক্তারের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। বিনোদ বাবুও ভয়ে ও রাগে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চৌধুরী মহাশয় তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"কখন হইতে এই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে ?"

আমি যাহা জানিতাম বলিলাম। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এরূপ হওয়ার পর হইতে রাণী-মা এ ঘরে আসিয়াছিলেন ?" আমি বলিলাম যে, তিনি আসেন নাই; ডাক্তার তাঁহাকে জোর করিয়া আসিতে বারণ করিয়াছেন।

তিনি আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"সর্ব্বনাশ কতদূরে গড়াইয়াছে তাহা তুমি আর রমণী জানিতে পারিয়াছ কি ?" আমি বলিলাম যে, আমরা কেবল বুঝিয়াছি যে রোগটা যেন ছোঁয়াচে।

তিনি আমার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,-"ইহাকে ডাক্তারী মতে টাইফএড জ্বর বলে; বাঙ্গালা মতে ইহাকে পিত্তশ্লেষ্মিক বিকার বলিলেও বলা যায়। এ জ্বর এদেশে খুব কম হয়; তাই লোকে ইহার কথা বড় জানে না; কিন্তু রমণী বোধ হয় ইহার কথা জানে। ইহা অতি ভয়ানক রোগ এবং বড় সংক্রামক।"

এতক্ষণে বিনোদ বাবু প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,—"না, ইহা টাইফএড জ্বর নহে। এখানে আর কাহারও কোন কথা বলিবার অধিকার নাই; আমিও কাহারও কোন কথা শুনিতে চাহি না। আমার সাধ্যমত কর্ত্তব্য পালনে আমি ক্রটী করি নাই,—"

চৌধুরী মহাশয় অঙ্গুলি-সঙ্কেতে রোগীর শয্যা দেখাইয়া তাঁহার কথায় বাধা দিলেন। ডাক্তার বাবু ইহাতে অধিকতর রাগত হইয়া বলিলেন,—"আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়াছি! কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনিতে লোক গিয়াছে। আমি সেই ডাক্তার ব্যতীত আর কাহারও সহিত রোগের বিচার করিতে সম্মত নহি। আপনি রোগীর ঘর হইতে চলিয়া যাউন।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—আমি যাদশাপন্ন জীবের সাহায্যার্থে এখানে আসিয়াছি এবং যদি কলিকাতা হইতে ডাক্তার আসিতে বিলম্ব ঘটে তাহা হইলে, সেই কারণে আবার এখানে আসিব। আমি আপনাকে আবার বলিতেছি, জ্বর টাইফএডের আকার ধারণ করিয়াছে এবং আপনার কদর্য্য চিকিৎসা প্রণালীই এরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ। যদি এই মহিলার মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে বিচারালয়ে আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, আপনার মূর্খতা ও একগুঁয়েমি ইহার মৃত্যুর কারণ।"

চৌধুরী মহাশয়ের কথা সমাপ্ত হইবামাত্র পার্শ্বের বসিবার ঘরের দ্বার খুলিয়া গেল এবং রাণী-মাতা সে স্থান হইতে অতিমাত্র দৃঢ়তার

সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"আমি কাহারও কথা শুনিব না,—আমি ঘরের ভিতর যাইবই যাইব।"

চৌধুরী মহাশয় সকল সময়েই অতিশয় সাবধান এবং কোন বিষয়েই কখনও তাঁহার কোন ভুল হয় না। কিন্তু আজি কেমন তাড়াতাড়িতে তিনি সংক্রামক রোগের নিকটে রাণী-মাতাকে আসিতে বারণ করিতে ভুলিয়া গেলেন এবং পাশের ঘরে সরিয়া গিয়া তাঁহার আগমন পথ পা্কার করিয়া দিলেন। এক্ষেত্রে বিনোদ বাবুর অধিকতর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেল। রাণী-মাতা ঘরের মধ্যে পা বাড়াতেই তিনি গিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়ালেন এবং বলিলেন,—"আপনাকে বড়ই কষ্টের সহিত নিবেদন করিতেছি যে, যতক্ষণ এই জ্বর সংক্রামক হওয়ার আশঙ্কা দূর না হইতেছে, ততক্ষণ আমি আপনাকে বিনয় সহকারে অনুরোধ করিতেছি, আপনি এঘরে আসিবেন না।"

রাণী-মাতার বাহুদ্বয় ঝুলিয়া পড়িল এবং তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ডাক্তারের হাতের উপর পড়িয়া গেলেন। আমি ও চৌধুরাণী ঠাকুরাণী তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া তাঁহকে ধরিলাম এবং ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে তাঁহার নিজ ঘরে লইয়া গেলাম। চৌধুরী মহাশয় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রাণী-মার ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত গমন করিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিলেন; তাঁহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়াছে এই সংবাদ দিলে তিনি চলিয়া আসিলেন।

আমি ডাক্তারের নিকট আসিয়া তাঁহাকে জানাইলাম যে রাণী-মা এখনই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। তিনি তাঁহাকে আশ্বাস দিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। চৌধুরী মহাশয় ও রাজা সময়ে সময়ে রোগীর খবর লইতে লাগিলেন। মহোদ্বেগে ধীরে ধীরে সময় কাটিতে লাগিল। অবশেষে বেলা ৫টা কি ৬টার সময় কলিকাতার ডাক্তার আসিয়া পৌছিলেন। আমাদের বিনোদ বাবুর চেয়ে এ ডাক্তারের বয়স কম। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া তাঁহাকে খুব গম্ভীর ও স্থির বুদ্ধির লোক বলিয়া বোধ হইল। পূর্ব্ব চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহার কি মত দাঁড়াইল তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু আমি বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিলাম যে, তিনি বিনোদ বাবুর চেয়ে আমাকে আর রমণীকেই বেশী প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং বিনোদ বাবুর কথা বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিতেছেন এমনও বোধ হইল না। এই সকল দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ হইল যে পীড়া সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত চৌধুরী মহাশয় যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহাই ঠিক। তাহার পর যখন বিনোদ বাবু আসল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন আমরা তাঁহার ভুল বেশ জানিতে পারিলাম।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জ্বরটা কি রকম দেখিতেছেন?"

কলিকাতার ডাক্তার বলিলেন,—"টাইফএড জ্বর, তাহার কোনই সন্দেহ নাই।"

কলিকাতার ডাক্তার বাবু এই কথা বলার পর রমণী যেরূপ আনন্দসূচক ঈষৎ হাস্যের সহিত আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, আমার বোধ হয়, স্বয়ং চৌধুরী মহাশয় এখানে উপস্থিত থাকিলে সেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতেন না। চৌধুরী মহাশয়ের ভয়ে তাহার এত আনন্দ কেন?

ডাক্তার আমাদিগকে আবশ্যক মত উপদেশ দিয়া এবং আর পাঁচ দিন পরে আবার আসিবেন স্থির করিয়া, বিনোদ বাবুকে ডাকিয়া লইয়া গোপনে কি কথাবার্ত্তা কহিতে লাগি-

লেন। তিনি মাসী-মার আরোগ্য হওয়া না হওয়া সম্বন্ধে কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন না। বলিলেন যে,—"এরূপ রোগের এ অবস্থায় কিছুই বলা সম্ভব নহে।"

নিতান্ত উদ্বেগের সহিত পাঁচ দিন অতিবাহিত হইল। মাসী মার অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। রাণী-মাতার শরীরের অবস্থা কিন্তু ক্রমশঃ ভাল হইতে লাগিল। তিনি প্রতিদিন অন্ততঃ দুই তিন বার করিয়া রোগীর গৃহে আসিয়া শয্যা হইতে দূরে দাঁড়াইয়া মাসী-মাকে দেখিয়া যাইবার নিমিত্ত ডাক্তার বাবুর নিকট নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। আমার বোধ হয়, ডাক্তার দেখিলেন তাঁহাকে বুঝাইয়া কোন ফল হইবে না; তখন তিনি অনিচ্ছা সহকারে তাঁহাকে সে অনুমতি না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। সুখের বিষয়, এ কয় দিনের মধ্যে ডাক্তারের সহিত চৌধুরী মহাশয়ের আর কোন বচসা হয় নাই। তিনি সর্ব্বদাই রাজার সঙ্গে নীচে থাকিতেন; রোগীর যখন যে সংবাদ লইতেন তাহা লোক দ্বারা লইতেন।

পঞ্চম দিনে কলিকাতার ডাক্তার আবার আসিলেন এবং আমাদিগকে কিঞ্চিৎ ভরসা দিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, এ ব্যাধির প্রথম দশ দিন কাটিয়া গেলে ঠিক বুঝা যায় যে রোগের কিরূপ গতি দাঁড়াইবে। অতএব সেই দশম দিবসে তিনি তৃতীয় বার রোগীকে আবার দেখিয়া যাহা বলিবার হয় বলিবেন। এই পাঁচ দিনের মধ্যে চৌধুরী মহাশয় এক দিন কলিকাতায় গিয়া সেই রাত্রেই ফিরিয়া আসিলেন।

দশম দিবসে আমরা সকল ভাবনার দায় হইতে নিষ্কৃত পাইলাম। কলিকাতার ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গেলেন মাসী মা সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়াছেন। আর তাঁহার ডাক্তারে দরকার নাই; যেমন যত্ন তদ্বিবত চলিতেছে এখন এইরূপ চলিলেই আর কিছুই করিতে হইবে না। এই শুভ সংবাদ শুনিয়া রাণীমাতা নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীর এতই দুর্ব্বল হইয়াছিল যে, এ আনন্দ সহ্য করিয়া উঠিতে পারিলেন না এবং তাঁহার দেহ ও মন এতই অবসন্ন হইল যে, তিনি দুই এক দিবসের মধ্যে আপনার শয্যা হইতে উঠিতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন। তাঁহার জন্য বিনোদ বাবু আপাততঃ বিশ্রাম ও পরে স্থানপরিবর্ত্তন ব্যবস্থা করিলেন। ভাগ্যক্রমে তাঁহার অবস্থা আরও যে মন্দ হইল না তাই রক্ষা, নতুবা আমাদিগকে হয়ত বড় বিব্রত হইতে হইত। কারণ সেই দিন চৌধুরী মহাশয়ের সহিত ডাক্তার বাবুর ভয়ানক বচসা হইল, এবং ডাক্তার বাবু রাজবাটীতে যাতায়াত ছাড়িয়া দিলেন।

আমি ঝগড়ার সময়টায় উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু জানিতে পারিলাম, এই জ্বরের পর মাসী-মাকে কি পরিমাণ আহার দেওয়া আবশ্যক তাহাই উপলক্ষ করিয়া ঝগড়ার উৎপত্তি হয়। বিনোদ বাবু পূর্ব্ব হইতেই চৌধুরী মহাশয়ের কথা বিষ বলিয়া জ্ঞান করিতেন; এখন তো তাঁহার রোগী নিরাপদ হইয়াছেন, এখন তাঁহার কথা আরও বিরক্তিকর মনে করিবেন তাহাতে বিচিত্রতা কি? চৌধুরী মহাশয় সে দিন তাহার চিরাভ্যস্ত আত্মসংযম ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়া ডাক্তার বাবুর রোগের অবস্থা বুঝিতে যে ভুল হইয়াছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে অতিরিক্ত বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। ডাক্তার বাবু এ সকল ব্যবহার রাজার গোচর করিয়া বলিলেন যে, এরূপ অত্যাচার হইলে তাঁহাকে অগত্যা

রাজবাটীতে আসা বন্ধ করিতে হইবে। রাজা যে উত্তর দিলেন, তাহা নিতান্ত মন্দ না হইলেও, এক্ষেত্রে ডাক্তার বাবুর বিরক্তি উৎপাদন করিল। তিনি সেই দিনই রাগ করিয়া রাজবাটী পরিত্যাগ করিলেন এবং পরদিনই আপনার প্রাপ্য টাকার জন্য বিল পাঠাইয়া দিলেন।

অতঃপর আমাদিগকে কাজেই ডাক্তারের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। তা হউক, ডাক্তারের কিছু এখন আর দরবার নাই; এখন কেবল সুপথ্য খাওয়া আর নিয়মে থাকাই দরকার। তবে আরও দিনকতক, এ ডাক্তার না হউক, অন্য কোন ডাক্তার যাওয়া আসা করিলে ভাল দেখাইত। রাজা ভাবিলেন, অনর্থক অন্য ডাক্তার আনিয়া কি লাভ? যদিই মাসী-মার পীড়া দৈবাৎ আবার বাড়িয়া উঠে তখন একজন ডাক্তার ডাকিলেই চলিবে। আপাততঃ সামান্য দরকারে চৌধুরী মহাশয়ের পরামর্শই যথেষ্ট। কথা সকলই সত্য বটে, কিন্তু তথাপি আমি মনে মনে কিছু উদ্বিগ্ন থাকিলাম। রাজা ও চৌধুরী মহাশয়ের পরামর্শে রাণী-মার নিকট হইতে আমরা ডাক্তারের চলিয়া যাওয়ার কথা লুকাইয়া রাখিলাম। যদিও তাঁহার শরীরের অবস্থা বিবেচনায় ভাল ভাবিয়াই আমরা এ প্রতারণা করিতে লাগিলাম সত্য, তথাপি এ কার্য্যটা নিতান্ত অবৈধ ও অসঙ্গত বলিয়া আমার মনে হইল।

সেই দিনের আর একটী ঘটনা আমার চিত্তের অশান্তি অত্যন্ত বাড়াইয়া দিল। রাজা আমাকে কেতাবঘর হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন; সেখানে চৌধুরী মহাশয়ও ছিলেন। কিন্তু আমি তথায় যাইবামাত্র তিনি উঠিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা আমাকে বলিলেন,—"নিস্তারিণি! একটু বিশেষ কাজের কথা বলিবার জন্য তোমাকে ডাকাইয়াছি। কথাটা অনেক দিন হইতে বলিব মনে করিয়াছি, কিন্তু বাটীতে সম্প্রতি নানা প্রকার বিভ্রাট উপস্থিত হওয়ায় তাহা বলিতে পারি নাই। নানা কারণে, তোমাকে ছাড়া, অন্যান্য সকল চাকর বাকরকে জবাব দেওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। বুঝিয়া দেখ, মনোরমা দেবী যেই একটু ভাল হইয়া উঠিবেন সেই তিনি ও তাঁহার ভগ্নী পশ্চিমে বেড়াইতে যাইবেন; তাহা না করিলে তাঁহাদের শরীর থাকিবে না। চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী কলিকাতায় বাসা ঠিক করিয়াছেন, তাঁহারা শীঘ্রই সেই বাসায় চলিয়া যাইতেছেন। কেবল আমার জন্য এত লোক থাকার কোনই দরকার দেখিতেছি না। বিশেষতঃ, আমিও যে এখানেই বসিয়া থাকিব তাহারই বা স্থির কি? অতএব এ সকল লোককে আর অনর্থক একটী দিনও রাখিবার আবশ্যক নাই। আমি কোন কাজের হবে হচ্চে শুনিতে ভাল বাসি না। তুমি ইহাদের হিসাব নিকাশ করিয়া সকলকে যত শীঘ্র পার বিদায় করিয়া দেও।"

আমি অবাক্ হইয়া রাজার কথা শুনিলাম। তাঁহার কথা শেষ হইলে বলিলাম,—"সকলকেই কি জবাব দিতে হইবে? আপনি যদিই একা থাকেন তাহা হইলেও, আর কিছু হউক না হউক, একটা রাঁধুনি তো আপনার জন্য রাখিতে হইবে।"

তিনি বলিলেন,—"কিছু না, আমার কাজ আমি এক রকমে চালাইয়া লইব, সে জন্য কোন ভাবনা নাই। ভাল, যদি নিতান্তই তোমার কাহাকে রাখিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে রামীকে রাখিয়া দেও। তাহার দ্বারা অনেক কাজ পাওয়া যাইতে পারিবে।"

আমি বলিলাম,—"বলেন কি? আপনি

যাহার কথা বলিতেছেন, সমস্ত চাকর চাকরাণীর মধ্যে সে নির্ব্বোধের একশেষ। তাহার দ্বারা কি কাজ পাওয়া যাইবে?"

"তাহাকেই রাখিয়া দেও, আর না হয় গ্রামের ভিতর হইতে একটা ঠিকা ঝি আনিয়াই লও। সে আবশ্যকমত কাজ কর্ম্ম করিয়া দিয়া চলিয়া যাইবে, এখানে তাহার দিন রাত্রি থাকিবার দরকার নাই। তোমাকে যেমন বলিতেছি তুমি তাহাই কর। তোমাকে কোন কথা বলিলে তুমি বড় তর্ক করিয়া থাক। আমার ইচ্ছায় কাজ হইবে, না তোমার ইচ্ছায় কাজ হইবে? কতকগুলা নিকর্ম্মা লোক লইয়া, ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায় বসিয়া গল্প করিবার সুযোগ যাইতেছে দেখিয়া তোমার এ ব্যবস্থা ভাল লাগিতেছে না বুঝি? যাও, যাহা বলিলাম তাহা এখনই শেষ করিয়া ফেল।"

আমি "যে আজ্ঞা" বলিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। এ কথার পর আর কোন কথা বলা চলে কি? মাসী-মা ঠাকুরাণীরও শরীর ভাল নয়; এ সময়ে আমি যদি যাই তাহা হইলে তাঁহাদের বড়ই কষ্ট হইবে। কাজেই আমাকে চুপ করিয়া রাজার এই তিরস্কার সহিয়া থাকিতে হইল; নচেৎ আমিও তখনই কাজে জবাব দিয়া চলিয়া যাইতাম। সেই দিনেই আমি ঝি চাকর প্রভৃতি সকলকে জবাব দিয়া বাড়ী ফাঁক করিয়া ফেলিলাম। রাজা নিজে কোচম্যান ও সহিসের দলকে জবাব দিলেন এবং একটী বাদে আর সকল ঘোড়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। কেবল আমি রাণী আর একজনমাত্র মালী থাকিলাম। মালী বাগানের মধ্যে তাহার ঘরে থাকিত। যে একটা ঘোড়া থাকিল, সেই মালীই তাহার তদারক করিবে ব্যবস্থা হইল। এই বৃহৎ পুরী একবারে লোকহীন হইয়া গেল; রাণী-মাতা পীড়িত হইয়া ঘরে পড়িয়া থাকিলেন; মাসী-মাতার এই কাতর অবস্থা; ডাক্তার রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন; এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার মন নিতান্ত খারাপ হইয়া উঠিল। আমি তখন কামনা করিতে লাগিলাম, তাঁহারা শীঘ্র সারিয়া উঠুন, তাহার পর আর আমার যেন এখানে থাকিতে না হয়।

দশম পরিচ্ছেদ।

রাজবাটীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া এখানে থাকিতে আমার নিতান্ত অনিচ্ছা জন্মিয়াছিল; শীঘ্র এখান হইতে দুই চারি দিনের নিমিত্ত স্থানান্তর যাইবার সুযোগ উপস্থিত হইল। দাসদাসীকে জবাব দেওয়ার দুই এক দিন পরে রাজা আবার আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমি গিয়া দেখিলাম এবারও আগেকার মত রাজা ও চৌধুরী মহাশয় দুই জনে এক জায়গায় বসিয়া আছেন। কিন্তু সে বার আমি যাওয়ার পর চৌধুরী ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, এবার সেরূপ না করিয়া তিনি সেখানেই বসিয়া থাকিলেন এবং রাজা আমাকে যে সকল কথা বলিতে লাগিলেন, তিনিও তাহাতে যোগ দিয়া রাজার কথা বার্ত্তার সাহায্য করিতে লাগিলেন।

যে বিষয়ের জন্য রাজা আমাকে ডাকিয়াছিলেন তাহা তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। মাসী-মা ও রাণী-মা আপাততঃ স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য পশ্চিমে যাইবেন স্থির হইয়াছে। আমি

তাঁহাদের সঙ্গে থাকিব এবং আরও তিন চারি জন ঝি এবং আবশ্যক মত অন্যান্য ঝি ও লোক-জন সঙ্গে থাকিবে। অন্যান্য ঝি ও লোকজন যখন ইচ্ছা তখনই পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু বিদেশে অন্ততঃ একজনও খুব পাকা ও জানা শুনা ঝি সঙ্গে না থাকিলে রাণী-মার ও মাসী-মার কষ্ট হওয়াই সম্ভব। সেরূপ একজন ঝি সহজে পাওয়া ভার, অথচ একজন চাইই চাই। গিরিবালা রাণী-মার ও মাসী-মার বেশ জানা লোক এবং তাহার কাজকর্ম্মে তাঁহারা খুব তুষ্ট; অতএব তাহাকে যাহাতে সঙ্গে লইতে পারা যায় তাহার উপায় করিতে হইবে। রাগের মাথায় রাজা তাহাকে জবাব দিয়া ভাল করেন নাই। শীঘ্রই এরূপ দরকার উপস্থিত হইবে জানিলে তিনি কখনই এমন কাজ করিতেন না। রাজা বলেন, এখন সে কলিকাতায় আসিয়াছে। কলিকাতার যেখানে সে আছে, রাজা আমাকে তাহা লিখিয়া দিলেন। সে যেখানেই কেন থাকুক না, রাণী-মা ও মাসী-মার সে যেরূপ অনুগত, তাহাতে তাঁহাদের নাম শুনিলে সে তখনই ছুটিয়া আসিবে। তাহাকে আনিবার জন্য আমাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে। এই সকল কথা রাজা ও চৌধুরী মহাশয় আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। চৌধুরী মহাশয়ই বেশীর ভাগ কথা কহিলেন। এ প্রস্তাবে দোষ কিছুই দেখিলাম না; বরং সকলই ভাল বলিয়া বোধ হইল। তাহাকে ডাকিয়া আনিতে রাজা তো আর যাইতে বা তাহাকে পত্র লিখিতে পারেন না; ইহা আমার পক্ষেই সঙ্গত ও কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। সুতরাং আমি ইহাতে কোন ওজর করিলাম না। কিন্তু তাহাকে কলিকাতাতেই পাওয়া যাইবে কি না সে সম্বন্ধে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ থাকিল। গিরিবালাকে কলিকাতায় না পাইলে আমাকে বাটী ফিরিয়া আসিতে আজ্ঞা হইল। আমার যেন বোধ হয়, সে শক্তিপুরে আছে; কিন্তু তাঁহারা জানেন সে কলিকাতায় আসিয়াছে।

পরদিন প্রাতে আমি কলিকাতায় যাত্রা করিলাম। যাইবার পূর্ব্বে আমি মাসী মা ও রাণী-মার সংবাদ লইলাম। রমণী বলিল যে, মাসী-মা ঠাকুরাণী ক্রমেই ভাল হইতেছেন; আমারও তাঁহাকে দেখিয়া তাহাই বোধ হইল। রাণী-মার সহিত আমার দেখা হইল না। তিনি তখন নিদ্রিত ছিলেন। চৌধুরাণী ঠাকুরাণী তখন তাঁহার নিকটে ছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন যে, রাণী-মা এখনও অত্যন্ত কাতর ও দুর্ব্বল।

এই সকল পরিবর্ত্তন, এই জনহীনতা, এই সকল অদ্ভুত ব্যবস্থা, সকলে নিশ্চয়ই সন্দেহ-জনক বলিয়া মনে করিবেন। আমারও তাহাই মনে হইয়াছিল; কিন্তু কি করিব; আমি অধীন, আজ্ঞা পালন ভিন্ন আমার পক্ষে আর কি সম্ভব?

আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই হইল—কলিকাতার সে ঠিকানায় গিরিবালা নাই। আমি দিন দুই পরে রাজবাটীতে ফিরিয়া আসিয়া রাজার নিকট সকল কথা নিবেদন করিলাম। রাজা তখন অন্য চিন্তায় নিবিষ্ট-চিত্ত ছিলেন, তিনি আমার কথায় কোন মনো-যোগই দিলেন না। অনেক পরে বলিলেন, 'আমার সামান্য অনুপস্থিত কালের মধ্যে এখানে আর একটী বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে; চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী তাঁহাদের কলিকাতার নূতন বাসায় গিয়াছেন।' কেন তাঁহারা হঠাৎ চলিয়া গেলেন তাহা আমি জানিতে পারিলাম না। আমি রাজাকে জিজ্ঞাসিলাম যে, চৌধুরাণী ঠাকুরাণী চলিয়া গিয়াছেন, তবে এখন রাণী-মার কাছে আছে

কে? রাজা বলিলেন যে, এখন তাঁহার নিকট রামী আছে। গ্রামের মধ্য হইতে সংসারের কাজ করিবার জন্য একটা ঝি আনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কথাটা শুনিয়া আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম। রামীর মত নির্ব্বোধ ইতর মেয়ে মানুষ কি না এখন রাণী-মার কথার দোসর! ছিঃ! আমি তাড়াতাড়ি উপরে উঠিলাম। দেখিলাম সিঁড়ির কাছেই রামী দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাহাকে মাসী-মা ঠাকুরাণীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে আমাকে মুখ ভেঙ্গচাইতে ভেঙ্গচাইতে কদর্য্য ভাষায় যে উত্তর দিল তাহার এক বর্ণও আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমি তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, বিরক্তির সহিত চলিয়া গেলাম এবং রাণী-মার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম রাণী-মা যদিও এখনও অতিশয় দুর্ব্বল ও কাতর আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার শরীর এ কয়দিনে পূর্ব্বের অপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে বোধ হইল। সেদিন প্রাতঃকাল হইতে কাহারও নিকট মাসী-মার কোন সংবাদ না পাইয়া তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। এ কাজটা রমণীর পক্ষে বড়ই অন্যায় হইয়াছে। আমি আসিলে রাণী-মা আমাকে সঙ্গে লইয়া মাসী-মার ঘরে চলিলেন। যে বারান্দা দিয়া মাসী মার ঘরে যাইতে হইবে, আমরা তাহার খানিকটা দূরে যাওয়ার পর, রাজাকে দেখিয়া আমাদের দাঁড়াইতে হইল। রাজা যেন সেখানে আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি রাণী মাতাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় যাইতেছ?"

তিনি উত্তর দিলেন,—"দিদির ঘরে।"

রাজা বলিলেন,—"তোমার আশা ভঙ্গ হেতু কষ্ট নিবারণের জন্য তোমাকে এখনই বলিয়া দেওয়া ভাল যে, তুমি তাঁহার ঘরে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না।"

"দেখিতে পাইব না?"

"না। গত কল্য প্রাতে জগদীশ ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত তিনি এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

রাণী মাতা অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিলেন। এই বিস্ময়জনক কঠোর সংবাদ সহ্য করা তাহার পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার মুখের বর্ণ যেন সাদা হইয়া গেল এবং তিনি নীরবে স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া দেওয়াল হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। আমিও এমনই বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম যে, কি বলিব কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। সত্যই কি মাসী মা রাজবাটী হইতে চলিয়া গিয়াছেন? একথা আমি রাজাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

রাজা বলিলেন,—"সত্যই তিনি চলিয়া গিয়াছেন।"

আমি আবার বলিলাম,—"তাঁহার এই অবস্থায়, রাণীমাকে কোন কথাই না বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন!"

রাণী-মা একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন বোধ হয়। রাজা কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তিনি দেওয়ালের নিকট হইতে দুই একপদ অগ্রসর হইয়া সজোরে এবং ভীতভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"অসম্ভব কথা! ডাক্তার কোথায় ছিলেন? যখন দিদি চলিয়া যান তখন বিনোদ বাবু কোথায় ছিলেন?

রাজা বলিলেন,—"ডাক্তারের আর এখানে কোন দরকার ছিল না। তিনি আপন ইচ্ছায় যাওয়া আসা ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, মনোরমা দেবীর শরীর বেশ স্বচ্ছন্দ হইয়াছিল। কিন্তু তুমি অমন করিয়া

চাহিতেছ কেন? যদি আমার কথায় তোমার বিশ্বাস না হয় তাহা হইলে স্বচক্ষে দেখ না কেন? তাঁহার ঘরের দরজা খুলিয়া দেখ, ইচ্ছা হয়, বাটীর সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখনা কেন?”

রাণী মাতা তাহাই দেখিতে চলিলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। মাসী-মার ঘরে রামী ছাড়া আর সত্যই কেহ নাই। রামী সে ঘরের সামগ্রী পত্র গুছাইয়া রাখিতেছে, পরে এপাশের ওপাশের আরও দুই একটা ঘর দেখা গেল, কোথাও কেহ নাই। রাজা তখনও আমাদের প্রতীক্ষায় বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। রাণী-মাতা আমার কর্ণে কর্ণে বলিলেন,—“আমার কাছ ছাড়া হইও না, নিস্তারিণি, তোমার সাত দোহাই আমার কাছ ছাড়া হইও না।”

আমি তাঁহাকে কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তিনি বাহিরে আসিয়া তাঁহার স্বামীকে বলিলেন,—“বল রাজা বল, ইহার অর্থ কি? আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি—তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি—তোমার পায়ে পড়িতেছি, বল কি হইয়াছে?”

রাজা বলিলেন,—“কি আর হইবে? মনোরমা দেবী দেখিলেন তাঁহার শরীরে অনেকটা বল হইয়াছে; জগদীশ ও তাঁহার স্ত্রী কলিকাতায় যাইতেছেন শুনিয়া তিনিও কলিকাতায় যাইবার জন্ম ব্যস্ত হইলেন।”

“কলিকাতায়!”

“হাঁ, আনন্দধামে যাইতে হইলে কলিকাতা দিয়া যাওয়া সুবিধা নয় কি?”

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া রাণী-মা আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—“বল নিস্তারিণি দিদির এতটা পথশ্রম সহিবার মত শরীরের অবস্থা দেখিয়াছ কি না, বল।”

“না মা, আমি তো তাঁর তেমন অবস্থা হইয়াছে মনে করি না।”

রাজাও সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—“তুমি কলিকাতায় যাইবার আগে রমণীর কাছে বলিয়াছিলে কি না যে, মনোরমা দেবীর শরীরে বেশ বল হইয়াছে এবং তিনি ভাল আছেন বলিয়া তোমার বোধ হইয়াছে?”

“আজ্ঞে হাঁ, আমি একথা বলিয়াছিলাম বটে।”

আমার উত্তর শেষ হইবামাত্র তিনি রাণী-মার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—“এখন নিস্তারিণীর দুই রকম মত মিলাইয়া সঙ্গতাসঙ্গত বিচার কর। আমরা কি এতই পাগল যে যদি তাঁহার অবস্থা ভাল না বুঝিতাম তাহা হইলে তাঁহাকে যাইতে দিতাম? তাঁহার সঙ্গে জগদীশ আছেন, তোমার পিসী মা আছেন, আর রমণী আছে। তিন জন উপযুক্ত লোক সঙ্গে থাকিতে ভাবনার কারণ কি হইতে পারে? কালি তাঁহারা কলিকাতায় ছিলেন, আজি তিনি জগদীশ ও রমণীকে সঙ্গে লইয়া আনন্দধামে—”

রাণী-মা রাজার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—“আমাকে এখানে একা ফেলিয়া দিদি কেন আনন্দধামে চলিয়া গেলেন?”

“কারণ, তোমার খুড়া মহাশয় অগ্রে মনোরমা দেবীর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া তোমাকে লইয়া যাইবেন না লিখিয়াছেন। তাঁহার সে পত্র তোমাকে দেখান হইয়াছিল। সে কথা তোমার মনে থাকা উচিত ছিল।”

“আমার তাহা মনে আছে।”

“তবে মনোরমা দেবী চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া এত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছ কেন? আনন্দধামে যাইতে তোমার অত্যন্ত সাধ

হইয়াছে ; সেই জন্তই তোমার দিদিকে অগ্রে তোমার খুড়ার সহিত সে সম্বন্ধে পরামর্শ স্থির করিতে যাইতে হইয়াছে।"

আহা! রাণী-মার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি বলিলেন,—"দিদি আমাকে না বলিয়া কখন কোথায়ও যান না।"

রাজা বলিলেন,—"এবারও তিনি তোমাকে না বলিয়া যাইতেন না ; কিন্তু তোমারই ভয়ে তাহা পারেন নাই। তিনি বেশ জানেন, তুমি তাঁহাকে যাইতে দিবে না, তুমি তাঁহাকে কাঁদিয়া ব্যাকুল করিয়া তুলিবে। কিন্তু আর আমি বকাবকি করিতে পারি না। আমার শরীর ও মন এরূপ জালাতনে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। আমি নীচে চলিলাম। যদি তোমার এখনও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকে, তাহা হইলে নীচে আসিয়া বল।"

তিনি তখনই চলিয়া গেলেন। তাঁহার ভাব আজি বড় কেমন কেমন। তাঁহার মন এত কোমল, এত সহজে তিনি স্ত্রীলোকের ন্যায় কাতর হইয়া পড়েন, এরূপ ভাব আমি ইহার পূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই। আমি রাণী-মাতাকে ঘরের ভিতর গিয়া একটু বিশ্রাম করিবার জন্ত বিশেষ আগ্রহ করিলাম। তিনি সে কথা না শুনিয়া নিতান্ত ভীত ভাবে আমাকে বলিলেন,—"নিশ্চয়ই দিদির কিছু হইয়াছে।"

আমি বলিলাম,—"মনে করিয়া দেখুন রাণী-মা, মাসী-মার সাহস কত অধিক। এরূপ অবস্থাতেও পথশ্রম সহিতে উদ্যত হওয়া তাঁহার পক্ষে বিচিত্র নহে। আমার মনে এ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ হইতেছে না।"

সেইরূপ ভীতভাবে রাণী-মা আবার বলিলেন,—"যেখানে দিদি গিয়াছেন আমিও সেখানে যাইব। আমি স্বচক্ষে দেখিতে চাহি যে তিনি সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া আছেন। নিস্তারিণি, আমার সঙ্গে নীচে রাজার কাছে চল।"

তাঁহার সঙ্গে আমার যাওয়াটা হয়ত রাজার বিরক্তিকর হইতে পারে। আমি সে কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়া গমনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলাম। কিন্তু তিনি সে কথা মোটেই না শুনিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। রাজা মদ খান জানি। আমরা নীচে রাজার নিকটে আসিয়া গন্ধে বুঝিলাম, রাজা এখনই খুব মদ খাইয়াছেন। তিনি আমাদের দেখিয়াই রাগত স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, —"তোমরা কি মনে করিতেছ ইহার মধ্যে কোন চক্রান্ত আছে? সেটা বড় ভুল। ইহার মধ্যে কোন লুকান কাজ নাই।" পার্শ্বে আলবোলায় তামাক সাজা ছিল। তিনি কথা সমাপ্তি মাত্র তামাক টানিতে আরম্ভ করিলেন।

রাণী-মা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, —"দিদি যদি পথশ্রম সহিতে পারিয়া থাকেন, তবে আমিও তাহা পারিব। দিদির জন্ত আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছে, এজন্ত আমি অনুরোধ করিতেছি যে, আমাকে দিদির নিকট যাইবার অনুমতি দেও।"

রাজা বলিলেন,—"তোমাকে কালি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতেই হইবে। যদি তাহার মধ্যে কোন নিষেধের সংবাদ না আইসে, তাহা হইলে তুমি যাইতে পার। আমি জগদীশকে আজি রাত্রির ডাকে তোমার যাওয়ার কথা লিখিয়া পাঠাইব।"

তিনি একটী কথাও রাণী-মার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন না। কথা শেষ হইলে কেবল তামাক টানিতে লাগিলেন। রাণী মা নিতান্ত বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসিলেন,—"চৌধুরী মহাশয়কে এ কথা লিখিবে কেন?

রাজা বলিলেন,—"দুপুরের গাড়ীতে তোমার যাওয়া হইবে এই সংবাদ দিবার জন্য। তুমি কলিকাতায় পৌছিলে তিনি তোমাকে সঙ্গে করিয়া ষ্টেশন হইতে তাঁহার বাসায় লইয়া যাইবেন, সেখানে তুমি তোমার পিসী-মার নিকটে রাত্রি কাটাইয়া পর দিন আনন্দ-ধামে যাইবে।"

রাণী-মা এখনও আমার হাত ধরিয়া ছিলেন। কেন জানি না, তাঁহার হাত এখনও অত্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। তিনি বলিলেন,—"না না, চৌধুরী মহাশয় ষ্টেশনে আসিবার কোনই দরকার নাই। কলিকাতায় রাত্রিতে থাকিবার কোনই আবশ্যকতা নাই তো।"

"কলিকাতায় তোমাকে থাকিতেই হইবে। একদিনে আনন্দধাম পর্য্যন্ত, যাওয়া কখনই হইতে পারে না। কাজেই তোমাকে কলি কাতায় একরাত্রি থাকিতে হইবে। তোমার পিসীর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা তোমার কাকাও করিয়াছেন। এই দেখ তাঁহার পত্র।"

রাণী-মা পত্র হাতে করিয়া লইলেন এবং একবার তাহাতে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহা আমার হাতে দিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—"তুমি পড়। কি জানি, আমার কি হইয়াছে, আমি উহা পড়িতে পারিতেছি না।"

চারি ছত্রের একখানি চিঠি—নিতান্ত ছোট, নিতান্ত অসাবধানভাবে লেখা। আমার যেন বোধ হয়, তাহাতে এই কথা লিখিত ছিল,—"জীবিতাধিক লীলা,—যখন ইচ্ছা হইবে তখনই আসিও। পথে তোমার পিসীর বাড়ীতে রাত্রিতে থাকিয়া বিশ্রাম করিও। মনোরমার পীড়ার সংবাদে বড় দুঃখিত হই-লাম। আশীর্ব্বাদক শ্রীরাধিকা প্রসাদ রায়।"

আমার চিঠি পড়া শেষ হইবার পূর্ব্বেই রাণী-মা ব্যগ্রতার সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"সেখানে আমার যাইতে ইচ্ছা নাই—কলি-কাতায় এক রাত্রি থাকিতে আমার ইচ্ছা নাই। আমি মিনতি করিতেছি, চৌধুরী মহাশয়কে এজন্য কোন পত্র লিখিও না।"

ভয়ানক রাগের সহিত উচ্চস্বরে রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"কেন পত্র লিখিব না তাহা আমি জানিতে চাই। কলিকাতায় তোমার পিসীর বাড়ীতে থাকাই তোমার পক্ষে সম্পূর্ণ সঙ্গত এবং তোমার কাকারও তাহাই ইচ্ছা। জিজ্ঞাসা কর দেখি নিস্তা-রিণীকে।"

বাস্তবিকই রাজার এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সঙ্গত। আমি রাণীমার দিকে টানিয়া অনেক কথা কহি বটে, কিন্তু চৌধুরীমহাশয়ের সম্বন্ধে তাঁহার বিরুদ্ধ সংস্কারের আমি কোনই সমর্থন করিতে পারিলাম না। চৌধুরী মহাশয় বাঙ্গাল বলিয়া রাণীমা যদি তাঁহার উপর এত অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্যবহারের নিন্দা না করিয়া থাকা যায় না। রাজা উত্তরোত্তর অধিকতর ক্রোধ ও আগ্রহের সহিত যতবার কলিকাতায় চৌধুরী মহাশয়ের বাসায় থাকিবার কথা বলিতে লাগিলেন, ততবারই রাণী-মা তাহাতে অস্বীকার করিয়া চৌধুরী মহাশয়কে পত্র লিখিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন।

রাজা তখন অসভ্যভাবে আমাদের দিকে পিছন ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আর কথায় কাজ নাই। কিসে ভাল হয়, কিসে মন্দ হয়, তাহা যদি তুমি নিজে না বুঝিতে পার, তাহা হইলে অন্যে যাহা ভাল বুঝিবে তাহাই তোমাকে শুনিতে হইবে। যাহা মনোরমা দেবী তোমার পূর্ব্বে করিয়াছেন, এখন তোমাকে তাহাই করিতে বলা যাইতেছে মাত্র।"

রাণী সবিস্ময়ে বলিলেন,—"দিদি ! দিদি চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে !"

"হাঁ, চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে। তিনি সেখানে কালি রাত্রিতে ছিলেন। তোমার দিদি যাহা করিয়াছেন, তোমার কাকা যাহা বলিতেছেন, তোমাকেও তাহাই করিতে বলা যাইতেছে। আমাকে এমন করিয়া আর জ্বালাতন করিও না।"

এই বলিয়া রাজা সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। আমি তখন রাণী-মাকে বলিলাম,—"চলুন মা, আমরা উপরে যাই।" তিনি অন্যমনস্ক ভাবে আমার সহিত চলিলেন। তিনি স্থির ভাবে বসিলে, আমি তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত নানা কথা বলিতে লাগিলাম। কিন্তু তাঁহার মন হইতে মনোরমা দেবীর জন্য ভয় এবং তাঁহার কি জানি কেন, চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে রাত্রিতে থাকিতে অকারণ আশঙ্কা কোন ক্রমেই দূর করিতে পারিলাম না। চৌধুরী মহাশয়ের সম্বন্ধে রাণী-মার এরূপ অমূলক কদর্য্য মত দূর করিতে যত্ন করা আমার কর্ত্তব্য বোধে আমি বিহিত সম্মানের সহিত নিবেদন করিলাম,—"মা, ফল দেখিয়া কার্য্যের বিচার করা আবশ্যক। মাসী-মার পীড়ার প্রথম দিন হইতে চৌধুরী মহাশয়ের নিরন্তর যত্ন ও উদ্বেগ দেখিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা না করা অসম্ভব। বিনোদ বাবুর সহিত যে তাঁহার গুরুতর মনোবাদ ঘটিয়াছিল, মাসী-মার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠাই তাহার কারণ।"

বিশেষ আগ্রহের সহিত রাণী মা জিজ্ঞাসিলেন,—"কি মনোবাদ ?"

একথা লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপ ন্যায়-বিগর্হিত বোধে আমি সমস্ত কথা সবিশেষ জানাইলাম। আমার কথা শুনিয়া রাণী-মা অধিকতর বিচলিত ও ভীতভাবে দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতে লাগিলেন,—"আরও খারাপ—আরও ভয়ানক কথা ! চৌধুরী মহাশয় জানিতেন যে, ডাক্তার বাবু কখনই দিদিকে এ অবস্থায় অন্যত্র যাইতে দিবেন না; সেই জন্যই তিনি কৌশলে তাঁহাকে অপমান করিয়া আগেই সরাইয়া দিয়াছেন।"

আমি একটু প্রতিবাদের ভাবে বলিলাম,—"বলেন কি ? এও কি সম্ভব ?"

তিনি বলিতে লাগিলেন,—"নিস্তারিণি ! যে যাহাই কেন বলুক না, আমার দিদি যে স্বেচ্ছায় ঐ লোকটার হাতে পড়িয়াছেন, বা তাহার বাটীতে আছেন, এ কথা আমি কখনই বিশ্বাস করিব না। আমার কাকা শত সহস্র পত্রই লিখুন এবং রাজা শত সহস্র অনুরোধই করুন, আমি কিছুতেই ঐ ব্যক্তির বাটীতে জল গ্রহণ বা এক মুহূর্ত্ত বাস করিতে সম্মত নহি। তবে দিদির জন্য আমার যে ভাবনা হইয়াছে তাহাতে আমি সকলই করিতে পারি—চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতেও যাইতে পারি।"

আমি স্মরণ করাইয়া দিলাম, রাজার কথা প্রমাণে মাসী-মা তো এখন শক্তিপুর গিয়াছেন। রাণী-মা বলিলেন,—"আমি বিশ্বাস করিতে পারি না; আমার আশঙ্কা হইতেছে এখনও দিদি ঐ লোকটার বাটীতে আছেন। যদিই আমার আশঙ্কা অমূলক হয়—যদিই দেখি দিদি সত্যই আনন্দধামে চলিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে আমি চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে তিলার্দ্ধ কালও দাঁড়াইব না। তুমি আমার মুখে, দিদির মুখে অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর নাম অনেকবার শুনিয়া থাকিবে। আমি

কালি রাত্রে তাঁহার বাটীতে থাকিব, এ কথা এখনই তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানাইয়া রাখিতেছি। জানি না কেমন করিয়া সেখানে যাইব। জানি না কেমন করিয়া চৌধুরী মহাশয়ের হাত হইতে আমি এড়াইব; কিন্তু যদি দেখি দিদি আনন্দধামে গিয়াছেন, তাহা হইলে যেমন করিয়া হউক, আমি অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর বাটীতে যাইবই যাইব। তোমার কাছে আমার অনুরোধ, আমি অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীকে যে পত্র লিখিব তাহা তোমাকে স্বহস্তে ডাকে ফেলিয়া দিতে হইবে। রাজবাটীর চিঠির থলিয়ায় বিশ্বাস নাই। এটুকু উপকার তুমি করিবে কি না বল। বোধ হয় তোমার নিকট এই আমার শেষ অনুগ্রহ ভিক্ষা।"

আমি একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম এ সকল কথার অর্থ কি? হয়ত রোগে ও চিন্তায় রাণী-মার একটু মাথা খারাপ হইয়া গিয়া থাকিবে। যাহাই হউক, একজন পরিচিত স্ত্রীলোকের নিকট চিঠি পাঠাইতে দোষ কি বিবেচনায় আমি পত্র ডাকে পৌছাইয়া দিতে সম্মত হইলাম। পরাগত ঘটনা আলোচনা করিয়া দেখিতেছি, রাণী-মাতার কালিকাপুরের রাজবাটীতে অবস্থানের শেষদিনে শেষ বাসনা পূরণ করিতে আমি বিরোধিতা করি নাই, ইহা ভগবানের বিশেষ কৃপা বলিতে হইবে।

তিনি পত্র লিখিয়া আমার হাতে দিলেন, আমি স্বয়ং ডাকঘরে ফেলিয়া দিয়া আসিলাম। সেদিন রাজার সহিত আমাদের আর দেখা হইল না। আমি রাণী-মাতার আদেশ অনুসারে তাঁহার শুইবার ঘরের পাশের ঘরে শয়ন করিলাম। উভয় ঘরের মধ্য দরজা খোলা থাকিল। রাণী-মা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া, অনেক পুরাতন পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। পড়ার পর পত্র সকল পুড়াইয়া ফেলিতে লাগিলেন এবং বাক্স দেরাজ প্রভৃতি খালি করিয়া, যে সকল সামগ্রী তিনি বড় ভাল বাসিতেন, সে সকল স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তিনি যেন স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহাকে আর কখন রাজবাটীতে ফিরিয়া আসিতে হইবে না। শয়ন করার পর তাঁহার একটুও সুনিদ্রা হইল না। অনেক বার তিনি ঘুমাইতে ঘুমাইতে কাঁদিয়া উঠিলেন; একবার এতই জোরে কাঁদিয়া উঠিলেন যে, সে শব্দে তাঁহার নিজেরও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার স্বপ্নের কথা তিনি আমাকে বলিলেন না। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমার বড়ই দুঃখ হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে রাজা আমাদের নিকটে আসিয়া বলিলেন, বেলা বারোটার সময় গাড়ি প্রস্তুত হইয়া দরজার নিকটে আসিবে। সাড়ে বারোটার সময় আমাদের ষ্টেশন হইতে রেল গাড়ি ছাড়িয়া থাকে তাহার পূর্ব্বে রাণীকে ষ্টেশনে গিয়া পৌছিতে হইবে। রাজার, আপাততঃ কোন বিশেষ প্রয়োজনে বাহিরে যাইতে হইতেছে; কিন্তু রাণী যাত্রা করার পূর্ব্বে তিনি ফিরিয়া আসিবেন। যদিই কোন প্রতিবন্ধকে তাঁহার সে সময়ের মধ্যে ফিরিয়া আসা না হয়, তাহা হইলে রাণী-মার সঙ্গে আমাকে ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়া, তাঁহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিতে হইবে। রাণী-মার সঙ্গে সঙ্গে রামী-ঝি ও একজন দারবান্ কলিকাতা পর্য্যন্ত যাইবে। আমাকে ষ্টেশন হইতে আবার রাজবাটীতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। ঝি ও দারবান্ তাঁহাকে কলিকাতায় চৌধুরী মহাশয়ের বাসায় পৌছিয়া দিয়াই চলিয়া আসিবে। এখানে চাকর বাকরের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইয়াছে, এজন্য অধিক লোক সঙ্গে থাকার সম্ভাবনা

নাই। আর কতকগুলা লোক সঙ্গে থাকারও কোন দরকার আছে বলিয়া রাজা বিবেচনা করিলেন না। রাজা অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে, এই সকল ব্যবস্থা সমাপন করিলেন। রাণী-মাতা বিশেষ মনোযোগের সহিত তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিলেন। কিন্তু রাজা একবারও তাঁহার পানে ফিরিয়াও চাহিলেন না।

রাজা কথা সমাপ্ত করিয়া প্রস্থানাভিপ্রায়ে দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলে রাণী-মা হস্ত বিস্তার করিয়া তাঁহার পথাবরোধ করিলেন এবং বলিলেন,—"আর তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে না। আমাদের এই বিদায় সম্ভবতঃ চিরবিদায়। রাজা, আমি তোমার কৃতকার্য্য সমূহ যেমন অকপট চিত্তে ক্ষমা করিতেছি, বল তুমিও আমার কৃতকার্য্য সমূহ সেইরূপে ক্ষমা করিতে চেষ্টা করিবে ?"

তখন রাজার বদন অত্যন্ত পাণ্ডু হইয়া পড়িল এবং তাঁহার ললাট দেশে ঘর্ম্মবিন্দু সমূহ প্রকাশিত হইল। "আমি আবার আসিব" এই কথা বলিয়া তিনি বেগে প্রস্থান করিলেন ; যেন রাণী-মার কথায় ভীত হইয়াই তিনি পলায়ন করিলেন।

রাজার এই ব্যবহার দেখিয়া আমি মনে বড় ব্যথা পাইলাম এবং এতদিন এমন লোকের নুন খাইয়াছি বলিয়া আমার মনে বড় ঘৃণা হইল। রাণী-মাকে দুই একটা প্রবোধের কথা বলিব মনে করিলাম, কিন্তু তাঁহার ভাব দেখিয়া আমার কোন কথা বলিতে সাহস হইল না।

যথাসময়ে গাড়ি আসিল। রাণী-মার অনুমান যথার্থ—রাজা আর ফিরিলেন না। আমি শেষ কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া অগত্যা রাণী-মার সঙ্গে গাড়িতে উঠিলাম। গাড়ীতে উঠিয়া আমি তাঁহাকে সময়ে সময়ে পত্র লিখিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। তাঁহাকে নিতান্ত চিন্তিত দেখিয়া আমি দুই একটা সান্ত্বনার কথা বলিতে লাগিলাম, কিন্তু তিনি তখন এতই অন্যমনস্ক যে আমার কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। আমি তাহার পর বলিলাম,—"রাণী মার কালি রাত্রিতে ভাল ঘুম হয় নাই।" তিনি বলিলেন—"হাঁ ! কালি রাত্রিতে আমি ক্রমাগত স্বপ্ন দেখিয়া ছি।" আমি ভাবিলাম তিনি হয়ত স্বপ্নের বৃত্তান্ত আমাকে বলিবেন ; কিন্তু তিনি সে সকল কোন কথা না বলিয়া আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি নিজ হাতে অন্নপূর্ণা দেবীর সে চিঠিখানি ডাকে দিয়াছিলে তো ?" আমি উত্তর দিলাম,—"হাঁ মা।"

তিনি আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"রাজা কালি বলিয়াছিলেন বুঝি যে, চৌধুরী মহাশয় কলিকাতার রেলষ্টেশনে আমার জন্য অপেক্ষা করিবেন ?" আমি বলিলাম,—"হাঁ মা।" তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু আর কোন কথা কহিলেন না।

আমরা যখন ষ্টেশনে পৌছিলাম, তখন গাড়ি ছাড়িতে আর দেরি নাই। যে মালী গাড়ি হাঁকাইয়া গিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ী জিনিষপত্র ঠিক করিয়া গাড়িতে উঠাইয়া দিল ; দ্বারবান্ টিকিট কিনিয়া ফেলিল ; গাড়ির বাঁশী বাজিতে লাগিল। আমি এবং রামী রাণী-মার নিকট দাড়াইয়া ছিলাম। তাঁহার মুখ দেখিয়া আমার বোধ হইল, তিনি যেন হঠাৎ বড় ভয় পাইয়াছেন। গাড়িতে বসিবার সময় তিনি সহসা আমার বাহু ধারণ করিয়া বলিলেন,—"নিস্তারিণি, তুমিও যদি আমার সঙ্গে যাইতে তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত।" এখন যদি

সময় থাকিত কিম্বা এক দিন আগে যদি এ কথা মনে উদয় হইত তাহা হইলে, যদি আবশ্যক বুঝিতাম, রাজার কর্ম্মে জবাব দিয়াও আমি রাণী-মার সঙ্গে যাইতাম। কিন্তু এখন অন্য চিন্তা দূরে থাকুক, টিকিট কিনিয়া গাড়িতে উঠিবারও সময় নাই। তিনি বোধ হয় এ সকল অসুবিধা বুঝিতে পারিলেন, তাই এ কথা আর না বলিয়া নিজে গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন এবং উভয় হস্তে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"যখন আমরা নিঃসহায় তখন তুমি আমার আর আমার দিদির অনেক উপকার করিয়াছ। আমি জীবন থাকিতে তোমার কথা কখনই ভুলিব না। তুমি ভাল থাক, সুখে থাক। আমাকে এখন বিদায় দেও।"

যে স্বরে রাণী-মা এই সকল কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। আমি বলিলাম,—"আসুন মা,—শীঘ্রই আপনার মনের চিন্তা দূর হউক; শীঘ্রই আবার যেন আপনার চাঁদ মুখ দেখিতে পাই।"

গার্ড আসিয়া গাড়ির দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তখন রাণী-মা অতি মৃদুস্বরে আমাকে বলিতে লাগিলেন,—"তুমি স্বপ্নে বিশ্বাস কর কি? আমি কালি রাত্রিতে যেরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি এখনও আমার তাহা মনে করিয়া ভয় করিতেছে।" আমি কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই গাড়ি চলিতে আরম্ভ হইল। তাঁহার বিষাদ কালিমাচ্ছন্ন মুখ আর দেখিতে পাইলাম না।

রাজবাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। সমস্ত দিন রাণী-মার কাতরভাব মনে করিয়া আমার মন বড় খারাপ হইয়া থাকিল। সন্ধ্যার একটু আগে মনে করিলাম একবার বাগানে বেড়াই। রাজা যে সেই প্রাতঃকালে বাহির হইয়াছেন এখনও বাটী ফিরেন নাই। বাটীতে কথাটি কহিবার একটি লোক পর্য্যন্ত নাই। কলিকাতায় রাণী-মাকে পৌছাইয়া দিয়া দ্বারবানের সঙ্গে রামী ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহারা চৌধুরী মহাশয়ের বাটী পর্য্যন্ত রাণী-মার সঙ্গে ছিল। তিনি সেখানে পৌছিলেই তাহারা আবার ষ্টেশনে আসিয়া, পরের গাড়িতে এই মাত্র রাজবাটীতে ফিরিয়াছে। এখন কথার দোসরই বল, আর মন্ত্রীই বল, আর যাই বল, সকলই রামী। কিন্তু সেরূপ নির্ব্বোধ, সেরূপ কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকের সঙ্গে কথা কহিয়া সময় কাটান অসম্ভব। বাগানে বেড়াইতে বাহির হইলাম। মোড় ফিরিলে যেই সমস্ত বাগানের দৃশ্য আর চক্ষের সম্মুখে পড়িল, সেই আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম। দেখিলাম একজন অপরিচিত স্ত্রীলোক, আমার দিকে পিছন করিয়া বাগানে ফুল তুলিতেছে। আমি নিকটস্থ হইলে আমার পদশব্দ শুনিয়া, সে আমার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম সে রমণী। তাহাকে দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইলাম এবং কোন কথা কহিতেও পারিলাম না, একপদ অগ্রসর হইতেও পারিলাম না। সে কিন্তু আমার দিকে ফুলের গোছা হাতে লইয়া অতি নিশ্চিন্ত ভাবে চলিয়া আসিল এবং প্রশান্ত ভাবে জিজ্ঞাসিল,—"কি হইয়াছে?"

আমি রুদ্ধশ্বাসে বলিলাম,—"তুমি এখানে! কলিকাতায় যাও নাই! শক্তিপুর যাও নাই।

অতি পৌরুষব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্যের সহিত ফুলের আঘ্রাণ লইতে লইতে সে উত্তর দিল, "না; আমি একবারও রাজবাটী ছাড়িয়া যাই নাই তো।"

তখন আমি শ্বাসগ্রহণ করিয়া সাহসের সহিত জিজ্ঞাসিলাম,—"মাসী মা কোথায়?"

রমণী একবার হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং বলিল,—তিনি একবারও রাজবাটী ছাড়িয়া যান নাই তো।”

এই দারুণ বিস্ময়াবহ সংবাদ শুনিয়া আমার রাণী-মার বিদায়ের কথা মনে পড়িল হায় হায়! যদি সর্ব্বস্ব ব্যয় করিলে কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে এ সংবাদ জানিবার উপায় হইত, আমি তাহাও করিতাম। আমি আর কথা কহিতে পারিলাম না। রাণী মার কাতর দুর্ব্বল দেহের কথা স্মরণ করিয়া আমি শিহরিতে লাগিলাম। এই ভয়ানক সংবাদ তাঁহার কর্ণ-গোচর হইলে না জানি তাঁহার কি অবস্থা ঘটিবে! মিনিট দুই পরে রমণী ঘাড় তুলিয়া চাহিল এবং বলিল,—“এই যে রাজা ফিরিয়া আসিয়াছেন।”

রাজা হস্তস্থিত ছড়ির দ্বারা উভয় দিকের ফুল গাছে আঘাত করিতে করিতে আমাদের নিকটস্থ হইতে লাগিলেন এবং আমাদিগকে দেখিতে পাইবামাত্র সেই স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর সহসা এমন বিকট উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিলেন যে, সে শব্দে ভীত হইয়া নিকটস্থ বৃক্ষের পক্ষীরা পলায়ন করিল। তাহার পর আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—“তবে নিস্তারিণি, এতক্ষণে সব কথা বুঝিতে পারিয়াছ, কেমন?”

আমি কোন উত্তর দিলাম না তিনি রমণীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—“তুমি কখন বাগানে বাহির হইয়াছ?”

“আধ ঘণ্টা হইল আমি বাগানে বাহির হইয়াছি। আপনি বলিয়াছিলেন যে, রাণী-মা কলিকায় চলিয়া গেলেই আমি বাগানে বাহির হইতে পারিব।”

“ঠিক কথা। আমি তোমার কোন দোষ দিতেছি না— কেবল জিজ্ঞাসা করিতেছি মাত্র। তাহার পর কিয়ৎকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া তিনি আবার আমার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া পরি-হাসের স্বরে বলিলেন,—“তুমি এ ব্যাপারে বিশ্বাস করিয়াই উঠিতে পারিতেছ না, কেমন? আইস, স্বচক্ষে দেখ আসিয়া।”

রাজা অগ্রসর হইলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। রমণী আমার পশ্চাতে আসিতে লাগিল। কিয়দ্দুর আসার পর বাটীর অব্যবহৃত ভাগের দিকে ছড়ি দেখাইয়া তিনি বলিলেন,—“যাও ঐ দিকে। উপরে উঠিলে দেখিতে পাইবে, মনোরমা দেবী ঐ পাশের ঘরে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতেছেন। রমণি! তোমার নিকট চাবি আছে তুমি নিস্তারি-ণীকে সঙ্গে লইয়া গিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেও।”

এতক্ষণে ক্রমে ক্রমে আমার পূর্ব্ব সজী-বতা আবির্ভূত হইল। এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি, তাহা বিচার করিতে তখন আমার শক্তি হইল। আমি স্থির করিলাম, যে ব্যক্তি রাণী মাতার সহিত এবং আমার সহিত এতাদৃশ লজ্জাজনক প্রতারণা ও ভয়ানক মিথ্যা কথা ব্যবহার করিয়াছে তাহার অধীনে আর কর্ম্ম করা শ্রেয়ঃ নহে। আমি বলিলাম,—“রাজা আমি অগ্রে আপনার সহিত গোপনে দুই একটা কথা কহিয়া পরে এই লোকের সঙ্গে মাসী-মার ঘরে যাইব।

রমণী একটু রাগতভাবে চলিয়া গেল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—“আবার কি?”

আমি বলিলাম,—“আমি আমার কর্ম্ম হইতে অবিলম্বে অবসর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি?”

রাজা অতীব বিরক্তির সহিত আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—“কেন?”

আমি বলিলাম,—"এ বাটীতে যাহা ঘটিয়াছে সে সম্বন্ধে কোন মতামত ব্যক্ত করা আমার পক্ষে কর্ত্তব্য নয়। রাণীমাতার প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধার জন্য এবং আমার নিজের অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া আমি কর্ম্মে জবাব দিতে চাই।"

রাজা অতিশয় রাগত স্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"বুঝিয়াছি, তোমার আর বলিতে হইবে না। রাণীর মঙ্গলের জন্যই তাঁহার সহিত একটা নির্দ্দোষ প্রতারণা করিতে হইয়াছে বটে। বুঝিয়াছি, তুমি তাহা হইতে, নিজের যেমন বুদ্ধি সেইরূপ, জঘন্য ও ইতর অর্থ গ্রহণ করিয়াছ। রাণীর স্বাস্থ্যের জন্য অবিলম্বে বায়ু-পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। তুমিও জান, আমিও জানি, মনোরমা দেবীকে এখানে ফেলিয়া তিনি কখনই কোথাও যাইবেন না। সুতরাং যে যাই বলুক, রাণীর হিতার্থে এরূপ প্রতারণা না করিলে উপায় কি? তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি চলিয়া যাইতে পার। ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব কি? যখন ইচ্ছা তুমি চলিয়া যাইতে পার, কিন্তু সাবধান, এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার পর, যদি তোমার দ্বারা কখন আমার দুর্নাম রটনা হয়, তাহা হইলে তোমার সর্ব্বনাশ না করিয়া কখনই ছাড়িব না। স্বচক্ষে মনোরমা দেবীকে তুমি দেখিয়া যাও। তাঁহার কোন সেবা যত্নের ত্রুটি হইতেছে কি না দেখ। মনে থাকে যেন, ডাক্তার বলিয়াছিলেন, যত শীঘ্র সম্ভব রাণীর বায়ু-পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এই সকল কথা মনে রাখিয়া, আমার বিরুদ্ধে যদি কোন কথা বলিতে সাহস হয় তো বলিও।"

অতি দ্রুতভাবে ও ব্যস্ততার সহিত পরিক্রমণ করিতে করিতে তিনি বাক্য সমাপ্ত করিলেন। যতই কেন বলুন না, তিনি গত কল্য আমাদের নিকট অনবরত নানারূপ মিথ্যা কথা বলিয়াছেন এবং ভগ্নীর জন্য উদ্বেগে উন্মাদ প্রায় মাকে অকারণে, নিতান্ত জঘন্য প্রতারণা দ্বারা তাঁহার দিদির নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। এ সংস্কার কিছুতেই অন্যথা হইবার নহে। আমি মনের কথা মনেই রাখিলাম, কিন্তু যে সঙ্কল্প করিয়াছি তাহা পরিত্যাগ করিলাম না। তাঁহাকে কোন কথা বলিলেই তিনি কেবল রাগ করিবেন বই তো নয়।

তিনি আবার আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"কখন তুমি যাইতে চাও? মনে করিও না যে তুমি থাকিবে না বলিয়া আমি বড় ভাবিত হইয়াছি। এ সম্বন্ধে আমার আগাগোড়া কোন খানে কপটতা নাই। তুমি কখন যাইবে বল।"

"আপনার যত শীঘ্র আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া সুবিধা হইবে, আমি তত শীঘ্রই যাইব।"

"আমার সুবিধা অসুবিধা তোমায় দেখিবার দরকার নাই। আমি কালিই এখান হইতে চলিয়া যাইব। আজি রাত্রিতেই আমি তোমার হিসাব চুকাইয়া দিব। যদি কাহারও সুবিধা অসুবিধা দেখিয়া তোমার যাওয়া স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে মনোরমা দেবীর নিকটে যাও। রমণীকে যত দিনের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে এবং সে আজি রাত্রিতেই কলিকাতা যাইবে শুনিতেছি। এখন তুমিও চলিয়া গেলে মনোরমা দেবীকে দেখিবার লোক কেহই থাকিতেছে না।"

এরূপ দুঃসময়ে মনোরমা দেবীকে ফেলিয়া যাওয়া আমার অসাধ্য। তখন আমি রাজার সহিত কথা-বার্ত্তা কহিয়া স্থির করিয়া লইলাম

যে, যেই আমি রমণীর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিব, সেই সে চলিয়া যাইবে এবং ডাক্তার বিনোদ বাবু আবার যাতায়াত করিয়া রোগীকে দেখিতে থাকিবেন। এ সকল ব্যবস্থা স্থির হইলে আমি, মনোরমা দেবীর যত দিন দরকার তত দিন পর্য্যন্ত রাজবাটীতে থাকিতে স্বীকার করিলাম। কথা সমাপ্ত হইবামাত্র রাজা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং বিপরীত দিকে গমন করিতে লাগিলেন। রমণী এতক্ষণ আমাকে মাসী-মার ঘর দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত সিঁড়ির উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল। আমি তাহার নিকটে যাইবার অভিপ্রায়েই দুই এক পদ যাইতে না যাইতে রাজা স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন এবং আমাকে ডাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কেন এখানকার চাকরিতে জবাব দিতেছ?"

এত কথার পর তিনি আবারও এ আশ্চর্য্য প্রশ্ন কেন জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা আমি স্থির করিতে না পারিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি আমাকে আবার বলিলেন,—"দেখ, কেন তুমি যাইতেছ তাহা আমি জানিতে পারিলাম না। লোকে এ কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলে তোমার অবশ্যই একটা কারণ দেখাইতে হইবে, তখন তুমি কি কারণ দেখাইবে? রাজবাটীর সকলে নানা স্থানে চলিয়া যাওয়ায় তোমার আর থাকা হইল না। কেমন এই কথা বলিবে কি?"

"কেহ যদি আমাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করে, তাহাকে ও কথা বলায় কোন আপত্তি দেখিতেছি না।"

"বেশ কথা। আর আমার কিছুই জানিবার আবশ্যক নাই।"

আমি আর কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি বেগে চলিয়া গেলেন। তাঁহার ভাব আজি বড়ই অদ্ভুত। বাস্তবিকই তাঁহাকে দেখিয়া আমার ভয় হইল। আমি রমণীর নিকটস্থ হইলে সে আমাকে বলিল,—"বাপরে! কথা আর ফুরায় না।" তাহার পর আমাকে সঙ্গে লইয়া সে উপরে উঠিল এবং এক এক করিয়া সে অনেক ঘর ছাড়াইয়া গেল। শেষে একটা ঘরের সম্মুখে গিয়া সে আঁচল হইতে চাবি বাহির করিয়া ঘরের তালা খুলিয়া ফেলিল। সেই ঘরের মধ্যে আমরা প্রবেশ করিলে, রমণী আমার হাতে একটা চাবি দিয়া বলিল যে, এই চাবি দিয়া সম্মুখের দ্বার খুলিলে মাসী-মাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। এ দিকে যে এত ঘর আছে তাহা আমি কখনও জানিতাম না এবং কখনও এ সকল ঘর দেখি নাই। মাসী-মার ঘরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমি রমণীকে বুঝাইয়া দিলাম যে, অতঃপর মাসী-মার সমস্ত ভার আমিই গ্রহণ করিয়াছি; রমণীকে আর কিছুই করিতে হইবে না।

রমণী আমার কথার উত্তরে বলিল,—"আঃ তুমি আমাকে বাঁচাইলে। কলিকাতায় যাইবার জন্য আমার প্রাণ ছট্ ফট্ করিতেছে।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"তুমি কি আজিই যাইবে?"

সে বলিল,—"আজিই কি? এখনই। আমি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি। তোমাদের কাছে এত দিন কত দৌরাত্ম্য করিলাম, সেজন্য কিছু মনে করিও না।"

সে চলিয়া গেল। বিধাতাকে ধন্যবাদ যে তাহার সহিত আমার ইহজীবনে আর কখন সাক্ষাৎ হয় নাই। মাসী-মার ঘরে গিয়া দেখিলাম, তিনি নিদ্রিত। তাঁহার শরীরের অবস্থা পূর্ব্বের অপেক্ষা মন্দ বোধ হইল না। ইহা আমার স্বীকার করা সর্ব্বথা আবশ্যক যে,

আমি মাসী-মার কোন বিষয়েই অযত্ন দেখিতে পাইলাম না। ঘরটী বহুদিন অব্যবহৃত থাকায় নিতান্ত মলিন হইয়াছিল সত্য কিন্তু বায়ু ও আলোক গমনাগমনের কোন অসুবিধা ছিল না। আমি যত দূর বুঝিতে পারিতেছি, রাজা ও রমণীকে এক্ষেত্রে মাসী-মাকে লুকাইয়া রাখা ভিন্ন আর কোন অপরাধে অপরাধী করা যায় না। মাসী-মার ঘুমের ব্যাঘাত হইবে মনে করিয়া আমি তখন সে স্থান হইতে চলিয়া আসিয়া বাহিরে মালীকে ডাক্তার বাবুকে আনিতে যাইতে বলিলাম। আমি মালীকে আমার নাম করিয়া ডাক্তার মহাশয়কে আসিবার কথা বলিতে বলিলাম। এখন চৌধুরী মহাশয় এখানে নাই, একথা শুনিলে আমার প্রতি কৃপা করিয়া অবশ্যই ডাক্তার বাবু আসিবেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতেছি। মালী ঘণ্টা ২।৩ পরে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, ডাক্তার বাবুর আজি একটু শরীর খারাপ আছে, বোধ হয় তিনি কালি প্রাতে আসিবেন। আমাকে এই সংবাদ দিয়া মালী চলিয়া যাইতেছে এমন সময়ে আমি তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম যে, আজি রাত্রিতে তাহাকে আমাদের এই ঘরের নিকটে কোন একটা খালি ঘরে শুইয়া থাকিতে হইবে। মালী সহজেই বুঝিল যে এত বড় বাড়ীতে একা থাকিতে আমার ভয় করিতেছে; সে আমার এ প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং রাত্রি ৯।১০টার সময় আসিয়া দুই তিনটী ঘরের পরে একটা খালি ঘরে শুইয়া থাকিল। রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে রাজা বিকট স্বরে এত ভয়ানক চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন যে, আমি ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। সমস্ত বৈকাল রাজা নিতান্ত অস্থির ও উত্তেজিত ভাবে বাটীর চারিদিকে বাগানে ও ময়দানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। আমি মনে করিয়াছিলাম হয়ত তিনি অতিরিক্ত মদ খাইয়াছেন। রাত্রি গভীর হইলে তাঁহার উগ্রতা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল এবং তিনি সহসা ঘোর কর্কশ শব্দে সকলকে ডাকিতে লাগিলেন। ব্যাপার কি জানিবার জন্য মালী ছুটিয়া গেল। পাছে সেই বিকট রব মাসী-মার কাণে আসিয়া পৌঁছে এই আশঙ্কায় আমি মাঝের সমস্ত দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম। মালী বলিল, রাজা পাগল হইয়া গিয়াছেন। মদ খাইয়া যে তিনি এমন করিতেছেন ; তাহা নহে ; কেমন এক রকম ভয়ে তাঁহার কাণ্ডজ্ঞান সব লোপ হইয়া গিয়াছে। সে গিয়া দেখিল রাজা ঘরের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন আর চীৎকার করিয়া বলিতেছেন তাঁহার বাড়ী নরককুণ্ড, তিনি এ জঘন্য স্থানে আর মুহূর্ত্তও থাকিবেন না, এই মাঝ রাত্রিতেই তিনি এখান হইতে চলিয়া যাইবেন। মালী তাঁহার সম্মুখস্থ হইলে তিনি তাহাকে অকারণ কটুবাক্য বলিয়া, তখনই গাড়ি তৈয়ার করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। তখনই সে গাড়ি আনিলে রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাতে লাফাইয়া উঠিলেন এবং ঘোড়াকে চাবুক মারিয়া গাড়ি হাঁকাইয়া দিলেন। মালী চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইল, রাজার মুখের আকৃতি অতি ভয়ানক। রাজা কোথায় গেলেন, কেনই বা গেলেন তাহা সে জানে না। এই ঘটনার একদিন কি দুইদিন পরে, নিকটস্থ রাজপুর গ্রামের একজন লোক গাড়ি ফিরাইয়া আনিল। রাজা সে গ্রামে গিয়াছিলেন, পরে রেলে উঠিয়া কোথায় গিয়াছেন তাহা সে লোক জানে না। তাহার পর এ পর্য্যন্ত আমি রাজার আর কোন সংবাদ পাই নাই এবং তিনি এদেশেই আছেন, কি দেশান্তরী হইয়াছেন তাহাও আমি বলিতে

পারি না। সেই অবধি আর আমি তাঁহাকে দেখি নাই, প্রার্থনা করি এ জীবনে যেন তাঁহার সহিত আর আমার সাক্ষাৎ না হয়।

এই দুঃখজনক গল্পে আমার বক্তব্য অংশ ক্রমেই শেষ হইয়া আসিতেছে। যাঁহাদের অনুরোধে আমি এ কাহিনী লিখিতেছি, তাঁহারা আমাকে বলিয়াছেন যে, ঘুম ভাঙ্গার পর মাসী-মা আমাকে যাহা বলিলেন ও তাঁহার যেরূপ ভাব হইল তাহার বিবরণ এ প্রস্তাবের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে। এই মাত্র বলা আবশ্যক যে, বাটীর ব্যবহৃত ভাগ হইতে এই অব্যবহৃত ভাগে তাঁহাকে কিরূপে আনা হইল তাহা মাসী-মা জ্ঞাত নহেন। কোন ঔষধের শক্তিতেই হউক, বা স্বাভাবিক ভাবেই হউক, তিনি তখন ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। বাটীতে তৎকালে নির্ব্বোধের শিরোমণি রামী ভিন্ন অন্য দাসদাসী ছিল না,—আমি কলিকাতায়। সেই সুযোগে মাসী-মাকে স্থানান্তরিত করা সহজেই ঘটিয়াছে। মাসী-মা নিদ্রাভঙ্গের পর রমণীকে যত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন সে কিছুরই উত্তর দেয় নাই; কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়েই, তাঁহার সহিত সসম্মান ব্যবহার করিয়াছে ও তাঁহার শুশ্রূষার কোনই ত্রুটী করে নাই। এই অতি ঘৃণিত প্রতারণা ব্যাপারে লিপ্ত থাকা ব্যতীত, অপর কোন কারণে, ধর্ম্মতঃ রমণীকে দোষী করিতে পারি না।

রাণী-মাতার প্রস্থান সংবাদে, অথবা অচিরাগত ঘোরতর বিষাদজনক সংবাদ শ্রবণে মাসী-মাতার কিরূপ অবস্থা ঘটিল তাহা আমাকে বলিতে হইবে না। বহুদিনে, বহু যাতনার পর, মাসী-মার হৃদয় এই সকল শোক অতিক্রম করিতে সমর্থ হইল। যে পর্য্যন্ত তাঁহার শরীরে সম্পূর্ণ শক্তি না হইল সে পর্য্যন্ত আমি তাহার কাছ ছাড়া হই নাই। তাহার পর উভয়ে একত্রে কলিকাতায় আসিয়া আন্তরিক কষ্টের সহিত আমাদের পরস্পরের নিকট বিচ্ছিন্ন হইতে হইল। আমি ভবানীপুরে একজন আত্মীয়ের বাটীতে গমন করিলাম; মাসী-মা কাঁদিতে কাঁদিতে শক্তিপুরে রাধিকা বাবুর বাটীতে গমন করিলেন।

কর্ত্তব্যানুরোধে আর কয়েকটী কথা লিখিয়া আমি এই শোকপূর্ণ কাহিনী সমাপ্ত করিব। আমার বিশ্বাস যে, যে সকল বৃত্তান্ত আমি লিপিবদ্ধ করিলাম তাহার মধ্যে কোন স্থানেই চৌধুরী মহাশয়ের বিন্দুমাত্র দোষের বা কলঙ্কের সংস্রব নাই। আমি জ্ঞাত হইয়াছি, তাঁহার সম্বন্ধে অতি উৎকট সন্দেহ এবং তাঁহার কৃত কোন কোন কার্য্যের অতি ভয়ানক অর্থ কল্পিত হইয়াছে। যে যতই কেন বলুক না, তাঁহার নির্দ্দোষতা সম্বন্ধে আমার অবিচলিত বিশ্বাস আছে। আমাকে কলিকাতায় পাঠাইবার সময়ে তিনি রাজার সহায়তা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি তাহা না জানিয়া এবং না বুঝিতে পারিয়াই করিয়াছিলেন; সুতরাং সে জন্য কখনই নিন্দনীয় হইতে পারেন না। তিনি যদি রমণীকে জুটাইয়া দিয়া থাকেন এবং সেই রমণী যদি গৃহস্বামী কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত ও সম্পাদিত প্রতারণায় লিপ্ত হইয়া ইতরতা প্রকাশ করিয়া থাকে, সে জন্য চৌধুরী মহাশয় দোষী হইবেন কেন? চৌধুরী মহাশয়কে অকারণ কলঙ্কভাজন করা আমার সম্পূর্ণ মতবিরুদ্ধ। আর এক কথা,—রাণী-মাতা যে দিন রাজবাটী হইতে কলিকাতায় চলিয়া যান সে তারিখটা আমার কোন মতেই মনে আসিতেছে না, এজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি শুনিয়াছি সেই তারিখটা জানা অতি আবশ্যক; কিন্তু

জন্য আমি অনেক ভাবিয়াও কিছুই মনে করিতে পারি নাই। এত দিন পরে তাহা আর মনে করা কখনই সম্ভব নহে। যে দুই জন লোক রাণী-মার সঙ্গে গিয়াছিল, তাহার মধ্যে রামীর কথা বাদ দিয়া, দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত তারিখের মীমাংসা হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু কপালক্রমে সে বেচারা কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসার প্রায় পোনের কুড়ি দিনের পর, হঠাৎ ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হইয়া, অতি সামান্য সময়ের মধ্যে, এই আত্মীয়হীন বিদেশে প্রাণ হারাইয়াছে। জানিবার কোন সম্ভাবনা থাকিলেও আমি রামীকে রকম রকম করিয়া এ কথা অনেক বার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু সে কোনবার বা হা করিয়া জিব বাহির করিয়াছে, কোন বার বা শুধুই হা করিয়াছে। এই দুই কার্য্য ছাড়া অন্য কোন উত্তর তাহার নিকট কখন পাই নাই। আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া এই বলিতে পারি যে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাশেষি রাণী-মা কলিকাতায় গিয়াছিলেন। এত যদি জানিতাম তাহা হইলে সে তারিখটা এক জায়গায় টুকিয়া রাখিতাম। সেই রেলের গাড়িতে শেষ বিদায় সময়ে রাণী-মা কাতরভাবে আমার পানে যে ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, তাঁহার তখনকার সে মুখ আমার যেমন মনে পড়িতেছে, তাঁহার যাত্রার দিনটাও যদি সেইরূপ মনে পড়িত তাহা হইলেই বেশ হইত।

চৌধুরী মহাশয়ের পাচিকা রামমতি ঠাকুরাণীর কথা।

আমি লিখিতে পড়িতে কিছুই জানি না মিথ্যা কথা বলা ভারী পাপ তাহা আমি জানি আমার এই সকল কথায় একটীও মিথ্যা থাকিবে না। যাহা আমি জানি তাহাই আমি বলিব। যে বাবু আমার কথা লিখিয়া লইতেছেন আমি লেখাপড়া না জানায় আমার কথায় যত দোষ হইবে, তাহা যেন তিনি দয়া করিয়া শুধরাইয়া লন।

গেল গ্রীষ্মকালে আমার চাকরি ছিল না। আমি জানিতে পারিলাম শিমুলিয়ায় এক বাড়ীতে একজন রাঁধুনির দরকার আছে। সে বাড়ীর নম্বর ৫। আমি সেই কর্ম্ম জুঠাইয়া লইলাম। বাড়ীর কর্ত্তা বাবুর নাম জগদীশ। তাঁহারা বুঝি চৌধুরী। কর্ত্তা আর গিন্নী ছাড়া বাড়ীতে আর তাঁহাদের কোন আপনার লোক ছিল না। আমি ছাড়া তাঁহাদের একজন ঝি ছিল। অন্য চাকর বাকর ছিল না। আমরা কাজে ভর্ত্তি হওয়ার পর কর্ত্তাবাবু আর গিন্নি-মা বাসায় আসিলেন। তাঁহারা আসার পরেই আমরা শুনিতে পাইলাম যে দেশ হইতে এ বাসায় শীঘ্রই গিন্নি-মার ভাইঝি আসিবেন। তাঁহার জন্য ঘর ঝাড়িয়া ও বিছানা পাতিয়া রাখা হইল। গিন্নি-মার মুখে শুনিতে পাইলাম তাঁহার ভাইঝির নাম রাণী লীলাবতী দেবী। তাঁহার শরীর বড় খারাপ, তাঁহার জন্য আমাকে একটু যত্ন করিয়া রাঁধিতে হইবে। তিনি সেই দিনই আসিবেন শুনিলাম। সে দিন কোন্ তারিখ তাহা আমার মনে নাই। সে সকল কথা আমরা মনে করিয়া রাখিতে জানি না। আমরা দুঃখী মানুষ—অত কথা আমাদের দরকার হয় না। রাণী ঠাকুরাণী আসিলেন। তিনি আসিয়াই আমাদের খুব হেঙ্গামে ফেলিলেন। কর্ত্তা মহাশয় রাণীকে কেমন করিয়া বাসায় আনিলেন তাহা আমি বলিতে পারি না—আমি তখন কাজে ছিলাম। আমার যেন মনে হইতেছে বৈকাল বেলায়

তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বাসায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার উপরে যাওয়ার একটু পরেই আমরা একটা গোল শুনিতে পাইলাম, আর গিন্নি-মা আমাদের ডাকিতেছেন শুনিলাম। ঝি আর আমি দৌড়িয়া উপরে আসিয়া দেখিলাম রাণী খাটের উপর শুইয়া আছেন; তাঁহার মুখ সাদা পাঙ্গাস, তাঁহার হাত খুব মুঠাবান্ধা, আর তাঁহার মাথা এক দিকে বাঁকিয়া রহিয়াছে। গিন্নি-মা বলিলেন, রাণী এখানে আসিয়াই হঠাৎ বড় ভয় পাইয়াছেন। কর্ত্তা বলিলেন, তাঁহার মূর্চ্ছা হইয়াছে। আমাদের বাড়ীর তিন চারিটা বাড়ীর পরেই ভোলানাথ বাবুর ডাক্তারখানা, আমি তাহা বেশ চিনিতাম। ভোলানাথ বাবুর খুব যশ। তিনি যে রোগ ভাল করিতে না পারেন তাহা কলিকাতার আর কোন ডাক্তারই আরাম করিতে পারেন না। যাহারা তাঁহাকে জানে, তাহারা কখন অন্য কোন ডাক্তারের কথা শুনে না। তিনি যেমন শান্ত তেমনই পরোপকারী ও অমায়িক লোক। আমার একবার ব্যারাম হইলে আমি মরার মত হইয়াছিলাম। ভোলানাথ বাবু আমার কাছ হইতে একটীও পয়সা লইলেন না, বাড়ার ভাগ ঘর হইতে ঔষধ দিয়া, আর দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়া আমাকে যমের মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিলেন। তাঁর মত মানুষ আর হয় না। তিনি মানুষও যেমন চমৎকার, তাঁর বিদ্যাও তেমনই আশ্চর্য্য। শুনিয়াছি বড় বড় সাহেব ডাক্তারও তাঁর চিকিৎসা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যায়। আমি রাণীর অবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি কর্ত্তাবাবুকে ভোলানাথ বাবুর কথা বলিলাম। তিনি আমাকে তখনই ভোলানাথ বাবুকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। আমি দৌড়িয়া আসিয়া দেখিলাম, ভোলানাথ বাবু ডাক্তারখানাতেই আছেন। তিনি তখনই আমার সঙ্গে আসিলেন।

ভোলানাথ বাবু আসিয়া দেখিলেন, রাণীর কেবলই মূর্চ্ছা হইতেছে। একবারকার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া একটু জ্ঞান হইতে না হইতে তাঁহার আবার মূর্চ্ছা হইতেছে। ডাক্তার বাবু রোগীর অবস্থা বেশ করিয়া দেখিয়া, ঔষধ লইয়া যাইবার জন্য ডাক্তারখানায় আসিলেন। দরকারী ঔষধ ছাড়া তিনি একটা বাঁশীর মত চোঙ্গ সঙ্গে করিয়া আনিলেন। সেই চোঙ্গটার একদিক তিনি রাণীর বুকে লাগাইয়া আর একদিক আপনার কাণে লাগাইয়া থাকিলেন। খানিক ক্ষণ সেইরূপ থাকিয়া তিনি গিন্নি-মাকে বলিলেন,—"পীড়া বড়ই কঠিন দেখিতেছি। রাণী লীলাবতী দেবীর আত্মীয় স্বজনকে সংবাদ দেওয়া আপনাদের এখনই আবশ্যক।" গিন্নি-মা জিজ্ঞাসিলেন,—"দেখিলেন কি বুকের ব্যারাম?" ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"দেখিলাম অতি ভয়ানক বুকের পীড়া।" তিনি যেমন যেমন বুঝিলেন সমস্তই গিন্নি-মার নিকট স্পষ্ট করিয়া বলিলেন। আমি সে সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না; তবে মোটামুটি এই বুঝিলাম যে, তাঁহারই চিকিৎসা হউক, কি আর কোন ডাক্তারের চিকিৎসাই হউক, কিছুতেই রাণী আরাম হইবেন না। ভোলানাথ বাবু যখন একথা বলিলেন, তখন শিব সাক্ষাৎ হইলেও রাণী আর বাঁচিবেন না, তাহা আমি ঠিক বুঝিলাম।

কর্ত্তাবাবু এই সকল কথা শুনিয়া যেরূপ কাতর হইলেন গিন্নি-মা সেরূপ হইলেন না। কর্ত্তাবাবু কেমন একরকম লোক। তাঁহার কতকগুলি বিলাতী ইঁদুর আর পাখী আছে। তিনি তাহাদের ছেলের মত সোহাগ করেন, আর তাহাদের সঙ্গে কতই গল্প করেন।

ডাক্তার বাবুর কথা শুনিয়া কর্ত্তাবাবু যাত্রার সঙের মত হাত নাড়িতে নাড়িতে কত দুঃখ করিতে লাগিলেন। মা যদি একটা কথা জিজ্ঞাসা করেন, বাবু দশটা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপে আমাদের জ্বালাতন করিয়া শেষে একটু ঠাণ্ডা হইলেন। পরে বাটীতে যে একটু ফুলবাগান ছিল, সেখানে আসিয়া অনেক ফুল তুলিয়া আমাকে সেই ফুল দিয়া রোগীর ঘর সাজাইয়া দিতে বলিলেন—যেন তাহাতেই ব্যারাম সারিয়া যাইবে। আমার বোধ হয় বাবু আগে একটু পাগল ছিলেন। তা হউক, তিনি কিন্তু লোক ভাল। তাঁর কথা-বার্ত্তা বড় মিষ্ট, হাসি তাঁর মুখে লাগিয়াই আছে, আর তাঁর মনে একটুও অহঙ্কার নাই। আমি গিন্নি-মার চেয়ে কর্ত্তাবাবুকে বেশী ভাল বাসি। গিন্নি-মা বড় খিট্‌খিটে মানুষ।

রাত্রে রাণীর একটু জ্ঞান হইল। তিনি আগে হাত পা না নড়াইয়া মরার মত পড়িয়াছিলেন, এখন একটু হাত পা নাড়িতে লাগিলেন, আর ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। রোগ হওয়ার পূর্ব্বে যে তাঁহার চেহারা খুব ভাল ছিল তাহার ভুল নাই। গিন্নি-মা সারারাত্রি একা তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিলেন। আমি শুইবার আগে একবার তাঁহাকে দেখিতে গেলাম; দেখিলাম তিনি প্রলাপ বকিতেছেন। খানিকক্ষণ তাঁহার কথা শুনিয়া আমার বোধ হইল তিনি কি কথা বলিবেন বলিয়া, কাহাকে খুঁজিতেছেন। যাহাকে তিনি সন্ধান করিতেছেন তাহার নামটা আমি প্রথম বারে ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। দ্বিতীয় বারে কর্ত্তাবাবু আসিয়া আমাকে রাণীর বিষয়ে এত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে আমি সেবারেও নামটা ঠিক করিয়া শুনিতে পাইলাম না।

প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলাম রাণীর চেহারা আরও খারাপ হইয়া গিয়াছে; আর তিনি যেন কাকনিদ্রায় আছেন। ভোলানাথ বাবু পরামর্শ করিবার জন্য আর একজন ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। তাঁহারা রাণীর ঘুম ভাঙ্গাইতে বিশেষ করিয়া বারণ করিলেন। তাঁহার আগে কেমন শরীর ছিল; আগে তাঁহার কে চিকিৎসা করিয়াছিলেন; কখন অনেক দিন ধরিয়া তাঁহার পাগলের লক্ষণ দেখা গিয়াছিল কি না, ইত্যাদি নানা কথা ডাক্তারেরা গিন্নি-মাকে ঘরের এক দিকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শেষ কথার উত্তরে তিনি বলিলেন,—"হাঁ!" তাহাতে ডাক্তারেরা দুজনে দুজনের মুখ চাহিয়া ঘাড় নাড়িলেন। তাঁহাদের ভাব দেখিয়া আমার বোধ হইল যে সেই আগেকার পাগ্‌লামির সহিত এখনকার বুকের রোগের বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেছেন। আহা! রাণীর শরীরে এখন কোনই শক্তি নাই; তাঁহাকে দেখিলে তিনি যে আর একটুও বাঁচিবেন এমন মনে হয় না।

সেই দিন আর একটু বেলা হইলে রাণীর অবস্থা হঠাৎ বেশ ভাল হইতে লাগিল। অচেনা লোক তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করা নিষেধ; এজন্য আমি কি ঝি তাঁহার নিকট যাইতে পাইলাম না। তিনি যে একটু ভাল আছেন সে কথা আমি কর্ত্তাবাবুর মুখে শুনিলাম। রাণী একটু ভাল আছেন জানিয়া কর্ত্তাবাবুকে স্ফূর্ত্তিযুক্ত বোধ হইল। তিনি রান্নাঘরের জানালা হইতে হাসিতে হাসিতে আমাকে ডাকিয়া এই সকল খবর জানাইলেন। তাঁহার বয়স যাইট্ বৎসর ছাড়াইয়া গিয়াছে,

কিন্তু তাঁহার ভাব ছেলে মানুষের মত। তিনি আহ্লাদে আটখানা হইয়া ভাল কাপড় চোপড় পরিয়া বেড়াইতে গেলেন।

দুপুর বেলা আবার ভোলানাথ বাবু আসিলেন। তিনিও বুঝিলেন যে ঘুম ভাঙ্গার পর হইতে রাণীর অবস্থা একটু ভাল হইয়াছে। তিনি আমাদিগকে রাণীর নিকটে কোন কথা এবং রাণীকে আমাদের সঙ্গে কোন কথা কহিতে বারণ করিলেন, আর যাহাতে রাণীর খুব ঘুম হয় তাহারই তদ্বির করিতে বলিলেন। রাণী ভাল আছেন বলিয়া কর্ত্তাবাবুর যত আহ্লাদ দেখিলাম, ডাক্তার বাবুর তত দেখিলাম না। তিনি নীচে আসিয়া আর কোন কথাই বলিলেন না; কেবল বলিলেন যে, তিনি আবার বেলা ৫টার সময় আসিবেন। প্রায় বেলা ৫টার সময় গিন্নি মা অত্যন্ত ভয়ের সহিত উপর হইতে চীৎকার করিয়া আমাকে ডাক্তার বাবুকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। রাণীর আবার মূর্চ্ছা হইয়াছে। তখনও কর্ত্তা বাবু ফিরিয়া আইসেন নাই। আমি তাড়াতাড়ি বাহির হইতেছি, এমন সময় ভাগ্যক্রমেডাক্তার বাবুকে আমাদের দরজার কাছেই দেখিতে পাইলাম। তিনি আপনিই রোগীকে দেখিতে আসিতেছিলেন।

আমিও ভোলানাথ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠিলাম। ডাক্তার বাবু দ্বারের কাছে যাইতেই গিন্নি-মা বলিলেন,—"রাণী লীলাবতী সেই রকমই ছিলেন, ঘুম ভাঙ্গার পর হইতে তিনি কেমন এক রকম ভাব করিয়া ঘরের চারি দিকে চাহিতে লাগিলেন। হঠাৎ তিনি একবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মূর্চ্ছা হইল।" ডাক্তার বাবু কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া রোগীর নিকটে গিয়া মুখ নত করিয়া দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার মুখের খুব চিন্তিত ভাব হইল, তিনি রাণীর বুকের উপর হাত দিলেন।

গিন্নি-মা ডাক্তার বাবুর মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিল এবং তিনি অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আছেন তো?"

ডাক্তার স্থির ও গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন—"না; মৃত্যু হইয়াছে। কালি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পর আমার মনে ভয় ছিল যে রাণীর হঠাৎ মৃত্যু হইবে; তাহাই হইয়াছে।" গিন্নি-মা ডাক্তার বাবুর কথা শুনিয়া থর থর কাঁপিতে লাগিলেন এবং কয়েক পদ পিছাইয়া আসিয়া আপন মনে অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"এত শীঘ্র হঠাৎ মৃত্যু হইল! চৌধুরী মহাশয় বলিবেন কি?" ডাক্তার বাবু তাঁহাকে বলিলেন,—"আপনি সারা রাত্রি জাগিয়া আছেন,আপনার শরীর খারাপ হইয়া গিয়াছে, আপনার আর এখন এখানে থাকিয়া কাজ নাই, আপনি নীচে গিয়া মনকে স্থির করুন। আপাততঃ যাহা কর্ত্তব্য তাহার ব্যবস্থা আমি করাইয়া দিতেছি। যতক্ষণ ব্যবস্থা মত কার্য্য না হয় ততক্ষণ (আমার দিকে হাত ফিরাইয়া দেখাইলেন) ইনি এখানে থাকুন।" গিন্নি-মা নীচে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিতে লাগিলেন,—"চৌধুরী মহাশয়কে কেমন করিয়া এ কথা জানাইব? ওমা, কি হইবে!" তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

গিন্নি-মা চলিয়া গেলে ডাক্তার বাবু আমাকে বলিলেন,—"তোমাদের বাবু তো বিদেশী লোক। তিনি বোধ হয় কলিকাতার সকল ব্যবস্থা জানেন না।" আমি বলিলাম,—"না জানাই সম্ভব।" তিনি আবার বলিলেন,—"দেখিতেছি ইঁহাদের লোকজন বেশী নাই, হয়ত এ অবস্থায় তাঁহাদের কিছু বিব্রত

হইতে হইবে। যদি সুবিধা মনে কর, তাহা হইলে যেরূপ লোকের দ্বারা এ সময়ের সাহায্য হওয়া সম্ভব, আমি সেরূপ লোক দুই চারিজন পাঠাইয়া দিতে পারি।" আমি বলিলাম,—"আপনি কৃপা করিয়া সে সকল ব্যবস্থা না করিয়া দিলে ইহাদের বড়ই কষ্ট পাইতে হইবে। আমরা কাহাকেও চিনি না, কিছুই জানি না।" তিনি অনুগ্রহ করিয়া লোক পাঠাইতে সম্মত হইয়া চলিয়া গেলেন; আমি মরার নিকটে বসিয়া থাকিলাম।

কর্ত্তাবাবু বাটী আসিলেন কিন্তু উপরে আসিলেন না। আমি যখন তাঁহাকে দেখিলাম তখন তাঁহাকে দেখিয়া নিতান্ত অভিভূত বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাকে দেখিয়া নিতান্ত চিন্তিত ও অবসন্ন বলিয়া মনে হইল, কিন্তু বিশেষ দুঃখিত বলিয়া আমার মনে হইল না। দয়ার সাগর ভোলানাথ বাবু চারিজন লোক পাঠাইয়া দিলেন, তাহারা বৈষ্ণব। গিন্নি-মা সৎকারের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ওঃ! সৎকারের জন্য যে তাঁহারা কত টাকাই খরচ করিলেন তাহার আর কি বলিব? অতি উত্তম খাটে বেশ করিয়া বিছানা পাতা হইল। তাহার উপর রাণীকে শুয়াইয়া শাল দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইল। চন্দন কাষ্ঠ, ধূনা, ঘৃত প্রভৃতির দ্বারা সৎকারের ব্যবস্থা হইল। লোকেরা খাট কাঁধে লইয়া চলিল। কর্ত্তাবাবু খালি পায়ে গামচা কাঁধে লইয়া, নিতান্ত দুঃখিত ভাবে, থপ থপ করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। গিন্নি-মা আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে শান্ত করিতে থাকিলাম। রাণী লীলাবতী দেবীর স্বামী তখন বিদেশে বেড়াইতে গিয়াছেন, কোন্ স্থানে আছেন তাহার স্থিরতা নাই। তাঁহাকে সংবাদ দিবার কোন সুযোগ হইল না। শক্তি-পুরে বুঝি রাণীর বাপের বাড়ী; সেখানে সংবাদ গেল।

আমাকে যে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল শেষে তাহার উত্তর লিখিতেছি।

(১) আমি কি ঝি কর্ত্তাবাবুকে কখন নিজ হাতে রাণীকে ঔষধ খাওয়াইতে দেখি নাই।

(২) কর্ত্তাবাবুকে আমি কখন রাণীর ঘরে একা থাকিতে দেখি নাই।

(৩) রাণী এখানে আসিয়াই প্রথমে যে কেন খুব ভয় পাইয়াছিলেন তাহা আমি বলিতে পারি না। আমাকে বা ঝিকে সে ভয়ের কারণ কখনই কেহ বলেন নাই।

উপরের সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে পড়িয়া শুনান হইয়াছে। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি তাহার সমস্তই সত্য।

শ্রীমতী রামমতি দেব্যা। × ঢেরাসহি।

ডাক্তারের কথা।

ই সেক্সনের জন্ম মৃত্যুর রেজিষ্ট্রার মহাশয় সমীপেষু—

আমি শ্রীমতী রাণী লীলবতী দেবীর চিকিৎসা করিয়াছিলাম। তাঁহার বয়স একুশ বৎসর। গত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ৫ নং আশুতোষ দেবের লেনে মৃত্যু হইয়াছে, হৃদ্‌রোগ তাঁহার মৃত্যুর কারণ। পীড়া কত দিন ব্যাপী আমি তাহা জানি না। ইতি তারিখ ২৬শে জ্যৈষ্ঠ। ১২৮৫।

(স্বাক্ষর) শ্রীভোলানাথ ঘোষ।
লাইসেন্স প্রাপ্ত ডাক্তার।

বৈষ্ণবগণের কথা।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ভোলানাথ বাবুর লোক, একজন স্ত্রীলোকের সৎকারের জন্য আমাদের ডাকিয়া আনিয়া দেয়। আমরা চারি জনে আসিয়া শুনিলাম যে, তিনি একজন রাণী। আমরা তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নিমতলায় লইয়া আসি এবং চন্দন কাষ্ঠের চিতায় উঠাইয়া ঘৃত, ধূনা ও রত্নাদি দিয়া, সৎকার শেষ করি। আমরা প্রত্যেকে দুই টাকা হিসাবে পুরস্কার পাই। আমাদের সঙ্গে রাণীর পিসা মহাশয়ও ঘাটে গিয়াছিলেন। সৎকারের অনেক খরচ হইয়াছিল; কিন্তু আমাদের আর কিছু করিয়া দিলে ভাল হইত।

(স্বাক্ষর) শ্রীনিত্যানন্দ দাস।
শ্রীগোপীনাথ রায়।
শ্রীরামহরি দে।
শ্রীজগদ্দুর্লভ দাস।

নিমতলার ঘাটের কথা।

নাম—লীলাবতী দেবী। স্বামীর নাম—রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়। পিতার নাম—৺ প্রিয়প্রসাদ রায়। বয়স—একুশ বৎসর। মৃত্যুর দিন—২৫শে জ্যৈষ্ঠ। ১২৮৫ (ঘাটের রেজেষ্টরী বহি।)

শক্তিপুরের উদ্যানে বরদেশ্বরী দেবরীর প্রতিমূর্ত্তি
পার্শ্বস্থ প্রস্তরফলকের কথা।
সুন্দরী-শিরোমণি, পাপ-সংস্পর্শ-বিহীনা, পরলোকগতা

শ্রীশ্রীমতী রাণী লীলাবতী দেবীর
স্বর্গীয় জীবনের স্মরণার্থ
এই প্রস্তর-ফলক
সংস্থাপিত
হইল।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসুর কথা।

১২৮৫ সালের গ্রীষ্মারম্ভে আমি এবং আমার জীবিত সঙ্গিগণ কাবুল হইতে স্বদেশে ফিরিতে আরম্ভ করিলাম। এই সুদীর্ঘ প্রবাসে আমি বারংবার মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছি। কিন্তু সে সকলের বিবরণ অধুনা নিষ্প্রয়োজন। অতি কষ্টের পর ১৩ই ভাদ্র রাত্রে আমরা কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলাম।

যে অভিপ্রায়ে আমি স্বদেশের মায়া পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে প্রস্থান করিয়াছিলাম, তাহা পাঠকবর্গ জ্ঞাত আছেন। এই স্বারোপিত বনবাস হইতে আমি পরিবর্ত্তিত মানব হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলাম। নিদারুণ বিপদ ও কষ্ট ভোগ করিয়া আমার বাসনা কাঠিন্য লাভ করিয়াছে, আমার হৃদয় দৃঢ় হইয়াছে। অভিনব দুর্দ্দৈব পরম্পরার আঘাতে আমার জীবন নবীভূত ও বলীয়ান্ হইয়াছে। একদা আমি আত্ম-জীবনের ভবিষ্যতের অস্পষ্ট ছায়া সন্দর্শনে ভীতভাবে পলায়ন করিয়াছিলাম, অদ্য আমি সেই দুর্দ্দমনীয় ভবিষ্যতের সম্মুখীন হইবার নিমিত্ত পুনরাগত হইলাম। নবজীবন লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু আশাভঙ্গজনিত অপ্রতিবিধেয় মনস্তাপের এক বর্ণও কদাপি ভুলিতে সক্ষম হইয়াছি কি? না; আমি কেবল সে দারুণ যন্ত্রণা কেমন করিয়া

সহিতে হয় তাহা অভ্যাস করিয়াছি। যখন এই চিরপ্রিয় মাতৃভূমি হইতে প্রস্থান করি, তখনও লীলাবতী দেবী আমার চিন্তার একমাত্র বিষয়; আবার যখন সেই চিরপ্রীতি-পূর্ণ রমণীয় প্রদেশে পুনরায় প্রবেশ করিলাম, তখনও লীলাবতী দেবী আমার চিন্তার একমাত্র বিষয়। প্রেমের কি আশ্চর্য্য অন্ধতা! লীলাবতী এখন রাণী, লীলাবতী এখন পরের সামগ্রী। আমার অন্ধ প্রেম এ সকল কঠোর চিন্তা একবারও মনে উদিত হইতে দিতেছে না।

রাত্রি দশটার সময় কলিকাতায় পৌছিলাম। তখনই কে আমাকে লীলার সংবাদ দিবে? মনোরমা দেবী কেমন আছেন কেই বা জানাইবে? অগত্যা আমাকে পরদিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল। কিন্তু কোথায় যাইলে, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদের সংবাদ পাইব? সমস্ত রাত্রির একবারও নিদ্রার সাক্ষাৎ পাইলাম না। স্থির করিলাম পরদিন প্রত্যূষে শক্তিপুরে যাইব এবং আনন্দধাম-সন্নিহিত লোকজনের নিকট হইতে তাঁহাদের সংবাদ সংগ্রহ করিব।

গ্যাসালোক নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বেই আমি গাত্রোত্থান করিলাম এবং ষ্টেশনে আসিয়া উপনীত হইলাম। বহুক্ষণ ষ্টেশনে বসিয়া যম-যন্ত্রণা ভোগ করার পর বেলা ৭টার ট্রেণ আমাকে বহন করিয়া শক্তিপুর যাত্রা করিল। আমি বেলা প্রায় ১১টার সময় পূর্ব্ব-পরিচিত তারার খামারে পৌছিলাম। আমাকে দেখিয়া তারা চিনিতে পারিল এবং একটা কাঠের বাক্স পাতিয়া বসিতে দিল। আমি বসিলে তারা একে একে অনেক কথা আমাকে শুনাইল। তাহার সকল কথাই আমি ধীরভাবে শুনিলাম। যাহা বলিবার নহে তাহাও সে বলিল। তখন সংসার অন্ধকার! জীবন মরুভূমি হইল। আর কেন?

আর কেন? জানি না আর থাকি কেন? যে চিতায় লীলার কোমল কলেবর ভস্মীভূত হইয়াছে তাহার কণামাত্র ভস্ম পাওয়া যাইতে পারে কি? না, তাহা আর পাওয়া যাইবে না। তাহা পাইলে একবার মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই পবিত্র বিভূতি-বিলেপিতকায় হইয়া জীবন সার্থক করিতাম। তাহা হইবার নহে। তারার মুখে শুনিলাম লীলার স্মরণার্থ আনন্দোদ্যানে এক প্রস্তর-ফলক সংস্থাপিত হইয়াছে। লীলাবতী দেবীর স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পাষাণখণ্ড কি সহায়তা করিবে? আমার হৃদয় হইতে সে স্মৃতি বিলোপ করে এমন সাধ্য কাহার আছে? তথাপি একবার সেই পরলোকগতা নবীনার নামযুক্ত পাষাণ খণ্ড স্পর্শ করিতে বড়ই বাসনা হইল। আমি, ইহজগতে আমার এই শেষ বাসনা চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে, আনন্দধাম-সংলগ্ন উদ্যানোদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

ধীরে ধীরে আমি ক্রমশঃ সেই সুপরিচিত, চির নবীনতা ও সজীবতা পূর্ণ, বহুমাসব্যাপী আশা ও হতাশার লীলাক্ষেত্র, বিপদ ও আশঙ্কার নিকেতন, আমার জীবনের সেই প্রিয় রঙ্গভূমিতে উপনীত হইলাম। কিন্তু কি ভাবে? তাহা আর বুঝাইবার প্রযত্ন করিব না। সেই ক্ষেত্র হইতে আমি কতকাল হইল অন্তরিত হইয়াছি, কিন্তু প্রবল পূর্ব্বস্মৃতি আমাকে সকলই অচিরপূর্ব্ব দৃষ্ট, সম্প্রতি পরিত্যক্তরূপে প্রতীত করিতে লাগিল। আমার মনে হইতে লাগিল, এখনই তিনি আমার সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে রচনাপুস্তক হস্তে

লইয়া হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়া আসিবেন! অহো! মৃত্যু, তোমার আক্রমণ কি কঠোর! হে শমন! তুমি কি নির্ম্মম! হায়! আজি এ কি পরিবর্ত্তন!

আমি সেদিক হইতে ফিরিলাম। বরদেশ্বরী দেবীর সেই অমল ধবল মর্ম্মর প্রস্তর-বিনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি আমার নেত্রপথবর্ত্তী হইল। দেখিলাম, সেই প্রতিমূর্ত্তি পদতলস্থ বেদিকা পার্শ্বে, আর এক অভিনব বেদিকা বিনির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ নবীন বেদিকা কি সেই চিরস্মরণীয়া নবীনার স্মরণার্থ সংগঠিত হইয়াছে? আমি ধীরে ধীরে সেই বেদিকা আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলাম। নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, বেদিকার একপার্শ্বে স্বর্ণাক্ষর সংযুক্ত এক সমুজ্জল পাষাণফলক সন্নিবিষ্ট। আমি সেই নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন লিপি পাঠ করিতে প্রযত্ন করিলাম। সেই দেবীর নাম আমি পাঠ করিলাম। আমার শেষ বিদায় কালে তাঁহার সেই অশ্রুভারাবনত আয়ত ইন্দীবর লোচন; সেই ঘনকৃষ্ণ কেশকলাপ-সমাচ্ছন্ন অবসন্ন ও আনত শির এবং তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিবার নিমিত্ত আমাকে তাঁহার কাতর ও নির্দ্দোষ অনুরোধ ইত্যাদি সমস্ত ঘটনাই আমি আজি প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। বড় আশা করিয়াছিলাম পুনঃ সাক্ষাতে তাঁহার সুখময় পরিবর্ত্তন দেখিয়া সুখী হইব, তাঁহাকে আনন্দময়ী দেখিয়া আনন্দ লাভ করিব। হা বিধাতঃ! সে আশার কি এই পরিণাম?

আমি আর একবার সেই ক্লেশপ্রদ লিপি পাঠ করিবার প্রযত্ন করিলাম। কিন্তু না; আর তাহা দেখিব না। সেই দেবীর নামের সহিত এরূপ এক শব্দ সংযুক্ত হইয়াছে যে, তৎপাঠে আমার চিন্তাগ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে এবং আমাকে তাঁহার চিন্তা হইতে বিচ্যুত করিতেছে। অতএব বেদিকার এ পার্শ্বে না থাকিয়া অপর দিকে গমন করিলাম। আমি সেই স্থানে গিয়া উভয় বাহু দ্বারা সেই বেদিকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলাম এবং বেদিকার উপরে মস্তক স্থাপন করিয়া উপবেশন করিলাম। তখন বাহ্য জগৎ আমার নয়ন ও অন্তর হইতে অন্তরিত হইল। তখন আমি "প্রাণেশ্বরি! সর্ব্বস্ব ধন! কোথায় তুমি?" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। "গত কল্য বলিলেই হয়, আমি তোমার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছি,—গত কল্য বলিলেই হয়, তোমার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ হইয়াছে—আর আজি তুমি কোথায়? প্রাণেশ্বরি! আমার হৃদয় যত্ন! আজি তুমি কোথায়।"

কতক্ষণ আমি সেই ভাবেই পড়িয়া রহিলাম। দূরাগত এক অস্ফুটশব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। শব্দ ক্রমশঃ আমার নিকটে আসিতে লাগিল। তখন আমার বোধ হইল তাহা মানবের পদধ্বনি। শব্দ থামিয়া গেল। আমি বেদিকার উপর হইতে মস্তকোত্তলন করিলাম। তখন সূর্য্য অস্তোন্মুখ। তাহার বক্র স্নিগ্ধ কিরণ-সম্পাতে কানন উদ্ভাসিত। আকাশ মেঘ বিহীন। সুমন্দ মারুত হিল্লোলে চারিদিক আমোদিত। আমি দেখিলাম সেই বেদিকার বিপরীত দিকে, দুই অবগুণ্ঠনবতী রমণী সেই বেদিকা দেখিতেছেন এবং আমাকেও দেখিতেছেন। দুই জনেই একটু অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তখন রমণীদ্বয়ের এক জন অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়া ফেলিলেন। আমি সেই সান্ধ্য আলোকে, সবিস্ময়ে দেখিলাম তিনি মনোরমা দেবী। সে মুখের কতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যেন কত বর্ষমেয় কালের তরঙ্গাভিঘাত

তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে। দেখিলাম, সেই প্রীতি বিস্ফারিত উজ্জ্বল লোচন অধুনা নিতান্ত ভয়চকিত ও ব্যাকুল ভাবে আমার প্রতি চাহিয়া আছে। বদন-মণ্ডল শ্রীভ্রষ্ট, শুষ্ক, মলিন ও অবসন্ন হইয়াছে। যাতনা, মনস্তাপ ও বিষাদ তাহার উপর অনপনেয় অঙ্কপাত করিয়াছে।

আমি বেদিকা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অভিমুখে একপদ মাত্র অগ্রসর হইলাম। কিন্তু তিনি নির্ব্বাক্ ও নিশ্চল। তখন তাঁহার সঙ্গিনীর বদন হইতে একটা অপরিস্ফুট ধ্বনি বাহির হইল। আমি স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম। সহসা আমার জীবন অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং এক অবক্তব্য আতঙ্কে আমার আপাদ মস্তক অভিভূত হইয়া গেল। অবগুণ্ঠনবতী সঙ্গিনীর নিকট হইতে সরিয়া ধীরে ধীরে আমার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন মনোরমা দেবী কথা কহিলেন। সেই ভাবান্তরিত ভয়চকিত নয়নের ন্যায়, সেই রূপান্তরিত কাতর বদনের ন্যায় তাঁহার কণ্ঠস্বরের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই; আমি তাহা ঠিক চিনিতে পারিলাম।

তিনি অতি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন,—আমার স্বপ্ন! আমার সেই স্বপ্ন!" পরে করযোড়ে উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—"বিধাতা! তুমি উহাঁর সহায় হও; এই দুঃসময়ে, দয়াময়, তুমি উহাঁকে বল দেও।"

অবগুণ্ঠনবতী ধীরে ধীরে ও নিঃশব্দে আমার নিকটস্থ হইলেন। আমি তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতে অতঃপর আমার অন্য কোন দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিবার ক্ষমতা তিরোহিত হইয়া গেল। যে কণ্ঠ এতক্ষণ আমার নিমিত্ত ভগবানের সাহায্য কামনা করিতেছিল, তাহা নির্জীব ও রুদ্ধ হইয়া পড়িল এবং পরক্ষণেই সহসা সতেজ ও সজোরে আমাকে চলিয়া আসিবার নিমিত্ত নিতান্ত ভীত ও হতাশ ভাবে ডাকিতে লাগিল। কিন্তু তখন সেই অবগুণ্ঠনবতী আমার দেহ ও আত্মার উপর সর্ব্বতোমুখী আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছেন। অবগুণ্ঠনবতী বেদিকার অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

যে কণ্ঠ এতক্ষণ কথা কহিতেছিল সেই কণ্ঠ এক্ষণে অধিকতর নিকটস্থ হইয়া অধিকতর আগ্রহের সহিত বলিতে লাগিল, "তোমার মুখ ঢ কিম্বা রাখ, এই স্ত্রীলোকের মুখ দেখিও না। ভগবান্ উহাঁকে রক্ষা কর।"

তথাপি অবগুণ্ঠনবতী অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়া ফেলিলেন। দেখিলাম, সেই লীলাবতী দেবী—সেই সজীব, চিরমাধুর্য্যময়ী লীলাবতী দেবী—তাঁহার মৃত্যুর এই অবিসম্বাদিত নিদর্শনের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমার প্রতি চাহিয়া আছেন।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত।

শুক্লবসনা সুন্দরী।

তৃতীয় ভাগ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসুর কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।
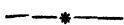
সেই সন্ধ্যা সময়ে, সেই সরসী-সন্নিহিত সুশ্যামল কানন মধ্যে, সহসা স্বর্গীয় লীলাবতী দেবীর সজীব প্রতিমূর্ত্তি-সন্দর্শন করার পর হইতে, আমার জীবন-প্রবাহ এক অভিনব পন্থা পরিগ্রহ করিল এবং আমার আশা ও আশঙ্কা, উদ্যম ও অনুরাগ, সমস্তই নবীভূত হইয়া আমাকে নবোৎসাহে বলীয়ান্ করিল। সেই অচিন্তিতপূর্ব্ব শুভসংঘটনের পরবর্ত্তী সপ্তাহ কালের বিবরণ বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

আমরা কলিকাতায় আসিয়া, কল্পিত নাম ধারণ করিয়া, অধিষ্ঠিত হইলাম। যে পথ-পার্শ্বে আমরা বাসস্থান মনোনীত করিলাম তাহা সতত জনাকীর্ণ। আমাদের বাস-ভবনের নিম্নতলে একখানি মনোহারী বিপণি। দ্বিতল ও ত্রিতলে আমাদের বাসা। দ্বিতলে আমি থাকি; আর ত্রিতলে শ্রীমতী মনোরমা দেবী ও শ্রীমতী লীলাবতী দেবী, আমার ভগ্নী পরিচয়ে, বাস করেন। আমি কলিকাতার একখানি ইংরাজি দৈনিক সংবাদ পত্রের জন্য প্রবন্ধ রচনা করি; আর তাঁহারা, অবকাশ-কালে মোজা কম্ফর্টর আদি বুনিয়া যাহা কিছু প্রাপ্ত হন, তদ্দ্বারা আমার সাহায্য করেন। আমাদের দাস দাসী নাই। রন্ধনাদি সমস্ত গৃহকর্ম্মই মনোরমা দেবী স্বয়ং সম্পন্ন করেন। তাঁহার সেই ক্ষীণ শরীরে, সেই দুর্ব্বল ও শীর্ণ দেহে, সেই চির-সুখ-সেবিত কলেবরে কঠোর গৃহকর্ম্ম সমাধা করা সম্পূর্ণ অসম্ভাবিত হইলেও আমাদের আয়ের অবস্থা দেখিয়া ও সম্ভাবিত ব্যয়ের পরিমাণ বিবেচনায়, অগত্যা তিনি

জোর করিয়া এই গুরু ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। কষ্টে সৃষ্টে এক জন ঝি রাখি-লেও রাখা যাইতে পারিত, কিন্তু কোন অপরিচিত নূতন লোককে আমাদের এই প্রচ্ছন্ন জীবনের সহিত মিশিতে দেওয়া নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ বিবেচনায়, তাহা করা হইল না। সংবাদ পত্রের জন্য পরিশ্রম করিয়া আমার যাহা আয় হয় তাহা হইতে কায়ক্লেশে আমাদিগের সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহিত করিয়া যৎকিঞ্চিৎ বাঁচিয়া থাকে, তাহা ভবিষ্যতের জন্য আমরা সযত্নে সঞ্চিত করিয়া রাখি। লীলাবতী দেবীর সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর হইতে, এপর্য্যন্ত, মনোরমা দেবীকে নানা কারণে বহু ব্যয় ভূষণ করিতে হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রীধন স্বরূপ কিঞ্চিৎ সঞ্চিত অর্থ ছিল, তদ্দ্বারা তৎসমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া, এক্ষণে তাহার প্রায় দুই শত টাকা মাত্র অবশিষ্ট ছিল। আমার হস্তেও প্রায় ঐ পরিমিত অর্থ ছিল। অধুনা আমরা উভয়ের সঞ্চিত এই ক্ষুদ্র সম্পত্তি এক-ত্রিত করিয়া ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিলাম। তাহা আমাদের পবিত্র ধন স্বরূপে রক্ষিত হইল। লীলার নিমিত্ত যে ভয়ানক যুদ্ধে আমি প্রবৃত্ত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহার জন্য ভবি-ষ্যতে আমার কখন কিরূপ প্রয়োজন উপস্থিত হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

এইরূপে বিশ্বরাজ্য হইতে পরিত্যক্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে, আমরা এই ঘোর জনাকীর্ণ কলি-কাতা মহানগর মধ্যে, অজ্ঞাতবাস আরম্ভ করিলাম। যুক্তির চক্ষে, আইন অনুসারে, আত্মীয় কুটুম্বের বিচারে, এবং সর্ব্বসাধারণের বিবেচনায় রাণী লীলাবতী দেবীর মৃত্যু হই-য়াছে। আমার চক্ষে এবং তাঁহার ভগ্নীর চক্ষে ৺প্রিয় প্রসাদ রায়ের কন্যা,রাজা প্রমোদ-রঞ্জনের স্ত্রী এখনও জীবিতা; কিন্তু সাধা-রণের চক্ষে তিনি মৃতের তালিকাভুক্ত—জীবনেও মৃতা ও ভস্মাবশেষে পরিণতা। তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন, সুতরাং তাহার চক্ষে তিনি মৃতা; ভবনস্থ দাস-দাসীগণ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, সুতরাং তাহাদের চক্ষে তিনি মৃতা; রাজ-পুরুষগণ তাঁহার সম্পত্তি তাঁহার স্বামী ও পিতৃষ্বসাকে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের চক্ষে তিনি মৃতা। সর্ব্বত্র, সর্ব্ববিধ বিচারে, তিনি মৃতা। তথাপি জীবিতা! দুঃখ ও দারিদ্র্য মধ্যে, দীনহীন এক পরিচিত শিক্ষ-কের সহায়তায়, এবং এক যাতনাক্লিষ্ট বিধবা ভগ্নীর যত্নে, পুনরায় সজীব মনুষ্যমণ্ডলী মধ্যে পরিগণিত হইবার চেষ্টায় নিযুক্ত। যে এই ঘটনা শুনিয়াছে সেই, ইহা নিরতিশয় অসম্ভব ব্যাপার বোধে, ঈষৎ বক্র হাস্যের সহিত, সকল কথা উপেক্ষা করিয়াছে এবং আমাদের দুই জনকে মুক্তকেশী নাম্নী উন্মা-দিনীর সহিত লিপ্ত, ঘোর দুরভিসন্ধির বশ-বর্ত্তী, দারুণ চক্রান্তকারী বলিয়া মনে করি-য়াছে। কিন্তু যে লীলাবতীকে কেহই চিনিল না, অতি স্বসম্পর্কিত ব্যক্তিগণও যাঁহাকে তাঁহার স্বরূপত্ব প্রদান করিল না এবং কেহই যাঁহাকে উন্মাদিনী মুক্তকেশী ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করিল না, তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ হইয়াছিল কি? যে মুহূর্ত্তে তাঁহার মৃত্যুর অকাট্য স্বাক্ষীস্বরূপ সেই স্মরণ লিপির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তিনি বদনের অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়াছেন, তৎকাল হইতে, অণুমাত্র ভ্রম হওয়া দূরে থাকুক, কোন প্রকার সন্দেহের ছায়াও আমার অন্তরে উদিত হয় নাই। সেই দিন দিবাকর অস্তগত হইবার পূর্ব্বে

তাঁহার যে জন্ম-ভবনের দ্বার তাঁহার পক্ষে চির-নিরুদ্ধ হইয়াছে তাহার দৃশ্য আমাদের নেত্র-পথ-ভ্রষ্ট না হইতেই, আমি আনন্দধাম হইতে প্রস্থান কালে, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ উপলক্ষে, তাঁহাকে যে যে কথা বলিয়াছিলাম তাহা আমাদের উভয়েরই মনে পড়িল। আমি তখনই তাহার পুনরাবৃত্তি করিলাম; তিনিও তাহা স্পষ্টই মনে করিলেন। "কিন্তু দেবি, যদি কখন এমন সময় উপস্থিত হয়, যখন আমার প্রাণপণ চেষ্টাতে আপনার এক মুহূর্ত্তেরও সন্তোষ জন্মিতে পারে, বা এক মুহূর্ত্তেরও কষ্ট বিদূরিত হইতে পারে, তখন কি দেবি, আপনি দয়া করিয়া এ দীনহীন শিক্ষককে স্মরণ করিবেন!" যে অবলা পরাগত গুরুতর বিপদ ও মনস্তাপের প্রায় কিছুই মনে করিতে অক্ষম, তিনি কিন্তু, আমার সেই বহুদিন পূর্ব্বে কথিত, এই কথাগুলি সুন্দররূপে স্মরণ করিতে সক্ষম হইলেন এবং তখনই, নিতান্ত আত্মীয় জ্ঞানে, আমার বক্ষে মস্তক স্থাপন করিয়া, আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন,—"দেবেন্দ্র, তাহারা আমাকে সকল কথাই ভুলাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে; তথাপি আমি দিদিকে আর তোমাকে ভুলি নাই।" বহুকাল পূর্ব্বেই আমি সেই দেবীর চরণে আমার সম্পূর্ণ প্রেম উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছি। তাঁহার এই বাক্যের পর, আমি আমার জীবনও সেই সন্তপ্তা নারীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত করিলাম এবং সর্ব্বশক্তিমান বিশ্ববিধাতার অনুকম্পায় আমার জীবন রক্ষিত হওয়ায়, আমি তাহা তদভিপ্রায়ে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হইলাম বলিয়া, সেই মঙ্গলময় দেবতার উদ্দেশে বার বার নমস্কার করিলাম।

সময় উপস্থিত হইয়াছে! শত শত ক্রোশ দূর হইতে, ঘোরারণ্য ও দুর্গম গিরি-সঙ্কট অতিক্রম করিয়া, মৃত্যুর ভীষণ আক্রমণের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া, আমি সমুচিত সময়ের সম্মুখীন হইবার নিমিত্ত, প্রত্যাগত হইয়াছি। অধুনা তিনি আত্মীয় স্বজনকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, বহুযাতনায় ক্লিষ্ট, রূপান্তরিত, শ্রীভ্রষ্ট এবং তাঁহার চিত্ত তমসাচ্ছন্ন। এখন তাঁহার সে পদ-গৌরব নাই, তাঁহার সে ধন-সম্পত্তি নাই, তদীয় চরণে আমার হৃদয় ও মনের ঐকান্তিক আনুগত্য কলঙ্ক-সংস্পর্শ-শূন্য হইয়া উৎসর্গ করিবার এই যথোপযুক্ত অবসর। বিপদ ভারে নিপীড়িত হইয়া, সংসারে বন্ধু-বিহীন হইয়া, তাঁহার এখন আমার হইবার অধিকার হইয়াছে। এখন আমিই তাঁহার একমাত্র সহায়, অনন্য অবলম্বন এবং অদ্বিতীয় বন্ধু। তাঁহার বিলুপ্ত অস্তিত্ব, অপগত রূপ-রাশি, বিলুণ্ঠিত সুখসম্পদ, সকলই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত, আমি তখনই বদ্ধপরিকর হইলাম। প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, এবং সুকৌশল-সম্পন্ন প্রতারণার বিরুদ্ধে আমাকে অস্ত্র ধারণ করিতে হইবে। সকল দুর্দ্দশার ও বিপদের সম্মুখীন হইতে আমি প্রস্তুত। আমার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিধ্বংসিত হউক, আমার সুহৃদগণ আমাকে, উন্মাদ বোধে, পরিত্যাগ করুন, শত সহস্র বিপদ ও যাতনা আমাকে নিষ্পেশিত করুক এবং আমার জীবনই বা গতপ্রায় হউক, আমি আমার সঙ্কল্প কদাপি পরিত্যাগ করিব না, ইহা আমার অখণ্ডনীয় পণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

---*---

আমার অভিপ্রায় ও অবস্থা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিলাম, অতঃপর মনোরমা ও লীলার বক্তব্য বিবৃত হওয়া আবশ্যক। আমি তাঁহাদের উভয়ের বর্ণিত বিশৃঙ্খল বৃত্তান্তমধ্য হইতে, আমার ও আমার উকীলের ব্যবহারের জন্য, যত্নসহকারে এক সার-সঙ্কলন করিয়াছি। পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য এস্থলে তাহাই প্রকাশিত করিলাম। কালিকাপুরের রাজবাটীর গিন্নি-ঝির বক্তব্য যেস্থলে পরিসমাপ্ত হইয়াছে, তাহার পর হইতে মনোরমার কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে।

স্বামি-ভবন হইতে রাণী চলিয়া আসার পর, তদ্‌ঘটনা এবং তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য বৃত্তান্ত গিন্নি-ঝি মনোরমা দেবীকে জানাইয়াছিল। ইহার কয়েকদিন পরে (কয় দিন তাহা নিস্তারিণী ঠাকুরাণীর ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না) চৌধুরাণী ঠাকুরাণীর এক পত্র আসিয়া পৌঁছে; তাহাতে লিখিত ছিল, যে কলিকাতায় চৌধুরী মহাশয়ের বাসায়, রাণী লীলাবতী দেবীর হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। কোন্ দিন এ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে চিঠিতে তাহা লেখা ছিল না। আর লেখা ছিল যে, গিন্নি-ঝি যদি ভাল বুঝে, তাহা হইলে এ দুঃসংবাদ এখনই মনোরমা দেবীর গোচর করিতে পারে, অথবা যতদিন তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষাও করিতে পারে।

ডাক্তার বিনোদ বাবু এই সময়ে স্বয়ং পীড়িত হওয়ায় কয়দিন রাজবাটীতে আইসেন নাই। তিনি আসিলে, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া,তাঁহারই সমক্ষে চিঠি প্রাপ্তির দিনেই কি তাহার পরদিনে, গিন্নি-ঝি সমস্ত সংবাদ মনোরমা দেবীকে জানাইল। এ দারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া মনোরমা দেবীর যেরূপ অবস্থা হইল তাহা এস্থলে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। সংপ্রতি এই মাত্র বলা আবশ্যক যে, সংবাদ প্রাপ্তির পর, তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত,তাঁহার স্থানান্তরে যাইবার শক্তি ছিল না। তৎপরে তিনি গিন্নি-ঝিকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় তাঁহারা পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। যদি ভবিষ্যতে কোন প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে কোন্ ঠিকানায় পত্র লিখিলে নিস্তারিণী ঠাকুরাণী পাইতে পারিবেন, তাহা পূর্ব্বেই মনোরমা দেবীকে তিনি জানাইয়া রাখিয়াছিলেন।

মনোরমা দেবী তাহার পরে করালী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে জানান যে রাণীর মৃত্যুর বিষয়ে তাঁহার সমূহ সন্দেহ আছে। তিনি এ সন্দেহের কথা আর কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে বাসনা করেন না; এমন কি নিস্তারিণীকেও তিনি মনের কথা জানান নাই। করালী বাবু পূর্ব্ব হইতেই মনোরমা দেবীর কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, বন্ধুভাবে তাঁহার সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন; এক্ষণে তিনি, অতি সাবধানতা সহকারে, এই বিপজ্জনক ব্যাপারের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার ভার গ্রহণ করিলেন।

করালী বাবু প্রথমেই চৌধুরী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন যে, রাণী লীলাবতী দেবীর মৃত্যু সম্বন্ধে যে যে ঘটনা এখনও শ্রীমতী মনোরমা দেবী জানিতে পারেন নাই, তৎসমস্ত সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত, তিনি প্রেরিত হইয়াছেন। বলা আবশ্যক যে চৌধুরী মহাশয়

তৎসমস্ত সংবাদ সবিস্তারে তাঁহার গোচর করেন এবং যাহাতে তাঁহার আরও সংবাদ সংগ্রহ করার সুবিধা হইতে পারে তাহারও সুযোগ করিয়া দেন। ডাক্তার ভোলানাথ বাবু, পাচিকা, ঝি ও বৈষ্ণবগণের সন্ধান চৌধুরী মহাশয়ই করালী বাবুকে বলিয়া দেন। চৌধুরী মহাশয়, তাঁহার পত্নী, ডাক্তার বাবু, এবং পাচিকা ও ঝির স্বাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া করালী বাবু স্থির সিদ্ধান্ত করেন যে, মনোরমা দেবীর এতাদৃশ সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক এবং ভগ্নীবিয়োগ-জনিত নিদারুণ মনস্তাপে তাঁহার বিচার-শক্তির এরূপ শোচনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তিনি মনোরমা দেবীকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যে কুৎসিত সন্দেহকে মনে স্থান দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা ভিত্তিহীন ও বিশ্বাসের অযোগ্য। উকীল বাবুর অনুসন্ধানের এইরূপে আরম্ভ ও সমাপ্তি হইল।

এদিকে মনোরমা দেবী আনন্দধামে ফিরিয়া আসিয়া, এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী রঙ্গমতী দেবীর লিখিত এক পত্র দ্বারা শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয় ভ্রাতুষ্পুত্রীর মৃত্যু-সংবাদ প্রথমে জ্ঞাত হন। সে চিঠিতেও মৃত্যুর তারিখ লেখা ছিল না। রঙ্গমতী দেবী সেই পত্রেই, উদ্যান-মধ্যে যে স্থানে তাঁহাদের বড় বধূ ঠাকুরাণীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহারই পার্শ্বে, পরলোকগতা ভ্রাতুষ্পুত্রীর স্মরণার্থ, এক স্মৃতি-চিহ্ন সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন। রায় মহাশয় এ প্রস্তাবে অসম্মত হন নাই। কয়েক দিবসের মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে এক বেদিকা নির্ম্মিত হইল এবং তাহার এক পার্শ্বে এক সুন্দর প্রস্তর-ফলক সংযোজিত হইল। এই স্মরণলিপি সংস্থাপন দিনে যথেষ্ট সমারোহ হইয়াছিল। চৌধুরী মহাশয় স্বয়ং এতদুপলক্ষে আনন্দধামে আসিয়াছিলেন এবং গ্রামের প্রজাবৃন্দ উপস্থিত থাকিয়া আপনাদের সম্মান জ্ঞাপন করিয়াছিল। সেই দিন এবং তৎপরে আরও এক দিন চৌধুরী মহাশয় আনন্দধামেই ছিলেন; কিন্তু রায় মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে, তাঁহার সহিত চৌধুরী মহাশয়ের একবারও সাক্ষাৎ হয় নাই। তবে লেখালিখিতে তাঁহাদের কথা-বার্ত্তা চলিয়াছিল বটে। রাণীর শেষ পীড়া ও মৃত্যুর অন্যান্য বৃত্তান্ত চৌধুরী মহাশয় পত্র দ্বারা রায় মহাশয়কে জানাইয়াছিলেন। যে যে বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই সংগৃহীত হইয়াছে তদপেক্ষা কোন নূতন কথা সে পত্রে ছিল না; তবে পত্র সমাপ্তির পর 'পুনশ্চের' মধ্যে মুক্তকেশী সংক্রান্ত একটা বড় কৌতূহলজনক সংবাদ লিখিত ছিল। তাহাতে রায় মহাশয়কে জানান হইয়াছে যে, মনোরমা দেবী আনন্দধামে আসিলে রায় মহাশয় তাঁহার নিকট মুক্তকেশী নাম্নী এক স্ত্রীলোকের কথা জানিতে পারিবেন। সেই মুক্তকেশী উন্মাদিনী। কালিকাপুরের রাজবাটীর সন্নিহিত এক গ্রামে মুক্তকেশী আবার ধরা পড়িয়াছে। বহুদিন অচিকিৎসায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করায়, মুক্তকেশীর মানসিক পীড়া সংপ্রতি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। রাজা প্রমোদরঞ্জনের প্রতি বদ্ধমূল বিদ্বেষ তাহার মত্ততার প্রধান লক্ষণ। সংপ্রতি সেই বিদ্বেষ আর এক নূতন ভাব ধারণ করিয়াছে। এই অভাগিনী নারী, অবরোধের কর্ম্মচারিগণের নিকটে আপনার পদ-গৌরব অধিকতর বর্দ্ধিত করিবার অভিপ্রায়ে এবং রাজাকে অধিকতর উত্যক্ত ও ব্যথিত করিবার মানসে, আপনাকে রাজার পত্নী বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। একদিন সংগোপনে সে রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া-

ছিল। সম্ভবতঃ, সেইদিন রাজমহিষীর সহিত স্বীয় আকৃতিগত অত্যাশ্চর্য্য সাদৃশ্য সন্দর্শনে, তাহার মনে এই দুরভিসন্ধি সঞ্চারিত হইয়াছে। পুনরায় অবরোধ হইতে তাহার পলায়নের কোনই সম্ভাবনা নাই। তথাপি সে স্বর্গীয়া রাণীর আত্মীয়গণকে পত্র লিখিয়া উত্যক্ত করিলেও করিতে পারে। তাদৃশ কোন পত্র হস্তগত হইলে, যেরূপ ব্যবহার করা বিধেয়, তাহাই বুঝাইবার জন্য, রায় মহাশয়কে এরূপে সাবধান করা হইল।

মনোরমা দেবী শ্রাবণ মাসের প্রারম্ভে আনন্দধামে উপনীত হইলে, তাঁহাকে এ পত্র দেখান হইয়াছিল। রাণী কলিকাতায় পিসী মার বাটীতে আসিবার সময়ে যে যে বস্ত্র ও সামগ্রী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন তৎসমস্তও এই সময়ে মনোরমাকে দেওয়া হইয়াছিল। রঙ্গমতী ঠাকুরাণী সেই সমস্ত সামগ্রী, সযত্নে সংগ্রহ করিয়া, আনন্দধামে পাঠাইয়াছিলেন।

দুর্ব্বল শরীরে, বিজাতীয় মনস্তাপ ও অত্যুৎকট চিন্তা সহ্য না হওয়ায়, আনন্দধামে আগমন করার অনতিকাল মধ্যে, মনোরমার আর একবার পীড়া হইল। মাসাধিক কালের মধ্যে তাঁহার শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইল বটে, কিন্তু ভগ্নীর মৃত্যু সম্বন্ধীয় সন্দেহের বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইল না। এতাবৎ কালের মধ্যে তিনি রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়ের কোনই সংবাদ পান নাই। রঙ্গমতী দেবী তাঁহাকে অনেক পত্র লিখিয়াছেন, এবং আপনার স্বামীর নাম করিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন। এ সকল পত্রের কোন উত্তর না দিয়া, মনোরমা দেবী চৌধুরী মহাশয়ের শিমুলিয়াস্থ ভবন এবং তদ্বাসি ব্যক্তিবর্গের ব্যবহার সংগোপনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাহাতে সন্দেহজনক কোন ব্যবহার দৃষ্ট হয় নাই।

রমণী নাম্নী সেই ধাত্রীর সম্বন্ধেও মনোরমা দেবী গোপনে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন; কিন্তু বিশেষ কোন সন্দেহজনক সংবাদ জানিতে পারেন নাই। প্রায় ছয় মাস অতীত হইল সে আপনার স্বামীর সহিত কলিকাতায় আসিয়াছে। পল্লীবাসীরা তাহাদিগকে শান্ত ও ভদ্রপরিবার বলিয়া বিশ্বাস করে। রাজা প্রমোদরঞ্জনের সম্বন্ধে মনোরমা দেবী অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন, তিনি এক্ষণে কাশীধামে, বন্ধু বান্ধবের সহিত, ধীরভাবে কাল কাটাইতেছেন।

সর্ব্বত্র বিফল-প্রযত্ন হইয়াও মনোরমা দেবী স্থির হইতে পারিলেন না। তিনি শেষে যে কারাগারে মুক্তকেশী অবরুদ্ধ আছে, স্বয়ং তথায় যাইবার সংকল্প করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই একবার মুক্তকেশীকে দেখিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত কৌতূহল ছিল। অধুনা মুক্তকেশী যে আপনাকে রাজা প্রমোদরঞ্জনের পত্নী বলিয়া পরিচয় দিতেছে, এ কথা কতদূর সত্য তাহা জানিতে তাঁহার আরও আগ্রহ হইল। যদিই তাহার এরূপ প্রলাপোক্তি সত্য হয়, তাহা হইলে কোন্ অভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়া, সে এরূপ কথা প্রচার করিতেছে তাহা নির্ণয় করিতে তাঁহার অত্যন্ত বাসনা জন্মিল। এই সকল তথ্য নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে ১১ই ভাদ্র তারিখে মনোরমা দেবী বাতুলালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

তিনি ১১ই ভাদ্র কলিকাতাতে রাত্রি যাপন করিলেন। রাণীর পূর্ব্ব অভিভাবিকা অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর বাটীতে তিনি রাত্রি যাপন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে দর্শন মাত্র, লীলাবতী দেবীকে স্মরণ করিয়া, অন্ন-

পূর্ণা ঠাকুরাণী এরূপ কাতর ও অভিভূত হইয়া উঠিলেন, যে মনোরমা দেবী সেখানে আর অধিকক্ষণ থাকা, উভয় পক্ষেরই অসম্ভব বোধে একজন পূর্ব্ব-পরিচিত ভদ্র-পরিবারের ভবনে আসিয়া রাত্রিপাত করিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি বাতুলালয়ে উপস্থিত হইলেন এবং অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রথমে বাতুলাশ্রমের অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহাকে মুক্তকেশীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতে নানা আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিলেন। চৌধুরী মহাশয় যে পত্রে রায় মহাশয়কে মুক্তকেশীর প্রসঙ্গ লিখিয়াছিলেন, তাহা মনোরমা দেবীর সঙ্গেই ছিল। তিনি পত্রের সেই অংশ দেখাইয়া, তিনিই যে, তল্লিখিত মনোরমা দেবী, এবং স্বর্গীয়া রাণীর তিনি যে অতি নিকট আত্মীয় এ সকল কথা অধ্যক্ষ মহাশয়কে বুঝাইয়া দিলেন; সুতরাং মুক্তকেশীর এরূপ পাগ্লামির কারণ কি তাহা অবধারণ করিতে অবশ্যই তাঁহার অধিকার আছে। তাঁহার এই সকল কথা শুনিয়া অধ্যক্ষ মহাশয় আর কোন আপত্তি করিলেন না।

মনোরমা দেবীর মনে ধারণা হইল যে, রাজা এবং চৌধুরী মহাশয় বাতুলালয়ের অধ্যক্ষকে আভ্যন্তরিক কোন রহস্য জানান নাই, এবং সে সরল ভাবে মুক্তকেশীর সম্বন্ধে যে যে কথা বলিল, চক্রান্তকারিগণের সহিত সংলিপ্ত হইলে, কখনই তাহা বলিত না। উন্মাদিনীর সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে কারাধ্যক্ষের সহিত মনোরমা দেবীর খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। সহজেই অধ্যক্ষ বলিল যে, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে, শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ চৌধুরী মহাশয় মুক্তকেশীকে ধরিয়া আনিয়া, এই গারদে পুনঃস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়েরও এক পত্র ছিল। রোগী পুনরায় গারদে আসিলে, অধ্যক্ষ প্রথমেই রোগীর কতকগুলি বিস্ময়জনক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেন, কিন্তু বায়ুরোগগ্রস্তগণের সেরূপ পরিবর্ত্তন তিনি আরও অনেক দেখিয়াছেন; উন্মাদের আন্তরিক পরিবর্ত্তনের সহিত, বাহ্য পরিবর্ত্তনও, অনেক সময় লক্ষিত হইয়া থাকে। রোগ সমভাবে থাকিলে প্রায়ই কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না; কিন্তু যখন ভাল হইতে মন্দে আইসে, অথবা মন্দ হইতে ভালতে যায়, তখনই প্রায় রোগীর আকৃতিগত পরিবর্ত্তন ঘটে। মুক্তকেশীর রোগের অবস্থা যে বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার সন্দেহ নাই, সুতরাং তজ্জন্য বাহ্যাকারের কিছু পরিবর্ত্তন তিনি অসম্ভব বলিয়া মনে করেন না। তথাপি কারাগার হইতে পলায়নের পূর্ব্বে মুক্তকেশীর যেরূপ ভাব ছিল, এবার পুনরায় আগমনের পর হইতে, তাহার অনেক বিভিন্নতা দেখিয়া তিনি কোন মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই সকল বিভিন্নতা এত সূক্ষ্ম যে তাহা বর্ণনা করা যায় না। তিনি এমন কথা বলেন না যে মুক্তকেশীর শরীরের দৈর্ঘ্য, আকার, বর্ণ, কিম্বা কেশ, চক্ষু ও মুখের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সে পরিবর্ত্তন যে কি তাহা তিনি অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু বুঝাইয়া দিতে অক্ষম। কারাধ্যক্ষের এই সকল কথা শুনিয়া, পরাগত ঘটনার নিমিত্ত মনোরমা দেবী যে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তাহা না হইলেও তাঁহার মনের বিশেষ ভাবান্তর জন্মিল, তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই। তিনি কিয়ৎকাল নীরবে সমস্ত কথা আলোচনা করিয়া হৃদয়ে বল সঞ্চয় করিলেন এবং ধীরে ধীরে কারাধ্যক্ষের সঙ্গে, অবরোধ মধ্যে, প্রবেশ করিলেন।

অনুসন্ধানে জানা গেল, মুক্তকেশী তখন কারামধ্যস্থ উদ্যানে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। কারাধ্যক্ষ মনোরমা দেবীকে সেই স্থানে লইয়া যাইবার জন্য, একজন পরিচারিকার উপর ভার দিয়া, স্বয়ং কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন। পরিচারিকা মনোরমাকে সঙ্গে লইয়া উদ্যানে প্রবেশ করিল এবং কিয়দ্দূর গমনের পর তাঁহারা দেখিতে পাইলেন দুইটী স্ত্রীলোক ধীরে ধীরে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে! পরিচারিকা বলিল,—ঐ যে মুক্তকেশী। আপনি উহার সঙ্গে যে ধাই আছে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই, সকল কথা জানিতে পারিবেন।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

মনোরমাও তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাহারাও মনোরমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হইলে, দুইজন স্ত্রীলোকের মধ্যে একজন সহসা স্থির হইয়া দাঁড়াইল, অত্যন্ত আগ্রহের সহিত মনোরমাকে দেখিতে লাগিল এবং পরক্ষণেই পরিচারিকার হস্ত ছাড়াইয়া সবেগে আসিয়া মনোরমার বাহুমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখনই মনোরমা আপন ভগ্নীকে চিনিতে পারিলেন এবং জীবন্মৃতার কাহিনী বুঝিতে পারিলেন —মনের সকল অন্ধকার বিদূরিত হইয়া গেল। সৌভাগ্যক্রমে সে সময়ে তথায় সেই পরিচারিকা ধাত্রী ভিন্ন আর কেহ উপস্থিত ছিল না। তাহার বয়স বেশী নয়। সে সম্মুখের এই কাণ্ড দেখিয়া এমনই বিচলিত হইয়া পড়িল যে, তখন কি করা কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিতে পারিল না। যখন সে একটু প্রকৃতিস্থ হইল,তখন আর কোন বিষয় না ভাবিয়া, তাহাকে মনোরমা দেবীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইতে হইল; কারণ তিনি তখন মূর্চ্ছিতা। অনতিকাল মধ্যেই তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলেন এবং পাছে তাঁহার ভগ্নী তাঁহার অবস্থা দেখিয়া কাতর ও অবসন্ন হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায়, বিহিত যত্নে আপনার চঞ্চলতা প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

তাঁহারা উভয়ে সেই পরিচারিকার চক্ষের উপরেই থাকিবেন, এই কথা স্বীকার করিলে, সে তাহাকে রোগীর সহিত স্বতন্ত্র ভাবে কথা কহিতে অনুমতি প্রদান করিল। তখন আর অন্য কথার সময় নাই। মনোরমা দেবী তখন রাণীকে কেবল স্থির হইয়া থাকিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং স্থির হইয়া থাকিলে শীঘ্রই নিষ্কৃতির উপায় হইবে, অন্যথা সকল দিকই নষ্ট হইয়া যাইবে, একথা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেন। এই নরকপুরী হইতে—এই জীবন্মৃতা অবস্থা হইতে শীঘ্র নিষ্কৃতির আশা পাইয়া রাণী, তাঁহার ভগ্নীর বাসনানুসারে, স্থির ভাবে থাকিতেই স্বীকার করিলেন। মনোরমা তদনন্তর পরিচারিকার সমীপাগত হইয়া তাহার হস্তে পাঁচটি টাকা প্রদান করিয়া, জিজ্ঞাসিলেন কখন এবং কোথায় তাহার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ হইতে পারিবে? তাহাকে কিয়ৎ পরিমাণে শঙ্কাকুল বোধ করিয়া, মনোরমা দেবী বুঝাইয়া দিলেন যে, অধুনা মনের চাঞ্চল্য হেতু তিনি সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে অক্ষম; সেই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই তিনি পরিচারিকার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। তাহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিবার তাঁহার কোন বাসনা নাই। পরদিন বেলা ৩টার সময়,গারদের উত্তর দিকের প্রাচীরের বাহিরে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সে স্বীকৃত হইল। এমন সময়ে দূরে কারাধ্যক্ষকে আসিতে দেখিয়া, মনোরমা শীঘ্র তাহার সহিত কথা শেষ করিয়া, আপনার ভগ্নীর কাণে কাণে বলিলেন,—"ভয় নাই, স্থির হও—কালি দেখা

হইবে।” কারাধ্যক্ষ সমীপস্থ হইয়া, মনোরমা দেবীর কিছু ব্যাকুলিত ভাব লক্ষ্য করিলে, তিনি তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, মুক্তকেশীকে দেখিয়া তিনি সত্যই কিছু কাতর হইয়াছেন। তাহার পর আর অধিকক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করা অবৈধ বোধে, ত্বরায় কারাধ্যক্ষের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সমস্ত কাণ্ডটা ভাল করিয়া আলোচনা করিবার শক্তি পুনরাগত হইলে, মনোরমা স্থির করিলেন যে, রাণীকে আইন সঙ্গত উপায়ে, তাঁহার যথার্থ অবস্থা প্রমাণ করাইয়া, মুক্ত করিতে হইলে বহুবিলম্ব ঘটিবে এবং তাহাতে সম্ভবতঃ রাণীর বর্ত্তমান দুরবস্থা হেতু, অবসন্ন মানসিক শক্তি আরও দুর্ব্বল ও অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িবে। এইরূপ বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি স্থির করিলেন যে ঐ পরিচারিকা দ্বারা গোপন ভাবে রাণীর নিষ্কৃতির উপায় করিতে হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া, কলিকাতার এক ব্যাঙ্কে তাঁহার যে সামান্য টাকা ছিল তাহা সংগ্রহ করিলেন এবং অলঙ্কারাদি যাহা সঙ্গেই ছিল তাহা বিক্রয় করিলেন। এই উপায়ে তাঁহার হস্তে প্রায় দেড় হাজার টাকা হইল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, যদি আবশ্যক হয় তাহা হইলে সংগৃহীত অর্থের শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত দিয়াও ভগ্নীর নিষ্কৃতি সাধন করিতে হইবে। সমস্ত টাকা সঙ্গে লইয়া, তিনি বাতুলাগারের প্রাচীর-পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন।

পরিচারিকা সেখানে উপস্থিত ছিল। মনোরমা সাবধানতার সহিত কথা-বার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন যে, পূর্ব্বে যে মুক্তকেশীর পরিচারিকা ছিল, মুক্তকেশী পলাইয়া যাওয়ায় তাহার কর্ম্ম গিয়াছিল। আবারও যদি মুক্তকেশী কোনরূপে পলাইতে পারে তাহা হইলে তাহারও কর্ম্ম যাইবে। এ কর্ম্ম যে খুব ভাল তাহা সে মনে করে না; কারণ এ কর্ম্মে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবারও বাড়ী যাইবার ছুটী নাই। তাহার স্বামী আছে; কিন্তু এক দেশে থাকিয়াও, সে স্বামীর সহিত দেখা করিতে পারে না। এজন্য সে বড়ই অসুখী। এই জন্যই তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে, কলিকাতায় কোন দোকান করিয়া, একত্রে থাকিবে স্থির করিয়াছে। কিন্তু দোকান করিতে, খুব কম হইলেও, হাজার টাকা পুঁজি চাই। তাহাই জুঠাইবার জন্য, এইরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া, সে এই কর্ম্মে রহিয়াছে। তাহার স্বামীও আর এক জায়গায় কর্ম্ম করিতেছে। হাজার টাকা হাতে হইলেই সে এ কর্ম্মের মুখে ছাই দিয়া চলিয়া যাইবে। এই সকল কথা শুনিয়া মনোরমা দেবী যে সুরে কথা কহিলে কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা স্থির করিয়া লইলেন। তিনি বলিলেন যে, যাহাকে তাহারা মুক্তকেশী বলিয়া মনে করিতেছে, সে তাঁহার অতি নিকট আত্মীয় এবং সে মুক্তকেশী নহে। ভুল ক্রমে তাহাকে মুক্তকেশী বলিয়া গরদে আনিয়া রাখা হইয়াছে। তাহাকে মুক্ত করিয়া দিবার উপায় করিলে ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল হইবে। পরিচারিকা কোন আপত্তি উত্থাপন করিবার পূর্ব্বেই মনোরমা হাজার টাকার নোট বাহির করিয়া, তাহাকে এই উপকারের জন্য পুরস্কার স্বরূপে, দান করিবার প্রস্তাব করিলেন। সে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল এবং এরূপ সৌভাগ্য সম্ভব বলিয়াই সে প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিল না। মনোরমা আগ্রহ সহকারে বলিলেন,—“ইহাতে তোমার ভয়ের কারণ কিছুই নাই। এক জন যথার্থ বিপদাপন্ন লোকের উপকার করিয়া যদি পুরস্কার পাওয়া যায়, তাহাতে ক্ষতি কি আছে? এই তোমা

দোকানের পুঁজির টাকা হইল। এখন তোমার কর্ম্ম থাকুক আর নাই থাকুক, তাহাতে আর ভাবনা কি? তুমি তাহাকে নিরাপদে আমার নিকট লইয়া আইস। আমি তোমাকে এই হাজার টাকা দিয়া তাহাকে লইয়া যাইব।"

পরিচারিকা বলিল,—"আপনি এই কথা লিখিয়া আমাকে এক খানি পত্র দিলে বড় ভাল হয়। আমার স্বামী যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, এত টাকা এক সঙ্গে আমি কোথায় পাইলাম, তখন আমি তাঁহাকে আপনার ঐ পত্র দেখাইব।"

মনোরমা বলিলেন,—"আমি তোমার প্রার্থনা মত পত্র লিখিয়া আনিব, তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা করিবে বল?"

"হাঁ, তা করিব।"

"কখন?"

"কালি।"

স্থির হইয়া গেল অতি প্রত্যূষে মনোরমা দেবী এই স্থানে আসিয়া, পার্শ্বস্থ দুইটা বড় গাছের আড়ালে, দাঁড়াইয়া থাকিবেন। পরিচারিকা যে ঠিক সময়ে উপস্থিত হইতে পারিবে তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং তাঁহাকে সেখানে কতক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে বলা যায় না! কিন্তু যতই হউক, সে সুযোগ পাইবামাত্র মুক্তকেশীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে, স্থির থাকিল।

পর দিন অতি প্রত্যূষে নোট ও পত্র লইয়া মনোরমা যথাস্থানে উপস্থিত হইলেন। অনতিকাল মধ্যেই পরিচারিকা রাণী লীলাবতী দেবীর হস্ত ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। মনোরমা তৎক্ষণাৎ তাহার হস্তে পত্র ও নোটের তাড়া দিয়া, সাশ্রুনয়নে আপনার ভগ্নীকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। এই স্থানে অচিন্তনীয় ভয়ানক ঘটনার পর, ভগ্নী পুনর্ম্মিলন সংঘটিত হইল।

পরিচারিকা, অতি সদ্বিবেচনা সহকারে, রাণীর গায়ে এক খানি মোটা বিছানার চাদর দিয়া আনিয়াছিল। মনোরমা প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে, মুক্তকেশীর পলায়ন-বৃত্তান্ত অবরোধ মধ্যে কিরূপে প্রচার করিতে হইবে, এবং প্রচারিত হইবার পরই বা সে কি বলিবে, তাহা তাহাকে শিখাইয়া দিলেন। সে পাগলদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্য লোক শুনিতে পায় এমনই ভাবে বলিবে যে, মুক্তকেশী কয় দিন হইতে কেবলই কলিকাতা হইতে কালিকাপুর কতদূর তাহারই সন্ধান করিতেছে। তাহার পর যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার পলায়ন সংবাদ চাপিয়া রাখা যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা না বলিয়া, যখন নিতান্তই না বলিলে নহে বুঝিবে, তখন বলিবে যে মুক্তকেশীকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। মুক্তকেশী এখন রাজা প্রমোদরঞ্জনের রাণী হইয়াছে, ইহাই তাহার পাগলামির প্রধান অঙ্গ; বিশেষত: সে আবার কালিকাপুর কতদূর তাহার সন্ধান করিয়াছে, সুতরাং সে নিশ্চয়ই কালিকাপুরের দিকে গিয়াছে, সকলের মনেই এই ধারণা হইবে এবং তাহারা সেই দিকেই তাহার সন্ধান করিতে ছুটিবে; প্রকৃত দিকে কেহই যাইবে না।

পরিচারিকার সহিত এই সকল ব্যবস্থা শেষ করিয়া, মনোরমা ভগ্নীকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন এবং সেই দিন বৈকালের গাড়ীতে উঠিয়া, রাত্রিতে আনন্দধামে পৌঁছিলেন।

আনন্দধামে আগমন কালে, পথে মনোরমা ধীরে ধীরে, সুকৌশলে রাণীকে বিগত বৃত্তান্ত সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া-

ছিলেন। রাণীর তখন শরীর ও মনের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। তিনি সকল কথা মনে করিয়া ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। তথাপি এই লোমহর্ষণ কাণ্ড সম্বন্ধে তিনি যাহা স্মরণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, নিতান্ত অসম্বন্ধ বৃত্তান্ত হইলেও, তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ থাকা আবশ্যক।

রাণী লীলাবতী কালিকাপুর হইতে চলিয়া আসার পর ক্রমে কলিকাতার ষ্টেশনে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন দিদির জন্য চিন্তায় তাঁহার যেরূপ উৎকণ্ঠিত অবস্থা ছিল, তাহাতে সে দিন কোন তারিখ, কি বার কিছুই তাঁহার মনে থাকা সম্ভব নহে। সে সকল কোন কথাই তাঁহার মনে নাই।

ষ্টেশনে আসিয়াই তিনি চৌধুরী মহাশয়কে দেখিতে পাইলেন। চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে যে সকল লোক ছিল তাহারাই রাণীর সমস্ত সামগ্রীপত্র গাড়ি হইতে নামাইয়া লইল। তিনি গাড়ি হইতে নামিয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিলেন এবং চৌধুরী মহাশয়ের সহিত এক ঘোড়ার গাড়িতে উঠিয়া চলিতে লাগিলেন। সে গাড়িখানা কি রকম তাহা তিনি তৎকালে লক্ষ্য করেন নাই।

গাড়িতে উঠিয়া তিনি চৌধুরী মহাশয়কে মনোরমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। চৌধুরী মহাশয় তদুত্তরে বলেন যে, মনোরমা এখনও আনন্দধাম যান নাই; আরও কয়েক দিন বিশ্রাম না করিয়া, তিনি ততদূর পর্য্যটন করিতে অশক্ত।

এখনও তবে মনোরমা চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতেই অবস্থান করিতেছেন কি না, এ কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি যে উত্তর দেন, তাহা রাণী ঠিক মনে করিয়া পারেন না। তবে ইহা তঁ আছে যে, চৌধুরী মহাশয় রাণীকে তখনই মনোরমাকে দেখাইতে লইয়া যাইতেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে রাণীর কলিকাতা ভাল করিয়া দেখা ছিল না, এজন্য কোন্ কোন্ পথ দিয়া তাঁহাদের গাড়ি চলিতে লাগিল তাহা তিনি ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না। যেখানে গাড়ি থামিল, সে স্থানটা বহুজনাকীর্ণ ও কলরবপূর্ণ। এই কথা শুনিয়া নিশ্চয় বুঝা যাইতেছে যে, চৌধুরী মহাশয় কখনই তাঁহাকে আশুতোষ দের গলির মধ্যস্থ স্বীয় আবাসে লইয়া যান নাই।

তাঁহারা উপরে উঠিয়া একতম প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জিনিষপত্র সযত্নে তুলিয়া লওয়া হইল এবং একজন ঝি আসিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া দিল এবং দীর্ঘ শ্মশ্রুযুক্ত এক বাঙ্গাল পুরুষ আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া গেল। রাণী, তাঁহার দিদি কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করায়, চৌধুরী মহাশয় উত্তর দেন যে, তিনি এখানেই আছেন এবং এখনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তিনি এবং সেই শ্মশ্রুধারী বাঙ্গাল তাহার পর সে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন এবং রাণী তথায় একাকিনী বসিয়া রহিলেন। সে ঘরের সাজগোজ বড় মন্দ এবং ঘরটা দেখিতেও ভাল নহে। নিম্নতলে অনেক মানুষ কথা কহিতেছে বলিয়া তিনি বিবেচনা করিলেন। অনতিকাল মধ্যে চৌধুরী মহাশয় আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং বলিলেন যে, মনোরমা দেবী এখন ঘুমাইতেছেন, এ অবস্থায় তাঁহাকে বিরক্ত করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এবার চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে একজন ভদ্রবেশধারী পুরুষ ছিলেন। চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে নিজের একজন বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিলেন।

সেই ভদ্রলোকটীর নাম কি, অথবা তিনি

কে তাহার কিছুই না বলিয়া চৌধুরী মহাশয় আবার প্রস্থান করিলেন। ভদ্রলোকটী রাণীর ঘরেই থাকিলেন। তাঁহার কথা-বার্ত্তা বিশেষ সৌজন্যব্যঞ্জক সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার কয়েকটী আশ্চর্য্য প্রশ্ন শুনিয়া এবং তাঁহার দৃষ্টির বিকট ভাব দেখিয়া রাণী নিতান্ত চমকিত হইয়া উঠিলেন। অজ্ঞাত পুরুষ কিয়ৎ-কাল মাত্র সে ঘরে থাকিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার অত্যল্পকাল পরে, আর এক ভদ্রলোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং আপনাকে চৌধুরী মহাশয়ের একজন বন্ধু বলিয়া পরিচিত করিলেন। তিনিও অতি বিকটভাবে রাণীর প্রতি কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিলেন এবং কতক-গুলি নিতান্ত অসঙ্গত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তদনন্তর তিনিও পূর্ব্ব ব্যক্তির ন্যায় প্রস্থান করিলেন। এই কলকাণ্ড দেখিয়া রাণীর মনে অত্যন্ত ভয় হইল এবং তিনি নীচে নামিয়া আসিয়া ঝিকে ডাকিতে সংকল্প করিলেন।

তিনি তদভিপ্রায়ে আসন হইতে উত্থিত হইবামাত্র চৌধুরী মহাশয় তথায় পুনরাগত হইলেন। তিনি আসিবামাত্র রাণী তাঁহাকে নিতান্ত উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসিলেন, যে তাঁহার ভগ্নীর সহিত সাক্ষাতের জন্য, তাঁহাকে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। প্রথমে চৌধুরী একটা উড়ো জবাব দিলেন, কিন্তু নিতান্ত পীড়াপীড়ি হওয়ায়, অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত স্বীকার করিলেন যে, মনোরমা দেবী যেরূপ ভাল আছেন বলিয়া এক্ষণ বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ তিনি সেরূপ নাই। তাঁহার কথার ভঙ্গী ও মুখের ভাব দেখিয়া রাণীর অত্যন্ত ভয় হইল এবং অপরিচিত ব্যক্তিদ্বয়ের আগমনাবধি তাঁহার মনে যে উদ্বেগ সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল। এই সকল প্রবল মানসিক কষ্টে রাণীর মস্তিষ্ক নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হওয়ায়, এক গ্লাস পানীয় জলের প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। চৌধুরী মহাশয় দ্বার সমীপে আসিয়া কাহাকে একগ্লাস জল এবং স্মেলিং সল্টের সিসি আনিতে বলি-লেন। সেই শ্মশ্রুধারী বাঙ্গাল উভয় সামগ্রীই আনয়ন করিল। জলপান করিতে আরম্ভ করিয়া রাণী তাহাতে এরূপ কটু আস্বাদ অনুভব করিলেন যে, তাঁহার মাথা ঘোরা আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি চৌধুরী মহাশয়ের হস্ত হইতে স্মেলিং সল্টের সিসিটা লইয়া তাহার ঘ্রাণ লইলেন। মাথা আরও ঘুরিয়া উঠিল এবং স্মেলিং সল্টের সিসি হস্তভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। চৌধুরী মহাশয় পতনোন্মুখ সিসি ধারণ করি-লেন। রাণীর শেষ এই মাত্র মনে আছে যে, চৌধুরী মহাশয় তাঁহার নাসিকাগ্রে স্মেলিং সল্টের সিসি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

অতঃপর রাণীর কথিত নিতান্ত অসম্বদ্ধ ও সামঞ্জস্যবিরহিত। তিনি বলেন যে, অনেক রাত্রিতে তাঁহার চৈতন্য হয়, তখন তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর বাটীতে উপস্থিত হন এবং সেখানে আহারাদি করিয়া রাত্রি যাপন করেন। কেমন করিয়া কাহার সঙ্গে তিনি অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর বাটীতে গমন করিলেন তাহা কিছুই মনে করিতে পারেন না। কিন্তু যেমন করিয়াই হউক, তিনি যে অন্নপূর্ণা দেবীর বাটীতে গমন করিয়াছিলেন তাহা তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন। আরও অসম্ভব কথা! তিনি বলেন যে, সেখানে রমণী নাম্নী সেই পরিচারিকা তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছিল! অন্নপূর্ণার সহিত তাঁহার কি কি কথা হইয়াছিল, অথবা সেখানে আর

কেই বা ছিল, এবং রমণীই বা সেখানে কেন আসিয়াছিল, এ সকল কোন কথাই তিনি মনে করিয়া বলিতে পারেন না।

পরদিন প্রাতের যে বৃত্তান্ত তি.ন বর্ণনা করেন, তাহা আরও অসম্বদ্ধ ও অবিশ্বাস্য। তিনি বলেন, প্রাতে চৌধুরী মহাশয় ও রমণীর সহিত তিনি গাড়ি করিয়া বেড়াইতে বাহির হন। কিন্তু কখন এবং কেন তিনি অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর বাটী হইতে চলিয়া আইসেন তাহার কোন কথাই তিনি বলিতে পারেন না। গাড়ি কোন্ দিকে চলিল, কোথায় গিয়া থামিল, এবং চৌধুরী মহাশয় ও রমণী নিয়ত তাঁহার সঙ্গেই ছিল কি না, এ সকল কথারও তিনি উত্তর দিতে পারেন না। সহসা তিনি এক সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে এবং নানাবিধ অপরিজ্ঞাত স্ত্রীলোকের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মধ্যে যে কি হইল, একদিন কি দুই দিন—কত সময় অতীত হইল, তাহার এক কথাও তিনি মনে করিয়া বলিতে অক্ষম।

এই স্থানই বাতুলালয়। এই স্থানে তিনি সবিস্ময়ে শ্রবণ করিলেন যে, লোকে তাঁহাকে মুক্তকেশী বলিয়া ডাকিতেছে এবং এই স্থানে তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিলেন, তিনি মুক্তকেশীর বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া আছেন। তাঁহার পরিচারিকা তাঁহাকে বলিল,—"তুমি আপনার কাপড় চোপড় দেখিতেছ না? কেন তুমি আপনাকে রাণী রাণী বলিয়া আমাদের জ্বালাতন করিতেছ? তুমি মুক্তকেশী একথা সকলেই জানে।"

আনন্দধাম যাত্রাকালে, পথে সাবধানতা সহকারে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, মনোরমা রাণীর নিকট হইতে কেবল এই অসম্বদ্ধ ও সামঞ্জস্যহীন বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন। বাতুলালয়ে অবস্থান কালে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল মনোরমা দেবী তাহা জানিতে চেষ্টা করিলেন না; কারণ অধুনা রাণীর যেরূপ মনের অবস্থা তাহাতে সে বৃত্তান্ত পুনরায় আলোচনা করিতে হইলে নিতান্ত কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। বাতুলালয়ের অধ্যক্ষের কথা মতে রাণী ২৭শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে তথায় উপস্থিত হন। সেই দিন হইতে ১৫ই ভাদ্র পর্য্যন্ত তিনি অবরুদ্ধা ছিলেন। এই তাবৎকাল লোকে নিরন্তর তাঁহাকে মুক্তকেশী বলিয়া ডাকিয়াছে, তিনি যে সত্যই মুক্তকেশী তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছে এবং তিনি যে উন্মাদিনী তাঁহাকে সকলেই বলিয়াছে ও তাঁহার সহিত তদনুরূপ ব্যবহারও করিয়াছে। এরূপ ভয়ানক অবস্থায় অবস্থাপিত হইলে তাঁহার অপেক্ষা কঠিন প্রকৃতিক, অভিজ্ঞ ও ক্লেশসহিষ্ণু ব্যক্তির চিত্তও নিশ্চয়ই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে এবং কেহই এরূপ ভয়ানক ঘটনার পর অপরিবর্ত্তিত রূপে প্রত্যাগত হইতে পারে না।

১৫ই রাত্রিতে আনন্দধামে পৌঁছিয়া, সেদিন মনোরমা দেবী কোন গোল উত্থাপন করিলেন না। পরদিন প্রাতে তিনি রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের গৃহে প্রবেশ করিলেন। বিশেষ রূপ সতর্কতার সহিত, অগ্রে প্রাসঙ্গিক নানা কথা বলিয়া, তিনি যাহা যাহা ঘটিয়াছে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন। আশঙ্কা ও বিস্ময় অন্তরিত হইলে, রায় মহাশয় রাগের সহিত বলিলেন যে, মুক্তকেশী নিশ্চয়ই মনোরমাকে ভুলাইয়াছে। তিনি চৌধুরী মহাশয়ের পত্রের শেষাংশ এবং উভয়ের আকৃতিগত যে সাদৃশ্যের কথা মনোরমা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, তৎসমস্ত তাঁহাকে মনে করিতে বলিলেন। তিনি সে পাগলিনীকে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও সম্মুখে আসিতে দিতে অস্বীকার করিলেন;

আর বলিলেন যে, সেরূপ উন্মাদিনীকে বাটীতে আসিতে দেওয়াই নিতান্ত অত্যাচার হইয়াছে। মনোরমা অতিশয় ক্রোধের সহিত সে গৃহ হইতে বাহিরে চলিয়া আসিলেন। ক্রোধের প্রথম উগ্রতা মন্দীভূত হইলে তিনি স্থির করিলেন, রাণী সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত লোকের ন্যায়, এ বাটী হইতে বিদূরিত হইবার পূর্ব্বে, যেমন করিয়া হউক, রায় মহাশয়ের সমক্ষে তাঁহাকে একবার উপস্থিত করিতেই হইবে। এই সংকল্প করিয়া তিনি অনতিকাল মধ্যে রাণী লীলাবতীকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় রায় মহাশয়ের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য ভৃত্য প্রবেশ করিতে একবার নিষেধ করিল বটে, কিন্তু মনোরমা তাহাকে একটা ধমক দিতেই, সে দ্বার ছাড়িয়া দিল। তখন মনোরমা, ভগ্নীর হাত ধরিয়া, রায় মহাশয়ের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।

সেখানে যাহা যাহা ঘটিল তাহার বর্ণনা করিতে হৃদয় নিরতিশয় ব্যথিত হয়; এজন্য মনোরমা সে কথা আমাকে বলিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাহা হউক, এস্থলে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রায় মহাশয় সম্পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিলেন যে,তাঁহার সম্মুখাগত স্ত্রীলোককে তিনি কখনই চিনেন না; তাহার মুখের ভাব ও ব্যবহারাদি দেখিয়া তাঁহার স্থির প্রতীতি হইয়াছে যে, সে কখনই তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী হইতে পারে না; তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর যে মৃত্যু হইয়াছে তৎপক্ষে তাঁহার কোনই সংশয় নাই এবং যদি এই পাগলিনীকে অদ্যই তাঁহার বাটী হইতে স্থানান্তরিত করা না হয়, তাহা হইলে তিনি দ্বারবানের দ্বারা তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবেন। রায় মহাশয় যেরূপ স্বার্থপর, অলস, ও হৃদয়-হীন ব্যক্তি তাহাতে এ ব্যবহার তাঁহার অনুরূপ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু হাজার হইলেও মনে মনে চিনিতে পারিয়া, মুখে অস্বীকার করা সম্পূর্ণই অসম্ভব। সেরূপ ঘৃণিত ও জঘন্য ব্যবহার নিতান্ত পশু-প্রকৃতিক মনুষ্যের পক্ষেও কদাপি সম্ভব নহে। এ পক্ষে চেষ্টার এই স্থানে শেষ হইল দেখিয়া, মনোরমা অতঃপর বাটীর দাস-দাসীগণের নিকটে একথা উত্থাপন করিলেন। তাহারা পূর্ব্ব হইতে তাহাদের প্রভু-তনয়ার সহিত মুক্তকেশী নাম্নী উন্মাদিনীর যে সাদৃশ্যের কথা শুনিয়া আসিতেছে, এক্ষণে তাহা বিচার করিয়া, তাহারাও উপস্থিত স্ত্রীলোককে রাণী লীলাবতী বলিয়া স্বীকার করিল না। এতক্ষণে মনোরমা বুঝিলেন যে, দীর্ঘকাল অবরোধ ও নানাবিধ মনস্তাপ হেতু, তাঁহার ভগ্নীর বাহ্যাকারের যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাঁহার চক্ষে না হইলেও, অন্যের চক্ষে তাহা বড়ই ভয়ানক। যে কল্পনাতীত চক্রান্ত তাঁহার মৃত্যু ঘোষণা করিয়াছে, তাহা এতই প্রবল যে, তাহার ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া রাণীর জন্মভবনে ও তাঁহার আজন্ম পরিচিত ব্যক্তিগণের নিকটেও তাঁহার বিদ্যমানতা সমর্থন করা মনোরমার পক্ষে অসম্ভব হইল।

ঘটনা নিরতিশয় বিপজ্জনক না হইলে, এত শীঘ্র হতাশ ভবে এ চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে হইত না। গিরিবালা নামে সেই ঝি রাণীকে যেরূপ জানিত, তাহাতে সে যে তাঁহাকে এ অবস্থায় দেখিলে চিনিতে পারিত না, এমন বোধ হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে এখন সেখানে ছিল না; দিন দুই পরে সে আসিতে পারে কথা আছে। তাহার চেনার দরুণ হয়ত অন্যের মনের সংস্কারও ক্রমশঃ দূর করিলে করা যাইতে পারিত। তা ছাড়া রাণীকে দিন কতক এখানে লুকাইয়া রাখিতে

পারিলেও, ক্রমে ক্রমে অবশ্যই তাঁহার শরীর ভাল হইয়া উঠিত এবং তাঁহার পূর্ব্ব লাবণ্য ও সজীবতা আবার দেখা দিত। তাহা হইলে লোক-জন অবশ্যই তাঁহাকে চিনিতে পারিত। কিন্তু যে উপায়ে তাঁহাকে স্বাধীন করা হইয়াছে, তাহাতে তাদৃশ কোন অনুষ্ঠান নিতান্তই অসম্ভব। গারদ হইতে লোকেরা আপাততঃ তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য কালিকাপুরের দিকে ধাবিত হইয়াছে, কিন্তু যেই তাহারা সেখানে তাঁহার সন্ধান না পাইবে, সেই নিশ্চয়ই আনন্দধামের দিকে ধাবিত হইবে। এই সকল কথা আলোচনা করিয়া মনোরমা আপাততঃ এ সকল চেষ্টা পরিত্যাগ করাই আবশ্যক বলিয়া স্থির করিলেন এবং যত শীঘ্র সম্ভব, এ স্থান হইতে কোন নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

কলিকাতায় গিয়া, থাকাই তাঁহার সুবিধা বলিয়া মনে হইল। সেরূপ লোকারণ্যের মধ্যে লুক্কায়িত থাকা অনেকটা সহজ কাজ। চিরস্মরণীয় ১৬ই ভাদ্রের বৈকালে মনোরমা ভগ্নীকে ধৈর্য্য ও সাহস অবলম্বনের নিমিত্ত উত্তেজিত করিলেন। তাহার পর তাঁহারা উভয়ে চিরপরিচিত ক্রীড়াভূমি ও বাল্যলীলার নিকেতন হইতে নিতান্ত নিঃসম্পর্কিত লোকের ন্যায়, ভীত ও অপরাধী ব্যক্তির ন্যায়, সঙ্কোচ-সহকারে, প্রস্থান করিলেন। তাহারা উদ্যান-পার্শ্ব দিয়া চলিয়া আসার পর, রাণী লীলাবতী দেবী ইহজীবনের মত একবার আপনার জননীর প্রতিমূর্ত্তি শেষ দেখা দেখিয়া লইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। মনোরমা তাঁহাকে এ বাসনা পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই রাণী এ বিষয়ে দিদির ইচ্ছামত কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার সেই নিষ্প্রভ নয়নে জ্যোতিঃ সঞ্চারিত হইল, তাঁহার ক্ষীণ ও দুর্ব্বল বাহুতে আবার শক্তির আবির্ভাব হইল। তিনি জোর করিয়া দিদিকে সেই দিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। আমার অন্তরে নিয়তই এই বিশ্বাস যে, বিশ্ববিধাতা, কৃপাসিন্ধু, দীনবন্ধু, এই ঘটনায় সেই যাদশাপন্না মর্ম্মপীড়িতা সুন্দরীর শরীরে ও হৃদয়ে বলবিধান করিয়া তাঁহার চিরমঙ্গলময় নামের অকাট্য প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কারণ এরূপ না হইলে তাঁহার এ বিয়োগবিধুর দীন সন্তান ইহসংসারে সে নিদারুণ অন্তর্জ্জালা-নিবৃত্তির উপায় কোথায় খুঁজিয়া পাইত?

তাঁহারা উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেই অনুষ্ঠানে এই তিনটি জীবনের ভবিষ্যৎ সমসূত্রে গ্রথিত হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমরা তৎকালে অতীত কাহিনী যতদূর পরিজ্ঞাত ছিলাম তাহা লিখিত হইল। সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার মনে স্বতই দুই মীমাংসা সমুপস্থিত হইল। প্রথমতঃ এই লোমহর্ষণ কুমন্ত্রণা কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত এবং এই অচিন্তনীয় দুষ্কর্ম্ম প্রচ্ছন্ন করিবার নিমিত্ত, চক্রান্তকারিগণকে কতই সুযোগের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছে, কতই সাবধানতা সহকারে ঘটনাবলী পরিচালিত করিতে হইয়াছে, তাহা আমি মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলাম। অন্যান্য আভ্যন্তরিক প্রক্রিয়া ও বৃত্তান্ত এখনও আমার

অপরিজ্ঞাত থাকিলেও, সেই শুক্লবসনা সুন্দরী এবং রাণীর আকৃতিগত সাদৃশ্য-সূত্রাবলম্বনে যে এই অচিন্তনীয় দুষ্কর্ম্ম সংসাধিত হইয়াছে, তৎ-পক্ষে কোনই সন্দেহ নাই। স্পষ্টই বুঝা যাই-তেছে যে, মুক্তকেশী চৌধুরী মহাশয়ের বাসায় রাণীরূপে পরিচিত ও সম্মানিত হইয়াছিল। ইহাও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, রাণী বাতুলা-লয়ে সেই পরলোকগতা রমণীর স্থান অধিকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সকল পরিবর্ত্তন এরূপ সুকৌশলে সংসাধিত হইয়াছিল যে, ডাক্তার, চৌধুরী মহাশয়ের ভবনস্থ পাচিকা ও দাসী এবং সম্ভবতঃ, বাতুলালয়ের অধ্যক্ষ প্রভৃতি নির্লিপ্ত ও নিরীহ ব্যক্তিগণ, বিশেষ সংস্রবে থাকিয়াও এ দারুণ চক্রান্তের অভ্য-ন্তরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হন নাই। অথচ সহসা তাঁহাদের সকলকেই চক্রান্তে বিশেষরূপ লিপ্ত ও সহায়কারী বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার মনের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত প্রথম সিদ্ধান্তের পরিণাম মাত্র। চৌধুরী মহাশয় ও রাজার হস্তে আমাদের তিন জনের কোন প্রকারে নিষ্কৃতি নাই, ইহা স্থির। এই চক্রান্তে কৃত-কার্য্য হওয়ায় তাঁহাদের দুই জনের তিন লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছে; একজন দুইলক্ষ টাকা পাইয়াছেন, আর একজন স্ত্রীর যোগে এক লক্ষ টাকা হস্তগত করিয়াছেন। এই ভয়ানক কাণ্ড প্রচ্ছন্ন রাখিতে না পারিলে, তাঁহাদের লাভের হানি তো হইবেই, অধিকন্তু তাঁহাদের উভয়কেই যার-পর-নাই বিপন্ন হইতে হইবে এবং রাজদ্বারে বিশেষরূপ দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এই সকল কারণে, তাঁহাদের জঘন্য চক্রান্তের প্রধান লক্ষ্য কোথায় লুক্কায়িত আছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত এবং তাঁহাকে তাঁহার অকৃত্রিম সুহৃদ মনোরমা ও আমার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার নিমিত্ত, তাঁহারা কোন প্রকার যত্নের ও চেষ্টার ত্রুটি করি-বেন না।

এই অতি ভয়ানক বিপদ প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারে বিবেচনা করিয়া, আমি কলিকাতায় বহুজনতাপূর্ণ কার্য্য-ময় এক পল্লী মধ্যে আমাদের বাসস্থান অব-ধারিত করিলাম। সে পল্লীর সকল লোকেই কর্ম্মময় ও স্ব স্ব ভাবনায় ব্যস্ত, সুতরাং তাহা-দের এমন সময় ও অবকাশ নাই যে, তাহারা পরের সন্ধান করিয়া বেড়ায়। আমি কলি-কাতায় এই জনাকীর্ণ অরণ্য মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া, এই ঘোর অত্যাচারের প্রতিবিধান, এবং এই বিজাতীয় কাণ্ডের প্রতিকারযত্নে জীবনকে ব্রতী করিলাম।

এই নূতন আবাসে, নূতন অবস্থায় অব-স্থাপিত হওয়ার পর, যখন কয়েক দিনের মধ্যে আমাদের জীবন-প্রবাহ ধীরে ধীরে, সুনিয়মে চলিতে আরম্ভ করিল, তখন ভবিষ্যতে আমি কিরূপ প্রণালীতে আমার বর্ত্তমান ব্রতপালনে অগ্রসর হইব, তাহা অবধারণ করিয়া লইলাম।

আমি যে লীলাবতীকে চিনিতে পারিয়াছি, অথবা মনোরমা যে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া-ছেন, এ দুই প্রমাণে কোন ফল হইবে না, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। আমরা দুই জনেই তাঁহার নিকট অপরিসীম, অতি বলবান্ প্রেম-ডোরে বাঁধা। এই প্রেম আমা-দের হৃদয়ে তাঁহার সম্বন্ধে যে অভ্রান্ত-সংস্কার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে, তাহার অন্যথা করে কাহার সাধ্য? আমাদের কি বিচার করিয়া, আলোচনা করিয়া, ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাকে চিনিতে হইবে?

অতীত ঘটনাবলীর ভয় ও নানাবিধ অত্যুৎকট মনস্তাপ, মুক্তকেশীর সহিত তাঁহার

আকৃতিগত যে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিভিন্নতা ছিল, তাহা বিদূরিত করিয়া, তাঁহাকে এক্ষণে অবিকল তত্তুল্য করিয়া তুলিয়াছে। আমি যৎকালে আনন্দধামে অবস্থান করিতাম, তৎকালে উভয়কে দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, যদিও স্থূলতঃ উভয় কামিনীর অত্যাশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে, তথাপি সূক্ষ্মরূপে দর্শন করিলে, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। সেই অতীত কালে, এতদুভয়কে একত্রে দাঁড় করাইয়া দেখিলে, কাহারও মনে তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা সম্বন্ধে কোনই ভ্রান্তি হইত না। কিন্তু এখন আর সে কথা বলা যায় না। লীলাবতীর অনাগত জীবনে যদি কখন বিষাদ ও যাতনা সমুপস্থিত হয়, তাহা হইলে মুক্তকেশীর সহিত তাঁহার সাদৃশ্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে বলিয়া তৎকালে আমি আশঙ্কা করিয়াছিলাম। সুখ-সৌভাগ্য-সম্বেষ্টিতা লীলাবতী দেবীর জীবনের সহিত তাদৃশ অপ্রিয় কল্পনা একবারও মনে মনে বিমিশ্রিত করিয়াছিলাম বলিয়া আমার তখন নিরতিশয় আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু হায়! ঘটনাচক্র এখন সত্য সত্যই সে সুকুমারীর সুকোমল হৃদয় ও শরীরকে নিদারুণ দুঃখ-ভাবে নিপীড়িত করিয়াছে। তাঁহার অনবদ্য সৌন্দর্য্য ও যৌবন-শ্রী অধুনা যাতনাজনিত কালিম-কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছে এবং একদা যে সাদৃশ্যের কথা মনে মনে আলোচনা করিয়াও ব্যথিত হইয়াছিলাম, এখন তাহা সর্ব্বাংশে সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা দুইজন তাঁহাকে যে চক্ষে দর্শন করি সে চক্ষু ব্যতীত অন্য কোন চক্ষু তাঁহাকে তাঁহার বাতুলালয় হইতে মুক্তির দিবস দর্শন করিলে, কখনই সেই লীলাবতী বলিয়া চিনিতে পারিত না; এবং সে জন্য তাহাদিগকে অপরাধী করিবার কোনই কারণ নাই।

এই সকল কারণে লীলার বাহ্যাকারের যেরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল তাঁহার হৃদয়ের অবস্থাও তেমনই মন্দ হইয়াছিল। দৈহিক দুর্ব্বলতা হেতু তাঁহার চিরন্তন সঞ্জীবতা, লাবণ্য ও শোভা যেমন বিধ্বংসিত হইয়াছিল, মনের শক্তিও সেইরূপ বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার স্মৃতি-শক্তি বড়ই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বকালের কোন প্রসঙ্গই তিনি ভাল করিয়া মনে করিতে পারিতেন না; অতীত ঘটনা সকল তিনি সহসা স্মরণ করিতে পারিতেন না এবং অল্প দিন পূর্ব্বে চৌধুরী মহাশয়ও রাজার প্রযত্নে যে যে কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে তাহাও তিনি মনে করিয়া বলিতে পারিতেন না। লীলার মানসিক শক্তির এবংবিধ অভাব ও তাঁহার নিরন্তর অপ্রফুল্লতা আমাদের চিন্তার প্রধান ও প্রথম বিষয় হইল। আমি ও মনোরমা অবিরত লীলার হৃদয়ে প্রফুল্লতা সঞ্চারিত করিতে ও তাঁহাকে তাঁহার বিগত সঞ্জীবতা পুনঃ প্রদান করিতে বিহিত-বিধানে চেষ্টা করিতে নিযুক্ত হইলাম।

আহার ও পথ্যের সুব্যবস্থায় বাহ্য দুর্ব্বলতা বিদূরিত হইয়া, ক্রমশঃ মনের অবস্থাও ভাল হইবে মনে করিয়া, আমরা আপনার অতি সামান্য আহারে পরিতৃপ্ত থাকিয়া, লীলার নিমিত্ত নানাবিধ পুষ্টিকর ও বলবিধায়ক সুখাদ্য ব্যবস্থা করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে, মানসিক শক্তি সমুত্তেজিত করিবার বাসনায়, নানা প্রকার আয়োজন করিলাম। আমাদের সেই ক্ষুদ্র আবাসে, লীলার জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠ, আমরা নানাপ্রকার মনোহর পুষ্পাদি দ্বারা সাজাইতে লাগিলাম এবং লীলার চিত্ত-বিনোদিত হইতে পারে, এরূপ নানাবিধ সামগ্রী সংগ্রহ করিতে

লাগিলাম। তাহাতে লীলার চিত্ত অনুরক্ত হইতেছে দেখিয়া, ক্রমশঃ আমি তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ কাব্যাদি পড়াইবার ব্যবস্থা করিলাম। লীলা সানন্দে পাঠ করিতে সম্মত হইলেন। আবার—বহুকাল পরে—আবার আমি লীলার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার নিকট কাব্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে নিযুক্ত হইলাম। ইহাতে লীলার চিত্ত ক্রমেই অধিকতর সজীব ও প্রফুল্ল হইতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার পূর্ব্ববৎ ভাব আবার দেখা দিতে লাগিল। একদিন আমি লীলাকে পাঠ বলিয়া দিয়া, নীচে নিজ-প্রকোষ্ঠে আগমন করিয়া, প্রবন্ধ রচনায় নিযুক্ত হইলাম। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে, আমি আবার লীলার ঘরে গমন করিলে, লীলা লজ্জাবনত বদনে, ঈষৎ হাস্যের সহিত, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেবেন্দ্র বাবু, আমি আনন্দধামে কখন কখন এক একটা কবিতা লিখিতাম; আপনি তাহার বড়ই প্রশংসা করিতেন। কিন্তু তাহার পর, এতদিনের মধ্যে আর একটীও কবিতা লিখি নাই। আজি আবার আমি একটী ছোট কবিতা লিখিয়াছি। যদি তাহা দেখিয়া আপনি রাগ না করেন, তাহা হইলে, সেটী আপনাকে দেখিতে দিব। বলুন রাগ করিবেন না?" ধন্য বিধাতঃ! তোমার অপার করুণাবলে আমার প্রাণের প্রাণ লীলাবতী যাহা ছিলেন আবার তাহাই হইতেছেন!

যেইরূপেই হউক, যত ক্ষতি স্বীকার করিয়াই হউক, এবং যত কষ্টেই হউক, লীলার পূর্ব্ব অবস্থা পুনরায় সংস্থাপন করিতেই হইবে। মনোরমা ও আমি পরামর্শ করিলাম, আমাদের সংকল্প সিদ্ধির নিমিত্ত যে কোন অনুষ্ঠান করিতে হইবে, সকলই লীলার নিকট প্রচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। কারণ সেই সকল ব্যাপারের আলোচনা করিতে হইলে লীলার অতিশয় কষ্ট হইবার সম্ভাবনা এবং তাহাতে তাঁহার ক্ষীণ মস্তিষ্ক আবার অবসন্ন হইয়া পড়িতে পারে। এইরূপ সংকল্পবদ্ধ হইয়া আমি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম।

মনোরমার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম, এ সম্বন্ধে যেখান হইতে যত বৃত্তান্ত আমরা সংগ্রহ করিতে পারি, সমস্ত সংগৃহীত হইলে পর, করালী বাবুকে সকল কথা জানাইতে হইবে এবং আইনের সাহায্যে আমাদের কোন উপকার হইবে কি না, তাহার মীমাংসা করিতে হইবে। মনোরমা রাজবাটীতে অবস্থানকালে, যে দিনলিপি লিখিয়াছিলেন, প্রথমতঃ আমি তাহারই আলোচনায় নিযুক্ত হইলাম। এই দিনলিপির মধ্যে স্থানে স্থানে আমার প্রসঙ্গ ছিল। তৎসমস্ত আমার নিকট হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিবেন মনে করিয়া, মনোরমা তাহা আমাকে পড়িতে না দিয়া স্বয়ং পাঠ করিয়া আমাকে শুনাইতে লাগিলেন। আমি তন্মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় অংশ সমূহ লিখিয়া লইতে লাগিলাম। গভীর রাত্রিতে সাংসারিক অন্য কার্য্য শেষ হওয়ার পর, আমরা দিনলিপির আলোচনা করিতাম। তিন রাত্রিতে এ কার্য্য শেষ হইল।

তদনন্তর, কোন দিকে কোন সন্দেহ উৎপাদন না করিয়া, অন্যত্র হইতে যে সংবাদ সংগ্রহ করা যাইতে পারে তাহারই চেষ্টায় নিযুক্ত হইলাম। লীলা যে বলিতেছেন, তিনি অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর আবাসে রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, এ কথা কতদূর সত্য তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত আমি ঠাকুরাণীর বাটীতে গমন করিলাম। এস্থলে এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ অন্য স্থলেও, প্রকৃত ব্যাপার গোপন রাখিয়া, যখন লীলার কথা উঠিল, তখনই 'স্বর্গীয় রাণী' বলিয়া তাঁহার উল্লেখ করিলাম।

মৎকৃত প্রশ্নের উত্তরে অন্নপূর্ণা যে উত্তর দিলেন, তাহা শুনিয়া আমার পূর্ব্বের সন্দেহ দূরীভূত হইল। লীলা সেখানে রাত্রিতে থাকিবেন বলিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু একবারও সেখানে আইসেন নাই। এই বিষয়ে এবং অন্যান্য কোন কোন বিষয়ে, লীলার নিতান্ত বিস্ময়াবহ ভ্রম হইয়াছিল সন্দেহ নাই। এরূপ ভ্রমের কারণ অনুসন্ধান করা সহজ নহে। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, এরূপ বিপরীত প্রমাণ আমাদের উদ্দেশ্যের নিতান্ত প্রতিকূল সন্দেহ নাই।

ঠাকুরাণীকে লীলা যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা দেখিতে চাহিলে, তিনি আমাকে তাহা দিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহার খাম খানি তিনি রাখেন নাই; নিষ্প্রয়োজন বোধে, তিনি তাহা ফেলিয়া দিয়াছেন। চিঠিতে কোন তারিখ দেওয়া নাই। ডাকের মোহর দেখিয়া একটা তারিখ বুঝিতে পারা যাইতে পারিত, কিন্তু খাম খানিও হারাইয়া গিয়াছে। দেখিলাম, চিঠিতে রাণী স্বয়ং লিখিয়াছেন বটে, যে তিনি কল্য আসিয়া অন্নপূর্ণা দেবীর বাটীতে রাত্রি অতিবাহিত করিবেন। সে কয় ছত্রের দ্বারা বর্ত্তমান অনুসন্ধান বিষয়ে, কোনই সহায়তা হইবার সম্ভাবনা নাই।

অন্নপূর্ণা দেবীর বাটী হইতে হতাশভাবে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া, রাজবাটীর গিন্নি-ঝি নিস্তারিণী ঠাকুরাণীকে একখানি পত্র লিখিবার জন্য মনোরমাকে বলিলাম। তাঁহাকে লেখা হউক যে, চৌধুরী মহাশয়ের কোন কোন ব্যবহার একটু সন্দেহজনক মনে হওয়ায়, গিন্নি-ঝি সত্যের অনুরোধে, সমস্ত ঘটনা আমাদিগকে জানাইলে, আমরা উপকৃত হইব। এ ক্ষেত্রেও 'স্বর্গীয়া রাণী' নামেই লীলাবতীর কথা উল্লেখ করা হইল। এদিকে পত্রের উত্তর আসিতে যে কয়দিন বিলম্ব হইবে, সে সময়টা নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া না থাকিয়া, আমি সিমুলিয়ার ডাক্তার বাবুর নিকট গমন করিলাম। সেখানে আপনাকে শ্রীমতী মনোরমা দেবীর প্রেরিত লোকরূপে পরিচিত করিয়া, 'স্বর্গীয়া রাণীর' মৃত্যু সম্বন্ধে তৎকালে উকীল করালী বাবু যে যে সন্ধান করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত আরও কোন নূতন সংবাদ এখন জানিতে পারা সম্ভব কি না, জিজ্ঞাসা করিলাম? ভোলানাথ বাবুর সহায়তায় আমি মৃত্যুর সার্টিফিকেটের নকল পাইলাম; এবং যে বৈষ্ণবেরা সৎকারার্থ শব লইয়া গিয়াছিল তাহাদের সাক্ষাৎ পাইলাম, আর রামমতি নাম্নী সেই ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণীরও সন্ধান পাইলাম। রামমতি সংপ্রতি প্রভুপত্নীর সহিত মনান্তর হেতু কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছে। এই সময়ে ক্রমে ক্রমে আমি গিন্নি-ঝি, ডাক্তার বাবু, বৈষ্ণবগণ, রামমতি প্রভৃতি সকলের লিখিত বৃত্তান্ত সংগৃহীত করিলাম। তৎসমস্ত এগ্রন্থের যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এই সকল কাগজপত্র সংগৃহীত হইলে, আমি মনে করিলাম, এখন করালী বাবুর সহিত পরামর্শ করার সময় হইয়াছে। মনোরমা আমার নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, কোন বিশেষ গোপনীয় কথাবার্ত্তার জন্য আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব; অতএব কোন্ দিন কোন্ সময়ে উকীল বাবুর সুবিধা হইবে, তাহা জানাইলে তিনি বাধিত হইবেন।

প্রাতে আমি লীলাকে সঙ্গে লইয়া আমাদের ভবনস্থ বারান্দায় বেড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিয়ৎকাল পরিক্রমণের পর, তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত সজীব বোধ করিয়া আমরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং লীলাকে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' পড়াইতে লাগিলাম।

কিয়ৎকাল পাঠালোচনা হইলে আমি উঠিবার উদ্যোগ করিলাম। তখন লীলা নিতান্ত উদ্বিগ্ন ভাবে আমার মুখের দিকে একবার দৃষ্টি পাত করিলেন এবং তাঁহার অঙ্গুলি সকল পূর্ব্বকালের ন্যায় তত্রত্য একটা পেনসিল লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। তিনি অবশ্যই কি বলিবেন মনে করিয়া, আমি একটু অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তিনি নিতান্ত কাতরভাবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"পূর্ব্বকালে তুমি আমাকে যেমন ভালবাসিতে, এখনও কি তেমনই ভালবাস? এখন আমার সে লাবণ্য নাই, সে সজীবতা নাই, আমার মনের সে প্রখরতা নাই। এখন, দেবেন্দ্র, এখনও কি তুমি আমাকে তেমনই স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাক? এখন আমি তোমার স্নেহের, তোমার ভালবাসার নিতান্ত অযোগ্য। আমাকে তুমি বলিয়া দেও, আমি কি করিলে আবার তেমনই হইতে পারিব।"

শিশুর ন্যায় সরল ভাবে লীলাবতী সুন্দরী এইরূপে আমাকে হৃদয়ের ভাব জানাইলেন। আমি বলিলাম,—"লীলাবতি, তুমি পূর্ব্বকার অপেক্ষা এক্ষণে আমার অধিকতর স্নেহের, অধিকতর ভালবাসার সামগ্রী হইয়াছ। তোমার সুখ-সৌভাগ্য অপগত হওয়ায়, সম্ভবত তোমার নিতান্ত কষ্ট হইয়াছে, কিন্তু আমার ভালবাসা তোমার সুখ-সৌভাগ্য দেখিয়া জন্মে নাই, সুতরাং তাহার হ্রাস হইবে কেন? তোমার কষ্টে, তোমার দুঃখে আমার অনুরাগ এখন আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কেন লীলা, তুমি এ অলীক চিন্তার প্রশ্রয় দিয়া হৃদয়কে ব্যথিত করিতেছ? দেবি! হৃদয়কে প্রফুল্ল করিতে সচেষ্ট হও, এ অবস্থান্তরের কষ্ট বিস্মৃত হইতে চেষ্টা কর, এবং সতত সানন্দিত থাকিয়া আমাকে ও মনোরমাকে সুখী কর তোমার আনন্দ, তোমার প্রফুল্লতা, তোমার সুখ ভিন্ন আমাদের জীবনের আর কোনই লক্ষ্য নাই।"

লীলা কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া পরে বলিলেন,—আর আমার আনন্দের কি অভাব আছে? যদি কিছু অভাব থাকে তাহাও আর থাকিবে না। কিন্তু দেবেন্দ্র, তুমি যেন, এখন কোথায় যাইবে বোধ হইতেছে। যেখানেই যাও, ফিরিয়া আসিতে দেরি করিও না। তুমি বাটী না থাকিলে আমার চিত্ত সুস্থির থাকে না।"

আমি বলিলাম,—"না লীলা, আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। তুমি চিত্তকে সুস্থির ও সজীব করিতে চেষ্টা কর।"

বাহিরে আসিয়া আমি মনোরমাকে আমার সঙ্গে আসিতে সঙ্কেত করিলাম। প্রকাশ্যরূপে পথে বাহির হইলে আমার বিপদ ঘটিতে পারে; সে বিষয়ে মনোরমাকে সতর্ক করিয়া রাখা আবশ্যক বোধে আমি বলিলাম,—"সম্ভবতঃ আমি এক ঘণ্টার মধ্যেই বাটী ফিরিব। আমার অনুপস্থিত কালে, দেখিও কেহই যেন বাটীর মধ্যে আসিতে না পায়। আর যদিই কিছু ঘটে—"

মনোরমা তৎক্ষণাৎ আমার কথায় বাধা দিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"বল দেবেন্দ্র, আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল, কি বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে; তাহা হইলে সে জন্য আমি সাবধান থাকিব।"

আমি বলিলাম,—"লীলার পলায়ন সংবাদ শুনিয়া রাজা প্রমোদরঞ্জন, বোধহয়, কলিকাতা আসিয়াছেন। তুমি শুনিয়াছ আমি এ দেশ হইতে চলিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে, তিনি আমার পশ্চাতে গোয়েন্দা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যদিও

আমি তাঁহাকে কখন দেখি নাই, তথাপি সম্ভবতঃ তিনি আমাকে চিনেন।"

মনোরমা আমার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া উদ্বেগের সহিত আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলেন। ইহাতে আমার যে কতই গুরুতর বিপদ ঘটিতে পারে তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন বোধ হইল।

আমি বলিলাম,—"এত শীঘ্রই যে রাজা অথবা তাহার নিয়োজিত লোক আমাকে কলিকাতার পথে দেখিতে পাইবে, এরূপ আমি মনে করি না; তবে সেরূপ ঘটনা ঘটিলেও ঘটিতে পারে। যদিই সেরূপ কোন কারণে আমি আজি রাত্রে বাটী ফিরিতে না পারি, তাহা হইলে তোমরা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইও না এবং, কোনরূপ কৌশল করিয়া, লীলাকে কোন কথা জানিতে দিও না। যদি আমি বুঝিতে পারি, কোন গোয়েন্দা আমার অনুসরণ করিতেছে, তাহা হইলে সে আমার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে এ বাটী পর্য্যন্ত না আসিতে পারে, আমি তাহার বিহিত ব্যবস্থা করিব। যতই বিলম্ব হউক, আমি যে ফিরিয়া আসিব তাহার কোন সন্দেহ নাই। তুমি সে জন্য উদ্বিগ্ন হইও না।"

দৃঢ়তার সহিত মনোরমা বলিলেন,—"না। মনে করিও না যে, ক্ষুদ্র-হৃদয় স্ত্রীলোক ভিন্ন তোমার আর সহায় নাই। আমি কখনই সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া তোমার বাধা জন্মাইব না।" আবার কিয়ৎকাল তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তাহার পর উভয় হস্তে আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"কিন্তু দেবেন্দ্র সাবধানের বিনাশ নাই। বল তুমি খুব সাবধানে চলাফেরা করিবে?"

আমি মস্তকান্দোলন করিয়া সম্মতি প্রকাশ করিলাম এবং এই সন্দেহ-সমাকুলিত অন্ধকারময় অনুসন্ধানের নিমিত্ত প্রাথমিক অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

করালী বাবুর কার্য্যালয়ে আসিতে পথে কোনই সন্দেহজনক কাণ্ড দেখিলাম না। কিন্তু কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া আমার হঠাৎ মনে হইল যে, আমি এরূপে এখানে আসিয়া কাজ ভাল করি নাই। মনোরমার দিনলিপি শুনিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, তিনি করালী বাবুকে রাজবাটী হইতে যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন তাহা নিশ্চয়ই চৌধুরী মহাশয় খুলিয়াছিলেন এবং গিরিবালার যোগে প্রেরিত তাঁহার দ্বিতীয় পত্রও চৌধুরীর স্ত্রী বাহির করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং চৌধুরী মহাশয় করালী বাবুর আপিসের ঠিকানা বেশ জানেন। এখন তিনি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন যে, লীলাকে আবার হস্তে পাইয়া, মনোরমা অবশ্যই করালী বাবুর সহিত পরামর্শ করিবেন। এরূপ স্থলে, করালী বাবুর আপিসের নিকট নিশ্চয়ই চৌধুরী মহাশয় ও রাজা গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। আমি এ দেশ হইতে চলিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে, আমাকে অনুসরণ করিবার নিমিত্ত যে লোক লাগাইয়াছিলেন, যদি এবারও তাহাদের লাগাইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার প্রত্যাগমন সংবাদ এখনই ব্যক্ত হইয়া যাইবে। রাস্তায় পাছে কেহ আমাকে চিনিতে পারে, এই ভাবনাই ভাবিতেছি, কিন্তু এখানে

যে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা আছে, তাহা আমার একবারও মনে হয় নাই। এ সকল কথা বিবেচনা করিয়া, সময় থাকিতে, আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। এখন আর সে বিবেচনায় ফল কি? যাহা হইয়াছে তাহার হাত নাই; এখন ফিরিবার সময় বিশেষ সতর্ক থাকিব সঙ্কল্প করিলাম।

কিয়ৎকাল বাহিরে অপেক্ষা করার পর, করালী বাবুর আরদালি আমাকে বাবুর খাসকামরায় লইয়া গেল। দেখিলাম করালী বাবু লোকটী খুব কৃশ, খুব ফরসা, বড় ধীর এবং বেশ বিচক্ষণ। আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া আসন গ্রহণ করিলাম এবং বলিলাম,—"মহাশয়, আমার বক্তব্য আমি যত সংক্ষেপেই কেন শেষ করি না, তথাপি অনেকক্ষণ সময় লাগিবে।"

তিনি উত্তর দিলেন,—"মনোরমা দেবীর কর্ম্মে সময়ের বিচার করিতে আমার অধিকার নাই। আমার অংশিদার শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ কালে আমাকে বিশেষরূপে উপদেশ দিয়াছেন যে, মনোরমা দেবীর কার্য্য উপস্থিত হইলে তাহাতে কদাচ অবহেলা করা না হয়।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসিলাম,—"উমেশ বাবু এখন কোথায় আছেন?"

তিনি উত্তর দিলেন,—"তিনি আপাততঃ দার্জ্জিলিঙ্গে বাস করিতেছেন। তাঁহার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে বটে, কিন্তু কতদিনে তিনি ফিরিয়া আসিবেন তাহার কোন স্থিরতা নাই।"

এই সকল কথা বলিতে বলিতে করালী বাবু, সমুখস্থ কাগজপত্র খুঁজিয়া, মোহর যুক্ত একখানি পত্র বাহির করিলেন। আমি মনে করিলাম, তিনি বুঝি পত্রখানি আমার হস্তে প্রদান করিবেন। কিন্তু তিনি পত্র খানি না দিয়া, সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন এবং আমার বক্তব্য শ্রবণ করিবার অভিপ্রায়ে আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। আমি কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া, বর্ত্তমান ব্যাপারের যাহা যাহা জানিতাম, সকলই তাঁহাকে জানাইলাম। আইন ব্যবসায়িগণ সহজেই অতিশয় চাপা। বিশেষতঃ, করালী বাবু তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। তথাপি আমার কথা শুনিতে শুনিতে, বিস্ময় ও অবিশ্বাস হেতু, বারংবার তাঁহার মুখের নিরতিশয় ভাবান্তর দেখা গেল; তিনি চেষ্টা করিয়াও, সে ভাব কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। আমি ক্ষান্ত না হইয়া আমূল বক্তব্য শেষ করিলাম এবং সমস্ত কথা সমাপ্ত করিয়া সাহসের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এখন বলুন, এ বিষয়ে আপনার মত কি?"

তিনি, বেশ করিয়া বিচার না করিয়া, হঠাৎ মত দিবার লোক নহেন। বলিলেন,—"আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যকতা আছে।"

তিনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। সে সকল তীক্ষ্ণ, সন্দেহ-পূর্ণ, অবিশ্বাস-পূর্ণ, প্রশ্ন শুনিয়া আমি সহজেই অনুমান করিলাম যে, করালী বাবু স্থির করিয়াছেন, আমি নিশ্চয়ই কাহারও চাতুরীতে পড়িয়াছি। যদি আমি মনোরমার পত্র লইয়া না আসিতাম, তাহা হইলে হয়ত, তিনি আমাকে কোন দুষ্টাভিসন্ধি-প্রণোদিত, প্রবঞ্চনাকারী, অসৎ লোক বলিয়াই মনে করিতেন।

তাঁহার জিজ্ঞাসা শেষ হইলে, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম,—"আমার কথা সত্য বলিয়া কি আপনার বিশ্বাস হইতেছে না?"

তিনি উত্তর দিলেন,—"আপনাদের বিশ্বাস মতে আপনি সম্পূর্ণ সত্য কথা বলিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। শ্রীমতী মনোরমা দেবীকে আমি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, এবং তজ্জন্য এরূপ ব্যাপারে তিনি যে ভদ্রলোককে মধ্যস্বরূপে বিশ্বাস করিয়াছেন,তাঁহাকে আমিও বিশ্বাস করিতে বাধ্য। আমি, শিষ্টাচারের অনুরোধে এবং যুক্তির অনুরোধে, ইহাও স্বীকার করিতেছি যে, রাণীর অস্তিত্ব আপনার নিকটে ও মনোরমা দেবীর নিকটে সুন্দররূপে সপ্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু আপনি আমার নিকট আইনের মত জানিতে আসিয়াছেন। আমি আইন ব্যবসায়ী। আইনানুসারে আমাকে বলিতে হইতেছে, দেবেন্দ্র বাবু আপনার মোকদ্দমা টিকিবে না।"

আমি বলিলাম,—করালী বাবু আপনি বড় শক্ত কথা বলিতেছেন।

তিনি বলিলেন,—"আমার শক্ত কথা আমি সহজ করিয়া দিতেছি। রাণী লীলাবতী দেবীর মৃত্যুর প্রমাণ, সহজ চক্ষে দেখিলেও, বেশ পরিষ্কার ও সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার পিসীই বলিতেছেন যে, তিনি পিসার বাসায় আসিয়াছিলেন, সেখানে পীড়িতা হইয়াছিলেন এবং সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। মৃত্যু সম্বন্ধে এবং সে মৃত্যু যে স্বাভাবিক ভাবে ঘটিয়াছিল তদ্বিষয়ে ডাক্তারের প্রমাণ রহিয়াছে। যে বৈষ্ণবগণ সৎকার করিয়াছে তাহারাও সাক্ষী রহিয়াছে। এই মামলা আপনি উড়াইয়া দিতে চাহিতেছেন। আপনি বলিতেছেন, যে স্ত্রীলোক মরিয়াছে ও যাহার সৎকার হইয়া গিয়াছে, সে রাণী লীলাবতী নহে। ইহার আপনি কি প্রমাণ দিতেছেন? আপনার কথিত বৃত্তান্তের প্রধান প্রধান অংশ আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, তাহার মূল্য কি দাঁড়ায়। মনোরমা দেবী পাগলাগারদে গিয়া একটী পাগলিনীকে দেখিতে পান। ইহা সকলেরই জানা আছে যে মুক্তকেশী নাম্নী এক পাগলিনীর সহিত রাণীর আকৃতির অত্যদ্ভুত সমতা ছিল; সে ঐ গারদ হইতে পলাইয়া গিয়াছিল। ইহাও জানা আছে যে, গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ যে স্ত্রীলোককে পাগলাগারদে রাখা হয়, সে সেই মুক্তকেশী বলিয়াই পুনরায় গৃহীত হয়। ইহাও জানা আছে যে, যে ভদ্রলোক মুক্তকেশীকে গারদে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি রাধিকা বাবুকে সতর্ক করিয়াছিলেন,যে রাধিকা বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রীরূপে পরিগণিত হওয়াই মুক্তকেশী নাম্নী পাগলিনীর বাতুলতার প্রধান লক্ষণ। আর ইহাও জানা আছে যে, যদিও কেহই তাহার কথা প্রত্যয় করে নাই, তথাপি গারদে মুক্তকেশী বার বার আপনাকে রাণী লীলাবতী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। এ সকলই সত্য ঘটনা। ইহার বিরুদ্ধে আপনার বলিবার কি কথা আছে? মনোরমা দেবী তাঁহাকে দেখিয়াই রাণী বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু পরাগত ঘটনা সকল সে পরিচয়ের নিতান্ত প্রতিকূল। মনোরমা দেবী তখনই কি আপনার ভগ্নীর স্বরূপত্ব কারাধ্যক্ষের গোচর করিয়া আইন-সঙ্গত উপায়ে, তাঁহার মুক্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন? না—তিনি গোপনে এক জনকে ঘুস দিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এইরূপ সন্দেহজনক ভাবে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া, যখন তিনি তাঁহাকে রাধিকা বাবুর নিকট লইয়া আসিয়াছিলেন, তখন তিনি কি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন? মৃত ভ্রাতুষ্পুত্রীর মুখ মনে পড়ায় তিনি একবারও বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন কি? না। চাকরবাকরের কেহই কি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিল? না। তাহার পর তাঁহার স্বরূপত্ব

সমর্থন ও অন্য নানারূপ চেষ্টার জন্য তাঁহাকে নিকটেই কোন স্থানে রাখা হইয়াছিল কি? না—তাঁহাকে গোপনে কলিকাতায় আনা হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে আপনিও তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আপনি কোনরূপ জ্ঞাতি কুটুম্ব নহেন; এমন কি তাঁহাদের বহুদিনের বন্ধুও নহেন। চাকরবাকরের সাক্ষ্যের দ্বারা আপনার সাক্ষ্য কাটিয়া গেল। আর আপনারা যাঁহাকে রাণী বলিতেছেন, তিনি নিজেই নিজের সাক্ষ্য কাটিয়া দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, তিনি রাত্রিতে কলিকাতায় এক জায়গায় ছিলেন। আপনি প্রমাণ পাইয়াছেন, তিনি সে জায়গার দিক দিয়াও যান নাই। আর আপনি বলিতেছেন, তাঁহার এখন মনের যেরূপ অবস্থা তাহাতে তাঁহাকে নিজে কোন কথা বলিবার জন্য, কোন স্থানে উপস্থিত হইতে দেওয়া অসম্ভব। সময় বাঁচাইবার অনুরোধে, উভয় পক্ষেরই সামান্য সামান্য কথা আমি এখন আর আলোচনা করিলাম না। এখন আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আদালতে জুরির সমক্ষে এই মোকদ্দমা উঠিলে আপনি কি প্রমাণ দিবেন?"

উত্তর দিবার পূর্ব্বে একবার আমূল সমস্ত অবস্থাটা বেশ করিয়া ভাবিয়া লইলাম। মনোরমা ও লীলার কাহিনী একজন নিঃসম্পর্কিত লোক শুনিলে কি বিবেচনা করে তাহা আমি এই প্রথম বুঝিলাম। আমাদের সম্মুখে যে সকল বিকট প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, এতক্ষণে আমার তদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিল। আমি বলিলাম,—"মহাশয় যেরূপ বলিতেছেন, তাহাতে সমস্ত ঘটনা নিশ্চয়ই আমাদের অত্যন্ত বিরোধী বটে।"

তিনি আমাকে বাধা দিয়া বলিতে লাগিলেন,—"কিন্তু আপনি মনে করিতেছেন, এ সকল সত্য ঘটনা; সুতরাং ইহার বিরুদ্ধ ব্যাপার সমূহ সহজেই কার্য্য কারণ দেখাইয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইবে। সে সম্বন্ধেও আমি যাহা বুঝি তাহা বলি শুনুন। বিচারক আপনার অত ব্যাখ্যা, অত মীমাংসা শুনিয়া কখনই কার্য্য করিবেন না। তিনি ঘটনাটি শুনিয়া সহজেই যাহা বুঝা যায়, তাহাই বুঝিবেন ও তদনুযায়ী বিচার করিবেন। মনে করুন, আপনারা যাঁহাকে রাণী লীলাবতী বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, তিনি স্বয়ং বলিতেছেন, এক স্থানে তিনি রাত্রিপাত করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রমাণ হইতেছে, তিনি তাহা করেন নাই। আপনি এ বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য, তাঁহার সে সময়ের মনের অবস্থা প্রভৃতির বর্ণনা করিয়া দর্শন শাস্ত্রের তর্ক বাধাইয়া দিলেন। আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, আপনার সে মীমাংসা ভুল; কিন্তু মনে করুন দেখি, বিচারক বাদীর নিজের কথায় অধিক বিশ্বাস করিবেন, না আপনার কূট তর্কে অধিক বিশ্বাস করিবেন?"

আমি বলিলাম,—"কিন্তু নিয়ত চেষ্টা ও যত্ন করিয়া আরও প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে না কি? আমার ও মনোরমা দেবীর কয়েক শত টাকা আছে—"

তিনি আমার মুখের দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিলেন,—"দেবেন্দ্র বাবু, আপনিই একবার বেশ করিয়া অবস্থাটা ভাবিয়া দেখুন না। আপনি রাজা ও চৌধুরী মহাশয়ের প্রকৃতির যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যদিও সত্য বলিয়া আমি স্বীকার করিতেছি না, তথাপি যদি তাহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আপনার নূতন প্রমাণ সংগ্রহ করার

প্রতিকূলে, তাঁহারা প্রাণপণ যত্নে প্রভৃত প্রতিবন্ধক না জন্মাইয়া কখনই স্থির থাকিবেন না। মোকদ্দমার যতদূর ব্যাঘাত জন্মাইতে পারা যায়, তাহা তাঁহারা নিশ্চয়ই জন্মাইবেন, প্রত্যেক কথার উপর আইনের কূট তর্ক উঠিবে এবং কয়েকটী শতের কথা কি বলিতেছেন—সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াও আমাদিগকে হারিয়া বাটী আসিতে হইবে। যে সকল স্থলে আকৃতিগত সাদৃশ্যের গোল থাকে, বর্ত্তমান মোকদ্দমার ন্যায় আনুষঙ্গিক এত গোলমাল না থাকিলেও, তাহার মীমাংসা নিতান্ত কঠিন। আমি এই অতি অসাধারণ কাণ্ডের কোনই মীমাংসা দেখিতেছি না। বস্তুতই দেবেন্দ্র বাবু, এ মোকদ্দমার কোন জুত নাই—ইহা টিকিবে না।"

কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস মোকদ্দমার বেশ জুত আছে এবং ইহা টিকিবে। আমি এ সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম,—"ভাল, অন্য কিরূপ প্রমাণ পাইলে কাজ হইতে পারে বলুন।"

তিনি বলিলেন,—"আর যে প্রমাণে ফল পাওয়া যাইতে পারে তাহা সংগ্রহ করা আপনার সাধ্যাতীত। তারিখগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলে, সহজেই নিশ্চিত ফল পাওয়া যাইত। কিন্তু আমি দেখিতেছি, তাহা সংগৃহীত হওয়াও অসম্ভব। যদি মৃত্যুর তারিখ ও রাণীর কলিকাতা আগমনের তারিখ এতদুভয়ের অনৈক্য দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে কাহাকেও আর কথাটী কহিতে হইত না এবং আমি তখনই বলিতাম, মোকদ্দমা চালাইতে হইবে।"

"এখনও চেষ্টা করিলে তারিখ পাওয়া যাইতে পারে।"

"যে দিন তাহা পাইবেন, সেই দিন আপনার মোকদ্দমার আর এক চেহারা দাঁড়াইবে। যদি এখন তাহা পাইবার কোন সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে আমাকে বলুন, আমি মোকদ্দমার কাগজপত্র তৈয়ার করিতে আরম্ভ করি।"

আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম। গিন্নি-ঝি কিছু বলিতে পারে না, লীলার কিছু মনে নাই, মনোরমা কিছু জানেন না। ইহ জগতে কেবল রাজা ও চৌধুরী মহাশয় ভিন্ন, বোধ হয়, আর কেহই তাহা জানে না। বলিলাম,—"এখনই তারিখ সংগ্রহ করিবার কোন উপায় দেখিতেছি না। এখন অনেক চিন্তা করিয়াও, কেবল রাজা ও চৌধুরী মহাশয় ছাড়া, আর কেহ তাহা জানেন এরূপ মনে করিতে পারিতেছি না।"

এ পর্য্যন্ত করালী বাবুর স্থির গম্ভীর বদনে একবারও হাসি দেখি নাই। এখন তাঁহার মুখে ঈষৎ হাস্য দেখা দিল। তিনি বলিলেন,—"এই দুই জনের সম্বন্ধে আপনার যেরূপ বিশ্বাস, তাহাতে সেস্থান হইতে কৃতকার্য্য হওয়া কতদূর সম্ভব তাহা বুঝিয়া দেখুন। যদি তাঁহারা এই চক্রান্ত দ্বারা রাশীকৃত টাকা হস্তগত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কখনই তাঁহারা এ সম্বন্ধে কোন কথা স্বীকার করিবেন, এমন বোধ হয় না।"

"কিন্তু করালী বাবু, তাঁহাদের উপর বল প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে।"

"কে বল প্রয়োগ করিবে ?"

"কেন, আমি।"

আমরা উভয়েই দাঁড়াইয়া উঠিলাম। তিনি আগ্রহ সহকারে অধিকতর মনঃসংযোগ করিয়া আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। বুঝিলাম যে আমি তাঁহাকে কিয়ৎ পরিমাণে ব্যতি-

ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছি। তিনি বলিলেন,—"আপনি অতিশয় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। দেখিতেছি এ ব্যাপারের মধ্যে নিশ্চয়ই আপনার কোন বিশেষ স্বার্থ মিশ্রিত আছে। আমার তাহা জানিবার কোনই প্রয়োজন নাই; আমি আপনাকে এই মাত্র বলিতেছি যে, যদি কখন আপনি মোকদ্দমা খাড়া করিতে পারেন, তাহা হইলে জানিবেন, আমি আপনাকে সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত সাহায্য করিব। সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে আমি একথাও বলিয়া রাখি যে, যদিই আপনি রাণীর অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া উঠিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার টাকা উদ্ধারের কোন উপায় হইবে, এমন বোধ হয় না। বাঙ্গাল মহাশয়ের বাড়ী নাই, ঘর নাই, তাঁহার ঠিকানা করাই ভার হইবে। আর রাজার দেনা এত বেশী যে এক কপর্দ্দকও আদায় করিতে পারা যাইবে না। আপনি নিশ্চয়ই জানেন—"

আমি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম,—"রাণীর আর্থিক প্রসঙ্গের কোনই আবশ্যকতা নাই। আমি পূর্ব্বেও তাঁহার আর্থিক অবস্থা জানিতাম না; এবং এখনও তাঁহার অর্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছে ভিন্ন আর কিছুই জানি না। আপনি অনুমান করিয়াছেন যে, এ ব্যাপারের মধ্যে আমার কোন বিশেষ স্বার্থ মিশ্রিত আছে, সে কথা সত্য। সে স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে আমার মনোবৃত্তির উত্তেজনা ভিন্ন অন্য কোন কামনামূলক নহে;—" তিনি আমার বাক্য-স্রোত প্রতি রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি আমার অভিপ্রায়ের সন্দেহ করিয়াছেন মনে করিয়া, আমি তখন একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। এজন্য, তাঁহার কথা শুনিবার নিমিত্ত অপেক্ষা না করিয়া বলিতে লাগিলাম,—"আমার স্বার্থের মূলে কোন অর্থ লাভের আকাঙ্ক্ষা নাই। রাণী তাঁহার জন্ম-ভবন হইতে অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায় বিতাড়িত হইয়াছেন; তাঁহার মৃত্যুর খোদিত নিদর্শন তাঁহার মাতৃ-প্রতিমূর্ত্তির পাদদেশে সংস্থাপিত হইয়াছে। কেবল দুই ব্যক্তি এই বিজাতীয় অত্যাচারের নিমিত্ত দায়ী। সেই জন্ম-ভবনের দ্বার, তাঁহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত, পুনরায় উন্মুক্ত হইবে; এবং সর্ব্বসাধরণের সমক্ষে সেই খোদিত নিদর্শন বিনষ্ট হইবে। যদিও বিচারাসান সমাসীন বিচারপতি মহাশয়ের ক্ষমতা বলে তাহা সংসাধিত না হয়, তথাপি আমি স্বীয় ক্ষমতা বলে, আমার নিকট ঐ দুই ব্যক্তিকে তাহাদের দুষ্কৃতির নিমিত্ত দায়ী ও পদাবনত করিবই করিব। আমি এই ব্রতে আমার জীবন সমর্পণ করিয়াছি। যদিও আমি নিঃসহায়, তথাপি ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিলে, নিশ্চয়ই আমার মনোরথ সফল করিব।"

করালী বাবু কোন কথা না কহিয়া, টেবিলের দিকে একটু সরিয়া বসিলেন। তাহার মুখ দেখিয়া আমার বোধ হইল যে তিনি স্থির করিয়াছেন, ভ্রান্ত দুরাকাঙ্ক্ষা হেতু আমার জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এবং আমাকে আর কোনরূপ উপদেশ দেওয়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

আমি আবার বলিলাম,—"আমাদের উভয়ের মনের ভাব উভয়ের জানা থাকিল; কাহার বিশ্বাস সফলিত হয় তাহা ভবিষ্যতে সপ্রাণিত হইবে। সংপ্রতি মহাশয় আমার কথিত বৃত্তান্ত মনঃসংযোগ সহকারে শ্রবণ করায় আমি নিতান্ত কৃতজ্ঞ হইয়াছি। আপনি আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে,আইন সঙ্গত কোন প্রতিকার আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে; মোকদ্দমায় যেরূপ প্রমাণের প্রয়োজন আমাদের তাহা নাই। আর মোকদ্দমা চালাইবার মত অবস্থাও

আমাদের নহে। এ সকল সংবাদ জানিয়াও আমার কিছু লাভ হইয়াছে বলিতে হইবে।"

আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া দ্বার পর্য্যন্ত গমন করিলে, তিনি আমাকে আবার ডাকিয়া হস্তে সেই পূর্ব্ব কথিত পত্র খানি প্রদান করিলেন এবং বলিলেন,—"কিছুদিন পূর্ব্বে ডাকযোগে এই পত্র খানি আমার নিকট আসিয়াছে। এখানি আপনি হাতে করিয়া লইয়া যাইবেন কি? মনোরমা দেবীকে বলিবেন, আমি এ বিষয়ে যে উপদেশ দিলাম তাহা আপনার যেমন বিরক্তিকর হইয়াছে, সম্ভবতঃ তাঁহারও তেমনই অপ্রীতিজনক হইবে; সেজন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত।"

যখন তিনি কথা কহিতেছিলেন, তখন আমি পত্রখানির শিরোনাম পাঠ করিতেছিলাম। তাহাতে লিখিত আছে,"শ্রীমতী মনোরমা দেবী সমীপেষু। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র বসু উকীল মহাশয়ের নিকটে। ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট। কলিকাতা।" সে হাতের লেখা আমি আর কখন দেখি নাই। প্রস্থান কালে আমি করালী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"রাজা প্রমোদরঞ্জন এখনও পশ্চিমে আছেন, কি কোথায় আছেন, আপনি জানেন কি?"

তিনি উত্তর দিলেন,—"আমি তাঁহার উকীলের নিকট শুনিয়াছি, তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।"

আমি প্রস্থান করিলাম। আফিসের বাহিরে আসিয়া সাবধানতার অনুরোধে, কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, চলিয়া যাইব স্থির করিলাম। বিপরীত দিকে, গড়ের মাটের পথে চলিতে লাগিলাম। হাইকোর্ট হইতে ইডনগার্ডেন যাইতে যে পথ আছে তাহার সম্মুখে গিয়া আমি একটু দাঁড়াইয়া চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম হাইকোর্টের কোণে দুইটী লোক দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছে। এক মুহূর্ত্তকাল ভাবিয়া, আমি সে দিক হইতে ফিরিয়া, লোক দুইটীর পার্শ্ব দিয়া, আবার ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিলাম। আমি নিকটস্থ হইলে, একজন একটু সরিয়া গেল, আর একজন সমানই দাঁড়াইয়া থাকিল। কাছ দিয়া যাইবার সময় আমি লোকটার মুখের দিকে ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করিলাম। সন্দেহ ঘুচিয়া গেল, স্পষ্ট চিনিতে পারিলাম, আমি এ দেশ হইতে চলিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে, যে দুই ব্যক্তি আমার অনুসরণ করিয়াছিল এ ব্যক্তি তাহারই একজন।

যদি আমি স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তখনই তাহার সহিত ঝগড়া বাধাইয়া, তাহাকে উত্তম মধ্যম দিয়া, কাইত করিয়া ফেলিতাম। কিন্তু এখন আমার চারিদিক ভাবিয়া কাজ করা আবশ্যক। এখন সেরূপ কার্য্য করিলে আমাকে রাজা প্রমোদরঞ্জনের হাতে পড়িতে হইবে। 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' এই নীতিই এ অবস্থায় আমার অবলম্বনীয়। যে লোকটা চলিয়া গেল; সে যে দিকে গেল আমি সেই দিকেই চলিতে লাগিলাম এবং শীঘ্রই তাহাকে ছাড়াইয়া চলিলাম। ভবিষ্যতে সহজে চিনিতে পারিবার জন্য, তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া রাখিলাম; তাহার পর আমি সেদিক হইতে ফিরিয়া ধীরে ধীরে লাট সাহেবের বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিলাম। লোক দুইটা ক্রমাগতই আমার পিছনে আসিতেছে দেখিলাম। একখানি খালি গাড়ি পাওয়া, অথবা হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের মোড়ে গাড়ির আড্ডা পর্য্যন্ত যাওয়া আমার উদ্দেশ্য। অচিরে একখানি খালি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ি বিপরীত দিক দিয়া আসিতেছে দেখিলাম। কোচম্যান আমাকে

তাহার দিকে চাহিতে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু গাড়ি।" আমি কোন কথা না বলিয়া তাহার গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম এবং তাহাকে বলিয়া দিলাম,—"বৌবাজার"। সে গাড়ি হাঁকাইয়া দিল। সেখানে আর খালি গাড়ি ছিল না। একটা গাড়ীর আড্ডা পর্য্যন্ত না যাইতে পারিলে, আমার অনুসরণকারীদের গাড়ি পাইবার সম্ভাবনা নাই। তাহারা নিরুপায় হইয়া আমার গাড়ীর পিছনে দৌড়িতে লাগিল। কিন্তু সেরূপে তাহারা কতক্ষণ দৌড়িবে? কিছু কাল পরেই তাহারা নিরস্ত হইল। আমি যথাস্থানে পৌছিয়া, গাড়ি হইতে নামিলাম। দেখিলাম তাহারা কেহই সঙ্গে আসিয়া উঠিতে পারে নাই। অনেকক্ষণ এদিক সেদিক করিয়া ঘুরিয়া একটু রাত্রি হইলে, বাসায় ফিরিলাম।

বাসায় আসিয়া দেখিলাম, মনোরমা আমার নিমিত্ত বসিয়া আছেন। লীলা আজি অনেকক্ষণ পরিশ্রম করিয়া একটী প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। আমি বাসায় ফিরিবামাত্র মনোরমা আমাকে সেই প্রবন্ধটী দেখাইবেন স্বীকার করিলে পর, লীলা, তাঁহার অনুরোধে, শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। এখন তাঁহার ঘুম আসিয়াছে। প্রবন্ধের কাগজ হস্তে লইয়া দেখিলাম, সেই মুক্তাফলতুল্য সুন্দর সমশীর্ষ হস্তাক্ষর পূর্ব্বে নিতান্ত দুর্ব্বলতা হেতু, যেরূপ কুৎসিত, বক্র ও বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছিল, এখন ক্রমশঃ তদপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে। রচনার কৌশল ও ভাষার ভঙ্গী দেখিয়া মানসিক শক্তি যে পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে সবিশেষ সুদৃঢ় হইয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে স্থির করিলাম। লীলার ক্রমোন্নতি দেখিয়া, অপার আনন্দ সহকারে, আমি বার বার মনে মনে বিধাতার চরণোদ্দেশে প্রণাম করিলাম। তাহার পর নিতান্ত অস্ফুট স্বরে মনোরমাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলাম। পার্শ্বের ঘরেই লীলা নিদ্রাগত আছেন; একটু উচ্চ শব্দ হইলে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা।

যতক্ষণ আমি করালী বাবুর সহিত কথোপকথনের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলাম, ততক্ষণ মনোরমার মুখের কোন ভাবান্তর দেখিলাম না। কিন্তু যখন আমি সেই লোক দুইটার কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম, এবং রাজা ফিরিয়া আসিয়াছেন এ সংবাদ জানাইলাম, তখন তাঁহার মুখের নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাব দেখিলাম।

তিনি বলিলেন,—"নিতান্ত কুসংবাদ; দেবেন্দ্র, বড়ই মন্দ কথা। তার পর।"

আমি বলিলাম,—"তার পর বলিবার আর কোন কথা নাই; কিন্তু তোমাকে দিবার একটা সামগ্রী আছে।" এই বলিয়া করালী বাবু প্রদত্ত সেই পত্রখানি তাঁহাকে প্রদান করিলাম। তিনি পত্রের শিরোনাম পাঠ করিয়াই কে পত্র লিখিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলেন।

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"কে পত্র লিখিয়াছে, চিনিতে পারিয়াছ কি?"

তিনি উত্তর দিলেন,—"খুব চিনিয়াছি—জগদীশনাথ চৌধুরী এ পত্রের লেখক।"

এই কথা বলিয়া তিনি পত্রের গালার মোহর ভাঙ্গিয়া তাহা খুলিয়া ফেলিলেন এবং পত্র বাহির করিয়া তাহা পাঠ করিলেন। পাঠকালে, সম্ভবতঃ ক্রোধাতিশয্য হেতু, তাঁহার মুখ ও চক্ষু আরক্ত বর্ণ হইয়া উঠিল। পাঠ সমাপ্ত হইলে তিনি আমাকে তাহা পাঠ করিতে দিলেন। তাহাতে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত ছিল,—

"মহীয়সী মনোরমা সুন্দরি! আপনার অতুলনীয়, মহোচ্চ গুণ সমূহে বিমুগ্ধ হইয়া, অদ্য আমি আপনাকে দুইটী হৃদয়তৃপ্তিকর আশ্বাসের কথা বলিতে অগ্রসর হইতেছি। কোন ভয় নাই! আপনার স্বাভাবিক সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি-বৃত্তি পরিচালনা করিয়া আপনি নিভৃত-নিবাসে কালাতিপাত করিতে থাকুন; কদাপি বিপদাকীর্ণ প্রকাণ্ড লোক-রাজ্যে প্রবেশ করিবার প্রয়াস করিবেন না। ইহ সংসারে আত্মত্যাগের ন্যায় মহৎ কার্য্য আর কিছুই নাই; আপনি তাহাই অবলম্বন করুন। আত্মীয় সঙ্গে একান্ত বাস চির নবীনতায় ও সজীবতায় পরিপূর্ণ; আপনি স্বচ্ছন্দে ও নির্ব্বিঘ্নে তাহাই সম্ভোগ করুন। সুন্দরী-কুলোত্তমে! মানব-জীবনের বিপদ-বাত্যা সমূহ কখনই নির্জ্জন বাসরূপ অধিত্যকাকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে না; আপনি সানন্দে সেই উপত্যকায় বাস করিতে থাকুন।

"আপনি যদি এই প্রণালীর অনুবর্ত্তিনী হন, তাহা হইলে আমি আপনাকে অভয় দিতেছি, আপনার কখনই কোন বিপদ ঘটিবে না। আর কোন অভিনব বিষাদ-ভারে আপনার অতি কোমল মনোবৃত্তি সমূহ কদাপি নিপীড়িত হইবে না; আপনাকে আর কেহই উত্যক্ত করিবে না এবং আপনার নির্জ্জন নিবাসের সুন্দরী সঙ্গিনীর কেহই আর অনুসন্ধান করিবে না। আপনার হৃদয়মধ্যে তিনি নূতন আশ্রয় স্থান লাভ করিয়াছেন। অমূল্য—অমূল্য আশ্রয় স্থান। আমি তাঁহার এই অপূর্ব্ব সৌভাগ্যের হিংসা করি।

"আর একটী স্নেহপূর্ণ সাবধানতার কথা জ্ঞাপন করিয়া, আমি আপনার উদ্দেশে এই লিপি রচনারূপ পরম প্রীতিপদ কার্য্য হইতে আপাততঃ অবসর গ্রহণ করিব। আপনি সম্প্রতি যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা অতিক্রম করিয়া আর একপদও অগ্রসর হইবেন না। কাহাকেও কোন রূপ ভীতি প্রদর্শনের প্রযত্ন করিবেন না। আপনার সুবিধা লক্ষ্য করিয়া, আমি আমার এই কর্ম্মময় জীবন, অপরিসীম উদ্যমশীলতা এবং অতলস্পর্শী অভিসন্ধি সমূহকে দমিত ও অবনত রাখিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে কালপাত করিতেছি। আমাকে কোন মতেই পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতারিত করাইবেন না। যদি আপনার কোন অপরিণত-বুদ্ধি, উদ্ধত বন্ধু থাকেন, আপনি তাঁহার অত্যনুরাগকে মন্দীভূত করিয়া দিবেন। যদি দেবেন্দ্র বাবু কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন, আপনি তাঁহার সাহত বাক্যালাপ করিবেন না। আমি আত্ম-পরিগৃহীত পন্থায় পরিভ্রমণ করিতেছি এবং প্রমোদ-রঞ্জন আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন। যে দিন দেবেন্দ্র বাবু আমার সেই পথবর্ত্তী হইবেন, সেই দিন তাঁহার সকলই ফুরাইবে।"

এই পত্রের শেষভাগে বহুবিধ অঙ্কশোভিত এক 'জ' ভিন্ন অন্য কোন প্রকার নাম লিখিত ছিল না। নিতান্ত ঘৃণার সহিত পত্রখানি দূরে নিক্ষেপ করিয়া আমি বলিলাম,—"এ ব্যক্তি যখন তোমাকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা করিতেছে, তখন সে নিশ্চয়ই নিজে বিশেষ ভয় পাইয়াছে।"

মনোরমার ন্যায় নারী যে এ পত্র আমারই মত ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিয়াছেন, এ কথা বলাই বাহুল্য। পত্রের ভাষার ভাব ও তন্মধ্যস্থ প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা সূচক সম্বোধন বাক্য সমূহ তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি নিতান্ত ক্রুদ্ধ স্বরে আমাকে বলিলেন,—"দেবেন্দ্র! যদি কখন এই দুইটা নররূপী পিশাচ তোমার হাতে পড়ে, আর যদি কোন কারণে তাহাদের একজনকে

তোমার ক্ষমা করিতে হয়, তাহা হইলে তোমার নিকট আমার এই মিনতি তুমি যেন চৌধুরীটাকে কখন ছাড়িও না।"

আমি নিক্ষিপ্ত পত্র পুনরায় তুলিয়া লইয়া বলিলাম,—"সময় উপস্থিত হইলে, তোমার কথা সহজেই মনে পড়িবে বলিয়া, আমি পত্র খানি যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতেছি।"

মনোরমা বলিলেন,—"কিন্তু হায়! সে সময় কি কখন উপস্থিত হইবে? আজি করালী বাবু যে কথা বলিয়াছেন, পরে পথে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার পর আমাদের আর কোন শুভ সংঘটনের আশা করাই অন্যায়।"

"আজিকার কথা ছাড়িয়া দেও মনোরমা। অপর এক ব্যক্তিকে আমাদের হইয়া কাজ করিতে অনুরোধ করা ভিন্ন, আজি তো আর কিছুই করা হয় নাই। কালি হইতে আমার দিন গণনার আরম্ভ—"

"কেন? কালি হইতে কেন?"

কারণ কালি হইতে আমি নিজে কাজ করিতে আরম্ভ করিব।"

"কিরূপে?"

"আমি কালি ভোরের গাড়িতে কালিকাপুর যাইব, এবং বোধ করি, রাত্রেই ফিরিব।"

"কালিকাপুরে?"

"হাঁ। করালী বাবুর আফিস হইতে আসিবার সময় আমি সমস্ত বিষয়টা বেশ করিয়া বিবেচনা করিয়াছি। তাঁহার একটা কথার সঙ্গে আমার মনের ঠিক ঐক্য হইয়াছে। লীলা কোন্ দিন রাজবাটী হইতে যাত্রা করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন, তাহা স্থির করিবার জন্য আমাকে প্রাণপণে যত্ন করিতে হইবে। এই খুব পাকা চক্রান্তের মধ্যে এই স্থানটী নিতান্ত কাঁচা আছে এবং এই তারিখটা বাহির করিতে পারিলেই, লীলা যে এখনও জীবিতা আছেন তাহা নির্ব্বিবাদে সপ্রমাণিত হইয়া যাইবে।"

মনোরমা বলিলেন,—"তুমি মনে করিতেছ, তারিখ জানিতে পারিলে, স্থির বুঝিতে পারিবে যে, ডাক্তারের লিখিত বৃত্তান্তানুসারে লীলার মৃত্যুর পরও, লীলা সজীব অবস্থায় কালিকাপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন?"

"ঠিক তাই।"

"লীলা যে পরেই আসিয়াছেন, এ কথা তুমি কেন মনে করিতেছ? লীলা তো নিজে এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতেছেন না।"

"কিন্তু গারদের অধ্যক্ষ বলিতেছেন যে, ২৭শে তারিখে তাঁহাকে গারদে লইয়া গিয়াছিল। এক রাত্রির অপেক্ষা অধিককাল যে চৌধুরী তাঁহাকে অচেতন করিয়া রাখিতে পারিয়াছিল, ইহা আমার কোন মতেই সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আমার অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই ২৬শে কালিকাপুর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। এ দিকে ডাক্তারের প্রমাণানুসারে ২৫শে তাঁহার মৃত্যু হইয়া গিয়াছে, দেখা যাইতেছে। এ কথা যদি আমরা প্রমাণ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইতে আর কোনই অপেক্ষা থাকিবে না।"

"ঠিক কথা, আমি এখন বুঝিয়াছি; কিন্তু এ প্রমাণ সংগ্রহ করিবার উপায় কি?"

"নিস্তারিণী ঠাকুরাণীর বর্ণনা পাঠে আমার দুইটী উপায়ের কথা মনে হইয়াছে। যে দিন লীলা কালিকাপুর হইতে চলিয়া আইসেন, সেই দিনই নিস্তারিণী ডাক্তার বিনোদ বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সুতরাং ডাক্তার বাবুর সে তারিখের কথা মনে থাকাই সম্ভব। তার পর সেই দিনই রাজা রাত্রিকালে গাড়ি

হাকাইয়া যে ষ্টেশনে গিয়াছিলেন, সেখানকার যে স্থানে তিনি ছিলেন, তথায় সন্ধান করিলেও তারিখ পাওয়া যাইতে পারে। হউক আর না হউক, এ জন্য চেষ্টা করিয়া দেখা আবশ্যক। আমি দৃঢ় সংকল্প করিয়াছি, এ চেষ্টা না করিয়া কখনই ক্ষান্ত হইব না।”

“দেবেন্দ্র আমি এখন মন্দটাই ভাবিতেছি। কিন্তু যদি নিয়তই মন্দ ভিন্ন ভাল ফল দেখা না যায়, তখন আর আমি মন্দের জন্য আশঙ্কা করিব না। মনে কর যদি এ উপায়ে কিছুই সন্ধান পাওয়া না যায়,—যদি কালিকাপুরে কোন লোক কিছুই বলিতে না পারে?”

“তাহা হইলেও হতাশ হইব না। এই কলিকাতায় দুইটী লোক আছে, তাহারা নিশ্চয়ই সকল কথা জানে। একজন রাজা প্রমোদরঞ্জন, আর একজন জগদীশ চৌধুরী! যাহারা নিরপরাধ ও এ চক্রান্তে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত তাহাদের সে তারিখের কথা মনে না থাকিতে পারে; কিন্তু যাহারা পাপী, তাহারা এ কথা কখনই ভুলিবে না। যদি আমি কোন উপায়েই কৃতকার্য্য না হই, তখন আমি ঐ দুই ব্যক্তির এক জনের নিকট হইতেই হউক, অথবা উভয়ের নিকট হইতেই হউক, জোর করিয়া এ কথা আদায় করিব।”

মনোরমা নিতান্ত উৎসাহের সহিত বলিলেন,—‘যদি জোর করিতে হয়, তাহা হইলে আগেই চৌধুরীকে ধর।”

আমি বলিলাম,—“না মনোরমা, অগ্রে যে স্থানে বল-প্রয়োগে অধিকতর ফল লাভের সম্ভাবনা আছে, সেই স্থানেই চেষ্টা আরম্ভ করিতে হইবে। আগে রাজাকে ধরিতে হইবে, তাহার পর চৌধুরীকে ধরিব। চৌধুরীর জীবনের মধ্যে লুকাইবার মত কোন কাঁচা কথা আমরা এখনও জানি না। কিন্তু আমরা জানি, রাজার জীবনে নিশ্চয়ই একটা সর্ব্বনাশ জনক রহস্য আছে,—”

অমনই মনোরমা বলিয়া উঠিলেন,—“তুমি মুক্তকেশী সংক্রান্ত সেই অজ্ঞাত রহস্যের কথা বলিতেছ?”

“হাঁ, সেই রহস্য। সেই উপায়েই আমি তাহাকে কায়দা করিব, তাহার পদ-প্রতিষ্ঠা নষ্ট করিয়া দিব, তাহাকে আমার পদাবনত করিয়া আনিব, এবং তাহার এই অতি ঘৃণিত দুষ্ক্রিয়া জগৎ সমক্ষে ধরিয়া দিব। কেবল অর্থ লাভের অভিসন্ধি ব্যতীত, নিশ্চয়ই আরও কোন কারণের বশবর্ত্তী হইয়া রাজা চৌধুরী মহাশয়ের সহিত একমতে, এই ভয়ানক কুক্রিয়া সাধিত করিয়াছেন, ইহা আমার স্থির বিশ্বাস। তুমি স্বকর্ণে শুনিয়াছ, রাজা চৌধুরীকে বলিয়াছেন যে, তাঁহার স্ত্রী যাহা জানে তাহাতেই তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে পারে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে মুক্তকেশীর রহস্য প্রচার হইলে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে এ কথাও তুমি স্বকর্ণে শুনিয়াছ?”

“হাঁ, তাতো আমি শুনিয়াছি বটে!”

“মনোরমা, আমার অন্য সকল চেষ্টা বিফল হইলেও, আমি যেমন করিয়া হউক, এই রহস্য প্রকাশ করিব। আমার সেই ভূতপূর্ব্ব সংস্কার এখনও আমার অস্থি মজ্জায় মিশিয়া রহিয়াছে। আমার এখনও বিশ্বাস যে, সেই শুক্লবসনা সুন্দরী আমাদের এই তিনটী জীবনের নেত্রী। কালপূর্ণ হইয়া আসিতেছে; আমরা নিরূপিত পরিণামের নিকটস্থ হইতেছি। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যে, পরলোকগতা মুক্তকেশী এখনও অঙ্গুলিসঙ্কেতে আমাকে সেই পরিণামের পথ দেখাইয়া দিতেছেন।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পর দিন প্রাতেই হুগলি জেলার উদ্দেশে যাত্রা করিলাম এবং বৈকালে বিনোদ বাবুর বাটীতে উপনীত হইলাম। তাঁহার সহিত দেখা ও কথাবার্ত্তা হইল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। রাণী যে দিন চলিয়া আইসেন, সেই দিনই রাজবাটী হইতে ডাক্তার বাবুকে ডাকিতে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা হেতু, তিনি সে দিন রাজবাটীতে যাইতে পারেন নাই। কয়দিন পরে তিনি পুনরায় মনোরমা দেবীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ঠিক মনে নাই। মধ্যে কয়দিন অতীত হওয়ার পর, ডাক্তার বাবু রাজবাটীতে আসিয়াছিলেন তাহা ঠিক জানিতে পারিলেও রাণীর যাত্রার তারিখ স্থির করিতে পারা যাইত। নিস্তারিণীর মন সে সময়ে নানা কারণে নিতান্ত অস্থির ছিল। রাণী চলিয়া আসার কয়দিন পরে, তাঁহার মৃত্যু সংবাদ নিস্তারিণীর হস্তগত হয় এবং কয়দিন পরে সে সংবাদ মনোরমা দেবীকে জানান হয়, তাহা তিনি ঠিক করিয়া রাখিতে পারেন নাই; এরূপ সময়ে, এরূপ কুসংবাদ পাইয়া চিত্ত স্থির রাখা সম্ভবও নয়। এদিকে কোন সন্ধান পাইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, আমি রাজপুরে অনুসন্ধান করিবার সংকল্প করিলাম। রাজপুরে উপস্থিত হইয়া, রাজা গাড়ি বিদায় করিয়া দেন। কোন্ তারিখে সেখানে তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহা যদি সন্ধান করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই রাণীর যাত্রার তারিখও ঠিক জানিতে পারা যাইবে। কিন্তু যখন কুপড়তা হয়, তখন কোন দিকেই সুবিধা হয় না। রাজা সেখানে কবে আসিয়াছিলেন, এ কথা কে মনে করিয়া রাখিবে? সেখানে কোনই সন্ধান করিতে পারিলাম না। রাজার সঙ্গে যদি অনেক লোক জন থাকিত, রাজার জন্য যদি গাড়ি রিজার্ভ করিতে হইত, যদি তাঁহার অনেক জিনিষ পত্র সে দিন বুক করা হইত, তাহা হইলে ষ্টেশনের আফিসে তাহার কিছু লেখাপড়া থাকিত; সুতরাং তারিখ পাওয়ার বিশেষ সুবিধা হইত। কিন্তু রাজা উন্মাদের ন্যায় ভাবে, পলাতক ব্যক্তির ন্যায় একাকী বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ ষ্টেশনে আমার উদ্দেশ্য বিষয়ক কোন সহায়তা হইল না।

কোন দিকে কিছুই হইল না; এ দিকে গাড়িরও এখন দেরি আছে দেখিয়া মনে করিলাম একবার কালিকাপুরের রাজবাটীতে যাই। সেখানকার মালীটা রাজার সঙ্গে রাজপুর পর্য্যন্ত আসিয়াছিল; সে হয় ত, কোন সন্ধান বলিলেও বলিতে পারে। সেখানেও হতাশ হইলে এদিকের চেষ্টা বন্ধ করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে হইবে। যে গাড়িতে করিয়া আমি কালিকাপুর আসিলাম, রাজবাটীর বহু দূর হইতেই আমি তাহা ছাড়িয়া দিলাম। বড় রাস্তা ছাড়িয়া গলি রাস্তায় প্রবেশ করার পর দেখিতে পাইলাম, আমার আগে আগে একটা লোক, একটা ব্যাগ হাতে করিয়া দ্রুতপদে রাজবাটীর দিকে চলিয়া যাইতেছে। তাহার চেহারা দেখিয়াই আমার তাহাকে একটা ছেঁড়া মোক্তার বলিয়া মনে হইল। তাহাকে দেখিয়া আমি একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে করিলাম, উভয়ের মধ্যস্থ ব্যবধান আরও অধিক হইয়া যাউক। সে লোকটা আমাকে দেখিতে পায়

নাই; সে আপন মনে চলিতে লাগিল এবং ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল। কিয়ৎকাল পরে আমি রাজবাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াও সে লোকটাকে দেখিতে পাইলাম না; সম্ভবতঃ সে প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকিবে।

আমি দরজার নিকটস্থ হইয়া দুইটী স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলাম; একটি প্রাচীনা, অপরটীকে দেখিয়াই আমি, মনোরমার বর্ণনা স্মরণ করিয়া, বুঝিতে পারিলাম, সেই রামী। আমি সেই প্রাচীনা স্ত্রীলোককে, রাজা বাটীতে আছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলে, সে ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল। গেল জ্যৈষ্ঠ মাসে রাজা চলিয়া গিয়াছেন, ইহা ছাড়া তাহারা আর কোন কথাই বলিতে পারিল না। রামী কেবল কারণে অকারণে হাসিতে লাগিল, আর অনর্থক ঘাড় নাড়িতে লাগিল। আমি প্রাচীনাকে আবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, রাজা কখন গেলেন? কেন গেলেন? কেমন করিয়া গেলেন? তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিলাম যে, হঠাৎ রাত্রিকালে রাজা ঘোররবে চীৎকার করিয়া উঠায় বৃদ্ধার নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং রাজার বিকট ভাব দেখিয়া সে অত্যন্ত ভীত হয়। কিন্তু সে যে কোন্ তারিখ তাহা তাহার একটুও মনে নাই।

সেদিক হইতে ফিরিয়া, আমি বাগানের দিকে মালীর সহিত দেখা করিতে চলিলাম। আমি তাহাকে জ্ঞাতব্য কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে আমার প্রতি একটু সন্দিগ্ধ ভাবে দৃষ্টিপাত করিল। আমি নিস্তারিণী ঠাকুরাণীর নাম করায় তাহার মনে কতকটা বিশ্বাসের সঞ্চার হইল এবং সে আমার কথার উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইল। বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন; আমার চেষ্টার অন্যত্র যেমন ফল হইতেছে, এখানেও তাহাই হইল। মালী তারিখ ঠিক করিয়া বলিতে নিতান্তই অক্ষম।

যখন আমি মালীর সঙ্গে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছি, তখন সেই ব্যাগধারী লোকটা, ধীরে ধীরে রাজবাটী হইতে বাহির হইয়া ক্রমশঃ আমাদের দিকে আসিতে লাগিল। তাহার অভিসন্ধি সম্বন্ধে আমার মনে পূর্ব্বেই একটু সন্দেহ হইয়াছিল। মালীকে ঐ লোকটার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় মালী হয়ত মিথ্যা করিয়া নয়ত সত্যই, কোন কথা জানে না বলিল। তাহাতে আমার মনের সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল। তখন আমি, লোকটার সহিত কথা কহিয়া, সকল সন্দেহ পরিষ্কার করিবার অভিপ্রায় করিলাম। অপরিচিত স্থলে প্রথমে অন্য কোন কথা জিজ্ঞাসা করা অন্যায় বোধে, আমি তাহার নিকটস্থ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, রাজবাটী বাহিরের লোকে দেখিতে পায় কি না?

তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইল, সে আমাকে বিলক্ষণ জানে এবং, আমাকে রাগাইয়া দিয়া, আমার সহিত ঝগড়া বাধান তাহার অভিপ্রায়। কিন্তু সে যেরূপ অতিরিক্ত বিরক্তিকর বাক্য বলিল, তাহা শুনিয়া রাগ হওয়া দূরে থাক, হাসি পায়। আমি প্রত্যুত্তরে অতিরিক্ত বিনয় ও ভদ্রতার কথা বলিলাম এবং তাহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম। আমি মনে মনে বুঝিলাম যে, করালী বাবুর কার্য্যালয় হইতে ফিরিবার সময়ে রাজার গুপ্তচরেরা আমাকে চিনিতে পারিয়া রাজাকে অবশ্যই সে সংবাদ জানাইয়াছে। রাজা তৎক্ষণাৎ বুঝিয়াছেন যে, আমি যখন এক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি, তখন অবশ্যই কালিকাপুরে সন্ধান না করিয়া কখনই ছাড়িব না। সেই জন্যই এ ভগ্নদূতের আগমন। যদি

কোনক্রমে লোকটা আমার সহিত ঝগড়া বাধাইতে পারিত তাহা হইলে, আর কিছু না হইলেও, আপাততঃ আমার নামে অনধিকার প্রবেশ, গালি দেওয়া প্রভৃতি নানাপ্রকার সত্য মিথ্যা দাবিতে নালিশ রুজু করিয়া, কয়েকদিনের জন্ত আমাকে মনোরমা ও লীলার কাছ ছাড়া করিয়া রাখিতে তো পারিত।

কালিকাপুর হইতে ষ্টেশনে আসিবার সময়ে আমার পশ্চাতে চর লাগিয়া থাকিবে বলিয়া আমি মনে করিলাম; কিন্তু কোনই সন্দেহজনক কাণ্ড দেখিলাম না। সে ছেঁড়া বাবুটাকেও কোথাও দেখিতে পাইলাম না। কলিকাতায় আসিয়াও কোন দিকে কোন লোক আমার অনুসরণ করিতেছে, এরূপ বোধ হইল না। আমি ষ্টেশন হইতে হাঁটিয়া বাসায় আসিলাম এবং বিশেষ সাবধানতার সহিত চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া, বাসায় প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, আমার অনুপস্থিতি কালের মধ্যে মনোরমার ভয় পাইবার কোনই কারণ ঘটে নাই। আজিকার অনুসন্ধানের ফলাফল মনোরমা জানিতে চাহিলে, আমি তাঁহাকে অকাতর ভাবে সমস্ত কথা জানাইলাম। আমার অকাতর ভাব দেখিয়া তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

বস্তুতই আমার অনুসন্ধানের নিষ্ফলতা আমাকে একটুও অভিভূত করিতে পারে নাই। কর্ত্তব্যবোধে আমি এ প্রযত্ন করিয়াছি মাত্র, কোন বাঞ্ছনীয় ফলের প্রত্যাশা করি নাই। আমার তখন মনের যেরূপ গতি, তাহাতে ক্রমে ক্রমে যতই রাজার সহিত আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিরোধিতার অধিকতর আবশ্যকতা উপস্থিত হইতে লাগিল, ততই আমার উৎসাহ অধিকতর বর্দ্ধিত হইতে থাকিল। আমার উচ্চতর মনোবৃত্তির সহিত বৈরনির্য্যাতন প্রবৃত্তি বহুদিন হইতেই মিশিয়া আছে। যে ব্যক্তি লীলার পাণিগ্রহণ করিয়াছে সেই পাষণ্ডকে তাহার পাপোচিত প্রতিশোধ দিতে আমার আন্তরিক অনুরাগ। সত্যের অনুরোধে আমার স্বীকার করা আবশ্যক যে, প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি আমার হৃদয়ে বিশেষ বলবান্ থাকায়, লীলার ভাবী শুভকল্পে আমার এতাদৃশ প্রবল অনুরাগ ও উৎসাহ জন্মিয়াছে। কিন্তু এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, স্বীয় ভবিষ্যৎ সুখ ও স্বার্থের আকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত হইয়া আমি উপস্থিত ব্যাপারে এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও যত্নশীল হই নাই। রাজাকে আয়ত্ত করিতে পারিলে, অথবা তাঁহার এই নিদারুণ দুষ্কৃতি জগৎ সমক্ষে ধরিয়া দিতে পারিলে, ভবিষ্যতে লীলার উপর তাঁহার আর কোনই অধিকার থাকিবে না, এবং কেহই আর অতঃপর লীলাকে আমার চিরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে সমর্থ হইবে না, এই দারুণ লোভজনক আশা আমার এতাদৃশ অত্যনুরাগের মূলীভূত নহে। লীলার তদানীন্তন দুরবস্থা, তাঁহার মনের সেই বিজাতীয় অবসন্নতা ও অপ্রসাদ প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহার প্রতি আমার যে অপরিসীম প্রেমানুরাগ ছিল, তাহা শতগুণে সংবর্দ্ধিত হইয়াছে এবং পিতা বা ভ্রাতা, আপনার কন্যা বা ভগ্নীকে এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন দেখিলে যেরূপ বাৎসল্য-পূর্ণ হৃদয়ে কাতর ও ব্যথিত হয়, আমার হৃদয়ও তাহাই হইয়াছে। লীলা আমার জীবন-সঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী হইবেন কি না, সে ভাবনা আমি এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়াছি। সে লোভ—সে আকাঙ্ক্ষা আমার এক্ষণে নাই। লীলার এ কষ্ট—লীলার এ দুরবস্থা আমার অসহ্য। আমার স্নেহপ্রবণ বাৎসল্যময় হৃদয়ের এখন এই ভাব।

হুগলী হইতে ফিরিয়া আসার পরদিন,

মনোরমাকে আমার নিজ প্রকোষ্ঠে ডাকিয়া আনিয়া, রাজা প্রমোদরঞ্জনকে আয়ত্তাধীন করিবার নিমিত্ত, মনে মনে যে প্রণালী অবলম্বন করিব স্থির করিয়াছি, তৎসমস্ত জানাইলাম। এতকাল মুক্তকেশীর সহায়তায় রাজার জীবনের সেই অপরিজ্ঞাত রহস্য জ্ঞাত হইবার আশা ছিল; কিন্তু মুক্তকেশী এখন নাই। এখন সেই দুর্জ্ঞেয় সংবাদ জ্ঞাত হইতে হইলে মুক্তকেশীর জননী-সংক্রান্ত পারিবারিক ও অন্যান্য সংবাদ সমূহ অগ্রে সংগ্রহ করিতে না পারিলে তাহাকে কায়দা করিয়া কথা বাহির করিতে পারা যাইবে, এমন বোধ হয় না। অতএব মুক্তকেশীর প্রধান ও অকৃত্রিম আত্মীয় রোহিণীর নিকটে সর্ব্বাগ্রে সন্ধান করা আবশ্যক; কিন্তু রোহিণী কোথায় থাকেন তাহা আমাদের জানা নাই। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মনোরমা রোহিণীর ঠিকানা নির্ণয় করিবার যে এক উপায় বলিলেন, তাহা আমার মনে বেশ সদ্যুক্তি বলিয়া বোধ হইল। তিনি বলিলেন, তাঁহার খামারে তারামণির নিকটে পত্র লিখিলে এ বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। কিরূপে রোহিণীর নিকট হইতে মুক্তকেশী বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। কিন্তু মুক্তকেশী তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যাওয়ার পর, রোহিণী ঠাকুরাণী যে নানা স্থানে নানা প্রকারে তাহার সন্ধান করিয়াছেন, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। মুক্তকেশী আনন্দধাম যেরূপ ভাল বাসিতেন, তাহাতে আনন্দধামের নিকটস্থ প্রদেশে যে রোহিণী সর্ব্বাগ্রেই সন্ধান করিয়াছেন, তাহা এক প্রকার নিশ্চয় কথা। যে কোন সময়ে মুক্তকেশীর সংবাদ প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাহা জানাইবার জন্য, রোহিণী নিশ্চয়ই সেখানকার পরিচিত লোকদের নিজ ঠিকানা জানাইয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং রোহিণীর ঠিকানা তারামণির জানিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

তৎক্ষণাৎ তারামণিকে মনোরমা এক পত্র লিখিলেন। তাহার পর মনোরমার নিকট হইতে আমি রাজার বাল্য জীবন ও পরিবারিক বৃত্তান্ত জানিয়া লইতে আরম্ভ করিলাম। তিনি বিশেষ কিছু জানিতেন না, যাহাও জানিতেন তাহাও শুনা কথা মাত্র। আমিও তাহাই জানিয়া লইলাম।

রাজা প্রমোদরঞ্জনের পিতা রাজা বসন্তরঞ্জন আজন্ম কুব্জ; সুতরাং নিতান্ত কুৎসিত-দর্শন ছিলেন; এজন্য তিনি লোকসমাজে বাস করিতে বড় ভাল বাসিতেন না। প্রমোদরঞ্জন তাঁহার একমাত্র পুত্র। বসন্তরঞ্জন, লোকালয়ের বহির্ভূত থাকিয়া, নিরন্তর সংগীত আলোচনায় কালাতিপাত করিতেন, তাঁহার রাণী এবং আবশ্যকমত দাস-দাসী ব্যতীত, অন্য কোন লোক তাঁহাদের সংস্রবে আসিত না। তাঁহারা কালিকাপুরের রাজ-ভবনে বনবাসী ব্যক্তির ন্যায় বাস করিতেন; কেহই সাহস করিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রয়াসী হইত না।

কেবল স্থানীয় ভট্টাচার্য্য মহাশয় একবার তাঁহাদিগকে নিতান্ত জ্বালাতন করিয়াছিলেন। তিনি লোক পরম্পরায় শ্রুত হইয়াছিলেন যে, রাজা দেব-দেবী মানেন না, পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধ করেন না—নিতান্ত নাস্তিক। রাজা এরূপ পাষণ্ড হইলে বড়ই সামাজিক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা মনে করিয়া, তিনি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ঘোর তর্ক বাধাইয়া দেন। কিয়ৎকাল রাজার সহিত বাক্যালাপ করিয়া তিনি রাজাকে বস্তুতই ঘোর নাস্তিক ও পাষণ্ড বলিয়া স্থির করেন এবং তাঁহার দেব-বিদ্বেষ বাক্য শ্রবণ করিয়া 'রাম রাম' বলিতে বলিতে

কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া প্রস্থান করেন। এই ঘটনার পর সন্নিহিত তাবৎ জনপদে রাজার অত্যন্ত দুর্নাম ও কলঙ্ক প্রচারিত হয়। রাজার কখনই কালিকাপুরে বাস করিতে অনুরাগ ছিল না; বিশেষতঃ এই ব্যাপারের পর, তিনি আরও বীতরাগ হইয়া উঠেন এবং পুনরায় পাছে সেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বা অন্য কেহ তাহাকে উত্ত্যক্ত করে, এই আশঙ্কায় রাজা অতঃপর কালিকাপুরের বাস পরিত্যাগ করেন।

কিছু দিন কলিকাতায় বাস করিয়া, তাঁহারা স্বামী স্ত্রীতে পশ্চিম যাত্রা করেন এবং পশ্চিমেই তাঁহাদের মৃত্যু হয়। পশ্চিম প্রদেশেই রাজা প্রমোদরঞ্জনের জন্ম হইয়াছিল। অগ্রে তাঁহার জননী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রমোদরঞ্জন দুই এক বার এদেশে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে সময়, লীলার পিতা ৺প্রিয়প্রসাদ রায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় নাই। পরিচয় হওয়ার পর উভয়ের আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা খুব বাড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তৎকালে প্রমোদরঞ্জনের আনন্দধামে যাতায়াত ছিল না। রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয় তাঁহাকে দুই একবার ৺প্রিয়প্রসাদের সঙ্গে দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে অন্য কোন বিশেষ বৃত্তান্ত তিনি জানিতেন না।

যদিও মনোরমার মুখে এই কয়টী কথা শুনিয়া বিশেষ কোন আশাপ্রদ সংবাদ পাইলাম না, তথাপি ভবিষ্যৎ স্মরণ করিয়া, ইহাও আমার মন্তব্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম।

তারামণির পত্রের উত্তর আসিবার জন্য আমরা ডাক ঘরের ঠিকানা লিখিয়া দিয়াছিলাম। দিন দুই পরে সন্ধান করিয়া দেখিলাম, পত্রের উত্তর আসিয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাই আমাদের প্রতিকূল ছিল, এই মুহূর্ত্ত হইতে সমস্তই আমাদের অনুকূল হইতে লাগিল। তারামণির পত্রে রোহিণীর ঠিকানা ছিল।

আমরা যাহা অনুমান করিয়াছিলাম তাহাই ঠিক। মুক্তকেশী চলিয়া যাওয়ার পর, রোহিণী অনেক দুঃখ করিয়া তারামণিকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন এবং যদি কোন ক্রমে কখন মুক্তকেশীর সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সে সংবাদ তাঁহাকে জানাইবার নিমিত্ত বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেই পত্রে রোহিণীর ঠিকানা লেখা ছিল। সেই ঠিকানা তারা এক্ষণে আমাদের নিকট নকল করিয়া পাঠাইয়াছে। সে ঠিকানা কলিকাতাতেই—আমাদের বাসা হইতে জোর আধ ঘণ্টার পথ।

'বিলম্বে কার্য্য হানি' এই চির প্রচলিত উপদেশ-বাক্য স্মরণ করিয়া আমি পরদিন প্রত্যূষে রোহিণীর সন্ধানে যাত্রা করিলাম। প্রকৃত প্রস্তাবে আমার অনুসন্ধানের অদ্যই রীতিমত আরম্ভ। বলিতে গেলে, আমি যে ভয়ানক সমরে জীবনপাত করিতে সংকল্প করিয়াছি, অদ্যই তাহার প্রাথমিক অনুষ্ঠান।

আমি তারামণির পত্রনির্দ্দিষ্ট ভবন-দ্বারে ডাকাডাকি করার পর, রোহিণী ঠাকুরাণী স্বয়ং আসিয়া আমাকে দরজা খুলিয়া দিলেন। তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না। আমার কি দরকার তিনি জানিতে চাহিলে, শক্তিপুরের আনন্দধামের উদ্যান মধ্যে তাঁহার সহিত রাত্রিকালে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, একথা আমি তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলাম এবং মুক্তকেশী বাতুলালয় হইতে পলায়ন করার পর, আমি কলিকাতার পথে তাঁহার বিশেষ

সাহায্য করিয়াছিলাম, তাহাও তাঁহাকে বলিলাম। তাঁহার সহিত আমার কথাবার্ত্তার আর অধিকার কি আছে? কাজেই আমি এই সকল কথারই খুব করিয়া দোহাই দিলাম। আমি এই সকল কথা বলিলে তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন এবং ঘরের ভিতর আসিয়া বসিতে বলিলেন। আমি মুক্তকেশীর কোন সংবাদ জ্ঞাত আছি মনে করিয়া, তিনি তাহা জানিবার জন্য অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মুক্তকেশীর বৃত্তান্ত আমি যতদূর জানি তাহা ব্যক্ত করিতে হইলে এ ব্যাপারের মধ্যে যে ভয়ানক চক্রান্ত আছে, তাহার কথাও বলিতে হয়। কিন্তু এরূপ অল্প পরিচিত ব্যক্তির নিকট সে সকল রহস্য ব্যক্ত করা কখনই যুক্তি সঙ্গত নহে। যাহাতে মুক্তকেশীর সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন প্রকার অলীক আশার সঞ্চার না হয়, আমি সাবধানতা সহকারে, সেইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম এবং বুঝাইয়া দিলাম যে, যে ব্যক্তির কৌশলে মুক্তকেশীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সে কে তাহাই নির্ণয় করা আমার উদ্দেশ্য। ভবিষ্যতে আমার স্কন্ধে কোন দোষ না স্পর্শে, এই বিবেচনায় আমি বলিলাম যে, মুক্তকেশী কোথায় আছেন তাহা সন্ধান করিবার কোন উপায়ই আমি দেখিতে পাইতেছি না এবং তাঁহাকে যে আর সজীব অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যাইবে, এমন আশাও আমার নাই। আমার বিশ্বাস, দুই ব্যক্তি কৌশল করিয়া মুক্তকেশীকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে। সেই দুই ব্যক্তির দ্বারা আমি ও আমার কয়েকজন একান্ত আত্মীয় ব্যক্তিকে মর্ম্মান্তিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। অতএব সেই দুই পাষণ্ডকে তাহাদের পাপোচিত শাস্তি প্রদান করা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য

বৃদ্ধা রোহিণীর মন এতই চিন্তাকুল হইয়াছিল যে, তিনি প্রথমতঃ আমার বাক্যের মর্ম্ম সুন্দর রূপে প্রণিধান করিতে সক্ষম হইলেন না। আবার আমি তাঁহাকে আমার অভিপ্রায় ধীরভাবে ও পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিলাম। কারণের স্বতন্ত্রতা থাকিলেও এক্ষেত্রে আমাদের উভয়ের লক্ষ্যের যে অবিসংবাদিত একতা আছে তাহার আর সন্দেহ কি? তিনিও তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং যে পাষণ্ডেরা মুক্তকেশীকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাদের শাস্তির জন্য তাঁহার দ্বারা যে কোন সাহায্য সম্ভব তিনি তাহা করিতে সম্মত আছেন বলিলেন। এরূপ স্থলে মূল হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে চেষ্টা করিলে আমার পক্ষে এবং তাঁহার বলিবার পক্ষে সুবিধা হইবে মনে করিয়া, আমি, তাঁহাদের আনন্দধাম হইতে চলিয়া আসার পর এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তৎসমস্ত জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তিনি তাহার উত্তরে যাহা বলিলেন, আমি নিম্নে তাহার মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিতেছি।

তারার খামার হইতে প্রস্থান করিয়া তাঁহারা কলিকাতায় আসিবেন স্থির করেন। কিন্তু রেল গাড়িতে মুক্তকেশীর এরূপ দুর্ব্বলতার লক্ষণ দেখা যায় যে, কলিকাতা পর্য্যন্ত না আসিয়া তাঁহাদিগকে পথিমধ্যে এক ষ্টেশনে নামিয়া, এক সপ্তাহ কাটাইতে হয়। তাহার পর কলিকাতায় আসা হইল এবং রোহিণী পূর্ব্বে যে বাসায় থাকিতেন, সেই বাসায় এক মাস থাকার পর বাড়ীওয়ালার সঙ্গে মনান্তর হওয়ায়, তাঁহাদের বাসা বদল করিতে হয়। নূতন বাসায় যাইতে মুক্তকেশী অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং পাছে কলিকাতায় আবার কেহ সন্ধান পায়, এই ভয়ে সে নিতান্ত ভীত হয়। তাহার সঙ্গে নিয়ত একত্র থাকায়

রোহিণীরও অনেকটা এইরূপ অকারণ ভীতি-প্রবণ স্বভাব হইয়া পড়িয়াছিল। তিনিও আর কলিকাতায় না থাকিয়া, অতঃপর মুক্তকেশীকে সঙ্গে লইয়া স্থানান্তরে গিয়া বাস করিতে মনস্থ করেন। গোপীনাথপুর নামক গ্রামে তাঁহার স্বামী দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন; রোহিণী সেই স্থানেই বাস করিতে মানস করিলেন। সেখানে তাঁহার আত্মীয়-কুটুম্ব ছিল; সুতরাং সেখানে থাকাই বিশেষ সুবিধা। মুক্তকেশী কোন মতেই তাহার মাতার নিকট যাইবে না ও থাকিবে না; কারণ এক বার সেখান হইতে তাহাকে রাজা ধরিয়া লইয়া গিয়া আবার গারদে পূরিয়াছিলেন; এবারও তিনি নিশ্চয়ই পুনঃ পুনঃ সেখানে সন্ধান করিবেন এবং মুক্ত-কেশী তথায় গমনমাত্র আবার ধরা পড়িবে। অতএব তাহাকে সঙ্গে লইয়া রোহিণী গোপী-নাথপুর আসিলেন।

এখানে আসিয়া মুক্তকেশীর কঠিন পীড়া দেখা দিল। লীলাবতী দেবীর সহিত রাজা প্রমোদরঞ্জনের বিবাহ সংবাদ একখানি দুপয়সা দামের খবরের কাগজে দেখিতে পাওয়ার পর হইতে,মুক্তকেশীর পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষা করান হইল। তিনি বলিলেন,—"রোগীর হৃদ্রোগ হইয়াছে।" অনেক দিন পরে মুক্তকেশী একটু ভাল হইল বটে, কিন্তু পীড়া একবারে সারিল না; মধ্যে মধ্যে দেখা দিতে লাগিল। এইরূপে বৎসরা-ধিক কাল কাটিয়া যাওয়ার পর, মুক্তকেশী জেদ ধরিল যে, সে একবার কালিকাপুর যাই-বেই যাইবে এবং যেমন করিয়া হউক, রাণী লীলাবতীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবেই করিবে। এই নিতান্ত অসঙ্গত এবং সম্পূর্ণ বিপজ্জনক অভিসন্ধি পরিত্যাগ করাইবার জন্য রোহিণী যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মুক্ত-কেশী কোন যুক্তির কথাতেই কর্ণপাত করিল না। তাহার এরূপ অভিপ্রায়ের কারণ কি জানিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলে সে বুঝাইয়া দিল যে, ইহ সংসারে তাহার কালপূর্ণ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই; সে এমন কোন কথা জানে, যাহা রাণী লীলাবতীকে গোপনে জানান নিতান্ত আবশ্যক। যে ডাক্তার তাহার চিকিৎসা করিতেছিলেন তিনি বলিলেন যে, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বল-প্রয়োগ করিলে তাহার পুনরায় কঠিন পীড়া হইবে এবং সম্ভবতঃ তাহাতে মৃত্যু ঘটিবে। সুতরাং স্নেহপরায়ণা রোহিণী ঠাকুরাণীকে মুক্তকেশীর বাসনার বশ-বর্ত্তিনী হইয়া চলিতে হইল।

গোপীনাথপুর হইতে হুগলী আসিবার পথে কালিকাপুর অঞ্চলের একটী লোকের সহিত রোহিণীর আলাপ হয়; সে ব্যক্তি বাস স্থান সন্নিহিত সমস্ত প্রদেশ বেশ জানে ও চিনে। তাহারই নিকট হইতে, রোহিণী জানিতে পারিলেন যে, কালিকাপুরের ক্রোশ দুই দূরে শ্যামপুর নামে একটী সামান্য পল্লী-গ্রাম আছে। সেখানে রাজা বা রাজবাটীর লোক যাতায়াত করার খুব অল্প সম্ভাবনা। সুতরাং সেইরূপ স্থানে গিয়া থাকিলে কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না। তিনি, মুক্তকেশীকে সঙ্গে লইয়া, সেই স্থানে এক গৃহস্থের বাটীর মধ্যে একখানি ঘর ভাড়া করিয়া থাকিলেন। এই স্থান হইতে মুক্তকেশী যতবার লীলার সহিত দেখা করিবার জন্য কালিকাপুরের কাষ্ঠের ঘরে যাওয়া আসা করিয়াছিল, ততবারই তাহাকে পায়ে হাঁটিয়া যাতায়াত করিতে হইয়াছিল। দূর নিতান্ত কম নয়—প্রায় দুই ক্রোশ। রাণী ঠাকুরাণীকে মুক্তকেশীর যাহা বলিবার আছে, তাহা পত্র দ্বারা লিখিয়া পাঠাইবার জন্য, রোহিণী ঠাকু-

রাণী তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়াছিলেন; কিন্তু আনন্দধামে লীলাবতী দেবীকে মুক্তকেশী যে নামহীন পত্র লিখিয়াছিল, তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ নাই বলিয়া, সে আর পত্রের উপর কোন মতেই নির্ভর করিতে সম্মত হয় নাই। একাকিনী যাইয়া রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহার দৃঢ় সংকল্প।

যখন যখন মুক্তকেশী, রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশায়, কাঠের ঘরে যাইত, রোহিণী ঠাকুরাণীও তখন তখন তাহার সঙ্গে যাইতেন; কিন্তু তিনি খুব দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, সুতরাং সেখানে কি ঘটিত তাহা তিনি দেখিতে বা জানিতে পারিতেন না। এইরূপে নিত্য সুদূর পথ যাতায়াত করায়, মুক্তকেশীর ভগ্ন স্বাস্থ্য অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং অবশেষে রোহিণী যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাই ঘটিল। আবার মুক্তকেশীর বুকে বেদনা হইল এবং গোপীনাথপুরে তাহার যেমন অসুস্থতা ঘটিয়াছিল, সেইরূপ হওয়ায় মুক্তকেশী শয্যাগত হইয়া পড়িল। এইরূপ অবস্থায়, মুক্তকেশীর উদ্বেগ শান্তির জন্য দয়াময়ী রোহিণী ঠাকুরাণী, মুক্তকেশীর পরিবর্ত্তে স্বয়ং রাণী লীলাবতীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিলেন। তিনি কাঠের ঘরের নিকটস্থ হইয়া রাণীকে দেখিতে পাইলেন না; দেখিলেন একজন হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ প্রবীণ ভদ্রলোক পুস্তক হস্তে অপেক্ষা করিতেছেন। বলা বাহুল্য এই ব্যক্তি জগদীশনাথ চৌধুরী। চৌধুরী মহাশয় অত্যল্পকাল নিবিষ্ট মনে তাঁহাকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি কি এ স্থানে কাহারও সহিত সাক্ষাৎকার প্রত্যাশা করেন?" রোহিণী কোন উত্তর প্রদান করিবার পূর্ব্বেই, তিনি আবার বলিলেন,—"আমি রাণী মাতার একটি কথা একজনকে বলিবার জন্য এখানে অপেক্ষা করিতেছি। কিন্তু যে লোককে সে কথা বলিতে হইবে, তাহার আকৃতির ঐক্য হইতেছে না বলিয়া সন্দেহ হইতেছে।"

এই কথা শুনিবামাত্র রোহিণী নিঃসঙ্কোচে সমস্ত কথা চৌধুরী মহাশয়কে জানাইলেন এবং সানুনয়ে অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহার অভিপ্রায় চৌধুরী মহাশয় ব্যক্ত করিলে দুঃখিনী মুক্তকেশীর হৃদয় অনেক শান্ত হইবে। তিনি বলিলেন, তাঁহার সংবাদ অতি প্রয়োজনীয়; রাণী লীলাবতী দেবীর বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, যদি মুক্তকেশী বা তাঁহার সঙ্গিনী আর অধিক দিন এ প্রদেশে অবস্থান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই রাজা প্রমোদরঞ্জন তাঁহাদের সন্ধান করিতে পারিবেন; সুতরাং অবিলম্বে তাঁহাদের এ স্থান হইতে কলিকাতায় চলিয়া যাওয়া আবশ্যক। রাণী মাতাও শীঘ্রই কলিকাতায় যাইতেছেন। যদি মুক্তকেশী ও রোহিণী ঠাকুরাণী কলিকাতায় গিয়া তাঁহাদের ঠিকানা রাণী মাতাকে লিখিয়া জানান, তাহা হইলে অদ্য হইতে এক পক্ষ কালের মধ্যে তাঁহাদের সহিত রাণী মাতার সাক্ষাৎ ঘটিবে। তিনি বন্ধুভাবে মুক্তকেশীকে এই হিতপরামর্শ জানাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মুক্তকেশী তাঁহাকে অপরিচিত জানিয়া, এরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন যে, তিনি নিকটস্থ হইয়া কথাবার্ত্তা কহিবার কোনই সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই।

এই সকল কথা শুনিয়া রোহিণী নিতান্ত ভীত ও কাতর ভাবে বলিলেন যে, নিরাপদে মুক্তকেশীকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়াই তাঁহার প্রধান কামনা; কিন্তু এই বিপদসঙ্কুল স্থান হইতে তাহাকে আপাততঃ স্থানান্তরিত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব; কারণ সে সম্প্রতি সুকঠিন পীড়ায় শয্যাগত। এজন্য চিকিৎসক ডাকা

হইয়াছে কি না, চৌধুরী মহাশয় জানিতে চাহিলেন। তদুত্তরে রোহিণী বলিলেন, "পাছে তাহাতে তাঁহার বৃত্তান্ত প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে তিনি বৈদ্য ডাকিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। তখন চৌধুরী বলিলেন যে, তিনি স্বয়ং একজন ডাক্তার। যদি রোহিণীর আপত্তি না থাকে তাহা হইলে তিনি স্বয়ং যাইয়া মুক্তকেশীর সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থা করিতে সম্মত আছেন। রোহিণী ঠাকুরাণী মনে মনে ভাবিলেন, এই ভদ্রলোক যখন রাণী লীলাবতী দেবীর সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত এবং তাঁহার নিয়োজিত বার্ত্তাবহ, তখন ইঁহাকে বিশ্বাস করাই সঙ্গত। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি কৃতজ্ঞতা সহকারে চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং তদনন্তর উভয়ে শ্যামপুরের কুটীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তাঁহারা যখন কুটীরাগত হইলেন তখন মুক্তকেশী নিদ্রিত ছিল। চৌধুরী মহাশয় তাহাকে দর্শনমাত্র চমকিয়া উঠিলেন। নিশ্চয়ই রাণী লীলাবতী দেবীর সহিত পীড়িতার অত্যদ্ভুত আকৃতিগত সাদৃশ্য সন্দর্শনে তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। রোহিণী ঠাকুরাণী এ সকল রহস্য কিছুই জানিতেন না; তিনি মনে করিলেন, মুক্তকেশীর পীড়ার আতিশয্য দর্শনে চৌধুরী মহাশয় বিচলিত হইয়াছেন। চৌধুরী মহাশয়, মুক্তকেশীর নিদ্রাভঙ্গ করিতে, নিষেধ করিলেন। রোগের লক্ষণাদি সম্বন্ধে তিনি রোহিণীকে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং অতি সন্তর্পণে রোগিণীর হাত দেখিলেন। তাহার পর সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া তিনি গ্রাম্য চিকিৎসকের আলয়ে গমন করিলেন এবং তথা হইতে আবশ্যকমত ঔষধাদি সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাগত হইলেন। রোহিণীকে তিনি বলিয়া দিলেন যে, এই ঔষধ সেবন করিলে মুক্তকেশীর শরীরে যথেষ্ট শক্তি জন্মিবে এবং কলিকাতা গমনের পথশ্রম তিনি সহ্য করিতে সক্ষম হইবেন। অদ্য এবং কল্য নিয়মিতরূপে ঔষধ সেবন করিলে পরশ্ব কলিকাতায় যাওয়ার কোন অসুবিধা থাকিবে না। পরশ্ব দ্বিপ্রহরে গাড়ীতে যাহাতে তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে যাত্রা করিতে পারেন তাহার সুব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি স্বয়ং রেলষ্টেশনে অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন। যদি তাঁহারা উক্ত সময়ে রেলষ্টেশনে উপস্থিত হইতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি বুঝিবেন যে, মুক্তকেশীর পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছে; তিনি তৎক্ষণাৎ যথাবিহিত সাহায্য করিবার জন্য পুনরায় এই কুটীরে চলিয়া আসিবেন। এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া চৌধুরী মহাশয় চলিয়া গেলেন।

তাঁহার প্রদত্ত ঔষধ সেবনে মুক্তকেশীর বিশেষ উপকার হইল। অচিরে কলিকাতায় রাণীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে এই আশ্বাসে সে, অতিশয় উৎসাহিত হইয়া উঠিল। নিয়মিত সময়ে তাঁহারা ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। চৌধুরী মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তৎকালে একটী প্রবীণা স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিতেছিলেন; সেই স্ত্রীলোকটীও এই গাড়িতে কলিকাতায় যাইবেন। চৌধুরী মহাশয় যত্ন সহকারে তাঁহাদের টিকিট কিনিয়া গাড়িতে উঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহাদের কলিকাতার ঠিকানা রাণী মাতাকে লিখিয়া জানাইবার জন্য, রোহিণীকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। সেই প্রবীণা স্ত্রীলোক অন্য কামরায় প্রবেশ করিলেন। কলিকাতায় পৌছিলে তিনি কোথায় গেলেন বা তাঁহার কি হইল, তাহার কোন সন্ধান রোহিণী জানেন না। রোহিণী কলিকাতায় বাসা স্থির

করিয়া, অঙ্গীকারানুসারে, রাণী লীলাবতী দেবীর নিকট ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইলেন। এক পক্ষ কাটিয়া গেল তথাপি কোন উত্তর আসিল না। আরও কয়েক দিন পরে যে প্রবীণা স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহাদের ষ্টেশনে দেখা হইয়াছিল, তিনি রোহিণীর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন যে রাণী মাতা সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন; মুক্তকেশীর সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি অগ্রে রোহিণী ঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন; এ কার্য্যে তাঁহার আধ ঘণ্টার অধিক বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা নাই। রোহিণী সম্মত হইলেন। মুক্তকেশী তথায় উপস্থিত ছিল; সেও বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিল। তখন রোহিণী ও সেই প্রবীণা স্ত্রীলোক একখানি ভাড়াটিয়া গাড়িতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে সেই স্ত্রীলোক রঙ্গমতী দেবী। কিয়দ্দূর যাওয়ার পর, সেই স্ত্রীলোক একটা ভবনদ্বারে গাড়ি থামাইতে বলিলেন এবং রোহিণীকে বলিলেন যে, এই বাটীতে একটা সামান্য কাজ আছে, ২।১ মিনিটেই তিনি তাহা শেষ করিয়া আসিবেন; ততক্ষণ রোহিণী দেবীকে একটু অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। তিনি ভবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু আর বাহির হইলেন না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর রোহিণীর বড় ভয় হইল। তখন তিনি তাঁহার বাসায় গাড়ি ফিরাইয়া আনিবার জন্য গাড়োয়ানকে আদেশ করিলেন। গাড়ি কিঞ্চিদধিক আধ ঘণ্টার মধ্যে বাসায় ফিরিয়া আসিল। তিনি আসিয়া দেখিলেন, মুক্তকেশী বাসায় নাই!

বাসার নীচেতলায় একটী বৃদ্ধা বাস করিত, উপরতলায় মুক্তকেশী ও রোহিণী থাকিতেন। রোহিণী সেই বৃদ্ধার নিকট সন্ধান পাইলেন যে, তিনি প্রস্থান করিবামাত্র, একটি বালক একখানি পত্র লইয়া আসিয়াছিল এবং বৃদ্ধাকে বলিয়াছিল, উপরতলায় যে স্ত্রীলোক থাকেন তাঁহাকে এই চিঠি দিতে হইবে। বৃদ্ধা বালককে উপরের সিঁড়ি দেখাইয়া দিলে, সে পত্র দিয়া তখনই চলিয়া গেল। সে চলিয়া যাওয়ার পর মুক্তকেশী একখানি মোটা চাদর গায়ে দিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন এবং ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। মুক্তকেশীর ঘর খুঁজিয়া সে চিঠিখানি পাওয়া গেল না। অতএব নিশ্চয়ই চিঠিখানি তাহার সঙ্গে ছিল। চিঠিখানিতে নিশ্চয়ই বিশেষ প্রলোভনজনক সংবাদ ছিল। নচেৎ মুক্তকেশী কদাপি কলিকাতার পথে একাকিনী যাইতে সাহস করিত না।

উদ্বেগের প্রথম তরঙ্গ কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে, রোহিণী স্থির করিলেন যে, সর্ব্বাগ্রে বাতুলালয়ে সন্ধান করা আবশ্যক। তদভিপ্রায়ে পরদিন প্রাতে তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া জ্ঞাত হইলেন যে, সেরূপ কোন ব্যক্তিই সেখানে নাই। সম্ভবতঃ কল্পিত মুক্তকেশী বাতুলালয়ে নিরুদ্ধ হওয়ার দুই এক দিন পূর্ব্বে রোহিণী তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি মুক্তকেশীর জননী হরিমতির নিকট তাঁহার কন্যার সন্ধানার্থে পত্র লিখিলেন। এ পত্রের যে উত্তর আসিল তাহাতে জানা গেল, তিনি মুক্তকেশীর কোনই সন্ধান জানেন না। তাহার পর আর কি করা উচিত বা আবশ্যক তাহা তিনি স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তৎকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তিনি মুক্তকেশীর সম্বন্ধে কোন সংবাদই জ্ঞাত নহেন

এবং সে সহসা কোথায় গেল, বা কেন গেল তাহার কিছুই তিনি বলিতে পারেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রোহিণী ঠাকুরাণীর নিকট এই পর্য্যন্ত মাত্র সংবাদ পাওয়া গেল। যদিও এ সকল সংবাদ আমার অপরিজ্ঞাত, তথাপি এতদ্দ্বারা আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন সহায়তা হইবে কি না সন্দেহ। যাহা হউক, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার পত্নী প্রতারণাজাল বিস্তার করিয়া মুক্ত-কেশীকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিয়াছেন এবং তাহাকে রোহিণীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। স্বামী কিংবা স্ত্রীকে, অথবা উভয়কেই রাজবিচারে দণ্ডিত করিতে পারা যায় কি না, তাহার বিচার ভবিষ্যতে করিলেও চলিতে পারিবে। কিন্তু অধুনা আমার হৃদয়ে যে প্রবল অভিসন্ধি রহিয়াছে, তদ্দ্বারা আমি অন্য পথে চালিত হইলাম। রাজা প্রমোদরঞ্জন সংক্রান্ত দুজ্ঞেয় রহস্যের কিঞ্চিন্মাত্রও আভাস লাভ করার আশয়ে আমি রোহিণীর সহিত সাক্ষাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তদ্ধেতু বিগত ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতির অন্যান্য অংশ স্পষ্টীকৃত করিবার অভি-প্রায়ে, পুনরায় প্রশ্ন উত্থাপিত করিলাম। আমি বলিলাম,—"এই বিষাদজনক ব্যাপারে আপ-নার কোন প্রকার সহায়তা করা আমার আন্ত-রিক বাসনা। আমি আপনার বিপদে নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি। আপনি মুক্তকেশীকে যেরূপ যত্ন করিয়াছেন এবং তাহার জন্য যে প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, লোকে আপনার পেটের সন্তানের জন্যও সেরূপ করিতে পারে না।"

রোহিণী বলিলেন,—"ইহাতে বিশেষ কিছুই প্রশংসার কথা নাই। আহা! সে আমার পেটের মেয়ের মতই ছিল। আমি তাহাকে অতি শৈশবকাল হইতে অনেক কষ্টে মানুষ করিয়াছি। আমি তাহাকে মানুষ করিবার জন্য যদি এত কষ্ট না করিতাম, তাহা হইলে তাহার জন্য আমার আজি কোন কষ্ট হইত না। আমার নিজের কখন ছেলেপিলে হয় নাই। এত দিন পরে মুক্তকেশীও আমাকে ছাড়িয়া গেল।" এই বলিয়া বৃদ্ধা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া, বৃদ্ধা কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে, আমি আবার জিজ্ঞাসিলাম,—"আপনি কি মুক্তকেশীর জন্মের পূর্ব্বেও হরি-মতিকে জানিতেন?"

"মুক্তকেশী হইবার বেশী দিন আগে নয়—৩ মাস আগে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। সর্ব্বদা দেখা শুনা হইত, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা কখনই হয় নাই।"

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—"হরি-মতির বাড়ীর কাছেই কি আপনার বাড়ী ছিল?"

তিনি উত্তর দিলেন,—"হাঁ মহাশয়, পুরাণ রামনগরে আমাদের খুব কাছাকাছি বাড়ী ছিল?"

"পুরাণ রামনগর? তবে কি হুগলী জেলার ঐ নামে দুইটা গ্রাম আছে?"

"২০।২৫ বৎসর আগে তাই ছিল বটে। নদীর ধারে রামনগরের প্রায় আধ ক্রোধ দূরে এক গ্রাম বসিয়াছিল। এই নূতন রামনগরের

ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং পুরাণ রামনগর হইতে একে একে সকল লোক উঠিয়া গিয়া নূতন রামনগরে ঘর বাঁধিতে লাগিল। এখন রামনগর বলিলে নূতন রামনগরই বুঝায়। কেবল গ্রামের ঠাকুরবাড়ী ও ভট্টাচার্য্য মহাশয় ছাড়া আর প্রায় সকল লোকই ক্রমে উঠিয়া গিয়াছে।"

"ঐ স্থানেই কি আপনার স্বামী পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া আসিতেছিলেন ?"

"না মহাশয় ! আমার স্বামী প্রথমে দরিদ্র ছিলেন। হুগলী জেলার একটি বড় লোক তাঁহাকে আশ্রয় দেন। তাঁহার জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্যে আমার স্বামী বহুদিন কর্ম্ম করেন। হাতে কিছু টাকার সংস্থান হইলে, তিনি কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, রামনগরে ঘর বাঁধিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। আমরা নিঃসন্তান ; সুতরাং আমাদের অধিক টাকাকড়ির দরকার ছিল না। আমরা সেখানে বাস করার এক বৎসর কি দেড় বৎসর পরে হরিমতি ও তাহার স্বামী সেই গ্রামে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন।"

"পূর্ব্ব হইতেই আপনার স্বামীর সহিত তাঁহাদের পরিচয় ছিল কি ?"

"হরিমতির স্বামী রামধন চক্রবর্ত্তীর সহিত আমার স্বামীর পূর্ব্বে পরিচয় ছিল। এ গ্রামে বর্দ্ধমানের রাজার যে ঠাকুরসেবা আছে, তাহারই গোমস্তার পদ খালি হওয়ায়, উক্ত রামধন চক্রবর্ত্তী জোগাড় করিয়া সেই পদে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। সেই অবধি তাঁহারা স্বামীতে স্ত্রীতে রামনগরে বাস করিতে আরম্ভ করেন। যখন তাঁহারা রামনগরে আসিয়া বসতি স্থাপন করিলেন, তখন চক্রবর্ত্তীর বয়স অনুমান ৪০ বৎসর এবং তাঁহার গৃহিণী হরিমতির বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হইবে। মুক্তকেশী তখন পেটে। তাঁহারা আমাদের বাটীর নিকটে বাস করিতে আরম্ভ করার পর, ক্রমে জনরব হরিমতির সম্বন্ধে নানা কথা প্রচার করিতে লাগিল। শুনিতে পাওয়া গেল, বিবাহের পর হইতে হরিমতির সহিত তাহার স্বামীর বনিবনাও ছিল না ; সে স্বামীর নিকটেও থাকিত না। স্বামী অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও তাহাকে ঘরে আনিতে পারেন নাই ; সে কেবলই বাপের বাড়ীতে থাকিত এবং ইচ্ছামত ব্যবহার করিত। তাহার পর হঠাৎ হরিমতির মতিগতি ফিরিল, সে স্বেচ্ছায় স্বামীর সহিত ঘরকন্না করিতে সম্মত হইল। কেন যে তাহার হঠাৎ এমন মন হইল তাহা বলা যায় না। যাহা হউক সে স্বামীর ঘরে আসার কিছু পরেই চক্রবর্ত্তীর এই চাকরি জুটিল এবং তদবধি তাঁহারা রামনগরে বাস করিতে থাকিলেন। এরূপ স্ত্রীকে কেহই গ্রহণ করিতে সম্মত হয় না। কিন্তু চক্রবর্ত্তী বড় ভদ্রলোক ; এমন স্বতন্ত্রা স্ত্রীকেও তিনি বড় ভাল বাসিতেন। আমাদের সহিত যতই আলাপ পরিচয় বাড়িতে লাগিল, ততই আমরা বুঝিতে পারিলাম, হরিমতি বড় খোষপোষাকী, বেহায়া, স্বতন্ত্রা লোক। কিসে লোকে তাহার রূপের প্রশংসা করিবে, এই চেষ্টায় সে সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকিত। স্বামী তাহার জন্য যত্নের কোনই ত্রুটি করিতেন না ; কিন্তু সে একবার স্বামীর দিকে ফিরিয়াও চাহিত না। আমার স্বামী নিয়তই বলিতেন, পরিণামে ইহাদের বড়ই অমঙ্গল হইবে। শীঘ্রই সেই কথা ফলিল। তাঁহারা রামনগরে ৪।৫ মাস থাকিতে না থাকিতেই, ভয়ানক কলঙ্কের কথা প্রচার হইয়া পড়িল। দুই জনেরই তাহাতে দোষ ছিল।"

"স্বামী স্ত্রী দুই জনেরই দোষ ?"

"না না। চক্রবর্ত্তী বেচারার কোন দোষ ছিল না। তিনি দয়ার পাত্র, তাঁহার স্ত্রী আর যে ব্যক্তি——"

"আর যে ব্যক্তির জন্য এই কলঙ্কের উৎপত্তি?"

"হাঁ। সে ব্যক্তির সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম—এরূপ জঘন্য ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে কখনই উচিত হয় নাই। আপনি তাঁহাকে জানেন—আমার মুক্তকেশী তাঁহাকে বিলক্ষণ চিনিত।"

"রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়?"

"হাঁ। রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়ই বটেন।"

আমার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। রাজার যে দুর্জ্ঞেয় রহস্য জানিবার নিমিত্ত আমি ব্যাকুল এবং যাহা জানিতে পারিলে রাজাকে নিশ্চয় করতলস্থ করিতে পারা যাইবে বলিয়া আমার স্থির বিশ্বাস, বুঝি এতক্ষণে সেই রহস্য ব্যক্ত হইবার সূত্রপাত হইতেছে মনে করিয়া, আমার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। কত রহস্য জাল বিচ্ছিন্ন করিয়া, কত বিপদবাত্যা অতিক্রম করিয়া সে মূল রহস্য আমার আয়ত্তগত হইবে আমি তখন তাহার কিছুই জানিতাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"রাজা প্রমোদরঞ্জন কি তৎকালে আপনাদের সন্নিধ্যে অবস্থান করিতেন?"

"না মহাশয়, তিনি মধ্যে মধ্যে আমাদের গ্রামে আসিতেন। প্রথমে যখন তিনি আইসেন তখন তাঁহাকে কেহ জানিত না; ক্রমে তাঁহার সহিত অনেকের আলাপ হয়।"

"তিনি যখন প্রথমে আপনাদের গ্রামে আইসেন, তখন মুক্তকেশীর জন্ম হইয়াছিল কি?"

"মুক্তকেশী যখন ৭।৮ মাসের তখন রাজা আমাদের গ্রামে প্রথম দেখা দেন।"

"রাজা সকলের নিকটে অপরিচিত ছিলেন; হরিমতিও তাঁহাকে চিনিত না?"

"আমরা প্রথমে তাহাই মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু শেষে যখন এই কলঙ্ক প্রচার হইয়া পড়িল তখন আর তাঁহাদের আলাপ ছিল না, এ কথা কেহই বিশ্বাস করিল না। সে ঘটনা আমার এমনই মনে পড়িতেছে, যেন তাহা কল্য ঘটিয়াছে। এক রাত্রিতে হঠাৎ রামধন চক্রবর্ত্তী আমাদের জানালা দিয়া এক মুঠা ঢিল ফেলিয়া দিয়া আমাদের ঘুম ভাঙ্গাইলেন তাহার পর আমার স্বামীকে, বাহিরে যাইয়া তাঁহার কথা শুনিবার নিমিত্ত বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। তাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিলেন। তাহার পর আমার স্বামী মহাশয় গৃহে প্রবেশ করিয়া আমাকে বলিলেন, 'সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আমি যাহা বরাবর মনে করিতাম তাহাই ঘটিয়াছে। চক্রবর্ত্তীর স্ত্রীর বাক্সে নানা প্রকার মহামূল্য অলঙ্কারাদি পাওয়া গিয়াছে।' আমি জিজ্ঞাসিলাম,—'চক্রবর্ত্তী মহাশয় কি মনে করিতেছেন তাঁহার স্ত্রী সে সকল সামগ্রী চুরি করিয়াছেন?' তিনি উত্তর দিলেন,—'আরে না পাগলি, না। চুরি করা মহাপাপ সন্দেহ নাই; কিন্তু এ তার চেয়েও মহাপাপ। সেই যে রাজা প্রমোদরঞ্জন রায় আমাদের গ্রামে মধ্যে মধ্যে যাওয়া আসা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার সহিত চক্রবর্ত্তীর স্ত্রীর খুব ভাব। তাহারা গোপনে কথাবার্ত্তা কহে, দেখাসাক্ষাৎ করে; এখন সহজেই বুঝিয়া দেখ এ সকল অলঙ্কার তাহার বাক্সে কেমন করিয়া আসিল। আমি চক্রবর্ত্তীকে বিশেষ সাবধান থাকিয়া, আরও প্রমাণের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে পরামর্শ দিয়াছি।' আমি বলিলাম,—'কিন্তু তোমাদের সিদ্ধান্ত

ভুল হইয়াছে। চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী যে এইরূপ একজন চির অপরিচিত লোকের সহিত হঠাৎ ভ্রষ্টা হইবে ইহা তো আমার কখন সম্ভব মনে হয় না।' আমার স্বামী বলিলেন,—তুমি মনে করিয়া দেখ, চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী শত সাধ্যসাধনাতেও কখন স্বামীর ঘর করিতে রাজি হয় নাই। তাহার পর, বলা নাই কহা নাই, আপনি ইচ্ছা করিয়া স্বামীর ঘর করিতে আসিল। ইহার মধ্যে অবশ্যই একটা নিগূঢ় কাণ্ড রহিয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। আর দিন দুই চুপ করিয়া থাক না; সকল কথাই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে।' হইলও তাই। দিন দুই পরে বিষম কলঙ্কের ঢাক বাজিয়া উঠিল।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া রোহিণী ঠাকুরাণী একটু নীরব হইলেন। আমি মনে করিতে লাগিলাম, যে বিষম রহস্য জানিবার নিমিত্ত আমি ব্যাকুল, তাহার সন্ধান পাইবার সূচনা হইতেছে কি? স্ত্রীচরিত্রের এবংবিধ ভঙ্গুরতা এবং পুরুষচরিত্রের এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ সংসারে প্রতিনিয়তই চতুর্দ্দিকে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই নিত্য পরিদৃষ্ট সামান্য ঘটনার মধ্যে, রাজা প্রমোদরঞ্জনের আজীবন ভীতিবিধায়ক রহস্যের মূল নিহিত থাকা সম্ভব কি?

রোহিণী ঠাকুরাণী আবার বলিতে লাগিলেন —"তার পর মহাশয়, চক্রবর্ত্তী আমার স্বামীর পরামর্শ মতে চুপ করিয়াই থাকিলেন। অধিক দিন অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল না। পরদিনই সন্ধ্যার পর চক্রবর্ত্তী দেখিতে পাইলেন, তাঁহার স্ত্রী ও রাজা প্রমোদরঞ্জন, ঠাকুর বাড়ীর পার্শ্বে, একটা গোপন স্থানে দাঁড়াইয়া, ফুস্ ফুস্ করিয়া কথা কহিতেছে। চক্রবর্ত্তীকে দেখিবা মাত্র রাজা থতমত খাইয়া যেরূপভাবে আত্মচরিত্রের সমর্থন করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে তাঁহার অপরাধ আরও সুস্পষ্ট হইয়া পড়িল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় দারুণ অপমান হেতু অতিশয় ক্রোধ-পরবশ হইয়া রাজাকে প্রহার করিলেন। কিন্তু রাজার জোরে তিনি পারিবেন কেন? রাজা তাঁহাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুররূপে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিলেন। গোলমালে চারিদিকে অনেক লোক জমিয়া গেল। অপমানের সীমা থাকিল না। সেই রাত্রিতে এই সকল সংবাদ শুনিয়া, যখন আমার স্বামী চক্রবর্ত্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন, তখন আর তাঁহাতে দেখিতে পাইলেন না। চক্রবর্ত্তী সেই অবধি নিরুদ্দেশ। তাঁহার জন্য গ্রামস্থ সকল ভদ্রলোকেই দুঃখিত হইল এবং তাঁহার অনেক সন্ধান করিল; কিন্তু কিছুই ফল হইল না। অনেকদিন পরে, কাশ্মীর হইতে তিনি আমার স্বামীকে পত্র লিখিয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি আজিও জীবিত আছেন; কিন্তু পূর্ব্ব পরিচিত কোন লোকের সহিত তাঁহার আর সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনা নাই; তাঁহার স্ত্রীর সহিত কদাচ সাক্ষাৎ ঘটা নিতান্তই দুরাশা।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"রাজা কি করিলেন? তিনি কি নিকটেই থাকিলেন?"

"না। সেখানে আর কি তিনি থাকিতে পারেন? সেই রাত্রিতেই হরিমতির সহিত তাঁহার অত্যন্ত বচসা হইল। পরদিন হইতে তিনিও অন্তর্দ্ধান হইলেন।"

"আর হরিমতি? নিশ্চয়ই এ ঘোর কলঙ্কের পর তিনি আর সে গ্রামে বাস করিতে পারিলেন না।"

"তিনি খুব থাকিলেন। তাঁহার কঠিন হৃদয়, অপমান বা কুৎসা দ্বারা বিদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। তিনি অম্লান বদনে সকলের উপর টেক্কা দিয়া গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি জোর করিয়া সকলকে জানাইতে

লাগিলেন যে, তাঁহার সম্বন্ধে নিতান্ত অমূলক মিথ্যা অপবাদ ঘোষিত হইয়াছে। তিনি সম্পূর্ণ নিরপরাধা। তখন পুরাণ গ্রাম ভাঙ্গিয়া লোকে নূতন গ্রামে ঘর বাঁধিলেন। সেই বেহায়া মেয়েমানুষ অদ্যাপি সেখানেই আছেন এবং বোধ হয় মরণ পর্য্যন্ত সেই খানেই থাকিবেন।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"তাঁহার চলিতেছে কেমন করিয়া? তাঁহার স্বামী তাঁহাকে এই কাণ্ডের পর আর সাহায্য করিতে কখনই সম্মত নহেন।"

"না মহাশয়, তিনি সাহায্য করিতে ইচ্ছুক। তিনি আমার স্বামীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে লিখিয়াছিলেন যে, ঐ অভাগিনী স্ত্রীলোক যখন তাঁহারই স্ত্রী-পরিচয়ে তাঁহারই বাটীতে বাস করিতেছে, তখন সে যতই মন্দ হউক না, তাহাকে অন্নাভাবে ভিখারিণীর ন্যায় মরিতে দেওয়া তাঁহার ইচ্ছা নহে। তিনমাস অন্তর, কলিকাতায় এক নির্দ্দিষ্ট লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, সে গ্রাসাচ্ছাদনের অনুরূপ সাহায্য পাইবে।"

"হরিমতি সেইখান হইতে টাকা আনিয়া থাকে?"

"কদাপি না। সে বলিল, তাহাকে যদি অত্যন্ত প্রাচীন হইয়া মরিতে হয়, তাহা হইলেও সে কখন রামধন চক্রবর্ত্তীর নিকট এক কড়া কড়িও গ্রহণ করিবে না। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর, চক্রবর্ত্তীর ঐ চিঠি আবার আমার চক্ষে পড়ায়, আমি হরিমতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, যদি তোমার কোন অভাব হয়, আমাকে তাহা জানাইও। সে তাহার উত্তরে বলিয়াছিল, অন্নাভাবে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইব সেও স্বীকার, তথাপি চক্রবর্ত্তী বা তাহার কোন আত্মীয় লোককে আমি দুঃখের কথা কখনই জানাইব না।'"

"আপনার কি বোধ হয়, তাহার নিজের টাকা কড়ি আছে?"

"যদিই থাকে তো সে অতি সামান্য। লোকে বলে, আমারও তাই মনে হয়, রাজা প্রমোদরঞ্জন তাহাকে গোপনে সাহায্য করিয়া থাকেন।"

এ পর্য্যন্ত যে যে কথা শুনিলাম তাহাতে রাজার সম্বন্ধীয় কোন বিশেষ রহস্য-বিষয়ক সন্ধানই তো পাওয়া গেল না। কেবল একটা কথা আমার মনে অতিশয় সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হইল। চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী এই দারুণ অপমানের পরও, সেই গ্রামে কেন জোর করিয়া বাস করিতে লাগিল, তাহার কোন মীমাংসা করিতে আমি সক্ষম হইলাম না। সেই স্থানে নিরন্তর বাস করিতে করিতে ক্রমে তাহার নির্দ্দোষতা সপ্রমাণিত হইবে মনে করিয়া সে সেখানে থাকিয়া গেল, এ সিদ্ধান্ত বিশেষ সারবান্ নহে। আমার যেন মনে হইল, তাহাকে বাধ্য হইয়া অগত্যা রামনগরে থাকিতে হইয়াছে। কিন্তু কে তাহাকে বাধ্য করিয়া সেই স্থানে রাখিল? সহজেই অনুমান হইতেছে, যে তাহাকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতেছে, সেই তাহাকে নিশ্চয়ই রামনগরে বাধ্য করিয়া রাখিয়াছে। সে স্বামীর নিকট অর্থ গ্রহণ করে নাই; তাহার নিজের বিশেষ টাকা কড়ি নাই; এরূপ পতিত, কলঙ্কিত, আত্মীয়বিহীন স্ত্রীলোকের অন্যত্র সাহায্য লাভ করাও সম্ভব নহে। এরূপ স্থলে জনরব যাহা ঘোষণা করিতেছে তাহাই সত্য বলিয়া মনে করিতে হইতেছে। নিশ্চয়ই রাজা প্রমোদরঞ্জন তাহাকে সাহায্য করেন। কিন্তু কেন? তাহাকে নিয়ত অর্থ সাহায্য করিয়া সেই

রামনগরে রাখায় রাজার উদ্দেশ্য কি? কি দুরভিসন্ধি সংগোপিত রাখিবার জন্য এই অনুষ্ঠান? হরিমতির সহিত রাজার প্রসক্তির কথা প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য, অথবা মুক্তকেশীর পিতৃত্ব বিষয়ক তাঁহার কলঙ্ক অপনোদনের জন্য এই অনুষ্ঠান কদাপি সঙ্গত নহে। কারণ তত্রত্য জনসাধারণ এ সকল ব্যাপার অতিশয় বিশ্বাস করে, সুতরাং তাহাদের বিশ্বাস কদাপি এতদুপায়ে তিরোহিত হইবার নহে। তবে কি? নিশ্চয়ই এ ব্যবহারের অভ্যন্তরে গূঢ় অভিসন্ধি আছে। রাজার জীবনের সহিত যে এক ভয়ানক রহস্য সংযোজিত আছে এবং যাহা হরিমতি জানে ও সম্ভবতঃ মুক্তকেশী জানিত, তাহাই প্রচ্ছন্ন রাখিবার অভিপ্রায়ে হরিমতিকে সেই স্থানে থাকিতে হইয়াছে। এখন আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, রাজার সহিত গোমস্তা-পত্নীর গুপ্ত আলাপে যে সকল কথা চলিত, তাহা যদি আর কোন ব্যক্তির শ্রবণ-পথে পতিত হইত, তাহা হইলে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই সেই রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারিত।

তবে কি এ ঘটনায় লোকের অনুমান সত্য নয়? তবে লোকে যে অবৈধ প্রণয় এ ব্যাপারে মূল বলিয়া অনুমান করিয়াছে তাহা কি অমূলক? তবে হরিমতি যে মিথ্যা অপবাদের কথা সমর্থন করিয়াছে তাহাই কি সত্য? তবে কি প্রকৃত কথা লোককে জানিতে না দিবার জন্যই রাজা ও হরিমতি এই সন্দেহজনক ব্যবহারে লিপ্ত হইয়াছিলেন? এইরূপ মীমাংসাই আমার সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। রাজার রহস্যের মূল এই স্থানে নিহিত আছে, তাহা আমার বেশ হৃদ্গত হইল।

তদনন্তর নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আমি নিঃসন্দেহে জানিতে পারিলাম যে, হরিমতি যখন স্বামীর ঘরে আইসে নাই, তখন সে ব্যভিচারিণী ছিল এবং অবশ্যম্ভাবী কলঙ্ক গোপন করিবার জন্যই সে স্বতঃ স্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। স্থান ও কালের আলোচনা করিয়া আমার নিঃসন্দেহ প্রতীতি জন্মিল যে, হরিমতির কন্যা মুক্তকেশী কোন মতেই রামধন চক্রবর্তীর ঔরসজাত কন্যা হইতে পারে না। কিন্তু রাজা প্রমোদরঞ্জন মুক্তকেশীর পিতা কি না, তাঁহার সহিত হরিমতির পূর্ব্বাবধি প্রসক্তি ছিল কি না, এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ আমি দেখিতে পাইলাম না। যদি আকৃতি ধরিয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে মুক্তকেশীকে রাজা প্রমোদরঞ্জনের কন্যা বলিয়া কদাপি স্বীকার করা যায় না।

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"রাজা যখন আপনাদের গ্রামে যাতায়াত করিতেন, তখন আপনি তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়া থাকিবেন।"

রোহিণী বলিলেন,—হাঁ, অনেকবার দেখিয়াছি।"

"তাঁহাকে দেখিয়া মুক্তকেশীর সহিত তাঁহার আকৃতিগত সাদৃশ্যের কথা কখন আপনার মনে উদিত হইয়াছিল কি?"

"না মহাশয়, তাঁহার সহিত মুক্তকেশীর আকৃতিগত কোন সাদৃশ্য ছিল না।"

"তবে কি মুক্তকেশীর চেহারা তার মার মত?"

"না, মার মতও নয়।"

মাতার অনুরূপও নহে এবং আনুমানিক পিতার অনুরূপও নহে। আকৃতিগত সাদৃশ্য যে এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ নহে, তাহা আমি জানি এবং সেরূপ ঘটনা যে এককালে উড়াইয়া দিবার যোগ্য নহে তাহাও বুঝি। তাহার পর মনে করিলাম, রাজা প্রমোদরঞ্জন ও হরিমতির রামনগরে আবির্ভাবের পূর্ব্বে, তাঁহাদের

জীবনের কিরূপ ভাব ছিল তাহার সন্ধান করিতে পারিলে হয়ত সুবিধা হইতে পারে। এই অভিপ্রায়ে আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"যখন রাজা প্রমোদরঞ্জন প্রথমে আপনাদের গ্রামে আসিলেন, তখন তিনি কোথা হইতে আসিলেন আপনারা শুনিয়াছিলেন কি?"

"না মহাশয়। কেহ বলিত তিনি কৃষ্ণসরোবর হইতে আসিয়াছেন এবং কেহ বলিত উত্তর দেশ হইতে আসিয়াছেন; কিন্তু ঠিক খবর কেহই জানিত না।"

"বিবাহের পর, স্বামীর ঘরে আসিবার পূর্ব্বে হরিমতি কোথায় থাকিত, বা কি করিত তাহার কোন সন্ধান আপনি জানেন কি?"

"সে বিবাহের পরে, স্বামীর ঘরে আসিবার পূর্ব্বে, পিত্রালয়েই থাকিত। শুনিয়াছি তৎকালে তাহার বাপের বাড়ীর দেশের এক বড়লোকের বাড়ীতে তাহার সর্ব্বদা যাতায়াত ছিল।"

"সে বড়লোকের বাড়ীতে সে কিরূপ ভাবে যাতায়াত করিত?"

"শুনিয়াছি সেই বড়লোকের বাড়ীর একজন স্ত্রীলোকের সহিত হরিমতির খুব ভাব ছিল। সেই জন্যই সে সেখানে যাওয়া আসা করিত।"

"এমন ভাবে কত দিন সে যাতায়াত করিত তাহা আপনি জানেন কি?"

"ঠিক জানি না; তবে ৩।৪ বৎসর হওয়া সম্ভব।"

"সেই বড়লোকের নাম আপনি কখন শুনিয়াছেন কি?"

"হাঁ মহাশয়, তাঁহার নাম দীনবন্ধু রায়।"

আচ্ছা, দীনবন্ধু রায়ের সহিত রাজা প্রমোদরঞ্জনের বিশেষ সদ্ভাব ছিল, অথবা তিনি সে দিকে কখন কখন বেড়াইতে যাইতেন, এমন কথা আপনারা কেহ কখন শুনিয়াছেন কি?"

"না মহাশয়, এরূপ কথা আমরা কেহ কখন শুনি নাই।"

কি জানি ভবিষ্যতে কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইতে পারে মনে করিয়া, আমি দীনবন্ধু রায়ের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লইলাম। কিন্তু আমার মনে স্থির বিশ্বাস হইল যে, রাজা প্রমোদরঞ্জন কদাপি মুক্তকেশীর পিতা নহেন। আমি আরও স্থির সিদ্ধান্ত করিলাম, হরিমতির সহিত রাজার গুপ্ত সাক্ষাতের অবশ্যই অন্য কোন গূঢ় অভিসন্ধি ছিল এবং অবৈধ প্রণয় কদাপি তাহার কারণ নহে। তদনন্তর আমি রোহিণী ঠাকুরাণীকে মুক্তকেশীর বাল্যজীবন সংক্রান্ত দুই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে মনস্থ করিলাম। ভাবিলাম হয়ত এই কথাবার্ত্তার মধ্য হইতে আমার অনুসন্ধানের অনুকূল দুই একটা কথা প্রকাশ হইয়াও পড়িতে পারে।

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"এই পাপে ও দুরবস্থায় জন্মিয়া বেচারা মুক্তকেশী কিরূপে আপনার হাতে পড়িল, তাহার কথা আমি কিছুই শুনি নাই।"

রোহিণী বলিলেন,—ইহা জগতে ঐ দুঃখিনী বালিকাকে যত্ন করিতে আর কেহই ছিল না। পাপীয়সী জননী কন্যাকে, তাহার জন্মদিনাবধি ঘৃণা করিত, যেন সেই সম্পূর্ণ অপরাধিনী। বালিকার এই অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণ বড় কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে আমি নিজ সন্তানের ন্যায় লালনপালন করিবার জন্য প্রার্থনা করিলাম।"

"সেই সময় হইতে বরাবরই কি মুক্তকেশী আপনার কাছে থাকিত?"

"নিরন্তর আমার কাছে থাকিত না। হরি-

মতির ঘাড়ে কখন কখন খেয়াল চাপিত। আমি তাহাকে মানুষ করিতেছি, আমার এই বিষম অপরাধের সাজা দিবার জন্যই যেন, সে সময়ে সময়ে জোর করিয়া মেয়ে লইয়া যাইত। কিন্তু তাহার এরূপ খেয়াল বড় বেশী দিন থাকিত না। মুক্তকেশীকে সে আবার ফিরাইয়া দিত। যদিও আমার নিকট-থাকিয়া মুক্তকেশী খেলার সঙ্গী পাইত না এবং তাহাকে উৎসাহহীন হইয়াই থাকিতে হইত, তথাপি সে আমার কাছে আসিতে পারিলে বড়ই সন্তুষ্ট হইত। যখন হরিমতি তাহাকে আনন্দধামে লইয়া গিয়াছিল, সেই সময়ে সে অনেক দিন আমার কাছছাড়া ছিল। সেই সময়েই আমার স্বামীর মৃত্যু হয়। তখন তাহার বয়স দশ এগার বৎসর হইবে; কিন্তু বুদ্ধি বড় কম, আর যেন কেমন বিমর্ষ ভাব। দেখিতে মুক্তকেশী তখন পরমাসুন্দরী। তাহার মা তাহাকে লইয়া ফিরিয়া আসিলে, আমি তাহাকে লইয়া কলিকাতায় আসিতে চাহিলাম। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর রামনগরে থাকিতে আমার আর মন টিকিল না।"

"হরিমতি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইল?"

"না। আনন্দধাম হইতে সে যেন আরও কর্কশ-স্বভাবা হইয়া আসিয়াছিল। লোকে বলিতে লাগিল, রাজা প্রমোদরঞ্জনের হুকুম লইয়া তবে হরিমতি গ্রামান্তরে যাইতে পাইয়াছিল। আরও বলিতে লাগিল, ভগ্নীর টাকা আছে জানিয়া হরিমতি তাহার মরণকালে সেবা করিতে গিয়াছিল। কিন্তু তাহার কিছু থাকা দূরে থাকুক, সৎকার করিবার মত পয়সাকড়িও ছিল না। এই সকল কথা শুনিয়া, হয় ত হরিমতির মেজাজ আরও খারাপ হইয়াছিল। ফলতঃ মেয়ে লইয়া স্থানান্তরে যাইতে দিতে কোন মতেই সে রাজি হইল না; বরং আমার নিকট কন্যাকে থাকিতে না দিয়া, আমাদের উভয়কে কষ্ট দেওয়াই তাহার অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হইল। তখন আর কোন উপায় না দেখিয়া আমি গোপনে মুক্তকেশীকে বলিলাম,—'যদি কখন বিশেষ কোন কষ্ট উপস্থিত হয়, তখন তুমি আমার কাছে পলাইয়া যাইও; আপাততঃ এই ভাবেই তোমাকে থাকিতে হইবে।' কত দিনই আমি কলিকাতায় থাকিলাম; মুক্তকেশী আর আমার নিকট আসিবার সুযোগ পাইল না। অবশেষে পাগলাগারদ হইতে পলাইয়া, সে আমার নিকট উপস্থিত হইল।"

"আপনি জানেন কি, কেন রাজা তাহাকে এমন করিয়া পাগলাগারদে আট্‌কাইয়া রাখিতেন?"

"মুক্তকেশী আমাকে যাহা বলিয়াছে, আমি তাহাই জানি। সে এ সম্বন্ধে গোলমাল করিয়া কত কথাই বলিত, তাহা আমি সব বুঝিতে পারিতাম না। তাহার কথার স্থূল মর্ম্ম এই, তাহার মাতা রাজার বিষয়ে একটা বিশেষ গোপনীয় কথা জানিত। আমি রামনগর হইতে চলিয়া আসার বহুদিন পরে, সেই কথা কোন সময়ে তাহার মা তাহার নিকট হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার পর মুক্তকেশী সেই গোপনীয় কথা জানিতে পারিয়াছে বুঝিয়া, রাজা তাহাকে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। সে গোপনীয় কথা যে কি তাহা তাহাকে হাজার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেও সে বলিতে পারিত না। কেবল বলিত, তার মা যদি মনে করে, তাহা হইলে রাজা প্রমোদরঞ্জনের সর্ব্বনাশ করিতে পারে। বোধ হয় হরিমতি তাহাকে ঐ কথাই বলিয়া থাকিবে। মুক্তকেশী যদি বস্তুতঃ কিছু জানিত, তাহা

হইলে আমাকে তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিত, এমন তো কখন বোধ হয় না।”

আমারও মনের এইরূপ বিশ্বাস। আমি মনোরমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে,যখন কাঠের ঘরে রাণীর সহিত মুক্তকেশীর সাক্ষাৎ হয়, তখন যে তিনি সত্য সত্যই কোন রহস্য জানিতে পারিতেন এমন বোধ হয় না। মুক্ত-কেশীর জননী হয় ত অসাবধানভাবে এমন কিছু বলিয়া থাকিবে, যাহা অবলম্বন করিয়া স্থূলবুদ্ধি মুক্তকেশী সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, সেও রাজার সর্ব্বনাশ করিতে পারে। পাপ-জনিত সন্দিগ্ধচিত্ত রাজা মনে করিয়া থাকিবেন, মুক্তকেশী তাহার মাতার নিকট সমস্ত কথা জানিয়াছে এবং রাণীও মুক্তকেশীর নিকট সমস্ত শ্রবণ করিয়াছেন।

রোহিণী ঠাকুরাণীর নিকট হইতে আর কোন বিশেষ সংবাদপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া এবং সময়ও অনেক হইয়াছে বুঝিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিবার সময় বলিলাম,—“আমি আপনাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করিয়াছি। আপনি হয়ত আমার উপরে কতই রাগ করিয়াছেন।”

তিনি বলিলেন,—“সে কি বাবা, আমি যাহা জানি তাহা আপনি যখন জিজ্ঞাসা করি-বেন, তখনই আমি বলিতে রাজি আছি।” তাহার পর সতৃষ্ণ নয়নে আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন,—“আমার বোধ হয়, আপনি মুক্তকেশীর খবর কিছু জানেন। যখন আপনি প্রথমে আসিলেন তখনই আপনার মুখ দেখিয়া আমার তাহা বোধ হইয়াছিল। সে আছে কি নাই, এ খবরটি পর্য্যন্ত না জানিয়া থাকা কত কষ্টকর তাহা আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না।' এরূপ অনিশ্চিত থাকার চেয়ে একটা ঠিক খবর পাওয়া বড়ই ভাল। আপনি বলিয়াছেন, তাহার সহিত আর সাক্ষাতের আশা নাই। আপনি জানেন কি, বলুন সত্য করিয়া, আপনি কি নিশ্চয় জানেন, ভগবান্ তাহার সকল কষ্টের শেষ করিয়া দিয়াছেন কি?”

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। ধীরে ধীরে বলিয়া ফেলিলাম—“বোধ হয় তাহাই ঠিক। আমি মনে মনে নিশ্চয় জানি, ইহ জগতে মুক্তকেশীর সকল জ্বালার শান্তি হইয়া গিয়াছে।”

আহা বৃদ্ধা মাটীতে আছড়াইয়া পড়িলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—“বলুন মহাশয়, আপনি এ সংবাদ কেমন করিয়া জানিলেন? কে আপনাকে এ কথা বলিল?”

আমি উত্তর দিলাম,—“কেহই আমাকে বলে নাই। কতকগুলি কারণে আমি ইহা স্থির করিয়াছি। সে সকল কথা এখনও প্রকাশ করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। আপনি সকলই জানিতে পারিবেন। আমি এ কথা আপনাকে বলিয়া রাখিতেছি [illegible], তাহার যত্নের কোন ত্রুটী হয় নাই, আর [illegible] বুকের বেদনাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আরও আপনাকে নিশ্চয়রূপে জানাইতেছি যে, তাহার সৎকারাদি কার্য্য যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। সকল বৃত্তান্তই আপনি ক্রমে জানিতে পারিবেন।”

তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—“মরিয়া গিয়াছে!—সৎকার হইয়াছে! এই অল্প বয়সে, সে আর নাই, আর আমি তাই শুনিবার জন্য বসিয়া আছি! আমি তাহাকে খাওয়াইয়াছি, ধুয়াইয়াছি মানুষ করিয়াছি। সে আমাকেই মা বলিয়া ডাকিত। সেই মুক্তকেশী আজি আর নাই! হা বিধাতঃ! কিন্তু বলুন মহাশয়! আপনি এত খবর কেমন করিয়া জানিলেন?”

আমি তাঁহাকে। আবার বলিলাম,—

"আপনি অপেক্ষা করুন, সকলই জানিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। আবার আমার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইবে; আমি আর একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্ত ২।১ দিনের মধ্যেই আবার আসিব।"

তিনি বলিলেন,—"না মহাশয়, যাহা জিজ্ঞাস্ত থাকে তাহা এখনই জিজ্ঞাসা করুন—আমাকে ভাবিত করিয়া রাখিবেন না।"

"রামনগরে হরিমতির ঠিকানা কি এই কথাটা কেবল আমার জানিতে ইচ্ছা আছে।"

আমার কথায় তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং যেন মুক্তকেশীর মৃত্যু সংবাদ ভুলিয়া গেলেন। সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"হরিমতির ঠিকানা লইয়া আপনি কি করিবেন?"

আমি বলিলাম,—"হরিমতির সহিত দেখা করিব। রাজার সহিত তাহার গোপন সাক্ষাতের কারণ কি, আমি তাহা জানিতে চাহি। আপনি বা প্রতিবেশিগণ যাহা মনে করিয়াছেন, রাজা ও হরিমতির বিগত সাক্ষাতের রহস্য নিশ্চয়ই তাহা অপেক্ষা স্বতন্ত্রবিধ। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে আমাদের অজ্ঞাত অতি গুরুতর এক রহস্য আছে। আমি সেই রহস্য উদ্ভেদ করিবার অভিপ্রায়ে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া হরিমতির নিকট যাইতেছি।

রোহিণী ঠাকুরাণী সকাতরে বলিলেন,—"এরূপ কার্য্য করিবার পূর্ব্বে একবার বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন। হরিমতি অতি ভয়ানক মেয়েমানুষ।"

"আপনি আমার ভালর জন্তই এ কথা বলিতেছেন তাহা আমি বুঝিতেছি। কিন্তু আমার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, আমি তাহার সহিত নিশ্চয়ই দেখা করিব।"

রোহিণী আমার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"দেখিতেছি আপনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। তবে ঠিকানা লিখিয়া লউন।"

তিনি ঠিকানা বলিয়া দিলেন। আমি তাহা আমার পকেট বহিতে লিখিয়া লইলাম। তাহার পর বলিলাম,—"আমি আজি আসি, আপনার সহিত আবার দেখা হইবে। আপনাকে সকল কথাই পুনঃ সাক্ষাতে বলিব।"

তিনি বলিলেন,—"এস বাবা! বুড়া মানুষের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিও না। আবার বলিতেছি, হরিমতি বড় ভয়ানক মেয়ে মানুষ।"

আমি কোন উত্তর না দিয়া প্রস্থান করিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া লীলার বড়ই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। এত দুঃসহ দুঃখ ও দারিদ্র্য ভারে যে লীলা একদিনও অবসন্ন হন নাই, আজি তিনি সহসা নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। লীলা শয্যার উপর বসিয়া আছেন, মনোরমা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত ও বিনোদিত করিবার জন্ত বহুবিধ অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। লীলা অবনত মস্তকে বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছেন। আমাকে দূর হইতে দর্শনমাত্র মনোরমা আমার নিকটস্থ হইয়া অস্ফুট-স্বরে বলিলেন,—"দেখ, তুমি যদি উহাকে উত্তেজিত করিতে পার।" তিনি প্রস্থান করিলেন।

আমি লীলার নিকটস্থ হইয়া একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলাম এবং জিজ্ঞাসিলাম,—"বল লীলা, বল, কেন তুমি এমন করিয়া আছ ? বল, তুমি কি ভাবিতেছ ?"

লীলা ছলছলিত নয়নে আমার নয়নের প্রতি চাহিয়া বলিল,—"আমার মন ভাল নাই, আমি কত কি ভাবি—"এই বলিয়া সরলা একটু আনত হইয়া আমার স্কন্ধের উপর মস্তক স্থাপন করিলেন। আমি বলিলাম,—"কেন তোমার মন ভাল থাকে না বল ! আমি এখনই তাহার প্রতিকার করিব।"

লীলা দীর্ঘনিশ্বাস সহ বলিলেন,—"আমি তোমাদের কোনই উপকারে লাগি না। আমি তোমাদের ঘাড়ের বোঝা মাত্র। দেবেন্ ! তুমি টাকা উপার্জ্জন কর, দিদিও তোমার সাহায্য করেন। আমিই কেবল বসিয়া থাকি। তুমি হয়ত ক্রমে দিদিকেই আমার চেয়ে বেশী ভাল বাসিবে। দোহাই তোমাদের, তোমরা আমাকে এমন করিয়া পুতুলের মত তুলিয়া রাখিও না।"

আমি সস্নেহে লীলার মস্তকোত্তোলন করিয়া সাদরে তাঁহার কপোল-নিপতিত কেশ-সমূহ অপসারিত করিয়া দিলাম। তদনন্তর বলিলাম—"এই কথা ! ইহারই জন্ম তোমার এত দুঃখ ? তুমিও আমাদের কাজের সহায়তা কর না কেন ? আজি হইতেই তুমি কাজ আরম্ভ কর।" এই বলিয়া আমি তাঁহার বিশৃঙ্খল কাগজ পত্র একত্রিত করিয়া তাঁহার নিকটে আনিয়া দিলাম এবং বলিলাম,—"জান তো তুমি, আমি কাগজের জন্ম প্রবন্ধ রচনা করিয়া জীবিকার্জ্জন করি। তুমিও বহুদিনের যত্নে বেশ রচনা করিতে শিখিয়াছ। আজি হইতে তুমিও প্রবন্ধ চয়না করিতে আরম্ভ কর। যে ব্যক্তি আমার প্রবন্ধ গ্রহণ করিয়া অর্থ প্রদান করে, সেই ব্যক্তিই তোমার প্রবন্ধ গ্রহণ করিয়া অর্থ প্রদান করিবে। তোমার প্রবন্ধ একখানি স্ত্রীলোক-প্রকাশিত কাগজে অতি সমাদরে প্রকাশিত হইতে থাকিবে ; সুতরাং তোমারও এতদুপায়ে যথেষ্ট উপার্জ্জন হইবে। সেই অর্থ তুমি নিজের নিকটে রাখিয়া দিবে। মনোরমা যেমন আমার নিকটে আসিয়া সংসার খরচের জন্ম টাকা চাহেন, অতঃপর সেইরূপ তোমার নিকটেও চাহিবেন। ভাবিয়া দেখ লীলা, তখন তোমার সাহায্য নহিলে আমাদের আর চলিবে না।"

তাঁহার বদনে আগ্রহপূর্ণ আনন্দ-জ্যোতিঃ দেখা দিল। তিনি বিগত কালের ন্যায় উৎসাহ ও সজীবতা সহকারে কাগজ-কলম লইয়া লিখিতে বসিলেন। তাহার পর হইতে লীলা অবিরত যত্নে ও পরমোৎসাহে কর্ম্মে মনঃসংযোগ করিতে লাগিলেন। স্বকীয় অকর্ম্মণ্যতা-বোধ হেতু তাঁহার এই শুভ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। মনোরমা ও আমি এই হিত পরিবর্ত্তনের অনুকূলতা করিতে লাগিলাম। তাঁহার প্রবন্ধ রচনা সমাপ্ত হইলে, তিনি তাহা আমার হস্তে প্রদান করিতেন। আমি তাহা মনোরমাকে দিতাম এবং তিনি তাহা লুকাইয়া রাখিতেন। আমি আমার উপার্জ্জিত অর্থ হইতে কিছু কিছু টাকা, লীলার রচিত প্রবন্ধের মূল্য আদায় হইয়াছে বলিয়া, তাঁহাকে প্রদান করিতাম। কখন কখন লীলা সগর্ব্বে তাঁহার মুদ্রাধার আমাদের সমক্ষে উন্মুক্ত করিয়া দেখাইতেন যে, তিনি হয়ত সে সপ্তাহে আমার অপেক্ষাও অধিক উপার্জ্জন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এবংবিধ গৌরবের প্রশ্রয় দিয়া এই নির্দ্দোষ প্রতারণা চালাইতাম। আহা ! লীলার তৎকাল রচিত সেই সমস্ত

প্রবন্ধ এখনও আমার নিকট রহিয়াছে। তৎসমস্ত আমার নিকট অমূল্য সম্পত্তি—লীলার চিত্তবিকার বিদূরিত করার সাধনস্বরূপ সেই কাগজগুলি আমার চির সমাদৃত রক্ষণীয় ধন।

কিন্তু পরাগত সুখ-স্মরণে জীবনের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইবার প্রয়োজন নাই। বিষম সন্দেহ ও ভীতিপূর্ণ, এই কঠোর ক্লেশময় বর্ত্তমান ব্যাপারের আলোচনায় পুনঃ প্রবৃত্ত হওয়াই আবশ্যক।

লীলার অজ্ঞাতসারে কথা কহিবার সুযোগ উপস্থিত হইবামাত্র, আমি মনোরমাকে রোহিণীর সহিত সাক্ষাতের বৃত্তান্ত ও কথাবার্ত্তা সমস্তই জানাইলাম। হরিমতির সহিত সাক্ষাতের কথা উঠিলে, মনোরমাও রোহিণীর ন্যায় বলিলেন,—"দেবেন্দ্র, এখনও তুমি এমন কিছুই জানিতে পার নাই যাহার জন্য হরিমতি তোমাকে ভয় করিবে। অন্যান্য সহজ উপায়ের চেষ্টা না করিয়া এখনই হরিমতির নিকট যাওয়া উচিত কি? যখন তুমি আমাকে বলিয়াছিলে, লীলার কৃষ্ণসরোবর হইতে কলিকাতায় আসার তারিখ রাজা ও চৌধুরী মহাশয় ব্যতীত আর কেহই জানেন না, তখন তোমারও মনে পড়ে নাই, আমারও মনে পড়ে নাই যে, আর এক ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাহা জানে। সে ব্যক্তি রমণী। রাজার নিকট হইতে সেই তারিখের কথা বাহির করিবার চেষ্টা করার অপেক্ষা রমণীর নিকট চেষ্টা করা অপেক্ষাকৃত সহজ নহে কি?"

আমি উত্তর দিলাম,—"সহজ হইতে পারে। কিন্তু আমরা জানি না রমণী এ চক্রান্তে কতদূর লিপ্ত। এ ব্যাপারে যদি তাহার কোন স্বার্থ না থাকে, তাহা হইলে এ কথা মনে করিয়া রাখা তাহার পক্ষে সম্ভব নাও হইতে পারে। রাজা ও চৌধুরী স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া এই দুষ্কর্ম্ম-সাধন করিয়াছেন, সুতরাং এ ব্যাপারের প্রত্যেক কথা তাঁহাদের মনে আছে সন্দেহ নাই। অতএব এক্ষণে রমণীর সন্ধানে সময় নষ্ট করা নিতান্তই অনাবশ্যক। মনোরমা, তুমি মনে করিতেছ যে, আমি রাজাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিব না? অথবা আমি রাজার নিকট হারিয়া যাইব?"

তিনি উত্তর দিলেন,—"সে ভয় আমার নাই; কারণ এবার চৌধুরীর রাজার সঙ্গে নাই। অতি ধূর্ত্ত চৌধুরীর সহায়তা না পাইলে রাজা তোমার কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবেন না।"

আমি উত্তর করিলাম,—"আমি চৌধুরীকেই কি ছাড়িব মনে করিয়াছ? কখনই না। তোমার মনে আছে, গিন্নি-ঝির লিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া জানা গিয়াছে যে চৌধুরী মহাশয় রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের সহিত পত্র লেখালেখি চালাইয়াছিলেন। নিতান্ত গুরুতর প্রয়োজন উপস্থিত না হইলে, তিনি কখনই সেই অপ্রকৃতিস্থ ও তাঁহার চির-বিদ্বেষী ব্যক্তিকে পত্র লিখিতেন না ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। সেই পত্র ও সাক্ষাতের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই এমন কোন কথা জানা যাইবে, যাহাতে চৌধুরীকে আমাদের মুঠার মধ্যে আনিতে পারা যাইবে। আমি তো রামনগরে যাইতেছি। এই সময়ের মধ্যে তুমি রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়কে এই মর্ম্মে এক পত্র লেখ যে, জগদীশনাথ চৌধুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাতের সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হওয়া তোমার নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। অতএব তিনি যেন তাহা অচিরে লিখিয়া পাঠান। যদি তিনি স্বেচ্ছায় লিখিয়া না দেন, তাহা হইলে আইনের

সাহায্যে তাঁহার নিকট হইতে সকল কথা বাহির করা যাইবে, ইহাও লিখিতে তুমি ভুলিও না।"

"তা আমি লিখিব; কিন্তু তুমি কি সত্য সত্যই রামনগর যাইতে সঙ্কল্প করিয়াছ?"

"তাহাতে আর কোনই সংশয় নাই। কালি না হয় পরশ্ব আমি নিশ্চয়ই রামনগরে যাইব।"

তৃতীয় দিনে আমি রামনগরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এ কার্য্যে আমার ২।১ দিন বিলম্ব হওয়া অসম্ভব নহে। এজন্য মনোরমার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলাম, তিনিও প্রতিদিন আমাকে পত্র লিখিবেন, আমিও তাঁহাকে পত্র লিখিব। সাবধানতার অনুরোধে আমরা পরস্পরকে আরোপিত নামে পত্র লিখিব স্থির হইল। যত দিন আমি মনোরমার নিকট হইতে নিয়মিতরূপ পত্র পাইতে থাকিব, তত দিন আমি বুঝিব যে ভয়ের কোনই কারণ উপস্থিত হয় নাই। যদি কোন দিন পত্র না পাই তাহা হইলে আমি সেই দিনই চলিয়া আসিব। লীলার নিকট আমার অনুপস্থিতির নানারূপ কল্পিত কারণ উত্থাপন করিলাম এবং তাঁহাকে স্বচ্ছন্দ চিত্ত ও সন্তুষ্ট দেখিয়া আমি যাত্রা করিলাম। মনোরমা দ্বার পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন এবং অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"আমরা কিরূপ চিন্তাকুল থাকিব তাহা মনে থাকে যেন। তুমি নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিলে, আমাদের সকল শান্তি। যদিই এ যাত্রায় কোন অচিন্তিত-পূর্ব্ব ঘটনা ঘটে—মনে কর যদিই তোমার সহিত রাজার সাক্ষাৎ হয়—"

আমি বাধা দিয়া জিজ্ঞাসিলাম,—"রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে, এরূপ আশঙ্কা তোমার মনে কেন উদিত হইতেছে?"

"বলিতে পারি না কেন; তথাপি মনে হইতেছে। হয়ত তাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে। আমার মনের এইরূপই প্রকৃতি। দেবেন্দ্র তুমি হাস, আর যাহাই কর দোহাই তোমার, যদি সেই ব্যক্তি তোমার সম্মুখীন হয়, তাহা হইলে তুমি যেন ক্রোধান্ধ হইয়া কোন কাজ করিও না।"

"কোন ভয় নাই, মনোরমা। আমি রাগের বশবর্ত্তী হইব না।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আমি বিদায় হইয়া দ্রুতপদে ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমার মনে উৎসাহ ও আশার সীমা নাই। কে যেন আমাকে বলিয়া দিতেছে, আমার এবারকার যাত্রা নিষ্ফল হইবে না। সময় অতি মনোহর। অতি নির্ম্মল বায়ু ঝির ঝির করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। নবোদিত দিবাকরের হৈম কিরণ বিশ্ব বিভূষিত করিতেছে। সকলই প্রীতিপদ, সকলই সন্তোষময়। আমার হৃদয় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ এবং সর্ব্বশরীর তদ্ধেতু আসুরিক বল-সম্পন্ন। যথাসময়ে রেল শকট বসুধা বিকম্পিত করিতে করিতে ধাবমান হইল। যথাকালে আমি নির্ব্বিঘ্নে রামনগর পৌছিলাম।

রামনগর অতি ক্ষুদ্র গ্রাম। বড় জনহীন, বড় ফাকা ফাকা। তথাপি নিরন্তর কলিকাতা বাসের পর হঠাৎ এরূপ স্থানে আসিলে চিত্ত বিনোদিত হয়। গ্রামে পৌছিয়া আমি সন্ধানে সন্ধানে ক্রমে হরিমতির বাটীর নিকট উপস্থিত হইলাম। রাস্তায় বিশেষ লোকজন নাই। কদাচিৎ

একটি স্ত্রীলোক কলসী কাঁকে করিয়া সরোবর হইতে জল আনিতে চলিতেছে; এক জন চাষা টোকা মাথায় দিয়া গরু তাড়াইতে তাড়াইতে মাঠ হইতে ফিরিতেছে। কোথায় বা গ্রাম্য পণ্য-বিক্রেতা বাঁশের খুঁটি হেলান দিয়া নিদ্রা দিতেছে। এক বৃদ্ধ ছেঁড়া মাদুরে বসিয়া ডাবা হুকায় তামাকু খাইতেছে।

আমি নির্দ্দিষ্ট বাটীর দ্বার সমীপস্থ হইয়া দেখিলাম তাহা অভ্যন্তর হইতে বদ্ধ। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া আমি সেই দ্বারের শিকল নাড়িতে লাগিলাম। কিয়ৎ কাল পরে, একজন মধ্য বয়সী স্ত্রীলোক আসিয়া, আমাকে দ্বার খুলিয়া দিল এবং আমি কাহার সন্ধান করিতেছি জিজ্ঞাসা করিল। আমি তাহাকে বলিলাম যে, একটু বিশেষ দরকারের জন্য হরিমতি ঠাকুরাণীর সহিত আমি দেখা করিতে ইচ্ছা করি। সে, আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, ভিতরে চলিয়া গেল এবং কিঞ্চিৎ কাল পরে ফিরিয়া আসিয়া আমার দরকার কি জানিতে চাহিল। আমি তখন বলি কি? তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলাম,—"ঠাকুরাণীর কন্যার বিষয়ে বিশেষ কোন কথা আছে।" সে পুনরায় চলিয়া গেল এবং পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া আমাকে ভিতরে আসিতে বলিল। দেখিলাম ছোট একটী একতালা কুঠরী, সম্মুখে খুব চওড়া রক। অঙ্গনমধ্যে এক তুলসীমঞ্চ। তাহার চারিদিকে কয়েকটা ফুলের গাছ। সকলই বেশ পরিষ্কার; অতিশয় ঝরঝরে। আমি দাসীর সঙ্গে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, ঘরের মধ্যভাগও বেশ পরিষ্কার। ভিত্তি-গাত্রে হিন্দুদেবদেবীর অনেক ছবি বিলম্বিত। ঘরের এক কোণে কোষাকুষি প্রভৃতি সরঞ্জাম। আর দেখিলাম, একটি জানালার নিকটে একজন প্রাচীনা স্ত্রীলোক, হরিনামের ঝোলা হস্তে, বসিয়া আছেন। তাঁহার দেহের যথাযথ স্থানে তিলকাদি শোভা পাইতেছে।। তাঁহার মূর্ত্তি খুব বলিষ্ঠ ও দৃঢ়িষ্ঠ। মাথার চুল সব পাকে নাই, অনেক পাকিয়াছে। মুখ ও দৃষ্টির ভাব এতই সংযত যে, তাহা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ভাব অনুমান করিতে প্রয়াসী হওয়া নিতান্তই নিরর্থক। তাঁহার ওষ্ঠাধর স্থূল ও ইন্দ্রিয়াসক্তির পরিচায়ক। ইনিই হরিমতি।

আমি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই, তিনি আমাকে বলিলেন—"আপনি আমাকে আমার কন্যার কথা বলিতে আসিয়াছেন? বলুন কি?"

তাঁহার কণ্ঠস্বরও এরূপ সমান যে, তাহা শুনিয়াও তাঁহার মনের ভাব অনুমান করা সম্ভব নহে। তিনি আমাকে একখানি পিঁড়ি দেখাইয়া দিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি যখন বসিতেছি, তখন তিনি মনোযোগ সহকারে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। আমি মনে করিলাম, এ বড় কঠোর ঠাঁই; অতএব খুব সাবধান হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে হইবে। বলিলাম,—"আপনি জানেন, আপনার কন্যা হারাইয়া গিয়াছে?"

"আমি তাহা বেশ জানি।"

"এ অবস্থায় তাহার মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নহে, ইহাও আপনি আশঙ্কা করেন বোধ হয়।"

"হাঁ। আপনি কি আমাকে তাহার মৃত্যু সংবাদ দিতে আসিয়াছেন?"

"তাই বটে।"

সম্পূর্ণ উদাসীন ও অকাতর ভাবে, কণ্ঠস্বর ও মুখভঙ্গীর কোন প্রকার অন্যথা না করিয়া তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "কেন?" মাথায় একটা

কুকুর মরিয়া গিয়াছে শুনিলেও কেহ এরূপ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে পারিত কি না সন্দেহ।

আমি তাঁহার কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেন? আপনি কি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কেন আমি আপনার কন্যার মৃত্যু-সংবাদ দিতে আসিয়াছি?"

"হাঁ। সেই বা আপনার কে, আমিই বা আপনার কে, আপনি তাহার কথা জানিলেন কিরূপে?

"যে রাত্রিতে সে পাগলাগারদ হইতে পলাইয়াছিল, সেই রাত্রিতে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহার পর সে যাহাতে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিতে পারে, আমি সে জন্য তাহার সাহায্য করিয়াছিলাম।"

"আপনি বড় অন্যায় কাজ করিয়াছিলেন।"

"তার মার মুখে এ কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম।"

"তা আপনি হউন, তথাপি আমি ঐ কথাই বলিতেছি। সে যে মরিয়াছে, তাহা আপনি জানিলেন কিরূপে?"

"তাহা আমি এখন বলিতে অক্ষম। কিন্তু আমি জানি সে আর নাই।"

"কি উপায়ে আমার ঠিকানা পাইলেন, তাহাও আপনি বলিতে অক্ষম কি?"

"আমি রোহিণী ঠাকুরাণীর নিকট আপনার ঠিকানা জানিয়াছি।"

"রোহিণী অতি নির্ব্বোধ মেয়েমানুষ। সে কি আপনাকে আমার নিকট আসিতে বলিয়া দিয়াছিল?"

"না, তা তিনি বলেন নাই।"

"তবে আপনি এখানে আসিলেন কেন?"

"মুক্তকেশীর মাতা, কন্যা বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে জানিবার নিমিত্ত, স্বভাবতঃ অত্যন্ত ব্যাকুল আছেন ভাবিয়া, আমি আসিয়াছি।"

হরিমতি আরও একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"বেশ কথা। আপনার অন্য কোন অভিপ্রায় নাই?"

সহসা এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব ভাবিতেছি, এমন সময় তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"যদি আপনার কোন অভিপ্রায় না থাকে, তাহা হইলে আপনার কথা শেষ হইয়াছে; আপনি এখন আসিতে পারেন। আপনি কি উপায়ে এ সংবাদ জ্ঞাত হইলেন, তাহা যদি বলিতেন, তাহা হইলে আপনার সংবাদ আরও সন্তোষজনক হইত। যাহা হউক, তাহার জন্য কোন শ্রাদ্ধ করা আবশ্যক হইবে কি না বুঝিতে পারিতেছি না। আপাততঃ স্নান করা দরকার হইবে বোধ হইতেছে।" এই বলিয়া তিনি নির্ব্বিকারচিত্তে হরিনামের ঝুলি যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। তদনন্তর আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া, পুনরায় বলিলেন,—"আপনি এখন আসুন তবে।"

তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া আমার রাগ হইল এবং আমি, তখন আমার অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে বলিতে সঙ্কল্প করিয়া, কহিলাম,—"এখানে আসিবার আমার আরও কারণ আছে।"

হরিমতি বলিলেন,—"হাঁ, আমিও তা বুঝিয়াছি।"

"আপনার কন্যার মৃত্যু—"

"কি রোগে তাহার মৃত্যু হইল?"

"হৃদ্রোগ।"

"হাঁ। তার পর?"

"আপনার কন্যার মৃত্যু উপলক্ষে দুইটী লোক আমার এক অতি প্রিয় ব্যক্তির সর্ব্বনাশ

সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহার একজন রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়।”

“বটে ?”

আমি প্রণিধান করিয়া দেখিতে লাগিলাম, রাজার নাম শ্রবণে তাহার মুখের কোন ভাবান্তর হয় কি না, সে একটুও বিচলিত হয় কি না। দেখিলাম সে পাষাণ দ্রবীভূত হইবার নহে। তাহার একটী শিরাও বিকম্পিত হইল না।

আমি বলিতে লাগিলাম,—“আপনার কন্যার মৃত্যু অপরের অনিষ্টের কারণ হইতেছে শুনিয়া, আপনি হয় ত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছেন।”

হরিমতি উত্তর দিলেন,—“না, আমি কিছুই আশ্চর্য্য জ্ঞান করি নাই। আপনি আমার বিষয়ে যেরূপ আগ্রহযুক্ত, আমি আপনার বিষয়ে সেরূপ আগ্রহযুক্ত নহি।

আমি আবার বলিলাম,—“আপনি হয় ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, আমি এ সকল কথা আপনার নিকট বলিতে আসিয়াছি কেন ?”

“এ কথা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি বটে।”

“আমি রাজা প্রমোদরঞ্জনকে এই দারুণ দুষ্ক্রিয়ার জন্য দায়গ্রস্ত করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি বলিয়া, আপনাকে এত কথা জানাইতে আসিয়াছি।”

“আপনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, তা আমার কি ?”

“শুনুন। রাজার অতীত জীবনে এরূপ অনেক ব্যাপার আছে, যাহা জানিতে পারিলে আমার উদ্দেশ্যের বিশেষ সহায়তা হইবে। আমি সেই জন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি।”

“কি ব্যাপার বলুন।”

“যখন আপনার স্বামী ঠাকুরবাড়ীর গোমস্তা ছিলেন, সেই সময়ে পুরাণ রামনগরে যে সকল কাণ্ড ঘটিয়াছিল ও আপনার কন্যা জন্মিবার পূর্ব্বে যে যে ব্যাপার হইয়াছিল, তাহাই আমি জানিতে চাহি।”

এতক্ষণে, এত সঙ্কোচ, এত গাম্ভীর্য্যের পর,—এতক্ষণে যেন হরিমতিকে আমি বিচলিত করিতে পারিয়াছি বোধ হইল। দেখিলাম তাঁহার চক্ষে রাগের লক্ষণ স্পষ্টই প্রকাশিত হইতেছে ; তাঁহার স্থির, নিশ্চল হস্তদ্বয় পরিধান বস্ত্রের এক প্রান্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—“আপনি সে সকল ব্যাপারের কি জানেন ?”

আমি উত্তর দিলাম,—“রোহিণী যাহা যাহা জানিতেন, আমি সে সবই জানি।”

তাঁহার ভঙ্গী দেখিয়া তিনি যেন ক্রোধান্ধ হইয়া কি বলিবেন মনে হইল। কিন্তু না, তিনি তখনই সে ভাব সংবরণ করিলেন ও দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়া ঈষৎ বিদ্রূপসূচক হাসির সহিত আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—“এতক্ষণে আমি সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিতেছি। রাজা প্রমোদরঞ্জনের সহিত আপনার বৈরিতা আছে ; আপনি শত্রু-নির্য্যাতনে সচেষ্ট হইয়াছেন ; আমাকে তাহারই সাহায্য করিতে হইবে ; রাজার সহিত আমার যাহা যাহা ঘটিয়াছে সে সব আপনাকে বলিতে হইবে। কেমন ? তাহা নহিলে চলিবে কেন ? আপনি মনে করিয়াছেন, আমি একটা পতিতা, দুঃখিনী মেয়ে মানুষ বই তো নহি, দুঃখে কষ্টে দিন যাপন করি, সহজেই ভয়প্রযুক্ত আপনার নিকট সকল কথা বলিয়া ফেলিব। বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি, আপনার অভিপ্রায় বেশ জানিতে পারিয়াছি।” এই বলিয়া তিনি হাঃ হাঃ শব্দে ক্রোধ সহকৃত কর্কশ হাস্য করিলেন। তাহার পর আবার বলিতে লাগিলেন,—“আমি এখানে

কিরূপে থাকি তা আপনি জানেন না বুঝি ! পাড়ার লোক ডাকিয়া আপনাকে তাড়াইয়া দিবার আগে, সে সকল কথা আপনাকে শুনাইয়া দিতেছি। অকারণে, অন্যায়রূপে আমার চরিত্রের কুৎসা চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছিল। সেই কুৎসা দূর করিয়া, পুনরায় সুনাম লাভ করিবার বাসনায়, আমি এই স্থানে নিরন্তর পড়িয়া আছি এবং ক্রমে ক্রমে তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছি, আগে যাহারা আমাকে দেখিলে মুখ বাঁকাইত, এখন তাহারা আমার সহিত সাগ্রহে ফিরিয়া কথা কহে। যে সকল সতী-লক্ষীরা আগে আমাকে দেখিলে হাসিতেন, এখন তাঁহারাই আমি কেমন আছি, জানিবার জন্য, ব্যাকুল। আগে কোন ক্রিয়া-কর্ম্মে গ্রামের কেহই আমাকে নিমন্ত্রণ করিত না এবং আমি জোর করিয়া কোন ক্রিয়া বাড়ীতে গেলেও লোকে বিরক্ত হইত। এখন আমি সেই ক্রিয়া বাড়ীর রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া কাজ কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। এ সকল কথা বুঝি আপনি জানিতেন না? গ্রামের যেখানে যাইবেন, সেইখানেই আমার সুযশ শুনিতে পাইবেন। বলরাম ভট্টাচার্য্য সপরিবারে শয্যাগত। কে তাঁহাদের পথ্য রাঁধিয়া দেয়, সেবা শুশ্রূষা করে জানেন? আমি। ভজার মা ঘরে মরিয়া পড়িয়া ছিল, সৎকার হয় না। কে উদ্যোগী হইয়া, খরচ পত্র করিয়া তাহার সৎকার করাইল জানেন? আমি। গোয়ালাদের মেয়ে প্রসব হইল; কিন্তু এমন সাধ্য নাই যে একটি পয়সা খরচ করিয়া মেয়ের প্রাণ বাঁচায়। তখন ঘি, ঝাল মসলা লইয়া কে উপস্থিত জানেন? আমি। কত আপনাকে বলিব? বলিয়াই বা ফল কি? কোন ভয়েই আমি কদাপি অবসন্ন হইব না। গ্রামস্থ তাবতেই আমার আত্মীয় এবং আমার সুনাম সর্ব্বত্র। আমি কেবল পরের উপকার, পূজা অর্চ্চনা, রামায়ণ—মহাভারত পাঠ ও হরিনাম করিয়া কাটাই।” এমন সময়ে পথে কোন লোকের জুতার শব্দ শুনিয়া হরিমতি একটু জানালা খুলিলেন। একজন বৃদ্ধ, লম্বোদর, শ্মশ্রু-গুম্ফবিরহিত, শিখাধারী ব্রাহ্মণ, চটি জুতা ফটাস্ ফটাস্ করিতে করিতে, পথ দিয়া চলিতেছেন। তিনি হরিমতিকে দর্শনমাত্র জিজ্ঞাসিলেন,—“মা! ভাল আছ তো?” হরিমতি উত্তর দিল,—হাঁ বাবা, ভাল আছি।” ব্রাহ্মণ চলিতে চলিতে বলিতে লাগিলেন,—“তোমার মত পুণ্যশীলা লোক ভাল থাকিলেই সকল মঙ্গল।” তখন হরিমতি সগর্ব্বে বলিল,—“দেখিলেন তো স্বচক্ষে? উনি সিদ্ধান্ত মহাশয়! এখানকার টোলের অধ্যাপক এবং গ্রামের পুরোহিত। শুনিলেন তো উনি কি বলিলেন? আপনি মনে করিয়াছেন, এইরূপ স্ত্রীলোক নিন্দার ভয়ে অবসন্ন! এখন কি ভাবিতেছেন বলুন।”

আমি উত্তর দিলাম,—“যাহা ভাবিয়া আসিয়াছি, এখনও তাহাই ভাবিতেছি। গ্রাম মধ্যে আপনি যথেষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। সে সম্মান নষ্ট করিতে আমার ইচ্ছা নাই, সাধ্যও নাই। আমি জানি রাজা প্রমোদরঞ্জন আপনারও শত্রু, আমারও শত্রু। তাঁহার উপর আমার রাগের যেরূপ কারণ আছে, আপনারও সেইরূপ আছে। আপনি এ কথা অস্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন, করুন। আপনি আমাকে অবিশ্বাস করিতে পারেন, আমার উপর রাগ করিতেও পারেন; কিন্তু যদি আপনার কিছুমাত্র চৈতন্য থাকে, তাহা হইলে ঐ দুর্ব্বৃত্তের সর্ব্বনাশ সাধনার্থ আমার সহায়তা করা আপনার নিতান্ত আবশ্যক ও উচিত।”

তিনি বলিলেন,—"আপনি উঁহার সর্ব্বনাশ করিয়া আমার নিকট আসিবেন ; তখন দেখিবেন আমি কি বলি।"

এই কথা কয়টি তিনি দ্রুত, ক্রুদ্ধ ও প্রতিহিংসাপূর্ণ ভাবে সমাপ্ত করিলেন। যে দারুণ ক্রোধ এত দিন তিনি পোষণ করিতেছেন, তাহা এতক্ষণে আমি জাগরিত করিতে সমর্থ হইয়াছি ; কিন্তু ক্ষণেকের নিমিত্ত। দলিত-ফণা সর্পের ন্যায় তাঁহার ক্রোধ তখনই স্ফুিত হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু সঙ্গেসঙ্গেই আবার সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"আপনি তবে আমাকে বিশ্বাস করিবেন না ?"

"না।"

"কেন ? আপনি ভয় পাইতেছেন ?"

"আপনার কি তাহাতেই বোধ হইতেছে ?"

"আমার বোধ হইতেছে, আপনি রাজা প্রমোদরঞ্জনের ভয়ে ভীত।"

"বটে !"

আমি দেখিলাম তাঁহার বদনে ও চক্ষুতে সবিশেষ ক্রোধের লক্ষণ প্রকটিত হইতেছে। অতএব এই সুরে কথা চালাইলে কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে আশা করিয়া আমি বলিলাম, "রাজা যেরূপ ধনবান্ ও পদ-প্রতিষ্ঠা-বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাতে তাঁহাকে ভয় করা আপনার পক্ষে কোনই বিচিত্র কথা নহে। প্রথমতঃ তাঁহার উপাধি রাজা, তিনি প্রভূত-জমিদারীর স্বামী, অতি সদ্বংশে তাঁহার জন্ম—"

এই সময়ে তিনি হঠাৎ অতিশয় হাসিয়া উঠিলেন এবং অতীব ঘৃণার সহিত বলিলেন,—"হাঁ হাঁ, রাজা—জমিদারীর স্বামী—অতি সদ্বংশে জন্ম ! ঠিক্ ঠিক্ ! অতি সদ্বংশে—বিশেষতঃ মাতৃপক্ষে !"

এখন সময় নষ্ট করিয়া এ সকল কথার মর্ম্মালোচনা করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না এ স্থান হইতে প্রস্থান করার পর, এ সব কথা ভাবিয়া দেখিব মনে করিয়া, আমি বলিলাম,—আমি বংশের বিচার করিতে আপনার নিকট আসি নাই। আমি রাজার মাতৃসম্বন্ধে কিছুই জানি না—"

তিনি তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়া বলিলেন,—"তবে আপনি রাজার সম্বন্ধেও কিছু জানেন না।"

আমি বলিলাম—"তা ভাবিবেন না। আমি রাজার সম্বন্ধে অনেক জানি এবং অনেক সন্দেহ করি।"

"কি কি আপনি সন্দেহ করেন ?"

"আমি যাহা যাহা সন্দেহ করি না তাহাই আপনাকে আগে বলিতেছি। আমি সন্দেহ করি না যে, তিনি মুক্তকেশীর পিতা।"

এই কথা যেই বলা সেই মাগী বাঘিনীর মত লাফাইয়া উঠিল। ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। অতিশয় ক্রোধ-বিকম্পিত স্বরে সে বলিতে লাগিল,—"কি স্পর্দ্ধা ! কোন্ সাহসে তুমি এরূপ কথার উত্থাপন করিতেছ ? কে মুক্তকেশীর পিতা, কে পিতা নহে ইহার বিচার তুমি কোন্ সাহসে করিতেছ ?"

আমিও জোর করিয়া বলিলাম,—"আপনার ও রাজার জীবনে যে রহস্য আছে, তাহা এতৎসংক্রান্ত নহে। যে রহস্য রাজার জীবন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, আপনার কন্যার জন্মের সহিত তাহার উদ্ভব হয় নাই এবং আপনার কন্যার মৃত্যুতে তাহার অবসান হয় নাই।"

তিনি সে স্থান হইতে একটু সরিয়া গেলেন এবং দ্বারের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিলেন,—"আপনি চলিয়া যাউন।"

আমি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলাম,—"আপনি ও রাজা যে সময়ে রাত্রিকালে ঠাকুরবাড়ীর পার্শ্বে গোপনে আলাপ করিতেন এবং যে সময়ে আপনাদের সেই রহস্যালাপ আপনার স্বামী ধরিতে পারিয়াছিলেন, তখন আপনার অথবা রাজার অন্তঃকরণে আপনার কন্যার জন্মসংক্রান্ত কোন ভাবনা ছিল না; আপনাদের মধ্যে কোন অবৈধ প্রণয়ও ছিল না।"

দেখিলাম তাঁহার ভঙ্গীর বিশেষ পরিবর্ত্তন হইল। আমার উক্তির মধ্যে আমি দৈবাৎ ঠাকুরবাড়ীর পার্শ্বে, এই দুইটি কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। ইহাই কি এরূপ ভাবান্তরের কারণ? তাঁহার ক্রোধ অনেকটা কমিয়া গেল বোধ হইল। তিনি কিয়ৎকাল নির্ব্বাক্‌ভাবে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"আপনি কি এখনও আমাকে অবিশ্বাস করিতেছেন?"

তিনি উত্তর দিলেন,—"হাঁ।"

"আপনি কি এখনও আমাকে চলিয়া যাইতে বলেন?"

"হাঁ। আর কখন এখানে আসিবেন না।"

আমি দ্বারের দিকে চলিয়া আসিলাম এবং গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে, বলিলাম,—"আশা করি রাজার সম্বন্ধে আমি আপনার আশাতীত কোন সংবাদ আনিতে সক্ষম হইব। যদি তাহা পারি তবেই আবার আমি আপনার নিকট আসিব।"

"রাজার বিষয়ে এমন কোন সংবাদ নাই যাহা আমি আশা করি না। কেবল—"আর কিছু না বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে আপনার আসনে উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন,—"কেবল তাঁহার মৃত্যু সংবাদের আশা নাই।"

দেখিলাম তাঁহার অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাস্যরেখা প্রকটিত হইয়াছে। আর দেখিলাম, তিনি অতি ধূর্ত্ততাসহ আমার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতেছেন। আমি কিরূপ বলিষ্ঠ, রাজার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে ও মারামারি বাধিলে কোন্ পক্ষ জয়ী হইবে, তাহাই কি তিনি আলোচনা করিতে ছিলেন? যাহাই ভাবুন, আমি আর বাক্যব্যয় না করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

আমি বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইলাম সেই সিদ্ধান্ত মহাশয় আবার ফিরিয়া যাইতেছেন। তিনি সেই জানালার নিকটস্থ হইলে হরিমতি জিজ্ঞাসিলেন,—"সুদোর ছেলে, ক'দিনের পর, আজি ভাত খাবে কথা ছিল; খেয়েছে কি বাবা?" সিদ্ধান্ত বলিলেন,—"খেয়েছে বোধ হয়। তোমার বাছা এতও মনে থাকে! আমাদের এই গ্রাম খানির তুমিই লক্ষ্মী।"

আর কি চাও? গ্রামের অধ্যাপক ও পুরোহিত আমার সমক্ষে তাঁহার সহিত দুই দুইবার কথা কহিলেন; তাঁহাকে পুণ্যশীলা ও গ্রামের লক্ষ্মী বলিলেন। ইহার অপেক্ষা সম্মান আর কি হইতে পারে?

নবম পরিচ্ছেদ।

—**—

আমি হরিমতির আবাস ত্যাগ করিয়া কয়েক পদ মাত্র আসিতে না আসিতে, পার্শ্বে একটা দরজা খোলার শব্দ পাইলাম। ফিরিয়া দেখিলাম, ঠিক হরিমতির বাটীর পার্শ্বেই,

একটা বাটীর দরজায় একটা কালো মত লোক দাঁড়াইয়া আছে। লোকটা দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিল এবং আমার আগে আগে যাইতে লাগিল। আমি সহজেই চিনিতে পারিলাম, যে ছেঁড়া মোজার আর একবার আমার আগে আগে কৃষ্ণসরোবরের পথে চলিয়াছিল এবং যে আমার সহিত ঝগড়া বাধাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল, এ সেই লোক। নিকটস্থ হইলে আমার সহিত লোকটা একবার কথাবার্ত্তা কহিবে কি না, ভাবিতে ভাবিতে আমিও সেই দিকে চলিতে লাগিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, সে একটি কথাও কহিল না, একবার ফিরিয়াও চাহিল না, একমনে দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। তাহার এরূপ ব্যবহারে আমার মনে বড়ই কৌতূহল ও সন্দেহ জন্মিল এবং আমি তাহাকে দৃষ্টিপথে রাখিয়া তাহার অনুসরণ করিতে মনস্থ করিলাম। এইরূপে চলিতে চলিতে আমরা রেল ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। লোকটা একবারও পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিক্ষেপ করিল না।

গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে হইয়াছে। যে ২।১ জন আরোহী দেরি করিয়া আসিয়াছে, তাহারা তখনও টিকিট ঘরের গবাক্ষের নিকট গোল করিতেছে। শুনিতে পাইলাম সেই ছেঁড়া মোজারও সেই গোলে মিশিয়া, কৃষ্ণ সরোবরের টিকিট চাহিতেছে। টিকিট লইয়া সে গাড়িতে উঠিল, তাহাও আমি দেখিলাম।

এ ব্যাপারের অর্থ কি? আমি স্পষ্টই দেখিয়াছি, হরিমতির বাটীর ঠিক পার্শ্বস্থ বাটী হইতে সে বাহির হইয়াছে। শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, আমি হরিমতির সহিত সাক্ষাৎ করিব, সম্ভবতঃ এই আশঙ্কা করিয়া রাজা এই লোককে হরিমতির ভবন-পার্শ্বে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। লোকটা নিশ্চয়ই আমাকে হরিমতির বাটীতে যাইতে ও তথা হইতে আসিতে দেখিয়াছে এবং তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণসরোবরে, রাজাকে এই সংবাদ দিবার জন্য, ধাবিত হইয়াছে। সুতরাং অতঃপর স্বল্প কালের মধ্যে রাজার সহিত আমার সাক্ষাৎ হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

ঘটনাচক্র যে স্থানে গিয়াই অবস্থিত হউক, আমি কোন দিকেই দৃষ্টিপাত না করিয়া এবং রাজা প্রমোদরঞ্জন বা অন্য কাহারও জন্য কোন চিন্তা না করিয়া, অবিলম্বিত গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কলিকাতায় বড় আশঙ্কিত হইয়া চলাফেরা করিতে হইত; কারণ সেখানে আমাকে কেহ চিনিতে পারিলে, ক্রমে লীলার গুপ্তনিবাসও জানিতে পারিবে। কিন্তু এখানে সেরূপ কোন আশঙ্কা নাই। এখানে আমি ইচ্ছামত চলাফেরা করিতে পারি। যদিই কেহ আমাকে চিনিতে পারে তাহাতে আমারই বিপদ ঘটিবে, অপর কেহই সে জন্য দায়গ্রস্ত হইবে না।

ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় প্রায় সন্ধ্যা হইল। এরূপ অপরিচিত নূতন স্থানে রাত্রিতে আর কোন সন্ধানের সুবিধা হইবে না। বুঝিয়া, আমি ষ্টেশন সন্নিহিত এক দোকান ঘরে আশ্রয় লইলাম এবং সেই স্থানেই জলযোগ করিয়া পড়িয়া থাকিলাম। আহারান্তে মনোরমাকে সমস্ত সংবাদ সহ এক পত্র লিখিলাম।

রাত্রিতে দোকান ঘর নিতান্ত নির্জ্জন হইয়া গেল। আমি ছেঁড়া মাদুরে পড়িয়া অন্ধকার সমস্ত ঘটনা আলোচনা করিতে লাগিলাম। হরিমতির সমস্ত ব্যবহার ও সকল কথাবার্ত্তা স্মরণ করিতে লাগিলাম। যখন রোহিণী আমার নিকট রাজা ও হরিমতির নৈশ মিলন-

ক্ষেত্র স্বরূপে ঠাকুরবাড়ীর পার্শ্বের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তখনই আমার মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে, এরূপ অবৈধ প্রণয়ের জন্য, তাঁহারা ঠাকুরবাড়ীর সমীপদেশ ভিন্ন আর কোথায় কি স্থান পান নাই? এরূপ প্রকাশ্য স্থান কি এতাদৃশ কার্য্যের অনুকূল? যাহাই হউক, আমি দৈবাৎ ঠাকুরবাড়ীর নাম করিয়া ফেলিবার পর হইতে হরিমতির বিস্ময়জনক ভাবান্তর হইয়াছিল। আমার অনেক দিন হইতে ধারণা হইয়াছে যে, কোন অতি গুরুতর দুষ্ক্রিয়া রাজা প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহাই তাঁহার জীবনের রহস্য। অধুনা ঠাকুরবাড়ির নামে হরিমতির ভয় দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইল যে, এই স্ত্রীলোক সেই দুষ্ক্রিয়ার কেবল সাক্ষী নহে—এ তাহার সাহায্যকারী।

কিন্তু কি সে দুষ্ক্রিয়া? অনেক ভাবিয়াও তাহার কিছুই অনুমান করিতে সক্ষম হইলাম না। দেখিয়াছি হরিমতি রাজাকে যেমন ঘৃণা করে, রাজার মাকেও তেমনই ঘৃণা করে। রাজার বংশের কথা উত্থিত হইলে, সে নিতান্ত ঘৃণা ও বিদ্রূপ সহ বলিয়াছিল যে, অতি সদ্বংশেই তাঁহার জন্ম বটে, "বিশেষতঃ মাতৃপক্ষে।" এ কথার অর্থ কি? একথার তিন অর্থ সম্ভব। ১মতঃ হয় ত রাজার জননী অতি নীচ-বংশোদ্ভবা। ২য়তঃ, হয় ত তাঁহার চরিত্র ভাল ছিল না। ৩য়তঃ, হয় ত তিনি রাজার পিতার বিবাহিতা বনিতা ছিলেন না। হরিমতির কথা সবিশেষ বিচার করিলে শেষ কথাটাই সঙ্গত মনে হয়। রাজার উপাধি, ঐশ্বর্য্য ও বংশ সকলেরই উপর হরিমতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছিল। শেষ মীমাংসা ভিন্ন তাহার কথার কোনই অর্থ হয় না। কিন্তু তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে অবশ্যই রাজা কোন অত্যদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করিয়া নাম, সম্ভ্রম, বিষয়াদির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন সন্দেহ নাই। সে কৌশল, সে রহস্য, অবশ্যই তিনি বিহিত যত্নে প্রচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টাশীল এবং তাহা প্রকাশিত হইলে তাঁহার সম্পূর্ণ অধঃপতন ধ্রুব নিশ্চিত। তাঁহার সমস্ত ব্যবহার স্মরণ করিয়া দেখিলে, এরূপ কোন ঘৃণিত রহস্য তাঁহার জীবনের সহিত নিশ্চয়ই সংশ্লিষ্ট আছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে রামনগরের ঠাকুরবাড়ীর সহিত তাহার সম্বন্ধ কি? এই স্থানে এত সতর্কতার সহিত হরিমতিকে নিয়োজিত করিয়া রাখায় রাজার অভিপ্রায় কি? এই দুর্জ্জেয় কাণ্ডের কোনই মীমাংসা সম্ভব নহে। ফলতঃ যাহাই হউক, প্রত্যূষে উঠিয়া, ঠাকুরবাড়ীর বর্ত্তমান গোমস্তার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিব সঙ্কল্প করিয়া আপাততঃ এ চিন্তা পরিত্যাগ করিলাম এবং নিদ্রাদেবীর শুভাগমন প্রার্থনায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পতিত রহিলাম। যদি বা নিদ্রা এক বার দেখা দিতেন তাহাও হইল না। দোকানদার ভজহরি দে বিলক্ষণরূপ অহিফেন সেবা করিয়া থাকেন। শেষ রাত্রি না হইলে তাঁহার নিদ্রা হয় না। তিনি এ দিকের সমস্ত রাত্রিটুকু নিরন্তর তামাক খাইতে খাইতে ও কাশিতে কাশিতে অতিবাহিত করিয়া থাকেন। এখন তিনি একবার তাম্রকূট সেবনার্থ উঠিয়া দেশলাই ঘসিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন ও টীকা ধরাইলেন এবং বিহিত বিধানে তামাক সাজিয়া ভড়র ভড়র শব্দে হুঁকা টানিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাশি—ওঃ দম আট্‌কাইয়া মারা যায় আর কি! তবু কি হুঁকা ছাড়ে!

এই বিসদৃশ ব্যাপার দেখিয়া আমি হাঁই ছাড়িয়া ও গা ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিলাম। আর একটা দোহার পাইলাম ভাবিয়া, ভজহরি বড় খুসি হইল এবং সাদরে বলিল,—"বাবু কি তামাক খাইবেন না কি ?"

আমি উত্তর দিলাম,—"না. আমি তামাক খাই না।"

ভজহরি হয় ত দুঃখিত হইল এবং আমাকে নিতান্ত অপদার্থ বলিয়াই মনে করিল। জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবুর কি করা হয় ?"

আমি তাহাকে যাহা হয় একটা বুঝাইয়া দিলাম। সে তখন জিজ্ঞাসা করিল,—"এ দেশে মহাশয়ের কি মনে করে আসা ?"

আমি বলিলাম,—"মনে বিশেষ কিছুই নাই। একবার এ দেশটা দেখা-শুনাই প্রধান ইচ্ছা।"

সে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"আর মহাশয়, এ দেশে এখন আর দেখিবার কিছুই নাই। পূর্ব্বকালে আমাদের গ্রামের ঠাকুরবাড়ী দেখিবার জন্য অনেক লোক সর্ব্বদা যাওয়া আসা করিত বটে। তখন সে এক দিন ছিল। এখন সবই গিয়াছে।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"আগে অনেক লোক আসিত, এখন আর আসে না কেন ?"

"কি আর বলিব মহাশয়, কালে কালে সবই লোপ হইতেছে। এখন কি আর লোক ঠাকুর দেবতা মানে ? আমাদের এই ঠাকুরের ভারী মাহাত্ম্য। দেশ-বিদেশ হইতে লোক ঠাকুরের পূজা দিতে, তাঁহাকে দর্শন করিতে ও তাঁহার কাছে ধন্না দিতে আসিত। ওঃ তখন ধুম ছিল কত ! তখন ঠাকুরবাড়ীর কাছেই আমার দোকান ছিল। প্রতিদিন আমরা বিশ ত্রিশ টাকা বেচা কেনা করিতাম। শেষে আর কিছুই হয় না; পেট চলে না দেখিয়া ক্রমে রেলের ধারে দোকান উঠাইয়া আনিয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"ঠাকুরের মাহাত্ম্য কি রকম ?"

"ওঃ ঠাকুর বড় জাগ্রত। যে যা কামনা করে তা কখন নিষ্ফল হয় না।"

"বটে ! ঠাকুরের সেবার ব্যবস্থা কিরূপ ?"

ঠাকুরের যা আয় আছে, তা সব সেবায় খরচ হয়। সে আয় বড় কম নয়—বৎসরে ২॥০ হাজার টাকা। তা ছাড়া ঠাকুরের আরও এক আয় আছে; তাতেও বড় কম জমে না।"

"আর কি আয় ?"

এ অঞ্চলে চারিদিকে ১৫ ক্রোশের মধ্যে যেখানে যে বিবাহ হইবে, সেই তারিখ ধরিয়া, ঠাকুরবাড়ীর খাতায় সে জন্য কিছু না কিছু প্রণামী জমা দিতে হইবেই হইবে। তা দু পয়সাই হউক, আর দু হাজার টাকাই হউক। ঠাকুরবাড়ীর খাতায় এ প্রদেশের যে বিবাহের উল্লেখ নাই, সে বিবাহ অসিদ্ধ। বিবাহ বিষয়ে কত আইন আদালত হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরবাড়ীর খাতায় যে বিবাহের প্রণামী জমা নাই, সে বিবাহ মিথ্যা ও জুয়াচুরি বলিয়া আদালত নামঞ্জুর করিয়াছে। এমন ব্যাপার কতই হইয়াছে। কেন আপনি কি শুনেন নাই, চলিত কথাই আছে, 'রামনগরের ঠাকুরবাড়ী, বিয়ের বাব সরকারী।' এমন চলিত কথা কতই আছে। ইহাতেও ঠাকুরের মন্দ আয়——"

আমি তাহার কথার শেষাংশ আর শুনিলাম না। যাহা শুনিলাম তাহাতেই আমার হৃদয়-শোণিত সবেগে বহিতে লাগিল। পূর্ব্বাপর সমস্ত বিচার করিয়া আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল, এই ঠাকুরবাড়ীর খাতায় রাজার জীবনের সমস্ত রহস্য নিহিত আছে। হরিমতির কথাবার্ত্তা স্মরণ করিয়া, এবং রাজার

সমস্ত ব্যবহার আলোচনা করিয়া, আমার মনে বিলক্ষণ বিশ্বাস জন্মিল, নিশ্চয়ই রাজা তাঁহার পিতার বিবাহিতা বনিতার পুত্র নহেন এবং নিশ্চয়ই রাজার পিতার বিবাহের প্রণামী ঠাকুরবাড়ীর খাতায় জমা নাই। এই স্থানেই যাহা হউক একটা কাণ্ড আছে। কতক্ষণে স্বয়ং ঠাকুরবাড়ী উপস্থিত হইয়া স্বচক্ষে খাতা দেখিব ভাবিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইলাম। কতক্ষণে রাত্রির অবসান হইবে ভাবিয়া আমি অধীর হইলাম। ঠাকুরের মাহাত্ম্য বিষয়ে ভজহরি অনেক বক্তৃতা করিল। কিন্তু আমি তাহার কোন কথাতেই কর্ণপাত করিলাম না, কোন উত্তর প্রত্যুত্তরও করিলাম না। সে আমাকে নিদ্রিত মনে করিয়া অগত্যা নিরস্ত হইল।

ক্রমে সুদীর্ঘ নিশার অবসান হইলে, আমি দোকান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম এবং অতিশয় উৎকণ্ঠিতভাবে ঠাকুরবাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। অদ্যকার কার্য্যের ফলাফলের উপর আমার উদ্দেশ্যের সফলতা ও বিফলতা সবিশেষ নির্ভর করিতেছে। সুতরাং যত্ন-সহকারে হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ ও শান্ত করিতে করিতে সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

ক্রমে শুভ্রবর্ণ, সমুন্নত ও বিস্তৃত ঠাকুরবাড়ী আমার নেত্র-পথবর্ত্তী হইল। গ্রামের সমস্ত লোক ঘরবাড়ী উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে। বনের ভগ্নাবশেষ সকল চারিদিকে ঢিবি হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আমি সেই সকল ভগ্নাবশেষের পার্শ্ব দিয়া দ্রুতপদে চলিতেছি, এমন সময় একটা ভগ্নপ্রাচীরের পার্শ্বদেশ হইতে দুইটী লোক দেখা দিল। তাহাদের একজন আমার পরিচিত। আমি যে দিন উকিল করালী বাবুর আফিস হইতে ফিরিতে ছিলাম, তখন যে দুই ব্যক্তি আমার সঙ্গ হইয়াছিল এ ব্যক্তি তাহাদেরই একজন। তাহার সঙ্গীটাকে আমি কখন দেখি নাই। তাহারা আমার সহিত কোনই কথা কহিল না এবং আমার নিকটস্থ হইতেও চেষ্টা করিল না। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, আমি যে হরিমতির সহিত দেখা করিয়াছি, রাজা সে সংবাদ পাইয়াছেন এবং তদনন্তর আমি যে নিশ্চয়ই ঠাকুরবাড়ী যাইব, তাহাও তিনি বুঝিয়াছেন। সেই সংবাদ প্রাপ্তির জন্যই, তিনি এই দুই লোককে এই স্থানে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন সন্দেহ নাই। আমার অনুসন্ধান এবার যে ঠিক পথে চলিতেছে বর্ত্তমান ব্যাপার তাহার অবিসংবাদিত প্রমাণ। আমি ঠাকুরবাড়ীর দ্বার ছাড়াইলাম। বর্ত্তমান গোমস্তার বাসা দেবালয়ের খুবই নিকট। আমি সেই দিকেই চলিলাম।

গোমস্তা মহাশয়ের বেশ বাড়ীটুকু। চারিদিকে নানাবিধ ফলফুলের গাছ, মধ্যে বেশ পরিষ্কার একটি একতালা ঘর, সম্মুখে রংকরা ঝিলিমিলি ও রেল-লাগান একটি বারান্দা। তিনি পুত্র-বিহীন লোক; একাকী সেই বাড়ীতে বাস করেন। আমি যখন তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি বারান্দায় একখানি জলচৌকির উপর বসিয়া প্রকাণ্ড একটা গাড়ু লইয়া, মুখ ধুইতেছেন। লোকটী প্রাচীন; বেশ সভ্যভব্য; বড় সুমূর্ত্তি; কিন্তু একটু বেশী গম্ভে। তাঁহার একটু সংস্কৃত বোধ আছে; গোমস্তাগিরির চেয়ে একটু বেশী লেখা পড়া জানা আছে; মনে মনে এ সকল কারণে একটু অহঙ্কারও আছে এবং সে অহঙ্কারটুকু চাপিয়া রাখার ক্ষমতাও নাই। আমাকে দেখিয়া তিনি পরম সমাদরে আপ্যায়িত করিলেন। আমি কলিকাতা হইতে আসিয়াছি এবং তাঁহারই নিকটে আমার প্রয়োজন শুনিয়া, তাঁহার আহ্লা র

সীমা থাকিল না। অনেক কথার পর ক্রমে ঠাকুরবাড়ীর কথা উঠিল এবং বিবাহের প্রণামী-বিষয়ক কথাও উঠিল। আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"এই বিবাহের প্রণামী বাবদে আপনাদের সালিয়ানা কি পরিমাণ আয় হয়?"

তিনি বলিলেন,—"আয় সকল বৎসর সমান হয় না; কারণ বিবাহ সকল বৎসর সমান হয় না। তবে এ কথা বলিতে পারি, এ অঞ্চলে এমন বিবাহই হয় না, যাহার জন্য কিছু না কিছু প্রণামী এ ঠাকুরবাড়ীতে না আইসে। কেহ ইচ্ছা করিয়া দিল, কেহ যে দিল না, তা আর হইবার যো নাই। কারণ এখন সর্বসাধারণের সংস্কার দাঁড়াইয়াছে, এখানকার খাতায় তারিখ ধরিয়া অল্পই হউক, অধিকই হউক, কিছু জমা না দিলে, সে বিবাহই অসিদ্ধ। কাজেই লোকে প্রণামী জমা না দিয়া কোন মতেই থাকিতে পারে না; সুতরাং আয়ের কোন ব্যাঘাত হয় না।"

আমি বলিলাম, "যখন আপনাদের খাতায় প্রণামী জমা হওয়া এত গুরুতর ব্যাপার এবং তাহা না হইলে যখন এত অনিষ্টের সম্ভাবনা, তখন সে সম্বন্ধে আপনাদের বড়ই সাবধান থাকিতে হয় তো।"

তিনি বলিলেন,—"ওঃ সে বিষয়ে সাবধানতার কোন ত্রুটি নাই। নিয়ম এই, যিনি যখন গোমস্তা থাকিবেন, তাঁহাকে স্বহস্তে বিবাহের প্রণামী জমা করিতে হইবে এবং যেটি যে তারিখে আসিবে, সেটি সেই তারিখেই জমা করিতে হইবে। রাত্রি দ্বিপ্রহর হইলেও ছাড়াছাড়ি নাই। তারপর এখান হইতে ৩ ক্রোশ পশ্চিমে, রূপনগর গ্রামে রাজসরকারের সদর কাছারী আছে। সেই কাছারিতে নায়েব ও অন্যান্য আমলা থাকেন। এ প্রদেশে রাজসরকারের যত বিষয়-সম্পত্তি আছে, রূপনগরেই তাহার কাছারিবাড়ী। আমাদের ঠাকুরবাড়ীর কাগজপত্রও সেখানে দাখিল করিতে হয়। অন্যান্য কাগজপত্র নিয়মমত সময়ে সময়ে পাঠাইতে হয়, কিন্তু বিবাহের প্রণামী যে দিনকার যেটি, সেই দিনই সেটি চালান সহ লিখিয়া পাঠাইতে হয়। সেখানে চালানখানি সেরেস্তায় থাকে, আর পাকা খাতায় সেটি জমা হয় এবং সে পাকাখাতা অতি সাবধানে রাখা হয়।"

আমি বলিলাম,—"এ সকল অতি সুব্যবস্থা সন্দেহ নাই। আমি একবার আপনাদের এই বিবাহের খাতা দেখিতে ইচ্ছা করি। যদি মহাশয় কৃপা করিয়া দেখান।"

তিনি বলিলেন,—"তার আর বিচিত্র কি? এখনই আপনাকে দেখাইয়া দিতেছি। এ বিষয়ে আপনার কোন গোল উপস্থিত হইয়াছে বুঝি? তা সেজন্য কোন চিন্তা নাই। এ প্রদেশের যদি কোন বিবাহের কথা হয়, তাহা হইলে আমাদের খাতায় তাহার নিদর্শন নিশ্চয়ই পাইবেন। কোন্ কুলীন কোথায় ভাঙ্গিয়াছে, কে কোথায় বিবাহ দিয়া জাতি নষ্ট করিয়াছে, কোন শ্রোত্রীয় ফাঁকি দিয়া কুলীনের ঘরের মেয়ে বিবাহ করিয়াছে ইত্যাদিরূপ সমস্ত পরিচয় আমাদের খাতা হইতে প্রকারান্তরে পাওয়া যায়। আর যদি এ অঞ্চলে কোন বেশ্যার ছেলে কলে কৌশলে সমাজে চলিবার যোগাড় করে, আমাদের প্রণামীর খাতা তাহার প্রবল শত্রু। এরূপ কোন সংবাদ যদি আপনার দরকার হয়, আপনি আমাদের খাতা হইতে নাম আর তারিখ টুকিয়া লইয়া, যে কোন ভাল ঘটককে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, সে তখনই আপনাকে

সকল সংবাদ দিবে। তবে চলুন, এখনই যদি মহাশয় তাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আমার সঙ্গে আসুন। আমি এইরূপ সময়েই প্রতিদিন ঠাকুরবাড়ী, গিয়া থাকি।"

আমি বলিলাম,—"চলুন তবে। আমার এখনই তাহা দেখিবার দরকার।"

গোমস্তা মহাশয়ের বাক্য-স্রোত থামিল না। কথা কহিতে কহিতে আমরা ঠাকুরবাড়ী আসিলাম। ঠাকুরবাড়ী বৃহৎ ব্যাপার। এক-দিকে ভোগের মহল, একদিকে লোকজন থাকিবার মহল, একদিকে গোমস্তার মহল, একদিকে অতিথিশালা। এক প্রকাণ্ড পাঁচ-ফুকুরি দালানে পাষাণময় হরিহরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। আশে পাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরে আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিগ্রহ সংস্থাপিত। প্রকাণ্ড উঠান—পাথর ছাওয়া। সম্মুখে নহবৎখানা। আমি গোমস্তা মহাশয়ের সহিত চারিদিক ঘুরিয়া, শেষে তাঁহার মহলে প্রবেশ করিলাম এবং তাঁহার ঘরে গিয়া বসিলাম।

তিনি বলিলেন,—"বকেয়া খাতাপত্র সমস্ত পাশের এই ঘরে থাকে। বলিতে গেলে সে ঘর কাগজেই বোঝাই। কিন্তু সকলই বেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ আছে—দেখিতে কোন কষ্ট নাই। আসুন আমার সঙ্গে, আপনাকে ঐ ঘরে লইয়া যাই।"

আমি তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। দেখিলাম বস্তুতই সে ঘর কাগজে বোঝাই বটে। তিনি বলিলেন,—"দেখিতেছেন, এ ঘরটি একটি সিন্দুক বলিলেই হয়। এইরূপ হওয়াই উচিত। ঘরের একটি দ্বার। তাহা আবার কেমন মজবুত দেখুন। বাহিরে এই দ্বারের তিন স্থানে তিনটি তালা। ভিতরে এ দ্বার বন্ধ করিবার কোনই উপায় নাই; কারণ ভিতর হইতে বন্ধ করিবার কখনই কোন দরকার হয় না। ভিতরে কেবল দুইটি কড়া লাগান আছে মাত্র—সেও কেবল ধরিবার ও খুলিবার সুবিধার জন্য।"

প্রকৃত প্রস্তাবে বন্দোবস্ত খুবই ভাল। কাগজপত্রগুলি বৃহৎ বৃহৎ ঘড়িঞ্চায় রক্ষিত এবং বর্ষে বর্ষে ভাগ করিয়া টিকিট মারা। আমাকে গোমস্তা মহাশয় জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি কোন বর্ষের কাগজ দেখিতে চাহেন?"

আমি বলিলাম,—"১২১১ সালের আগে?"

তিনি আমাকে ১২১১ সালের ঘড়িঞ্চা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,—"ইহার বামদিকে উত্তরোত্তর আরও আগেকার কাগজ দেখিতে পাইবেন। আপনি নিঃসঙ্কোচে ইচ্ছামত ও আবশ্যকমত কাগজ পত্র দেখুন। আপাততঃ কৃপা করিয়া আমাকে একটু ছুটী দিউন; আমি সরকারী কাজ দেখিতে যাই।"

আমি বলিলাম,—"আপনি যাইবেন বই কি? আপনি যতটুকু অনুগ্রহ করিয়াছেন, ইহা আশাতীত। আমি আপনার শিষ্টাচারে পরমাপ্যায়িত হইয়াছি।"

গোমস্তা মহাশয় চলিয়া গেলেন; আমি ১২০৯ সালের ১নং জমা খরচ বহি বাহির করিলাম। আমি জানিতাম, ১২১১ সালে রাজা প্রমোদরঞ্জনের জন্ম হয়। সুতরাং অন্তত পক্ষে তাহার দুইবৎসর আগে, তাঁহার পিতা মাতার বিবাহ হইয়াছিল ধরিতে হয়; কিন্তু যে কয়টা মাসে বিবাহ হয়, সে সব কয়টাই দেখিলাম; কত বিবাহের বাবদে কত টাকাই প্রণামী জমা দেখিলাম, কিন্তু এ সংক্রান্ত তো কিছুই দেখিলাম না। তাহার পর ১২০৮ দেখিতে আরম্ভ করিলাম। বৈশাখ—কিছুই নাই। জ্যৈষ্ঠ—কিছুই নাই। আষাঢ়—কিছু নাই। শ্রাবণ—কিছু নাই। অগ্রহায়ণ—কিছু নাই। মাঘ—আছে আছে। দেখিলাম পৃষ্ঠার শেষভাগে, স্থানের অল্পতা

হেতু একটু ঠেসাঠেসি করিয়া, এই বিবাহের প্রণামী জমা করা আছে। লিখিত রহিয়াছে, রাজা বসন্তরঞ্জন রায়ের সহিত কুসুমকামিনী দেবীর বিবাহ বাবদ প্রণামী জমা ১০০৲। ইহার অব্যবহিত পর পৃষ্ঠার উপরে, দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির বিবাহের উল্লেখ আছে। আমার সহিত নামের সমতা হেতু আমি তাহা মনে করিয়া রাখিলাম। রাজার বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে বিবাহের উল্লেখ আছে তাহাও আমি বেশ করিয়া দেখিয়া লইলাম এবং, পাছে ভুলিয়া যাই ভাবিয়া, পকেট বহিতে এ সকল সংবাদ লিখিয়া লইলাম। কেবল স্থানের অত্যল্পতা হেতু অতিশয় যে সাঘিসি ভিন্ন, রাজা বসন্তরঞ্জনের বিবাহ বিষয়ে আর কোন সন্দেহজনক লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইল না। যে রহস্য এখনই উদ্ভেদ করিতে সক্ষম হইব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম, তদ্বিষয়ে হতাশ হইলাম। ঠাকুরবাড়ীর খাতায় যাহা দেখিলাম তাহাতে রাজা প্রমোদরঞ্জনের সংক্রান্ত কোনই বিরুদ্ধ প্রমাণ দেখিলাম না; বরং তাঁহার সততা সম্বন্ধেই প্রকৃষ্ট প্রমাণ পরিদৃষ্ট হইল। অতঃপর খাতা বন্ধ করিয়া কি কর্ত্তব্য ভাবিতে ভাবিতে, বাহিরে আসিলাম। গোমস্তা মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"মহাশয়ের কাজ শেষ হইয়াছে?"

আমি বলিলাম,—"আজ্ঞা হাঁ। কিন্তু আমার অনুসন্ধান সন্তোষজনক হইল না।"

তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন, আপনি যাহা সন্দেহ করিয়াছিলেন, খাতায় কি তাহার বিরোধী প্রমাণ দেখিতে পাইলেন?"

আমি বলিলাম,—"তাই বটে।"

তিনি বলিলেন,—"তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার ভুল হইয়াছিল। যাহা হউক, যদিই মনে বিশেষ সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে সন্দেহ ভঞ্জন আপনি রাজপুরের সদর কাছারীর খাতা ও চালান মিলাইতে পারেন। যদিও এখানকার খাতার সহিত সেখানকার কাগজ পত্রের কোনরূপ অনৈক্যের সম্ভাবনা নাই, তথাপি মনের সন্দেহ মিটাইয়া ফেলাই ভাল।"

আমারও মনে হইল, অধুনা তাহাই সৎপরামর্শ; একবার রাজপুরের খাতা সন্ধান করা নিতান্তই কর্ত্তব্য; যদিও তাহাতে কোন প্রকার বিভিন্নতা লক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তথাপি সেটি না দেখিয়া ফিরিয়া যাইলে, কার্য্য অসমাপিত থাকিবে। অতএব অদ্য এখনই এই দুই তিন ক্রোশ পথ আমি পদব্রজে গমন করিতে সংকল্প করিলাম। তদনন্তর বিহিত বিধানে গোমস্তা মহাশয়ের সহিত শিষ্টাচার সমাপ্ত করিয়া আমি রাজপুরের অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

রাজপুর একটা মহকুমা এবং রামনগরের ন্যায় নিতান্ত পল্লীগ্রাম নহে। ডাক্তার বিনোদ বাবুর বাটী রাজপুরের নিকটেই এবং কৃষ্ণসরোবর হইতে বেশী দূর নহে। আমি পূর্ব্বে একবার রাজপুরের নিকটে বিনোদ বাবুর বাটীতে এবং কৃষ্ণসরোবরের রাজবাড়ীতে আসিয়াছিলাম।

ঠাকুরবাড়ী হইতে বাহির হইয়া কিয়দ্দূর আসার পর আমি পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম পূর্ব্বদৃষ্ট ব্যক্তিদ্বয় এবং তাহাদের সঙ্গে তৃতীয় এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। কিয়ৎকাল পরে তন্মধ্যস্থ একজন রামনগরের দিকে চলিয়া গেল এবং অপর দুইজন আমার অবলম্বিত পথেই চলিতে আরম্ভ করিল। তাহারা আমারই অনুসরণ করিতেছে বুঝিয়া, আমার মনে পুনরায় আশার সঞ্চার হইল। কারণ ঠাকুরবাড়ীর অনুসন্ধান শেষ হইলে আমি নিশ্চয়ই রাজপুরে যাইব, একথা

অবশ্য রাজা বুঝিয়াছেন এবং সেই জন্যই অনুসরণকারী নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং রাজপুরে কোন না কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যাইবে এরূপ আশা করা কখন অসঙ্গত নহে। আবার আশার সঞ্চারে আমার হৃদয় বলীয়ান্ হইয়া উঠিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

আমি দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম; লোক দুইটাও কিছু দূরে দূরে সমানভাবে আমার সঙ্গে আসিতে লাগিল। দুই একবার তাহারা একটু অধিকতর বেগে চলিয়া আমার নিকটস্থ হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু আবার তখনই দাঁড়াইয়া উভয়ে কি পরামর্শ করিয়া, পুনরায় পূর্ব্ববৎ দূরে দূরে আসিতে লাগিল। তাহাদের মনে যে কোন দুরভিসন্ধি আছে তাহার সন্দেহ নাই। সেই দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ ও সদুপায়ের জন্য তাহারা অপেক্ষা করিতেছে, ইহা আমার বেশ বোধ হইল। তাহাদের অভিপ্রায় কি তাহা যদিও আমি স্থির করিতে পারিলাম না, তথাপি নির্ব্বিঘ্নে রাজপুর গমন করার পক্ষে আমার ব্যাঘাত ঘটিবে বলিয়া আশঙ্কা হইতে লাগিল। শীঘ্রই এ আশঙ্কা সফলিত হইল।

রাস্তা নিতান্ত জনহীন। একস্থানে উহা অতিশয় বাঁকিয়া গিয়াছে। সেই বাঁকের নিকটস্থ হইবামাত্র, পশ্চাতে পদধ্বনি শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম লোক দুইটা আমার খুব নিকটে আসিয়াছে। যেই আমি পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলাম, সেই যে লোকটা কলিকাতায় আমার সঙ্গ লইয়াছিল, সে হঠাৎ অগ্রসর হইয়া আমার বাম দিকে ধাক্কা দিয়া চলিয়া গেল। তাহারা এইরূপে আমার সঙ্গ লওয়ায় আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলাম, তাহার পর এই ব্যবহারে আমি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলাম এবং হস্ত দ্বারা লোকটাকে ঠেলিয়া দিলাম। সে তখনই বাবা গো, মেরে ফেলিল গো, দোহাই কোম্পানি, কে আছ, রক্ষা কর' বলিয়া চীৎকার করিল। তাহার সঙ্গী তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া আমার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিল, পূর্ব্বকথিত ব্যক্তি আমার বাম হস্ত ধারণ করিল। এইরূপে তাহারা আমাকে বন্দী করিয়া ফেলিল। তাহারা উভয়েই আমার অপেক্ষা বলশালী, সুতরাং তাহাদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিলে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া অগত্যা নিরস্ত হইয়া থাকিলাম এবং সন্নিকটে যদি অপর কোন লোক দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাহার নিকটে সাহায্য পাইব আশা করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, অদূরে মাঠে, একজন কৃষক কর্ম্ম করিতেছে। সে ব্যক্তি সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবে বিবেচনায়, আমি তাহাকে আমাদের সহিত রাজপুর পর্য্যন্ত আসিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। সে ব্যক্তি নিতান্ত অসভ্যভাবে ঘাড় নাড়িয়া, অপর দিকে চলিয়া গেল। আমার শত্রুদ্বয় এই সময়ে ব্যক্ত করিল যে, তাহারা রাজনগরে উপস্থিত হইয়া আমার বিরুদ্ধে মারপিটের নালিশ রুজু করিবে। আমি তাহাদের বলিলাম,—"তোমরা আমার হাত ছাড়িয়া দেও। আমি তোমাদের সঙ্গে রাজপুর

যাইতেছি চল।" আমার অপরিচিত ব্যক্তি নিতান্ত কর্কশভাবে, হাত ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করিল। কিন্তু অপর ব্যক্তি, এ ব্যবহার অসঙ্গত ও বিগর্হিত বোধে, হাত ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইল এবং তাহার সঙ্গীকেও সেইরূপ করিতে বলিল। তাহারা উভয়ে আমার হাত ছাড়িয়া দিলে, আমি স্বাধীনভাবে তাহাদের মধ্যে চলিতে লাগিলাম।

বাঁক ছাড়াইয়া কিয়দ্দূর মাত্র যাইয়াই আমরা রাজপুর গ্রামে উপনীত হইলাম। গ্রামের প্রবেশমুখেই থানা। ব্যক্তিদ্বয় আমাকে সঙ্গে লইয়া থানায় গেল এবং আমার বিরুদ্ধে মারপিটের অভিযোগ উপস্থিত করিল। দারোগা মহাশয়, উভয় পক্ষের বক্তব্য লিখিয়া লইয়া, আমাদের সকলকে তখনই চালান দিলেন। ডেপুটী বাবুর নিকট আমরা উপস্থিত হইলাম। লোকটি বড় রুক্ষভাব এবং আপনার ক্ষমতাগৌরবে বড়ই অহঙ্কৃত। তিনি উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া, সাক্ষীর কথা জিজ্ঞাসিলে, অভিযোগকারীদ্বয় সেই চাষার নামোল্লেখ করিল দেখিয়া, আমি অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। তিনি অভিযোগকারীদিগকে সেই সাক্ষী আনিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়া আমাকে আপাততঃ জামিনে খালাস দিতে চাহিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া বুঝিলাম, আমি বিদেশী লোক না হইলে, তিনি আমার জামিন চাহিতেন না। স্থির হইল আবার তিন দিন পরে মোকদ্দমা হইবে।

আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, আমার সময় নষ্ট করাইয়া কোনরূপে আমার উদ্দেশ্য-সাধনে বিলম্ব ঘটানই এই দুই ব্যক্তির অভিপ্রায়। যেরূপে হউক, কিছু সময় অতীত রাই তাহাদের অভিসন্ধি। বর্ত্তমান মোকদ্দমা তাহারই একটা উপায় মাত্র। সম্ভবতঃ এইরূপে কিছু সময় কাটাইতে পারিলে, তাহারা মামলা চালাইবে না। আমার মন এই সকল আলোচনা করিয়া এতই চঞ্চল হইল যে, আমি ডেপুটিবাবুকে, গোপনে পত্র লিখিয়া সমস্ত ব্যাপার জানাইতে ইচ্ছা করিলাম। তদর্থে কালী, কলম, কাগজ লইয়া লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়ার পর, এ কার্য্যের একান্ত অবৈধতা আমার হৃদ্গত হইল। এই ক্ষুদ্র ঘটনা আমাকে এরূপে বিচলিত করিয়াছে স্মরণ করিয়া, আমি মনে মনে লজ্জিত হইলাম। তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়িল যে এ প্রদেশে আমার একজন পরিচিত লোক আছেন। তিনি ডাক্তার বিনোদ বাবু। পূর্ব্বে মনোরমা দেবীর পত্র লইয়া আমি তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে আসিয়াছিলাম। সে পত্রে মনোরমা আমাকে বিশেষ আত্মীয় বলিয়া বারংবার উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে এই পূর্ব্ব পরিচয়বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া এক পত্র লিখিলাম এবং অধুনা যে বিপদে পতিত হইয়াছি তাহারও উল্লেখ করিলাম। এরূপ বন্ধুবিহীন অপরিচিত স্থানে তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন আমার নিষ্কৃতির অন্য উপায় নাই, তাহাও লিখিলাম। আদালত হইতে হুকুম লইয়া একটা ঠিকা লোক নিযুক্ত করিলাম এবং যাতায়াতের গাড়িভাড়া করিয়া ডাক্তার বাবুকে আনিবার নিমিত্ত পত্রসহ লোক পাঠাইয়া দিলাম। পথ অতি সামান্য; সুতরাং শীঘ্রই আমার নিষ্কৃতির উপায় হইবে ভাবিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

যখন পত্র লইয়া লোক চলিয়া গেল, তখন বেলা আন্দাজ ১॥টা। বেলা প্রায় ৩॥টার সময় আমার প্রেরিত লোক সঙ্গে ডাক্তার বিনোদ

বাবু আসিয়া আদালতগৃহে উপস্থিত হইলেন। বিনোদ বাবুর এই অত্যদ্ভুত সৌজন্যে ও অনুগ্রহে আমি বিমোহিত হইলাম। তখনই জামিন মঞ্জুর হইয়া গেল। বেলা ৪ টার পূর্ব্বে আমি রাজপুরের পথে, ডাক্তার বিনোদ বাবুর সমভিব্যাহারে, স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে লাগিলাম। ডাক্তার বিনোদ বাবু আমাকে তাঁহার বাটীতে আহার করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিবার জন্য, সাদরে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি সবিনয়ে এ যাত্রা তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষায় আমার অক্ষমতা জানাইয়া বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। সময়ান্তরে আমি নিশ্চয়ই তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব বলিয়া, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম এবং সদর কাছারির উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

আমি যে জামিনে খালাস হইয়াছি, এ কথা নিশ্চয়ই অবিলম্বে রাজা প্রমোদরঞ্জন জ্ঞাত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ অভিনব কৌশলের উদ্ভাবনা করিয়া আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রতিকূলতা করিবেন। তিনি যে রকম লোক সন্নিহিত প্রদেশে তাঁহার যেরূপ সম্ভ্রম ও আধিপত্য তাহাতে তিনি মনে করিলে অনেক অনর্থই ঘটাইতে পারেন। যতক্ষণ তাঁহার সর্ব্বনাশের অবিসংবাদিত প্রমাণ হস্তগত করিয়া, তাঁহাকে আয়ত্তগত করিতে না পারিতেছি, ততক্ষণ আমার নিশ্চিন্ত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। এইরূপ বিচার করিয়া আমি সত্বর জমিদারী কাছারীতে উপস্থিত হইলাম।

সৌভাগ্যক্রমে তখন কাছারিতে নায়েব মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে আমার উদ্দেশ্য জানাইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ একজন আমলাকে খাতা দেখাইতে আদেশ করিলেন। আমি খাতা অন্বেষণ করিয়া ১২০৮ সালের মাঘ মাস বাহির করিলাম এবং ঠাকুরবাড়ীর খাতায় রাজার বিবাহের পূর্ব্বে যে বিবাহের উল্লেখ আছে, তাহা মিলাইয়া দেখিলাম। পরে আমার নামধারী যে এক বিবাহ লিখিত আছে তাহাও দেখিলাম। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে—? কিছু নাই! রাজা বসন্তরঞ্জন রায়ের বিবাহ-বিষয়ক বিন্দুবিসর্গেরও উল্লেখ নাই! সর্ব্বনাশ!

তখন আমার মনের যে অবস্থা হইল তাহা বর্ণনাতীত। আমার শিরায় বিদ্যুদ্বেগে শোণিত ধাবিত হইতে লাগিল। এত পরিশ্রম—এত যত্নের পর আমার আশার সফলতা হইল। বস্তুতই এ বিবাহ খাতায় উঠে নাই কি! আমার চক্ষুর ভুল হয় নাই তো! আবার দেখি—ভাল করিয়া দেখি। না—নিঃসন্দেহ রাজা বসন্তরঞ্জনের বিবাহের প্রণামী সদর কাছারির খাতায় জমা হয় নাই। এত কষ্টের পর আমার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল; রাজা প্রমোদরঞ্জনের সমস্ত রহস্য পরিষ্কার হইল; আমি তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে সক্ষম হইলাম। আহো, এই রহস্য না বুঝিতে পারিয়া কত সময়েই কত সন্দেহ করিয়াছি, কত রকম ভাবনাই ভাবিয়াছি। কখন মনে করিয়াছি, রাজা হয়ত মুক্তকেশীর পিতা, আবার কখন মনে করিয়াছি, তিনি হয়ত মুক্তকেশীর স্বামী। কিন্তু প্রকৃত বিষয়ের সন্দেহ কদাপি আমার মনে উদিত হয় নাই।

এখন কি বলিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে, যে, রাজা প্রমোদরঞ্জন বেশ্যাপুত্র। তাঁহার জননীর সহিত তাঁহার পিতার কোন কালে শাস্ত্র-সম্মত বিবাহ হয় নাই; সুতরাং রাজা যে উপাধি ও পদ-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কোনই

অধিকার নাই। তাঁহার পিতামাতা স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কদাপি বিবাহ হয় নাই। রাজা প্রতারণা করিয়া, ধূর্ত্ততা সহকারে, ন্যায়সঙ্গত ও আইন-সঙ্গত উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করিয়াছেন। সেই প্রতারণা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার জন্য, কৌশলে, হরিমতির সাহায্যে, ঠাকুরবাড়ীর খাতায় জাল করিয়া রাখিয়াছেন। সদরের খাতায় সেরূপ জাল করিবার সুবিধা হয় নাই। কোন সন্দেহ হইলে ঠাকুরবাড়ীর খাতাই লোকে দেখে, সদরের খাতা পর্য্যন্ত কেহ সন্ধান করিতে আইসে না ভাবিয়া, তিনি তত-দূর সতর্কতার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। তাঁহার প্রতারণা এখন সহজেই ধরা পড়িতেছে। চালানে নাই, সদরের খাতায় নাই, ঠাকুরবাড়ীর খাতার লেখাও পৃষ্ঠার শেষে স্বল্প স্থানে কোন প্রকারে গুজিয়া দেও-য়ার মত। সুতরাং তাহা যে জাল তাহা সহজেই বোধগম্য হইতেছে।

কেন যে রাজার ব্যবহার দারুণ অস্থিরতা-পূর্ণ ও সন্দিগ্ধ, কেন যে তিনি মুক্তকেশীকে অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য এরূপে ব্যাকুল, কেন যে তিনি হরিমতিকে অর্থ দ্বারা এইরূপে পোষণ করিয়া আসিতেছেন, ইত্যাদি সকল কথাই এক্ষণে পরিস্ফুট হইল। যে কল্পনা-তীত অতি ভয়ানক রহস্য এই সকল ব্যবহারের কারণ তাহা অতঃপর আমার হস্তগত। আমি এখন একটী মুখের কথায় রাজার পদ-প্রতিষ্ঠা, মান-সম্ভ্রম জলবুদ্বুদের ন্যায় উড়াইয়া দিতে পারি। এক কথায় তাঁহাকে সম্ভ্রমহীন, বন্ধুহীন, আশ্রয়হীন, অর্থহীন ভিখারী করিয়া দিতে পারি। তখন আমার মনে হইল যে, রাজা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝিয়া থাকিবেন যে, তাঁহার সর্ব্বনাশের আর কোন বিলম্ব নাই। এরূপ অবস্থায় তিনি কোনরূপ দুষ্কর্ম্ম সাধনে পশ্চাৎ-পদ হইবেন, এমন বোধ হয় না। আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, রাজা হয় ত এই প্রতারণার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিলুপ্ত করিতেও প্রয়াসী হইতে পারেন। হয় ত তিনি এই সকল খাতা ধ্বংস করিয়া সকল প্রমাণ বিদূরিত করিতে উদ্যত হইবেন। এখানকার খাতা কোনরূপে ধ্বংস করা সম্ভব না হইলেও, ঠাকুরবাড়ীর খাতা ধ্বংস করা সহজ হইতে পারে। এই আশঙ্কা মনে উদিত হওয়ার পর, আমি নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে, ঠাকুরবাড়ী গিয়া খাতার সেই পৃষ্ঠার, গোমস্তার সহি ও মোহর-যুক্ত, একটা নকল লইবার প্রতিপ্রায় করিলাম। আমি তাড়াতাড়ি নায়েব মহাশয়ের নিকট বিদায় লইয়া, রামনগরের অভিমুখে চলিলাম। পথে পাছে পূর্ব্ববৎ কেহ আমার অনুসরণ করিয়া বিবাদ বাধায় এই আশঙ্কায়, বাজার হইতে একগাছি মোটা লাঠি ক্রয় করিয়া লইলাম। দৌড়াইতে আমি বাল্যকাল হইতে বিশেষ নিপুণ। সুতরাং আবশ্যক হইলে আমার চরণযুগলও আমাকে সাহায্য করিবে বলিয়া আমার আশা হইল।

আমি যখন রাজপুর হইতে বাহির হইলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে এবং একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে। এক ক্রোশ পরিমিত পথ যাওয়ার পর, একটা লোক সহসা আমার পশ্চাৎ দিক হইতে দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া আমাকে ছাড়াইয়া চলিয়া গেল এবং তখনই পাশে একটা শব্দ হইল। আমি, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এবং লাঠি গাছটি উত্তম রূপে ধরিয়া, ভিজিতে ভিজিতে অন্ধকারে সমান চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর যাওয়ার পর, পার্শ্বস্থ একটা বেড়ার ধারে খস্ খস্ শব্দ হইল এবং তখনই তিন জন

লোক পগারের মধ্য হইতে রাস্তায় আসিল। আমি একটু সরিয়া গেলাম। কিন্তু তাহাদের একজন আমার নিকটস্থ হইয়া হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা আমাকে আঘাত করিল। সে উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া মারে নাই; সুতরাং আমার বড় লাগিল না। আমিও তৎক্ষণাৎ আমার লাঠির দ্বারা তাহার মস্তকে এক আঘাত করিলাম। সে ব্যক্তি দুই তিন পদ পিছাইয়া সঙ্গীদের স্কন্ধে পড়িবার উপক্রম করিল; আমি এই অবকাশে দৌড়িতে আরম্ভ করিলাম; তাহারাও আমার পশ্চাতে ছুটিতে লাগিল। প্রথমে খানিকক্ষণ আমি তাহাদের ছাড়িয়া বেশী দূর আসিতে পারিলাম বোধ হইল না। অন্ধকারে, অপরিচিত স্থানে, ঐ দৌড়ান বড়ই বিপজ্জনক। পার্শ্বের যে কোন দ্রব্যে পা বাধিয়া পড়িয়া যাওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। ক্রমে ক্রমে অনুসরণকারিগণের পদ-শব্দ মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। তখন আমার প্রত্যয় হইল, তাহারা পিছাইয়া পড়িতেছে। এইরূপ সময়ে, অন্ধকারে, অলক্ষিত ভাবে, পার্শ্ববর্ত্তী কোন এক বেড়ার ফাক দিয়া, আমি ময়দানের দিকে গমন করিতে অভিপ্রায় করিলাম। সম্ভবতঃ অনুসরণকারিগণ, আমি সোজা যাইতেছি মনে করিয়া, সোজাই চলিবে; আমি যে অন্যদিকে চলিয়া গিয়াছি, তাহা তাহারা বুঝিতেই পারিবে না। এই অভিপ্রায় করিয়া, আন্দাজি পাশের এক বেড়ার ফাক দিয়া, আমি ময়দানে প্রবেশ করিলাম। এবং পূর্ব্ববৎ দৌড়িতে লাগিলাম। অনুসরণকারীদ্বয়ের এক জন অপরকে নিরস্ত হইতে বলিল, তাহা আমি শুনিতে পাইলাম। তাহারা দৌড় বন্ধ করিল তাহাও বুঝিলাম। তাহাদের পদ-শব্দ ও কণ্ঠস্বর কিছুই আর আমার কর্ণগোচর হইল না। আমি আন্দাজে আন্দাজে অন্ধকারে ময়দানের মধ্যে, দৌড়িতে লাগিলাম। যেমন করিয়া হউক, পুরাণ রামনগরে আমায় যাইতেই হইবে, তা যত বিপদই হউক, আর যে অসুবিধাই হউক। কেবল এক সঙ্কেত আমি স্থির রাখিলাম। যখন আমি রাজপুর হইতে বাহির হইয়াছিলাম, তখন আমার পিছনে ঝড় বহিতেছিল; এখনও সেই ঝড় পিছনে রাখিয়া আমি ছুটিতে লাগিলাম। এইরূপে বেড়া, খানা, ডোবা, ঝোপ পার হইয়া দৌড়িতে দৌড়িতে চলিতেছি, এমন সময়ে দূরে আলোক জ্বলিতে দেখিতে পাইলাম। আমি, পথ জানিয়া লইবার জন্য, তাড়াতাড়ি সেই দিকে চলিলাম। নিকটস্থ হইতে না হইতে দেখিলাম, একটা লোক লণ্ঠন হাতে করিয়া বাহিরে আসিতেছে। আমাকে দর্শনমাত্র সে ব্যক্তি আমার মুখের দিকে লণ্ঠন উচ্চ করিয়া ধরিল। আমরা উভয়েই চমকিয়া উঠিলাম। আমি ঘুরিতে ঘুরিতে ঠিক পুরাণ রামনগরেই আসিয়া পড়িয়াছি। লণ্ঠনধারী ব্যক্তি অপর কেহই নহেন, আমার প্রাতের পরিচিত গোমস্তা মহাশয়! দেখিলাম তাঁহার ভাবভঙ্গীর অতিশয় পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহাকে নিতান্ত অস্থির ও সন্দেহযুক্ত বোধ হইল। তিনি আমাকে দর্শনমাত্র যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্মই আমি বুঝিতে পারিলাম না। তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"চাবি কোথায়? আপনি লইয়াছেন কি?

আমি বলিলাম,—"চাবি কি? আমি তো এই রাজপুর হইতে আসিতেছি। চাবি কিসের?"

বৃদ্ধ নিতান্ত অস্থির ভাবে বলিলেন,—"ঠাকুরবাড়ীর দপ্তরখানার চাবি—যেখানে কাগজ থাকে। এখন উপায় কি? ভগবান্ কি

ঘটাইলে? শুনিতেছেন মহাশয়, চাবি সব হারাইয়াছে।”

আমি বলিলাম,—“কেমন করিয়া হারাইল? কখন? কে লইল?”

অনিশ্চিত দৃষ্টির সহিত গোমস্তা বলিলেন,—“কিছু জানি না। আমি ঠাকুরবাড়ী হইতে এই ফিরিয়া আসিতেছি। তার পর বড় দুর্য্যোগ দেখিয়া দরজা জানালা সব বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িয়াছি। তার পর ঐ দেখুন জানালা খোলা কে ভিতরে ঢুকিয়া চাবি লইয়া গিয়াছে।”

তিনি আমাকে খোলা জানালা দেখাইবার নিমিত্ত যেমন হাত নাড়িলেন, তেমনই লণ্ঠন খুলিয়া গেল এবং দমকা বাতাস লাগায় বাতি নিভিয়া গেল। আমি বলিলাম,—“শীঘ্র আর একটা আলো লইয়া আসুন। তাহার পর চলুন ঠাকুরবাড়ী যাই। শীঘ্র, কোন বিলম্ব না হয়।”

যে আশঙ্কা আমি করিয়াছি, তাহাই দেখিতেছি ফলিল। এত যত্ন করিয়া যে ভয়ানক প্রতারণার মূল আমি নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছি এবং যে জন্য আমি রাজা প্রমোদরঞ্জনকে সম্পূর্ণরূপ করতলগত করিয়াছি বলিয়া বোধ করিতেছি, তাহার নিদর্শন বুঝি হাত ছাড়া হইয়া যায়। কারণ যদি রাজা ঠাকুরবাড়ীর খাতা সরাইয়া ফেলিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার জালের প্রমাণ আর থাকিল না। তাঁহার মাতার চরিত্র ও নিজ জন্ম বৃত্তান্তের কোন প্রশ্ন এত দিন পরে উত্থিত হওয়া সম্ভব নহে। যদিই বা সে কথা এখন উঠে, তাহা হইলে এদেশে তাঁহার পিতা মাতার বিবাহ হয় নাই বলিলেও, এখন লোকে মানিয়া লইতে পারে। বিশেষতঃ তাঁহার এখন যেরূপ মানসম্ভ্রম, তাহাতে এরূপ কোন সন্দেহ অধুনা লোকের মনে উদিত হওয়াই অসম্ভব। অতএব এখন খাতা খানি সরাইতে পারিলে, রাজার সকল দিক রক্ষা হয় এবং আমারও সকল চেষ্টা ও পরিশ্রম বিফল হয়। না জানি এতক্ষণে কত সর্ব্বনাশই হইয়া গেল ভাবিয়া, আমি আর গোমস্তার আলোকসহ পুনরাগমনের অপেক্ষা করিতে পারিলাম না; সেই অন্ধকারেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে, বিপরীত দিক হইতে একটি মনুষ্য আসিয়া আমার নিকটস্থ হইল এবং সবিনয়ে বলিল,—“রাজা আমাকে ক্ষমা করুন—”

কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিলাম লোকটি আমার অপরিচিত। আমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম,—“অন্ধকারে তোমার ভুল হইয়াছে তুমি রাজা প্রমোদারঞ্জনকে খুজিতেছ কি? আমি রাজা প্রমোদরঞ্জন নহি।”

সে ব্যক্তি থতমত খাইয়া বলিল,—“আমি আপনাকে আমার মনিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম।”

তুমি কি এই স্থানে তোমার মনিবকে দেখিতে পাইবে মনে করিয়াছিলে?”

“আজ্ঞা, এই গলিতে অপেক্ষা করার জন্য আমার প্রতি হুকুম ছিল।”

এই বলিয়া সে লোকটা চলিয়া গেল। এদিকে লণ্ঠনসহ গোমস্তা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি ব্যস্ততার অনুরোধে তাঁহার হাত ধরিয়া তাহাকে হড় হড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম। তিনি উল্লিখিত লোকটাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—“ও কে? ও কিছু জানে না কি?”

আমি বলিলাম,—“উহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই,—চলুন এখন।”

গলির মোড় ছাড়াইলেই ঠাকুরবাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা গলির মোড় ছাড়াইবামাত্র সেই পল্লীবাসী একটীশিশু, আমাদের নিকটস্থ হইয়া, গোমস্তা মহাশয়ের সম্মুখে আসিয়া বলিল,—"দাদা ঠাকুর, দপ্তর-খানার ভিতর মানুষ ঢুকিয়াছে। ভিতরের দিক হইতে কুলুপ বন্ধ করার শব্দ আমি শুনিয়াছি; আর দিয়েশলাই জ্বালিয়াছে, তার আলোও জানালার ফাক দিয়া দেখিয়াছি।"

গোমস্তা ভয়ে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া আমার গায়ের উপর ভর দিলেন। আমি তাঁহাকে উৎসাহ দিবার জন্য বলিলাম,—"ভয় কি? চলুন শীঘ্র। এখনও বিশেষ দেরি হয় নাই। সে যাহা হউক না, আমরা এখনই তাহাকে ধরিতে পারিব। আপনি লণ্ঠন লইয়া যত শীঘ্র পারেন আমার সঙ্গে আসুন।"

এই বলিয়া আমি দ্রুতপদে ঠাকুরবাড়ীর অভিমুখে চলিলাম। হঠাৎ পার্শ্বে কোন লোকের পদ-শব্দ শুনিয়া আমি, ব্যগ্রতাসহ সেই দিকে ফিরিবামাত্র, দেখিতে পাইলাম সেই চাকরটাও ছুটিয়া আসিতেছে। আমি তাহার দিকে ফিরিবামাত্র সে বলিল,—"আমি আমার মনিবের সন্ধানে আসিয়াছি।" আমি তাহার কথায় মনোযোগ না দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সেই গলির মোড় ছাড়াইলাম, সেই ঠাকুরবাড়ী নেত্রপথবর্ত্তী হইল। দেখিতে পাইলাম, দপ্তরখানার বহুতর ঘুলঘুলি দিয়া অতিশয় আলোক বাহির হইতেছে। যখন খুব নিকটস্থ হইলাম, তখন কাগজ ও কাপড় পোড়া গন্ধ পাইতে লাগিলাম এবং চটপট শব্দও শুনিতে পাইলাম। ক্রমেই ঘুলঘুলির আলোক অধিকতর প্রবল হইতে লাগিল। আমি দৌড়িয়া দরজায় হাত দিলাম। কি সর্ব্বনাশ! দপ্তরখানায় আগুন লাগিয়াছে! এই ভয়ানক ঘটনা হৃদয়ঙ্গম হওয়ার পর, আমি সে স্থান হইতে পদমাত্র নড়িবার পূর্ব্বে, এবং একবার নিশ্বাস ফেলিবারও পূর্ব্বে, শুনিতে পাইলাম, কে ঘরের ভিতর হইতে সজোরে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিল এবং তালায় চাবি ঘুরাইতে লাগিল; আর শুনিতে পাইলাম, কে দ্বরের অপর পার্শ্ব হইতে সাহায্যের জন্য অতি ভয়ানক হৃদয়-বিদারক স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

যে চাকরটার সঙ্গে আমার দুইবার দেখা হইয়াছিল সে নিতান্ত অবসন্ন ও কাতর হইয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িল এবং বলিল,—"হে ভগবন্ কি করিলে? নিশ্চয়ই রাজা প্রমোদ-রঞ্জন রায়ের গলা। নিশ্চয়ই তিনি।"

তাহার কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে, গোমস্তা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় আর একবার ভিতর হইতে তালায় চাবি ঘুরাইবার শব্দ পাওয়া গেল। গোমস্তা বলিলেন,—"হা ভগবন্, কাহার অদৃষ্টে এরূপ অপমৃত্যু লিখিয়াছ? সর্ব্বনাশ হইয়াছে! ও যেই হউক, উহার মৃত্যু নিশ্চিত। ও যে তালা বিগড়াইয়া ফেলিয়াছে।"

অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তির দারুণ দুষ্কৃতির জন্য মনে তাহার উপর যত ক্রোধ ছিল; ঐ হৃদয়হীন নরাধম সততা ও পবিত্রতা, প্রেম ও অনুরাগ যেরূপে পদবিদলিত করিয়াছে, তজ্জন্য উহার উপর যে মর্ম্মান্তিক নির্য্যাতন স্পৃহা ছিল; বহুদিন ধরিয়া উহার পাপোচিত প্রতিফল প্রদান করিবার নিমিত্ত যে দুর্দ্দমনীয় বাসনা ছিল; সে সকলই অধুনা আমি বিস্মৃত হইলাম—অতীত স্বপ্নের ন্যায় তৎসমস্ত আমার হৃদয় হইতে তিরোহিত হইয়া গেল। তখন তাহার বর্ত্তমান নিরতিশয় শোচনীয় দশা ভিন্ন আমার আর কিছুই মনে স্থান পাইল

না; এইরূপ ভয়ানক মৃত্যুর হস্ত হইতে তাহার উদ্ধার সাধন ভিন্ন আমার অন্তরে আর কোন প্রবৃত্তি থাকিল না। আমি তখন চীৎকার করিয়া বলিলাম,—"তালা বিগড়াইয়া গিয়াছে। জানালার নিকট আসিবার চেষ্টা কর। আমরা জানালা ভাঙ্গিবার উপায় করিতেছি। তুমি যে হও, আর বিলম্ব করিলে মারা যাইবে।"

শেষবার কুলুপের শব্দ হওয়ার পর, অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তি আর সাহায্যের জন্য চীৎকার করে নাই। এক্ষণে তাহার সজীবতার নিদর্শনস্বরূপ কোন শব্দই আর শুনা যাইতেছে না, কেবল দাহ্য পদার্থের ফট্ ফট্ শব্দ ভিন্ন আর কিছুই কর্ণগোচর হইতেছে না। আমি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, চাকরটা উন্মাদের ন্যায় অধীর হইয়া ঠিক আমার পিছনে দাঁড়াইয়া আছে; আর গোমস্তা মহাশয়, দূরে মাটীর উপর বসিয়া, কেবল কাঁপিতেছেন ও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। আমি সহজেই অনুমান করিলাম, এই ব্যক্তির দ্বারা উপস্থিত ব্যাপারের কোন সহায়তা হওয়া অসম্ভব।

তখন কি করা উচিত তাহা আমার মনে হইল না। অদূরে এক ব্যক্তি দুঃসহ যাতনায় প্রপীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে, এই দারুণ কল্পনা আমার বুদ্ধিভ্রংশ করিল। আমি তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, নিকটস্থ কাষ্ঠস্তূপ হইতে একখানি প্রকাণ্ড কাষ্ঠ উঠাইলাম এবং সেই চাকরটাকেও তাহা জোর করিয়া ধরিতে বলিলাম। উভয়ে তাহা ধরিয়া একটা জানালার সমীপস্থ হইলাম এবং বারংবার প্রবল বলে সেই বৃহৎ কাষ্ঠ দ্বারা জানালায় আঘাত করিতে লাগিলাম। কিয়ৎকাল আঘাত করার পর, সেই জানালা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। কি ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড! রাশি রাশি অগ্নি লক্ লক্ করিতে করিতে সেই বাতায়ন পথ দিয়া বাহিরে ধাবিত হইতে লাগিল। ভাবিয়াছিলাম, এই উন্মুক্ত পথ দিয়া অল্প প্রমাণ বায়ু প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়া, তন্মধ্যস্থ ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিলেও করিতে পারে। কিন্তু বায়ু প্রবেশের অবসর কোথায়? তখন আমি নিতান্ত নিরুপায় ও হতাশ হইয়া বলিলাম,—"হায় হায়! লোকটাকে বাঁচাইবার কি আর কোন উপায় নাই?"

বৃদ্ধ গোমস্তা বলিলেন,—"কোন আশাই নাই। বৃথা চেষ্টা যে ভিতরে আছে, সে এতক্ষণে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে।"

ক্রমে পিল্ পিল্ করিয়া লোক আসিয়া কলরব বাধাইল। আমার তখনও মনে হইতে লাগিল, হয়ত হতভাগা এখনও মূর্চ্ছিত হইয়া অধোবদনে ঘরের মেজেয় পড়িয়া আছে। হয়ত এখনও চেষ্টা করিলে তাহাকে বাঁচান যাইতে পারে। এই মনে করিয়া আমি সমাগত দর্শকগণের মধ্যে গিয়া বলিলাম—"প্রত্যেক কলসী জলের দাম দুইপয়সা করিয়া দিব। তোমরা ঠাকুরবাড়ী হইতে ঘড়া লও, যে যেখান হইতে পার ঘড়া কলসী যোগাড় কর। কূয়া হইতেই হউক, কি ঠাকুরবাড়ীর পুকুর হইতেই হউক, যত পার জল আনিতে থাক। প্রতি কলসী দুই পয়সা।" এই কথায় দর্শকগণের মধ্যে একটা উৎসাহ উপস্থিত হইল। সকলেই জলের জন্য ছুটাছুটী করিতে লাগিল। কিন্তু দৌড়াদৌড়ি ও গোলযোগ যত হইতে লাগিল, কাজ তত হইতে লাগিল না। যাহা হউক, সারি সারি অনেক কলসী জল আসিয়া জানালার মধ্য দিয়া অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকুণ্ডে পড়িতে থাকিল। পয়সা, সিকি, দুয়ানি, ও কিছু টাকা, গোমস্তার হস্তে দিলাম। তিনি জলবাহকগণকে হিসাব

করিয়া পয়সা দিতে থাকিলেন। এদিকে এইরূপ কার্য্য চালাইয়া, আমি সেই কাষ্ঠস্তূপ হইতে একখানি লম্বা গুঁড়ি বাছিলাম। যে সকল লোক কলসী বা ঘড়া কিছুই সংগ্রহ করিতে না পারায় জল আনিতে পারিতেছিল না, তাহাদের সাত আট জনকে সেই কাঠের গুড়ি টানিয়া আনিতে উপদেশ দিলাম। আমার প্রতিশ্রুত পুরস্কারের লোভে তাহারা তৎক্ষণাৎ সেই গুঁড়ি উঠাইল। আমিও তাহা ধরিলাম। পরে সকলে মিলিয়া দপ্তরখানার দরজায় সেই গুঁড়ি দ্বারা বারংবার প্রচণ্ডরূপে আঘাত করিতে লাগিলাম। যদিও শুনমেঘবারা সেই প্রকাণ্ড দরজা অতিশয় সুদৃঢ়, তথাপি পুনঃ পুনঃ এরূপ প্রচণ্ড আঘাত কতক্ষণ সহিতে পারে? অবশেষে ভীষণ শব্দ সহকারে সেই বৃহৎ দরজা ঘরের ভিতর দিকে পড়িয়া গেল। তখন সাগ্রহে সকলেই গৃহমধ্যস্থ ব্যক্তির জন্য দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। কিন্তু নিকটস্থ হয় কাহার সাধ্য! দারুণ অগ্নিতাপে আমাদের দেহ পুড়িয়া যাইতে লাগিল! অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া রহিলাম। তখন জলবাহিগণকে এই উন্মুক্ত দরজার মধ্য দিয়া জল ঢালিতে আদেশ দিলাম। কলসী কলসী জল সেই দরজার মধ্যে পড়িতে লাগিল।

চাকরটা কাতরভাবে অগ্নির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসিল,—"তিনি কোথায়?"

গোমস্তা বলিলেন,—"সে কি আর আছে? ছাই হইয়া গিয়াছে। কাগজপত্রও ছাই হইয়া গিয়াছে। হা ভগবন্, এ কি করিলে?"

নিরন্তর লোকজন তাড়াতাড়ি করিয়া জল আনিয়া ঢালিতে লাগিল। আমি তখন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া দূরে গিয়া উপবেশন করিলাম ঠাকুরবাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে জানিয়া, থানার দারোগা, জমাদার কনষ্টবল ও চৌকিদারগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দারোগার উৎসাহবাক্যে লোকে উৎসাহিত হইয়া আরও আগ্রহসহকারে জল আনিতে লাগিল। যাহাতে এই অগ্নি দপ্তরখানা ছাড়াইয়া, ঠাকুরবাড়ীর অন্যান্য মহলে বিস্তৃত না হয়, দারোগা তাহার জন্য যথেষ্ট যত্ন করিতে লাগিলেন। আমার শক্তি ও উৎসাহ কিছুই নাই। আমি বুঝিলাম, যে নরাধম এই কাণ্ডের নায়ক তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এই বোধের পর হইতে আমি, নিতান্ত অবসন্নভাবে সেই অগ্নিকাণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, নিশ্চেষ্টবৎ বসিয়া রহিলাম। ক্রমেই আগুন কমিয়া আসিতে লাগিল। হয়ত দাহ্যপদার্থের অভাবে, অথবা অবিরত জলপাত হেতু ক্রমে অগ্নির তেজ মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে অগ্নি হইতে সাদা সাদা ধূম উদ্গত হইতে থাকিল এবং ক্রমে দেখিলাম পুলিশের লোকেরা দল বাঁধিয়া সেই ভগ্ন দ্বার সমীপে দাঁড়াইল এবং সমাগত দর্শকগণ আরও পশ্চাতে দাঁড়াইল। দুইজন কনষ্টবল দারোগার আদেশক্রমে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং অনতিকাল মধ্যে ধরাধরি করিয়া একটা প্রকাণ্ড বোঝা লইয়া ফিরিল। দর্শকেরা সরিয়া আসিল এবং দুই ভাগ হইয়া গেল। সকলেই যেন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। স্ত্রীলোক ও শিশুগণ সকলের পশ্চাতে দাড়াইয়া থাকিল। ক্রমে সেই বিপুল জনতার মধ্য হইতে নানারূপ শব্দ আসিয়া আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। এইরূপ বিভিন্ন উক্তি সমূহ আমার শ্রুতিগোচর হইতে থাকিল।

"পেয়েছে পেয়েছে?" হাঁ।" "কোথায় পেলে?" "দরজার পাশে উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিল?" "খুব পুড়িয়াছে কি?" "গা পুড়িয়াছে

মুখখানা পোড়ে নাই।" "লোকটা কে?" "রাজা, একটা রাজা।" "রাজা তা. ওখানে কেন?" "রাজা না হবে।" "না রাজাই বটে।" নিশ্চয়ই একটা কুমতলব ছিল।" "তা আর বলিতে।" দপ্তরখানা জ্বালাইয়া দিতে গিয়াছিল।" "তাই হবে।" "দেখিতে কি বড় ভয়ানক হয়েছে?" "হয়েছে বই কি?" "মুখখানা বড় ভয়ানক হয় নাই।" "কেহ তাকে চেনে কি?" "একটা লোক বল্‌ছে, চেনে?" "কে সে?" "একটা চাকর। কিন্তু সে এমনই বেকুবের মত হইয়া গিয়াছে যে দারোগা তাহার কথা বিশ্বাস করিতেছে না।" "আর কেহই চেনে না কি?"

এমন সময় দারোগা মহাশয় গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"চুপ চুপ।" তৎক্ষণাৎ সকল গোল থামিয়া গেল। তখন দারোগা মহাশয় বলিলেন,—"যে ভদ্রলোক এই ব্যক্তিকে বাঁচাইবার জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি কোথায়?"

বহু কণ্ঠে একসঙ্গে শব্দ উঠিল,—"এই দিকে—এই যে মহাশয়।"

দারোগা মহাশয় লণ্ঠন হস্তে লইয়া আমার দিকে অগ্রসর হইলেন এবং বলিলেন—"মহাশয়! একবার কৃপা করিয়া এই দিকে আসিবেন।"

এই বলিয়া তিনি আসিয়া আমার হস্ত ধারণ করিলেন। আমি তখন কথা কহিতে পারিলাম না; তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতেও বলিলাম না। মৃত ব্যক্তিকে আমি কখন দেখি নাই; সুতরাং আমার তাঁহাকে চিনিবার কোন সম্ভাবনা নাই; এই কথা কয়টি বলিব ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু আমার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। আমি যন্ত্র-পুত্তলির মত তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। কিয়দ্দূর যাওয়ার পর, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"মহাশয়, এই মৃত ব্যক্তিকে চেনেন কি?"

সে স্থানটায় অনেক লোক গোল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমার সম্মুখে লণ্ঠন হস্তে তিন ব্যক্তি দণ্ডায়মান আছে। তাহাদের দৃষ্টি এবং সমবেত সমস্ত লোকের দৃষ্টি আমারই মুখের প্রতি প্রতিসঞ্চালিত হইল। সম্মুখস্থ ব্যক্তিত্রয় লণ্ঠন নত করিয়া ধরিল। আমার চরণ সমীপে কি পতিত রহিয়াছে তাহা আমি বুঝিলাম।

পুনরায় প্রশ্ন হইল,—"আপনি চেনেন কি মহাশয়?"

ধীরে ধীরে আমি দৃষ্টি নত করিলাম। প্রথমতঃ বস্ত্রাচ্ছাদিত পদার্থ-বিশেষ আমার চক্ষে পড়িল। তাহার উপর যে এক আধ ফোটা বৃষ্টি পড়িতেছে তাহার শব্দও শুনিতে পাইলাম। তাহার পর কি দেখিলাম? সেই ক্ষীণালোকে তাঁহার ঝলসিত, জীবনবিহীন বদন আমার চক্ষে পড়িল। এইরূপে ইহ জীবনে আমাদের প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ সমাপ্ত হইল। নিয়তির অচিন্তনীয় ব্যবস্থাক্রমে, অন্ত এই ভাবে আমাদের দর্শন ঘটিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পুলিশ-তদন্ত সে দিন যাহা হইবার তাহা হইল। পরদিন বৈকালে থানায় আবার বিশেষরূপ লেখাপড়া হইবে; আমাকেও সেখানে যাইতে হইবে কথা থাকিল। আমি রাত্রিতে পূর্ব্বপরিচিত ভজহরির দোকানে নিতান্ত ক্লান্ত ও কাতরভাবে গিয়া পড়িলাম।

প্রাতে উঠিয়া ডাকঘরে চিঠির সন্ধানে গমন করিলাম। এদিকে যাহাই কেন ঘটুক না, কলিকাতা হইতে অন্তরে থাকায় লীলা ও মনোরমার জন্য যে দুশ্চিন্তা, কিছুই তাহার সমতুল্য নহে। মনোরমার পত্র পাইলে হৃদয় কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইবে জানিয়া, আমি প্রাতে উঠিয়াই ডাকঘরে গমন করিলাম। মনোরমার পত্র আসিয়াছে। কোন দুর্ঘটনাই ঘটে নাই; তাঁহারা উভয়েই সম্পূর্ণরূপ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ আছেন। আমি কোথায় আসিয়াছি, মনোরমাকে বলিয়া আসিয়াছি, কিন্তু লীলাকে বলি নাই বলিয়া, লীলা বড়ই অভিমানিনী হইয়াছেন এবং আমি ফিরিয়া গেলে আমার সহিত আর বাক্যালাপ করিবেন না বলিয়াছেন। মনোরমার পত্রে এ কথা পাঠ করিয়া মন বড়ই আনন্দিত হইল। লীলার সহিত কলহ হইবে। না জানি সে কলহ কতই মিষ্ট! লীলা আবার পূর্ব্ববৎ সজীব ও প্রফুল্ল হইয়াছেন, ইহ জগতে এতদপেক্ষা শুভ-সংবাদ আমার পক্ষে আর কিছু নাই।

আমি মনোরমাকে এখানকার সমস্ত সংবাদ একে একে পরে পরে লিখিয়া জানাইলাম। যাহাতে এ সকল ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও লীলা জানিতে না পারেন এবং কোন প্রকার সংবাদপত্র লীলার হস্তে না পড়ে, তজ্জন্য মনোরমাকে সাবধান করিয়া দিলাম। অন্য স্ত্রীলোক হইলে, এসকল কথা এরূপ ভাবে আমি কখনই জানাইতে সাহস করিতাম না। কিন্তু বিগত ঘটনাসমূহের বৃত্তান্ত শ্রবণে মনোরমার যেরূপ সাহস, সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়াছি তাহাতে তাঁহাকে এ সকল ব্যাপার জানাইলে কোন অনিষ্ট হইবে না বলিয়া আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। পত্রখানি নিতান্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িল। বৈকালে আমাকে থানায় যাইতে হইল।

যথাসময়ে থানায় পৌঁছিলাম। দেখিলাম, ইন্‌স্পেক্টর সবইন্‌স্পেক্টর, হেডকনষ্টবল, কনষ্টবল, প্রভৃতিতে থানা গস্ গস্ করিতেছে। আমি উপস্থিত হইলে তাঁহাদের তদন্ত আরম্ভ হইল। বহুতর সাক্ষী উপস্থিত হইয়াছে; আমিও তাহার মধ্যে অন্যতম। এ সম্বন্ধে কয়টী অতি গুরুতর প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে। প্রথমতঃ মৃত ব্যক্তি কে? ২য়তঃ তাহার মৃত্যু কেমন করিয়া ঘটিল? ৩য়তঃ ঠাকুরবাড়ীর দপ্তরখানায় আগুন লাগাইবার কারণ কি? ৪র্থতঃ চাবি অপহরণ করিবার উদ্দেশ্য কি? ৫মতঃ একজন অপরিচিত ব্যক্তি তৎকালে কেন উপস্থিত ছিল? প্রথম প্রশ্নের মীমাংসার জন্য পুলিশ, রাজপুর হইতে, রাজা প্রমোদরঞ্জনের পরিচিত কয়েকজন লোক আনাইয়াছেন। চাকরটা এমন বিকলচিত্ত হইয়া গিয়াছে যে তাহার কোন কথা প্রামাণিক বলিয়া পুলিশ বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু রাজপুর হইতে আগত কয়েকজন ভদ্র লোকের সাক্ষ্য দ্বারা, অধিকন্তু মৃত ব্যক্তির নামাঙ্কিত ঘড়ি দেখিয়া, তিনি যে রাজা প্রমোদরঞ্জন রায় তৎসম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল। যে বালক প্রথমেই গোমস্তাকে দেশলাই জ্বালার খবর দিয়াছিল, সাক্ষীশ্রেণীর মধ্যে সেও ছিল। সে নির্ভীকচিত্তে সুস্পষ্টরূপে সকল কথাই বলিল। সৌভাগ্যক্রমে আমাকে অধিক কথা বলিতে হইল না। আমি বলিলাম যে মৃত ব্যক্তিকে কখন দেখি নাই; তিনি যে তৎকালে পুরাণ রামনগরে ছিলেন তাহাও আমি জানিতাম না; দপ্তরখানা হইতে যখন লাস বাহির করা হয়, তখন আমি সঙ্গে ছিলাম না; আমি পথ ভুলিয়া যাওয়ায়, গোমস্তার বাটীর নিকটে পথ জানিয়া লইবার জন্য, দাঁড়াইয়াছিলাম; সেই সময়ে তাঁহার চাবি হারাইয়াছে শুনিতে পাই; যদি আমার দ্বারা

কোন সাহায্য হয় এই অভিপ্রায়ে, আমি তাঁহার সহিত ঠাকুরবাড়ী আসি; আমি সেই স্থানে আসিয়া আগুন দেখিতে পাই; তথায় আমি শুনিতে পাই কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি দপ্তরখানার ভিতর দিক হইতে কুলুপে চাবি ঘুরাইতেছে; আমি দয়াপরতন্ত্র হইয়া, তাহাকে বাঁচাইবার জন্য, যথাসাধ্য চেষ্টা করি। অন্যান্য সাক্ষীগণকে চাবি চুরি ও আগুন লাগাইবার কারণ সম্বন্ধে নানারূপ জেরা করা হইল। কিন্তু আমি বিদেশী লোক, সুতরাং এ সকল বিষয়ের কিছুই জানি না বিবেচনায়, আমাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করা হইল না। আমাকে যখন এ সকল বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হইল না, তখন আমি স্বয়ং যাহা স্থির করিয়াছি তাহা বলিতে কখনই বাধ্য নহি। আরও বিবেচনা করিয়া দেখিলাম সে সকল কথা ব্যক্ত করিলে হয়ত কেহই বিশ্বাসও করিবে না। যে হেতু এই ব্যাপারের আমি যে কারণ নির্দ্দেশ করিব, তাহার প্রমাণ এক্ষণে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। আর বলিতে হইলে হয়ত আমাকে সমস্ত বৃত্তান্ত, রাজার সমস্ত প্রতারণা ও অসদ্ব্যবহারের কথা, ব্যক্ত করিতে হইবে। উকীল করালী বাবু যেমন সে সকল কথা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন নাই, এস্থলেও সম্ভবতঃ সেইরূপ ফল হইবে।

সেখানে বলি না বলি, পাঠকগণের অবগতির জন্য আমার মনের ভাব এস্থলে লিপিবদ্ধ করায় হানি নাই। রাজা যখন শুনিলেন যে আমি রাজপুরের মারপিটের মোকদ্দমায় জামিনে খালাস হইয়াছি, তখন তাঁহাকে নিরুপায় হইয়া, আমার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের নিমিত্ত, শেষ উপায় অবলম্বন করিতে হইল। পথিমধ্যে আমাকে আক্রমণ চেষ্টা তাহারই একতর এবং দপ্তরখানা হইতে, খাতার যে পত্রে তৎকৃত জাল আছে তাহা অপসারিত করিয়া, দুষ্কৃতির প্রত্যক্ষ নিদর্শন প্রচ্ছন্ন করা তাহার অন্যতর। শেষোক্ত উপায়ই অধিকতর কার্য্যকর; কারণ তাহা হইলে, তিনি যে প্রতারণা করিয়াছেন তাহা প্রমাণ করিবার কোন নিদর্শনই বিদ্যমান থাকিবে না। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁহার লুক্কায়িত ভাবে দপ্তরখানায় প্রবেশ করা আবশ্যক এবং খাতার সেই পাতাখানি ছিঁড়িয়া লইয়া পুনরায় প্রচ্ছন্নভাবে বহির্গত হওয়া আবশ্যক। যদি আমার এই অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে ইহাও অসঙ্গত নহে যে, সুযোগের জন্য তাঁহাকে রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। রাত্রিতে সুযোগ ক্রমে চাবি হস্তগত করিয়া, তিনি দপ্তরখানায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। তথায় আবশ্যকানুসারে তাঁহাকে দেশলাই জ্বালিতে হইয়াছিল এবং পাছে আমি বা অন্য কোন কৌতূহলাক্রান্ত ব্যক্তি সন্ধান পাইয়া প্রতিবন্ধক ঘটায় এই আশঙ্কায় তাঁহাকে অগত্যা দপ্তরখানার দরজার ভিতর দিকের কড়ায় তালা লাগাইতে হইয়াছিল।

ইচ্ছাপূর্ব্বক দপ্তরখানায় অগ্নিপ্রয়োগ করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। অসাবধানতা ও অত্যন্ত ব্যস্ততাহেতু দৈবাৎ আগুন লাগিয়া যাওয়াই সম্ভব। নিশ্চয়ই তিনি প্রথমতঃ আগুন নিবাইবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া অগত্যা পলাইতে চেষ্টা করেন। প্রাণভয়ে পলায়ন করিবার সময় তিনি সম্ভবতঃ অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। রিং এ অনেক চাবি ছিল। তিনি ভয় ও ব্যস্ততাপ্রযুক্ত হয়ত অন্য চাবি লাগাইয়া তালায় অতিশয় বল প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং তালাটি এককালে খারাপ করিয়া ফেলিয়াছিলেন; অবিলম্বেই

আগুন এরূপ প্রবল হইয়া উঠে যে, তাঁহার পক্ষে তাহা অসহ্য হইয়া পড়ে। আমরা যৎকালে জানালা ভাঙ্গিয়া পথ পরিষ্কার করি, তখন তাঁহার জীবলীলার অবসান না হইলেও, তিনি মরণোপম মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। সুতরাং তাহাকে বাঁচাইবার জন্য আর কোন যত্ন করিলেও সফলকাম হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। যখন আমরা দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম, তাহার বহু পূর্ব্বেই তাঁহার প্রাণান্ত ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই। আমি মনে মনে সমস্ত ঘটনার এইরূপ মীমাংসা করিয়াছিলাম।

চাকরটাকে বস্তুতই মতিভ্রান্ত বলিয়া বোধ হইল। সে বলে মৃতব্যক্তি নিশ্চয়ই তাহার প্রভু এবং ঐ গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিবার জন্য তাহার প্রতি আদেশ ছিল। শুনিয়াছি ডাক্তার পরে পরীক্ষা করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যে এই ঘটনায় ঐ ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

আমি নিতান্ত ক্লান্তশরীর ও অবসন্নহৃদয় হইয়া ভজহরির দোকানে ফিরিয়া আসিলাম এবং শুইয়া পড়িলাম। পরশু আমার রাজপুরের মোকদ্দমা হইবে। সুতরাং কল্য আমার আর কোন কাজ হাতে নাই। আমার অবস্থা ভাল হইলে আমি কল্য কলিকাতায় গিয়া লীলামনোরমাকে দেখিয়া আসিতাম। আমার হস্তস্থিত অর্থের ভূরিভাগ ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এরূপ দুরবস্থাপন্ন দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে তাদৃশ অপব্যয় অসম্ভব।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া আমি পূর্ব্ববৎ ডাকঘরে গমন করিলাম। দেখিলাম পূর্ব্ববৎ মনোরমার প্রাপ্তিপদ পত্র পড়িয়া আছে। মনোরমার পত্র পড়িয়া জানিতে পারিলাম, যতই আমার ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে ততই অভিমানিনী লীলাবতীর ক্রোধ আরও বাড়িত হইতেছে এবং তিনি আমাকে অপরাধোচিত শাস্তি দিবার বিশেষ আয়োজন করিতেছেন।

ডাকঘর হইতে ফিরিবার সময় বিগত রাত্রির ভয়ানক ব্যাপার সমূহের অভিনয়স্থল অন্ত দিবালোকে একবার দর্শন করিতে বাসনা হইল। ইহসংসারের সর্ব্বত্র কঠোর ও মধুরের অপূর্ব্ব মিলন। যে আকাশে প্রদীপ্ত দিবাকর পরিদৃষ্ট হয়, সেই আকাশেই সুধাংশু বিরাজ করে। যে মুহূর্ত্তে বসুন্ধরায় মানব শমন-সদন গমন করিতেছে, সেই মুহূর্ত্তেই অভিনব শশু জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে। যে স্থানে কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে একজন মানব যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সেই স্থান অধুনা সম্পূর্ণরূপ উৎসাহবিহীন। দেখিলাম, গোমস্তা মহাশয় আপনার ঘরে বসিয়া তামাক সেবন করিতেছেন। পোড়া ঘরের ছাই মাটী ও অর্দ্ধদগ্ধ দ্রব্যাদি অন্বেষণ ও বাহির করিবার জন্য কয়েকজন মজুর লাগিয়াছে। যে স্থানে সেই অভাগার মৃত দেহ পতিত ছিল, সেই স্থানে অধুনা একজন মজুরের শানকপূর্ণ খানা গামছা জড়ান রহিয়াছে। অগ্নি সন্দর্শনে বহুপ্রকার পতঙ্গ সন্নিহিত প্রদেশে প্রাণত্যাগ করিয়া পড়িয়া আছে। কয়েকটী কাক সাগ্রহে তাহার অনুসন্ধান করিতেছে। একটি সুশ্যামাঙ্গী পরিণতা বয়বা যুবতী সগৌরবে এই স্থানের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইতেছে, আর একজন অনুরূপ যুবা তৎকালে বিপরীত দিক দিয়া আসিতেছে। উভয়ে এই স্থানে নিকটস্থ হইলে, কাহারও নয়ন সাকাঙ্ক্ষ ও সানুরাগ দৃষ্টিপাত করিতে ভুলিল না এবং কাহারও অধর ঈষৎ হাস্যের শোভা বিস্তার না করিয়া নিরস্ত হইল না। এই ত সংসারের প্রকৃতি!

রাজার মৃত্যু হওয়ায়, লীলার স্বরূপত্ব সমর্থন চেষ্টা আপাততঃ সম্পূর্ণরূপ বিফল হইল। এ

চিন্তা বহুবারই আমার মনে উদিত হইয়াছিল, অধুনা সেই ভয়াবহ দৃশ্য হইতে প্রত্যাবর্তন কালেও এই চিন্তা আমার চিত্তে পুনরুদিত হইল। তাঁহার জীবলীলার অবসান হইয়াছে, সঙ্গেসঙ্গে, আমার প্রভূত যত্ন যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম এবং অপরিমেয় অনুরাগ সকলই ব্যর্থ ও বিফল হইল এবং সমস্ত আশার অবসান হইল। কিন্তু ইহাও ভাবিয়া দেখা উচিত যে, যদিই তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলেই বা কি হইত? যে রহস্য আমি এত যত্ন করিয়া উদ্ভেদ করিয়াছিলাম, তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে রাজার সম্পত্তি ও সম্ভ্রমের যে ব্যক্তি যথার্থ উত্তরাধিকারী তাহারই উপকার হইত। রাজা বেশ্যাপুত্র হইয়াও, প্রবঞ্চনা দ্বারা, প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করিয়াছেন। এক্ষণে রাজার এই রহস্য প্রচারিত হইলে সেই ব্যক্তিরই উপকার হইত। লীলার স্বত্বপত্র-সমর্থন বিষয়ে এই ব্যাপার কোন সহায়তা করিতে পারিত এমন বোধ হয় না। মনে এই-রূপ ভাবোদয় হওয়ায়, কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিলাম।

ফিরিবার সময় ঘুরিতে ঘুরিতে যেখানে হরিমতির বাটী তাহারই পাশ দিয়া আসিলাম। আর একবার হরিমতির সহিত দেখা করিয়া যাইব কি? দরকার কি? রাজার মৃত্যু সংবাদ নিশ্চয়ই তিনি বহু পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন। আমার সহিত সাক্ষাৎকালে রাজার সম্বন্ধে তিনি যে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার মনে পড়িল এবং বিদায় কালে আমার প্রতি যেরূপ ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন তাহাও আমার মনে পড়িল। তাঁহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে আমার আর প্রবৃত্তি হইল না। আমি ধীরে ধীরে ভজহরির দোকনে ফিরিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যার সময় দোকানে বসিয়া ভজহরির সহিত নানা প্রকার গল্প করিতেছি, এমন সময় একটি বালক আসিয়া আমার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। আমি আলোক-সন্নিহিত হইয়া পত্রের শিরোনাম পাঠ করিতে অন্যমনস্ক হইয়াছি, এমন সময়ে বালক পলাইয়া গেল। তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করা অনর্থক বোধে, আমি অগত্যা পত্র পাঠে প্রবৃত্ত হইলাম। পত্রখানি আমার নামে লিখিত। তাহাতে কাহারও নাম স্বাক্ষর নাই এবং হস্তাক্ষরও বিকৃত করিয়া লিখিত। কিন্তু প্রথম দুই এক ছত্র পাঠ করিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম এ পত্র কাহার লিখিত। হরিমতিই এ পত্রলেখিকা। নিম্নে তাহার অবিকল নকল প্রদত্ত হইতেছে।

হরিমতির কথা।

মহাশয়!

আপনি বলিয়াছিলেন, আর একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, কিন্তু আইসেন নাই। তা আসুন বা না আসুন, খবর সমস্তই আমি জানিতে পারিয়াছি। আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম, সেই ব্যক্তির সর্ব্বনাশের সময় হয় ত উপস্থিত হইয়াছে এবং আপনিই হয় ত তাহার বিধি-নিয়োজিত উত্তরসাধক। কথা ঠিক—আপনি কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

শুনিলাম আপনি সেই ব্যক্তির জীবন রক্ষার্থ যত্ন করিয়া নিতান্ত দুর্ব্বল হৃদয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। যদি আপনি কৃতকার্য্য হইতেন তাহা হইলে আপনাকে আমি পরম শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিতাম। উদ্দেশ্যের বিভি-

রতা থাকিলেও, আপনার সাহায্যে আমার বাসনা সফল হইয়াছে। আমার তেইশ বৎসরের জাতক্রোধ আজি মিটিয়াছে। এই সুদীর্ঘ কালের বৈরনির্যাতন স্পৃহা আজি শান্ত হইয়াছে। আপনার অভিপ্রায় অন্যরূপ হইলেও, আমি আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

যে ব্যক্তি আমার এই মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট আমি বিশেষ ঋণী। এ ঋণ কি প্রকারে শোধ করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যদি আমার বয়স দিন থাকিত, যদি আমার যৌবন থাকিত তাহা হইলে নির্জ্জনে প্রেমের রহস্যালাপ করিবার জন্য, আপনাকে ডাকিয়া পাঠাইতাম। বিশ বৎসর আগে আপনাকে সেরূপ ভাবে ডাকিয়া পাঠাইলে, সে নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিতে আপনার কখনই সাধ্য হইত না। কিন্তু এখন আমার সে দিন আর নাই। অধুনা আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করিয়া ঋণ পরিশোধ করা ভিন্ন অন্য উপায় আমার নাই। আপনি যখন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন কোন কোন বিষয় জানিবার জন্য আপনার মনে অতিশয় কৌতুহল ছিল। আপনাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সে সকল কথা আমি এক্ষণে জানাইতেছি।

১২২৭ সালে বোধ হয় আপনি বালক ছিলেন। আমি কিন্তু তৎকালে সুন্দরী যুবতী। পুরাণ রামনগরে আমি তখন বাস করিতাম। একটা মূর্খ লোক আমার স্বামী ছিল। যেরূপে হউক, সে সময়ে কোন একজন বড় লোকের সহিত আমার আলাপ ছিল। তাহার নাম করিলাম না; কারণ তাহার নাম সম্ভ্রম কিছুই তাহার নিজের নহে। আপনিও তাহা এক্ষণে জানিতে পারিয়াছেন।

কিরূপে সে আমার কৃপালাভ করিল তাহা এক্ষণে বলা ভাল। সোণাদানা ও ভাল কাপড় চোপড় পরিয়া ভদ্রলোকের মত থাকিতে সকল মেয়েমানুষই ভালবাসে, আমিও বড় ভাল বাসিতাম। সে ব্যক্তি আমার মন বুঝিয়া, ঠিক আমার পছন্দ মত জিনিস গুলি নিয়তই আমাকে দিত। নিঃস্বার্থ ভাবে সে কখন আমাকে সেই সকল উপহার দিত না। প্রতিদান স্বরূপে আমার নিকট হইতে সে একটা অতি তুচ্ছ প্রার্থনা করিত। আমার স্বামীর অজ্ঞাতসারে, ঠাকুরবাড়ীর দপ্তরখানার চাবি হস্তগত করিবার সে প্রার্থী। চাবিতে তাহার কি দরকার জিজ্ঞাসা করিলে সে আমাকে মিথ্যা কথা বলিয়া বুঝাইয়া দিত। কিন্তু আমি যখন আমার প্রার্থনা মত সামগ্রী পাইতেছি তখন তাহার উদ্দেশ্য জানিবার আমার দরকার কি? আমি স্বামীর অজ্ঞাতসারে তাহাকে চাবি দিলাম এবং তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার কার্য্যের উপর চক্ষু রাখিলাম। একবার, দুইবার, তিনবার, চারিবার, এইরূপে চাবি লইল—চতুর্থবারে আমি তাহার অভিসন্ধি ধরিয়া ফেলিলাম। বুঝিলাম সে ঠাকুরবাড়ীর বিবাহের প্রণামীর খাতায় একটা জমা বাড়াইয়া দিতে চায়। তাহাতে আমার ক্ষতি কি? কাজটা অন্যায় বটে, কিন্তু তাহা লইয়া গোল করিলে গহনাগুলি আমাকে তখন দেয় কে? আমি জানিতে পারিয়াছি বুঝিয়া সে আমাকে চক্রান্তে মিশাইয়া লইল এবং তখন কলে ও কৌশলে আমি ক্রমে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলাম।

তাহার পিতা মাতার মোটে বিবাহই হয় নাই। অন্য লোকে কেহই একথা জানিত না। তাহার পিতা তাহাকে মৃত্যুর পূর্ব্বে নিজমুখে এই সকল কথা বলিয়াছিলেন এবং একখানি

উইল পর্য্যন্ত না করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধিমান ছেলে, পিতার মৃত্যু হইবামাত্র, সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিল এবং পাছে শত্রুপক্ষে জানিতে পারিয়া, গোল তুলে এবং প্রকৃত উত্তরাধিকারী আসিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়, এই ভয়ে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ঠাকুরবাড়ীর খাতায় প্রণামী জমা করিয়া সে সকল আশঙ্কা নির্ম্মূল করিতে মনস্থ করিল। এজন্য তাহাকে নিন্দা করা অন্যায়। সংসারে কে আপনার স্বার্থ এরূপে রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারে? এই অভিপ্রায়ে দপ্তরখানার খাতা অন্বেষণ করিতে করিতে, যে বৎসরে বিবাহ হইলে তাহার জন্ম হওয়া সঙ্গত হয়, সেই বৎসরের একটা পাতার নীচে একটু ফাক দেখিতে পাইয়া তাহার আহ্লাদের সীমা থাকিল না। এমন সুযোগ ঘটিবে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই।

তাহার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া, তৎকালে তাহার উপর আমার বড় দয়া হইয়াছিল। তাহার মাতা ব্যভিচারিণী, বা তাহার পিতা দুশ্চরিত্র, অথবা তাঁহাদের বিবাহ হয় নাই ইত্যাদি কারণে তাহাকে অপরাধী করা কখনই সঙ্গত নহে। অপরাধ যদি কাহারও থাকে তাহা হইলে সে জন্য তাহার পিতা মাতাই অপরাধী। ন্যায় বিচার করিলে, আ... কেন, কেহই তাহাকে অপরাধী বলিয়া মনে করি... পারেন না।

এ দিকে খাতার ...লীর মত কালী ও তদনুরূপ লেখা তৈয়ার ক...তে অনেক সময় কাটিয়া গেল। যাহা হউক শেষে সব ঠিকঠাক হইলে সে কাজ গুছাইয়া ফেলিল। এপর্য্যন্ত আমার সহিত সে কোন মন্দ ব্যবহার করে নাই। আমাকে যাহা যাহা দিবার কথা ছিল সে সকলই দিয়াছে, এবং কোন সামগ্রী ফাঁকি দিয়া ছেলে ভুলানর মত দেয় নাই। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল তাহা হয় ত আপনি রোহিণীর মুখে শুনিয়াছেন। চারিদিকে অকারণে আমার নিন্দা প্রচার হইয়া উঠিল। উক্ত বড়লোক মহাশয়কে ও আমাকে নির্জ্জনে, রাত্রিকালে বাক্যালাপ করিতে দেখিয়া আমার স্বামী যাহা মনে করিলেন, তাহা বোধ করি আপনি শুনিয়াছেন। তাহার পর সেই বড়লোক মহাশয় আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন তাহা বোধ করি আপনি শুনেন নাই। আমি তাহা বলি শুনুন।

ঘটনা এইরূপ দাঁড়াইল দেখিয়া আমি তাহাকে সকাতরে বলিলাম,—"দেখ, অকারণে আমার স্বামী আমার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছেন এবং আমাকে সত্য সত্যই কলঙ্কিনী বলিয়া মনে করিতেছেন। তুমি দয়া করিয়া আমার এই কলঙ্ক দূর করিয়া দেও। তোমাকে অন্যান্য সকল বৃত্তান্ত বলিতে হইবে না। তুমি কেবল আমার স্বামীকে বুঝাইয়া দেও, তিনি যে বিষয়ে আমাকে অপরাধিনী মনে করিতেছেন, তাহাতে আমার এক বিন্দুও অপরাধ নাই। তোমার জন্য আমি যাহা করিতেছি, তাহা স্মরণ করিয়া আমার এই উপকার তোমাকে করিতেই হইবে।" সে স্পষ্ট বলিল যে, এ কার্য্য সে পারিবে না। সে আরও বলিল যে, এই মিথ্যা কথা আমার স্বামী ও অন্যান্য সকলে বিশ্বাস করাই তাহার পক্ষে মঙ্গল; কারণ যতদিন তাহাদের মনে এই বিশ্বাস থাকিবে, ততদিন প্রকৃত বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইবে না। আমি তাহার কথা শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইলাম এবং বলিলাম আমি প্রকৃত কথা সকলকে বলিয়া দিব। তাহার উত্তরে সে বলিল, কথা ব্যক্ত হইলে

তাহারও যেমন সাজা হইবে, আমার তেমনই সাজা হইবে; আইনের চক্ষে উভয়েই সমান অপরাধী।

কথা সত্য! এই নরাধম আমাকে নানা প্রলোভনে ফেলিয়া বিষম ফাঁদে ফেলিয়াছে। আমি আইন কানুন কিছুই বুঝি না, পরিণামে কি হইবে তাহাও চিন্তা করি নাই। তাহার অবস্থা দেখিয়া, তাহার প্রয়োজন ও আগ্রহ বুঝিয়া তৎপ্রদত্ত অলঙ্কারাদির লোভে পড়িয়া আমি গলিয়া গিয়াছিলাম এবং তাহার সহায়তা করিয়াছিলাম। এখন কাজেই আমিও জড়াইয়া পড়িয়াছি। এ কথা ব্যক্ত হইলে তাহারও যে দণ্ড আমারও সেই দণ্ড। এইরূপে সেই দুরাত্মা আমার সর্ব্বনাশ করিল। তখন অনন্যোপায় হইয়া আমাকে তাহার ভয় করিয়া চলিতে হইল। এখন বুঝিতে পারিতেছেন, কেন আমি সেই পাপিষ্ঠ প্রবঞ্চককে আন্তরিক ঘৃণা করিতাম। এখন বুঝিতে পারিতেছেন, যে মহাত্মা সেই নরাধমের সর্ব্বনাশ সাধনার্থ যত্নবান্ হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য এত কথা কেন আমি সন্তোষ সহকারে লিখিয়া জানাইতেছি?

আমাকে সম্পূর্ণরূপে চটাইতেও তাহার সাহস হইল না। আমার ন্যায় স্ত্রীলোককে অতিশয় বিরক্ত করাও যে নিরাপদ নহে তাহাও সে বুঝিত। এজন্য সে আমাকে আর্থিক সাহায্য করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিল। তাহার দয়ার সীমা নাই। পাপিষ্ঠ আমাকে দয়া করিয়া কিছু পুরস্কার এবং আমাকে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে ও হইতেছে তাহার জন্য আমার কিছু ক্ষতিপূরণ করিবার প্রস্তাব করিল। আমি দুইটী সর্ত্ত পালন করিলে, সে আমাকে তিনমাস অন্তর যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিবে, স্বীকার করিল। ওঃ তাহার কি সদাশয়তা! সে দুই সর্ত্ত কি শুনুন। ১ম, তাহার এবং আমার উভয়েরই ইষ্টের জন্য, আমি এ সম্বন্ধে নীরব থাকিব। ২য়, তাহার অনুমতি না লইয়া, আমি রামনগর হইতে অন্য কোথায় যাইতে পারিব না। কিন্তু আমার তখন আর উপায় নাই। কাজেই পাপিষ্ঠের এই সকল সর্ত্তে আমাকে স্বীকৃত হইতে হইল। আমার মূর্খ স্বামী ন্যায়ান্যায় বিচার না করিয়া, আমার দুর্নাম প্রচার করিয়াছে। এক্ষণে, সে স্বামীর গলগ্রহ হওয়ার অপেক্ষা, এই নরাধমের সাহায্যে সুখস্বচ্ছন্দে থাকাই ভাল। মোটা টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা হইল। যে সকল সতী লক্ষ্মীরা আমাকে দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন, তাঁহাদের অপেক্ষা আমার দিন কাটিতে লাগিল ভাল।

এইরূপে সেই স্থানে থাকিয়া সুনাম অর্জ্জন করিবার জন্য আমি বিশেষ যত্নশীল থাকিলাম, এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হইলাম। তাহার প্রমাণ আপনি স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন। এই গুপ্ত কাণ্ড আমি কিরূপে গোপন করিয়া রাখিলাম এবং আমার পরলোকগতা কন্যা মুক্তকেশী তাহার কিছু জানিতে পারিয়াছিল কি না, তাহা জানিতে আপনি নিশ্চয়ই কৌতূহলযুক্ত হইয়াছেন। আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ, সুতরাং কোন কথাই গোপন করিব না। কিন্তু দেবেন্দ্র বাবু, এই বিষয়ে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে, আপনি যে আমার কন্যার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি বিস্ময়াবিষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমি তাহার কোনই কারণ নির্ণয় করিতে পারি নাই। যদি তাহার বাল্যজীবন জানিতে আপনার আগ্রহ থাকে, তাহা

হইলে আপনি রোহিণীর নিকট হইতে তাহা জানিবেন। কারণ তিনি সে বৃত্তান্ত আমার চেয়ে ভাল জানেন। এখানে বলিয়া রাখা ভাল, আমি মেয়েটাকে কখনই বড় ভাল বাসিতাম না। সে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমার জ্বালার কারণ ছিল; বিশেষতঃ তাহার স্থূলবুদ্ধি আমার বড়ই বিরক্তিকর। আমি সরল ভাবে সকল কথা বলিলাম; আশা করি ইহাতেই আপনি সন্তুষ্ট হইবেন।

রাজার সর্ত্ত পালন করিয়া, আমি তাঁহার প্রদত্ত প্রচুর অর্থ ভোগ করিতে লাগিলাম। এবং স্বচ্ছন্দরূপে দিনপাত করিতে থাকিলাম। যদি কখন আমার কোন স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে আমার এই নূতন প্রভুর নিকট আমাকে হুকুম লইতে হইত। তিনি তাদৃশ স্থলে অনুমতি প্রদান করিতে প্রায়ই কুণ্ঠিত হইতেন না। আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে নরাধম আমার উপর অত্যধিক অত্যাচার করিতে কখনই সাহসী হইত না। তাঁহার গুপ্ত কাণ্ড, নিজ সাবধানতার অনুরোধেও যে, আমি সহসা প্রকাশ করিতে পারিব না, তাহা সে বেশ জানিত। আমি, একবার আমার এক বৈমাত্রেয় ভগ্নীর মরণকালে শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত, শক্তিপুরে গিয়া অনেক দিন ছিলাম। শুনিয়াছিলাম, ভগ্নীর অনেক টাকা ছিল। মনে করিয়াছিলাম যে,যদি কখন কোন কারণে আমার ত্রৈমাসিক বৃত্তি বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে অন্য দিকে, সময় থাকিতে, চেষ্টা-দেখা মন্দ নয়। কিন্তু আমার কষ্টই সার হইল। সিকি পয়সাও পাওয়া গেল না; ভগ্নীর কিছুই ছিল না।

শক্তিপুরে যাইবার সময় আমি মুক্তকেশীকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। রোহিণী যে তাহাকে 'নয়' করিয়া লইতেছে এজন্য আমি কখন কখন বড়ই বিরক্ত হইতাম এবং তাহাকে কাড়িয়া আনিতাম। রোহিণীকে আমি কখনই দেখিতে পারিতাম না; ও রকম বেকুব মেয়েমানুষ আমার দুচক্ষের বিষ। আমি তাহাকে জ্বালাতন করিবার জন্যই, সময়ে সময়ে মুক্তকেশীকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিতাম। এই কারণেই মেয়েকে শক্তিপুরে সঙ্গে লইয়া যাই। সেখানে তাহাকে আনন্দধামের মেয়ে স্কুলে পড়িতে দিয়াছিলাম। আনন্দধামের জমিদারণী শ্রীমতী বরদেশ্বরী দেবীর চেহারায় বিশেষত্ব কিছু ছিল না; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এক সুন্দর পুরুষের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। যাহা হউক বড়ই বিস্ময়ের বিষয়, সেই জমিদারণী ঠাকুরাণী আমার কন্যাকে অতিশয় ভাল বাসিতে লাগিলেন। স্কুলে সে তো কিছুই শিখিত না, বাড়ারভাগ আনন্দধামে আদর পাইয়া আরও বিগড়াইয়া উঠিল। তাহার অনেক খেয়াল ছিল, তাহার উপর আবার আনন্দধাম হইতে সর্ব্বদা সাদা কাপড় পরার খেয়াল বাড়িয়া আসিল। আমি নিজে নানা প্রকার রঙীন কাপড় পরিতে ভাল বাসিতাম। সুতরাং মেয়ের অন্য ভাব আমার বড়ই বিরক্তিকর হইল এবং আমি বাড়ি ফিরিয়াই তাহার ঘাড় হইতে এ ভূত ছাড়াইব স্থির করিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কোন ক্রমেই তাহার এ সংস্কার আমি দূর করিতে পারিলাম না। তাহার প্রকৃতিই এইরূপ। যদি তাহার মাথায় কোন কথা একবার ঢুকে, তাহা হইলে তাহা আর কোন মতেই সে ছাড়ে না। সকল বিষয়েই তাহার এইরূপ ভয়ানক একগুঁয়েমি। তাহার সহিত

আমার অবিশ্রান্ত ঝগড়া চলিতে লাগিল। রোহিণী আমাদের এই ভাব দেখিয়া মুক্ত-কেশীকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আনিতে চাহিলেন। যদি রোহিণীও, তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া, সদা কাপড় পরায় মত না দিতেন, তাহা হইলে আমি তাহার সঙ্গে মেয়েকে যাইতে দিতাম। কিন্তু মেয়ের পক্ষ হইয়া আমার বিপক্ষতা করায়, আমি তাহা-দের দুই জনকেই জব্দ করিব স্থির করিলাম এবং মেয়েকে রোহিণীর সহিত কোন মতেই আসিতে দিলাম না। মেয়ে আমার নিকটেই থাকিল। ক্রমে গ্রামমধ্যে আমার সুযশ ব্যক্ত হইতে লাগিল এবং আমার মেয়েটিকে অনেকেই ভালবাসিতে লাগিল। তাহার সাদা কাপড়ের ঝোঁক আমি আর বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলাম না। কিছুদিন পরে ঐ পাপিষ্ঠের গোপনীয় কাণ্ড উপলক্ষে এক বিষম বিবাদ বাধিয়া গেল।

আমি একবার কাশী যাইব মনস্থ করিয়া, অধুনা নরকস্থ বড়লোক মহাশয়ের নিকট অনুমতি চাহিয়া পাঠাই। তিনি আমার পত্রের উত্তরে নানাবিধ অতি কুৎসিত ও ঘৃণিত কটুক্তি পূর্ণ এক পত্র দ্বারা আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া পাঠান। সেই পত্র পাঠ করিয়া আমার এতই রাগ হয় যে, আমি মেয়ের সাক্ষাতেই তাহাকে নানাপ্রকার গালি দিতে আরম্ভ করি এবং বলিয়া ফেলি যে, "নরাধম জানে না যে, আমি একটি মুখের কথায় তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া দিতে পারি।" কেবল এই টুকুমাত্র বলার পর, মুক্তকেশী কৌতূ-হলযুক্ত হইয়া সাগ্রহে আমার প্রতি চাহিয়া আছে দেখিয়া, আমার চৈতন্ত হইল এবং আমি চুপ করিলাম। আমার বড়ই ভাবনা হইল। মেয়ের মাথার ঠিক নাই। সে যদি লোকের কাছে বলিয়া বেড়ায় যে, তাহার মা মনে করিলে ঐ ব্যক্তির সর্ব্বনাশ করিতে পারে, তাহা হইলেও লোকের মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে এবং তাহাতে নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটিতে পারে। এই ভাবিয়া আমি মেয়েকে, কাছ ছাড়া হইতে না দিয়া, সাবধান করিয়া রাখিলাম। কিন্তু মহাশয়; পর দিনই বিষম সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল।

বলা নাই, কহা নাই, পরদিন বড়লোক মহাশয় আমার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাকে সে যে কঠোর পত্র লিখি-য়াছে তজ্জন্য তাহার অনুতাপ হইয়াছে। পাছে আমি বড় রাগ করিয়া থাকি, এই ভাব-নায় সে আমাকে ঠাণ্ডা করিতে আসিয়াছে। কিন্তু সে দিন তাহার নিজের মেজাজ খুব খারাপ। সে মুক্তকেশীকে কখনই দেখিতে পারিত না, মুক্তকেশীও তাহাকে দেখিতে পারিত না। এক্ষণে মুক্তকেশীকে ঘরে দেখিয়া, সে তাহাকে বাহিরে যাইতে বলিল। কিন্তু মুক্তকেশী সে কথায় ভ্রূক্ষেপও করিল না। ভয়ানক চীৎকার করিয়া আপনাদের বড়লোক বলিল,—"শুনিতে পাচ্ছিস? এ ঘর থেকে বেরিয়ে যা।" মুক্তকেশীও অতি-শয় রাগিয়া উঠিল এবং বলিল,—"আমার সহিত ভদ্রভাবে ভাল করিয়া কথা কহ।" দুর্ব্বৃত্ত আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—"এ পাগলাটাকে ঘর হইতে তাড়াইয়া দেও।" মুক্তকেশী চিরকালই আপনাকে যথেষ্ট বিজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করে। তাহাকে পাগল বলায় সে ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিল এবং আমি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে, সে এক পদ অগ্রসর হইয়া বলিল,—"যদি ভাল চাও, এখনই আমার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর। এখনই তোমার গুপ্ত কথা আমি বলিয়া দিব। জান

না তুমি, একটি মুখের কথায় তোমার সর্ব্বনাশ করিয়া দিতে পারি।” কালি আমি যে কথা বলিয়াছি, সে আজি ঠিক সেই কথাই তাহাকে বলিল। যেন সে সকলই জানে। বড়লোক মহাশয়ের যে ভাব হইল তাহা বলিয়া বুঝান ভার। সে দারুণ ক্রোধে যে সকল কথা বলিয়া আমাকে গালি দিতে লাগিল তাহা এতই ঘৃণাজনক যে, এ স্থলে উল্লেখ করা অসম্ভব। যাহা হউক, গালি গালাজের স্রোত বন্ধ হইয়া গেলে, নরাধম নিজের সাবধানতার জন্য মুক্তকেশীকে পাগলা গারদে আটকাইয়া রাখিবার প্রস্তাব করিল। মুক্তকেশী ভিতরকার কথা কিছুই জানে না; আমি রাগের ভরে কালি কেবল ঐ কথা বলিয়াছি; সে কেবল ঐ কথাই জানে; আর কিছু সে জানে না; ইত্যাদি নানা কথায় আমি তাহার ক্রোধ শান্তির চেষ্টা করিলাম। কত দিব্য ও শপথ করিলাম। কিন্তু সে, কিছুই বিশ্বাস করিল না। সে স্থির করিল, নিশ্চয়ই আমি কন্যাকে সকল কথা জানাইয়াছি। তখন নিরুপায় হইয়া আমাকে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল। মুক্তকেশীর মনে বদ্ধমূল সংস্কার হইল যে, তাহার ঐ কথায় নরাধম যখন এত ভয় পাইয়াছে তখন অবশ্যই এ কথা তাহার পক্ষে বড়ই সাংঘাতিক; সে তখন সুযোগ পাইলেই এই কথা সকলকে বলিতে লাগিল। পাগলাগারদে গিয়া সেখানকার লোকদিগকে প্রথমেই বলিল যে, সমুচিত সময় উপস্থিত হইলে সে রাজার সর্ব্বনাশ করিবে। আপনি যখন তাহার সহায়তা করিয়াছিলেন, তখন কথা উঠিলে, সে হয় ত আপনাকেও এ কথা বলিত। আমি শুনিয়াছি, এই অতি বড় ভদ্র লোক যে অভাগিনী রমণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, মুক্তকেশী তাঁহাকেও এ কথা বলিয়াছিল। কিন্তু আপনি কিংবা সেই মন্দভাগিনী যদি মুক্তকেশীকে কখন বিশেষ করিয়া সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন, আমার কথা সম্পূর্ণ সত্য। মুক্তকেশী গুপ্ত কথার বিন্দু-বিসর্গও জানিত না। সে বুঝিয়াছিল যে, একটা গোপনীয় কথা আছে সত্য; কিন্তু কি সে কথা তাহার একবর্ণও সে কখন শুনে নাই।

বোধ করি এতক্ষণে আমি আপনার কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে পারিয়াছি। আমার সম্বন্ধে বা কন্যার সম্বন্ধে আর কিছুই আমার বলিবার নাই। মনোরমা নাম্নী একটী স্ত্রীলোক আমাকে মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিবে জানিয়া, আপনার ভদ্রলোক মহাশয়, উত্তরের জন্য, আমার কাছে একটা মুসাবিদা রাখিয়াছিল। নিশ্চয়ই সেই স্ত্রীলোকের নিকট নরাধম আমার সম্বন্ধে নানা প্রকার মিথ্যা কথা বলিয়াছে। বলুক, সে যখন আর নাই, তখন তাহার কথায় আর ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত নিতান্ত বন্ধুভাবে আপনাকে সমস্ত বিবরণ জানাইলাম; কিন্তু অতঃপর আপনাকে অতিশয় ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করিয়া পত্রের সমাপ্তি করিব। আপনার সহিত সাক্ষাৎকালে, আপনি অতীব সাহসিকতা সহকারে, মুক্তকেশীর পিতৃবিষয়ক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন; যেন তাহাতে সন্দেহের বিষয় আছে। ইহা আপনার পক্ষে নিতান্ত অভদ্রোচিত অকর্ত্তব্য ব্যবহার হইয়াছে। আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটিলে, আপনি কদাচ তাদৃশ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন না। যদি আপনি মনে করেন যে, আমার স্বামী মুক্তকেশীর পিতা নহেন, তাহা হইলে আমাকে যৎপরোনাস্তি অপমানিত করা হইবে। যদি এ বিষয়ে আপনার কোন

কৌতূহল থাকে, তাহা হইলে সে কৌতূহল দমন করিবার নিমিত্ত আমি আপনাকে উপদেশ দিতেছি। দেবেন্দ্র বাবু, পরকালের কথা বলিতে পারি না, ইহকালে আপনার সে কৌতূহল নিবৃত্তির আর উপায় নাই।

অতঃপর আমার নিকট আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। যদি আর কখন আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন, তাহা হইলে আপনাকে আমি সমাদর করিব। যদি কখন সাক্ষাৎ ঘটে, তাহা হইলে এ পত্রের কোন কথা তুলিবেন না। কারণ এ পত্র যে আমি লিখিয়াছি তাহা আমি কখনই স্বীকার করিব না। সতর্কতার অনুরোধে আমি পত্রে স্বাক্ষর করিলাম না। এ পত্রের লেখার ভঙ্গীও আমার হস্তাক্ষর অপেক্ষা বিস্তর ভিন্ন। আর এরূপ সুকৌশলে এ পত্র আপনার নিকট পাঠাইলাম যে, ইহা আমার প্রেরিত বলিয়া স্থির করা কখনই সম্ভব হইবে না, এরূপ সাবধানতায় আপনার ক্ষতি কিছুই নাই। কার যে সংবাদ ইহাতে আছে, আমার সাবধানত হেতু, তাহার কোন অন্যথা হইতেছে না।

দেবেন্দ্রনাথ বসুর কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—*—

হরিমতির এই অত্যদ্ভুত পত্র পাঠ করার পর তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিতে আমার ইচ্ছা হইল। পত্রের সূচনা হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত যে অস্বাভাবিক কঠিনহৃদয়তা, লজ্জাহীনত ও মনোবৃত্তির নীচতা পরিলক্ষিত হইতেছে; যে মৃত্যু ও দুর্ঘটনা নিবারণের নিমিত্ত আমি সবিশেষ চেষ্টাশীল ছিলাম, তাহাই নানা কৌশলে আমার স্কন্ধে আরোপিত করিবার জন্য পত্রের সর্ব্বত্র যেরূপ প্রযত্ন পরিদৃষ্ট হইতেছে; তৎসমস্ত মনে করিয়া আমার অন্তরে এতই ঘৃণার উদয় হইল যে, আমি তখনই সেই লিপি খণ্ডবিখণ্ডিত করিতেছিলাম; কিন্তু সহসা মনোমধ্যে অন্য এক ভাবের উদয় হওয়াতে, আমি বিরত হইলাম।

আমার মনে হইলে, পত্র খানির দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধ না হইলেও, মুক্তকেশীর পিতৃনিরূপণ পক্ষে ইহা আমার সহায় হইতে পারে। মুক্তকেশীর পিতা কে স্থির করা আমার পক্ষে আবশ্যক এবং তাহা আমার অনুসন্ধানের একাংশ স্বরূপ। তাহার সহিত উপস্থিত ব্যাপারের কোন সংস্রব থাকা অসম্ভব নহে। পত্রমধ্যে দুই একটী স্থানে এরূপ দুই একটি উক্তি পরিদৃষ্ট হইতেছে, যাহা ধরিয়া বিচার, আলোচনা ও অনুসন্ধান করিলে অনেক কথা প্রকাশ হইতে পারে। কিন্তু এখন তাহার সময় নয়। সময়ান্তরে, অবকাশ মতে, আমি তাহাতে মনঃসংযোগ করিব। এই বিবেচনায় আমি সযত্নে পত্র খানি পকেট বহির মধ্যে রাখিয়া দিলাম।

কালি একবার আমাকে রাজপুরের ফৌজদারী আদালতে হাজির হইতে হইবে; তাহার পর এখানকার কার্য্যের শেষ। প্রাতে উঠিয়াই আমি যথারীতি ডাকঘরে গমন করিলাম। পত্র পাইলাম; কিন্তু তাহা বড় হালকা; যেন তাহার ভিতর কিছুই নাই। আমি নিতান্ত উদ্বিগ্ন ভাবে তাহার খাম খুলিয়া ফেলিলাম; দেখিলাম ভিতরে অতি ক্ষুদ্র এক খণ্ড কাগজ ভাঁজা হিয়াছে। তাহাতে নিম্নলিখিত কয়টি

লিখিত কালী চোপসান, ও ব্যস্ততা সহ লিখিত কথা মাত্র লিখিত রহিয়াছে।

"যত শীঘ্র পার চলিয়া আইস। আমি বাসা বদলাইতে বাধ্য হইয়াছি। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের গলি, ৩নং বাটীতে আসিবে। আমাদের জন্য কোন ভয় করিও না। আমরা উভয়েই নিরাপদ ও সুস্থ আছি। শীঘ্র আসিবে।—মনোরমা"

পত্র পাঠ করিয়াই আমার মনে হইল জগদীশনাথ চৌধুরী নিশ্চয়ই কোন দৌরাত্ম্যের সূচনা করিয়াছেন। ভয়ে আমার অন্তর অভিভূত হইয়া গেল। আমি রুদ্ধশ্বাস হইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলাম। না জানি কি হইয়াছে। ধূর্ত্ত জগদীশনাথ চৌধুরী না জানি কি চক্রান্ত করিতেছে! নাগাইদ সন্ধ্যা আমি সেখানে গিয়া পৌছিতে পারি। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই কত অনিষ্ট ঘটিতে পারে তাহা কে বলিতে পারে? কল্য বৈকালে মনোরমা এই পত্র লিখিয়াছেন; তাহার পর এক রাত্রি অতীত হইয়াছে। হয়ত এই সময়ের মধ্যেই কত অনিষ্ট ঘটিয়া থাকিবে। কেবল মনোরমার বুদ্ধি ও সাহসের উপর আমার অত্যধিক বিশ্বাসই আমাকে এখনও স্থির হইয়া ভাবিতে সক্ষম রাখিয়াছে। যত শীঘ্র সম্ভব রাজদ্বার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কলিকাতায় প্রস্থান করিবার সংকল্প করিলাম। পাছে সময় নষ্ট হয় এই ভয়ে, আমি রেল-ষ্টেশনের নিকট হইতে, রাজপুর যাইবার জন্য, এক খানি ঠিকা গাড়ি ভাড়া করিলাম। আমি যখন গাড়িতে উঠিতেছি, তখন আর একটি ভদ্রলোক আমার গাড়িতে অংশিদার হইতে চাহিলেন। বলা বাহুল্য, আমি সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম; কারণ এ উপায়ে গাড়ির পূরাভাড়া আমাকে দিতে হইবে না। গাড়িতে বসিয়া আমরা নানাবিধ গল্প করিতে করিতে চলিলাম। এই অগ্নিকাণ্ড ও রাজা প্রমোদরঞ্জনের অপমৃত্যু তৎকালে এদেশের প্রধান ঘটনা; সুতরাং সহজেই সেই প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়িল। যে ভদ্র লোকটি আমার অংশিদার হইয়া গাড়িতে উঠিলেন, রাজার উকীল মণি বাবুর সহিত তাঁহার বিশেষ আলাপ আছে। রাজার এইরূপ মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া মণি বাবু সমস্ত বিষয় অবধারণ ও সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া বিহিত ব্যবস্থা করিবার জন্য, স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজার সম্পত্তি ও তাঁহার উত্তরাধিকারী ইত্যাদি বিষয়ে মণি বাবুর সহিত এই ভদ্রলোকটির অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছে। রাজার দেনা এতই অধিক যে, তাহা আর কাহারও জানিতে বাকী নাই। এজন্য উকীল বাবু সে কথা আর গোপন করিবার চেষ্টা করেন নাই। রাজা মরণের পূর্ব্বে কোন উইল করিয়া যান নাই, আর উইল করিবার মত তাঁহার কোন সম্পত্তিও ছিল না। স্ত্রীর যে সম্পত্তি তাঁহার হস্তে পড়িয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই পাওনাদারেরা গ্রাস করিয়াছিল। রাজা বসন্তরঞ্জনের খুড়তুতো ভাইয়ের এক পুত্র আছেন। অধুনা তিনি এই ঋণজড়িত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। যাহা হউক, তিনি যদি হিসাব করিয়া চলিতে পারেন, তাহা হইলে বহুকালে সম্পত্তি ঋণমুক্ত হইলেও হইতে পারে।

যদিও শীঘ্র কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার জন্য দারুণ উৎকণ্ঠায় আমার অন্তঃকরণ ব্যাকুল, তথাপি এ সকল সংবাদ সহজেই আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিল। আমি বিবেচনা করিলাম, রাজার এই জালের সংবাদ ব্যক্ত না করাই সৎপরামর্শ। যে প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করিয়া এই ২৩ বৎসর কাল

তিনি এই সমস্ত আয় ভোগ করিয়া আসিতেছেন ও যে সম্পত্তি তিনি উৎসন্ন করিয়াছেন, সেই সম্পত্তি এক্ষণে ঘটনাচক্রে সেই প্রকৃত উত্তরাধিকারীর হস্তগত হইতেছে। এক্ষণে রাজার জালের কথা ব্যক্ত করায় কাহারও কোন ইষ্ট সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি প্রতারণা করিয়া লীলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার এতাদৃশ নীচতা ও পাপিষ্ঠতা জগতে প্রচারিত না হওয়াই সৎপরামর্শ। এই বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া আমি তৎকালে এ কথা ব্যক্ত করিলাম না। এই বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া আমি এই আখ্যায়িকা বর্ণিত ব্যক্তিবৃন্দের কল্পিত নাম ব্যবহার করিয়াছি।

রাজপুরে সমাগত হইয়া আমি এই ভদ্র লোকের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম এবং আদালত গৃহে উপস্থিত হইলাম। যাহা আমি মনে করিয়াছিলাম, তাহাই হইল। সেখানে আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত, কেহই উপস্থিত নাই। সুতরাং তৎক্ষণাৎ আমার নিষ্কৃতি হইল। আদালত হইতে বাহিরে আসিবামাত্র ডাক্তার বিনোদ বাবুর এক পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, কার্য্যানুরোধে তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে হইতেছে; কিন্তু তিনি বলিয়া রাখিতেছেন যে, তাঁহার নিকট যে কোন সাহায্যের প্রয়োজন হইবে, তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে তাহা সম্পাদন করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন। আমি পত্রোত্তরে সবিনয়ে নিবেদন করিলাম যে, নিতান্ত গুরুতর কার্য্যানুরোধে আমাকে এখনই কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। এজন্য আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও তাঁহার নিকট আমার চির কৃতজ্ঞতা বাচনিক ব্যক্ত করিয়া যাইতে না পারায়, আন্তরিক দুঃখিত থাকিলাম।

যথাসময়ে আমি ডাকগাড়িতে চড়িয়া কলিকাতায় চলিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমি বেলা ৪৷৷০ টার সময় কলিকাতায় পৌছিয়া ৩নং দর্পনারায়ণ ঠাকুরের গলিতে উপস্থিত হইলাম। বাড়িটী বেশ ছোট খাট —দেখিতেও বেশ পরিষ্কার। আমি দরজার কড়া নাড়িবা মাত্র এক সঙ্গে লীলা ও মনোরমা উভয়েই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়দিন মাত্র আমাদের সাক্ষাৎ নাই, কিন্তু বোধ হইল যেন কত কালই আমরা তফাৎ হইয়া আছি। প্রথম সাক্ষাতে সকলেরই নয়ন যে প্রকার উৎফুল্ল হইল, মুখ যেরূপ উজ্জ্বল হইল, তাহাতে হৃদয়ে যে অপরিসীম আনন্দোদয় হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল। লীলার বড় অভিমান। পূর্ব্ব হইতেই তিনি ঝগড়া করিবার অনেক আয়োজন করিয়াছেন; কিন্তু এত সাধের ঝগড়াও তাঁহার করা হইল না। তিনি আমাকে দর্শন মাত্র হাসিয়া ফেলিলেন এবং আনন্দাশ্রু-সিক্ত নয়নে আমার বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। আমি নিকটস্থ হইয়া তাঁহার হস্তধারণ করিয়া জিজ্ঞাসিলাম—"লীলা, লেখা চলিতেছে তো?" অভিমানিনী লীলা দুর্দ্দমনীয় হাস্যবেগ চাপিয়া বলিলেন,—"যাও, তুমি বড় দুষ্ট, তোমার সহিত আমার আর কথা নাই।"

আমরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং সকলে ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবেশন করিলাম।

আমি তখন মনোরমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলাম,—"যে বিপদে পড়িয়াছিলাম, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তোমাদের নিকট যে আবার আসিতে পারিব, তাহা আমার মনে ছিল না।"

লীলা সাগ্রহে আমার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"অ্যা! কি হইয়াছিল?"

আমি বলিলাম,—"তুমি যদি আমার উপর রাগ ত্যাগ কর তবে সব বলি।"

লীলা বলিলেন,—"রাগ আমি কখন করি নাই, রাগ কখন করিবও না। তুমি এখন বল কি হইয়াছিল।"

আমি বলিলাম,—"তুমিও যেমন আমার উপর রাগ কর নাই, আমারও তেমনই কিছুই হয় নাই। তোমার কথাও যেমন মিছা, আমার কথাও তেমনই মিছা। এখন আমাদের ঝগড়া মিটিয়া গেল, কেমন?"

লীলা বলিলেন,—"কাজেই, তুমি যে দুষ্ট, তোমার সহিত আমি ঝগড়া করিতে পারি কই।"

লীলার জীবনের উপর দিয়া যে দারুণ দুর্দ্দৈব বাত্যা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে নিরতিশয় অবসন্ন ও প্রপীড়িত করিয়াছিল; কিন্তু মনোরমার প্রভূত যত্নবলে লীলার বদনমণ্ডলে সেই বিষাদ-কালিমা এখন আর নাই। করুণাময়ী জননীতুল্যা মনোরমা দেবীর উদ্ভাবিত কৌশল ও সদ্যুক্তি পরম্পরায় ক্লিষ্টা, রুগ্না, ব্যথিতা লীলাবতীর দেহে ও হৃদয়ে, বাহ্যে ও অন্তরে পুনরায় পূর্ব্ববৎ সজীবতা ও নবীনতার পূর্ণাবির্ভাব সংঘটিত হইয়াছে। অপরিমেয় স্নেহের শান্তিসুধা সংস্পর্শে লীলা নবজীবন লাভ করিয়াছেন।

লীলা কার্য্যান্তর উপলক্ষে কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্থানান্তরে চলিয়া গেল, আমি বর্ত্তমান ব্যাপারে মনোরমার বুদ্ধি ও সাহসের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া, কাণ্ডটা কি ঘটিয়াছিল জিজ্ঞাসা করিলাম।

মনোরমা বলিলেন,—"আমার আর তখন লিখিবার সময় ছিল না, তাই সকল কথা লিখিতে পারি নাই। আমার চিঠি পাইয়া তুমি অতিশয় ভাবিত হইয়াছিলে কি? তোমাকে বড় শ্রান্ত ও কাতর দেখাইতেছে।"

আমি উত্তর দিলাম,—"প্রথমে আমার খুব ভয় হইয়াছিল। তার পর মনে করিলাম, যেখানে মনোরমা আছেন, সেখানে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম, জগদীশনাথ চৌধুরীর কোন নূতন চাতুরী এই ভয়ের কারণ। তাই ঠিক কি?"

তিনি বলিলেন,—"ঠিক! কল্য তাহার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। কেবল দেখা নহে, তাহার সহিত কথা বার্ত্তাও হইয়াছে।"

"কথাবার্ত্তা হইয়াছিল? আমরা কোথায় থাকি তাহা কি সে জানিতে পারিয়াছিল?"

"সে আমাদের বাসায় আসিয়াছিল, কিন্তু উপরতলায় উঠে নাই। কেমন করিয়া কি ঘটিল, বলিতেছি শুন। পুরাণ বাসার উপরকার ঘরে লীলা ও আমি কাজ কর্ম্ম করিতেছিলাম। এমন সময় জানালার ফাক দিয়া দেখিতে পাইলাম, রাস্তার অপর ধারে চৌধুরী একটা লোকের সঙ্গে দাঁড়াইয়া আছে।"

"তোমাকে কি সে জানালার ফাক দিয়া দেখিতে পাইয়াছিল?"

"না—আমি অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিয়াছিলাম সত্য কিন্তু সে আমাকে দেখিতে পায় নাই বোধ হয়।"

"তাহার সঙ্গে যে ছিল সে কে? অপরিচিত লোক কি?"

"না দেবেন, অপরিচিত নয়। আমি তখনই তাহাকে চিনিতে পারিলাম। সে পাগলাগারদের অধ্যক্ষ।"

"চৌধুরী কি তাহাকে আমাদের বাসা দেখাইয়া দিতেছিল ?"

"রাস্তায় পরিচিত লোকের সহিত দেখা হইলে যেরূপ ভাবে লোকে কথা কহে, তাহারা সেইরূপ ভাবেই কথা কহিতেছিল। যদি সে সময় লীলা আমার মুখ দেখিতে পাইত, তাহা হইলে বুঝিতে পারিত, নিশ্চয়ই কি একটা ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছে এবং হয় ত অত্যন্ত গোল করিয়া ফেলিত। আমি নিয়ত লীলার দিকে পিছন ফিরিয়া জানালার ফাক দিয়া দেখিতে লাগিলাম। শীঘ্রই তাহারা তফাৎ হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথে চলিয়া গেল। কিন্তু চৌধুরী আবার তখনই ফিরিয়া আসিল এবং পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া পেনসিল দিয়া কি লিখিল। তাহার পর রাস্তা পার হইয়া, সে আমাদের বাসার নীচের দোকানে আসিল। আমি দৌড়িয়া বাহিরে আসিলাম এবং কদাচ তাহাকে উপরে উঠিতে দিব না সংকল্প করিয়া নীচের সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া থাকিলাম। তখনই দোকানদারের ছোট মেয়েটি সেই কাগজ টুকু হাতে করিয়া আনিল। নরাধম তাহাতে লিখিয়াছে,— "সুন্দরি! আমাদের উভয়ের পক্ষেই অত্যাবশ্যক একটি কথা বলিবার জন্য আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছি।— জগদীশ।" "আমি মনে করিলাম, এরূপ দুর্জ্জনকে সহসা বিদায় করিয়া দেওয়ার অপেক্ষা, ইহার বক্তব্য জানিয়া লওয়াই সৎপরামর্শ। বিশেষতঃ তুমি এখানে উপস্থিত নাই। এখন তাহাকে বিরক্ত করিলে অত্যাচারের পরিমাণ দশগুণ বাড়িতে পারে। এই মনে করিয়া আমি মেয়েটিকে বলিলাম,—"ভদ্রলোকটীকে তোমাদের পাশের ঘরে আসিতে বল ; আমি এখনই সেখানে যাইতেছি।" পাছে লীলা টের পায় ইহাই আমার বিশেষ ভয়। আমি তখনই দোকানের পাশের ঘরে উপস্থিত হইলাম। বিলাসিতার পরিচায়ক নানা বস্ত্রালঙ্কার সমাচ্ছন্ন বিরাটকায় চৌধুরীকে সম্মুখে দেখিয়া, পুনরায় আমার কৃষ্ণ সরোবরের দিন মনে পড়িল। পরমাত্মীয় ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলে লোকে যেরূপ কথা কহে, সে সেইরূপ ভবে কথা কহিতে আরম্ভ করিল। যেন কোন ঘটনাই ঘটে নাই। যেন আমরা সম্পূর্ণ আত্মীয়তায় বদ্ধ ; যেন অনন্তরজাত ঘটনাসমূহ স্বপ্নবৎ বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে।"

"কি বলিল তাহা তোমার মনে আছে ?"

"ঠিক মুখস্থ বলার মত বলিতে না পারিলেও, আমি তাহার মর্ম্ম তোমাকে ঠিক বলিতে পারিব। আমার বিষয়ে সে যে সকল জঘন্য কথা বলিল তাহা আমি বলিয়া উঠিতে পারিব না। কিন্তু তোমার বিষয়ে যাহা বলিল, তাহা আমি এখনই বলিতেছি। আমি পুরুষ হইলে তাহাকে প্রহার করিতাম। রাগে আমার অন্তর অস্থির হইলেও আমি নীরবে সমস্ত সহ্য করিলাম। সে দুই বিষয়ের প্রার্থী। ১মতঃ আমার প্রতি তাহার অন্তরের অনুরাগ সে নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করিতে অনুমতি চাহে। বলা বাহুল্য আমি তাহার তাদৃশ প্রসঙ্গে কর্ণপাত করিতে অস্বীকার করিলাম। তাহার ২য় কথা, তদীয় পত্র লিখিত শাসন বাক্যের পুনরাবৃত্তিমাত্র। এ কথা পুনরায় বলিবার প্রয়োজন কি আমি জিজ্ঞাসা করিলে, সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তাহার প্রতি অত্যাচারের সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই তাহাকে উত্তেজিত হইয়া পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে

হইয়াছে। সে রাজাকে কর্ত্তব্য বিষয়ে পুনঃপুনঃ বিহিত উপদেশ প্রদান করিয়াছিল; কিন্তু রাজা তাহার উপদেশ গ্রাহ্য করেন নাই। তখন কাজেই চৌধুরীকে রাজার কথা ছাড়িয়া দিয়া, আত্মসাবধানতায় নিযুক্ত হইতে হইয়াছে। যদিই তোমার দ্বারা তাহার কোন বিপদ উপস্থিত হয়, এই ভয়ে, তুমি যখন কৃষ্ণসরোবর হইতে ফিরিয়া আইস, তখন চৌধুরী অলক্ষিত ভাবে তোমার পশ্চাতে থাকিয়া আমাদের বাসা দেখিয়া যায়। উকীলের লোকেরাও সে দিন তোমার অনুসরণ করিয়াছিল। চৌধুরী এত দিন আমাদের ঠিকানা জানিয়াও, আমাদের উপর কোন দৌরাত্ম্য করিবার প্রয়োজন দেখিতে পায় নাই। কিন্তু সম্প্রতি রাজার মৃত্যু হওয়ায়, তাহার ধারণা হইয়াছে, তুমি নিশ্চয়ই অতঃপর এই চক্রান্তের অপর প্রধান ব্যক্তিকে আক্রমণ করিবে। এইরূপ মনে হইবামাত্র, সে পাগলাগারদের অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করে এবং তাঁহার পলাতকা বন্দিনী কোথায় লুকাইয়া আছে তাহা দেখাইয়া দিতে ইচ্ছা করে। তাহাতে আর কিছু উপকার না হইলেও, তোমাকে নানাপ্রকার মামলা মোকদ্দমা করিতে হইবে; সুতরাং তাহার কোন অনিষ্ট চেষ্টা করিতে তোমার আর সময় থাকিবে না। সে এ সম্বন্ধে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হইয়াছে। কেবল একই কারণে সে এখনও উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্যসাধনে বিরত আছে।”

“কি কারণ?”

“সে কারণ বলা ও স্বীকার করা নিতান্ত লজ্জার কথা। আমিই এ সম্বন্ধে একমাত্র কারণ। এ কথা যখন আমার মনে হয় তখন দারুণ ঘৃণায় আমি আপনাকে আপনি ধিক্কার দিতে থাকি। কিন্তু যাহাই হউক, ঐ পাষাণহৃদয় দুরাচার আমার প্রশংসায় বিমুগ্ধ। আত্মসম্মানের অনুরোধে, আমি একথা এতদিন বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু তাহার দৃষ্টি, তাহার ভঙ্গী ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া, তাহার বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে। কি বিড়ম্বনা! কি ভয়ানক লজ্জার কথা! আমার সম্বন্ধে কথা বলিবার সময়ে সত্যই দেবেন্দ্র, তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে বলিল, কারাধ্যক্ষকে বাড়ী দেখাইবার সময় তাহার মনে হইল, প্রিয় ভগ্নী লীলাবতীর সঙ্গশূন্য হইলে আমার যাতনার সীমা থাকিবে না। আমার সেই কষ্ট নিবারণের উদ্দেশে, বাড়ী দেখাইতে গিয়াও সে দেখাইতে পারিল না এবং অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে ভাবিয়া নিরস্ত থাকিল। আমি এই সকল কথা স্মরণ করিয়া, যাহাতে তোমাকে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে না দিই, ইহাই তাহার অনুরোধ। পুনরায় কোন কারণ উপস্থিত হইলে সে হয় ত সাধ্যমত অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত না হইয়া থাকিতে পারিবে না। মরিয়া যাই সেও ভাল, তবু তাহার মত লোকের সঙ্গে এরূপ চুক্তি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি কিছুই বলিলাম না।”

আমি বলিলাম,—“কথা সব ঠিক বটে, কিন্তু ভয়ের কারণ কিছুই নাই। চৌধুরী কেবল তোমাকে অনর্থক ভয় প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিল বলিয়া আমার মনে হইতেছে। কারাধ্যক্ষের দ্বারা আমাদের কোন বিপদ ঘটাইতে তাহার আর সাধ্য নাই। কারণ এক্ষণে প্রমোদরঞ্জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং হরিমতি সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়াছে। আমার কথা চৌধুরী কি বলিল?”

সকলের শেষে সে তোমার কথা বলিল। তখন তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং

তাহার ভাব পূর্ব্বকালের মত হইল। সে বলিল,—"তোমাদের দেবেন্দ্র বাবুকে সাবধান থাকিতে বলিবে। তাঁহাকে বলিয়া দিবে, আমি যে সে লোক নহি। স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য আমি দয়ামায়া বিসর্জ্জন দিতে পারি, সমাজকে পদবিদলিত করিতে পারি এবং আইন ও রাজ-শাসনকে পদাঘাতে উপেক্ষা করিতে পারি। আমার স্বর্গীয় বন্ধু যদি আমার পরামর্শমতে চলিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পরিবর্ত্তে আজি দেবেন্দ্র বাবুর লাস লইয়া পুলিশ-তদন্ত হইত। আমাকে উত্ত্যক্ত করিলে দেবেন্দ্র বাবুর কদাপি নিষ্কৃতি নাই। তিনি যাহা লাভ করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকুন। আমি, তোমার অনুরোধে, তাঁহার সে সুখে প্রতিবন্ধক হইব না। তাঁহাকে আমার নমস্কার জানাইয়া বলিবে যে, জগদীশনাথ চৌধুরী কিছুতেই পিছ পা নহে। আর কিছু বলিব না। অদ্য আমি আপনার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আমাকে মনে রাখিবেন।" এই বলিয়া এবং কাতর ভাবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে চলিয়া গেল।"

"ফিরিয়া আসিল না? আর কিছুই বলিল না?"

"না, গৃহনিষ্ক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে, আর একবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে চলিয়া গেল। আমি তৎক্ষণাৎ স্থির করিলাম যে, এ বাসায় আর কদাচ থাকা উচিত নয়। যখন চৌধুরী ইহার সন্ধান পাইয়াছে এবং তুমি এখানে উপস্থিত নাই, তখন এখানে থাকিলে নিশ্চয়ই বিপদ ঘটিবে। লীলার স্বাস্থ্যের জন্য তুমি এ বাসা হইতে উঠিয়া আর একটু নির্জ্জন স্থানে যাইবার অভিপ্রায় করিয়াছিলে। আমি লীলাকে সেই কথা মনে করিয়া দিলে, সে বড় আনন্দিত হইল। সে সমস্ত সামগ্রী পত্র গোছ গাছ করিতে লাগিল।"

"বাড়ী ঠিক করিলে কেমন করিয়া?"

"কেন? খবরের কাগজে আমি এই বাড়ীর সংবাদ দেখিয়াছিলাম। আমি তখনই রাস্তা হইতে একটা ঠিকা মুটে ডাকাইয়া তাহার দ্বারা চিঠি পাঠাইয়া দিলাম। তখনই উত্তর আসিল এবং সমস্ত ঠিক হইয়া গেল। সন্ধ্যার পরে আমরা গাড়ি ভাড়া করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কেহই আমাদের দেখিতে পাইল না।"

আমি আন্তরিক সন্তোষের সহিত তাঁহার ধীরতার প্রচুর প্রশংসা করিলাম এবং তাঁহার সাহসের ও সুবুদ্ধির যথেষ্ট সুখ্যাতি করিলাম। তখন তিনি নিতান্ত সভয়নেত্রে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"চৌধুরী অতি দুরন্ত! নিতান্ত ধূর্ত্ত লোক! সে না করিতে পারে এমন কর্ম্মই নাই। দেবেন্দ্র, এখন কি করিলে আমরা নিরাপদ হইতে পারি বল।"

আমি বলিলাম,—"উকীল করালী বাবুর সহিত সাক্ষাতের পর এখনও বহুদিন অতীত হয় নাই। আমি যখন তাঁহার নিকট হইতে বিদায় হই, তখন তাঁহাকে লীলার সম্বন্ধে এই কয়টি কথা বলিয়াছিলাম, লীলা তাঁহার জন্ম-ভবন হইতে অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায় বিতাড়িত হইয়াছেন; তাঁহার মৃত্যুর খোদিত নিদর্শন তাঁহার মাতৃ-প্রতিমূর্ত্তির পাদদেশে সংস্থাপিত হইয়াছে। কেবল দুই ব্যক্তি এই বিজাতীয় অত্যাচারের নিমিত্ত দায়ী। সেই জন্ম-ভবনের দ্বার তাঁহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত পুনরায় উন্মুক্ত হইবে; এবং সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে সেই খোদিত নিদর্শন বিনষ্ট হইবে। যদিও বিচারাসন সমাসীন বিচারপতি মহাশয়ের ক্ষমতাবলে তাহা সংসাধিত না হয়, তথাপি আমি

স্বীয় ক্ষমতা বলে, আমার নিকট সেই দুই ব্যক্তিকে দুষ্কৃতির নিমিত্ত দায়ী ও পদানত করিবই করিব। সেই দুই জনের একজন অধুনা মানব ক্ষমতার বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অপর ব্যক্তি এখনও আছে; সুতরাং আমার সংকল্পও ঠিক আছে।”

দেখিলাম মনোরমার নয়নদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং বদনমণ্ডল আরক্তিম হইল। বুঝিলাম আমার প্রতিজ্ঞার সহিত তাঁহার পূর্ণ মাত্রায় সহানুভূতি আছে। আমি বলিতে লাগিলাম,—“আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, আমার উদ্দেশ্যের সফলতা সম্বন্ধে অনেক ব্যাঘাত ও অনেক সন্দেহ আছে। এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু করা হইয়াছে, বা যে যে বিপদের সম্মুখীন হওয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতের তুলনায় তৎসমস্ত অতি সামান্য ও নগণ্য। তথাপি মনোরমা, যাহাই কেন হউক না, এ উদ্যম কদাপি পরিত্যাগ করা হইবে না। সমস্ত আয়োজন ঠিক না করিয়া, জগদীশনাথ চৌধুরীর ন্যায় দুর্দ্দান্ত ব্যক্তির বিরোধিতায় দণ্ডায়মান হইব, এরূপ উন্মাদ আমি নহি। ধৈর্য্যে আমার অভ্যাস আছে, সুতরাং সমুচিত সময়ের জন্য অপেক্ষিত থাকিতে আমি প্রস্তুত আছি। তাহাকে এখন ভাবিতে দেও, সে তোমাকে যে ভয় প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে, আমরা যথার্থই তাহাতে ভীত হইয়াছি। আমাদের কোন সংবাদই যেন সে না পায়, আমাদের কোন কথাই যেন তাহার কর্ণগোচর না হয়। তাহা হইলে তাহার মনে ধারণা হইবে যে, তাহার অবস্থা সম্পূর্ণরূপ নিরাপদ হইয়াছে। তাহার পর তাহার দারুণ অহঙ্কৃত প্রকৃতি তাহার সর্ব্বনাশের পথ আপনি উপস্থিত করিয়া দিবে। অপেক্ষা করিবার এই এক কারণ—অপেক্ষা করিবার আরও গুরুতর কারণ আছে। শেষ চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে, মনোরমা তোমাদের সহিত আমার সম্বন্ধ আরও গাঢ় হওয়া উচিত।”

সবিস্ময়ে মনোরমা আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—“তোমার চেয়ে আত্মীয় ইহজগতে আমাদের কেহই নাই। তোমার সহিত সম্বন্ধ কি রূপে আরও গাঢ় হইতে পারে?”

আমি একটু বিবেচনা করিয়া বলিলাম,—“সে কথা দেবি, আমি আজ বলিব না। এখন তাহা বলিবার সময় উপস্থিত হয় নাই; কখনও হইবে কি না সন্দেহ। কিন্তু আপাততঃ আর একটা কথা আমাদের বিশেষ বিচার্য্য। তুমি লীলাকে, তখন তাঁহার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ না জানাইয়া ভাল করিয়াছ, কিন্তু—”

“আরও অনেক দিন না যাইলে একথা লীলাকে বলা কখনই উচিত নহে।”

“না মনোরমা, আজিই সুকৌশলে, অন্যান্য কোন কথা না বলিয়া, কেবল তাঁহার মৃত্যু সংবাদটী লীলাকে জানান আবশ্যক।”

মনোরমা কিয়ৎ কাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং অঞ্চলে বদনাবৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“দেবেন, তোমার অভিপ্রায় বুঝিয়াছি। কিন্তু সে শুভ দিন কি ঘটিবে?”

আমি বলিলাম,—“কেন দিদি, তুমি আশঙ্কা করিতেছ? মনোরমা, তুমি আমাদের মা, তুমি আমাদের ভগ্নী। তোমার স্নেহ, তোমার দয়াই আমাদের সকল ভরসা। এখন আমাদের আর কি কষ্ট আছে। আমরা দরিদ্র হইলেও আমাদের সংসার এখন সুখময়। লীলার ধনসম্পত্তি দেখিয়া আমি কদাপি মুগ্ধ হই নাই। লীলা আমার চক্ষুতে চির প্রেমময়, চির আনন্দময়। অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্না লীলার

অপেক্ষা, দুঃখিনী লীলা আমার বিবেচনায় আরও মধুর। তবে কেন দিদি, তুমি কাতর হইতেছ?”

মনোরমা আর কোন উত্তর না দিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। পরদিন লীলা সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত হইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, রাজার মৃত্যু হেতু তাঁহার জীবনের প্রধান ভ্রান্তি ও বিষাদ বিদূরিত হইয়াছে এবং এক্ষণে তিনি সম্পূর্ণ-রূপ স্বাধীনা হইয়াছেন।

তদবধি আর কখন আমরা তাঁহার নামোল্লেখ করি নাই এবং তাঁহার মৃত্যুবিষয়ক কোন প্রসঙ্গও উত্থাপন করি নাই। আমরা অধিকতর আগ্রহ সহকারে সাংসারিক কার্য্যে মনঃসংযোগ করিলাম এবং ধীর ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। আমাদের মনোগত অভিপ্রায় মনোরমা ও আমি প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিলাম। অবৈধ বোধে, আমরা উভয়েই তাহা লীলার নিকট অধুনা ব্যক্ত করিলাম না।

চৌধুরী যদি কলিকাতা হইতে অন্য দেশে চলিয়া যায়, তাহা হইলে আমার সকল আশাই ব্যর্থ হইবে। কারণ চৌধুরীকে আয়ত্তগত করিয়া তাহার পাপোচিত দণ্ড বিধান করিতে হইবে, ইহা আমার দৃঢ় সংকল্প এবং এই বাসনাই আমার সমস্ত মনোবৃত্তির উপর সতত প্রবল আধিপত্য করিতেছে। আমি জানিতাম, ৫নং আশুতোষ দের লেনে চৌধুরীর বাসা। সেই ৫নং বাটীর মালিক কে তাহা আমি সন্ধান করিলাম। সেই বাটী আমার ভাড়া লইবার আবশ্যক আছে, অতএব তাহা শীঘ্র খালি লইবার সম্ভাবনা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলাম। বাড়ীর মালিক বলিলেন যে, বাটীর বর্ত্তমান ভাড়াটিয়া আবার নূতন করিয়া ৬ মাসের এগ্রিমেণ্ট করিয়াছেন, সুতরাং আগামী আষাঢ় মাসের এ দিকে বাটী খালি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তখন মোটে অগ্রহায়ণ মাস। সুতরাং আমি এ সম্বন্ধে আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইলাম।

রোহিণী ঠাকুরাণীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়া, মুক্তকেশীর মৃত্যুসংক্রান্ত অন্যান্য সংবাদ জানাইব স্বীকার করিয়াছিলাম। একদিন অবসর বুঝিয়া, আমি তদভিপ্রায়ে রোহিণী ঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষৎ করিলাম এবং সমস্ত সংবাদ তাঁহাকে জানাইলাম। ঘটনা যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আভ্যন্তরিক বৃত্তান্তের কিয়দংশ তাঁহাকে জানাইলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না বলিয়া, অগত্যা তাঁহাকে কিছু কিছু বলিতে হইল। এই সাক্ষাতে যাহা ঘটিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই সাক্ষাৎ হেতু, মুক্তকেশীর পিতৃনিরূপণ বিষয়ে, যত্নবান্ হইতে আমার ইচ্ছা হইল।

আমি বাসায় ফিরিয়া আসিয়া মনোরমার সহিত এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিলাম এবং তদনন্তর তাঁহারই নাম করিয়া দীনবন্ধু বাবুকে এক পত্র লিখিলাম। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, হরিমতি স্বামীর ঘরে আসিবার পূর্ব্বে, এই দীনবন্ধু বাবুর বাটীতে সতত যাতায়াত করিত এবং কখন কখন সেখানে থাকিত। মনোরমার জবানী এই পত্র লিখিত হইল এবং কয়েকটি পারিবারিক তথ্য নিরূপণ এই পত্র লিখিবার উদ্দেশ্য বলিয়া উল্লিখিত হইল। দীনবন্ধু বাবু তখনও বাঁচিয়া আছেন কি না সন্দেহ, তথাপি একবার লিখিয়া দেখা গেল।

দুই দিন পরে পত্রের উত্তর আসিল এবং তাহা হইতে যে যে সংবাদ পাওয়া গেল

তাহাতে বুঝা গেল যে, কৃষ্ণসরোবরের রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়ের সহিত দীনবন্ধু বাবুর কখন পরিচয় ছিল না এবং তিনি কখন দীনবন্ধু বাবুর বাটীতে পদার্পণ করেন নাই। আনন্দধামের ৺ প্রিয়প্রসাদ রায়ের সহিত দীনবন্ধু বাবুর বিশেষ বন্ধুতা ছিল এবং তিনি সতত দীনবন্ধু বাবুর বাটীতে যাতায়াত করিতেন। পুরাতন পত্রাদি দেখিয়া দীনবন্ধু বাবু নিঃসংশয়িত রূপে বলিতে সক্ষম যে, ১২২৬ সালের ভাদ্র মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত তিন মাস কাল প্রিয়প্রসাদ বাবু দীনবন্ধু বাবুর বাটীতে ছিলেন। তাহার পর তিনি চলিয়া যান এবং অনতিকাল মধ্যেই তাঁহার বিবাহ হয়।

মোটামুটি দেখিলে এ সংবাদ বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে না হইতে পারে। কিন্তু মনোরমা ও আমি সূক্ষ্মরূপে অন্যান্য বৃত্তান্তের সহিত ঐক্য করিয়া যে মীমাংসায় উপনীত হইলাম, তাহা আমাদের মনে অকাট্য বলিয়া বোধ হইল।

ইহা আমরা জানি যে ১২২৬ সালে হরিমতি সতত দীনবন্ধু বাবুর বাটীতে যাওয়া আসা করিত এবং সেই সময়েই প্রিয়প্রসাদ বাবুও সেই স্থানে ছিলেন। লীলার সহিত মুক্তকেশীর অত্যদ্ভুত আকৃতিগত সমতার বিষয় সকলেই জ্ঞাত আছেন এবং লীলা যে আকৃতি বিষয়ে মাতৃ অনুরূপ নহেন—পিতার অনুরূপ তাহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। প্রিয়প্রসাদ বাবু অতিশয় রূপবান্ এবং অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ পুরুষ ছিলেন। সুতরাং এরূপ স্থলে কিরূপ মীমাংসা সঙ্গত তাহা বলা অনাবশ্যক।

হরিমতির পত্রও এস্থলে আমাদের মীমাংসার সহায়তা করিল। সে নিষ্প্রয়োজনে তাহার লিখিত পত্র মধ্যে, বরদেশ্বরী দেবীর প্রসঙ্গে লিখিয়াছে যে, তাঁহার "চেহারায় বিশেষত্ব কিছু ছিল না; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এক সুন্দর পুরুষের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।" তীব্র গায়ের জ্বালা ভিন্ন সে পত্রে এরূপ কথা লিখিবার কোন দরকার ছিল না। সুতরাং ইহা হইতেও বুঝা যাইতেছে যে, বরদেশ্বরী দেবীর উপর হরিমতির বিরক্ত হইবার অবশ্যই কোন কারণ ছিল। সে কারণ কি তাহা অনুমান করা অতি সহজ।

এস্থলে বরদেশ্বরী দেবীর নাম উত্থাপিত হওয়ায়, সহজেই মনে মনে প্রশ্ন উঠিতেছে, আনন্দধামে মুক্তকেশীকে দেখিয়া, সে কাহার সন্তান তদ্বিষয়ে বরদেশ্বরী দেবীর মনে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল কি? না। বরদেশ্বরী দেবী তাঁহার স্বামীর বিদেশাবস্থান কালে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন এবং যাহার কোন কোন অংশ মনোরমা আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছেন, তাহাতে মুক্তকেশীর কথা বিশেষরূপে লিখিত আছে সত্য কিন্তু স্বতঃ সঞ্জাত স্নেহ ও কৌতূহল ভিন্ন, সেই লেখার অন্য উদ্দেশ্য থাকা সম্ভব নহে। হরিমতি, চরিত্রের এই দারুণ কলঙ্ক প্রচ্ছন্ন রাখিবার নিমিত্ত, যেরূপ যত্নবতী ছিল তাহাতে অপর ব্যক্তির এ রহস্য পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভাবিত নহে। স্বয়ং প্রিয়প্রসাদ রায়ই মুক্তকেশীকে নিজ সন্তান বলিয়া জানিতেন এমন বোধ হয় না।

এই বিষয় আলোচনা করিতে করিতে আমার মনে হইল, পিতা-মাতার পাপে সন্তানেরা দুঃখ পায়; বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই কথা অতি সুন্দররূপে সপ্রমাণ হইতেছে। লীলা ও মুক্তকেশী উভয়েই নিরীহ ও নিষ্পাপ। কিন্তু উভয়কেই অকারণ কত কষ্টই সহ্য করিতে হইল।

আপাততঃ মুক্তকেশীর প্রসঙ্গের এক প্রকার মীমাংসা হইয়া গেল। যে মূর্ত্তি প্রথম দর্শনাবধি নিরন্তর আমাকে উৎকণ্ঠিত ও বিচলিত করিয়া রাখিয়াছিল তাহার প্রসঙ্গালোচনার এই স্থলেই সমাপ্তি হইল। সে যেরূপ অলক্ষিত ভাবে আমার সম্মুখে উপনীত হইয়াছিল, সেইরূপ অলক্ষিত ভাবেই কাল-সমুদ্রে বিলীন হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আরও চারি মাস অতীত হইল। ফাল্গুন মাস আসিল—সুখময় বসন্ত দেখা দিল। আমাদের জীবন-প্রবাহ নির্ব্বিঘ্নে, মন্থর গতিতে এ কয় মাস প্রবাহিত হইল। লীলা এখন সম্পূর্ণ রূপ সুস্থ, সম্পূর্ণরূপ প্রফুল্ল, সম্পূর্ণরূপ ক্রীড়াময় ও সম্পূর্ণরূপ আনন্দময়। কে বলিবে যে এই কোমল লতিকার উপর দিয়া সেই প্রবল ঝটিকা চলিয়া গিয়াছে? সে সকল দুর্দ্দৈব অতীতের অনন্তসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে, আমাদের ব্যবহারে ও কার্য্যে তাহার কোনই পরিচয় আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন লীলাকে দেখিয়া, কাহারও মনে সেই আনন্দ-ধামের প্রফুল্লতাময়ী, উৎফুল্লাননা লীলাবতী ভিন্ন আর কিছুই উদিত হইতে পারে না। এখন মনোরমাকে দেখিয়াও সেই বুদ্ধিমতী, চতুরা, সুস্থকায়া সুন্দরী ভিন্ন আর কিছুই মনে পড়িতে পারে না। কে বলিবে যে আমাদের জীবনের মধ্য দিয়া অতি ভয়ানক দেড়বৎসর পরিমিত কাল অতীত হইয়া গিয়াছে?

লীলার জীবনাগত, একমাত্র বিষয়ের যাবতীয় স্মৃতি তাঁহার মানসপট হইতে এককালে বিলুপ্ত হইয়াছে। কৃষ্ণসরোবরের রাজবাটী পরিত্যাগ করার পর হইতে বর-দেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি পার্শ্বে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎকাল পর্য্যন্ত, কোন ঘটনার একবর্ণও তিনি স্মরণ করিতে অক্ষম। নানা কৌশলে আমি তৎসাময়িক বিভিন্ন প্রসঙ্গ তাঁহার স্মরণ-পথে পুনরুদিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু বিন্দুমাত্রও কৃতকার্য্য হই নাই।

ধীরে ধীরে এবং অলক্ষিত রূপে আনন্দ-ধামের পূর্ব্বভাব সমূহ আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইতে লাগিল। লীলাকে না দেখিলে আর এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারি না। আমার সম্মুখে লীলার কেমন লজ্জা হয় এবং বদন কমল রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। তিনি বদন নত করেন। আমি তাঁহাকে কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য যদি অন্বেষণ করি, তাহা হইলে সাক্ষাৎ হইবামাত্র সে কাজ আমি ভুলিয়া যাই এবং কিছুই বলিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হই। তাঁহাকে দেখিলে আমার হৃদয় বিকম্পিত। ক্রমে এমন হইল যে, মনোরমা সমক্ষে না থাকিলে, আমরা কোন কথাই কহিতে অক্ষম হইয়া উঠিলাম। আমি সেই সামান্য দীনহীন শিক্ষক—লীলা সেই সুখসেবিতা স্বর্গ-কন্যা! এরূপ পার্থক্য স্থলে—এরূপ অসম-ক্ষেত্রে বিবাহের আশা করা অসঙ্গত। আমি লীলার পাণিগ্রহণার্থী, এ কল্পনাও বাতুলতা বলিয়া আমি অবসন্ন হইতাম। এইরূপ দুশ্চিন্তায় ক্রমে কাজকর্ম্মে আমার অতিশয় শৈথিল্য ঘটিল।

এদিকে লীলারও সতত চিন্তাকুল অবস্থা। কোথায় বা লেখাপড়া—কোথায় বা কবিতা

রচনা। সেই প্রফুল্লাননা লীলা নিয়ত উন্মনা ও বিষণ্ণা হইয়া উঠিলেন। মনোরমা আমাদের উভয়েরই এইরূপ চিন্তাকুল ভাব স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। তিনি লীলাকে এক দিন একথা জিজ্ঞাসিলেন। লীলা বিষাদের হাসি হাসিয়া সকল কথা উড়াইয়া দিলেন।

আমরা কেহই কাহাকে কোন কথা বলিতে পারি না। উভয়ের মনই বহুবিধ ভাবের উত্তেজনায় কাতর; কিন্তু উভয়েই নীরব। একদিন—একদিন সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে, ভগবান সহসা আমাদের হৃদয়বল সংবর্দ্ধিত করিয়া দিলেন এবং আমাদিগকে পরম সুখী করিলেন। লীলা তাঁহার প্রকোষ্ঠ মধ্যে পুস্তকাদি লইয়া অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া আছেন; সহসা আমি তথায় প্রবেশ করিলাম। এতই সাবধানে ও নিঃশব্দে আমি লীলার নিকটস্থ হইলাম যে, লীলা কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিনি নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবে কলম লইয়া লিখিতেছেন; আমি ধীরে ধীরে তাঁহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলাম। তথাপি লীলা কিছুই জানিতে ও বুঝিতে পারিলেন না! তিনি প্রবন্ধ লিখিতেছেন—কি বিষয়ে? 'নির্ব্বাক্ প্রেম।' কাগজের মাথায় শিরোনাম লিখিত হইয়াছে, কিন্তু প্রবন্ধের আর কিছুই লেখা হয় নাই। একছত্র লেখা হইয়াছিল, কিন্তু কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া থাকার পর, আমি বলিলাম,—"লীলা! তোমার প্রবন্ধের বিষয়টী বড়ই সুন্দর।"

লীলা চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিলেন। দারুণ লজ্জায় তাঁহার বদন রক্তবর্ণ হইল। লোচনযুগল নত হইয়া পড়িল। তিনি বলিলেন,—তুমি এখানে আসিয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছ? কই আমি তো কিছুই জানিতে পারি নাই।"

আমি বলিলাম,—আমি অনেকক্ষণ আসিয়াছি। তা হউক, তোমার প্রবন্ধের বিষয়টী বড় ভাল। তুমি শিরোনাম লিখিয়াছ কিন্তু আর কিছুই লিখিয়া উঠিতে পার নাই। আমি এসম্বন্ধে অনেক কথা জানি; তোমাকে তাহা বলিয়া শুনাই। তাহা হইলে তোমার প্রবন্ধ লেখার সুবিধা হইবে।

লীলা অধোমুখে বলিলেন—না। আমি প্রবন্ধ লিখিব না।"

আমি বলিলাম,—"প্রবন্ধ লেখ, বা নাই লেখ কথা গুলি শুনিয়া রাখা ভাল। একদা ঘটনাক্রমে এক অতি সামান্য দীনহীন ব্যক্তি এক সুন্দরী-শিরোমণি, সুখসৌভাগ্যশালিনী রাজকুমারীর প্রেমে মুগ্ধ হয়। অভাগ্য দরিদ্র এরূপ দেবদুর্ল্লভ অমূল্য সম্পত্তি-লাভের জন্য লোলুপ হইলেও, সে কদাপি আপন পদ, অবস্থা ও সামর্থ্যের কথা বিস্মৃত হয় নাই। সে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়া চন্দ্রলাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু কাহাকে সে কথা সে বুঝিতে দেয় নাই। যে ভূর্লোকললামভূতা গুণবতীর জন্য তাহার হৃদয় এতাদৃশ উন্মত্ত হইয়াছিল, তাঁহাকে লাভ করা তাহার মত হতভাগার পক্ষে কখনই সম্ভব নহে, তাহা সে জানিত। সেই স্বর্গ-কন্যা তাহার ন্যায় জঘন্য জীবের প্রেমের প্রতিদান করিবেন, ইহাও সে কখন প্রত্যাশা করিত না। তথাপি সে সেই সুন্দরীকে ভাল বাসিত। কিরূপ সে ভালবাসা? সে ভালবাসার জন্য সে অকাতরে জীবন দিতে প্রস্তুত; হৃদয়ের হৃদয়ে সেই সুন্দরীর প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া, স্নেহ, ভক্তি মায়া প্রভৃতি কুসুমরাশি দিয়া তাঁহার চরণার্চ্চনা করিয়া সে সুখী; সেই সুন্দরীর কোন সেবার প্রয়োজন উপস্থিত অযাচিত ভাবে, তাহা সম্পাদন করিয়া কৃতার্থ;

কিন্তু যে প্রেমে তাহাকে জীবন দিতেছে ও তাহার জীবন লইতেছে, যাহার সতেজ শিখায় তাহার হৃদয় দগ্ধীভূত হইয়া যাইতেছে, যে প্রেমের তীব্র জ্বালায় সে অধীর হইয়া রহিয়াছে, সে প্রেমের বার্ত্তা ইহ সংসারে কাহার সমক্ষে সে কদাপি ব্যক্ত করে নাই। যিনি এই সুপবিত্র প্রণয়ের আধার, যে স্বর্গ-কন্যা এই সুদৃঢ় প্রণয়ের কেন্দ্রস্বরূপ তাঁহাকেও কদাপি সে এ প্রণয়ের কথা বুঝিতে দেয় নাই। তাহারই যথার্থ নির্ব্বাক্ প্রেম। বল সুন্দরি! তাহার প্রতি করুণ নয়নে দৃষ্টিপাত না করা সে সুন্দরী শিরোমণির কি উচিত কার্য্য হইয়াছে? সে ঘৃণিত হউক, সে সামান্য হউক, সে অধম হউক, কিন্তু সে যথার্থ প্রেমিক। তাহাকে উপেক্ষা করা কি সে সুন্দরীর উচিত ব্যবস্থা হইয়াছে?”

সেই দিন—সেই মুহূর্ত্তে—সেই শুভক্ষণে বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলাম কি? দেখিলাম, লীলাবতী সুন্দরীর সেই কুসুম-সুকুমার গণ্ড-স্থল বহিয়া মুক্তাফলের ন্যায় অশ্রুবিন্দু সমূহ দরদরিত ধারায় ঝরিত হইতেছে। আমি সাদরে, সাগ্রহে তাঁহার হস্তধারণ করিলাম। তিনি অধোমুখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—“কিন্তু সেই দেবতা—সেই মহা-পুরুষ—সেই আরাধ্যতম মহাত্মা বড় মিথ্যাবাদী। সেই মর্ম্মপীড়িতা দুঃখিনী বালা তাঁহার জন্য কত অশ্রুবর্ষণ করিতেছে, তিনি একদিনও তাহার বিচার করেন নাই; সেই অভাগিনী কিরূপ ব্যাকুলভাবে কালাতিপাত করিয়াছে, তাহা একবারও মনে করেন নাই। সে দীনহীনা। তাহার তুচ্ছ প্রেমের কথা সেই স্বর্গ-দেবতাকে সে একদিনও জানাইতে সাহস করে নাই; উপেক্ষার ভয়ে সেই অভা-গিনী কদাপি সেই গুণময়ের সমীপে স্বীয় প্রেমের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহারই যথার্থ নির্ব্বাক্ প্রেম। বল দেবতা তাহার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত না করা সে মহাপুরুষের কি উচিত কার্য্য হইয়াছে?”

আমি তখনই উভয় বাহু দ্বারা সেই সুখ-সেবিতা সুন্দরীকে আলিঙ্গন করিলাম এবং বারবার প্রীতি পরিপূরিত পবিত্র চুম্বন পরম্পরায় অপার্থিব সুখসম্ভোগ করিতে লাগিলাম! তখন পবিত্র বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইয়া আমাকে চিরসুখী করিবার নিমিত্ত সেই সুন্দরী-শিরো-মণিকে আমি অনুরোধ করিলাম। তিনি আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—“এই দুঃখিনী, তোমার অযোগ্যা হইলেও, তোমারই দাসী। দাসীকে চরণসেবায় বঞ্চিত করিও না।”

আমি তখনই মনোরমার সমীপস্থ হইলাম এবং লীলার সহিত আমার বিবাহের নিমিত্ত তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি আমার কথা শুনিয়া আনন্দে রোদন করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—“ভাই দেবেন্! যে দিন আনন্দধামের সরসী-সন্নিহিত সৌধ-মধ্যে তোমাকে এই প্রেম পরিত্যাগ করিতে উপ-দেশ প্রদান করিয়াছিলাম; যে দিন অমানুষী ধৈর্য্য ও অত্যদ্ভুত বিবেচনা সহকারে তুমি আমার নিতান্ত কঠোর উপদেশের বশবর্ত্তী হইতে স্বীকার করিয়াছিলে, সেই দিনের কথা আজি মনে পড়িতেছে। যে যে প্রতিবন্ধক তৎকালে তোমার অতুলনীয় প্রেমের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, ঈশ্বরের অপরিসীম করুণাবলে সৎসমস্তের যাবতীয় নিদর্শন অধুনা বিদূরিত ও বিলুপ্ত হইয়াছে। সোদরাধিক স্নেহাস্পদ দেবেন্দ্র! তোমার নিকট অপরি-চ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাজালে আমি বদ্ধ। সেই কৃতজ্ঞ-তার পরিচয় প্রদান করিতে পারি এরূপ সাধ্য

ইহ জগতে এ অভাগিনীর নাই। আমার জীবনের জীবন, সমস্ত সুখের কেন্দ্র, একমাত্র আনন্দবর্ত্তিকা লীলাকে তোমার রক্ষণশীল হস্তে সমর্পণ করিয়া অপার আনন্দ সম্ভোগ করা আমার পরম সৌভাগ্য। অতএব ভাই! সত্বর এই শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা কর। আর কি বলিব ?"

আমি বলিলাম,—"দেবি, আমরা যেরূপ প্রচ্ছন্ন ভাবে জীবনপাত করিতেছি, তাহাতে কোনরূপ উৎসব সহকারে এই শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করা অসম্ভব। তুমিই আমাদের মঙ্গলময়ী। তুমি আশীর্ব্বাদ সহকারে আমার হস্তে পাত্রী সম্প্রদান করিলে আমি চরিতার্থ হইব। লীলার যে আর বিবাহ হইয়াছিল তাহা আমার কদাপি মনে হয় না। আমার মনে হয়, লীলা আমারই এবং আমি লীলারই; আমাদের আজীবন এই সম্বন্ধ। বস্তুতই লীলার সে বিবাহ, বিবাহ নামের নিতান্ত অযোগ্য। যদি দারুণ প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি আমাকে উত্তেজিত করিয়া না রাখিত, যদি সেই দুষ্কৃতিকারী ব্যক্তিদ্বয়কে দণ্ডিত করিবার দৃঢ় সংকল্প আমার মনে না থাকিত, যদি সফলতার সুবিমল চিত্র প্রতিনিয়ত আমাকে উৎসাহিত না করিত, তাহা হইলে সেই অতীত ভ্রান্তির কথা, সেই লীলার দুর্ব্বিষহ অতীত যাতনার কথা, কদাচ আমাদের মানসক্ষেত্রে সমুদিত হইত না।"

মনোরমা বলিলেন'—"আজি তোমার কথা শুনিয়া ভাই, এতদিনের সমস্ত অন্তরতাপ নিবারিত হইল। তুমি লীলার সহায়, আশ্রয় ও রক্ষক। সেই লীলা তোমারই হইবে, ইহার অপেক্ষা শুভ সংবাদ আর কি হইতে পারে ? লীলা এখন সম্পত্তিহীনা, আশ্রয়হীনা, আত্মীহীনা। এখনও এই লীলার প্রতি তোমার অনুগ্রহের লাঘব হয় নাই, ইহা পরম সৌভাগ্য।"

আমি বলিলাম,—"দিদি, সম্পত্তিতে আমার কি প্রয়োজন ? আমি লীলার সম্পত্তি দেখিয়া কদাপি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হই নাই; সুতরাং আজি তাঁহার সম্পত্তি নাই বলিয়াও কাতর নহি। লীলা সমস্ত বসুধার অধীশ্বরীই হউন, বা কপর্দ্দক বিহীনা ভিখারিণীই হউন; অগণ্যহিতৈষী মিত্রমণ্ডলীতে তিনি পরিবৃতা থাকুন, বা সংসার-সমুদ্রে একাকিনী ভাসিতে থাকুন, আমার চক্ষে তিনি চিরপ্রেমময়ী—চির আদরিণী। তাঁহার যেরূপ দশা বিপর্য্যয় কেন ঘটুক না, এ অধম তাঁহার চিরদিন মুগ্ধ স্তাবক ও অনুগত প্রেমিক। তবে দিদি, তবে তাঁহার সম্প্রত্তি, আশ্রয় বা আত্মীয় অনুসন্ধান করিবার আমার প্রয়োজন কি ?"

মনোরমা বলিলেন,—"তোমার এতাদৃশ প্রগাঢ় অনুরাগের বিষয় আমি বেশ জানি। কিন্তু লীলার এই অবস্থা কি চিরস্থায়ী হইবে ? ধন-সম্পত্তি আবাসাদি সকলই থাকিতে, অভাগিনী কি চিরদিনই অপরিচিত ভাবেই কালাতিপাত করিবে ? তাহার ন্যায়-সঙ্গত অধিকারে সে কি চিরবঞ্চিত থাকিবে ?"

আমি বলিলাম, "না, কখনই না। আমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া দেখ মনোরমা; তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, লীলার এ অবস্থা আমি কদাপি থাকিতে দিব না। কিন্তু আইনের সাহায্যে কার্য্যোদ্ধার করিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন ও বহুকাল অপেক্ষা করা আবশ্যক। আমরা উভয়েই অশক্ত। আশু উদ্দেশ্য সাধনের আর কোনই উপায় দেখিতেছি না। লীলা পূর্ব্বের ন্যায় লাবণ্যময়ী ও শোভামরী হইয়াছেন। এখন হয়ত প্রজাগণ

ও দাসদাসীগণ তাঁহাকে চিনিতে পারে এবং তাঁহার হস্তাক্ষর মিলাইয়া, হয়ত অপর লোকেও তাঁহার স্বরূপত্ব স্বীকার করিতে পারে। কিন্তু সেই হৃদয়হীন, স্বার্থপর রাধিকা-প্রসাদ রায় এইরূপ প্রমাণ সমূহ চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লইবেন কি? সে সম্বন্ধে আমার কোনই আশা নাই। তিনি যদি গ্রাহ্য না করেন তাহা হইলে সকল উদ্যমই বৃথা। তাঁহার প্রতীতি জন্মাইতে হইলে আরও গুরুতর প্রমাণের প্রয়োজন হইবে। লীলার কৃষ্ণ-সরোবরের প্রাসাদ পরিত্যাগ ও মুক্তকেশীর মৃত্যু এই দুই ঘটনার তারিখের কখনই সমতা নাই। মুক্তকেশীর মৃত্যুর তারিখ আমরা জানি, কিন্তু লীলার কৃষ্ণ-সরোবর ত্যাগের তারিখ আমরা জানি না এবং বহু সন্ধানেও এপর্য্যন্ত তাহা আমরা স্থির করিতে পারি নাই। আর কেহই তাহা মনে করিয়া না রাখিতে পারে; কিন্তু যে ব্যক্তি পাপী, যে ব্যক্তি এই চক্রান্তে লিপ্ত, সে আপনার পাপের পূর্ণ কাহিনী অবশ্যই মনে করিয়া রাখিয়াছে। আর কেহই জানুক আর নাই জানুক, চৌধুরী যে নিশ্চয় সে তারিখ মনে করিয়া রাখিয়াছে তাহার সংশয় নাই। একবার সমুচিত সুযোগ মতে, আমি তাহাকে আয়ত্তগত করিব, তাহার পর অন্য বিচার।"

মনোরমার সহিত তাহার পর বিবাহ-সংক্রান্ত অনেক কথা হইল। বিবাহ কিরূপ প্রাণালীতে হইবে, ঘটা কিছু হইবে কি না, আমোদ আহ্লাদ কিছু হইবে কি না, কি কি লাগিবে ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনা হইল। একেতো আমাদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ, তাহাতে আমাদের অধুনা অজ্ঞাতবাস! এরূপ স্থলে কোন লোক নিমন্ত্রণ করিয়া ঘটা-ঘটি করা সঙ্গত ও সম্ভব নহে। তথাপি কোন অনিষ্ট সম্ভাবনা নাই জানিয়া আমার চিরসুহৃদ্ রমেশ বাবুকে এতদুপলক্ষে নিমন্ত্রণ করা স্থির হইল। তিনিই আমাদের বরযাত্র ও কন্যাযাত্র দুইই। অন্যান্য ব্যবস্থার বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

দশ দিন পরে, বিধাতার অনুগ্রহে, আমরা অপরিসীম সুখের অধিকারী হইলাম—আমাদের বিবাহ হইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—•••—

বিবাহের পর কাল-স্রোত আমাদের পক্ষে যেন অতি দ্রুতবেগে চলিতেছে বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে নববর্ষ সমাগত হইল এবং প্রথম মাসও অতীত হইয়া গেল। জ্যৈষ্ঠ মাস গতপ্রায়। আষাঢ় মাসে চৌধুরীর বাসার মেয়াদ ফুরাইবে, তাহা আমার বেশ মনে আছে। যদি পুনরায় সে মেয়াদ বাড়াইয়া নূতন করিয়া এগ্রিমেণ্ট করে, তাহা হইলে সে আমার হাতে থাকিল এবং তাহাকে যখন খুসি আমি করতলগত করিতে পারিব। কিন্তু সে যদি আর মেয়াদ না বাড়াইয়া এখনই চলিয়া যায়, তাহা হইলে তো সকল আশাই ফুরাইবে, সকল মন্ত্রণাই ব্যর্থ হইবে। যথেষ্ট সময় নষ্ট করা হইয়াছে—আর এক মুহূর্ত্তও এখন নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই।

আমার বিবাহের পর কখন কখন আমার মনে হইয়াছে, যাহা আমার জীবনের সকল সুখের মূল, এবং যে দেবদুর্ল্লভ সম্পত্তি লাভের

নিমিত্ত আমি লালায়িত ছিলাম, যখন তাহা বিধাতার অনুগ্রহে, আমার হইয়াছে; তখন আমার সুখ ও সন্তোষের কিছুই বাকী নাই। তখন কেন আমি সেই দুর্দ্দান্ত ব্যক্তির সহিত বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হই? হয়ত তাহাতে আমাদিগকে নিরতিশয় বিপন্ন হইতে হইবে এবং হয়ত আমাদের এই বহু-যত্নার্জ্জিত স্বর্গীয় সুখ বিধ্বংসিত হইবে। এতদিন পরে, যেন আমার হৃদয় একটু অবসন্ন হইল। মধুময় প্রেমের মধুর স্বর আমাকে যেন কঠোর কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত করিল। অমৃতময়ী লীলার অপার্থিব প্রেমই এইরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ। সেই অমৃতময়ী লীলার অপার্থিব প্রেমই অচিরে আমার মনের অন্যরূপ পরিবর্ত্তন ঘটাইল।

এক রাত্রিতে লীলা শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, আমি পার্শ্বে বসিয়া অতৃপ্ত নয়নে তাঁহার নিদ্রিত লাবণ্যরাশি সন্দর্শন করিতেছি। বুঝিলাম, সুন্দরী স্বপ্ন দেখিতেছেন। দেখিলাম নবীনার নিদ্রিত নয়ন ভেদ করিয়া অশ্রু-বিন্দু ঝরিতে লাগিল। শুনিলাম, তাঁহার বদন হইতে কয়টি অস্ফুট ধ্বনি নির্গত হইল। কি সে শব্দ? 'দিদি কোথায়? না, আমি যাইব না।" আর কি বলিতে হইবে যে লীলা এখন কৃষ্ণসরোবর হইতে যাত্রার পরাগত ঘটনার স্বপ্ন দেখিতেছেন? সেই অশ্রু, সেই যাতনার অব্যক্ত ধ্বনি তখনই আমার শিরায় শিরায় অগ্নি জ্বালিয়া দিল। আমি পরদিন দশগুণ বলে বলীয়ান্ হইয়া, নবোৎসাহে কার্য্য-সাগরে ঝাঁপ দিলাম।

চৌধুরীর বিষয়ে আগে যতদূর সম্ভব জানা চাই। এ পর্য্যন্ত তাহার জীবন আমার পক্ষে দুর্জ্ঞেয় রহস্যের ভাণ্ডার হইয়া রহিয়াছে। মনোরমার উত্তেজনায়, রাধিকা-প্রসাদ রায় মহাশয় যে সকল বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, এবং যাহা এই আখ্যায়িকার যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল কোন কথা নাই। রোহিণী ঠাকুরাণীর সহিত নানা প্রতারণা করিয়া, চৌধুরী মুক্তকেশীকে কলিকাতায় আনিয়াছিল। কিন্তু এখন তাহা ধরিয়া চৌধুরীকে বিপন্ন করিবার কোন উপায় দেখিতেছি না। তবে কি করি? মনোরমার দিনলিপির মধ্যে এক স্থানে চৌধুরীর সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। আকৃতি-প্রকৃতির বর্ণনা করিয়া যে স্থলে তিনি তাহার ইতিহাস জানিতে উৎসুক হইয়াছেন তথায় লিখিয়াছেন,"চৌধুরী মহাশয় স্বীয় নিবাস-ভূমির সীমায় প্রবেশ করিতেও নিতান্ত অনিচ্ছুক, জানি না ইহার কারণ কি। কিন্তু স্বীয় জন্মভূমির লোক কোথায় কে আছে তাহা জানিতে এবং তাহাদের সন্ধান লইতে তিনি সততই ব্যস্ত। তিনি যেদিন প্রথমে আসিয়া পৌঁছিলেন, সে দিন আসিয়াই জিজ্ঞাসিলেন, গ্রামসন্নিধানে পূর্ব্ববঙ্গের কোন লোক বাস করে কি না। সতত নানা দূরদেশ হইতে অনেক মোহরাঙ্কিত পত্র তাঁহার নিকট আসিয়া থাকে,ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাঁহার জীবনে অবশ্যই কোন রহস্য আছে। সে রহস্য কি তাহা আমার সম্পূর্ণ দুর্জ্ঞেয়।"

দেশে যায় না কেন? দেশের লোকে সন্ধান করেই বা কেন? নিশ্চয়ই সে দেশের লোকের ভয় করিয়া চলে। কিন্তু এমন কি ব্যাপার ঘটিতে পারে যাহাতে এহেন দুর্দ্দান্ত লোককেও দেশের ভয়ে সঙ্কুচিত থাকিতে হয়? অবশ্যই কোন গুরুতর কাণ্ড আছে। কিন্তু কি সে কাণ্ড? কাহাকে জিজ্ঞাসা করি? কে সে সন্ধান বলিতে পারে?

চিত্তের এইরূপ অনিশ্চিত ও অস্থির অবস্থায়

মনে করিলাম, প্রিয় বন্ধু রমেশের বাড়ী তো পূর্ব্ব-বঙ্গে। ভাল তাঁহাকেই কেন একবার এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাউক না।

এইরূপ স্থির করিয়া মনে করিলাম, রমেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করার পূর্ব্বে, চৌধুরী লোকটী কেমন ও তাঁহার রীতি প্রকৃতি কিরূপ তাহা একবার স্বচক্ষে দেখিয়া অবধারণ করা আবশ্যক। এই বিবেচনায় আমি সেই দিন বেলা ৩টা কি ৪টার সময় আশুতোষ দের লেনে গমন করিলাম। মনে করিলাম, কিয়ৎকাল সন্নিহিত কোন স্থানে গোপন ভাবে অপেক্ষা করিলে, অবশ্যই চৌধুরীকে দেখিতে পাইব। অবশ্যই কোন না কোন কার্য্যানুরোধে সে একবারও বাটীর বাহির হইবে। আমাকে দেখিতে পাইলেও চৌধুরী যে আমাকে চিনিতে পারিবে, এমন আশঙ্কা আমি করি না; কারণ একদিন রাত্রিকালে, লুক্কায়িত ভাবে আমার অনুসরণ করিবার সময়ে, সে আমাকে দেখিয়াছে। বাটীর পার্শ্ব দিয়া আমি বারংবার যাতায়াত করিলাম। বাহিরে আসা দূরে থাকুক, কেহ একটা জানালাও খুলিল না। অনেকক্ষণ পরে নীচের তলায় একটা জানালা খুলিয়া গেল। কোন লোক-কেই দেখিতে পাওয়া গেল না, কিন্তু লোকের আওয়াজ পাওয়া গেল। সে স্বর মনোরমার দিনলিপি পাঠ করিয়া আমার পরিচিত হইয়া রহিয়াছে। শুনিতে পাইলাম, সেই মৃদুগম্ভীর চাপা আওয়াজে শব্দ হইতেছে, "এস এস, আমার সব সোণার যাদু। এস, আমার আঙ্গু-লের উপর বইস সোণামণি। বাহবা। তুই-বড় দুষ্ট। তুই কথা শুনিস্ না কেন বেটা? যাও সব, এক—দুই—তিন। বাহবা।" বুঝিলাম এই সেই চৌধুরী, ইঁদুর লইয়া খেলা করিতেছে। পূর্ব্বে কৃষ্ণসরোবরে যেমন, এখন এখানেও তেমনই। আবার কিয়ৎকাল সকলই নিস্তব্ধ। বহুক্ষণ পরে বাহিরের দরজা খুলিয়া গেল এবং চৌধুরী বাহিরে আসিল। সে ধীরে ধীরে রাস্তায় পড়িয়া উত্তর মুখে চলিল এবং ক্রমে মাণিকতলা ষ্ট্রীটে পড়িল। আমিও ধীরে ধীরে একটু তফাতে থাকিয়া, তাহার পশ্চাতে চলিতে লাগিলাম।

লোকটার স্থূলতা ও আকৃতি-প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে মনোরমার লিখিত যে বর্ণনা পাঠ করিয়াছি, তাহা ঠিক মিলিল। কিন্তু লোকটার এই ষাটি বৎসর বয়সে এরূপ আশ্চর্য্য সজীবতা প্রফুল্লতা এবং চত্বারিংশ বর্ষাপেক্ষা অল্পবয়স্ক ব্যক্তিগণের ন্যায় ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া আমি অবাক্ হইলাম। অপূর্ব্ব কোমল-তার সহিত, বদনমণ্ডলে অতি মধুর মৃদুহাস্য মাখাইয়া, চতুর্দ্দিকে সস্নেহ ও সানুরাগ দৃষ্টি বিক্ষেপ করিতে করিতে এবং হস্তের প্রকাণ্ড অথচ সুদৃশ্য যষ্টি ঘুরাইতে ঘুরাইতে, সে অতি সহজভাবে চলিতে লাগিল। যদি কোন অপ-রিচিত লোককে কেহ বলিত, এই ব্যক্তি কলিকাতার মালিক, তাহা হইলে সে কথা শুনিয়া সে লোক কদাচ অবিশ্বাস করিতে পারিত না। সে একবারও পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিল না। সম্ভবতঃ সে আমাকে দেখিতে পাইল না। এইরূপে চলিতে চলিতে সে ক্রমে হেদোর ধারে পৌঁছিল। তথা হইতে বিডন ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইয়া পশ্চিম মুখে চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এক দোকান হইতে একখানি পাঁউরুটি ক্রয় করিল। নিকটে আস্তাবলে একটা বানর বাঁধা ছিল, তাহার নিকটস্থ হইয়া সস্নেহে বলিল,—"আহা বেটা! তোমাকে সারাদিন বাঁধিয়া রাখে—কিছু খাইতে দেয় না। তোমার বড় ক্ষুধা লাগি

যাছে ? নেও বেটা, এই রুটিখানি দিতেছি, খাও তুমি।”

সে বানরকে রুটি খাওয়াইয়া আস্তাবলের বাহিরে আসিবামাত্র, একটি ভিক্ষুক, তিনদিন খাওয়া হয় নাই বলিয়া, তাহার সম্মুখে হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। সে, হস্তস্থিত যষ্টি দেখাইয়া তাহার প্রতি আরক্ত নয়নে দৃষ্টিপাত করিল। ভিক্ষুক অগত্যা সরিয়া দাঁড়াইল।

ক্রমে আমরা বেঙ্গল থিয়েটার পর্য্যন্ত পৌছিলাম। রঙ্গভূমির দ্বারদেশে প্রকাণ্ড এক বিজ্ঞাপন ঝুলান রহিয়াছে। চৌধুরী অনেকক্ষণ তাহা দেখিল এবং সহাস্যমুখে টিকিট ঘরের নিকটে আসিয়া একখানি টিকিট ক্রয় করিল। থিয়েটারের অধ্যক্ষের ও অন্যান্য কোন কোন লোকের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। আমি সংবাদপত্র-সংসৃষ্ট লোক বলিয়া তাঁহারা আমাকে জানিতেন। আমি তাঁহাদের নিকট দুইখানি টিকিটের প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ অনুগ্রহ সহকারে আমাকে দুইখানি টিকিট প্রদান করিলেন। আমি স্থির করিলাম, রমেশ বাবু ও আমি আজি রাত্রিরে অভিনয় দেখিতে আসিব। চৌধুরীকে রমেশ চেনেন কি না, তাহা সেই সুযোগে জানিতে পারা যাইবে।

আমি ফিরিবার সময় রমেশের বাসা দিয়া আসিলাম; কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। তাঁহাকে, থিয়েটারে যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে অনুরোধ করিয়া, এক পত্র লিখিয়া আসিলাম। আমি, নিজ আবাস হইতে যথাসময়ে আহারাদি করিয়া, পুনরায় রমেশ বাবুর বাসায় চলিলাম। দেখিলাম, তিনি অগ্রেই প্রস্তুত হইয়া, আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমি বলিলাম,—“চল ভাই।”

তিনি বলিলেন,—“তা আর বলিতে!”

আমরা দুই জনে লোকতঃ অভিনয় দর্শনার্থ, ধর্ম্মতঃ চৌধুরী দর্শনার্থ, যাত্রা করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আমরা যখন থিয়েটারে আসিলাম, তখন কনসার্ট বাজনা প্রায় শেষ হইয়াছে; অভিনয় আরম্ভ হয় হয় হইয়াছে। সকল লোকেই স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আমাদিগকে গিয়া ষ্টলের এক পাশে দাঁড়াইতে হইল। আমরা যে জন্য আসিয়াছি, এরূপ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলে তাহার কোন হানি নাই। চারিদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া চৌধুরীর সন্ধান করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তিনি আপনার বিরাট দেহ ফুলাইয়া ড্রেসসারকেলে বসিয়া আছেন। শ্রোতৃবৃন্দের যে কেহ একবার তাঁহাকে দৈবাৎ দেখিতেছে সেই, মধ্যে মধ্যে নয়ন ফিরাইয়া, সেই সুকান্তি সুগঠিত অবয়ব, সুপরিচ্ছদধারী, স্থূলাঙ্গ, পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। আমি, সরিয়া সরিয়া ক্রমে এমন স্থলে দাঁড়াইলাম যে, তাহাকে দেখিতে রমেশের কোন ব্যাঘাত না ঘটে। কি জন্য আগ্রহ করিয়া রমেশকে থিয়েটারে আনিয়াছি, তাহা কিন্তু তাঁহাকে এখনও বলি নাই।

অভিনয় আরম্ভ হইল। প্রথম দৃশ্য হইয়া গেল। চৌধুরী নিবিষ্ট চিত্তে অভিনয় দেখিতে লাগিল, একবারও কোন দিকে ফিরিয়া চাহিল না। স্বস্থানে বসিয়া, মৃদু মৃদু হাস্য সহকারে, মধ্যে মধ্যে আপনার বিরাট মস্তক নাড়িতে নাড়িতে, চৌধুরী একমনে যেন থিয়েটার

মিলিতে লাগিল। ক্রমশঃ দৃশ্যের পর দৃশ্য অতীত হইয়া, প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত হইল। দর্শকেরা চারিদিকে গোলমাল করিয়া বাহিরে যাইবার জন্য উঠিয়া পড়িল। চৌধুরীকে রমেশ জানেন কি না, তাহা অবধারণ করিবার এই সুযোগ। আমি এতক্ষণ ধরিয়া এইরূপ সুযোগের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমি রমেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"রমেশ! দেখ দেখি, তুমি ঐ লোকটিকে চেন কি?"

আমি চৌধুরীর দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলাম। চৌধুরী তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। থিয়েটারের কনসার্ট বাজিতে আরম্ভ হইয়াছে। বলিলাম—"ঐ যে মোটা লম্বা লোকটা দাঁড়াইয়া আছে। দেখিতে পাইতেছ না?"

রমেশ বলিলেন,—"দেখিতেছি বটে; কিন্তু উহাঁকে আমি কখন দেখি নাই। কেন বল দেখি? লোকটা কি খুব বিখ্যাত বড়লোক? উহাকে কেন দেখাইতেছ?"

আমি বলিলাম,—"উহার বিশেষ বৃত্তান্ত জানা আমার অতিশয় দরকার। তোমাদের দেশেই উহার বাড়ী। উহার নাম জগদীশ-নাথ চৌধুরী। এ নামটা কখন শুন নাই কি?"

"না ভাই, লোকটাকেও কখন দেখি নাই; নামটাও কখন শুনি নাই।"

আমি বলিলাম,—"ভাল করিয়া দেখ ভাই। কেন এজন্য আমি এত ব্যগ্র হইয়াছি, তাহা তোমাকে পরে বলিব। তুমি বুঝি লোকটার সম্মুখ দিক ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছ না। এই দিকে এস। এখান হইতে ভাল করিয়া দেখ দেখি।"

আমি তাঁহাকে সরাইয়া একটু পাশ পানে লইয়া আসিলাম। সেখানে তখন রমেশ ও আমি ছাড়া আর কোন লোক নাই। কেবল আমাদের নিকটেই আর একটী সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক দাঁড়াইয়া আমাদের ব্যবহার দর্শন করিতেছিলেন। তাঁহার আকার বড় কৃশ, খুব গৌরবর্ণ, বাম গালে একটা কাটা দাগ। সম্ভবতঃ আমাদের কথাবার্ত্তা তাঁহার কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে এবং সেইজন্য হয় ত তাঁহারও কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া থাকিবে।

যাহা হউক রমেশ খুব মনোযোগ সহকারে চৌধুরীর সেই হাস্যময় বদন কিয়ৎকাল দর্শন করিয়া বলিলেন,—"না ভাই, আমি ঐ মোটা লোকটাকে কখন কোথাও দেখি নাই।"

এই সময়ে চৌধুরী একবার নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং দৃষ্টিপাত করিবামাত্র রমেশের দৃষ্টির সহিত তাঁহার দৃষ্টি মিলিল। আমি তখন নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিলাম, রমেশ চৌধুরীকে না চিনিলেও, চৌধুরী রমেশকে বিলক্ষণ চিনেন। সুধুই চীনেন না—বিলক্ষণ ভয় করেন! রমেশকে দেখার পর সেই নরাধমের মুখের যেরূপ পরিবর্ত্তন হইল তাহা দেখিয়া কখনই ভুল হইবার সম্ভবনা নাই। রং যেন শাক হইয়া গেল; মুখের সে সহাস্য ভাব যেন কোথায় উড়িয়া গেল; সেই চঞ্চল আমোদময় লোক যেন পাষাণ মূর্ত্তি হইয়া গেল। ফলতঃ রমেশকে দেখিয়া নিরতিশয় ভয়ে, চৌধুরীর অন্তরাত্মা যে অভিভূত হইয়াছে, তাহার কোনই সন্দেহ নাই।

সেই গণ্ডদেশে চিহ্নযুক্ত কৃশকায় ব্যক্তিও আমাদের নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন। রমেশকে দেখিয়া চৌধুরীর পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আমার মনেও যেরূপ ধারণা হইয়াছিল, স্পষ্টই বোধ হইল, তাঁহারও সেইরূপ ধারণা

হইয়াছে। লোকটি কিন্তু বড়ই ভদ্র প্রকৃতি। তিনি আমাদের কাণ্ড সমস্তই দর্শন করিতেছিলেন সত্য; কিন্তু ঐ ব্যাপারে আমাদের সহিত যোগ দিবার জন্য কোন প্রকার ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন না। চৌধুরীর এবংবিধ অবস্থানান্তর এবং ঘটনার এতাদৃশ অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন দর্শনে, আমি এতই বিচলিত হইয়াছিলাম যে, কিয়ৎকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলাম। এমন সময়ে রমেশ বলিলেন,—"ওঃ! ঐ মোটা লোকটা কিরূপ ভাবে দেখিতেছে দেখ! আমাকেই দেখিতেছে কি? আমি কি খুব বড়লোক নাকি? আমি উঁহাকে চিনি না; লোকটা আমাকে চিনিল কিরূপে?"

আমি চৌধুরীর দিকে; নজর রাখিলাম। চৌধুরীও ক্রমাগত রমেশের দিকে চাহিয়া থাকিল। রমেশ অন্য দিকে মনঃসংযোগ করিলেন। যেই দেখিল রমেশ অন্য দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছেন, সেই চৌধুরী সরিতে আরম্ভ করিল এবং অল্পকালের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি রমেশের হাত ধরিয়া, জোর করিয়া দরজার দিকে টানিয়া আনিতে লাগিলাম। রমেশ আমার রকম দেখিয়া অবাক্ হইতে লাগিলেন। বিস্ময়ের বিষয়, সেই কৃশকায় ব্যক্তিও আমাদের আগেই, ভিড় ঠেলিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। বাহির হইতে তখন দলে দলে লোক ভিতরে ফিরিয়া আসিতেছে; তজ্জন্য আমাদের শীঘ্র যাওয়ার ব্যাঘাত ঘটিল। আমরা যখন বাহিরে আসিলাম তখন চৌধুরী বা সেই কৃশকায় লোক, দুজনকেই দেখিতে পাইলাম না। তখন আমি রমেশ বাবুকে বলিলাম,—"চল ভাই বাসায় ফিরিয়া চল। আর থিয়েটার দেখিয়া কাজ নাই। তোমার সঙ্গে আমার ভয়ানক দরকারী কথা আছে?"

রমেশ সবিস্ময়ে বলিলেন,—"ব্যাপার কি?"

আমি কথার দ্বারা কোন উত্তর না দিয়া, তাঁহার হাত ধরিয়া, তাহাকে হড় হড় করিয়া টানিয়া আনিতে লাগিলাম। রমেশকে চৌধুরী চিনিতে পারিয়াছে এবং তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে অন্তরিত হইবার অভিপ্রায়ে, পলাতক হইয়াছে, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। যদি সে এই ভয়ে এখন এককালে কলিকাতা ছাড়িয়া পলায়ন করে তাহা হইলেই তো সর্ব্বনাশ! অতএব আর এক মুহূর্ত্তকালও নষ্ট করা অবিধেয়। আরও আমার মনে হইল, সেই কৃশকায় ব্যক্তিও অবশ্যই কোন অভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া চৌধুরীর পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে। কি জানি সেই বা কি বিঘ্ন ঘটায়। এই দুই প্রকার সন্দেহে আমি নিতান্তই চলচ্চিত্ত হইলাম এবং যেই আমি রমেশের গৃহ মধ্যস্থ হইলাম, সেই তাঁহাকে আমার মনোগত সমস্ত অভিপ্রায় না জানাইয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমার সমস্ত কথা শুনিয়া রমেশ বলিলেন,—"তা ভাই, এ বিষয়ে আমি তোমার কি সাহায্য করিতে পারি? যখন লোকটাকে আমি মোটেই চিনি না, তখন উঁহাকে জব্দ করার আমি কি উপায় করিতে পারি?"

আমি বলিলাম,—"তুমি চেন বা নাই চেন ও ব্যক্তি নিশ্চয়ই তোমাকে চেনে এবং তোমারই ভয়ে সে থিয়েটার হইতে পলাইয়াছে। তবেই দেখ রমেশ, ইহার মধ্যে অবশ্যই কোন নিগূঢ় কারণ আছে। তুমি তোমার অতীত জীবনের বৃত্তান্ত সমস্ত স্মরণ করিয়া দেখ।

তোমার স্বদেশাতিবাহিত জীবনের প্রত্যেক ঘটনা একবার মনে করিয়া দেখ। কোন লোক তোমার ভয়ে চিরদিন ভীত থাকিতে পারে, এমন কোন ঘটনা মনে পড়ে কি না, একবার ভাবিয়া দেখ।”

সবিস্ময়ে দেখিলাম, আমার কথা শুনিয়া রমেশের অতিশয় ভাবান্তর হইল। তাঁহাকে দেখিয়া চৌধুরীর যেরূপ ভাবান্তর হইয়াছিল, আমার কথা শুনিয়া তাঁহারও সেইরূপ ভাবান্তর হইল। তাঁহার মুখ চোখ সাদা হইয়া গেল এবং তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—“অতি ভয়ানক কথা! অতি ভয়ানক! কিন্তু ঐ ব্যক্তিই কি সেই ব্যক্তি? অসম্ভব। তবে কি?”

আমি তাঁহাকে ব্যাকুল চিত্ত দেখিয়া বলিলাম,—“ভাই, আমার কথায় যদি তোমার কোন মনস্তাপের কারণ উদয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়া তোমার নিকট বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু ভাবিয়া দেখ ভাই, ঐ চৌধুরীর দুর্ব্ব্যবহারে আমার স্ত্রীকে কত কষ্টই সহ্য করিতে হইয়াছে। যদি ঐ ব্যক্তিকে কোনরূপে আয়ত্ত করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে আমার স্ত্রীর সেই কষ্ট নিবারিত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। আমি আমার সেই দুঃখিতা পত্নীর জন্য, তোমাকে এরূপ ক্লিষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমি তোমার নিকট আবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

এই কথার পর বিদায়প্রার্থী হইয়া, আমি গাত্রোত্থান করিলাম। রমেশ আমার হাত ধরিয়া আমাকে বসাইয়া বলিলেন,—“তোমার কথায় আমার আপাদমস্তক কম্পিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহাতে তোমার কোনই দোষ নাই। আমার অতীত জীবনে এক ভয়ানক ব্যাপার সংঘটিত হয় এবং সেই জন্য আমি অদ্যাপি স্বদেশে যাই নাই। তোমার কথায় আজি আমার সেই অতীত ঘটনা আমূল স্মৃতিপথারূঢ় হইতেছে। তাহাতেই আমি বিচলিত হইয়াছি। তুমি সে জন্য কিছু মনে করিও না ভাই।”

আমি বলিলাম,—“সেই অতীত ঘটনার সহিত ঐ ব্যক্তির কোন প্রকার সংস্রব ছিল কি? ও কেন তোমাকে দেখিয়া এরূপ ভীত হইল?”

রমেশ বলিলেন,—“সেই অতীত ঘটনার সহিত একাধিক ব্যক্তির সংস্রব ছিল। দুই ব্যক্তির গুরুতর সংস্রব ছিল। আমি সেই দুই ব্যক্তির একজন। অপর ব্যক্তি কোথায় আছে, ইহ সংসারে আছে কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। সে ব্যক্তির আকৃতি আমি ইহজীবনে কদাচ ভুলিব না, মরণান্তেও ভুলিতে পারিব কি না সন্দেহ। আমাকে দেখিলে সে ব্যক্তি যেখানেই কেন থাকুক না, সাক্ষাৎ যমদূত বোধে অতিশয় ভীত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি থিয়েটারে যে ব্যক্তিকে দেখাইলে, তাহার সহিত আমার কথিত ব্যক্তির কোনই সাদৃশ্য নাই। ও ব্যক্তি কখনই সে ব্যক্তি নহে।”

আমি বলিলাম,—“ভাবিয়া দেখ রমেশ” কাল সহকারে মনুষ্যের কতই পরিবর্ত্তন হইতে পারে। যে কৃশ থাকে, সে স্থূল হইতে পারে। যাহার দাড়ি গোঁপ ছিল, সে হয়ত তাহা কামাইতে পারে। কাথায় ছোট ছোট চুলের স্থলে বড় বড় চুল হইতে পারে। এরূপ পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব নহে।”

রমেশ বলিলেন,—“অসম্ভব নহে সত্য! যদিই এস্থলে তাদৃশ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে সে পরিবর্ত্তন বড়ই বিস্ময়াবহ

সন্দেহ নাই। কারণ ও ব্যক্তিকে দেখিয়া আমার পূর্ব্বকথিত ব্যক্তির কথা মনেও পড়িতেছে না।”

আমি বলিলাম,—“ভাই! যদি বিশেষ আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তুমি আমাকে সেই অতীত বৃত্তান্ত জানিতে দিলে, আমি একবার সমস্ত ব্যাপার স্বয়ং বুঝিয়া মীমাংসার চেষ্টা করিতাম।”

রমেশ বলিলেন,—“আপত্তি—তোমার নিকট সে বিষয় বলিবার কোন আপত্তি নাই। তোমাকে সে কথা কখন বলি নাই ইহা আমার বড়ই অন্যায় হইয়াছে। কিন্তু সে কথা বড়ই দুঃখজনক; তাহা আমার হৃদয়কে চির-কালের জন্য ক্ষতবিক্ষত করিয়া রাখিয়াছে। বিহিত যত্নে তাহা ভুলিতে চেষ্টা করাই উচিত। কিন্তু এতকাল নিরন্তর চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, তথাপি তাহার এক বর্ণও ভুলিতে পারি নাই। নিতান্ত কষ্টজনক হইলেও, তোমাকে তাহা আজি বলিব। আমার জীবন কিরূপ কষ্টময়—কিরূপ যন্ত্রণা আমি সতত ভোগ করি, তুমি তাহা আজি বুঝিতে পারিবে। কিন্তু সে কাহিনী শুনিয়া তোমার কোন উপকার হইবে এরূপ আমার মনে হয় না। তথাপি আমি তোমাকে সকল কথাই জানাইব।”

এই বলিয়া রমেশ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রকোষ্ঠমধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সহসা গৃহের দ্বার ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া, আমার নিকটস্থ হইলেন এবং পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“ভাই দেবেন্দ্র, তোমাকে সহোদরাধিক ভাল বাসিয়া থাকি, এ কথা আজি নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। তুমি আমাকে যে ঋণে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, কোনকালে তাহা পরিশোধ করা আমার সাধ্য নহে। তোমার ন্যায় বন্ধুর নিকট আমার এ বিজাতীয় মনস্তাপের বিবরণ এতদিন প্রচ্ছন্ন রাখা আমার পক্ষে বিহিত কার্য্য হয় নাই। এখনই আমি সেই অকৃতজ্ঞ-তার সংশোধন করিতেছি। কিন্তু ভাই, আমার সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, তোমাকেও আমার ন্যায় কাতর হইতে হইবে এবং তোমার প্রেমময় হৃদয় আমার দুঃখে নিতান্ত ব্যথিত হইবে। কিন্তু যাহাই হউক, আমি সমস্ত কথাই তোমাকে বলিতেছি। ভাই, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে, সাক্ষাৎ দেবীর ন্যায় আমার এক রূপগুণবতী কনিষ্ঠা ভগ্নী ছিলেন। অতি বৃদ্ধ পিতা-মাতাও ছিলেন। আমার সেই ভগ্নী এবং আমি ভিন্ন তাঁহাদের আর কোন সন্তান ছিল না। আমাদের সংসার বড় স্বচ্ছল ছিল না—আমরা দরিদ্র ছিলাম। তথাপি বড় সুখী ছিলাম। আমাদের ক্ষুদ্র সংসারের সকলেই কর্ত্তব্যপরায়ণ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। সুতরাং দারুণ দুঃখেও আমরা সুখী ছিলাম।

“যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন আমার ভগ্নীর বয়স প্রায় ২০ বৎসর। একটি অতি সুশীল ও সচ্চরিত্র ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল এবং তাঁহাদের একটি পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল। আমার ভগ্নীর রূপ অতুলনীয় ছিল। লোকে দৈবাৎ তাঁহাকে দেখিতে পাইলে অবাক্ হইয়া যাইত। তাঁহার গুণও অলোকসামান্য ছিল। তাঁহার রূপ ও গুণের বিষয় আমাদের প্রদেশে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়াছিল। আহা! তাঁহার সেই পরম সুন্দর বদনে পরম সুন্দর হাসি, সেই অতি মধুর কথাবার্ত্তা, সেই অতি মনোহর ভাবভঙ্গী মনে হইলে হৃদয় ফাটিয়া যায়। হা বিধাতঃ! তুমি কি করিলে! আমাদের নিকট হইতে তাঁহাকে কোথায় লইয়া গেলে।”

রমেশের চক্ষু জলভারাকুল হইল। তিনি কিয়ৎকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—"সেই সুশীলা, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী আমাদের সকলেরই পরম স্নেহের সামগ্রী ছিলেন। তাঁহার অপার্থিব গুণরাশি ও অতুলনীয় রূপরাশি উভয়ই তাঁহাকে আমাদের সকলের নয়ন-পুত্তলী করিয়া রাখিয়াছিল। সেই সময়ে আমাদের ভবন-সন্নিধানে রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি বাস করিত। সেই রঘুনাথের সহিত আমার অতিশয় ঘনিষ্ঠতা ছিল। রঘুনাথ কলিকাতায় থাকিত; ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, এবং বেশ খোষ পোষাকী বাবু ছিল। সে কখন কখন বাটী আসিত এবং বাটী আসিয়া আমাদের বাটীতে বড় বেশী সময় অতিবাহিত করিত। আমার সহিত অত্যধিক আত্মীয়তা তাহার এরূপ ব্যবহারের কারণ মনে করিয়া, আমরা কোনই সন্দেহ করিতাম না। আমি বাটী না থাকিলেও, রঘুনাথ আমাদের বাটীতে থাকিত। আমার জননীর সহিত সে কখন কলিকাতার কথা কহিত, আমার জনকের সহিত কখন সে ধর্ম্মকথা কহিত, আমার ভগ্নীর সহিত কখন সে নানাদেশের কথা কহিত। কখন কখন সে আমাদের বাটীতে আহারও করিত। আমার ভগ্নীর প্রতি তাহার অতিশয় যত্ন দেখা যাইত। সে প্রতিনিয়ত অতি সুন্দর সুন্দর নানাপ্রকার সামগ্রী আমার ভগ্নীকে প্রদান করিত। সে সকল সামগ্রী আমাদের দেশে সচরাচর পাওয়া যাইত না। কিন্তু এই প্রকার যত্ন ও স্নেহ ভিন্ন অন্য কোন কুলক্ষণের পরিচয় আমরা কদাপি জানিতে পারি নাই। ক্রমে সেই দুরাত্মার স্বভাবের পরিচয় পাওয়া গেল। আমার ভগ্নীপতির মুখে একদিন শুনিলাম যে, দুরাত্মা রঘুনাথ আমার ভগ্নীর নিকট প্রেমের প্রস্তাব করিয়াছে। তাঁহাকে অশেষবিধ প্রলোভন দেখাইয়া, কুলটা হইবার পরামর্শ দিয়াছে এবং তাহার নিকট ধর্ম্ম বিক্রয় করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছে। আমার বন্ধু হইয়া আমার এইরূপ সর্ব্বনাশের চেষ্টা! এই কথা শুনিবামাত্র আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল এবং সে পুনরায় আমাদের গৃহাগত হইলেই, বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিয়া, তাহাকে তাড়াইয়া দিতে আমার বাসনা হইল। কিন্তু আমার ভগ্নীপতির পরামর্শক্রমে ক্রোধ সংবরণ করিয়া, তাহাকে এক পত্র দ্বারা জানাইলাম যে, সে যেন আর কদাপি আমাদের বাটীতে না আইসে। তাহার সহিত সর্ব্বপ্রকার আত্মীয়তা অদ্য হইতে শেষ হইয়া গেল। হতভাগা এ পত্রের কোন উত্তর দিল না। আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। ভাবিলাম, সে হয়ত আপনার কদর্য্য ব্যবহার স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইয়াছে। কিন্তু কোথায় তাহার লজ্জা। কোথায় বা তাহার ঘৃণা। সে যে মনে মনে আমাদের সকলের সর্ব্বনাশ করিবার মন্ত্রণা করিতেছিল, তাহা আমরা কিছুই ভাবি নাই।

একদিন দ্বিপ্রহর কালে, আমার ভগ্নী প্রয়োজনানুরোধে আমাদের গ্রাম্য সরোবরে গমন করিয়াছিলেন। পুষ্করিণী আমাদের বাসবাটী হইতে প্রায় আধ পোয়া পথ দূরে অবস্থিত। আমরা দরিদ্র; বিশেষতঃ পল্লীগ্রামবাসী। পুরস্ত্রীর এরূপ ভাবে যাতায়াত আমাদের দেশের ব্যবস্থা ছিল। আমাদের বাটী হইতে পুষ্করিণী পর্য্যন্ত লোকালয় ছিল না; কেবল মাঝামাঝি এক স্থানে এক শিবের ঘর ছিল। আমার ভগ্নী যখন পুষ্করিণী হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন,তখন এক প্রকাণ্ড ষাঁড় রাগত হইয়া তাঁহাকে তাড়া করে। তিনি

প্রাণের ভয়ে ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি সেই দেবালয়ের মধ্যে প্রবেশ করেন। তিনি দেবালয়ে প্রবেশ করিবামাত্র নরাধম রঘুনাথও তথায় প্রবেশ করে এবং বলপূর্ব্বক আমার নিষ্পাপ-হৃদয়া সহোদরার অনপনেয় সর্ব্বনাশ সাধন করে।

এদিকে আমার ভগ্নীর ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, আমার চিত্ত নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইল এবং আমি তাঁহার সন্ধানে বহির্গত হইলাম। কিয়দ্দূর মাত্র যাইতে না যাইতে, অতি অস্ফুট রোদনধ্বনি আমার কর্ণগোচর হইল এবং আমি সভয়ে দ্রুতবেগে সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলাম। দেবালয়ের নিকটস্থ হইয়াই আমি জানিতে পারিলাম যে, সেই স্থান হইতেই রোদনধ্বনি বিনির্গত হইতেছে এবং সে কণ্ঠস্বর আমার সহোদরা ভগ্নীর ভিন্ন আর কাহারও নহে। আমি মৃতকল্প হইয়া ছুটিতেছি। এমন সময় দেখিলাম, দেবালয়ের দ্বার হইতে এক ব্যক্তি দ্রুতবেগে বাহিরে আসিল। সেই ব্যক্তি রঘুনাথ। সে আমাকে দর্শনমাত্র বিকট হাস্য করিয়া বলিল—"যাও, যাও রমেশ, যাহার মুখ দেখিতে চাহ নাই, সে আজি মনের বাসনা মিটাইয়াছে! দেখ গিয়া, ঐ মন্দির মধ্যে তোমার ধর্ম্ম-ধ্বজা ভগ্নী সতীত্ব-ধন হারাইয়া অধোবদনে পড়িয়া কাঁদিতেছে! আজি আমার মনের কালী দূর হইয়াছে। যাও, তুমি এখন তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া ঘরে লইয়া যাও।"

সে পশু প্রকৃতিক নরাধম যখন এই কথা বলিল, তখন আমার চৈতন্য তিরোহিত হইয়া গেল এবং আমি যেন বিশ্বসংসার শূন্যময় দেখিতে লাগিলাম। অচিরে বিজাতীয় ক্রোধ আমার হৃদয় আচ্ছন্ন করিল এবং আমি ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় অস্থিরভাবে তাহার উপর লাফাইয়া পড়িলাম। আমার হস্তে কোন অস্ত্র নাই। সে আত্মরক্ষার নিমিত্ত, উভয় হস্তে আমাকে প্রহার করিতে লাগিল। আমি তখন নিরুপায় হইয়া, তাহার দক্ষিণ হস্তের এক স্থানে বিষম দংশন করিয়া ধরিলাম। তাহার রুধিরে আমার বক্ষঃস্থল ও বস্ত্র ভাসিয়া গেল, তাহা আমার বেশ মনে আছে। সেও আমার পৃষ্ঠদেশ কামড়াইয়া ধরিল। কিন্তু আমার দংশনে তাহার যেরূপ প্রকাণ্ড এক খণ্ড মাংস উঠিয়া গিয়াছিল, তাহার দংশনে আমার সেরূপ কিছুই হয় নাই। তথাপি দেবেন্দ্র, আমার দেহে অদ্যাপি সেই ক্ষত চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।"

এই বলিয়া রমেশ গায়ের জামা খুলিয়া ফেলিলেন এবং আমাকে পৃষ্ঠদেশের সেই চিহ্ন দেখাইলেন।

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"তোমার আঘাত গুরুতর না হইলেও, যদি এখনও তাহার চিহ্ন বিদ্যমান আছে, তখন নিশ্চয়ই তাহার বাহুতে বিশেষ চিহ্ন আছে।"

তিনি বলিলেন,—"তাহার কোনই ভুল নাই।"

আমি আবার জিজ্ঞাসিলাম,—"তাহার পর কি হইল?"

"তাহার পর সে আমাকে ছাড়াইয়া পলাইয়া গেল। তখন আরও ২।১ জন লোক সেই স্থানে জমিয়া গেল। তখন আমি অজ্ঞান। ক্রমে খুব গোল হইল। আমার বৃদ্ধ জনক-জননী, আমার ভগ্নীপতি এবং গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকল লোক ও থানার পুলিশ সকলেই সেই স্থানে উপস্থিত হইল। আমার ভগ্নী সকলের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিলেন। তাহার পর, কেহ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিবার পূর্ব্বে, কেহ সাবধান হইবার পূর্ব্বে, তত্রত্য এক খণ্ড ইষ্টক লইয়া

তিনি অতিশয় শক্তি সহকারে আপনার মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। তখনই রুধিরস্রোতে তাঁহার দেহ ভাসিয়া গেল এবং অতি অল্প কাল মধ্যে ধীরে ধীরে সেই অপাপবিদ্ধা,সুরসুন্দরীর পবিত্র কলেবর হইতে প্রাণবায়ু প্রস্থান করিল।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া রমেশ পুনরায় কিয়ৎকাল উভয় হস্তে স্বীয় বদনাবৃত করিয়া থাকিলেন। তদনন্তর আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"অচিরে আমার জনকজননী দারুণ লজ্জা ও অত্যন্ত মনস্তাপ জনিত স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু, স্বর্গধামে গমন করিলেন। আমার ভগ্নীপতি মহাশয় আমার সেই শিশু ভাগিনেয়টিকে লইয়া কোথায় গেলেন, তাহা আমি জানি না। তাঁহারা এখন আছেন কি না বলিতে পারি না। নরাধম রঘুনাথের দুর্ব্বৃত্ততায় আমাদের সোণার সংসার ছাই হইয়া গেল। সেই অবধি আমি দেশত্যাগী। লজ্জায় ক্ষোভে, ঘৃণায় আমি আর তাহার পর পূর্ব্ব-পরিচিত লোকের সমক্ষে মুখ দেখাই না। আমার সে বাসভবনও বোধ করি এতদিনে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"তাহার পর সে নরাধম রঘুনাথের কি হইল।

"রঘুনাথের যে কি হইল তাহা আর কেহই বলিতে পারে না। তাহার সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য, আমি যে তাহার কতই সন্ধান করিয়াছি তাহা আর কি বলিব। অনাহারে অনিদ্রায় আমি নিরন্তর তাহার সন্ধানে ফিরিয়াছি, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই। আমি কখন শুনিয়াছি সে লাহোরে, কখন শুনিয়াছি সে কাশ্মীরে, কখন শুনিয়াছি সে মান্দ্রাজে আছে। আমি সকল স্থানেই গিয়াছি। কিন্তু কোথায়ও তাহাকে ধরিতে পারি নাই। তাহার নামে গবর্ণমেণ্ট হুলিয়া বাহির করিয়াছেন। সেই হুলিয়া বহু ভাষায় অনুবাদিত হইয়া ভারতবর্ষের সকল থানায় প্রেরিত হইয়াছে। তাহাতে তাহার আকৃতির বিশেষ বর্ণনা আছে। অধিকন্তু তাহার দক্ষিণ হস্তে আমার দংশন জনিত ক্ষত চিহ্নেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু সকল আশাই বৃথা হইল। ইহ জীবনে তাহাকে ধরিবার ও তাহাকে দণ্ডিত করিবার সম্ভাবনা আর নাই।"

এই বলিয়া রমেশ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নিরস্ত হইলেন। আমি বলিলাম,—"বস্তুতই রমেশ তোমার কথা শুনিয়া আজি আমি যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইলাম। তোমার জীবনের উপর দিয়া এরূপ অতি ভয়ানক ঝড় প্রবাহিত হইয়াছে এবং তাহা তোমাকে মথিত ও অবসন্ন করিয়া দিয়াছে ইহা আমি পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। যাহা হউক, এক্ষণে যখন এই লোমহর্ষণ শোকজনক বৃত্তান্ত আমি জানিতে পারিলাম, তখন তোমার সহিত সৌহৃদ্যের অনুরোধে, সেই দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তির অন্বেষণ করিতে আমিও বাধ্য। কিন্তু সকল কথা স্মরণ ও আলোচনা করিয়া দেখ। আমি যে, চৌধুরীকে নাট্যালয়ে তোমাকে দেখাইলাম, সে ব্যক্তি পূর্ব্বের রঘুনাথ নহে কি?"

রমেশ বলিলেন,—"না না, সে কখনই নহে। রঘুনাথ কৃশকায়, রঘুনাথ শ্যামবর্ণ, রঘুনাথের দাড়ি গোঁপ ছিল। ও ব্যক্তি ভয়ানক স্থূলকায়, গৌরবর্ণ, দাড়ি গোঁপ বিহীন। এতদিনে রঘুনাথের মাথায় অবশ্যই পাকা চুল দেখা দিত, কিন্তু এ ব্যক্তির সকল চুল কাঁচা।"

আমি বলিলাম,—"কিন্তু ভাই, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সকল বিষয়ে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নহে। তৎকালে রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীর বয়স ছিল কত তাহা তুমি জান কি?"

"অনুমান ৩০ বা ৩৫ হইবে।"

"বর্ত্তমান জগদীশনাথ চৌধুরীর বয়স প্রায় ৬০। এ বিষয়ে কোন অনৈক্য দেখা যাইতেছে না। আর মনে করিয়া দেখ, ইহ সংসারে তোমাকে দেখিয়া ভীত হইতে পারে এমন লোক কেহ আছে কি?"

রমেশ বলিলেন,—"না ভাই, রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী ছাড়া আমার ভয়ে ভীত হইতে পারে, এমন লোক সংসারে থাকা অসম্ভব। আমি কখন কাহারও অনিষ্ট করি নাই; অপর কেহও আমার কোন অনিষ্ট করে নাই। সংসারে আমার মিত্র অনেক আছে, কিন্তু শত্রু কেহই নাই।"

আমি বলিলাম,—একবার সব বিষয়টা বেশ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ। তোমাকে দেখিয়া ভয় পায় বা তোমার নিকট হইতে পলায়ন করে, এমন ব্যক্তি ইহ সংসারে রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী ব্যতীত আর কেহই নাই। যে ব্যক্তিকে থিয়েটারে দেখাইয়াছি সে যে তোমাকে দেখিয়া অতিশয় ভীত হইয়াছিল এবং তোমার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে পলায়ন করিবার অভিপ্রায়ে, অসময়ে থিয়েটার ছাড়িয়া গিয়াছিল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তুমি তাহাকে চিনিতে পার নাই; কিন্তু সে যে তোমাকে চিনিয়াছে তাহারও কোন ভুল নাই। আর আমি ইহা উত্তমরূপ জ্ঞাত আছি যে ঐ ব্যক্তি পূর্ব্ববঙ্গের লোকের সম্মুখীন হইতে অনিচ্ছুক এবং যেখানে যখন থাকে, সেখানে পূর্ব্ববঙ্গের কোন লোক থাকে কি না, অগ্রে তাহার সন্ধান করে। ফলতঃ ভাই, আমি যেন দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, সেই পাপী রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী এখন দুর্বৃত্ত জগদীশনাথ চৌধুরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উহার বর্ত্তমান কার্য্য সমস্ত প্রণিধান করিলেও, উহাকে দুষ্কর্ম্মে চিরাভ্যস্ত বদ্ধ পাপী বলিয়াই বোধ হয়। এই সকল কারণে ঐ ব্যক্তিই যে সেই রঘুনাথ তৎপক্ষে আমার আর কোনই সন্দেহ নাই। তাহার পূর্ব্ব চিহ্ন সমস্তই কালসহকারে এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। কৃশতার পরিবর্ত্তে তাহার এখন স্থূলতা হইয়াছে; শ্যামবর্ণের পরিবর্ত্তে গৌরবর্ণ হইয়াছে; শ্মশ্রু ও গুম্ফ তিরোহিত হইয়াছে এবং নামও বিভিন্ন হইয়াছে। তথাপি যে এই ব্যক্তিই সেই দুরাত্মা তাহার কোনই ভুল নাই। এখনই কোন উপায়ে তাহার হাতের জামা তুলিয়া দেখিলে, নিশ্চয়ই তাহার বাহুতে তোমায় দংশন চিহ্ন বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যাইবে। তুমি যাহাই বল, ও যে সেই ব্যক্তি তাহাতে অণুমাত্র সংশয়ের কারণ দেখিতেছি না। তুমি উহাকে চিনিতে পার নাই, আর ও তোমাকে চিনিতে পারিয়াছে, ইহাও কিছু অসম্ভব কাণ্ড নহে। ও ব্যক্তির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; কিন্তু তোমার বিশেষ কোন দৈহিক পরিবর্ত্তন হয় নাই। সুতরাং তোমাকে ও সহজেই চিনিয়াছে, অথচ তুমি উহাকে চিনিতে পার নাই। বিশেষতঃ পাপী ব্যক্তি নিয়তই সশঙ্ক থাকে এবং স্বকীয় দুষ্কর্ম্ম ব্যক্ত হইল ভাবিয়া সততই কাতর হয়। সেরূপ ব্যক্তি যাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে এবং যাহাদের দ্বারা প্রতিমুহূর্ত্তেই তাহার বিপন্ন হওয়া সম্ভাবিত, তাহাদিগকে যেরূপে মনে করিয়া রাখে, তাহাদের চিত্র হৃদয়পটে যেরূপে অঙ্কিত করিয়া রাখে, অপরে কখনই সেরূপ পারে না। আমার মনে আর কোনই সন্দেহ নাই ভাই। পঁচিশ বৎসরের পর দুরাত্মা রঘুনাথের আজি সন্ধান হইয়াছে। আজি একসঙ্গে তোমার মর্ম্মজ্বালা ও আমার মর্ম্মজ্বালা নিবারণের সুযোগ হইয়াছে। আর কালবিলম্বে প্রয়োজন নহে

আমি সেই নরাধমের সর্ব্বনাশের পথ আজি রাত্রিতেই উন্মুক্ত করিয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া আমি গাত্রোত্থান করিলাম। রমেশ বলিলেন,—"তোমার সমস্ত যুক্তি শুনিয়া আমার মনেও ধারণা হইতেছে, ঐ জগদীশ চৌধুরীই সেই রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী হওয়া সম্ভব। কিন্তু আকৃতির বড়ই পরিবর্ত্তন। যাহাই হউক তুমি কি প্রণালীতে আপাততঃ কার্য্য করিবে স্থির করিতেছ?"

আমি বলিলাম,—"তাহা এখনও আমি স্থির করিতে পারি নাই। সময় এক তিলও নষ্ট করা হইবে না। অবিলম্বে ও এদেশ ছাড়িয়া নিশ্চয়ই পলাতক হইবে। যাহা করিতে হয় আজি রাত্রিতেই করিব। তোমাকে পরে সকল সংবাদ দিব। এখন আমি আসি।"

এই বলিয়া অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে আমি রমেশের বাসা হইতে প্রস্থান করিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বাসায় আসিতে আসিতে আমার মনে আরও স্থির বিশ্বাস, জন্মিল যে, জগদীশ চৌধুরী নিশ্চয়ই রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীর নামান্তর। সেই রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী এতকাল পরে রমেশ চন্দ্র রায়কে দেখিতে পাইয়াছে এবং নিশ্চয়ই নিদারুণ ভয়ে সে অবসন্ন হইয়াছে। সে বুঝিয়াছে, তাহার যমদূত এতকাল পরে দেখা দিয়াছে এবং অচিরে পলায়ন করিতে না পারিলে তাহার আর স্বচ্ছন্দতা নাই। সুতরাং যদি নিতান্তই আজি রাত্রিতে পারিয়া না উঠে, তাহা হইলে কল্য প্রত্যূষে সে পলায়ন করিবে। তাহার বাটীর মেওয়াদও ফুরাইয়া আসিয়াছে।

তখন আমার মনে হইল কালি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে হয়ত সকলই হাত ছাড়া হইয়া যাইবে—হয়ত সে কোথায় পলাইয়া যাইবে তাহার আর সন্ধান করিয়াও উঠিতে পারিব না। অতএব মরি বা বাঁচি আজি রাত্রিতেই তাহাকে ধরিতে হইবে।

আমার সেই দুঃখিনী লীলা ঐ নরাধমের চক্রান্তে আজি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন! আজি সমাজে তিনি অপরিচিতা, মানব রাজ্যে তিনি লুক্কায়িতা, অতুল সম্পত্তি থাকিতেও তিনি আজি দীনহীনা। তাঁহার সর্ব্বস্ব দুই পাপিষ্ঠে লুণ্ঠন করিয়াছে। তাহার একজন নরকে গমন করিয়া আপনার কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করিতেছে; অপর ব্যক্তি আমার সম্মুখে উপস্থিত। তাহাকে পদাবনত করিবার উপায় আজি আমার হস্তগত হইয়াছে। এ লোভ কখনও কি সংবরণ করা যায়?

আমার পরম বন্ধু রমেশ ঐ দুরাত্মার দ্বারা অচিন্তনীয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, অপরিসীম অপমানিত হইয়াছেন, এবং অবক্তব্য হৃদয়-জ্বালা ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত যেরূপ দুশ্ছেদ্য আত্মীয়তা শৃঙ্খলে আমি বদ্ধ, তাহাতে তাঁহার যত মনস্তাপ তৎসমস্তই আমার নিজ মনস্তাপের সমতুল্য বলিয়া মনে হইতেছে। ঐ পিশাচকে একবার ধরিতে পারিলেই তাহারও প্রতিফল দিতে পারিব। কপালে যাহা থাকে হইবে, আজি রাত্রিতেই আমি ঐ নরাধমের সম্মুখীন হইব।

বিপদের সম্ভাবনা অনেক। কিন্তু তাহা ভাবিয়া কি ফল? যত বিপদই কেন হউক না, যখন তাহার সম্মুখীন হইবই সঙ্কল্প করিয়াছি, তখন ভাবিয়া আর কি লাভ? তথাপি একবার ভাবিয়া দেখা ভাল এবং যদি কোন

প্রতিকারের সম্ভাবনা থাকে, তাহাও বিবেচনা করা উচিত। সে পিশাচ যখন বুঝিবে যে, আমাকে নিপাত করিলে আপাততঃ তাহার সকল বিপদের শান্তি হইবে, তখন সে কখনই তাহাতে পশ্চাদ্‌পদ হইবে না। সে তখনই আমাকে ধ্বংস করিয়া ক্ষান্ত হইবে। কিয়ৎ পরিমাণে এই বিপদ লাঘব করিবার নিমিত্ত, আমার মনে এক অভিসন্ধি উদিত হইল। যদি আমি রমেশকে এক পত্র লিখিয়া রাখি এবং একটা নিয়মিত সময়ের পরে, আমার নিকট হইতে আর কোন সংবাদ না পাইলে, তাঁহাকে সেই পত্র খুলিতে অনুরোধ করি; যদি তাহার পর রমেশের পূর্ণ নাম স্বাক্ষরযুক্ত, ঐ পত্রের প্রাপ্তিস্বীকারসূচক এক রসিদ গ্রহণ করি এবং সেই রসিদ সঙ্গে রাখিয়া যদি চৌধুরীকে তাহা দেখাই, তাহা হইলে তাহার মনে হইতে পারে যে, কেবল আমাকে নিপাত করিলেই তাহার নিস্তার নাই। তাহার অন্য প্রবল শত্রুও তাহার সর্ব্বনাশ সাধনার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। এ অভিসন্ধি আমার মনে বড়ই ভাল বলিয়া বোধ হইল। আমি ব্যস্ততাসহ বাসায় আসিলাম এবং নিঃশব্দে আমার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া এই পত্র লিখিলাম :—

"ভাই রমেশ! তোমাকে থিয়েটারে যে লোকটীকে দেখাইয়াছিলাম সেই ব্যক্তিই রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী। এখন তাহার নাম জগদীশনাথ চৌধুরী হইয়াছে, তাহা তোমার অবিদিত নাই। সে ৫ নং আশুতোষ দের গলিতে অবস্থিতি করে। অবিলম্বে তাহাকে পুলিশে ধরাইয়া দিবে। আমি তাহাকে ধরিতে আসিয়া প্রাণ হারাইয়াছি। আর কি লিখিব?—অভিন্ন দেবেন্দ্র।"

এই পত্র এক খামের মধ্যে পুরিয়া, বেশ করিয়া গালার মোহর দিয়া আটিলাম, এবং খামের উপর লিখিলাম, "কল্য প্রাতে বেলা নয়টা পর্য্যন্ত এই পত্র খুলিও না। নয়টার পর ইহা খুলিয়া বিহিত ব্যবস্থা করিও। আপাততঃ এতৎসহ যে রসিদ পাঠাইলাম তাহাতে সম্পূর্ণ নাম স্বাক্ষর করিয়া পাঠাইবে। তাহার পর সেই খামসমেত পত্র আর এক খানি বৃহত্তর খামের মধ্যে পুরিয়া, তাহাতেও মোহর লাগাইলাম। আমার মনে স্থির প্রতীতি হইল যে, যদিই আমি আজি চৌধুরীর হাতে মরি, তাহা হইলে তাহারও আর নিস্তার নাই। রমেশ যদি সন্ধান পান যে ঐ ব্যক্তিই সেই রঘুনাথ, তাহা হইলে সে রমেশের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারিলেও, পুলিশের হাতে কদাপি নিস্তার পাইবে না। তাহা হইলে কল্য তাহার সকল বিদ্যাই বাহির হইয়া পড়িবে এবং তাহাকে যৎপরোনাস্তি দণ্ডিত হইতে হইবে। সে যেরূপ বুদ্ধিমান লোক তাহাতে আমার এরূপ সাবধানতা দেখিয়া,সে সকলই বুঝিতে পারিবে সুতরাং নিশ্চয়ই তাহাকে অনেক ভাবিয়া কাজ করিতে হইবে।

তখন মনে হইল, এ পত্র রমেশের কাছে পাঠাই কিরূপে? নীচে নামিলাম। সেখানকার দোকান ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছিল। আমি দোকানদারকে সমস্ত কথা বলিলে, সে বলিল যে, তাহার ছেলে খুব হুঁসিয়ার। তাহাকে জল খাইবার জন্য চারিটা পয়সা দিলে, সে এখনিই চিঠি দিয়া আসিতে পারিবে। তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া তাহাকে ঠিকানা বুঝাইয়া দিলে, সে পত্র লইয়া গেল। শীঘ্র কার্য্য সমাপ্তির অনুরোধে,তাহাকে যাতায়াতের গাড়িভাড়া করিয়া দিলাম এবং ফিরিয়া

আসার পর, আমার অন্য দরকার আছে বলিয় সেই গাড়ী রাখিয়া দিতে বলিলাম। এখন রমেশের স্বাক্ষর যুক্ত রসিদ খানি পাইলেই

যদিই আজি আমার জীবন যায়, তাহা হইলে আমার কাগজপত্রের জন্য কোন গোল উপস্থিত না হয়, এই বিবেচনায়, আমি পুনরায় নিজ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া, সমস্ত কাগজ ও চিঠি প্রভৃতি গুছাইয়া রাখিলাম। সমস্ত বিষয় ঠিক করিয়া, মনোরমাকে এক খানি পত্র লিখিলাম এবং সেই পত্রসহ বাক্স দেরাজ প্রভৃতির চাবিগুলি রাখিয়া একটী গালা মোহরাঙ্কিত প্যাকেটের মধ্যে স্থাপিত করিলাম এবং সেই পুলিন্দাটী আমার দেরাজের উপরেই রাখিয়া দিলাম। তদনন্তর লীলা ও মনোরমা, আমার অপেক্ষায় এত রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া আছেন মনে করিয়া; প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করিলাম। এতক্ষণ পরে, সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ কালে, আমার হাত পা কাঁপিতে লাগিল। যদিই আজি চৌধুরীর হস্তে আমার জীবলীলার অবসান হয়, তাহা হইলে এই সাক্ষাৎই তাঁহাদের সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ। এইরূপ মনে হওয়ায়, আমি বিচলিত হইলাম। কিন্তু দৃঢ় সঙ্কল্পের বলে তখনই সে ভাব আমি দমন করিয়া ফেলিলাম।

আমি ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সেখানে লীলা নাই; কেবল মনোরমা একাকিনী বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছেন। তিনি আমাকে দর্শন মাত্র বলিলেন,—এত সকালে ফিরিলে যে? শেষ পর্য্যন্ত ছিলে না বুঝি?'

আমি বলিলাম,—রমেশ ও আমি কেহই শেষ পর্য্যন্ত থাকিলাম না। লীলা কোথায়?"

"তাহার মাথা ধরিয়াছে; এজন্য আমি জেদ করিয়া তাহাকে সকালে ঘুম পাড়াইয়াছি।"

লীলা নিদ্রিত হইয়াছেন কি না দেখিবার নিমিত্ত, আমি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। বুদ্ধিমতী মনোরমা আমার মুখের ভাব, কথাবার্ত্তা এবং ব্যবহারাদি লক্ষ্য করিয়া অনুমান করিলেন যে, আমি অদ্য নিশ্চয়ই একটা কোন কঠোর ব্যাপারে হস্তার্পণ করিয়াছি। সেই জন্য তিনি অতিশয় কৌতূহলপূর্ণ নয়নে আমার প্রতি চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

আমি আমাদের শয়ন-প্রকোষ্ঠে আসিয়া ধীরে ধীরে শয্যার নিকটস্থ হইলাম এবং মশারি সরাইয়া দেখিলাম, আমার পত্নী নিদ্রার সুকোমল আশ্রয়ে শান্তিলাভ করিতেছেন। সেই সুকুমারকায়া নবীনার সহিত আমার এখনও একমাস বিবাহ হয় নাই। এই অল্প সময়ের মধ্যেই এইরূপ জীবন মরণ-বিধায়ক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইতেছে মনে করিয়া, এতক্ষণে আমার প্রাণ ব্যাকুল হইল। যদি এই উদ্যমে আমার প্রাণান্ত ঘটে, তাহা হইলে লীলাকে এই দেখাই আমার শেষ দেখা। আমার বিকল হৃদয়কে বলীয়ান্ করিবার নিমিত্ত, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলাম এবং মঙ্গলময়ের কৃপায় সকলই মঙ্গলময় হইবে ভাবিয়া আশ্বস্ত হইলাম। আমি ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া লীলার নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম। দ্বার-সন্নিহিত হওয়ার পর পুনরায় সেই নিদ্রিতা সুন্দরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সজল নয়নে ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম,—"দয়াময়! আমার প্রাণের প্রাণ, অভাগার সর্ব্বস্ব ঐ পাপসংস্পর্শবিহীনা

নবীনাকে তোমারই চিরকল্যাণময়, চরণাশ্রয়ে রাখিয়া যাইতেছি। অনাথনাথ! সকল যাতনাই সহজ ও সহনীয়। কিন্তু ঐ প্রেম-পুত্তলীর কষ্টের কল্পনাও অসহনীয়। অতএব দীনবন্ধো! ঐ সরলা যেন কোনপ্রকার কষ্ট না পায় ইহাই এ দীনহীনের একমাত্র প্রার্থনা।" আমি আর অপেক্ষা না করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

লীলা নিদ্রিত না থাকিলে, হয়ত আমি এরূপ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবার জন্য কখনই আসিতে পারিতাম না। ধন্য জগদীশ্বর! দেখিলাম বাহিরে মনোরমা একখণ্ড কাগজ হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমাকে দর্শনমাত্র তিনি বলিলেন,—"দোকানদারের ছেলে এই কাগজটুকু আমাকে দিয়া গিয়াছে। আর বলিতে বলিয়াছে যে, তোমার জন্য গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে।"

আমি বলিলাম,—"হাঁ ঠিক কথা; আমি এখনই আবার বাহিরে যাইব। "এই বলিয়া আমি সেই কাগজখণ্ডে যাহা লিখিত ছিল তাহা পাঠ করিলাম। তাহাতে লিখিত ছিল;—"তোমার পত্র পাইলাম। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি তোমাকে আমি দেখিতে না পাই, তাহা হইলে পত্র খুলিয়া পাঠ করিব ও তদনুযায়ী কার্য্য করিব। অভিন্ন শ্রীরমেশচন্দ্র রায়।"

আমি সেই কাগজখণ্ড আমার পকেট বহির মধ্যে স্থাপিত করিলাম এবং অগ্রসর হইবার নিমিত্ত পা বাড়াইলাম। তখন মনোরমা দ্রুত আসিয়া উভয় হস্তে আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন। এবং বলিলেন,—"আমি বুঝিতে পারিতেছি, আজি রাত্রিতেই তুমি শেষ চেষ্টা করিবে।"

আমি বলিলাম,—"হাঁ, শেষ এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চেষ্টা আজিই করিব।"

"কিন্তু দেবেন্দ্র, একাকী যাইও না, আমি মিনতি করিতেছি, একাকী যাইও না! আমি তোমার সঙ্গে যাইব। আমি স্ত্রীলোক বলিয়া আমাকে সঙ্গে লইতে অমত করিও না। আমি তোমার সঙ্গে যাইবই যাইব। আমি বাহিরে গাড়ির মধ্যে বসিয়া থাকিব।"

এই বলিয়া সেই স্নেহশীলা কামিনী আমার হস্ত ত্যাগ করিয়া দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আমি উভয় হস্তে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলাম,—"না দেবি, এবিষয়ে তোমার সাহায্য করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। এরূপ কার্য্যে স্ত্রীলোকের দ্বারা কোন প্রকার সাহায্য হওয়া সম্ভব নহে। আমার সঙ্গে না যাইয়া বাড়ীতে আমার প্রত্যাগমন-কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকা তোমার পক্ষে কত আবশ্যক তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? তুমি লীলাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিলে আমার অনেক সাহায্য হইবে এবং আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিব।"

তিনি কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বে এবং পুনরায় আমার গতি রোধ করিবার পূর্ব্বে, আমি বেগে বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। তৎক্ষণাৎ গাড়িতে উঠিয়া কোচম্যানকে ঠিকানা বলিয়া দিলাম। আর বলিয়া দিলাম,—"যদি দশ মিনিটের মধ্যে যাইতে পার, তাহা হইলে দুনা ভাড়া।"

তখন রাত্রি ১১টা। এত গভীর রাত্রে মানুষ কখনই মানুষের সহিত দেখা করে না। যদি সে দেখা না করে? জোর করিয়া দেখা করিব। যদি তাহাতেও কৃতকার্য না হই, তাহার দ্বারে সমস্ত রাত্রি অপেক্ষা করিব। সে যে ত্বরায় পলায়ন করিবে, তাহাতে কোন ভুল নাই। সে যখন বাটীর বাহির হইবে, আমি তখনই তাহাকে ধরিব।

মোড়ে গাড়ি থামাইয়া তাহার ভাড়া চুকাইয়া দিলাম। তাহার পর চৌধুরীর বাসার দিকে চলিতে লাগিলাম। যখন আমি বাটীর নিকটস্থ হইলাম, তখন সেই পথে, বিপরীত দিক হইতে আর একটি লোক আসিতেছে দেখিতে পাইলাম। লোকটি নিকটস্থ হইলে চিনিতে পারিলাম, তিনি সেই গণ্ডদেশে চিহ্নযুক্তযুবক। আমার বোধ হইল তিনিও আমাকে চিনিতে পারিলেন। কিন্তু তিনি আমাকে কোন কথাই বলিলেন না। আমি ৫নং বাটীর দরজায় থামিলাম। তিনি কিন্তু সোজা চলিয়া গেলেন। ইনি কি দৈবাৎ এ পথে আসিয়া পড়িয়াছেন, না থিয়েটার হইতে চৌধুরীর অনুসরণ করিয়া এখানে আসিয়াছেন? যাহা হউক, তাহা আর এখন ভাবিবার দরকার নাই। সেই কৃশকায় যুবা দৃষ্টিপথের অতীত হইলে, আমি দরজার কড়া নাড়িতে লাগিলাম। চৌধুরীর লোক ইচ্ছা করিলে, কর্ত্তা নিদ্রিত হইয়াছেন বলিয়া, আমাকে তাড়াইতে পারে। দেখি কি হয়।

একটা দাসী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল এবং জিজ্ঞাসিল, আমার কি দরকার। আমি তাহাকে আমার কার্ড দিয়া বলিয়া দিলাম যে, —"বড় গুরুতর দরকার বলিয়াই এত রাত্রিতে এবং এরূপ অসময়ে তোমার বাবুকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি। তুমি এই কথা বলিয়া তাঁহাকে এই কাগজ খানি দিলে আমার বড় উপকার হইবে। এই কাগজে আমার নাম লেখা আছে।"

সে কিছু ইতস্ততঃ করিয়া, মুনিবের নিকট আমার সংবাদ লইয়া যাইতে রাজি হইল। কিন্তু যাইবার সময় বেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া গেল। সুতরাং আমি পথেই দাঁড়াইয়া থাকিলাম অতি অল্পকাল মধ্যেই সে ফিরিয়া আসিয়া দরজা খুলিল, এবং বলিল যে, তাহার মুনিব আমাকে নমস্কার জানাইয়া, আমার কি দরকার জানিতে চাহিতেছেন। আমি বলিলাম -"তাঁহাকে আমার নমস্কার জানাইয়া বল গিয়া যে, আমার দরকার অন্য কাহারও নিকট বলিবার নহে।"

সে আবার দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল —আবার ফিরিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল এবং আমাকে ভিতরে আসিতে বলিল। তখনই আমি চৌধুরীর ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নীচে আলো ছিল না। মাগীটা একটা কেরোসীনের ঠোঙ্গা আনিল; তাহারই ক্ষীণ আলোকে আমি সিঁড়ি দেখিয়া চলিতে লাগিলাম। যখন সিঁড়িতে উঠি তখন দেখিতে পাইলাম, বারান্দা হইতে একটি স্ত্রীলোক একটা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তিনি আমার প্রতি অত্যুগ্র দৃষ্টিপাত করিলেন। মনোরমার দিনলিপিতে আমি যে বর্ণনা পাঠ করিয়াছি, তাহার সহিত ঐক্য করিয়া আমার বিলক্ষণ বোধ হইল, ইনিই সেই রঙ্গমতী ঠাকুরাণী-আমি উপরে উঠিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম এবং তৎক্ষণাৎ জগদীশনাথ চৌধুরীর সম্মুখীন হইলাম।

দেখিলাম ঘরের চারি দিকে বাক্স, ব্যাগ কাপড় চোপড় ছড়ান রহিয়াছে। চৌধুরী একটা ব্যাগের মধ্যে জিনিষ পত্র গুছাই-

তেছে। আর দেখিলাম, তাহার সেই ইঁদুরের খাঁচা সম্মুখস্থ টেবিলের এক পার্শ্বে স্থাপিত আছে। কাকাতুয়া ও ময়ুয়া কোথায় আছে, দেখিতে পাইলাম না। চৌধুরী চেয়ারে বসিয়া আছে, তাহার সম্মুখে একখানি দেরাজযুক্ত টেবিল। ঘরে আরও তিন চারি খানি চেয়ার পড়িয়া আছে। এক দিকে একখানি খাট রহিয়াছে আমাকে দর্শনমাত্র চৌধুরী, "আসুন মহাশয়, বসুন," বলিয়া একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিল।

বৈকালে চৌধুরীকে যেরূপ প্রফুল্ল ও সজীব দেখিয়াছিলাম, এখন সেরূপ নাই। নাট্যশালায় যে দারুণ ভীতি তাহাকে অবসন্ন করিয়াছিল, তাহা এখনও তাহাকে অধিকার করিয়া আছে। সে আমার মুখের দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া বলিল,—"আপনি আমার নিকট বিশেষ দরকারে আসিয়াছেন; কিন্তু আমার নিকট আপনার কি দরকার হইতে পারে, তাহা আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।"

তাহার চক্ষুর ভাব দেখিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইল, থিয়েটারে সে আমাকে দেখিতে পায় নাই। রমেশকে দেখিয়া সে এতই বিচ-লিত হইয়াছিল যে, অন্য কিছু দেখিবার ও ভাবিবার তাহার সময় ছিল না। ইহা আমার পক্ষে শুভ বলিতে হইবে। কারণ আমাকে রমেশের সঙ্গে দেখিলে সে সহজেই বুঝিতে পারিত যে, আমি তাহার সমস্ত অতীত দুর্বৃত্ত-তার পরিচয় পাইয়াছি। সুতরাং সে হয়ত আমার সহিত দেখাই করিত না এবং হয়ত দেখা করিলেও অতি সাবধানতার সহিত কথা কহিত।

আমি বলিলাম,—"আজি রাত্রিতে আপ-নার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সুখী হইলাম। দেখিতেছি, আপনি স্থানান্তরে যাইবার উদ্যোগে আছেন।"

"আমার স্থানান্তর গমনের সহিত আপ-নার দরকারের কোন সম্বন্ধ আছে কি?"

"কিছু আছে বই কি?"

"কি সম্বন্ধ আছে বলুন। আমি কোথায় যাইতেছি আপনি জানেন কি?"

"না। কিন্তু কেন আপনি কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইতেছেন তাহা আমি জানি।"

তৎক্ষণাৎ সে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল এবং ঘরের একমাত্র দরজায় একটা তালা লাগাইয়া আসিল। তাহার পর সেই চাবিটা পকেটে ফেলিয়া বলিল,—"দেবেন্দ্র বাবু, আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকিলেও,আমরা উভয়েই উভয়কে বিলক্ষণ জানি। এখানে আসিবার পূর্ব্বে আপনি কি একবারও ভাবেন নাই যে,আমার সহিত এলোমেলো ভাবে কথা কহিবার মত সহজ লোক আমি নহি?"

আমি উত্তর করিলাম,—"আমি আপনার সহিত এলোমেলো কথা কহিতে আসি নাই। অতি গুরুতর বিষয়ের জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি। যে দ্বার আপনি রুদ্ধ করিয়া আসিলেন, তাহা খোলা থাকিলেও আপনার কোন রূপ অসদ্ব্যবহার হেতু, আমি তন্মধ্য দিয়া প্রস্থানের চেষ্টা করিতাম না এবং যতক্ষণ কার্য্য শেষ না হয়, ততক্ষণ কিছুতেই তাহা করিব না।"

চৌধুরী টেবিলের উপর হস্ত স্থাপন করিয়া আমার মুখের দিকে মনোযোগ সহ-কারে দৃষ্টিপাত করিল। তাহার হস্তের ভারে টেবিল কাঁপিয়া উঠিল এবং তদুপরিস্থ পিঞ্জরা-বদ্ধ ইন্দুর সকল রং করা তারের ফাঁক দিয়া উঁকি দিতে লাগিল। সে আমাকে জিজ্ঞা-সিল,—"আপনার অভিপ্রায় কি?"

"শুনিলাম আপনি কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইতেছেন। এই শেষ সময়ে আপনার নিকট হইতে কয়েকটটী কথা জানিয়া লইতে চাহি এবং আপনাকে কয়েকটী কথা জানাইয়া দিতে চাহি।"

তাহার প্রশস্ত ললাট দিয়া ঘর্ম্মবারি বিনির্গত হইতে লাগিল। সে টেবিলের দেরাজে হাত দিল এবং তাহার চাবি খুলিয়া ফেলিল। তাহার পর বলিল—"আমি কেন কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইতেছি, তাহা আপনি তবে জানেন। বলুন দেখি কৃপা করিয়া কেন।"

আমি বলিলাম,—"আমি তাহা বলিতেও পারি, এবং তাহার প্রমাণও দেখাইতে পারি।"

"ভাল, একে একে হউক। আগে বলুন।"

আমি গম্ভীর ভাবে দৃঢ়তার সহিত বলিলাম,—"আপনি রমেশচন্দ্র রায় নামক এক ভদ্রলোকের ভয়ে পলাতক হইতেছেন।"

সেই নরাধমই যে রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী তদ্বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ থাকিল না। কারণ সে থিয়েটারে রমেশকে দেখিয়া যেরূপ বিচলিত হইয়াছিল আবার আমার মুখে রমেশের নাম শুনিয়া অবিকল সেইরূপ হইয়া উঠিয়া সে দেরাজের ভিতর হইতে একটা ভারী পদার্থ টানিয়া বাহির করিতেছে বোধ হইল। তখনই সে এক বারুদ পোরা, ঠিক করা, ছনলা পিস্তল বাহির করিল। আমি বুঝিলাম আমার জীবন একটু সূক্ষ্ম সূতায় ঝুলিতেছে। আমি বলিলাম,—"আরও এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করুন। দেখুন আপনার দরজা রুদ্ধ এবং আমি নিরস্ত্র। তথাপি আমি একটুও বিচলিত হইতেছি না এবং একটুও নড়িবার চেষ্টা করিতেছি না। আর দুইটা কথা শুনুন।"

"আপনি যথেষ্ট বলিয়াছেন, আর শুনিতে চাহি না। আপনি বুঝিতে পারিতেছেন, আমি এখন কি ভাবিতেছি?"

"বোধ হয় পারিতেছি।"

"আমি ভাবিতেছি, নানারূপ সামগ্রী চতুর্দ্দিকে পড়িয়া থাকায়, ঘরটা বড় বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে। ইহার উপর আবার আপনার মস্তিষ্ক চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিয়া বিশৃঙ্খলতা আরও বাড়াইব কি না, তাই ভাবিতেছি।"

আমি বলিলাম,—"আগে এই কাগজটুকু পড়ুন দেখি, তাহার পর যাহা হয় করিবেন। মনে করিবেন না যে, আমাকে নিপাত করিলেই আপনার বিপদের শেষ হইবে।"

আমি পকেট বহি হইতে কাগজ খণ্ড বাহির করিয়া তাহাকে পড়িতে দিলাম। সে উচ্চ স্বরে সেই কয় ছত্র পাঠ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত সাবধানতার ব্যবস্থা বুঝিতে পারিল। তখনই সে পুনরায় দেরাজের মধ্যে পিস্তল রাখিয়া দিয়া বলিল,—"দেখুন দেবেন্দ্র বাবু, আমি আপাততঃ পিস্তল রাখিয়া দিলাম বটে, কিন্তু আমি যে উহা আর বাহির করিয়া আপনার মগজ উড়াইয়া দিব না, ইহা আপনি যেন মনে করিবেন না। আমি নিরপেক্ষ লোক, পরম শত্রুর সম্বন্ধেও আমি সুবিচার করিতে পরাঙ্মুখ নহি। আমি স্বীকার করিতেছি যে, আপনার মগজ ঘাসে বোঝাই নহে; তাহাতে সার আছে। সে কথা যাউক, এখন কাজের কথা—"

আমি বলিলাম,—"কাজের কথা হইবার পূর্ব্বে আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, আপনি যে রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী তাহা আমি জানি। জগদীশনাথ চৌধুরী যে আপনার প্রকৃত নাম নহে তাহাও আমি জানি। আপনার দক্ষিণ হস্তে রমেশ বাবুর দাঁতের দাগ

যে এখনও বিদ্যমান আছে তাহাও আমি জানি।"

দেখিলাম তাহার বদনমণ্ডল ঘোর উৎকণ্ঠা কালিমায় আচ্ছন্ন হইল। বলিল,—"এ সকল মিথ্যা কুৎসিত কথা যে আপনাকে জানাইয়াছে সে আমার শত্রু; এ জন্ত যে ব্যবস্থা করা আবশ্যক তাহা শীঘ্রই করিব। এক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, ঐ কাগজ খণ্ডে যে ব্যক্তি নাম স্বাক্ষর করিয়াছে সে কে?"

আমি বলিলাম,—"তিনি রমেশচন্দ্র রায়। আপনি যখন রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী ছিলেন, তখন তিনি আপনার পরম বন্ধু ছিলেন। আপনি তাঁহার ভগ্নীর সতীত্ব নাশ করিয়া,। বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। এখন তাঁহাকে চিনিয়াছেন কি?

আবার সে দেরাজের মধ্যে হাত দিয়া পিস্তল বাহির করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু ক্ষান্ত হইয়া আবার বলিল,—"আপনার পত্রানুযায়ী কার্য্য করিতে বন্ধুকে কতক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিয়া দিয়াছেন?"

"কালি প্রাতে বেলা ৯টা পর্য্যন্ত।"

"বুঝিয়াছি, আপনি বেশ বিবেচনার সহিত ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি যদি খুব যত্ন সহকারে উদ্যোগী হইয়া যাত্রা করি, তাহা হইলেও যে বেলা ৯টার আগে কলিকাতা হইতে বাহির হইতে পারিব এরূপ কোন সম্ভাবনা নাই। অন্যান্ত কথার পূর্ব্বে ইহা স্থির থাকা আবশ্যক যে, যতক্ষণ আপনি আপনার বন্ধুকে লিখিত পত্র আমার নিকট ফিরাইয়া আনিয়া না দিবেন, ততক্ষণ আমি আপনাকে ছাড়িয়া দিব না। এক্ষণে বলুন আপনার কি জিজ্ঞাস্য।"

আমি বলিলাম,—"তাহা আপনি শীঘ্রই জানিতে পারিবেন। কিন্তু আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন কি, আমি কাহার স্বার্থের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি?"

সে বিদ্রূপের স্বরে বলিল,—"নিশ্চয়ই কোন স্ত্রীলোকের স্বার্থ।"

আমি বলিলাম,—"তাহা বলিলে ঠিক কথা হয় না। আমার স্ত্রীর স্বার্থ।"

তখনই যেন তাহার চক্ষে আমি অন্যরূপ লোক হইয়া পড়িলাম। আমাকে আর বিপজ্জনক বলিয়া তাহার বোধ থাকিল না। সে আমার মুখের দিকে, ঈষৎ হাস্যযুক্ত বিদ্রূপব্যঞ্জক দৃষ্টিপাত করিতে করিতে এককালে দেরাজ বন্ধ করিয়া ফেলিল। আমি বলিতে লাগিলাম,—"আপনি বিশেষরূপ জ্ঞাত আছেন যে, গত কয়েক মাস নিরন্তর যত্নে আমি এ সম্বন্ধে যতদূর জ্ঞাত হইয়াছি, তাহাতে কোন সত্য কথা আমার সমক্ষে প্রচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিলে, কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। আপনি এক অতি কুৎসিত চক্রান্তের প্রধান অভিনেতা। নির্ব্বিবাদে এক লক্ষ টাকা লাভ করাই আপনার তাদৃশ অতি নিন্দনীয় চক্রান্তে লিপ্ত হওয়ার একমাত্র

চৌধুরী কিছু জবাব করিল না; কিন্তু তাহার বদন অতিশয় চিন্তা-মেঘাচ্ছন্ন হইল।

আমি ব[লি]তে লাগিলাম,—"আপনার আর্থিক লাভ আপনি নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে থাকুন, আমি তাহা পুনর্গ্রহণের প্রার্থী নহি।" তাহার মুখমণ্ডল মেঘমুক্ত হইল। আমি বলিতে লাগিলাম,—"যে ধর্ম্মবিগর্হিত, ঘোর দুষ্ক্রিয়ার সাহায্যে এই হৃদয়হীন—"

সে আমাকে বাধা দিয়াবলিল,—"দেবেন্দ্র বাবু, আপনি কি এখানে নৈতিক উপদেশ শুনাইতে আসিয়াছেন? তাহা হইলে কৃপা করিয়া সে উপদেশ আপনি বন্ধ করিয়া রাখুন;

আমার তাহাতে কোনই প্রয়োজন নাই। সময় বিশেষে তাহা আপনার অন্যান্য আত্মীয়ের উপকারে আসিতে পারে, অতএব এখন এখানে তাহা অপব্যয় করিবেন না। আপনি কি চান তাই বলুন।"

আমি বলিলাম,—"প্রথমতঃ, আমার সম্বন্ধে, আপনার স্বহস্ত লিখিত, এই ব্যাপারের একটা সম্পূর্ণ স্বীকার পত্র আমি চাহি।"

সে তাহার একটা স্থূল অঙ্গুলি উন্নত করিয়া বলিল,—"এক দফা। তার পর ?"

আমি বলিলাম,—"আমার স্ত্রী যে দিন কৃষ্ণ সরোবরের ভবন পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আইসেন, সে দিন কোন্ তারিখ তৎসম্বন্ধে আপনার, সমর্থনোক্তি ভিন্ন, অন্য কোন অকাট্য ও সহজ প্রমাণ চাহি। ইহাই আমার দ্বিতীয় দাওয়া।"

সে বলিল,—"দেখিতেছি। যে জায়গায় গলদ আছে, আপনি সেইখানটাই ধরিয়াছেন। তার পর ?"

"আপাততঃ এই পর্য্যন্ত।"

"বেশ! আপনি আপনার বক্তব্য শেষ করিয়াছেন, এক্ষণে আমার কথা শুনুন। মোটের উপর বিবেচনা করিলে আপনি যাহাকে কৃপা করিয়া কুৎসিত চক্রান্ত বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, তৎসংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত স্বীকার করার অপেক্ষা, এই স্থানে আপনার দেহ-পিঞ্জর হইতে প্রাণ-পক্ষী উড়াইয়া দেওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশী। এক্ষণে আপনি যদি আমার প্রস্তাবে স্বীকার হন, তাহা হইলে আপনার প্রস্তাবমত সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিতে আমি সম্মত আছি। আপনি যেরূপ বর্ণনা চাহেন আমি তাহা লিখিয়া দিতেছি, যে প্রমাণ আপনি চাহেন তাহাও আমি সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। আমার পরলোকগত বন্ধু তাঁহার স্ত্রীর কলিকাতা যাত্রা সম্বন্ধে, দিন, তারিখ ঘণ্টা সমস্ত ঠিক করিয়া আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এ বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রমাণ কি না বলুন ? আমি আপনাকে সে পত্র দিতে পারি। আর রাণীকে ষ্টেশন হইতে আনিবার জন্য যে আড়গোড়া হইতে ব্রুহাম ভাড়া করিয়াছিলাম, তাহার ঠিকানা আপনাকে বলিয়া দিতে পারি। সেখানকার অর্ডর বহিতে নিশ্চয়ই আপনি তারিখ জানিতে পারিবেন। সম্ভবতঃ কোচম্যান বা সহিসও মনে করিয়া কোন কোন কথা বলিলেও বলিতে পারিবে। আপনি যদি আমার সর্ত্ত পালন করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে এ সকলই আমি করিতে সম্মত আছি! শুনুন আমার সর্ত্ত কি ? ১ম সর্ত্ত। আমি ও আমার স্ত্রী, যখন যেরূপে হউক, এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব। আপনি, কিম্বা আপনার বন্ধু কোন রূপে তাহার প্রতিবন্ধকতা সাধন করিতে পারিবেন না। ২য় সর্ত্ত। কালি প্রাতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার কর্ম্মচারী না আসিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনাকে আমার নিকটে থাকিতে হইবে। তাহার পর, আপনার যে বন্ধুর নিকট সেই মোহর আঁটা চিঠি আছে, সেই বন্ধুকে, আমার কর্ম্মচারীর মারফতে আপনার এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া পাঠাইতে হইবে যে, তিনি যেন পত্রপাঠ আমার কর্ম্মচারীর হস্তে, সেই চিঠি ফিরাইয়া দেন। আমার কর্ম্মচারী যতক্ষণ সেই পত্র ফিরাইয়া আনিয়া আমার হাতে না দিবে, ততক্ষণও আপনাকে আমার নিকট অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। এই স্থলে আমি স্বীকার করিতেছি যে, আপনার পত্র হস্তগত হইলে, পাঠ না করিয়াই পুড়াইয়া ফেলিব। তাহার পর আমি সস্ত্রীক প্রস্থান করিলে আরও আধ-ঘণ্টাকাল আপনাকে এখানে অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইবে। তদনন্তর তদনন্তর স্বাধীন

ভাবে যথেচ্ছা বিচরণ করিতে পারিবেন, আমার তাহাতে কোন আপত্তি থাকিবে না। আমার সর্ত্তের কথা আপনাকে জানাইলাম। এখন আপনি ইহাতে সম্মত আছেন কি না বলুন।”

এই দীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে লোকটার বুদ্ধি-স্থৈর্য্য, অত্যন্ত দূরদৃষ্টি, অপরিসীম ধূর্ত্ততা, এবং অত্যাশ্চর্য্য সাহসিকতার অত্যদ্ভুত পরিচয় দেখিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। তাহার প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইলে, লীলার স্বরূপত্ব সমর্থন সম্বন্ধীয় প্রমাণাদি আমার হস্তগত হইতেছে সত্য, কিন্তু এরূপ নরাধমকে বিনা দণ্ডে ছাড়িয়া দিতে হইতেছে। আর এই দুরাত্মা রমেশের উপর যে অত্যাচার করিয়াছে, তাহারও কোন প্রতিফল দেওয়া হইতেছে না। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক এই সুদীর্ঘ কালের পর, তাহার সেই অতীত দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত, রমেশ বা আমি তাহাকে কিরূপে দণ্ডিত করিতে পারি। নিজ শক্তিতে আমরা তাহাকে কোনই শাস্তি দিতে পারি না, ইহা নিশ্চয়। সুতরাং তাহাকে শাস্তি দিবার নিমিত্ত, আমাদিগকে রাজ-শাসনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার সে পূর্ব্ব দুষ্কৃতির প্রমাণ কোথায়? এই ব্যক্তিই যে সেই ব্যক্তি তাহাই বা কে বলিবে? স্বয়ং রমেশই যখন তাহাকে চিনিতে পারিতেছেন না,তখন আর কে তাহা সমর্থন করিতে সক্ষম? তাহার দক্ষিণ হস্তের ক্ষতচিহ্ন বিশেষ প্রমাণ রূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না; কারণ নানা কারণে তাহার উৎপত্তি সম্ভাবিত। অতএব তাহাকে ছাড়িয়া না দিলেই বা আমরা একণে কি করিতে পারি? সুতরাং তাহার দ্বারা উপস্থিত বিষয়ের যে সকল অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, অগত্যা আমাদিগকে তাহাই যথেষ্ট বোধ করিয়া আপাততঃ ক্ষান্ত হইতে হইতেছে। আরও আমার মনে হইল, প্রমোদরঞ্জনকে হাতে পাই পাই করিয়া পাইলাম না; সে চিরদিনের মত ফাঁকি দিয়া পলাইল। কি জানি যদি এও আবার কোন প্রকারে হাত ছাড়া হইয়া যায়। না, এ সুযোগ পরিত্যাগ করিয়া অন্য মন করা কদাপি সুবুদ্ধির কার্য্য নহে। লীলার স্বরূপত্ব সমর্থিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সত্যের জয় হইবে—আপাততঃ ইহাই যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া বলিলাম,—“আমি আপনার সমস্ত সর্ত্তে সম্মত হইলাম।”

আমার মুখের দিকে কিয়ৎকাল দৃষ্টিপাত করিয়া চৌধুরী বলিল,—“অতি উত্তম। এক্ষণে সকল বিষয়ের সুন্দর মীমাংসা হইয়া গেল।”

এই বলিয়া সে চেয়ার হইতে গাত্রোত্থান করিল এবং হাই তুলিতে তুলিতে উভয় বাহু বিস্তার করিয়া আলস্য ত্যাগ করিল। তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিল,—“ভাল হইয়া বসুন, দেবেন্দ্র বাবু! এখন আমি আপনার সহিত শত্রুভাব পরিত্যাগ করিয়াছি।”

তাহার পর সে দ্বার-সন্নিহিত হইয়া তালা খুলিয়া ফেলিল এবং বলিল,—“রঙ্গমতি দেবি, প্রিয়তমে, একবার এদিকে আসিতে পারিবে কি? এখানে দেবেন্দ্রবাবু নামে একটি ভদ্রলোক আছেন। তোমার আসায় কোন আপত্তি নাই।” তিনি আসিলেন। তখন চৌধুরী আবার বলিল,—“প্রিয়তমে! তোমার জিনিষ পত্র গুছানর ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আমার জন্য একটু চা তৈয়ার করিয়া দিবার সময় হইবে কি? এই দেবেন্দ্র বাবুর সহিত আমার অনেক লেখা পড়ার কাজ আছে; সেই জন্যই এখন একটু চা খাওয়ার দরকার হইতেছে।”

রঙ্গমতী ঠাকুরাণী সম্মতিসূচক মস্তকান্দোলন করিয়া প্রস্থান করিলেন। ঘরের কোণে

একটা ডেস্ক ছিল। চৌধুরী তাহার সমীপস্থ হইয়া কয়েক দিস্তা কাগজ ও কতকগুলা পাখার কলম বাহির করিল। তাহার পর কলম-গুলাকে, যখন যেটা দরকার তখন সেটা লই-বার সুবিধা হইবে বলিয়া, ডেস্কের উপর ছড়া-ইয়া রাখিল এবং সংবাদপত্রাদির জন্য ব্যবসায়ী লেখকগণ যেরূপ লম্বা লম্বা করিয়া কাগজ কাটিয়া লয়, সেইরূপ কাগজ কাটিয়া লইল। তাহার পর আমার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল,—"আজিকার এই রচনা এক অসাধারণ সামগ্রী হইবে। প্রবন্ধাদি রচনা বিষয়ে আমার চির-দিন অভ্যাস আছে। মনুষ্যের যত প্রকার মানসিক উন্নতি হইতে পারে, তন্মধ্যে ভাবের শৃঙ্খলা-বিধান-ক্ষমতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমার তাহা আছে। আপনার তাহা আছে কি দেবেন্দ্র বাবু?"

তাহার পর যতক্ষণ চা না আসিল, ততক্ষণ সে গৃহ মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল এবং যে যে স্থলে তাহার ভাবের গ্রন্থি সংলগ্ন না হইল, তত্তৎস্থলে সে আপনার কপোলদেশে হস্ত দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। এইরূপে বাধ্য হইয়া, কল্পনাতীত ঘোর দুষ্কর্ম্ম স্বীকার করিতে বসিয়াও, সে ব্যক্তি আপনার অনর্থক অহঙ্কার ও গৌরব প্রকাশ করিবার সুযোগ হইল মনে করিয়া, কিরূপে আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, তাহা ভাবিয়া আমি অতি-শয় আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিলাম। এমন সময় রঙ্গমতী দেবী চা লইয়া আসিলেন এবং চৌধুরী স্ত্রীর প্রতি মধুর হাস্য সহ দৃষ্টিপাত করিয়া, তাহা গ্রহণ করিল। রঙ্গমতী চলিয়া গেলেন। চৌধুরী চা ঢালিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"একটু চা খাইবেন কি দেবেন্দ্র বাবু?"

আমি অস্বীকার করিলাম। সে হাসিয়া বলিল,—"আপনি ভয় করিতেছেন বুঝি, পাছে আপনাকে বিষ খাওয়াই। ছি ছি! আপনারা অনাবশ্যক স্থলে বিশেষ সাবধান; ইহাই দক্ষিণদেশী লোকের প্রধান দোষ।"

চৌধুরী লিখিতে বসিল। একখণ্ড কাগজ সম্মুখে লইল এবং একটা কলম লইয়া দোয়াতে ডুবাইল। তাহার পর একবার গলা ঝাড়িয়া লইল এবং খস্ খস্ শব্দে অতি দ্রুত লিপিতে আরম্ভ করিল। মোটা মোটা বড় বড় অক্ষরে ছত্রের মধ্যে অনেক খানি করিয়া ফাক দিয়া লিখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে একখণ্ড কাগজ ফুরাইয়া গেল। এইরূপে এক এক খণ্ড লিখিয়া তাহাতে সংখ্যা দিয়া, ঘাড়ের উপর দিয়া পশ্চাদ্দিকে ফেলিয়া দিতে লাগিল। কলমটাও যখন খারাপ হইয়া গেল, তখন তাহাও এইরূপে পশ্চাদ্দিকে ফেলিয়া দিয়া, আবার আর একটা কলম গ্রহণ করিল। ক্রমে তাহার চেয়ারের চারিদিকে কাগজের স্তূপ হইল। এইরূপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতীত হইল; সেও লিখিতে লাগিল, আমিও নীরবে বসিয়া থাকিলাম। মধ্যে মধ্যে সে এক এক চোমক চা খাইতে লাগিল; তদ্ভিন্ন আর কোন কারণে সে একবারও থামিল না, একবারও আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিল না। একটা, দুইটা, তিনটা ক্রমে চারিটা বাজিল; তথাপি চারিদিকে কাগজ পড়ার নিবৃত্তি নাই; কাগজ খসখসানিরও বিরাম নাই। চৌধুরীর অক্লান্ত লেখনী সমান চলিতে লাগিল; চারিটার পর হঠাৎ একটা কলমের খোঁচার শব্দ শুনিতে পাইলাম! তৎক্ষণাৎ চৌধুরী অতিশয় গৌরবের সহিত আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—"বহুত আচ্ছা।" তাহার পর স্বকীয় বিশাল বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া সাহ-ঙ্কারে বলিল,—"দেবেন্দ্র বাবু মার দিয়া। যাহা লিখিয়াছি তাহাতে স্বয়ং অতিশয় সন্তুষ্ট

হইয়াছি। আপনি যখন পড়িবেন তখন আপনিও যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। বিষয়ের শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু জগদীশের মাথার সমাপ্তি নাই, শেষও নাই। যাউক, এখন আমি কাগজ গুলি গুছাইয়া একবার আগাগোড়া পড়িয়া দেখিব এবং আবশ্যক স্থলে সংশোধন করিব। এইমাত্র ৪টা বাজিয়াছে। বেশ। গোছান, পড়া, সংশোধন করা ৪টা হইতে ৫টা। নিজের শ্রান্তি-দূর করিবার জন্য অতি অল্প নিদ্রা, ৫টা হইতে ৬টা। যাত্রার উদ্যোগ, ৬টা হইতে ৭টা। কর্ম্মচারীর মারফতে আপনার চিঠি আনান ব্যাপার, ৭টা হইতে ৮টা। তাহার পর প্রস্থান আর কি! এই দেখুন আমার কাজের তালিকা।

তাহার পর সে ঘরের মেজের উপর বসিয়া কাগজগুলি গুছাইয়া লইল এবং একটা গুণছুঁচ ও সূতা দ্বারা সকলগুলি গাঁথিয়া ফেলিল। নিজে একবার সবটা পড়িল। তাহার পর রঙ্গভূমির নট যেমন স্বরের হ্রাসবৃদ্ধি ও অঙ্গভঙ্গী করিয়া অভিনয় করে, তদ্রূপ ভাবে সে সেই সকল কাগজ আমাকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। পাঠকগণ, কিঞ্চিৎকাল পরেই চৌধুরীর লিখিত কাগজ দেখিতে পাইবেন। অধুনা এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সে যাহা লিখিয়াছিল, আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

তদনন্তর যে আড়গোড়া হইতে ব্রুহাম ভাড়া করিয়াছিল তাহার ঠিকানা আমাকে সে লিখিয়া দিল এবং প্রমোদরঞ্জনের একখানি পত্র দিল। সেই পত্র কৃষ্ণসরোবর হইতে ২৫শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে লিখিত। রাণী লীলাবতী ২৬শে তারিখে কলিকাতায় আসিবেন এই সংবাদ তাহাতে লেখা আছে। সুতরাং যে দিন তিনি ৫নং আশুতোষ দের গলিতে পরলোক গমন করিয়াছেন এবং নিমতলার ঘাটে তাঁহার সৎকার হইয়াছে, বলিয়া প্রচার সে দিন তিনি কৃষ্ণসরোবরের রাজবাটীতে স্বচ্ছন্দ শরীরে জীবিত ছিলেন এবং তাহার পর দিন তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। রাজার স্বহস্ত-লিখিত এই প্রমাণ এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সন্দেহ নাই। গাড়ি আড়গোড়ায় যদি আর কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইলে আরও ভাল হয়।

চৌধুরী ঘড়ি দেখিয়া বলিল,—"স পাঁচটা বাজিয়াছে। আমি এখন একটু ঘুমাইব। আপনি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন দেবেন্দ্র বাবু, আমার দৈহিক গঠন মহাত্মা নেপোলিয়ানের অনুরূপ। সেই চিরস্মরণীয় ব্যক্তির ন্যায়, নিদ্রার উপরেও আমার সম্পূর্ণ আধিপত্য আছে। আপনি এখন কৃপা করিয়া একটু ছুটি দিউন। ততক্ষণ আমার পত্নী আপনার নিকট বসিয়া গল্পগুজব করিবেন এখন।"

আমি বুঝিতে পারিলাম, যতক্ষণ সে নিদ্রার সেবা করিবে ততক্ষণ আমাকে পাহারা দিবার জন্যই রঙ্গমতী ঠাকুরাণীকে ডাকা হইতেছে। সুতরাং আমি কোন কথা না কহিয়া আমাকে সে যে সকল কাগজ দিয়াছে তাহাই গুছাইতে লাগিলাম। এ দিকে রঙ্গমতী নিঃশব্দে তথায় আগমন করিলেন। তখন চৌধুরী সেই খাটের উপর চিৎ হইয়া পড়িল এবং দুই তিন মিনিটের মধ্যেই অতি সদাত্মা সাধু পুরুষের ন্যায় সুনিদ্রায় মগ্ন হইল।

রঙ্গমতী আমার প্রতি অতি কুটিল, হিংসা ও ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিলেন —"আমার স্বামীর সহিত আপনার যে যে কথা হইয়াছে, তাহা আমি শুনিয়াছি! আমি

হইলে আপনার বুকে ছোরা বসাইয়া দিয়া এতক্ষণ আপনার জীবন শেষ করিয়া দিতাম।” এই কথার পর তিনি একখানি পুস্তক লইয়া পাঠ করিতে থাকিলেন এবং যতক্ষণ তাঁহার স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ না হইল ততক্ষণ আর কোন কথা বলিলেন না এবং একবারও আমার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না।

ঠিক এক ঘণ্টা পরে চৌধুরী চক্ষু মেলিল এবং উঠিয়া বসিল। তাহার পর স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—“প্রিয়তমে রঙ্গমতি, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি। তোমার ওদিকের সব গোছগাছ ঠিক হইয়াছে? আমার এদিকে যে সামান্য গোছান বাকী আছে তাহা ১০ মিনিটে শেষ হইবে। কাপড় চোপড় ছাড়িয়া তৈয়ার হওয়া, ১০ মিনিট। কর্ম্মচারী আসিবার পূর্ব্বে আর কি করিব?” এই বলিয়া সে একবার ঘরের চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, ইঁদুরের খাঁচা দেখিয়া নিতান্ত কাতরভাবে বলিল,—“আমার প্রধান প্রেমের সামগ্রী এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। আমার এই সাধের সোহাগের সন্তানতুল্য ইঁদুরগুলি। ইহাদের কি করিব? এখন তো আমরা অবিশ্রান্ত নানা দেশ ভ্রমণ করিব, কোথাও স্থির হইব না; সুতরাং জিনিষপত্র যত কম হয় ততই ভাল। এই স্নেহময় পিতার নিকট হইতে স্থানান্তরিত হইলে কে আমার কাকাতুয়া, মনুয়া, আর ইঁদুরগুলির যত্ন করিবে?”

অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া সে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। স্বকৃত দারুণ দুষ্কর্ম্মের বিষয় স্বহস্তে লিখিতে সে একটুও কাতর হয় নাই; কিন্তু পাখী ও ইঁদুরের ভাবনায় সে এখন বস্তুতই অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিল। বহুক্ষণ চিন্তার পর সে আবার ডেস্কের নিকট বসিয়া বলিল,—এক উপায় মনে পড়িয়াছে। এই সুবিস্তীর্ণ রাজধানীর পশুশালায় আমার কাকাতুয়া ও মনুয়া আমি দান করিয়া যাইব। তাহার জন্ম যে বর্ণনা-পত্র লিখিত হওয়া আবশ্যক, তাহা এখনই লিখিতেছি।”

সে প্রত্যেক কথা বলিতে বলিতে লিখিতে লাগিল। “নং ১। অতি মনোহর বর্ণ-সম্পন্ন কাকাতুয়া। যাহারা বুঝে তাহাদের পক্ষে বিশেষ আদরের সামগ্রী। নং ২। অতি সুশিক্ষিত বুদ্ধি-সম্পন্ন কয়েকটি মনুয়া। নন্দন কাননের উপযুক্ত। জগদীশনাথ চৌধুরী কর্ত্তৃক কলিকাতার পশুশালায় প্রদত্ত হইল।”

রঙ্গমতী বলিলেন,—“কই ইঁদুরের কথা লিখিলে না?” চৌধুরী ডেস্কের নিকট হইতে রঙ্গমতীর সমীপস্থ হইল এবং স্নেহ-গদগদ স্বরে বলিল,—“মানব-হৃদয়ের কাঠিন্য ও দৃঢ়তার একটা সীমা আছে। যত দূর আমার সাধ্য তাহা আমি করিয়াছি। ইঁদুরগুলিকে আমি কোন মতেই ছাড়িতে পারিব না। তাহা হইলে আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইবে।”

রঙ্গমতী, স্বামীর প্রশংসা করিয়া, বলিলেন,—“কি আশ্চর্য্য কোমলতা!” সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে দারুণ ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিক্ষেপ করিতে ভুলিলেন না। তাহার পর ঠাকুরাণী সযত্নে ইঁদুরের খাঁচা লইয়া এ প্রকোষ্ঠ হইতে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে রাত্রির অবসান হইল। তখনও কর্ম্মচারী আসিল না দেখিয়া, চৌধুরী একটু উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল। বেলা সাতটার সময় দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হইল এবং অবিলম্বে কর্ম্মচারী দেখা দিল। সে লোকটাকে দেখিলেই বোধ হয়, তাহার হাড়ে হাড়ে দুষ্ট বুদ্ধি মাখা আছে। চৌধুরীর মুখে শুনিলাম, তাহার নাম হরেকৃষ্ণ। চৌধুরী তাহাকে

ঘরের এক কোণে লইয়া গিয়া কাণে কাণে ফুস্ ফুস্ করিয়া কি কথা বলিল, তাহার পর প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ কর্ম্মচারী আমার সমীপস্থ হইয়া বিনীতভাবে পত্রের প্রার্থনা করিল। আমার প্রেরিত গালা মোহর আঁটা পত্র খানি এই পত্রবাহক দ্বারা ফেরৎ পাঠাইবার নিমিত্ত, রমেশকে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলাম, এবং সে পত্র কর্ম্মচারীর হস্তে প্রদান করিলাম। চৌধুরী পুনরায় সেই ঘরে আসিলে, কর্ম্মচারী চলিয়া গেল। চৌধুরীর এক আদটু যে কাজ বাকী ছিল তাহা সে এই অবকাশে সমাপ্ত করিয়া ফেলিল।

বেলা ৮টার একটু আগে, কর্ম্মচারী রমেশ বাবুর নিকট হইতে আমার চিঠি ফিরিয়া আনিল। চিঠি যেমন মোহর আঁটা তেমনি আছে; কেহই তাহা খুলে নাই। চৌধুরী পত্র খানি উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেখিয়া, দেশলাই জ্বালাইল এবং তৎক্ষণাৎ তাহা ভস্মীভূত করিল। তাহার পর আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—মনে করিবেন না, দেবেন্দ্র বাবু, যে ভবিষ্যতে আপনি আমার হস্ত হইতে এই অত্যাচারের কোনই প্রতিফল পাইবেন না।" আমি কোন উত্তর দিলাম না।

কর্ম্মচারী যে গাড়ি করিয়া রমেশের নিকট যাতায়াত করিয়াছিল; সেই গাড়ি দরজায় খাড়া ছিল। এক্ষণে কর্ম্মচারী ও ঝি জিনিষ পত্র গাড়িতে তুলিতে লাগিল। এদিকে রঙ্গমতী দেবীও কাপড় ছাড়িয়া আসিলেন। চৌধুরী আমার কাণে কাণে বলিল,—"আমার সঙ্গে গাড়ি পর্য্যন্ত আসুন। আপনাকে এখনও বলিবার কথা আছে।"

আমিও সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া আসিলাম। রঙ্গমতী দেবী, ইঁদুরের খাঁচা লইয়া, আগেই গাড়িতে উঠিলেন। চৌধুরী আমাকে এক পার্শ্বে টানিয়া লইয়া গিয়া, অস্ফুট স্বরে বলিল,—"মনোরমা দেবীর সহিত যখন আমার শেষ সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন তাঁহাকে কৃশ ও পীড়িত বোধ হইয়াছিল। সেই নারীকুলোত্তমার তাদৃশী অবস্থা দেখা অবধি, আমি অতিশয় চিন্তাকুল আছি। আপনি কৃপা করিয়া তাঁহার প্রতি যত্নের ত্রুটি করিবেন না। এই প্রস্থান কালে, আমি সানুনয়ে, আপনাকে এই অনুরোধ করিয়া যাইতেছি।"

তাহার পর সে তাহার সেই প্রকাণ্ড শরীর কষ্টে গাড়ির মধ্যে পূরিয়া ফেলিল। গাড়ি চলিয়া গেল। তখনই গলির মোড় হইতে আর একখানি গাড়ি আসিল এবং যেদিকে চৌধুরীর গাড়ি গিয়াছে, সেই দিকেই চলিল। যখন আমার ও চৌধুরীর কর্ম্মচারীর নিকট দিয়া গাড়ি খানি গেল, তখন দেখিতে পাইলাম, তাহার মধ্যে সেই গণ্ডদেশে দাগযুক্ত যুবক বসিয়া আছেন।

কর্ম্মচারী বলিল,—"আপনাকে আরও আধ ঘণ্টা কাল এখানে অপেক্ষা করিতে হইবে।"

আমি বলিলাম—"হাঁ।"

আমরা পুনরায় সেই উপরের ঘরে গিয়া বসিলাম। চৌধুরী আমার হস্তে যে সকল কাগজ দিয়াছে, তাহাই বাহির করিয়া, যে ব্যক্তি সেই অতি ভয়ানক চক্রান্তের প্রধান চক্রী এবং যে তাহা শেষ পর্য্যন্ত স্বয়ং সম্পন্ন করিয়াছে, তাহারই স্বহস্ত-লিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করিতে লাগিলাম।

জগদীশনাথ চৌধুরীর কথা।

বহুকাল বহু ভাবে পশ্চিম প্রদেশে অতিবাহিত করিয়া বিগত ১২৮৫ সালের গ্রীষ্মকালে আমি এদেশে আগমন করি। আমার সহসা এদেশে আগমনের গুরুতর গোপনীয় অভিসন্ধি ছিল এবং সেই অভিসন্ধি-সাধনার্থ, সাহায্যকারী স্বরূপে, আরও কয়েক ব্যক্তি আমার সঙ্গে আসিয়াছিল। রমণী নাম্নী এক স্ত্রীলোক এবং হরেকৃষ্ণ নামক এক পুরুষ তন্মধ্যে প্রধান। কি সে অভিসন্ধি যদি তাহা জানিবার জন্য কাহারও কৌতূহল হয়, তাহা হইলে আমি সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহার সে কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে আমি নিতান্ত অক্ষম। এ প্রদেশে আসিয়া, প্রথমে কয়েক সপ্তাহ কাল আমার স্বর্গগত বন্ধু রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়ের বাটীতে অতিবাহিত করিব স্থির করিলাম। তিনিও পশ্চিম হইতে সস্ত্রীক আসিয়া পৌছিলেন এবং আমিও পশ্চিম হইতে সস্ত্রীক আসিয়া পৌছিলাম। এ সম্বন্ধে উভয় বন্ধুর অদ্ভুত সাম্য। তৎকালে আর এক গুরুতর বিষয়ে উভয় বন্ধুর অত্যদ্ভুত সমতা ছিল। উভয়েরই সে সময়ে ভয়ানক অপ্রতুল। টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন। সভ্য-জগতে কে এমন ব্যক্তি আছেন যে, আমাদের তদানীন্তন অবস্থা দেখিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন না? যদি কেহ থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি হৃদয়হীন, অথবা অপরিমিত ধনবান্। প্রকৃত ব্যাপারের স্বরূপ আখ্যানই আবশ্যক। এই জন্য আমি এস্থলে আমার এবং আমার রাজবন্ধুর আর্থিক কৃচ্ছ্রতার কথা সরলভাবে সংঘোষিত করিলাম।

মনোরমা নাম্নী এক অপার্থিব রমণী কর্ত্তৃক আমরা রাজার সেই প্রকাণ্ড ভবনে অভ্যর্থিত হইলাম এবং অনতিকাল মধ্যেই সেই সুন্দরীর নিকট আমি হৃদয় বিক্রয় করিলাম। এই ষাটি বৎসর বয়সে আমার হৃদয়ে অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক হৃদয়ের স্থায় প্রেমাগ্নি প্রবল তেজে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। আমার হৃদয়ের যাবতীয় মূল্যবান্ সামগ্রী আমি সেই রমণীরত্নের চরণারবৃন্দে উৎসর্গীকৃত করিতে লাগিলাম; আমার নিরপরাধা পত্নী কেবলমাত্র অসার পদার্থপুঞ্জই পাইতে থাকিলেন। জগতের এই রীতি, মানবের এই স্বভাব, প্রেমের এই ধর্ম্ম। জিজ্ঞাসা করি এ সংসারে আমরা ছায়াবাজীর পুতুল ভিন্ন আর কি? হে সর্ব্বশক্তিমান বিধাতঃ! কৃপা করিয়া একটু ধীরে আমাদের রজ্জু আকর্ষণ কর! ত্বরায় আমাদের এই নৃত্য ব্যাপার পরিসমাপ্ত করিয়া দেও! সুন্দররূপে প্রণিধান করিতে পারিলে, পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী বাক্য মধ্যে এক সম্পূর্ণ দর্শন শাস্ত্রের অঙ্কুর পরিদৃষ্ট হইবে। এই দর্শনশাস্ত্র আমার উদ্ভাবিত।

এক্ষণে আরব্ধ উপাখ্যানের অনুসরণ করিতেছি। আমরা কৃষ্ণসরোবরে অবস্থিত হওয়ার পর, আমাদের তদানীন্তন অবস্থা স্বয়ং শ্রীমতী মনোরমা সুন্দরী অতি সুন্দর ও বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছেন। অপরিসীম সৌভাগ্য হেতু, তদীয় অত্যদ্ভুত দিনলিপি, আমি বিগর্হিত উপায়ে পাঠ করিতে পাইয়াছিলাম। তৎপাঠে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, তিনি প্রসঙ্গসমূহ এতই স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন যে, আমার তদ্বিষয়ে আর কোন কথাই বলিবার প্রয়োজন নাই। যে নিরতিশয় কৌতূহলজনক কাণ্ডের বর্ণনা করা আমার আবশ্যক, এবং যাহার সহিত আমি সম্পূর্ণরূপে সংলিপ্ত, শ্রীমতী মনোরমা সুন্দরীর কঠিন পীড়া হইতে তাহার আরম্ভ ও উৎপত্তি।

এই সময়ে আমাদের অবস্থা বড়ই ভয়ানক। প্রমোদের কয়েকটা গুরুতর দেনা এই সময়ে পরিশোধ করিতে না পারিলে তাঁহার বিপদের সীমা থাকিবে না; আমারও তদ্বৎ প্রয়োজনীয় অপেক্ষাকৃত সামান্য অপ্রতুলের কথা এস্থলে উল্লেখ না করিলেও হানি নাই। প্রমোদের রাণীর সম্পত্তি আমাদের উভয়ের কেবল একমাত্র ভরসাস্থল; কিন্তু তাঁহার মৃত্যু না হইলে, তাহার সিকিপয়সাও হস্তগত হইবার উপায় নাই। বড়ই মন্দ সংবাদ; আরও মন্দ সংবাদ আছে। আমার পরলোকগত বন্ধুর এতদ্ভিন্ন চিন্তার আরও এক গোপনীয় কারণ ছিল। আমি, সৌজন্যের বশবর্ত্তী হইয়া, কদাপি তাহা জানিবার জন্য বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করি নাই। মুক্তকেশী নাম্নী এক স্ত্রীলোক সন্নিহিত কোন স্থানে লুক্কায়িত আছে, সে সময়ে সময়ে রাণী লীলাবতীর সহিত সাক্ষাৎ করে এবং তৎকর্ত্তৃক একটা রহস্য ব্যক্ত হইলে রাজার সর্ব্বনাশ নিশ্চিত, এই কয়টী সংবাদ ভিন্ন তৎকালে আমি আর কিছু জানিতাম না। প্রমোদ আমাকে স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে, যদি মুক্তকেশীকে ধরিতে না পারা যায় এবং রাণীর সহিত তাহার আলাপ বন্ধ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বনাশের ইয়ত্তা থাকিবে না। যদি তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের আর্থিক অপ্রতুলতার কি হইবে? অপরিসীম সাহসী জগদীশকেও এই আশঙ্কায় কাঁপিতে হইল!

তখন আমি প্রাণপণে মুক্তকেশীর সন্ধানে নিযুক্ত হইলাম। যদিও আমাদের টাকার দরকারের সীমা নাই, তথাপি সে চেষ্টারও বরং দেরি করিলে চলিতে পারে, কিন্তু মুক্তকেশীর সন্ধানে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব সহে না। আমি তাহাকে কখন দেখি নাই, কিন্তু শুনিয়াছিলাম রাণী লীলাবতীর সহিত তাহার অত্যদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল। এই সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে যখন আমি জানিতে পারিলাম যে, সে বাতুলালয় হইতে পলায়ন করিয়াছে, তখন আমার মনে এক অত্যদ্ভুত কল্পনার উৎপত্তি হইল এবং পরিণামে তাহার অতি বিস্ময়াবহ ফল ফলিল। আমার সেই অভিনব কল্পনা দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তির সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তন সাধনের পরামর্শ প্রদান করিল। রাণী লীলাবতী ও মুক্তকেশীর পরস্পর নাম, ধাম ও অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিলে সকল বিপদই বিদূরিত হইয়া যাইবে: আমাদের তিন লক্ষ টাকা হস্তগত হইবে এবং রাজা প্রমোদরঞ্জনের গোপনীয় রহস্যও চিরদিনের নিমিত্ত প্রচ্ছন্ন থাকিবে। কি অপূর্ব্ব কল্পনা।

আমার অভ্রান্ত বুদ্ধি স্থির করিল যে, মুক্তকেশী দুই এক দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই আবার কৃষ্ণ সরোবরের কাঠের ঘরে আসিবে। অতএব আমি কাঠের ঘরে অপেক্ষা করিয়া থাকিব স্থির করিলাম। গিন্নি-ঝি নিস্তারিণীকে বলিলাম যে, প্রয়োজন হইলে আমাকে কাঠের ঘরে দেখিতে পাওয়া যাইবে, আমি সেই স্থানে অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিব। আমি কখনই অকারণে লোকের অনু-সান্ধিৎসা বা সন্দেহ উত্তেজিত করি না। নিস্তারিণী কখনই আমাকে অবিশ্বাস করিত না; উপস্থিত ছলনাও সে অবিশ্বাস করিল না।

এইরূপে কাঠের ঘরে অপেক্ষা করা নিষ্ফল হইল না। মুক্তকেশীর দেখা পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু যে স্ত্রীলোক তৎকালে তাহার অভিভাবিকা, সে আসিয়া দেখা দিল। সেই প্রবীণা স্ত্রীলোকও আমার মিষ্ট কথায় পূর্ণভাবে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিল না এবং আমাকে তাহার সন্তানবৎ স্নেহের সামগ্রীর

সমীপে লইয়া গেল। যখন আমি প্রথমে মুক্তকেশীর সমীপস্থ হইলাম, তখন সে নিদ্রিত ছিল। এই অভাগিনীর সহিত রাণী লীলাবতীর অত্যদ্ভুত আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিয়া, আমার শরীর দিয়া তাড়িত-প্রবাহ সঞ্চালিত হইল। কল্পনাবলে যে অচিন্তনীয় ব্যাপারের বাহ্যাবয়ব মাত্র আমি সংগঠিত করিয়াছিলাম, অধুনা এই নিদ্রিতা নারীর বদন সন্দর্শনে তাহা পূর্ণ মাত্রায় পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখস্থ সুন্দরীর অবস্থা দেখিয়া আমার স্নেহ-প্রবণ হৃদয় বিগলিত হইল এবং তাহার যাতনা শান্তির নিমিত্ত আমি চেষ্টান্বিত হইলাম। আমি তাহাকে উত্তেজক ঔষধ দিয়া, তাহার কলিকাতা যাত্রার সুযোগ করিয়া দিলাম।

এই স্থানে এক অত্যাবশ্যক প্রতিবাদ উত্থাপিত করিয়া, সাধারণের হৃদয় হইতে এক শোচনীয় ভ্রান্তি বিদূরিত করা নিতান্ত আবশ্যক। আমার জীবনের ভূরিভাগ চিকিৎসা ও রসায়ন শাস্ত্রের আলোচনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। রসায়ন শাস্ত্রের অভিজ্ঞতা মানবকে অতুলনীয় ক্ষমতাশালী করে, এই জন্য তাহার আলোচনায় আমার অত্যন্ত অনুরাগ। আমি একথার অর্থ বুঝাইয়া দিতেছি। মন মানবরাজ্যের নেতা ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। কিন্তু মনের শাসনকর্ত্তা কে? শরীর। বেশ করিয়া আমার কথা বুঝিবেন। এই অপরিসীম শক্তিসম্পন্ন শরীর রসায়নবিদের সম্পূর্ণ পদাবনত। যখন কালিদাস মেঘদূতের কল্পনা করিয়া তাহা লিখিতে বসিয়াছিলেন, তখন রসায়নবিৎ জগদীশ চৌধুরী যদি তাঁহার নিত্য খাদ্যের সহিত পদার্থ বিশেষের একটু গুড়া মিশাইয়া দিতে পারিত, তাহা হইলে তাঁহার লেখনী বটতলার অপেক্ষাও জঘন্য ও অপাঠ্য গ্রন্থ প্রসব করিয়া কলঙ্কিত হইত। বৈজ্ঞানিক-চূড়ামণি নিউটনকে জীবিত করিয়া আমার সমক্ষে লইয়া আইস; আমার সুকৌশলে, বৃক্ষ হইতে ফল পতন দেখিয়া মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব তাঁহার মনে উদিত হওয়া দূরে থাকুক, তিনি সেই ফল ভোজন করিয়া বসিয়া থাকিবেন। আর তোমাদের দুর্দ্দান্ত নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে লইয়া আইস, আমি তাঁহার পোলাও-কাবাবের সহিত এমন সামগ্রী মিশাইয়া দিব যে, ভোজনান্তে তিনি অত্যন্ত কোমলপ্রাকৃতিক ভদ্রলোক হইয়া উঠিবেন। আর যে বীরবর প্রতাপসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য, সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ ও প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত, আমার হাতের একটি খিলি খাইলে, 'রক্ষা কর!' 'রক্ষা কর!' শব্দে তিনি আকবর বাদসাহের পদতলে পড়িয়া বিলুণ্ঠিত হইবেন। রসায়ন এমনই অদ্ভুত বিদ্যা! ইহার এইরূপ অপরিসীম ক্ষমতা! কিন্তু এখন এত কথা কেন বলিতেছি? কারণ আমার রাসায়নিক অভিজ্ঞতা উপলক্ষ করিয়া লোকে অনেক কুৎসা রটনা করিয়াছে এবং আমার অভিপ্রায়ের বিপরীত অর্থ কল্পনা করিয়াছে। লোকে বলে, আমি আমার এই বিপুল রাসায়নিক জ্ঞান মুক্তকেশীর উপর প্রয়োগ করিয়াছিলাম এবং সুযোগ হইলে, মনোরমা সুন্দরীর উপরেও তাহা প্রয়োগ করিতাম। উভয়ই অতি ঘৃণাজনক মিথ্যা কথা। অবিলম্বে বুঝিতে পারিবেন যে, মুক্তকেশীর জীবন রক্ষা করাই তৎকালে আমার প্রধান আবশ্যক ছিল এবং যে পাশকরা খুনে, আমার কথা কলিকাতায় বড় ডাক্তার সমর্থন করিতেছেন জানিয়াও জোর করিয়া মনোরমার চিকিৎসা করিতেছিল, তাহার হস্ত হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করাই আমার প্রধান কামনা ছিল। এই ব্যাপারে দুইবার—দুইবার মাত্র আমি রসায়নের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু সে

দুই স্থলে যে দুই ব্যক্তির উপর তাহা প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাঁহাদের কোনই ক্ষতি হয় নাই। একদা একখানি গরুর গাড়ির পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীমতী মনোরমা সুন্দরীর পরম সুন্দর গতি পর্য্যবেক্ষণ রূপ অসীম সুখভোগ করার পর, উক্ত আরাধ্য শত্রু কর্ত্তৃক গিরিবালার হস্ত-ন্যস্ত পত্রদ্বয়ের একখানি এককালে বাহির করিয়া ও অপর খানি নকল করিয়া লইবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। এই স্থলে দুই কাঁচ্চা সামগ্রীর দ্বারা আমার বুদ্ধিমতী পত্নী উপ-দেশানুযায়ী সমস্ত কার্য্য সুনির্ব্বাহিত করেন। আর একবার, রাণী লীলাবতী কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলে, আমাকে রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরে বর্ণিত হইবে। এতদ্ব্যতীত আর কোন স্থলেই আমি রাসায়নিক কোন প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করি নাই। যদি লোকে এবিষয়ে কোন বিরুদ্ধ কথা প্রচার করে, তাহা হইলে আমি এই স্থলে মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ ঘোষণা করিতেছি। এতক্ষণে হৃদয়-ভারের কিছু লাঘব হইল। তার পর?

রোহিণীকে বুঝাইয়া দিলাম যে, মুক্ত-কেশীকে, রাজা প্রমোদরঞ্জনের হস্ত হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য, কলিকাতায় লইয়া যাওয়া আবশ্যক! দেখিলাম রোহিণী অতি আগ্রহ সহকারে এ প্রস্তাবে সম্মত হইল। তাহার পর কলিকাতায় যাত্রার একটা দিনস্থির করি-লাম। সেই দিনে তাহারা রেলে চড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। তখন এদিকের অন্যান্য গোলযোগে মনঃসংযোগ করিবার সময় হইল। রোহিণী কলিকাতায় গিয়া রাণী লীলা-বতীকে আপনাদের ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইবে কথা ছিল। কিন্তু যদিই তাহারা, অনুরূপ অভিপ্রায় করিয়া, পত্র না লিখে, তাহা হইলে কি হইবে? অতএব গোপনে তাহাদের ঠিকানা জানিয়া রাখা আবশ্যক। আমার মনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কে এ কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম? আমার মন উত্তর দিল,—আমার অর্দ্ধাঙ্গ—শ্রীশ্রীমতী রঙ্গমতী দেবী। সুতরাং তাঁহাকেও সেই গাড়িতে চড়িয়া কলিকাতা যাইতে হইল। যখন তিনি যাইতেছেন তখন তাঁহার দ্বারা আরও একটা কাজ সারিয়া লওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে হইল। শ্রীমতী মনোরমা দেবীর পরিচর্য্যার জন্য একজন সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের প্রয়োজন আমার অধীনে এ কার্য্যে অতি নিপুণা রমণী নাম্নী এক স্ত্রীলোক ছিল। তাহার কথা পূর্ব্বেই বলি-য়াছি। আমার স্ত্রীর যোগে তাহাকে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলাম। আমার স্ত্রী, রোহিণী ও মুক্তকেশী এক সঙ্গে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন দেখিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। সেই রাত্রিতে আমার অর্দ্ধাঙ্গ সকল কার্য্য শেষ করিয়া এবং রমণীকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। রোহিণী যথাসময়ে রাণীকে পত্র দ্বারা তাহাদের কলিকাতার ঠিকানা জানাইয়া পাঠাইল। বলা বাহুল্য, ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, আমি সে পত্র হস্তগত করিয়া রাখিলাম।

সেই দিন মনোরমা সুন্দরীর চিকিৎসকের সহিত আমার অনেক বচসা হইল। মূর্খের চিরন্তন নিয়মানুসারে, সে আমাকে নানা অপ্রিয় কথা বলিল; কিন্তু আমি অনর্থক কলহ করিয়া অসন্তোষের বৃদ্ধি করিলাম না।

তাহার পর আমার কলিকাতায় চলিয়া আসার অতিশয় প্রয়োজন উপস্থিত হইল। আগতপ্রায় ব্যাপারের জন্য কলিকাতায় আমার একটা বাসা লওয়া আবশ্যক এবং পারিবারিক কোন কোন প্রশ্নের মীমাংসার জন্য রাধিকা

প্রসাদ রায় মহাশয়ের সহিত একবার স'ক্ষাৎ করাও আবশ্যক। এবং আশুতোষ দের লেনে বাসা স্থির হইল। আনন্দধামে রাধিক বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল।

শ্রীমতী মনোরমা সুন্দরীর পত্রাদি আমি গোপনে খুলিয়া পাঠ করিতাম। সুতরাং আমার জানা ছিল যে, তিনি বর্ত্তমান পারি বারিক অকৌশল নিবারণের জন্য, কিছু দিনের নিমিত্ত রাণী লীলাবতীকে আনন্দধামে লইয়া আসিতে রাধিকা বাবুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমার উদ্দেশ্যের অনুকূল বোধে, আমি এ পত্র নির্ব্বিরোধে যথাস্থানে যাইতে দিয়াছিলাম। অধুনা আমি র ধিকা প্রসাদ রায় মহাশয়ের নিকটস্থ হইয়া মনোরমার প্রস্তাবের সমর্থন করিলাম। বলিলাম যে, এজন্য রাণীকে তাঁহার এক পত্র লেখা আবশ্যক এবং রাণী কলিকাতা হইয়া আসিবার সময় কোথায় রাত্রিবাস করিবেন, সে পত্রে তাহারও ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। কলিকাতায় রাণীর পিসীমার বাসা আছে। সেই বাসাতেই রাণীকে থাকিতে আজ্ঞা করিতে বলিলাম। দেখিলাম, রাধিকাপ্রসাদ রায় লোকটা অতি অপদার্থ। তাহার ন্যায় দুর্ব্বল-চিত্ত লোকের নিকট হইতে কাজ আদায় করিতে আমার মত দুর্দ্ধর্ষ লোকের কতক্ষণ লাগে? আমি তখনই তাহার নিকট হইতে আবশ্যকমত চিঠি বাহির করিয়া লইলাম।

রায় মহাশয়ের পত্র লইয়া কৃষ্ণ সরোবরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, সেই অকর্ম্মণ্য চিকিৎসকের অব্যবস্থায়, মনোরমার পীড়া বড় ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে। বড় ভয়ানক বিকার দাঁড়াইয়াছে। সে বিকার আবার সংক্রামক। রাণী ঠাকুরাণী, পীড়িতার সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য, জোর করিয়া মনোরমা দেবীর ঘরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত আমার মনের কখনই ঐক্য ছিল না। তিনি আমাকে একবার গোয়েন্দা বলিয়া গালি দিয়াছিলেন; তিনি আমার ও রাজার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রধান অন্তরায়। এই সকল কারণে তাঁহার সহিত আমার কোন প্রকার আত্মীয়তা ছিল না। সুতরাং স্বহস্তে যদি তাঁহাকে আমি সেই ঘরে পূরিয়া দিতাম তাহা হইলেও অন্যায় হইত না। কিন্তু, অসামান্য সহৃদয়তা সহকারে আমি তাহা করি নাই। তাঁহার প্রবেশের ব্যাঘাতও ঘটাই নাই। যদি হতভাগা ডাক্তারটা ব্যাঘাত না দিত, তাহা হইলে তিনি সেই ঘরে প্রবেশ করিতেন এবং সম্ভবতঃ সেইরূপ পীড়ায় আক্রান্ত হইতেন। তাহা হইলে আমি এত পরিশ্রম ও কৌশল করিয়া ধীরে ধীরে যে জাল বিস্তার করিতেছি, তাহার আর প্রয়োজন হইত না। কিন্তু তাঁহাকে ডাক্তারটা তথায় যাইতে দিল না।

কলিকাতা হইতে ভাল ডাক্তার আনার কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে সেই দিন ডাক্তার আসিলেন। তিনি আমার সমস্ত কথাই সমর্থন করিলেন। পঞ্চম দিবসের পর হইতে আমার মনোমোহিনী রুগ্নার শুভ লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। এই সময়ে আবার একবার আমাকে কলিকাতায় আসিতে হইল। আশুতোষ দের লেনে বাসার ঠিকঠাক করা, রোহিণী এখনও তাহার বাসায় আছে কি না গোপনে তাহার সন্ধান করা এবং হরেকৃষ্ণের সহিত কোন কোন পরামর্শ করা আমার দরকার ছিল। সকল কাজ সারিয়া, আমি রাত্রিতে আবার ফিরিয়া আসিলাম। আর পাঁচ দিন পরে ডাক্তার বলিলেন যে, পীড়িতার জন্য আর কোন ভয় নাই। এখন বিহিত যত্নে সেবা শুশ্রূষা

করিতে পারিলেই, তিনি ত্বরায় আরোগ্য হইয়া উঠিবেন। এই সময়ে ডাক্তারটাকে তাড়ান নিতান্ত আবশ্যক হওয়ায়, আমি এক দিন তাহার সহিত ভয়ানক ঝগড়া বাধাইয়া দিলাম এবং অনেক গালিগালাজ করিলাম। প্রমোদকে পূর্ব্বেই শিখাইয়া রাখিয়াছিলাম, সে এ কলহে মাথা দিল না। ডাক্তার আর আসিবে না বলিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল। আমিও বাঁচিলাম।

এখন বাড়ীর চাকর চাকরাণীদের তাড়ান দরকার। প্রমোদরঞ্জনকে অনেক শিখাইয়া পড়াইয়া তৈয়ার করিলাম। তিনি কেবল একটা নিতান্ত নির্ব্বোধ ঝি ছাড়া আর সব লোকজনকে জবাব দিবার জন্য, নিস্তারিণীকে হুকুম দিলেন। নিস্তারিণী অবাক্! কিন্তু যাই হউক, বাটী খোলসা হইয়া গেল। যে ঝি থাকিল সে থাকা না থাকা দুইই সমান, কারণ সে নির্ব্বোধের চূড়ামণি; সুতরাং আমাদের অভিসন্ধি বুঝিয়া ফেলা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহার পর নিস্তারিণীকেও কিয়ৎ কালের জন্য স্থানান্তরিত করার আবশ্যক। গিরিবালাকে সন্ধান করার ওজরে, তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইলাম। আমাদের যাহা মনোভীষ্ট তাহা ঠিক হইল।

রাণী উৎকণ্ঠায় নিতান্ত কাতর হইয়া সর্ব্বদা নিজের ঘরে পড়িয়া থাকেন, আর সেই নির্ব্বোধ ঝিটা দিন রাত্রি তাঁহার কাছে থাকে। শ্রীমতী মনোরমা সুন্দরী উত্তরোত্তর আরোগ্য হইতেছেন বটে, কিন্তু এখনও শয্যাগত; রমণী চব্বিশ ঘণ্টা তাঁহার নিকট থাকে আমি, আমার স্ত্রী আর প্রমোদরঞ্জন ছাড়া বাটীতে আর কেহ থাকিল না। সকল দিকে এইরূপ সুবিধা করিয়া, যে খেলা আমি সাজাইয়াছি তাহার আর এক চাইল চালিলাম। ভগ্নীর সঙ্গশূন্য হইয়া রাণীকে যাহাতে একাকিনী শক্তিপুর যাইতে হয়, তাহাই আমার চেষ্টা। মনোরমা সুন্দরী অগ্রে চলিয়া গিয়াছেন, এ কথা যদি রাণীকে না বুঝাইতে পারি, তাহা হইলে তিনি কখনই একাকিনী যাইতে সম্মত হইবেন না। এই কথা তাঁহাকে বুঝাইতে হইবে বলিয়া, রাজবাটীর যে অংশে কোন লোক থাকে না, তাহারই একতম প্রকোষ্ঠে আমরা সেই রুগ্না সুন্দরীকে লুকাইয়া ফেলিলাম। রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে আমি, আমার স্ত্রী ও রমণী এই তিনজনে মিলিয়া এই কার্য্য সম্পন্ন করিলাম। প্রমোদ বড় চঞ্চল, এজন্য তাহাকে ইহার মধ্যে লইলাম না। কি অপূর্ব্ব, কি রহস্যময়, কি নাটকোচিত দৃশ্য! আমার মনোমোহিনী, রোগ মুক্তির পর, প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন। যে যে ঘর দিয়া যাইতে হইবে, আমরা তাহার স্থানে স্থানে আলোক স্থাপন করিলাম এবং দ্বারাদি সমস্ত খুলিয়া রাখিলাম। তাহার পর ধীরে ধীরে খট্টা সমেত রোগিণীকে বহন করিয়া লইয়া চলিলাম। দৈহিক শক্তির আধিক্য হেতু, আমি খট্টার মাথার দিক ধরিলাম, আর রঙ্গমতী দেবী ও রমণী পায়ের দিক ধরিলেন। এই মহামূল্য ভার আমি অপার আনন্দের সহিত বহন করিলাম। আমাদের এই নৈশ লীলা চিত্রিত করিতে পারে, এমন চিত্রকর কে আছে?

ভবনের এক নির্জ্জন ভাগে শ্রীমতী মনোরমা সুন্দরীকে রমণীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া, পর দিন প্রাতে আমি সস্ত্রীক কলিকাতায় আসিলাম। রাধিকাবাবু ভ্রাতুষ্পুত্রীকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন এবং যাহাতে, কলিকাতায় পিসীর বাড়ীতে রাত্রিবাস করিবার জন্য তাঁহাকে উপদেশ দিয়া-

ছেন, কলিকাতায় আসিবার সময়, সে পত্র প্রমোদরঞ্জনের হাতে রাখিয়া আসিলাম এবং তাঁহাকে বলিয়া রাখিলাম, আমার নিকট হইতে সংবাদ পাইলে তিনি যেন সে পত্র তাঁহার রাণীকে দেন। যে বাতুলালয়ে মুক্তকেশী অবরুদ্ধ ছিল, রাজার নিকট হইতে তাহার ঠিকানা জানিয়া লইলাম এবং পলাতকা বন্দিনী পুনরায় ধরা পড়িয়াছে বলিয়া অধ্যক্ষের নামে এক খানি চিঠি লিখাইয়া লইলাম।

আমার বাসায় হাঁড়িকুড়ি পর্য্যন্ত গোছান ছিল; সুতরাং সে বিষয়ে কোন ভাবনা ছিল না। এখন মুক্তকেশী হরিণীকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য, আর এক জাল পাতিলাম। এইখানে তারিখের প্রধান দরকার। আমি সব নখদর্পণে রাখিয়াছি; ঠিক বলিতেছি।

২৫ শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে, কোন উপায়ে রোহিণীকে আগে সরাইবার অভিপ্রায়ে, এক খানি গাড়ি করিয়া আমার অর্দ্ধাঙ্গকে পাঠাইয়া দিলাম। রাণী লীলাবতী দেবী কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং রোহিণীর সহিত কথা কহিতে চাহেন, এই কথা বলিতেই রোহিণী আমার অর্দ্ধাঙ্গের সহিত গাড়িতে উঠিয়া আসিল। তার পর পথিমধ্যে একটা স্থানে একটু বিশেষ দরকার আছে বলিয়া নামিয়া, আমার অর্দ্ধাঙ্গ বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে আমি সুকৌশলে মুক্তকেশীকে বাসায় আনিয়া উপস্থিত করিলাম। মুক্তকেশী তখন হইতে হঠাৎ রাণী লীলাবতী হইয়া পড়িল এবং আমার, লোকজন তাহাকে আমার শ্যালক-পুত্রী এবং আমার পত্নীর ভ্রাতুষ্পুত্রী বলিয়া জানিল।

কিরূপে এই বৃহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিলাম বলি শুন। এদিকে যখন এক অর্দ্ধাঙ্গ রোহিণীকে লইয়া নিযুক্ত, তখন অপর অর্দ্ধাঙ্গ, অর্থাৎ স্বয়ং জগদীশ, রাস্তা হইতে এক ছোকরা ধরিয়া মুক্তকেশীকে এক পত্র পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে লেখা ছিল যে, রাণী লীলাবতী আজিকার দিন রোহিণীকে সঙ্গে রাখিবেন; মুক্তকেশীও যেন পত্রবাহক ভদ্রলোকের সঙ্গে রাণীর নিকট আইসেন। ভদ্রলোক মহাশয় পথে গাড়িতে অপেক্ষা করিতেছেন। যেই সংবাদ পাওয়া সেই মুক্তকেশী আসিল এবং গাড়িতে উঠিল। হরিণী জালে পড়িল। এরূপ স্থলে, এরূপ ভাবে, এই অত্যদ্ভুত ব্যাপারের অভিনয় সম্পন্ন করিয়া আমি একটু আত্মপ্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বল দেখি, তোমার কোন কবি এরূপ অত্যদ্ভুত কাণ্ডের কল্পনা করিতে পারেন? কোন উপন্যাস-লেখক এরূপ অত্যদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ করিতে পারেন?

আশুতোষ দের লেন পর্য্যন্ত আসিতে, পথে মুক্তকেশী একটুও ভীত ভাব দেখাইল না। কেন দেখাইবে? আমি যখন স্নেহের অভিনয় করিব, তাহাতে তখন না গলিয়া থাকিতে পারে এমন লোক কে আছে? আমি তাহাকে ঔষধ দিয়াছি তাহাতে তাহার উপকার হইয়াছে; আমি তাহাকে রাজার হস্ত হইতে পলায়ন করিবার উপায় করিয়া দিয়াছি এবং সম্প্রতি রাণীর সহিত সাক্ষাতের সুযোগ করিয়া দিতেছি, সুতরাং আমার মত বিশ্বাসের পাত্র আর কে আছে? কিন্তু এক বিষয়ে আমি বড় অসাবধান হইয়াছিলাম। সে যে আমাদের বাসায় আসিয়া রাণীকে দেখিতে পাইবে না, এ বিষয়ে তাহাকে কিছু বলিয়া রাখা উচিত ছিল। আমার বাসায় আসিয়া সে যখন উপরে উঠিল, তখন সম্পূর্ণ অপরিচিতা রঙ্গমতী দেবী ভিন্ন আর কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া, সে নিরতিশয় ভীত, কম্পান্বিত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল।

আমি তাহাকে অভয় দিবার বিস্তর চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সেই চিররুগ্না দারুণ হৃদ্রোগে পীড়িতা ছিল, বিজাতীয় অবসাদ হেতু, সেই পীড়ার অধুনা আতিশয্য ঘটিল এবং তাহার আক্ষেপ আরম্ভ হইল—সে মূর্চ্ছিতা হইল। তাহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হওয়া বিচিত্র নহে। আমি বড়ই ভীত হইলাম এবং নিকটস্থ ডাক্তার ভোলানাথ ঘোষ মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইলাম। সৌভাগ্যের বিষয় ডাক্তারটি অতি বিচক্ষণ ও উপযুক্ত। আমি তাঁহাকে বলিয়া রাখিলাম যে, রোগীর বুদ্ধি বড় কম এবং তিনি সময়ে সময়ে বিভীষিকা দেখিয়া প্রলাপ বকিয়া থাকেন। বন্দোবস্ত করিলাম, আমার স্ত্রী ব্যতীত আর কোন পরিচারিকা পীড়িতার নিকট থাকিবে না। কিন্তু অভাগিনীর পীড়া এতই বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, আমাদের ইষ্টানিষ্টজনক কোন কথাই বলিতে তাহার সাধ্য ছিল না। তাহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমার মনে বড়ই ভয় হইল—যদি এই কল্পিত রাণী লীলাবতী, আসল রাণী লীলাবতী কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বেই, মরিয়া যায়।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার হরেকৃষ্ণের বাটীতে উপস্থিত থাকিবার জন্য, আমি রাণীকে পত্র লিখিয়াছিলাম এবং যাহাতে ২৬শে তারিখে রাণী লীলাবতীর কলিকাতায় আসা নিশ্চয়ই ঘটে, রাজাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে লিখিয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি মুক্তকেশীর অবস্থা দেখিয়া, যাহাতে আরও অগ্রে রাণী লীলাবতীর কলিকাতায় আসা হয়, তাহার জন্য আমি ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম। কিন্তু তখন আর উপায় কি? এস্থলে কোন সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া, আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। জগদীশ দিবাকর তৎকালে রাহুগ্রস্ত হইল।

সে রাত্রিতে কল্পিত রাণী লীলাবতীর অবস্থা বড়ই ভাল বোধ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে আমারও হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। আমার পূর্ব্ব পত্রানুসারে কার্য্য হইলে পর দিন বেলা ১২॥• টার গাড়িতে কৃষ্ণ সরোবর হইতে যাত্রা করিয়া ২॥• সময় রাণী লীলাবতীর কলিকাতায় আসিয়া পৌছিবার কথা। এদিকে যখন মুক্তকেশী একদিন বাঁচিবে ভরসা হইতেছে তখন আর ভয় কি? তখন রাণীর জন্য যে সকল বন্দোবস্ত করিতে হইবে তাহাতে মনঃসংযোগ করা আবশ্যক হইল।

বিখ্যাত ব্রাউন কোম্পানির আড়গোড়ায় গিয়া রাণীকে ষ্টেশন হইতে আনিবার নিমিত্ত, একখানি ব্রুহাম ও জুড়ি ঠিক বেলা ২টার সময় যাহাতে আমার বাসায় আসিয়া পৌছে, তাহার অর্ডর রেজষ্টরী করিয়া দিয়া আসিলাম। তাহার পর হরেকৃষ্ণের বাসায় গিয়া যাহাতে রাণী উঠিতে পারেন, তাহারও বন্দোবস্ত করিলাম। তাহার পর কল্পিত মুক্তকেশীর বাতুলতা প্রমাণের জন্য যে দুইজন ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইব মনে করিয়াছিলাম তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কথাবার্ত্তা ঠিক করিলাম। তাঁহারা দুইজনেই অতি ভদ্র লোক। পরের উপকারার্থ তাঁহাদের জীবন দীক্ষিত। তাঁহারা উভয়েই আমার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া, আমার প্রয়োজন মত সার্টিফিকেট লিখিয়া দিতে স্বীকৃত থাকিলেন। এরূপ উদারতা তাঁহাদের অত্যুন্নতির পরিচায়ক। তাঁহারা যথার্থ সাধু। এই সকল ব্যাপার শেষ করিয়া যখন আমি বাসায় ফিরিলাম, তখন ৫টা বাজিয়া গিয়াছে। আসিয়া দেখিলাম সর্ব্বনাশ হইয়াছে—মুক্তকেশী মরিয়া গিয়াছে! ২৫শে মরিয়া গেল—এদিকে ২৬শের এদিকে রাণী কলিকাতায় আসিবেন না। সর্ব্বনাশ

জগদীশনাথ অবাক্! মনে কর কি ভয়ানক ব্যাপার! জগদীশ অবাক্!

তখন যে মালা গোলা গিয়াছে, তাহা না গিলিলে আর উপায় কি! যে চাইল চালা গিয়াছে, তাহা আর ফিরে না। আমি ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই, ডাক্তার ভোলানাথ বাবু কৃপা করিয়া, সৎকারাদির সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আমি কাতর ভাবে, 'বল হরি' বলিতে বলিতে খালি পায়ে সৎকার করিতে চলিলাম। তাহার পর নীরবে ঘটনা-স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলাম।

পরদিন প্রাতে প্রমোদের পত্র পাইয়া জানিলাম সেই দিন ১২॥০ টার ট্রেণে রাণী লীলাবতী কৃষ্ণ সরোবর হইতে যাত্রা করিবেন। যথাসময়ে আড়গোড়া হইতে গাড়ি আসিল। কল্পিত লীলাবতী শ্মশানে ভস্ম করিয়া, আসল লীলাবতীকে আনিবার জন্ত আমি ষ্টেশনে চলিলাম। মুক্তকেশীর যত কাপড় চোপড় সকলই আমি খুলিয়া রাখিয়াছিলাম। তৎসমস্ত গাড়ির মধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম। মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের প্রভাবে জীবিতা রাণী লীলাবতীর শরীরে মৃতা মুক্তকেশীর আবির্ভাব হইবে। কি অদ্ভুত কাণ্ড! বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ উপন্যাস-লেখকগণ! আপনারা এই অত্যদ্ভুত ব্যাপার মনে রাখিবেন।

নিয়মিত সময়ে ষ্টেশনে গিয়া রাণী লীলা-বতীকে গাড়িতে উঠাইলাম। পথে তিনি ভগ্নীর ভাবনায় বড়ই কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এখনই আমার বাসায় ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া আমি তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলাম এবং নিজবাসা বলিয়া তাঁহাকে হরেকৃষ্ণের বাসায় তুলিলাম। যে দুই কর্ত্তব্য-পরায়ণ ভদ্রলোক অপরিসীম সৌজন্ত সহকারে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট দিতে সম্মত ছিলেন, তাঁহারা পাশের ঘরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাণীকে ভগ্নীর বিষয়ে আশ্বস্ত করিয়া, আমি একে একে আমার সেই কর্ত্তব্যপরায়ণ বন্ধু-দ্বয়কে রাণীর সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। তাঁহারা অতি বুদ্ধিমান; সুতরাং সংক্ষেপে সকলই বুঝিয়া লইলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে, মনোরমা দেবীর পীড়ার ভয়ানক বৃদ্ধি হইয়াছে সংবাদ দিয়া, আমি ঘটনা খুব পাকাইয়া তুলিলাম।

যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই হইল। চিন্তা ও ভয়ে রাণী লীলাবতীর মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। রসায়ন-বিদ্যার অসীম ভাণ্ডার হইতে আমাকে অধুনা সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল। এক গ্লাস ঔষধ মিশ্রিত জল ও এক শিশি ঔষধ মিশ্রিত স্মেলিংসল্ট রোগীর হৃদয় হইতে সর্ব্ব-প্রকার ভয় ও ভাবনা অন্তর্হিত করিয়া দিল। রাত্রিতে আর একটু ঔষধের সাহায্যে রাণীর সুনিদ্রার সুযোগ করিয়া দিলাম। রমণী স্বহস্তে রাণীর পরিচ্ছদ বদলাইয়া দিল—মুক্ত-কেশীর পরিচ্ছদ রাণীর দেহে উঠিল। ২৭শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে আমি ও রমণী এই পুনর্জ্জীবিতা মুক্তকেশীকে লইয়া বাতুলালয়ে গমন করি-লাম। ডাক্তারদ্বয়ের সার্টিফিকেট, রাজা প্রমোদরঞ্জনের চিঠি, আকৃতির সমতা, মনের অবসাদ ও অস্থিরতা সকলই অনুকূল হইল, সুতরাং কেহই সন্দেহ করিল না। আসল রাণী লীলাবতীর কাপড় চোপড় মোট মোটারি আমার নিকট ছিল। আমি তৎসমস্ত সযত্নে আনন্দধামে পাঠাইয়া দিলাম।

এই অত্যদ্ভুত ঘটনাপুঞ্জের আখ্যান এই স্থলেই পরিসমাপ্ত হইতেছে। ইহার ফল স্বরূপে আমাদের যে আর্থিক লাভ হইল তাহার বিষয় সকলেই জ্ঞাত আছেন। এই ব্যাপারের—এই কল্পনাতীত

কাণ্ডের রহস্যোদ্ভেদ করিতে ইহজগতে কাহারও সাধ্য হইত না। কেবল আমার দুর্ব্বলহৃদয়তা, আমার প্রগাঢ় প্রেম, সেই সুন্দরীকুলোত্তমা মনোরমার প্রতি আমার অত্যধিক আন্তরিক অনুরাগ, আমার কঠোরতা ও অতি সাবধানতা বিনষ্ট করিয়াছিল; তাহাতেই আজি আমি পরাজিত, আজি আমাদের অবস্থার এই বিপর্য্যয়! পাছে সেই ব্যথিতা সুন্দরীর হৃদয়-বেদনা সংবর্দ্ধিত হয় এই ভয়ে গর্ম্ভদ হইতে তাঁহার ভগ্নী পলায়ন করিলে, আমি তাঁহাদের অনুসরণ করি নাই। আমার সেই একগুঁয়ে পরলোকগত বন্ধুর প্রাণান্ত হওয়ার পর, আমি যখন বাতুলালয়ের অধ্যক্ষকে তাহার পলাতকা বন্দিনীকে ধরিয়া দিব বলিয়া ডাকিয়া আনিয়াছিলাম, তখনও সেই অদম্য প্রেম সেই কোমলতা আমাকে অভিভূত করিল। আমি উদ্দেশ্য সাধনে পরাঙ্মুখ হইলাম। পাঠক! এই পরিপক্ক কঠোর-হৃদয় বৃদ্ধের হৃদয়-উদ্যান একবার দর্শন কর। দেখিবে তথায় প্রেমময়ী শ্রীমতী মনোরমা সুন্দরীর প্রতিমূর্ত্তি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত রহিয়াছে। ইচ্ছা হয় যুবকবৃন্দ, বদনে কাপড় দিয়া হাস্য কর, আর সুন্দরীগণ! কৃপা করিয়া, আমার দুঃখে এক বিন্দু অশ্রু বর্ষণ কর।

আর একটা কথা বলিয়া আমি এই লোমহর্ষণ বৃত্তান্তের উপসংহার করিব। আমি বুঝিতে পারিতেছি, কৌতূহলপরবশ লোকেরা এখনও তিনটী বিষয়ে সন্দিগ্ধ আছেন। তাঁহাদের প্রশ্নত্রয় ও তাহার উত্তর নিম্নে লিখিতেছি।

প্রথম প্রশ্ন। শ্রীমতী রঙ্গমতী দেবী আমার একান্ত অনুগত এবং আমার ইচ্ছা পূরণার্থ অতীব দুষ্কর কর্ম্ম সাধনেও কখন পশ্চাৎপদ নহেন। এরূপ হইবার কারণ কি? যাহারা আমার চরিত্র ও প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কোন কথাই বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু অন্য লোকের জন্য বলিতেছি, অনুরূপ ভৈরবী পশ্চাতে না থাকিলে, কোন ভৈরবই সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পারেন না। শক্তির সাহায্য না পাইলে পুরুষ অকর্ম্মণ্য। স্বামী সাক্ষাৎ দেবতা এবং অবিচলিত চিত্তে তাঁহার সেবা ও বাসনা পূরণই স্ত্রীর ধর্ম্ম। ইহাই না তোমাদের ধর্ম্মনীতি? তবে আর জিজ্ঞাসা কর কেন? আমার ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রী ধর্ম্মসূত্র বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এস্থলে সনাতন ধর্ম্মের পূর্ণানুষ্ঠান ঘটিয়াছে। ছিঃ? তবে তোমরা এসম্বন্ধে কথা কহ কেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন। যে সময়ে মুক্তকেশীর মৃত্যু হইয়াছিল, যদি তখন তাহার মৃত্যু না হইত তাহা হইলে আমি কি করিতাম? যদি রাণী লীলাবতী কলিকাতায় আসার পরও মুক্তকেশীর মৃত্যু না হইত, তাহা হইলে আমাকে কি করিতে হইবে? তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ নিঃসঙ্কোচে তাহার যাতনাময় জীবনের অবসান করিয়া সুখময় চির শান্তির উপায় করিয়া দিতাম। তাহা হইলে সেই মানসিক ও দৈহিক রোগগ্রস্তা দুঃখিনীর দেহাবরোধ-নিবদ্ধ আত্মাকে পরম স্পৃহণীয় মুক্তি প্রদান করিয়া সুখী করিতাম। ইহার আবার জিজ্ঞাসা কি?

তৃতীয় প্রশ্ন। সমস্ত ঘটনা ধীরভাবে আলোচনা করিলে, আমার চরিত্র কি নিন্দনীয় বলিয়া মনে হইতে পারে? আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, কদাপি না। এই ব্যাপারের মধ্যে আমি বিহিত বিধানে অকারণ পাপানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি রসায়ন-বিদ্যার সাহায্যে অক্লেশে রাণী লীলাবতীর জীবনা-

বসান করিতে পারিতাম। বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া, বহু কৌশল উদ্ভাবিত করিয়া নিরন্তর বহু যত্ন করিয়া আমি এত কল পাতিয়াছিলাম কেন? কেবল নিষ্পাপ থাকিবার অভিপ্রায়ে। আমার কৃতকার্য্য ও যাহা আমি করিলে করিতে পারিতাম এতদুভয়ের আলোচনা কর—বুঝিতে পারিবে আমি কত ধর্ম্মাত্মা—কিরূপ সাধু পুরুষ।

লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম আমার এই প্রবন্ধ অসাধারণ সামগ্রী হইবে। তাহাই হইয়াছে। যেমন ব্যাপার তদনুরূপ বর্ণনা হইয়াছে কি না, সাধারণে বিচার কর। ইতি।

শ্রীজগদীশনাথ চৌধুরী।

[অবিমুক্ত বারাণসী ধামের ধর্ম্ম সভার অন্যতম সভ্য, হরিদ্রা নগর জ্ঞান-প্রচারিণী সভার সম্পাদক, বিরাটপুর নীতিসঞ্চারিণী সভার সভাপতি, কৈবল্যনগরের জমিদার, লাঘব গ্রামের বিজ্ঞান সভার পৃষ্ঠপোষক, ভূতপূর্ব্ব 'হিন্দু' পত্রিকার সম্পাদক ইত্যাদি ইত্যাদি।]

দেবেন্দ্রনাথ বসুর কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চৌধুরীর লিখিত কাগজ সমূহের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে দেখিলাম যে, আধঘণ্টা আমার অপেক্ষা করিয়া থাকিবার কথা, তাহা উত্তীর্ণ হইয়াছে। হরেকৃষ্ণ মস্তকালোলন করিয়া আমাকে প্রস্থানের অনুমতি দিল। আমি তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলাম। হরেকৃষ্ণ বা রমণীর আর কোন কথা ইহজীবনে আমি শুনি নাই। ধীরে ধীরে অলক্ষিত ভাবে, তাহারা পাপের উত্তর সাধকতা করিতে আমাদের সম্মুখীন হইয়াছিল। আবার ধীরে ধীরে, অলক্ষিত ভাবে তাহারা কোথায় অন্তর্ধান হইল, কে বলিতে পারে?

অত্যল্পকাল মধ্যে আমি পুনরায় গৃহাগত হইলাম। অতিঅল্প কথায় লীলা ও মনোরমাকে এই বিপজ্জনক ব্যাপারের বৃত্তান্ত বিদিত করিলায এবং অতঃপর আমাদের কি করিতে হইবে, তাহারও আভাষ দিলাম। বিস্তারিত বিবরণ পরে বিবৃত হইবে বলিয়া আমি তখন তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম এবং অবিলম্বে ব্রাউন কোম্পানির আড়গোড়ায় গমন করিলাম। আমার প্রয়োজন অতি গুরুতর একথা জানাইয়া, আমি তাঁহাদের খাতা হইতে একটি সংবাদ জানিবার প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। খাতা বাহির করিয়া তাঁহারা দেখাইয়া দিলেন, ১৮ই জুন অর্থাৎ ২৬শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে, খাতার ঘরে ঘরে নিম্নলিখিত কয়টি কথা লিখিত আছে:—

"ব্রুহাম ও জুড়ি। জগদীশনাথ চৌধুরী। ৫ নং আশুতোষ দের লেন, সিমুলিয়া। বেলা ২। ১৬। জাফর কোচম্যান।"

উক্ত জাফর কোচম্যানের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা জানাইলে, তাঁহারা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"গত জ্যৈষ্ঠ মাসে তুমি সিমুলিয়া, ৫নং আশুতোষ দের লেন হইতে একটি বাবুকে শিয়ালদহ ষ্টেশনে লইয়া গিয়াছিলে মনে আছে কি?'

জাফর উত্তর দিল,—"হাঁ হুজুর, খুব মনে আছে।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"কেন এ কথা তোমার মনে থাকিল?"

সে উত্তর দিল,—"আজ্ঞে, মনে থাকিবে না কেন? একটা ভয়ানক লম্বা চৌড়া লোক সে দিন গাড়িতে সোওয়ার হইয়াছিল। সে কথা সহজে ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। লোকটার কথাবার্ত্তাও কি এমন মিষ্ট! বড় মানুষের এমন ভাব আর কখন দেখি নাই। সে বাবুজি এখন কোথায় আছেন ধর্ম্মাবতার?"

আমি বলিলাম,—"তিনি এখন কলিকাতায় নাই।"

সে বলিল,—"আমি তাঁর জানালার কাছে একটা কাকাতুয়া টাঙ্গান দেখিয়াছিলাম। কি চমৎকার কাকাতুয়া মহাশয়! কত কথাই পাখীটা বলে।"

আমি বলিলাম,—"ঠিক কথা, তাঁহার কাকাতুয়া ছিল বটে। তার পর, তুমি ষ্টেশনে গাড়ি লইয়া গেলে?"

"আজ্ঞে হাঁ, সেই মোটা বাবু গাড়িতে উঠিলেন। আমি শিয়ালদহ ষ্টেশনে গাড়ি লইয়া গেলাম। একজন রাণীকে সেখান হইতে আনিবার কথা ছিল। সে রাণীর নাম কি ভাল? আমার মনে আছে—বলিতেছি, আমি—হাঁ—রাণী লীলাবতী। ঠিক, তাঁর নাম রাণী লীলাবতীই বটে, তা আমার বেশ মনে আছে। আমরা রাজা, রাণী, কি বড় লোকের কাজ একবার করিলে, কখন নাম ভুলি না। কখন কোন উপলক্ষে বখশিসটা আশটা পাওয়ার আশাতেও বটে, আর পরে আবশ্যক হইলে চাকরি বাকরির আশাতেও বটে, আমরা নাম মনে করিয়া রাখি।"

আমি বলিলাম,—"ঠিক কথা; যাঁহাকে আনা হইয়াছিল, তাঁহার নাম রাণী লীলাবতী বটে।"

এ পর্য্যন্ত জাফর যাহা বলিল তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তারিখের কথা সে বলিতে পারে না, প্রয়োজনও নাই। এই আড়গোড়ার রেজিষ্টরী বহিতে তারিখের চূড়ান্ত প্রমাণ আছে। তখনই আমি খাতা হইতে সেই অংশের নকল তুলিয়া লইলাম। আড়গোড়ার অধ্যক্ষকে সমস্ত কথা জানাইলে, তিনি তাহাতে একটা নাম সহি ও কারবারের মোহর করিয়া দিলেন; জাফর কোচম্যানকে আমি দুই তিন দিনের জন্য লইয়া যাইব। সে জন্য কারবারের যে ক্ষতি হইবে তাহার পূরণ স্বরূপে টাকা জমা দিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট চিত্তে দুই তিন দিনের জন্য জাফরকে বিদায় দিলেন।

তদনন্তর আমি সেখান হইতে রমেশ বাবুর বাসায় আসিলাম এবং তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলাম। ঐ ব্যক্তিই যে রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী তাহা তিনি বুঝিলেন এবং তাহাকে আইনের সাহায্যে দণ্ডিত করিবার কোনই উপায় নাই, তাহাও তিনি স্বীকার করিলেন। কিন্তু এই সংবাদ জানিতে পারিয়া আমার যে কার্য্য উদ্ধার হইয়াছে, তজ্জন্য তিনি অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমি তাঁহাকে জানাইলাম যে, সত্বর আমি, আমার স্ত্রীর স্বরূপত্ব সমর্থন করিবার জন্য, আনন্দধামে যাইব; তাঁহাকেও তদুপলক্ষে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। বলা বাহুল্য, তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাহাতে সম্মত হইলেন; কিন্তু শেষে অবকাশাভাবে ঘটিয়া উঠিল না।

রমেশের বাসা হইতে বিদায় হইয়া, আমি উকীল করালী বাবুর আফিসে গমন করিলাম এই অনুসন্ধান ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার প্রারম্ভে, আমি করালী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ

করিয়াছিলাম। তখন তিনি আমাকে নিতান্ত অভরসার কথা বলিয়াছিলেন, আর বলিয়াছিলেন যে, "যদি আপনি কখন মোকদ্দমা খাড়া করিতে পারেন, তাহা হইলে জানিবেন, আমি আপনাকে সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত সাহায্য করিব।" আজি আমি মোকদ্দমা খাড়া করিতে পারিয়াছি; আজি সকল প্রকার অকাট্য প্রমাণ আমার হস্তগত। এতদিন পরে, আজি আবার আমি করালী বাবুর আফিসে চলিলাম। তখন ঐ দুই পাপিষ্ঠকে বিহিত বিধানে দণ্ডিত করিবার সংকল্প ছিল। এখন আর সে সংকল্প নাই; কারণ এখন উভয়েই আমার আয়ত্তাতীত হইয়াছে। তাহা হউক, লীলার স্বরূপত্ব সংস্থাপন ও তাঁহার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়া সর্ব্বসাধারণের হৃদয় হইতে এই বিজাতীয় প্রতারণাজাত ভ্রান্তির অপনোদন করা আমার ঐকান্তিক কামনা। যত শীঘ্র সম্ভব, তাহা সফলিত করিতে পারিলেই আমি পূর্ণ মনস্কাম হই। লীলা তাঁহার পিতৃব্যের আলয়ে—সেই আনন্দধামে—সর্ব্বজন কর্ত্তৃক স্বীকৃত ও আদৃত হইলেই, আমার সকল বাসনা চরিতার্থ হয়। উমেশ বাবুর অনুপস্থিতিতে অধুনা করালী বাবুরই এই বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক।

করালীবাবু আমার অনুসন্ধানের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ও তাহার বর্ত্তমান ফলাফল জ্ঞাত হইয়া যেরূপ অপরিসীম বিস্ময় প্রকাশ করিলেন ও আমার যত্ন, উদ্যোগ ও কার্য্যপ্রণালীর যেরূপ প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ এস্থলে লিপিবদ্ধ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। বলা বাহুল্য যে, তিনি তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে এই অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন।

পরদিন প্রাতে লীলা, মনোরমা, করালী বাবু, তাঁহার একজন মুহুরী, জাকর কোচম্যান এবং আমি আনন্দধামের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। যতক্ষণ পর্য্যন্ত লীলার স্বরূপত্ব সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত না হয় এবং সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে ৺প্রিয়প্রসাদ রায়ের দুহিতা শ্রীমতী লীলাবতী দেবী বলিয়া স্বীকার না করে, ততক্ষণ যে খুল্লতাতের ভবন হইতে তিনি একদা অপরিচিতের ন্যায় অপমানিত ও বিদূরিত হইয়াছেন, তাঁহার সেই পিতৃব্য-ভবনে তাঁহাকে কদাপি লইয়া যাইব না, ইহাই আমার দৃঢ় সংকল্প। তদভিপ্রায়ে, আপাততঃ তারার খামারে লীলার অবস্থিতির ব্যবস্থা করিবার জন্য, মনোরমাকে পরামর্শ দিলাম। তারামণি, আমাদের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, এতই বিস্ময়াবিষ্ট হইল যে, তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে। যাহা হউক, সেখানে তাঁহাদের অবস্থিতির ব্যবস্থা করিয়া, করালী বাবু ও আমি, রাধিকা বাবুর সহিত সাক্ষাতের বাসনায়, আনন্দধামে গমন করিলাম।

হৃদয়হীন, স্বার্থপর রাধিকাবাবু আমাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলেন এবং আমাদের উদ্দেশ্য জ্ঞাত হইয়া যেরূপ পাষণ্ডের ন্যায় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, তাহা মনে করিলেও লজ্জা ও ঘৃণা হয়। কিন্তু আমরা কোন দুর্ব্যবহারে বিচলিত না হইয়া, তাঁহাকে আমাদের কথায় কর্ণপাত করিতে বাধ্য করিলাম। তখন তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল যে, এই ভয়ানক চক্রান্তের সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বস্তুতই তিনি যার-পর নাই অভিভূত হইয়াছেন এবং নিতান্ত ছেলেমানুষটীর মত বলিতে লাগিলেন "যখন লোকে বলিল, আমার ভাইঝি মারা গিয়াছে, তখন আমি কেমন করিয়া বুঝিব যে,

সে এখনও বাঁচিয়া আছে? আমরা তাঁহাকে একটু ঠাণ্ডা হইতে সময় দিলে, তিনি তাঁহার প্রাণের অধিক লীলাকে সাদরে গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন। তা সে জন্ত এত তাড়াতাড়ি কেন? তিনি তো আর মরিতে বসেন নাই যে, এখনই এ কাজ না সারিলে কোন মতেই চলিবে না। পুনঃ পুনঃ তিনি এইরূপ পাগলামির ও হৃদয়হীনতার কথা কহিয়া আমাদিগকে জ্বালাতন করিতে লাগিলেন। আমি সবিশেষ দৃঢ়তা সহকারে তাঁহার এই সকল পাগলামী বন্ধ করিয়া দিলাম। আমি জোর করিয়া বলিলাম, হয় তিনি স্বেচ্ছায় সরল ভাবে, সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর প্রতি সুবিচার করুন, নয় তাঁহাকে আইনের সাহায্যে আদালতে টানিয়া লইয়া গিয়া, তাঁহার দ্বারা আমরা আবশ্যক মত কাজ আদায় করিয়া লইব। তিনি করালী বাবুর দিকে কাতর ভাবে দৃষ্টিপাত করিলে, করালী বাবুও আমারই কথার সমর্থন করিলেন। তখন অগত্যা তিনি, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, আমাদের ব্যবস্থা মত কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন।

করালী বাবু ও আমি সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম এবং ঢোল ফিরাইয়া, প্রজাবর্গের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলাম যে, রাধিকা বাবুর হুকুম, তাহাদের সকলকে পরশু তারিখে আনন্দধামে আসিতে হইবে। ইত্যবসরে আমি অতি সরল ভাষায় ও সংক্ষেপে এই চক্রান্তের একটা বিবরণ লিখিয়া রাখিলাম।

নিয়মিত দিন উপস্থিত হইল। আনন্দধাম সংলগ্ন প্রান্তর লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সন্নিহিত প্রদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এই অত্যদ্ভুত কাণ্ডের বৃত্তান্ত শুনিতে ও লীলাকে দেখিতে সমাগত হইয়াছে। একটা উচ্চ বারান্দার উপর আমাদের বসিবার জন্ত চেয়ার পাতা ছিল। শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়কে আমরা জোর করিয়া সেই স্থানে ধরিয়া আনিয়াছিলাম। তাঁহার দুই দিকে দুই জন খানসামা—একজনের হাতে স্মেলিংসল্টের সিসি, আর এক জনের হাতে গোলাপ জলের বোতল। রায় মহাশয়ের নিজের হাতে ওডিকঁলো ভিজান রুমাল।

আমরা সেই স্থানে সমবেত হওয়ার পর, শ্রীমতী মনোরমা দেবী লীলাবতীকে সঙ্গে করিয়া তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র সমবেত ব্যক্তিগণ তুমুল আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। সেই কলরবে রায় মহাশয়ের মূর্চ্ছা হইবার মত হইয়া উঠিল। অনেক কষ্টে, অনেক গোলাপজল প্রয়োগে এবং স্মেলিংসল্টের সাহায্যে, তিনি সে যাত্রা কোনরূপে সামলাইয়া উঠিলেন।

আমি উচ্চস্বরে ধীরে ধীরে আমার লিখিত বৃত্তান্ত ও প্রমোদরঞ্জনের পত্র পাঠ করিলাম। জাফর কোচম্যান ও তাহার বক্তব্য বিশদরূপে ব্যক্ত করিল। উকিল বাবুও আইন-সঙ্গত ব্যাপার, অতি মিষ্ট কথায়, বুঝাইয়া দিলেন। কাহারও মনে তিলমাত্র সন্দেহ থাকিল না। সকলেই মহানন্দে মগ্ন হইল। তাহার পর শ্রীমতী বরদেশ্বরী দেবীর প্রতিমাপার্শ্বস্থ সেই স্মারক চিহ্ন সর্ব্বসমক্ষে ভগ্ন ও বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলাম; রায় মহাশয় মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন; সুতরাং তাঁহাকে কয়েকজন ধরাধরি করিয়া উপরে লইয়া গেল। এদিকে "যতো-ধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল নিনাদিত হইতে লাগিল।

আমরা সকলে আনন্দধামে কিছু কালও থাকি, স্বার্থপর, স্বকীয় সুখাভিলাষী, স্বজন-সঙ্গ-বিরোধী রাধিকাপ্রসাদ রায়ের কদাপি তাহা অভিপ্রায়-সঙ্গত ও বাসনানুগত হইতে পারে

না, ইহা আমরা বেশ জানি ও বুঝি। বিশেষতঃ আমরাও তাদৃশ গলগ্রহ রূপে সেখানে একদিনও থাকিতে ইচ্ছুক ছিলাম না। যে কার্য্যের জন্ত আমরা আসিয়াছিলাম, সে কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হওয়ার পর, আমরা রায়মহাশয়ের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলাম। হৃদয়হীন রাধিকাবাবু একটা মৌখিক শিষ্টাচারও করিলেন না। বলিলেন—"তা—তা বেশ—তা আচ্ছা!" আমরা সেই দিনই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। আসিবার সময় বিস্তর লোক আমাদের সঙ্গে জয়ধ্বনি করিতে করিতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিল।

এত দিনের যত্ন ও অধ্যবসায় সফল হইল। আমাদের দারিদ্র্যই আমাদের এতাদৃশ শুভ পরিণামের একমাত্র কারণ। ধনবান্ হইলে আমরা কদাপি এরূপ ভাবে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতাম না; নিশ্চয়ই তাহা হইলে আমরা আদালতে বিচার প্রার্থী হইতাম। কোনরূপ অকাট্য প্রমাণাভাবে আমাদের নিশ্চয়ই পরাজয় হইত। যে যে উপায়ে প্রমাণসমূহ ও আভ্যন্তরিক বৃত্তান্তসমূহ আমরা জানিতে পারিলাম, আইনের সাহায্যে তাহা জানিতে পারিতাম কি? আইনের সাহায্যে হরিমতির সহিত সাক্ষাৎ হইত না। আইনের সাহায্যে কখনই রমেশের অতীত কাহিনী জানিয়া, চৌধুরীকে বাধ্য করিয়া সকল সংবাদ আদায় করিতে পারিতাম না। হে করুণাময় বিশ্বজীবন! আমাদিগকে দরিদ্র করিয়া তুমি আমাদের মনোরথ সিদ্ধির উপায় করিয়া দিয়াছ। তোমার অপার করুণাবলে আজি লীলা পরিচিন্তা, পুনর্জীবিতা দুঃখ-বিহীনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আর দুইটি ক্ষুদ্র ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইলেই বর্ত্তমান উপন্যাস পরিসমাপ্ত হয়।

এই সুদীর্ঘ পরিশ্রম ও উৎকণ্ঠার পর—সমস্ত বিঘ্নবিপত্তি বিদূরিত হওয়ার পর—আশার সফলতা হেতু সকলই সুখময় হওয়ার পর, আমার একবার স্থান ও দৃশ্য পরিবর্ত্তন করিতে বাসনা হইল। লীলা ও মনোরমা উভয়েই আমার প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। স্থির হইল, এলাহাবাদ যাইব। প্রিয়বন্ধু রমেশ বাবু এই কথা শুনিয়া, যাইবার জন্ত ক্ষেপিয়া উঠিলেন। বড়ই ভাল হইল। এরূপ অকৃত্রিম বন্ধুসহ দেশভ্রমণে অধিকতর আনন্দ জন্মিবে তাহার সন্দেহ কি? আমরা মহানন্দে দুই বন্ধুতে রেলে উঠিলাম এবং যথাসময়ে এলাহাবাদ পৌঁছিলাম।

এলাহাবাদে আমরা একটা বাসা ভাড়া করিলাম এবং সানন্দে চারিদিকে দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। একদিন মধ্যাহ্নকালেই আমি বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাব করিলাম; কিন্তু রমেশ তাহাতে সম্মত হইলেন না। সুতরাং আমাকে একাকী যাইতে হইল। দুই এক ঘণ্টা পরেই আমি প্রত্যাগত হইলাম। বাসায় আসিয়া দেখিলাম, ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া রমেশ কাহার সহিত কথা কহিতেছেন। এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া আমার মনে যৎপরোনাস্তি কৌতূহল জন্মিলেও রমেশকে উত্যক্ত করা হইবে আশঙ্কায়, আমি বারান্দায় অপেক্ষা করিয়া থাকিলাম। দুই একটা কথাও আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি শুনিতে পাইলাম,

রমেশ বলিতেছেন,—"বটে! বাবা সুরেশ, তুমি খুব চিনিয়াছ তো! তোমার উৎসাহ ও অধ্যবসায় দেখিয়া আমি বড় আনন্দিত হইয়াছি। এত দিন পরে আমার মনের কালী মিটিয়াছে। ভগবান তোমায় সুখে রাখুন। তুমি আজিই কলিকাতায় যাইতেছ, যাও। আমিও হয়ত আজিই ফিরিব।" এই কথার পর ঘরের দরজা খুলিয়া গেল এবং গণ্ডদেশে দাগযুক্ত সেই যুবা পুরুষ গৃহ-নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি, আমাকে চিনিতে পারিয়া, মস্তকান্দোলন করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে বড় শ্রান্ত ও কাতর বোধ হইল। আমি তৎক্ষণাৎ রমেশের ঘরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম রমেশ বড় প্রফুল্ল ও আনন্দযুক্ত। তিনি আমাকে দর্শনমাত্র আমার গলা জড়াইয়া বলিলেন,—"আজি আমার বড়ই সুসংবাদ! আজি ২৫ বৎসর পরে, আমি আমার সেই অভাগিনী ভগ্নীর একমাত্র সন্তানের সন্ধান পাইয়াছি। আমার সেই ভাগিনেয় এই চলিয়া গেল; এখন কলিকাতায় যাইবে। কলিকাতায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তাহার নাম সুরেশ। অতি শিষ্ট শান্ত খাসা ছেলে হইয়াছে।"

রমেশের চক্ষুতে আনন্দাশ্রু দেখা দিল। এ সংবাদে বস্তুতই আমি নিরতিশয় আনন্দিত হইলাম। আমি সমুচিত কথায় আমার আন্তরিক আনন্দ ব্যক্ত করিলাম।

তাহার পর রমেশ বলিলেন,—"আরও এক অতি ভয়ানক সংবাদ আছে; রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী ওরফে জগদীশনাথ চৌধুরী খুন হইয়াছে।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"খুন হইয়াছে? কে খুন করিল?"

রমেশ বলিলেন,—"তাহা জানি না। আমার ভাগিনেয় কলিকাতায় তাহার সন্ধান পায় এবং সেই দুর্ব্বৃত্তই যে জগদীশনাথ চৌধুরী সাজিয়া কলিকাতায় আছে, তাহাও জানিতে পারে। সে তদবধি অপরিসীম অধ্যবসায় সহকারে তাহার অনুসরণ করে। আজি সুরেশ দেখিয়া আসিয়াছে, কর্ণেলগঞ্জের নিকটে, কে তাহার বুকে ছোরা মারিয়া নিপাত করিয়াছে। তাহার মৃতদেহ এখনও তথায় পড়িয়া আছে।

আমি বসিয়া পড়িলাম ভগবন্! তোমার বিচার কি অব্যাহত! কিছুতেই তোমার সূক্ষ্মদর্শী ন্যায় বিচারের অন্যথা হইবার নহে। যে ঘোর দুষ্কর্ম্মান্বিত মহাপাপী স্বীয় অসামান্য বুদ্ধি-বিদ্যা-বলে আমাদের হস্ত অতিক্রম করিয়া, রাজশাসনের চক্ষে ধূলি দিয়া সংসার রাজ্যে বিচরণ করিতেছিল, তোমার ন্যায়-বিচারকের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে তাহার সাধ্য হইল না। তুমি আজি অন্যের অলক্ষিত ভাবে, তাহার প্রতি তোমার ন্যায়-দণ্ড প্রয়োগ করিয়া, তোমার সর্ব্বদর্শিতার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছ। হা ভ্রান্ত মানব! কৃপাময়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, নিস্তারের আশা করা নিতান্তই মত্ততা। তখন আমি রমেশকে বলিলাম,—"চল ভাই, আমরা একবার স্বচক্ষে দেখিয়া আসি। হয় ত সুরেশের ভ্রান্তি হইয়া থাকিবে।"

রমেশ বলিলেন,—"না ভাই, ও সম্বন্ধে সুরেশের ভ্রান্তির কোনই সম্ভাবনা নাই। তথাপি চল, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া আসাই সৎপরামর্শ।"

আমরা উভয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম কর্ণেলগঞ্জের এক গাছতলায় লোকারণ্য। মধ্যস্থলাভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য, লোকে ঠেলাঠেলি করিতেছে। যাহারা ফিরিয়া আসিতেছে, তাহাদের কেহ

বলিতেছে, "কি চেহারা!" কেহ বলিতেছে, "হায়! হায়!" কেহ বলিতেছে, "নিশ্চয়ই একটা রাজা!" কেহ বলিতেছে, "বাঙ্গালা মুল্লুকের রাজা।" আমরা অতি কষ্টে, ভিড় ঠেলিয়া দেখিতে পাইবার মত স্থানে, উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম চৌধুরীর প্রাণহীন বৃহৎ দেহ, ভূশয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। সেই উন্নত সুপ্রশস্ত ললাট, সেই কৃষ্ণ কুঞ্চিত ঘন কেশরাশি, সেই গৌরবর্ণোদ্ভাসিত সুগঠিত মুখশ্রী, সেই কুপথ-চালিত অপরিসীম জ্ঞান ও বুদ্ধির নিকেতন-স্বরূপ বিশাল মস্তক অধুনা ধূলিধূসরিত হইয়া ভূতলে নিপতিত। সেই প্রবঞ্চনার রঙ্গভূমি, যুগপৎ হাস্য ও রোদন নিপুণ, পরমশোভাময় নয়নদ্বয় মৃত্যু- কালিমায় সমাচ্ছন্ন ও মুদ্রিত! সেই বিলাসিতার বিশাল ক্ষেত্র, সেই সুখসেবিত দেহ এখন জীবনশূন্য ও সংজ্ঞা-বিহীন। সেই অসাধারণ বুদ্ধি-বিদ্যা-সম্পন্ন ব্যক্তি স্বার্থের জন্য হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া, আর কার্য্য-সমুদ্রে ঝাপ দিবেন না; ন্যায়ান্যায় বিচার বিহিত হইয়া, পরানিষ্টের কল্পনায় আর প্রমত্ত হইবে না এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান-বর্জ্জিত হইয়া, পাপপঙ্কে আর পরিলিপ্ত হইবে না। এইরূপে—এই ভয়ানক ভাবে তাহার জীবন নাটকের যবনিকাপাত হইল। তাহার সুবিশাল বক্ষঃস্থলের বাম ভাগে ছুরিকা ঘাতের গভীর চিহ্ন রহিয়াছে। সেই আঘাতেই তাহার জীবনান্ত সাধন করিয়াছে। শরীরের আর কুত্রাপি কোনরূপ আঘাত চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। সন্নিহিত প্রদেশ রুধিরে প্লাবিত ক্ষতমুখ হইতে তখনও শোণিত প্রবাহিত হইতেছে। কে তাহাকে হত্যা করিল, কে এই জঘন্য উপায়ে বৈরনির্য্যাতন-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিল, পুলিশ তাহার কোন সন্ধানই করিতে পারিল না। চৌধুরী যদিও রমেশ ও আমার ঘোরতর অনিষ্ট করিয়াছে, তথাপি তাহার এতাদৃশ পরিণাম দেখিয়া, আমরা নিতান্ত ক্লিষ্ট হইলাম এবং সে দৃশ্য অধিকক্ষণ দর্শন করিতে আমাদের আর প্রবৃত্তি হইল না। আমরা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। সেই দিনই আমরা এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় আসিলাম।

চৌধুরী-পত্নী রঙ্গমতী দেবী এই ঘটনার পর, এলাহাবাদ হইতে একদিনের জন্যও স্থানান্তরে গমন করেন নাই। প্রতিদিন প্রাতে ও সায়ংকালে সন্নিহিত জনগণ দেখিতে পাইত, যে স্থানে চৌধুরী নিহত হন, এক অবগুণ্ঠনবতী প্রবীণা কামিনী সেই স্থলে, ভক্তি সহকারে প্রণাম করিতেন এবং উভয় হস্তে তত্রত্য ধূলি গ্রহণ করিয়া মস্তকে স্থাপন করিতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ধীরভাবে আমাদের জীবন-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। দরিদ্র হইলেও, আমরা পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। এক বৎসর পরে আমার এক নয়নবিনোদন পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া, আমাদের সংসার আরও সুখময় ও আনন্দময় করিয়া দিল। আমরা সকলেই অপরিসীম আনন্দে ভাসমান হইলাম; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মনোরমার আনন্দের সীমা থাকিল না। মনোরমার সেই সুকুমারকায় প্রফুল্ল প্রসূনবৎ শিশুকে ক্রোড়ে

ধারণ করিয়া একদিন আমাকে বলিলেন,—"জান দেবেন্দ্র, খোকা কথা কহিতে শিখিলে কি বলিবে?" খোকা মধুর ভাষায় ও মধুর স্বরে বলিবে, "যাদের মাচি নেই তালা কায় কি?"

আমি বলিলাম,—"কেবল খোকাই কি ঐ কথা বলিবে? খোকার বাপ মা এখনও বলিতেছে, এবং চিরদিনই বলিবে, যাদের মনোরমা দিদি নাই, তাহারা বাঁচে কেমন করিয়া?"

ক্রমে ৬ মাসে আমরা খোকার অন্নপ্রাশনোৎসব সমাধা করিলাম। প্রিয় সুহৃৎ রমেশ বাবু, তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র, পরম শুভানুধ্যায়ী করালী বাবু, রোহিণী ঠাকুরাণী, তারামণি এই কয়জন আত্মীয় তদুপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া আমাদের ক্ষুদ্র ভবনে সমাগত হইলেন। উমেশ বাবুকে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম; কিন্তু নিতান্ত অসুস্থতা হেতু তিনি আসিতে সক্ষম হন নাই। এই আখ্যায়িকার প্রথমাংশে উমেশ বাবুর যে কথা বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহা তিনি এই সময়ে আমার অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

অন্ন প্রাশনের পর, কার্য্যোপলক্ষে, আমাকে কিছু দিনের নিমিত্ত, ঢাকায় যাইতে হয়। প্রথম প্রথম আমি নিয়মিতরূপে হয় মনোরমার, না হয় লীলাবতীর পত্র পাইতাম। কিন্তু আমি কখন ফিরিব তাহার স্থিরতা না থাকায়, শেষ কয়দিন আমাকে আর পত্রাদি লিখিতে বারণ করিয়াছিলাম। গোয়ালন্দ হইতে সন্ধ্যার পর যে গাড়ি ছাড়ে আমি তাহাতেই কলিকাতায় ফিরিলাম। অতি প্রত্যূষে আমি বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু এ কি! বাসায় জন-প্রাণী নাই—নীরব। লীলা নাই, মনোরমা নাই, খোকা নাই!

বাসার সম্মুখস্থ দোকানদার আমাকে দেখিয়া বলিল,—"বাবু আসিয়াছেন? মা ঠাকুরাণীরা আপনার জন্য এই পত্র রাখিয়া গিয়াছেন।" এই বলিয়া সে আমাকে একখানি পত্র দিল। তৎপাঠে আমি অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। লীলা তাহাতে লিখিয়াছেন যে, তাঁহারা আনন্দধামে গিয়াছেন। কেন গিয়াছেন, তাহার বিন্দুবিসর্গও উল্লেখ করিতে মনোরমা বারণ করিয়াছেন। যে মুহূর্ত্তে আমি ফিরিয়া আসিব, তৎক্ষণাৎ আনন্দধামে যাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছে এবং তথায় গমনমাত্র সমস্ত ব্যাপার আমি জানিতে পারিব বলিয়া আমাকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। ভয় বা চিন্তার কোনই কারণ নাই; একথাও স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে; পত্রে আর কিছুই নাই।

তৎক্ষণাৎ আমি পুনরায় শিয়ালদহ ষ্টেশনাভিমুখে ধাবিত হইলাম এবং বৈকালে আনন্দধামে পৌঁছিলাম। আমি যখন সেই স্থানে শিক্ষকতা করিতাম, তখন যে ঘর আমার ব্যবহার্থ নির্দ্ধারিত ছিল, দেখিলাম লীলা-মনোরমা সেই ঘরেই অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। যে স্থানে, যে চেয়ারে বসিয়া, আমি লেখা পড়া করিতাম, এক্ষণে সেই স্থানে ও সেই চেয়ারে মনোরমা খোকাকে কোলে লইয়া বসিয়া আছেন। খোকা একটা চুষী কাঠি চুষিতে চুষিতে, লাল ফেলিয়া, তাঁহার কাপড় ভিজাইয়া দিতেছে। আর আমি যে টেবিলে কাজ করিতাম, তারই পাশে দাঁড়াইয়া লীলা, সেই অতীত কালের অনুরূপ ভাবে, একখানি ছবির বহির পাতা উল্টাইতেছেন।

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলাম,—"ব্যাপার

কি? তোমরা এখানে কেন? রাধিকা বাবু জানেন কি——"

আমার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মনোরমা বলিলেন যে, রায় মহাশয় হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। তাহার পর করালী বাবু, তাঁহাদিগকে অবিলম্বে আনন্দধামে আসিতে বলিয়াছেন।

এতক্ষণে আমার মনে প্রকৃত অবস্থার ছায়াপাত হইল। আমি সম্পূর্ণরূপে তাহা হৃদগত করিবার পূর্ব্বে, লীলা সকৌতুকে ও ঈষৎ হাস্য সহকারে, আমার মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে, গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—"হুজুরের নিকট একটা কৈফিয়ৎ না দিলে আমাদের অপরাধ কোন রকমেই মাপ হইবে না দেখিতেছি? কাজেই ধর্ম্মাবতারের সন্তোষের জন্য, আমাকে পূর্ব্ব কথার উল্লেখ করিতে হইতেছে।"

মনোরমা বলিলেন,—"তাই বা কেন? ভবিষ্যতের কথাতেই আরও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সেই চঞ্চল শিশুসহ মনোরমা গাত্রোত্থান করিলেন এবং আমার সম্মুখস্থ হইয়া, আনন্দাশ্রু-প্লাবিতনেত্রে কহিলেন,—"বল দেখি, দেবেন্দ্র আমার কোলে কে?"

আমি বলিলাম,—"যদিও তোমাদের আজিকার কাণ্ড দেখিয়া আমি পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছি, তথাপি আমার এমন বুদ্ধিভ্রংশ হয় নাই যে, আমি নিজের ছেলে চিনিতে পারি না।"

সেই অতীত কালের ন্যায় সরলতা ও প্রফুল্লতা সহকারে, মনোরমা সমুৎসাহে বলিলেন,—"বঙ্গদেশের মধ্যে একজন গণ্যমান্য প্রধান জমিদারের বিষয়ে ওরূপ ভাবে কথা কহা তোমার উচিত নয়। সাবধান করিয়া দিতেছি, ভবিষ্যতে বিশেষ হুসিয়ার হইয়া কথাবার্ত্তা কহিবে। জান তুমি ইনি কে? নিশ্চয়ই তুমি জান না। ইহাঁর পরিচয় বলিতেছি শুন। এই খোকা বাবু শক্তিপুরের জমিদার, আনন্দধামের একমাত্র মালিক। এখন চিনিতে পারিয়াছেন কি মহাশয়? খবরদার!"

আমাদের সুখে ও দুঃখে, বিপদে ও সম্পদে যিনি সাহস ও ভরসা, আনন্দ ও উৎসাহ রাশি লইয়া যিনি প্রতিনিয়ত উপস্থিত; যাহার স্নেহের সীমা নাই, করুণার সীমা নাই এবং মমতার সীমা নাই; যে দেবী আমাদের রক্ষয়িত্রী, সৌভাগ্যপ্রতিষ্ঠাত্রী এবং সর্ব্ববিষয়ের নিয়ন্ত্রী সেই আনন্দময়ীর উল্লিখিত শুভময়, সুখময়, প্রেমময় কথার পর আর বলিবার কথা কি থাকিতে পারে? আনন্দে আমার হস্ত বিকম্পিত হইতেছে—লেখনী হস্ত-ভ্রষ্ট হইতেছে!

তৃতীয় ভাগ সমাপ্ত

—»•«—

সোণার কমল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, গ্রাম্য স্কুল হইতে এণ্টান্স পাস করিয়া, শ্রীমান্ বিনোদ-বিহারী রায়, প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িবার অভিপ্রায়ে, কলিকাতায় আসিলেন। তিনি ধনীর সন্তান, সুতরাং তাঁহার নিমিত্ত কোন সুব্যবস্থার অভাব হইল না। সিমুলিয়ায় ভদ্রপল্লীর মধ্যে একটী সুন্দর বাসায় তিনি অবস্থান করিতে লাগিলেন; তাঁহার জন্য এক জন শিক্ষক ও অভিভাবক, পাচক, ভৃত্য ও দ্বারবান, নিযুক্ত হইল। বুদ্ধিমান্ ও অনুরাগী বালক বিশেষ প্রশংসার সহিত ফাষ্ট আর্টস্ ও বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। যখন বিনোদ ফিপ্থ ইয়ার্ ক্লাসে অধ্যয়ন করেন, তখন দৈবাৎ এক অচিন্তিত-পূর্ব্ব অপ্রত্যাশিত ঘটনা উপস্থিত হইল। সেই ঘটনা তাঁহার নয়ন-সমক্ষে সুখময় ও আনন্দময় নন্দনকাননের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল এবং ক্রমশঃ তাহাকে সর্ব্বতোভাবে আয়ত্ত করিয়া, কঠোর কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতারিত করিল।

এক দিন মধ্যাহ্ন কালে, এক সহাধ্যায়ীর বাটী হইতে ফিরিবার সময়, বিনোদ একটী সরু গলির মধ্য দিয়া আসিতেছিলেন। সেই গলিতে একটী ক্ষুদ্র ভবনের দ্বারে আদালতের কয়েক জন পেয়াদা ও এক জন ফিরিঙ্গী একত্র হইয়া বড়ই গোলযোগ করিতেছিল। বিনোদ দেখিলেন, তাহারা বাটীর মধ্য হইতে, কতক-গুলি জিনিষ পত্র আনিয়া বাহিরে ফেলিয়াছে এবং বাটীর মধ্যস্থিতা এক বিধবা ভদ্র-মহিলাকে উচ্চৈঃস্বরে তিরস্কার করিতেছে; মহিলা, ক্ষুদ্র অঙ্গনের এক পার্শ্বে অধোমুখে দাঁড়াইয়া, নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছেন। অবগুণ্ঠনে তাঁহার বদনের ভূরিভাগ আচ্ছন্ন।

জনতা ভেদ করিয়া, বিনোদ সেই মহিলার নিকটস্থ হইলেন এবং বিনীতস্বরে বলিলেন,—"মা, আমি আপনার পুত্র। কি হইয়াছে, বলুন। আমি সাধ্যমত প্রতিকারের চেষ্টা করি।"

সংক্ষেপে ও ধীরভাবে সেই বিধবা নারী ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলেন। বিনোদ বুঝিলেন আর্থিক অপ্রতুলতা হেতু, কয়েক খানি অলঙ্কার বন্ধক দিয়া, এই বিধবা নারী কিছু টাকা ধার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অলঙ্কার বিক্রয় করিয়াও মহাজনের টাকা শোধ না হওয়ায়, সে বাকী টাকার নিমিত্ত এই মহিলার অজ্ঞাত-সারে, তাঁহার নামে নালিশ করিয়া ডিক্রী করে। অদ্য সেই ডিক্রী জারি করিয়া,

আদালতের লোকের দ্বারা, তাহার প্রাপ্য টাকার অপেক্ষা অনেক অধিক মূল্যের সামগ্রী লইয়া যাইতেছে। তাহাতেও মহিলার বিশেষ কাতরতার কারণ ছিল না; কিন্তু তন্মধ্যে তাঁহার স্বর্গগত স্বামীর কয়েকটী প্রিয় সামগ্রী ছিল। পবিত্র স্মৃতির নিদর্শন-স্বরূপে, মহিলা, সেই সামগ্রীগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তিনি সেই কয়টী দ্রব্য রাখিবার নিমিত্ত সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছেন; কিন্তু ডিক্রীদার ও আদালতের লোকেরা, জিনিসগুলি ফিরাইয়া দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছে।

বিনোদ, সমস্ত কথা শুনিয়া, বেলিফ্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার ডিক্রী কত টাকার?"

বেলিফ উত্তর দিল, "পঁচিশ টাকা বারো আনা।"

তাহার পর মহিলার নিকটস্থ হইয়া, বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনাদের ঘরে দোয়াত কলম আছে কি মা?"

তিনি উত্তর দিলেন,—"আছে।"

বিনোদ বলিলেন,—"এক বার তাহা চাহি।"

অদূরে মহিলার দাসী দাঁড়াইয়াছিল। ইঙ্গিত-অনুসারে সে উপর হইতে দোয়াত ও কলম লইয়া আসিল। বিনোদ, তৎসমস্ত লইয়া, বেলিফের নিকটে গিয়া বলিলেন,—"ওয়ারাণ্টের পৃষ্ঠে সমস্ত টাকার রসিদ লিখিয়া দেও। আমি টাকা দিতেছি।"

বিনোদ টাকা বাহির করিলেন। বেলিফ্‌ রসিদ দিয়া টাকা লইল। পেয়াদারা হতাশ ভাবে এক জন অপরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। কয়েক জন মুটিয়া ডাকা হইয়াছিল তাহারা মনে মনে বিনোদকে গালি দিতে লাগিল। সকলে চলিয়া গেল।

ওয়ারাণ্ট দেখিয়া বিনোদ বুঝিলেন, মহিলার নাম শ্রীমতী তারাসুন্দরী দাসী। তিনি সেই কাগজ মহিলাকে প্রদান করিয়া বলিলেন,—"আপনার দেনা মিটিয়া গিয়াছে মা। আর কোন জিনিষই কেহ লইয়া যাইবে না" তাহার পর সেই ঝির দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তুমি বুঝি এই বাড়ীতে কাজ কর? এস না, জিনিস গুলি ধরাধরি করিয়া বাড়ীর মধ্যে আনিয়া ফেলি।"

উভয়ে মিলিয়া জিনিষ পত্র বাটীর মধ্যে ফেলিলেন। তাহার পর বিনোদ, সেই মহিলার নিকটস্থ হইয়া, বলিলেন,—"এখন তবে আসি মা?"

সাশ্রু-নয়না তারাসুন্দরী, রাস্তার ধারের দরজা, বন্ধ করিয়া, বলিলেন,—"বুঝিলাম বাবা, তুমি যথার্থ মহাপুরুষের সন্তান। দেবতার সন্তান না হইলে, কখনই এমন দেবত্ব হয় না। এখনই যাইতে পাইবে না; একটু বসিয়া—দুইটা কথাবার্ত্তা কহিয়া যাইবে। আমার সহিত উপরে আইস।"

বিনোদ কোন আপত্তি করিলেন না। তারাসুন্দরী বিশৃঙ্খলভাবে পতিত সেই সামগ্রীরাশির মধ্য হইতে, একটা বাঁধা হুকা, একটী রূপার ডিবা, এক যোড়া খড়ম ও একটা টুপি বাছিয়া লইলেন। তাহার পর ঝিকে অবশিষ্ট সামগ্রী যথাস্থানে রাখিতে আদেশ দিয়া, বিনোদকে সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিলেন। তথায় এক অপ্সরীসদৃশী রূপসী কিশোরী ব্যাকুল ভাবে দ্বারের প্রতি চাহিয়া বসিয়া আছেন। তারাসুন্দরী গৃহে প্রবেষ করিয়া বলিলেন, —"মা, বিজলী, আমাদের সব জিনিষই আছে"

বিজলী, অতিশয় ব্যস্ততার সহিত, মাতার হস্ত হইতে পিতার খড়ম গ্রহণ করিলেন এবং প্রথমে তাহা মস্তকে, পরে বক্ষে স্থাপন করিয়া বলিলেন,—"আমার সেই স্বর্গগত পিতা ইহা পায়ে পরিতেন। কেমন করিয়া এ সব জিনিষ ফিরিয়া পাইলে মা? ফিরিয়া পাইবার তো কোন উপায় ছিল না।"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"এক দেবতা আমাদের সহায় হইয়াছিলেন। দেবতার সাহায্যে কি না হইতে পারে?"

বিনোদ তখন তারাসুন্দরীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলেন; এই জন্য বিজলী তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। এক্ষণে তারাসুন্দরী, একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া, বলিলেন,—"ইনিই সেই দেবতা।"

সেই স্কন্দ-কান্তি-মোহন যুবাকে সহসা সম্মুখে দেখিয়া, যুবতী সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন এবং অধোমুখে জননীকে জিজ্ঞাসিলেন,—"ইনি কে মা?"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"জানি না কে।" যুবকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"এস বাবা, তোমাকে, আদর করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। আমাদিগের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ। প্রাণের আশীর্ব্বাদ ভিন্ন তোমাকে দিবার কিছুই নাই। ভগবান নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল করিবেন। তুমি রাজ-রাজেশ্বর হইবে।"

অগত্যা বিনোদকে কিয়ৎকালের নিমিত্ত তথায় থাকিতে হইল এবং সংক্ষেপে আপনার পরিচয়ও দিতে হইল। হরিপুরের ৺ হরিদাস রায় তাঁহার পিতা, তিনি এখানে কলেজে পড়েন, নিকটেই তাঁহার বাসা, তাঁহার নাম শ্রীবিনোদবিহারী রায় ইত্যাদি বৃত্তান্ত তিনি জানাইলেন। অনেক প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া বিনোদ বুঝিলেন যে তারাসুন্দরী ও তাঁহার কন্যা এখানকার অধিবাসী নহেন; পল্লীগ্রামে তাঁহাদের পূর্ব্ব-নিবাস। তাঁহারা কায়স্থ; নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন; তাঁহাদের অন্য পরিচয় নিতান্ত ক্লেশজনক; সুতরাং তাহা তাঁহারা ব্যক্ত করিতে বাসনা করিলেন না। আবশ্যক হইলে ভবিষ্যতে তাঁহারা জীবনের অতীত কাহিনী বিনোদকে জানাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাঁহারা নিঃসহায়; কিন্তু একান্ত সৎ ও নির্ম্মল-স্বভাব। পিতৃহীনা দুরবস্থাপন্না কন্যার এখনও বিবাহ হয় নাই।

বিদায় কালে বিনোদকে দয়া করিয়া, সময়ে সময়ে তাঁহাদের সন্ধান লইবার নিমিত্ত তারাসুন্দরী কাতর ভাবে অনুরোধ করিলেন। বলা বাহুল্য, বিনোদ সানন্দে সেই অনুরোধ পালনে সম্মত হইলেন।

বিনোদ প্রস্থান করিলেন। যে অবস্থায় ও যে ভাবে এই স্থানে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই অবস্থায় ও সেই ভাবে তিনি ফিরিতে পারিবেন কি? না। প্রাণের অনেক জিনিষ হারাইয়া, কত অজ্ঞাত—পূর্ব্ব সুখের এবং আনন্দের কল্পনা ও আশায় হৃদয়কে মাতাইয়া, তিনি ফিরিয়া আসিলেন। বিজলীর রূপ, তাঁহার ভঙ্গী, তাঁহার কণ্ঠস্বর, বিনোদের সম্মুখে এক সুখময়, অদৃষ্টপূর্ব্ব, কল্পনারাজ্যের মোহময় পথ খুলিয়া দিল। তিনি যেন আত্মহারা হইয়া পড়িলেন।

বিনোদ, এই ঘটনার পর হইতে, তারাসুন্দরী ও বিজলীর পরমাত্মীয়রূপে পরিগণিত হইয়া উঠিলেন এবং তদবধি, সময় ও সুযোগ উপস্থিত হইবামাত্র, তিনি বিজলীদের বাটীতে যাতায়াত করিতে থাকিলেন। পরিচয় ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল এবং অচিরকালমধ্যে যুবক ও যুবতী পরস্পরের প্রেমে আকণ্ঠ ডুবিয়া পড়িলেন।

প্রণয়-শাস্ত্রে যে যে বিধান আছে, এ ক্ষেত্রে তাহার কোনই অন্যথা হইল না। উপযুক্ত ভূমিতে, সমুচিত সময়ে, প্রণয়ের বীজ পড়িয়া সহজেই অঙ্কুরিত হইল। প্রতিনিয়ত জলসেক ও যত্ন করায়, অচিরে তাহা বাড়িয়া উঠিল এবং কোনরূপ বিঘ্ন বাধা না পাইয়া অবিলম্বে পত্র-পুষ্প সুশোভিত মনোহর পাদপে পরিণত হইয়া উঠিল।

কত সময়েই তাঁহাদিগের নির্জ্জনে সাক্ষাতের সুবিধা হইত; কত সময়েই তাঁহাদের প্রাণের কথা পরস্পরকে জানাইবার সুযোগ ঘটিত এবং কত সময়েই তাঁহারা পরস্পরের বুদ্ধি, বিবেচনা ও চরিত্রবলের মহোচ্চতা পরীক্ষা করিবার অবসর পাইতেন। প্রত্যেকেই আপনাকে অপরের অপেক্ষা অযোগ্য এবং একান্ত হীন বলিয়া মীমাংসা করিতেন; সুতরাং এ ক্ষেত্রে নিরতিশয় মধুময়, মোহময়, পবিত্র প্রেমেরই উদ্ভব হইল, একথা বলাই বাহুল্য।

তারাসুন্দরী যুবক-যুবতীর এই ভাব লক্ষ্য করিতে পারিলেন না, এমন নহে। এই বর্দ্ধমান প্রেমের স্রোত নিরুদ্ধ করিতে তাঁহার বাসনা হইল না; কিন্তু নিদারুণ চিন্তায় তিনি আকুল হইয়া রহিলেন। বিবাহ-সঙ্ঘটনের শত সহস্র প্রতিবন্ধক তিনি দেখিতে থাকিলেন। অদৃষ্ট নিতান্ত প্রসন্ন না হইলে, এরূপ শুভ সম্মিলন ঘটিবে না ইহাও তিনি বুঝিলেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি কন্যাকেও ইহার আভাস দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিনোদ এম্, এ, পাস করিলেন। কিন্তু কথাটা বলাই ভাল—এবার আর তিনি প্রথম বিভাগের উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিলেন না। গেজেটে দ্বিতীয় বিভাগে এম্ এর তালিকায় তাঁহার নাম প্রকাশিত হইল। কেবল আইন শুনিবার জন্য প্রাতে এক এক বার কলেজে যাওয়া ছাড়া, তাঁহার আর কলিকাতায় থাকিবার প্রয়োজন রহিল না।

ক্রমে সুদীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশ আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রাণের প্রাণ বিজলীকে নিত্য দর্শনের সুযোগ ছাড়িয়া, বিনোদকে এবার বাটী যাইতে হইবে। এই দীর্ঘাবকাশ কলিকাতায় কাটাইবার ওজর কিছুই নাই। মা কোন কথাই শুনিবেন না; দাদা আর বউ দিদি ঝগড়া করিবেন। বিশেষতঃ বড়ই আদরের, বড়ই স্নেহের বিধবা ভগ্নী অপরাজিতা, সুদীর্ঘ কালের পর, বাপের বাড়ী আসিয়াছেন; তাঁহার সহিত দেখা করিবার নিমিত্ত কলেজ বন্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই যাওয়া উচিত ছিল! ছুটীর সময় না যাওয়া নিতান্ত অসম্ভব। অতএব বাটী যাইতেই হইবে এবং অন্ততঃ একমাস কাল বিজলীর কাছ ছাড়া হইয়া থাকিতেই হইবে। অতীব উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে, তারাসুন্দরী ও বিজলীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে, বিনোদ তাঁহাদিগের আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিজলী একাকিনী উপরের ঘরে বসিয়াছিলেন। বিনোদ ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—"তুমি একা বসিয়া আছ বিজু? মা কোথায়?"

বিজলী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এত পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা থাকিলেও, একাকিনী বিনোদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে তাঁহার বড়ই লজ্জাবোধ হইতে লাগিল মুখ রক্তবর্ণ হইল; লজ্জা সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলিল। অধোমুখে অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"মা নীচে স্নান করিতে গিয়াছেন।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমাকে আজি বাড়ী যাইতে হইবে। তাই তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

বিজলীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিনোদকে দর্শন করিয়া, বিনোদের সহিত কখন কখন এক একটী কথা কহিয়া, বিজলী শোক ও দুঃখ, দুরবস্থা ও দারিদ্র্য সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতেই অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। অনেক সুখের কল্পনা হৃদয়ে লইয়া, প্রাণের ভিতর অনেক আনন্দের পুঁতুল ভাঙ্গিয়া ও গড়িয়া, তিনি বড়ই সন্তোষের সহিত কাল কাটাইতেছেন। অভাগিনীর কপাল দোষে সে সুখের রাজ্য বুঝি আজি ভাঙ্গিয়া যায়। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসিলেন—"বাড়ীতে কত দেরী হইবে?"

বিনোদ উত্তর দিলেন,—"অন্ততঃ এক মা ”

তবু ভাল! বিজলীর প্রাণ কতকটা আশ্বস্ত হইল। এক মাস দীর্ঘ সময় বটে; কিন্তু কষ্টে স্বষ্টে কাটিতে পারে। বলিলেন,—"দয়া করিয়া, নিজগুণে, এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে আমাকে এক একবার মনে করিবে কি?"

বিনোদ ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন,—তোমার অনুরোধ আমি রক্ষা করিতে পারিব না। এক একবার তোমাকে মনে করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে। হৃদয় অনবরত যাহাকে ধ্যান করে, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যাহার স্বর্ণকান্তি অনপনেয় অঙ্কে অঙ্কিত, মন যাহার অশেষ গুণরাশি অনুচিন্তনে প্রতিনিয়ত ব্যাপৃত, সেই সর্ব্ব-শোভাময়ী বিজলীকে আমি এক একবার স্মরণ করিব, এরূপ কঠোর প্রতিজ্ঞায় কখনই আবদ্ধ হইতে পারিব না।"

পূর্ণ হৃদয়ের পূর্ণ প্রেমের কথা। বিজলী ইহার অনুরূপ উত্তর দিতে অশক্ত। উত্তর মনে আসিয়াছিল, কিন্তু মুখে আসিল না। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—তুমি হয় তো পরিণাম চিন্তা করিতেছ না।"

বিনোদ বলিলেন,—আমি একবারও পরিণাম চিন্তায় উদাসীন নহি। তুমি আমার হৃদয় রাজ্যের রাজেশ্বরী। স্থির সঙ্কল্প করিয়াছি বিজু' তোমাকে সহধর্ম্মিণী করিয়া, আমি জীবনকে অচ্ছেদ্য সুখের নিগড়ে বাঁধিয়া ফেলিব। সংসারের কোন বিঘ্ন-বাধা আমাকে এই সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করিতে পারিবে না। প্রাণেশ্বরি, হৃদয়দেবি, আমার এই বিদায়-কালে, তোমার অভিপ্রায় কৃপা করিয়া ব্যক্ত কর।"

বিজলী নিরুত্তর। মনের আবেগে তখন তিনি উন্মাদিনী। ভাষায় সে হৃদয়-ভার পরিব্যক্ত করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। তাঁহার চক্ষুতে জল আসিল। তখনই বিনোদের চরণ-তলে লুণ্ঠিত হইয়া, আপনাকে তাঁহার ক্রীতদাসী বলিয়া স্বীকার করিবার জন্য বিজলীর হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল; কিন্তু তিনি নিরুত্তর। সকাতরে বিনোদ পুনরায় বলিলেন,—"বুঝিতেছি দেবি, আমি অতি হীন, নিতান্ত অযোগ্য। আমার এ সঙ্কীর্ণ ও কুৎসিত হৃদয়ক্ষেত্র তোমার ন্যায় দেবীর নিমিত্ত মন্দির প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত স্থান নহে। কিন্তু আমি সকল কথা ভুলিয়াই নিতান্ত প্রগল্‌ভ আশায় প্রমত্ত হইয়াছি এবং আপনার অপূর্ণতার

বিচার না করিয়াই, এই দুরাশা-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি। অতঃপর তুমি ইচ্ছা করিলে এই জীবনকে চিরানন্দময় ও সুখের নিকেতন করিতে পার, অথবা ইহার আশা ভরসা বিচূর্ণ করিয়া ইহাকে চির-দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া দিতে পার। বল দেখি, বল করুণাময়ি, আমার জন্য তুমি কোন্ গতি স্থির করিতেছ?"

বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। বিজলী কাঁপিতে কাঁপিতে বিনোদের চরণ সমীপে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—"জানি না, কোন্ পুণ্যবলে এই ঘৃণিত কুসুম দেবপূজায় ব্যবহৃত হইবার কথা হইতেছে; জানি না, কোন্ সুকৃতি ফলে এই পথের মৃত্তিকা দ্বারা রাজমুকুট-নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে। তোমার সহধর্ম্মিণী—তোমার জীবনসঙ্গিনী! বড়ই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা। বড়ই লজ্জাজনক দুরাশা! এ অভাগিনীর সে স্পর্দ্ধা নাই। তোমার দাসীর দাসী হইয়া চরণের এক প্রান্তে স্থান পাইলেই আমি আপনাকে ভাগ্যবতীগণের অগ্রগণ্যা জ্ঞান করিব। কিন্তু"—

আবার বিজলীর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। নিতান্ত ব্যাকুলতার সহিত বিনোদ বলিলেন,—"কিন্তু কি? বল, বল, বিজলি! কিন্তু কি? আমাকে স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুনরায় নরকে নিক্ষেপ করিও না।"

বিজলী বলিলেন,—"কিন্তু আমি মা'র মুখে শুনিয়াছি তোমার সহিত আমার বিবাহ সঙ্ঘটন অসম্ভব। আমরা অপরিচিত দরিদ্র। তুমি রাজরাজেশ্বর; রূপে গুণে, ধনে, মানে অতুলীয়। এরূপ বৈষম্য স্থলে বিবাহ করিতে, তোমার আত্মীয়গণ, কখনই মত দিবেন না।"

বিনোদ ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন,—"এই কথা! আমার প্রাণ এতক্ষণ উড়িয়া গিয়াছিল। তোমার এ কথার কোনই মূল্য নাই। আমার মা, আমার দাদা আমাকে বড়ই ভাল বাসেন। যাহাতে আমি সুখী হই, তাহাই তাঁহারা করিয়া থাকেন! আমার প্রবল বাসনার বিরোধে, তুচ্ছ ধন-সম্পত্তির জন্য বা অবস্থার বৈষম্য হেতু, কখনই তাঁহারা আপত্তি করিবেন না। তোমার মার নিকট শুনিয়াছি, তোমাদের সহিত আমাদিগের ঘরে মিল আছে। আর কোন কারণই তো আমাকে এ রত্ন বক্ষে ধারণে বঞ্চিত করিবে না।"

বিজলী বলিলেন,—"আমি বলিতে পারি না। বোধ হয় আরও আপত্তি আছে। বিবাহ না হয়, নাই হইবে। এ দাসী চিরদিন মনে মনে তোমারই চরণের দাসী হইয়া থাকিবে। বিবাহের দুরাশা আমি কোন দিনই মনে স্থান দিই নাই। বিবাহ হউক বা না হউক, সে জন্য আমার বিশেষ চিন্তাও নাই। তুমি আমার ইষ্ট দেবতা; বিবাহ না হইলেও, কল্পনায় তোমার সেবিকা ও সঙ্গিনী হইয়া আমি পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করিব এবং মনে মনে নিরন্তর তোমাকে ধ্যান করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিব। আর কিছু আমি জানি না।"

বিনোদ বাহু প্রসারণ করিয়া বিজলীকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইতেছিলেন; কিন্তু তারাসুন্দরী উপরে উঠিতেছেন বুঝিতে পারিয়া, নিরস্ত হইলেন। বিজলী উঠিয়া একটু দূরে দাঁড়াইলেন। তারাসুন্দরী প্রবেশ করিলেন।

বিনোদ বলিলেন,—"মা, আমাকে আজই বাটী যাইতে হইবে; প্রায় একমাস বিলম্ব হইতে পারে; আপনাদের নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"এবার অনেক দিন বাড়ী যাও নাই; এই দীর্ঘ ছুটিতে বাড়ী যাওয়াই আবশুক। আমরা বহু বিষয়েই তোমার মুখাপেক্ষী। তোমাকে দিনান্তে একবারও দেখিতে না পাইলে, আমাদের বড়ই কষ্ট হইবে। বাটী হইতে দুই একদিন অন্তর একখানি করিয়া পত্র লিখিলে আমরা বড়ই সুখী হইব।"

বিনোদ বলিলেন—"নিশ্চয়ই পত্র লিখিব। অনুরোধ করিতেছি, আপনাদিগের কোনরূপ বিপদ বা অমঙ্গলের সূচনা হইলে, আমি যেন তৎক্ষণাৎ সংবাদ পাই। বিজলী, তোমাকেই এ ভার গ্রহণ করিতে হইবে। বল, সামান্ত অনিষ্টের আশঙ্কা হইলেই তুমি আমাকে সংবাদ দিবে!

বিজলী সম্মতিসূচক মস্তকান্দোলন করিলেন। বিনোদ তারাসুন্দরীকে প্রণাম করিলেন,—"তবে বিজু, আমি যাই।"

বিজলী নিরুত্তর—অধোমুখ। তারাসুন্দরী বলিলেন,—"আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সকল মনোরথ সফল হউক।"

ধীরে ধীরে বিনোদ প্রস্থান করিলেন। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলার' জগজ্জয়ী কবি কালিদাসের লেখনী-চিত্রিত দুষ্মন্ত, যখন কণ্ মুনির আশ্রম-পালিতা বল্কলবসনা শকুন্তলার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার হৃদয়ের যে ভাব হইয়াছিল, এই অধম লেখকের ক্ষুদ্র নায়কের ক্ষুদ্রহৃদয়ও যে অধুনা তদ্রূপ আলোড়িত হইতে থাকিল, এ অনুমান অসঙ্গত নহে। সুতরাং :—

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিবকেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥"

কালিদাসের এই অতুলনীয় বাক্যের সাহায্যে, আমরা বিনোদের বর্ত্তমান মনের অবস্থা কেন না পরিস্ফুট করিতে সাহসী হইব?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মধ্যাহ্ন কালে, হরিপুরে রায়দিগের প্রকাণ্ড ভবনের এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া বিনোদ লেখাপড়া করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে অনেক কাগজ, খাতা, কলম ও দোয়াত; চারি দিকেই ছোট বড় অনেক পুস্তক; কোন খানি খোলা, কতক গুলি বোজান। পড়া শুনা আর ভাল লাগিল না। পুস্তক হইতে নয়ন অপসারিত করিয়া, উভয় হস্ত দ্বারা কেশগুলিকে নাড়িতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ চিন্তার পর, বলিয়া, উঠিলেন,—"সময় হইয়াছে,—জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য সাধনের সময় আসিয়াছে। বয়সের অল্পতা, সময়ের অনুপযোগিতা কিছুই আর প্রতিবন্ধক নহে। কে জানে সে অন্বেষণে আমার জীবনে কি বিপদ ঘটিবে। বিবাহের পূর্ব্বে —নিরপরাধা নারীকে জীবনসঙ্গিনী করিবার পূর্ব্বে, এই ব্রত সমাপ্ত করিতে হইবে। বাঁচি বা মরি, এই কার্য্যই অধুনা অবলম্বনীয়। ছি! এ অবস্থায় প্রেমের কথা, সুখের চিন্তা, সাধের কল্পনা শোভা পায় না। এইবার কলিকাতায় যাওয়ার পর বিজলীর নিকট বিদায় লইয়া এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইব। ইহারই ফলের উপর আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত ব্যবস্থা নির্ভর করিতেছে।" আবার তিনি

পুস্তক পাঠে মনঃসংযোগ করিলেন। তাঁহার হস্তস্থিত পুস্তক "Jeffrey on Beauty and Taste" একটু পড়ার পর এ পুস্তক পড়িতে আর ভাল লাগিল না। উপন্যাস বাহির করিলেন। পুস্তকের নাম,"Henry Dunbar" গ্রন্থকর্ত্রীর নাম Miss Braddon, এ পুস্তক তাঁহার পুনঃপুনঃ অধীত; তথাপি তিনি আগ্রহের সহিত এই পুস্তক আবার অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

রায়-পরিবারের সহিত বিনোদের কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ না থাকিলেও, তিনি স্বর্গীয় হরিদাস রায় মহাশয়ের পুত্ররূপে পরিচিত। একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে, ঘটনাক্রমে পিতৃহীন হইয়া, বিনোদ রায়দিগের ভবনে আনীত হইয়াছেন এবং তদবধি অপত্য-নির্ব্বিশেষে তথায় প্রতিপালিত হইতেছেন।

স্বর্গীয় হরিদাস রায় মহাশয়ের এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্র যতীন্দ্রনাথ রায় বয়স বিনোদের অপেক্ষা দশ বারো বৎসরের বড়; কন্যা অপরাজিতা বিনোদের অপেক্ষা তিন বৎসরের ছোট।

বিনোদ এই সংসারে আনীত হওয়ার তিন বৎসর পরে, হরিদাস রায় মহাশয় স্বর্গলাভ করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়গণকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, বিনোদকে যেন কখনই কেহ কোনরূপ অযত্ন না করেন; কেহই যেন তাঁহাকে পর না ভাবেন; গৃহিণী যেন তাহাকে গর্ভজাত সন্তান ভিন্ন অন্যরূপ মনে না করেন এবং যতীন্দ্রও যেন তাঁহাকে কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহার এক উইলও ছিল, অন্যান্য কথা ব্যতীত তাহাতে বিনোদের সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট ছিল যে, "ইহাও প্রকাশ থাকে যে, শ্রীমান্ বিনোদবিহারী আমার পুত্ররূপে প্রতিপালিত হইতেছেন। যদি বিবাহাদির পর আমার প্রথম পুত্র যতীন্দ্রের সহিত বিনোদের মনের অকৌশল ঘটে এবং উভয়ের পৃথক্ অন্নে বাস করিতে হয়, তাহা হইলে আমার পরিত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি, যতীন্দ্র ও বিনোদ তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লইবেন।"

ঘটনা-চক্রে আবর্ত্তিত পিতৃমাতৃহীন বিনোদ, এই নূতন পরিবারের মধ্যে স্থান পাইয়া, বড়ই সুখে কাল কাটাইতেছেন। তিনি ৺হরিদাস রায়কে পিতা, তাঁহার গৃহিণীকে মাতা; তাঁহার পুত্রকে জ্যেষ্ঠ সহোদর এবং তাঁহার কন্যাকে সহোদরা ভগিনী ভাবিয়াই আসিতেছেন। গৃহিণী তাঁহাকে গর্ভজাত সন্তান বলিয়া স্নেহ করিয়া থাকেন, যতীন্দ্র তাঁহাকে বাস্তবিকই কনিষ্ঠ ভাই বলিয়া মনে করেন, এবং অপরাজিতা তাঁহাকে বড়ই ভাল বাসেন। সর্ব্ব সাধারণে তাঁহাকে রায়দিগের ছোট বাবু বলিয়াই জানে।

রায়দিগের সম্পত্তি নিতান্ত অল্প নহে। তাঁহাদের ভূসম্পত্তির বার্ষিক আয় দশ-বারো হাজার টাকা। পল্লীগ্রামে এই আয়ে একটু ধূমধামের সহিত থাকা যাইতে পারে। তাঁহাদিগের সংসারে লোকও বেশী নহে। বিধবা কর্ত্রী ঠাকুরাণী, যতীন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রী এবং বিনোদ এই কয় ব্যক্তিকে লইয়া রায় পরিবার গঠিত। সম্প্রতি এই সংসারে আর এক জন বাড়িয়াছেন। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, বিবাহের কিছু পরেই, অপরাজিতা বিধবা হইয়াছেন। নানা কারণে বাধ্য হইয়া তিনি এত দিন শ্বশুরালয়েই ছিলেন। তাঁহার স্বামীর পরিত্যক্ত প্রায় দেড় লক্ষ টাকা আয়ের তিনিই উত্তরাধিকারিণী। সেই আয় নিষ্কণ্টক করিয়া লইবার নিমিত্ত, যতীন্দ্র ও বিনোদের অভিপ্রায়ানুসারে বৈধব্যের পরেও প্রায় পাঁচবৎসর

তাঁহাকে শ্বশুরগৃহেই থাকিতে হইয়াছিল। অধুনা সে সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। তিন মাস হইল এই ধনশালিনী বিধবা আপনার মা ও ভাইদের নিকট আসিয়াছেন।

বিনোদ যখন পুস্তক পাঠে অত্যন্ত আবিষ্টচিত্ত, সেই সময়ে যতীন্দ্র তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিনোদ সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি আজি গ্রামান্তরে যাইবেন শুনিতেছি। কোথায় যাইবেন? কেন যাইবেন?

যতীন্দ্র বলিলেন—"যাইবার কথা হইয়াছে বটে কিন্তু তোমার সহিত পরামর্শ না করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। সে কথা পরে বলিতেছি। এই নিদারুণ গ্রীষ্মে কয়েক দিনের অবকাশ পাইয়া বাটী আসিয়াছ। এ সময়ে এত পরিশ্রম করিয়া পড়া-শুনা না করিলেই ভাল হয়। অধিক পরিশ্রমে তোমার চেহারা যেন খারাপ হইয়া যাইতেছে। না হয় বি, এল্ নাই দিবে।"

বিনোদ বলিলেন,—"মা রাগ করার পর হইতে আমি তো আর রাত্রি জাগিয়া পড়ি না দাদা। আমি এখন পরীক্ষার কোন পুস্তকও পড়িতেছি না। পরীক্ষাটা না দিলেই বা হইবে কি? বয়স তো কম হইল না। কবে আপনাদের কাজে লাগিব তাহা তো জানি না।"

যতীন্দ্র বলিলেন,—"কাজে লাগিবার কোনই প্রয়োজন দেখিতেছি না। যে আয় আছে, তাহাতে দুই ভাইয়ের নির্ব্বিবাদে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ব্যাঘাত হইবে বোধ হয় না। অপরাজিতারও একটা রাজার মত আয়। অতি দুঃখের বিষয় হইলেও, অতঃপর সে আয় আমাদিগের সংসারের উন্নতির নিমিত্তই প্রধানতঃ খরচ হইবে সন্দেহ নাই। অতএব তুমি এম্, এ, বি, এল পাস করিয়া মাসে আড়াই শত টাকা না আনিলে যে বিশেষ ক্ষতি হইবে, এমত বোধ করি না। তুমি লেখাপড়া শিখিয়া মুখোজ্জ্বলকারী হইয়াছ, ইহাই যথেষ্ট। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার যশ পৃথিবী ব্যাপ্ত হউক। একটা গুরুতর কথার জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি উপযুক্ত হইয়াছ, তোমার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কাজই আমার করিতে ইচ্ছা হয় না। বিশেষ এখন যে কাজের কথা বলিতেছি, তাহা নিতান্তই তোমার পরামর্শ সাপেক্ষ।"

বিনোদ একটু উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন,—"এমন কি কথা দাদা? আপনি যে বিষয়ে যাহা করিবেন, তাহার উপর আবার আমার পরামর্শ কি?"

যতীন্দ্র বলিলেন,—"তাহা হইলেও, এ বিষয়টা তোমার শুনিতেই হইবে, আর ইহার একটা উত্তরও দিতে হইবে। মা তো আমাকে তোমার বিবাহের জন্য বড়ই পীড়াপীড়ি করিতেছেন; তোমার বউ দিদিও এজন্য কম উৎপীড়ন করিতেছেন না। আমি মনে করিতেছি, এই মাসেই শুভ কর্ম্ম শেষ করিয়া ফেলি। তা তুমি কি বল ভাই?"

বিনোদ চমকিত হইয়া উঠিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! আমি কাহাকেও না বলিয়া, গুরুজনের মত না লইয়া, বিবাহের সকলই স্থির করিয়াছি। কথাটা এই সুযোগে, দাদার পায়ে ধরিয়া, বলিয়া ফেলি না কেন? না না, এখন থাকুক, আরও দিন কতক যাউক। অন্য সময়ে, অন্য সুযোগে বলিব।" অবনত মস্তকে উত্তর দিলেন,—"তা—আজ্ঞা—এখন সে কথা থাকুক। আমি এ সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলিতে পারিব না।

যদি কিছু বলিতে হয়, বউ দিদিকে বলিব।"

যতীন্দ্র বলিলেন,—"তা তাঁকেই বলিও কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন আপত্তির কথা আমি আর শুনিতে পারিব না ভাই। কেন না, মা ঠাকুরাণী এজন্য কাঁদাকাটা পর্য্যন্ত আরম্ভ করিয়াছেন। আমি পাত্রী স্থির করিয়াছি। সে বিষয়ের সমস্ত কথা তোমার বউদিদির নিকট হইতেই শুনিও। বিলম্ব না করিয়া আজিই তোমার অভিপ্রায় প্রকাশ করিও। তোমার জলখাবারের সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমি বাটীর মধ্যে গিয়া তোমার বৌদিদিকে জলখাবার আনিতে বলি না কেন? জল খাওয়া হইবে, কথাবার্ত্তাও হইবে।"

যতীন্দ্র প্রস্থান করিলেন; বিনোদ ভাবিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি উপায়? স্নেহময়ী মা কাঁদিতেছেন। কি ভয়ানক কথা! লৌকিক না হউক, ধর্ম্মতঃ আমার বিবাহ হইয়াছে বলিয়া ফেলি। মা'র কাছে কাঁদিয়া, দাদার পায়ে ধরিয়া বলিলে তাঁহারা কখনই অমত করিবেন না। কিন্তু কি বলিব? কাহার কন্যা, কোথায় বাস, কি পরিচয় সে সকল কিছুই জানি না। এইবার গিয়াই সে সংবাদ যেমন করিয়া হউক জানিব। তাহার পর বাড়ীতে সকল কথা বলিব। বিবাহ স্থির হইয়াছে বুঝিলে এখানকার সকলেই নিশ্চিন্ত হইবেন। কিন্তু বিবাহ ঘটিবে কবে জানি না। যে কর্ত্তব্যের ভার আমার স্কন্ধে তাহার পরিসমাপ্তি না হইলে কখনই বিবাহ হইবে না। বিজলীকে সমস্ত বলিব, তাঁহার জননীকে সকল কথা জানাইব। নিশ্চয়ই তাঁহারা বুঝিবেন এবং বিলম্ব করিতে সম্মত হইবেন। ঈশ্বর আমাকে বল দেও, বুদ্ধি দেও, সাহস দেও যেন জীবনের ব্রত সুসিদ্ধ হয়, যেন কর্ত্তব্য-সাধন জনিত শান্তি-লাভে আমি বঞ্চিত না হই।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ধীরে ধীরে সেই প্রকোষ্ঠের একটী পার্শ্ব-দ্বার খুলিয়া গেল এবং ধীরে ধীরে সেই উন্মুক্ত দ্বার দিয়া এক ভুবনমোহিনী সুন্দরী তথায় প্রবেশ করিলেন। তিনিই অপরাজিতা—বিধবাবেশধারিণী। তাঁহার এক হস্তে রজত পাত্রপূর্ণ বিবিধ খাদ্য সামগ্রী। অপরাজিতা বলিলেন,—"বউদিদি তোমার জন্য জলখাবার আনিতেছিলেন, আমি তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া আনিয়াছি। তিনিও আসিবেন এখন। দাদা তাঁহাকে তোমার সহিত কি পরামর্শ করিতে বলিয়াছেন। উঠ, এখন জল খাও! একি বিনোদ তোমার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন তুমি কত ভাবিতেছ। কি জন্য এত ভাবনা তোমার?"

এই স্থলে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। বিনোদ বয়সে কিছু বড় হইলেও, অপরাজিতা কখনই তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকেন না। এজন্য গুরুজনগণের শাসন ও তিরস্কার সকলই ব্যর্থ হইয়াছে। বাল্যকাল হইতে একত্রাবস্থান ও খেলা-ধূলা করায় উভয়ের মধ্যে বড়ই সমপ্রাণতা হইয়াছে। বয়সও প্রায় সমান। কাজেই অপরাজিতা কোন মতেই বিনোদকে দাদা বলিয়া উঠিতে পারেন নাই মুখে যেন বাধিয়া যায়। তিনি অন্যায় বুঝিলে বিনোদকে শাসন করেন;

তাঁহার বিশ্বাস, দাদা বলিলে যেন মস্ত একটা গুরুলোক মনে করিয়া সাবধানে কথা কহিতে হইবে; নিকটে আসিতে হইলে ভয়ে পা কাঁপিবে; সকল সময়েই ধমক খাইবার জন্য প্রাণকে তৈয়ার করিয়া রাখিতে হইবে। বিনোদের সম্বন্ধে তাহা তিনি পারিবেন না। বিনোদও, অপরাজিতার মুখ হইতে দাদা সম্ভাষণ অপেক্ষা, নাম ধরিয়া ডাকাটাই বেশী ভাল বাসেন। সুতরাং এইরূপই চলিয়া আসিতেছে।

বিনোদ বলিলেন,—"না অপি, আমি তো কিছুই ভাবিতেছি না। যে ব্যক্তি তোমার ন্যায় ভগিনীর আদর, স্নেহ, ভালবাসা ভোগ করে, এ জগতে তাহার কোনই ভাবনার কারণ থাকিত পারে কি? তবে বোধ হয় প্রাণের মধ্যে লুকান দুই একটা ভাবনা ছাড়া মানুষ নাই। আমার একটা প্রধান ভাবনার কারণ তুমি। তোমাকে দেখিলেই আমার প্রাণে বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। তোমার অশেষ গুণের সঙ্গে সঙ্গে, তোমার এই দুর্দ্দশার কথা মনে হইলেই, প্রাণটা যেন ফাটিয়া যায়।"

অপরাজিতা কিয়ৎকাল অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"আমার দুর্দ্দশা কি?"

বিনোদ বলিলেন,—"তাহাও কি ছাই মুখে বলা যায়! দুর্দ্দশা তোমার সকল দেহেই মাখা রহিয়াছে।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"আমার বৈধব্য তোমার কষ্টের কারণ। তোমরা পুরুষ—ভোগাসক্ত, হৃদয়ের বলশূন্য ক্ষুদ্র জীব। বৈধব্য কি মহত্ব তাহা প্রণিধান করিবার শক্তি তোমাদের নাই। আপনাদিগের সংকীর্ণ হৃদয় লইয়া তোমরা নারী-হৃদয়ের বিচার করিতে অগ্রসর হও; সেই জন্য তোমরা বিধবার দুর্দ্দশাই দেখিতে পাও। কিসে আমার দুর্দ্দশা?"

বিনোদ বলিলেন,—"তোমার ঐ বস্ত্র, তোমার ঐ ভূষণহীন দেহ, সিন্দুরশূন্য সীমন্ত, ভোগবিহীন অবস্থা সকলই দুর্দ্দশার পরিচয় দিতেছে।"

অপরাজিতা একটু হাসিয়া বলিলেন,—"ছি! এম্ এ পাস করা উচ্চশিক্ষিত বিনোদ বাবুর মুখে এ কথাটা ভাল শুনায় না। আমার বস্ত্রে পাইড় নাই, দেহে স্বর্ণ ও হীরক নাই, সীমন্তে সিন্দুর নাই, সামান্য ভোগের উপায় নাই; সুতরাং আমার দুর্দ্দশা অসীম। বিনোদ—ভাই? এ সকল নিতান্ত স্বার্থপরের কথা। দেহকেই যাহারা সকল পদার্থের সার বলিয়া জ্ঞান করে, সেই নাস্তিকদের এই উক্তি। তুমি এ সকল জঘন্য কথা কোথায় শিখিয়াছ? আমার কোন ভোগ নাই, কোন তৃপ্তি নাই? আমি অলঙ্কার পরি না, কিন্তু যাহাদের আমি বড় ভালবাসি, তাহারা অলঙ্কার পরে; তাহাদের বস্ত্রালঙ্কার দেখিয়া, তাহাদিগকে সাজাইয়া আমি কেন না পূর্ণ সন্তোষ পাইব? আমি মাকে ভক্তি করি, দাদাকে শ্রদ্ধা করি, বউদিদিকে খুব ভালবাসি, তোমাকে অভিন্নহৃদয় সহোদর বলিয়া স্নেহ, ভক্তি, শ্রদ্ধা সকলই করি। আমার বৈধব্য এ সকল সুখ আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লয় নাই তো। তবে কেন আমি অসুখী হইব?"

বিনোদ নীরব। সকল কথার উত্তর দিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। অপরাজিতা আবার বলিলেন,—"শুনিতেছি শীঘ্রই তোমার বিবাহ হইবে। সেই বউটীকেও আমি আমার অভিন্নহৃদয়া সখী বলিয়া বুঝিব। তাহাকে খাওয়াইয়া পড়াইয়া, তোমার সহিত তাহাকে হাস্য-কৌতুক করিতে দেখিয়া, আমি পূর্ণ তৃপ্তি

উপভোগ করিব। তবে আমার কোন্ আনন্দ নাই ভাই ?"

বিনোদ নীরব হৃদয়ের এ কি অলৌকিক উদারতা! অপরাজিতা আবার বলিলেন,—"আমি শুনিয়াছি, আমার সন্তান হয় নাই বলিয়া তোমরা আক্ষেপ কর। একটী সন্তান হওয়ার পর যদি আমার বৈধব্য ঘটিত, তাহা হইলে তোমরা এত দুঃখিত হইতে না। বড় লজ্জার কথা! দাদার ছেলে হইবে, তোমার ছেলে হইবে, আমিই তাহাদের মানুষ করিব, তাহারা দিনরাত্রি আমার কাছেই থাকিবে, পিসী মা ছাড়া আর কিছু তাহারা জানিবে না। তথাপি সন্তানের অভাব হেতু তোমরা আমাকে অভাগিনী বলিয়া মনে করিবে ? কিন্তু তোমরা পুরুষ—ঈশ্বর হয়তো তোমাদের এত বুঝিবার শক্তি দেন নাই।"

এক গ্লাস জল ও এক ডিবা পান হস্তে লইয়া, আর এক পূর্ণাঙ্গী সুন্দরী যুবতী তথায় প্রবেশ করিলেন। তিনিই যতীন্দ্রনাথের পত্নী—ব্রজেশ্বরী। টেবিলের উপর জলের গ্লাস ও পানের ডিবা রাখিয়া, ব্রজেশ্বরী যাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন, তাহা বর্ত্তমান কালের রুচি অনুসারে বড়ই অশ্লীলরসিকতা ও অসভ্য জনোচিত উক্তি। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে হইলে, ভাল-মন্দ কিছুই বাদ দেওয়া চলে না। কাজেই আমার, চক্ষুকর্ণ নিরুদ্ধ করিয়া, সেগুলি লিখিয়া ফেলিলাম। ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"ওমা! এখনও জল খাওয়া হয় নাই বুঝি! ভাই-বহিনে এক জায়গায় হইলেই বুঝি খাওয়া-দাওয়া সবই ভুলিয়া যাইতে হয় ?"

বিনোদ বলিলেন,—"বউদিদি, তুমি ভারি দুষ্ট; এই তো অপি খাবার লইয়া আসিয়াছে।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"ওমা, সে বুঝি এই তো। তা জানি আমরা, আমোদে থাকিলে সময়টা বড় শীঘ্রই পলাইয়া যায়। তা বেশ তো, আমি না হয় আর কোন কথাই বলিব না। তুমি এখন জল খাইতে আরম্ভ কর; আমি তোমাকে দুইটী দরকারী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া যাই। তাহার পর তোমরা ভাই-বহিনে যত পার রঙ্গরস করিতে থাক।"

বিনোদ ভোজন আরম্ভ করিলেন। ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"তোমার দাদার মুখে শুনিয়াছি, বিধবার বিবাহ শাস্ত্র-সঙ্গত; তুমিও অনেকবার বলিয়াছ, সে বিষয়ে কোনই ভুল নাই।"

বিনোদ বলিলেন,—"আবার বলিতেছি, অবস্থা বিশেষে বিধবা-বিবাহ নিতান্ত বিধেয়"।

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—তবে তোমাদের মত গুণবান্ ভাই থাকিতে, এমন ভুবন ভুলান ভগিনীর বিবাহ হয় না কেন ?

অপরাজিতার মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি অধোমুখে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। ব্রজেশ্বরী বলিলেন—ঠাকুরঝি যাইতেছ কেন ? ভাল কথাই তো আমি বলিতেছি। তা যাইতেছ—যাও আমি ঠাকুরপোর মত ঠিক করিয়া তোমার দাদাকে জানাইয়া, সব বন্দোবস্ত স্থির করিয়া ফেলিব এখনই।"

অপরাজিতা প্রস্থান করিলেন। ব্রজেশ্বরীর তাহাই দরকার। তিনি বলিলেন,—তামাসা যাউক, এই মাসেই তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে ঠাকুরপো। এখন তোমার কি মত বল।

বিনোদ বলিলেন,—আমি এখন কিছুদিন বিবাহ করিব না।"

"কেন ?"

"এ কেনর উত্তর নাই। আমার এখন

ইচ্ছা হয় না—ভাল লাগে না। যখন ভাল লাগিবে, তখন তোমাকে ডাকিয়া, দাদাকে বলাইয়া, বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে অনুরোধ করিব।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"মাকে কি বলিয়া বুঝাইব? তোমার অকারণ অনুরোধ তাঁহারা শুনিতে চাহেন না। তোমার দাদা যদিও তোমার অনিচ্ছা বুঝিয়া চুপ করিয়া থাকেন, মা তো সে কথা কাণেও ঠাঁই দিবেন না।"

বিনোদ বলিলেন,—"তুমি মনে করিলে বাড়ীর সকলকে যাহা খুসী তাহাই বুঝাইতে পার। তুমি এ বাটীর লক্ষ্মী; তোমার কথা কে না বুঝিবে, কে না শুনিবে? মাকে বলিও আমি এবার কলিকাতা হইতে ঘুরিয়া আসিয়াই বিবাহ করিব। আর দাদাকে বলিও, আমি সকল বিষয়েই তাঁহার আজ্ঞার অধীন, কেবল বিবাহবিষয়ে, একটা নিগূঢ় কারণে, আমি কিছু দিন বিলম্ব করিতে চাহিতেছি মাত্র। তিনি যেন দয়া করিয়া এই অপরাধটা ক্ষমা করেন।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"সে নিগূঢ় কারণ কি, আমাকে না বলিলে, আমি তোমার কোন কথাই শুনিব না।"

বিনোদ বলিলেন,—"বলিব, বউদিদি এ জগতে সে কথা তোমাকেই প্রথমে বলিব; কিন্তু আজ নয়। দোহাই তোমার, এখন আমাকে মাপ কর। যাও তুমি, আমি এখন বেড়াইতে যাই। আমি যেমন যেমন বলিয়া দিলাম, সেই সব কথা একটু ভাল করিয়া, একটু গুছাইয়া, দাদাকে ও মাকে বলিও, যেন এদিক ওদিক না হয়। আর যেন নষ্টামী করিয়া, দাদার কাছে আমার নামে কতকগুলা মিথ্যা ঠকামি লাগাইও না। তাহা হইলে মজা দেখিতে পাইবে।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"ঠিক বলিব—এক বর্ণও এদিক ওদিক হইবে না। তোমার যদি বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে যাহা বলিব তাহা শুনিয়া রাখ না কেন? আমি বলিব, তোমার দেশমজানী ভগিনী তোমার গুণধর ভাইয়ের মনটীকে একেবারে বেমালুম চুরি করিয়াছেন। এখন যদি সেই ভগিনীকে ধরিয়া ভাইয়ের গলায় গাঁথিয়া দিতে পার, তবেই সকল দিক রক্ষা হয়। কেমন, এই তো কথা? দেখ, কিছু ওদিক হয় নাই তো?"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই, মুখে কাপড় দিয়া খল্ খল্ হাসিতে হাসিতে, ব্রজেশ্বরী প্রস্থান করিলেন। নিতান্ত চিন্তিতভাবে, অন্য দ্বার দিয়া, বিনোদ নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একখানি ডাকের চিঠি বিনোদের হস্তগত হইল। তাহাতে এই কথা লিখিত ছিল,—

"বিনোদ বাবু,

আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। সহসা মাতাঠাকুরাণীর অতিশয় কঠিন পীড়া হইয়াছে। আমার দ্বারা চিকিৎসাদির কোন ব্যবস্থাই হইয়া উঠা সম্ভব নহে। এ সংসারে সহায় ও ভরসা সকলই আপনি। এ অবস্থায় যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, দয়া করিয়া তাহাই করিবেন। ইতি ১৩ই বৈশাখ, ১৩০৭ সাল।

আশ্রিতা
বিজলী।"

পত্র পাঠ করিয়া বিনোদ অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন। সংসারে কোন আত্মীয় বন্ধু নাই। নিশ্চয়ই পীড়িতা জননীকে লইয়া বিজলী বড়ই বিব্রত হইয়াছেন। এরূপ বিপদের কথা শুনিয়া স্থির থাকা উচিত নহে। সুতরাং কল্য প্রাতেই বিনোদকে কলিকাতা যাইতে হইবে। কিন্তু কেমন করিয়া মা, দাদা, বউদিদি ও অপরাজিতার নিকট সহসা কলিকাতা গমনের প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন, তাহা তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। এই সে দিন তিনি কলিকাতা হইতে বাটী আসিয়াছেন, আবার আজই ফিরিয়া যাইবার কথা বলা বড়ই অসঙ্গত। বলিলেও কেহই মত দিবেন না, সকলেই অনেক আপত্তি করিবেন। আসল কথাটাও সকলকে জানাইবার উপায় নাই। বড়ই বিষম সমস্যা।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বিনোদ ধীরে ধীরে বউ দিদির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কোন প্রকার স্চনা না করিয়া একেবারেই বলিয়া ফেলিলেন, —"দোহাই বউদিদি তোমার পায়ে পড়ি; যে মাকে আমার একটী উপকার করিতেই হইবে।"

ব্রজেশ্বরী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তা এত তাড়াতাড়ি কেন? আমি যখন বলিয়াছি, তোমার দাদার সহিত পরামর্শ করিয়া এ কাজ ঘটাইয়া দিব, তখন তুমি পায়ে পড় বা না পড়, আমি নিশ্চয়ই তাহা ঘটাইব। এত ব্যস্ত হইতেছ কেন? ক'নে তো ঘরেই আছে; না হয় দু দিন দেরী হইবে।"

বিনোদ বলিলেন,—"তুমি যে রকম দুষ্ট, তাহাতে তোমার সহিত কথা কহাই ভার। আমি বড় বিপদে পড়িয়াই তোমার কাছে আসিয়াছি; আর তুমি কেবল বাজে কথা বলিয়া হাসিয়া উড়াইতেছ।"

ব্রজেশ্বরী মুখ ভার করিয়া বলিলেন,—"বিপদ! কিসের বিপদ? ক'নে কি তোমাকে অগ্রাহ্য করিয়া আমারই সতীন হইবেন স্থির করিতেছেন? তা সে জন্য তোমাদের সুন্দ-উপসুন্দের মত লড়াই করিতে হইবে না। আমি যেমন করিয়া পারি, তোমার জিনিষ তোমাকেই ধরিয়া দিব।"

বিনোদ বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"আঃ যাও তুমি!"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—বটেই তো, ঘরে মনের মত বউ জুটিলে, ধরিয়া আনা বউদের দূর করিয়া দিতেই হয়।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি যাই। বড় দুঃখে, বড় বিপদে পড়িয়াই তোমার কাছে আসিয়াছিলাম। তুমি কথাটা একবার শুনিলেও না। এ সংসারে আর কাহার কাছে তবে দুঃখের কথা বলিব?"

বিনোদ গমনোদ্যত হইতেছেন দেখিয়া, ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"না না—ব'স। তোমার বিপদ এখন বিবাহ হওয়া; আর কথা, দাদাকে বলিয়া কিছু দিন বিবাহ বন্ধ রাখা। এ সকল আমার জানা আছে বলিয়াই আমি মনোযোগ দিতেছি না। অন্য কোন কথা আছে নাকি? বল, কি কথা, আমি শুনিতেছি। একটা পান খাইবে?"

বিনোদ বলিলেন,—"না, আমি পান টান খাইতে চাহি না, এখন আমার কিছুই ভাল লাগিতেছে না।"

ব্রজেশ্বরী জিজ্ঞাসিলেন,—"কি হইয়াছে? মুখ খানা অত ভার ভার কেন?"

বিনোদ বলিলেন,—"আমাকে কালি প্রাতেই কলিকাতায় যাইতে হইবে।"

"কেন?"

"আমার একটী আত্মীয়ের কঠিন পীড়া।"

"কে বলিল ?"
"চিঠি আসিয়াছে।"
"কই, দেখি।"
"চিঠি বাহিরে ফেলিয়া আসিয়াছি।"
"কে সে আত্মীয় ?"
"তোমরা চেন না।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"চিনি বা না চিনি, এরূপ অবস্থায় তোমার যাওয়া উচিত বটে। এ বিষয়ে বাড়ীর সকলকে রাজি করিয়া দিবার জন্য আমাকে মুরব্বি ধরিতে আসিয়াছ, কেমন ? এ কথা শুনিলে তোমার দাদা যে সহজেই মত দিবেন, তাহার ভুল নাই ; কিন্তু মা তো কোন কথাই শুনিবেন না। কতদিন পরে মোটে সেদিন বাটী আসিয়াছ ; আবার আজই যাওয়ার কথা বলিতে গেলে তিনি ভয়ানক রাগিয়া উঠিবেন। যাহা হউক, আমি চেষ্টা দেখিতেছি ; তুমি এক ঘণ্টা পরে সংবাদ পাইবে। তাহা তো হইল, কিন্তু ঠাকুরঝির হুকুম আদায় করিবে কে ? তোমাকে নিজেই তাঁহার পায় ধরিয়া ছুটি লইতে হইবে তো।"

বিনোদ বলিলেন,—অপির জন্য আমি ভাবি না ; তাহাকে দুইটা কথা জোর করিয়া বলিলেই হইবে। মা'র আর দাদার সম্মতির কথা এক ঘণ্টার মধ্যে তোমার নিকট হইতে শুনিতে চাই। বিলম্ব হইলে তোমার সহিত আড়ি হইবে।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"আর আমি যদি মত না দিই।"

বিনোদ বলিলেন,—"তুমি আগেই বলিয়া ফেলিয়াছ, এ অবস্থায় আমার যাওয়া উচিত বটে। এখন যদি তুমি অমত কর, তাহা হইলে বুঝিব, সেটা তোমার মনের কথা নয় কেবল ।"

বিনোদ পুনরায় সেই বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। টেবিলের উপর বিজলীর সেই পত্রখানি নিতান্ত অসাবধানভাবে খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি আবার তাহা পাঠ করিলেন। তাহার পর নিতান্ত চিন্তিতভাবে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন।

নিঃশব্দে পশ্চাতের দ্বার দিয়া অপরাজিতা তথায় প্রবেশ করিলেন। চিত্রাদি নানাবিধ শোভন পদার্থে সেই প্রকোষ্ঠ সজ্জিত। টেবিলের উপরে অস্‌লারের অতি রমণীয় এক ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। সেই আলোকের উজ্জ্বল আভা, অপরাজিতার সমুজ্জ্বল বর্ণে প্রতিভাত হইয়া, অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; গৃহের শোভা যেন বহুগুণে বর্দ্ধিত হইল।

নিরাভরণা সুন্দরী-শিরোমণি নিঃশব্দে আসিয়া বিনোদের পশ্চাতে দাঁড়াইলেন। সুন্দর ও সুন্দরীর রূপের তুলনা যদি সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে আমরা এই স্থানে তাহার প্রয়াস করিতাম। কি অপূর্ব্ব শোভাময় যুবক, চিত্রার্পিত পুত্তলীর ন্যায়, অর্দ্ধশায়িতাবস্থায়, চেয়ারে উপবিষ্ট। আর শুভ্রবসনা, ভূষণ-বিহীনা, সুন্দরী-প্রধানা, নবীনা সেই চেয়ারের পশ্চাতে নীরবে দণ্ডায়মানা।

বিজলীর স্বাক্ষরিত পত্র অপরাজিতার চক্ষু-সমক্ষে পড়িল ; তিনি তাহা পাঠ করিলেন ! জিজ্ঞাসিলেন,—"বিনোদ—"

বিনোদ চমকিয়া উঠিলেন ; ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কি অপি, কতক্ষণ আসিয়াছ ?"

অপি উত্তর দিলেন,—"এই আসিতেছি। তুমি নাকি কালি কলিকাতায় যাইবে ?"

বিনোদ বলিলেন,—"হাঁ, তুমি কোথায় শুনিলে ?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"বউদিদির কাছে। বউদিদি মাকে বুঝাইতেছিলেন। মা রাজি হইয়াছেন ; কিন্তু একবার তোমাকে

দেখা করিতে বলিয়াছেন। দাদারও আপত্তি নাই; তাঁহার যাহা বলিবার আছে, তিনি নিজে আসিয়া তোমাকে বলিবেন।"

বিনোদ বলিলেন,—"এখন তুমি মত দিলেই আমি নিশ্চিন্তমনে যাইতে পারি।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"আমার মত তো তুমি চাও নাই—আমার কথা তো তুমি কাহাকেও বল নাই।"

বিনোদ বলিলেন,—"তোমাকে নিজে বলিব বলিয়াই কোন উকীল খাড়া করি নাই।"

অপরাজিতা অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিনোদ আবার বলিলেন,—"আমি সম্ভবতঃ দুই তিন দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিব। এখন তুমি আমাকে যাইতে বলিলেই আমি হাসিতে হাসিতে যাইতে পারি।"

কিয়ৎকাল নিস্তব্ধতার পর, অপরাজিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিজলী কে?"

বিনোদ নিতান্ত বিচলিত ও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"বিজলী! বিজলীর কথা তোমাকে কে বলিল? বিজলী যেই হউক তাহা জানিবার তোমার কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"প্রয়োজন নাই" এ কথা বলিতে পার না। যদি অধিকার নাই বলিতে, তাহা হইলে হয়ত আমাকে চিন্তিত হইতে হইত। তোমার সুখ-দুঃখ ভাল মন্দ ইত্যাদির সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সুতরাং তোমার আত্মীয়-বন্ধু কার্য্যাকার্য্য সকলই জানিতে আমাদের প্রয়োজন আছে। বুঝিতেছি, বিজলী স্ত্রীলোক; হস্তাক্ষর ও লেখার ভঙ্গী দেখিয়া অনুমান করিতেছি, তিনি সুশিক্ষিতা; আরও বুঝিতেছি; তিনি সর্ব্বপ্রকারেই তোমার অনুগত ও মুখাপেক্ষিণী; আর তিনি স্বয়ং আপনাকে তোমার আশ্রিতা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন; তাহাতেও যাহা বুঝা যাইতে পারে, তাহাও বুঝিতেছি। এত বুঝিতেছি বলিয়াই 'বিজলী কে' জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।"

বিনোদ অধোমুখ। পত্রখানি সাবধানে—সঙ্গোপনে রাখিবার ত্রুটিতে তাঁহাকে এই দুরবস্থায় নিপতিত হইতে হইয়াছে। অপরাজিতা অসাধারণ বুদ্ধিমতী; বিনোদ মিথ্যাকথনে অশক্ত। দুইটা কল্পিত বাক্যে যাহা তাহা করিয়া বুঝাইলে চলিবে না; চলিলেও বিনোদ তাহা পারিবেন না; সুতরাং তিনি নিরুত্তর।

অপরাজিতা আবার বলিলেন,—"বুঝিতেছি বিজলীর কথা ব্যক্ত করিতে তোমার ইচ্ছা নাই। আর সে কথা বলিবার জন্য আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি না।"

বিনোদ উঠিয়া বলিলেন,—"অপি, আমি জীবনে কখন কোন মিথ্যা কথা কহি নাই, বিশেষতঃ তোমার নিকট হইতে জীবনের কোন রহস্য প্রচ্ছন্ন রাখা নিতান্ত অসম্ভব। সত্বরেই জানিতে পারিবে, বিজলী কে। আপাততঃ আমাকে ক্ষমা কর। আমি কল্য কলিকাতা যাইব; তুমি স্বচ্ছন্দে অনুমতি দিলে সুখী হই।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"আত্মীয়ের পীড়া; তোমার যাওয়াই উচিত। শীঘ্র ফিরিতে চেষ্টা করিবে।"

বিনোদ বলিলেন,—"নিশ্চয় ফিরিব। এবার আসিয়া বিজলীর পরিচয় তোমাকে জানাইব। প্রার্থনা করি, আমার মুখে শুনিবার পূর্ব্বে, বিজলীর কথা বাটীর কাহাকেও তুমি জানাইবে না।"

অপরাজিতা প্রস্থান করিলেন।

পরদিন বিকালে আসিয়া বিনোদ কলিকাতায় পৌঁছিলেন এবং নিজের বাসা বা অন্য কোথাও না গিয়া, প্রথমেই তারাসুন্দরীর সেই ক্ষুদ্র বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া কড়া নাড়িতে লাগিলেন। ভিতর হইতে মধুময় কোমল কণ্ঠে —যে কণ্ঠস্বর বিনোদের প্রাণের ভিতর সর্ব্বদা বাজিয়া থাকে, সেই চিরতৃপ্তিপ্রদ কণ্ঠে শব্দ হইল—"কে ?"

বাহির হইতে শব্দ হইল—"বিনোদ।"

দ্বার খুলিয়া গেল। দ্বারপার্শ্বে জলদ-বক্ষে স্থির সৌদামিনীর ন্যায় আগুল্‌ফলম্বিতকেশী অলৌকিক শোভাময়ী বিজলী হাসিভরা মুখ লইয়া দণ্ডায়মানা। উৎকণ্ঠার সহিত বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিজু, মা কেমন আছেন ?"

বিজলী বলিলেন,—"একটু ভাল আছেন। ভিতরে আইস।"

বিনোদ সেই ভবনে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিজলীর সহিত বিনোদ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তারাসুন্দরী বসিয়া আছেন। বিনোদ নিকটস্থ হইলে তিনি বলিলেন,—"দুই দিন আমার সামান্য জ্বর হইয়াছিল। কালি বৈকাল হইতে আমি বেশ আছি। অকারণ অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া, আমার কোন কথা না শুনিয়াই বিজু তোমাকে পত্র লিখিয়া ফেলিয়াছে। বাটীতে ছুটীর সময় স্বচ্ছন্দে ছিলে, বোধ হয় বড় বিরক্ত হইয়াই আসিতে হইয়াছে বাটীর লোকেরাও বোধ হয় অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। না বুঝিয়া ছেলে মানুষ বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছে।"

বিনোদ বলিলেন,—"বিজু বড়ই ভাল কাজ করিয়াছেন। ঈশ্বর কৃপায় আপনি আজ ভাল আছেন; কিন্তু যদি আপনার পীড়া বাড়িয়া উঠিত, তাহা হইলে তো বিজলীকে বড়ই বিপদে পড়িতে হইত। কোন সঙ্কোচ না করিয়া, আত্মীয়-জ্ঞানে, বিজু যে আমাকে যথাসময়ে সংবাদ দিয়াছেন, ইহাতে আমি বড় সুখী হইয়াছি।"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"তুমি দেব-কুমার; তোমার দেব প্রকৃতি। বোধ হয় তুমি এখনও বাসায় যাও নাই। শরীরের বড়ই কষ্ট হইয়াছে। বিজলি, ঘরে কি আছে, দেখিয়া শুনিয়া বিনোদকে একটু জল খাইতে দেও মা।"

বিজলী সেই ঘরের এক প্রান্তে অধোমুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন; এক্ষণে মাতার আদেশ পালনে প্রস্থান করিলেন। তারাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন,—"তোমাকে একটা গুরুতর কথা বলিব বলিয়া বহুদিন হইতেই মনে করিতেছি; কিন্তু সে কথা শুনিয়া পাছে তুমি আমাদের উপর বিরক্ত হও, এই ভয়ে সাহস করিয়া এত দিন বলিতে পারি নাই, আজিও যে তাহা বলিয়া উঠিতে পারিব, এমন বোধ করি না। অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, আর একদিন তোমাকে সে কথা জানাইব।"

বিনোদের হৃদয়ে রক্তপ্রবাহ অতি দ্রুতবেগে বহিতে লাগিল। তিনি অতি কষ্টে হৃদয়-বেগ সংযত করিয়া বলিলেন,—"আপনি যতদূর বলিয়াছেন, তাহার পর যদি আর কিছু না বলেন, তাহা হইলে নানাবিধ আশঙ্কায় ও সন্দেহে আমি অতিশয় কষ্ট পাইব। আমি

আপনার স্নেহের পাত্র; আমি এরূপ কষ্ট পাইলে আপনি কখনই সুখী হইবেন না; যাহা বলিতে হয়, কৃপা করিয়া এখনই বলুন।”

তারাসুন্দরী বলিলেন—“যদি আমাদিগের এরূপ দুঃখের দশা না হইত, যদি আমাদিগকে এরূপ ঘৃণিত ও দীনভাবে না থাকিতে হইত, তাহা হইলে সহজেই তোমার নিকট মনের কথা প্রকাশ করিতে সাহসী হইতাম। অবস্থা গুণে, এখন তাহা বলা দূরে থাকুক, মনে ভাবিতেও লজ্জা হয়। তুমি বড় আগ্রহযুক্ত হইয়াছ, না বলিলে হয় ত দুঃখিত হইবে; কাজেই বলিতেছি।”

বিনোদ হৃদয়কে পরমপ্রীতিপ্রদ সংবাদ শুনিবার নিমিত্ত প্রস্তুত করিতে লাগিলেন; নিতান্ত উৎসুক ও ব্যাকুল হৃদয়কে যত্নে স্থির করিয়া রাখিলেন। তারাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন,—“এ জগতে এক্ষণে তুমিই আমাদের একমাত্র আত্মীয় ও পরম হিতৈষী। তোমার সহিত এই আত্মীয়তার বন্ধন আরও সুদৃঢ় ও প্রগাঢ় করিবার নিমিত্ত অনেক সময়ে একটা ভয়ানক দুরাশা আমার মনকে কষ্ট দেয়। যদি তুমি রাজ-রাজেশ্বর না হইতে, যদি তোমার রূপ, গুণ, পাণ্ডিত্য সকলই অতুলনীয় না হইত, আর যদি আমরা এত দরিদ্র, এত দুঃখী, এত দুরবস্থাগ্রস্ত না হইতাম, তাহা হইলে আমার দুরাশা বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হইত না।”

এই সময় বিজলী একখানি রেকাবে করিয়া কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য ও এক গ্লাস জল লইয়া উপস্থিত হইলেন। তারাসুন্দরী বলিলেন,—“তুমি একটু জল খাও বাবা। আমি সকল কথাই বলিতেছি।”

বিনোদের হৃদয়ে তখন অনন্ত কল্পনা; তারাসুন্দরীর বাক্যের সমাপ্তি শুনিবার নিমিত্ত তখন তিনি উন্মাদ। ক্ষুধাতৃষ্ণা তখন তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। বলিলেন,—“আপনার কথার শেষ না শুনিলে অন্য কিছুই আমি করিব না।”

তারাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন—“আমি নানা উপায়ে জানিতে পারিয়াছি, বিজলী তোমাকে বড়ই ভাল বাসে।”

বিজলীর মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। অবনত মস্তক আরও অবনত হওয়াতে চিবুক হৃদয় স্পর্শ করিল। সে স্থান হইতে পলায়ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার বাসনা জন্মিল; কিন্তু হস্ত-পদাদি শক্তি-শূন্য! অগত্যা সেই স্থানে পাষাণপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তারাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন,—“বোধ হয় আমার এই দুঃখিনী কন্যাকে তুমিও ভালবাসিয়া থাক।”

বিনোদ বলিলেন,—“আর কি বলিবেন, বলুন।”

তারাসুন্দরী বলিলেন,—“আমারা কুলীন কায়স্থ; পর্য্যায়েও তোমাদের সমান। অন্যান্য ঘটনা এত প্রতিকূল না হইলে, আমি তোমার হস্তে বিজলীকে সমর্পণ করিবার আশা করিতে পারিতাম।”

বিনোদ বলিলেন,—“বলুন মা, আমি কি করিলে বিজলী লাভের যোগ্য হইতে পারি।”

তারাসুন্দরী বলিলেন,—“বিজলী লাভের যোগ্যতা তোমার যথেষ্ট আছে। আমি জানি বিজলী তোমার দাসী হইবারও অযোগ্যা। তথাপি তুমি তাহাকে দয়া করিয়া দাসীরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, ইহা আমাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফল। কিন্তু তোমার মা আছেন, দাদা আছেন। তাঁহারা

কেবল এই অভাগিনীর আশীর্ব্বাদমাত্র গ্রহণ করিয়া বিজলীকে লইতে সম্মত হইবেন কেন?"

বিনোদ বলিলেন,—"এ সম্বন্ধে আপনি কোনই ভয় করিবেন না। কিঞ্চিৎ ধনের জন্য তাঁহারা কখনই আমার ইচ্ছার বিরোধিতা করিবেন না। অবস্থার বৈষম্যের কথা তাঁহারা মুখেও আনিবেন না। আপনার কন্যাকে দেখিবামাত্র তাঁহারা যে পরম স্নেহে তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিবেন, সে বিষয়ে আমার কিছুই সন্দেহ নাই।"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"আমাদের পূর্ব্বপরিচয় তুমি এখনও জান না। সে বিষয় জানা তোমার নিজেরও আবশ্যক; তোমার মা দাদাকেও তাহা জানান আবশ্যক। এক দিন তাহা তোমাকে জানাইতেই হইবে—আজই বলি না কেন? পরিচয়ের কোন স্থলেই কোন দোষ নাই; দোষ কেবলই আমাদের পোড়া কপালের।"

তাহার পর বিজলীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"বাক্স হইতে সেই কাগজ-পত্রগুলি বাহির করিয়া আন তো মা।"

বিজলী চলিয়া গেলেন। তারাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন,—"বড়ই দুঃখের কথা—বলিতে প্রাণ ফাটিয়া যায়; তথাপি বলিতেই হইবে। এক পল্লীগ্রামে আমাদের নিবাস ছিল। আমার স্বামীর অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না; কিন্তু সংসারে কোন অভাব অপ্রতুলও ছিল না। আবার স্বামীর এক অভিন্নহৃদয়-অকপট বন্ধু ছিলেন। তিনি রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী এবং সর্ব্বসদ্গুণের আশ্রয়। আমার স্বামী ও তাঁহার সেই বন্ধু এক দিন এক সঙ্গে বেড়াইতে যান। তদবধি তাঁহারা আর কেহই বাটিতে ফিরেন নাই। এক দিন পরে, একটা মৃতদেহ পুষ্করিণীতে ভাসিতে দেখিয়া, লোকে তাহা আমার স্বামীর দেহ বলিয়া স্থির করে। এ সম্বন্ধে লোকে যাহা বলে, পলিসে যাহা সপ্রমাণ করে এবং অনেকেই যাহা বিশ্বাস করে, আমি স্বয়ং সে স্থানে উপস্থিত থাকিয়া চক্ষুতে দেখিলেও, তাহা বিশ্বাস করিতাম না; এখনও করি না।"

বিনোদের বুকের ভিতর কেমন একটা যন্ত্রণার তরঙ্গ ছুটিতে লাগিল। সুদূর অতীতের কেমন এক বিভীষিকাময়ী ছায়া তাঁহার নয়নসমক্ষে উপস্থিত হইল। তিনি সভয়ে ভগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন,—"লোকে কি বলে?"

তারাসুন্দরী বলিলেন—"লোকে বলে, তাঁহার সেই প্রাণের বন্ধু, একটা ঘৃণিত কারণে, আপনার চিরদিনের বন্ধুকে খুন করিয়াছেন।"

বিনোদ চমকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল। পৃথিবী তাঁহার সমক্ষে যেন দুলিতে ও নাচিতে থাকিল। তারাসুন্দরী বলিলেন,—"আর কিছু আমার বলিতে হইবে না। এই কাগজপত্র পড়িলেই অন্যান্য কথা তুমি বুঝিতে পারিবে।"

বিনোদ সভয়ে ও কম্পিতহস্তে বিজলীর নিকট হইতে কাগজ গুলি গ্রহণ করিলেন। ভাজ খুলিয়া ফেলিলেন—অন্ধকার! চাদর দিয়া চক্ষু দুইটী একবার মার্জ্জনা করিলেন। কাগজে লিখিত বৃত্তান্তের কয়েক পঙ্ক্তি মাত্র পাঠ করিয়া, সর্পদষ্ট জীবের ন্যায় তিনি সেই স্থানে পড়িয়া গেলেন। আর্ত্তস্বরে অতিকষ্টে বলিলেন,—"বিজলি, তোমার সহিত মিলনের আশা আজি শেষ হইল! আমিই তোমার সেই পিতৃহন্তা যদুপতি মিত্রের এক মাত্র পুত্র। মা, আপনার পতিহন্তার পুত্র কখনই আপনার

স্নেহের যোগ্য নহে। বিজলি তোমার পিতৃহন্তার শোণিত আমার সর্ব্বশরীরে বহিতেছে ; এরূপ কলঙ্কিত ব্যক্তি কখনই তোমার দেবদুর্লভ প্রণয়ের অধিকারী নহে। মা, আমি বিদায় হই। যদি কখন আমার ললাট হইতে নরহন্তার পুত্ররূপ নিদারুণ কলঙ্ক অপগত হয়, যদি আমার পিতার চরিত্র হইতে বন্ধুহননরূপ কল্পনাতীত দুষ্কৃতির রেখা কখন প্রক্ষালিত হয়, তবেই আমার সাক্ষাৎ পাইবেন ; নচেৎ আমার এই বিদায়, জন্মের মত বিদায় জানিবেন।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নিতান্ত উত্তেজিত হৃদয় লইয়া, বিচলিত-ভাবে, বিনোদ আপনার বাসায় আসিলেন। তাঁহার বিশ্বাসী ও একান্ত অনুরাগী ভৃত্য রঘু, প্রভুকে এরূপ অসময়ে প্রত্যাগত দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইল। ছুটীর এখনও প্রায় কুড়ি পঁচিশ দিন বাকী। বিজলী-ঘটিত বৃত্তান্ত রঘুর অবিদিত ছিল না। অনেক সময়েই তাহাকে নানা-প্রয়োজনানুরোধে তারাসুন্দরীর ভবনে যাইতে হইত। এক্ষণে বাবুর অপ্রত্যাশিত পুনরাগমন, সম্ভবতঃ বিজলীর সহিত বিজড়িত বলিয়া, সে মীমাংসা করিল। অত কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। সে, বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া, জিজ্ঞাসিল,—“এত শীঘ্র ফিরিবার কথা ছিল না তো? সংবাদ ভাল তো?”

বিনোদ উত্তর দিলেন,—“হাঁ। তুমি একবার শ্রীরামকে ডাকিয়া আন।”

রঘু, ভৃত্য হইলেও, বিনোদকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসে। আজি বিনোদের মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার মনে বড় ভয়ের সঞ্চার হইল। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ—যেন এখনই তিনি রোদন করিয়াছেন। দেহ ঈষৎ বিকম্পিত। কণ্ঠস্বর একটু বিকৃত। সে উৎকণ্ঠিত ভাবেই আজ্ঞা-পালনে গমন করিল।

বিনোদের কলিকাতায় আগমনের পর হইতে, জোড়াসাঁকোর একটী প্রধান মুদীখানার দোকান তাঁহার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ সরবরাহ করিতেছে। শ্রীরামদাস নামক এক কৈবর্ত্ত, সেই দোকানের একজন প্রধান কর্ম্মচারী। শ্রীরাম, মাসে মাসে হিসাবের ফর্দ্দ লইয়া, টাকা লইবার নিমিত্ত বিনোদের নিকট আসিত। শ্রীরাম সুচতুর, বুদ্ধিমান, বিনয়ী, বাক্‌পটু ও বিশ্বাসী। ক্রমশঃ এই সকল গুণের পরিচয় পাইয়া, বিনোদ তাহাকে ভালবাসিতে থাকেন। পরিচয়ে তিনি জানিতে পারেন, শ্রীরামের নিবাস স্বর্ণগ্রাম। এই পরিচয়ের পর হইতে, বিনোদ অনেক সময়েই তাহার সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিতেন। শ্রীরামের সহিত কথোপকথনের সময় প্রায়ই তাঁহাকে বিমনা ও বিচলিত বলিয়া বোধ হইত। আজি সেই শ্রীরামকে ডাক পড়িল জানিয়া রঘু বুঝিল, একটা কি গুরুতর কাণ্ডই ঘটিতেছে।

রঘু প্রস্থান করিলে, বিনোদ কাগজ-কলম ঠিক্ করিয়া পত্র লিখিতে বসিলেন ; সংক্ষেপে দুইখানি পত্র লিখিয়া ফেলিলেন। রঘুর সহিত শ্রীরাম আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিনোদ বলিলেন,—“সময় ঠিক্ হইয়াছে। পরশ্ব যাত্রা করিব, স্থির করিয়াছি। খুড়া-মহাশয়কে এখনই কাগজ কলম লইয়া পত্র লিখিয়া দাও। তুমি প্রস্তুত হও।”

সবিনয়ে শ্রীরাম বলিল,—“একেবারে

কাজ ছাড়িয়া দিব কি? হিসাব নিকাশ শোধ করিতে হইবে।”

বিনোদ বলিলেন,—“চাকরীর সম্বন্ধ রাখিবার প্রয়োজন নাই। হিসাব বুঝাইয়া দিয়া বিদায় লইয়া আসিবে। এখনই পত্র লেখ।”

শ্রীরাম ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া, পত্র লিখিতে বসিল।

বিনোদ, রঘুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—“আমার সহিত তোমায় বিদেশে যাইতে হইবে। ফিরিতে কত বিলম্ব হইবে বলা যায় না। তোমার আমার আবশ্যকমত জিনিষ-পত্র গুছাইয়া লও। কিন্তু সাবধান, মোট যেন বেশি না হয়। যে সকল জিনিষ না লইলে নিতান্তই চলিবে না কেবল তাহাই লইবে মাত্র।”

রঘু বলিল—“হুজুরের যে সকল জিনিষে নিতান্ত দরকার, কেবল তাহাই লইতে হইলে একগাড়ি মোট হইবে।”

বিনোদ বলিলেন,—“কিছু না। একটী ব্যাগ ও একটী মোট এই দুইটীতেই যাহা ধরে, তাহাই তুমি লইতে পাইবে।”

রঘু অবাক্ হইল। বিনোদ মুখে জল দিয়া আসিলেন। মাথাটা একটু পরিষ্কার করিলেন। বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিলেন। শ্রীরামের পত্র লেখা সমাপ্ত হইল। তিনখানি পত্রে টিকিট অঁাটিয়া ডাকে দিবার নিমিত্ত রঘুর হস্তে প্রদান করা হইল। আসিবার সময়ে একখানি ভাল সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী ডাকিয়া আনিবার জন্ত আদেশ হইল। শ্রীরাম ও রঘু প্রস্থান করিল। নিতান্ত অস্থিরভাবে বিনোদ, বারংবার বারান্দায় পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে গাড়ী আসিলে, বিনোদ তাহাতে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। সন্ধ্যার অনেক পরে তিনি বাসায় ফিরিলেন। কল্য প্রাতে সাতটার সময় পুনরায় গাড়ী আনিবার আদেশ দিয়া, তিনি উপরে উঠিলেন।

রাত্রি প্রায় নয়টার সময়ে তারাসুন্দরীর ঝি সভয়ে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল,—“আপনি কেমন আছেন, কোথায় আছেন জানিবার নিমিত্ত মা-ঠাকুরাণী আমাকে পাঠাইয়াছেন। বৈকালে একবার আসিয়াছিলাম; আপনার দেখা পাই নাই।”

বিনোদ বলিলেন,—“আমি এখানেই আছি। কল্যও থাকিব। পরশ্ব আমি বিদেশে যাত্রা করিব। কোথায় থাকিব, কত স্থানে যাইব, তাহা এখন বলিতে পারি না। তোমরা খুব সাবধান থাকিবে।”

ঝি বলিল,—“কি হইয়াছে দাদা-বাবু? দিদী-বাবু আজ সারাদিন মাটীতে পড়িয়া কাঁদিতেছেন। মা-ঠাকুরাণী, একবারও উঠেন নাই। রান্না-বাড়া খাওয়া-দাওয়া কিছুই হয় নাই। শুনিয়াছি ওবেলা আপনি গিয়াছিলেন। আমি তখন বাজারে গিয়াছিলাম। আপনি চলিয়া আসিবার পর হইতেই না কি গোল হইয়াছে! তা কি হইয়াছে বাবু?”

বিনোদ বলিলেন,—রাজাদের একটা সুখের ঘর ছিল। দুরন্ত দস্যু ঢুকিয়া সেই ঘরে আগুন দিয়া আপনি পুড়িয়া মরিয়াছে, আর অনেককেও পোড়াইয়াছে। তুমি এখন যাও।”

আর কোন কথা বলিতে সাহস না করিয়া ঝি চলিয়া গেল। বিনোদ, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পালঙ্কের উপর পড়িয়া রহিলেন। প্রাণের বিজলীকে এখন আর একবার চ'খের দেখা দেখিতেও, তাঁহার অধিকার নাই। বিজলীর জননী অসীম দয়াবতী। পতিহন্তার কাতর পুত্রের সংবাদ গ্রহণে এখনও তাঁহার

প্রবৃত্তি। তাঁহাদিগের এই করুণালাভের বিনোদের আর কোন অধিকার নাই। দারুণ অনিদ্রায় ও বহুবিধ দুশ্চিন্তায়, বিনোদ রজনী অতিবাহিত করিলেন।

প্রাতে গাড়ী আসিল। বিনোদ, মনের আবেগে ব্যস্তভাবে বাহির হইলেন। মধ্যাহ্ন-কালে তিনি প্রত্যাগত হইলেন। স্নানাহার সমাপ্ত হইলে, শ্রীরাম আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। শ্রীরাম বলিয়া গেল, 'সে প্রস্তুত হইয়া আছে।'

তারাসুন্দরীর ঝি আবার আসিয়া সংবাদ লইয়া গেল। বৈকালে বিনোদ আবার গৃহ-ত্যাগ করিলেন। সন্ধ্যার পর ফিরিয়া, বাসার দ্রব্যসামগ্রী যেখানে যাহা রাখার আবশ্যক রঘুকে তাহার উপদেশ দিলেন। দ্বারবান্‌কে সাবধান থাকিতে আজ্ঞা করিলেন। পাচক ব্রাহ্মণ, তাঁহার অনুপস্থিতি কালে, যাহাতে বাসায় থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। রাত্রি পূর্ব্ববৎ অশেষ যন্ত্রণায় অতিবাহিত হইল।

পর দিন প্রাতে বিনোদ, শ্রীরাম ও রঘু বিদেশ যাত্রা করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হুগলী জেলার অন্তর্গত স্বর্ণগ্রাম অতি সামান্য পল্লীমাত্র। গ্রামে পথ ঘাট ভাল নাই; বিশেষ সঙ্গতিশালী বা সম্ভ্রান্ত লোকেরও বাস নাই। কয়েক ঘর কৈবর্ত্ত ও গোয়ালা, এক ঘর ব্রাহ্মণ, আর কয়েক ঘর কায়স্থ লইয়া প্রধানতঃ এই গ্রাম গঠিত। দুইঘর কায়স্থ সর্ব্বপ্রকারে গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরূপে পরিচিত ছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা এক্ষণে নাই। তাঁহার মধ্যে একঘরের কর্ত্তার নাম জগবন্ধু বসু। তিনি ষাটি টাকা বেতনে, কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টের কোন আপিসে, কর্ম্ম করিতেন। আয় সামান্য হইলেও, গ্রামে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। গ্রামবাসীরা বিপদে ও সম্পদে পরমাত্মীয়-জ্ঞানে তাঁহার শরণাগত হইত। দ্বিতীয় ঘরের কর্ত্তা যদুপতি মিত্র বিশেষ সঙ্গতিশালী লোক ছিলেন। তাঁহার জমিদারী বা কৃষিকার্য্য ছিল না; কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহার ঘরে প্রভূত নগদ টাকা ছিল। তাঁহার বাসভবন, রাজ-প্রাসাদের ন্যায় শোভাময় এবং গৃহসজ্জা অনেক ঐশ্বর্য্য-শালীর অপেক্ষা মূল্যবান্ ও বিপুল। যদুপতি নিরতিশয় নিরহঙ্কার, শান্তস্বভাব ও পর-হিত-পরায়ণ ছিলেন। গ্রামে তাঁহার অবিসংবাদিত প্রভুতা ছিল। সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক সম্মান করিত।

জগবন্ধু ও যদুপতি প্রায় সমবয়স্ক; যদু-পতির বয়স একটু বেশী। উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম আত্মীয়তা ছিল। উভয়েরই চরিত্র সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে কোন প্রয়োজনানুরোধে, এই দুই অকপট বন্ধু সন্নিহিত দুর্গাপুর-নামক গ্রামে গমন করেন। এক দিন পরে তত্রত্য এক সরোবরে একটী মৃতদেহ ভাসিতে দেখা যায়। সকলেই তাহা জগবন্ধুর দেহ বলিয়া অনুমান করেন। সুদক্ষ পুলিশও যদুপতিকে বন্ধুহন্তা বলিয়া নির্ণয় করেন এবং তদনুরূপ রিপোর্ট সদরে প্রেরণ করিয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি করেন। এরূপ ধনশালী ব্যক্তির পক্ষে অকারণে অভিন্নহৃদয় বান্ধবের নিধনসাধন, নিতান্ত অসঙ্গত হইলেও, পুলিশ, অপরিসীম প্রতিভাবলে, এক সুসঙ্গত কারণ প্রদর্শন করিয়া, আপনাদিগের সূক্ষ্মদর্শিতা ও

অসীম অনুসন্ধান-কৌশল প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা দুর্গাপুরের এক কুৎসিতা, বিগলিত-যৌবনা ধীবর-নন্দিনীকে বন্ধুদ্বয়ের প্রণয়িনীরূপে প্রতিপন্ন করিয়া, প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই দুর্ঘটনার একমাত্র মূল-কারণ-রূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। জেলেনী স্বয়ং জবানবন্দীতে এবং আনুষঙ্গিক আরও দুই একটি সাক্ষীর বাক্যে এ কথার সমর্থন হইয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায়, আরও অনেক অনুকূল প্রমাণ পুলিশের হস্তগত হইয়াছে। সুতরাং যদুপতি নিশ্চয়ই হৃদয়হীন বন্ধুহন্তৃ-রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছেন।

প্রায় দশবৎসর হইল এই ঘটনা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এতাবৎকাল যদুপতির আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তিনি জীবিত আছেন, কি কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছেন, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। যদুপতির সহধর্ম্মিণী, এক পুত্র প্রসব করিয়াই, সূতিকাগারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। যদুপতি আর দারপরিগ্রহ করেন নাই। সেই মাতৃহীন সন্তান বেতনভোগী দাস-দাসী দ্বারাই প্রতিপালিত হইত। এই দুর্ঘটনার সময়ে তাহার বয়স প্রায় দশ বৎসর। হরিপুরের হরিদাস রায়ের সহিত যদুপতির অতিশয় ঘনিষ্ঠতা ছিল। যদুপতির অন্তর্দ্ধানের কয়েক দিন পরে, সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিয়া, হরিদাস স্বয়ং স্বর্ণগ্রামে আগমন করেন এবং অন্যান্য বিষয়ের আবশ্যক-মত ব্যবস্থা করিয়া, যদুপতির পুত্র বিনোদবিহারীকে নিজালয়ে লইয়া যান। বিনোদ তথায় অপত্য-নির্ব্বিশেষে হরিদাস রায়ের পুত্র-রূপেই পরিচিত হইয়া জীবন যাপন করিতেছেন পিতৃমাতৃহীন বালক, যেরূপ যত্নে ও আদরে তথায় বাস করিতেছেন, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই।

পরলোক-গত জগদ্বন্ধু বসুর সংসারে পত্নী তারাসুন্দরী ও পাঁচ বছরের মেয়ে বিজলী ছাড়া কেহই ছিল না। উল্লিখিত দুর্ঘটনার কয়েক দিবস পরে, এক আত্মীয় ব্যক্তি তাঁহাদিগকে কলিকাতায় লইয়া যান। তাঁহারা এক্ষণে কি ভাবে, কোথায় বাস করিতেছেন, স্বর্ণ-গ্রামস্থ কোন ব্যক্তি তাহার সন্ধান জানে না। সেই আত্মীয় ব্যক্তি, সাত আট বৎসর তারাসুন্দরীকে নানাপ্রকার সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। গত দুই বৎসর তাঁহার আর কোনই সন্ধান নাই। তাঁহার সাহায্যে বঞ্চিত হওয়ার পর হইতে তারাসুন্দরীর দুর্দ্দশার ইয়ত্তা নাই। নিজের ও বিজলীর যে দুই চারি-খানি সামান্য অলঙ্কার ছিল, জীবন রক্ষার নিমিত্ত তাহা নষ্ট করিতে হইয়াছে। ঘরের দ্রব্যসামগ্রীও অনেক ধ্বংস হইয়াছে। তাঁহারা এক্ষণে কোথায় কি ভাবে অবস্থান করিতেছেন, পাঠকগণের তাহাও অবিদিত নাই।

স্বর্ণ-গ্রামের প্রায় তিন ক্রোশ দূরে জয়নগর নামে একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। সেখানে জমিদার রাসবিহারী নাগের বাস। তিনি সুবর্ণবণিক্‌জাতীয়। তাঁহার আয় বার্ষিক বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা; ক্ষমতা ও প্রতাপ প্রভূত। রাসবিহারীর তাদৃশ লেখা-পড়া বোধ ছিল না। তাঁহার চরিত্রও কোনরূপেই ভদ্র-জনোচিত ছিল না। কারণে বা অকারণে তিনি সন্নিহিত জনপদবাসী লোকদিগকে নিগৃহীত ও উৎপীড়িত করিতেন। এই জন্য চতুর্দ্দিকে পাঁচ শত ক্রোশ পর্য্যন্ত স্থানে তাঁহার নাম সভয়ে উচ্চারিত হইত এবং তাঁহার অত্যাচার-কাহিনী, অস্ফুটরূপে আলোচিত হইত। যে সময়ের কথা এই গ্রন্থে বিবৃত হইতেছে, তখন রাসবিহারীর বয়স বত্রিশ বৎসর

অন্তর্দ্ধানের বৎসর দুই পূর্ব্ব হইতে, যদু-পতির সহিত রাসবিহারীর বড়ই মনান্তর ঘটিয়াছিল। দুর্গাপুরের এক ব্রাহ্মণ, এক সময়ে নিতান্ত দায়গ্রস্ত হইয়া রাসবিহারীর নিকট কিছু টাকা ধার করিয়াছিলেন। রাসবিহারীর টাকা ধার করিলে কেহই শোধ করিতে পারিত না। কেন না সুদে আসলে সে টাকা রাসবিহারীর খাতায় ক্রমেই ফাঁপিয়া উঠিত। টাকার যতই উশুল দেওয়া হউক না কেন, আসল দূরে থাকুক সুদই শোধ হইত না। অধমর্ণ ব্রাহ্মণের ঋণ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল; এদিকে রাস-বিহারীও তাঁহার উপর নিতান্ত নির্য্যাতন আরম্ভ করিলেন। সেই ব্রাহ্মণের পঞ্চাশ বিঘা আমন ধানের জমি ছিল। সুদে আসলে টাকা ও সেই পঞ্চাশ বিঘা জমি না পাইলে, রাসবিহারী তাঁহাকে অব্যাহতি দিতে অস্বীকৃত হইলেন। এই জমিটুকু থাকায়, ব্রাহ্মণ একটু শ্রীমান্ লোকের অব-স্থায় দিনপাত করিতেন। তাহা ত্যাগ করিতে হইলে, তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে, ইহা তিনি বুঝিতেন। ব্রাহ্মণ রাসবিহারী দ্বারা তিরস্কৃত, অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইলেন। এইরূপ সময়ে স্বর্ণগ্রামের যদুপতি মিত্র, করুণা সহকারে ব্রাহ্মণের উপকারার্থ অগ্রসর হই-লেন। যত টাকা পাইলে রাসবিহারী, ব্রাহ্মণের উপর দাবী ত্যাগ করিতে সম্মত আছেন তত টাকাই যদুপতি প্রদান করি-লেন। ব্রাহ্মণ অব্যাহতি পাইলেন; কিন্তু যদুপতির উপর রাসবিহারীর বড়ই আক্রোশ জন্মিয়া থাকিল। যদুপতি প্রভূত ধনশালী ও বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। রাসবিহারী প্রকাশ্য-ভাবে তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারি-লেন না; কিন্তু একটা জাল এক-তরফা মোকদ্দমা করিয়া, যদুপতির বিরুদ্ধে প্রায় দুই হাজার টাকার এক ডিক্রি করিয়া রাখিলেন। এ সংবাদ যদুপতির গোচরে আসিবার পূর্ব্বে জগবন্ধুর হত্যাকাণ্ড সাধিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে যদুপতি অন্তর্হিত হইলেন।

যদুপতির অন্তর্দ্ধানের কয়েক দিবস পরে, রাসবিহারী সেই ডিক্রি জারি করাইয়া তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করাই-লেন; কিন্তু নীলামের দিন সদরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার লোকেরা দেখিল, ডিক্রির সমস্ত টাকা আদালতে জমা দেওয়া হইয়াছে। কে টাকা দিয়াছে, জানিতে না পারিয়া, যদু-পতির অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র বিনোদবিহারীর উপর রাসবিহারীর ভয়ানক ক্রোধ হইল এবং সুযোগ পাইলেই, তাঁহাকে বিলক্ষণরূপ শিক্ষা দিবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প হইল।

যদুপতি ও জগবন্ধুর বৃত্তান্ত একরূপ কথিত হইল। এই দুই ব্যক্তির তিরো-ধানের পর হইতে, স্বর্ণ গ্রাম শ্রীভ্রষ্ট হইল। জগবন্ধুর বাস-ভবন অধুনা পতনোন্মুখ হইয়াছে। যদুপতির প্রাসাদের তাদৃশ দুর্গতি না হইলেও, তাহার শোভা ও সৌন্দর্য্য অপগত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেক বৃক্ষ-লতাদি জন্মিয়া, অট্টালিকাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। তথায় সর্ব্বত্র পশু-পক্ষীর আবাস স্থান হইয়াছে। বাটীতে জন-প্রাণী নাই। সেই বিপুল গৃহ সামগ্রীও কিছুই নাই। সদর-দরজায় একটা মরিচা-ধরা ভাঙ্গা তালা লাগান আছে মাত্র।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বর্ণ গ্রামে এক-ঘর ব্রাহ্মণের বাস আছে। সেই ব্রাহ্মণ রাম-জীবন চক্রবর্ত্তী অধ্যাপকও নহেন, যাজকও নহেন। যৎসামান্য তেজারতি ও কিঞ্চিৎ কৃষি-কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তিনি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ

করেন। তিনি যদুপতি মিত্রের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠ ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই অনুগৃহীত। যদুপতিই তাঁহার স্বাধীনভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। রামজীবনের বয়স চল্লিশ বৎসর; দেহ কৃশ অথচ সুদীর্ঘ; বদনে শ্মশ্রু বা গুম্ফ কিছুই নাই তিনি শ্যামবর্ণ।

অপরাহ্ণকালে রামজীবন আপনার চণ্ডী-মণ্ডপে একটী মাদুরের উপর বসিয়া তামাক খাইতেছেন। তাঁহার সম্মুখে একটী বাক্স। তাহার উপর একখানি বালির কাগজের লম্বা খাতা। বাক্সের পাশে একখানা বড় মাটীর খুরীতে একটী দোয়াত ও চারিটী কালী; মাদুর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে এক চকমকির বাক্স; তাহার একটী ঘরে কতকগুলি কয়লা; অন্য ঘরে একখানা পাথর, ইস্পাত ও কয়েকখানি সোলা। গৃহের অন্যান্য আস্‌বাবের মধ্যে আর দুইটী মাদুর; আর দুইটা হুঁকা। রাম-জীবন ঘোর-চিন্তাকুল। কলিকার তামাক নিঃশেষিত হইলে, হুঁকা রাখিয়া তিনি বলিলেন —"সময় তো হইয়াছে। তবে এত দেরী হইতেছে কেন?"

একবার উঠিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। তাঁহার বাড়ি আসিবার পথের দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া দেখিলেন। পথ জনশূন্য! আবার চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে আসিয়া জাঁকাল করিয়া তামাক সাজিতে বসিলেন। তামাক সাজা শেষ হইলে তিনি মাদুরের উপর না উঠিয়া, মাটিতে বসিয়াই, তামাক টানিতে লাগিলেন।

এইরূপ সময়ে ভুবনদাস নামে এক কৈবর্ত্ত, একখানি ষ্ট্যাম্প-কাগজ হাতে লইয়া, তথায় উপস্থিত হইল। রামজীবন তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন—"তুমি এখন আসিলে ভুবন? এখন খৎই বা লিখিবে কে? টাকাই বা দেওয়া হইবে কিরূপে?"

ভুবন বলিলেন,—আমি তিনু দাদাকে বলিয়া আসিয়াছি; তিনিই আসিয়া খৎ লিখিয়া দিবেন এখন; আর সাক্ষীর জন্য পাড়ার দুই চারি জন লোক ডাকিয়া আনিলেই চলিবে।"

রামজীবন বলিলেন,—"তাহা বুঝিতেছি; কিন্তু আমি আজি সমস্ত দিন বড়ই ব্যস্ত থাকিব; আজি যে তোমার কাজ হইয়া উঠে, এমন বোধ হয় না।"

ভুবন বলিল,—"আমার তো আজি টাকা না হইলেই চলিবে না, দাদা-ঠাকুর! আপনি জানেন তো, আমার কি ভয়ানক দরকার।"

রামজীবন কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলি-লেন,—"তুমি ষ্ট্যাম্প-কাগজখানি আমার নিকট রাখিয়া যাও। আমি আপাততঃ দশটী টাকা দিতেছি; ইহাতেই আজি কাজ চালাও। আমি এখন বড় ব্যস্ত আছি; অধিকক্ষণ থাকিতেও পারিব না; কোন কথাবার্ত্তাও এখন হইবে না।"

ভুবন বলিল, | "তা—যে আজ্ঞা।"।

ভুবন ষ্ট্যাম্প-কাগজখানি রামজীবনের বাক্সের উপর ফেলিয়া দিল। রামজীবন বাক্স খুলিয়া একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিলেন এবং তাহা ভুবনের হাতে দিয়া বলিলেন,—'তুমি এখন যাও। কালি যেমন করিয়াই হউক, তোমার কার্য্য শেষ করিয়া দিব।"

ভুবন. অগত্যা নোট লইয়া এবং একটী প্রণাম করিয়া, প্রস্থান করিল।

বাস্তবিকই রামজীবন, আজি বড় ব্যস্ত। তিনি পরোপকারী, বুদ্ধিমান্ অথচ সৎস্বভাব, বিষয় কর্ম্মে বিশেষ চতুর ও অতিশয় সাবধান.। কোনরূপ দলিল না লেখাইয়া, এবং পাঁচ জন

সাক্ষী না রাখিয়া, কাহাকেও টাকা ধার দিবার লোক তিনি নহেন। আজি বাস্তবিকই তিনি একটু ব্যাকুল আছেন ; এই জন্যই এত সহজে ভুবনকে তিনি বিদায় করিলেন। গ্রামের আর কেহ, আজি তাঁহার নিকটে আইসে, ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে। তিনি আবার উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। আবার সেই গ্রাম্যপথের যত দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে, তত দূর দেখিতে থাকিলেন। পথ পূর্ব্ববৎ জন-শূন্য। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অচিরে একটা গাড়ু হাতে লইয়া প্রত্যাগত হইলেন। গাড়ুর জলে হাত ধুইয়া, গামছায় হাত মুখ মুছিয়া, গাড়ুর উপর গামছাখানি স্থাপন করিলেন। আবার এক বার বাহিরে যাইয়া পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন,—"তাই বোধ হয় ঠিক ; নিশ্চয়ই কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে। কি জানি, বড়ই চিন্তার বিষয়।"

আবার চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া তামাক সাজিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সহসা পার্শ্বস্থ পথে মনুষ্যের পদ-শব্দ শুনিয়া, তিনি কলিকা-তামাক ফেলিয়া বাহিরে আসিলেন। তৎক্ষণাৎ তিন ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। একজন পরম-রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন, পরিচ্ছন্ন-বেশধারী, নবীন যুবক। আর একজন একটা প্রকাণ্ড কার্পেটের ব্যাগ ও একটা মোট হস্তে ভৃত্য। তৃতীয় ব্যক্তি, স্বর্ণগ্রাম-নিবাসী, অথচ কলিকাতা-প্রবাসী, কৈবর্ত্ত শ্রীরাম দাস। তরুণ-বয়স্ক যুবক আমাদিগের সুপরিচিত বিনোদবিহারী রায়। সঙ্গে তাঁহার সুচতুর ও প্রিয় ভৃত্য রঘু।

বিনোদবিহারী ভক্তি-সহকারে রামজীবনের চরণে প্রণত হইলেন। রামজীবন সস্নেহে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। তখন ব্রাহ্মণের দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। সকলেই চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

সেই দিন সন্ধ্যার পর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অন্তঃপুরে, একখানি খড়ের ঘরের মধ্যে, তিন ব্যক্তি উপবিষ্ট—বিনোদবিহারী, রামজীবন ও শ্রীরাম। পিতলের একটী পিল্‌সুজের উপর মিট্ মিট্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে। ঘরে বিশেষ কোন আস্‌বাব নাই ; সামান্য একখানি তক্তাপোষের উপর একখানি কম্বল পাতা রহিয়াছে ; বিনোদ ও রামজীবন তাহাতেই উপবিষ্ট। মাটীর উপর একখানি মাদুর বিছাইয়া শ্রীরাম বসিয়া আছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের হাতে একটী ডাবা হুঁকা, আর বিনোদের সম্মুখে কতকগুলি কাগজ-পত্র রহিয়াছে। অন্যান্য নানা কথার পর, বিনোদ বলিলেন,—"এ কাগজে কেবল দারোগা, ইন্‌স্পেক্টরের রিপোর্ট এবং তাহাদের গৃহীত কয়েকটী সাক্ষীর জবানবন্দী আছে মাত্র। আপনারা সে সমস্ত কথা অবগত আছেন, মনে করিয়া, আমি এক্ষণে তাহা পাঠ করিবার প্রয়োজন দেখিতেছি না। কিন্তু এ সকল বৃত্তান্ত ব্যতীত, এতদ্বিষয়ক অন্যান্য আনুষঙ্গিক এমন অনেক ঘটনা থাকিতে পারে, যাহা জানিলে, অনুসন্ধানের বিশেষ সুবিধা হওয়া সম্ভব। আপনি আমাকে সম্প্রতি কোন্ পথ অবলম্বন করিতে বলেন ? আমি প্রথমে হুগলীতে পুলিশের সদর আফিসে অনুসন্ধান আরম্ভ করিব—না, এই স্থানে থাকিয়া, নিকটবর্ত্তী

স্থানসমূহে যে কিছু বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহারই চেষ্টা দেখিব ?”

রামজীবন বলিলেন,—“আমি তোমাকে এই দুই রকমের কিছুই করিতে বলি না বাবা! তুমি ছেলে মানুষ। তোমার এই সুখের শরীর। তোমাকে কোনরূপ কষ্ট করিতেই আমি বলিতে পারি না। তুমি মিত্র-দাদার একমাত্র সন্তান। তুমি বাঁচিয়া আছ—সুখ-স্বচ্ছন্দে আছ, এই আমাদের পরম সৌভাগ্য। তুমি থাকিলে, আবার সব হইবে বাবা! যাহা হইবার হইয়াছে। যদি কোন অনুসন্ধান করা নিতান্তই আবশ্যক বলিয়া স্থির কর, তাহা হইলে, যেরূপ করা তোমার অভিপ্রায় হয়, তাহা আমাদিগকে বল। শ্রীরাম ও আমি—উভয়েই এজন্য কোন ক্লেশ স্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ হইব না। তোমার কোন কষ্ট স্বীকার করিয়াই কাজ নাই।”

বিনোদ বলিলেন,—“আপনি স্নেহের প্রাবল্যে আমার প্রতি বড়ই অন্যায় আদেশ করিতেছেন। আমি পুত্র। বয়স অল্প হইলেও, আইন-মতে আমি এখন প্রাপ্ত-বয়স্ক হইয়াছি। নিরুদ্দেশ পিতার সন্ধান করা, অতঃপর আমার জীবনের একমাত্র কর্তব্য হওয়াই উচিত। যদি তাঁহার পরলোক গমনের কোন বিশ্বাসজনক সংবাদ পাওয়া যাইত, তাহা হইলে এসম্বন্ধে নিরস্ত থাকিলে চলিত। বসু মহাশয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু, নিতান্ত শোকজনক হইলেও তাঁহাকে বাঁচাইয়া আনিবার আর কোন আশা নাই; কিন্তু আপনারাও বুঝিতেছেন, আমিও বিশ্বাস করি, এমন কি, বসু মহাশয়ের বিধবা পত্নী তারাসুন্দরীও জানেন যে, আমার পিতার দ্বারা এরূপ কাণ্ড সংঘটিত হওয়া কখনই সম্ভব নহে। আমার পিতৃদেব এই-নিদারুণ কলঙ্কের ভার মাথায় লইয়া, নিরুদ্দেশ রহিলেন। আমি তাঁহার পুত্র, এ সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে লাগিলাম,—ইহাও কি কখনও মনুষ্যোচিত ব্যবস্থা ?”

শ্রীরাম দাস বলিল,—“আমি একটা নিবেদন করি। বাবু যাহা বলিতেছেন তাহার উপর আর কথা নাই। সাবালক হওয়ার পর, প্রথমেই এই বিষয়ের সন্ধান করা, বাবুর প্রধান কাজ হওয়াই উচিত। একটা চূড়ান্ত রকম চেষ্টা না করিয়া চুপ থাকা, বড়ই দোষের কথা।

রামজীবন বলিলেন,—“ধর্ম্ম-মতে, শাস্ত্র-মতে এবং লোকাচার-মতে এ কাজ যে পুত্রের প্রধান কর্তব্য, তাহা আমি বুঝি। কিন্তু শ্রীরাম! তুমি বাবাজীকে এখন কি করিতে বল? স্থানীয় সন্ধান তৎকালে অনেক করা হইয়াছে। সে সকল কথা, আমাদিগের বেশ মনে আছে। নূতন সন্ধান, এখানে আর কি হইবে তাহা তো আমি বুঝিতেছি না।”

বিনোদ বলিলেন,—“তাহা আমি ঠিক্ বলিতে পারি না। অনুসন্ধান-কালে এরূপ বিষয়ের কিরূপে কোন্ প্রমাণ সহসা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা বলা যায় না। আমি ইংরাজীতে অনেক পুস্তক ও খবরের কাগজে এরূপ ব্যাপারের বিবরণ বহু দিন হইতে যত্ন-সহকারে পাঠ করিয়া আসিতেছি। কলি-কাতায় আমার এক পরম বন্ধুর পিতা গোয়েন্দা-পুলিশের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। তিনি আমাকে বড়ই ভালবাসেন। তাঁহার সহিত আমি এ বিষয়ের অনেক পরামর্শ করিয়াছি এবং তাঁহার নিকট আমি বিস্তর সদুপদেশ পাইয়াছি। বুঝিয়াছি, এরূপ ব্যাপারে বড় বড় ঘটনা ধরিয়া

অনুসন্ধান করিলে, বিশেষ ফল হয় না। পুলিশ বা অন্যান্য লোক, সাধারণতঃ মোটা বিষয়গুলির উপরেই দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করেন ; কিন্তু সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি প্রায়ই এড়াইয়া যায়। অথচ হয় তো সেইরূপ একটা ক্ষুদ্র ঘটনা ধরিয়া অনুসন্ধান চালাইলে, মূল বিষয়ের অনেক ব্যাপারই, বুঝিতে পারা যায়।”

রামজীবন বলিলেন,—“এ কথা অসম্ভব নহে ; কিন্তু এ বিষয়ে পুলিশ সে সময়ে অনুসন্ধানের কোনই ত্রুটি করে নাই। কোনও ক্ষুদ্র ঘটনাই তাহারা ছাড়িয়া দিয়াছে, আমার এরূপ বোধ হয় না। আমি তো এ বিষয়ে কোন জায়গায় ফাঁক দেখিতেছি না বাবা।”

বিনোদ বলিলেন,—“পুলিশের অনুসন্ধান কিছুই নহে। তাহারা সরকারের বেতনভোগী লোক। যাহা হয় একটা মীমাংসা করিয়া দিতে পারিলেই, তাহাদের ঝঞ্জাট মিটিয়া যায়। সুতরাং তাহাদের রিপোর্টের উপর বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা, আমাদের উচিত নহে। আমরা এ ব্যাপার নিশ্চয়ই স্বতন্ত্রচক্ষে দেখিব। প্রাণের মমতা হৃদয়ের ভালবাসা, রক্তের টান্, এই সকলের উত্তেজনায় আমরা কাজ করিব। সুতরাং আমাদের চেষ্টা যে অন্যরূপ হইবে, তাহার কোনই ভুল নাই।”

রামজীবন বলিলেন,—“বড় ভাল কথাই তুমি বলিতেছ বাবা ! আমরা এক প্রকার মূর্খ লোক ; এমন সূক্ষ্ম বুদ্ধি আমাদের নাই। তোমার কথা শুনিয়া আমার বড়ই আশা হইতেছে যে, হয় তো এতদিনে এই ব্যাপারের একটা কিনারা হইবে। আমাদিগকে যাহা করিতে বলিবে, তাহাতেই আমরা রাজি আছি কিন্তু কথাটা এই—এখানে রাসবিহারী নাগ চিরদিনই মিত্র-দাদার বড়ই শত্রু। শুনিয়াছি, তোমার উপরেও তাহার ভয়ানক রাগ। সে লোকটা বড়ই দুর্দ্দান্ত। সেই জন্যই আমি বলিতেছি, তুমি যেখানে আছ, সেখানেই সুখস্বচ্ছন্দে থাক। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার পায়ে যেন কাঁটার আঁচড়ও না লাগে। যাহা যাহা করিতে হইবে, আমাদিগকে তাহা বলিয়া দিয়া তুমি এস্থান হইতে চলিয়া যাও।”

শ্রীরাম বলিল,—“এ কথা ঠিক। সোণার বেণে বেটা, না পারে এমন কাজ কিছুই নাই। সে যে রাগিয়া আছে, এ কথা সকলেই জানে। কিন্তু বাবু না লাগিয়া থাকিলে, আমাদের বুদ্ধিতে সকল বিষয়ের যে সুবিধা-মত অনুসন্ধান হইবে, ইহা আমার বোধ হয় না। আমি বলিতেছি,—এই বাড়ীতেই হউক, বা অন্য জায়গায় হউক, বাবু লুকাইয়া থাকুন। আমরা বাবুর পরামর্শ-মত কাজ করিতে থাকি।”

বিনোদ বলিলেন,—“তাহাতে বিশেষ ফল হইবে না। তোমাদের সাহায্য আমার বিশেষ আবশ্যক হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি স্বয়ং অনুসন্ধান না করিলে ফল কিছুই হইবে না এবং আমার মনেরও তৃপ্তি জন্মিবে না। বিপদ ও অনিষ্টের আশঙ্কা ত্যাগ করিয়া সকল ঘটনাই আমি স্বয়ং আলোচনা করিব। অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে। প্রাণের ভয়ে আমি কোন কর্ম্মেই ক্ষান্ত হইব না। আপনারা অকপটভাবে আমার সাহায্য করিবেন ভরসা আছে ; আমি কেবল তাহাই চাহি।”

রামজীবন বলিলেন,—“আশীর্ব্বাদ করি ঈশ্বর তোমার অভীষ্টসিদ্ধ করুন। এক্ষণে তুমি কি স্থির করিতেছ বল ?”

বিনোদ বলিলেন,—“আপনারা মোটামুটী সকল বিষয়ই জানেন। তথাপি ঘটনার যে যে স্থান আপনাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার, তাহা আমি বলিতেছি। তাহার পর কি করা কর্ত্তব্য, তাহা হয় তো আপনারা সহজেই স্থির

করিতে পারিবেন। প্রথমে দেখুন, দুর্গাপুরের পুকুরে যে লাস ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহার দেহের অনেক স্থান ক্ষত-বিক্ষত। ডাক্তার সাহেব বলিতেছেন, ক্ষুদ্র ছুরিকা দ্বারা সেরূপ ক্ষত হইতে পারে না, বড় তরবারি, বা নেপালের ভোজালিয়া দ্বারা সেরূপ আঘাত হওয়া সম্ভব। বুঝিয়া দেখুন, আমার পিতা ও বসু মহাশয় একসঙ্গে বাটী হইতে বাহির হইয়াছিলেন; সেরূপ একখানা প্রকাণ্ড অস্ত্র কাপড়ের মধ্যে, বা জামার পকেটে লুকাইয়া লওয়া কখনই সম্ভব নহে। পথে বহুলোকের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল; কেহই এরূপ অস্ত্র তাঁহাদের নিকট দেখে নাই। তাহার পর দেখুন, লাসের গায়ে যে জামা ছিল, তাহার কোন স্থানে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নাই। যে বধ করিয়াছে সে কি হত ব্যক্তির জামা খুলিয়া মারিয়া ফেলার পর, তাহার গায়ে পুনরায় জামা পরাইয়া জলে ডুবাইয়া দিয়াছে? আরও দেখুন, লাস দেখিয়া যে যে ব্যক্তি সনাক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভাল চিনিতে পারেন নাই বলিয়াছেন। প্রথমতঃ ফুলিয়া ও পচিয়া লাস অত্যন্ত বিরূপ হইয়াছিল তাহার পর অস্ত্রাঘাতে তাহার নাক ও কাণ ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, মাছে ও অন্যান্য প্রাণীতে দেহের কোন কোন অংশ খাইয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং তাহা যে, জগবন্ধু বসুর দেহ, এ কথা নিশ্চিতরূপে কেহই বলিতে পারে নাই। তাঁহার স্ত্রী, হয় তো সে অবস্থায় দেখিয়াও, স্বামীর দেহ নিশ্চিত রূপে চিনিতে পারিতেন; কিন্তু পুলিশ, তাঁহাকে সনাক্ত করিতে লইয়া যায় নাই। তথাপি তাহা যে জগবন্ধুর দেহ, তাহা মীমাংসা করিবার অন্য কারণ আছে। সে কারণ ঐ জামা। এ জামা যে জগবন্ধুর তাহা অনেকেই বলিয়াছে এবং তিনি যে ঐ জামা গায়ে দিয়াই সে দিন বাহির হইয়াছিলেন ইহা অনেকে দেখিয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। বিশেষতঃ সেই জামার পকেটে দুইখানি পত্র ছিল; সে পত্র দুইখানি জগবন্ধু নামে লিখিত; ডাকযোগে সেই দিন প্রাতে তিনি তাহা পাইয়াছিলেন। আর দেখুন একটা ইতর স্ত্রীলোক ঘটিত বিরোধ এ ব্যাপারের কারণ বলিয়া পুলিশ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; কথাটা সম্পূর্ণই অবিশ্বাস্য। কেন না সকল সাক্ষীই আমার পিতা ও বসু মহাশয়কে সম্পূর্ণ সচ্চরিত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। আমার পিতা পত্নী-হীন যুবা পুরুষ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে কোন চরিত্রহীনা স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি নিতান্ত অসম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু তিনি প্রভূত ধনশালী ব্যক্তি; ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির নিমিত্ত একটা অতি কুৎসিতা—নিতান্ত ইতর জাতীয়া স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি, তাঁহার পক্ষে সম্ভব বলিয়া আমার বোধ হয় না। এজন্য দুই ক্রোশ দূরে, এক দরিদ্রা নারীর পতনোন্মুখ কর্ণকুটীরে, যাতায়াত করা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত বলিয়া আমি বোধ করি না। যদি সে হতভাগিনী কোন উপায়ে আমার পিতৃদেবের চিত্তাকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে তাহা হইলে, ভাবিয়া দেখুন, আমার পিতৃদেব স্বাধীন ব্যক্তি ছিলেন; এজন্য গৃহে বিবাদ করিবারও কোন লোক ছিল না; তিনি অনায়াসে তাহাকে স্বকীয় ভবনে আনিয়া রাখিতে পারিতেন। যদি মনে করা যায় তিনি বড় লোক-প্রিয় ছিলেন, সমাজ-রঞ্জন এরূপ অনুষ্ঠান করেন নাই, তাহা হইলে দেখিতে হইবে, তিনি দানে বা পরোপকারে বা অন্য কোন কার্য্যেই ব্যয়-কুণ্ঠ ছিলেন না;

এরূপ ব্যক্তি বাটীতে স্থান না দিলেও স্বতন্ত্র স্থানেও যে আপনার প্রণয়িনীর উপযুক্ত বাসস্থান বা বসন-ভূষণাদির ব্যবস্থা করিয়া দিবেন না, এরূপ কখনই সম্ভব নহে। তাহার পর দেখিতে হইবে যে, পুলিশের মীমাংসাতে আমার পিতার অধঃপতনের কিছুই বাকী ছিল না; তিনি বেশ্যাসক্ত, সুরপায়ী নরহন্তা —যে সে মনুষ্য নহে—আপনার চিরদিনের অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদের প্রাণনাশকারী। এত অধঃপতন যাহার হইয়াছে, সে কি খুন করিয়া সুদীর্ঘ কালের জন্য পলাতক হইয়া থাকে? সে অর্থ দ্বারা, সুদক্ষ আইনজ্ঞ লোকের দ্বারা, আপনার নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। এবং সম্ভবতঃ রাজবিচারে সহজেই নিষ্কৃতিলাভও করিত। এরূপ অনেক ঘটনা সতত ঘটিয়া থাকে। আর দেখুন, খুন করিবার সময় কেহই কাহাকে দেখে নাই। প্রধান সাক্ষী রাসবিহারী নাগ বলিতেছেন, তিনি সেই দিন সন্ধ্যার পর, আমার পিতাকে দুর্গাপুরের মাঠ দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই—তিনি ধনবান্ ও প্রবল-প্রতাপ লোক—তিনি তখন সে মাঠে কি করিতে গিয়াছিলেন? অন্ধকারে তিনি তখন আমার পিতাকে স্পষ্টরূপে চিনিলেন কিসে? যদি চিনিয়াই থাকেন, তাহা হইলে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না কেন? মোটামুটি দেখিতে গেলে, আইনের চক্ষুতে আমার পিতার খুন করা অপরাধ এক প্রকার সপ্রমাণ হইয়াছে বটে; কিন্তু সূক্ষ্মরূপে—আমার ন্যায় দৃষ্টিতে বিচার করিলে ইহার অনেক স্থানেই গলদ দেখা যায়। আমি যাহা যাহা বলিলাম, সেই সকল কথার যখন সুমীমাংসা হইয়া যাইবে তখন আমার পিতাকে নরহন্তা বলিয়া আমি কেন সকলেই বিশ্বাস করিবে। আপাততঃ আমার বিশ্বাস ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন বিশেষ ভুল আছে।”

রামজীবন বলিলেন,—তোমার কথা শুনিয়া আমারও সম্পূর্ণরূপে তাহাই বিশ্বাস হইতেছে। এ ব্যাপার যে মিথ্যা, তাহা আমরা ঠিক জানি; কিন্তু পুলিশের দ্বারা যে প্রমাণ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা যে সম্পূর্ণরূপ বিরুদ্ধ, ইহাই আমরা স্থির বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, পুলিশের সে মীমাংসা আগাগোড়াই ভুল।

শ্রীরাম বলিল,—“আমি বেশ বুঝিতেছি, বাবুর কথামত সন্ধান চালাইলে নিশ্চয়ই সকল মীমাংসা উল্টাইয়া যাইবে। আমি এজন্য শরীরপাত করিতে প্রস্তুত আছি। এক্ষণে বাবু কি স্থির করিতেছেন বলুন।

বিনোদ বলিলেন,—আমি মনে করিতেছি কল্য আপনাদের দুই জনকে সঙ্গে লইয়া আমি একবার দুর্গাপুর যাইব। ঘটনার স্থানটা আমি স্বচক্ষে একবার দেখিব, আর আবশ্যক বুঝিলে, দুর্গাপুরের দুই একটী লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিব। তাহার পর এ সম্বন্ধে কোন্ পথে চলা আবশ্যক তাহা স্থির হইবে। অতি বাল্যকালে আমি এদেশ ত্যাগ করিয়াছি! পথ ঘাট ভুলিয়া গিয়াছি; লোকেও আমাকে চিনিবে না, আমিও অনেককে চিনিব না: এই জন্যই আপনাদিগকে সঙ্গে যাইতে বলিতেছি, নতুবা আমি একাই যাইতাম। তাহার পরে যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহার ভার আপনারাই গ্রহণ করিবেন। রাসবিহারীর ভয়ে আপনারা চিন্তিত হইবেন না। আমি কল্য একবেলা মাত্র এখানে থাকিব। ইহারই মধ্যে রাসবিহারী যে আমার কোন গুরুতর অনিষ্ট করিতে পারিবে, এরূপ আশঙ্কা নাই।”

রামজীবন বলিলেন,—"যত বিপদই হউক, আর যাহাই ঘটুক, এবিষয়ের অনুসন্ধান করিতেই হইবে। বাবাজীর কথাই ঠিক থাকিল। কল্য প্রত্যুষে দুর্গাপুর যাওয়া যাইবে।"

দশম পরিচ্ছেদ।

দশ বৎসরের পূর্ব্বে, যে জলাশয় সমীপে ঘোরতর নৃশংস কাণ্ড সঙ্ঘটিত হইয়াছিল; যে স্থানে, বিনোদের দেবোপম পিতা স্বহস্তে, খরধার অসির তীক্ষ্ণ আঘাতে, বাল-বন্ধুর হৃদয় ও দেহের অসংখ্য স্থান ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছেন; সেই স্থানে, অদ্য বিনোদ চিন্তাকুলিত চিত্তে উপস্থিত হইলেন। সেই দুর্ঘটনার স্মৃতি সাধারণ মনুষ্যের হৃদয় হইতে প্রায় অপগত হইয়াছে। কাল স্বকীয় সর্ব্ব-সাধন ক্ষম হস্ত দ্বারা, সেই হৃদয়বিদারক ঘটনার যাবতীয় চিহ্ন বিধৌত করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু বিনোদের হৃদয়ে আজ তাহা নবীভূতরূপে জাগরূক হইল। যেন গতকল্য সায়ংকালে সেই বিজাতীয় ব্যাপার সংসাধিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। হৃদয় অবসন্ন হইল; বক্ষ-বেপন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; হস্তপদ যেন শক্তি-শূন্য হইয়া পড়িল। শ্রীরাম ও রামজীবন তাঁহার সঙ্গী।

অনেকক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া, বিনোদ বলিলেন, "খুড়ামহাশয়! এই স্থানেই আমার পিতার শেষ পদচিহ্ন নিপতিত হইয়াছিল। এই স্থানই তাঁহার অমূলক কলঙ্ক-কালিমার শেষ নিদর্শন। এই স্থান হইতেই তাঁহার জন্মভূমির সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এস্থান অন্যের পক্ষে পাপ-নিকেতন হইলেও, আমার চক্ষুতে ইহা পবিত্র পুণ্যতীর্থ। আপনারা অনুমতি করুন, আমি এই স্থানে আমার নিরুদ্দেশ জনকের উদ্দেশে প্রণাম করি।"

রামজীবনের চক্ষুতে জল আসিল। বিনোদ তত্রত্য মৃত্তিকায় ললাটস্পৃষ্ট করিয়া প্রণত হইলেন। যখন তিনি গাত্রোত্থান করিলেন, তখন তাঁহার নয়নে জল। বলিলেন,—"খুড়ামহাশয়! আমি পিতার আদেশ শ্রবণ করিয়াছি। আমার আয়াস নিষ্ফল হইবে না। আমার পিতা নিষ্পাপ—দেবতা। তাঁহার আশীর্ব্বাদ আমি লাভ করিয়াছি। সেই আশীর্ব্বাদ-বলে আমি তাঁহার অলীক কুকীর্ত্তির অমূলক প্রসঙ্গ নির্ম্মূল করিতে পারিব।"

রামজীবন বলিলেন,—"আমি ব্রাহ্মণ; কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার সঙ্কল্প সফল হউক।"

বিনোদ ভক্তিসহকারে তাঁহার চরণ-ধূলি মস্তকে স্থাপন করিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ স্থানে লাস ভাসিয়া উঠিয়াছিল?"

রামজীবন বলিলেন,—"কোন্ স্থানে লাস ভাসিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমি দেখি নাই। আমাকে যখন সনাক্ত করিবার নিমিত্ত চৌকিদার ডাকিয়া আনিয়াছিল, তখন লাস জমির উপর তোলা হইয়াছিল। সে স্থানটী পূর্ব্বদিকে। আমি যেন এখনও সেই স্থানে লাস দেখিতেছি।"

শ্রীরাম বলিল,—"যেখানে লাস ভাসিয়া উঠিয়াছিল, আমি তাহা জানি। যখন মড়া ভাসিয়া উঠিয়াছে বলিয়া প্রচার হইল, তখনই আমি দেখিতে আসিয়াছিলাম। দারোগা আসার পর লাস ডাঙ্গায় তোলা হইয়াছিল। তখন আমার বয়স এই বাবুর মত। সকল

কথাই আমার বেশ মনে আছে। আসুন আমার সঙ্গে, আমি সে স্থান দেখাইয়া দিতেছি।"

শ্রীরাম অগ্রগামী হইল, বিনোদ ও রামজীবন তাহার অনুসরণ করিলেন। পুষ্করিণীর পূর্ব্ব তীরে উপস্থিত হইয়া, শ্রীরাম একটা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,—"এই স্থানে লাস ফেলিয়া রাখিয়াছিল।" আর একটা ঢিল জলের উপর ছুড়িয়া বলিল,—"ঠিক ঐ স্থানে লাস ভাসিতেছিল।"

বিনোদ উভয় স্থানই দর্শন করিলেন। বিজলীর পিতা নিদারুণ যন্ত্রণায় বিগতজীব হইয়া যে স্থানে ভাসিয়াছিলেন এবং যে স্থানে তাঁহার সেই পুতিগন্ধপূর্ণ বিকৃত-দেহ রক্ষিত হইয়াছিল, উভয়ই তিনি দর্শন করিলেন। কিন্তু সেই হৃদয়-বিদারক অতীত কাণ্ডের কোন চিহ্নই অধুনা বর্ত্তমান নাই। তাহার পর বিনোদ পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া দেখিলেন। এক স্থানে জলে তিনটী বক চরিতেছিল; বিনোদ নিকটস্থ হইলে তাহারা উড়িয়া গেল। জলমধ্যে মৎস্য আস্ফালন করিল; জলে তজ্জন্য তরঙ্গ উঠিল। তীরের নিকট কল্মীলতা ভাসিতেছিল, সেই তরঙ্গ লাগায় একটু দুলিয়া উঠিল। পুষ্করিণীর দক্ষিণদিকে একটু ঘনারণ্য ছিল; বিনোদ সেদিকেও গমন করিলেন। একটা গোসাপ গ্রীবা বক্র করিয়া, কিয়ৎকাল তাঁহাদিগকে দর্শন করিল, তাহার পর পলাইয়া গেল। বিনোদ বলিলেন,—"এই পুষ্করিণীর নিকটেই যদি খুন হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বনের নিকটই সে কাজ শেষ হওয়া সম্ভব। যদিও এ পুষ্করিণীর নিকটেই লোকের বাস নাই, তথাপি দেখা যাইতেছে, ইহার উত্তর দিক দিয়া চলাচলের রাস্তা রহিয়াছে। সুতরাং লুকাইয়া খুন করার পক্ষে এই বনের পার্শ্ব ব্যতীত আর কোথাও সুবিধা দেখা যাইতেছে না। এ স্থানটা দেখা হইল; চলুন এখন একবার আমরা গ্রামের মধ্যে যাই।"

তাঁহারা যখন পথে উঠিলেন, সেই সময় দুই জন কৃষক মাঠে যাইতেছিল। তাহারা রামজীবনকে প্রণাম করিল। একজন বলিল,—"চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সকালবেলা কোথায় চলেছ?"

রামজীবন বলিলেন,—"তোদেরই গাঁয়ে যাচ্ছি।"

কৃষকদ্বয় চলিয়া গেল। রাসবিহারী নাগ যে স্থান হইতে যদুপতি মিত্রকে পলাইতে দেখিয়াছিল, গমনকালে বিনোদ সে স্থান দেখিয়া লইলেন এবং তখন যদুপতি যেখানে ছিলেন বলিয়া রাসবিহারী জবানবন্দী দিয়াছে, তাহাও তিনি জানিয়া লইলেন। উভয় স্থানের দূরত্ব তিনি অনুমান করিয়া লইলেন। তাহার পর তাঁহারা ক্রমশঃ দুর্গাপুর গ্রামে উপস্থিত হইলেন।

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"খুড়া মহাশয়! এ গ্রামে রাসবিহারীর কোন প্রবল শত্রু আছে, আপনি জানেন?"

রামজীবন বলিলেন,—"কোন্ গ্রামে নাই? দশ ক্রোশের মধ্যে সকল গ্রামে, সকল লোকই রাসবিহারীর পরম শত্রু। কিন্তু কেহই তো তাহা সাহস করিয়া স্বীকার করিবে না।"

শ্রীরামকে বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"কোনও স্ত্রীলোককে রাসবিহারী প্রাণের সহিত ভালবাসে, এমন সংবাদ তুমি রাখ কি?"

শ্রীরাম বলিল,—"রাসবিহারী শত শত স্ত্রীলোককে এ পর্য্যন্ত ভালবাসিয়া আসিতেছে; কিন্তু কাহারও সহিত তাহার ভালবাসা দুই চারি মাস—বড় জোর এক বৎসরের অধিক

থাকিতে দেখা যায় না। প্রথম প্রথম রাসবিহারী মনের মত স্ত্রীলোক দেখিলে পাগল হইয়া উঠে; তাহার জন্ত খুন-খারাপি করিতেও ভয় পায় না। কিন্তু কিছুদিন পরে, আর একটা স্ত্রীলোক চখে পড়িবামাত্রই, রাসবিহারী সাবেকটাকে দূর করিয়া দেয়; হয় তো তাহার আর খোঁজও লয় না। এ বিষয়ে তাহার লজ্জাসরম লুকোচুরি কিছুই নাই।”

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—“এরূপ স্ত্রীলোক এ গ্রামে কেহ আছে?”

শ্রীরাম উত্তর দিল,—“অনেক থাকাই সম্ভব। তবে একটার কথা আমি বিশেষ বলিতে পারি। সে চঁড়ালের মেয়ে। কিন্তু তেমন সুন্দরী আমি তো আর কোথাও দেখি নাই। তাহার স্বামী চাষ করিত। ঐ পুকুরের পশ্চিম ধারে তাহার ক্ষেত ছিল। রাসবিহারী অনেক কাণ্ড করিয়া চাঁড়াল বউকে হস্তগত করে। স্বামীটা স্ত্রীকে বড়ই ভালবাসিত। দুর্দান্ত লোকের সহিত সে যখন কোনই বিবাদ করিতে পারিল না, আর ইহার প্রতিকারও যখন তাহার দ্বারা কিছু হইল না, তখন সে বেচারা এ গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।”

বিনোদ উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—“পলাইয়া কোথায় গেল?”

শ্রীরাম বলিল,—“তাহা কেহ বলিতে পারে না। শুনা যায় কোন দূরদেশে গিয়া সে চাষ আবাদ করিতেছে।”

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—“কত দিন হইল, সে চলিয়া গিয়াছে?”

শ্রীরাম বলিল,—“তাহা ঠিক বলিতে পারি না। সে একটা সামান্ত লোক। কবে কোন্ সময়ে সে কি করিয়াছে, তাহা মনে করিয়া রাখা বা তাহার বিশেষ সন্ধান করা যায় না। তবে যে সময়ে এই খুন হইয়াছে, সেই সময়ে চাঁড়াল বউয়ের সঙ্গে রাসবিহারীর খুব চলাচলি। বোধ হয় এই ঘটনার কিছু আগে বা কিছু পরে, সে মনের দুঃখে দেশ ছাড়িয়াছে।”

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—“তাহার পর তাহার স্ত্রীর কি হইল?”

শ্রীরাম বলিল,—“কিছুদিন পরে একটা মুসলমানের মেয়ের জন্ত রাসবিহারী উন্মাদ হইয়া উঠিল। আহা! সেই মেয়েটার ভাইকে রাসবিহারী যেরূপ কষ্ট দিয়াছিল, তাহা মনে হইলে এখনও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।”

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—“তাহার ভাইকে এরূপ কষ্ট দিয়াছিল কেন?”

শ্রীরাম বলিল,—“তাহার ভাই বলিয়াছিল, ‘আমার জান্ থাকিতে আমার বহিনকে কখনই রাসবিহারী বাবু ছুঁইতে পাইবে না।’ রাসবিহারী রাগে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া, সদর কাছারি বাড়ীতে তিন দিন গাছে পা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। তাহার হাত পায়ের নখের মধ্যে কাঁটা ফুটাইয়া দিয়াছিল। তাহার নাক আর একটা কাণ কাটিয়া দিয়ছিল। তাহার পর তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া, তাহার সম্মুখেই তাহার ভগিনীর সর্ব্বনাশ করিয়াছিল।

বিনোদ চমকিত হইলেন; মনে মনে ভাবিলেন, ক্ষণিক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্ত মানুষ এমন বিগর্হিত ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিতে পারে, ইহা স্মরণ করিলেও হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে। জিজ্ঞাসা করিলেন,—“সে মুসলমান এখন কোথায় আছে?”

শ্রীরাম বলিল,—“এই কাণ্ডের পর তাহার শরীর একেবারে ভাজিয়া গিয়াছে। সে আর খাটিয়া খাইতে পারে না। কলিকাতার এক

মসজিদের কাছে বসিয়া সে ভিক্ষা করে। বোধ হয় এখনও কলিকাতায় আছে।"

বিনোদ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তার পর—সে চাঁড়ালের স্ত্রীর কি হইল?"

শ্রীরাম বলিল,—"রাসবিহারী তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ ছাড়িয়া দিল। তাহার রূপ-যৌবন যথেষ্ট ছিল। ধর্ম্ম হারাইয়া সে তখন সাধারণ বেশ্যা হইয়া উঠিল। বোধ হয় সে এখন হুগলীতে কোন ধনবান্ লোকের আশ্রয়ে সুখ স্বচ্ছন্দে আছে।"

বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর সেই মুসলমানের ভগিনী—সে কোথায় গেল?"

শ্রীরাম বলিল,—"কিছুদিন পরেই রাসবিহারী তাহাকেও ছাড়িয়া দিল। সে নিকটেই আর এক গ্রামের এক মুসলমানের সহিত নিকা করিয়া গৃহস্থ ভাবেই আছে।"

বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খুড়া মহাশয়! সে জেলেনীর বাড়ী কোথায়? আমাকে একবার সে বাড়ীটাও দেখাইয়া দেন।"

রামজীবন বলিলেন,—"সে বড় বেশী তফাৎ নয়—আইস।"

একটু অগ্রসর হইয়াই, রামজীবন একখানি অতি সামান্য খড়ের ঘর দেখাইয়া দিয়া বলিলেন—"এই তাহার বাড়ী।"

সেই সময় এক মলিনবসনা বৃদ্ধা একঝুড়ি ঘুঁটে লইয়া বাহিরে আসিল। রামজীবন বলিলেন,—"এই সেই জেলেনী।"

বিনোদ বিশেষরূপে তাহাকে চিনিয়া রাখিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"এ গ্রামে আমার যাহা দেখিবার ছিল, তাহা একরূপ শেষ হইল। চলুন, এক্ষণে আমরা বাটী ফিরি। আজ মধ্যাহ্নকালে আমি হুগলী যাত্রা করিব। শ্রীরামকে আমার সহিত যাইতে হইবে। আপাততঃ রাসবিহারী কোন্ কোন্ বিষয়ে কিরূপ অত্যাচার করিতেছে, আপনি তাহার সন্ধান রাখিবেন এবং বিশেষ কোন সংবাদ পাইবামাত্র হুগলীতে আমার নামে "পোষ্ট-মাষ্টারের নিকটে পৌঁছে" এই ঠিকানা দিয়া তাহা লিখিয়া পাঠাইবেন। আমাকে সম্ভবতঃ আরও অনেক বার এখানে আসিতে হইবে। সমস্ত সংবাদ আমার মুখেই আপনি শুনিতে পাইবেন। কোন গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইলে, আমি আপনাকে পত্র লিখিয়া জানাইব।"

রামজীবন জিজ্ঞাসিলেন,—"কোন বিশেষ কথা বুঝিতে পারিলে কি বাবা?"

বিনোদ উত্তর দিলেন,—অনেক কথা বুঝিতে পারিয়াছি খুড়া মহাশয়! কিন্তু আর একটু পাকা রকম না বুঝিলে আপনাকে তাহা জানাইতে পারিব না।

দূরে ঘোড়ায় চড়িয়া একটী লোক আসিতেছিল। ঘোড়া, বিশেষ বলশালী ও সতেজ হইলেও, আরোহীর ইচ্ছানুসারে ধীরে ধীরে চলিতেছিল। তাহার সম্মুখে দুই জন ও পশ্চাতে দুইজন লাঠিয়াল। রামজীবন দূর হইতেই লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"কি সর্ব্বনাশ! রাসবিহারী যাগ আসিতেছে। এক্ষণে বাবাজীকে কোথায় লুকাই?"

বিনোদ বলিলেন,—লুকাইবার আবশ্যক নাই। যদি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলিবেন, আপনার বিশেষ আত্মীয়ের পুত্র। এদেশে একবার বেড়াইতে আসিয়াছেন।"

বড়ই উৎকণ্ঠার সহিত তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুই সম্প্রদায় নিকটস্থ হইলে, রামজীবনের দল পথের একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন; রাসবিহারীর দল মধ্য দিয়া

চলিতে লাগিল। পাশাপাশি হইলে, রাসবিহারী জিজ্ঞাসা করিল,—কি ঠাকুর, কোথায় গিয়াছিলে?

রামজীবন সসম্মানে উত্তর দিলেন,—এই দুর্গাপুরেই একটু দরকার ছিল।

রাসবিহারী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—সঙ্গে এ বাবুটী কে?

রামজীবন বলিলেন,—"আমার একটী আত্মীয়ের ছেলে; একবার এদেশ বেড়াইতে আসিয়াছেন।"

রাসবিহারী জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় নিবাস?

"কলিকাতা।"

রাসবিহারী বলিলেন,—"কলিকাতার লোক বন দেখিতে পায় না। এখানে তাই দেখিতে আসিয়াছ বাবু? ঠাকুর, আমার বাটীতে তোমার আত্মীয়কে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে; এদেশের রাজাই আমি; যদি কিছু দেখিতে শুনিতে হয়, তাহা হইলে আমার বাটীতে যাওয়াই আবশ্যক।"

বিনোদ বলিলেন—আপনার বাটীতে গিয়া, আপনার সহিত দেখা করিবার আমার বিশেষ প্রয়োজনও আছে; কিন্তু এ যাত্রায় ঘটিবে না। আর এক যাত্রায় আসিয়া আপনার সহিত নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ করিতে যাইব।

রাসবিহারী চলিয়া গেল, রামজীবন বলিলেন,—"বাব! বাব! আমার বড়ই ভয় হইয়াছিল।"

বিনোদ বলিলেন,—"বড়ই ভাল হইয়াছে। ঐ লোকটাকে বিশেষ করিয়া চিনিয়া রাখা আমার বড়ই আবশ্যক।"

তাঁহারা রামজীবনের বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। তাড়াতাড়ি সে স্থানে আহারাদি শেষ করিয়া, সেই দিনই বিনোদ, শ্রীরাম ও রঘু হুগলী যাত্রা করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

হরিপুরে রায়দিগের বিশাল ভবনের অন্তঃপুরস্থিত একটী প্রকোষ্ঠে একটী বাতায়ন খুলিয়া, অপরাজিতা অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে অন্তঃপুর-সংলগ্ন উদ্যান। তথায় কত রকমের কতই ফুল ফুটিয়াছে। বলনিপুণ বায়ু তাহাদিগকে লইয়া বড়ই কৌতুক করিতেছে। একটা ফুলকে ধাক্কা দিয়া, আর একটা ফুলের গায়ে ফেলিয়া দিতেছে; সে ফুলটা যেন "ছিঃ! কর কি?" বলিয়া পিছাইয়া যাইতেছে। কোথাও ফুল নাচিতেছে ও দুলিতেছে। কোথাও বা ফুলে ফুলে আলিঙ্গন করিতেছে। কোথাও নির্লজ্জ ভ্রমর, ফুলের উপর বসিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু শকুন্তলার ন্যায় বিব্রত হইয়া, ফুল কেবলই মাথা নাড়িতেছে ও গা দুলাইতেছে। অপরাজিতা বাতায়ন-সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই সকল ব্যাপার দেখিতেছিলেন কি না। তিনি ভাবিতেছেন, বিনোদ তিন দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন; ছয় দিন হইয়া গেল, তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, তিনি ফিরিয়াও আসিলেন না। কেন এরূপ হইল?

নিঃশব্দে পশ্চাতের দ্বার দিয়া ব্রজেশ্বরী সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন,—"এখন হইতে তোমার ভাইরা, তোমার

অপেক্ষায়, ফুলবাগানে বসিয়া থাকিবেন ঠিক্ হইয়াছে কি?”

অপরাজিতা, চিন্তার ভাব ত্যাগ করিয়া হাসিমুখে বলিলেন,—“আমার ভাইরা চোর নহেন।”

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—“সে কথা তো আমি জানি; তাঁহাদিগকে চোরার জন্য লুকাইয়া থাকিতে হয় না। সদরে যাঁহারা প্রাণের সুভ-দ্রাকে লইয়া সুখে থাকিতে পারেন, তাঁহাদের লুকোচুরির প্রয়োজন কি?”

অপরাজিতা বলিলেন,—“ভাইয়ের ভাল-বাসা সদরে ভোগ করিবারই জিনিষ। আমার বোধ হয়, এ সংসারে ভাইয়ের অপেক্ষা মিষ্ট সামগ্রী আর কিছুই নাই। স্বামী, নারীজাতির দেবতা—পরম পদার্থ; তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া পূজা করা ও কায়মনোবাক্যে তাঁহার মনো-রঞ্জন করা নারীর ধর্ম্ম। ভাইয়ের প্রতি ভাল-বাসায় সে ধর্ম্মপালনের কোনই ব্যাঘাত হইতে পারে না। আমরা ভালবাসা কথাটাকে বড় বিকৃত করিয়া বুঝি। ভালবাসা বলিলে, একটা দৈহিক সুখের সম্বন্ধ আমরা জড়াইয়া ফেলি। তাই, পরম প্রণয়ের পদার্থ; ভাইকেও ‘ভাল-বাসি বলিতে আমরা কুণ্ঠিত হই।”

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—“অত কথা আমরা বুঝি না; তোমার মত পণ্ডিতও আমি নহি, অধ্যাপক-ঠাকুরণও নহি। মোটের উপর বুঝিলাম, তুমি নিজমুখে স্বীকার করিয়াছ, ভাই তোমার বড় প্রাণের সামগ্রী। তা বেশ তো ভাই, তার জন্য এত বক্তৃতাতেই বা কাজ কি, আর লম্বা চওড়া কথাতেই বা দরকার কি? এখন হইতে তোমাকে আর ঠাকুর-ঝি না বলিয়া সতীন বলিয়াই ডাকিব। বোধ হয় তাহা হইলে তুমি আমাকে সন্দেশ খাওয়াইবে।”

অপরাজিতা বলিলেন,—“সন্দেশ খাওয়াইব কি কিসে খাওয়াইব, তাহার ব্যবস্থা ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিব। সপত্নী কথাটা হইতেই সতীন কথা জন্মিয়াছে। ভগিনী লোকতঃ ধর্ম্মতঃ চিরদিন ভাইয়ের ভগিনীই থাকিবে, পত্নী কখনই হইবে না। মনুষ্য-সমাজের ব্যবস্থা যাহাই হউক, আমার বিবেচনায়, ভগিনীর সম্বন্ধ বড়ই মধুর, বড়ই পবিত্র এবং বড়ই কোমল। পত্নীর সহিত পতির সম্বন্ধ লৌকিক, পতি-পত্নীর মিলন একটা ঘটনামাত্র এবং একটা দৈহিক সম্বন্ধের উপর তাহার ভিত্তি। কিন্তু ভাই-ভগিনীর সম্বন্ধ আজন্ম, পূর্ব্বাগত এবং অবিচ্ছেদ্য। পতির সহিত পত্নীর মনের একতা না হইলে, একের প্রতি অন্যের অনুরাগ না জন্মিলে এবং একে অপ-রের তৃপ্তি না হইলে, তাঁহাদের সম্বন্ধ বিছিন্ন হইয়া যায়, অশেষ অনর্থের উদ্ভব হয়, পুণ্য-ক্ষেত্রে পাপের স্রোত বহিতে থাকে এবং সুখের সংসারে পিশাচ নৃত্য করে। কিন্তু ভাই ও ভগিনীর সম্বন্ধ সেরূপ নহে। স্নেহে বা বিদ্বেষে, অনুরাগে বা বিতৃষ্ণায়, আদরে বা অনাদরে সকল অবস্থাতেই ভাই-ভগিনী, ভাই-ভগিনীই থাকিবেন। লোকে স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলে। বাস্তবিক একটা বলিয়া আনা জিনিষের পক্ষে অর্দ্ধাঙ্গ হইলেই যথেষ্ট গৌরব হইল; কিন্তু ভাই-ভগিনী সমাজ; কারণ এক উপাদানে উভয়েরই দেহ গঠিত; সমান স্নেহে উভয়েই লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত; এক আনন্দময় আশ্রয়ে উভয়েরই বাল্যজীবন অতিবাহিত এবং এক সুখময় জোগ্যদ্রব্য সেবনে উভয়েই পরিপুষ্ট। আমার বোধ হয়, ভাই-ভগিনীর মত সম্বন্ধ, পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। বউ দিদি, আমি ভাইকে ভালবাসি বলিয়া তুমি চিরদিন আমাকে বিদ্রূপ

করিও, তোমার রসিকতার ভাণ্ডারে যত কথা সঞ্চিত আছে, সে সমস্ত ব্যবহার করিয়া আমাকে লাঞ্ছিত করিও ; বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, আমি তাহাতে গৌরব অনুভব করিব। তবে সপত্নী বলিয়া যদি আমাকে বিদ্রূপ কর, তাহাতে আমি শতবার আপত্তি করিব। কেন না পত্নী, পতির দাসী, সেবিকা, ভোগ্যা, লালসা-তৃপ্তির কেন্দ্র ; কিন্তু ভগিনী ভ্রাতার মন্ত্রী, সুখ-সৌভাগ্যের অনুরাগিণী এবং সর্ব্ব-বিষয়ে অভিন্নহৃদয়া হিতৈষিণী।”

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—“সকল কথাই তো বুঝিলাম। যদি এতই হইয়া থাকে, তাহা হইলে সপত্নীও হও না কেন? তাহাতে মধুর সম্বন্ধ আরও মধুর হইয়া উঠিবে।”

অপরাজিতা বলিলেন,—“তাহা হইবার হইলে তোমাদের ধরিয়া আনিতে হইত না।”

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—“ভাল, এক ভাইয়ের জন্য তো এখনও ধরিয়া আনা হয় নাই। সেই খালি জায়গাটায় তুমি জুড়িয়া বইস না কেন? বড়ই মানাইবে ভাল ; দুই বিদ্বানে মিলিবে বেশ ; আর রূপে ঠাকুরপো যেমন অতুলনীয়, তুমিও তেমনই ভুবনমোহিনী। বল যদি, আমি এই মাসেই তাহা ঘটাইয়া দিতে পারি।”

অপরাজিতা বলিলেন,—“যদি তোমার কথার কোন অর্থ থাকিত, তাহা হইলে আমি জবাব দিতাম। বিনোদের ন্যায় ভাই পাইয়া বাস্তবিকই আমি আপনাকে ভাগ্যবতী জ্ঞান করি। তাঁহার জন্য, তোমার মত, একটী সন্তান প্রসব করিবার লোকের দরকার হইবে বটে। হাজার হাজার লোক ধন সম্পত্তি লইয়া তাহার উমেদারী করিতেছে। তাহার মধ্য হইতে দেখিয়া, শুনিয়া, বাছিয়া, বিচার করিয়া একটা—ইচ্ছা হইলে দশটা উঠাইয়া আনিলেই হইবে। কিন্তু আমি তাঁহার ভগিনী ; সংসারের সর্ব্বস্ব দান করিয়াও তুমি তাঁহার আর একটা ভগিনী আনিয়া দিতে পারিবে কি?”

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—“ঠাকুরঝি তোমার মুখে এই সকল মধুর কথা শুনিয়া, আর তামাসার কথা বলিতে লজ্জা হয়। এ সংসারে ভাইয়ের মর্য্যাদা তুমিই বুঝিয়াছ। তোমার ন্যায় ভগিনী যাহাদের আছে, সে ভাইরা বাস্তবিকই ধন্য। তোমাকে ঠাকুর-ঝি পাইয়া, তোমার ভাইয়ের দাসীরা নিশ্চয়ই সকল যন্ত্রণা, সকল ক্লেশ অতিক্রম করিয়া পরমানন্দে জীবন কাটাইবে।”

অপরাজিতা, ব্রজেশ্বরীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—“বাস্তবিকই তোমরা তামাসা করিয়া যাহাই বল না কেন, ভাই বড় আদরের বস্তু। ভাই যাহাকে ভাল বাসিয়া তৃপ্ত হন, ভাই যাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া আনন্দ লাভ করেন, ভগিনীর চক্ষুতে তিনিও বড়ই আদ-রের সামগ্রী। বলিয়াছি তোমাকে, ভাই ভগিনী সমান। আমি তোমাকে প্রাণের ভালবাসা মিশাইয়া চুম্বন করি। প্রার্থনা করি, তুমি দেবতার ন্যায় সন্তান প্রসব করিয়া আমার পিতৃবংশ উজ্জ্বল কর।”

অপরাজিতা, অনেকক্ষণ ব্রজেশ্বরীর কণ্ঠা-লিঙ্গন করিয়া, তাঁহার বুকের উপর পড়িয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন,—“বিনো-দের নিমিত্ত আমার বড়ই ভাবনা হইয়াছে বউ দিদি! আত্মীয়ের কঠিন পীড়া বলিয়া বিনোদ কলিকাতায় গিয়াছেন। দুই তিন দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন কথা ছিল। তিনি ফিরিয়াও আসিলেন না, তাঁহার কোন সংবাদও পাওয়া গেল না।”

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—“চিন্তারই বিষয় বটে। তোমার দাদাও এজন্য ভাবিতেছেন।

মা কতবারই এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হয় তো সে আত্মীয়ের পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছে।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"অসম্ভব নহে। কিন্তু তাহা হইলেও বিনোদ তো একটা সংবাদ দিতে পারিতেন। তাঁহার নিজের কোন পীড়া হওয়াও বিচিত্র নহে।"

এক জন ঝি আসিয়া অপরাজিতার হাতে একখানি ডাকের চিঠি দিল এবং বলিল,—"ছোট বাবুর পত্র, বড় বাবু তোমার কাছে দিতে বলিলেন। তাঁহার নামেও একখানি আসিয়াছে।"

অপরাজিতা তাড়াতাড়ি পত্র খুলিয়া ফেলিলেন। পত্রে লিখিত ছিল,—

"স্নেহের অপি!

তোমার নিকট বলিয়া আসিয়াছিলাম, আমি তিন দিনের মধ্যে বাটী ফিরিব; কিন্তু কোন অতি প্রয়োজনীয় কর্ত্তাব্যানুরোধে আমাকে কিছুকাল ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। কত দিনে ফিরিতে পারিব, ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। কোথায় থাকিব, তাহারও বিশেষ স্থিরতা নাই। যেখানে থাকি, সময় ও সুযোগ পাইলেই তোমাকে সংবাদ দিব। তুমি চিন্তা করিও না। আমি যে কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছি, তাহার বৃত্তান্ত তোমাকে নিজ মুখে বলিব; পত্রে তাহা লিখিবার সময় নাই। আমাদিগের দুই বউ দিদিটাকে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইবে। দাদাকে স্বতন্ত্র পত্র লিখিলাম। ইতি।

তোমার ভাগ্যবান্ অগ্রজ
বিনোদ।"

অপরাজিতা বলিলেন—"বড়ই চিন্তার কথা! সহসা বিনোদের কি প্রয়োজন উপস্থিত হইল! নানা স্থানে ঘুরিতে হইবে, কত দিনে কার্য্য শেষ হইবে তাহারও স্থিরতা নাই নিশ্চয়ই ব্যাপার গুরুতর—বিপজ্জনকও হইতে পারে।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"কিছুই বুঝা যাইতেছে না। জানি না ঠাকুরপো কি কাণ্ড ঘটাইয়াছেন।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"তুমি যাও বউ দিদি, দাদার পত্রখানি দেখিয়া আইস। যদি তাহাতে কোন গোপনীয় কথা না থাকে, তাহা হইলে সে খানি চাহিয়া লইয়া আইস। আমার পত্র তো তুমি দেখিয়াই চলিলে।"

ব্রজেশ্বরী প্রস্থান করিলেন। যতীন্দ্র বাবুর নিকট যে পত্র আসিয়াছিল, তাহাতে লিখিত ছিল,—

"শ্রীচরণকমলেষু,
প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন,

বড়ই ভয়ানক প্রয়োজনে আমাকে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইতেছে। কোথায় কখন থাকিব এবং কি কি করিব, তাহা এখনও স্থির করিতে পারি নাই। যে প্রয়োজনে যাইতেছি, তাহাতে হয় তো অনেক টাকা খরচ হইলেও হইতে পারে। আমার হাতে বড় বেশী টাকা নাই। একটা স্থানে স্থির হইয়া বসিতে পারিলেই, আপনার নিকট টাকা চাহিয়া পাঠাইব। আশঙ্কার বিশেষ কোন কারণ নাই। আমি অতি সাবধানে থাকিব ও সতর্কতার সহিত কাজ কর্ম্ম করিব। সঙ্গে বিশ্বাসী ও পুরাতন ভৃত্য মধু থাকিবে। আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন আমি অভীষ্টসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারি। শ্রীমতী মাতৃদেবীকে আমার অসংখ্য প্রণাম জানাইবেন। অপরাজিতাকে স্বতন্ত্র পত্র লিখিলাম। ইতি

সেবক শ্রীবিনোদবিহারী রায়।"

ব্রজেশ্বরীর হস্তে এই পত্র দিয়া যতীন্দ্র বলিলেন,— "ভয়ানক ভাবনার বিষয়। আমি পত্র পাঠ করিয়া বুঝিতেছি, বিনোদ নিশ্চয়ই কোন বিপজ্জনক ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছেন। তুমি অপিকে এ পত্র দেখাইতে পার। মনে করিতেছি, সংসারের একটা সুব্যবস্থা করিয়া, আর কিছু টাকা লইয়া, আমি হয় তো কালই কলিকাতায় যাইব।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—তুমি কলিকাতায় গিয়া কি করিবে? ঠাকুরপো তো কলিকাতা হইতে চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় আছেন, জানিতে পারিলে তোমাকে এখনই সেখানে যাইতে বলিতাম। ঠাকুর-ঝি সকল বিষয়ই বুঝেন ভাল; তুমি তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া, যাহা হয় স্থির কর।"

ব্রজেশ্বরীর হস্ত হইতে পত্র লইয়া, যতীন্দ্র স্বয়ং অপরাজিতার নিকট চলিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বেলা সাড়ে সাতটার সময় হুগলীর ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-অব্-পুলিশ সাহেবের দ্বারে বিনোদ দণ্ডায়মান। তিনি, কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যক্ষ সাহেবের নিকট হইতে, পুলিশ সাহেবের উপর, এক পরিচায়ক পত্র লইয়া আসিয়াছেন। বিনোদ কালেজের একজন অতি সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান্ ও প্রতিষ্ঠা-ভাজন ছাত্র। অধ্যক্ষ তাঁহাকে যথেষ্ট ভাল বাসেন। পুলিশ সাহেব ও কালেজের অধ্যক্ষ সাহেব নিতান্ত বিভিন্ন-কর্ম্মাবলম্বী হইলেও, অতি নিকট কুটুম্বিতা-সূত্রে উভয়েই ঘনিষ্ঠরূপে সংবদ্ধ। বিনোদ, দ্বারবান্ দ্বারা সেই পত্র, সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়া, দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন।

শীঘ্রই দ্বারবান্ ফিরিয়া আসিল এবং সাহেবের সেলাম জানাইল। বিনোদ সাহেবের কুঠির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেলাম ও শিষ্টাচার সমাপ্ত হইলে, সাহেব তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে বলিয়া জিজ্ঞাসিলেন —"আমার দ্বারা আপনার কোন্ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে?"

বিনোদ সবিনয়ে বলিলেন,—"আমি একটা পুরাতন চাপা-পড়া কথা লইয়া আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি। দশ বৎসর পূর্ব্বে, ১১ই কার্ত্তিক তারিখে, এই থানার অধীনে দুর্গাপুর গ্রামে, একটা খুন হইয়াছিল। সৌভাগ্য ক্রমে আপনি সে সময় এ জেলার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন; আবার নানা জেলা ঘুরিয়া, সম্প্রতি এই খানেই আসিয়াছেন।"

সাহেব একটু চিন্তা করিয়া, বলিলেন,— "যদুপতি মিত্র কর্ত্তৃক জগবন্ধু মিত্রের হত্যা-কাণ্ডের কথা আপনি বলিতেছেন কি? বড়ই দুঃখের বিষয়, অদ্যাপি সে খুনের কোন কিনারা হয় নাই। আসামী আজিও পলাতক।"

বিনোদ বলিলেন,—"তাহা আমি জানি। আমি এক্ষণে সবিনয়ে আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি, যদুপতি মিত্রকেই হত্যা-কারী বলিয়া মীমাংসা করিবার কি কি কারণ আছে?"

সাহেব বলিলেন,—"সকল কথা আমি এখন ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। কেন না, অনেক দিনের ঘটনা; সকল কথা মনে থাকা সম্ভব নহে। আপনি যে মহাত্মার পত্র

ইয়া আসিয়াছেন, তাহাতে আপনাকে সম্পূর্ণ পে বিশ্বাস করিয়া, সকল কথা জানাইতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা রি, এ বিষয়ের সহিত আপনার কি সম্বন্ধ? কন আপনি এই অতীত পুলিশ-কাহিনীর উদ্ধার করিতে উৎসুক হইয়াছেন?

বিনোদ বলিলেন,—"আপনি যেরূপ সরতার সহিত আমার প্রতি অনুগ্রহ করিতে চ্ছা প্রকাশ করিলেন, তাহাতে অকপটভাবে আপনাকে সকল কথা জানাইতে আমি বাধ্য। কিয়ৎকাল নিস্তব্ধতার পর, সাশ্রুনয়নে ও বিকৃত রে বিনোদ বলিলেন,—"সেই যদুপতি মিত্র হাশয় আমার পিতা।"

সাহেব, গম্ভীর-মুখে সমবেদনা-ব্যঞ্জক রে, বলিলেন, "বড়ই দুঃখের বিষয়। আপার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, আমি আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। অন্য কথার র্ব্বে, এস্থলে একটী প্রয়োজনীয় কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। প্রিন্সিপাল সাহেবর পত্রে দেখিতেছি, আপনার নাম বিনোদহারী রায়। আর যদুপতির উপাধি ছিল মত্র। আপনি কেমন করিয়া তাঁহার পুত্র ইতে পারেন?"

বিনোদ বলিলেন,—"এই দুর্ঘটনার পর রিপুরের ৺ হরিদাস রায় মহাশয় আমাকে জের বাটীতে লইয়া যান এবং ঔরস-পুত্রের য় যত্নে আমার লালন পালন করিতে থাকেন। খন আমার বয়স ১১।১২ বৎসর। আমি দবধি তাঁহারই পুত্ররূপে পরিচিত হইয়া সিতেছি এবং আমার নামের সহিত হারই উপাধি সংযুক্ত হইয়াছে।"

সাহেব বলিলেন,—"সকল গোলই তো টিয়া রহিয়াছে। আপনি এ ভয়ানক কাণ্ডের ধান কর্ত্তার সহিত লোকতঃ সকল সম্পর্কই ত্যাগ করিয়াছেন। যদুপতির উপাধি, তাঁহার বাসভবন, তাঁহার পরিচয় সকলই আপনি ছাড়িয়াছেন—ভালই করিয়াছেন। কিন্তু এত দিন পরে এ সম্বন্ধে আপনার কৌতুহল কেন জন্মিল? কেন আপনি, ইচ্ছা পূর্ব্বক ঘটনার যবনিকা ভেদ করিয়া, অতীত রহস্য জানিবার নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছেন?"

বিনোদ বলিলেন,—"সহসা কোন কৌতুহল হেতু আমি এ বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই নাই। চিরদিনই এ সম্বন্ধে আমার মনে প্রবল বাসনা আছে। নিরুদ্দেশ পিতার সন্ধান করিব, ইহাই আমার চিরদিনের সংকল্প। কিন্তু আমি এতদিন নাবালক ছিলাম। আমার কথা, ইহার পূর্ব্বে কোথাও গ্রহণীয় হইত না। অনেকে হয় তো বালকের কথা বলিয়া হাসিয়া উড়াইত। রাজদ্বারেও আমার কথা, শ্রবণযোগ্য হইত না। এই জন্যই এত দিন, প্রবল বাসনা থাকিলেও, আমি এই কর্ত্তব্য-পালনে অগ্রসর হইতে পারি নাই। এখন আমার বয়স হইয়াছে। আইনের চক্ষুতে ও লোকের বিচারে আমি আর এখন বালক নহি। এই জন্যই আমি সম্প্রতি এ কার্য্যের ভার মাথায় লইয়া এক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছি।"

সাহেব বলিলেন,—"বুঝিলাম, আপনি পিতার সম্বন্ধে পুত্রের অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্যসাধনের অভিপ্রায়ে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতেছি, আপনার এ কার্য্য ভাল হইতেছে না। আপনার পিতা, ঘোরতর দুষ্কর্ম্ম করিয়াও, স্বকীয় ক্ষমতা বা বুদ্ধিবলে রাজকর্ম্মচারীদিগের অলক্ষিত-ভাবে, লুক্কায়িত থাকিয়া জীবনপাত করিতেছেন। আপনার অত্যধিক আগ্রহ এবং অনাবশ্যক পিতৃভক্তি হয় তো তাঁহার সর্ব্বনাশের হেতুভূত

হইবে। হয় তো সরকারী কর্ম্মচারী আপনার পিতার যে সন্ধান এত দিন করিয়া উঠিতে পারে নাই, আপনি তাহা সহজেই করিয়া উঠিতে পারিবেন। সরকারী কর্ম্মচারী অনুসন্ধানার্থ আসিতেছে শুনিয়া, আপনার পিতা হয় তো স্বকীয় প্রচ্ছন্ন অবস্থানস্থান অধিকতর প্রচ্ছন্ন করিতেছেন; কিন্তু আপনি আসিতেছেন সংবাদ পাইলে, তাঁহার সে সাবধানতা বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং স্বাভাবিক অপত্য-স্নেহ, তাঁহাকে হয় তো সহজেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রবৃত্ত করিবে। তাহা হইলেই, এতদিন পরে তিনি হয় তো সহজে ধরা পড়িবেন। অতএব আপনার এই পিতৃ-ভক্তি, বর্ত্তমানস্থলে পিতৃশক্রতায় পরিণত হইবে।"

বিনোদ বলিলেন, "আপনার এই সদ্যুক্তি-পূর্ণ সদুপদেশহেতু আমি আপনাকে বার বার আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার হৃদয় লইয়া আপনি এ ঘটনার আলোচনা করিতে পারিতেছেন না; আমার প্রণালীর অনুসরণ-ক্রমে আপনি সমস্ত ব্যাপারের বিচার করিতেছেন না; এবং আমার চক্ষু লইয়া আপনি আদ্যোপান্ত বিষয়-সমূহ দেখিতেছেন না। আমার বিশ্বাস— পিতৃদেব এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক; তাঁহার চরিত্র, চিরদিনই সর্ব্বত্র সমাদৃত; তাঁহার শিক্ষা ও সংসর্গ সকলই এ কার্য্যের বিরোধী। আমার এই অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি সামান্য কৌতূহল-সম্ভূত নহে। আমি আমার পূজনীয় পিতৃদেবকে লোকের চক্ষুতে সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক ভাবে উপস্থিত করিব, তাঁহার সম্বন্ধে যত কিছু কলঙ্কের কথা বা কুকীর্ত্তির প্রসঙ্গ জন-সমাজে প্রচারিত হইয়াছে, তৎসমস্ত ধৌত করিব এবং রাজদ্বারে বা রাজকর্ম্মচারীদিগের সমক্ষে তিনি যে অপরাধে অপরাধী হইয়া আছেন, তাহা হইতে তাঁহাকে নির্ম্মুক্ত করিব। জগদীশ্বর কৃপা করিলে আমার এ সংকল্প নিশ্চয়ই সংসিদ্ধ হইবে। পিতার চরিত্র সম্বন্ধে যদি আমার একটুও অবিশ্বাস থাকিত, এই দারুণ দুষ্ক্রিয়া-সাধনে তিনি সম্পূর্ণ অক্ষম, ইহা যদি আমার স্থির বিশ্বাস না হইত, এবং নিশ্চয়ই কোন কল্পনাতীত ব্যাপার, অচিন্তনীয় উপায়ে তাঁহাকে অন্যায় অপরাধী করিয়া রাখিয়াছে, ইহা যদি আমার ধ্রুব সিদ্ধান্ত না হইত তাহা হইলে, আমি কদাপি এ সন্ধানে হস্তক্ষেপ করিতাম না।

সাহেব বলিলেন,—"আমি আপনার পিতৃভক্তির বার বার প্রশংসা করিতেছি। আপনাকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিতে আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু আপনি ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখুন, পিতৃভক্তির প্রাবল্যে এবং কর্ত্তব্যপালন প্রবৃত্তির আতিশয্যে আপনি ঘটনাগুলিকে উপযুক্তরূপ আলোচনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি না।—বহুদিনের কথা, সকল ঘটনা আমার ঠিক্ মনে নাই। কিন্তু ইহা আমার বেশ মনে আছে যে, তৎকালে যেরূপ প্রমাণাদি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে আপনার পিতার অপরাধ একরূপ অবধারিত হইয়াছিল। আপনি সমস্ত বিষয়টা কিরূপ শুনিয়াছেন ও কিরূপ বুঝিয়াছেন, তাহা একবার আমার নিকট বলুন দেখি।"

পুলিশের রিপোর্ট পাঠ করিয়া, সাক্ষীর জবানবন্দী দেখিয়া ও সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া, বিনোদ যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত করিলেন। রামজীবন চক্রবর্ত্তীর নিকট যেরূপভাবে তিনি হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, সাহেবের নিকটও তাহাই করিলেন। সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া সাহেব বলিলেন,—"আমি এখনই আপনাকে কো

কথা বলিতে পারিলাম না। এ সম্বন্ধে পুলিশের তদন্ত তখনই শেষ হয় নাই। পরেও পুলিশ-তদন্ত চলিয়াছে, এখনও চলিতেছে। আপনি সে সকল কথা কিছুই জানিতে পারেন নাই। আজি আপনি প্রস্থান করুন। আমি অগ্র আফিসে গিয়া এ বিষয়ের সমস্ত কাগজপত্র দেখিয়া রাখিব এবং আর যাহা যাহা জানা আবশ্যক, সমস্ত জানিয়া আসিব। কল্য প্রাতে আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তখন আপনার সমস্ত কথার আমি উত্তর দিব। এ বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিতও আমি পরামর্শ করিব। আবশ্যক হইলে, আপনি যাহাতে তাঁহারও সাহায্য পাইতে পারেন, আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিব।"

বিনোদ গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—"আপনাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া আমি এক্ষণে বিদায় হইতেছি।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিনোদ বাসায় ফিরিলেন। শ্রীরাম, গত রাত্রিতে ১০ টার সময় বাহিরে গিয়াছে—এখনও ফিরে নাই। ব্যস্ততা-সহকারে বিনোদ স্নানাদি সম্পন্ন করিলেন।

তখন একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ি বিনোদের বাসার দ্বারে লাগিল। গাড়ি হইতে বাহির হইল—শ্রীরাম দাস। কাহার সাধ্য তাহাকে আর শ্রীরাম দাস বলে? সে একটা প্রকাণ্ড বিলাসী বাবু। তাহার গায়ে সিল্কের গেঞ্জি। তাহার উপর অতি উত্তম আদ্দির পাঞ্জাবী, বুকের উপর সোণার চেন, কাঁধের উপর ফরাসডাঙ্গার সুন্দর উড়ানী, পরিধান সিমলার কালপেড়ে ধূতি, পায়ে ডসনের জুতা; মাথার মাঝখান দিয়া এলবার্ট কাটা ছিল; এখন কেশগুলা সুবিন্যস্ত নাই; একটু আলুথালু। তথাপি গত রাত্রিতে যে তাহার মধ্যস্থান সযত্নে চিরিয়া দেওয়া ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। তাহার গায়ে আতরের গন্ধ ভুর্ ভুর্ করিতেছে। সে, গাড়ির বাহিরে আসিয়া, পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া বলিল,—"আজি বোধ হয় আর দরকার হইবে না। দরকার হইলে খবর পাঠাইব।" কোচ্ম্যান্ টাকাটী গ্রহণ করিল, এবং অতীব সম্মান সহকারে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

শ্রীরামের চক্ষু একটু রক্তবর্ণ; মুখেও একটু দুর্গন্ধ। সে, বাসায় প্রবেশ করিয়া, বিনোদের নিকট গেল না। নীচে তাহার থাকিবার স্থান। সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া, যেমন কৈবর্ত্ত সে চিরদিন ছিল, সেইরূপই হইয়া পড়িল। তাহার পর রঘুর নিকট বাবুর খোঁজ করিল। তাহার পর স্নানাদি শেষ করিল।

বিনোদ, আহারাদি শেষ করিয়া, শয্যার উপর বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। এমন সময়ে শ্রীরাম সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দূর হইতে ভূলগ্ন মস্তকে তাহাকে প্রণাম করিল এবং বলিল,—"একটু বলিবার মত সংবাদ আছে।"

বিনোদ বলিলেন,—"বল।"

শ্রীরাম বলিল,—"দাস যে দিন পুকুরে ভাসিয়া উঠে, নিধে চাঁড়াল, তাহার একদিন পূর্ব্ব হইতে বাটী আইসে নাই।"

"সে এখন কোথায় আছে, তাহা তাহার স্ত্রী জানে কি?"

"আজ্ঞে না। নিধে তাহার স্ত্রীকে বড় ভালবাসিত। রাসবিহারী বলপূর্ব্বক তাহার স্ত্রীর ধর্ম্মনষ্ট করিলেও, নিধে স্ত্রীকে ত্যাগ করে নাই। সে তাহাকে লইয়া ঘরকন্না করিত এবং কি উপায়ে দুর্গাপুর হইতে চলিয়া গিয়া দেশান্তরে বাস করিতে পারে, স্বামী-স্ত্রীতে তাহার উপায় চিন্তা করিত।"

"রাসবিহারী কি নিধের বাটীতে আসিত?"

"না। নিধেরস্ত্রীকে রাসবিহারীর লোকেরা লইয়া যাইত।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"নিধের সম্মুখেই এ কাণ্ড ঘটিত? নিধে তাহার প্রতীকার করিতে পারিত না?

"আজ্ঞে না। তাহাকে চুপ্ করিয়াই থাকিতে হইত। তাহার বউ প্রথম প্রথম কাঁদা-কাটা করিত, যাইতে নারাজ হইত। কিন্তু লোকেরা, জোর করিয়া লইয়া যাইত। শেষে সে আর কথা কহিত না—লোক আসিলেই সঙ্গে যাইত। নিধে পাড়া-প্রতিবেশীর নিকট কাঁদাকাটা করিয়া সাহায্য চাহিয়াছিল; কিন্তু রাসবিহারীর ভয়ে কোন কথাই কেহ বলে নাই।"

বিনোদ বলিলেন,—"এরূপ অত্যাচার করিয়া, রাসবিহারী চাঁড়াল-বউকে কোন পুরস্কার দিয়াছিল?"

শ্রীরাম বলিল—"আজ্ঞে না। সে পাত্র রাসবিহারী নহে। পূজার সময় সে চাঁড়াল-বউকে একখানি বিলাতী কাপড় কিনিয়া দিয়াছিল। চাঁড়াল-বউ তাহা এক দিনও ব্যবহার করে নাই।"

"কেন নিধে দেশত্যাগী হইল তাহার কোন কারণ চাঁড়াল-বউ অনুমান করিতে পারে?"

শ্রীরাম বলিল,—"নিরুদ্দেশ হওয়ার দুই এক দিন আগে রাসবিহারীর সহিত নিধের খুব বচসা হইয়াছিল।"

"কোথায়?"

"গ্রামের মাঝেই। রাসবিহারী তাহাকে স্ত্রী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলে। সে তাহাতে রাসবিহারীকে অনেক কথা শুনাইয়া দেয়। রাসবিহারী রাগের ভরে তাহাকে চাবুক মারে। নিধেও তাহাকে পাঁচনবাড়ি দিয়া বিলক্ষণ দুই চারি ঘা দেয়। সে মাঠে লোক ছিল না। রাসবিহারীও ঘোড়ার উপর একা ছিল। কাজেই সে মারি খাইয়া পলাইয়া যায়। এ কথা নিধে আসিয়া তাহার স্ত্রীর নিকট বলিলে সে স্বামীকে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতে বলে। তাহার পর দূরে গ্রামান্তরে জায়গা ঠিক করিয়া একদিন রাত্রিতে আসিয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পরামর্শ দেয়। কথাটা দু'জনেই ভাল বলিয়া মনে করে। দুর্গাপুরে থাকিলে, রাসবিহারী নিশ্চয়ই যে নিধেকে প্রাণে মারিবে, তাহা তাহাদের দু'জনেরই খুব বিশ্বাস হয়। এই পরামর্শ মত কার্য্য করিবার জন্য নিধে সেই দিনই পলায়ন করে; এ পর্য্যন্ত আর ফিরিয়া আইসে নাই।"

বিনোদ বলিলেন,—"তাহার কোথায় যাওয়া সম্ভব, বা কোথায় থাকা সম্ভব, এ সম্বন্ধে তাহার স্ত্রী কোন অনুমান করিতে পারে?"

"আজ্ঞে না। যে যে জায়গায় যাওয়া বা থাকা সম্ভব বলিয়া তাহার মনে হয়, সে সকল স্থানেই তাহার স্ত্রী, সাধ্যমত সন্ধান করিয়াছে; কোনই ফল হয় নাই। তাহার পর রাসবিহারী, তাহাকে ছাড়িয়া দিলে সে হুগলীতে পলাইয়া আসিয়াছে এবং অধর্ম্মের পথে দিন কাটাইতেছে।"

বিনোদ বলিলেন,—"তাহার স্বামীর সম্বন্ধে সে আর কোন কথাই বলিতে পারে না?"

শ্রীরাম বলিল,—"আজ্ঞে না। সে মনে করে, তাহার স্বামী আর নাই। বাঁচিয়া থাকিলে সে নিশ্চয়ই স্ত্রীর সন্ধান করিত এবং ব্যভিচারিণী হইলেও সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিত না।"

বিনোদ বলিলেন,—"আচ্ছা, তুমি এখন বিশ্রাম কর। বোধ হয়, তোমাকে কল্য স্থানান্তরে যাইতে হইবে। আমাদের অতঃপর কোথায় যাওয়া হইবে এবং কি করিতে হইবে, কালি তাহা ঠিক বুঝিতে পারিব। তাহার পর যাহা হয়, ব্যবস্থা করিব। আমার হাতে টাকা-কড়ি কমিয়া আসিয়াছে। বাটী হইতে, বোধ হয়, টাকা আনার দরকার হইবে।"

শ্রীরাম পুনরায় প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। বিনোদ, পত্র লিখিতে বসিলেন। প্রথম পত্র লিখিলেন—রামজীবন চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে। তাহাতে স্বকীয় কুশল-সংবাদাদি লিখিয়া সাবধানে দুইটী বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া সত্বর উত্তর লিখিতে অনুরোধ করিলেন। ১ম বিষয়—"রাসবিহারী এখন কোন্ স্ত্রীলোকে আসক্ত? সে নারীর নিবাস কোন্ গ্রামে? সে কোন্ জাতীয়া?" ২য় বিষয়—"রাসবিহারী সম্প্রতি কাহারও প্রতি কোন অত্যাচার করিয়াছে কি না?" তাহার পর আর দুইখানি পত্র লিখিলেন। একখানি দাদাকে, একখানি অপরাজিতাকে। উভয় পত্রেই আপনার নিরাপদ কুশল সংবাদ লিখিলেন এবং কোন চিন্তার কারণ নাই বলিয়া আশ্বাস দিলেন। যতীন্দ্রের পত্রে জানাইলেন যে, টাকা আনিবার নিমিত্ত হয় তো শীঘ্রই লোক যাইবে। মা ও বউ-দিদির কথা লিখিতে ভুল হইল না। কোন পত্রেই বর্ত্তমান ঠিকানা লেখা হইল না।

পত্র গুলি ডাকে দিবার ব্যবস্থা করিয়া, বিনোদ- উকীল গুরুপ্রসাদ বাবুর বাটীর অভিমুখে, যাত্রা করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—*—

পর দিন যথাসময়ে বিনোদ, পুলিশ সাহেবের কুঠিতে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও মাজিষ্ট্রেট—দুই জনেই তথায় উপস্থিত। নিয়মিত শিষ্টাচারাদির পর, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব, বিনোদকে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের সহিত, পরিচিত করিয়া দিলেন। তাহার পর পুলিশ সাহেব বলিলেন—"আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত, আমি মাজিষ্ট্রেট-সাহেবের গোচরে আনিয়াছি। ইনি সমস্ত বিষয় বিশেষ মনোযোগের সহিত, আলোচনা করিয়াছেন এবং আপনার সম্বন্ধে অতিশয় আগ্রহযুক্ত হইয়াছেন। আমাদের দ্বারা আপনার কোন সহায়তা হইলে, বড়ই আনন্দলাভ করিব; কিন্তু আমরা যত দূর বুঝিতেছি, দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে তাহা আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির নিতান্ত প্রতিকূল। আপনি যে যে কথা জানেন, তাহা ছাড়া আপনার পিতার বিরুদ্ধে আরও ভয়ানক প্রমাণ পুলিশের হস্তে আছে। আপনাকে ক্রমশঃ তাহা বুঝাইয়া দিতেছি।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে ঘটিবে। কিন্তু এসম্বন্ধে আমি যে আপনাদের ন্যায় উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহা আপাততঃ আমার পরম সৌভাগ্য।"

ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বলিলেন,—"কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদিগের সহানুভূতি আপনার কোনই উপকারে লাগিবে না। আমরা আইনের দাস। আইনের চক্ষুতে আপনার পিতার অপরাধ সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে।

বিনোদ বলিলেন,—"আমি বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি যে, রাজকর্ম্মচারী বা আইন-ব্যবসায়ী না হইলেও আমিও আইনের দাস। আইনের বিন্দুমাত্র অন্যথাচরণ করিতে আমার কখনই প্রবৃত্তি নাই। আমার পিতা আইনের চক্ষুতে প্রকৃত প্রস্তাবে অপরাধী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, তাঁহার নিষ্কৃতির কামনা আমি করি না, বরং যাহাতে তিনি যথোপযুক্ত দণ্ড ভোগ করেন এবং আইনের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়, তাহাই আমার লক্ষ্য। আপনারা আমার অভিপ্রায় বুঝিতে ভ্রম না করেন ইহাই আমার প্রার্থনা।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ বলিলেন,—"তাহা হইলে, আপনি এই সময়েই এ অনুসন্ধান কেন ত্যাগ করুন না!"

বিনোদ বলিলেন,—"যদি আমার মনে পিতার অপরাধ-সম্বন্ধে কণিকামাত্রও সন্দেহ থাকিত, ভ্রমেও যদি এই ঘটনা সত্যের নিকটস্থ বলিয়া আমার মনে হইত, তাহা হইলে, আপনি বলিবার, পূর্ব্বেই, পিতার অদৃষ্টে যাহা থাকে হউক মনে করিয়া, এ আলোচনা আমি ত্যাগ করিতাম।"

পুলিশ সাহেব বলিলেন,—"বোধ হয়, আজি আমাদিগের কথা শুনিলে, আপনার সেইরূপ ইচ্ছাই জন্মিবে। আপনি মনোযোগ সহকারে আমার কথা শুনুন। দুর্গাপুরের পুকুরে জগবন্ধুর মৃতদেহ ভাসিয়া উঠার দুই একদিন পূর্ব্বে হত্যাকার্য্য সাধিত হইয়াছে, ইহা বোধ হয় আপনি স্বীকার করিবেন। লাস ভাসিয়া উঠার এক দিন পূর্ব্বে, রাত্রি বারোটার ট্রেণে যদুপতি, একটা অল্পবয়স্ক স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া, পশ্চিমে পলায়ন করিয়াছেন, ইহা একরূপ স্থির হইয়াছে। যদুপতির হাতে একখানি উত্তম তরবারি ছিল। স্ত্রীলোক ও তলবারি দেখিয়া রেলওয়ে পুলিশ, তাহার উপর সন্দিহান হয়। জিজ্ঞাসা করিলে, সে আপনাকে স্বর্ণ গ্রামের যদুপতি মিত্রের ভৃত্য রামদীন বলিয়া পরিচয় দেয়। যদুপতির আকৃতির যেরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, এ ব্যক্তির আকারও তদ্রূপ। এ ব্যক্তির গায়ের জামা, পায়ের জুতা, মাথার চুল, পরিধান বস্ত্র, সকলই বাঙ্গালীর মত। সে ঠিক বাঙ্গালীর মত কথাবার্ত্তা কহিতে পারে; অথচ সে আপনাকে হিন্দুস্থানী বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছে। কথাটী যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার নিকট কোনও লাইসেন্স ছিল না। যদুপতি মিত্র, অস্ত্র আইনের বিধানমতে, লাইসেন্স রাখিতে বাধ্য ছিলেন না। তাই বলিয়া তাঁহার এক জন ভৃত্য বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র লইয়া যাইতে পারে না। এই বিবেচনায় রেলওয়ে পুলিশ তাহার নিকট হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া কয়েক দিন পরে তাহা বেঙ্গল পুলিশের হস্তে পাঠাইয়া দিয়াছে। সেই তরবারি যে আপনার পিতার তাহা অস্বীকার করিবার কোনই কারণ নাই। আপনি খুলিয়া দেখুন, ইহার মুটের নিকট পরিষ্কৃতরূপে আপনার পিতার নামের আদ্য

অক্ষর জে এম (J, M,) ইংরাজিতে খোদা রহিয়াছে।”

পুলিশ সাহেব, আলমারি হইতে একখানি তরবারি বাহির করিয়া, বিনোদের হস্তে প্রদান করিলেন।

বিনোদ, তরবারি হাতে লইয়া কিয়দংশ খুলিয়াই বাঁটের নিকট ইংরাজি জে, এম, এই দুই অক্ষর দেখিতে পাইলেন। তাহার পর বলিলেন,—“আপনি সকল কথা বলিয়া যান। আমার যে উত্তর আছে, তাহা আপনার কথা-সমাপ্তির পর বলিব।”

পুলিশ সাহেব বলিতে লাগিলেন,—“জগবন্ধুর দেহে যে সকল আঘাত চিহ্ন দেখা গিয়াছিল, তাহা ডাক্তার সাহেবের মতে এবং পুলিশের অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের মতে, এইরূপ তরবারি দ্বারাই হইতে পারে। যখন রেলওয়ে পুলিশের নিকট হইতে এই তরবারি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন পনর দিন অতীত হইয়াছে। সুতরাং তখনই রা নকে ধরিতে পারা যায় নাই। রামদীন ও যদুপতি একই ব্যক্তি স্থির করিয়া, নানা স্থানে হুলিয়া করা হয়। এ পর্য্যন্ত তাহার কোনই সন্ধান করিয়া উঠিতে পারা যায় নাই। কিন্তু চারি পাঁচ দিন অতীত হইল, সংবাদ আসিয়াছে, রামদীন সম্প্রতি ভাগলপুরে ধরা পড়িয়াছে। তাহার সঙ্গের সে লোকটা ওলাউঠা রোগে মরিয়া গিয়াছে। অতএব আপনি দেখিতে পাইতেছেন, এত দিনের পর যদুপতি এইবার গেরেপ্তার হইয়াছে।”

বিনোদ বলিলেন,—“আপনাদিগের এই সকল কথা শুনিয়া আমি বিশেষ চিন্তাকুল হইতেছি না। যখন এ কাণ্ড হয়, আমার তখন নিতান্ত বাল্যকাল। সকল কথা আমি জানি না; যাহা জানি, তাহারও সকল অংশ আমার মনে থাকা সম্ভব নয়। তথাপি আমি এ কথা বেশ মনে করিয়া বলিতে পারি যে, রামদীন-নামে আমাদিগের বাটীতে একটা চাকর ছিল। আমি তাহার কোলে চড়িয়া অনেক সময় বেড়াইয়াছি। আমার ইহাও মনে পড়ে যে, আমার পিতা, তাহার উপর বিরক্ত হইয়া, তাহাকে জবাব দিয়াছিলেন। প্রস্থান-কালে রামদীন, ভিক্ষা-স্বরূপে চাহিয়াই হউক, বা চুরি করিয়াই হউক, একখানি তরবারি আনিয়া থাকিতে পারে। আপনারা যে রামদীনকে যদুপতি বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন, যদি সে তাহা হয় তাহা হইলে, গোলের মীমাংসা হইবে বটে, নতুবা ভাগলপুর হইতে রামদীনকে ধরিয়া আনিলেও, এ হত্যাকাণ্ডের কোনই কিনারা হইবে না।”

ম্যাজিষ্ট্রেট্ বলিলেন,—“ঠিক্ সেই দিন পশ্চিমে পলায়ন; যেরূপ অস্ত্র দ্বারা এই হত্যা-কাণ্ড সাধিত হইয়াছে, ঠিক্ সেইরূপ অস্ত্র লইয়া প্রস্থান; আকার প্রকারের সমতা ইত্যাদি ঘটনা অন্যান্য ব্যাপারের সহিত মিলাইয়া দেখিলে, সন্দেহের কোনই কারণ থাকে না। সেই দিন সন্ধ্যার সময় রাসবিহারী নাগ নামে একজন ভদ্রলোক, যদুপতিকে মাঠের মধ্য দিয়া দ্রুতভাবে পলাইতে দেখিয়াছেন। আপনি এই স্থলে আপত্তি করিয়াছেন যে, রাসবিহারী পলাতকের সহিত একটিও কথা কহেন নাই; কেন—কোথায় যাইতেছেন, কিছুই জিজ্ঞাসা করেন নাই; ইহা অসঙ্গত। কিন্তু এরূপ স্থলে কথা না কহার সহস্র কারণ থাকিতে পারে। রাসবিহারী ব্যস্ত ছিলেন; রাসবিহারীর কথা কহিতে ইচ্ছা হয় নাই; যদুপতি সম্ভ্রান্ত লোক; তিনি কেন অসময়ে কোথায় যাইতেছেন জিজ্ঞাসা করা অশিষ্টতা; ইত্যাদি অনেক

কারণে রাসবিহারী কথা না কহিতে পারেন। তাহার পর, শুনিয়াছি আপনি বলিয়াছেন, জগবন্ধু ও যত্নপতি যখন বেড়াইতে বাহির হন, তখন তাঁহাদের সহিত তরবারি ছিল না, অন্য লোকও ছিল না। এরূপ বৃহৎ তরাবারি দ্বারা খুন করিতে হইলে, তাহা জগবন্ধুর অগোচরে সঙ্গে লওয়া যত্নপতির পক্ষে সম্ভবপর নহে। ঠিক্ কথা। কিন্তু যে পুকুরের ধারে খুন হইয়াছে, তাহার দক্ষিণদিকে একটা ঘন বন আছে। যে ব্যক্তি খুন করিবে স্থির করিয়াছে, সে কি অন্য কোন সময়ে সেই বনে এই তরবারি লুকাইয়া রাখিয়া যাইতে পারে না? আমি আরও শুনিয়াছি, যে স্ত্রীলোকের প্রতি প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই হত্যাকাণ্ডের কারণ, আপনি বলিয়াছেন, সেই স্ত্রীলোক অতিশয় কুৎসিত, অধিক বয়স্কা এবং সর্ব্বথা যত্নপতির ন্যায় ধনবান্ ব্যক্তির অযোগ্যা। এ কথার উত্তর দিতে, আমার হাসি আইসে বাবু। আপনি লেখাপড়া শিখিয়াছেন, অনেক কাব্য-নাটক আলোচনা করিয়াছেন; ওথেলোর প্রতি যদি ডেস্‌ডিমনার আসক্তি হইতে পারে, তাহা হইলে এই জেলেনীর প্রতি যত্নপতির আসক্তি না হইবে কেন? প্রণয় ব্যাপারটা বড়ই ভয়ানক। কিসে কি হয় তাহা বলা বড়ই সুকঠিন।”

পুলিশ সাহেব বলিলেন,—“আপনার একটা কথা, বিশেষ বিচার্য্য। আমরাও এ মোকদ্দমার প্রথম হইতে সেই কথাটার কোন ভাল মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি নাই। জগবন্ধুর দেহে প্রকাণ্ড অস্ত্রের দাগ, শরীরের নানা স্থান ক্ষত বিক্ষত, কিন্তু তাঁহার জামার কোথাও একটীও চিহ্ন নাই। এ কথাটা বিশেষ ভাবিবার বিষয় বটে। বাস্তবিকই ইহার কোন মীমাংসা দেখা যাইতেছে না। তবে যদি মনে করা যায়, দুই বন্ধু অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া বড়ই ক্লান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত শরীরে পুকুরের ধারে, অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে, বিশ্রাম করিতে বসিয়াছিলেন এবং জগবন্ধু, অপেক্ষাকৃত স্থূলতাহেতু, দেহে উত্তমরূপে বায়ু লাগাইবার অভিপ্রায়ে, জামা খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই সময়ে যত্নপতি, পুষ্করিণীর অপর পারের বন মধ্য হইতে সঙ্গোপনে তরবারি আনয়ন করিয়া, তাঁহাকে বধ করেন এবং লাসকে চিনিতে লোকের অসুবিধা ঘটাইবার অভিপ্রায়ে পরে জামা পরাইয়া জলে ফেলিয়া দেন, তাহা হইলে নিতান্ত অসঙ্গত কল্পনা হয় না। ফলতঃ, আমরা এ ব্যাপারে আপনার অনুকূলে কোন প্রমাণই দেখিতে পাইতেছি না।”

বিনোদ বিনীতভাবে বলিলেন,—“আমি কোন তর্কবিতর্ক করিয়া আপনাদিগের বিরাগ ভাজন হইতে ইচ্ছা করি না। সবিনয়ে এইমাত্র বলিতেছি যে, এ সকল যুক্তি কেবল কল্পনামূলক। আমার বিশ্বাস, যদি কখনও আমার পিতা উপস্থিত হন, তাহা হইলে এ সকল যুক্তির বলে তাঁহার অপরাধ সপ্রমাণ হইবে না। তখন ঘটনাচক্র নিশ্চয়ই অন্যরূপ ধারণ করিবে।”

ম্যাজিষ্ট্রেট্ বলিলেন,—“আমাদিগের বিরাগ উৎপাদনের নিমিত্ত আপনি যে আশঙ্কা করিতেছেন, তাহার কোন ভিত্তি নাই। আপনি যে মহাত্মার পত্র লইয়া এবং যাঁহার আন্তরিক প্রশংসায়-ভূষিত হইয়া, আমাদিগের নিকট পরিচিত হইতে আসিয়াছেন, তিনি আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি। আপনার ন্যায়-সঙ্গত কথায় বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক আপনি কোন অন্যায় কথা বলিলেও আমরা বিরক্ত হইব না। দেখিতেছি আপনি বুদ্ধিমান, অধ্যবসায়ী, কর্ত্তব্য-পরায়ণ ও পিতৃভক্ত। এ সকল সদ্গুণসম্পন্ন ব্যক্তির সহা-

যত্ন করাই বিধেয়। আমাদিগের দ্বারা সাধ্যমতে তাহার ত্রুটি হইবে না।”

“বিনোদ বলিলেন,—“আমি আপনাদিগের সৌজন্য ও সদাশয়তায় চির-বাধিত হইতেছি। কেন আমি আপনাদিগের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া দুষ্কর। কিন্তু ইহা আপনারা স্থির জানিবেন যে, আজই হউক, বা বহুকাল পরেই হউক, আমি পিতার এ কলঙ্ক প্রক্ষালিত করিবই করিব। আপনারা তখন দেখিবেন, এ সকল যুক্তি নিতান্ত মূল্যহীন। আমার পিতা জীবিত আছেন কি না জানি না। যদি তিনি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে বড়ই আনন্দের সহিত আমার সেই নিষ্কলঙ্ক-স্বভাব পিতৃদেবকে সঙ্গে লইয়া, আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইব। যদি তিনি কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও সমস্ত প্রমাণ পদ-বিদলিত করিয়া, আমি আপনাদের মুখ হইতেই, আমার পিতৃচরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন সাধুতা-সূচক সমর্থন শ্রবণ করিব। আপনারা যে সকল প্রমাণের বলে এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তৎসমস্তই আকস্মিক ও অনুমেয় প্রমাণ। আমি জানি, আর আপনারা তো জানেনই, এইরূপ অলীক প্রমাণের বলে এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কত নিরপরাধ ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।”

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—“আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা অসম্ভব না হইতে পারে। আকস্মিক ও অনুমেয় প্রমাণ যে সকল সময়ে ঠিক্ হয় না, তাহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু যতক্ষণ অন্যরূপ কোন প্রমাণ উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ আমরা যে মীমাংসা করিয়াছি, তাহাই স্থির রাখা ভিন্ন আর উপায় কি? আপনি এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়াছেন। জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি এ সম্বন্ধে কি মীমাংসা করিয়াছেন?”

বিনোদ বলিলেন,—“আপনারা যে রাসবিহারী নাগের নাম ভদ্রলোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সে একটা মহাপাপী ও দুর্দ্দান্ত লোক।”

পুলিশ সাহেব বলিলেন,—“আমরা শুনিয়াছি, সে লোকটা অত্যাচারী জমিদার।”

বিনোদ বলিলেন,—“তবে আপনারা কিছুই শুনেন নাই। সে ব্যক্তি নরাধম। সে যে কত নারীর ধর্ম্মনাশ করিয়াছে, কত লোককে খুন করিয়াছে, কত নিরীহ ব্যক্তিকে অত্যাচারে উৎপীড়িত করিয়াছে, কত লোকের কত সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তাহা বলিয়া উঠা যায় না। আমার পিতার উপর বহুকালাবধি তাহার ক্রোধ ছিল। যে দিন পুকুরে লাস ভাসিয়া উঠে, তাহার দুই দিন পূর্ব্বে এক দরিদ্র চণ্ডাল রাসবিহারীর ভয়ানক অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া, নিরুদ্দেশ হইয়াছে। পুলিশ তাহার কোন সন্ধান রাখে না; অন্য কোন লোকও তাহার কোন খবর জানে না। আমি এখনও সকল ঘটনা মিলাইতে পারি নাই; কিন্তু আমার বড়ই সন্দেহ হয়, রাসবিহারীর সহিত এ ব্যাপারের নিশ্চয়ই কোন সম্বন্ধ আছে।”

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন,—“রাসবিহারী এরূপ অত্যাচারী লোক, তাহা আমরা জানি না। এত অত্যাচার সে চাপিয়া চলিতেছে কিরূপে?”

বিনোদ বলিলেন,—“তাহার অর্থ-বল আছে। পুলিশের নিম্ন-কর্ম্মচারীরা অর্থের দাস। তাহার প্রবল অত্যাচার করিবার শক্তি ও সুযোগ আছে। তাহার বিরুদ্ধে কথা কহে, এমন সাধ্য কাহারও নাই।”

পুলিশ সাহেব বলিলেন,—"আপনি রাসবিহারীর সম্বন্ধে বিশেষ কোন ঘটনা জানেন ?"

বিনোদ বলিলেন,—"দুই একটি ঘটনা জানি।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"আপনি এইরূপ উৎপীড়িত কোন ব্যক্তি দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে কোন নালিশ করাইয়া দিতে পারেন ?"

বিনোদ। বোধ হয় পারি ; আমি চেষ্টা করিব। আপনাদিগকে কিন্তু বাদীর প্রাণ-রক্ষার ভার লইতে হইবে। রাসবিহারী বলপূর্ব্বক একটী মুসলমানের সুন্দরী যুবতী ভাগিনীর ধর্ম্ম নষ্ট করিতে চাহে। মুসলমান ভয়ানক আপত্তি ও বিরোধ উপস্থিত করে। রাসবিহারী সেই হতভাগ্য ও তাহার ভগিনীকে আপনার কাছারি-বাড়ীতে ধরিয়া আনে। তাহার পর সেই পুরুষের উপর কল্পনাতীত অত্যাচার করিয়া, তাহার নাক-কাণ কাটিয়া দেয়। তদনন্তর তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া, তাহার সমক্ষেই তাহার ভগিনীর ধর্ম্মনাশ করে। সেই অত্যাচারে অভাগা মুসলমান অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। শুনিয়াছি, সে এখন কলিকাতায় এক মস্‌জিদের নিকট বসিয়া ভিক্ষা করে।

ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া, বলিলেন,—"এরূপ কাণ্ড নিতান্ত অরাজকতার পরিচায়ক।"

পুলিশ সাহেব বলিলেন,—"ইহা বৃটিশ-শাসনের কলঙ্ক। আপনি সেই মুসলমানকে আনিতে পারিবেন কি ?"

বিনোদ বলিলেন,—"চেষ্টা করিব। কিন্তু রাসবিহারীর বিরুদ্ধে স্বাক্ষী দিবে কে ?"

পুলিশ সাহেব বলিলেন,—"তাহার বিবেচনা পরে করিব। আপাততঃ এইরূপ একটী নালিশ রুজু হইলে, তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া, হাজত দেওয়া যাইতে পারিবে। তখন লোকের সাক্ষী দিতে সাহস হইবে।"

বিনোদ বলিলেন,—"তাহার বিরুদ্ধে আরও ভয়ানক মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে ; কিন্তু আজি আমি আর কিছুই বলিব না। আমি যত দূর অগ্রসর হইয়াছি, তাহাতে আমারই প্রাণ লইয়া টানাটানি। আমাকে হয় তো এই বিষয়ের জন্য বার বার স্বর্ণগ্রাম যাইতে হইবে। আমার উপরেও যে রাসবিহারী অনেক অত্যাচার করিবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।"

ম্যাজিষ্ট্রেট্ বলিলেন,—"আপনি পুলিশের সাহায্য পাইবেন ; আমরা তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব। আপনি যেখানে যে অবস্থায় পুলিশের সহায়তা চাহিবেন, সেখানেই তাহা পাইবেন, এরূপ আদেশ অদ্যই দেওয়া হইবে। কিন্তু মূল বিষয়ের কথা শেষ হইল না। আপনি সে সম্বন্ধে কিরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা আমরা বিশদ রূপে জানিতে ইচ্ছা করি।"

বিনোদ বলিলেন,—দুইটী ঘটনা সম্ভব বলিয়া আমার মনে হয়। রাসবিহারী স্বয়ং জগদ্বন্ধুকে খুন করিয়াছে। খুনটা রাসবিহারী কৃত, এ মীমাংসা করিবার আমার আরও একটা হেতু আছে। পুকুরে যে লাস্ পাওয়া গিয়াছে, তাহার নাক-কাণ কাটা ছিল। যে মুসলমানের উপর রাসবিহারী উৎপীড়ন করিয়াছিল বলিয়াছি, তাহারও নাক-কাণ কাটিয়া দিয়াছিল। নাক-কাণ কাটিয়া বিকৃত করা, রাসবিহারীর একটা অভ্যাস। দ্বিতীয় অনুমান যে দেহ পাওয়া গিয়াছে, তাহা জগদ্বন্ধুর নহে, অন্য কোন ব্যক্তির।"

ম্যাজিষ্ট্রেট্ জিজ্ঞাসিলেন,—"তাহা হইলে আমার জিজ্ঞাস্য—যদি রাসবিহারী কর্তৃক

জগদ্বন্ধু হত হইয়া থাকেন, তবে যদুপতি নিরুদ্দেশ কেন? আর যদি যদুপতি ও জগদ্বন্ধু, কেহই না মারা গিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা উভয়েই নিরুদ্দেশ কেন?"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি এ বিষয়ের এখনও কোন সুসঙ্গত মীমাংসা করিতে পারি নাই; যতদিন আমি স্বয়ং ইহার সুসঙ্গত মীমাংসা করিতে না পারিতেছি এবং যতদিন এ সম্বন্ধে কোন অবিসংবাদিত প্রমাণ আমার হস্তগত না হইতেছে, ততদিন আমি আপনাদিগের ন্যায় রাজপুরুষের সমক্ষে কোন কথা সমর্থন করিতে পারিতেছি না।"

ম্যাজিষ্ট্রেট্ বলিলেন,—"দেখিতেছি আপনার বুদ্ধি ভয়ানক তীক্ষ্ণ। আশা করি আপনার প্রযত্ন সফল হইবে। আপাততঃ আপনি কি করিবেন স্থির করিতেছেন?"

বিনোদ বলিলেন,—"পুলিশে যদুপতির সম্বন্ধে যে রিপোর্ট আসিয়াছে, আপনাদের অনুগ্রহে তাহা সংগ্রহ করিয়া, আমি অদ্যই ভাগলপুর যাইব। সেখানে যেরূপ ফলাফল হয়, তাহা আপনাদিগকে জানাইব। সন্দেহ জনকই হউক, অবিশ্বাস্যই হউক, আমার পিতার সন্ধান হইয়াছে বলিয়া যখন সংবাদ আসিয়াছে, তাহা শুনিবামাত্র তখনই আনন্দে আমার প্রাণ নাচিয়া উঠিয়াছে। যদি যদুপতি ও রামদীন একই ব্যক্তি হন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ ভাগলপুরে আমার অনুসন্ধানের পরিসমাপ্তি হইয়া যাইবে। তাহা না হইলে কি করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে আমি এখনও কিছু স্থির করিতে পারি নাই।"

পুলিশ-সাহেব বলিলেন,—"তাহা হইলে আপাততঃ কিছু দিনের নিমিত্ত আপনার সহিত আমাদিগর দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হইতেছে। প্রার্থনা করি, আপনি, নূতন কোন সংবাদ পাইলে, আমাদিগের গোচর করিবেন। আর সেই মুসলমানের সন্ধান করিয়া রাসবিহারীর বিরুদ্ধে নালিসের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট্ বলিলেন,—"অদ্য পুলিশ আফিসে গিয়া আপনার প্রয়োজনমত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লইবেন। আপনার নিকট রীতিমত মোহরাঙ্কিত একখানি পরওয়ানা থাকিবে। তাহা দেখিলে সর্ব্বত্রই পুলিশ আপনাকে সাহায্য করিবে।"

বিনোদ, গাত্রোত্থান করিয়া, অতীব-বিনীতভাবে উভয়কে অভিবাদন পূর্ব্বক, বিদায় লইলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বিনোদ বাসায় আসিয়া, ব্যস্ততা সহকারে স্নানাহার সমাপন করিয়া লইলেন। শ্রীরাম অদ্য বাসাতেই ছিল। বিনোদ তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আমি অদ্য ভাগলপুর যাইব; কবে ফিরিব বলিতে পারি না। তোমাকে একখানি পত্র লিখিয়া দিতেছি; এই পত্র লইয়া হরিপুর যাইতে হইবে। ইহা দেখাইয়া, আমার দাদা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের নিকট হইতে পাঁচ শত টাকা লইয়া তুমি কলিকাতায় যাইবে। আমি ভাগলপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিব। ফিরিবার সময় হুগলী দিয়া আসাও অসম্ভব নহে। যত শীঘ্র পারি, ফিরিবার চেষ্টা করিব। তোমাকে আমাদের বাটীতে পাইয়া

অনেকে হয়তো অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। আমার এক বুদ্ধিমতী ভগিনী আছেন। আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসার সীমা নাই। তিনি হয় তো অনেক কথা জানিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। আমি কি করিতেছি, কোথায় আছি, কোথা হইতে কোথায় যাইতেছি, ইত্যাদি সংবাদ তাঁহারা এক্ষণে জানিতে না পারেন, ইহাই আমার বাসনা। অতএব তুমি সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইয়া কথাবার্ত্তা কহিবে। যাহা নিতান্ত না বলিলে নহে তাহাই বলিবে। কলিকাতায় গিয়া তুমি সেই নাক-কাণ-কাটা মুসলমানের সন্ধান করিবে। তুমি তাহাকে চেন এবং সে কোথায় থাকে তাহার সন্ধান জান; সুতরাং তাহাকে সন্ধান করিতে বোধ হয় তোমার অসুবিধা হইবে না। তাহাকে আমার বিশেষ দরকার আছে। আমি কলিকাতায় আসিয়া যেন তাহাকে পাই।"

শ্রীরাম বলিল,—"বাবুর যদি কোন কারণে বিলম্ব হইয়া পড়ে তাহা হইলে আমরা সংবাদ পাইব কিরূপে?"

বিনোদ বলিলেন,—"বিলম্ব হইবার সম্ভবনা বুঝিলে আমি সংবাদ পাঠাইব।"

বিনোদ তাহার পর হুগলীর পোষ্টমাষ্টারকে এক পত্র লিখিয়া নিবেদন করিলেন যে, "বিনোদবিহারী রায়ের নামে যদি কোন পত্র আইসে, তাহা যত দিন অন্য সংবাদ দেওয়া না হয়, তত দিন পোষ্ট আফিসে জমা থাকিবে।" এই পত্র ডাকঘরে লইয়া গিয়া, পোষ্টমাষ্টার বাবুর হাতে দিয়া, রসিদ আনিবার নিমিত্ত শ্রীরামকে আদেশ করিলেন। শ্রীযুক্ত রামজীবন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার এক পত্র আসিবার সম্ভাবনা। সে পত্র নিতান্ত গোপনীয় ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। সেই জন্যই এই সাবধানতার আবশ্যক।

শ্রীরাম পত্র লইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর বিনোদ হরিপুরের পত্র লিখিতে বসিলেন। বড়ই ভাবনার কথা—কি লিখিবেন? তিনি তো জীবনে ভক্তিভাজন জ্যেষ্ঠের সহিত, আদরিণী ভগিনীর সহিত, স্নেহময়ী মাতার সহিত, রঙ্গমতী ভ্রাতৃজায়ার সহিত কখনই কোন প্রতারণা করেন নাই। আজি তিনি আপনার উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় অবলম্বিত কার্য্য, গন্তব্য স্থানাদির বিবরণ, সকলই সাবধানে সঙ্গোপনে রাখিয়া, স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে চলিতেছেন। বড়ই অন্যায় ও অসঙ্গত ব্যবহার! না জানি তাঁহারা বিনোদের জন্য চিন্তায় কতই ব্যাকুল হইতেছেন, কতই ইষ্টানিষ্ট কল্পনা করিয়া তাঁহারা হয়ত উদ্বেগে অস্থির হইতেছেন। তাহাদিগকে এরূপ কষ্ট দেওয়া নিতান্ত অকৃতজ্ঞতা, একান্ত-হৃদয়-হীনতা। কিন্তু সর্ব্ব হৃদয়ের ভাবজ্ঞ ভগবান্ জানেন, বিনোদের প্রাণ তাঁহাদিগের প্রতি কত অনুরাগী, তাঁহাদিগের সুখ-সন্তোষ ও প্রীতি-সাধনে কতই আগ্রহান্বিত। বর্ত্তমান ব্যাপারের বিবরণ বিনোদ তাঁহাদিগকে জানাইতে অশক্ত। কেন না তাঁহারা সম্ভবতঃ এসকল কথা শুনিয়া, বা এ চেষ্টায় বিনোদকে নিযুক্ত দেখিয়া, পাছে তাঁহার সহিত সকল সম্বন্ধের শেষ হয়, পাছে তিনি পর হইয়া যান, এই আশঙ্কায় ব্যাকুলা হইয়া উঠিবেন এবং হয়তো বিনোদের অবলম্বিত ব্রতের বিরোধিতাও করিবেন। বিনোদ জানেন, তাঁহাদিগের সহিত সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য—জীবনে ও মরণে তাঁহারা বিনোদের আপন হইতেও আপন। বিনোদ কখন মা দেখেন নাই, মাতৃস্নেহ কিরূপ উপাদেয় সামগ্রী, তাহা বাল্যকালে জানিতেন না। হরিদাস

রায় মহাশয়ের সংসারে আনীত হইয়া এবং তথায় অলৌকিক মধুময় মাতৃস্নেহ ভোগ করিয়া তাঁহার প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে। তাঁহার ভাই-ভগিনী ছিল না। তিনি যতীন্দ্রের ন্যায় গুণ-ময়, অকৃত্রিম প্রেমময়, একান্ত স্নেহময় জ্যেষ্ঠ পাইয়া চরিতার্থ হইয়াছেন। আর অপরা-জিতা—স্বর্গের দেবী নিষ্কলঙ্ক—সুপবিত্র—অলৌকিক—স্বভাব—দেববালা, হিম-কর-নিঃসৃত সুশীতল সুধার অপেক্ষা মধুরতর ভাল-বাসার সাগরে তাঁহাকে ভাসাইয়া রাখিয়াছেন। তাহার কি আর তুলনা সম্ভব! দেবতারাও এরূপ ভগিনী পাইলে চরিতার্থ হন। এরূপ ভগিনীর স্নেহ যে ভোগ করিতে পায়, এ সংসারে সেই সুখী। ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহার বিপদে সম্পদ ঘটাইয়াছেন। যাহা তাঁহার ছিল না, যাহা পাইবার তাঁহার আশা ছিল না, তাহা তিনি বিপুল পরিমাণে পাইয়া-ছেন। এ সংসারে বিনোদ ধন্য হইয়াছেন!

বিনোদ ভাবিতে লাগিলেন, কর্ত্তব্য-পাল-নই ধর্ম্ম। পিতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য—অসীম, অনন্ত, অচ্ছেদ্য। আমি কর্ত্তব্য পালন-রূপ পরম ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছি মাত্র। ইহা যখন জানিতে পারিবে, তখন মা, দাদা, বৌ-দিদি, অপরাজিতা, তোমরা আমার উপর রাগ করিবে কি? আমাকে ত্যাগ করিবে কি? আমাকে ঘৃণা করিবে কি? কখনই না। তোমরা দেবতা। কর্ত্তব্য-পালনে দেবতার অনুগ্রহ ভিন্ন, নিগ্রহ কখনই হইতে পারে না। তোমাদের বিনোদ চিরদিনই তোমাদের আছে, তোমাদেরই থাকিবে।

বিজলী—সাধের—সোণার—আদরের—বিজলী! এক দিন তোমাকে না দেখিলে, থাকিতে পারিতাম না, সংসার অন্ধকার দেখিতাম। আজি দশ বারো দিন হইল, তোমার সহিত সাক্ষাৎ নাই। আর কি জীবনে সাক্ষাৎ হইবে না? অবশ্য হইবে। কিন্তু পিতৃহন্তার পুত্ররূপে আমি তোমার সম্মুখে কখনই দাঁড়াইব না। যে দিন পিতার কলঙ্কের চিহ্নও থাকিবে না, যে দিন আমার নিরপরাধ পিতৃচরিত্রের নির্ম্মলতা সর্ব্বত্র ঘোষিত হইবে, সেই দিন বিজলি! তোমার এই প্রেম-মুগ্ধ, গুণ-মুগ্ধ, অযোগ্য প্রেমিক, তোমার স্বর্গীয় প্রণয়-সুধাংশুর স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণ-তলে শান্তিলাভার্থ উপস্থিত হইবে। নচেৎ এই পর্য্যন্ত। এ পাপমুখ আর তুমি দেখিতে পাইবে না। পিতৃহন্তার পুত্রের ছায়াও তোমাকে স্পর্শ করিয়া কলঙ্কিত করিবে না।

পিতঃ! কোথায় তুমি? জানি তুমি দেবতা। বাল্যকালে তোমার যে অমৃত-নিষিক্ত স্নেহ উপভোগ করিয়াছি, তাহার স্মৃতি এখনও এ অধমকে উন্মত্ত করে। কোন্ পাপে তোমার দেব-চরিত্রে এই অচিন্তনীয় কলঙ্ক? কিন্তু ইহাও কি কখন সম্ভব? সাহেবেরা এ সকল বিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞ; তাঁহারা বলেন, ইহা সম্ভব। সাধারণ বলে, ইহা সম্ভব। জনরব শত মুখে বলে, ইহা সম্ভব। যুক্তি বলিতেছে, মানবচরিত্র দুর্জ্ঞেয়—মানবের পক্ষে সকলই সম্ভব। বিচার বলিতেছে, ঘটনা সকলই প্রতিকূল—এ কার্য্য সম্ভব। তাই কি ঠিক্? কখনই না। আমার প্রাণ বলিতেছে, ইহা অসম্ভব। আমার যুক্তি, তর্ক, বিচার সকলই বলিতেছে, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। পিতঃ! কোথায় তুমি? তুমি আমার ধর্ম্ম, তুমি আমার স্বর্গ, তুমি আমার শ্রেষ্ঠ সাধনা। বলিয়া দেও, পিতৃদেব! বলিয়া দেও, কি করিলে আমি তোমার দর্শন পাই। উপদেশ দেও,

কোন্ পথে কার্য্য করিলে, আমার মনোরথ সফল হইবে। আমি তোমার চরণে বার বার প্রণাম করিতেছি। তোমারই আশীর্ব্বাদে আমি তোমাকে দর্শন করিয়া এবং পুনরায় তোমারই চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া, জীবন সফল করিব।

বিনোদ, পিতৃচরণোদ্দেশে সাশ্রুনয়নে প্রণাম করিয়া, গাত্রোত্থান করিলেন; তাঁহার হৃদয়ের ভার যেন বহুগুণে লঘু হইয়া গেল; তিনি যেন আশ্বস্ত হইলেন। রঘুকে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া, বিনোদ বাসা হইতে বাহির হইলেন।

পুলিশ-আফিস্ হইতে কাগজ-পত্র লইয়া ও অন্যান্য সংবাদ সংগ্রহ করিয়া,বিনোদ বাসায় ফিরিলেন। শ্রীরামকে আবশ্যক মত খরচ দিয়া, অন্যান্য বিষয়ের উচিত ব্যবস্থা করিয়া, রঘুর সহিত বিনোদ গাড়িতে উঠিলেন। ষ্টেশনে আসিয়া বিনোদ দেখিলেন, গাড়ির আর বিলম্ব নাই। যথাসময়ে রেলগাড়িতে উঠিয়া তাঁহারা ভাগলপুর অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

পথে চিন্তার সীমা নাই। কোন দৃশ্য বা কোন নূতন কাণ্ড ক্ষণকালও তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারিল না। রামদীন ও যদুপতি কি একই ব্যক্তি? দুষ্কর্ম্ম প্রচ্ছন্ন করিবার জন্য তাঁহার পিতাই কি রামদীন, নাম গ্রহণ করিয়াছেন? এ কথা কি সম্ভব? দুষ্কর্ম্ম তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু অন্য বহুকারণেও তো তাঁহার প্রচ্ছন্ন থাকার প্রয়োজন ঘটিতে পারে। কে জানে তাঁহার জীবনে কি রহস্য আছে। বিনোদ মনে করিতে লাগিলেন, সাধু উদ্দেশ্যে ও সৎকর্ম্ম সাধনের নিমিত্তও মহাত্মারা অনেক সময়ে ছদ্মবেশ ধারণ করেন। সেরূপ কোন ঘটনায় বাধ্য হইয়া তাঁহার পিতা এ অসঙ্গত রূপান্তর ধারণ করিয়াছেন কি না, কে বলিতে পারে? মনে বড়ই আশার সঞ্চার হইল। এই বার বোধ হয়, নিরুদ্দেশ পিতার সন্ধান হইল ভাবিয়া তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইতে লাগিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অদ্য প্রাতে যতীন্দ্র বাবু হুগলী গমন করিয়াছেন। ডাক-যোগে বিনোদ বাবুর যে পত্র আসিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার কোন ঠিকানা বা অবস্থান-স্থানের উল্লেখ না থাকিলেও, ভারতবর্ষের কর্ম্মঠ ও সুদক্ষ ডাক-বিভাগ, আপনার কর্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ হয় নাই। ডাকঘর, পত্রের উপর যথাস্থানে উত্তম-রূপে, হুগলীর ছাপ মারিয়া দিতে ভুল করে নাই। সেই ডাকের ষ্ট্যাম্প দেখিয়া বিনোদের সন্ধানার্থ হুগলী যাওয়াই আত্মীয়গণ সৎপরামর্শ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যতীন্দ্র বাবু সঙ্গে এক হাজার টাকা লইয়াছেন। বিনোদ পত্রে টাকার অপ্রতুলতার কথা লিখিয়াছিলেন। যদি লোক দ্বারা টাকা পাঠাইলে পাইতে অসুবিধা হয়, যদি মণিঅর্ডার বা রেজিষ্টরি পত্র যোগে টাকা পাঠাইলে পাইতে বিলম্ব হয়, এইরূপ নানাপ্রকার আশঙ্কা করিয়া। যতীন্দ্র স্বয়ং টাকা সহ প্রস্থান করিয়াছেন। যতীন্দ্র ও অপরাজিতা তন্ন তন্ন করিয়া বিনোদের পত্রের প্রত্যেক কথা আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, নিশ্চয়ই বিনোদ কোন ভয়ানক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বৈকালে ব্রজেশ্বরী, আপনার ঘরের মধ্যে অন্যমনস্কভাবে বসিয়া আছেন। হাতে গৃহস্থালীর অনেক কাজ আছে; কিন্তু তাহার কিছুই তিনি করিতেছেন না। ধীরে ধীরে, অতি চিন্তাকুলভাবে অপরাজিতা তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র ব্রজেশ্বরী বলিলেন—"আহা! ঠাকুরঝির মুখখানি আজি শুখাইয়া গিয়াছে! দুই ভাইই বাড়ীছাড়া।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"ভাইরা কাছে থাকা বড়ই সুখের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহারা পুরুষমানুষ,—নানা কাজে তাঁহাদিগকে নানাস্থানে যাইতে হয়; সুতরাং নিয়ত বাড়ীতে বসিয়া থাকা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। কার্য্যসূত্রে তাঁহাদিগকে বাড়ী ছাড়িয়া যদি বিদেশে যাইতে হয়, তাহা হইলেই তাঁহাদের আত্মীয়গণের মুখ শুখাইয়া যাওয়া ভাল কথা নহে। কিন্তু যদি মনে হয়, তাঁহারা স্বচ্ছন্দ নাই, তাঁহাদের বিপদ ঘটিয়াছে, অথবা তাঁহাদিগকে ক্লেশ পাইতে হইতেছে তাহা হইলে যাঁহারা তাঁহাদিগকে ভালবাসেন, তাঁহাদের মুখ শুখাইবে, এটা কি একটা আশ্চর্য্য কথা, বউ দিদি? বাস্তবিক বিনোদের নিমিত্ত আমার বড়ই চিন্তা হইতেছে। আমার যেন মনে হইতেছে, বিনোদ নিশ্চয়ই কোন বিশেষ বিপদে পড়িয়াছেন।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"বালাই, বিপদ কেন হইবে? যদি কিছু হইয়া থাকে, তাহা হইলে হয় তো সখের বিপদ হইয়াছে। আমি যে কথা বলিতেছি, তাহা যে তোমরা ভাই ভগিনী কেহই কাণেও তুলিতেছ না। ঠাকুরপোর বয়স হইয়াছে; রূপ ফাটিয়া পড়িতেছে; ধনবান্ বলিয়াও চারিদিকেই প্রচার আছে। কলিকাতায় অনেক রকম উপসর্গ ঘুরিয়া বেড়ায়। যে কোন উপসর্গ যে তাহার ঘাড়ে চাপে নাই, এ কথা কে বলিতে পারে?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"তাহা না ঘটিতে পারে, এমন নহে। কেন না, পুরুষ মানুষ আত্ম-সংযমে বড়ই অপটু। তাহাদের লাম্পট্য, আদর মাখা বিদ্রূপের কথা—হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বিষয়। তাহাদের হাতে কলম; তাহাদের হাতেই শাসন; তাহারাই কর্ত্তা। এই জন্যই তাহাদের মুখে স্ত্রী-চরিত্রের নিন্দা কথায় কথায়; কিন্তু ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, এ সম্বন্ধে নারী-জাতির সাধুতা, পুরুষের অপেক্ষা অনেক বেশী। যাহারা স্ত্রী থাকিতেও অনায়াসে পর-নারীতে আসক্ত হয়, আর স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, তিন দিন পরেই আবার নূতন স্ত্রী সংগ্রহ করে, তাহারা ইন্দ্রিয়-সংযমে একান্ত অক্ষম, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বিচারের এ সময় নহে এবং আমাদের তাহাতে প্রয়োজনও নাই। যদি বিনোদের ন্যায় সুশিক্ষিত ও সুপরীক্ষিত ব্যক্তির কথা না হইত, হইলে তুমি বার বার যাহা বলিতেছ, তাহাই আমাদের প্রথমেই মনে হইত। আমার বিবেচনায় বিনোদের সম্বন্ধে সেরূপ সন্দেহ করাও পাপ।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"এ বিষয়ে পুরুষমানুষের ভালমন্দ বড়ই কম দেখিতে পাওয়া যায়; বাস্তবিক এ সম্বন্ধে তাহারা বড়ই শিথিল। ধর্ম্ম-শাস্ত্র তাহাদের অনুকূল, সমাজ তাহাদের সহায়, আর সংস্কার তাহাদের পোষক। এই জন্যই এ বিষয়ে তাহারা ধর্ম্ম-জ্ঞান-শূন্য—যথেচ্ছাচারী।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"কিন্তু বউ দিদি, পুরুষের এই চরিত্রহী-তার অনুকূল যুক্তিও অনেক আছে। যদিও সে যুক্তি উপেক্ষা করিয়া, চরিত্রকে নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারিলেই

পুরুষের গৌরব বর্দ্ধিত হয়, তথাপি যাহারা দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা ও সংসর্গের দোষে, পাপে প্রমত্ত হয়, তাহারা আমাদের দয়ার পাত্র; তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারিলেই, করুণা-রূপিণী নারীজাতির মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়। এই ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, চরিত্র-বল-বিহীন পুরুষগণের যুক্তি ও চেষ্টার বিষয় আলোচনা করা নারীর পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক। নারী যে ধর্ম্ম শিখিয়াছে, যে ধর্ম্ম অনায়াসে পালন করিয়া আসিতেছে এবং যে ধর্ম্মের মধুর শাসন তাহাদের অস্থি-মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছে, তাহা তুলনা-রহিত, তাহা স্বর্গপ্রদ, তাহা পরম সমাদৃত এবং তাহা নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ, অমূল্য ভূষণ ও অবিচ্ছিন্ন সহচর। যে নারী সে ধর্ম্ম হারাইয়াছে, সে রাক্ষসী ও পিশাচী হইয়াছে। স্বামী নারীর দেবতা। ইন্দ্রিয়-বিষয়ে সাধুতা নারী-জীবনের সার ধন। স্বামীর জাতি যে নীতির অনুসরণ করেন, স্ত্রীর জাতি যেন তাহা কাণেও ঠাঁই না দেয়। বিনোদের জ্ঞান ও শিক্ষা যেরূপ উচ্চ এবং তাঁহার হৃদয় যেরূপ বলবান্, তাহাতে তাঁহাকে সাধারণ পুরুষের ন্যায় নীতি জ্ঞান-বিহীন বলিয়া মনে করিতে কখনই ইচ্ছা হয় না।”

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—“ঠাকুরপো খুব নিখুঁত লোক—লেখা-পড়া, জ্ঞানবুদ্ধিতে খুব টনটনে মানুষ। কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ ব্যাপারে তাঁহার যে পা সরিয়া না যাইতে পারে, এমন কথা কখনই বলা যায় না। যে দেশের ইন্দ্র-চন্দ্র পর্য্যন্ত অধঃপাতে গিয়াছেন, সে দেশের পুরুষের আর কথা কি?”

বিজলীর কথা সকল সময়েই অপরাজিতার মনে আছে। সে কথা এখন ব্রজেশ্বরীর নিকট ব্যক্ত করিয়া তৎ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত গ্রহণ করিতে অপরাজিতার ইচ্ছা হইল। কিন্তু বিনোদ বলিয়াছেন, তিনি না বলিলে, যেন সে কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করা না হয়। সুতরাং বিনোদের বাসনানুসারে অপরাজিতাকে সে কথা চাপিয়া রাখিতে হইল। কিন্তু তিনি স্থির করিয়াছেন, নিশ্চয়ই বিজলীর সহিত, বিনোদের এই গুপ্ত ব্যস্ততার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এ সম্বন্ধে তিনি অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছেন, বিজলীর পত্রের প্রত্যেক অক্ষর তিনি আলোচনা করিয়াছেন। বুঝিয়াছেন, বিজলী ধর্ম্মশীলা, দুঃখিনী, গৃহস্থ-কন্যা। সেই বিজলী, যদি বিনোদের নয়ন-মনকে ঝলসাইয়া থাকে, তাহাতে বিশেষ আপত্তির কথা অপরাজিতার একবারও মনে হয় নাই। অনেক ক্ষণ নীরবে নানা কথা চিন্তা করিয়া, অপরাজিতা বলিলেন,—“বউ দিদি! আমরা বিনোদের সম্বন্ধে সঙ্গত অসঙ্গত নানারূপ কল্পনা করিতেছি; কিন্তু মা যাহা বলিতেছেন, তাহা তো এক বারও ভাবিয়া দেখিতেছি না। মা বলিতেছেন,—বিনোদ আমার পেটের ছেলে নহে—পালিত পুত্র। এ কথাটা সকলেই জানে। বিনোদও না জানেন এমন নহে। বাল্যকালে সে মা-হারা হয়; তাহার পিতা ছিলেন। এখন তিনি আছেন কি না সন্দেহ। বিনোদের এখন বয়স হইয়াছে। এখন সে, পিতার সন্ধানেও নিযুক্ত হইতে পারে।”

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—“তোমার দাদা বলেন, পিতার সন্ধান করিবার ইচ্ছা মনে উদিত হওয়া বিনোদের পক্ষে অসম্ভব নহে। কিন্তু সে কাজ বিনোদ লুকাইয়া করিবেন কেন? সে বিষয়ের অনুসন্ধান অবশ্য-কর্ত্তব্য—পবিত্র কর্ম্ম। আমরাও সে কার্য্যে প্রাণ-পণে বিনোদের সহায়তা করিব। তবে তিনি লুকান কেন? ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই অন্য কোন রহস্য আছে।”

অপরাজিতা বলিলেন,—"দাদা হয় তো কালিই ফিরিবেন; না হয় নিশ্চয়ই একটা সংবাদ দিবেন। আমার প্রাণ যেরূপ ব্যাকুল হইয়াছে, তাহাতে ঘরের কোণে বসিয়া বসিয়া, ভাবিতে ভাবিতে, আর কাল কাটাইতে পারিতেছি না। হয় তো বিনোদ বিপদে পড়িয়াছেন, আর আমরা নানা প্রকার কল্পনা করিতে করিতে স্বচ্ছন্দে বসিয়া আছি।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,——"তুমি স্ত্রীলোক —তুমি কি করিবে?"

অপরাজিতা বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"স্ত্রীলোক—' স্ত্রীলোক! স্ত্রীলোক মনে করিলে, পুরুষের কোন্ সাহায্য না করিতে পারে? তাহারা একরাশি করিয়া ভাত খায়, হাসিয়া বাড়ী ফাটায়, কাঁদিয়া দেশ ভাসাইয়া দেয়, ।ঘুমাইয়া কুম্ভকর্ণকে হারি মানায়, কোন্দলে দেশ তোলপাড় করে। আর যেখানে একটু গোলের কথা, সেখানেই স্ত্রীলোক—অবলা—আহা! তাহারা কি করিবে?"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"তুমি কোথায় যাইবে? কি বা করিবে? যেখানে গিয়া এই ভুবন-ভুলান রূপের বাঁধন খুলিয়া দিবে, সেখানেই দেশ উৎসন্ন হইবে; সৃষ্টি রসাতলে যাইবে। ভাইয়ের বিপদ উদ্ধার করিতে গিয়া, শেষে ভগিনী হয় তো এমন বিপদে পড়িবেন যে, রাম লক্ষ্মণ দু' জনেই, সীতা-হারা পাগল হইয়া, তখন পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইবেন।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"রূপ—পোড়া রূপের জন্ম বিপদ হওয়া অসম্ভব নহে। কেন না, এদেশের পুরুষ জাতি বড়ই চরিত্রহীন কিন্তু এ রূপের আগুনে যদি কেহ পুড়িয়া মরে, তাহা হইলে তাহারা আপনারাই পুড়িয়া মরিবে। তাহাতে আমার ক্ষতি কি—রাধই বা কি? দীপ দেখিয়া অনেক তাহাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত উন্মত্ত হ[illegible] কিন্তু ফল কি দাঁড়ায়—কেবল পুড়িয়া মর[illegible] দীপ কাহাকেও ডাকে না, কাহাকেও মরিতে বলে না। তুমি ঠিক্ জানিবে, বউ দিদি যে নারী ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি পদ-বিদলিত করিতে শিখিয়াছে, মৌখিক না হইয়া, সতীত্ব যাহা অন্তরের ধন হইয়াছে, বসুন্ধরার সম্রাট্, সম[illegible] বল-প্রয়োগ করিয়াও, তাহার ধর্ম্মের একতি[illegible] নষ্ট করিতে পারেন না। মনে করিয়া [illegible] রাবণের ন্যায় প্রতাপশালী কে ছিল? সীতা[illegible] এক বৎসর হাতে পাইয়াও, সেই রাবণ তাহ[illegible] ধর্ম্মনাশ করিতে পারে নাই। ধর্ম্মের ব[illegible] ও ধর্ম্মের বড়াই এক কথা, আর ধর্ম্মের প্রক[illegible] [illegible]ত্ত্ব-জ্ঞান আর এক কথা। যথার্থ ধর্ম্মশী[illegible] নারীর বিপদ কখনই হইতে পারে না। [illegible] না, দেবতারা তাহার সহায়; ধর্ম্ম তাহ[illegible] রক্ষক।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"ঠাকুর-ঝি, যখ[illegible] তোমার যে কথা শুনি, তাহাই আমাকে মা[illegible] ইয়া তুলে। তোমার অমৃতময় কথা শুনি[illegible] বোধ হয় শাস্ত্র-কথা-শ্রবণ, ধর্ম্মোপদেশ-গ্র[illegible] কিছুরই আর প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু [illegible] ধর্ম্মনাশের কোন ভয় না থাকিলেও, [illegible] নারী, বিপদে পুরুষের কি সাহায্য কর[illegible] পারে? হয় তো সে নিজে এত কাতর অবসন্ন হইয়া পড়ে যে, পুরুষকে তখন তা[illegible] জন্য আরও বিপদাপন্ন হইতে হয়।"

অপরাজিতা একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, ধর্ম্মশীলা নারী, ক[illegible] দৈহিক শক্তির অপ্রতুলতা হেতু, কষ্ট পা[illegible] সংসারে ধর্ম্ম-বল অন্যান্য সকল বল অ[illegible] শ্রেষ্ঠ। যাহার ধর্ম্ম-বল আছে, তাহার

দুষ্কর বা অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই। সাবিত্রী আপনার ধর্ম্ম-বলে যমকে পর্য্যন্ত জয় করিয়া মরা স্বামী বাঁচাইয়া আনিয়াছিলেন। দময়ন্তী ধর্ম্ম-প্রভাবে হেলায় ভয়ানক বিপদ-সমূহ অতিক্রম করিয়াছিলেন। যাহার ধর্ম্ম আছে, তাহার সকলই আছে। আমার তো একবারও মনে হয় না বউ দিদি! যে আমি অবলা বলিয়া বিপদে আত্মরক্ষা করিতে পারিব না; অথবা বিপদাপন্ন ভ্রাতার সাহায্য করিতে সমর্থ হইব না। মনে কর, দুষ্ট শত্রু আমার ভাইকে মারিয়া ফেলিবার জন্য ধরিয়াছে। আমি তখন আর কিছু সাহায্য করিতে না পারিলেও, যদি দূর হইতে প্রাণ-পণে চীৎকার করি, তা হইলে হয় তো সেই শব্দ শুনিয়া অন্য লোক সাহায্য করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতে পারে, এবং অনেক লোক দেখিয়া শত্রু, হয় তো আমার ভাইকে ছাড়িয়া পলাইতে পারে। ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালও বৃহৎ ব্যাপারে সাহায্য করিতে পারে। তবে কেন যে স্ত্রীলোক কিছু করে না, বা করিতে পারে না, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে আমার সাধ্য নাই যাহারা সুখের বেলায় হাসিতে হাসিতে বেশ ভাগ লইতে পারে, বিপদের সময় কেন তাহারা ঘরের মধ্যে বসিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে চুপ করিয়া থাকে, তাহা আমি বলিতে পারি না। যাহাই হউক, আমি যখন বুঝিতেছি, আমার ভাই হয় তো বিপদে পড়িয়াছেন, তখন আমি রূপ যৌবন বা দুর্ব্বলতার ওজরে কখনই এখানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব না। নিশ্চয়ই আমি স্বয়ং বিনোদের সন্ধানে যাত্রা করিব। যদি তিনি বিপদে পতিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কোন অসুবিধাই আমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। আমি তাঁহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত স্বচ্ছন্দে সকল বিপদেরই সম্মুখীন হইব।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"ঠাকুর ঝি, তুমি কখনই মানুষ নহ—তুমি দেবতা। দেবকার্য্যে দোষ হয় না; ভয়েও দেবতাকে বাসনা-নিবৃত্ত করিতে হয় না। তুমি যাহা কর, যাহা বল, যাহা বুঝাও সকলই ভাল। আমি তোমার মধু-মাখা কথা শুনিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করি।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"বেশ কর। এখন আইস, আমরা মার কাছে যাই।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"চল, তুমি ভাই খুঁজিতে যাইতেছ, তোমাকে সব গুছাইয়া দিতে হইবে। সাজ-সজ্জা বেশ-ভূষা অনাবশ্যক। কেন না ভগবান্ তোমাকে যে রূপের সাগর করিয়া গড়িয়াছেন, বেশ-ভূষার কলসী তাহাতে ঢাল বা না ঢাল, তাহা সমানই থাকিবে। কিন্তু ভাই ব্যবস্থাটা কিছু উল্টা হইতেছে না কি? সুভদ্রা কি কখন কৃষ্ণ-বলরামের সন্ধানে যাত্রা করিয়াছিলেন? তুমি নাকি খুব পণ্ডিতা; তাই তোমাকে পুরাণের এই কথাটা জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

ব্রজেশ্বরীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া, অপরাজিতা বলিলেন,—"তোমার এই দুষ্ট জিভখানা আমি কাটিয়া দিব। শ্রীকৃষ্ণ নিকলঙ্ক পূর্ণ পুরুষ। তাঁহার নামে না বুঝিয়া যাহারা কলঙ্ক আরোপ করে, তাহারা সকলেই মিথ্যাবাদী। এখন আইস তুমি?"

তাহার পর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে, ব্রজেশ্বরীকে লইয়া, অপরাজিতা সেই প্রকোষ্ঠ হইতে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অপরাজিতা ও ব্রজেশ্বরী যখন বারান্দায় আসিলেন, তখন হাসিতে হাসিতে একটা যুবতী দাসী তথায় উপস্থিত হইল। সে অনবরত হাসিতে হাসিতে বলিল,—"দিদি ঠাক্‌রুণ, বউ ঠাক্‌রুণ, তোমরা এখানে? বাপ্‌রে বাপ, এমন লোক তো কখন দেখি নাই!"

দাসী, মুখে কাপড় দিয়া, হাসিতে লাগিল। ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"আরে গেল! অত হাসিস্ কেন? কে লোক? কাহার কথা বলিতেছিস্?"

দাসী বলিল,—"হাসিব না? সে যে মজার লোক! তাহার রকম-সকম দেখিলে না হাসিয়া থাকা যায় কি? বাপ্‌রে, পেটের নাড়ী ছিঁড়িয়া গেল!

অপরাজিতা বলিলেন,—"কে সে লোক? কি করিয়াছে সে? বল্ না, আমরাও তোর সঙ্গে একটু হাসি।"

দাসী বলিল,—"তাহার রকম দেখিলেই তোমরা হাসিয়া অস্থির হইবে।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"কে সে?"

দাসী বলিল,—"কে সে, তা কি করিয়া জানিব? লাখ কথাতেও সে একটা কথা কয় না?"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"বোবা বুঝি?"

দাসী বলিল,—"উঁ হুঁ—তাহার কথায় খৈ ফুটে। এক কথায় সে দশটা জবাব দেয়।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"তবে যে বলিতেছিস্, লাখ্ কথাতেও সে কথা কহে না?"

দাসী বলিল,—"ঐ তো মজা! যখন তারমনের মত কথা হয়, তখন তার নাক, মুখ, চোখ দিয়া কথার তুব্‌ড়ি ছুটিতে থাকে। সে তখন খুব চালাক্; এক দমে রামায়ণ-পালাটা শেষ করিয়া ছাড়ে। আর যখন আমাদের মনের মত কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন সে যেন বোবা, হাবা, বোকার একশেষ, একেবারে পেঁচা হইয়া বইসে। কাহার সাধ্য তখন তাহার পেট হইতে একটা কাজের কথা বাহির করে।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"আশ্চর্য্য লোকই বটে! কোথায় আছে সে?"

দাসী বলিল,—"দপ্তর-খানায় জাম্বুবানের মত গা দুলাইতে দুলাইতে বসিয়া আছে।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"কোথা হইতে আসিয়াছে সে?"

দাসী বলিল,—"বলিতেছে, ছোট বাবুর কাছ থেকে আসিয়াছে।'

অপরাজিতা বলিলেন,—"ছোট বাবুর কাছ থেকে লোক আসিয়াছে, একথা এতক্ষণ বলিস নাই কেন? কি জন্য আসিয়াছে? কতক্ষণ আসিয়াছে? কি কথা বলিতেছে? কি খবর সে আনিয়াছে?"

দাসী বলিল,—"বাপ্ রে বাপ! সে দিবে মিন্‌সে মারিয়া ফেলিলেও যেমন কাজের কথা চুপ, এ দিকে ঠাক্‌রুণরাও তেমনই কথা হাউই। তাহার কথা ছাইও বুঝা যায় না নায়েব মহাশয় তাহাকে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কোন কথারই জবাব পান নাই কিছুই ভাল রকম বুঝিতে না পারিয়া শেষে তিনি আপনাদিগকে জানাইবার জন্য আমাকে ভার দিয়াছেন।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"সে কি খবর আনিয়াছে, তা তুই জানিতে পারিয়াছিস্ কি?"

দাসী বলিল,—"মাথা মুণ্ড তবে আর বলিতেছি কি? খবর কি ছাই তাহার কাছে

পাইবার যো আছে? সে মিন্‌সে যেন কথক-ঠাকুরের মত বেদিতে বসিয়া হাত, মুখ, গোঁপ চোখ, নাড়িতে নাড়িতে কতই বকাবকি করিতেছে; কিন্তু খবর কিছুই বলে না। যাও বলে তা শুনিয়া কিছুই বুঝা যায় না। আমার বোধ হয়, সে একটা পাগল। হয় তো ছোট বাবুর নাম করিয়া এখান হইতে কিছু ভিক্ষা লইতে আসিয়াছে।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"সে যে ছোট বাবুর কাছ থেকে আসিয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ আছে?

দাসী বলিল,—"আছে। সে বলিয়াছে, তাহার কাছে ছোট বাবুর হাতের চিঠি আছে।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"ছোট বাবুর পত্র লইয়া আসিয়াছে, এ কথা তুই এতক্ষণ বলিস্ নাই কেন? আইস ঠাকুরঝি, আমরা নীচে যাই। ইহার নিকট শুনিয়া কোন কথাই বুঝা যাইতেছে না।"

ভ্রাতৃজায়া ও ননন্দা ব্যস্ততা সহ নামিয়া আসিলেন। সেখানে আসিয়া অপরাজিতা একটী বুদ্ধিমতী ঝিকে ডাকিয়া বলিলেন;—"শুনিতেছি ছোট বাবুর নিকট হইতে একটী লোক আসিয়াছে। সে এখন বাহিরে কাছারিতে বসিয়া আছে। সে কেন আসিয়াছে, কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছে, শীঘ্র জানিয়া আইস।"

ঝি প্রস্থান করিল। অনতিকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া সে বলিল,—"সে বড় বাবুর নামে, ছোট বাবুর এক পত্র লইয়া আসিয়াছে। বড় বাবু বাড়ী নাই; কাজেই সে পত্র লইয়া ফিরিয়া যাইতেছে।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"তুমি তাহাকে ফিরিয়া যাইতে বারণ করিয়া আইস। তাহার পর যাহা করিতে হইবে, তাহা তোমাকে পরে বলিতেছি।"

ঝি পুনরায় প্রস্থান করিল। তখন ব্রজেশ্বরী ও অপরাজিতা, অল্প কথায়, একটা পরামর্শ স্থির করিলেন। ঝি প্রত্যাগত হইলে, অপরাজিতা বলিলেন,—"তুমি নায়েব মহাশয় ও সেই লোকটীকে সঙ্গে করিয়া পাশের ঘরে লইয়া আইস। আমরা তাহার কথা শুনিব।"

ঝি আবার প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল,—"তাঁহারা আসিয়াছেন।"

তখন অপরাজিতার আদেশে ঝি বলিল,—"এখানে বউ-ঠাক্‌রুণ আর দিদি-ঠাক্‌রুণ আছেন। যে লোক ছোট বাবুর নিকট হইতে আসিয়াছেন, তিনি কি জন্য আসিয়াছেন, বলুন।"

যিনি আসিয়াছেন তিনি আর কেহ নহেন—আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত শ্রীরাম দাস। শ্রীরাম বড়ই বিপদে পড়িল। সে ছোট বাবুর নিকট শুনিয়া আসিয়াছে, তাঁহার ভগিনী বড়ই বুদ্ধিমতী। কোন রহস্যই যেন প্রকাশ না হয়, কিছুই যেন কেহ জানিতে না পারেন, ইহাই তাহার প্রতি ছোট বাবুর উপদেশ। অথচ সে জানে, টাকা লইতেই তাহার আসা—বাবুর হাতে টাকার টানাটানি বড় বাবু বাটীতে নাই; সুতরাং সেই বুদ্ধিমতী দিদি-ঠাকুরাণীর জেরায় তাহাকে পড়িতে হইল। অতি অল্প কথায়, প্রকারান্তরে যাহা না বলিলে নহে তাহাই বলিয়া, কাজ সারিতে তাহার প্রতি উপদেশ ছিল। সেই কথা স্মরণ রাখিয়া সে বলিল,—"আমি ঠাকুরাণীদিগকে প্রণাম করিতেছি। ছোট বাবুর নিকট হইতে বড় বাবুর নামে এক পত্র লইয়া আমি আসিয়াছিলাম।"

অপরাজিতার উপদেশ মত মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, ঝি কথা কহিতে লাগিল। ঝি জিজ্ঞাসিল,—"পত্র কোথায় ?

শ্রীরাম বলিল,—"আমার কাছে আছে।"

ঝি বলিল,—"দেও।"

শ্রীরাম বড়ই মুস্কিলে পড়িল। বলিল,—"পত্র—তা—আজ্ঞে—আমার কাছে—পত্র ছিল—আজ্ঞে—আছে। পত্র তো আর কাহাকেও দিতে আজ্ঞা পাই নাই।"

ঝি বলিল,—"পত্র আর কাহাকেও দিতে হইবে না, এরূপ আজ্ঞা পাইয়াছ কি ?"

শ্রীরাম বলিল,—"ঠিক্ সেরূপ আজ্ঞাও পাই নাই। তবে বাবুর যেরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়াছি, তাহাতে পত্র আর কাহারও হাতে না দেওয়াই উচিত।"

ঝি বলিল,—"ঠাকুরাণীরা বুঝিতেছেন, যে ব্যক্তি মনিবের অভিপ্রায় বুঝিয়া কাজ করিতে পারে, সে বড় বুদ্ধিমান্, চতুর ও বিশ্বাসী লোক। তুমি বুঝিতেছ না কি, এই পত্র না দিলে, হয়তো বাবুর বিশেষ ক্ষতি হইতেও পারে ?"

শ্রীরাম বলিল,—"বিশেষ ক্ষতি কেন হইবে ? একটু অসুবিধা হইতে পারে।"

ঝি বলিল,—"তবে পত্র দেও।"

শ্রীরাম আর আপত্তি করিতে সাহস করিল না। ইতস্ততঃ না করিয়া, সে পত্রখানি ঝির হস্তে প্রদান করিল।

অপরাজিতা ও ব্রজেশ্বরী, পত্র পাঠ করিলেন। তাহাতে কোন সংবাদই নাই; কেবল পত্রবাহক দ্বারা পাঁচ শত টাকা পাঠাইবার কথা আছে। ঝি বলিল,—"এ পত্রে কি কথা আছে, তাহা তুমি জান কি ?"

বলিল,—"পাঁচ শত টাকা লইয়া যাইবার কথা আছে জানি। আর কোন কথা আছে না আছে আমি তাহা জানি না।"

ঝি জিজ্ঞাসিল,—"ছোটি বাবু এখন কোথায় আছেন ?"

"ঠিক্ জানি না"

"তিনি কলিকাতায় আছেন কি ?"

"বোধ হয় না।"

"তিনি কি হুগলীতে আছেন ?"

"না।"

"তাঁহার কোথায় থাকা সম্ভব বলিয়া তুমি মনে কর ?"

"আমি কেমন করিয়া কি মনে করিব ?"

"কেন ? তুমি সর্ব্বদা তাঁহার কাছে থাক; তিনি কোথায় গিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না ?"

শ্রীরাম একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—"বোধ হয় পশ্চিমে।"

ঝি জিজ্ঞাসিল,—"পশ্চিম তো অনেক জাগয়া। তাহার মধ্যে কোথায় তিনি আছেন বলিয়া তোমার মনে হয় ?"

শ্রীরাম বলিল,—"কিছু মনে হয় না।"

"বাবু পশ্চিমে আছেন, বলিয়া তোমার বোধ হয়; কিন্তু কোথায় তিনি আছেন, সে সম্বন্ধে কিছুই তোমার মনে হয় না। তুমি তাঁহার কিরূপ অনুগত লোক ?"

শ্রীরাম বলিল,—"আমি অতি সামান্য লোক।"

ঝি বলিল,—"সামান্য লোক হইলেও বাবু পশ্চিমে কোথায় আছেন, ইহা না জানা তোমার পক্ষে বড় অন্যায় কথা।"

শ্রীরাম বলিল,—আমার বোধ হয় বর্দ্ধমান ছাড়াইয়া কোন স্থানে তিনি থাকিলেও থাকিতে পারেন।"

"তুমি এখন টাকা লইয়া কি করিবে ?"

"বোধ হয় কিছুই করিব না।"

"তবে টাকা লইতে আসিয়াছ কেন ?"

"সঙ্গে রাখিব বলিয়া।"

"এ স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া তুমি কোথায় যাইবে ?"

শ্রীরাম বলিল,—"তা কি ঠিক বলা যায় ? কখন্ কোথায় যাইবার দরকার হয়, কে বলিতে পারে ?"

ঝি জিজ্ঞাসিল,—"প্রথমে তুমি কোন্ দিকে যাইবে ?"

"রেলের ষ্টেশনের দিকে।"

"সেখানে তুমি কোথাকার টিকিট কিনিবে ?"

"বোধ হয় কলিকাতার।"

"তাহা হইলে, ছোট বাবুর কাজ মিটিবে কিরূপে ? তিনি আছেন পশ্চিমে, আর তুমি টাকা লইয়া যাইতেছ কলিকাতায়। এ কি প্রকার ব্যবস্থা ?"

"দরকার পড়িলে তিনি আমার নিকট টাকা চাহিয়া লইবেন।"

তাঁহা হইলে তিনি শীঘ্র কলিকাতায় ফিরিবেন না বোধ হয় ?"

"ইচ্ছা তাঁর।"

"তুমি আপাততঃ কোথা হইতে আসিতেছ ?"

"এই রেলের ষ্টেশন হইতে।"

"তাহার পূর্ব্বে তুমি কোথায় ছিলে ?"

অনেক স্থান ঘুরিয়াছি। কত নাম করিব ?"

ছোট বাবুর সহিত তোমার কোথায় শেষ দেখা হইয়াছে ?"

"সে একটা বাসায়।"

"কোথায় সে বাসা ?"

"হুগলীতে।"

"ছোট বাবু কি কাজে হুগলী গিয়াছিলেন ?"

"অনেক কাজ। সব কি আমরা জানি ?"

"সব জানিয়া কাজ নাই। কি কাজ তুমি জান ?"

"বোধ হয় সাহেব-সুবার সহিত দেখা করা একটা কাজ।"

"আর ?"

ঠিক বলিতে পারি না। ঐ কাজই তো দেখিয়াছি। সাহেব-সুবার কাছে যাওয়া-আসার কথা আমরা জানি।"

ঝি জিজ্ঞাসিল,—"তিনি হঠাৎ পশ্চিমে যাইলেন কেন—বলিতে পার ?"

শ্রীরাম বলিল,—"তা আমরা কেমন করিয়া বলিব ? তিনি বড় লোক। যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।"

"তিনি পশ্চিমে—তুমি টাকা লইয়া যাইতেছ কলিকাতায়। তাঁহার হাতে টাকা নাই লিখিয়াছেন। তবে বোধ হয় তিনি শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরিবেন।"

"আশ্চর্য্য কি ? তিনি বড় লোক। ইচ্ছা হইলে সবই করিতে পারেন।"

"তিনি কোন বিপদে পড়েন নাই তো ?

শ্রীরাম বিশেষ উৎসাহের সহিত এ প্রশ্নের উত্তরে বলিল,—"রাধাকৃষ্ণ ! বিপদ কিসের ?"

"তাঁহার শরীর ভাল আছে ?"

"তাঁহার শরীর খুবই ভাল আছে। তাঁহার জন্য আপনারা কোন চিন্তা করিবেন না।"

ঝি বলিল—"তোমার সহিত এতক্ষণ কথা কহিয়াও বিশেষ খবর কিছুই পাওয়া গেল না। এজন্য ঠাকুরাণীরা বড়ই দুঃখিত হইতেছেন। বোধ হয়, ছোটবাবু তোমাকে এইরূপে অল্প কথায়, সকল বিষয় চাপিয়া রাখিয়া, কথা কহিতেই বলিয়া দিয়াছেন। সুতরাং তোমার

কোন দোষ নাই। তুমি উপদেশ-মত কার্য্য করিয়া ভালই করিয়াছ। ঠাকুরাণীরা ছোট বাবুর সংবাদের জন্য বড়ই চিন্তিত রহিয়াছেন; বিশেষ খবর, কিছু জানিতে পারিলে, তাঁহারা বড়ই সুখী হইতেন।"

শ্রীরাম বলিল,—"বাবুর জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই। তিনি বেশ সুস্থ আছেন। কোন প্রকার ভয় ভাবনা নাই; কোন বিপদেও তিনি পড়েন নাই।"

ঝি বলিল,—"আপাততঃ তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। ইহার বেশী আর কোন সংবাদ তুমি বলিবে না; সুতরাং আর জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই। বড় বাবু এখানে না থাকিলেও, টাকা পাওয়ার কোনই ব্যাঘাত হইবে না। তুমি কখন যাইবে মনে করিয়াছ?" শ্রীরাম বলিল,—"টাকা লইয়া রাত্রিকালে যাওয়া ভাল নয়। আজি রাত্রিতে না ফিরিলে বিশেষ ক্ষতি হইবে বলিয়াও বোধ হয় না। কালি প্রাতেই আমি যাইব।"

ঝি বলিল,—"নায়েব মহাশয়! দিদি-ঠাকুরাণী হুকুম দিতেছেন—এই লোক যখন চাহিবেন, তখনই যেন ইহাকে পাঁচ শত টাকা দেওয়া হয়। আর ইঁহার রাহাখরচ ইত্যাদিও যেন দিতে ভুল না হয়।"

নায়েব মহাশয় "যে আজ্ঞা" বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

শ্রীরামকে লক্ষ্য করিয়া ঝি বলিল,—"তুমি যখন যাইবে তখনই নায়েব মহাশয়ের নিকট টাকা পাইবে। আপাততঃ তুমি জল খাও—বিশ্রাম কর।"

শ্রীরাম ঠাকুরাণীদের উদ্দেশে পুনরায় প্রণাম করিয়া নায়েব মহাশয়ের সহিত বাহিরে আসিল এবং তথায় আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অপরাহ্নকালে কলিকাতার সেই ক্ষুদ্র বাসায় তারাসুন্দরী ও বিজলী বসিয়া আছেন। উভয়েই নিতান্ত বিষণ্ণ ও মলিন। বিনোদ বাবু সেই চলিয়া গিয়াছেন; সে আজি প্রায় পনর দিন হইল; এ পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোন সংবাদ নাই। আপনাদের অদৃষ্টে যাহা থাকে হউক, কিন্তু সেই একান্তহিতৈষী যুবকের কি হইল, অধুনা ইহাই তাঁহাদের চিন্তার প্রধান কারণ হইয়া পড়িয়াছে। বহুক্ষণ মাতা ও কন্যা নীরবে বসিয়া রহিয়াছেন। উভয়ের মনে সমান চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। কাহারও কথা কহিতে সাহস হইতেছে না। কথা কহিতে হইলেই হয় তো কাঁদিয়া ফেলিতে হইবে। অনেকক্ষণ পরে তারাসুন্দরী বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান্, তোমার মনে আরও কি আছে জানি না। কিন্তু মানুষের দুর্গতি ইহার অপেক্ষাও বেশী হইতে পারে কি? যে এক অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ীর মুখ চাহিয়াছিলাম, তিনিও আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন।"

বিজলী বলিলেন,—"মা তোমার কি বোধ হয়, তিনি আমাদের উপর রাগ করিয়া গিয়াছেন? আমরা কি অপরাধ করিয়াছি?"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"না—রাগ করিয়া যান নাই।। তাঁহার দয়ার শরীর। তিনি কি

আমাদের মত দুঃখিনীদের উপর রাগ করিতে পারেন।

বিজলী সজল নয়নে বলিলেন,—তবে এত নিগ্রহ কেন? কোন সংবাদ দিতেছেন না, বা লইতেছেন না কেন? সেই ভয়ানক দিনের পরও এখানে দুই দিন ছিলেন; ঝি তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিল; কিন্তু তখনও তিনি কোন দয়ার কথা বলিলেন না কেন? আমরা তো জ্ঞানতঃ কোন অপরাধ করি নাই।"

বিজলী কাঁদিয়া ফেলিলেন। তারাসুন্দরী অতি কষ্টে আপনার নয়নের জল পড়িতে না দিয়া, কন্যার নিকটস্থ হইলেন এবং সস্নেহে বিজলীর মুখ মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন—"সেই অতীত ঘটনার আলোচনা আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। অদৃষ্টে যাহা ছিল ঘটিয়া গিয়াছে। এক্ষণে ভগবান্ আমাদের আশাতিরিক্ত সুখসৌভাগ্যের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। কপালদোষে সে সাধের ঘর এক কথায় ভাঙ্গিয়া গেল।"

বিজলী বলিলেন,—"কিন্তু মা, লোকে বলিলেও, তুমি তো কখনই বিশ্বাস কর না যে, যদুপতি মিত্র মহাশয় আমার পিতাকে হত্যা করিয়াছেন।"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"কখন না। মিত্র মহাশয় দেবচরিত্রের লোক ছিলেন। তোমার পিতা তাঁহার পরম বন্ধু ছিলেন। এরূপস্থলে একের দ্বারা অপরের হত্যাকার্য্য কখনই সম্ভব নহে। পুলিশ ও অন্যান্য লোকে এই দুর্ঘটনার যে সকল কারণ দেখাইয়া স্থির করিয়াছে যে, ইহা সম্ভব ও সত্য, সে সকল যুক্তি ও কারণ যেনিতান্ত ঘৃণাজনক ও অবিশ্বাস্য, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।"

বিজলী আবার বলিলেন,—"আমরা যখন সে কথা বিশ্বাস করি না, সে সম্বন্ধে একটু সন্দেহও করি না, তখন তিনি আমাদের উপর রাগ করিলেন কেন?"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"তিনি রাগ করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। পিতার এই কলঙ্ক দূর করাই বোধ হয় তাঁহার অভিপ্রায়। এই অপবাদ দূর করিতে না পারিলে, আমাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে স্বভাবতঃ তাঁহার বিশেষ লজ্জা হইতে পারে। আরও দেখ, তিনি সুশিক্ষিত ও সুযোগ্য সন্তান। পিতার সুনাম বজায় করিবার চেষ্টা না করা, তাঁহার পক্ষে নিন্দার কথা। এ চেষ্টা ত্যাগ করিলে তাঁহার নিজের হৃদয় ও জীবনে কখনই শান্তিলাভ করিতে পারিবে না। এই সকল কারণেই তিনি চলিয়া গিয়াছেন। আমাদের ন্যায় নিঃসহায় লোকের উপর তিনি রাগ করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না।"

বিজলী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিন্তু মা, তিনি যে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া তুমি মনে করিতেছ, তাহাতে কখন তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন এরূপ তোমার বোধ হয় কি? সেই অতীত কাণ্ডের অন্ধকার ভেদ করিয়া, সত্যের আলোক তিনি প্রকাশ করিতে পারিবেন বলিয়া তোমার মনে হয় কি?"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"বড়ই কঠিন কথা—বড়ই চিন্তার বিষয়। ভরসার মধ্যে তিনি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, ধনবান্ ও বলবান্; কিন্তু আমার চিরদিনই সন্দেহ হয়, নিশ্চয়ই এ ব্যাপারের মধ্যে একটা দুর্দ্দান্ত লোকের চক্রান্ত আছে। আমি সে কথা কখনও কাহাকেও বলি নাই। সে লোকটার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। কোন প্রকার দুষ্কর্ম্মেই সে পশ্চাদ্‌পদ নহে। যদি আমার সন্দেহ সত্য হয়, তাহা হইলে

বিনোদের নিমিত্ত আমাদিগকে চিন্তিত থাকিতে হইবে। আমার সন্দেহ যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে কোন ভয়ের কারণ নাই। কৃতকার্য্য হউন বা না হউন, তাঁহার কোন বিপদ না ঘটিলেই আমি পরম লাভ জ্ঞান করিব।"

বিজলী বলিলেন,—"কিন্তু মা, যদি তোমার আশঙ্কাই সত্য হয়, তাহা হইলে কি হইবে?"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"তাহা হইলে কি হইতে পারে, তাহার কল্পনা করিতে আমার সাহসে কুলায় না। ঈশ্বর যাহা ঘটাইবেন, তাহাই হইবে।"

আবার মা ও মেয়ে নীরব। কিয়ৎকাল পরে বিজলী বলিলেন,—"মা, আমার বড় মাথা ঘুরিতেছে, আমি বুঝি পড়িয়া যাই।"

সঙ্গে সঙ্গে তারাসুন্দরী কন্যাকে চাপিয়া ধরিলেন। বিজলীর মস্তক হেলিয়া পড়িল, নয়ন মুকুলিত হইয়া উঠিল, হস্তাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবসন্নভাবে ঝুলিয়া রহিল। অতি সন্তর্পণে তারাসুন্দরী কন্যার মস্তক আপন উরুতে স্থাপন করিয়া, তাঁহাকে সেই ভূশয্যায় শয়ন করাইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে ঝিকে ডাকিতে লাগিলেন। ঝি নীচে কাজ করিতেছিল; তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। তারাসুন্দরী তাহাকে পাখা ও শীতল জল দিতে বলিলেন; তারাসুন্দরী ও ঝি উভয়ে সেই সুন্দরীশিরোমণি কিশোরীর নানাপ্রকার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে বিজলীর চৈতন্য সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত হইয়া গেল। রোগিণীর নিকটে ঝি শয্যারচনা করিল। উভয়ে বিজলীর সেই মৃতকল্প কলেবর অতি সাবধানে সেই শয্যায় স্থাপিত করিলেন। তারাসুন্দরী, ঝিকে ডাক্তার ডাকিয়া ও বরফ কিনিয়া আনিতে পাঠাইয়া, নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে, পীড়িতা কন্যার পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন।

বরফ লইয়া ঝি ফিরিয়া আসিল এবং ডাক্তারও শীঘ্র আসিতেছেন বলিয়া সংবাদ দিল। তারাসুন্দরী কন্যার মাথায় ও কপালে বরফ দিতে লাগিলেন।

সেই পাড়ার ডাক্তার অমৃতলাল বাবু বড়ই ভদ্রস্বভাব, সদয়হৃদয় ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। ঝি তাঁহাকেই ডাকিয়া আসিয়াছিল। অনতিকাল মধ্যে ডাক্তার বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সাবধানে রোগীর সমস্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। এবং জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ প্রশ্ন দ্বারা জানিয়া লইলেন। তাহার পর তিনি স্থির করিলেন, সহসা চিত্তের উপর কোন ভয়ানক আঘাত লাগায় এ পীড়ার উদ্ভব হইয়াছে। নিরন্তর চিন্তাজনিত অবসাদ এ রোগের হেতু। অমৃত বাবু উপযুক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন।

তারাসুন্দরী অশ্রুপাত করিতে করিতে বলিলেন,—"আমার অবস্থা নিতান্ত মন্দ; কিন্তু এই কন্যাই আমার জীবনের একমাত্র সম্বল। আমার এখনও দুই চারিটা ঘটী বাটী আছে। কন্যাকে রক্ষা করিবার জন্য আপনার দয়া ছাড়া আর উপায় নাই। আমার যাহা আছে, সমস্তই আপনার। আপনি দয়া করিয়া আমার মেয়েটীকে বাঁচাইয়া দিন।"

অমৃত বাবু বলিলেন।—"সে জন্য আপনার কোন চিন্তা করিতে হইবে না। আমি পাড়ার লোকের নিকট ফি লই না; সুতরাং আপনারও লাগিবে না। ঔষধের দাম আপাততঃ আপনার লাগিবে বটে; কিন্তু পরে বুঝিয়া তাহারও সুব্যবস্থা করা যাইবে। আমার দ্বারা যত্নের কোন ত্রুটি হইবে না। আপাততঃ কন্যার জন্য চিন্তার কোন কারণ দেখিতেছি না। আমি কল্য প্রাতে আসিব

ডাক্তার ঔষধ প্রয়োগ ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা বুঝাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। ঝি ঔষধ আনিল। নিয়মিতরূপে ঔষধ সেবন করান হইতে লাগিল এবং ডাক্তারের উপদেশমত অন্যান্য অনুষ্ঠান চলিতে থাকিল।

রোগের প্রথম আক্রমণ হইতেই বিজলী নির্ব্বাক্ ছিলেন। শেষ রাত্রি হইতে তিনি কথা কহিতে লাগিলেন। অসংবদ্ধ প্রলাপমাত্র হইলেও তাঁহার মুখে কথা শুনিয়া তারাসুন্দরীর মৃতদেহে যেন জীবনের সঞ্চার হইল। প্রাতঃ-কাল পর্য্যন্ত বিজলী নিরন্তর অর্থহীন সামঞ্জস্য-রহিত কথা কহিতে লাগিলেন। তারাসুন্দরী সে সমস্ত বাক্যের কোনই প্রকৃত অর্থ অব-ধারণ করিতে পারিলেন না; কিন্তু সেই অসংবদ্ধ বাক্যস্রোত অনুসরণ করিয়া তিনি স্থির করি-লেন যে, বিনোদের নিমিত্ত ভয়ানক চিন্তাই এই রোগের কারণ এবং বিজলী, এই অজ্ঞান অবস্থাতেও, সেই উদ্বেগের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই।

বেলা সাড়ে আটটার সময় ডাক্তার বাবু আবার আসিলেন। তিনি সাবধানতা সহকারে রোগীর অবস্থা দেখিয়া ও রাত্রি যে ভাবে কাটিয়াছে তাহা জানিয়া বলিলেন,—"কালি সন্ধ্যার পর পীড়িতার অবস্থা যেরূপ দেখি-য়াছি, এখন তাহার অপেক্ষা কিছু ভাল বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু রোগ সামান্যই আছে। এ রোগ কতদিনে সারিবে তাহা এখন স্থির করা যায় না। ঔষধ সেবনেও যে রোগের বিশেষ প্রতীকার হইবে, এমন বোধ হয় না। তথাপি পীড়িতার দুর্ব্বলতা ও অবসাদ নিবারণের জন্য একটা বলকারক ঔষধ নিয়-মিতরূপে চালাইতে হইবে। যদি রোগীর দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি না পায়, তাহা হইলে আপাততঃ ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি আবার বৈকালে আসিব।"

যথোপযুক্ত ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার প্রস্থান করিলেন। তারাসুন্দরী সেই সংজ্ঞাহীনা কন্যা লইয়া বসিয়া রহিলেন। আহার নিদ্রা বন্ধ।

দিন একরূপ কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পর পুনরায় ডাক্তার আসিলেন, এবং রোগীর সমস্ত লক্ষণ ও উপসর্গ দেখিয়া একটু বিমর্ষ হই-লেন। বলিলেন,—"আমি যাহা আশঙ্কা করিতেছিলাম, তাহাই ঘটিয়া আসিতেছে দেখিতেছি। রোগীর দুর্ব্বলতা একটু বাড়ি-য়াছে। এখনও চিন্তার কোন কারণ ঘটে নাই; কিন্তু এই দুর্ব্বলতা আরও বৃদ্ধি পাইলে বড়ই চিন্তার কারণ হইবে।

তারাসুন্দরী কাতরভাবে বলিলেন,—"আমি আপনাকে হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ দিতেছি। দুঃখিনীর আশীর্ব্বাদে আপনি চিরদীন সুখী থাকিবেন; কৃপা করিয়া যাহা করিলে এই দুর্ব্বলতা দূর হয়, তাহার ব্যবস্থা করুন।

ডাক্তার বলিলেন,—"আমি পূর্ব্বেও বলি-য়াছি, এখনও বলিতেছি, আমার যত্নের কোন ক্রটী হইবে না। কিন্তু যে আকস্মিক চিত্তের অবসাদ এই পীড়ার কারণ, তাহা দূর করিতে না পারিলে, অন্য চেষ্টায় বিশেষ ফল হইবে এরূপ আমি বোধ করি না। ঔষধে যাহা হইতে পারে, তাহার উপায় আমি করিতেছি।"

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। তারাসুন্দরী পীড়িতা কন্যা লইয়া অকূলপাথারে ভাসিতে লাগিলেন। হাতে একটীও পয়সা নাই। কন্যার শুশ্রূষা, ঔষধ পথ্য বুঝি আর চলে না। চিন্তার সীমা নাই। আরও একদিন কাটিয়া গেল।

ডাক্তার নিয়মিতরূপে দুইবার রোগীকে

দেখিতে পাইতেন। তারাসুন্দরী তাঁহার চিন্তাকুলভাব দেখিয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"কিরূপ বুঝিতেছেন?"

অমৃত বাবু বলিলেন,—"ভাল কিছুই বুঝিতেছি না। দুর্ব্বলতার বৃদ্ধি দেখিতেছি। জীবনের বিশেষ কোন আশঙ্কা এখনও উপস্থিত হয় নাই; তবে ক্রমশঃ এই ভাব বাড়িতে থাকিলে বিশেষ অনিষ্ট হওয়া আশ্চর্য্য নহে।"

আরও একদিন ধীরে ধীরে কাটিয়া গেল। বিজলীর অবস্থা বড়ই মন্দ হইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি অনেক সময়ে বাক্যহীন অজ্ঞান ভাবেই থাকিতে লাগিলেন। সে সময়ে বিশেষ মনঃসংযোগ সহকারে না দেখিলে, তাঁহাকে সজীব বলিয়া মনে করা যাইত না। তখন তাঁহার নয়নদ্বয় মুদ্রিত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রিয়াশূন্য, দেহের ভাব মৃতের ন্যায় বোধ হইত। কিন্তু তখনও তাঁহার নাড়ীর গতি অস্বাভাবিকরূপ দ্রুত, এবং হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া প্রবল বলিয়া উপলব্ধ হইত। এই ভাবে ক্রমাগত তিন চারি ঘণ্টা মৃতবৎ নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকার পর, সহসা বিজলী বিস্ফারিত লোচনে চারি দিকে চাহিয়া দেখিতেন। অনবরত নানারূপ প্রলাপ বাক্য তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইতে থাকিত; যেন কোথায় কাহাকে দেখিতে পাইয়া শয্যাত্যাগ করিবার প্রযত্ন করিতেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইত, যেন কখন দূরে, কখন বা অতি নিকটে কাহাকেও তিনি দেখিতে পাইতেছেন। সে সময় কখনও বা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিতেন, কখন বা কাতরভাবে শিশুর ন্যায় রোদন করিতেন। কখন বা কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া কোন বিশেষ কথা বলিতেন, কখনও বা দূরস্থিত কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া সৎপরামর্শ প্রদান করিতেন। কখন বা যেন ক্রোধে তিনি অভিভূত হইতেন, তখন তাঁহার হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ হইত; আবার কখন বা পরমানন্দে তাঁহার দেহ কণ্টকিত হইত এবং সন্তোষের সুবিমল জ্যোতিঃ তাঁহার বদনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিত। যখন বিজলী এইরূপ উন্মাদিনীভাবে থাকিতেন, তখন তাঁহার নয়নের আয়তন বড়ই বাড়িয়া উঠিত; যেন স্থানভ্রষ্ট হইয়া লোচনদ্বয় বাহিরে আসিতেছে বলিয়া বোধ হইত। তখন তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইত, দেহের স্থানে স্থানে উচ্চ শিরা দেখা যাইত এবং হস্তের অঙ্গুলি সকল বড়ই চঞ্চল হইয়া পড়িত। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল এই ভাবে থাকার পর, আবার বিজলী পূর্ব্ববৎ নিশ্চেষ্ট ও মৃতকল্প অবস্থায় অবস্থিত হইতেন।

ডাক্তার আসিয়া প্রাতে বলিয়া গিয়াছেন,—"রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে যাইতেছে। যে কারণে এই পীড়ার উদ্ভব হইয়াছে, এখনও চেষ্টা করিয়া তাহা দূর করিতে পারিলে, আরোগ্যের আশা করা যাইতে পারে। তাহা না হইলে, কি হইবে তাহা বলিতে পারি না।"

এ কথার অর্থ কি তাহা তারাসুন্দরী সহজেই বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু এ অবস্থায় সেই নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতি, বিপন্নের সহায়, নিঃসম্বলের সম্বল, ভগবান্‌ ভিন্ন আর কে রক্ষা করিতে পারেন? তারাসুন্দরী সেই সংজ্ঞাহীনা মরণাপন্না কন্যার মস্তক অঙ্কে লইয়া অনন্যমনে সেই আর্ত্তবান্ধব, বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

মধ্যাহ্নকালে তারাসুন্দরীর সেই ক্ষুদ্র বাসার সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হইল। ঝি নীচে ছিল, দ্বার খুলিয়া দেখিল, দরজার নিকট দুইজন স্ত্রীলোক, আর একটু দূরে রাস্তার উপর একখানি পাল্কী।

একটী স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই বাটীতে বিজলী থাকেন?"

ঝি উত্তর করিল,—হাঁ। তাঁহার বড় শক্ত ব্যারাম। তোমরা কে?"

স্ত্রীলোকেরা এ কথার কোন উত্তর না দিয়া, পাল্কীর নিকটে গমন করিল। পাল্কীর দ্বার খুলিয়া গেল। স্থূল বস্ত্রে আচ্ছন্নকায়া এক নারী সেই পাল্কী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গিনী স্ত্রীলোকদ্বয়ের সহিত আসিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দরজা বন্ধ করা হইলে, তিনি মুখের কাপড় খুলিয়া ফেলিলেন। তারাসুন্দরীর ঝি অবাক্ হইল! মানুষের এতরূপ হইতে পারে, ইহা তাহার, জানা ছিল না!

স্থূলবস্ত্রাবৃতা নারী বলিলেন,—"বিজলী কোথায়? সেখানে আর কে আছেন?"

ঝি বলিল,—"তিনি উপরে আছেন। বড় শক্ত ব্যারাম। বাঁচেন কি না সন্দেহ। কাছে কেবল মা আছেন।"

নবাগতা নারী বলিলেন,—"আমাকে সঙ্গে করিয়া সেখানে লইয়া চল।"

ঝির সহিত নবাগতা নারী ও তাঁহার পরিচারিকাদ্বয় উপরে উঠিলেন। তারাসুন্দরী তাঁহাকে দর্শনমাত্র বলিলেন,—"স্বর্গকন্যার ন্যায় আপনার আকার। বড় দুঃসময়েই আপনি আমাদের বাটীতে আসিয়াছেন। আপনি কে?"

নবাগতা নারী বলিলেন,—"আমি আপনার মেয়ে। মেয়েকে কেহ কখন আপনি বলিয়া কথা কহে না।"

নবাগতা কথা কহিতে কহিতে পীড়িতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, তাঁহার সমস্ত অবস্থা মনোযোগ সহকারে দেখিতে লাগিলেন এবং বিবিধ প্রশ্ন দ্বারা তারাসুন্দরীর নিকট রোগের সূচনা হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত অনেক বিবরণ জানিয়া লইলেন। বলিলেন,—"ভয় কি মা! ঈশ্বর নিশ্চয়ই আপনার কন্যাকে ভাল করিয়া দিবেন। এই লক্ষ্মীরূপা কন্যার অদৃষ্টে অনেক সুখসৌভাগ্য আছে। আকার প্রকারে দেখিতেছি, ইনি রাজরাণীর যোগ্য। আমি আপনার মুখে ডাক্তারের সমস্ত কথা শুনিয়া ও অন্যান্য বিবরণ জানিয়া বুঝিতেছি, দারুণ মানসিক ক্লেশে ইহার এই রোগ জন্মিয়াছে। সে ক্লেশ বোধ হয় আমি কতক দূর করিতে পারিব। আপনি বিজলীকে আমার কোলে দিয়া সরিয়া বসুন।"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"তোমার মধুমাখা কথা শুনিয়া আমার প্রাণে বড়ই ভরসা হইতেছে। বল মা, তুমি কে?"

নবাগতা বলিলেন,—"বলিয়াছি আমি আপনার বড় মেয়ে। আমার নাম অপরাজিতা।"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"তুমি কি তবে বিনোদের ভগিনী—৺ হরিদাস রায় মহাশয়ের কন্যা? তোমরা সকলেই দেবতা, দয়ার অবতার। তুমি যখন যেখানে যাইবে তখনই সেখানে আশা ভরসা, তোমার সঙ্গে যাইবে অকূলেও কূল পাইবে।"

অপরাজিতা বিনীতভাবে তারাসুন্দরীকে সরাইয়া দিয়া বিজলীর মস্তক স্বকীয় উরুদেশে স্থাপন করিলেন এবং ধীরে ও সাবধানে তাঁহার ললাটে ও বক্ষে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

বিজলী এতক্ষণ মৃতবৎ অচেতন ও বাক্য-হীন অবস্থায় ছিলেন। এক্ষণে সহসা নয়ন উন্মীলন করিয়া চীৎকার করিলেন,—"ঐ যে! ঐ যায়! হাতে ছোরা! কি ভয়ানক! ধর ধর! ঐ যে বাঁচা! কে ধরিল? তুমি—তুমি। নহিলে এত শক্তি—এত গুণ আর কাহার?"

বিজলীর অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাসি লাগিয়া রহিল। যেই বিজলীর বাক্যস্রোত বন্ধ হইল, তৎক্ষণাৎ অপরাজিতা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"ধরা তো পড়িয়াছে—মারিতে পারে নাই তো। আর ভয় কি?—"

অপরাজিতার কথায় বাধ্য দিয়া বিজলী উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"না না বুঝি আবার উঠিয়া পড়িল। লোকটার গায়ে খুব জোর। চল, চল, আমরাও যাই।"

বিজলী উঠিবার প্রযত্ন করিতেছেন দেখিয়া অপরাজিতা তাঁহাকে চাপিয়া ধরিলেন। বিজলীর কথা অসংবদ্ধ প্রলাপবাক্য নহে এবং তিনি অপরাজিতার বাক্যসমূহের মর্ম্ম প্রণিধান করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার মস্তিষ্কের পূর্ণবিকার ঘটে নাই বুঝিয়া, অপরাজিতার অসীম আনন্দোদয় হইল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন,—"পারে নাই—হাত ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। ঐ যে তাহার হাত হইতে ছোরা কাড়িয়া লইল। ঐ যে বুকের উপর পা দিয়া দাঁড়াইয়াছে, দেখিতেছ না?"

বিজলী অনুচ্চস্বরে বলিলেন,—"না। কই দেখিতে পাইতেছি না। কিছুই না। অন্ধকার। মারিতে পারে নাই তো? তুমি দেখিয়াছ?

অপরাজিতা বুঝিলেন, তিনি পীড়িতার মনের গতি অনুমান করিয়া এবং তাঁহার বাসনার অনুসরণক্রমে কথা কহিয়া, ক্রমে রোগিণীর মস্তিষ্ককে অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এবার বিজলী তাঁহার প্রশ্নের সঙ্গত ও অনুরূপ উত্তর দিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিল না।

রাত্রি এইরূপে কাটিয়া গেল অপরাজিতা সমস্ত রাত্রি বিজলীর মস্তক কোলে লইয়া বসিয়া রহিলেন। কন্যার পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইতেছে বলিয়া, তারাসুন্দরীও বুঝিতে পারিলেন। অপরাজিতার আগ্রহাতিশয্য হেতু, তারাসুন্দরী চারি দিন পরে কাপড় ছাড়িয়া একটু জল খাইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার ঝি বিনোদ বাবুর বাসা হইতে একজন দ্বারবান্ ডাকিয়া আনিল। সে নীচের ঘরে শুইয়া থাকিল। অপরাজিতার দাসীরা টাকা লইয়া রাত্রিতে সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং আপনারা সকলে আহারাদি শেষ করিয়া বারান্দায় শুইয়া রহিল।

বিজলী নিস্পন্দ ও নির্ব্বাক্ রহিলেন। কিন্তু তাঁহার বর্ত্তমান ভাব দেখিয়া, তিনি মৃতকল্প অবস্থায় রহিয়াছেন বলিয়া কাহারও মনে হইল না। তিনি সহজ ভাবে নিদ্রা যাইতেছেন বলিয়াই সকলের বোধ হইল। পীড়িতার কর্ণে যাহাতে কোন প্রকার শব্দ প্রবেশ করিয়া তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত না করে, অপরাজিতা তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

অপরাজিতা পরদিন প্রাতে তারাসুন্দরীর ঝির দ্বারা ডাক্তার বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বেলা সাড়ে আটটার সময় ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অপরাজিতা, লজ্জায় বা সঙ্কোচে, পীড়িতার শয্যা ত্যাগ করিয়া

স্থানান্তরে গমনের প্রয়োজন অনুভব করিলেন না। তিনি সাবধানতা সহকারে আপনার অঙ্গাদি আবৃত করিয়া এবং অল্পমাত্র অবগুণ্ঠনে বদনের কিয়দংশমাত্র আচ্ছন্ন করিয়া, সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন।

ডাক্তার বাবু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ যত্ন সহকারে রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন,—"বড়ই হিত-পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত নিয়মিত হইয়াছে, নাড়ীর গতি বড়ই ভাল দেখিতেছি, রোগীর মুখ চোখের ভাবও বিশেষ প্রকৃতিস্থ বলিয়া বোধ করিতেছে। আমি কালি প্রাতে দেখিয়া পীড়িতার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলাম; সেই জন্যই সন্ধ্যার পর আর আসি নাই; কিন্তু এক্ষণে ইনি সারিয়া উঠিবেন বলিয়া আমার সম্পূর্ণ ভরসা হইতেছে। কি রূপে এ পরিবর্ত্তন ঘটিল?

অপরাজিতার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন,—"আমার এই মেয়ে কিরূপ মন্ত্রবলে কি করিলেন তাহা বলিতে পারি না। বিজলীর প্রলাপবাক্যের সহিত উনিও চীৎকার করিয়া কথা কহিয়াছিলেন জানি। ক্রমেই বিজলীর কথা যেন অর্থযুক্ত বলিয়া বোধ করিতেছি। জানি না কিসে কি হইল।"

ডাক্তার বলিলেন,—"আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিদারুণ চিন্তা ও মানসিক অবসন্নতা এই রোগের কারণ; কোন উপায়ে সেই উদ্বেগ দূর করিতে পারিলে, রোগী প্রকৃতিস্থ হইবেন। বোধ হয়, সেই প্রণালীর অনুসরণে এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।"

অপরাজিতা সমর্থন-সূচক মস্তকান্দোলন করিলেন। ডাক্তার বাবু তারাসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইনি আপনাদের কে?

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"বড়ই আপনার লোক।"

ডাক্তার বাবু প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময়, পীড়িতার যতক্ষণ আপনি নিদ্রাভঙ্গ না হয়, ততক্ষণ তাঁহাকে কোনরূপ ঔষধ বা পথ্য প্রদান করিতে, নিষেধ করিয়া গেলেন।

অপরাজিতা বলিলেন,—"মা, আপনি বোধ হয়, নিজেও বুঝিতেছেন, ডাক্তারের মুখেও শুনিলেন, বিজলী অনেক ভাল আছেন। শীঘ্রই যে ভগিনী ভাল হইয়া উঠিবেন তাহার সন্দেহ নাই; এক্ষণে আপনি উঠিয়া স্নানাহার করুন।"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"তোমার ন্যায় ভগবতী যখন সশরীরে আবির্ভূতা হইয়াছেন, তখন মরা'ও বাঁচিতে পারে। কিন্তু মা, বিজু উঠিয়া কথা না কহিলে, আমি অন্ন-জল মুখেও দিতে পারিব না তো।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"সে কি মা, দেহ রক্ষা না করিলে বিজুর সে মধুর কথা শুনিবে কে? আপনি উঠিয়া এক ঘটি জল মাথায় দিয়া যাহা হয় কিছু আহার না করিলে, আমি বড়ই দুঃখিত হইব; আর বুঝিব, আমি আপনার পেটের মেয়ে নহি বলিয়া, আপনি আমাকে দেখিতে পারেন না।"

তাহার পর আপনার পরিচারিকাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তোমরা কি দেখিতেছ? মাকে ধরিয়া লইয়া যাও, মাথায় খানিকটা তেল দিয়া এক ঘড়া জল ঢালিয়া দেও, মাথা মুছাইয়া কাপড় ছাড়াইয়া দেও। এ বাটীর ঝিকে আমার কাছে ডাকিয়া দেও।"

অগত্যা তারাসুন্দরীকে উঠিতে হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তা মা, আমি এখানে বসিয়া থাকি, তুমি কেন আগে স্নান করিয়া একটু জল খাও না।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"তা কি হয় মা? আপনি পাঁচ ছয় দিন স্নানাহার করেন নাই; উদ্বেগে অস্থির হইয়া আছেন। আপনারই সর্ব্বাগ্রে শুশ্রূষার আবশ্যক। আপনি আসিলেই আপনাকে ভগিনীর নিকট রাখিয়া আমি যাইব।"

দাসীদ্বয়ের সহিত তারাসুন্দরী প্রস্থান করিলেন। তাঁহার ঝি আসিয়া অপরাজিতার সমক্ষে দাঁড়াইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের ঘরে সন্দেশ মিষ্টান্ন কিছু আছে কি?"

ঝি বলিল,—"একে টানাটানির সংসার, তাহার উপর এই রোগ। ঘরে কিছুই নাই।"

"বিজলীর দুগ্ধ আছে?"

কালি রাত্রিতেই ফুরাইয়া গিয়াছে, এখন আর একটুও নাই।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"তুমি আমার সঙ্গের লোকদের নিকট হইতে দুইটা টাকা চাহিয়া লও। শীঘ্র বাজার হইতে মার জন্য কিছু ভাল সন্দেশ ও ভগিনীর জন্য দুধ লইয়া আইস। এখনই সংসারে যে সকল জিনিষ লাগিতে পারে, তাহাও আনিয়া ফেল। বিলম্ব হয় না যেন; মা স্নান করিয়াই জল খাইবেন, বিজুর ঘুম ভাঙ্গিলেই দুধ দিতে হইবে।"

ঝি প্রস্থান করিল। অতি অল্প কাল মধ্যেই তারাসুন্দরী স্নান সমাপ্ত করিয়া উপরে আসিলেন। তাঁহার ঝিও সন্দেশ ও দুগ্ধাদি লইয়া উপস্থিত হইল। অপরাজিতার নির্ব্বন্ধাতিশয্য হেতু তারাসুন্দরী একটা সন্দেশ মুখে দিয়া জল খাইলেন। বলিলেন,—"এখন তুমি যাও মা?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"হাঁ মা আপনি বিজুর কাছে বসুন। যদি বিজুর ঘুম ভাঙ্গে, তখনই আমাকে ডাকিবেন। আমি শীঘ্রই আসিতেছি।"

অপরাজিতা প্রস্থানের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় বিজলী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিয়া উঠিলেন,—"বেশ হইয়াছে,—ধরা হইয়াছে, আর ছাড়া হয় না যেন। ধর, ভাল করিয়া ধর।"

অপরাজিতা তৎক্ষণাৎ পীড়িতার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"বেশ ধরা হইয়াছে, কোন মতেই আর ছাড়াইতে পারিবে না।"

বিজলী আবার বলিলেন—"উহাকে ভাল করিয়া বাঁধিয়া ফেল। হাত পা বাঁধ। হাঁ, হাঁ। আর তুমি ওখানে থাকিও না—চলিয়া আইস বড় কষ্ট করিয়াছ। ধন্য তুমি! দেরি করিও না—যদি তুমি আবার বিপদে পড়।"

অপরাজিতা চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"ভয় কি? তুমি যাহাকে ভাল বাস, তাহার কি বিপদ হয়? আসিতেছেন—ঐ যে আসিতেছেন।"

বিজলীর মুখে লজ্জার চিহ্ন দেখা দিল। মৃদুস্বরে বলিলেন,—"বড় অন্যায় করিয়াছি—তোমাকে বড় কষ্ট দিয়াছি। তোমার পা ধরিয়া কাঁদিতেছি—আমাকে ক্ষমা কর।"

বিজলী বালিকার ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। অপরাজিতা বলিলেন,—"না না, উনিই তোমার নিকট অপরাধী। তুমি কাঁদিও না। তোমার মুখে হাসি না দেখিলে, উঁহার চক্ষুতে সংসার অন্ধকার।"

বিজলী লজ্জায় মুখ ফিরাইলেন। অতুল আনন্দে তাঁহার মুখ আচ্ছন্ন হইল। অপরাজিতা নিজের মুখের প্রতি বিজলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিজলীর শূন্যদৃষ্টি যখন যে দিকে সঞ্চালিত হইতে

লাগিল, তিনি যখন যে দিকে বদন আবর্ত্তিত করিতে লাগিলেন, অপরাজিতাও সেই দিকেই, ঠিক তাঁহার চক্ষুর সমক্ষে নিজের বদন স্থাপিত করিতে লাগিলেন। অনেকবার বিজলীর দৃষ্টি অপরাজিতার দৃষ্টির সহিত মিলিত হইল, কিন্তু একবারও বিজলীর চক্ষু বুদ্ধিযুক্ত ভাবে অপরাজিতার বদন দেখিতে সমর্থ হইল না। অপরাজিতা জানিতেন, এরূপ যোগে যতক্ষণ দর্শন-শক্তির পূর্ণ আবির্ভাব না হইবে ততক্ষণ মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ হইয়াছে বলিয়া স্থির করা অসম্ভব। ইহাও তিনি জানিতেন যে, চিরপরিচিত ব্যক্তি বা চিরদৃষ্ট পদার্থ অপেক্ষা, নূতন লোক বা নূতন বস্তু সহজেই দর্শন-শক্তি উত্তেজিত করিয়া দেয়; সুতরাং সত্বরেই মস্তিষ্ককে প্রকৃষ্টরূপে কার্য্যক্ষম করিয়া তুলে। এই জন্যই অপরাজিতা এ প্রযত্ন পরিত্যাগ করিলেন না। বহুক্ষণ পরে একবার বিজলী, যেন কিয়ৎকাল সংজ্ঞাযুক্ত ভাবে, অপরাজিতার বদনের প্রতি চাহিলেন; কিন্তু অচিরকাল মধ্যেই আবার তাঁহার দৃষ্টি শূন্য-ভাবে অন্যদিকে সঞ্চালিত হইল। অপরাজিতাও পীড়িতার নয়ন-সমক্ষে স্বকীয় বদন স্থাপন করিলেন। বারংবার এইরূপ ঘটার পর, আবার একবার বিজলী জ্ঞানযুক্ত নয়নে অপরাজিতার বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অনেকক্ষণ তিনি সেদিক হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিতে পারিলেন না। তাহার পর সহসা বলিয়া উঠিলেন,—তুমি কে?”

আনন্দে অপরাজিতার চক্ষুতে জল আসিল। বলিলেন,—“আমি অপরাজিতা।”

বিজলীর মুখ একটু চিন্তাকুল হইল। বলিলেন,—“অপরাজিতা—কালো ফুল! না না—এ যে—সোণার কমল।”

অপরাজিতা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—“তবে তাই। আমি আজি হইতে বিজলীর ‘সোণার কমল’ হইলাম।”

ধীরে ধীরে বিজলীর চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল। তিনি পুনরায় নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। অপরাজিতা অস্ফুটস্বরে তারাসুন্দরীকে বলিলেন,—“মা, আপনার আদরের বিজুর জন্য আর কোন ভয় নাই।”

তারাসুন্দরী বলিলেন,—সকলই তোমার মাহাত্ম্য। দেবীর চেষ্টায় সকলই সম্ভব। তুমি এখন যাও মা, সমস্ত রাত্রি বসিয়া জাগিয়াছ, এদিকেও বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর। আমি। বিজুর কাছে বসিয়া আছি।

অপরাজিতা বলিলেন,—“আপনি অল্প অল্প গরম দুধ ঝিনুকে করিয়া বিজুর মুখে দিতে থাকুন। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলেও কোন ক্ষতি হইবে না। আমি শীঘ্র আসিতেছি।”

অপরাজিতা প্রস্থান করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

অতি ব্যস্ততা সহ স্নানাদি শেষ করিয়া, অপরাজিতা উপরে আসিলেন এবং পীড়িতার নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, বিজলীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। জননী দুগ্ধ দিবার উদ্যোগ করিবামাত্র কন্যার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ সহকারে বিজলী এবার পূর্ব্বের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠেন নাই, কোন প্রকার প্রলাপ বাক্য তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হয় নাই এবং হাস্য বা রোদনাদি

কোন অসংবদ্ধ ব্যবহারও তিনি করেন নাই। তবে তাঁহার লোচন-যুগল, পূর্ব্বের ন্যায় না হইলেও, এখনও, অস্বাভাবিকভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে। সেই বিস্তৃত নয়নে বিজলী চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন। দৃষ্টির পূর্ব্ববৎ উদ্দেশ্য-বিহীন ভাব আর নাই; এখন যেন কোন পদার্থ বা ব্যক্তি-বিশেষের দর্শন কামনায় তাঁহার নয়ন আগ্রহ সহকারে চারিদিকে ফিরিতেছে। কিয়ৎকাল এইরূপে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া, সহসা বিজলী বলিয়া উঠিলেন,—"তবে কেন দেখা দিলে? স্বপ্ন—স্বপ্ন। মিথ্যা কথা। না বলিয়া কেন চলিয়া গেলে?"

অপরাজিতা তৎক্ষণাৎ পীড়িতার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং বিজলীর নয়ন-সমক্ষে আপনার বদন সংস্থাপিত করিয়া বলিলেন,—"কোথায়ও যাই নাই ভাই, এখানেই আছি। কিছুই স্বপ্ন নহে, সকলই সত্য।"

বিজলী অনেকক্ষণ অপরাজিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"স্বপ্নও তবে সত্য হয়। তুমি কে?"

বিজলীর কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক হইয়াছে। অপরাজিতা আনন্দে বলিলেন,—"আমি সংসারের আর সকলের অপরাজিতা; কিন্তু তোমার সোণার কমল।"

বিজলী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তিনি তোমার কে? তুমি তাঁহার কে?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"বিনোদ আমার দাদা, আমি বিনোদের ভগিনী।"

বিজলীর দুর্ব্বল হস্তে স্বকীয় বস্ত্রাগ্র ধরিয়া টানিতে লাগিল। পীড়িতার অভিপ্রায় অনুমান করিয়া, অপরাজিতা কাপড় সরাইয়া ধরিবার সুবিধা করিয়া দিলেন। বিজলীর কম্পিত হস্ত, সেই বস্ত্রাগ্র আকর্ষণ করিয়া, আপনার মুখের উপর স্থাপন করিল।

অপরাজিতা বলিলেন,—"ছি ভাই, আমার কাছে কি লজ্জা করিতে আছে? তুমি যে আমার বড় আদরের ধন। যাহাকে বিনোদ ভাল বাসেন, তিনি আমাদের বড়ই সোহাগের সামগ্রী।"

বিজলী অনেকক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। তারাসুন্দরীকে অপরাজিতা বলিলেন,—"মা, বিজুর জন্য আর কোন ভয় নাই। এক্ষণে উপযুক্ত পথ্যাদি দিয়া যত্ন করিলে শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিবেন।"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"সকলই তোমার দয়া। তুমি দেব-বালা—তোমার ইচ্ছায় না হইতে পারে কি? আমি বড় দুঃখিনী—আশীর্ব্বাদ ছাড়া আমার আর সম্বল নাই। যে বয়সে তোমার যে দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে, তাহার পর তোমাকে আর কোন আশীর্ব্বাদ করিতে ইচ্ছা হয় না। তথাপি প্রাণের ভিতর হইতে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যেন ধর্ম্মে তোমার চিরদিন অচলা মতি থাকে, যেন তোমার আত্মীয়-স্বজন কোথাও কেহ কখন কোন কষ্ট না পান।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"আপনার এই আন্তরিক আশীর্ব্বাদে আমি ধন্য হইলাম। কিন্তু আপনি আমাকে বিধবা দেখিয়া এত কষ্ট প্রকাশ করিতেছেন কেন? হিন্দুরমণীর হৃদয়ে পরলোকগত স্বামী সজীব ভাবেই বিরাজমান থাকেন। স্বামীর সহিত কেবল জীবনাবধি সম্বন্ধ, এরূপ ঘৃণিত কদর্য্য শিক্ষা হিন্দু-কুল-বালারা কখনই প্রাপ্ত হয় না। যাঁহার সহিত সম্বন্ধ জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী। যিনি মোক্ষ-ফল-বিধাতা প্রত্যক্ষ দেবতা, যিনি নারীর ধ্যান ও জ্ঞানের একমাত্র বিষয়, সেই

পরম প্রেমাস্পদ মহাপুরুষ, যদি কর্ম্ম-সূত্রে বাধ্য হইয়া, দশ দিন বিদেশে যান, তাহা যেমন সহনীয়, দশ দিন অগ্রে যদি তিনি লোকান্তর গমন করেন, তাহাও তেমনই সহনীয় হওয়া উচিত। মনের মন্দিরে সেই দেবতার প্রতিমা যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাঁহার অদর্শন-জনিত যাতনা তাহাকে কখনই ব্যাকুল করিতে পারে না। আমার বৈধব্য হেতু আপনি একটুও দুঃখ করিবেন না; আমি এ অবস্থায় আপনাদের চরণাশীর্ব্বাদে বিশেষ কোন ক্লেশ অনুভব করি না।"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"ভগবান্ তোমাকে সুখে রাখুন। হিন্দু নারী যেন তোমাকে দেখিয়া অসময়ে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লয়।"

আবার বিজলী নয়ন উন্মীলন করিয়া বলিলেন,—"তুমি যেখানে থাক তাহাই কি স্বর্গ?"

অপরাজিতা হাসিয়া বলিলেন,—"এখনও সে স্থান স্বর্গ হয় নাই। যে দিন তুমি গিয়া সেখানে বাস করিতে আরম্ভ করিবে, সেই দিন হইতে তাহা স্বর্গ হইয়া উঠিবে।"

আবার বিজলী চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। অপরাজিতা বলিলেন,—"তোমার ঘুম আসিতেছে। লক্ষ্মী ভাই, একটু দুধ খাও আগে, তাহার পর ঘুমাও।"

তারাসুন্দরীর নিকট হইতে দুধের বাটী ও চামচা লইয়া অপরাজিতা ধীরে ধীরে বিজলীকে দুধ খাওয়াইয়া দিলেন। তাহার পর বিজলী বলিলেন,—"আমার মা—আমার দুঃখিনী মা কোথায়?"

তখনই আনন্দ-জনিত অশ্রুপূর্ণ নয়নে তারাসুন্দরী কন্যার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। বিজলী, অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে জননীর বদন লক্ষ্য করিয়া, ধীরে ধীরে স্বকীয় কম্পিত হস্ত তাঁহার কণ্ঠে স্থাপিত করিলেন।"

বিজলী সুস্থ হইয়া উঠিলেন। পর দিন তিনি উঠিয়া বসিতে পারিলেন। ডাক্তার আর আইসেন না, ঔষধও আর দেওয়া হয় না। যে যে পদার্থ তাঁহার পক্ষে এ অবস্থায় সুপথ্য, অপরাজিতা তৎসমস্ত যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং স্বহস্তে যত্ন, আদর ও সোহাগ মিশাইয়া, বিজলীকে আবশ্যকানুসারে সেবন করাইতেছেন। বিজলী অনেক সময়েই অপরাজিতার সহিত সুখ দুঃখের কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পরিচয় ও আত্মীয়তা ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার প্রাণের কথা অপরাজিতার বুঝিতে বাকী থাকিল না।

তারাসুন্দরীর সহিত অনেক সময়ে অপরাজিতার অনেক কথোপকথন হইয়াছে। কেন বিনোদ, সহসা কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া, স্থানান্তরে ফিরিতেছেন, কি নিদারুণ আন্তরিক বেদনা সেই নিষ্কলঙ্ক-স্বভাব বিনোদের প্রাণ-মন ব্যাকুল করিতেছে, এ সকল রহস্যই অপরাজিতা জানিতে পারিয়াছেন। তারাসুন্দরীর ন্যায় অপরাজিতারও বিশ্বাস, দশ বৎসর পূর্ব্বে, দুর্গাপুরের সরোবরতীরে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হইয়াছে, যদুপতি মিত্র মহাশয় নিশ্চয়ই তাহাতে লিপ্ত ছিলেন না। সেরূপ পিশাচের কখনই এরূপ দেব-সন্তান হইতে পারে না। মিত্র মহাশয় তাদৃশ নরাধম হইলে, অপরাজিতার পিতা ৺ হরিদাস রায় মহাশয় কখনই আজীবন তাঁহার সহিত সকল সম্বন্ধ বন্ধন সমান ভাবে অচ্ছিন্ন রাখিয়া, জীবনে ও মরণে তাঁহার হিত-কামনা করিতেন না। অপরাজিতা বুঝিলেন, নিশ্চয়ই সেই অচিন্তনীয় ব্যাপারের মধ্যে অন্য কোন

ভয়ানক রহস্য আছে; কিন্তু রহস্য যাহাই থাকুক, এতদিনে যে তাহার উদ্ভেদ হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহার কোনই সন্দেহ থাকিল না। বিনোদ যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহা কখনই নিষ্ফল থাকিতে পারে না। বিনোদের জ্ঞান ও বুদ্ধি, শক্তি ও সামর্থ্য সকল বিষয়েই অপরাজিতার অসীম বিশ্বাস।

যতই নানা ভাবে সেই অতীত হত্যাকাণ্ডের বিষয় অপরাজিতা আলোচনা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই কোন দুরন্ত লোকের গূঢ় চক্রান্ত নিহিত আছে এবং এত দিন পরে সেই অতীত কাণ্ডের যবনিকা উত্তোলন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সম্ভবতঃ বিনোদকে নানা প্রকারে বিপন্ন হইতে হইবে। বিনোদের বিপদ সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা, অপরাজিতার পক্ষে কখনই সম্ভব নহে। বিজলী সুস্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য আবশ্যক মত সকল সুব্যবস্থাই করা হইয়াছে। তবে অপরাজিতা আর এখানে থাকিবেন কেন?

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

সোণার কমল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—*—

গভীর রাত্রিকালে বিনোদ বাবুকে বহন করিয়া রেল গাড়ি ভাগলপুর পৌঁছিল। বিনোদের একজন সহাধ্যায়ী বন্ধু ভাগলপুরের স্কুলের অন্যতম শিক্ষক আছেন, একথা গাড়িতে উঠিবার সময়ই বিনোদের মনে হইয়াছিল। কিন্তু এই ঘোর রাত্রিকালে বন্ধুর বাটী অন্বেষণ করিতে ও পরে নিতান্ত অসময়ে তাঁহাকে বিরক্ত করিতে, বিনোদের প্রবৃত্তি হইল না। তিনি ধীরে ধীরে ও নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে, রেলওয়ে ষ্টেশনের ওয়েটিংরুমে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য রঘু বাহিরে বসিয়া রহিল। তিনি স্থির হইয়া বসিতে না বসিতে রিফ্রেসমেণ্ট রুমের চাপকান-আচ্ছাদিত-কলেবর, বিকট পাগড়ী ধারী, নগ্নপদ এক খানসামা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং এক লম্বা সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসিল,—"বাবু, গরম চা।"

বিনোদ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—"না।"

খানসামা আবার জিজ্ঞাসিল,—"এক পেয়ালা কাফি।"

বিনোদ পূর্ব্ববৎ ঘাড় নাড়িলেন। নাছোড় বান্দা খানসামা আবার জিজ্ঞাসিল,—"হুজুর চুরুট।"

বিনোদ তাহাতেও ঘাড় নাড়িলেন। তখন খানসামা স্থির করিল, বাঙ্গালী বাবুদের এখন আর চা-চুরুটে সানায় না। একটু উঁচু অঙ্গের কথা না পাড়াই বেকুবি হইয়াছে। ভ্রম-সংশোধন করিয়া জিজ্ঞাছিল,—"ধর্ম্মাবতার একটা পেগ?"

তাঁহার সুখ-সন্তোষ-সংবিধানার্থ একান্ত পরহিতৈষী খানসামার এইরূপ অযাচিত আগ্রহ হেতু, বিনোদ বড়ই জ্বালাতন হইয়া উঠিলেন। তিনি পকেটে হাত দিয়া একটী সিকি বাহির করিলেন এবং তাহা মেজের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—"আমার কিছুরই দরকার নাই।"

সেই গোলাকার উজ্জ্বল রজতখণ্ড গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত না হইয়াও, খানসামা ভূতলে করস্পর্শ করিয়া বিনোদকে সেলাম করিল; সঙ্গে সঙ্গে সিকিটী তাহার হস্তগত

হইল। আবার জিজ্ঞাসিল,—হুজুর কি সাহেব-গঞ্জে ডিনার করিয়াছেন?”

অতীব বিরক্তির সহিত বিনোদ বলিলেন,—“না।”

খানসামা বলিল,—“বটে! তবে তো ধর্ম্মাবতারের বড় কষ্ট হইয়াছে। আমি এখনই তাহার তদ্বির করিতেছি। ফাউল কারি, লেগ রোষ্ট, চপ, কটলেট ও রুটী মজুত আছে। একটা পীজন পাইয়ের উদ্যোগ করিব কি? এখনই শেষ হইবে, সকলই তাজা গরম পাইবেন। হায়! হায়! সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল, হুজুরের খাওয়া হয় নাই! কি কষ্ট!”

বিনোদ তখন আর্ত্তভাবে মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করিয়া, এই একান্ত শুভানুধ্যায়ী অনাহূত বন্ধুর হস্ত হইতে নিস্তার লাভের কামনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া খানসামাপুঙ্গব বলিল,—“হুজুর হয় তো ভাবিতেছেন, খাওয়ার কথা যাহা হউক হইল বটে; কিন্তু শেষের কথা কিছুই তো হইল না। তা সে জন্য ধর্ম্মাবতারের কোনই চিন্তা নাই। আপনার অবশ্যই জানা আছে, আমাদের কোম্পানির মত হুইস্কি আর কোন গুদামেই পাওয়া যায় না। সেই হুইস্কি আছে, সোডা-লিমনেড আছে, শেষের জন্য হুজুরকে কোন চিন্তা করিতে হইবে না।”

বিনোদের চিত্তের নিতান্ত চিন্তাকুল অবস্থা না হইলে, তিনি হয় তো খানসামার অদ্ভুত পরামর্শ ও আয়োজনের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেন না। সম্প্রতি এই সকল অকারণ হিতৈষিতা তাঁহার নিতান্ত বিরক্তিকর হইয়া পড়িল। তিনি ধীর ভাবে বলিলেন,—“তুমি এখন যাও, আমার মেজাজ বড় খারাপ আছে। তুমি কালি প্রাতে আমার সহিত দেখা করিও। এখন আর কথা কহিলে আমি বড়ই বিরক্ত হইব।”

অগত্যা খানসামা মহাত্মা প্রস্থান করিল। যাইবার সময় সে আবার একবার ভাল করিয়া সেলাম করিতে ভুলিল না। সে মনে মনে বুঝিয়া গেল, ‘এ বাবুটা বাবু নামের কলঙ্ক।”

বিনোদ বাবু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। অতি কষ্টে রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রাতে রঘু গাড়ি ঠিক করিয়া, বিনোদ বাবুকে সংবাদ দিল এবং ট্রঙ্ক প্রভৃতি লইয়া বিনোদ বাবুর পশ্চাতে চলিল। বিনোদ বাবু দয়াময় ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিয়া, নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে যাত্রা করিলেন। এখনই ভাগলপুরের থানায় যে রামদীনকে তিনি দেখিতে পাইবেন, সে ব্যক্তি কে? তাঁহার পিতা কি ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ও রামদীন নাম গ্রহণ করিয়া কালযাপন করিতেছেন? কি জানি ঈশ্বরের মনে কি আছে!

তিনি যখন গাড়িতে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন, তখন অতি ব্যস্ত ভাবে পূর্ব্বরাত্রির পরিচিত সেই খানসামা মহাশয় তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সেলাম করিল এবং বলিল,—“খোদাবন্দ, ব্রেকফাষ্ট' হাপ বাইল আণ্ডা, চা, রুটী, বিষকুট সব তৈয়ার। মেহেরবানি করিয়া আসুন। আহা! কালি রাত্রিতে খাওয়া হয় নাই, মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে।”

বিনোদ বাবু বলিলেন,—“আমি এখন বড় ব্যস্ত আছি, বিশেষ কাজে যাইতেছি। এখন খাওয়া দাওয়া আমার মনে নাই। তুমি এখন যাও।”

পকেট হইতে আবার একটী সিকি বাহির করিয়া বিনোদ বাবু মাটীতে ফেলিয়া দিলেন। আবার তাহা সেলামের সহিত মিশিয়া খান-

সামার হস্তে প্রবেশ করিল। বিনোদ বাবু গাড়িতে উঠিলেন। খানসামা বলিল—"হুজুর নিশ্চয়ই ডিপুটী বাবু। এখানে কোথায় ধর্ম্মাবতারের বাসা হইবে? আমি সময়ে সময়ে বাবুর বাসায় গিয়া হুকুম তামিল করিব।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি ডেপুটি নহি, এখানে একদিনের বেশী থাকিব না বোধ হয়।"

খানসামা অবাক্। বলিল,—"আপনি এত বড় বাবু ডেপুটী নহেন!"

হায় ডিপুটী! কি শুভক্ষণেই এ রঙ্গভূমিতে তোমার আবির্ভাব হইয়াছে। তুমি বাঙ্গালীর চরম গৌরবস্থল।

গাড়ি চলিয়া গেল। খানসামা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। সে হিসাব করিয়া রাখিয়াছে, এ সংসারে বাবু আছে বত্রিশ রকম। কিন্তু খাইতে বলিলেই বখসিস্ দেয়, এরূপ বাবু সে আর কখন দেখে নাই। খাইয়া পয়সা দেয় না, দিলেও যাহা দিবার কথা তাহার অপেক্ষা কম দেয়, দশ রকম কথা না শুনাইলে পকেটে হাত দেয় না, বখসিস্ চাহিলেই কদলী প্রদর্শন করে, অনেক আশা দিয়া শেষে গোলে মিশিয়া যায়, বাদশাহের মত ফরমাইস করিয়া পয়সার সময় নির্লজ্জ চোরের ন্যায় ব্যবহার করে, সুযোগ পাইলে হোটেলের কাঁটা, ছুরি, চামচা সরাইতেও পিছপা হয় না, খানসামাকে পরিতুষ্ট করিয়া ডিকাণ্টার হইতে নিজে মদ ঢালিয়া লয় এবং শেষে চারি উন্স খাইয়া এক উন্স ছাড়া কবুল করে না, ইত্যাদি অনেক রকম বাবু তাহার জানা আছে। কিন্তু খাইতে অনুরোধ করিলেই কিঞ্চিৎ বখসিস্ দেয়, এ এক প্রকার অদ্ভুত বাবু বটে। তাহার হিসাবে আর এক প্রকার বাবু বাড়িয়া গেল।

হেলিতে হেলিতে, দুলিতে দুলিতে অশেষ উৎকট ধ্বনি উৎপাদন করিতে করিতে, গজেন্দ্রগমনে গাড়ি বিনোদ বাবুকে বহন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রবল আশা, সঙ্গে সঙ্গে দারুণ সন্দেহ, অতিশয় উৎসাহ ও আগ্রহ, সঙ্গে সঙ্গে নিরুদ্যম ও অবসন্নতা, বিনোদের হৃদয়কে আলোড়িত করিতে থাকিল। তাঁহার মনের এইরূপ বিচলিত ভাবের বিষয় ভাড়াটীয়া গাড়ির পঞ্জরাবশেষ অশ্বদ্বয় অথবা তদুভয়ের পক-অহিফেনসেবী পরিচালক কেহই অনুভব করিতে পারিল না; সুতরাং তাহারা কেহই সে জন্য ব্যস্ত হইয়া আপনাদের বনিয়াদী চাইল ছাড়িল না। বিলম্বের জন্য বিনোদকে বিশেষ জালাতন করিয়া, গাড়ি অবশেষে থানার দ্বারদেশে উপনীত হইল। ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া বিনোদ গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন।

এই স্থানে—সম্মুখস্থ ঐ ভবনের স্থানবিশেষে, যে রামদীন আছে, সেই কি তাঁহার পিতা? নর-হন্তা হইলেও, তিনি বিনোদের সজীব দেবতা। বহুকাল পরে পিতৃ দর্শনের আশা বিনোদকে বড়ই উত্তেজিত করিল। মুখের চিন্তাকুল ভাব সযত্নে প্রচ্ছন্ন করিয়া, ধীর পদ-বিক্ষেপে বিনোদ থানার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—•—

ভাগলপুরের থানা তৎকালে একজন মুসলমান দারোগার অধীন ছিল। অনেক লোক লইয়া, হৈ হৈ শব্দ করিতে করিতে, দারোগা

মহাশয়, থানার বারান্দায় বসিয়া, তখন একটা চুরির আসামীকে কবুল করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার পাদুকাবৃত চরণ কখন কখন সেই হতভাগ্য চোরের বক্ষে বা বদনের সহিত সংমিলিত হইতেছে। অধিকন্তু তিনি অনবরত সেই অভাগার প্রতি যে মধুর বাক্যাবলী প্রয়োগ করিতেছেন, তাহা উচ্চাচরণ করা দূরে থাকুক, শ্রবণ করিতেও মনুষ্য লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হয়। যখন এই সকল মহদ্ব্যাপারের অনুষ্ঠানে থানা তোলপাড়, তখন বিনোদ বাবু ধীর ও গম্ভীর ভাবে, দারোগা মহাশয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মনোহর রূপ ও অসাধারণ গাম্ভীর্য্য দর্শনে, দারোগা মহাশয় তাঁহাকে একটা খুব 'বড় লোক' বলিয়া মনে করিলেন। নিতান্ত অসময়ে তাঁহার আগমন হেতু মনে মনে বিরক্ত হইলেও, দারোগা সাহেব মুখে সৌজন্য প্রকাশ করিয়া বিনোদকে সেলাম করিলেন এবং পার্শ্বস্থ এক্‌খানি চেয়ার দেখাইয়া বসিতে বলিলেন। তাহার পর সন্নিহিত হেড্‌কনষ্টবল ও কনষ্টবলগণকে বলিলেন,—"তোমরা এই আসামীকে গাছতলায় লইয়া গিয়া আসল কথা জানিবার চেষ্টা কর; আমি ততক্ষণ বাবুর সহিত একটু কথা কহি।"

আসামীটাকে ধাক্কা দিতে দিতে, কনষ্টবলগণ সরাইয়া লইয়া গেল। দারোগা সাহেব তখন বিনোদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কে? আপনার কি হুকুম?"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি কে তাহা আপনার এখন জানিবার আবশ্যকতা নাই। আপনার হাতে সম্প্রতি রামদীন নামে বাঙ্গালাদেশের এক খুনী আসামী আছে। আমি তাহারই সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি।"

দারোগা একটু স্থির ভাবে কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, বাবুটী একটা বড় রকম আফিসর হওয়াই সম্ভব, সুতরাং তাঁহার আগমনে পয়সা প্রাপ্তির কোন সুযোগ হইবে না, বাড়ার ভাগ কাজের কোন গলদ বাহির হইলেই পরম লাভ! এখন বিনোদ বাবুর কথা শুনিয়া, তাঁহার একটু আশার সঞ্চার হইল। কিন্তু আর একটু ভাল করিয়া না বুঝিয়া কোন্ পথে চলিলে সুবিধা হইবে, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। দারোগা জিজ্ঞাসিলেন,—"সে আসামীকে আপনি কেন দেখিতে চাহিতেছেন? কি জন্য আপনার তাহাকে দরকার ইহা না বুঝিলে আমরা আসামীর সহিত আপনাকে দেখা করিতে দিব কেন?"

বিনোদ বলিলেন—"আপনার কথা অসঙ্গত নহে। সে আসামী বাঙ্গালী কি হিন্দুস্থানী, পুলিশ তাহাকে যে লোক মনে করিতেছে, সে সেই লোক, কি অন্য কেহ, এ সকল কথা জানা আমার বিশেষ দরকার। আমি সেই জন্যই হুগলী হইতে আপনার নিকট আসিয়াছি।"

দারোগা স্থির করিলেন, এ একটা খাদ্য বটে। বলিলেন,—"আসামীকে উমি লোকের সহিত দেখা করিতে দিবার হুকুম নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম না হইলে, আমার কোন এক্তিয়ার নাই। আপনি কি পুলিশে কাজ করেন?"

বিনোদ বলিলেন,—"না।"

দারোগা জিজ্ঞাসিলেন,—"গবর্ণমেণ্টের আর কোন কাজ করেন কি?"

বিনোদ বলিলেন,—"না।"

দারোগা মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। বুঝিলেন, এ ব্যক্তি যখন হুগলী হইতে

আসামী দেখিবার অভিপ্রায়ে এতদূর আসিয়াছে, তখন কার্য্যসিদ্ধির জন্ত পয়সা খরচ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। বলিলেন,—"তা বাবু, সে আসামীর সহিত দেখা করায় আপনার কি দরকার? খুনী আসামীকে যাহার তাহার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হয় না।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"দেখার কথা না হয় একটু পরেই হইবে। আপাততঃ আমি তাহার সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা জানিতে ইচ্ছা করি।"

দারোগা বলিলেন,—"খুনী আসামীর কথা যে কেহ জিজ্ঞাসা করিলেই যে বলা হয়, এরূপ মনে করিবেন না। বিশেষ আমি সকল কথা জানি না। আসামী আর এক থানা হইতে সদরে চালান হইয়াছে। যে গ্রেপ্তার করিয়াছে সে বিশেষ বখসিস্ পাইবে, খোসনামিও তাহার খুব হইবে। খোদা আমাকে এরূপ একটা কাজও করিতে দেন নাই। আসামীর সহিত এক তাড়া কাগজও আসিয়াছে; অনেক জোবানবন্দী, অনেক হুলিয়া, অনেক পরোয়ানা তাহাতে আছে। যে জমাদার আসামীকে সঙ্গে লইয়া হুগলী যাইবে তাহারই জিম্মায় কাগজ পত্র সব দেওয়া হইয়াছে। আমি তো কোন কথাই ভাল করিয়া বলিতে পারিব না।"

বিনোদ বুঝিলেন, টাকার কথা না কহিলে এ ক্ষেত্রে কোন কাজ মিটিবে না। এই সেকেলে পাকা দারোগার কাছেই কাগজ পত্র আছে, সবই এ জানে; কিন্তু সহজে কোন কথা বলিবে না। কেবল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পরোয়ানা দেখাইয়া কার্য্যোদ্ধার হওয়া সম্ভব নহে। কারণ তাহা হইলে নিতান্ত দায়গ্রস্ত হইয়া, যাহা তাহা বলিয়া, কাজ শেষ করিবে। বলিলেন,—"আমার নিকট হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেবের দস্তখতি এক পরোয়ানা আছে। আপনি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, পুলিশ আমাকে সাহায্য করিতে বাধ্য। আমি একটা গুরুতর তদন্তে নিযুক্ত আছি।"

দারোগার হৃদয় অবসন্ন হইল। প্রাপ্তির আশায় ছাই পড়িল। পকেট হইতে একখানি মোহরাঙ্কিত কাগজ বাহির করিলেন এবং তাহা দারোগার হাতে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—"কিন্তু আপনি মনে করিবেন না যে, এই পরোয়ানা আমার হাতে আছে বলিয়া আমি আসল কথা ভুলিয়া গিয়াছি। আপনি একজন পুলিশের পুরাতন পাকা লোক। আপনার সাহায্য না পাইলে আমি কিছুই করিয়া উঠিতে পারিব না। আপনার মত লোককে পান পাইবার জন্ত কিছু না দিলে ভাল দেখাইবে কেন?

দারোগা বলিলেন,—"আপনি বিশিষ্ট ভদ্রলোক। আপনাকে কোন কথা বলিতে হইবে কেন? আমাদের এ চাকরি, জানেনই আপনি, সারাদিন চোর ঠেঙ্গাইয়া বেড়ান বই নয়। তা যা হয় আপনি বিবেচনা করিবেন। এখন সে আসামীর সম্বন্ধে আপনি কোন্ খবর জানিতে চাহেন?"

বিনোদ বলিলেন,—"আপনি আগে কাগজ পত্র গুলা আনান।"

দারোগা বলিলেন,—"কাগজ-পত্র এখনও আফিস ডেস্কেই আছে,—এখনও বোধ হয় জমাদার তাহা নিজের কাছে লইয়া যায় নাই। দেখিতেছি।"

দারোগা উঠিয়া সহজেই নির্দ্দিষ্টস্থান হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া আনিলেন এবং বলিলেন,—"কাগজ আমার বেশ দখা

আছে। আপনি কোন্ খবর জানিতে চাহেন বলুন।”

বিনোদ বলিলেন,—“এ আসামী কে? ইহার নিবাস কোথায়?”

দারোগা কাগজগুলি হাতে নাড়িতে নাড়িতে, বলিলেন,—“বাবু, এ বড় শক্ত আসামী। ইহার আদত নিবাস বাঙ্গালা দেশ—হুগলি জেলা—স্বর্ণগ্রাম। আসামী একটা বড় লোক। ইহার নাম যদুপতি মিত্র।”

বিনোদের বক্ষঃস্থলে রক্ত-স্রোত প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। বলিলেন,—“আসামী কি এইরূপেই আপনার পরিচয় দিয়াছে?”

দারোগা বলিলেন,—“না মহাশয়, তা হইলে ভাবনা ছিল কি? এই কথা প্রমাণ করিতে পুলিশকে যার পর নাই হায়রাণ হইতে হইয়াছে। লোকটা ভয়ানক চালাক।”

বিনোদ বলিলেন,—“আসামী কি প্রথমে এ নাম স্বীকার করে নাই?”

দারোগা বলিলেন,—“তোবা তোবা। এ নাম স্বীকার! আসামী গোড়া হইতেই খুব চালাকি করিয়া নিজের চাকর রামদীনের নামে জাহির হইয়াছে, আর সেই রকম সাজিতে যত কিছু যোগাযোগ লাগে, তাহার কিছুই সে করিতে বাকী রাখে নাই।”

বিনোদ বলিলেন,—“তাহার নিকট হুগলীর ষ্টেশনে যদুপতির নামযুক্ত তরবারি পাওয়া গিয়াছিল; তাহার সহিত একটা বাঙ্গালী স্ত্রীলোক ছিল; এ সকল কথা আমি জানি।”

দারোগা বলিলেন,—“তাহা হইলে আপনি অনেক কথাই জানেন। আসামী তাহার পর পাটনায় আসিয়া নামে এবং দেহাতে শুরাইয়া নামক এক গ্রামে সেই স্ত্রীলোকটাকে লইয়া বাস করে। প্রায় এক বৎসর পরে বাঁকিপুরের একজন সুদক্ষ ইনিস্পেক্টর তাহার সন্ধান পান। আসামী সেখানে রামদীন নামেই পরিচিত। যে দিন তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার সকল আয়োজন ঠিক হইয়াছে, সেই দিনই সে পলাতক হয়। কিরূপে যে সে সংবাদ পায় তাহা খোদা জানেন।”

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—“পলাইয়া কোথায় গেল?”

দারোগা বলিতে লাগিলেন,—“কোথায় গেল তাহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। দুই বৎসর এজন্য বেহারের সকল পুলিশ নাস্তানাবুদ হইয়া পড়ে। কত লম্বা লম্বা জটাদাড়িওয়ালা সন্ন্যাসী-ভৈরবী ধরিয়া টানা-টানি হয়। এ অঞ্চলে যেখানে যত সাধু ফকির ছিল, সকলকেই জ্বালাতন হইতে হইয়াছিল। যাহারা যোগী সাজিয়া ভিক্ষা করিয়া খায়, পুলিশের টানাটানিতে পড়িয়া তাহারাও পলাতক হইল।”

“তার পর?”

“তার পর খবর পাওয়া গেল, কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে যদুপতি ধরা পড়িয়াছে। সে একটা লম্বা চওড়া সন্ন্যাসী—বাঙ্গালীও বটে। কিন্তু তাহার সঙ্গে সে স্ত্রীলোকটা ছিল না।”

“সেই কি এই রামদীন?”

দারোগা বলিলেন,—“মহাশয়, শুনুন না। সে লোকটার সহিত অনেক বিষয়েরই মিল হইল এবং সে সহজেই আপনার নাম যদু-পতি বলিয়া স্বীকার করিল। কিন্তু আর কোন কথাই সে স্বীকার করিল না এবং খুন খারাপির এক বর্ণও তাঁহার কাছে পাওয়া গেল না। তাহার বাসস্থান ও জাতিরও অমিল হইল। তাহার বাস ছিল নদীয়া জেলায়, আর ব্রা[illegible]। সন্ন্যাসী হওয়ায়

পর তাহার নাম হইয়াছে কি একটা আনন্দ।”

“অমিল হইল বলিয়া পুলিশ তাহাকে ছাড়িয়া দিল কি ?”

“তাও কি পুলিশ ছাড়ে ? রাত্রিকে দিন, দিনকে রাত্রি তাহারা হামেশা করে, কত আকাশ-পাতাল অমিল পুলিশ মিলাইয়া ঠিক করিয়া দিতে পারে ; সেই পুলিশ কি সামান্য একটু অমিল দেখিয়া হটিয়া আসিবার পাত্র ? যদুপতি ধরা পড়িয়াছে বলিয়া পুলিশ খুব বাহবা লইল। কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না।”

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—“কি গোল হইল ?”

দারোগা বলিলেন,—“হুগলীর অনেক লোক কাশীতে ছিলেন। তাঁহাদের অনেকেই স্বর্ণগ্রামের যদুপতিকে জানিতেন। পুলিশ তাঁহাদের সকলকে আনিয়া ফেলিল ; কিন্তু কেহই এ যদুপতিকে সে যদুপতি বলিয়া সনাক্ত করিল না। বিশেষ সেখানে তখন একজন পেন্সন প্রাপ্ত সব জজ ছিলেন। তিনি যদুপতির বিশেষ পরিচিত। তিনি বিশেষ করিয়া বলিলেন, ‘এ ব্যক্তি কখনই স্বর্ণ গ্রামের সে যদুপতি নহে।’ এ লোক ২০ বৎসর সন্ন্যাসী হইয়া প্রকাশ্যভাবে কাশীতে আছে, ইহা কাশীর প্রধান প্রধান অনেক লোক হলপ করিয়া বলিল। আরও অনেক কারণে পুলিশকে শেষে দুঃখিত হইয়া আসামীকে ছাড়িয়া দিতে হইল।”

বিনোদ বলিলেন,—“আপনি এত কথা জানিলেন কিরূপে ?”

দারোগা বলিলেন,—“আমরাও যদুপতির সন্ধানে ছিলাম ; কাজেই এ সম্বন্ধে সকল কথা শুনিবার জন্য আমাদের খুব আগ্রহ ছিল। সেই সময়ে কাশীতে আমার এক দোস্ত কোতোয়াল ছিলেন। তিনি কিছু দিনের জন্য মুঙ্গের আসিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় ; তাঁহারই মুখে আমি এ সব কথা শুনিয়াছি।”

“সে যদুপতি এখন কোথায় আছে ?”

“ঠিক জানি না। বোধ হয় সে কাশীতেই আছে। সে তো লুকাইয়া বেড়ায় না।”

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—“তার পর এ রামদীনকে আপনারা পাইলেন কোথা ?”

দারোগা বলিলেন,—“দুই তিন বৎসর ইহার আর কোনই সন্ধান নাই। তার পর ভাগলপুরের বাঁকা মহকুমায় এ ব্যক্তি সহজেই ধরা পড়িল ; ইহার সঙ্গের সে স্ত্রীলোকটা হঠাৎ ওলাউঠা রোগে মারিয়া যায়। এ তাহার পর বাঁকায় এক মুদীখানা করিয়া দিন কাটায়। আর লুকাইয়া থাকে না, এ দেশ হইতে ও দেশ করিয়াও পলায় না। কাজেই সহজে ধরা পড়িল।”

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—“কিন্তু এই যে সেই যদুপতি ইহা আপনারা স্থির করিলেন কিরূপে ?”

দারোগা বলিলেন,—“সে বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। থানা তল্লাসীতে এ ব্যক্তির নিকট যদুপতির নামের এক পত্র পাওয়া গিয়াছে। এতদিন বসিয়া খাইতেছে ও নানা স্থানে ঘুড়িয়া বেড়াইতেছে, তবু এ লোকের হাতে এখনও টাকা অনেক। এ লোক আপনাকে বেহারী বলে ; কিন্তু ইহার কথাবার্ত্তা ঠিক বাঙ্গালীর মত ; দশ বৎসর এ দেশে থাকিলেও ইহার বাঙ্গালা কথা এখনও প্রায় সমানই আছে ; বেহারী কথাও এ বেশ কহিতে জানে। যদুপতি মিত্রের গল্প, পাঁচ

লাখ, দশ লাখ টাকার গল্প এ অনেক সময়েই করে। বাঙ্গালায় ফিরিবার জন্য ইহার বড়ই ইচ্ছা; কিন্তু একটা গোলের জন্য যাইতে সাহস করে না। ইদানীং এ বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে গোল শেষ হইয়াছে, এইবার বাঙ্গালায় ফিরিবে। যদুপতি মিত্রের মোকদ্দমা মিটিয়া গিয়াছে কি না, ইহা জানিবার জন্য সে অনেক সময়ে হুগলীতে ও অন্যান্য স্থানে পত্র লিখিয়া থাকে। একদিন এক লোকের কাছে এমন বলিয়া ফেলিয়াছে যে, যদুপতি মিত্র আর সে একই কথা। ইত্যাদি ছোট বড় অনেক কথার দ্বারা নিশ্চয় বুঝা যাইতেছে যে, এই ব্যক্তিই যদুপতি মিত্র। এ বিষয়ে আমাদের আর কোনই সন্দেহ নাই।"

বিনোদ বলিলেন,—"আপনারা যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বলবান্ বটে। একণে আমাকে একবার সেই আসামীকে দেখিতে দিবেন কি?

দারোগা বলিলেন,—"স্বচ্ছন্দে। আপনি আমার সহিত আসুন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দারোগা সাহেব অগ্রসর হইয়া, বিনোদকে আসিতে বলিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কম্পিত হৃদয়ে বিনোদ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। বিনোদের চিত্তের তখন যে অবস্থা তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। আর একটা পার্শ্বের বারান্দা অতিক্রম করিয়া তাঁহারা ভবনের অপর দিকে লম্বা গরাদে দেওয়া প্রকাণ্ড এক দ্বারের নিকটস্থ হইলেন। সে স্থানে এক জন অস্ত্রধারী পাহারাওয়ালা দণ্ডায়মান। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দারোগা বলিলেন,—"এই স্থানেই আসামী আছে। পাহারাওয়ালা চাবি খুলিয়া দিতেছে। আপনি আসামীর সহিত সাক্ষাৎ করুন, কথাবার্ত্তা কহুন। আমি একণে অন্য কার্য্যে যাই। আবার শীঘ্রই আপনার কাছে আসিতেছি।"

দারোগা সাহেব কোতের চাবি আনিবার নিমিত্ত হাওলদারকে ডাকিলেন। সে চাবি আনিয়া উপস্থিত হইলে, দারোগা বলিলেন,—"কোতের চাবি খুলিয়া দেও; এই বাবু আসামীর সহিত দেখা করিবেন। কোতের পাহারাওয়ালা আর তুমি দুজনেই এখানে থাক। নিকটে থাকিবার আবশ্যকতা নাই; একটু দূরে থাকিলেই চলিবে।"

বিনোদ বলিলেন,—"আপনার সুব্যবস্থায় বাধিত হইলাম।"

দারোগা চলিয়া গেলেন। হাওলদার চাবি খুলিতে লাগিল। বিনোদ ভাবিতে লাগিলেন,—"এই ঘরে—এই লৌহ দণ্ডগুলির অপর দিকেই কি আমার সেই পরম স্নেহময় সর্ব্বগুণময়, দেবকল্প পিতা অবস্থান করিতেছেন। তিনি পাপী হউন, তিনি নরহন্তা হউন, সে বিচারে আমার কি প্রয়োজন? তিনি আমার দেবতা। সে দেবদর্শন কি আবার আমার ভাগ্যে ঘটিবে? ভগবন্! জানি না তোমার কি বাসনা।"

হাওলদার দরজা খুলিয়া ফেলিল। তখন বিনোদ নিতান্ত কাতর ও অবসন্ন ভাবে সেই লৌহ দ্বারের সম্মুখীন হইলেন এবং দেখিতে পাইলেন, সেই দুর্ভেদ্য গৃহের আঁধার স্থলে, অন্ধকার মধ্যে, এক দীর্ঘাকার পুরুষ বসিয়া

আছে। বিনোদের বক্ষ-বেপন বার্দ্ধিত হইল। এইরূপ—তাঁহার ভক্তিভাজন পিতৃদেবও এই-রূপ দীর্ঘাকার। পুরুষ দ্বারের দিকে মুখ করিয়া উপবিষ্ট। অন্ধকারে ভাল দেখা যাইতেছে না—মুখ চোখ বেশ বুঝা যাইতেছে না। বিনোদ আরও নিকটস্থ হইলেন এবং নিতান্ত আগ্রহ সহকারে সেই কদর্য্য স্থানে উপবিষ্ট পুরুষের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দুই পদ পিছাইয়া আসিলেন এবং ঊর্দ্ধ দকে দৃষ্টিপাত করিয়া যুক্তকরে কহিয়া উঠিলেন,—"দয়াময় ভগবন্! জানি না ইহা তোমার কি নিগ্রহ। আমার সেই পিতৃদেব—কোথায় তিনি? এ জীবনে আমি কি সেই পরম দেবতার আর সাক্ষাৎ পাইব না?" তাহার পর আবার সেই কোতের দ্বারদেশে প্রত্যাগত হইয়া এবং তন্মধ্যস্থ হাতকড়ি-নিবদ্ধ সেই পুরু-ষকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"রামদীন আমাকে চিনিতে পার?"

রামদীন অনেকক্ষণ প্রশ্নকারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর বলিল,—"আমার মুনিবের এক খোকা ছিলেন। দশ বৎসর আগে আমি তাঁহাকে সারাদিন কোলে পিঠে লইয়া বেড়াইতাম। সেই বাবু এক্ষণে কোথায় আছেন, আছেন, কি না আছেন, কিছুই আমি জানি না। যে সকল ঘটনা পরে ঘটিয়াছে তাহাতে তিনি এতদিন বাঁচিয়া আছেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে, এতদিনে তাঁহার চেহারা এইরূপই হইত।"

বিনোদ কোমল ও করুণস্বরে বলিলেন,—"রামদীন! আমিই তোমার সেই খোকা বাবু।"

রামদীনের চক্ষুতে জল আসিল; বলিল,—"বাবু, আইস, আমার নিকটে আইস—তোমার গায়ে একবার হাত দিই।"

বিনোদ অগ্রসর হইয়া রামদীনের পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিলেন; রামদীন কাঁদিতে কাঁদিতে হাতকড়ি বদ্ধ উভয় হস্ত বিনোদের পায়ে দিল। বলিল,—"হুজুরকে আর কখন দেখিতে পাইব মনে ছিল না। কর্ত্তার খবর কি?"

বিনোদ বলিলেন,—"কোন খবরই পাওয়া যায় নাই। অনেক সন্ধান করিতেছি।"

রামদীন বলিল,—"আমি চলিয়া আসার পনর দিন পরে দুর্গাপুরের পুকুরের ধারে বোস মহাশয় মারা পড়িয়াছেন। আমি দূরদেশে থাকিয়া সকল খবর ঠিক শুনিতে পাই নাই। এ কথা আমি শুনিয়াছি যে, আমাদের কর্ত্তা মহাশয় সেই খুন করিয়াছেন বলিয়া পুলিশ সাব্যস্ত করিয়াছে; আর সেই অবধি কর্ত্তা মহাশয় নিরুদ্দেশ আছেন।"

বিনোদ বলিলেন,—"কথা ঐরূপই বটে।"

রামদীন বলিল,—"নিতান্ত মিথ্যা কথা। চক্ষুর সম্মুখে যে কাণ্ড দেখিলেও বিশ্বাস হয় না, লোকের কথায় তাহা বিশ্বাস করা যায় কি? ইহার মধ্যে একটা বড়ই গোল আছে, তাহার কোনই ভুল নাই।"

বিনোদ বলিলেন,—"তাহাই তো সম্ভব। কিন্তু গোলটা যে কি তাহা এখনও বাহির করিতে পারিতেছি না।"

রামদীন বলিল,—"গোল আর কিছুই নহে, সকলই সেই সোণারবেণে হারামজাদার কাজ। রাসবিহারী নাগ চিরদিন কর্ত্তামহাশয়ের প্রবল শত্রু। আপনি ছেলেমানুষ ছিলেন, কোন কথাই জানিতেন না। সে বেটা না পারে এমন কাজ নাই। সেই নিশ্চয় কোনদিন বেকায়দায় পাইয়া কর্ত্তা-মহাশয়কে ফাঁদে ফেলিয়াছে আর তাঁহার নামে এই দুর্নাম রটাইয়াছে।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমারও এইরূপ মনে হইয়াছে; কিন্তু তাহাকে এ ঘটনার

সহিত লিপ্ত করিবার কোনই সুযোগ দেখিতেছি না।"

রামদীন বলিলেন,—"যেমন করিয়া হউক সেই বেটাকে ধরিয়া অনুসন্ধান করিলে নিশ্চয়ই খুনের কিনারা হইবে, আর কর্ত্তা-মহাশয় কোথায় আছেন, আছেন কি না, সকলই জানা যাইবে।"

বিনোদ বলিলেন,—আমিও কতকটা সেইরূপ স্থির করিয়াছি।"

রামদীন বলিল,—"কি বলিব আমি সে সময়ে সেখানে ছিলাম না। আমি প্রাণের মায়া না করিয়া, যেরূপে হউক বেণে বেটাকে কায়দা করিয়া, একটা কিনারা করিতে পারিতাম! আমার কপাল মন্দ। এখন হুজুর বড় হইয়া নিজে তল্লাসে লাগিয়াছেন। আমি এ সময়েও কোন কাজে লাগিলাম না। এতকাল নুন খাইয়াছি, দুঃসময়ে আমাকে দিয়া একটু কাজও হইল না।"

বিনোদ বলিলেন,—"তুমি দুঃখিত হইও না। তোমাকে ভুলক্রমে ধরিয়াছে; এ ভুল জানিবামাত্র পুলিশ তোমাকে ছাড়িয়া দিবে। তাহার পর তুমি আমার সঙ্গে থাকিয়া এই সন্ধানে নিযুক্ত থাকিবে। আপাততঃ আমি তোমাকে কয়টী কথা জিজ্ঞাসা করিব। ভরসা করি, তুমি কোন কথা না লুকাইয়া সরল ভাবে সত্য উত্তর দিবে।"

রামদীন বলিল,—"মিথ্যা কথা আপনার নিকট কোন মতেই বলিব না। যে সকল কথা ব্যক্ত করিলে হুজুর আমার উপর নিতান্ত বিরক্ত হইবেন বুঝিব, তাহারও আমি কোন কথা লুকাইব না। ধর্ম্মাবতার যাহা ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করুন।"

বিনোদ বলিলেন,—"তুমি যখন চলিয়া আইস তখন তোমার হাতে বাবার নাম লেখা তলোয়ার ছিল?"

"ছিল বই কি?"

"সে তলোয়ার তুমি কোথায় পাইলে?"

"হুজুরের বাড়ীতে। আমি সেই তলোয়ার সর্ব্বদা ব্যবহার করিতাম। যখন কর্ত্তা-মহাশয় আমার ভয়ানক দোষের কথা শুনিয়া আমাকে দূর হইয়া যাইতে হুকুম দিলেন, তখন সেই তলোয়ার আমার হাতেই ছিল। আমি সেই অবস্থায় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখ হইতে তলোয়ার সমেত চলিয়া আসিলাম।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—তোমার যে দিন জবাব হয়, তাহার পনর দিন পরে হুগলীর রেল ষ্টেশনে পুলিশ তোমার তলোয়ার কাড়িয়া লয়। এ কয় দিন তুমি কোথায় ছিলে? কেন ছিলে?"

রামদীন বলিল,—"হুজুরের নিকট এ কথার উত্তর দিতে আমার মাথা কাটা যাইবে। যাহাই হউক, আমি সত্য কথা বলিব। হুগলীতে কোন ভদ্রঘরের এক বিধবার সহিত আমার ভালবাসা হয়। কেমন করিয়া ঘটে, আর সে কোন ঘর তাহা বোধ হয় বলিবার দরকার নাই। আমি প্রায়ই স্বর্ণগ্রাম হইতে সন্ধ্যার পর হুগলী আসিতাম, আবার রাত্রি থাকিতে হুগলী হইতে স্বর্ণগ্রামে ফিরিতাম। ক্রমে কর্ত্তা উহা জানিতে পারিলেন। আমাকে দুই চারি দিন এজন্য সাবধান করিয়া দিলেন। কিন্তু আমি তখন উন্মত্ত, যাহার হুকুমে জলে ডুবিতে আগুনে পুড়িতে পারিতাম, এ বিষয়ে তাঁহার হুকুমও মানিতে পারিলাম না। তাহার পর কর্ত্তা আমাকে দুর করিয়া দিলেন। কর্ত্তার দয়া যে ভোগ করিয়াছে, সে যদি কপাল ক্রমে তাহা হারায়, তাহা হইলে তাহার

মরণই মঙ্গল। কিন্তু আমি তখন কর্ত্তা মহাশয়ের রাগেও ভয় পাইলাম না। ভাবিলাম, ভগবানের কৃপায় আমার ভাল হইল। আমি হুগলীতে যাহা হয় একটা কাজ জুটাইয়া লইয়া থাকিয়া যাইব। সে সুবিধা সহজে হইয়া গেল। কিন্তু সেখানে আমার নিয়ত থাকার পর সেই স্ত্রীলোক ও আমার দুই জনেরই বেজায় বাড়াবাড়ী হইয়া উঠিল। বড়ই লোক জানাজানি—গণ্ডগোল হইয়া পড়িল। শেষে সেই স্ত্রীলোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ দুর্ঘট হইয়া উঠিল। তখন কাজেই আমরা পরামর্শ করিয়া দূর দেশে পলাইয়া যাওয়াই আবশ্যক বলিয়া স্থির করিলাম।"

বিনোদ বলিলেন,—"এতদূর পর্য্যন্ত তোমার কথা বেশ বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু দেশে আসিয়া তুমি নানা স্থানে পলাইয়া বেড়াইতে থাকিলে কেন? একটু লুকানো ভাবে কাল কাটাইতে থাকিলে কেন? তাহা আমি স্থির করিতে পারি নাই।"

রামদীন বলিল,—"হুজুর, আগেই শুনিয়াছেন, সে স্ত্রীলোকটা ভদ্রঘরের মেয়ে। আসিবার সময় সে কিছু অলঙ্কার টাকা কড়ি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। আমি জানিতাম, নিশ্চয় আমার নামে গ্রেফ্‌তারি পরওয়ানা বাহির হইবে। সেই জন্তই আমাকে একটু সাবধান হইয়া চলিতে হইয়াছিল।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমার পিতার এই হেঙ্গাম উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে তুমি চলিয়া আইস। যে দিন দুর্গাপুরে খুন হয় সেই দিনই রাত্রির গাড়ীতে তুমি হুগলী হইতে চলিয়া আইস। তবে তুমি সে ঘটনার কথা জানিতে পারিলে কোথায়? তুমি সময়ে সময়ে আমার পিতার মোকদ্দমা মিটিয়া গেল কি না, তাহার সন্ধান করিতে কেন?

রামদীন বলিল,—"আমি হুগলী হইতে চলিয়া আসার সময় এ সকল কথার কিছুই জানিতাম না। প্রথমে যখন শুরাইয়া গ্রামে আমাকেই কর্ত্তামহাশয় মনে করিয়া গোয়েন্দা লাগে, তখনই আমি এ কাণ্ডের কতকটা সন্ধান পাই। কর্ত্তামহাশয় একটা গোলে পড়িয়াছেন, পুলিশ তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, ইহাই আমি জানিতে পারি। তাহার পর সে মোকদ্দমায় কি হইল, তাঁহার দায় কাটিয়া গেল কি না, ইহা জানিবার জন্ত আমার খুব আগ্রহ হয়। আমি সন্ধান পাওয়ার মত লোক পাইলেই সে কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারি নাই। বিশেষ বৃত্তান্ত আমি গ্রেফ্‌তার হওয়ার পর জানিতে পারিয়াছি।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি আগে যেরূপ সাবধানে থাকিতে, এবার গ্রেফ্‌তার হওয়ার সময় সেরূপ সাবধান থাকিতে না শুনিয়াছি। তাহার কারণ কি?"

রামদীন বলিল,—"যাহার জন্ত ভয়, যাহার জন্ত এত সর্ব্বনাশ, যাহার জন্ত রাজা মুনিব হারাইলাম, মুনিবের বিপদে একটু কাজেও লাগিলাম না, দেশে দেশে চোরের মত ঘুরিয়া বেড়াইলাম, সে স্ত্রীলোক হঠাৎ মরিয়া গেল। তখন আর আমার ভয়ের কারণ থাকিল না। আমি তখন হইতে লুকাইয়া থাকিবার দরকার বুঝিলাম না।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমার নিকট বাবার নামের এক পত্র পাওয়া গিয়াছে। সে পত্র তুমি কোথায় পাইলে?"

রামদীন বলিল,—"সে পত্র স্বর্ণগ্রামে কর্ত্তামহাশয়ের হাত হইতে আমি পাইয়াছি। কর্ত্তা মহাশয় বৈকালে হাওয়া খাইবার জন্ত বাহির হন। আমি পিছনে ছিলাম। পথে একটা লোক তাঁহার হাতে সে পত্র দেয়। তিনি

তাহা পড়িয়া আমাকে রাখিয়া দিতে বলেন। তাহারই দুইদিন পরে আমার জবাব হয়। তখন তিনিও সে পত্র ফেরত চাহেন নাই, আমারও তাহা দিতে মনে হয় নাই। দরকারী পত্র হইবে বিবেচনায়, আমি এ পর্য্যন্ত তাহা নষ্ট না করিয়া যত্নে রাখিয়া দিয়াছি। এখন পুলিশের লোকেরা আমার নিকট হইতে তাহা কাড়িয়া লইয়াছে।"

বিনোদ বলিলেন,—"তোমাকে আপাততঃ আমার আর কোন জিজ্ঞাসা করিবার কথা নাই। তুমি ইচ্ছা করিলে আমার অনেক উপকার করিতে পারিবে। তুমি আমাদের বিশ্বাসী ও পুরাতন ভৃত্য। একটা অন্যায় কাজ করিয়াছ বলিয়া তোমাকে চিরদিন ত্যাগ করা উচিত নহে।"

রামদীন বলিলেন,—"হুজুর গোলামকে মাপ করিবেন। এ নিমকের চাকর হুজুরের কাজে জান দিবে।"

বিনোদ বলিলেন,—"বেশ কথা! আপাততঃ তোমার সহিত আর কথার প্রয়োজন নাই। আমি এখন পিতার সন্ধানে কাশী যাইব। সেখানেও আমার আশা সফল হইবে বোধ হয় না। যাহা হউক, সেখান হইতে আমি হুগলি ফিরিব। যতদিন পিতার সন্ধান না হয়, যতদিন এ বিষয়ের একটা কিনারা না হয়, ততদিন আমি আর কোন কাজ করিব না স্থির করিয়াছি। তোমার কোন ভয় নাই। তোমাকে পুলিশের লোক আজই সঙ্গে করিয়া হুগলী লইয়া যাইবে। আমি তোমার সঙ্গে যাইতে পারিব না। আমি যাই বা না যাই, তুমি হুগলী যাইলে তোমাকে ছাড়িয়া দিবে। তুমি সেখানেই থাকিও। সেখানে গিয়া সকল কথা বলিব—সকল পরামর্শ করিব। আমি এখন আসি।"

বিনোদ চলিয়া আসিলেন। হাওলদার চাবি বন্ধ করিল। দারোগা বিনোদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বিনোদ তাঁহাকে বলিলেন,—"আপনারা আসামী চালান দিউন। দুঃখের বিষয় আপনাদের সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। এ ব্যক্তি যদুপতি মিত্র নহে। যাহা হউক, আপনি আমার সহিত অনেক সৌজন্য করিয়াছেন এবং অনুগ্রহ পূর্ব্বক অনেক সংবাদ জানাইয়াছেন। আমি সে জন্য আপনার নিকট বিশেষ উপকৃত। এক্ষণে বিদায় হই।"

একখানি দশ টাকার নোট বিনোদের পকেট হইতে বাহির হইয়া দারোগার হস্তে প্রবেশ করিল। তিনি বিনোদকে সসম্মান সেলাম করিয়া বলিলেন,—"আমাদের এত প্রমাণ উড়িয়া যাইবে কিসে?"

বিনোদ বলিলেন,—"সকলই আনুমানিক প্রমাণ। যদুপতি মিত্রকে হুগলীর অনেক ভাল লোকই জানেন। এ ব্যক্তিকে কেহই যদুপতি বলিয়া সনাক্ত করিবে না।"

বিনোদ গাড়ীতে উঠিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হতাশ অথচ প্রসন্ন হৃদয়ে বিনোদ থানা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার একজন সহাধ্যায়ী এখানকার এনট্রান্স স্কুলের হেড-মাষ্টার। তিনি সেই দিকে গাড়ি চালাইতে আজ্ঞা দিলেন। গাড়ি মাষ্টার বাবুর দ্বারে লাগিলে, তিনি স্বয়ং কাহার গাড়ি দেখিবার নিমিত্ত, বারান্দায় আসিলেন। বহুকালের

বন্ধু বিনোদকে গাড়ির মধ্যে দেখিয়া মাষ্টার বাবুর আনন্দের সীমা থাকিল না। অনেক দিন পরে উভয় বন্ধুর সানন্দ সম্মিলন হইল। অন্যান্য কথার সহিত কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর, বিনোদ সেখানে আহার্য্য প্রস্তুত করিতে বলিয়া, আর যে সকল বিশেষ প্রয়োজন আছে, তাহা সম্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় গাড়িতে উঠিলেন। ডাকঘরে যাইবার নিমিত্ত কোচম্যানকে আদেশ দিয়া, বিনোদ অতঃপর কি করা কর্ত্তব্য মনে মনে তাহার আলোচনা করিতে লাগিলেন।

কাশীতে যে সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া বিনোদ মনে করিলেন। হইতে পারে যাঁহারা তাঁহাকে যদুপতি মিত্র বলিয়া চিনিতে পারেন নাই, তাঁহাদের সকলেরই ভ্রম হইয়াছে। হয়তো তাঁহার পিতা, কোন মানসিক বিকার হেতু, সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন এবং যে পাপের ভার তাঁহার স্কন্ধে আরোপিত হইতেছে, তদ্বিষয়ে অজ্ঞতা বা নির্লিপ্ততা হেতু স্বচ্ছন্দে প্রকাশ্যভাবেই জীবনপাত করিতেছেন। বহু কারণেই নানা ব্যক্তি তাঁহাকে না চিনিয়া থাকিতে পারেন। তাঁহার ন্যায় মহাত্মাকে বিপদে পাতিত করা অবৈধ বোধে, অনেকে হয়তো ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে চিনিয়াও চিনেন নাই। পুত্র পিতাকে দর্শন মাত্র, এবং পিতাও পুত্রকে দর্শনমাত্র চিনিতে পারিবেন। যে কারণে পিতা সংসার বিরাগীর অবস্থায় কালপাত করিতেছেন, পুত্রের সাক্ষাতে হয়তো সে কারণ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে এবং অতি সহজেই সাবধানতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবে। অনেক ভাবিয়া বিনোদ স্থির করিলেন, বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাট-সন্নিহিত সন্ন্যাসীকে দর্শন করা নিতান্ত আবশ্যক।

গাড়ি ডাকঘরে পৌছিলে বিনোদ গাড়ি হইতে নামিয়া পোষ্টমাষ্টার বাবুর নিকট হইতে একখানি তারের খবরের কাগজ চাহিয়া লইলেন এবং কলিকাতায় শ্রীরামের নিকট তারযোগে দুই শত টাকা পাঠাইবার নিমিত্ত সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তাঁহার নামে পোষ্ট মাষ্টারের নিকট টাকা আসিলেই তিনি পাইবেন, এরূপ ব্যবস্থা করিলেন। পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার স্বকৃত ব্যবস্থার কথা তাঁহাকে জানাইয়া রাখিলেন।

তাহার পর বন্ধুর বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে স্নানাহার সমাপ্তির পর, তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিশেষ গুরুতর প্রয়োজন হেতু, ভাগলপুরে দুই চারিদিন থাকিয়া, বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না বলিয়া, অতিশয় দুঃখ-প্রকাশ করিলেন।

আরোহীর আদেশানুসারে গাড়ি আবার ডাকঘরে আসিয়া লাগিল। তখন বেলা প্রায় ৪ টা। তখনই শ্রীরাম-প্রেরিত টাকার তার আসিয়াছে। বিনোদ, পোষ্টমাষ্টার মহাশয়কে শত ধন্যবাদ দিয়া, যথানিয়মে টাকা গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে বহন করিয়া গাড়ি রেলওয়ের ষ্টেশনে প্রবেশ করিল।

গাড়ির বিশেষ বিলম্ব নাই। বিনোদ কাশী পর্য্যন্ত একখানি প্রথম শ্রেণীর ও একখানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিয়া প্ল্যাটফারমে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ট্রেণ আসিল। চিরদিন এইরূপ সময়ে যেমন গোলমাল উপস্থিত হয়, আজিও তাহা হইল। বধুকে যথাস্থানে বসাইয়া দিয়া, বিনোদ প্রথম শ্রেণীতে

আরোহণ করিলেন। সৌভাগ্য-ক্রমে তাঁহার পরম সুহৃদ্ খানসামার সহিত একবারও দেখা হইল না। সেই গাড়িতে একটি উচ্চ পদস্থ ইংরাজ ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা পুলিশের ইন্‌সপেক্টর জেনেরল। বিনোদ ইচ্ছা করিলে তাঁহার সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার চিত্তের অবস্থা এখন ভাল নহে বলিয়া, তিনি সে চেষ্টা করিলেন না।

যথাসময়ে গাড়ি মোগলসরাই পৌঁছিল। আউদ এণ্ড রোহিল খণ্ডের গাড়িতে উঠিয়া বিনোদ বাবু অল্প সময়েই কাশী ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। বিনোদ ও রঘু গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন।

মনের অবস্থা বড়ই মন্দ। পুলিশ বুঝিয়াছে, এ যদুপতি কখনই তাহাদের লক্ষ্য যদুপতি নহেন। তবে বিনোদ এত কষ্ট স্বীকার, সময় নষ্ট ও অকারণ অর্থব্যয় করিয়া এখানে আসিলেন কেন? যদিই তিনি প্রকৃত ব্যক্তি হন, যদিই কোন কারণে তিনি সন্ন্যাসীর বেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন, যদিই তিনি প্রয়োজনানুরোধে এইরূপ থাকিবার আবশ্যকতা অনুভব করিয়া থাকেন, যদিই পুলিশ ঠিক লোককে ধরিয়াও প্রতারিত হইয়া থাকে, যদিই ইনি প্রকৃত ব্যক্তি হইলেও, বিরুদ্ধ প্রমাণাদির দ্বারা অব্যাহতি পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার পুত্রের এতদূর আসিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন না করিয়া ফিরিয়া যাওয়া উচিত হয় না। এইরূপ বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া বিনোদ কাশীতে উপস্থিত হইলেন। এই যদুপতিতে সন্দেহজনক ব্যাপার কিছু না কিছু না দেখিয়া পুলিশ কখনই তাঁহাকে ধরে নাই। হইতে পারে, পুলিশ সন্দেহ করিয়াছিল ঠিক, কিন্তু শেষ কালে ঠকিয়া গিয়াছে।

ঘোড়ার গাড়িতে উঠিবার পূর্ব্বে বহু পাণ্ডা তাঁহাকে ঘেরাও করিল। তিনি অনেক কষ্টে তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া একটু দূরে, একটু নির্জ্জন স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর গলায় কাপড় দিয়া ভূ-পৃষ্ঠে মস্তক-স্থাপন করিয়া প্রণাম করিলেন। তদনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—"প্রভো বিশ্বেশ্বর! তোমার এই অধম দাস তোমার পবিত্র পুরীতে আগমন করিয়াছে; কিন্তু তোমাকে দর্শন করা, বা, তোমার চরণোদ্দেশে বিল্বদলাঞ্জলি দেওয়া এ অভাগার অদৃষ্টে নাই। আমার সজীব ও স্নেহময় বিশ্বেশ্বর, আমার প্রতি যে বিশ্বেশ্বরের দয়ার সীমা ছিল না, আদরের অবধি ছিল না, সেই পরম করুণাময় প্রত্যক্ষ দেবতা পিতৃদেব আজি দেশত্যাগী—অজ্ঞাত কারণে নিরুদ্দেশ। সেই দেবতার দর্শন না পাইলে আমার জীবন বৃথা, আমার ধর্ম্ম বৃথা, আমার সাধনা ও সংকল্প বৃথা। প্রভো বিশ্বেশ্বর, তুমি মানব হৃদয়ের ভাবজ্ঞ। কৃপা করিয়া অভাজনকে ক্ষমা কর। দয়াময়, আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার সংকল্প সিদ্ধ হয়।

ঘোড়ার গাড়িতে আরোহণ করিয়া, বিনোদ দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌঁছিলেন। অল্প অনুসন্ধানেই বিনোদ জানিতে পারিলেন যে, কুবলয়ানন্দ নামে যে সন্ন্যাসী ঘাটের একটু দক্ষিণ পার্শ্বে একটী অতি নিম্ন একতল গৃহে বাস করেন, তিনিই তাঁহার লক্ষিত ব্যক্তি।

সহজেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া বিনোদ দেখিলেন, এক দীর্ঘকায়, ধবল কেশ-রাশি-সমন্বিত, সুদীর্ঘ শ্মশ্রুভারে আবৃত বক্ষ, বিভূতি-বিলেপিত-কায়, কৌপীনমাত্র-ধারী মহাপুরুষ ভক্তিসহকারে দেবার্চ্চনা করিতেছেন। দর্শনমাত্র বিনোদ চমকিত হইলেন। তাঁহার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল; চক্ষুতে

আনন্দাশ্রু দেখা দিল। তখনই সেই মহাপুরুষের চরণ সমীপে নিপতিত হইবার নিমিত্ত হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু হৃদয়কে সংযত করিয়া বিনোদ দূরে বিনামা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হইলেন এবং বিনীত ভাবে প্রণাম করিলেন। তাহার পর সেই মহাপুরুষের পূজা-সমাপ্তির প্রতীক্ষায়, ধীর ভাবে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন। মহাপুরুষের আকৃতি দেখিয়া বিনোদের বাল্যস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। এইরূপ—প্রায় এইরূপ আকৃতি তাঁহার হৃদয়-পটে অঙ্কিত রহিয়াছে। ইনিই কি তিনি?

মহাপুরুষের পূজা সাঙ্গ হইল। তিনি ভক্তি সহকারে দেব চরণে প্রণত হইয়া বিনোদের প্রতি নেত্রপাত করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি দেখিবামাত্র বিনোদের চমক ভাঙ্গিয়া গেল। আশা-ভঙ্গ-জনিত মনস্তাপে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। বুঝিলেন আয়াস বৃথা হইল, এ মহাত্মা কখনই তিনি নহেন। তাঁহার অন্তরে যে স্নেহময় মধুর দৃষ্টির স্মৃতি জাগিয়া রহিয়াছে ইহা সে দৃষ্টি নহে।

মহাপুরুষ জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ? এখানে কি প্রয়োজন?"

কণ্ঠস্বর শুনিয়া বিনোদের আশা নির্ম্মূল হইল। বুঝিলেন, তাঁহার অন্তর-প্রদেশে যে স্নেহময় মধুর ধ্বনি এখনও সময়ে সময়ে বাজিয়া উঠে, এ স্বর সে স্বর নহে। সবিনয়ে উত্তর দিলেন,—"আমি দূরদেশ হইতে একজন মহাত্মার অনুসন্ধানে আসিয়াছি। মহাশয়কে সেই ব্যক্তি বলিয়া প্রথমে ভ্রম হইয়াছিল। এক্ষণে ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছি। আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

মহাপুরুষ বলিলেন,—"আমাকে স্বর্ণগ্রামের মিত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলে কি?"

বিনোদ সবিনয়ে বলিলেন,—"আজ্ঞা হাঁ।"

মহাপুরুষ বলিলেন,—"জানি না কোন্ পাপে যদুপতি মিত্র ভ্রমে লোকে আমাকে বার বার উত্যক্ত করে। শুনিয়াছি যদুপতি খুন করিয়া পলাইয়াছে। তুমি তাঁহার কে?"

"পুত্র।"

"পুত্র হইয়া এমন পিতৃদ্রোহী কেন হইয়াছ? সে ব্যক্তি প্রাণের ভয়ে লুকাইয়া আছে। তাহাকে ধরিবার জন্য তোমার এত প্রযত্ন কেন?

বিনোদ বলিলেন,—"তিনি এরূপ কার্য্যে অশক্ত। নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে আর কোন রহস্য আছে। পিতার কলঙ্ক-বিমোচন করা আমার উদ্দেশ্য।"

মহাপুরুষ বলিলেন,—"ঘটনার আদ্যোপান্ত আমাকে বলিতে পার?"

বিনোদ সংক্ষেপে সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝাইয়া দিলেন, মহাপুরুষ বলিলেন,—"বুঝিলাম, তোমার অনুমানই যথার্থ। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে গভীর রহস্য আছে। তুমি এক্ষণে কি স্থির করিয়াছ?"

বিনোদ বলিলেন,—"যে ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটিয়াছে, সেই স্থানেই অনুসন্ধানের মূল কেন্দ্র করিব এবং যে ব্যক্তি এই ব্যাপারের প্রধান অপরাধী বলিয়া আমার ধারণা, তাহারই উপর নানা প্রকার উৎপীড়ন আরম্ভ করিব। তাহার নিকট হইতে রহস্যের উদ্ভেদ না হইলে আর উপায় নাই।"

মহাপুরুষ বলিলেন,—"নিশ্চয়ই হইবে। তুমি অতি সুপুত্র। তোমার ন্যায় পুত্রের পিতা নিশ্চয়ই অপাপ। কিন্তু বৎস, তোমার

উদ্দেশ্য-সিদ্ধির এখনও বিলম্ব আছে—এখনও অন্তরায় আছে।”

বিনোদ বলিলেন,—“বিলম্ব ও অন্তরায় আমি গ্রাহ্য করিব না। জীবনপাত করিয়াও যদি মনোরথ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইব।”

মহাপুরুষ বলিলেন,—“আশীর্ব্বাদ করিতেছি, নিশ্চয়ই তোমার কামনা সফল হইবে।”

ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া বিনোদ গাড়িতে উঠিলেন,গাড়ি ষ্টেশনে আসিল। কিন্তু তখন ট্রেণের অনেক বিলম্ব। সেইস্থানে কোনরূপে স্নানাহার শেষ করিয়া, যথাসময়ে রেল গাড়িতে আরোহণ করিলেন এবং পরদিন সন্ধ্যার পর কলিকাতায় পৌছিলেন।

বাসায় দেখিলেন তাঁহার নামে একখানি পত্র টেবিলের উপর কাগজ-চাপা দ্বারা চাপা রহিয়াছে। একি! কি ভয়ানক! এ যে অপরাজিতার হস্তাক্ষর! ডাকের চিঠি নয় তাড়াতাড়ি খাম খুলিয়া পত্র পাঠ করিলেন।

“ভাই বিনোদ!

আমি কলিকাতায় আসিয়াছিলাম—বাসায় দুই দিন ছিলাম—তোমার সহিত দেখা হইল না। তোমার চিন্তায় আমরা অস্থির হইয়াছি। তুমি কোথায় আছ জানিতে পারিলে, আমি তোমাকে দেখিতে যাইতাম। কোন উপায়েই তুমি কোথায় আছ, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না।

বিজলীর বড় কঠিন পীড়া হইয়াছিল। এখন একটু ভাল আছেন, সম্পূর্ণ সারেন নাই। ভগবানের কৃপায় বোধ হয় শীঘ্র সারিয়া উঠিবেন।

তুমি যে কার্য্যে ব্যস্ত আছ, আমি বোধ হয় তাহার কতক অনুমান করিতে পারিয়াছি। ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন।

কলিকা আসিবামাত্র আমাকে তোমার সংবাদ লিখিও। বিজলী এখন কেমন আছেন লিখিতে ভুলিও না। ইতি

তোমার স্নেহের ভগ্নী
অপি।”

পত্রপাঠ করিয়া বিনোদ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। সকল রহস্যই ব্যক্ত হইয়া পড়িল। অনুসন্ধানে দ্বারবান্ বলিল—“দিদিবাবু দুই দিন ছিলেন, বাজার আসিয়াছিলেন মাত্র—দ্বারবান্ লোক জন বাসায় থাকিত। তিনি গলির ভিতর ছোট বাড়িতেই থাকিতেন।

বিনোদ হতাশভাবে শয্যায় পড়িয়া বলিলেন,—“অপিকে আঁটিয়া উঠিবার যো নাই। কিন্তু বিজলীর পীড়া—বড় কঠিন পীড়া। বি সুসময়েই অপি এখানে আসিয়াছিলেন অপি স্বয়ং যত্ন করিয়াছেন—কোন ব্যবস্থারই ত্রুটি হয় নাই। হায়! দর্শন করা দূরে থাকুক, সে দেবীর নিকটস্থ হইতেও আমার অধিকার নাই।” দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিনোদ শয্যায় পড়িয়া রহিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিনোদ প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া শ্রীরামকে ডাকিতে পাঠাইলেন, শ্রীরা আসিলে বিনোদ সর্ব্বাগ্রে প্রেমচন্দ্র মুসলমানের সংবাদ জিজ্ঞাসিলেন। মুসলমানে সন্ধান হইয়াছে; কিন্তু সে নিতান্ত অকর্ম—উত্থান-শক্তি রহিত। বিনোদ বলিলেন,—

"কোন উপায়ে তাহাকে হুগলী লইয়া যাওয়া যায় কি না ?"

শ্রীরাম বলিল,—"লইয়া না যাওয়া যায় এমন নহে ; কিন্তু সে যেরূপ পীড়িত, তাহাতে ভয় হয় পাছে পথেই মারা যায়।"

বিনোদ বলিলেন,—"ভাল ডাক্তার লইয়া যাও ; উত্তম ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দেও। তাহার কাপড় চোপড় কিনিয়া দেও, তাহার আর যে কিছু দরকার থাকে তাহারও ঠিক করিয়া দেও। যে উপায়ে হউক, তাহাকে কল্যই হুগলী লইয়া যাইতে হইবে। আজি তাহার ব্যবস্থা কর।"

শ্রীরাম "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় বিনোদ তাহাকে হরিপুরের সমস্ত সংবাদ জিজ্ঞাসিলেন। শ্রীরাম একে একে সমস্ত কথা অবিকল জানাইল। সমস্ত শ্রবণ করিয়া বিনোদ মনে মনে ভাবিলেন, দাদাও আমার জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছেন অপরাজিতাও, শ্রীরাম টাকা লইয়া কলিকাতায় আসিতেছে জানিয়া, এখানে আমার সন্ধানে আসিয়াছিলেন। কি অসীম স্নেহ ! কি অপার করুণা ! কিন্তু ধিক্ আমাকে এমন অনুরক্ত ভাই ভগ্নীর সহিত প্রতারণা করিতেছি। জীবনে কখন মিথ্যা কহি নাই, তাঁহাদের নিকট কদাপি কোন প্রবঞ্চনা করি নাই ; কিন্তু আজি আমি তাঁহাদের নিকট প্রতারক। সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত হইয়া আমার এ অপরাধ তাঁহারা ক্ষমা করিবেন না কি ? নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবেন। বুদ্ধিমতী অপরাজিতা দুই দিন আসিয়াই সমস্ত কথা বুঝিয়া গিয়াছেন। বোধ করি কোন রহস্যই তাঁহার নিকট প্রচ্ছন্ন নাই। তথাপি এখনও আমার প্রতি দয়া—আমার জন্য অপরিসীম উদ্বেগ !

শ্রীরাম প্রস্থান করিলে, বিনোদ, প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপ্ত করিয়া, গাড়ি ডাকাইলেন এবং পাচকদিগকে আবশ্যকমত আদেশ দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তারাসুন্দরীর ঝি বাজারে যাইবার সময় রঘুকে দেখিতে পাইল এবং জানিয়া গেল, বাবু কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। সে বাটীতে গিয়া এ সংবাদ জানাইল।

নানাস্থান ঘুরিয়া বেলা প্রায় ১টার সময় বিনোদ বাসায় ফিরিলেন। শ্রীরাম তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। শ্রীরাম বলিল,—"তাহাকে লইয়া যাইবার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হইয়াছে। পাছে রাসবিহারী তাহাকে মারিয়া ফেলে ইহাই তাহার প্রধান ভয়। আমি তাহাকে সকল বিষয়ে ভরসা দিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছি।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমার কলিকাতায় আর কোন কাজ নাই। এক মুহূর্ত্তও বৃথা নষ্ট করিবার সময় নাই। অদ্য বৈকালে যাওয়া যাইতে পারে কি ?"

শ্রীরাম বলিল,—"আমি উপায় দেখিতে যাই।"

বিনোদ যথাসম্ভব অল্প সময়ে স্নানাহার সমাপ্ত করিয়া ক্লান্ত দেহকে শয্যার উপর ফেলিয়া দিলেন। বিজলীর কঠিন পীড়া হইয়াছিল—এখনও সারে নাই। কিন্তু বিনোদের এখন সেখানে যাইতে সাহস নাই—ভরসা নাই—অধিকার নাই। তিনি মনে মনে বলিলেন,—"বিজলী এখনও তোমার পিতৃহন্তার কলঙ্ক আমার সর্ব্বাঙ্গে মাখা রহিয়াছে ; এখনও তোমার পিতৃহন্তার শোণিত আমার ললাটে, আমার হৃদয়ে, আমার দেহের শিরায় শিরায় বহিতেছে, এ কলঙ্ক প্রক্ষালিত না হইলে এ রক্তের চিহ্ন না ধৌত হইলে, আমি তোমার নিকটস্থ হইবার অযোগ্য। যদি তাহা না হয়—যদি বাসনা

সিদ্ধ না হয়—তাহা হইলে বিজলী, এই পর্য্যন্ত—তোমার সহিত মিলনের আশার এই স্থানেই শেষ। হৃদয় তোমার চিন্তায় ফাটিয়া যাইতেছে। মন তোমার সহিত কথা কহিবার জন্ত অস্থির হইয়াছে। নয়ন তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে। আমি সকলই বিচূর্ণ করিব; তথাপি তোমার পিতৃহন্তার পুত্ররূপে কদাপি তোমার সমক্ষে উপস্থিত হইব না।"

সেই দিন বৈকালে বিনোদ, শ্রীরাম, গরফু সেখ ও রঘু হুগলী যাত্রা করিলেন। গরফুর অবস্থা বড় ভয়ানক; তাহার হাত ভাঙ্গা, পা ভাঙ্গা, হাতের অঙ্গুলিগুলি ভাঙ্গা, এ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোনই শক্তি নাই। পক্ষাঘাতে বিনষ্ট-শক্তি ব্যক্তির ন্তায় সে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর তাহার নাক নাই, একটা কাণ নাই। ইহাতে সে বড়ই বিকৃত-দর্শন হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া বিনোদের বড়ই দুঃখ হইল। অতি জঘন্ত প্রবৃত্তির ক্ষণিক মোহে আচ্ছন্ন হইয়া, মানুষ এরূপ কাণ্ড করিতে পারে; একজন সবল, সুস্থ, সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ, শ্রমজীবী লোককে এরূপ অকর্ম্মণ্য, হীনদশাপন্ন ও কুৎসিত কলেবর করিয়া দিতে পারে, ইহা মনে হইলেও হৃৎকম্প হইতে থাকে। তিনি মনে করিলেন,—"আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির যাহা হয় হইবে, কিন্তু এই ব্যক্তির প্রতি যে অসীম অত্যাচার হইয়াছে, তাহার প্রতিকার সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। ভগবন্! যে নরাধম এই নীরহ ব্যক্তির এই দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছে, তাহাকে সমুচিত শাস্তি না দিলে তোমার ন্তায়-রাজ্যের বড়ই কলঙ্ক হইবে।"

অতীব যত্নে এবং বিশেষ সাবধানতা সহ গরফুকে রেলে উঠান ও নামান হইল। তাহার নিমিত্ত হুগলীর বাবুঘাটের নিকট একটী স্বতন্ত্র ঘর লওয়া হইল। সেই ঘরে গরফুকে রাখিয়া ও তাহার সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া, তাহার পরিচর্য্যা করিবার ও সর্ব্বদা নিকটে থাকিবার একজন লোক রাখিয়া দিয়া, বিনোদ শ্রীরাম ও রঘুকে সঙ্গে লইয়া, গঙ্গার উপরিস্থিত তাঁহার মনোহর বাসায় আগমন করিলেন

দূর হইতেই বিনোদ দেখিতে পাইলেন, তাঁহার বাসায় অনেক লোক! অনেক স্ত্রীলোক ছুটাছুটী করিয়া কাজকর্ম্ম করিতেছে। অনেক দ্বারবান্ বাহিরে গোল করিতেছে। তিনি নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, সকলেই চেনা লোক —সকলেই হরিপুরের। তাঁহাকে দেখিবামাত্র দ্বারবানেরা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সসম্মান অভিবাদন করিল। তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমরা এখানে কেন?"

সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ দ্বারবান্ অগ্রসর হইয়া বলিল,—"হুজুর! দিদি জি মহারাজ।"

বিনোদ ব্যস্ততা সহ জিজ্ঞাসিলেন,—"এখানে আছেন?

"খোদাবন্দ।"

দ্রুতপদে বিনোদ ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অতীব ব্যস্ততাসহ উপরে উঠিলেন। সিঁড়ির উপরেই অবনত-বদনা অপরাজিতা দণ্ডায়মানা। বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"একি অপি! তুমি এখানে কেন? খবর সব ভাল তো?

অপরাজিতা সংক্ষেপে উত্তর দিলেন,—"হাঁ! তোমার জন্ত আসিয়াছি।"

বিনোদ বলিলেন,—"কেন? আমার তো কোন পীড়া হয় নাই, আমি তো কোন বিপদে পড়ি নাই। সর্ব্বদাই তো সংবাদ দিতেছি তবে কেন তুমি এখানে আসিলে?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"তুমি বিপদে পড়িয়াছ।"

বিনোদ বলিলেন,—"কে বলিল? আমি তো সে কথা জানি না। বিপদ হইলে অবশ্যই তোমাদের সর্ব্বাগ্রে জানাইতাম। তুমি কাজ ভাল কর নাই।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"সকল বিপদ সকল সময় সকলকে জানান যায় না। তুমি বিপদে পড়িয়াছ সত্য, তাহা হয়তো এখন আমাদের জানাইতে তোমার অভিপ্রায় নাই। কিন্তু যাহাদের তুমি পরমাত্মীয় তাহারা তোমাকে বিপন্ন বুঝিয়া স্থির থাকিবে কিরূপে? ভালমন্দ বিচার না করিয়াই আমি আসিয়াছি। বিশেষ অন্যায় কার্য্য করিতেছি বলিয়া মনে করি নাই।"

বিনোদ বলিলেন,—"মনে কর আমি অতিশয় বিপন্ন হইয়াছি। কিন্তু তুমি স্ত্রীলোক—তুমি আমার বিপদ উদ্ধারের কি সহায়তা করিবে?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"জানি না কি করিব? কিন্তু ইহা জানি, দরকার হইলে সবই করিতে পারিব।"

বিনোদ বুঝিলেন, অপরাজিতার ন্যায় বুদ্ধিমতী সাহসিকা নারী ভূতলে বড়ই দুর্লভ। তিনি যে সংকল্প করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার অখণ্ডনীয় যুক্তি আছে। বলিলেন,—"যাহা হইবার হইয়াছে, কল্য তোমাকে বাটী যাইতে হইবে।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"কেন যাইব? যাহা করিতে আসিয়াছি তাহার শেষ না করিয়া যাইব কেন? তোমার বিপদে সাহায্য করিব। যে দিন সে কার্য্যের সমাপ্তি হইবে, সে দিন তুমি না বলিলেও, আমি আপনি ফিরিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিব। যাহার শত অপরাধ ক্ষমা করিতে পার, তাহার এ অপরাধটা ক্ষমা করিবে না কি ভাই?"

বিনোদ বলিলেন,—"তুমি হয়তো আমার এখানকার কার্য্য কতক বুঝিয়াছ। তাহাতে তোমার দ্বারা কোনই সাহায্য সম্ভব নহে।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"খুব সম্ভব। এই দেখ অদ্য প্রাতে শ্রীযুক্ত রামজীবন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সংবাদ অতি গোপনীয়, অথচ অতি প্রয়োজনীয়। আমি কৌশলে অনেক কাণ্ড করিয়া তাহা জানিয়া লইয়াছি।"

বিনোদ ব্যস্ততাসহ জিজ্ঞাসিলেন,—"কি সংবাদ? তিনি কি বলিয়া গিয়াছেন?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"রাসবিহারী নাগ ক্রোধের বশে একটা চাকরকে এতই মারিয়াছে যে, সে বাঁচে কি না সন্দেহ।"

বিনোদ বলিলেন,—চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাটী ফিরিয়া গিয়াছেন কি? বড়ই প্রয়োজনীয় সংবাদ। সে চাকরটাকে রক্ষা করার চেষ্টা করিতে হইবে, সাহেবদের দেখাইতে হইবে, রাসবিহারীর অত্যাচার সমানই চলিতেছে।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"তবেই দেখ, সামান্য হইলেও আমার দ্বারা কিছু না কিছু সাহায্য হওয়া অসম্ভব নহে। আরও কোন কোন বিষয়ের ব্যবস্থাও আমি করিয়াছি; কিন্তু তাহার কথা তোমাকে এখনই বলিবার প্রয়োজন নাই। তোমার পায়ে পড়ি বিনোদ, তোমার এই গোলযোগের সময় আমাকে তাড়াইয়া দিও না।"

বিনোদ বলিলেন,—"তোমার ন্যায় নারী জগতে বিরল। তুমি আমাকে সকল বিষয়েই সাহায্য করিতে পার জানি। কিন্তু তোমাকে এরূপ ভাবে দেখিলে পাছে লোকে কিছু বলে এই জন্য ভয় হয়।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"আমার সঙ্গে চারি জন অতি বিশ্বস্ত দ্বারবান্ আছে, দুইজন পরিচারিকা আছে, একজন পাচিকা আছে, আর আমাদের বাটীর গৃহিণীস্বরূপা সোণার মা আছে। সুতরাং আমি একাকিনী নহি; কোন নিন্দার অবসরও নাই। তথাপি লোকে যদি কোন কথা বলে, সে কথা কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিতে হয় তাহা আমি জানি। তুমিও কি তাহা জান না ভাই?"

বিনোদ বুঝিলেন, কলঙ্কের কার্য্য যাহার জীবনের নিকটেও আসিতে পারে না, তাহার সম্বন্ধে লোকে যদি কখন কোন ঘৃণিত কথা বলে, সে কথা পদাঘাতে উড়াইয়া দেওয়াই উচিত। সুতরাং তিনি কথায় বা যুক্তিতে অপরাজিতাকে আটিয়া উঠিতে পারিলেন না। বলিলেন,—"আমি কলিকাতায় আসিয়া তোমার পত্র দেখিয়া অবাক্ হইলাম।"

"তুমি কলিকাতা হইতে আসিতেছ?"

"হাঁ।"

'বিজলী কেমন আছেন?"

বিনোদ নিরুত্তর। বিজলীকে অপরাজিতা দেখিয়াছেন—বিপদে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া নিশ্চয়ই তাহার সহিত বিশেষ আত্মীয়তা করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু বিনোদ যে তাঁহাকে হৃদয়ের দেবী জ্ঞানে ভাল বাসেন, তাহাও অপরাজিতা বুঝিয়াছেন কি? নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন। এরূপ বুদ্ধিমতী নারীর নিকট হৃদয়-ভাব প্রচ্ছন্ন রাখা কাহারও সাধ্য নহে। বড় লজ্জার কথা! বাটীর আত্মীয়গণের অজ্ঞাতসারে গোপনে নিজের ইচ্ছামত পাত্রী-নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহার প্রণয়-পাশে বদ্ধ হওয়া, বড়ই স্বাধীনতার পরিচায়ক।

অপরাজিতা আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"কথা কহিতেছ না কেন? তবে কি বিজলীর পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছে?"

বিনোদ বলিলেন,—"জানি না।"

"জান না? তবে কি তুমি তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আইস নাই?"

"না।"

তখন অপরাজিতা ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, হৃদয়-হীন, একটি সরল-হৃদয়া বালিকা তোমার জন্য উন্মাদিনী। তাহার সেই প্রেমোন্মত্ত ক্ষুদ্র হৃদয়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে তোমার কি একটুও দয়া হয় না? এই কি তোমার উচ্চশিক্ষা, এই কি তোমার সদাশয়তা? ছিঃ বিনোদ! তোমার ব্যবহারে আমি প্রাণে বড়ই বেদনা পাইয়াছি।"

বিনোদ বলিলেন,—শুনিয়াছ কি তুমি অপরাজিতা, আমি বিজলীর পিতৃহন্তার পুত্র?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"মিথ্যা কথা! তাঁহারা সে কথা বিশ্বাস করেন না।"

"তাঁহারা বিশ্বাস না করিলেও, লোকে তাহা বিশ্বাস করে, রাজ-পুরুষেরা তাহা বিশ্বাস করেন, আইন তাহা বিশ্বাস করে, ঘটনা তাহার অনুকূলে সাক্ষ্য দেয়। এ কলঙ্ক প্রক্ষালন না করিয়া আমি তাঁহার সম্মুখে কখনই যাইব না।"

তখন অপরাজিতা বলিলেন,—"তোমাকে অনেক রূঢ় কথা বলিয়াছি। তুমি বড়, আমি ছোট। তোমাকে জ্যেষ্ঠের ন্যায় সম্মান করাই কর্ত্তব্য কিন্তু অনেক সময়েই কনিষ্ঠের ন্যায় শাসন করি। এ স্বাধীনতা তুমিই দিয়াছ, বিনোদ। আমার কথায় যদি মর্ম্মপীড়া পাইয়া থাক, তাহা হইলে ছোট ভগ্নীকে ক্ষমা কর। এখন আইস। আগে জল খাও, শ্রান্তি দূর

কর। অনেক বিষয়ের অনেক কথা আছে —পরে বলিব।"

বিনোদ বিশ্রামার্থ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অপরাজিতা অন্যদিকে তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থা করিতে গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে উঠিয়াই বিনোদ পুলিশ সাহেবের কুঠিতে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া শুনিলেন, সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কুঠিতে গমন করিয়াছেন। বিনোদ মনে করিলেন, ভালই হইয়াছে। তিনিও অবিলম্বে তথায় গমন করিলেন।

শিষ্টাচারসূচক বাক্যাদি সমাপ্তির পর, পুলিশ সাহেব বলিলেন,—আপনার অনুমান যথার্থ। রামদীন যদুপতি মিত্র নহে।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"রামদীনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে কি?"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন,—"না বাবু, তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়ার বিরোধে পুলিশ ইনস্পেক্টর যুক্তিসঙ্গত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। রামদীনই যে ঐ খুন করে নাই তাহার ঠিক কি?"

বিনোদ বলিলেন,—"এ আপত্তি যে প্রমাণে টিকিবে না, তাহার সন্দেহ নাই। রামদীনের হাতে তরবারি পাওয়া গিয়াছিল, সে সেই দিনে রেলে চলিয়া গিয়াছিল, ইহাই তাহার বিরুদ্ধে সন্দেহজনক ঘটনা। কিন্তু তাহাতেই তাহার অপরাধ সপ্রমাণ হয় না।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"পুলিশ অন্য প্রমাণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবেন।"

বিনোদ বলিলেন,—"করুন। যত দিন যথেষ্ট প্রমাণ না পাওয়া যায়, তত দিন না হয় উহাকে হাজতে রাখুন। কিন্তু আমি পুনরায় সবিনয়ে বলিতেছি, রাসবিহারী নাগকে না ধরিলে এ খুনের কখনই কিনারা হইবে না, দেশেও শান্তি হইবে না।"

পুলিশ সাহেব বলিলেন,—"আমরা তাহাতে প্রস্তুত। আপনি সে সম্বন্ধে আমাদের সাহায্য করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ আছেন।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি সে মুসলমানকে সঙ্গে আনিয়াছি; তাহার অবস্থা দেখিলে আপনাদের হৃদয় ব্যথিত হইবে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"কিন্তু গোল এই যে, কেবল সেই মুসলমানের কথায় নির্ভর করিয়া একটা ধনবান্ লোককে গ্রেপ্তার করা সঙ্গত হইবে না। সে যে অন্য কারণে বা অন্য লোকের দ্বারা এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে? আপনি রাসবিহারী কৃত অত্যাচারের সময় উপস্থিত ছিলেন না। তাহার নালিশ লওয়া যাইতে পারে, রাসবিহারীর নামে সমন বাহির হইতে পারে; কিন্তু ওয়ারেণ্ট বাহির করিতে হইলে আর একটু প্রমাণ দেখা আবশ্যক। শুধু সমন দিয়া রাসবিহারীর মত লোককে কায়দা করা যাইবে না। শেষে ভাল প্রমাণ উপস্থিত করিতে না পারিলেও মোকদ্দমাও টিকিবে না। আপনি এ সম্বন্ধে কি উপায় চিন্তা করিতেছেন?"

বিনোদ বলিলেন,—"গরফু মুসলমানের ভগ্নী আছে। তাহাকে আনিতে পারিলে বোধ হয় কাজ হইতে পারে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"অন্য কোন উপলক্ষ না পাইলে, রাসবিহারীকে কায়দা করিবার

জন্য এই উপায়ই আমাদের অবলম্বন করিতে হইবে। একটা টাটকা ঘটনা হইলে বড় ভাল হয়। গরফুর ব্যাপারটা বড় পুরাতন। ধর্ম্মনাশের মোকদ্দমা, দাঙ্গাকারি-জখমের মামলা সঙ্গে সঙ্গে হইলেই খুব জোর হয়। যাহাই হউক, এটা হাতছাড়া করা হইবে না।”

পুলিশ সাহেব বলিলেন,—“আপনার মুখে শুনার পর হইতে আমরা গোয়েন্দা লাগাইয়া রাসবিহারীর সম্বন্ধে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি। সে যে ভয়ানক অত্যাচারী লোক সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এখন তাহার বিরুদ্ধে একটা নূতন কাণ্ড পাইলেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারি।”

বিনোদ বলিলেন,—“আমি কল্য এখানে আসিয়াছি; এখানে আসিয়াই সংবাদ পাইয়াছি; সে একটা চাকরকে ক্রোধের বশে এতই প্রহার করিয়াছে যে, চাকরটা মরণাপন্ন হইয়াছে। এখন আছে কি না বলা যায় না।”

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—“এ একটা বেশ মামলা। কিন্তু আইন-সঙ্গত কোন খবর আমরা পাইতেছি না। আপনারও শুনা কথা মাত্র। আপনি এ বিষয়ে অনেক পরিশ্রম করিতেছেন। প্রার্থনা করিতেছি, এজন্য আর একটু কষ্ট স্বীকার করুন। আপনি একবার আপনার দেশে যাইতে পারেন না কি?”

কেন পারিব না? এখনই পারি।”

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—“বেশ কথা। তাহা হইলে আপনি অবিলম্বে যাত্রা করুন। আপনার সহিত দুইজন পাহারাওয়ালা থাকুক। আবশ্যক হইলে তাহারা উর্দ্দি খুলিয়া দ্বারবানের ন্যায় আপনার সঙ্গে থাকিবে, অথবা প্রয়োজন হইলে তাহারা আপনার ইচ্ছানুসারে পাহারাওয়ালার বেশে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবে আপনি বোধ হয় সহজেই রাসবিহারীর এই নূতন কাণ্ডের সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। তৎক্ষণাৎ আপনি স্বয়ং আসিয়াই হউক, বা ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া লোক পাঠাইয়া হউক সংবাদ পাঠাইবেন। মামলা বুঝিয়া তখনই রাসবিহারীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরওয়ানা বাহির করা হইবে; আর হয় তো পুলিশ সাহেব স্বয়ং আবশ্যকমত লোকজন লইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে যাইবেন।”

বিনোদ বলিলেন,—“আমি তবে বিলম্ব না করিয়া এখনই যাত্রার আয়োজন করি।”

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—“একটু অপেক্ষা করুন। আমরা যেরূপ বুঝিতেছি, তাহাতে গরফুকে এখনই আমাদের নিকট আনিয়া গোল করিবার দরকার নাই। আমরা আপনার সঙ্গে তাহাকে দেখিতে যাইব।”

গাড়ি করিয়া তিনজনে গরফুর আবাস-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাহার সহিত যে যে কথাবার্ত্তা হইল তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। পুলিশসাহেবের আদেশ ক্রমে থানার দারোগা, গরফুর জবানবন্দী লিখিয়া লইয়া রাসবিহারী নাগের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা ঠিক করিলেন, এবং সেই দিন এ সম্বন্ধে “এ” ফরম পাঠাইলেন।

বিনোদ বাবু, সেই দিন আহারাদির পর শ্রীরাম, রঘু, দুইজন কনষ্টবল ও একজন দ্বারবান্ সঙ্গে লইয়া, স্বর্ণগ্রামের নিকটে পৌঁছিলেন। পাকা রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ি যায়। ঘোড়ার গাড়ি হইতে নামিয়া, প্রায় এক মাইল ঘন বন ভেদ করিয়া, এক সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া গ্রামের মধ্যে যাইতে হয়। গাড়োয়ানকে ঠিক সেই স্থানে হাজির থাকিবার আদেশ দিয়া, বিনোদ বাবু লোকজন সহ, সেই সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম

করিয়া রামজীবন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। রামজীবন তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন,—"কাজ ভাল হয় নাই বাবা। রাসবিহারী তোমার উপর বড়ই রাগিয়াছে! সে হুগলীর উকীল-মোক্তারের নিকট ও অন্যান্য উপায়ে সংবাদ পাইয়াছে যে, তুমি তাহার বিরুদ্ধে অনেক কাণ্ড করিতেছ। সে আমাকে নিজমুখে বলিয়াছে, তোমাকে কোন উপায়ে এক দিন হাতে পাইলে, সে সর্ব্বনাশ করিয়া তবে ছাড়িবে। বাবা, এখনই তুমি ফিরিয়া যাও। আর কোন সন্ধানে তোমার কাজ নাই।"

বিনোদ বলিলেন,—"আপনি আমাকে বড়ই স্নেহ করেন, এই জন্য এত ভয় পাইতেছেন। মনুষ্য-জীবন চিরস্থায়ী নহে। আজি না হয় রাসবিহারী আমাকে মারিয়া ফেলিবে। কিন্তু পলাইয়া গেলেও আর এক-দিন আমাকে মরিতে হইবে না কি? মৃত্যুর ভয়ে কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধনে বিরত হইতে কখনই পারিব না। আপনি আশীর্ব্বাদ করিবেন, তাহা হইলেই আমার মঙ্গল হইবে।"

শ্রীরাম বলিল,—"খুড়া ঠাকুর রাস-বিহারীর দিনকাল ফুরাইয়া আসিতেছে বোধ হয়। আপনি চিন্তা করিবেন না।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"যে চাকরটীকে রাসবিহারী মারিয়াছে, সে এখনও বাঁচিয়া আছে?"

রামজীবন বলিলেন,—"আছে।"

"কোথায় আছে সে?

"তাহার বাটীতে—দুর্গাপুরে। তাহাকে মর মর বুঝিয়া রাসবিহারী বাটী পাঠাইয়া দিয়াছে।"

"তাহার অবস্থা কিরূপ বুঝিয়াছেন?

"আমি স্বচক্ষে দেখি নাই। শুনিয়াছি তাহার একটা চক্ষু উঠিয়া গিয়াছে, দুইটা দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, পাঁজরার হাড়ও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

"আমরা এখনই তাহাকে দেখিতে যাইব।

"তুমিও যাইবে?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

রামজীবন বড়ই ভীত হইলেন। কিন্তু তাঁহার কথা টিকিবে না জানিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

বিনোদ আবার বলিলেন,—"আপনাকে সঙ্গে যাইতে হইবে না। চাকরটার নাম কি?"

"কেদার।'

"কি জাতি সে?"

"নাপিত।

বিনোদ তাহার পর শ্রীরামকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তুমি চিনিতে পারিবে?

শ্রীরাম বলিল,—"তাহাকে চিরদিনই জানি। সে আমাদের সমবয়স্ক।"

বিনোদ বলিলেন,—"তবে আইস সকলে।"

রামজীবন অবাক্। কিন্তু তিনি বারণ করিতে সাহস করিলেন না। বিনোদ তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া যাত্রা করিলেন। এত লোক সঙ্গে থাকিলেও, রামজীবন বিনোদকে একাকী বলিয়াই মনে করিলেন তাড়াতাড়ি একখানি চাদর কাঁধে ফেলিয়া বলিলেন,—"তোমাকে একলা যাইতে দেওয়া হইবে না। আমিও সঙ্গে যাইব।"

দুর্গাপুরে কেদার নাপিতের বাড়ীতে সকলে উপস্থিত হইলেন। পথে কোনই ব্যাঘাত বা বিপদ ঘটিল না।

কেদারের অবস্থা দেখিয়া বিনোদের বড়ই কষ্ট হইল, মোকদ্দমায় যাহা হয় হইবে,

আপাততঃ এ লোকটার চিকিৎসা হওয়া আবশ্যক বলিয়া তিনি মনে করিলেন। তাঁহার এমনও মনে হইল, অবিলম্বে রীতিমত চিকিৎসা হইলে কেদারের জীবনরক্ষা হইলেও হইতে পারে। কেদারের মা আছে, স্ত্রী আছে। বিনোদ তাহাদিগকে বলিলেন,—"তোমাদের কোন ভয় নাই। তোমরা কেদারকে সঙ্গে লইয়া হুগলী যাও। সেখানে চিকিৎসা হইলে কেদার বাঁচিবে। এখানে ডাক্তার নাই, ঔষধ নাই। আমি সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি। খরচ-পত্র যাহা লাগে দিতেছি।"

কেদারের মা বলিল,—"আমাদের যাইতে দিবে কেন?"

বিনোদ বলিলেন,—"কে যাইতে দিবে না?

"যে এই দশা করিয়াছে।"

বিনোদ বলিলেন,—"সে জন্য চিন্তা নাই। আমি সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি। শ্রীরাম শীঘ্র একখান পাল্কীর যোগাড় দেখ। যত ভাড়া লাগে ক্ষতি নাই।"

শ্রীরাম বলিল,—"আমি যাইতেছি; কিন্তু বেহারারা যাইতে চাহিবে কি না বলিতে পারি না।"

শ্রীরাম প্রস্থান করিল। বিনোদ এই অবসর কালে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা জানিয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক প্রশ্ন করিয়া, অনেক ভয় দেখাইয়াও বিশেষ কথা কিছুই তিনি জানিতে পারিলেন না। কেবল এই মাত্র বুঝিলেন যে, পরশ্ব বৈকালে রাসবিহারীর কয়েক জন লোক ধরাধরি করিয়া কেদারের মৃতকল্প দেহ তাহার বাটীতে ফেলিয়া গিয়াছে। কেন এরূপ ঘটিল জিজ্ঞাসা করিলে, লোকেরা বলিয়াছে, এক জন চাষার সহিত মারামারি করিয়া কেদারের এই দশা ঘটিয়াছে।"

বিনোদ বুঝিলেন, এ মোকদ্দমারও প্রমাণ চাহি। রাসবিহারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিবার সময় প্রমাণ সংগ্রহ না করিতে পারিলে কোনই সুবিধা হইবে না। কেদারকে নির্ব্বিঘ্নে পাঠাইয়া দিয়া তিনি সে চেষ্টা করিবেন স্থির করিলেন। কেদার এখন বেহুঁস—বাক্‌শক্তিহীন। যদি তাহার একটু সংজ্ঞা হয়, যদি সে চিকিৎসাদি হইলে কথা কহিতে পারে, তাহা হইলে প্রমাণের যোগাযোগ হওয়া অসম্ভব নহে।

শ্রীরাম পাল্কী লইয়া ফিরিল। অনেক কৌশলে তাহাকে পাল্কী যোগাড় করিতে হইয়াছে। তাহার মুখে সমস্ত অবস্থা ও বৃত্তান্ত শুনিয়া বিনোদ বড়ই পরিতুষ্ট হইলেন। অতি সাবধানে কেদারকে পাল্কীতে তুলিয়া দেওয়া হইল। তাহার স্ত্রী ও মা সঙ্গে থাকিল। একজন কনষ্টবলকে বিনোদ পোষাক পরিতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন,—"তুমি সাবধানে পাল্কীর সঙ্গে যাও। রোগীকে হাঁসপাতালে রাখিয়া পুলিশ সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিও। বলিও, বাবু এ ঘটনার এবং অন্যান্য ঘটনার প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া শীঘ্রই ফিরিবেন। কেদারের মা ও স্ত্রীকে আমার বাসা দেখাইয়া দিবে। সেখানে আমার ভগ্নী আছেন। আমার নাম করিয়া সেখানে বলিয়া পাঠাইবে যে, এই দুই স্ত্রীলোক সেখানে আহার করিবে। তাহাদের আর যে বিষয়ে যাহা দরকার হয়, তাহা বুঝিয়া আমার ভগ্নী যেন তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন। হয় তুমিই কালি ফিরিবে, না হয় সাহেবকে আর একজন কনষ্টবল পাঠাইতে বলিবে।"

পাল্কী চলিয়া গেল। পাকা রাস্তা পর্য্যন্ত সকলে পাল্কীর সঙ্গে গমন করিলেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। গরফুর ভগ্নী থাকে, নগরঘাট নামক ক্ষুদ্র গ্রামে—এখান হইতে ছয় ক্রোশ দূর। সুতরাং আজি রাত্রিতে কোন কার্য্য হইবে না ভাবিয়া, বিনোদ ও দলবল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে শ্রীরাম নগরঘাটে যাত্রা করিল। গরফুর ভগ্নীর সন্ধান করা, তাহাকে সম্পূর্ণ অভয় দিয়া মোকদ্দমা করিতে ও সাক্ষী দিতে অনুরোধ করা, এ সম্বন্ধে আর যে যে প্রমাণাদি পাওয়া যাইতে পারে তাহার তদ্বির করা ইত্যাদি অনেক গুরুভার লইয়া শ্রীরাম গমন করিল। যত শীঘ্র সম্ভব ফিরিয়া আসিবার ব্যবস্থা থাকিল।

রামজীবন প্রাতে উঠিয়া রাসবিহারী নাগের গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। সে নরাধম কি করিতেছে, বিনোদ আসিয়াছেন, ইহা সে জানিতে পারিয়াছে কি না, এবং জানিয়াই বা বিনোদকে শাস্তি দিবার জন্ম সে কি উপায় স্থির করিতেছে, এই সকল বিষয়ে যতদূর সম্ভব সংবাদ সংগ্রহ করাই তাঁহার গমনের উদ্দেশ্য। বেলা অনুমান এক প্রহরের সময় তিনি হৃষ্টচিত্তে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"বড় সুসংবাদ, রাসবিহারী কঠিন জ্বরে পড়িয়াছে, তিন দিন হইতে অজ্ঞান হইয়াছে!"

বিনোদ বলিলেন,—জীবনের কোন আশঙ্কা নাই তো?"

রামজীবন বলিলেন,—"বলা যায় না। যে ডাক্তার দেখিতেছে সে বলে, বেশী জোরে জ্বর হইয়াছে মাত্র, অন্য কোন দোষ ঘটে নাই।"

বিনোদ বলিলেন,—"তবু ভাল। সে বাঁচিয়া না থাকিলে আমার অনুসন্ধান বৃথা হইবে খুড়া। তাহাকে ধরিয়া কায়দা করিতে পারিলেই আমার অভীষ্ট সিদ্ধির আশা আছে। সে মরিয়া গেলে আমার সকল আশাই ফুরাইবে।

রামজীবন বলিলেন,—"তোমার ও সকল কথা আমি ভাল বুঝিতে পারি না। আমি এইমাত্র বুঝিতেছি যে, সে এরূপ অচেতন ভাবে শয্যায় পড়িয়া থাকিলে তোমার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।"

স্নানাহার সমাপ্ত করিয়া বৈকালে বিনোদ, রঘু রামজীবন ও কনষ্টবল দুর্গাপুর গমন করিলেন। সেই পুষ্করিণীর ধার দিয়াই তাঁহাদের যাইতে হইল। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিনোদ আবার সেই পুষ্করিণীর চারিদিক ভাল করিয়া দেখিলেন। প্রাকৃতিক দৃশ্য সমানই রহিয়াছে। অতীতের স্মৃতি জাগরূক করিবার কোন চিহ্নই সেখানে নাই। আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, পুষ্করিণী পশ্চাতে রাখিয়া, বিনোদ অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

দুর্গাপুর প্রান্তভাগে সুন্দরী জেলেনীর বাস। তাহার গৃহ-সন্নিধানে গমন করিয়া, সে কোথায় আছে জানিবার নিমিত্ত, বিনোদ খুড়া ঠাকুরকে অনুরোধ করিলেন। জেলেনী আপনার ঘরে বসিয়া পাতার জাল দিয়া ভাত রাঁধিতেছিল? রামজীবন আসিয়া এইরূপ বলিলেন, বিনোদ

একাকী তাহার সঙ্গে দেখা করিতে গমন করিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভৃতি সকলেই বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বিনোদ নিকটস্থ হইয়াই জিজ্ঞাসিলেন,—"মাসী ভাল আছ? আমাকে বুঝি আর চিনিতে পার না? তা পারিবে কেন? অনেক দিন দেখ নাই। আমি কিন্তু তোমাদের ভুলি নাই।"

জেলেনী অবাক্। সে অতি ইতর জাতীয়া। কোন ভদ্রলোকই তাহার সহিত 'ওরে,' 'হাঁরে' না করিয়া কথা কহে না। অত্র এক মনোহর রূপরাশিসম্পন্ন ভদ্রবেশযুক্ত নবীন যুবক তাহার বাটীতে কেবল পদার্পণ করিয়াই যে তাহাকে চরিতার্থ করিয়াছেন তাহা নহে, আবার অতি মিষ্টভাবে তাহাকে 'মাসী' বলিয়া আদরের কথা কহিতেছেন। সে বলিল,—"তা—তা বাবা—তা আমি কি তোমার মত লোককে চিনিতে পারি?"

বিনোদ বলিলেন,—"তোমার দোষ নাই। অনেক দিন, আমাকে তোমরা দেখ নাই। আমি যদুপতি মিত্র মহাশয়ের ছেলে।"

বৃদ্ধা উনানের নিকট হইতে উঠিয়া আসিল এবং উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—"তাই বটে। সেই খোকা বাবুই বটে। তা বাবু, তুমি এখানে এসেছ কেন? এখানে তোমাদের শত্রু অনেক। যেখানে ছিলে সেখানেই কেন থাকিলে না?"

বিনোদ বলিলেন,—"শত্রু আমার আর কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আমি তাহাকে এবার শাসন করিয়া দিব। তুমি শুন নাই, আমি কেদার নাপিতকে পাল্কী করিয়া হুগলী পাঠাইয়া দিয়াছি। কেহ আমার কিছু করিতে পারিয়াছে কি? তোমা-শুনা লোকদের সঙ্গে একবার দেখা করিব বলিয়া এবেলা আবার আসিয়াছি।" বিনোদ পকেট হইতে দুইটা টাকা বাহির করিয়া বলিলেন,—মাসী এই দুইটা টাকা লও, এক যোড়া কাপড় কিনিয়া পরিও। আমি এখন অন্যান্য দিকে চলিলাম। তুমি কালি প্রাতে আমার সহিত চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বাটীতে গিয়া দেখা করিও।

সেস্থান হইতে কিঞ্চিদ্দূরে অগ্রসর হওয়ার পর, একটা স্থানে বড়ই কোন্দল-কোলাহল শুনিতে পাইয়া, বিনোদ সেই দিকে চলিলেন। দেখিলেন, একটা লোককে প্রহার করিবার জন্য বাঁশ লইয়া, আর দুইটা লোক বড়ই আস্ফালন করিতেছে। বিনোদ সেই স্থানের নিকটস্থ হইয়া শুনিতে পাইলেন একজন বলিতেছে, নাগ বাবু কি না, মারিলেই হইল। বিনোদ বুঝিলেন, নাগ রাজ-শাসনের মস্তকে পদাঘাত করিয়া কি অরাজকেরই উদ্ভব করিয়াছে।

বিনোদকে পূর্ব্বে অনেকেই দেখিয়াছে। যে ব্যক্তি অনায়াসে রাসবিহারীর বিরোধী হইয়া সর্ব্বসম্মুখে কার্য্য করিতে পারে, সে কখন সাধারণ লোক নহে। বিশেষ যখন তাঁহার সঙ্গের একটা ভোজপুরী দ্বারবান্ হঠাৎ কনেষ্টবল হইয়া পড়িল, তখন অনেকেই তাঁহাকে নাগের গড়ুর বলিয়া মনে করিয়াছে। বিনোদ নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"তোমরা ঝগড়া করিতেছ কেন?

যে লোকটা একলা এক পক্ষ সে বলিল,—"দেখ দেখি মহাশয়, আমাকে গরিব পাইয়া ইহারা মারে। এ দেশে গরিবকে মারিলে কোন সাজা হয় না, তাই সবাই গরিবকে শুধু শুধু মারিতে আইসে।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"কে তোমাকে মারিতে আসিয়াছে? কেন তোমাকে মারিতে চাহে?"

সে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই, অপর দুই ব্যক্তি অগ্রসর হইল এবং তাহার একজন বলিল, "দেখ দেখি বাবু, এক বৎসর হইল বেটার কাছে একটা টাকা পাইব। চাহিলেই বেটা গালি দিয়া উঠে।"

বিনোদ প্রথম ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমার নিকট টাকা পাইবে?

সে উত্তর দিল,—"পাবে বই কি? তা তো আমি না বলছি না। তবে দু বৎসর অজন্মা—চালে খড় নাই—ছেলে পিলে নিয়ে উপোস করে আছি। দিই কোথা থেকে? ওরা বলে 'এখনই দে। তাই বিবাদ আর কি?"

বিনোদ পকেট হইতে দুইটী টাকা বাহির করিয়া বলিলেন,—"এই টাকাটী ওদের দিয়া, বাটী চলিয়া যাইবার সময় একটী টাকায় ধান কিনিয়া লইয়া যাও।"

সে লোকটা অবাক্! বিনোদ তাহার ধন্যবাদ বা আশীর্ব্বাদ শুনিবার নিমিত্ত সেস্থানে অপেক্ষা করিলেন না। কিয়দ্দূর অগ্রসর হওয়ার পর, চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"নিধে চাঁড়ালের ঘর কোথায় ছিল?"

তাঁহাদের পশ্চাতে অনেক লোক আসিতে ছিল। একজন বলিষ্ঠ ও অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া বলিল,—"আজ্ঞা সে তো অনেকদিন এ গ্রামে নাই।"

বিনোদ বলিলেন,—"তাহা আমি জানি। সে কোথায় আছে সন্ধান করাই আমার প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যেই আমি ঘুরিতেছি।"

লোক বলিল,—"সে সন্ধান পাওয়া সুকঠিন। কত লোকে কত অনুমান করে। আমরা গরিব, তাহার কোন কথাই বলিতে পারি না। আপনি সন্ধান করিলে লোকের অনুমান গুলিও কতক জানিতে পারিবেন হয় তো।"

বিনোদ বলিলেন,—"তোমার নাম কি?

লোক উত্তর দিল—"নিবারণ।"

"তুমি কি কাজ কর?"

নিবারণ বলিল,—"এক-আধ কুড়ো চাষ করি।"

"তোমরা কি জাতি?"

"আজ্ঞা গোয়ালা?"

"তুমি আমার সহিত আজি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে দেখা করিও। দেখিতেছি তুমি বেশ বুদ্ধিমান লোক। তোমার যাহাতে ভাল হয় আমি তাহার উপায় করিব।

নিধে চাঁড়ালের ভিটা পড়িয়া আছে। ঘরখানি কাল-সহকারে কোথায় গিয়াছে তাহার চিহ্নও নাই। স্থানটী দেখিয়া বিনোদ মনে করিলেন, পরমাসুন্দরী পত্নী লইয়া নিধে এই স্থানে সুখের ঘর-কন্না পাতিয়াছিল। কত আশা, কত আনন্দ তাহার হৃদয়কে এই স্থানে নাচাইত ও মাতাইত। নরাধমের পাপ-প্রবৃত্তি সকলই ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। নিধে এখন কোথায়?

সে স্থান হইতে দুই একটা উপস্থিত মত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া, বিনোদ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অনেক লোক তাঁহার সঙ্গে ও পশ্চাতে চলিতেছিল। নিবারণও সঙ্গে ছিল।

বিনোদ দুর্গাপুরে অসাধারণ শক্তি-শালী, দেবতুল্য ব্যক্তিরূপে পরিচিত হইয়া পড়িলেন। এক তো তিনি বিশেষ ধনবানের সন্তান, কোম্পানির লোক তাঁহার সঙ্গে ফিরে, তাঁহার কথা সকলেই শুনে, তিনি দানে কল্প-তরু, বুদ্ধি-বিদ্যায় বৃহস্পতি, রূপে কার্ত্তিক,

তাহার পর সকলের উপর তাঁহার ক্ষমতা,—তাঁহার এতই ক্ষমতা যে, তিনি এ হেন রাসবিহারীকে গ্রাহ্যও করে না! তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত দুর্গাপুরের নর-নারী ব্যাকুল।

স্বর্ণগ্রামে রামজীবনের বাটীর নিকট আসিলেও, অনেক লোক তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছে দেখিয়া, বিনোদ বলিলেন,—"ভাই সব, আজি তোমরা যাও। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। কালি আমি আবার তোমাদের গ্রামে যাইব। নিবারণ, তুমি একটু থাক। তোমার সহিত দুই একটা কথা আছে।"

ক্ষুণ্ণমনে লোকগুলি ফিরিয়া গেল। বিনোদ ও আর সকলে চণ্ডীমণ্ডপে উপবেশন করিলেন। নিবারণকে লক্ষ্য করিয়া বিনোদ বলিলেন,—"এখানে অন্য কোন লোক নাই; তুমি নির্ভয়ে কথা কহিতে পার। নিধে চাঁড়ালের সন্ধান জানা আমার বিশেষ আবশ্যক। যে আমাকে সে সন্ধান দিতে পারিবে সে আমার নিকট যাহা চাহিবে, আমি তাহাকে তাহাই দিব।"

নিবারণ বলিল,—"সন্ধান কেহই কিছু জানে বলিয়া বোধ হয় না। লোকটা হয় তো মরিয়া গিয়াছে।"

বিনোদ বলিলেন,—"অসম্ভব নহে। কিন্তু কোথায় গিয়া কিরূপে মরিল, তাহার কিছুই জানা যাইতেছে না।"

নিবারণ বলিল,—"সন্দেহ অনেক হইতে পারে; কিন্তু সে সব কথা বলিয়া কোন ফল নাই।"

বিনোদ বলিলেন,—"তোমার যাহা যাহা মনে হয় বল না কেন?"

নিবারণ বলিল,—"বাবু কি কি মনে করিয়াছেন, কিরূপ সন্ধান করিয়াছেন বলুন আগে; তাহা শুনিয়া আমার কোন বলিবার কথা আছে কি না বুঝিতে পারিব।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি জানি, রাসবিহারী তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে লাস গেল কোথা? ভয়ে ভয়ে নিধে যদি এদেশ ছাড়িয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলেই বা সে গেল কোথা? হুগলীতে সে নাই, কলিকাতাতেও নাই, নিকটের আর কোন স্থানেও নাই। তাহার স্ত্রীকে সে খুব ভাল বাসিত। নিরুদ্দেশ হইবার আগের দিন, তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে দেশ ছাড়িয়া পলাইবার পরামর্শ করিয়াছিল। তাহার স্ত্রী এখন হুগলীতে আছে। নিধে সে স্ত্রীর কোন খোঁজ লয় না কেন? যদি সে কোথায় গিয় মরিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার স্ত্রী সে সংবাদ জানিতে পারিত, আমিও যেরূপে হউক তাহা জানিতে পারিতাম। আমি অনেক প্রকার বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি; নিধের ব্যাপার বড়ই গোলের কথা।"

নিবারণ বলিল—"বাবু অনেক রকম ভাবিয়াছেন, অনেক খোঁজ করিয়াছেন। কিন্তু একটা কথা বাবুর মনে উদয় হয় নাই। মনে করুন, কেহ কি তাহাকে লুকাইয়া রাখিতে পারে না?—গুমি করা আশ্চর্য্য কথা নয় তো।"

বিনোদের চমক ভাঙ্গিল। এ একটা অতি সুসঙ্গত অনুমান; ইহা তাঁহার একবারও মনে হয় নাই! তিনি এই অনুমানের জন্য মনে মনে নিবারণের নিকট কৃতজ্ঞ হইলেন। বলিলেন,—"তোমার একথা ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে। আমি এ বিষয়েরও বিশেষ সন্ধান করিব। আজি রাত্রি হইয়া পড়িল তুমি আজি যাও কালি আমার সহিত দেখা করিও। কোন বিষয়ের ভয় নাই। যে বিষয়ে

যে দরকার হইবে, তাহা আমাকে জানাইবে। সাধ্যমত উপকার করিতে কখনই আমি কুণ্ঠিত হইব না।”

নিবারণ প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। আহারাদির পর নিদ্রায় রাত্রি কাটিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে বেলা অনুমান সাড়ে আটটার সময়, রামজীবন চক্রবর্ত্তীর বাটীর অভ্যন্তরে, প্রাঙ্গণ-পার্শ্বে বিনোদ ও সুন্দরী জেলেনী কথোপকথন করিতেছেন। জেলেনী বলিতেছে,—“মিথ্যা কথা বাবু, আগাগোড়া মিথ্যা কথা। তোমার বাপ কখনও কোন মেয়ে মানুষের মুখ পানে চাহিয়া দেখিতেন না। তাঁহার অপযশ ইহার আগে আর কখনও কেহ শুনে নাই। তিনি গরীব-দুঃখী সকলের মা বাপ ছিলেন। এমন অন্যায় কাজ তাঁহাকে দিয়া কখনই হইতে পারে না।”

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—“তবে তুমি পুলিশের কাছে এমন সাক্ষ্য কেন দিয়াছিলে?”

সুন্দরী বলিল—“ভয়ে, টাকারও লোভে। পুলিশ আমাকে দশ টাকা দিয়াছিল, আর বলিয়াছিল যদি তুই একথা না বলিস্, তাহা হইলে তোর সর্ব্বনাশ করিব। আমরা ছোটলোক; একটা মিথ্যা কথা কহিয়া দায় কাটাইতে পারিলে বড় অন্যায় বলিয়া মনে করি না।”

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—“নিধে চাঁড়ালের বিষয় তোমার মনে কি বোধ হয়?”

সুন্দরী বলিল,—“তা আমি বলিতে পারি না বাপু। নিধে যে হঠাৎ কোথায় গেল, আজ পর্য্যন্ত কেহই তাহার সন্ধান পাইল না। একথাটা খুব আশ্চর্য্য বটে।”

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—“তোমার কি মনে হয়, নিধে মরিয়া গিয়াছে?”

“না।”

তবে কি সে কোন দেশান্তরে বাস করিতেছে?”

সুন্দরী বলিল,—“তাহাও আমার মনে হয় না।”

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—“সে মরিয়া যায় নাই, এদেশেও নাই, অন্য স্থানেও নাই; তবে তাহার কি হইল?”

সুন্দরী বলিল,—সে কথা বাবু বলিতে পারি না। যাহা মনে আইসে তাহা মুখে বলিতেও ভয় হয়।”

বিনোদ বলিলেন,—“ভয়ের কথা আর তো কিছু নাই। রাসবিহারীর বিষ-দাঁত শীঘ্রই ভাঙ্গিবে। আমার এমন বিশ্বাস আছে, আমি সকলকে তাহার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিব। তবে তোমার মনে যাহা আসিতেছে, তাহা না বলিতেছ কেন?”

কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া, সুন্দরী বলিল,—আমার বোধ হয়, ইহার মধ্যেও রাসবিহারীর কারসাজী আছে। সে হয় তো নিধেকে লুকাইয়া রাখিয়াছে।”

বিনোদ চিন্তিত হইলেন। কল্য নিবারণ ঘোষ এই ভাবের কথা বলিয়াছে, আজি সুন্দরী জেলেনীও আবার সেই কথার পুনরুক্তি করিতেছে। এরূপ আশঙ্কা পূর্ব্বে আর কখন তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। তিনি বুঝিয়া দেখিলেন, যে ব্যক্তি এত গর্হিতাচণে সমর্থ, সে যে একটা মনুষ্যকে কিছু দিন লুকাইয়া

রাখিতে না পারিবে এমন নহে। জিজ্ঞাসিলেন,—"লুকাইয়া রাখিয়াছে? দশ বৎসর একটা মানুষকে লুকাইয়া রাখা যায় কি?"

সুন্দরী উত্তর দিল,—"কেন রাখা যাইবে না? উঁহার কত কাছারী আছে, কত জায়গায় কত বাড়ী আছে। ইচ্ছা করিলে যেখানে সেখানে একটা মানুষকে লুকাইয়া রাখ্‌বে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ও না পারে এমন কাজই নাই।"

বিনোদ বলিলেন,—"তোমার কথায় আমার অনেক উপকার হইয়াছে। এখন তুমি যাইতে পার। যখন যে বিষয়ে সাহায্যের প্রয়োজন হইবে, আমাকে তাহা জানাইও। প্রয়োজন হইলে আবার তোমাকে খবর দিব। তোমার কোন ভয় নাই। রাসবিহারী যাহাতে তোমার উপর অত্যাচার করিতে না পারে,তাহার ব্যবস্থা আমি করিব।"

জেলেনী প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল,—"তুমি চিরজীবী হও। কর্ত্তার মত তোমার খোসনাম হউক।"

বিনোদ উদ্বিগ্ন ভাবে বাহিরে আসিলেন। তথায় চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও নিবারণ ঘোষ ব্যতীত আর কেহই নাই। বিনোদ আসিয়াই জিজ্ঞাসিলেন,—"রাসবিহারী ইহার পূর্ব্বে আর কখনও কোন মানুষকে গুমি করিয়া রাখিয়াছিল, এমন কোন কথা আপনারা কখন শুনিয়াছেন কি?"

রামজীবন বলিলেন,—"বহুকাল পূর্ব্বে একবার এরূপ একটা কথার গুজব উঠিয়াছিল। সুন্দরবনের একটা প্রজার জমা রাসবিহারী জোর করিয়া কাড়িয়া লইতে চাহে। প্রজা তাহাতে ঘোরতর আপত্তি করে; মামলা-মোকদ্দমা করিয়াও রাসবিহারীকে অনেক কষ্ট দেয়। একদিন তাহাকে একাকী পাইয়া রাসবিহারীর লোকেরা ধরিয়া ফেলে এবং সদরে চালান দেয়। সে লোকটা তাহার পর আর দেশে ফিরিয়া যায় নাই। তাহার কি হইল, সে কোথায় গেল, এ সকল সংবাদ কেহই জানে না। রাসবিহারী তাহাকে গুমি করিয়াও রাখিতে পারে, মারিয়া ফেলিতেও পারে। কি হইয়াছে ঠিক জানা যায় না।

নিবারণ বলিল,—"নিধে চাঁড়ালের হঠাৎ নিরুদ্দেশ দেখিয়া বড়ই সন্দেহ হয়। আমার তো মনে হয় রাসবিহারী তাহাকে গুমি করিয়াছে।"

বিনোদ বলিলেন,—আমাকে আজি হুগলী যাইতে হইবে। বোধ হয় কালিই আবার আসিব। এখানে যাহা যাহা জানিয়াছি ও বুঝিয়াছি, ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেবের সহিত তাহার পরামর্শ করা আবশ্যক হইতেছে। নিবারণ, তোমার ঘরে এবার ধানটান মজুত আছে কি?"

নিবারণ বলিল,—"আজ্ঞা না। গত দুই বৎসর অজন্মা হওয়ায়, নিত্য খোরাকের ধান পাওয়াই ভার হইয়াছে; ঘরে মজুত কোথা হইতে থাকিবে?"

বিনোদ, পকেট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া, নিবারণের হস্তে প্রদান করিলেন এবং বলিলেন,—"ছেলে পিলে যেন খাবার কষ্ট না পায়। আমার টাকা নিজের বলিয়া জানিবে। আর যখন যে বিষয়ে সাহায্য পাইলে উপকার হইবে মনে করিবে, তাহা আমাকে বলিতে কুণ্ঠিত হইবে না।"

নিবারণ ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়া প্রণাম করিল।

রামজীবন বলিলেন,—"হুগলী পর্য্যন্ত

আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। পথে তোমাকে একা যাইতে দিতে আমার বড় ভয় হয়।"

বিনোদ বলিলেন,—"আপনি সঙ্গে যাইলে আমি চরিতার্থ হইব। কিন্তু যে আশঙ্কা আপনি করিতেছেন তাহা অমূলক।"

এই সময়ে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর শ্রীরাম আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল—"সব ঠিক হইয়াছে। গরফুর ভগ্নী মতিয়ার সহিত দেখা হইয়াছে। সে সর্ব্বপ্রকারে আমাদের মতানুসারে চলিতে সম্মত আছে। গরফুর ভগ্নীপতিও এ বিষয়ের অনেক কথা জানে; সেও এ বিষয়ে উদ্যোগী আছে। আর এই ঘটনার একজন মাতব্বর সাক্ষী পাওয়া গিয়াছে; গরফু ও তাহার ভগ্নীর উপর অত্যাচারের সকল কথাই সে জানে। সে রাসবিহারীকে ডরায় না। আবশ্যক হইলে সে সকল কথা আদালতে বলিতে প্রস্তুত আছে।"

বিনোদ বলিলেন,—'বেশ কথা; তোমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। এক্ষণে হুগলী যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও।"

স্নানাহার সমাপ্তির পর বিনোদ, রামজীবন, শ্রীরাম, রঘু ও কনষ্টবল, বন্য-পথ অতিক্রম করিয়া, পাকা রাস্তায় গাড়ীতে উঠিলেন এবং বৈকালে হুগলীতে পৌছিলেন। পথে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন ব্যাপারই ঘটিল না।

বিনোদের উপদেশ ও অভিপ্রায় সমস্ত বুঝিয়া লইয়া, কনষ্টবল থানায় চলিয়া গেল। আর সকলকে সঙ্গে লইয়া বিনোদ আপনার বাসায় গমন করিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়, শ্রীরামের সহিত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া, খানসামাকে তামাক সাজিতে আদেশ করিলেন। বিনোদ পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

—*—

বিনোদ আসিয়াছেন বুঝিতে পারিয়াই, অপরাজিতা নিতান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে, সিঁড়ির উপরে তাঁহার প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার মুখ ভার, মন যেন বড়ই অপ্রসন্ন। বিনোদ ব্যস্ততা সহকারে তাঁহার নিকটস্থ হইলেন এবং শীঘ্র তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন,—"দেখ আপ! আমার তো কোনই বিপদ হয় নাই। তুমি অকারণ আমার বিপদের কল্পনা করিয়া কেবলই ভাবিতেছ—কতই কষ্ট পাইতেছ।"

অপরাজিতা নিরুত্তর। বিনোদ চিন্তাকুল ভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"একি অপি, কোন কথা কহিতেছ না কেন? কোথা হইতে কোন মন্দ সংবাদ আসিয়াছে কি?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"না।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"আমার জন্য চিন্তায় তুমি কাতর হইয়াছ কি?"

অপরাজিতা আবার মৃদুস্বরে বলিলেন, "না।"

বিনোদ বলিলেন,—"তবে কি? আমার কোন ব্যবহারে তুমি মনে কষ্ট পাইয়াছ কি?"

অপরাজিতা দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"হাঁ।"

বিনোদ বলিলেন,—"তাহা হইলে হয় আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, না হয় তুমি পাগল হইয়াছ। আমি জ্ঞানতঃ, তোমার মনে বেদনা জন্মিতে পারে এমন কোন কার্য্য যদি করিয়া থাকি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, নিশ্চয়ই আমার বুদ্ধি বিচলিত হইয়াছে। আর আমার কোন কার্য্যে যদি তুমি মনে ব্যথা

পাইয়া থাক, তাহা হইলে স্থির করিতে হইবে, তুমি আপনার বিচার-শক্তি হারাইয়াছ।”

অপরাজিতা বলিলেন,—“ইহার কোনটাই সত্য কথা নহে।”

বিনোদ বলিলেন,—“তবে কি? বল দিদি, বল আর কি হইয়াছে? আমি তোমার ছোট ছোট কথা, একটু একটু জবাব শুনিয়া বড়ই কাতর হইতেছি।”

অপরাজিতা বলিলেন,—“আমি এখনই বিজলীর পত্র পাইয়াছি।”

বিনোদ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসিলেন,—“তিনি ভাল আছেন?

অপরাজিতা বলিলেন,—“এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে বোধ হয় তোমার অধিকার নাই। সে পত্র পাঠ করিলে দুঃখিনী, মর্ম্মপীড়িতা বালিকার সে হৃদয়ভেদী রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিলে, বোধ হয় পাষাণও গলিয়া যায়! বিনোদ, ভাই, একবার দূর হইতে তাঁহাকে দেখা দিয়া আসিলে, না হয় স্বহস্তে একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহার সংবাদ মাত্র লইলে, সরলা বালিকার এ হৃদয়-জ্বালা নিবারিত হইত। আমি বিজলীর সেই পত্র পড়িয়া এখনই কাঁদিতেছিলাম। স্থির করিয়াছিলাম, তোমার সহিত তুমুল কলহ করিব; কিন্তু সে সঙ্কল্প অসম্ভব। তুমি বিপদের ক্ষেত্র হইতে নির্ব্বিঘ্ন ফিরিয়া আসিয়াছ দেখিয়া, সকলই ভুলিয়া গিয়াছি। তাই এত অল্প বিবাদে তুমি অব্যাহতি পাইলে।”

বিনোদ গম্ভীর ও ব্যথিত স্বরে বলিলেন,—“তুমি বুঝিতেছ না দিদি, আমার প্রাণের মধ্যে কি যুদ্ধ চলিতেছে। এক দিকে বিজলীর প্রতি অপরিসীম ভালবাসা, অন্য দিকে তাঁহার পিতৃশোণিতে আমার সর্ব্বাঙ্গীন প্রলেপ। এইরূপ অবস্থায় তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিতে বা তাঁহার জন্য উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করিতে স্বভাবতঃ ঘৃণা হয়, লজ্জা হয়। এক দিকে পিতার কলঙ্ক মোচনরূপ গুরু কর্ত্তব্যের ভার আমার স্কন্ধে, অন্য দিকে অহর্নিশ বিজলীর জন্য চিন্তা। তুমি বুঝিতেছ না দিদি, আমার হৃদয়ে কি আগুন জ্বলিতেছে। তুমি এক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছ, ইহা আমার সৌভাগ্য। তুমি নিশ্চয়ই কল্য বিজলীর পত্রের উত্তর লিখিবে। আমার এ হৃদয়ের ভাব যেরূপে পার, ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। কিয়ৎ-কালের অদর্শনে বা অনাদরে তিনি আপাততঃ কষ্ট অনুভব করিতেছেন সত্য; কিন্তু কে বলিতে পারে যে, তাঁহার এই কষ্ট চিরস্থায়ী হইবে না। পিতার কলঙ্ক বিমোচিত না হইলে, তাঁহার সহিত ইহ জীবনে আমার আর সাক্ষাৎ হইবে না।”

অপরাজিতা বলিলেন,—“তোমার এ সকল কথার বিশেষ কোন অর্থ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না; কিন্তু সে তর্ক এখন আর করিব না। তোমার সহিত আর কে কে এখানে আসিয়াছেন?”

বিনোদ বলিলেন,—“চক্রবর্ত্তী খুড়া, আর শ্রীরাম আসিয়াছেন।”

অপরাজিতা বলিলেন,—“তাঁহাদের জন্য আপাততঃ জলখাবার পাঠাইতে হইবে কি? তাঁহারা বৈঠকখানায় বিশ্রাম করিতেছেন তো?”

বিনোদ বলিলেন,—“হাঁ। তাঁহাদের জন্য সকল সুব্যবস্থা আমি করিয়া আসিয়াছি।”

অপরাজিতা বলিলেন,—“যে উদ্দেশ্যে এই শ্রম তাহার কি হইল বল।”

বিনোদ কোন উত্তর না দিয়া, সম্মুখস্থ দ্বারের অপর পার্শ্বস্থিত বারান্দায় গমন করিলেন। অপরাজিতা তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হই-

লেন। তথায় একখানি কাষ্ঠাসন পড়িয়াছিল। বিনোদ, তাহার উপর বসিয়া, একে একে সমস্ত বৃত্তান্ত অপরাজিতার গোচর করিলেন। সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া, অপরাজিতার মুখ বড়ই চিন্তাকুল হইল। তিনি কোন কথা কহিলেন না। তাঁহাকে নির্ব্বাক্ ও চিন্তাযুক্ত দেখিয়া বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"আবার তোমার কথা বন্ধ হইল কেন? আবার তুমি কি ভাবিতেছ অপি?"

অপরাজিতা অন্যমনস্কভাবে বলিলেন,—"বিশেষ কিছু না?

বিনোদ বলিলেন,—"কেন অপি! আজি বার বার তোমার ভাবান্তর দেখিতেছি? আমার কোন্ ব্যবহার আবার তোমাকে বিচলিত করিল? কেন দিদি, আবার তোমার এ চিন্তাকুল ভাব দেখিতেছি?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"তুমি দুঃখিত হইও না। আমার ভাবান্তর কিছুই হয় নাই চিন্তা কতকটা হইয়াছে বটে। তোমা কোন ব্যবহার তাহার কারণ নহে; যে সক ঘটনা শুনিতেছি, তাহাই তাহার কারণ?"

বিনোদ বলিলেন,—"যাহা শুনিয়াছ তাহাতে চিন্তার কারণ বিশেষ কিছুই নাই তো।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"আছে—বিশেষ চিন্তার কারণ ঘটিয়াছে। এই বারই তোমার বিশেষ বিপদ ঘটিত; আমি সে সংবাদের নিমিত্ত নিয়ত প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু রাসবিহারীর কঠিন জ্বর এবার আমাদের সহায় হইয়াছে। জ্বর বোধ হয় শীঘ্রই সারিয়া যাইবে, এবার যে সকল কার্য্য তুমি করিয়া আসিয়াছ, আর যাহা যাহা করিবে স্থির করিয়াছ তাহাতে তোমাকে নিশ্চয়ই গুরুতর বিপদে পড়িতে হইবে। কিন্তু যাহা হইবে, তাহার অন্যথা ঘটাইতে বোধ হয় আমাদের সাধ্য নাই। সুতরাং তাহার জন্য প্রস্তুত থাকাই আমাদের কর্ত্তব্য।"

বিনোদও একটু চিন্তিত ভাবে বলিলেন, —"অসম্ভব নহে। তোমার আশঙ্কা এবার ঘটিলেও ঘটিতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া তুমি কি আমাকে এই মহৎ কার্য্য পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দেও?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"কখন না। সামান্য বিপদই হউক, অসামান্য বিপদই হউক, চরণে কুশাঙ্কুর মাত্র বিদ্ধ হওয়ার পর অব্যাহতি লাভ ঘটুক, অথবা অশেষ আশা ও উৎসাহপূর্ণ এই নবীন জীবন বিনষ্টই বা হউক, যে ব্রত তুমি গ্রহণ করিয়াছ, তাহার পরিসমাপ্তি করিতে তুমি বাধ্য। সে পবিত্র, পুণ্যময় সৎকার্য্য সাধনে পরাঙ্মুখ হইলে, আমিই তোমাকে কুলাঙ্গার ও বর্ব্বর বোধে ঘৃণা করিব। বিপদের ভয়ে এই পবিত্র ব্রত-পালনে পরাঙ্মুখ হইলে আমাদের অগৌরবের সীমা থাকিবে না। তবে ভাই, একটা কথা আমি তোমাকে অনুরোধ করি? তুমি অকারণ বিপদের অন্বেষণ করিও না; স্বকার্য্য সাধন করিতে যত বিপদ অপরিহার্য্য তাহা ঘাড় পাতিয়া গ্রহণ করিবে; কিন্তু পরিহার্য্য বিপদের নিকটেও যাইবে না। তোমাকে আমার নিকট এই কথার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি কখনই তোমার এই সদুপদেশ লঙ্ঘন করিব না। যাহাতে অনর্থক বিপদের সম্ভাবনা আছে বুঝিব, সেরূপ কোন কার্য্যই আমি করিব না। অথচ বিপদের ভয়ে কোন আবশ্যক কার্য্য সম্পাদনে আমি পশ্চাৎপদ হইব না। সে কথা যাউক। আমরা নিতান্ত স্বার্থপরের

ন্যায়, অনেকক্ষণ আপনাদের কথাই কহিতেছি, নিজের ভাবনাই ভাবিতেছি। কেদারের সংবাদ কিছু জান কি?”

অপরাজিতা বলিলেন,—“আজি কেদারের অবস্থা খুব খারাপ গিয়াছে। তাহার মা ও স্ত্রী এখানে খাইতে আসিবে কথা ছিল; কিন্তু কেদারকে ফেলিয়া আসিতে পারে নাই। আমি লোক দিয়া খাবার হাঁসপাতালে পাঠাইয়াছি। এ বেলাও তাহার খবর লইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলাম। শুনিতেছি, এবেলা সে একটু ভাল আছে। তুমি দেখিয়াছ, এ গরিব বাঁচিবে বলিয়া তোমার আশা হয় কি?”

বিনোদ বলিলেন,—“অবস্থা খুব খারাপ। এ অবস্থায় কি ঘটিবে, তাহা বলা যায় না,আমি কালি প্রাতে তাহাকে দেখিয়া আসিব।”

তাহার পর চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও শ্রীরামের সহিত মিলিত হইবার অভিপ্রায়ে বিনোদ নীচে নামিয়া আসিলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিনোদ বাবু পরদিন প্রাতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠিতে গমন করিলেন। সাহেব তখন প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া কাজে বসিয়াছেন। বিনোদের কার্ড প্রাপ্তিমাত্র সাহেব তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শিষ্টাচারাদি সমাপ্তির পর, বিনোদ আসন গ্রহণ করিলে, সাহেব বলিলেন,—“গরফু ও কেদার নাপিত উভয়েরই মোকদ্দমা অতি সঙ্গিন। এই দুই জনের প্রত্যেকটীর জন্যই ওয়ারেণ্ট দেওয়া যাইতে পারে। আমি কল্য কেদারের মুমূর্ষোক্তি লিখিয়া লইয়াছি।”

বিনোদ সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন,—“কেদার কি মারা গিয়াছে?”

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—“ডাক্তার সাহেব বলিয়াছেন, তাহার জীবনের আশা নাই। সেই জন্যই কল্য আমাকে কাছারির কাজ ফেলিয়া, তাহার জবানবন্দী লিখিয়া লইতে যাইতে হইয়াছিল। শুনিতেছি, সে কালি রাত্রিতে ভাল ছিল, আজি প্রাতেও একটু ভাল আছে। সে যে প্রকার জবানবন্দী দিয়াছে, তাহাই আপাততঃ যথেষ্ট মনে করিয়া ওয়ারেণ্ট বাহির করা যাইতে পারিবে। কেবল আপনার অপেক্ষায় আমি এখনও কিছু করি নাই। প্রমাণের অবস্থা কিরূপ?”

বিনোদ বলিলেন,—“গরফু ঘটিত ব্যাপারের সম্পূর্ণ প্রমাণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আপনি অনুমতি করিলেই আমি সাক্ষী হাজির করিতে পারিব। কেদারের সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণের চেষ্টা আমি এখনও করিয়া উঠিতে পারি নাই।”

সাহেব বলিলেন,—“সে জন্য এক্ষণে কোন অসুবিধা দেখিতেছি না। তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়া গ্রেফতারি পরোয়ানা বাহির করায় বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। সুতরাং এখন, রাসবিহারীকে হাজতে ফেলিয়া ক্রমে প্রমাণাদি উপস্থিত করিলে কাজের অসুবিধা হইবে না।”

বিনোদ বলিলেন,—“এ সম্বন্ধেও আমি যে সন্তোষজনক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিব, তাহার সন্দেহ নাই।”

সাহেব বলিলেন,—“নিশ্চয়ই পারিবেন। আপনি এবিষয়ে যেরূপ ধীরতা, সাহস,

সদ্‌বিবেচনা প্রভৃতি গুণের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আপনাকে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারি না। আপনি আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন। কিন্তু সে কথা এখন থাকুক। আপাততঃ পুলিশ যে ভাবে গরফুর মোকদ্দমা চালান দিয়াছেন, তাহাতে সঙ্গে সঙ্গে ওয়ারেন্ট বাহির করা যাইতে পারে, পুলিশ সাহেবও এজন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছেন। আমরা উদ্বিগ্নভাবে আপনার প্রতীক্ষা করিতেছি।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, রাসবিহারীর সম্বন্ধে আরও অতি ভয়ানক চার্জ্জ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। আমি তাহার ভাল প্রমাণ এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। দয়া করিয়া আমাকে সময় দিলে আমি সে সম্বন্ধে চেষ্টা করিব। তাহার পর তাহার বিরুদ্ধে এক সঙ্গে সকল কেসের ওয়ারেন্ট বাহির হইলেই বোধ হয় সুবিধা হইবে। তাহাকে আগেই ধরিয়া ফেলিলে, বা স্থানান্তরিত করিলে, হয় তো আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে।"

সাহেব বলিলেন,—"আপনার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে আমাদিগের কোনই আপত্তি নাই। আপনি যে ভাবে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহাতে আপনার ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া চলাই আমাদের কর্ত্তব্য। রাসবিহারীর যে সকল দুষ্কর্ম্ম আপনি আমাদিগের গোচরে আনিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্যে নিতান্ত শৈথিল্য ও অনবধানতা ব্যক্ত হইতেছে। রাসবিহারী ঘটিত এই সকল কথা শুনিয়া সকলেই মনে করিবে, হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ ও শাসন-বিভাগে লিপ্ত তাবৎ কর্ম্মচারী হয় বেজায় ঘুষ খায়; না হয় কেবল ঘুমাইয়া, মদ খাইয়া, বা লনটেনিস্ খেলিয়া কাল কাটায়। এরূপ অরাজক, মুসলমানদিগের শাসনের শেষ ভাগে হইলে শোভা পাইত। আপনি রাসবিহারীর বিরুদ্ধে যে নূতন চার্জ্জের কথা বলিতেছেন, তাহা কি ভাবের?"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি আপনাকে পূর্ব্বে একদিন কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম যে, নিধে চাঁড়াল নামক এক ব্যক্তি রাসবিহারীর অত্যাচারে দেশত্যাগী হইয়াছে, এপর্য্যন্ত তাহার সন্ধান নাই। আমার সন্দেহ হইতেছে, রাসবিহারী তাহাকে প্রচ্ছন্নভাবে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে। আমি স্বয়ং এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া ফলাফল আপনাকে জানাইতে ইচ্ছা করি। তাহার পর যথা-কর্ত্তব্য করিবেন।"

সাহেব বলিলেন,—"উত্তম কথা। আপনি তাহার বিরুদ্ধে আরও যে সকল কেস উপস্থিত করিবেন মনে করিয়াছেন, ইচ্ছানুরূপ সময়ে তাহার আয়োজন করিবেন। কিন্তু সম্প্রতি তাহার বিরুদ্ধে যে দুই ভয়ানক মোকদ্দমা আপনি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার জন্য ওয়ারেন্ট বাহির করিতে বিলম্ব হইলে, আমাদের বড়ই নিন্দার কথা হইবে।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি আপনাদিগকে এ জন্য অধিক বিলম্ব করিতে অনুরোধ করি না।"

সাহেব বলিলেন,—"আপনি আমাদিগকে কত বিলম্ব করিতে বলেন?"

বিনোদ বলিলেন,—"তিন চার দিন মাত্র। বোধ হয় তিন চারি দিনেই আমার কার্য্য শেষ হইবে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"তাহাই হইবে। আপনার অনু-

রোধে তিন চারি দিন গ্রেফতারি পরোয়ানা বাহির করা বন্ধ থাকিল।"

বিনোদ বলিলেন,—"তাহা হইলে এই কথাই এক্ষণে স্থির থাকিল। আমি অদ্য স্বর্ণ-গ্রামে যাইব এবং সেখানে আবশ্যক মত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। যদি আমি নির্বিঘ্নে কার্য্য শেষ করিতে পারি, তাহা হইলে তিন চারি দিনের মধ্যেই স্বয়ং আসিয়া, বা উপ-যুক্ত লোক পাঠাইয়া আপনাদিগকে সকল কথা জানাইব। যদি তিন চারি দিনের মধ্যে আমার নিকট হইতে কোন সংবাদ না আইসে তাহা হইলে আপনারা বুঝিবেন যে, আমার প্রাণান্ত হইয়াছে, বা আমি ঘোরতর বিপদে পড়িয়াছি। তখন আপনারা যোগ্য লোক দ্বারা ওয়ারেণ্ট পাঠাইবেন এবং যদি আমি তখনও জীবিত থাকি, তাহা হইলে আমার উদ্ধারের ব্যবস্থা করিবেন।"

সাহেব বলিলেন,—"জীবনান্ত হইতে পারে বলিয়া যদি আপনার আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে এরূপ বিপজ্জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আপনাকে আমি পরামর্শ দিই না।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি এ কার্য্যের জন্য জীবনকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছি। আমার পিতা নর-হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া সমাজ-পরিত্যক্ত ও নিরুদ্দেশ হইয়া রহিলেন। আমার বিশ্বাস এ জগতে রাস-বিহারী পাষণ্ড-ব্যতীত তাঁহার সংবাদ আর কেহই জানে না। তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে না পারিলে, সে কখনই তাহা স্বীকার করিবে না। অন্য মোকদ্দমায় অভি-যুক্ত হইয়া সে হাজতে থাকিলে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। আমি তাহাকে স্বয়ং স্বকীয় অধীনতায় বদ্ধ করিয়া, আয়ত্ত করিতে চাহি।"

সাহেব বলিলেন,—"আপনার অভিপ্রায় আমি বুঝিতে পারিয়াছি, এজন্য আপনাকে রাজকীয় সহায়তা প্রদানেও আমরা প্রস্তুত আছি। আপনার নিকট পরোয়াণা আছে; আপনি আবশ্যক বুঝিলে, ইচ্ছামত পুলিশ কর্ম্মচারী সঙ্গে লইতে পারিবেন।"

বিনোদ বলিলেন,—"আপনার সৌজন্যে আমি অনুগৃহীত হইয়াছি, কিন্তু এজন্য কাহারও সহায়তা আমি লইব না। যে ব্যক্তি আমার পিতার দেব-চরিত্রে এই কলঙ্ক আরোপ করিয়া, তাঁহাকে দেশান্তরিত করিয়াছে, তাহাকে রাজদণ্ডে ও মনুষ্য-সমাজে লাঞ্ছিত করিবার নিমিত্ত যে কিছু অনুষ্ঠান আবশ্যক, তাহা আমি স্বয়ং সম্পন্ন করিব। তবে প্রয়ো-জন না হইলেও, আইনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত, আমি পূর্ব্ববৎ দুইজন প্রচ্ছন্ন-বেশধারী কনষ্টবল সঙ্গে রাখিতে ইচ্ছা করি।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"আপনার উদ্যম ও অধ্যবসায় অসাধারণ, নির্ভীকতা ও কার্য্যময়তা অতুলনীয়। আপনি পিতার সুসন্তান। আশা করি, আপনার প্রযত্নে আপনার পিতৃনামের কলঙ্ক সম্পূর্ণরূপে প্রক্ষালিত হইবে। কিন্তু আমি বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনি বালক; আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আপনি অকারণে বিশেষ বিপজ্জনক কার্য্যে কদাচ হস্তক্ষেপ করিবেন না।'

বিনোদ সবিনয়ে বলিলেন,—"মহাশয়ের উপদেশ আমার শিরোধার্য্য। আমি নিশ্চয়ই অতিশয় সাবধানতা সহকারে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব। আপনার নিকট আমি চির-বাধিত। বিদায় কালে একটা কথা আমি বিনীতভাবে মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছি। রামদীনের সম্বন্ধে আপনি কি স্থির করিয়া-ছেন? আমার বোধ হয় এ ব্যাপারের সহিত তাহার কোনই সংস্রব নাই

সাহেব কহিলেন,—"পুলিশ এ পর্য্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারে নাই। এ ব্যাপারে আপনি যাহা হউক প্রমাণ না আনিতে পারিলে, আর কেহ যে কিছু আনিতে পারিবে এমন বোধ হয় না। আপনি যখন তাহাকে নিরপরাধ বলিয়া বুঝিতেছেন, তখন তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়ায় হানি নাই। ভবিষ্যতে যদি তাহার সম্বন্ধে কোন গোল উঠে, বা তাহাকে প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে যাহাতে তাহাকে সহজে পাওয়া যায়, তাহার একটা উপায় থাকা মন্দ নহে। আপনি অন্য কাছারির সময়, একটা জামিন দিয়া তাহাকে খালাস করিয়া লইয়া যাইবেন।"

যথানিয়মে অভিবাদনাদি করিয়া, বিনোদ বিদায় হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট হইতে বিদায় হইয়া বিনোদ সত্বর পুলিশ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। যাহা যাহা তিনি করিয়াছেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত তাঁহার যেরূপ কথোপকথন হইয়াছে, সমস্ত তাঁহাকে জানাইয়া এবং তাঁহার উপদেশ ও অভিপ্রায় বুঝিয়া লইয়া বিনোদ যথানিয়মে সে স্থান হইতে বিদায় হইলেন।

তাহার পর তাঁহার গাড়ি হাঁসপাতালের ফটকে প্রবেশ করিল। তখন ডাক্তার সাহেব সেখানেই ছিলেন। বিনোদ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অন্যান্য কথার পর, কেদার নাপিতের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। সাহেবের কথা শুনিয়া বিনোদ বুঝিলেন, কেদার একটু ভাল আছে, তাহার জ্ঞান হইয়াছে, সে কথা-বার্ত্তা কহিতেছে, কিন্তু এখনও জীবনের কোন আশা নাই। ডাক্তার সাহেবের অনুমতি লইয়া তিনি কেদারের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন।

কেদারের মা ও স্ত্রী বিনোদকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মা বলিল,—"আপনারই জন্য যদি আমার কেদার প্রাণ পায়।"

তাহার স্ত্রী বলিল,—"যেমন বাবু, তেমনই তাঁহার বহিন। তিনি, আমাদের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া, কাঁদিয়া ফেলিলেন। পরের জন্য কেহ কি কাঁদে?"

কেদারের মা বলিল —"এ সব কি মানুষ? ইহাঁরা দেবতা। কালি আবার লোক দিয়া তিনি আমাদের জন্য কত খাবার এখানে পাঠাইয়াছেন; আমরা যাইতে পারি নাই বলিয়া বার বার লোক দিয়া খবর লইয়াছেন।"

যখন দুর্গাপুরে কেদারের বাটীতে উপস্থিত হইয়া, বিনোদ তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তখন সে অজ্ঞান ছিল। এক্ষণে তাহার বেশ জ্ঞান হইয়াছে। তাহার মা তাহাকে বুঝাইয়া দিল, এই বাবুই তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়াছেন, কত খরচ করিয়াছেন, কত যত্ন করিতেছেন, খবর লইতেছেন। ইনি রাসবিহারী নাগের ভয় করেন না, তাহার সর্ব্বনাশ ইহার দ্বারাই হইবে। সমস্ত শুনিয়া, কেদার তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার বাম হস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কাজেই সে এক হাত কপালে তুলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। বিনোদ বলিলেন,—"তুমি একটু ভাল আছ শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি।

এখানে এইরূপ যত্নে কিছুদিন থাকিলে তুমি সারিয়া উঠিবে।"

অতি মৃদুস্বরে কেদার বলিল,—"আপনার দয়া। বড় কঠিন কাজে আপনি হাত দিয়াছেন। নাগ পারে না এমন কাজ নাই। আপনার কাজ শেষ হইয়াছে কি? আর সেখানে না যাইতে হইলেই ভাল হয়।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমার কাজ এখনও শেষ হয় নাই। তুমি অনেক দিন রাসবিহারীর সংসারে কাজ করিয়াছ। অনেক কথা তোমার জানা থাকিতে পারে। তোমাদের গ্রামের নিধে চাঁড়ালের উপর রাসবিহারী অনেক অত্যাচার করিয়াছিল। তাহার পর সে কোথায় অন্তর্দ্ধান হইয়া গিয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার সন্ধান নাই। আমি সেই বিষয়ের সন্ধানের জন্য বড়ই আগ্রহান্বিত হইয়াছি।"

কেদার বলিল,—"কোন প্রকার সন্ধান করিতে পারিয়াছেন কি?

বিনোদ বলিলেন,—"না। কেহ কেহ বলিতেছে, রাসবিহারী হয় তো তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে।"

কেদার বলিল,—"অসম্ভব নয়। রাসবিহারীর এরূপ বে-আইন কয়েদ করা দুই এক জন লোক আছে বলিয়া আমার বোধ হয়।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"কিসে তুমি এরূপ অনুমান কর?"

কেদার বলিল,—"রাসবিহারীর এক জন শত্রু কোন কাজে পড়িয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল জানি। তাহার পর সে আর দেশে ফিরিয়া যায় নাই। কোথায়ও তাহার সন্ধান হয় নাই, তাহার লাসও কেহ কোথায় দেখে নাই। তাহার কি হইল, আমরা সর্ব্বদা কাছে থাকিয়াও, তাহা বুঝিতে পারি নাই। ইহাতেই বোধ হয়, রাসবিহারী তাহাকে গুমি করিয়াছে।

বিনোদ বলিলেন,—"সম্ভব বটে। কিন্তু এমন করিয়া মানুষ গুমি করিল, অথচ তোমরা পর্য্যন্ত কখন জানিতে পারিলে না, ইহা কি সম্ভব?"

কেদার বলিল,—"আশ্চর্য্য কিছু নাই। অনেক স্ত্রীর ধর্ম্মনাশ, খুন, জখম, আমরা তাহার চাকর হইলেও, জানিতে পারিতাম না।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"কিন্তু যে ব্যক্তি খুন করিতে একটুও পিছ পা নহে, সে কেন মানুষ গুমি করিয়া বিব্রত হইবে?"

কেদার বলিল,—"কথাটা আমরাও অনেক সময়েই ভাবিয়াছি। আমার বোধ হয়, যখন খুন করিবার অসুবিধা হইত, যখন খুন করিলে ধরা পড়িবে বলিয়া সে বোধ করিত, তখনই মানুষটাকে সে লুকাইয়া ফেলিত। এও এক রকম খুন। কেন না হয় তো সেখানে মানুষটা সহজেই, দুই এক মাসের মধ্যে, আপনি মরিয়া থাকিত।"

বিনোদ বলিলেন,—"তোমার এ সকল অনুমান বড়ই সুসঙ্গত। তবে একটা কথা সহজেই মনে হয় যে দুনিয়ায় কাহাকেও যে ব্যক্তি ভয় করে না, আর সংসারের কোন লোকই যাহার বিরুদ্ধে কথা কহিতে সাহস করে না, সে নিধে চাঁড়ালের মত একটা সামান্য লোককে একবারে খুন না করিয়া, কেন তাহাকে লুকাইয়া রাখিবে? নিধেকে মাঠের মধ্যে খুন করিয়া ফেলিলেই কে রাসবিহারীর কি করিতে পারিত?"

কেদার বলিল,—"এ কথা ঠিক বটে। কিন্তু আমি আগেই বলিয়াছি খুন করিবার সকল সময়ে হয় না। যে এত অত্যা-

চার করে সে খুব সাবধানী লোক। চারিদিক্ বাঁচাইয়া চলিতে পারে বলিয়াই, রাসবিহারীর এত অত্যাচার চলিয়া আসিতেছে। নিজ গ্রামে খুন করিয়া রাসবিহারী হয় তো লাস পাচ ক্রোশ দূরে আর এক গ্রামের মাঠে ফেলিয়া দেয়; এমন ভাবে লাস পুকুরে ফেলিয়া থাকে যে, তাহা কখনই ভাসিয়া উঠে না। এইরূপ সাবধানে সে কাজ করে। এ কাজে তাহার বিশ্বাসী লোক আছে। অনেকে ইহা জানে কিন্তু সহজে রাসবিহারীকে ধরিতে ছুইতে পারে না। তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষী প্রমাণও পাওয়া যায় না। কোন গরীব লোকই তাহার বিরুদ্ধে কথা কহিতে সাহস করে না। ধনবান্ ভদ্রলোক গ্রামে কেহ নাই। যে দুই জন ছিলেন, জানি না, তাঁহাদের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছে। গ্রামের চৌকীদারটী পর্য্যন্ত রাসবিহারীর বাধ্য—টাকার বাধ্য— ভয়ে বাধ্য।"

বিনোদ বলিলেন,—"তা তো ঠিক। এত সাবধান না হইলে, এত পাপ এত দিন লুকাইয়া চলিতে পারে কি? আমার বোধ হয়, তুমি বলিতেছ যে, যেখানে যেরূপ সুবিধা পায়, সেখানে রাসবিহারী সেইরূপ করে। যেখানে খুন করিলে লাস সরাইবার সুবিধা দেখে, সেখানে খুন করিয়া ফেলে। যেখানে সে সুবিধা না হয় সেখানে সে গুমি করে। তোমার কথা শুনিয়া আমি বুঝিতেছি যে, নিধেকে হয়ত খুন করিবার সুবিধা হয় নাই; তাই হয় ত তাহাকে লুকাইয়া ফেলিয়াছে।"

কেদার বলিলেন,—"আজ্ঞা হাঁ।"

বিনোদ বলিলেন,—"এমনও হইতে পারে যে, নিধেকে খুন করিয়া লাস এমন ভাবে গোপন করিয়াছে যে এ পর্য্যন্ত কেহই তাহা জানিতে পারে নাই।"

কেদার বলিল,—"তাহা তো হইতেই পারে। সেরূপ কাণ্ড তো কতই হইয়াছে। তবে লোককে গুমি করিয়া রাখাও রাসবিহারীর পক্ষে অসম্ভব নয়; সেরূপ ভাবে দুই চারি জনকে সে লুকাইয়া রাখিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়।"

বিনোদ বলিলেন,—"বুঝিতেছি, এ সকল অনুমান মাত্র। কি যে হয়, রাসবিহারী কি যে করে, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে কাহারও সাধ্য নাই। তবে কথা এই, মানুষ গুমি করিয়া রাখিতে হইলে একটা ভাল নিরাপদ জায়গা চাই,—বাড়ীর চাকর পর্য্যন্ত জানিতে না পারে, এমন একটা জায়গা ঠিক করিয়া রাখা সহজ ব্যাপার নহে।"

কেদার বলিল,—"রাসবিহারীর সেরূপ জায়গা আছে। তাহার বাটীর এক ক্রোশ দক্ষিণে উত্তরপাড়া নামে গ্রাম ছিল। এখন গ্রাম নাই, বসতি উঠিয়া গিয়াছে, ঘর দুয়ার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বাগান আর বনে সমস্ত জায়গা ছাইয়া গিয়াছে। সে গ্রামটার এমন অবস্থা হইয়াছে যে, দিনেও সে দিকে লোক যাইতে ভয় পায়। সেই গ্রামে রাসবিহারীর এক পুরাতন ভাঙ্গা বাড়ী আছে। সে বাড়ীতে নিশ্চয়ই একটা কাণ্ড থাকা সম্ভব। কেন না সে বাড়ীর দেউড়িতে একজন বাগ্দি নিয়ত উপস্থিত থাকে, সেখানে রাঁধাবাড়া করিয়া খায়, রাত্রিতেও শুইয়া থাকে। যদি কোথায় যাইতে হয়, তাহা হইলে দরজায় চাবি দিয়া যায়, আবার শীঘ্রই ফিরিয়া আইসে। এ কথা আমি জানি, আরও দুই একজন জানে। কিন্তু সেখানে কি আছে তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না, সকলেই আন্দাজ করে, হয় তো যাহাদের প্রাণে মারার সুবিধা হয় না, তাহাদিগকে সেখানে আটকাইয়া রাখে।"

বিনোদ এই সকল কথা ইষ্টমন্ত্রের ন্যায়

প্রাণের মধ্যে গাঁথিয়া লইলেন। বলিলেন, —"অসম্ভব নয়। কিন্তু যে সকল স্ত্রীলোক লইয়া সে অত্যাচার করে, তাহাদের হয় ত সেখানেও লইয়া যাইতে পারে। এই জন্যই এ লুকান স্থানটা রাখিয়াছে।"

কেদার বলিল,—"এজন্য তাহার লুকান স্থানের দরকার হয় না। কান্না, পায়ে ধরা, চীৎকার কিছুই সে গ্রাহ্য করে না। তাহার বৈঠকখানায় কত সতীর চীৎকার প্রায় শুনা যায়। সে সব কথা নয়। কয়েদ করা লোক থাকাই সেখানে সম্ভব। আর কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না।"

বিনোদ বলিলেন,—"এত বড় ভয়ানক ব্যাপার যদি সেখানে থাকে, তাহা হইলে কেবল মাত্র একটা সামান্য বাগ্‌দির হাতে তাহার ভার রাখিয়া, রাসবিহারী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে কি ?"

কেদার বলিল,—"প্রকাশ হইবার কোন উপায় নাই ; যে বাগদি সেখানে থাকে সে খুব অনুগত, লোকজন কেহ সেদিকে যায় না ; কেহ কিছু জানিতে পারে না। এই সকল কারণে বোধ হয় এমন কাণ্ড চলিয়া আসিতেছে। আমি ঠিক বলিতে পারি না ; আপনি এত অনুসন্ধান করিতেছেন, সে দিকটাও একবার সন্ধান করিবেন।"

বিনোদ বলিলেন,—"নিশ্চয়ই সন্ধান করিব। তোমার কথায় আমার বিশেষ উপকার হইল।"

কেদার বলিল,—"কিন্তু খুব সাবধান ! উত্তরপাড়ার সে বাড়ীতে যাওয়ার রাস্তা নাই। চারিদিকে কেবল বন। নিকটে গ্রাম কি লোক নাই। লোকের পায়ে পায়ে যে রকম রাস্তা হয়, তাও সেখানে নাই। কেহ তো সেখানে যায় না। কেবল এক পথ আছে, তাও রাসবিহারীর বাড়ীর পাশ দিয়া গিয়াছে, খানিক দূর যাওয়ার পর, সে পথও বনে মিশিয়া গিয়াছে। কাজেই সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করিতে হইলে, রাসবিহারী জানিতে পারিবে। খুব সাবধান বাবু।"

বিনোদ বলিলেন,—"তোমার কথামত আমি খুব সাবধানে কাজ করিব। আমি আজিই স্বর্ণগ্রাম যাইব। ফিরিয়া আসিয়া তোমাদের সহিত দেখা করিব। ভরসা করি, এবার আসিয়া তোমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিব। তুমি খুব সাবধানে থাকিবে।" তাহার পর তাহার মা ও স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তোমরা বিশেষ সাবধান থাকিবে। যখন যে বিষয়ের আবশ্যক হইবে, আমার ভগ্নীর নিকট চাহিয়া পাঠাইবে। কোন কথাই তাঁহাকে জানাইতে কুণ্ঠিত হইবে না। আমি এক্ষণে আসি।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হাসপাতাল হইতে বিদায় হইয়া বিনোদ নিজের বাসায় আসিলেন। বৈঠকখানায় চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও শ্রীরাম বসিয়াছিলেন। বিনোদ তাঁহাদের নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, —"খুড়া মহাশয়, স্নান হইয়াছে বোধ হয়, আহার এখনও হয় নাই ?"

রামজীবন বলিলেন,—"অতি প্রত্যুষেই গঙ্গাস্নান সারিয়াছি বাবা ; অপরাজিতা মা-লক্ষ্মী যে জলখাবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন,

তাহাতে এ বেলা আর আহারের প্রয়োজন হইবে বোধ হয় না।”

বিনোদ একটু হাসিয়া বলিলেন,—“যাহা হউক, চারিটী ভাত খাইয়া লউন। আমাদিগকে আহারাদির পর স্বর্ণগ্রামে যাইতে হইবে। এখানে আপনার যে যে কাজ ছিল, তাহা শেষ হইয়াছে তো?”

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, “হাঁ বাবা, হাতের কাজ সকলই শেষ হইয়াছে। বলিতেছিলাম কি, তুমি নিজে স্বর্ণ গ্রাম না যাইলে ক্ষতি কি? যে কাজ আছে তাহা কেন আমাদিগকে বুঝাইয়া দেও না কেন? আমরা নিশ্চয়ই তোমার কথামত সমস্ত কাজ শেষ করিতে পারিব।”

বিনোদ বলিলেন,—“আপনারা পারিবেন না, এমন কাজ কিছুই নাই। কিন্তু আমাকে যাইতেই হইবে। আমি স্বয়ং উপস্থিত না থাকিলে, উপস্থিত মত কার্য্যের ব্যবস্থা এখান হইতে কিরূপে করিব?”

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—“তা যাহা ভাল বুঝ বাবা কর, কিন্তু না যাইলেই বড় ভাল হইত। আমার কেমন যেন ভাল লাগিতেছে না। আর কি বলিব?”

শ্রীরামকে ডাকিয়া, একটু দূরে আসিয়া, বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—“তুমি নিধে চাঁড়ালের স্ত্রীর সন্ধান করিয়াছিলে?”

শ্রীরাম বলিল,—“আজ্ঞা হাঁ।”

“সে এখানেই আছে?”

“আজ্ঞা হাঁ।”

“তবে আহারাদি শেষ করিয়া লও, এখনই স্বর্ণগ্রাম যাইতে হইবে।”

বিনোদ পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অপরাজিতা তৎক্ষণাৎ সম্মুখে আসিলেন। বিনোদ বলিলেন,—“আমি স্নান করিয়া আসিতেছি। তুমি আমায় ভাত দিতে বল, আমি এখনই স্বর্ণগ্রাম যাইব।”

অপরাজিতা কোন কথা না কহিয়া, বিনোদের ভোজনের ব্যবস্থা করিতে গমন করিলেন। অতি ব্যস্ততাসহ স্নানাদি শেষ করিয়া, বিনোদ উপরে আসিলেন। অপরাজিতা স্বহস্তে স্থান পরিষ্কার করিয়া, আসন পাতিয়া, জল রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে স্বহস্তে থালায় করিয়া ভাত লইয়া আসিলেন এবং সে থালা যথাস্থানে স্থাপনের পর ত্বরিতপদে গমন করিয়া, আর এক থালায় নানা প্রকার ব্যঞ্জনাদি লইয়া আসিলেন। বিনোদকে উঠিয়া আসিয়া খাইতে বলিয়া, তিনি আবার দ্রুতপদে দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন আনিতে গমন করিলেন। দুগ্ধ বড়ই উষ্ণ ছিল; অপরাজিতা তাহাতে পাখার বাতাস দিতে লাগিলেন।

বিনোদ, ভোজন করিতে করিতে, অদ্য সাহেবদিগের সহিত যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে, কেদার তাহাকে যাহা যাহা বলিয়াছে, সমস্তই অপরাজিতাকে জানাইলেন। আহার সমাপ্ত হইলে, বিনোদ আচমনাদি শেষ করিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন।

এতক্ষণ অপরাজিতা বিশেষ কোন কথা কহেন নাই; অনন্যমনে বিনোদের বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন মাত্র। এক্ষণে জিজ্ঞাসিলেন,—“এবার তুমি কবে ফিরিবে?”

বিনোদ বলিলেন,—“ঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে যেমন যাওয়া আসা চলিতেছে সেইরূপই হইবে বোধ হয়। দুই-তিন দিনের বেশী বিলম্ব হইবে বোধ হয় না।”

অপরাজিতা বলিলেন,—“তাহা হইলে দুই-তিন দিনের বেশী বিলম্ব দেখিলে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, তুমি বিপদে পড়িয়াছ?”

বিনোদ বলিলেন—"তাহা মনে করিবে কেন ?

অপরাজিতা বলিলেন,—"তবে কোন্ অবস্থা দেখিলে তাহা মনে করিব, বলিয়া দেও।

বিনোদ অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিয়া উঠিলেন,—"এ প্রকার একটা কথা স্থির করিয়া রাখা মন্দ নহে। তোমার প্রশ্ন আমাকে বড়ই সতর্ক করিয়া দিয়াছে। শুন দিদি, যদি দুই দিন অতীত হইয়া যায় অথচ আমি ফিরিয়া না আইসি, অথবা আমার নিকট হইতে কোন সংবাদ না আইসে, তাহা হইলে বুঝিবে, আমি কোন বিপদে পড়িয়াছি।"

অপরাজিতা নীরব। বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন —"কি ভাবিতেছ ?

অপরাজিতা বলিলেন,—"তখন আমার কর্ত্তব্য কি, তাহাই ভাবিয়া স্থির করিতেছি।"

"কি স্থির করিলে ?

অপরাজিতা বলিলেন,—"তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট তোমার নাম করিয়া বলিয়া পাঠাইব যে, রাসবিহারী নাগকে এখনই গ্রেপ্তার করা হউক বিনোদ বাবু বিপন্ন।"

বিনোদ আরও কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন এবং অপরাজিতার সাবধানতার বার বার প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—"মন্দ পরামর্শ নহে। আমি একখানি পত্র লিখিয়া রাখিতেছি। আমার বিলম্ব হইলে সেই পত্রখানি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিবে। তাহাতেই সকল কথা লেখা থাকিবে।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"বেশ কথা। আজি বুধবার। যদি শুক্রবারের রাত্রির মধ্যে তোমার সংবাদ না পাই, তাহা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট সেই রাত্রিতেই তোমার পত্র পাঠাইয়া দিব, এবং যতক্ষণ তোমার খবর না পাই, ততক্ষণ ছট্‌ফট্ করিতে করিতে বসিয়া থাকিব।"

বিনোদ বলিলেন,—"বোধ হয় কোনই প্রয়োজন হইবে না। আমরা অকারণ অনাগত বিপদ-ভয়ে অনাবশ্যক সাবধানতা অবলম্বন্ করিতেছি। কালি যদি না হয়, তাহা হইলে পরশু আমি নিশ্চয়ই ফিরিব।"

অপরাজিতা নীরব। বিনোদ আবার বলিতে লাগিলেন—"আমি যাহা জানিবার নিমিত্ত ব্যাকুল রহিয়াছি, এইবার সে সন্ধানের সূত্র-পাত হইবে। আমার বিশ্বাস, আমার পিতৃদেবের নিয়তি কি হইয়াছে, তাহা এ জগতে রাসবিহারী ভিন্ন আর কেহই জানে না। সেই রাসবিহারীকে এইবার আমি স্বয়ং আয়ত্ত করিব। তাহাকে অধীন করিয়া, সম্পূর্ণরূপে নিজের পদানত করিয়া তাহার নিকট হইতে এ সংবাদ বাহির করিতে পারিব। যে আশায় বুক বাঁধিয়া এত আয়োজন করিতেছি, জানি না তাহার সফলতা আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে, অথবা অতঃপর কি ভাবে, কোন্ পথে আমাকে কার্য্যসূত্রের অনুসরণ করিতে হইবে।"

বিনোদ ধীরভাবে সকল কথা গুছাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নামে পত্র লিখিয়া অপরাজিতার হস্তে প্রদান করিলেন এবং তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

অপরাজিতা মনে মনে বলিলেন,—"পরশু —পরশু পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট ভাবে তোমার জন্য চিন্তা করিয়া কাল নষ্ট করা অসম্ভব। কিন্তু উপায় নাই ; তাহাই থাকিতে হইবে। পরশুর পর—শুক্রবারের রাত্রিতে আমি কি করিব ? বিনোদ বিপন্ন হইয়াছেন বুঝিয়াও আমি

কেবল ভাবিয়া সময় কাটাইব? জানি না ভগবান্ কি ঘটাইবেন।"

বিনোদ বাহিরে আসিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়, শ্রীরাম, রঘু এবং দুই জন বলিষ্ঠকায় ভোজপুরী দ্বারবান্ সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। অন্যান্য সকলকে গাড়িতে রাখিয়া, তিনি কাছারীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, রামদীনের মুক্তি সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়া লইলেন এবং সাবধানতার অনুরোধে আপনার ভগ্নীর নিকট যে পত্র লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহার কথাও জানাইলেন। সাহেব তাঁহার এই সুব্যবস্থার কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

সেখান হইতে বিদায় হইয়া বিনোদকে জেলখানায় যাইতে হইল। সাহেবের আদেশ-লিপি দেখাইলে, একটু লেখা পড়ার পর, রামদীন মুক্ত হইল। বলা বাহুল্য, সে আগ্রহ সহকারে বিনোদের সঙ্গী হইল।

পূর্ব্ব পরিচিত কনষ্টবল দুইজনও তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হইল।

দুইখানি গাড়ি করিয়া সকলে যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যার একটু পরে সকলে নির্ব্বিঘ্নে স্বর্ণগ্রাম পৌঁছিলেন। সে রাত্রিতে আর কোন কার্য্য হইল না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

হরিপুরের রায় বাবুদিগের বিশাল ভবনের অন্তঃপুর মধ্যে, ব্রজেশ্বরী আপনার শয়ন-প্রকোষ্ঠে বসিয়া, অপরাজিতাকে পত্র লিখিতেছেন। পত্র রচনা সমাপ্ত হইলে, তিনি তাহা পাঠ করিলেন।

"ভাই-ভুলান ঠাকুরঝি আমার,

"কালি তোমার কোন পত্র আইসে নাই; সে জন্য আমি বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি বলিলে হয় তো তোমার বড় গায়ে লাগিবে না; কিন্তু সত্য বলিতেছি, তোমার দাদাও বড় ব্যাকুল হইয়াছেন; এ কথায় বোধ হয় তুমিও ব্যাকুল হইবে।

"তুমি ভাই বড় একচখো। ভাই দুজনেই সমান। এক ভাইকে পাগল করিয়া—নিয়ত কাঁদাইয়া, আর ভাইকে লইয়া রঙ্গ-রসে কাল কাটান বড় পক্ষপাতিতা নয় কি? দুজনকে সমান করিয়া চলিতে পারিলেই তোমার বেশ বাহাদুরী বুঝা যাইত।

"ঠাকুরপোর দিকে তোমার প্রাণের টান আছে জানি; কিন্তু তোমার দাদা বলেন, তাঁহার দিকেও কম নহে। তোমার রকম দেখিয়া তাঁহার কথাটা মিথ্যা বলিয়াই মনে হয় না কি?

ঠাকুরপোর সহিত স্বাধীনভাবে ঘর-কন্না করিবে, ইহাই যদি তোমার মনে ছিল, তাহা হইলে সে কথা ঘুণাক্ষরে আগে আমাকে জানাইলে, আমি নিশ্চয়ই তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দিতাম। তোমাকে এত কাণ্ড করিয়া ঘর ছাড়িয়া গিয়া, ভাইকে ধরিতে হইত না।

"এখানে বড় কলঙ্ক রটিয়াছে। তোমার দাদা বলেন, হয় তো লোকে আমাদের বাটীতে আহার-ব্যবহার ত্যাগ করিবে। কিন্তু তিনি এ কথাও বলেন, ঠাকুরপো ছেলেমানুষ বলিয়া গোল করিয়া ফেলিয়াছেন; তোমার দাদা হইলে সকল দিক সামলাইয়া সাবধানে চলিতে পারিতেন—এত গোল হইত না।

"তুমি বড় আমোদে আছ, তাই হয় ত সকল সময় আমাদের কথা মনে পড়ে না—পড়িলেও হয়ত পত্র লেখার সময় হয় না।

"আমাদের পোড়া মন তোমাদের খবর না পাইলে বড়ই অস্থির হয়। এক সময়ে, একটু আমোদ বন্ধ করিয়া, একটা খবর লিখিতে পারিবে না কি?

"ঠাকুরপোর কাজের কতদূর কি হইল? তিনি একবার বাটী আসিয়া পূজনীয়া মা ঠাকুরাণীকে আর আমাকে দেখা দিয়া যাইতে পারিবেন না কি? তুমি দয়া করিয়া একবার ছুটি দিলেই আসিতে পারেন বোধ হয়।

"তোমার দাদা হয় তো তোমাদের দেখিবার জন্য কালি হুগলী যাইবেন। কিন্তু দেখিও ভাই, যেন দুই ভাইয়ে মারামারি না বাধে—খুব সাবধান।

"ঠাকুরপো পনর দিন, আর তুমি দশ দিন বাড়ী ছাড়া। বাড়ী হাঁ হাঁ করিতেছে। দোহাই ঠাকুরঝি, তুমি ঘরে বসিয়া যাহা হয় করিও—এমন করিয়া ভাই লইয়া আর পলাইও না।

"তুমি আপন মুখে কবুল করিয়াছ, ভাইকে ভালবাসার চেয়ে সুখ আর নাই। ভাইয়ের গৃহিণী হইয়া সংসার করার কত সুখ, তাহা বোধ হয় এখন বলিতে পারিবে। কথাটা সরল মনে বলিবে কি?

"তোমাদের জন্য চিন্তায় আমরা বড় কষ্টে আছি। আমি বলিতেছি, তোমাদের কলঙ্কের বোঝা যেমন করিয়া হউক, আমরা ঘাড় পাতিয়া লইব; তোমরা ঘরে ফিরিয়া আইস।

"একদিন সংবাদ না পাইলে আমরা বড় কষ্ট পাই, এ কথা মনে করিবার একটু অবকাশ কি তোমরা পাও না? ইতি

"তোমার (কে তা বুঝিতে পার না)
ব্রজেশ্বরী।"

পত্র পাঠ করিয়া ব্রজেশ্বরী তাহা খামের মধ্যে পুরিয়া ফেলিলেন। ঠিক সেই সময় যতীন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"আজিও তো বিনোদ কি অপির কোন পত্র পাওয়া গেল না। তোমার হাতে ও কি পত্র?"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"এ পত্র আমি এখন ঠাকুরঝিকে লিখিতেছি। এখনও আঁটা হয় নাই। দেখিবে কি?"

যতীন্দ্র বলিলেন,—"না—দেখিতে চাহি না। তোমার পত্র কেবল কদর্য্য গালিতে পূর্ণ।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"আমি যাহা বলি, তাহা যদি গালি বলিয়া মনে হয়, আর তাহা শুনিতে যদি তোমরা ভাল না বাস, তাহা হইলে সাবধানে চলিতে পার না? তোমরা অন্যায় কাজ করিতে পার, আমাদের বলাতেই যত দোষ!"

যতীন্দ্র বলিলেন,—"সকলকে আপনার মত দেখা সকল সময়ে উচিত হয় না। সে দিনকার কথা বলিব কি?"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"বল না—কি বলিবে। যাহার মনে পাপ নাই, সে কথার ভয় করিবে কেন? কি বলিতে চাও—বল!"

যতীন্দ্র বলিলেন,—"বলিতে বলিতেছ—বলি তবে—আমার দোষ নাই। সেই সেদিন—মনে পড়ে তোমার? খুব মনে পড়ে—সে কি ভুলিবার কথা—সেই সেদিন তোমার দাদা যে দিন এখানে আসিয়াছিলেন—বলি—না বলিব না—তোমার মুখ শুকাইয়া যাইতেছে—আহা আহা! না আর কাঁদিতে হইবে না। আমরা তো সে জন্য কিছু বলিতেছি না—সে তো সওয়া রোগ—জানি আমরা সে রোগ তোমাকে

কখন ছাড়িবে না। না—আর বলিব না—থাক্—তুমি আর কাঁদিও না।”

যতীন্দ্র ব্রজেশ্বরীর নিকটস্থ হইলেন এবং সাদরে বাম হস্তে তাঁহার চিবুক ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে কাপড় দিয়া তাঁহার মুখ মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন,—“তবেই তো ভাই; জান যদি সে কথা মনে হইলেই কাঁদিতে হইবে, তবে সে ছাই কথা তুলিবার কি দরকার ছিল? তা যাক্ -আর তো সে কথা বলিতেছি না, তবু কাঁদ কেন? না আর কাঁদিও না। তোমার ভাইয়ের গলা জড়াইয়া ধরা গুণের কথা সকলেই জানে তো—তুমিও সে কাজ লুকাইয়া কর না—সে জন্য কাহাকে ভয়ও কর না। তবে আজি কাঁদিতেছ কেন? আমি আর বলিব না, তুমি আর কাঁদিও না।”

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—“তুমি বড় দুষ্ট? আমার ইচ্ছা হইতেছে, তোমার গোঁফ গুলা টানিয়া ছিঁড়িয়া দেই।”

যতীন্দ্র বলিলেন,—“এ ইচ্ছা হইতে পারে। যে ব্যক্তিকে আপনার সুখের পথের কণ্টক বলিয়া মনে হয়, তাহাকে সাজা দিয়া, কষ্ট দিয়া,দূর করিয়া দিতে ইচ্ছা হয় বটে। তা ভাই তোমার ভুল হইতেছে; আমি তো তোমার ভাই লইয়া রঙ্গ-রসের বিরোধিতা করা দূরে থাকুক, সহায়তাই করিয়া থাকি। তবে কেন ভাই আমার গোঁফ ছিঁড়িয়া দিবে?”

তখন ব্রজেশ্বরী ব[illegible] অাঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না বুঝি, সোহাগভরে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা যতীন্দ্র বাবুর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া, তাঁহার বক্ষে মস্তক স্থাপন করিলেন এবং বলিলেন,—“তোমার মত দুষ্ট বোধ হয় দুনিয়ায় আর কেহ নাই। থাক তুমি—আমি তোমাকে খুব জব্দ করিব।”

তখন যতীন্দ্র সাবধানে ব্রজেশ্বরীর হস্ত আপনার কণ্ঠ হইতে তুলিয়া এবং উভয় হস্তে তাঁহাকে ধরিয়া আপনি একটু সরিয়া বসিলেন এবং বলিলেন,—“ও ব্রজেশ্বরি! তোমার বড় ভুল হইয়াছ; তুমি কি ভাবিয়া কি করিলে? আমি তোমার দাদা নহি—আমি যতীন্দ্র! তুমি দাদা ' ভাবিয়া কাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়েছ? তোমার দাদা শুনিলে হয় তো বড়ই ঝগড়া বাধাইবেন। আমি কিন্তু একথা তাঁহাকে বলিয়া দিব না।”

যতীন্দ্র হা হা শব্দে হাসিতে লাগিলেন। ব্রজেশ্বরী মুখ ভার করিয়া, হেট মুখে বসিয়া রহিলেন। যতীন্দ্র তাঁহার চক্ষুর সহিত নিজ চক্ষু মিলাইবার অভিপ্রায়ে নত মুখে বলিলেন,—“বিনোদ, অপরাজিতা ছেলে মানুষ; তুমি তাহাদের উপর বড়ই লাগ। আমাকেও রেয়াইত কর না। আমরা কি একদিনও তোমার কথার জবাব দিতে পারি না? তা রাগ করিও না ভাই, দোহাই তোমার। এই লও—আমার গোঁফ ছিঁড়িয়া দেও।”

এই বলিয়া আদরে ব্রজেশ্বরীকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার কপোল চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন,—“আমি একবার কালি হুগলী যাইব মনে করিতেছি। কি বল?”

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—“তুমি তো বলিয়াছ কোন ভয়ের কারণ নাই। ঠাকুরপো হুগলী থাকিয়া আর পশ্চিমের স্থানে স্থানে ঘুরিয়া পিতার সন্ধান করিতেছেন। তবে কেন কালি হুগলী যাইবে?”

যতীন্দ্র বলিলেন,—“সে কথা ঠিক। আমি যতদূর বুঝিয়াছি ইহাতে বিনোদের কোন বিপদ বা অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। আর অপি যখন সেখানে গিয়াছে, তখন যত্নেরও কোন ক্রটি

হইতেছে না। তথাপি তাহারা দুই জনেই ছেলে মানুষ। কি করিতেছে কি হইতেছে খোঁজ না লইয়া চুপ করিয়া থাকা আমার উচিত নহে।”

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—“হিংসা হইতেছে বুঝি? ঠাকুরঝিকে ঠাকুরপো একা দখল করিয়াছেন, এটা বড়ই অসহ্য”

যতীন্দ্র বলিলেন,—“আবার—আবার দুষ্টামি! আবার সেদিনকার কথা বলিব?”

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—“আর তোমার সেদিনকার কথা বলিতে হইবে না। আমার মনে সময়ে সময়ে একটা বড় ভাবনা হয়। তুমি কি ভাবিবে জানি না—তথাপি আমি কথাটা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ঠাকুরপো যদি পিতার সন্ধান পান তাহা হইলে কি আমাদের ছাড়িয়া পিতার সঙ্গে পৈতৃক বাটীতে গিয়া বাস করিবেন?”

যতীন্দ্র বলিলেন,—“আমি এ কথার কখনই আলোচনা করি নাই। এক তো পিতার সন্ধান পাওয়ার আশা খুবই কম। দশ বৎসর নিরুদ্দেশ; তিনি যে বাঁচিয়া আছেন তাহা আমার মনে হয় না। মনে কর যদিই খুড়া মহাশয়কে পাওয়া যায় তাহা হইলে তিনি আর বিনোদ যে বিষয়ের যাহা স্থির করিবেন তাহাই হইবে; আমি তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া কার্য্য করিব।

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—“বেশ সোজা কথা তুমি বলিয়া তো খালাস হইলে। আমি সে কথা বলিতেছি না। যদি ঠাকুর-পো পিতার সঙ্গে স্বর্ণগ্রামে বাস করার অভিপ্রায় করেন, তাহা হইলে কি হইবে, তাহাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

যতীন্দ্র বলিলেন,—“তাঁহারা সেরূপ অভিপ্রায় করিবেন বলিয়া আমার মনে হয় না। যদিই সে প্রকার অভিপ্রায় করেন, তাহা হইলে সে বিষয়ে তোমার কি অভিপ্রায় এই সময় বলিয়া রাখ, আমি তাহার মত ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিব।”

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—“যেখানে ঠাকুর-পো থাকিবেন, সেখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঠাকুর-পোকে লইয়াই সংসার। সেই ঠাকুরপো এখানে না থাকিলে, এক দিনও এ বাটিতে থাকা যাইবে না। এ বিষয়ে তুমি কি ভাবিয়াছ জানি না।”

যতীন্দ্র কহিলেন,—“আমি এ সম্বন্ধে কোন কথাই ভাবি নাই; কেন না ভাবিবার কথা কিছুই নাই। ইহা আমি স্থির জানি বিনোদ কোন বিষয়ে কখনই আমার ইচ্ছার বিরোধী হইবে না। আর খুড়া মহাশয়—তাঁহার সন্ধান আর হইবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস—যদিই অদৃষ্টক্রমে তাঁহাকে পাওয়া যায়, কখনই আমাদের ক্লেশজনক কোন ব্যবস্থায় তিনি মত দিবেন না। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমার কোনই চিন্তার কারণ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু তোমার যখন এ সম্বন্ধে চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে, তখন কিরূপ ব্যবস্থা হইলে তুমি সুখী হও, তাহা এই সময়ে বলিয়া রাখ।”

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—„তাহা বলিবার পূর্ব্বে, কেন ছোট ঠাকুরের সন্ধান পাওয়া যাইবে না বলিয়া তুমি মনে করিতেছ, সেই কথাটা আগে আমাকে বল।”

যতীন্দ্র কহিলেন,—“সেটা সোজা কথা। যখন তিনি প্রথম নিরুদ্দেশ হন, তখনকার সকল কথাই আমার বেশ মনে আছে। আমার বাবা এ বিষয়ে অনুসন্ধানের কোন ত্রুটি করেন নাই। তিনি হতাশ হইয়া এ সন্ধান ছাড়িয়া দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাহাকে

খুনী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। কথাটা অলীক এবং অসম্ভব সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাই হউক, সরকারী লোক কথাটা মিথ্যা বলিয়া একবারও মনে করে নাই; সুতরাং যতদূর অনুসন্ধান সম্ভব, তাহার কিছুই তাঁহারা ছাড়ে নাই। তাঁহারা অশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই।"

জেশ্বরী কহিলেন,—"তাহা হইলে তাঁহার কি হইল বলিয়া তোমার মনে হয়?"

যতীন্দ্র। আমার মনে হয়, তিনি মারা পড়িয়াছেন। নিশ্চয়ই কোন শত্রু তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিয়াছে।

"তুমি এরূপ কথা ঠাকুর-পোকে বল নাই কেন?"

যতীন্দ্র। আমি কতক কথা বলিয়াছি বই কি। কিন্তু বিনোদকে একবারে এ চেষ্টা ত্যাগ করিতে আমি পরামর্শ দিই নাই। কেন না বিনোদ তাঁহার ঔরস-পুত্র। এ সম্বন্ধে একবার স্বয়ং সাধ্যমত সন্ধান করা পুত্রের উচিত। আর বিনোদ অসাধারণ বুদ্ধিমান ও বিদ্বান্ ব্যক্তি। অন্যে যতই অনুসন্ধান করুক, বিনোদের ন্যায় বিদ্যা, বুদ্ধি ও আন্তরিক অনুরাগ লইয়া কেহই এ কার্য্য করিয়াছে বলিয়া আমি বোধ করি না। সুতরাং বিনোদকে এ চেষ্টা হইতে একেবারে নিরস্ত হইবার পরামর্শ দিলে, অন্যায় কার্য্য হইবে বলিয়া মনে করি।"

ব্রজেশ্বরী কহিলেন,—"ঠাকুর করেন যেন অসম্ভবও সম্ভব হয়—ছোটঠাকুর মহাশয়কে যেন পাওয়া যায়। তবে এই গোলের কথা শুনিয়া অবধি বড় ভয় হয়, পাছে ঠাকুর পো ছোটকর্ত্তাকে পাইলে আমাদের ছাড়িয়া যান।"

যতীন্দ্র। এ আশঙ্কার কোনই কারণ নাই। তথাপি তোমার কি অভিপ্রায় বল।

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"আমি ঠাকুর-পোকে কখনও ছোট ভায়ের মত স্নেহ করি; কখনও বা একমন একপ্রাণ ভাবিয়া নানা প্রকার তামাসা করি; কখনও বা পেটের ছেলে ভাবিয়া কত শাসন ও অনুযোগ করি। ঠাকুর-পোও যখন যে ব্যবহার সঙ্গত, আমার মনের ভাবগতি বুঝিয়া, সেইরূপই করিয়া আসিতেছেন। এরূপ অকৃত্রিম একপ্রাণ সুহৃদ আমাদের আর কেহ নাই। ঠাকুর-পোকে দেখিলে সুখ, তামাসায় সুখ। ভাইয়ে এত আনন্দ হয় না, ছেলেতে এরূপ হয় কি না জানি না। এই ঠাকুর-পোর সহিত যদি এক সঙ্গে থাকা না হয়, তবে কি লইয়া ঘর-কন্না করিব? আমাদের ছেলে হয় নাই। সে জন্য আমার কোন দুঃখ হয় না। আমি জানি বড় ঘটা করিয়া ঠাকুর-পোর বিবাহ দিব, বড় সুন্দরী আমার যা হইয়া দিদি দিদি করিতে করিতে আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবে, মনের মত করিয়া তাহাকে সাজাইব, তাহার পেটে ঠাকুর-পোর সোণার ছেলে" হইবে; সেই ছেলে আমি মানুষ করিব, বউ কেবল ছেলেকে মাই দিবে, তা ছাড়া আর খোকাকে ছুইতেও দিব না; পেটে ছেলে না হওয়ার দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে। আমি ঠাকুর-পোর উপর অনেক ভরসা করি। ঠাকুরপোকে লইয়া অশেষ সুখী হইব বলিয়া আশা করি। কাজেই যেদিন হইতে এই গোলমালের কথা উঠিয়াছে, সেই দিন হইতে আমার অনেক ভাবনা হইয়াছে।"

যতীন্দ্র। তোমার ভাবনা নিতান্ত অমূলক। তুমি বিনোদকে বড় ভালবাস সত্য

কিন্তু তাহাকে তুমি এখনও চিনিতে পার নাই; ইহা বড় লজ্জার কথা। আমি জানি বিনোদ দেব-চরিত্র-বিশিষ্ট মানব। তোমার এই আদর, এই মমতা, মার এত স্নেহ, অপির এত সোহাগ, তুমি কি মনে কর, ইহা তাহার প্রাণে গাঁথিয়া যায় নাই? জীবনের যে অবস্থাই কেন হউক না, আমাদের ছাড়িয়া বিনোদ কোন অবস্থাতেই সুখী হইবে না, ইহা স্থির জানিবে। সুতরাং তোমার ভয়ের কোন কারণই নাই। এখন আমি কালি একবার হুগলী যাইব কি না বল।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"মার মত হয়—যাও।"

যতীন্দ্র কহিলেন,—"তবে আইস, মার কাছে গিয়া পরামর্শটা স্থির করিতে হইবে।"

উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

সোণার কমল।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বুধবারের রাত্রিকালে বিনোদ সঙ্গিগণ সহ স্বর্ণগ্রামে আসিয়াছেন, একথা বোধ হয় পাঠকগণের স্মরণ আছে। বৃহস্পতিবারের প্রাতে, গরফুর মোকদ্দমার সাক্ষী প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া আনিবার অভিপ্রায়ে শ্রীরাম নগর-ঘাটা যাত্রা করিল। রামদীন, রঘু, কনষ্টবলদ্বয় এবং দ্বারবানদ্বয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চণ্ডী-মণ্ডপে বসিয়া আছে। বাটীর মধ্যে একস্থানে বসিয়া রামজীবন ও বিনোদ কথা কহিতেছেন। চক্রবর্ত্তী বলিতেছেন,—"আমি বাবা, ও কথাটা মোটেই বুঝিতে পারিতেছি না। উত্তর-পাড়ায় ঘর-বাড়ী কিছু আছে বলিয়া আমার তো মনে হয় না। আমার জ্ঞানে আমি কখন উত্তরপাড়ায় যাই নাই। সেস্থানে কেবল জঙ্গল, মানুষের যাতায়াত সেখানে মোটেই নাই। যদিই সেখানে রাসবিহারীর বাড়ী থাকে, তাহা দেখিতে যাওয়ায় আমাদের এখন দরকার কি? নাগ অতি ভয়ানক লোক। তোমাকে সে প্রবল শত্রু বলিয়া জানিয়াছে। বাস্তবিক তুমি প্রকাশ্য রূপেই তাহার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছ। আমার বোধ হয়, তোমার অনিষ্ট করিবার জন্য সে কোন কাজেই পিছাইবে না। তাহার সাহস অতুল, লোকবল যথেষ্ট, ধন-সম্পত্তিও প্রচুর। সে যে কি কাণ্ড ঘটাইবে তাহা ভাবিয়া আমি ভয়ে অস্থির হইয়া রহিয়াছি। তাহার জ্বর ভাল হইয়াছে। সে আজিই পথ্য করিবে শুনিয়াছি। এখন তাহার হাত হইতে ভগবান্ ভিন্ন আর কেহ তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন বলিয়া আমার মনে হয় না। এ কয়দিন যে তোমাকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিতে পারিয়াছি, সে কেবল তাহার জ্বরের জন্য। এখন যে কি ঘটিবে, আমি কেবল তাহাই ভাবিতেছি।

বিনোদ বলিলেন,—"সে যে আমাকে প্রাণে মারিবার চেষ্টা করিবে, তাহা আমিও বেশ বুঝিতেছি।"

রামজীবন বলিলেন,—"তবেই বাবা, বিশেষ সাবধান হওয়া বড়ই আবশ্যক। এ বিষয়ে তোমাকে কোন কাজ করিতে দিতে আমার আর ইচ্ছা নাই। পুলিশ আসুক, তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাউক, বিচারে তাহার

সাজা হউক, ফুরাইয়া যাউক সকল গোল। তোমার নিজের এত কাণ্ড করিবার দরকার কি বাবা ?”

বিনোদ। আপনি দেখিতেছেন না খুড়া মহাশয়, এ সংসারে আমার পিতার সংবাদ যদি কোন ব্যক্তির জানা সম্ভব হয়, তাহা হইলে সে লোক রাসবিহারী ছাড়া আর কেহ নহে। রাসবিহারী তদন্তের সময় সাক্ষ্য দিয়া বলিয়াছে, সে তাঁহাকে বেগে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছে। সেই অসময়ে তাহার বাটী হইতে দূর স্থানে সে কেন আসিল ? আমার পিতা নিকটবর্ত্তী সকল স্থানেই সুপরিচিত লোক ; তাঁহাকে সেইরূপ ভাবে চলিয়া যাইতে এ জগতে রাসবিহারী ছাড়া আর কেহই দেখিল না। ইহাতে সহজেই অনুমান হয়, ইহার মধ্যে নিশ্চয় একটা গোল আছে। রাসবিহারীকে গলায় পা দিয়া না ধরিতে পারিলে, সে গোলের কোনই মীমাংসা হইবে না।

রামজীবন। তাহার তো কোন উপায় দেখিতেছি না। এক পুলিশ আসিয়া যদি তাহাকে ধরে, তবেই যাহা হউক হইবে ; নহিলে আমরা কয়জন তাহার কি করিতে পারিব ?

বিনোদ। আমরাই করিব। আমি স্বয়ং তাহাকে আমার হাতের মধ্যে আনিয়া ফেলিব, ইহা আপনি স্থির জানিবেন।

রামজীবন। একটা কথা বলি। একটু ঠাণ্ডা হইয়া কাজ করিলে হয় না ? ভাল, আগে তাঁহাকে পুলিশ ধরুক, তাহার পর যাহা হয় করিলে হইবে না ?

বিনোদ। তখন সে আর আমার হাতে থাকিবে না খুড়া মহাশয়। তখন সে সরকারের বাহাদুরের হাতে গিয়া পড়িবে। তাহার নিকট হইতে জোর করিয়া কোন কথা আদায় করিবার ক্ষমতা, তখন আর আমার হাতে থাকিবে না। সে তখন মোকদ্দমায় যাহা হয় হইবে ভাবিয়া, আমার আবশ্যক মত কোন সংবাদই আমাকে দিবে না ; বাড়ার ভাগ, আমাকে পরম শত্রু এবং তাহার সেই দুরবস্থার কারণ জানিয়া, আমার সংবাদ প্রাপ্তির সকল পথই বন্ধ করিয়া দিবে।

রামজীবন। ভাল, সময় মত অন্য সুযোগ, যাহা হয় করিলেই হইবে। আমি বলিতেছি, এ যাত্রায় আর কিছু না করিলেই ভাল হয়।

বিনোদ। কোন বিশেষ কাণ্ডই তো আমি এখন করিতেছি না। যে কয়টা মোকদ্দমা তাহার বিরুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছে, আমি এক্ষণে তাহারই প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছি মাত্র।

রামজীবন। তবে উত্তরপাড়ায় সে বাটীতে যাইবার কথা বলিতেছ কেন ?

বিনোদ। নিধে চাঁড়ালের খোঁজে। নিধে হঠাৎ গেল কোথা, ইহার একটা সন্ধান হওয়া আবশ্যক। এ ব্যাপারের সহিত রাসবিহারীর কোনই সম্বন্ধ নাই। সুতরাং ইহাতে রাসবিহারীর অধিক বিরাগের কারণ কি হইবে ?

রামজীবন। কি সে রাসবিহারীর সম্বন্ধ আছে, আর কিসে নাই, তাহা আমি জানি না বাবা। বিরক্ত সে খুবই হইয়াছে। এখন ভাল মন্দ কোন বিচার না করিয়াই সে তোমার মন্দ চেষ্টা করিবে। সে কথা যাউক, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, নিধে চাঁড়ালের অদৃষ্টে কি হইয়াছে, তাহারই খোঁজ করিতে গিয়া, এ সময়ে আপনাদের বিপদ ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন কি ? এ

নিধের সন্ধান করিবার কোনই আবশ্যকতা আমি দেখিতেছি না।

বিনোদ। খুড়া মহাশয়, একটা কথা আপনি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখুন। যেদিন নিধে চাঁড়াল অন্তর্দ্ধান হয়, সেই দিনই আমার পিতা নিরুদ্দেশ হন, সেই দিনই জগবন্ধু বসু মহাশয়ের মৃত্যু হয়। এই তিনটী ঘটনা এক দিনে, আর আমার বোধ হয় এক সময়েই ঘটে। বসু মহাশয়ের মৃত্যু সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই; কেন না সকলেই সে লাস দেখিয়া, তাহা বসু মহাশয়ের দেহ বলিয়া, সনাক্ত করিয়াছে। আমার পিতার সম্বন্ধে পুলিশ ও অন্যান্য লোক অনেক সন্ধান করিয়াছে; কোথাও কেহ কোন খবর পায় নাই। সুতরাং তিনি হয় তো নাই, থাকিলেও তাঁহার সন্ধান পাওয়া সুকঠিন, বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আমরা কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধে তাঁহার সন্ধান করিতেছি মাত্র। যদি কেহ তাঁহার সন্ধান জানা সম্ভব হয়, তাহা হইলে যে তাঁহাকে পলাইতে দেখিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছে, সেই তাহা জানিতে পারে। সে কথা যাউক। বসু মহাশয়ের মৃত্যু সম্বন্ধেও সন্দেহ নাই। আমার পিতার সম্বন্ধে সন্ধানের ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু নিধের সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কেহই কোন সন্ধান করে নাই। তাহার প্রসঙ্গ মানব-সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আমার বিশ্বাস, তাহার ন্যায় একটা সামান্য লোককে লুকাইয়া রাখা নিতান্ত কঠিন কার্য্য নহে। আমার মনে হয়, তিনটী ঘটনার একসঙ্গে গ্রথিত। তন্মধ্যে একটীমাত্র ঘটনাই সূত্র ধরিতে পারিলে, আর দুইটীর তথ্য সহজে নির্ণয় করা যাইবে। যাহার কোন সন্ধানই হয় নাই, এক্ষণে তাহার সন্ধান করিলে হয় তো সহজেই ফল পাওয়া যাইবে বিবেচনায়, আমি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি। নিধের সন্ধান হইলে, আমার পিতার সন্ধান হওয়াও আশ্চর্য্য নহে বলিয়া আমার মনে হয়।

রামজীবন। তোমার অভিপ্রায় আমি বুঝিতেছি। সত্য বটে ঘটনা তিনটীই এক সময়ে ঘটিয়াছে। তিনটা কার্য্যেরই বোধ হয় একই কারণ থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু আমি বলিতেছি, এক সঙ্গে পাঁচ রকম চেষ্টা করায় লাভ কি? রাসবিহারীকে জব্দ করিয়া কথা আদায় করিবে বলিতেছ, সেই তো বেশ কথা। যখন বেশ গোলযোগ হইবে, তখন সেই চেষ্টা করিলেই হইবে। এ চেষ্টার সহিত আবার নিধের সন্ধান জড়াইতেছ কেন? নিধে কি আছে? সে বেটা এত দিনে কোথায় গিয়া মরিয়া ভূত হইয়াছে। এসন্ধানে এখন কোন দরকার নাই।

বিনোদ। একসঙ্গে পাঁচ রকম চেষ্টা করায় ক্ষতি কি খুড়া মহাশয়? কে বলিতে পারে কোন্‌টায় কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে?

রামজীবন। আমি বুঝিতেছি বাবা, তুমি যাহা ধরিয়াছ তাহা না করিয়া কখনই ছাড়িবে না। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যেন কোন নূতন বিপদ না ঘটে। আর কি বলিব?

বিনোদ। আপনার আশীর্ব্বাদে আমি সকল বিপদ কাটাইয়া উঠিব। আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।

তাঁহারা এ বিষয়ের আলোচনা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন। তথায় রামদীন, রঘু, দুইজন কনষ্টবল ও দুইজন দারবান্ পূর্ব্ব হইতেই বসিয়াছিল, এক্ষণে নিবারণ আসিয়া তাহাদের সংখ্যা বাড়াইয়াছে। নিবারণকে লক্ষ্য করিয়া বিনোদ বলিলেন,—"উত্তরপাড়ার জঙ্গলের মধ্যে রাসবিহারীর একটা পুরাতন

বাটী আছে; তাহার খবর তুমি কিছু জান কি?"

নিবারণ বলিল,—"না বাবু, উত্তরপাড়া নাগের খাসমহল? সেখানকার বাগান জঙ্গল সকলেরই মালিক রাসবিহারী। সেখানে চাষ আবাদের জমিও নাই; আমাদের সে দিকে যাইবার কোন দরকার কখনই হয় নাই। সে দিকে দিনে-দুপুরে ঠেঙ্গাইয়া মানুষ মারিলেও কাহারও সন্ধান পাইবার উপায় নাই।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি কালি সেখানে যাইব। তুমি আমাদের সঙ্গে যাইতে চাহ কি?"

নিবারণ বলিল,—"সেখানে যাইতে পারা যাইবে, এমন বোধ করি না। যাইতে পারিলেও, ফিরিয়া আসিতে পারিব না, সেখানেই প্রাণ যাইবে বুঝিতেছি। কিন্তু আপনি যখন যাইতেছেন, তখন কপালে যাহা থাকুক, আমি নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে যাইব।"

রামদীন বলিল,—"হুজুর। আমরাও যাইব তো?"

বিনোদ বলিলেন,—"বড় বিপদের কাজ, অতি দুর্গম স্থান। সেখানে কাহাকেও আমি যাইতে বলিব না। যে ইচ্ছা করিয়া যাইবে তাহাকেই সঙ্গে লইব।"

রামদীন বলিল,—"গোলাম আগে আগে যাইবে। যদি বিপদ হয় তাহা হইলে আগে গোলামের জান যাইবে তাহার পর হুজুরের যাহা হয় হইবে।"

তখন এ বিষয়ের আর কোন আলোচনা হইল না। কেন না তখন সুন্দরী জেলেনী আসিল, দুর্গাপুরের অনেক লোক বিনোদকে দেখিতে আসিল। অনেকে অনেক প্রার্থনা জানাইল। বিনোদ অনেককেই যথাসম্ভব সাহায্য করিলেন। বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নানা গোলে কাটিয়া গেল। বিশেষ কাজ কিছু হইল না।

আহারাদির পূর্ব্বেই রামদীন কোথায় গেল কেহই তাহা জানিতে পারিল না। সকলের স্নানাহার শেষ হইল; তথাপি সে ফিরিল না। তাহার জন্য বিনোদ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"এ দেশে তাহার অনেক জানা-শুনা লোক আছে। সে হয় তো কোথায় গিয়া খাওয়া-দাওয়া করিতেছে। সে জন্য চিন্তার বিশেষ কারণ নাই।"

বিনোদের মনে এ মীমাংসা ঠিক বলিয়া বোধ হইল না। এইরূপ স্থির করিয়া তাহার সন্ধান না করা, তিনি উচিত কাজ বলিয়া মনে করিলেন না। তিনি নানা স্থানে তাহার সন্ধানার্থ লোক প্রেরণ করিলেন। লোকেরা ফিরিয়া আসিতে লাগিল। রামদীনের কোনই সন্ধান নাই। অবশেষে বিনোদ স্বয়ং তাহার সন্ধানে যাইতে উদ্যত হইলেন। রামজীবন, তাঁহাকে নিরস্ত করিবার জন্য অনেক যুক্তি দেখাইয়া, স্বয়ং সন্ধানার্থ বাহির হইলেন। তিনি ফিরিবার পূর্ব্বেই— সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ অগ্রে, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর রামদীন ফিরিয়া আসিল।

বিনোদ বলিলেন,—"একি রামদীন, তুমি কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া, সারাদিন কোথায় কাটাইয়া আসিলে? আমরা তোমার ভাবনায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছি।"

রামদীন করযোড়ে বলিল,—"হুজুর গোলামের কসুর মাপ করিবেন। আমি উত্তরপাড়া গিয়াছিলাম।"

বিনোদ বলিলেন,—"সে কি! উত্তরপাড়া গিয়াছিলে? কেন গিয়াছিলে? কে তোমাকে যাইতে বলিয়াছিল?"

রামদীন বলিল,—"কাহারও হুকুম লইয়া যাই নাই। অন্যায় কাজ করিতেছি বলিয়া মনে করি নাই; এজন্য হুকুম চাহি নাই। কালি যখন সেখানে যাইতে হইবে, আর জায়গাটা কেবলই জঙ্গল, তখন তাহার রাস্তা, যাওয়া আসার উপায়, ঠিক করিয়া রাখা উচিত বলিয়া আমার মনে হইয়াছিল। সমস্ত দিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকার অপেক্ষা, একটা দরকারী কাজ শেষ করা মন্দ নহে বলিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম। তাই আমি সেখানে গিয়াছিলাম।"

বিনোদ বলিলেন,—"তার পর? কি তুমি দেখিয়াছ?"

রামদীন বলিল,—"আমি সে বাড়ী দেখিয়াছি। বৃহৎ বাড়ী। চারি দিকে উঁচু পাঁচীর। লোকজন কাহাকেও দেখিলাম না। দরজায় তালা বন্ধ। কোন লোক সেখানে থাকে বলিয়া বোধ হইল না। দরজার কাছেও বন।"

বিনোদ বলিলেন,—"সেখানে যাইবার পথ আছে?"

রামদীন বলিল,—"কখন কখন সেখানে মানুষের যাওয়া-আসা থাকিলেও একটা পথ থাকিত। আমি চারিদিক্ দেখিয়াছি। কোন দিকেই মানুষের যাওয়া আসার পথ নাই। আমি কিন্তু যাওয়ার একটা রাস্তা ঠিক করিয়া আসিয়াছি। কষ্ট করিয়া কোনরূপে সে পথ দিয়া যাওয়া যাইতে পারিবে।"

বিনোদ বলিলেন,—তুমি মন্দ কাজ কর নাই; আমি তোমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু একটা কথা আমাকে বলিয়া গেলে আমাদের এত ভাবনা হইত না।"

রামদীন বলিলেন,—"চাকরের অপরাধ যদি মনিব মাপ না করেন তাহা হইলে কাহার কাছে সে দাঁড়াইবে?"

বিনোদ বলিলেন,—তুমি বিশ্রাম কর, জল খাও, তাহার পর অন্যান্য কথা হইবে।"

রাত্রি আটটার পর শ্রম-কাতর শ্রীরাম ফিরিয়া আসিল। সে সমস্ত দিনের কার্য্য-বিবরণ বলিতে উদ্যত হইলে, বিনোদ বলিলেন —"তুমি আগে অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিবে, আহারাদি করিয়া ঠাণ্ডা হইবে, তাহার পর তোমার কথা শুনিব; আমরা যাহা পরামর্শ করিয়াছি তাহাও তোমাকে বলিব।"

অগত্যা শ্রীরামকে বাধ্য হইয়া অগ্রে দেহ-রক্ষার ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইল। আবশ্যক মত কার্য্য শেষ হইলে, সে বিনোদের নিকটে আসিয়া বলিল,—"কালি প্রাতে গরফুর মোকদ্দমা সংক্রান্ত লোকেরা এখানে আসিবার জন্য বাটী হইতে যাত্রা করিবে। বোধ হয় বেলা দুপুরের মধ্যে পৌঁছিতে পারে। গাড়ি করিয়া আসিবে। আমি খরচ-পত্র দিয়া আসিয়াছি।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমরা কালি প্রাতে উত্তরপাড়ার জঙ্গলে বেড়াইতে যাইব স্থির করিয়াছি। বলা যায় না, সেখানে আমাদের বিলম্ব হওয়াও অসম্ভব নহে। যদি তাহারা আইসে, তাহা হইলে চেনা লোককে দেখিতে না পাইয়া, তাহারা বিব্রত হইবে। তাহা হইলে শ্রীরাম, তোমার আমাদের সঙ্গে যাওয়া হইবে না।"

শ্রীরাম বলিল,—"কেন, খুড়াঠাকুর বাড়ী থাকিবেন, তাহা হইলেই তাহাদের কোন অসুবিধা হইবে না।"

রামজীবন বলিলেন,—"আমার বাড়ি থাকা হইবে না, দরকার আছে—স্থানান্তরে যাইতে হইবে।"

বিনোদ বলিলেন,—"কিন্তু খুড়া মহাশয়, বলিয়া রাখিতেছি, আমাদের সঙ্গে আপনার যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনার যে কাজ আছে তাহা বন্ধ রাখিয়া, আপনাকে কালি বাড়ীতেই থাকিতে হইবে।"

রামজীবন বলিলেন,—"শক্ত কাজ; বন্ধ রাখিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছি। কিছুতেই বন্ধ হইবে না, কাজেই যাইতে হইবে।"

বিনোদ বলিলেন,—"এখন সে পরামর্শ থাকুক। প্রাতে যাহা হয় স্থির করা হইবে।"

সে রাত্রিতে আর বিশেষ কোন কাজ হইল না। সকলেই নিতান্ত উদ্বিগ্ন মনে কল্য না জানি কি ঘটিবে ভাবিয়া ব্যাকুল চিত্তে, অনেক রাত্রিতে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রাতে উঠিয়া বিনোদ বলিলেন,—"আমি এখনই উত্তরপাড়া যাইব। রামদীন, দ্বারবান্, দুইজন, কনষ্টবল দুইজন, শ্রীরাম, তোমরা সকলে প্রস্তুত হও। খুড়া মহাশয় বাড়ী থাকুন।"

রামজীবন বলিলেন,—"বাড়ী থাকিলে চলিবে না—আমারও কাজ আছে—আমাকেও স্থানান্তরে যাইতে হইবে—আমিও প্রস্তুত হই।"

তাঁহারা গমনোদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় দুর্গাপুরনিবাসিনী এক দরিদ্রা মুসলমান-নারী কাঁদিতে কাঁদিতে তথায় উপস্থিত হইল এবং বিনোদের পাদ-মূলে নিপতিত হইয়া বলিল, —"আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, আমার মেয়ের ভেদ-বমি হইতেছে—মারা যায় যায় হইয়াছে। আপনি রক্ষা করুন।"

বিনোদ তাহাকে উঠিতে বলিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"ওলাউঠা হইয়াছে? ঔষধ কিছু দেওয়া হইয়াছে কি?"

স্ত্রীলোক বলিল,—"কোথায় পাইব? দিন যায় না—ঔষধ ডাক্তার কেমন করিয়া হইবে?"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি তোমাকে পাঁচটী টাকা দিতেছি। তুমি শীঘ্র বাটী গিয়া ডাক্তার-ডাক—ঔষধ আন। তাহার পর ওবেলা সংবাদ লইয়া যাহা করা উচিত আমি তাহার উপায় করিব।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"শুনিয়াছি তুমি দয়ার সাগর। এমন বিদ্যা নাই, যা তুমি জান না। তুমি এক বার আসিয়া দেখিলেই আমার মেয়ে ভাল হইবে।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি ডাক্তার নহি —আমার কাছে বিশেষ কোন ঔষধও নাই। ডাক্তার ডাকাই তোমার উচিত। বিলম্ব না করিয়া তুমি তাহারই চেষ্টা কর।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"তুমি যদি জবাব দেও, তবে আমার মেয়ে কিছুতেই বাঁচিবে না। শুনিয়াছি তুমি যা না পার, তা আর কেহ পারে না। আমার কপাল মন্দ, তাই তুমি টাকা দিয়া ডাক্তারের কথা বলিয়া বিদায় করিতেছ।"

স্ত্রীলোক খুব কাঁদিতে লাগিল। বিনোদ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আমি একবার যাইয়া তোমার মেয়েকে দেখিলে যদি তুমি সন্তুষ্ট হও, তাহা হইলে চল, আমি যাইতেছি। কিন্তু তোমাকে ডাক্তারও ডাকিতে হইবে, ঔষধও আনিতে হইবে।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"তুমি দেখিলে আর কিছুই করিতে হইবে না। তুমি যাহা মনে কর, তাহাই করিতে পার। বাবা, তুমি রাজা হও।"

বিনোদ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"তাহাই হউক, আমার ভয়ানক কাজ ছিল। খানিকক্ষণ তাহা বন্ধ রাখিতে হইল। চল, আগে তোমার কন্যাকে দেখিয়া আসি। রামদীন, রঘু, আর একজন কনষ্টবল আমার সঙ্গে চল।"

রামজীবন হাঁফ ছাড়িয়া বলিলেন,—"আমার বিশেষ কাজও এ বেলা বন্ধ থাকিল। চল, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই।"

অগ্রে স্ত্রীলোক, তৎপশ্চাতে রামজীবন, তাহার পর বিনোদ, তদনন্তর রামদীন, রঘু, কনষ্টবল ও একজন দ্বারবান্ যাত্রা করিলেন। আবার সেই ভয়ানক পুষ্করিণী! সেই নরহত্যার—বিনোদের পিতার কু-কীর্ত্তির নিদর্শন স্থল—সেই জলাশয়! বিনোদ একটু চঞ্চল হৃদয়ে, চারিদিকে শূন্য ভাবে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, সেই পুষ্করিণীর ধার দিয়া চলিতে লাগিলেন।

স্ত্রীলোক একটু দ্রুত চলিতে লাগিল।—বলিল,—"আমি একটু আগে যাই। মেয়েকে দেখিগে—সব ঠিক করিগে। তোমরা এস—চক্রবর্ত্তী ঠাকুর আমার বাড়ী জানেন।"

স্ত্রীলোক দৌড়িতে লাগিল। পুষ্করিণীর এক পার্শ্বে বন আছে, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সেই বনের নিকটস্থ হইলে, সহসা "রে রে" শব্দে পাঁচ ব্যক্তি সেই বনের মধ্য হইতে বাহির হইল এবং কথা কহিবার বা ভাবিবার সময় না দিয়া, বিনোদের মাথায় এক প্রচণ্ড লাঠির আঘাত করিল। বিনোদ তখনই "বাবাগো" শব্দে ভূ-পতিত হইলেন।

রামজীবন চক্রবর্ত্তী, ক্ষুধিত সিংহের ন্যায় লম্ফ দিয়া,সেই ব্যক্তিকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং বজ্র মুষ্টিতে তাহার ঘাড়ে এক কিল মারিলেন। সে চক্ষুতে অন্ধকার দেখিতে লাগিল, তাহার হাত হইতে লাঠি পড়িয়া গেল। তাহাকে রামজীবনের হাত হইতে উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে, অপর চারিজন আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। রামদীন ও দ্বারবান্ লাঠির আঘাতে তৎক্ষণাৎ দুইজনকে ধরাশায়ী করিল। বাকী দুইজন, একটু সরিয়া গিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর বেগে পলায়ন করিল। রামদীন ও দ্বারবান্ তাহাদের পশ্চাতে দৌড়িতে দৌড়িতে ক্রমাগত হস্তস্থিত লাঠির দ্বারা তাহাদের পায়ে মারিতে লাগিল। তাহারা পড়িয়া গেল। রামদীন তখন দ্বারবান্‌কে বলিল,—"তুমি এখানে থাক। যদি ইহারা উঠিতে, বা পলাইতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে পায়ে হাতে খুব মারিবে। প্রাণে মারিও না। আমি বাবুকে দেখিয়া আসি; ইহাদের বাঁধিবার জন্য দড়া লইয়া আসি।"

রামদীন আসিয়া দেখিল, কনষ্টবল পুষ্করিণী হইতে কাপড় ভিজাইয়া জল আনিয়া বিনোদের চক্ষুতে মুখে ও কপালে দিতেছে; রঘু তাঁহার মাথা কোলের উপর লইয়া রহিয়াছে; আর চক্রবর্ত্তী মহাশয় চাদর দিয়া বাতাস করিতেছেন।

রামদীন কাতরভাবে বলিল,—"মাথা হইতে অল্প রক্ত পড়িতেছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আঘাত কি গুরুতর বলিয়া বোধ করিতেছেন?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"না। এখনই জ্ঞান হইবে।"

রামদীন ও দ্বারবান্ প্রথমে যে দুই

ব্যক্তিকে আঘাত করিয়াছিল, তাহারা সংজ্ঞা-শূন্য ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে; কিন্তু চক্রবর্ত্তীর কিল খাইয়া যে ব্যক্তি ভূপতিত হইয়াছিল, সে এক্ষণে চক্ষু মেলিয়া চাহিতে লাগিল এবং সন্নিহিত লাঠি গাছটা হাত দিয়া সরাইয়া লইল। রামদীন তাহা লক্ষ্য করিয়া, ব্যাঘ্রের ন্যায় বেগে তাহার ঘাড়ে পড়িল। সে বলিল,—"কাজও হইল না, ধরাও পড়িলাম। ইহা কখনই হইবে না। ঐ বাবুকে খুন না করিলে আমাদের বখ্‌সিস্ মাটী।"

রামদীন বলিল,—"তবে যমের বাড়ী গিয়া বখসিস আদায় কর।"

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাথায় প্রচণ্ড লাঠি পড়িল। সে ব্যক্তি রক্তাক্ত কলেবরে ভূপতিত রহিল। চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"বেটাকে মারিয়া ফেলিয়াছ কি? বেশ করিয়াছ।"

রামদীন নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"বাবুর অবস্থা কি রূপ বুঝিতেছেন?"

রামজীবন বলিলেন,—"ভয় নাই; শীঘ্র চৈতন্য হইবে। তাহার পর ভাল করিয়া বুঝা যাইবে।"

রামদীন বলিল,—"এ লোকগুলাকে এই ভাবে মাঠে ফেলিয়া যাওয়া উচিত কি? সবগুলাই বাঁচিবে; কেবল এই হতভাগা যদি মরে।"

রামজীবন বলিলেন,—"না, ফেলিয়া যাওয়া হইবে না। এ দুইটার এখনই জ্ঞান হইবে। ইহারা উঠিয়া আবার অনিষ্ট করিতে পারে। তুমি, আমাদের সকলের চাদর দিয়া ইহাদের হাত পা আগে ভাল করিয়া বাঁধিয়া ফেল। মাঠে যে দুইজন পড়িয়া আছে তাহাদের কাছে দ্বারবান্ আছে। তাহারা পলাইতে পারিবে না।"

বিনোদ চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। বলিলেন,—"আঃ! আমরা কোথায়?"

রামদীন চাদর দিয়া দুইজনের হাত পা সুদৃঢ় রূপে বাঁধিয়া ফেলিল। আবার বিনোদের নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিল,—"বাবুর কি ভাব দেখিতেছেন?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"ভাল। তুমি খান দুই গরুর গাড়ির জোগাড় দেখিতে পার?"

রামদীন বলিল,—"পারি; কিন্তু এখন এখান হইতে যাইতে ভরসা হয় না। দূরে কে একজন আসিতেছে বোধ হয় না?"

যে ব্যক্তি প্রথমে চক্রবর্ত্তীর কিল খাইয়াছিল, শেষে রামদীনের লাঠির আঘাতে রক্তাক্ত কলেবর হইয়া পড়িয়াছিল, সে বলিয়া উঠিল,—"জল—একটু জল।"

চক্রবর্ত্তী কনষ্টবলকে বলিলেন,—"তুমি উহার মুখে একটু জল দেও। উহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা কর। জলে কাপড় ভিজাইয়া উহার আঘাত স্থানে বাঁধিয়া দেও।"

কনষ্টবল তাহাই করিতে লাগিল। যে লোক আসিতেছিল সে নিবারণ ঘোষ। সে নিকটস্থ হইলে সংক্ষেপে চক্রবর্ত্তী সমস্ত কাণ্ড তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন। সে বলিল,—"এরূপ হইবে তাহা আমরা জানি। ইহার চেয়েও ভয়ানক কাণ্ড হওয়াও অসম্ভব নহে। এ সকল রাসবিহারীর শেষ কালের মরণ কামড়।

রামজীবন বলিলেন,—"সে যাহা হউক, এক্ষণে এই লোকগুলাকে কি করিয়া চালান করি বল দেখি?"

নিবারণ বলিল,—"কোথায় পাঠাইতে চাহেন?"

রামজীবন বলিলেন,—কনষ্টবল সঙ্গে দিয়া হুগলী পাঠাইতে চাহি।"

"আমি গরুর গাড়ির সন্ধান করিব কি?"

"দুইখানি গাড়ি দেখ দেখি।"

বিনোদ চক্ষু মেলিয়া বলিলেন,—"বড় কষ্ট —মাথার মধ্যে বড় কষ্ট। খুড়া মহাশয় আমাকে বাড়ী লইয়া চলুন।"

রঘু বলিল,—"আমি আর রামদীন বাবুকে বেশ লইয়া যাইতে পারিব।"

রামদীন বলিল,—"সেই বেশ। আমরা বাবুকে লইয়া যাই। আপনি এ সকল লোকের ব্যবস্থা করিয়া আসুন।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"তাহা হইবে না। আমাকেও তোমাদের সঙ্গে থাকিতে হইবে।" কনষ্টবলকে জিজ্ঞাসিলেন,—"ও লোকটার অবস্থা কি বুঝিতেছ?"

কনষ্টবল বলিল—"বাঁচিলে বাঁচিতে পারে। বেশ নিশ্বাস ফেলিতেছে। ঘুমাইয়া পড়িয়াছে বোধ হয়। মাথার হাড় ফাটে নাই; চামড়া ফাটিয়া গিয়াছে।"

যে দুইজন হাত-পা বাঁধা পড়িয়াছি , তাহার মধ্যে একজন বলিল—"আমা র তোমরা কি করিবে?"

রামদীন বলিল,—"যমালয়ে পাঠাইয়া তোমাদের উপকার করা হইল না। এখন হুগলী পাঠাইয়া গারদে পচাইব মনে করিয়াছি। তা, তোমাদের কি ইচ্ছা? আমাদের বৈঠকখানায় বসিয়া খাজা কাঁটাল আর ক্ষীর খাইতে চাহ কি?"

তাহারা চুপ করিয়া রহিল। বিনোদ আবার বলিলেন,—"আমার মাথায় জল ঢালা বন্ধ না হয়। রক্ত জমিতে না পায়।"

রামদীন একটা ভাঙ্গা হাঁড়ি সংগ্রহ করিয়া জল আনিল এবং ক্রমাগত ধীরে ধীরে তাহা হইতে আহত স্থানে জল ঢালিতে লাগিল।

দ্বারবান্ দূরে যে দুই জনের নিকট দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের পায়ে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল। নড়িবার ও দাঁড়াইবার ক্ষমতা ছিল না। তাহারা ভূশয্যায় পড়িয়া দ্বারবানকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল।

রামদীন যাহার মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিল, সে বলিয়া উঠিল,—"আমি উঠিয়া বসিতে চাহি। একটু জল দেও!"

কনষ্টবল বলিল,—"জল খা। শুইয়া থাক, শুয়ার।"

দূরে দুইখানি। গরুর গাড়ি আসিতেছে দেখা গেল। বিনোদকে রামজীবন জিজ্ঞাসিলেন,—"বাবা, এখন কেমন বুঝিতেছ?"

বিনোদ বলিলেন,—"মস্তিষ্কে আঘাত লাগায় আমি অজ্ঞান হইয়াছিলাম মাত্র—বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় নাই বোধ হয়। আমাকে বাটী লইয়া চলুন; খানিকটা নিদ্রা হইলে আমার বিশেষ উপকার হইবে।"

রামজীবন বলিলেন,—"এই ডাকাইত গুলাকে গরুর গাড়ি করিয়া, কনষ্টবলের সঙ্গে হুগলী চালান দিতেছি। তুমি কি বল?"

বিনোদ বলিলেন,—"বেশ; কিন্তু সে মাগীটাকেও এই সঙ্গে চালান দেওয়া উচিত। সেও এই চক্রান্তের একজন।"

রামজীবন বলিলেন,—"তাহাকে আমি জানি। পরে তাহাকে ধরা যাইবে। এখন ইহারাই যাউক।"

গাড়ি আসিল। একে একে সকলকেই গাড়িতে উঠান হইল। গাড়িতে দড়া ছিল। তাহা দ্বারা কাহারও হাত, কাহারও পা, কাহারও উভয়ই, গাড়ির সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হইল। যে লোকটার মাথা ফাটিয়া গিয়াছিল, সে যাহাতে শুইয়া যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইল। কয়েক আটী বিচালী দিয়া তাহার বিছানা ও বালিশ করিয়া দেওয়া হইল।

কনষ্টবল বলিল,—"এত গুলা আসামী লইয়া একা লওয়া উচিত হয় না। পথে অনেক উৎপাত ঘটিতে পারে।"

রামজীবন কথাটা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন। বলিলেন,—"ঐ পথ দিয়াই যাইতে হইবে। যদি দরকার বোধ কর, তাহা হইলে তোমার জুড়িদারকে সঙ্গে করিয়া লও। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, ঠিক ঠিক থানায় লিখাইয়া দিও। ঐ লোকটাকে হাঁসপাতালে পাঠাইতে হইবে বোধ হয়। তুমি গোটা দুই টাকা লইয়া যাও। পথে দরকার মত খরচ করিও।"

রঘুর নিকট টাকা ছিল। সে কনষ্টবলের হাতে দুই টাকা প্রদান করিল। কনষ্টবল বলিল,—"আমরা দুই জনেই যাওয়া ঠিক নহে। এখানে কখন কি হয় বলা যায় না। একজনও বাবুর কাছে না থাকা ভাল নহে।"

রামজীবন বলিলেন,—"তাহা হইলে তোমার সঙ্গে অন্ত এক জনকে দিতেছি। তুমি থানায় লেখাপড়া শেষ করিয়া এবং আসামী-দিগকে বুঝাইয়া দিয়াই চলিয়া আসিবে। এখন বেলা নয়টা। বেলা ১টার মধ্যে নিশ্চয়ই গরুর গাড়ি হুগলী পৌঁছিবে। লেখাপড়া, হাঁস-পাতালে যাওয়া ইত্যাদিতে জোর দুই ঘণ্টা লাগিবে। খাওয়া দাওয়াতেও এক ঘণ্টা। তাহার পরে ঘোড়ার গাড়ি করিয়া আসিলে তুমি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই এখানে ফিরিয়া আসিতে পারিবে।"

সে বলিল,—"নিশ্চয়ই পারিব।"

রামজীবন বলিলেন,—"নিবারণ, তুমি এই সঙ্গে যাও; আবার সন্ধ্যার মধ্যে ঘুরিয়া আসিতে পারিবে।"

বিনা বাক্যে নিবারণ কনষ্টবলের সঙ্গী হইল। গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

তখন দ্বারবান্, রামদীন, রঘু ও রাম-জীবন এক এব জন বিনোদের পৃষ্ঠদেশ দিয়া অপরের হস্ত ধারণ করিলেন। দেহের প্রধান স্থান গুলিই আশ্রয় পাইল। সেই অবস্থায় বিনোদকে তুলিয়া, রামজীবন জিজ্ঞাসিলেন,—"কষ্ট হইতেছে কি বাবা?"

বিনোদ বলিলেন,—"না।"

ধীরে ধীরে তাঁহারা চলিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই অবস্থায় ধরাধরি করিয়া বিনোদকে চক্রবর্ত্তীর বাটীতে আনিয়া ফেলা হইল এবং বাটীর মধ্যে এক নিভৃত কক্ষে শয্যা প্রস্তুত করিয়া শয়ন করান হইল। একবার বিনোদের নিদ্রা-ভঙ্গ হইলে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ সেবন করান হইল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্ত্রী ও কন্যা অবিশ্রান্ত-ভাবে বিনোদের শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। আহত স্থানে নিরন্তর জল-ধারা প্রদত্ত হইতে লাগিল। বৈকালে বিনোদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। রামজীবন অতীব উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন কেমন বুঝিতেছ, বাবা?"

বিনোদ বলিলেন,—"কোন ভয় নাই। শরীর সুস্থ হইয়াছে। যে স্থানে লাঠি মারি-য়াছে সেই স্থানটায় অতিশয় বেদনা ভিন্ন অন্য কোন কষ্ট নাই।"

রামজীবন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিছু আহার করিবে কি?"

বিনোদ বলিলেন,—"এরূপ আঘাতে জ্বর হওয়ার আশঙ্কা আছে। অতএব অন্নাদি কোন

পদার্থ না থাকিয়া, একটু একটু দুধ খাইয়া থাকাই ভাল।”

চক্রবর্ত্তীর ব্রাহ্মণী বলিলেন,—“তবে বাবা এখন আর একটু দুধ আনি।”

বিনোদ বলিলেন,—“আচ্ছা।”

দুধ আসিল এবং ঝিনুকে করিয়া ধীরে ধীরে বিনোদের মুখে দেওয়া হইল। দুধ খাওয়ার পর, বিনোদ বলিলেন,—“একবার উঠিবার চেষ্টা করিতে ইচ্ছা করিতেছি।”

রামজীবন বলিলেন,—“কাজ নাই। আজি উঠা হইবে না। তাহা হইলে মূর্চ্ছা যাইতে পার।”

বিনোদ বলিলেন,—“আমার অনুগত লোকজনদের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।”

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—“তাহাদের সকলকে ডাকিয়া আনিতেছি। তিনি বাহিরে গমন করিলেন। তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা মাথার কাপড় আর একটু টানিয়া দিয়া, বিনোদের পার্শ্বেই বসিয়া রহিলেন। চক্রবর্ত্তীর সহিত শ্রীরাম, রামদীন, দুইজন দ্বারবান্ ও কনষ্টেবল তথায় প্রবেশ করিল।

বিনোদ বলিলেন,—“তোমরা বোধ হয় আমার জন্য বড়ই চিন্তিত আছ। আমি এখন ভাল আছি। শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেও উঠিতে পারি; কিন্তু পাছে অসুখ বাড়ে এই অশঙ্কায় এখন উঠিতেছি না। শ্রীরাম, তোমার সে লোকেরাও আসিয়া পৌঁছে নাই?”

শ্রীরাম বলিল,—“আজ্ঞা না। বোধ হয় সন্ধ্যার মধ্যে আসিবে।”

বিনোদ বলিলেন,—“আসিলে তাহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। আমার সহিত আজি আর তাহাদের সাক্ষাৎ হইবে না। কালি প্রাতে আমি উঠিতে পারিব; তখন তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা হইবে।

রামদীন বলিল,—“আমাদিগের প্রতি এখন আর কোন হুকুম আছে কি?”

বিনোদ বলিলেন,—“খুড়া মহাশয়ের ভয়ে আমি বলিতে পারিতেছি না; কিন্তু না বলিলেও চলিতেছে না। আজি রাত্রি যে আমাদিগের নির্ব্বিঘ্নে কাটিবে এমন বোধ হয় না। তোমরা সকলে বিশেষ সাবধান থাকিবে। রঘুকে বলিবে, ট্রঙ্ক হইতে আমার রিভলভার বাহির করিয়া, যেন ছয়টা ঘরেই টোটা পুরিয়া রাখে। তোমরাও সকলে ভাল ভাল লাঠি ঠিক করিয়া রাখিবে।”

কনষ্টেবল বলিল,—“হুজুর একখানা তলোয়ার পাইবার উপায় নাই কি? আমার হাতে তলোয়ার থাকিলে আমি একশত জনের মোহড়া লইতে পারি।”

বিনোদ বলিলেন,—“আমি তলোয়ার সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিতাম; কিন্তু রক্তপাত করা আমার ইচ্ছা নহে। যদিই কোন শত্রু আইসে, তোমরা লাঠি দ্বারা তাহার হাত পা ভাঙ্গিয়া দিবে, ইহাই আমার ইচ্ছা। তবে যে রিভলভার ঠিক করিয়া রাখিতে বলিলাম, নিতান্ত ভয়ানক প্রয়োজন উপস্থিত না হইলে তাহার ব্যবহার হইবে না। নিবারণ আর কনষ্টেবল কতক্ষণে ফিরিয়া আসিবে, খুড়া মহাশয়?”

রামজীবন উত্তর দিলেন,—“সন্ধ্যার মধ্যে তাহারা নিশ্চয়ই ফিরিবে।”

বিনোদ বলিলেন,—“তোমরা এখন বাহিরে যাইতে পার। আমার নিকট কাহারও থাকিবার প্রয়োজন নাই। খুড়ী মা ও দিদি ঠাকুরাণী আমাকে যেরূপ যত্ন করিতেছেন, তাহাতে আর কাহারও কোন প্রকার সাহায্য অনাবশ্যক।”

একজন দ্বারবান্ বলিল,—"সন্ধ্যার পর হইতে আমরা দুইজন এই ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া পাহারা দিব।"

বিনোদ বলিলেন,—"তাহার কোন প্রয়োজন নাই। কেবল আমাকে রক্ষা করাই দরকার নহে; আমাদিগের প্রত্যেককেই বাঁচিতে হইবে, অথচ শত্রুদিগকে ধরিয়া ফেলিতে হইবে। কোনরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে, প্রয়োজন মত ব্যবস্থা হইবে।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় ব্যতীত, পুরুষেরা সকলেই প্রস্থান করিল।

বিনোদ বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়, সন্ধ্যার আগেই খুড়ী মা, দিদি ও ছোট ছোট ছেলেদের অন্ত কোন গৃহস্থের বাটীতে রাখিয়া আসিতে হইবে।"

রামজীবন বলিলেন,—"তুমি যেরূপ ব্যবস্থা করিতেছ, তাহাতে বোধ হইতেছে, আজি আমাদিগের ভয়ানক বিপদ হইবে বলিয়া তোমার আশঙ্কা হইতেছে। আমার ইচ্ছা, এই সময়ে তোমাকেও স্থানান্তরে রাখিয়া আসি।"

বিনোদ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"তাহাই যদি হইবে খুড়া মহাশয়, তবে তো আমি এখানে না আসিলেও চলিত। প্রাণের মায়া আমি অনেক দিন ত্যাগ করিয়াছি। অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত, নরাধম রাসবিহারীকে সজীব অবস্থায় আমি ধরিব, ইহাই আমার সঙ্কল্প। আমি দূরে থাকিলে আমার সকল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আপনি আমাকে যেরূপ স্নেহ করেন, তাহাতে আমার জীবনের জন্যই আপনার চিন্তা হইতেছে; কিন্তু আপনি আমার উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাইতেছেন। আপনি আজি প্রাতে যে অসীম সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমি বুঝিয়াছি, ভয় কাহাকে বলে তাহা আপনি জানেন না স্নেহের প্রাবল্যে আপনি আমাকে ভয়াতুর ব্যক্তির ন্যায় সাবধান করিতেছেন।"

রামজীবন নীরব।

দিন প্রায় কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎপূর্ব্বে কনষ্টবল ও নিবারণ আসিয়া পৌঁছিল। সন্ধ্যার অনেকক্ষণ পরে নগরঘাটা হইতে তিন জন মুসলমান আসিল। শ্রীরাম তাহাদিগকে যত্ন করিয়া এক পল্লীবাসীর খালি ঘরে রাখিয়া আসিল। গরফুর ভগ্নী আইসে ন'ই; যে মুহূর্ত্তে আবশ্যক হইবে, তখনই সে আসিবে, ইহাই স্থির হইয়াছে। অদ্য রাত্রির সম্ভাবিত বিপদের কথা শ্রীরাম মুসলমানদিগকে জানাইয়া রাখিল। তাহারা উৎসাহ সহকারে যথাসময়ে সংবাদ প্রাপ্তির প্রার্থনা করিল। নিবারণ আহারাদির পর, প্রকাণ্ড লাঠি লইয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চণ্ডী-মণ্ডপে অন্যান্য সকলের সহিত মিশিয়া, গল্প গুজব করিতে লাগিল।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। কোন প্রকার বিপদের কোন লক্ষণই উপস্থিত হইল না। নানাপ্রকার জল্পনা চলিতে থাকিল। সকলেই স্থির করিল, আজি প্রাতে যে কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহার পর তাহাদিগের নিকটস্থ হইতে কাহারও সাহসে কুলাইবে না।

বিনোদ ভালই আছেন। সন্ধ্যার পর হইতে নিদ্রা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিতেছে না। তিনি নিতান্ত সতর্ক ভাবে শয্যায় পড়িয়া আছেন। প্রত্যেক শব্দ তাঁহাকে বিচলিত করিতেছে। কিসের শব্দ, কেন হইল, জানিবার নিমিত্ত তিনি ব্যাকুল হইতেছেন। রামজীবন একবার ভিতর, একবার বাহির, করিতেছেন এবং বিনোদের কৃত বিবিধ

প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। বাটীতে একজনও স্ত্রীলোক বা শিশু নাই।

রজনী জ্যোৎস্নাময়ী। সুধাংশুর স্নিগ্ধোজ্জ্বল কৈৰকরে বসুন্ধরা সমাচ্ছন্ন। ধীরে ধীরে মৃদু পবন-হিল্লোলে বৃক্ষ-শাখা ও লতিকাগ্র হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য করিতেছে। পৃথিবী নিস্তব্ধ। নিদ্রার সর্ব্বসন্তাপনাশক ক্রোড়ে, রামজীবন চক্রবর্ত্তীর ভবনস্থ ব্যক্তিবৃন্দ ব্যতীত তাবতেই শান্তি সম্ভোগ করিতেছে। সে শান্তি-ভঙ্গ করিয়া, সেই নীরবতা বিনাশ করিয়া সেই দৃশ্যের পবিত্রতা বিধ্বংস করিয়া, সহসা এককালে চতুর্দ্দিক্ হইতে শব্দ হইয়া উঠিল, "মার, মার।" তৎক্ষণাৎ চণ্ডীমণ্ডপস্থ ব্যক্তিবৃন্দ, যেন যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায়, লাঠি হস্তে প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইল এবং "রে রে" শব্দে চারিদিকে ধাবিত হইল। মাথায় ভিজা কাপড় বাঁধিয়া ও রামজীবনের স্কন্ধাশ্রয় করিয়া বিনোদ চণ্ডীমণ্ডপে আসিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"আমি আসিয়াছি, কোন ভয় নাই, কেহই যেন পলাইতে না পারে।"

দূরে ও নিকটে, পার্শ্বে ও পশ্চাতে "মার, মার" "ধর ধর", "ঐ যায়", "বাবা গো", "মা গো" শব্দে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হইয়া উঠিল। যে তিন জন মুসলমান অপর গৃহস্থের বাটীতে শয়ন করিয়াছিল, তাহারাও বাঁশ হাতে লইয়া আসিয়া যোগ দিল। শত্রুরা বাটীর চারিদিক ঘেরাও করিয়াছিল এবং তাহারা সংখ্যায় পঁচিশ জনের কম ছিল না। আমাদিগের লিখিতে যে সময় যাইতেছে ইহারই মধ্যে রামদীন, নিবারণ ও বংশীবলদয়ের আঘাতে অনেকগুলি শত্রু ধরণীশায়ী হইল; কিন্তু এ পক্ষেও একজন দ্বারবান্ বড়ই আঘাত পাইল। তখন শত্রুরা চারিদিক হইতে একত্রিত হইয়া, এক স্থানে মিলিত হইল। বিনোদের পক্ষীয় লোকেরা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বিনোদ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"যেন কেহই পলাইতে না পারে। কেবল পায়ে আঘাত করিবার চেষ্টা করিও।"

শত্রুদিগের নিকট কয়েকখানি তরবারি ও সড়কি ছিল।

বিনোদ বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়, আপনি দেখিয়াছেন কি, শত্রুদিগের মধ্যে রাসবিহারী নিজে আছে?"

রামজীবন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ লোকটা?"

বিনোদ দেখাইয়া বলিলেন,—"যাহার মুখে মুখোস।

রামজীবন বলিলেন,—"তুমি ক্ষণেক পিস্তল লইয়া এই দেওয়াল হেলান দিয়া, এই স্থানটায় বসিয়া থাক, আমি একবার দেখিয়া আসি।"

বিনোদ তাহাই করিলেন। তখন রামজীবন মাথায় চাদর বাঁধিয়া এবং প্রকাণ্ড এক পাকা লাঠি হাতে লইয়া, চণ্ডীমণ্ডপ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং "মার মার" শব্দে ধাবিত হইলেন। অগ্র-পশ্চাৎ কোন বিচার না করিয়া, তিনি একেবারে শত্রুদিগের মধ্যবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন। অদ্ভুত লাঠি চালানর ক্ষমতা! দেখিতে দেখিতে তিন জন ধরাশায়ী হইল। অবশিষ্টেরা হটিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু পশ্চাৎ হইতে রামদীন ও নিবারণ তাহাদের উপর নিরন্তর লাঠি প্রহার করিতে লাগিল। তখন যাহার মুখে মুখোস, সে চীৎকার করিয়া বলিল,—"যে লোকটা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আছে, তাহাকে যদি ধরিয়া আনিতে পার, অথবা

মারিয়া ফেলিতে পার, তাহা হইলে যাহা চাহিবে তাহাই আমি বখ্‌সিস্‌ দিব।"

তখন অগ্রসর হওয়াই শত্রুপক্ষীয় লোকদিগের এক মাত্র লক্ষ্য রহিল এবং তাহারা আত্মরক্ষা বা শত্রুনিপাত ভুলিয়া গেল। তখন রামজীবন, রঘু, দ্বারবান্‌ এক জন, মুসলমান তিন জন ও কনষ্টবল দুই জন, শত্রুরা যাহাতে এক পাও অগ্রসর হইতে না পারে, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুতরাং এক স্থানেই উভয় পক্ষীয় লোক সম্মুখীন হইল এবং সেই স্থানে তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল।

একজন মুসলমান বড়ই আহত হইল। রামদীনের বাম হস্তে বর্শা বিদ্ধ হইল। সে তাহাতে দৃক্‌পাতও না করিয়া, বর্শা বাহির করিয়া ফেলিল এবং সমান লাঠি চালাইতে লাগিল। একজন কনষ্টবল ভূপতিত হইল, বিপক্ষদিগেরও অনেক লোক অকর্ম্মণ্য হইল।

রামজীবন চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"ভাই সব, যাহার মুখে মুখোস উহাকে যেমন করিয়াই হউক, ধরিতে হইবে। চারি দিক হইতে লাঠি চালাও।"

শত্রুপক্ষে যাহাদিগের হস্তে তরবারি ছিল তাহারা বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না; কেন না লাঠির আঘাতে অনেকগুলি তরবারি ভগ্ন হইয়া গেল। সড়কি চালাইতেও যেরূপ ব্যবধানের প্রয়োজন, তাহা না থাকায় সড়কি-ওয়ালাদের বিশেষ সুবিধা হইতেছিল না। তথাপি বিপক্ষেরা সংখ্যায় বিনোদের পক্ষ অপেক্ষা বেশী। এই সংখ্যা-বাহুল্য হেতু তাহারা ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিল। এক পা এক পা করিয়া ক্রমে তাহারা চণ্ডীমণ্ডপের নিকটে আসিয়া পড়িল। রামজীবন ভয়ে আকুল হইয়া উঠিলেন।

মুখোসওয়ালা বলিল,—"ঐ থামের আড়ালে বসিয়া আছে। সড়কি দিয়া বিঁধিয়া ফেল। বখ্‌সিস্‌ যে যাহা চাহিবে সে তাহাই পাইবে।"

রামজীবন প্রাণপণে লাঠি চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু বুঝি সকল চেষ্টাই বিফল হয়! বুঝি তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া শত্রুরা চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া পড়ে!

সহসা সেই আর্ত্তনাদ, প্রহারধ্বনি ও উভয় পক্ষের চীৎকার শব্দ পরাভূত করিয়া, নৈশ নিস্তব্ধতা বিনাশ করিয়া এবং সমস্ত প্রকৃতিকে বিচলিত ও বিকম্পিত করিয়া, কোমল সুমধুর নারী-কণ্ঠ হইতে উচ্চ শব্দ উঠিল,—"ধরিয়া ফেল! বাঁধিয়া ফেল! মারিয়া ফেল! প্রত্যেক ব্যক্তির নিমিত্ত সহস্র মুদ্রার তোড়া আমার পাল্কির মধ্যে প্রস্তুত রহিয়াছে।"

বিনোদ চমকিত হইয়া উঠিলেন; তাঁহার চক্ষুতে জল আসিল। একি! অপরাজিতার কণ্ঠস্বর! তখনই দশ জন ভীমকায় পুরুষ, পশ্চাৎ হইতে আসিয়া, বেগে শত্রুদিগকে জড়াইয়া ধরিল এবং প্রত্যেকে মল্লযুদ্ধে অপরকে পরাভূত করিয়া ভূপাতিত করিল। তখন উভয় পক্ষই লাঠি তরবারি ও সড়কি পরিত্যাগ করিল। বিনোদের পক্ষীয় লোকেরা আসিয়া সেই মল্লযুদ্ধে যোগ দিল। সংখ্যার বাহুল্য হেতু, শত্রুরা সহজেই পরাভূত হইল।

তখন নবাগত বীরেরা বলিল,—"মা জি, সকলকে মারিয়া ফেলি?"

সেই নারীকণ্ঠে আদেশ হইল,—"না। গ্রামে সকলের বাটীতেই কুয়া আছে, সুতরাং দড়া আছে। নিকটের সকল গৃহস্থই জাগিয়া উঠিয়াছে। সকল বাটী হইতে দড়া আনিয়া প্রত্যেক লোকের হাত-পা কঠিনরূপে বাঁধিয়া ফেল।"

তখন শ্রীরাম দড়া আনিতে ছুটিল। রাম-

জীবন বিনোদের নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"বাবা, একি ভগবতী আমাদের সহায় হইয়াছেন ?

বিনোদ বলিলেন,—"অপরাজিতা আসিয়াছেন। আপনি দেখুন, কোথায় তিনি।"

শ্রীরাম আট-দশ গাছ দড়া লইয়া ফিরিল। তখন শত্রুপক্ষীয় প্রত্যেক লোকের হস্ত-পদ একত্রিত করিয়া দৃঢ় নিবদ্ধ করা হইল। যে ব্যক্তি বল প্রকাশ করিয়া আপত্তি করিতে লাগিল, নবাগত বীরেরা তাহার বুকে পা দিয়া তাহাকে পরাজিত করিল।

সমস্ত বন্ধন-কার্য্য শেষ হইলে, সেই নারী-কণ্ঠে পুনরায় শব্দ হইল, "আমার ভাই কোথা ?"

রামজীবন বিনীতভাবে বলিলেন,—"মা, আমি বিনোদের খুড়া; আপনি আমার সঙ্গে আসুন। বিনোদ সুস্থ আছেন।"

পাল্কীর মধ্য হইতে দুই জন পরিচারিকা দুইটী লণ্ঠন হস্তে বাহির হইল এবং সেই দেবীর উভয় পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, রামজীবন হুগলীতে অপরাজিতার অনেক গুণের পরিচয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু কখন তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। এক্ষণে তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, এত রূপ মনুষ্যের কখনই হয় না। বলিলেন,—"মা, আসুন।"

ধীরে ধীরে, কম্পিত কলেবরে অপরাজিতা রামজীবনের পশ্চাতে চলিলেন। পরিচারিকারা লণ্ঠন লইয়া পার্শ্বে পার্শ্বে চলিল। চণ্ডীমণ্ডপের সিঁড়িতে উঠিবার সময় অপরাজিতার পদদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল, যেন দেহভার বহনে অসমর্থ হইল। তখন তিনি একজন পরিচারিকার হস্তাশ্রয় করিলেন। বিনোদ, ক্ষীণ শরীরে, বিকম্পিত পদে উঠিয়া অগ্রসর হইবার নিমিত্ত, পা বাড়াইলেন। অপরাজিতা চণ্ডী-মণ্ডপে উঠিয়া, কম্পিত কাতর কণ্ঠে বলিলেন,—"ভাই আমার, দাদা আমার, তুমি নাকি আহত হইয়াছ ?"

তৎক্ষণাৎ সেই অপাপবিদ্ধা স্নেহময়ী সুন্দরী সংজ্ঞাহীনা হইয়া ছিন্ন-মূল পাদপের ন্যায়, বিনোদের চরণ-সমীপে পড়িয়া গেলেন। তখন বিনোদ ও রামজীবন পরিচারিকাদিগকে লইয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। মুখে ও চক্ষুতে জল প্রয়োগ এবং বায়ু-ব্যজন হইতে লাগিল। রামজীবনের আদেশে শ্রীরাম একটা লণ্ঠন লইয়া বাটীর মহিলাদিগকে আনিতে গেল। শীঘ্রই অপরাজিতার মোহ অপনোদিত হইল। তখন তিনি বলিলেন,—"বিনোদ কই ? আমার নিকটে আইস দাদা। তোমার শরীরে কোথায় প্রহার করিয়াছে ? আঘাত কি গুরুতর হইয়াছে ?"

বিনোদ বলিলেন,—"না। সামান্য আঘাত, ভয়ের কোন কারণ নাই। কিন্তু বড় অসমসাহসের কার্য্যই তুমি করিয়াছ। তুমি এতদূর করিবে ইহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"এখানে অনেক পুরুষ। আমাকে বাটীর মধ্যে লইয়া চল।"

তখন শ্রীরামের সহিত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্ত্রী ও কন্যা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা পরম সমাদরে এই সুর-সুন্দরীকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গেলেন।

ক্রমে উষার পিঙ্গলমূর্ত্তি দেখা দিল এবং প্রভাতের মধুর বায়ু আহত ও শ্রম-কাতর ব্যক্তিবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রামজীবন প্রভৃতি সকলকে ডাকিয়া, বিনোদ বলিলেন,—“নানা স্থানে নিপতিত উভয় পক্ষের আহত ব্যক্তিগণকে সাবধানে এক স্থানে আনিয়া দেওয়া আমাদের এখন প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।”

তখন সেই নবাগত দশজন বীর ও রামজীবন আহতগণকে তুলিয়া এক স্থানে আনয়ন করিতে লাগিলেন। পনর জন আঘাত পাইয়াছে। হত একজনও হয় নাই। নাগের পক্ষের দশজন ও বিনোদের পাঁচজন আঘাত পাইয়াছে। কাহারও হাত ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে। কাহারও অসির আঘাতে দেহের স্থানবিশেষের মাংস ও চর্ম্ম ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, কাহারও দেহ হইতে দর দর ধারায় রুধির পড়িতেছে, কেহ বা মোহাচ্ছন্ন হইয়াছে, কেহ বা যন্ত্রণা হেতু কাতরতা প্রকাশ করিতেছে। বিনোদ সকলকেই সমান যত্নে শুশ্রূষা করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শ্রীরাম ও রঘু সেই কার্য্যের ভার পাইল। নবাগত দশজনও ইচ্ছা পূর্ব্বক এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। কাহারও মুখে ও মাথায় শীতল জল দেওয়া হইতে লাগিল। মাদুর বিছাইয়া ও বালিশ মাথায় দিয়া সকলকেই শয়ন করান হইল। সকলেরই ক্ষত স্থান সমূহ রেড়ির তৈল ও তুলা দিয়া উত্তমরূপে বাঁধিয়া দেওয়া হইল। আবশ্যকানুসারে কাহারও দেহের স্থান বিশেষে শীতল জলের ধারা দেওয়া হইতে লাগিল। রাসবিহারীর গ্রামে একজন ডাক্তার আছেন। তাঁহাকে ডাকিবার নিমিত্ত নিবারণ গমন করিল। প্রচুর দুগ্ধ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত রামজীবন লোক পাঠাইলেন।

সেই বাটীর পশ্চাতে বনের পার্শ্বে দুই খানি পাল্কী পড়িয়া রহিয়াছে। বাহকগণ এই সকল ভয়ানক কাণ্ড দেখিবার নিমিত্ত পাল্কী ছাড়িয়া এই দিকে আসিয়াছে। বিনোদ বলিলেন,—“খুড়া মহাশয়, দেখুন দেখি পাল্কীতে কিছু আছে কি না। অপরাজিতার কথার ভাবে আমার বোধ হইয়াছিল, তাঁহার সঙ্গে অনেক টাকা আছে।”

রামজীবন পাল্কীর নিকট গিয়া দেখিলেন, প্রত্যেকের মধ্যে একটী করিয়া প্রকাণ্ড ষ্টীল ট্রঙ্ক। তিনি তাহা তুলিয়া আনিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু বড় ভারী; পারিলেন না। তখন তিনি ও একজন দ্বারবান্ ধরাধরি করিয়া একে একে সেই ট্রঙ্ক আনিয়া চণ্ডীমণ্ডপে ফেলিলেন।

ক্রমে লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। রাত্রিতে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে ডাকাইত পড়িয়াছিল। কেহই পলাইতে পারে নাই, সকলকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। অনেকে মারা পড়িয়াছে। জনরব, ইত্যাদি নানা কথা অচিরে বহু দূরে বহন করিয়া লইয়া চলিল। স্ত্রী ও পুরুষ, বালক ও বালিকা এই কাণ্ড দেখিবার নিমিত্ত, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখস্থ অঙ্গন ও পথ ছাইয়া ফেলিল। স্থানাভাবে ক্রমে বন-জঙ্গল ভাঙ্গিয়াও লোক দাঁড়াইতে লাগিল। তিন ক্রোশ দূরের লোকও ছুটিয়া আসিতে লাগিল। কোলাহলে সেখানে যেন হাট বসিয়া গেল। বেলা যখন সাতটা তখন চণ্ডীমণ্ডপ হইতে যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই কেবল মনুষ্যমস্তক ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না।

আহতগণের শুশ্রূষার ব্যবস্থা ঠিক চলি-

তেছে দেখিয়া বিনোদ দারবান্ ও কনষ্টবলকে ডাকিয়া, বলিলেন,—"তোমরা ঐ লোকটার মুখের মুখোস খুলিয়া ফেল। খুড়া মহাশয়, আপনি আমার নিকটে আসুন।"

মুখোস খুলিতে দিতে সে লোক বড়ই আপত্তি করিতে লাগিল। তখন কনষ্টবল তাহার বুকে পা দিয়া দাঁড়াইল, কাজেই আর নড়াচড়া চলিল না। মুখোস খুলিয়া ফেলিলে, চারিদিক হইতে শব্দ উঠিল,—"রাসবিহারী বাবু!" "আরে না, সে কেন ডাকাইতি করিবে;" "ডাকাইতি তো নয়, ঐ বাবুকে মারিবার জন্য চেষ্টা।" "সেই বটে।" "বেশ হইয়াছে খুব, হইয়াছে!" "যেমন পাপ তার তেমনই সাজা!" "ধর্ম্ম আছেন মাথার উপরে!" এই বা হইয়াছে কি?" ইত্যাদি নানা প্রকার শব্দ চারিদিক্ হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। একটা লোকও আহা করিল না, কেহ হায় হায় করিল না।

বিনোদ বলিলেন,—"মুখোস না খুলিলেও আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি রাসবিহারী নাগ। বুঝিয়াছ তুমি, এ পর্য্যন্ত তোমার দ্বারা যত অত্যাচার ঘটিয়াছে, তাহার শাস্তি ভোগ করিবার সময় এত দিনে উপস্থিত হইয়াছে।"

চীৎকার করিয়া রাসবিহারী বলিল,—"কাহার সাধ্য আমাকে শাস্তি দেয়?"

বিনোদ বলিলেন,—"শাস্তি দিবার কর্ত্তা গবর্ণমেণ্ট। সেই গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সাহেব ও অন্যান্য লোক তোমাকে এখনই গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছেন। আদালতে বিচার হওয়ার পর তোমার উচিত মত শাস্তি হইবে। আপাততঃ তুমি আমার হাতে বাঁধা পড়িয়াছ।"

রাসবিহারী হা শব্দে হাসিয়া বলিল,—"তোমার হাতে? আমাকে বাঁধা কি তোমার সাধ্য। পাল্কী করিয়া যে আসিল সে তে মার কে?"

বিনোদ বলিলেন,—"আমার ভগ্নী।"

রাসবিহারী বলিল,—"বেশ ভগ্নী তো তোমার! এমন ভগ্নী তুমি কোথায় পাইলে? আগে তো তোমার ভগ্নী ছিল না। তোমার সেই ভগ্নীই আমাকে বাঁধিয়াছে। তুমি যদি এক রাত্রি মাত্র তোমার ঐ ভগ্নীকে আমার কাছে দেও, তাহা হইলে আমি, হাত-পা বাঁধা কেন, ফাঁসি কাঠে গলা ঝুলাইয়া দিতেও পারি।"

রামজীবন বলিলেন,—"ছুঁচো বেটা! মুখ সামলাইয়া কথা কহ। লাথি মারিয়া মুখ ছিঁড়িয়া দিব।"

বিনোদ বলিলেন,—"ছি খুড়া, উহার মত ক্ষুদ্র জীবের কথায় রাগ করিতে আছে কি? দেখ রাসবিহারী, তুমি আমার পিতা যদুপতি মিত্র মহাশয়ের কোন সংবাদ বলিতে পার কি?"

রাসবিহারী বলিল,—"পারি। সে জগদ্বন্ধু বোসকে খুন করিয়া ডাকাত হইয়াছে।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"আর কোন সংবাদ তুমি জান না?"

রাসবিহারী বলিল,—"জানি; কিন্তু তোমাকে বলিব কেন? তোমার ঐ ভগ্নী যদি আমার বৈঠকখানায় গিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে তাহার কাণে কাণে সব কথা বলিতে রাজি আছি।"

রামজীবন বলিলেন,—"সোজা কথায় জবাব দিবে কেন? জুতো মারিয়া হাড় ভাঙ্গিয়া দিব, আর তখন ঠিক জবাব বাহির হইবে।"

রাসবিহারী বলিল,—"তুমিও একজন কৃষ্ণ-বিষ্ণু হইয়াছ দেখিতেছি। যে লোক

সম্মুখে কথা কহিতে হইলে কাঁপিয়া খুন হইত, সেও যে আজি জুতা মারিতে চাহে!"

একজন দর্শক বলিল,—"উনি তো বামুন ঠাকুর—দেবতা; ওঁর জুতা খাইলেও তুমি উদ্ধার হইবে। তোমার মুখে কুকুর-শিয়ালেও লাথি মারিবে।"

রাসবিহারী বলিল,—"বল, যে যত পার বলিয়া লও। একবার খোলসা হইলেই ঐ সকল মুখে রক্ত বাহির করিয়া ছাড়িব।"

বিনোদ বলিলেন,—"তুমি যদি আমার কথার যথার্থ উত্তর দেও তাহা হইলে আমি তোমার সহিত ভদ্র-ব্যবহার করিতে সম্মত আছি।"

রাসবিহারী বলিল,—"তুমি যদি একটুও ভদ্র ব্যবহার জানিতে, তাহা হইলে তোমার ঐ ভগ্নীকে আমার কাছে বসাইয়া রাখা উচিত ছিল। ছি! ভগ্নীকে নিজে রাখা কি ভাল?"

বিনোদ বলিলেন,—"তোমার সহিত কথা কহা অসম্ভব। তোমার দণ্ড যাহাতে কিছু লঘু হয় তাহার চেষ্টা করিলেও করিতে পারিতাম। কিন্তু বুঝিলাম, তোমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ। তথাপি আর একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। নিধে চাঁড়ালের খবর তুমি জান?"

রাসবিহারী বলিল,—সে বেটা হয় তো কোথায় পটল তুলিয়াছে। তাহার খবর কে তোমাকে দিবে? তাহার বউটি কিন্তু বেশ। অনেক দিন তাহার সঙ্গে আমার ভাব ছিল। কিন্তু এক জিনিষ অনেক দিন ভাল লাগে কি? তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছি। এখন সে হুগলী আছে।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"উত্তরপাড়ায় জঙ্গলের মধ্যে তোমার বাড়ী আছে?"

রাসবিহারী বিচলিত হইল। এতক্ষণে সে যেন চিন্তিত ও ভীত হইল। বলিল,—'কেন?"

বিনোদ বলিলেন, "কেন কি? সেখানে তোমার বাড়ী আছে কি না বল?"

রাসবিহারী বলিল,—"আছে। কিন্তু তুমি সে খোঁজ করিতেছ কেন?"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি এখনই সেখানে যাইব। আমার বিশ্বাস, নিধে চাঁড়াল সেখানেই আছে।"

রাসবিহারী বলিল,—"সেখানে? রাধা-কৃষ্ণ! সেখানে কি মানুষ থাকিতে পারে? সেখানে যাইও না, মারা যাইবে, সাপে খাইবে।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমাকে মারাই তোমার উদ্দেশ্য। আমাকে মারিতে আসিয়াই তোমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। আমি যদি সাপের কামড়ে মরি, তোমার পক্ষে সে তো মঙ্গলের কথা।"

রাসবিহারীর দিকে আর দৃষ্টিপাত না করিয়া, বিনোদ সেস্থান হইতে উঠিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিনোদ একটু চিন্তা করিয়া রামজীবনের নিকটস্থ হইলেন এবং আর কেহ শুনিতে না পায়, এইরূপ ভাবে তাঁহাকে বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়, এখন এই লোকগুলাকে কোথায় রাখা যায়? সাহেব ও সিপাহীরা নিশ্চয়ই

বেলা ১০ টার মধ্যে এখানে আসিয়া পৌছিবেন। তাঁহাদের হাতে ইহাদিগকে দিতে পারিলে আমরা নিশ্চিন্ত হইব। যতক্ষণ তাঁহারা না আইসেন, ততক্ষণ ইহাদের সাবধানে রাখিতে হইবে—যেন পলাইতে না পায়—কেহ আসিয়া বাঁধন কাটিয়া না দেয়—কোন উপায়ে সরিতে না পারে। আমাদিগকে এখনই উত্তরপাড়া যাইতে হইবে। লোক-জন কে কোথায় থাকিবে, কে সঙ্গে যাইবে, আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন।"

রামজীবন বলিলেন,—"তোমাদের বাটীর বৈঠকখানা ঘরে ইহাদের পূরিয়া, দরজায় চাবি লাগাইয়া, চারিজন লোক খাড়া করিয়া রাখা ভিন্ন আর উপায় দেখিতেছি না।"

বিনোদ বলিলেন,—"তাহাই হউক। দরজা-জানালা ভাঙ্গা নাই তো। সাবধান! যদি রাসবিহারী এখন পলাইতে পারে, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ ঘটাইবে। ইহাদের এক ঘরে রাখা উচিত নহে। অন্ততঃ রাসবিহারীকে একটা স্বতন্ত্র ঘরে রাখা আবশ্যক। যাহাই হউক, শীঘ্র উপায় করুন। সাহেবেরা আসিবার পূর্ব্বে আমি উত্তরপাড়া হইতে ঘুরিয়া আসিতে ইচ্ছা করি।"

পাল্কীর বেহারারা হাত-পা বাঁধা লোকগুলাকে ধরিয়া বিনোদ বাবুর পুরাতন বাটীতে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। গমন কালে অনেকেই নানা প্রকারে অসুবিধা ঘটাইতে লাগিল। রামজীবন বেত মারিয়া সকলকে ঠাণ্ডা করিলেন। রাসবিহারীর পৃষ্ঠেও অনেক বেত পড়িল। যখন তাহাদের লইয়া যাওয়া হইতেছে, সেই সময়ে ডাক্তার আসিলেন। বিনোদ বলিলেন,—"আপাততঃ আপনার সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিবার সময় নাই। আমি একটু বিশেষ কাজে যাইতেছি, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। কালি রাত্রিতে এখানে একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়াছে। অনেক গুলি লোক অল্প-বিস্তর আঘাত পাইয়াছে। আপনি দয়া করিয়া, ইহাদিগকে যত্ন সহকারে দেখুন; কেহই যেন কষ্ট না পায়। আপনার পুরস্কার ও ঔষধাদির মূল্য আমি আসিয়াই দিব। এখনই হুগলী হইতে পুলিশ সাহেব ও অন্যান্য লোক আসিবেন। আমাকে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্ম প্রস্তুত থাকিতে হইবে।"

ডাক্তার বলিলেন,—"আমি আপনার বৃত্তান্ত-সকলই জানি। আপনি এক্ষণে যে কার্য্যে যাইতেছেন, স্বচ্ছন্দে তাহা শেষ করিয়া আসুন। আমার উপর যে ভার থাকিল, তাহা আমি যথাসাধ্য সুসম্পন্ন করিব।"

বিনোদ বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়, খোলা তরবারি হাতে দুই ব্যক্তিকে সেখানে পাহারা রাখুন। দরজায় ভাল তালা দিয়াছেন তো?"

রামজীবন বলিলেন,—"হাঁ। দুই ঘরে দুটা দুটা চারিটা তালা দিয়াছি। শ্রীরাম, রঘু আর একজন দ্বারবান্ পাহারা থাকুক। এখানে ডাক্তার বাবুর কাছে বোধ হয় অনেক লোক চাহি। মার সঙ্গের পাঁচ জন লোক এখানে থাকুক, পাঁচ জন আমাদের সঙ্গে চলুক। বেহারা ছয়টা আমাদের সঙ্গে একখানি পাল্কী লইয়া আসুক। তোমার হাঁটিয়া যাওয়া হইবে না, বাবা। বাকী বেহারারা এখানে থাকুক।"

রামদীন হাতে অনেক ভিজা কাপড় জড়াইয়া ছিল। সেই কাপড়ে আর একবার জল দিয়া, সকলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে পথ-প্রদর্শক। ভাঙ্গা হাত লইয়াও সে যাইবে।

ট্রাঙ্ক দুইটা বাটীর ভিতর পাঠান হইল। সকল দিক একবার উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া,

অপরাজিতার নিকট বিদায় লইয়া উদ্দেশে পিতৃদেবতার চরণে প্রণাম করিয়া, মনকে অন্য চিন্তা বিরহিত করিয়া, বিনোদ ও তাঁহার সঙ্গিগণ উত্তরপাড়া যাত্রা করিলেন। খুড়া মহাশয় হাঁটিয়া যাইবেন, আর বিনোদ পাল্কীতে উঠিবেন ইহা অসঙ্গত; সুতরাং পাল্কী সঙ্গে চলিবার ব্যবস্থা হইল। খুড়া বুঝাইয়া দিলেন,—"ছেলেরা বাপ-খুড়ার কোলে চড়িয়া যায়, তবে তুমি পরের কাঁধে কেন না যাইবে বাবা?"

বিনোদ কোন মতেই পাল্কীতে উঠিতে সম্মত হইলেন না। কল্যকার সেই আঘাত, তাহার পর সমস্ত রাত্রি জাগরণ, পরিশ্রম, উৎকণ্ঠা ও অশেষ ক্লেশ। শরীর বড়ই কাতর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

-*—

রাসবিহারী নাগের বাটীর পার্শ্ব দিয়াই উত্তরপাড়া যাইবার পথ। অন্য দিক দিয়া যাইবার কোনই উপায় নাই। বিনোদের মনে আশঙ্কা ছিল, নাগের ভবন-সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে তাহার লোকেরা নিশ্চয়ই আক্রমণ করিবে এবং অভিপ্রেত স্থানাভিমুখে কখনই অগ্রসর হইতে দিবে না। রামজীবন জানিতেন, উত্তরপাড়া যাত্রা কালে তাঁহাদিগকে বিপদাপন্ন হইতে হইবে এবং হয় তো সে বিপদের পরিমাণ বিগত বিপদ সমূহের অপেক্ষা গুরুতর হইবে। শঙ্কাকুলচিত্তে তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রামদীন, ভগ্ন-হস্ত হইলেও, নির্ভীক ভাবে, সম্প্রদায়ের প্রদর্শকরূপে অগ্রে চলিতে লাগিল।

রাসবিহারীর বিশাল ভবন তাঁহাদের নেত্রপথবর্ত্তী হইল। ফুলবাগান, বৈঠকখানা কাছারি, অশ্বশালা, পূজার বাড়ী, অন্দরমহল, ভৃত্যাদির বাসস্থান সকলই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। কতই বিগত কাহিনীর বিষাদময়ী ছায়া কল্পনা-সূত্রাবলম্বনে বিনোদের মনকে ব্যথিত করিতে লাগিল। এই সকল রম্য নিকেতনের অভ্যন্তরে কত সময় কতই বিজাতীয় ও বীভৎস কাণ্ডের অভিনয় হইয়াছে। কত ধর্ম্মশীলা কুল-কামিনী, ঐ পুষ্প-কানন মধ্যস্থিত উপবনে, পাশবিকশক্তির বিরুদ্ধে অসম যুদ্ধে অবসন্ন হইয়া, আর্ত্তনাদ করিতে করিতে, আপনার ধর্ম্মধনকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন; ঐ অট্টালিকার অভ্যন্তরে কত সময় কত অভাগা আপনার প্রেমময়ী প্রিয়তমাকে পরের অঙ্কশায়িনী দেখিয়া, অব্যক্ত যন্ত্রণার তীব্র তুষানলে দগ্ধ হইয়াছে। ঐ প্রাসাদের স্থান বিশেষে হয় তো কত সময় কত সহায়-সম্পত্তি-বিহীন দরিদ্র ব্যক্তি, হৃদয়ের বিষম বেদনাজনিত অপরিহার্য্য প্রতিবাদ উত্থাপিত করিয়া, নিদারুণ দৈহিক ক্লেশ ভোগ করিয়াছে। কত পাপের তরঙ্গ, কত উৎকট ভোগ-প্রবৃত্তির বিকট রঙ্গ, কত ঘৃণিত কার্য্যের বিগর্হিত সঙ্গ এবং কত নিন্দিত অনুষ্ঠানের অযোগ্য প্রসঙ্গ, ঐ সকল মনোহর সৌধের নানাস্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কত ভৈরব হাস্যের বিকট রোল, কত প্রমত্ত কাণ্ডের উৎকট গোল, কত অবলার পাষাণ-ভেদী দুঃখের আলেখ্য, কত নিরপরাধ নর-নারীর হৃদয়-নিঃসৃত অশ্রুবারি, কত সাধু-সজ্জনের হাহাকার ও আর্ত্তনাদ ঐ সকল সুরম্য হর্ম্ম্যের ইষ্টক ও কাষ্ঠাদির সহিত মিশিয়া আছে।

বিনোদ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া

করিলেন,—"যে হতভাগ্য পুরুষ, প্রভুতা ও ধনমদে মত্ত হইয়া, এইরূপ ভয়ানক পাপ-স্রোতে বসুন্ধরা প্লাবিত করিতেছিল, ঘটনা-চক্রে তাহার লীলার সমাপ্তি হইয়া আসিতেছে। তাহার অনেক পাপই সুন্দর রূপে সপ্রমাণ হইবে সন্দেহ নাই; সুতরাং তাহার ধন-বল বা কোন শক্তিই তাহাকে এবার রাজ-শাসন হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।" তাহার পরেই তাঁহার মনে হইল,—"রাসবিহারী কি ভয়ানক পাপী, কি চিরাভ্যস্ত হীন-চরিত্র! নিধে চাঁড়ালের কোন কথাই সে বলিল না। আমার পিতার কোন বৃত্তান্তই তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না। তাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র অনুতাপ নাই। এখনও সে একটুও কাতর নহে। কোনরূপ অবসন্নতা তাহাকে এখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই। অতি হীন জনের সঙ্গে সমভাবে ঘৃণিতরূপে নিবদ্ধ থাকিয়া, এখনও সে আমাকে অশ্রাব্য অনালোচ্য কুৎসিত বাক্য বলিতে সাহস করিতেছে। এ ব্যক্তি যদি সৎস্বভাব ও সুশিক্ষিত হইত, তাহা হইলে এরূপ অকাতর, নির্ভীক ও তেজস্বী হৃদয় লইয়া, হয় তো মহৎ ব্যক্তি রূপে পরিগণিত হইলেও হইতে পারিত।'

রাসবিহারীর ভবনের সীমা অতিক্রম করা হইল। কোন দিকে কোন প্রকার বিপদের সম্ভাবনাও কেহ বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিলেন, সেই সুবিশাল পুরীর সর্ব্বত্র যেন জন-শূন্য। প্রধান দ্বারের পার্শ্বে একজন দৌবারিক বসিয়া আছে; কিন্তু সে যেন উদাসীন ও উৎসাহ হীন! কাছারিতে কয়েকজন আমলা বসিয়া তামাক খাইতেছে ও কি কথা কহিতেছে। পাল্কী ও লোকজন লইয়া বিনোদ বাটীর সীমা অতিক্রম করিলেন। কোন কথা কহা দূরে থাকুক, কেহ তাঁহাদের প্রতি দৃক্‌পাতও করিল না।

ক্রমে পথ অতি সংকীর্ণ হইয়া পড়িল। চারি দিকে কেবল বন। মাঝখান দিয়া একটা পাদচারী লোকের যাওয়ার মত পথের চিহ্ন আছে মাত্র; পাল্কী তাহার মধ্য দিয়া যাইতে পারিল না। সেই স্থানেই পাল্কী রহিয়া গেল। দুই জন বেহারা পাল্কীর নিকট রহিল আর চারিজন তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। ক্রমে সে পথও বিলুপ্ত হইয়া গেল। কেবল ঘন বন ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। রাম-দীন স্থানে স্থানে গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া ও পাতা ফেলিয়া একটা চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল এবং সহজেই পথ নির্ণয় করিয়া গন্তব্য স্থানে উপনীত হইবার উপায় করিয়া গিয়াছিল। সে সকলকে নির্ভীক ভাবে তাঁহার অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিতে লাগিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মুখের ভাব বিশেষ চিন্তাকুল। বিনোদ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া চলিতে চলিতে বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়, কি ভাবিতেছেন?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"ভাবিতেছি যে কি তাহা বলিয়া উঠা যায় না। তুমি পরম পণ্ডিত হইলেও, বালক। বিদ্যাবুদ্ধি-বলে, ধন-সম্পত্তির বলে একটা ভয়ানক কাণ্ড বাধাইয়া তুলিয়াছ! কিন্তু ইহার শেষ ফল কি হইবে, তাহা আমি এখনও ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না।"

বিনোদ বলিলেন,—"খুড়া মহাশয় আমার মনের কথায় আপনি প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। আমি যে উদ্দেশে এত গোল ঘটাইতেছি, তাহার সিদ্ধির কোন উপায়ই তো দেখিতেছি না। আমার বিশ্বাস ছিল, রাসবিহারীকে

হাতে পাইলেই আমার পিতার সন্ধান পাওয়া যাইবে। তাহাকে ক্ষমতাধীন করিয়াও তো কোন উপায় হইল না। তবে কি হইবে?"

রামজীবন বলিলেন,—"তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির করিতে হইলে, অন্য প্রকার চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাকে মিষ্ট করিয়া একবার জিজ্ঞাসা করিলেই যে, সকল কথার সদুত্তর দিবে, এমন লোক সে নহে। তাহাকে নির্জ্জনে লইয়া অশেষ উৎপীড়ন করিলে, যদি কথা পাওয়া যায়।"

বিনোদ বলিলেন,—"সে কথা ঠিক। রাসবিহারীর ন্যায় পুরাতন পাপী এক কথায় যে লুকান রহস্য ব্যক্ত করিবে, তাহা কখন সম্ভব নহে। তাহাকে উৎপীড়ন করিয়া কথা বাহির করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সে পাপী—নরাধম; কিন্তু তাহাকে দণ্ডিত করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। ক্রমশঃ তাহার যে সকল দুষ্কৃতির বৃত্তান্ত আমি জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে তাহাকে রাজদ্বারে যথোচিত শাস্তি প্রদানের সুব্যবস্থা করিতে আমার বাসনা জন্মিয়াছে সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বকীয় অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় অন্বেষণ করিবার প্রবৃত্তি এক মুহূর্ত্তও আমাকে ত্যাগ করে নাই। রাসবিহারীর শাস্তির সময় উপস্থিত-প্রায়; কিন্তু আমার মনোরথ-সিদ্ধির কোন সূত্রই তো আমি এখনও দেখিতেছি না।"

রামজীবন বলিলেন,—"আমিও কিছুই বুঝিতেছি না। উত্তরপাড়ার বনের মধ্যে রাসবিহারীর বাটী আছে, তাহা আমরাও জানি। কিন্তু সে বাড়ীতে যে, কিছু সন্ধান পাওয়া যাইবে, ইহা তো আমার কখন মনে হয় নাই। এ স্থানে মানুষের যাওয়া আসার লক্ষণও নাই। এখানকার সন্ধানেই বা কি ফল হইবে?"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি বিভিন্ন স্থানে নানা প্রকার সংবাদ শুনিয়া স্থির করিয়াছি, উত্তরপাড়ায় নিধের সন্ধান হওয়া অসম্ভব নহে। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, নিধের যদি সন্ধান হয়, তাহা হইলেই আমার পিতৃদেবেরও সন্ধান হইবে।"

রামজীবন বলিলেন,—"উত্তরপাড়ার এ বাটীতে কোন রহস্য থাকা সম্ভব নহে। যাহাই হউক, দেখিতেই হইবে। তুমি এ সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছ, নানা স্থানে নানা প্রকার সন্ধান জানিয়াছ, অনেক বিষয় অনেক প্রকারে ভাবিয়া দেখিয়াছ, তোমার বুদ্ধিবিদ্যাও যথেষ্ট; সুতরাং তুমি যখন এস্থানে সন্ধান করা আবশ্যক বলিয়া বুঝিয়াছ, তখন তাহার শেষ করিতেই হইবে।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি আর কিছু জানি না খুড়া মহাশয়। আপনার চরণ-ধূলা আমার প্রধান সম্বল। আর আমার পিতৃদেবের সেই চরণ-যুগল আমার একমাত্র লক্ষ্য। ফলাফল ভগবান্ জানেন; তাহা ভাবিতে বা স্থির করিতে আমাদের অধিকার নাই। আপনার পদধূলি আমাকে যে পথ দেখাইয়া দিতেছে, আমার পিতৃদেবের চরণ আমাকে যে পথে যে ভাবে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, আমি বিপদ বা সম্পদ, সুখ বা দুঃখ, জীবন বা মরণ কিছুই লক্ষ্য না করিয়া, সেই দিকেই ধাবিত হইতেছি। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির কি উপায় হইবে তাহা আর ভাবিয়া কাজ নাই,—আর তাহা ভাবিবও না। যে কার্য্য সম্মুখে উপস্থিত তাহা সম্পন্ন করাই আমাদের এখনকার সাধনা।"

রামদীন বলিল,—"হুজুর, বনের ফাঁক দিয়া সম্মুখে ঐ সেই বাড়ী দেখা যাইতেছে।"

বিনোদের বক্ষে রক্তস্রোত প্রবলবেগে

বহিতে লাগিল। ভাবিলেন,—"এই স্থানে—এই জন-সমাগম-শূন্য অরণ্য মধ্যস্থ ভগ্ন ভবনে আমার পিতার কোন সন্ধান পাইব কি? নিধে চাঁড়াল এখানে এই সুদীর্ঘ কাল আছে কি? এতদিন এরূপ ভাবে থাকিলে সে বাঁচিতে পারে কি? বাঁচিয়া থাকিলে এবং তাহাকে দেখিতে পাইলে, কোন সন্ধান সে দিতে পারিবে কি? ঈশ্বর জানেন। কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার সামর্থ্য নাই। তাঁহার মনে যাহা আছে, তাহাই হইবে।"

তাঁহারা সেই পুরাতন বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

—*—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিনোদের হৃদয় নানা ভাবের প্রাবল্যে আলোড়িত হইয়া উঠিল। নানা প্রকার সুখময়ী আশা, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা-বিনাশক আশঙ্কা তাঁহার অন্তরকে উত্থিত ও অবনত করিতে থাকিল। তিনি যৌবনের প্রথম সীমায় অধিষ্ঠিত হইলেও, একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ ও ধর্ম্ম-ব্রত। হৃদয়ের এই বিষম সময়ে তিনি একবার প্রাণ ভরিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিত্ত অপেক্ষাকৃত বলবান্ ও প্রকৃতিস্থ হইল। তখন তিনি সেই প্রাচীন অট্টালিকার অবস্থা দর্শনে চিত্ত-সন্নিবিষ্ট করিলেন। দেখিলেন, সেই অট্টালিকা বহুবিস্তৃত ও চারিদিকে উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত; ভবনে প্রবেশের একমাত্র পথ সুদৃঢ় কবাট দ্বারা নিরুদ্ধ এবং সেই কবাটের দুই স্থান তালার দ্বারা আবদ্ধ। ভবনের অভ্যন্তরের অবস্থা কিরূপ, বাহির হইতে তাহা নির্ণয় করিবার কোন সুযোগ নাই। তথায় জনমানব সমাগমের কোন চিহ্ন নাই; সুতরাং কেহই তাঁহাদিগের কার্য্যে বাধা দিবার সম্ভাবনা নাই।

বিনোদ বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়, এ স্থানে একটা কোন গুপ্ত কাণ্ড থাকাই সম্ভব; নতুবা এ বাটীর প্রবেশপথ এত সযত্নে সুরক্ষিত হইত না। আমাদিগের বাসনাসিদ্ধির কোন উপায় হউক বা নাই হউক, অনুসন্ধান দ্বারা এ স্থান হইতে রাসবিহারীর অনন্ত পাপ লীলার কোন না কোন নূতন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই। যাহাই হউক, এই ভবনের মধ্যে প্রবেশ করিতে ইতস্ততঃ করিবার আর আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে আপনি তালা দুইটা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার কোন উপায় করুন।"

রামজীবন বলিলেন—"তালা খুব ভাল এবং যে কড়ায় ও শিকলে ইহা লাগান রহিয়াছে তাহাও বিলক্ষণ মজবুত। তথাপি আমরা চেষ্টা করিয়া যে ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিব না, এমন বোধ হয় না।"

রামদীন বলিল,—"আমার একটা হাত কাজের মত নাই; এক হাতে বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিব বোধ হয় না। আমি বিবেচনা করি, অনবরত ইটের ঘা মারিতে মারিতে কড়া ও শিকলের স্ক্রুগুলো ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।"

শ্রীরাম বলিল,—"সে চেষ্টা চলুক; আর আমি বলিতেছি, ঐ আম গাছটায় উঠিয়া, প্রাচীরের উপর উঠিবার চেষ্টা করা হউক। প্রাচীরের উপর উঠিতে পারিলে, কোন প্রকারে ভিতরে লাফাইয়া পড়া যাইতে পারিবে।"

বিনোদ বলিলেন,—"তোমার এ পরামর্শ মন্দ নহে। দুই রকম চেষ্টাই চলুক; শক্ত ইট সংগ্রহ করিয়া কড়া ও শিকিল ভাঙ্গিতে থাক। আর শ্রীরাম তুমি গাছের উপর উঠিয়া প্রাচীরে পড়িবার চেষ্টা কর।"

তখন বহুলোক মিলিয়া শিকল ও কড়ায় নানা প্রকার আঘাত করিতে লাগিল। ইট চূর্ণ হইতে থাকিল; শিকলের ও কড়ার কিছুই হইল না।

শ্রীরাম গাছের উপর উঠিয়া বলিল,—"আমি এ স্থান হইতে পাঁচীরের উপর লাফাইয়া পড়িতে পারি। বাটীর ভিতর অনেক দূর আমি দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু কোথায়ও মানুষের চিহ্ন দেখিতেছি না।"

বিনোদ বলিলেন,—"তুমি পাঁচীরের উপর আইস, তাহার পর একটা জাগয়া স্থির করিয়া লাফাইয়া ভিতরে পড়। ভিতর হইতে কোন প্রকার শক্ত সামগ্রী পাওয়া যাইলেও যাইতে পারে; তাহার দ্বারা তালা ভাঙ্গিবার উপায় হইতে পারিবে।"

অসীম সাহসিকতার সহিত শ্রীরাম গাছ হইতে লাফাইয়া প্রাচীরের উপর পড়িল; ব্যবধান প্রায় ছয় হাত। তাহার বুকে একটু আঘাত লাগিল। স্থিরভাবে একটু বসিয়া, সে বলিল,—"বাটী প্রকাণ্ড; সমস্তই একতলা কোন দিকে একটীও দোতলা ঘর নাই। অনেক ঘরের দরজা জানলা খোলা। সমস্ত বাটীই ঘন বনে ঢাকা। বন আর লতা অনেক ঘরের ভিতরেও প্রবেশ করিয়াছে। দুই একটী ঘর যেন বাহির হইতে তালা দ্বারা বন্ধ আছে বোধ হইতেছে। কিন্তু কোথায় মানুষের কোন চিহ্ন দেখিতেছি না।"

বিনোদ বলিলেন,—"লাফাইয়া ভিতরে পড়িবার কোন উপায় আছে কি না দেখ।"

শ্রীরাম বলিল,—"পাঁচীর বোধ হয় পাঁচ ছয় হাত উচ্চ। লাফাইয়া পড়িলে আঘাত লাগিলেও লাগিতে পারে; কিন্তু আন্দাজ কুড়ি হাত তফাতে একটা নোনা আতার গাছ আছে। ঐ স্থানে গিয়া গাছটাকে ধরিতে পারিলে আর কোন ভয় থাকিবে না; সহজেই নামা যাইবে।"

বিনোদ বলিলেন,—"তাঁহারই চেষ্টা কর।"

শ্রীরাম অগ্রসর হইতে লাগিল। যে পাঁচ জন নবাগত বীর তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছে, তাহাদের একজন, কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই, সেই আম গাছের উপর উঠিয়া পড়িল এবং প্রাচীরের উপর শ্রীরামের অধিকৃত স্থানে লাফাইয়া পড়িল। শ্রীরাম তখন নোনা আতা গাছের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে এবং তাহারই শাখা-বিশেষ অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রাচীরের উপর হইতে নূতন আরোহী বলিল,—"হুজুর, ভিতরে লাফাইয়া পড়িব কি?"

বিনোদ বলিলেন,—"অনেক উচ্চ। আঘাত লাগিবে বোধ হয়।"

সে ব্যক্তি উত্তর দিল,—"কিছু না, হুজুর হুকুম দিলে ইহার অপেক্ষা বেশী উঁচু হইতে লাফাইতে পারি।"

বিনোদ বলিলেন,—"তবে তাহাই কর।"

শ্রীরাম তখন গাছ আশ্রয় করিয়া ভিতরে পড়িয়াছে। এ ব্যক্তিও ভিতরে লাফাইয়া পড়িল! উচ্চৈঃস্বরে বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাহারও লাগে নাই তো?"

উভয়ে উত্তর দিল,—"না।"

বিনোদ বলিলেন,—"আগে একটা শক্ত জিনিষের সন্ধান কর।"

শ্রীরাম দরজার বিপরীত দিক হইতে উত্তর করিল,—"এখানে নিশ্চয়ই মানুষ থাকে। এক-

খানা দড়ীর খাটিয়া পড়িয়া আছে। শিকার উপর হাঁড়ি রহিয়াছে, উনান আছে, কয়েকখানি শুকনা কাঠ রহিয়াছে, জলের কলসী, মাটীর ভাঁড় ও প্রদীপও আছে।"

নবাগত বীর বলিল,—"আর একখানি বেশ মজবুত কুড়ালি আছে।"

রামজীবন বলিলেন,—'বটে! কুড়ালই আমাদের এখন বিশেষ দরকারী জিনিষ। তুমি সেই খানি প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া ফেলিয়া দেও।"

নবাগত বীর সে স্থান হইতে একটু দক্ষিণ পার্শ্বে সরিয়া গিয়া, কুঠার ফেলিয়া দিল। রামদীন তাহা তুলিয়া আনিল। দ্বারবান্ তাহা দ্বারা কড়ায় ও শিকলে সবলে পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড আঘাত করিতে লাগিল; অবিলম্বে কড়ার মুখ কাটিয়া গেল, শিকল উঠিয়া পড়িল। তখন তাবৎ ব্যক্তি সেই ভবন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাহারা দেখিলেন, দ্বারের সন্নিধানে একটা স্থান অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার এবং দ্বারের পার্শ্বস্থিত প্রকোষ্ঠ মনুষ্যের দ্বারা অধিকৃত হইয়া থাকে বলিয়া বোধ হয়। তথায় নিয়ত না হউক, সময়ে সময়ে যে মনুষ্য বাস করে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহার পর প্রশস্ত অঙ্গন। সে স্থান নানা প্রকার গুল্ম-লতায় আচ্ছাদিত।

শ্রীরাম ও সেই বীর তখন সেই অট্টালিকার কক্ষে কক্ষে উঁকি দিয়া দেখিয়া বেড়াইতেছে। সহসা এক নিরুদ্ধ-দ্বার প্রকোষ্ঠের নিকট হইতে শ্রীরাম চীৎকার করিয়া বলিল,—"এই ঘরে নিশ্চয়ই মানুষ আছে।"

তখন উন্মাদের ন্যায় অস্থিরতা সহকারে, কণ্টক লতা বা গুল্মাদির ব্যাঘাত উপেক্ষা করিয়া বিনোদ সেই দিকে প্রধাবিত হইলেন;

বলিলেন,—"ভাঙ্গিয়া ফেল! যেমন করিয়া পার, দরজা খুলিয়া ফেল! খুড়া মহাশয় কুড়ালি লইয়া শীঘ্র আসুন।"

রামজীবন প্রভৃতি সকলে ব্যস্ততার সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রকোষ্ঠের দ্বার সদর দরজার মত মজবুত ছিল না; তাহাতে একটী মাত্র তালা লাগান ছিল। অল্প আঘাতেই কড়া ভাঙ্গিয়া গেল। দ্বার উন্মুক্ত হইল। যে সময়ে দ্বার খোলা হইতেছিল, বিনোদ এবং রামজীবন সেই সময়ে বাতায়ন দিয়া প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তর ভাগে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। তাঁহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন, তথায় ভূ পৃষ্ঠে মলিন ও ছিন্ন বস্ত্রাচ্ছাদিত এক সজীব বা নির্জীব মনুষ্য-মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। দ্বার খুলিবা মাত্র প্রথমে বিনোদ, তৎপশ্চাতে রামজীবন, তদনন্তর অন্যান্য সঙ্গিগণ সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নিকটস্থ হইয়া বিনোদ দেখিলেন, সুদীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুধারী কঙ্কালাবশেষ এক মনুষ্য উদাস ভাবে তাঁহাদিগের প্রতি চাহিয়া আছে। করুণ স্বরে বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে? তুমিই কি নিধে চাঁড়াল?"

শায়িত ব্যক্তি নিতান্ত ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিল,—"একি পরিহাস? নিধে চাঁড়াল কে? তাহাকে তো অনেক দিন আগে মারিয়া ফেলিয়াছে। তবে আজি আবার তোমরা তাহার নাম করিতেছ কেন?

বিনোদ বলিলেন,—"কে মারিয়াছে? কোথায় মারিয়াছে?"

সেই শায়িত ব্যক্তি পুনরায় উত্তর দিল—"তোমরা কে? কিছুই কি তোমরা জান না? দুর্গাপুরের পুকুরের ধারে নিধেকে মারিয়া জলে ডুবাইয়া দিয়াছিল, এ কথা তোমরা শুন নাই কি?"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"তবে আপনি কে ?"

শায়িত ব্যক্তি বলিলেন,—"আমি কে তাহা যদি তোমরা না জান, তবে আর জানিয়া কাজ নাই। আমি নিধে চাঁড়ালের একজন সঙ্গী ; প্রভেদ এই, তাহার যন্ত্রণা অতি অল্প সময়েই শেষ হইয়াছিল ; আমার যন্ত্রণা অনেক দিন চলিতেছে। বোধ হয় এইবার যন্ত্রণার শেষ হইতেছে। মরণের আর বিলম্ব নাই। এ অবস্থায় আমার পরিচয় জানাইবার আর প্রয়োজন দেখিতেছি না।"

বিনোদ বলিলেন,—"অনেক কথা কহিয়াছেন, কৃপা করিয়া আর একটী কথা কহুন। আমরা আপনার হিতৈষী। দয়া করিয়া আপনার নামটী বলুন।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"হিতৈষী হও, আর শত্রু হও, আমার তাহাতে আর ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। আমার নাম শুনিলে চিনিতে পারিবার কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। কারণ এ নাম পৃথিবী হইতে অনেক দিন মুছিয়া গিয়াছে। এক সময়ে আমাকে লোকে জগদ্বন্ধু বসু বলিয়া ডাকিত।"

বিনোদ, দুই চারি পদ পিছাইয়া আসিয়া, গদগদশ্রুলোচনে ভগবানকে স্মরণ করিয়া ভূতলে মস্তক সংলগ্ন করিলেন ; কিয়ৎকাল পরে উঠিয়া বলিলেন,—"ভগবন্, তুমি না পার কি ? দশ বৎসর পূর্ব্বে দুর্গাপুরের পুকুরে যাঁহার মৃতদেহ লোকে ভাসিতে দেখিয়াছে ; যাঁহাকে মনুষ্য-সমাজ ও রাজপুরুষগণ, এমন কি তাঁহার স্ত্রী কন্যা পর্য্যন্ত মৃত ব্যক্তি বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি এখনও সজীব, সজ্ঞান এবং সেই অতীত ঘটনার সম্পূর্ণ রহস্যজ্ঞ।" তাহার পর সেই বৃদ্ধের চরণ-তলে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন,—"বাস্তবিকই আপনার যন্ত্রণার শেষ হইয়াছে। আমি আপনাকে মুক্ত করিতেই আসিয়াছি। অধিক কথা আমি এখন জিজ্ঞাসিব না, সমস্ত বৃত্তান্ত আমার এখন জানিবারও প্রয়োজন নাই। কেবল একটী কথা আমি কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনার সেই অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু, যাঁহার সহিত আপনি কুক্ষণে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহার সংবাদ কি ?"

বৃদ্ধ ক্ষীণ হস্তে চক্ষু পরিষ্কার করিয়া বলিলেন,—"যদুপতি—আমার প্রাণের দোসর যদুপতি। উভয়েরই এক দশা ! তিনি জীবিত ছিলেন, এই বাটীরই কোন এক অংশে—খুব দূরে তিনি ছিলেন। অনেক সময়ে তাঁহার আওয়াজ শুনিতে পাইতাম। বহুদিন আর কিছু শুনিতে পাইতেছি না। এত কষ্ট সহিয়া সে সুখী লোক এতদিন জীবিত আছেন কি ?"

বিনোদ বলিলেন,—"দুইজন ইঁহার নিকটে থাক। ইঁহাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া আইস। আমার এই চাদর লইয়া ইঁহাকে পরিতে দেও। আমি এখন অন্য দিকে যাইতেছি। দুই জন ছাড়া আর সকলে আমার সঙ্গে

বেগে সকলে অন্য বিরুদ্ধ প্রকোষ্ঠের সন্ধানে ছুটিতে লাগিলেন। পাঁচ-সাতটা ঘরের পরেই আর একটা তালা দেওয়া ঘর দেখিতে পাওয়া গেল। কিন্তু সে ঘর হইতে বিজাতীয় দুর্গন্ধ নির্গত হইয়া তন্মধ্যে কোন মৃতদেহের বিদ্যমানতা পরিব্যক্ত করিতেছে। বিনোদ দারুণ উৎকণ্ঠার সহিত বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়, শেষে কি এই হইল ? বসু মহাশয় যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই কি সত্য হইল ? আমার পিতা কি তবে নাই ? এই

কারাগারেই কি তাঁহার জীবনের শেষ হইয়াছে?"

রামজীবন বলিলেন,—"শান্ত হও বাবা যেরূপ অসম্ভব ব্যাপার ঘটিতেছে দেখিতেছি, তাহাতে কোন কথাই ঠিক করিয়া বলিতে পারা যায় না। এ ঘরে কোন সজীব মনুষ্য নাই; নিশ্চয়ই এখানে যিনি ছিলেন, তাঁহার গলিত দেহ এই ঘরে পড়িয়া আছে। কিন্তু তিনিই যে তোমার পিতা একথা কে বলিতে পারে? রাসবিহারী আর কাহাকেও এরূপ অবস্থায় রাখিয়াছিল কি না, কে জানে।"

কুঠার আঘাতে দ্বার খুলিয়া গেল। বিনোদ বলিলেন,—"তোমরা যাও, আর কোন ঘরে তালা বন্ধ আছে কি না,সন্ধান কর। এখানে সকলে থাকিবার আবশ্যক নাই।"

শ্রীরাম প্রভৃতি সঙ্গিগণ প্রস্থান করিল। উৎকট দুর্গন্ধ উপেক্ষা করিয়া বিনোদ ও রামজীবন প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, ভয়ানক কাণ্ড! বহুদিন পূর্ব্বে মৃত ব্যক্তি-বিশেষের বিকৃত ও গলিত শরীর জীবনের সুখ ও দুঃখ, বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য হইয়া, সেই ভূ-শয্যায় পতিত রহিয়াছে।

সেই শবের সমীপদেশে উপবেশন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে, বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন,— "জানি না তুমি কে? বলিতে পারি না তুমি আমার পিতা কি না। যদি তুমি আমার জনক হও, তাহা হইলে কোন পাপে তোমাকে আজি এ দশায় দেখিতে হইল, তাহা সেই সর্ব্ব কর্ম্ম-ফলবিধাতা ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই বলিতে পারেন না।"

দূর হইতে শ্রীরাম উচ্চৈঃস্বরে বলিল,— আর একটা ঘরে তালা বন্ধ আছে। এখানেও মানুষ আছে।"

রামজীবন ও বিনোদ বেগে সেই দিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, শ্রীরাম প্রভৃতি লোকেরা দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। বিনোদ সর্ব্বাগ্রে প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন; পশ্চাতে রামজীবন। তাঁহারা দেখিলেন, জগদ্বন্ধুর ন্যায় সুদীর্ঘ ধবল শ্মশ্রু ও কেশ সমন্বিত এক পুরুষ দেওয়ালের গায়ে মস্তক রাখিয়া, কাতর ভাবে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দর্শন মাত্র বিনোদের প্রাণ বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "আপনি কে?"

চক্রবর্ত্তীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বৃদ্ধ ক্ষীণ-কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"তোমরা কে? আমার যদি চক্ষু-কর্ণের উপরে বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে তোমাদিগকে চিনিবার চেষ্টা করিতাম। বালক, তোমার নাম কি?"

বিনোদ উত্তর দিলেন,—"শ্রীবিনোদ-বিহারী রায়।"

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন,—"রায়? হইবে! কিন্তু তুমিও কি রামজীবন ভায়া নহ?"

রামজীবন বলিলেন,—"মিত্র দাদা! এই হতভাগাই আপনার রামজীবন ভায়া। আর এই বালকই আপনার পুত্র—বিনোদ-বিহারী।"

তৎক্ষণাৎ বিনোদ, সেই বৃদ্ধের চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন।

বাহিরে ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইল। বহু লোক, নানা প্রকার অস্ত্রাদি লইয়া, বেগে সদর দরজা দিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং রাসবিহারী নাগ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

---*---

বিনোদ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ উত্তরপাড়া যাত্রা করার কিঞ্চিৎ কাল পরে, রাসবিহারীর ভবনস্থিত অনুগত ভৃত্য, দ্বারবান্, লাঠিয়াল প্রভৃতি লোকেরা, যেমন করিয়া হউক প্রভুকে মুক্ত করিতে সঙ্কল্প করিল। সহিস কোচোয়ান প্রভৃতি লোকেরাও তাহাদের সহিত যোগ দিল। ত্রিশ জন লোক সেই অভিপ্রায়ে সমবেত হইল। তাহারা যে যেরূপ পারিল, সে সেইরূপ অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া লইল। নবীন উৎসাহে তাহারা আসিয়া যদুপতি মিত্রের ভবনস্থিত রক্ষীদিগকে আক্রমণ করিল। তিন চারি জন মাত্র রক্ষী ছিল; বহুসংখ্যক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে তাহারা সহজেই পরাভূত হইয়া গেল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাসবিহারীর এই বন্ধুগণ প্রভুকে ও প্রভুর ভৃত্যদিগকে উদ্ধার করিল। রাসবিহারী, নববলে বলীয়ান্ হইয়া, সঙ্গিগণ সহ সন্নিহিত রামজীবন চক্রবর্ত্তীর বাটীর দিকে ধাবিত হইল। সেখানে তখন ডাক্তার মহাশয় অনেক লোক লইয়া রোগিগণের শুশ্রূষায় ও চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিলেন। বহু অস্ত্রধারী লোক সহ রাসবিহারীকে সহসা সমাগত দেখিয়া, সকলেই বিস্ময়াপন্ন ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল। রাসবিহারী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"ভাই সব, এই বাটীর মধ্যে এক স্ত্রীলোক আছে; তাহার মত সুন্দরী আমি কখনও কোথায় দেখি নাই। তাহাকে পাইয়া যদি এক দিনও বাঁচিয়া থাকিতে হয়, আমি তাহাতে রাজি আছি। তোমরা যেমন করিয়া পার, তাহাকে ধরিয়া আমার বৈঠকখানায় লইয়া চল।"

এই সময় এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া রাসবিহারীর কাণে কাণে বলিল,—"এই সুযোগে কোন স্থানান্তরে পলাইয়া যাইলে হইত না? শুনিতেছি এখনই পুলিশ আসিবে।"

বিকট হাস্য করিয়া রাসবিহারী বলিলেন, "পাগল তোমরা! পুলিশ রাসবিহারীর কি, করিবে? এ জগতে রাসবিহারীর অনিষ্ট করিতে পারে, এমন ক্ষমতা কাহারও নাই। এই বাটীতে দুইটা ট্রাঙ্কে আন্দাজ দশ হাজার টাকা আছে। সুন্দরীকে আমার হাতে দিয়া তোমরা সকলে সেই টাকা ভাগ করিয়া লও।"

তখন সেই লোক সকল, অর্থলোভে উন্মত্ত হইয়া, বেগে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিল। মহিলাগণের উচ্চ ক্রন্দনের রোল শুনিতে পাওয়া গেল। অপরাজিতা তখন সাবধানে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, অধোমুখে পুর-মধ্যস্থ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ছিলেন। রাসবিহারীর সমস্ত কথাই তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন। এ অবস্থায় যাহা কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিতে তাঁহার অধিক সময় লাগিল না। রাসবিহারীর কয়েকজন লোক তাঁহার নিকটস্থ হইয়া "এই, এই" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল।

অপরাজিতা বলিলেন,—তোমরা কেহই আমার নিকট আসিও না; তোমাদের মনিবকে আমার কাছে পাঠাইয়া দেও।"

এক ব্যক্তি বলিল,—"টাকা কোথায়? ট্রাঙ্ক দুইটা চাহি।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"এই ঘরে আছে, তোমরা কোন দৌরাত্ম্য করিও না, আমি বাহির করিয়া দিতেছি।"

লোকেরা বাহিরে আসিল। রাসবিহারী তখন মধ্যে প্রবেশ করিল

অপরাজিতা বলিলেন,—"আপনি আমাকে আপনার বৈঠকখানায় লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। আমি স্বেচ্ছায় আমার দাসীদিগকে সঙ্গে করিয়া সেখানে যাইতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু আপনাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, আমার ভাই যে স্থানে গিয়াছেন সে স্থান হইতে যতক্ষণ তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া না যাইবে, ততক্ষণ আপনি আমার সহিত দেখা-শুনা করিতে পাইবেন না।"

রাসবিহারী বলিল,—"তাহাই আমার উদ্দেশ্য। তোমাকে বৈঠকখানায় রাখিয়া তোমার ভাইকে আমি ধরিতে যাইব। এখন তোমার সহিত আলাপ করিবার সময় আমার নাই। তোমার ভাইকে ধরিয়া, তাহার হাতে পায়ে গলায় শিকল লাগাইয়া তোমার নিকট লইয়া আসিব। সে যদি না দেখিল যে, তাহার রূপের ডালি বহিন আমার সহিত এক বিছানায় বসিয়া আছে, তাহা হইলে আমার সমস্ত আয়োজনই বৃথা, জীবনই মাটি।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"বেশ কথা! আমার পাল্কী আছে; আমি আপনার সম্মুখে তাহাতে উঠিতেছি। আপনার লোকেরা আমাকে সঙ্গে করিয়া বৈঠকখানায় লইয়া চলুক!"

এত সহজে উদ্দেশ্য সাধন হইবে, তাহা রাসবিহারী মনে করে নাই। সে চরিতার্থ হইল।

অপরাজিতা বলিলেন,—"টাকার ট্রাঙ্ক দুইটার জন্য আপনার লোকেরা প্রার্থনা করিতেছিল; এই ঘরে তাহা আছে। আপনি ইচ্ছা করিলে তাহা লইতে পারেন।

রাসবিহারী বলিল,—"নিশ্চয়ই লইতে হইবে। আজিকার যুদ্ধে আমার পুরস্কার তুমি, আর আমার লোকদের পুরস্কার ঐ টাকা।"

টাকার ট্রাঙ্ক বাহির করিয়া লোকেরা লইয়া গেল। পাল্কী আসিল। রামজীবনের স্ত্রী ও কন্যা কাঁদিয়া আকুল হইলেন। অপরাজিতা তাঁহাদের চরণধূলি লইয়া বলিলেন, —"কোন চিন্তা করিবেন না। আমার দেহে করস্পর্শ করিতে পারে এমন লোক সংসারে নাই। আমি বড় জোর দুই ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া আবার আপনাদের চরণ বন্দনা করিব!"

নিশ্চিন্ত ভাবে অপরাজিতা বাহিরে আসিলেন। বিগত রাত্রির বিবিধ যন্ত্রণা ও ক্লেশে তাঁহার রূপের বিভা অপচিত না হইয়া যেন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া কাতর আহতগণ ক্ষণেকের নিমিত্ত সকল জ্বালা ভুলিয়া গেল। অপরাজিতা পাল্কীতে উঠিবার সময় বলিলেন,—"আপনার মনে থাকে যেন, আমার ভাইকে বাঁধিয়া আনিতে না পারিলে, আপনি আমার সম্মুখে আসিতে পারিবেন না।"

রাসবিহারী বলিল,—"নিশ্চয়। আমি এখনই তাহাকে বাঁধিয়া আনিতেছি।"

পাল্কীর কপাট বন্ধ হইল, দুই জন ঝি দুই পার্শ্বে দাঁড়াইল, বাহকেরা পাল্কী কাঁধে তুলিল, রাসবিহারী ও কয়েক জন লোক অগ্রে চলিল, অবশিষ্টেরা পাল্কীর পশ্চাতে চলিল। সকল গোল থামিয়া গেল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই সকল ভয়ানক কাণ্ড সম্পন্ন হইল।

যথাসময়ে রাসবিহারী লোকজন সহ নিজের ভবনে পৌছিল; সঙ্গে সঙ্গে বৈঠকখানার দ্বারে অপরাজিতার পাল্কী আসিয়া লাগিল। দুই জন ঝি সঙ্গে লইয়া, অপরাজিতা সেই পাপের নিকেতনে প্রবেশ

করিলেন এবং ভিতর হইতে সমস্ত প্রবেশ দ্বার বন্ধ করিয়া বলিলেন,—"আপনি এক্ষণে প্রস্থান করুন; যতক্ষণ আমার ভাইকে বাঁধিয়া না আনিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ আমার সহিত সাক্ষাৎ বা কথা কহিবার চেষ্টা করিবেন না। যদি বলপূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমাকে সজীব দেখিতে পাইবেন না।"

রাসবিহারী বলিল,—"আমি এখনই তাহাকে ধরিয়া আনিতেছি। আমার আর একটুও অপেক্ষা করিবার সময় নাই। না জানি হতভাগা এতক্ষণে আরও কতই গোল বাধাইল। সময় থাকিলে আমি তোমার কোন কথাই শুনিতাম না।"

তাহার পর রাসবিহারী কতকগুলি তালা লইয়া বৈঠকখানার সকল দ্বারে লাগাইয়া দিল এবং চাবি গুলি আপনার পকেটে রাখিয়া বেগে নামিয়া আসিল। তাহার অনুচরবর্গ আশাতীত পুরস্কার লাভ করিয়াছে—দশ হাজার টাকা পাইয়াছে; সুতরাং তাহাদের উৎসাহের সীমা নাই। দ্বিগুণ উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া তাহারা রাসবিহারীর সহিত উত্তরপাড়া অভিমুখে ধাবিত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

রাসবিহারী প্রস্থান করার অনতিকাল পরেই বৈঠকখানার একটী দ্বারের তালা খুলিয়া গেল এবং বাহির হইতে শব্দ হইল,—"দ্বার খোল, আমি ভিতরে যাইব।"

মধুর কোমল নারী-কণ্ঠের ধ্বনি শ্রবণে অপরাজিতা সবিস্ময়ে দ্বারের নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি? কেন ভিতরে আসিতে চাহ?"

যে নারী দ্বার খুলিয়া ছিলেন, তিনি সুন্দরী ও যুবতী। বলিলেন,—"বুঝিতেছ না, আমি স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোককে ভয় করিতেছ কেন?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"ভয় যমকেও করি না। তুমি যে একা আছ তাহার প্রমাণ কি?"

স্ত্রীলোক উত্তর করিলেন,—"প্রমাণ আমার কথা?

অপরাজিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে তাহা এখনও বলিলে না তো।"

স্ত্রীলোক বলিলেন,—"যে নারী এমন রাক্ষসের হাত হইতে এতক্ষণও নিস্তার পাইতে পারে, সে বড়ই চতুরা। ভাবিয়াছিলাম, আমি কে তাহা না বলিলেও তুমি বুঝিতে পারিবে।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"এ বাটীতে স্ত্রীলোকের যেরূপ সদ্গতির কথা শুনিয়া আসিতেছি, তাহাতে কেবল কণ্ঠস্বর শুনিয়া কাহার কি পদ তাহা স্থির করা দুষ্কর। এই জন্য তোমার পরিচয় জানিবার প্রয়োজন।"

স্ত্রীলোক বলিলেন,—"তুমি এক্ষণে যাঁহার হৃদয়েশ্বরী আমাকে লোকে তাঁহার স্ত্রী বলিয়া থাকে।

অপরাজিতা বলিলেন,—"এ অনুমান পূর্ব্বেই আমার মনে উদিত হইয়াছিল। তবে তুমিই কি স্বামীর এই সকল কার্য্যের দূতী।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"আমার স্বামীর এরূপ কার্য্যে দূতীর সাহায্য লাগে না; দূতী মধ্যে থাকিলে কাজটা একটু মিষ্ট হয়, একটু সরস

অপরাজিতা তখন রাসবিহারীর স্ত্রীকে অপর দিক দিয়া বাহিরে যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন,—"তোমার ভাইকে আমি দেখিতে ইচ্ছা করি। আমি এখানে থাকিব।

অপরাজিতা দ্বার খুলিয়া দিলেন। ঘর্ম্মাক্ত কলেবর বিনোদ তথায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"অপি, আমার আদরের ভগ্নি অপি, যে তোমাকে এই পাপ নিকেতনে আনি-
ছে, কোন শাস্তিই তাহার অপরাধের অনু-
একটুও ... হার সর্ব্বনাশ উপ-
জানি হতভাগা এতক্ষণে আর উপর রাগ করিয়া
বাধাইল। সময় থাকিলে আমি
কথাই শুনিতাম না।"

তাহার পর রাসবিহা...তো হইয়া কাঁদিতে
তালা লইয়া বৈঠকখানার স,—"আমি শুনিয়াছি
ইয়া দিল এবং চাবি গুলি অধমকে রক্ষা করাই
রাখিয়া বেগে নামিয়া আসিয়া আমার স্বামিকে
চবর্গ আশাতী... পুরস্কার হইবে।"
দশ হার বিনোকা পাইয়া করিলেন —"ইনি কে?"
দের উ অপরাজিতা বলেন,—"নাগের স্ত্রী।"
উন্মত্ত বিনোদ বলিলেন,—"অপরাধ অনেক;
উত্তরপরাধী রাজ-পুরুষদিগের হস্তগত; এ সম্বন্ধে
মার কোন কথাই চলিবে না। আমি আপ-
কে কোন প্রকার ভরসা দিতে অক্ষম। অপি,
নির্ভয়ে একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই
সিতেছি।"

বিনোদ প্রস্থান করিলেন। নাগের স্ত্রী
াশ ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল!

বাহিরে "রিজার্ভ পুলিশের" একশত কনষ্ট-
ব্ল বন্দুক হস্তে দণ্ডায়মান; বেঙ্গল পুলিশের পরেই শ জন কনষ্টবল লাঠি হস্তে উপস্থিত গেল একদায় প্রায় ত্রিশ জন, হেড কনষ্টবল চারি-খোল, ইন্‌স্‌পেক্টর, সব ইনস্পেক্টর সুপারিণ্টেণ্ড এবং এসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত।

এক স্থানে রাসবিহারী এবং তাহার সঙ্গি-গণ বসিয়া আছে; তাহার চতুর্দ্দিকে রিজার্ভ পুলিশের কনষ্টবলগণ সঙ্গিন সমেত বন্দুক লইয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। রাসবিহা-রীর পায়ে বেড়ি এবং হাতে হাতকড়ি। অন্যান্য সকলেরও হস্ত-পদ-নিবদ্ধ এবং চারি চারি ব্যক্তি এক শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত।

বিনোদ বাহিরে আসিয়া পুলিশ সাহেবকে বলিলেন,—"আমার ভগ্নী এই ঘরেই আছেন। আপনি সুসময়ে আসিয়া, উত্তরপাড়ায় রাস-বিহারীকে গ্রেফতার না করিলে, আমাদের সর্ব্বনাশ হইত। আমরা যাবজ্জীবন আপনার নিকট অচ্ছেদ্য ঋণে আবদ্ধ রহিলাম।"

সাহেব বলিলেন,—"আপনি এ বিষয়ে যেরূপ তৎপরতা, উৎসাহ এবং অধ্যব-সায়ের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অদ্ভুত। আমরা সকলেই আপনার ব্যবহারে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি। আপনি সকল কার্য্যই স্বয়ং সমাধা করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টের কোন সাহায্যই গ্রহণ করেন নাই। কোন বিপদের সম্মুখীন হইতে আপনি একবারও পশ্চাৎপদ হন নাই। আমরা আপ-নাকে অজস্র প্রশংসা করিতেছি। এক্ষণে আপনি পিতা, পিতার বন্ধু ও ভগ্নীকে লইয়া সুখ-দুঃখের কথা কহিবার নিমিত্ত যেখানে ইচ্ছা গমন করুন; আমরা আসামীদিগকে লইয়া এবং চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে যাহারা পড়িয়া আছে তাহাদিগের উচিত মত ব্যবস্থা করিয়া, পরে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। প্রার্থনা করি এই সুদীর্ঘ সময় আপনি আত্মীয়গণের সহিত পরম সুখে অতিবাহিত করিবেন।"

বিনোদ সাহেবদ্বয়ের নিকট বিদায় হইয়া,

অপরাজিতার সমীপে আগমন করিলেন। রামজীবনের বাটীতে যে পাল্কী ছিল, তাহা আনিবার জন্ত বাহকেরা অনেকক্ষণ গমন করিয়াছিল। এক্ষণে পাল্কী আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইল। রাসবিহারীর হতভাগিনী স্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া, অপরাজিতা পাল্কীতে উঠিলেন। ঝি দুই জন পাল্কীর উভয় পার্শ্বে দাঁড়াইল, বাহিরে আর একখানি পাল্কীতে যদুপতি মিত্র ও জগবন্ধু বসু মৃতকল্প অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। বিনোদ এবং রামজীবন সেই পাল্কীর দুই দিকে দাঁড়াইলেন। সঙ্গে দ্বারবান্ প্রভৃতি কয়েক জন লোক চলিতে লাগিল। উভয় পাল্কী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া যদুপতি মিত্রের সেই জীর্ণ ভবনে প্রবেশ করিল।"

রামজীবনের স্ত্রী ও কন্তা তৎক্ষণাৎ সেই বাটীতে আগমন করিলেন। শ্রীরামের বাটীর যাবতীয় স্ত্রী ও পুরুষ পরিচর্য্যা করিতে অগ্রসর হইল। অনেকের চেষ্টায় উপরের তিন-চারিটী ঘর এক প্রকার পরিষ্কার করা হইল। শয্যা প্রস্তত করিয়া যদুপতি ও জগদ্বন্ধুকে শয়ন করান হইল। উষ্ণদুগ্ধ পান করিয়া তাঁহারা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। মনের আনন্দে ও হৃদয়ের সন্তোষে তাঁহারা ক্রমে উৎসাহশীল হইয়া উঠিলেন। নাপিত আসিয়া তাঁহাদের ক্ষৌর-কার্য্য সমাধা করিয়া দিল। বিনোদের বস্ত্র ও জামা পরিধান করায় তাঁহাদের মূর্ত্তি অন্যরূপ হইয়া উঠিল। আনন্দের সীমা রহিল না।

দশম পরিচ্ছেদ।

চারিদিকে আনন্দের কলরব। উৎসাহে সকলেই উন্মত্ত। যাহা হইবার নহে, যাহা স্বপ্নেও কেহ মনে করে নাই, যাহা কবির কল্পনাতেও উদিত হইতে পারে না, তাহাই আজি ঘটিয়াছে। মৃত ব্যক্তি যমালয় হইতে সজীব অবস্থায় সশরীরে প্রত্যাগত হইয়াছে কল্পনাতীত কলঙ্কের বাঝাপি বেশ কাজ লোকসমাজের অন্তরালে পর্ম সে পাত্র?" তিনি স্বকীয় নিষ্কলঙ্ক দেব-চ? না, এখন দেখা দিয়াছেন। বিনোদের বিশ্বাস নাই, পিতার ও পিতৃসখার পরিদেয়। মা যদি তাঁহাদের মুখে বিগত ক্লেশে অশ্রু-বর্ষণ করিতেছেন। বলুন।" শীলতা, ধর্ম্মময়তা, বিদ্যা ও বুদ্ধির রাস রায়ের বৃদ্ধদ্বয় আন্তরিক আনন্দ পরিব্যক্ত করিতেছেন। বিনোদ নত বদনে তাঁহাদের সেই সুখ ও সন্তোষজনিত পরিতৃপ্তি উপভোগ করিতেছেন। অতি অল্প সময়েই বিনোদ সুকৌশলে সমস্ত ঘটনা ও অবস্থা তাঁহাদিগকে জানাইয়াছেন। বিজলী ও তাঁহার জননী জীবিত আছেন, এবং বিনোদ তাঁহাদের একান্ত হিতৈষী জানিয়া জগদ্বন্ধু আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছেন।

হাসিতে হাসিতে রামজীবন তথায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"দাদা, সকল কথা আপনাকে বলা হয় নাই। এত দিনে পেটের কথা সব বলিয়া শেষ করিতে পারিব জানি না। আপনার সেই রামদীন চাকর এ ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। ভুল প্রযুক্ত আপনাকে মনে করিয়া, পুলিশ তাহাকে অনেক কষ্ট

দিয়াছে। গরিব আপনার ক্ষমার প্রার্থী; সে আপনাকে প্রণাম করিতে চাহে।”

যদুপতি বলিলেন,—“ভায়া, আমি আর কে? তুমি আর বিনোদ সকলই করিয়াছ। তোমাদের প্রাণান্ত চেষ্টা না হইলে আমাদিগকে রাসবিহারীর সেই ঘরেই মরিয়া ভূত হইতে হইত। তোমরা রামদীনকে ক্ষমা করিলেই যথেষ্ট। তাহাকে আসিতে বল।”

এ৮৮৬ রামজীবনের আজ্ঞাক্রমে, রামদীন আসিয়া
জানি হতভাগা এতক্ষণ মৌখে প্রণাম করিল। যদু-
বাধাইল। সময় থাকি—“আমি বিনোদের মুখে
কথাই শুনিতাম না। শুনিয়াছি, তুমি অনেক কষ্ট
তাহার পর তোমার বাম হস্তখানি গিয়াছে।
তালা লইয়া বৈঠকখা তুমি কষ্ট না পাও, বিনোদ
ইয়া দিল এবং চাবি ও ব্যবস্থা করিবেন।”
রাখিয়া বেগে নামিয়া লিল,—“হুজুরের নিকট আমি
চবর্গ আশালী গোলামের কসুর মাপ করিতে
দশ হইবে। হুজুরকে যে আবার দেখিতে পাইলাম,
ইহাতেই আমার সকল পুরস্কার লাভ হইয়াছে।
হাতের কথা কি বলিতেছেন? এ কাজে জান
দিলেও কোন ক্ষতি হইত না।”

যদুপতি বলিলেন,—“এরূপ সদ্ব্যবহারের পর যদি তোমার অপরাধের কথা আমরা ভুলিয়া না গিয়া তোমাকে ক্ষমা না করি, তাহা হইলে আমরা মহা পাপী।”

রামদীন পুনরায় প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

যদুপতি বলিলেন,—“ভায়া, অনেকেই আমাদের জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছে। গ্রামের লোক এই দুই বুড়াকে এত ভাল বাসিত মনে করিলে আহ্লাদ হইতে পারে বটে। শ্রীরাম দাস অনেক কষ্ট করিয়াছে; দুর্গাপুরের অনেক লোক অনেক সাহায্য করিয়াছে। বিনোদ, সকলকে তুমি তুষ্ট করিও, সকলকেই আমাদের ভালবাসা জানাইও, আর সকলকেই আপনার লোক জানিয়া, আপদ-বিপদে সাহায্য করিও। রামজীবন ভায়া, তোমার মেয়ের ছেলে-মেয়ে হইয়াছে। তুমিও বুড়া হইয়া গিয়াছ। আজি এই আনন্দের দিনে ঘরে গৃহিণী না থাকায় বড় কষ্টের বিষয় মনে হইতেছিল। তোমার নাতিনী আমার গৃহিণী হইয়া ঘর আলো করিবেন কি?”

অন্যান্য নানা বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত বিনোদ প্রস্থান করিলেন।

জগদ্বন্ধু বলিলেন,—“ঠিক বলা যায় না। উমেদার অনেক। কাহার কপাল প্রসন্ন হইবে কে জানে।”

যদুপতি বলিলেন,—“আচ্ছা, স্বয়ম্বরের উদ্যোগ কর; দেখ আমার কপাল প্রসন্ন হয় কি না।”

জগদ্বন্ধু বলিলেন,—“তুমি খুনে। বন্ধুকে খুন করিয়া তুমি পলাতক। খুনের গলায় কেহ কি মালা দেয়?”

যদুপতি বলিলেন,—“আর তুমি তো মরিয়া ভূত হইয়াছ হে। ভূতকে কেহ কি বিবাহ করে?”

জগদ্বন্ধু বলিলেন,—“বুড়ী জেলেনী মাগীও যাহার কাছে পার পায় না, তাহাকে মালা দিতে কাহার দায় পড়িয়াছে?”

একটা হাসির রোল উঠিল। যদুপতি বলিলেন,—“রহস্য যাউক। ভাবিয়া দেখ ভাই, এ সংসারে হরিদাস রায় কি অপ্রাকৃত মনুষ্য। তাঁহার সহিত আমার আত্মীয়তা যথেষ্ট ছিল সত্য। এ সংসারে কে সেই খাতিরে এত করে ভাই? আমার নিঃসহায় পুত্রকে নিজের পুত্রের ন্যায় যত্নে মানুষ করি লেখা-পড়ায় সুপণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে

উইলের দ্বারা বিষয়েরও পুত্রের অনুরূপ অংশ বিনোদকে দিয়া গিয়াছেন; পরের ছেলে বলিয়া আপনারাও বুঝেন নাই, বিনোদকেও বুঝিতে দেন নাই। এ সংসারে এরূপ আত্মীয়তা বড়ই বিরল। তিনি আমার অপেক্ষা বয়সে কিছু বড় ছিলেন। কিন্তু মরিবার বয়স হয় নাই। আজি তিনি বাঁচিয়া থাকিলে, কি সুখের বিষয়ই হইত।”

এই সময়ে অপরাজিতা, দুইখানি রেকাবে খানিকটা করিয়া মোহনভোগ লইয়া, তথায় উপস্থিত হইলেন। রামজীবন বলিলেন,—“ইনিই বিনোদের ভগ্নী অপরাজিতা।”

অপরাজিতা উভয় বৃদ্ধের নিকট এক একখানি রেকাব রাখিয়া উভয়কে প্রণাম করিলেন। যদুপতি বলিলেন,—“মা, যাহা শুনিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি তোমার প্রকৃতি অলৌকিক। তুমি আমাদের জন্য বড় ক্লেশ ভোগ করিয়াছ, তাহাও আমরা শুনিয়াছি। তুমি বিনোদের ভগ্নী; সুতরাং আমার কন্যা। পিতা কখন পুত্র কন্যার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।”

বিনোদ পুনরায় তথায় আগমন করিলেন।

জগদ্বন্ধু বলিলেন,—“তুমি মা আমার দুঃখিনী কন্যাকে বাঁচাইয়াছ। তাহাদের সম্ভবাতীত যত্ন করিয়াছ। তোমার গুণ কখন বলিয়া শেষ করিতে পারিব না।”

অপরাজিতা বলিলেন,—“আপনার কন্যা রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী। তাঁহাকে কে না ভাল বাসিবে?”

যদুপতি বলিলেন,—“জগদ্বন্ধু, মোহনভোগ একটু একটু খাইতে খাইতে গল্প কর; সঙ্গে সঙ্গে রাসবিহারীর সেই শুকনা চাউলের কথা মনে করিতে থাক।”

জগদ্বন্ধু বলিলেন,—“সে চাউলও যদি না দিত, তাহা হইলে বাঁচিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিতে কি?”

যদুপতি বলিলেন,—“তা ঠিক। সে যাহা হউক, মেয়ে তোমার খুবই বড় হইয়াছে। এখন প্রথমেই তোমাকে বিবাহের জন্য পাত্র খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে।”

জগদ্বন্ধু বলিলেন,—“পাত্র খুঁজিবার কষ্ট বোধ হয় আমাকে পাইতে হইবে না। অতি সৎপাত্র আমার ঠিক করাই আছে। কলিকাতায় গিয়াই বোধ হয় শুভ কর্ম্ম শেষ করিতে পারিব।”

যদুপতি বলিলেন,—“বটে! তাহা হইলে নাগের কয়েদে থাকিয়াও তুমি বেশ কাজ করিয়াছ দেখিতেছি। কোথায় সে পাত্র?”

জগদ্বন্ধু বলিলেন,—“বলিব? না, এখন বলিয়া কাজ নাই। যদুপতিকে বিশ্বাস নাই, বড় দুষ্ট লোক। যদি ভাঙ্গচি দেয়। মা যদি বল তবে বলি।”

অপরাজিতা বলিলেন,—“বলুন।”

জগদ্বন্ধু বলিলেন,—“পাত্র হরিদাস রায়ের পুত্র—বিনোদবিহারী রায় এম্ এ।”

অপরাজিতার মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বিনোদের মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইল। পিতা এ কথার কি উত্তর দেন, জানিবার জন্য তাঁহার প্রাণ অস্থির হইল।

যদুপতি বলিলেন,—“তবে আইস বেহাই, তোমার সহিত কোলাকুলি করি। আমরা শৈশব হইতে এক সঙ্গে বেড়াইয়াছি, এক সঙ্গে খেলা-ধূলা লেখা-পড়া করিয়াছি, শেষ জীবনে উভয়ে এক সঙ্গে সমান দুঃখ ভোগ করিয়াছি। আমাদের মধ্যেই এরূপ বন্ধন হওয়া আবশ্যক।”

যদুপতি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জগদ্বন্ধুও অগ্রসর হইলেন। উভয় বন্ধু আন্তরিক

প্রেমের প্রাবল্যে পরস্পর গভীর আলিঙ্গন করিলেন। সকলেরই চক্ষুতে জল।

অপরাজিতা বলিলেন,—"আপনারা জল খান।"

যদুপতি বলিলেন,—"তুমি আমাদের ভাগ্য-দেবী। তোমার জন্যই আজি আমাদের এত আনন্দ। কেবল এক নিরানন্দ তোমার এই বেশ। তোমাকে বালিকা কালে দেখিয়াছি—যেন সোণার পুতুল। সে মূর্ত্তি এখন আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। কিন্তু মা, তোমার এই বেশ দেখিয়া তোমার সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিতেছি না।"

অপরাজিতা অধোমুখে বলিলেন, "এ অবস্থায় কিসে যে লোক আনন্দে সুখী হওয়া যায়, তাহা আমি ঠিক করিয়া লইয়াছি। এখন আর আমি ইহাতে অসুখী নহি। আপনারা এ জন্য অসুখী হইবেন না। এখন আপনারা আর একটু মোহনভোগ খান।"

তাহারা পরমানন্দে জলযোগ ও হাস্য-কৌতুক করিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

রামদীন আসিয়া সংবাদ দিল, সাহেবরা ও বাবুরা দেখা করিতে আসিয়াছেন। বিনোদ সেই ঘরে দুইখানি আমকাঠের বেঞ্চ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অপরাজিতা রেকাব লইয়া প্রস্থান করিলেন। রামজীবন আদর-সহকারে সাহেবদ্বয়কে ও বাবুদের উপরে লইয়া আসিলেন।

বিনোদ অগ্রসর হইয়া, পরম সমাদরে সাহেবদ্বয়, ইন্‌স্পেক্টর ও সব-ইন্‌স্পেক্টরদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া ঘরের মধ্যে আসিলেন। বলিলেন,—"আমাদের সকলই গিয়াছে। কেবল ইট কয়খানি যায় নাই। আপনাদিগকে বসিতে দিবার একখানি আসনও আমাদের নাই। কৃপা সহকারে এই কদর্য্য আসনে উপবেশন করিয়া আমাদের অনুগৃহীত করুন।"

সাহেবদ্বয় এক বেঞ্চে আসন গ্রহণ করি-লেন, অন্য বেঞ্চে বাবুরা বসিলেন। সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন,—"আমি আপনাদের দুর্দ্দ-শার কথা সমস্তই বুঝিতেছি। সে যাহা হউক, আপনার প্রতিজ্ঞা সত্য হইল, অনুমান যথার্থ হইল, আপনার পিতা নিষ্কলঙ্ক হইলেন, আপনার পরিশ্রম ও ক্লেশ সার্থক হইল, ইহা আমাদের বড়ই আনন্দের বিষয়। এই মহাত্মাই বুঝি আপনার পিতা? আর ইনিই বুঝি আপনার পিতৃবন্ধু?"

বিনোদ মস্তকান্দোলন করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। সাহেব পূর্ব্বে মিলিটারি অফিসর ছিলেন। বলিলেন,—"মিত্র মহাশয়! আপনি বন্ধুর বুকে ছোরা মারিয়া পলাইয়াছিলেন। ছিঃ! আপনি অতি ভয়ানক লোক! আর আপনি মরিয়া বাঁচিয়াছেন! মরিয়া ভূত হওয়ার কথা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র প্রচারিত আছে। আমরা অদ্য তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতেছি।"

একটা হাসির রোল উঠিল। বিনোদ বলিলেন,—"আপনাদের আজি পরিশ্রম ও কষ্টের সীমা নাই। আমি আপনাদিগকে কিঞ্চিৎ জল খাওয়াইবার ইচ্ছা করিতেছি এবং আমার সেই ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য সানুনয় অনুরোধ করিতেছি। কিন্তু আমাদের অবস্থা আপনারা দেখিতেছেন। কোনই

আয়োজন করিয়া উঠিতে পারি নাই। খানিকটা দুধ, কতকগুলি কলা, কিঞ্চিৎ চা, আর বলিতে সাহস করি না, যদি দয়া করিয়া গ্রহণ করেন, আমাদের লুচি মোহনভোগ ছাড়া আর কোন পদার্থই সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কৃপা করিয়া অনুমতি করিলে, আমি সমস্ত আনিয়া উপস্থিত করি।"

সাহেব বলিলেন,—"আমাদের আহারের ভয়ানক প্রয়োজন হইয়াছে। আপনি না বলিলেও আমাদিগকে খাদ্য চাহিয়া লইতে হইত। আপনি প্রচুর আয়োজন করিয়াছেন; আনয়ন করুন।"

বিনোদ যাইবার সময় বাবুদের বলিয়া গেলেন,—"আপনারা কায়স্থ। যদি অন্নভোজনে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তাহাই দিতে বলি। নতুবা লুচি-তরকারিও আছে। ফলতঃ কিছু না খাইলে ছাড়িব না।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন,—"ভাতই ভাল।"

গরম চা আসিয়া পড়িল। ইন্‌স্পেক্টর ও সবইন্‌স্পেক্টর আহূত হইয়া গৃহান্তরে পরিতোষ সহকারে মৎস্যের ঝোল ও ভাত খাইলেন। তাঁহাদের পরিত্যক্ত বেঞ্চ সাহেবদের টেবিল হইল। নানা প্রকার খাদ্য আসিল। সাহেবরা পানাহার করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন।

চুরুট খাইতে খাইতে বড় সাহেব বলিলেন,—"আসামীদিগকে চালান দেওয়া হইয়াছে। যাহারা আহত, তাহাদের গাড়ি করিয়া পাঠান হইয়াছে। চক্রবর্ত্তীর বাটী হইতে অনেকের জবানবন্দী লিখিয়া লওয়া হইয়াছে। আপনি অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া আনন্দে আছেন, বড় ব্যস্তও আছেন জানিয়া, আপনাকে ডাকাডাকি করিয়া ত্যক্ত করি নাই; এখনও ত্যক্ত করিতাম না। কিন্তু এক খাওয়ার প্রয়োজন—"

বিনোদ বাধা দিয়া সবিনয়ে বলিলেন,—"সেটা অতি কদর্য্য ভাবেই সম্পন্ন হইল।"

সাহেব বলিলেন,—"সেজন্য যদি আপনি কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সব ঠিক-ঠাক হওয়ার পর আর একদিন ভাল করিয়া খাওয়াইবেন? দ্বিতীয় প্রয়োজন—আপনার পিতার ও তাঁহার বন্ধুর জবানবন্দী। কেন না সঙ্গে সঙ্গে রাসবিহারীর কেস তৈয়ার করিতে হইবে।"

যদুপতি বলিলেন,—"স্বচ্ছন্দে লিখিয়া লইতে পারেন। যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমরা তাহার উপর দিতে প্রস্তুত আছি।"

সবইন্‌স্পেক্টর অগ্রসর হইয়া লিখিতে বসিলেন। যেরূপ প্রশ্ন উত্তর হইতে লাগিল তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ না করিয়া, আমরা তাহার তাৎপর্য্য মাত্র নিম্নে সঙ্কলিত করিতেছি।—সালের—মাসের—শে যদুপতি, জগদ্বন্ধু দুই জনে পরামর্শ করিয়া, বেলা আন্দাজ পাঁচটার সময় দুর্গাপুরের দিকে বেড়াইতে যান। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকায়, ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতে তাঁহাদের বিলম্ব হইয়া পড়ে। মাঠে সে সময় আবাদ না থাকায়, কোথায়ও জনমানব ছিল না। যখন তাহারা পুষ্করিণীর নিকটস্থ হইলেন, তখন প্রায় সন্ধ্যা। তাঁহারা দূর হইতে দেখিলেন, পুষ্করিণীর পাড়ে চারি পাঁচজন লোক মারামারি করিতেছে। তখনই "বাবাগো, মাগো" শব্দে চীৎকারধ্বনি তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করে। তাঁহারা ব্যস্তভাবে নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, রাসবিহারী নাগ, নিধে চাঁড়ালের বুকে প্রকাণ্ড তরবারি বসাইয়া দিয়াছে, তাঁহারা যখন নিকটস্থ হইলেন, তখন রাসবিহারী তরবারি বুক হইতে তুলিয়া লইতেছে। যদুপতি বলিলেন, "ছি ছি রাসবিহারী

তুমি নিধেকে মারিয়া ফেলিলে।" এই কথায় রাসবিহারী তাঁহাদের বাঁধিতে হুকুম দিল। তাহার সঙ্গের চারি ব্যক্তি তাঁহাদের ধরিয়া ফেলিল। রাসবিহারীও নিধের মৃতদেহের নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া তাহাদের সাহায্য করিল। সম্মুখে এই হত্যাকাণ্ড দেখিয়া তাঁহারা হতবুদ্ধি ও জড়প্রায় হইয়া গিয়াছিলেন। বিশেষ বলপ্রকাশ বা চীৎকার করিতে তাঁহাদের মনে হইল না। রাসবিহারী উভয়েরই মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। সে বলিল,—"লাশই হইয়াছে। এই দুই জনের একজন খুন হইয়াছে, আর এক জন খুন করিয়াছে সাব্যস্ত করিলেই হইবে।" তাহার পর সে জগদ্বন্ধুর গায়ের জামা চাদর কাপড় সকলই খুলিয়া লইল, এবং তাঁহাকে ছোট একখানি গামছা মাত্র পরাইয়া দিল। পরে নিধের মৃতদেহের সমীপে গিয়া, সঙ্গীদের সাহায্যে মৃতদেহে জগদ্বন্ধুর জামা পরাইল, তাহার কটিতে কাপড় জড়াইয়া দিল, গলায় চাদর বাঁধিয়া দিল। তাঁহারা নীরবে সেই স্থানে পড়িয়া সকলই দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর নিধের দেহ জলে ডুবাইয়া দিল। তাহার কাপড় চোপড় বোধ হয় সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল।

নিধের রক্তাক্ত সেই তরবারি হস্তে রাসবিহারী তাঁহাদের নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"যাহা বলি তাহা যদি নিঃশব্দে কর, তাহা হইলে তোমাদের প্রাণে মারিব না; আর যদি একটুও গোল কর বা কোন আপত্তি কর, তাহা হইলে এই পুকুরে নিধের সহিত তোমাদের দেহও ডুবিবে।" তাহারা কোন আপত্তিই করিতে সাহস করিলেন না। তাহার পক্ষে দুই একটা মানুষ কাটিয়া ফেলা বড় বেশী কথা নহে, ইহা তাঁহারা বেশ জানিতেন। তাঁহাদের চক্ষু উত্তমরূপে বাঁধিয়া ফেলিল, হস্তদ্বয় পিঠের দিকে বাঁধিয়া দিল তাহার পর দুইজন লোক দুইজনকে ধরিল। রাসবিহারী বলিল,—"ভদ্রলোকের মত চলিয়া আইস।" তাঁহারা অন্ধভাবে চলিতে লাগিলেন। তখন বোধ হয় রাত্রি অনেক। কোন্ পথ দিয়া কোথায় লইয়া যাইতেছে তাহা তাঁহারা জানিতে পারিলেন না। পায় লতা-গুল্ম বাধিয়া যাওয়ায়, গায়ে গাছ ও ডাল লাগায় তাঁহারা বুঝিলেন, বনের মধ্য দিয়া তাঁহারা যাইতেছেন। কতদূর পথ যাইতে হইল তাহাও তাঁহারা ঠিক করিতে পারিলেন না। অনুমান দেড় ক্রোশ পথ চলার পর একটা স্থানে তাঁহাদের দাঁড় করাইল। তালা খোলার শব্দ হইল। দুইজনকে দুইটা ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। তাহার পর তাঁহাদের চক্ষু খুলিয়া দিয়া বলিল,—"আজি এইখানে থাক, কালি যাহা হয় করিব।" সে কালি আর আসিল না। রাসবিহারী আর দেখা দিল না। ঘরের তালা বন্ধ হইল। মধ্যে মধ্যে একটা লোক আসিয়া এক হাঁড়ি মোটা চাউল দিয়া যাইত ও দুইটা কলসীতে জল রাখিয়া যাইত। শত বিনয়ে সহস্র প্রলোভনেও সে কথা কহিত না। সেই চাউল জলে ভিজাইয়া বা কাঁচা চিবাইয়া খাইতে হইত জল বা চাউল ফুরাইলে তখনই পাওয়া যাইত না। যখন সেই লোকটার সময় হইত, তখই সে আসিত। সুতরাং ভয়ে ভয়ে অল্প অল্প করিয়া জল ও চাউল খরচ করিতে হইত। শীতের সময় প্রথমবার একখানি করিয়া কম্বল ও কাপড় দিয়াছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে আর বস্ত্রাদি দেয় নাই। ঘর হইতে বাহির হওয়ার কোনই উপায় ছিল না। ঘরেই মল-মূত্র ত্যাগ করিতে হইত। দূরবর্ত্তী দুই স্বতন্ত্র ঘরে দুই জন ছিলেন।

প্রথম প্রথম চীৎকার করিয়া পরস্পরের সংবাদ লওয়া হইত। ক্রমে দুর্ব্বলতার আতিশয্যে সে সুখও বন্ধ হইল। এইরূপ অবস্থায় বহুকাল থাকার পর, তাঁহারা বুঝিতে পারেন, আর একটা লোক সেই বাড়ীতে আনীত হইয়াছে, কারণ সেও চীৎকারে যোগ দিত তাঁহারা কথা শুনিয়া জানিতে পারেন, সে ব্যক্তি রাসবিহারীর একজন প্রজা। কিছুদিন পরে সকলেরই চীৎকার বন্ধ হয়। অধিকন্তু অচিরে একটা মরা পচার দুর্গন্ধে উভয় বন্ধুই অস্থির হইয়া পড়েন এবং তাঁহাদের একজন মারা গিয়াছেন স্থির করিয়া, বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে স্থান তাঁহারা ত্যাগ করিতে পারিবেন, এ আশা তাঁহাদের ছিল না। তাহার পর এই অসম্ভাবিত মুক্তি।

সাহেব বলিলেন,—"এ ব্যাপার অদ্ভুত। বিনোদ বাবু প্রথম হইতেই এরূপ কাণ্ড হওয়া অসম্ভব বলিয়া আভাস দিয়া আসিতেছেন। আমরা কেহই তাঁহার কথায় আস্থাবান্ হইতে পারি নাই। আজি তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ। আপনারা এক্ষণে আনন্দ উপভোগ করুন—আমরা বিদায় হই। শীঘ্রই আপনাদের সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিবার সুযোগ হইবে আশা করি। বিনোদ বাবু, একটা কথা যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করি। আপনাদের দশ হাজার টাকা হারাইয়াছে কি?"

বিনোদ বলিলেন,—"ঠিক বলিতে পারি না, কত টাকা। দুই ট্রাঙ্ক টাকা ছিল। দশ হাজার টাকাই সম্ভব।"

সাহেব বলিলেন,—"সব টাকাই পাওয়া গিয়াছে। রাসবিহারীর লোকেরা ট্রাঙ্ক ভাঙ্গিয়া তাহা ভাগ করিয়া লইয়াছিল। তাহাদের কাছেই টাকা ছিল। টাকা সমেত আসামীদিগের বিরুদ্ধে ডাকাইতির চার্জ্জ সাব্যস্ত করিয়া, তাহাদের চালান দিতে হইয়াছে। মোকদ্দমার পর আপনি সমস্ত টাকা পাইবেন।"

বিহিত শিষ্টাচারাদির পর, সাহেবেরা ও বাবুরা প্রস্থান করিলেন। বিনোদ বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্ণকালে কলিকাতার সেই বাসায় বিজলী ও তারাসুন্দরী বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। বিজলীর শরীর বড় দুর্ব্বল; দেহের বর্ণ যেন সাদা হইয়া গিয়াছে। নড়িতে চড়িতে বড় কষ্ট হয়; শুইয়া না হয় বসিয়াই দিন কাটাইতে হইতেছে। রাত্রিতে ভাল নিদ্রা হয় না; যদি একটু নিদ্রা আইসে নানাবিধ সুখ-দুঃখ-পূর্ণ স্বপ্নেই সেটুকু কাটিয়া যায়। আহার খুব কমিয়া গিয়াছে।

বিনোদ সেই চলিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই; একখানি চিঠি লিখিয়াও তিনি সংবাদ লন নাই,—দেন নাই। কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, খুব নিকটেই বাসা, তথাপি একটিবার কোন খবর লন নাই। তাঁহারা কি কোন অপরাধ করিয়াছেন? জ্ঞানতঃ কোনই দোষ তাঁহারা করেন নাই তো। ঘটনা যেরূপ ঘটিয়াছে, লোকে যাহা বুঝিয়াছে, পুলিশ যাহা বুঝিয়াছে, তাহাই তাঁহারা বলিয়াছেন। তাঁহারা সে কথা বিশ্বাস করেন নাই,

তাঁহাদের বিশ্বাস সম্পূর্ণ বিপরীত, ইহাও তো বিশেষ রূপে বলিয়াছেন। তবে কেন তিনি এই দুঃখিনীদের প্রতি এরূপ নিষ্করুণ ব্যবহার করিলেন? তিনি দেবতা। দেবতার বিবেচনায় ভুল হইতে পারে না; তবে তাঁহার এত ভুল হইল কেন? তাঁহাদের অদৃষ্ট!

বিজলীর প্রাণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বড়ই আশা তিনি হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন, বড়ই মোহকর স্বপ্ন তাঁহাকে মাতাইয়াছিল, বড়ই সুখের ও সোহাগের রাজ্যে তিনি বেড়াইতেছিলেন; দুর্ভাগ্যক্রমে সকলই হঠাৎ শেষ হইয়া গেল। সহসা কাল মেঘ দারুণ বজ্র উদ্‌গিরণ করিল। আশার লতা ছিঁড়িয়া গেল। স্বপ্নের সুখ ফুরাইয়া গেল। আনন্দের রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেল। কেন এমন হইল?

বড়ই সঙ্কুচিত ভাবে, কাতর কণ্ঠে বিজলী জিজ্ঞাসিলেন,—"মা, তিনি—সেই দেবী, তিনি আর খবর দেন না কেন মা?"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"জানি না মা, কি হইল। পাঁচ ছয় দিন তাঁহারও সংবাদ আইসে নাই। ওদিকে প্রতিদিনই তো অপরাজিতার পত্র পাওয়া গিয়াছে। কেন এ কয়দিন কোন সংবাদ আসিতেছে না?"

বিজলী বলিলেন,—"কোন বিপদ ঘটাও তো অসম্ভব নহে। তাঁহারা বড়ই ভয়ানক কার্য্যে মাথা দিয়াছেন।"

সব যায়, কিন্তু সুখের আশা, আনন্দের কল্পনা গিয়াও তো যায় না। বিজলী বিষাদিনী। দারুণ বজ্র তাঁহার সকল আশার শেষ করিয়া দিয়াছে। তাঁহার হৃদয়-কানন ভস্ম হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সবই আছে। আবার সেই ভস্মস্তূপ হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়াছে; আবার সেই শুষ্ক তরু মঞ্জরিত হইয়াছে। আশা যায়—হৃদয়কে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়া, নিতান্ত নিষ্ঠুর দস্যুর ন্যায় আশা চলিয়া যায়; কিন্তু তখনই পরম দয়াময় দেবতার ন্যায় শান্তির অমৃত-কলস হস্তে লইয়া, আবার আসিয়া দেখা দেয়; আবার ভস্মাবশেষ প্রাণকে নন্দন-কাননে পরিবর্ত্তিত করে, সুমধুর সুশীতল শান্তি-সলিল সেচন করিয়া, আবার হৃদয়-কাননের তরু-লতাকে সজীব ও সুস্থ করিয়া তুলে। বিজলীর হৃদয় বড়ই প্রবল আঘাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; কিন্তু আবার সবই নবীন হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ ভাঙ্গা-গড়া অনেকবার চলিয়াছে।

যখন অপরাজিতার কথা মাতার নিকট বলিবার প্রয়োজন হইল, তখন বিজলী তাঁহার নামটা মুখে আনিতে ভরসা করিলেন না কেন? তাঁহার কর্ণমূলে কুহকিনী আশা সেই দেবীকে ঠাকুরঝি বলিতে উপদেশ দিয়াছে; লজ্জা বলপূর্ব্বক কণ্ঠরোধ করিয়া তাহা বলিতে বারণ করিতেছে। আর বিনোদ তাহার সহিত সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন বলিয়াই যদি বিজলী বুঝিয়া থাকেন, তবে তাঁহার কথা স্পষ্টরূপে বলিতেই বা ক্ষতি কি? পোড়া আশার সূত্র ছিঁড়িয়াও ছিঁড়ে না। যখন মনে হয় সকলই ফুরাইয়াছে, তখনও সকলই থাকে।

তারাসুন্দরী বলিলেন—"হুগলী হইতে অপরাজিতার পত্র পাওয়া গিয়াছে। সে পত্রেও আমাদের জন্য উদ্বেগের সীমা নাই। কোন বিপদ না ঘটিলে হঠাৎ পত্র লেখা বন্ধ হইল কেন? এ অবস্থায় আমাদের চুপ করিয়া বসিয়া থাকা উচিত নহে। বিনোদ হয় তো বিপদে পড়িয়াছেন। অপরাজিতার হয় তো সময় নাই। আমরা তাঁহাদের পরমাত্মীয়। এ আত্মীয়তা কেবলই কি মৌখিক? তাঁহাদের বিপদের কল্পনা করিয়া স্থির থাকা আমাদের উচিত নহে।"

বিজলী জিজ্ঞাসিলেন,—"তবে কি করিবে মা?

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"আজিকার দিনটা দেখিব। কালি হয় তো হুগলী যাইব।"

বিজলী নিরুত্তর। এ কথার কি উত্তর? বহুক্ষণ মা ও মেয়ে কোন কথাই কহিলেন না। সহসা প্রবল শব্দে বাহিরের দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। বিজলী চমকিয়া উঠিলেন। প্রাণ যেন নাচিয়া উঠিল। বেগে গিয়া দরজা খুলিয়া দিবার বাসনা হইল। কড়া নাড়ার শব্দটা যেন তাঁহার চির পরিচিত। ঝি কোথায় গিয়াছিল। কড়া আবার বাজিয়া উঠিল। বিজলী চঞ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তারাসুন্দরী বেগে সিঁড়ি দিয়া নিয়ে অবতরণ করিলেন এবং দরজা খুলিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ উৎসাহে উন্মত্ত, আনন্দে অস্থির, বিনোদ আসিয়া তারাসুন্দরীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন,—"মা, আপনার আশীর্ব্বাদে সকলই শুভ হইয়াছে। আমার নিষ্কলঙ্ক পিতা জীবিত আছেন; আপনার স্বামীর মৃত্যু হয় নাই; তিনি সুস্থ শরীরে আছেন। আপনি বিধবার বেশ এখনই পরিত্যাগ করুন।"

তারাসুন্দরী ধীরে ধীরে সেই স্থলে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—"তুমি তো আমাদের বিনোদ! তবে এ দুঃখের দশায় আমাদের সঙ্গে বিদ্রূপ করিতেছ কেন?"

বিনোদ বলিলেন,—"কথাটা নিতান্ত অসম্ভব হইলেও সত্য। আমি আপনার নিকট মিথ্যা কহিতেছি, ইহা কি কখন সম্ভব?"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"দেখিলেও যাহা সহজে বিশ্বাস হয় না, তাহাও কি শেষে সত্য হইল? তোমার কথা—দেবতার বাক্য, মিথ্যা হইবে কেন?"

বিনোদ সংক্ষেপে কতক বৃত্তান্ত বলিলেন। তাঁহারা শীঘ্রই আসিতেছেন, শীঘ্রই চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন হইবে ইহাও জানাইলেন।

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"বাবা তুমি উপরে যাও, দুঃখিনী বিজলীকে সকল কথা বলিয়া আইস।"

একটু সামান্য অনুমতির নিমিত্ত বিনোদ ব্যাকুল ছিলেন। আর কি বিলম্ব সহে? তীরবেগে তিনি উপরে উঠিলেন বিজলী বাতায়ন হইতে সকলই শুনিয়াছেন। আনন্দাশ্রু তাঁহার মুখ ভাসাইয়া রাখিয়াছে। বিনোদ উপরে উঠিতে না উঠিতে, সেই সুন্দরী বেগে আসিয়া বিনোদের বক্ষের উপর পড়িলেন এবং বলিলেন,—"বিনোদ তোমার গুণের তুলনা নাই; তোমার এ পরিশ্রমের পুরস্কার নাই।"

বিনোদ, সেই ক্ষীণকায়া, কম্পিতা সুন্দরীকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন,—"পুরস্কার আছে। যাঁহাকে পাইব বলিয়া এ সাধনা করিয়াছি, যাঁহার সন্তোষই জীবনের ব্রত, তাঁহার নিকট এ পরিশ্রমের পুরস্কার আছে। আমি সে পুরস্কার লইতে জানি। সকল স্থানে, দাতা ইচ্ছা থাকিলেও সহজে পুরস্কার দান করে না; কৃপণ যথেষ্ট ধন থাকিলেও, সহজে লোককে পুরস্কার দিতে পারে না; অনেক স্থলে একটু জোর করিয়া, একটু কৌশল করিয়া প্রাপ্য আদায় করিতে হয়। আমার জীবনের অমূল্য পুরস্কার, আমার পরিশ্রমের অতুলনীয় পুরস্কার, আমার সাধনার চিরস্মরণীয় পুরস্কার আমি তোমার নিকট হইতে গ্রহণ করিতেছি দেখ।"

তখন সেই দেবকান্তি যুবা সেই সুরবালার অধরে প্রেমের প্রথম সুমধুর চুম্বন বিন্যাস করিলেন। সে আনন্দের সে সুখের অনুরূপ

পদার্থ বোধ হয় জগতে আর কিছুই নাই। তাহা মধুরতার সার, পবিত্রতার ভাণ্ডার, শান্তি ও সুখের আধার। পবিত্র প্রেমের প্রথম চুম্বন—অতুলনীয়—স্বর্গীয়—দেবভোগ্য অমৃত-রসে অভিষিক্ত।

বিনোদ বলিলেন,—"হৃদয়েশ্বরি! আমি তোমার নিকট অধিকক্ষণ থাকিতে পাইব না। এখনই আমাকে প্রস্থান করিতে হইবে। আমার পিতা আসিয়াছেন। তোমার পিতা আসিয়াছেন, অপরাজিতা আসিয়াছেন। আত্মীয়-স্বজন অনেক আসিয়াছেন। সকলের সকল ব্যবস্থা আমাকেই করিতে হইবে। আবার হয় তো আজিই বাটী যাইতে হইবে। শীঘ্রই অচ্ছেদ্য বন্ধনে আমরা বদ্ধ হইব। দাদা, মা, বউ-দিদির সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় নাই; তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদের জন্য বড়ই চিন্তাকুল রহিয়াছেন।"

বিজলী কোন্ কথাটা আগে জিজ্ঞাসা করিবেন? হৃদয়ে তো কথার স্রোত বহিয়া যাইতেছে। বলিলেন,—"আমাকে সঙ্গে লইয়া যাও; আমি একবার দূর হইতে বাবাকে দেখিয়া আসি।"

বিনোদ বলিলেন, "এখনই তাঁহারা এখানে আসিবেন। আমি গিয়াই তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া আসিব। তুমি মার বেশ বদলাইয়া দেও। ও বেশ এখন বড়ই মন্দ দেখাইতেছে।"

আবার—আবার সেই সুমধুর চুম্বন। তাহার পর বিনোদ সে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া নিম্নে আসিলেন। তারাসুন্দরীকে সমস্ত কথা জানাইয়া তিনি ব্যস্ততা সহ প্রস্থান করিলেন।

বিজলী ধীরে ধীরে আসিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে জননীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"মা সিঁথেয় সিঁদুর পর, হাতে চুড়ি লোহা পর, সাড়ী পর, আর অকল্যাণ করিও না।"

কাঁদিতে কাঁদিতে তারাসুন্দরী কন্যার মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন,—"না মা, এখন থাক। এতদিন অকল্যাণ করাতেও যদি এত কল্যাণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর এক ঘণ্টায় কোন ক্ষতি হইবে না।"

বিজলী বলিলেন,—"কেন মা, এখনও কি তোমার সন্দেহ আছে?"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"না মা, বিনোদের কথার উপর সন্দেহ করিলে চন্দ্র-সূর্য্য মিথ্যা হইবে। যাঁহার জন্য আমার এই অভাগিনীর সাজ, তাঁহাকে দিয়াই আমি সাজ বদলাইয়া লইব মা।"

তাহার পর দেখা-সাক্ষাৎ মিলন সকলই হইল। সকল কথা লিখিবার স্থান আমাদের নাই। জগদ্বন্ধু স্বহস্তে তারাসুন্দরীর বেশ পরিবর্ত্তিত করিলেন। অন্তরজাত ঘটনাবলীর বৃত্তান্ত বলিতে ও শুনিতে অনেক কাল কাটিয়া গেল। যাহা স্বপ্নেও কেহ মনে করে নাই, শেষে তাহা সত্য হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

হরিপুরে সমারোহের সীমা নাই। ছোট বাবুর বিবাহ! কত নাচ-গান হইয়া গিয়াছে, কত দান ধ্যান হইয়া গিয়াছে, কত ভোজ্য-ভোজন হইয়া গিয়াছে, কত বারুদবাজি পুড়িয়া গিয়াছে, কত তৈল-বাতি জ্বলিয়া গিয়াছে—এখনও কত বাকী আছে।

এখনই বরকন্যা বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সহিত পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। ব্রজেশ্বরী তাঁহাদের বরণ করিয়া ঘরে তুলিয়া লইয়াছেন। মাতার শুভাশীর্ব্বাদ, ও দিদির স্নেহ-নিষিক্ত কল্যাণ-কামনা, অপরাজিতার অন্তর-নিঃসৃত আনন্দাশ্রু লইয়া বরকন্যা ঘরে বসিয়াছেন। দর্শনার্থিনী নারীগণ সে স্থান হইতে সরিয়া আসিয়াছে।

কন্যা দেখিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতেছে। হাসিতে হাসিতে ব্রজেশ্বরী তথায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"এতাদনে ঠাকুরপো, আমার সেই "কেনর" উত্তর পাইয়াছি। এক মাস আগে, তোমার দাদার অনুরোধে, আমি তোমাকে বিবাহের জন্য পীড়াপীড় করিয়াছিলাম। তুমি অমত প্রকাশ করিয়াছিলে। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "কেন ?" তুমি বলিয়াছিলে,—"এ "কেনর" উত্তর নাই। এতদিনে আমি সে "কেনর" উত্তর পাইয়াছি।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"কি উত্তর পাইয়াছ ?"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"এমন অপ্সরাকে যে দেখিয়াছে, মানুষকে তাহার মন চাহিবে কেন ?"

বড়ই ব্যস্ততার সহিত অপরাজিতা তথায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়, এখনই আসিয়া পৌছিলেন। মা, দাদা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া এখানে আনিতেছেন।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"কিন্তু দেখদেখি ঠাকুরঝি তোমার দাদার কি বিবেচনা! এই সোণার অঙ্গে দুইগাছা শুধু বালা পরাইয়া,ভ্রাতৃবধূ ঘরে আনিতে তাঁহার একটু লজ্জা হইল না ?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"সময় কই বউ দিদি ? অতি অল্প সময়ে গহনা হইয়া উঠিবে কেন ? পলাইয়া যায় নাই তো। এখন যেখানে যা সাজে দিলেই হইবে। আর এ অঙ্গে গহনার কি দরকার ? গহনা তো হারি মানিয়া গায়ে উঠিতে সাহস করিবে না। মাথার সিঁদুর, দুগাছি শাঁখা, একগাছি নোয়া, আর একখানি লাল পেড়ে সাড়ী পরিলেই ছোট বউকে রাজরাজেশ্বরীর মত দেখাইবে।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"তা হউক, তোমাদের ভাই বহিনের কেমন এক কথা ; দাঁড়াও আমি আসিতেছি। তুমি কোথাও যাইও না ঠাকুরঝি।"

ধীরে ধীরে বিজলী উঠিয়া অপরাজিতার নিকটে আসিলেন এবং অবগুণ্ঠনের এক পার্শ্ব খুলিয়া বলিলেন,—"আপনাকে ঠাকুরঝি বলিয়া ডাকিবার জন্য কত দিনই বিরলে বসিয়া কাঁদিয়াছি। এ অধিকার জীবনে কখন পাইব বলিয়া আশা ছিল না। আজি ভগবানের দয়ায়, আপনাদের অনুকম্পায়, অভাগিনীর সে অধিকার হইয়াছে। আজি আমি প্রাণ ভরিয়া আপনাকে ঠাকুরঝি বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে আপনার গলা জড়াইয়া ধরি।"

তখন বিজলীর সেই মৃণাল-বিনিন্দিত ভুজবল্লী অপরাজিতার সেই কুসুম-কোমল কলেবর বেষ্টন করিয়া ধরিল। সুনির্ম্মল মুকুরে সমুজ্জ্বল আলোক প্রতিফলিত হইল ; কুসুম-রচিত প্রতিমার কণ্ঠে কুসুম-মালা শোভা পাইল ; বিশুদ্ধ কাঞ্চনের সহিত মৌক্তিকের মিলন হইল। ঘরে তখন বিনোদকে লইয়া তিন জন উপস্থিত। তিন জনেরই তখন চক্ষুতে জল। অপরাজিতা বলিলেন,—"কিন্তু ভাই, তোমার ঐ আপনি কথাটা আমার প্রাণে যেন বিষ ঢালিয়া দিতেছে। বিনোদ আমার দাদা হইলেও, আমি তাঁহাকে কখন দাদা বলিতে পারি নাই। কিন্তু এখন হইতে দেখিতেছি,

তাঁহাকেও দাদা, আপনি মহাশয় বলিয়া কথা কহিতে হইবে, তোমাকেও ছোট বউ দিদি বলিয়া ভয়ে ভয়ে চলিতে হইবে।"

বিনোদ বলিলেন,—"একের পাপে অন্যের দণ্ডের কেন ব্যবস্থা করিতেছ? তোমার মুখে বিনোদ সম্বোধন, তোমার শাসন, তোমার উপদেশ ও তিরস্কার সকলই আমার পরম তৃপ্তিকর। সে আনন্দে যেন আমাকে কখন বঞ্চিত হইতে না হয়।"

বিজলী পূর্ব্ববৎ অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"আর যাহাকে আপনি যাহা ইচ্ছা বলিবেন, কিন্তু আমাকে আপনি বিজু বলিয়া না ডাকিলে আমি খুব কষ্ট বোধ করিব। আমি আর আপনি বলিব না।"

অপরাজিতা পরম স্নেহের সহিত বিজলীকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন ব্রজেশ্বরী একটা বাক্স হইয়া তথায় প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন,—"স্বামীর ভগ্নীও বড় মিষ্ট সামগ্রী, স্বামীর গন্ধ তাঁহার গায়ে লাগিয়া থাকে কি না! এখন এস আমার কাছে।"

ব্রজেশ্বরী সাদরে বিজলীর হাত ধরিয়া শয্যায় আনিয়া বসাইলেন এবং সেই বাক্স খুলিয়া ফেলিলেন। তাহার মধ্যে একবাক্স হীরকাদি-খচিত স্বর্ণালঙ্কার। ব্রজেশ্বরী সেই গুলি একে একে বাহির করিয়া বিজলীর গায়ে পরাইয়া দিতে দিতে বলিলেন,—"দেখ ঠাকুরঝি, দেখ ঠাকুরপো, আজি গহনার জন্ম সার্থক হইল কি না! প্রার্থনা করি, এই গহনাগুলি তোমার অঙ্গে ক্ষয় হইয়া যাইবে।"

এই সময়ে যদুপতি, অপরাজিতার মাতা এবং যতীন্দ্র সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন। যতীন্দ্রের জননী বলিলেন,—"আপনি আশ্চর্য্যরূপে জীবন লাভ করিয়াছেন, ইহাতে আমাদিগের বড়ই আহ্লাদ। এক সময়ে আপনি সর্ব্বদাই আমাদিগের বাটীতে আসিতেন; আমিও কর্ত্তার সহিত কতবার আপনার বাটীতে গিয়াছি। কর্ত্তার সহিত আপনার যেরূপ আত্মীয়তা ছিল, অন্যে তাহা না জানিতে পারে; কিন্তু আপনিও তাহা জানেন, আমিও জানি। এত বিপদের পরও ভগবান্ যখন আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন এবং আমাদিগের নিকট ফিরাইয়া দিয়াছেন, তখন আবার সকলই আনন্দময় হইবে আশা করিতেছি।"

যদুপতি বলিলেন,—"সকলই হইল কিন্তু আমার সে হরিদাস দাদা আর ফিরিয়া আসিবেন না; সুতরাং পূর্ণানন্দ হইল কই? সেকালের আনন্দ বোধ হয় আর ফিরিবে না; কেন না, বউ ঠাকুরাণী তখন আমাকে ঠাকুরপো বলিতেন; এখন আর তাহা বলেন না। সে সময়ে তাঁহার মুখে তুমি আমি শুনিতাম; এখন আপনি ছাড়া আর শুনিব না; সুতরাং পূর্ব্বের আনন্দ আর ফিরিল কই।"

যতীন্দ্রের জননী বলিলেন,—"বেশ বলিয়াছ ঠাকুরপো। আমারও অভিমানের দুইটা কথা আছে, শুন আগে। তুমি বর্ত্তমান থাকিতেও, বিনোদ, পিতৃহীন বালকের ন্যায় বিবাহ করিতে গেল; যতীন্দ্র ছেলে-মানুষ, বরকর্ত্তা হইয়া কার্য্য শেষ করিয়া আসিল। এটা কি তোমার ভাল কাজ হইয়াছে ঠাকুর পো?"

যদুপতি বলিলেন,—"বড়ই ভাল কাজ হইয়াছে বউ ঠাকরুণ। আমি ইচ্ছা করিয়াই এ দুই দিন, পুরাতন বন্ধুদিগের সহিত দেখা করিবার ওজরে হুগলীতে কাটাইয়া আসিলাম। তুমি বুঝিয়া দেখ, বউ ঠাকরুণ, বিনোদ আমার কে? সে যখন নিতান্ত শিশু তখন হইতেই তাহার সহিত আমার আর সম্বন্ধ নাই। কে তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিয়াছে? কে তাহাকে রোগে-শোকে শুশ্রূষা করিয়া

বাঁচাইয়া রাখিয়াছে ? কে তাহাকে পেটের ছেলের অধিক যত্ন করিয়া এমন সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিয়াছে ? কে তাহাকে বি, এ, এম, এ, পাশ করাইয়া এমন কৃতী করিয়াছে ? কে তাহাকে আপনার উপাধিটী পর্য্যন্ত দিয়া আপনার করিয়া লইয়াছে ? আর কে আপনার পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া ধর্ম্মার্জ্জিত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ তাহাকে দান করিয়াছে ? বউ ঠাকরুণ, বিনোদ তোমাদিগের সন্তান। তাহার শুভাশুভ কোন কর্ম্মে কথা কহিবার বা ব্যবস্থা করিবার কোনই অধিকার আমার নাই। তাহার বিষয়ে তোমরা যাহা করিবে তাহাই হওয়া উচিত। বিনোদ যে আমার সেই স্বর্গগত দাদার পুত্ররূপে তোমারই গর্ভে জন্মিয়াছে, ইহাই আমি বুঝিয়াছি। যতীন্দ্র তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর। বিনোদের সম্বন্ধে যতীন্দ্র যাহা করিবেন আমি তাহার মধ্যে কথা কহিবার কে ?”

যতীন্দ্র বলিলেন,—“বড় অল্প সময় বলিয়া বধূমাতাকে কোন অলঙ্কার দেওয়া হয় নাই। কিন্তু এখন দেখিতেছি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে জড়াও গহনা। একি ব্যাপার অপি ?”

অপরাজিতা বলিলেন,—“বউ দিদি আপনার সকল গহনা বিজলীকে দান করিয়াছেন; গহনা দেওয়া হয় নাই বলিয়া তোমাকে আমাকে অনেক গালি দিয়া, স্বহস্তে আপনার বাক্স আনিয়া, যেখানে যাহা সাজে তাহা পরাইয়া দিয়াছেন।”

যতীন্দ্র বলিলেন,—“বড়ই ভাল কাজ করিয়াছেন। বিনোদ যে আমার প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়, বধূমাতা যে আমার পরম আদরের সামগ্রী ইহা আমিও জানি তিনিও জানেন। প্রার্থনা করি, তাঁহার এই ভাব যেন কখনও বিচলিত না হয়।”

যদুপতি বলিলেন,—“আইস যতীন্দ্র, আমরা বাহিরে যাই। ছুই বধূমাতা লজ্জায় কাপড় মুড়ি দিয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছেন।”

যতীন্দ্রের জননী বিজলীকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া আনিলেন এবং বলিলেন,—“তোমার শ্বশুরকে প্রণাম কর মা, পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দাও। বড় বউ মা, তুমিও আইস, শ্বশুরকে প্রণাম কর।”

ব্রজেশ্বরী ও বিজলী যদুপতির চরণে প্রণাম করিলেন। যদুপতি বলিলেন,—“আশীর্ব্বাদ ভিন্ন আমার আর কিছুই নাই মা। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমরা বহু পুত্রবতী হও, চিরসুখী হও, সর্ব্বপ্রকারে তোমরা উভয়ে একপ্রাণ হইয়া সুখে জীবন যাপন কর, আর নারীর মধ্যে দেবী, পুণ্যময়ী অপরাজিতার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী হও। আমার পাঁচ ছয় লক্ষ টাকা ঘরে মজুত ছিল; কিন্তু এখন তাহার কিছুই নাই, কোন সন্ধানও নাই। আসবাব পত্র যে কতই ছিল, তাহার সীমা নাই। এখন তাহার কিছুই দেখিতেছি না; বোধ হয় দস্যুরা সকলই লুটিয়া লইয়াছে। আমি এখন বড় দরিদ্র। তোমরা বড় আদরের সামগ্রী, প্রাণের আশীর্ব্বাদ ছাড়া তোমাদিগকে আর কিছুই আমি দিতে পারিলাম না।”

যতীন্দ্রের মাতা বলিলেন,—“তুমি দরিদ্র এ কথা বলিও না ঠাকুর পো। যাহার যতীন্দ্র-বিনোদ আছে, তাহার সকলই আছে। তোমার আশীর্ব্বাদ বউ মাদের অমূল্য সম্পত্তি। তোমার টাকা যে আর পাওয়া যাইবে না, এমন কথা বলা যায় না। আমি কর্ত্তার মুখে শুনিয়াছিলাম, কোন না কোন সময়ে টাকা-কড়ি পাওয়া যাইলেও যাইতে পারে; জিনিষ পত্রের কি হইয়াছে তাহা শুনি নাই।”

যদুপতি বলিলেন,—"দাদা যদি একথা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে হয় তো পাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকিতে পারে। কিন্তু কিরূপে পাওয়া যাইবে তাহা ঈশ্বর জানেন। আমি বুঝিতেছি কিছুই পাওয়া যাইবে না। যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমার তাহাতে আর কোনই প্রয়োজন নাই। যতীন্দ্র ও বিনোদ তোমরা দুই ভাই তাহা তুল্যরূপে বিভাগ করিয়া লইবে, ইহাই আমার অনুরোধ। আমি তোমাদিগের নিকট আপাততঃ মাসিক কিঞ্চিন্মাত্র সাহায্যের প্রার্থী। কিছুদিন পরেই, তোমাদিগের সঙ্গসুখ আর কয়েকদিন মাত্র ভোগ করিয়াই, আমি কাশী যাইব। প্রিয় বন্ধু জগবন্ধু চিরদিন সহোদর ভাইয়ের মত আমার অনুগত ও পরমাত্মীয়; এখন আবার তিনি বৈবাহিক হইলেন। তাঁহার অবস্থা বড় মন্দ; এ বয়সে এবং এই দুর্গতির পর, আর কোনরূপ উপার্জ্জন করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। তাঁহার একটা ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াই আমার এক্ষণে প্রধান চিন্তা।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়, আমাদিগের দশ হাজার টাকা হারাইয়া গিয়াছিল; আমরা কেহই সে জন্য দুঃখিত হই নাই। সুতরাং সে দশ হাজার টাকা এখনও হারাইয়া রহিয়াছে মনে করিলে, আমাদিগের কোনই কষ্টের কারণ নাই। এখন শুনিতেছি, সেই দশ হাজার টাকা পাওয়া যাইবে। আপনি তাহা আদালত হইতে বাহির করিয়া তালুই মহাশয়কে দিন না কেন? যদি বলেন, আমার টাকা তিনি লইবেন কেন? আমি বলিতেছি, বিপদে-সম্পদে কন্যা-জামাতার সাহায্য লইতে কাহারও কোনই আপত্তি হইতে পারে না। আমি সেই টাকা এখনই বিজলীকে দিতেছি। বিজলী বাপ মাকে টাকা দিলে তাঁহারা কেন লইবেন না?",

যদুপতি বলিলেন,—"অবশ্য লইবেন। তাঁহার হৃদয় বড়ই উদার। তোমাকে তিনি দেবী বলিয়া চিনিয়াছেন। আমরা অনায়াসে তাঁহাকে যে সাহায্য করিতে পারি, তিনি তাহা অনায়াসেই গ্রহণ করিতে বাধ্য। আমার ভরসা আছে, আমি সহজেই এ বিষয়ে তাঁহার মত করাইতে পারিব।"

ঝি আসিয়া সংবাদ দিল, কলিকাতা হইতে ছোট বাবুর শ্বশুর আসিয়াছেন।

যদুপতি বলিলেন,—"এক সন্তান পাঠাইয়া দিয়া বেহাইন নিশ্চয়ই বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন, তাই খবর লইতে চাকর পাঠাইয়াছেন। এস আমরা যাই।"

যদুপতি, যতীন্দ্র ও বিনোদ বাহিরে চলিলেন; বাহিরে আসিয়া যদুপতি জগদ্বন্ধুকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন,—"আজিকার বাজারে পাশকরা ছেলের বিবাহ দিয়া বাপেরা অনেক পায়। তুমি আমাকে ফাঁকি দিলে কেন ভাই?"

জগদ্বন্ধু বলিলেন,—"আমি তোমাকে কি দিব দাদা?"

যদুপতি বলিলেন,—"আমার যাহা নাই। এ বয়সে একটী তৈয়ারী করা গৃহিণী পাইলে আমি আবার সুখের ঘর-কন্না পাতিতে পারিতাম। শুনিয়াছি তোমার গৃহিণী বিধবা; আমিও পত্নীহীন; সুতরাং বিশেষ অসুবিধা কোন পক্ষেই হইত না।"

জগদ্বন্ধু বলিলেন,—"তোমার গৃহিণী দুর্গাপুরে কাঁদিয়া মরিতেছে। আমার গৃহিণী বিধবা ছিলেন; কিন্তু আমি তাঁহাকে সধবা সাজাইয়া আসিয়াছি।"

বাটীর মধ্যে জলখাবার আয়োজন করিয়া, অপরাজিতা সকলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

জগবন্ধু বলিলেন,—"বেশ কথা, বড় ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে বটে।"

যদুপতি বলিলেন,—"তবে বাজার হইতে কিছু কিনিয়া আনিয়া খাও। মেয়ের বিবাহ দিয়া দৌহিত্র না হওয়া পর্য্যন্ত জামাতার বাটীতে খাইতে নাই। তোমাকে কেহ জল খাইতে ডাকে নাই। আমি বরকর্ত্তা, সব খবর ঠিক জানি।"

জগবন্ধু বলিলেন,—"তুমি কে হে, এতদিন পরে কর্ত্তা হইয়া দেখা দিলে? আমি হরিদাস রায় মহাশয়ের পুত্রের সহিত মেয়ের বিবাহ দিয়াছি। বাটীতে বিহাইন আছেন; যাহা বলিতে হয়, যাহা বুঝিতে হয় তাঁহার নিকট বলিব ও বুঝিব। তুমি কোন্ অধিকারে আমার কুটুম্ব বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছ,? কে তুমি?"

যদুপতি বলিলেন,—"ঠিক কথাই বলিয়াছ ভাই। বাস্তবিকই আমি কে? সকলই হরিদাস দাদার অলৌকিক মাহাত্ম্য। তাঁহার কৃপা না হইলে, আজি আমাদের এ আনন্দ কোথায় থাকিত?"

সকলে পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

উপসংহার।

বহুদিন ব্যাপী দায়রার বিচারে, রাসবিহারীর অনেক নরহত্যা ও অন্যান্য অনেক অত্যাচার সপ্রমাণ হইয়া গেল। জুরিরা একবাক্যে তাহাকে অপরাধী স্থির করিলেন রাসবিহারীর প্রতি দয়াপরবশ হইয়া জজ সাহেব যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা করিলেন। যে দিন এই আদেশ প্রচারিত হইল, সেই রাত্রিতেই রাসবিহারীর স্ত্রী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না থাকায় গভর্ণমেণ্টের হস্তগত হইল। রাজপুরুষেরা প্রকাশ্য নিলামে রাসবিহারীর স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রয় করিলেন। ব্রজেশ্বরী ও বিজলীর নামে অপরাজিতা দুই লক্ষ মুদ্রা মূল্যে যাহা ক্রয় করিলেন।

বেঙ্গল ব্যাঙ্কের তদানীন্তন সেক্রেটারী এক পত্র দ্বারা বিনোদকে জানাইলেন, "হরিপুরের হরিদাস রায় দশবৎসর পূর্ব্বে বিনোদ বিহারী মিত্র নামক এক নাবালকের নামে, ব্যাঙ্কে সাত লক্ষ টাকা জমা রাখিয়াছেন। সর্ত্ত আছে, ঐ বালক যখন সাবালক হইবে, তখন তাহাকে সমস্ত টাকা সুদ সুদ বুঝাইয়া দিতে হইবে। বিনোদ-বিহারীর পিতার নাম যদুপতি মিত্র। সংবাদপত্রাদিতে এক অদ্ভুত মোকদ্দমার বৃত্তান্ত দেখা যাইতেছে। সেই আশ্চর্য্য কাণ্ডের প্রধান ব্যক্তি বিনোদবিহারী রায়; কিন্তু ইহাও প্রকাশ হইয়াছে যে সেই বিনোদবিহারী রায়ই যদুপতি মিত্রের পুত্র। আপনাকে সেই ব্যক্তি মনে করিয়া এই পত্র লিখিত হইল। যদি আপনিই প্রকৃত ব্যক্তি হন, তাহা হইলে শীঘ্র রীতিমত প্রমাণাদিসহ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া সেই টাকা গ্রহণ করিবেন, বা তাহার যথেচ্ছা ব্যবস্থা করিবেন।" বলা বাহুল্য সহজেই সমুচিত প্রমাণাদি উপস্থিত করিয়া, বিনোদ সমস্ত টাকা হস্তগত করিলেন এবং যতীন্দ্র যাহা শ্রেয়ঃ মনে করেন, তাহাই করিবেন ভাবিয়া, তৎসমস্ত তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন।

যতীন্দ্র স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া স্বর্ণগ্রামের বাটী সুন্দররূপে মেরামত করাইলেন এবং আবশ্যক মত গৃহ-সজ্জা সংগ্রহ করিয়া, যথাযথ স্থানে বিন্যস্ত করিলেন। তাঁহারা সকলেই কখনও বা স্বর্ণগ্রামে, কখনও বা হরিপুরে বাস করিতে লাগিলেন:

একদিন যতীন্দ্র হাসিতে হাসিতে ব্রজেশ্বরীকে জিজ্ঞাসিলেন,—"বিনোদ একদিনও স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবে থাকিবার কল্পনাও মনে ঠাঁই দিয়াছে কি? আমি বলিয়াছিলাম, তুমি তবে বিনোদকে চেন না। কেমন তোমার আশঙ্কা মিথ্যা হইয়াছে?"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"তা হইয়াছে; কিন্তু এরূপ হইয়াছে কি তোমার গুণে?"

যতীন্দ্র বলিলেন,—"তবে কি তোমার গুণে?"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"না। তা কেন হইবে? আমার ভাই-ভুলানী ঠাকুরঝির গুণে।"

ব্রজেশ্বরীর হাসিমাখা গালে যতীন্দ্র একটী ছোট চড় উপহার দিলেন।

যতীন্দ্র ও বিনোদ সানুনয়ে যদুপতিকে গৃহে থাকিয়া, কর্ত্তৃত্ব করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু তিনি কিছু দিনের পর, কোন ক্রমেই গৃহে থাকিতে সম্মত হইলেন না। কাশীতে তাঁহার নিমিত্ত গঙ্গার ধারে মনোহর অট্টালিকা ক্রয় করা হইল। দাস-দাসী ও পরিচারক নিয়োজিত হইল। তিনি ইচ্ছামত ব্যয়-ভূষণ করিয়া কাশীতে বাস করিতে লাগিলেন।

জগবন্ধুর নামে দশহাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ খরিদ করা হইল। স্বর্ণগ্রামের বাটীর জীর্ণ-সংস্কার করিয়া তিনি ও তাঁহার পত্নী তথায় কাল কাটাইতে লাগিলেন।

রামজীবন চক্রবর্ত্তীর খড়ের ঘর ভাঙ্গিয়া পাকাবাড়ী প্রস্তুত হইল। অপরাজিতা তাঁহার কন্যাকে স্বহস্তে দুই সহস্র মুদ্রার স্বর্ণালঙ্কার পরাইয়া দিলেন।

অপরাজিতার নিকট হইতে শ্রীরাম মূলধন স্বরূপ নগদ পাঁচ শত টাকা এবং অনেক নিষ্কর জমি লাভ করিল। সে কলিকাতায় কাজ-কর্ম্ম না করিয়া স্বদেশে স্বাধীন ভাবে, সম্পন্ন গৃহস্থের ন্যায় চাষ-আবাদ করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

কেদার নাপিত সুস্থ হইয়া হুগলীর হাঁসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিল। বিনোদ তাহাকে নিজের আশ্রয়ে রাখিলেন: অপরাজিতা তাহার পত্নীকে অনেক অর্থ প্রদান করিলেন।

রামদীনকে অপরাজিতা নগদ এক সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিলেন। তাহার হাত ভাল হইয়া গিয়াছে। টাকা লইয়া সে দেশে গেল না; যাবজ্জীবন বিনোদের দাস হইয়া থাকিবে সঙ্কল্প করিয়া, সে এখানে রহিয়া গেল।

আর যে যে ব্যক্তি অপরাজিতার সঙ্গে স্বর্ণগ্রাম গিয়াছিল, আর বিনোদের সঙ্গে থাকিয়া সহায়তা করিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেককেই অপরাজিতা পাঁচ শত টাকা হিসাবে পারিতোষিক প্রদান করিলেন। নিবারণ ঘোষ সকলের সঙ্গে পাঁচশত টাকা পাইল, বাড়ার ভাগ তাহার একটি পাকা ঘর হইল। গরফু মুসলমানকে কলিকাতায় থাকিয়া আর ভিক্ষা করিতে হয় না। সে বিনোদের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়া, এক্ষণে ভগ্নীর নিকট বাস করিতেছে।

বঙ্গের তদানীন্তন লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর এই বিস্ময়াবহ কৌতুকজনক মোকদ্দমার সমস্ত

বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পত্র লিখিলেন এবং তিনি নিতান্ত আগ্রহ সহকারে বিনোদ বাবুর সহিত আলাপ করিতে অভিলাষী হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বেলভিডিয়রে লইয়া আসিলেন। ছোট লাট সাহেব বিনোদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও সাহসের প্রভূত প্রশংসা করিলেন। সেই বৎসর ভারতেশ্বরীর জন্মদিন উপলক্ষে গেজেটে বিনোদের রাজোপাধি প্রাপ্তির সংবাদ ঘোষিত হইল। এই উপাধি বিনোদ কখন ব্যবহার করিতেন না, বা অপর কাহাকেও তাঁহার নামের সহিত এই উপাধি ব্যবহার করিতে দেখিলে, সন্তুষ্ট হইতেন না।

লক্ষ্মীরূপা অপরাজিতা সংসারের কর্ত্রীরূপে সকল বিষয়েরই সুব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। যতীন্দ্র ও বিনোদ, মঙ্গলময়ী দেবী জানিয়া, তাঁহাকে চিরদিন পরম সমাদর করিতেন এবং তাঁহার মন্ত্রণা গ্রহণ না করিয়া সাংসারিক ও বৈষয়িক কোন কর্ম্মই সম্পন্ন করিতেন না। ব্রজেশ্বরী সতত তাঁহার সহিত পরিহাস-নিরতা থাকিলেও, তাঁহাকে চিরদিন অলৌকিক-স্বভাবা, পুণ্যময়ী দেববালা বলিয়া জানিতেন। বিজলী তাঁহাকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিতে লাগিলেন। তাঁহার "সোণার কমল" শান্তি ও পবিত্রতাপূর্ণ স্বর্ণকলস হস্তে লইয়া সর্ব্বত্র ধর্ম্ম, পুণ্য, আনন্দ ও নির্ম্মলতা সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। হরিপুর ও স্বর্ণগ্রামের যাবৎ নর, নারী তাঁহাকে সৌভাগ্য-লক্ষ্মী বলিয়া জ্ঞান করিতে থাকিল।

সমাপ্ত।

নহে। কিন্তু আমি সে লোভ দমন করিতে জানি; আমি ভাল মন্দ চিনিতে পারি! আমার হৃদয় এত অসার নহে যে, আমি পবিত্র সুখের সহিত, অপবিত্র সুখের বিনিময় করিব; স্বর্গীয় আনন্দের সহিত ঘৃণিত লিপ্সার পরিবর্ত্তন করিব এবং কাঞ্চন-মূল্যে পিত্তল ক্রয় করিব।”

আমিনী কহিল,--

“পুত্রের বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য, হয়ত বাদশাহ আকবর তোমার পিতার নিকট অনুরোধ করিবেন। সম্রাটের আদেশ তিনি কখনই অন্যথা করিতে পারিবেন না। তখন তুমি কি করিবে?”

মেহেরউন্নিসা চারুমুখে একটু হাসিয়া বলিলেন,—

“সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত আছি। আকবরের ন্যায় ন্যায়-পরায়ণ বাদশাহ, বাগ্‌দত্তা কন্যার অন্যত্র বিবাহ দিতে বলিবেন, ইহা অসম্ভব। আর পিতাও যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া আমার অন্যত্র বিবাহ দিবেন, তাহাও বোধ হয় না।”

আমিনী আবার কহিল,—

“তোমার অপেক্ষা কাহারও অধিক বুদ্ধি নাই। আপনার ভাল মন্দ তুমি যেমন বুঝিবে, এমন কে বুঝিবে? কিন্তু দেখিও, ভাই, পরিণামে যেন মনঃপীড়া না পাইতে হয়।”

মেহেরউন্নিসা সুগোল নবনীত-বিনিন্দিত কমনীয় ভুজবল্লী উর্দ্ধোত্থিত করিলেন এবং প্রেমাশ্রু-পূর্ণ সফরী সদৃশ নয়নে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—

“সকলই তাঁহার ইচ্ছা!”

আমিনী কার্য্যান্তর ব্যপদেশে চলিয়া গেল। ইতিহাস-প্রথিতা, জগদ্বিখ্যাত সুন্দরী মেহেরউন্নিসা সেই স্থানে বসিয়া স্বীয় ভবিষ্যৎ ভাবনায় ভাসমানা হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

হৃদয়ের বিনিময়।

চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমনই এক হৃদয় অপর হৃদয়কে আকর্ষণ করে। বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন যে তাড়িতের শক্তি-বিশেষ সহযোগে চুম্বকে আকর্ষণী শক্তি জন্মে; চুম্বক বস্তুতঃ লৌহ-বিশেষ। হৃদয়ের পক্ষেও তাহাই বটে! এ বিশ্ব-সংসারে হৃদয়ের ছড়াছড়ি; কিন্তু কই কয়টা কয়টার জন্য মরে ও বাঁচে? কয়টা কয়টাকে হাসায় ও কাঁদায়? হায়! এ সংসারে কয়জন কয় জনের জন্য ভাবে? সকল হৃদয় যদি সকল হৃদয়ের দিকে ধাইত, সকলে যদি সকলের জন্য ভাবিত; তাহা হইলে এ সংসার স্বর্গ হইত, তাহা হইলে মনুষ্য দেবতা হইত, তাহা হইলে মানুষ, হৃদয়ে হৃদয় ঢালিতে শিখিয়া, সকল ক্লেশ, সকল জ্বালা নিবারণ করিতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় না—সকল হৃদয় সকল হৃদয়ের দিকে ধায় না। এক হৃদয়-নিঃসৃত প্রেমরূপ পবিত্র তাড়িত সংস্পর্শে যদি অপর হৃদয় আলোকিত হয়, তাহা হইলে সেই হৃদয়-যুগল পরস্পর আকর্ষণ-সূত্রে বদ্ধ হয়। মানুষের হৃদয়ের গতি এইরূপ। ইহাকেই লোকে ভালবাসা, প্রণয়, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি নানাবিধ প্রকারে ভেদ করে। বস্তুতঃ

তৎসমস্তই একপ্রকার বৃত্তি—সকলই হৃদয়ের আকর্ষণ মাত্র। স্বার্থত্যাগ ইহার কার্য্য। এই স্বার্থত্যাগের অপেক্ষা পবিত্র ও মহৎ কার্য্য ক্ষুদ্র মানব-জীবনে আর কিছুই হইতে পারে না। এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনে যিনি যত স্বার্থ-ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই তত অবিনশ্বর হইয়া, যুগযুগান্তরে পরম্পরাগত মানব-বৃন্দের হৃদয়ে, দেবতার ন্যায় আরাধিত হইতেছেন। যে মহানুভব দেশের স্বাধীনতার জন্য আপনার প্রাণ সমর-ক্ষেত্রে বলি দিয়াছেন; যিনি অজ্ঞ লোকের ভ্রম-ভঞ্জনার্থ নিরন্তর শরীর-পাত করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালনের পরিচয় দিয়াছেন; যিনি বিপন্ন মানবের বিপদ-উদ্ধারার্থ আত্ম-সুখ-শান্তি বিস্মৃত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বার্থ-ত্যাগের বীর। তাঁহাদের সকলের হৃদয় ব্যক্তি সাধারণের দুঃখ ও দুরবস্থা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়াছে। এ জগৎ সেরূপ দেবতাদের নাম কখনও ভুলিবে না। যে এ জগতে স্বার্থ-ত্যাগের মহিমা বুঝিতে না পারে, তাহার সহিত কখনও আলাপ করিও না। তাহার হৃদয় পাষাণে গঠিত; সে মনুষ্য নামের অযোগ্য। স্বার্থ-ত্যাগই ধর্ম্মের মূল-ভিত্তি—সমাজ-সংস্থিতির আধার। মূলে ভালবাসা না থাকিলে, স্বার্থ-ত্যাগ করা যায় না। পিতা, পুত্রকে ভালবাসেন বলিয়াই, পুত্রের সন্তোষের নিমিত্ত নিজের সুখ লক্ষ্য করেন না। জননী, অপত্যস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া, স্বয়ং ক্ষুধায় কাতর হইলেও, সন্তানের নিমিত্ত আহার্য্য সংগ্রহ করেন। সক্রেতিস সত্যের প্রণয়ে বিমোহিত ছিলেন বলিয়াই, সত্যের অনুরোধে, জীবন দিতে কাতর হন নাই। চৈতন্যদেব প্রেমের তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই অন্য কোন সুখই তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। রামমোহন রায় ধর্ম্ম-প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই কোন সামাজিক ক্লেশকেই ক্লেশ বলিয়া মনে করেন নাই। এসকলই ভালবাসার জন্য স্বার্থত্যাগের ঘটনা। অতএব সকল ধর্ম্মের মূলই ভালবাসা অর্থাৎ স্বার্থ-ত্যাগ। যে ধর্ম্ম, ভালবাসার পথ ছাড়িয়া, অন্য উপায়ে মুক্তির পথ দেখাইয়া দেয়, তাহা পশুর ধর্ম্ম—তাহা মনুষ্যের গ্রহণীয় নহে। মনুষ্যের মুক্তি ভালবাসায়, উন্নতি ভালবাসায়, বিকাশ ভালবাসায়, আনন্দ ভালবাসায় এবং চরমোৎকর্ষ ভালবাসায়। অধিকের কথা ছাড়িয়া দেও,একজন একজনের জন্য ম রতে পারে, একজন আর একজনের হাসি দেখিলে সকল দুঃখ ভুলিয়া যায়, একজনের যাতনা দেখিলে আর একজন তদধিক কাতর হয়, একজনের বিপদ দেখিলে আর একজন আপনাকে তদধিক বিপন্ন মনে করে, একজনের শোকাশ্রু দেখিলে আর একজন সেই স্থলে সম-শোকাশ্রুপাতে তাহার অশ্রুজল বাড়াইয়া দেয়, ইহার অপেক্ষা পবিত্র, স্বর্গীয় উদার ও দেবভাব আমি আর কিছু জানি না। মনুষ্য-সমাজ যত প্রেমের আদর করিতে শিখিবে, প্রেমিকদের যত দেবতা বলিয়া পূজা করিতে শিখিবে, ততই জগৎ স্বর্গ হইবে, ততই মানুষ অনন্ত প্রেমে ডুবিয়া, জরামৃত্যু বিস্মৃত হইবে। এই যে প্রেম ইহা সমভাবে নর-নারীর হৃদয়ে আবির্ভূত হইতে পারে। কিন্তু মানব-জাতির হৃদয় এতই ঘৃণিত ও কলুষ-সঙ্কুল যে অনেকেই নারীর সহিত নরের যে ভালবাসা তাহার উদারতা প্রণিধান করিতে পারেন না, বরং তাহা একটু লজ্জার কথা বলিয়াই মনে করেন। ধিক্! তাঁহাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে! নর-নারীর প্রেমে স্বতই জীব-সংস্থিতি-সংরক্ষণার্থ এবং স্রষ্টার সাক্ষাৎ অভিপ্রায় সংগত যে পবিত্র সম্বন্ধ-বিশেষের আবির্ভাব হয়, তাহা তুমি নানা বিধ সামাজিক কারণে লজ্জার আবরণে ঢাকিলেও

ঢাকিতে পার। কিন্তু সে প্রেম—যদি তাহা চপল লিপ্সা হেতু না হয়, তাহা হইলে তাহাও লজ্জার কথা? তাহা দুর্ব্বল-হৃদয়তার চিহ্ন? তাহা ক্ষুদ্র মনুষ্যের অবলম্বনীয়? যে ব্যক্তি এই কদর্য্য বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছে, সে সমাজের প্রবল শত্রু; তাহাকে সর্পের ন্যায় ভয় করিও। কি, ভালবাসা ক্ষেত্র বিশেষে লজ্জার কথা? ভালবাসা লজ্জার কথা, এ কথা শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিও এবং সে অপূর্ব্ব দার্শনিকের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিও। যদি এ পাপ-তাপ-পূর্ণ ক্ষুদ্র পৃথিবীতে কিছু পবিত্রতা থাকে, তবে সে পবিত্রতা যেখানে হৃদয়ের বিনিময় ঘটিয়াছে সেই স্থলেই আছে। যেখানে প্রেমিক, তোমার আমার ন্যায় ক্ষুদ্র পাপীর কথার বাহির হইয়া, চন্দ্রের সুধা খাইতে ও কুসুমে শয়ন করিতে শিখিয়াছে, সেইখানে আছে। সেই প্রেমিক—সে যে কেন হউক না—পূজনীয়। তাহার দ্বারা পাপ হয় না, দুষ্কর্ম্ম তাহার চিত্তে আইসে না। এমন উদার প্রেম—নরনারী ইহার আশ্রয় হইলে, ইহা লজ্জার কথা হইবে? ছিঃ ছিঃ!

আমরা সে দিন যখন রতনসিংহকে দেবলবর নগরে দেখিয়াছিলাম, তখন বুঝিয়াছিলাম কুমারী যমুনা ও কুমার রতনসিংহ হয়ত পরস্পর পরস্পরের নিকট চিত্ত হারাইলেন। আমাদের সে সন্দেহ মিথ্যা নহে। কারণ সেই দিনের পর, রতনসিংহ আরও তিন দিন অকারণে দেবলবর নগরের রাজ-ভবনে অতিথি হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ রাজা সে তিনবারই বাটী ছিলেন এবং রতনসিংহকে পুত্রের ন্যায় সমাদর করিয়াছিলেন। কুমারী যমুনাও, তাঁহার সহিত অপেক্ষাকৃত সরল-ভাবে আলাপ করিয়া তাঁহাকে অতুল আনন্দিত করিয়াছিলেন। তৃতীয়বার যখন রতনসিংহ চলিয়া যান, তখন তিনি ভুল ক্রমে অসি ফেলিয়া গিয়াছিলেন এবং মধ্য-পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহা লইয়া গিয়াছিলেন। আর তিনি চলিয়া গেলে কেহ কেহ বলে যে, বহুদূর তিনি গন্তব্য পথের বিপরীত পথ-প্রবাহী হইয়াছিলেন। কুমারী যমুনাও, সে দিন শারীরিক অসুস্থতার ছল করিয়া কিছু আহার করেন নাই এবং কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারেন নাই। এই সকল কার্য্য-কারণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, আমাদের বোধ হইতেছে যে, এই যুবকযুবতী বুঝি পরস্পরের নিকট চিত্ত হারাইয়াছেন। আমাদের সন্দেহ সত্যতা কি অসত্যতার দিকে বিনত হয়, তাহা আমরা অবিলম্বেই জানিতে পারিব। যদি সন্দেহ সত্য হয়, তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে, স্বার্থ-ত্যাগের অগ্নিপরীক্ষার এই যুগল-প্রেমের স্বর্ণ-কান্তি কিরূপে বিভাসিত হয়। সেই জন্যই আমরা বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে উক্ত বিধ প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছি।

এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে,দেবলবর-রাজ বহুদিনাবধি কুমার রতনসিংহের সহিত দুহিতার বিবাহ দিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কন্যার তদ্বিষয়ে অভিপ্রায় কি জানিবার নিমিত্ত কুসুমের প্রতি ভারার্পণ করেন। কুমারীর হৃদয়ের ভাব বুঝিতে কুসুম পারিয়াছিল; সুতরাং সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা না করিয়াই, তাঁহার অনুরাগের কথা রঞ্জিত করিয়া ব্যক্ত করে। বৃদ্ধ রাজার মুখে এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে; সে আর কালবিলম্ব না করিয়া, কুমারীকে গিয়া জানাইল যে, কুমার রতনসিংহের সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে, ত্বরায় শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইবে। দেবলবর-রাজও কুসুমের মুখে কন্যার মনের

তা জানিতে পারিয়া, অবসরক্রমে, মহারাণা প্রতাপসিংহের নিকট, এই ব্যাপার নিবেদন করিলেন। মহারাণাও নিরতিশয় সন্তোষ সহকারে এ বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিলেন; সুতরাং বিবাহসম্বন্ধ উভয়-পক্ষ হইতে এক প্রকার স্থির হইয়া গেল। কেবল মুসলমানদিগের সহিত বিরোধের অবসান হইলেই, শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইবার অপেক্ষা রহিল।

প্রণয়ীযুগল কিন্তু ঘোর উৎকণ্ঠায় ভাসিতে লাগিলেন। কারণ তাঁহারা পরস্পর কেহ কাহারও মনের ভাব অবগত নহেন। কুমার ভাবিতেছেন, 'কুমারী যমুনার সহিত বিবাহ হইলে সুখের সীমা রহিবে না; কিন্তু কুমারীর হৃদয়ের ভাব কি? যদি অন্য কোন ভগ্যবান্ ব্যক্তি কুমারীর প্রেমাস্পদ হয়, তবে সকলই বিড়ম্বনা। অতএব না-বুঝিয়া একার্য্যে সম্মতি দিব না। মহারাণা আদেশ করিলে, তাঁহার চরণে ধরিয়া বলিব, আমি অতুলনীয়া যমুনা কুমারীকে, তাঁহার অনিচ্ছায় বিবাহ করিয়া, বিষাদ-সমুদ্রে ডুবাইতে চাহি না।' কুমারীর মনের ভাবও অবিকল সেইরূপ; সুতরাং এ বিবাহ সম্বন্ধে লোকে যাহাই মনে করুক, পাত্র পাত্রী মনে মনে কতই দুঃখের ও সুখের প্রতিমা ভাঙ্গিতেছেন, ও গড়িতেছেন। উভয়েই ভাবিতেছেন, পুনরায় সুযোগ পাইলেই অপরের হৃদয়ের ভাব জানিতে হইবে।

অবিলম্বেই সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। দেবলবর নগর সন্নিহিত চিন্দিনেশ্বরী দেবীর সেবার ত্রুটি-বিষয়ক সংবাদ মহারাণার গোচর হইল। মহারাণা কুমার রতনসিংহের উপর তাহার যথাবিহিত তত্ত্বাবধারণের ভারার্পণ করিলেন। তদুপলক্ষে দিবস চতুষ্টয় দেবলবর রাজ-ভবনেই কুমারের অধিষ্ঠান হইল। এই চারি দিবসের মধ্যে নানাবিধ সময়ে ও নানা প্রকারে উভয়ে উভয়ের হৃদয় জানিলেন। কি জানিলেন? যাহা জানিলেন তাহাতে প্রত্যেকের এই বোধ হইল যে, অপর তাঁহাকে যত ভালবাসেন, তাঁহার প্রেম হৃদয় তাহার সমতুল্য নহে। এ সন্দেহ যে প্রণয়ের মূলে থাকে, সেখানে প্রণয় অকৃত্রিমভাবে ও অমিত পরিমাণেই থাকে। অতএব এই যুগল হৃদয়ের শুভ বিনিময়ই ঘটিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

বেলা প্রহরেক সময়ে শৈলম্বর নগরের এক নিভৃত রাজ-প্রকোষ্ঠে শৈলম্বররাজ ও কুমার অমরসিংহ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। যে যে রাজপুত-কুল-ভূষণগণ স্বদেশের স্বাধীনতা সংরক্ষণার্থ ব্যতিব্যস্ত, অচিরে যবনেরা উদয়পুর আক্রমণ করিবে জানিতে পারিয়া, তাঁহারা আহার, নিদ্রা ও সম্ভোগ-ইচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়া, প্রতিনিয়ত বিপদ নিরাকরণের উপায় বিধানে নিরত। শৈলম্বররাজ মহারাণার একজন প্রধান কুটুম্ব। এই বীরবংশ, চিরকাল, পুরুষ পরম্পরাক্রমে, মহারাণাগণের জন্য, অকাতরে সমস্ত বিপদের সম্মুখীন হইয়া থাকেন ও আবশ্যকমতে জীবনও বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। সম্প্রতি মিবারের বিপদে বর্ত্তমান শৈলম্বররাজ যৎপরোনাস্তি চিন্তাকুল; তিনি বারংবার মহারাণার নিকট গমন করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিতেছেন। মহারাণার সহিত শেষ সাক্ষাৎ সময়ে, তিনি কোন নিগূঢ়

কারণে, কুমার অমরসিংহকে সঙ্গে লইয়া আই-সেন। কুমারেরও আসিবার ইচ্ছা ছিল—পরন্তু স্বয়ং সহসা আগমন করার অপেক্ষা, আহূত হইয়া আসা তাঁহার পক্ষে সমধিক সুবিধাজনক হইল।

শৈলম্বররাজ, মহারাণা প্রতাপসিংহ অপেক্ষা, বয়ঃপ্রবীণ, এজন্য কুমারগণ তাঁহাকে পিতার ন্যায় সম্মান ও সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। শৈলম্বর-রাজ পুত্রহীন। বাল্যকালে অমর-সিংহ সতত শৈলম্বররাজ-ভবনে গমনাগমন করিতেন। শৈলম্বররাজ ও তাঁহার মহিষী পুষ্পবতী তাঁহাকে তৎকাল হইতে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। সম্প্রতি কুমার বহু দিন পরে আগমন করায়, সকলে অপরিমিত আনন্দিত হইলেন। অন্তঃপুর মধ্যে মহিষী কুমারের সুখ-সেবনার্থ নানাবিধ আয়োজনে লিপ্ত হইলেন। শৈলম্বর-রাজ কুমারকে জিজ্ঞা-সিলেন,—

"অমর! তোমার কি বোধ হয়? মিবা-রের কি জয়াশা নাই?"

"মিবারের জয়াশা নাই, একথা কেমন করিয়া বলি? যে মিবার ভ্রমেও কাহারও নিকট কখন ন্যূনতা স্বীকার করেন নাই, সম্প্রতি সেই মিবারের এককালে অধঃপতন হইবে তাহা আমার বিশ্বাস হয় না।"

শৈলম্বররাজ কহিলেন,—

"কিন্তু বৎস, আকবরের উদ্যম বড় সহজ নহে। নীচাশয় মানসিংহ শুনিতেছি স্বয়ং আসিবে।

কুমার কহিলেন,—

"কিন্তু আর্য্য! ইহা কি আপনার বোধ হয় যে, আমাদের এত যত্ন ব্যর্থ হইবে? সত্য বটে অনেক রাজপুত, স্বদেশগৌরব ত্যাগ করিয়া, আকবরের পদলেহনে রত হইয়াছে, তথাপি কি আমাদের এমন বল নাই যে, আমরা যবনগণকে মরুভূমি পার করিয়া দিতে পারি?"

শৈলম্বররাজ কহিলেন,—

"অমর! যবনেরা যে আমাদের কিছুই করিতে পারিবে না, তাহা আমার বিশেষ জানা আছে। তবে কথা এই যে, স্বজাতি শত্রু বড় ভয়ানক। মানসিংহ, সাগরজি প্রভৃতি রাজপুত-কুল-গ্লানি বিভীষণগণ আমাদের যুদ্ধের প্রকৃতি, বল, উপায় সকলই অবগত আছে। তাহাতে আবার মানসিংহ মহারাণা কর্ত্তৃক ঘোরতর অপমানিত হইয়াছে। সুতরাং এবারকার যুদ্ধ যে বড় সহজ হইবে তাহা আমার বিশ্বাস হয় না।"

অমর বলিলেন,—

"আপনার কথা যথার্থ বটে। কিন্তু আমরা কি এমন কোন সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারি না, যাহাতে শত্রুর বুদ্ধি ও বল পরাভূত হইবার সম্ভাবনা?"

শৈলম্বররাজ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—

"আমাদের সৈন্যসংখ্যা যতই হউক, তাহা বিপক্ষগণের সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা অল্প হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই অল্প সৈন্য, সুকৌ-শলে ও স্থান বুঝিয়া স্থাপিত করিয়া রাখিলে, অধিকতর কার্য্য হইবার সম্ভাবনা।"

অমর বলিল,—

"আপনার পরামর্শ সারবান্ সন্দেহ নাই। কোন্ স্থান আপনার অভিপ্রেত?"

আবার, অনেকক্ষণ চিন্তার পর, শৈলম্বর-রাজ বলিলেন,—

"বোধ হয় হল্‌দিঘাটের উপত্যকাই উত্তম স্থান। কারণ যবনগণের সেই পথ দিয়াই মিবারে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা। অতএব

সেই পথ অবরুদ্ধ রাখিতে পারিলে যবনের জয়াশা থাকিবে না।"

কুমার বলিলেন,—

"আপনি উত্তম স্থির করিয়াছেন। সম্ভব কেন, নিশ্চয়ই হল্‌দিঘাট ব্যতীত অন্য স্থান দিয়া মিবারে প্রবেশ করা যবনদিগের সুবিধা হইবে না। অতএব সেই পথ নিরুদ্ধ রাখাই সৎপরামর্শ। আরও দেখুন, হল্‌দিঘাট অবরুদ্ধ রাখিতে যেরূপ সৈন্যবলের প্রয়োজন, অন্য কোন স্থান অবরুদ্ধ করিতে হইলে, তদপেক্ষা অনেক অধিক সৈন্যের প্রয়োজন হইবে।"

শৈলম্বররাজ। "তুমি যদি আমার অগ্রে রাজধানীতে গমন কর, তাহা হইলে এই প্রস্তাব মহারাণাকে জানাইয়া রাখিবে, পরে আমিও তাঁহাকে এই কথা জানাইব। তাহার পর সৈন্য সংগ্রহের কথা। আমার অধীনে বোধ করি ৫০০০ পাঁচ সহস্র সৈন্য গিয়া মহারাণার ধ্বজার নিম্নে দণ্ডায়মান হইবে। তবে তুমি যদি তিন চারি দিন এখানে থাকিতে পার; তাহা হইলে ঐ সৈন্য সংখ্যা দ্বিগুণ হইবার সম্ভাবনা। কারণ প্রজাবর্গ যদি জানিতে পারে যে, তুমি স্বয়ং সৈন্যসংগ্রহার্থ এখানে আসিয়াছ, তাহা হইলে রোগী বা দুর্ব্বল, বৃদ্ধ বা যুবা, নর বা নারী উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া উঠিবে এবং স্ব স্ব ধন-প্রাণ জগৎ-পূজ্য মহারাণার প্রয়োজনার্থ পরিস্থাপিত করিবে।

"যে আজ্ঞা—আমি চারি পাঁচদিন অপেক্ষা করিলে যদি অধিকতর উপকার হয়, তবে তাহাই করিব। কিন্তু আর্য্য! যাহারা অক্ষম, যাহারা কাতর, তাহারা যেন রাজ-ভক্তির উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া অনর্থক ক্লেশ না পায়।"

এই সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া নিবেদন করিল,—

"কুমার আসিয়াছেন শুনিয়া, মহিষী তাঁহার সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। অতএব যদি কুমারের এখানে আর কোন প্রয়োজন না থাকে, তিনি তাহা হইলে পুরোমধ্যে আগমন করুন।"

অমরসিংহ সম্মতির প্রার্থনায় শৈলম্বররাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি সম্মতি-সূচক ইঙ্গিত করিলে, কুমার পরিচারিকার সহিত পুরোমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দেবী-বাক্য।

সায়ংকালে দেবলবর-রাজ-তনয়া যমুনা দুইটী পাখী লইয়া খেলা করিতেছেন। কখন বা তাহাদের বদনচুম্বন করিতেছেন, কখন বা তাহাদিগকে মস্তকে স্থাপন করিতেছেন, কখন বা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতেছেন, তাহারা উড়িয়া আসিয়া তাহারই স্কন্ধে বসিতেছে। রাজকুমারী যখন পক্ষিদ্বয় লইয়া ক্রীড়ায় মগ্ন, সেই সময়ে হাসিতে হাসিতে কুসুম তথায় আসিয়া বলিল,—

"নির্ব্বোধ বনের পাখী! কিছুই বুঝিস্ না? রাজকুমারীর আদর আর কত দিন?"

যমুনা জিজ্ঞাসিলেন,—

"কেন কুসুম, আমি কি এতই চঞ্চলচিত্ত? যাহাদের একদিন ভাল বাসিয়াছি, তাহাদিগকে চিরদিনই ভাল বাসিব।"

কুসুম বলিল,—

"কথা সত্য বটে, কিন্তু হৃদয় যদি এক

স্থানে বদ্ধ হইয়া থাকে, তবে তাহা স্থানান্তরে যাইতে পারে কি ?"

যমুনা হাসিয়া বলিলেন,—

"হৃদয় বদ্ধ হইয়াছে কি না, সে বিচারে এখন কি প্রয়োজন ?"

কুসুম বলিল,—

"তোমার প্রয়োজন না থাকিতে পারে ; কিন্তু কুমারী যমুনার কাহার প্রতি কিরূপ অনুরাগ, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত, কুমার রত্নসিংহ আমাকে ভার দিয়াছেন ; সুতরাং আমার প্রয়োজন আছে।"

"তুমি পরীক্ষা করিয়া কি বুঝিলে ?"

"বুঝিলাম কুমারীর অনুরাগ কুমার ব্যতীত আর সকলের প্রতিই যথেষ্ট।"

কুমারী মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"এত যদি বুঝিয়াছ, তবে এই বেলা কুমারকে সাবধান করিয়া দেও।"

কুসুম বলিল, –

"কুমারের ভাবনা পরে ভাবিলেও চলিবে; এক্ষণে এক ব্যক্তিকে সাবধান করা আমার বড়ই আবশ্যক হইয়াছে।"

"কেন আবার কে তোমাকে ভার দিয়াছে ?"

কুসুম গম্ভীর ভাবে বলিল,—

"তুমি।"

কুমারী বলিলেন,—

"আমার ভার তো চিরদিনই বহিতে হইবে।"

কুসুম বলিল—

"হাসিও না আমি হাসির কথা বলিতেছি না। এখানে বইস,—যাহা বলি, মনোযোগ দিয়া শুন।"

কুমারী সন্দেহাকুলচিত্তে তথায় উপবেশন করিলেন। তখন কুসুম জিজ্ঞাসিল,—

"আমায় সত্য করিয়া বল, কুমারের প্রতি তোমার অনুরাগ কত প্রবল ?"

কুমারী অনেকক্ষণ বিনতবদনে চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন—

"অনুরাগ কতদূর বাড়িলে তাহাকে প্রবল বলা যায়, তাহা আমি জানি না। আমি এই জানি যে, এ জগতে এমন কোন পদার্থই আমি ভাবিয়া পাই না, যাহার সহিত কুমার রত্নসিংহের বিনিময় করিতে পারি। তোমাকে মনের কথা বলিতেছি, আমি ভবানীর পূজা করিতে বসিয়া মন্ত্র মনে করিতে পারি না, কেবল কুমারের নাম আমার মনে পড়ে ; দেবীর ধ্যান করিতে বসিয়া তাঁহার মূর্ত্তি হৃদয়ে আইসে না, যত চেষ্টা করি, কেবল কুমারের সেই মোহন কান্তিই মনে পড়ে। জগদম্বে! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর ; আমার হৃদয়ে আর আমার প্রভুতা নাই।"

কথা সাঙ্গ হইলে কুসুম দেখিল, কুমারীর নেত্র অশ্রু-সমাকুল হইয়াছে। বুঝিল, প্রেম নিতান্ত চপল নহে। বলিল,—

"কিন্তু যমুনে! হৃদয় তো মত্ত করী। দমন না করিলে, হৃদয়ের বেগ তো কতই বাড়িতে পারে—তাহাতে হয়ত অনিষ্টও হইতে পারে। কত লোক কত পারে, তুমি চেষ্টা করিয়া হৃদয়ের বেগ একটু কমাইতে পার না কি ?"

কুমারী বলিলেন,—

"তোমায় কি বলিয়া বুঝাইব ? তুমি তো জান, আমার হৃদয় আমার কেমন আয়ত্ত। জ্ঞানতঃ যুক্তি ও চিন্তার পথ ছাড়িয়া আমার হৃদয় কখনই অন্য পথে যায় না। কিন্তু এবার আমার হৃদয় আর তেমন নাই। আর আমি

ইহাকে বশে রাখিতে পারি না। কুমার ব্যতীত সংসারে যে আরও বহু সামগ্রী আছে, কুমার ভিন্ন চিন্তার যে আরও বহু বিষয় আছে, অনেক সময় এ সকল কিছুই আমার মনে থাকে না। ইহাতে আমার দোষ কি? কিন্তু কুসুম, কুমারের প্রতি আমার এই যে প্রেম, ইহার আতিশয্যে আমার কি অনিষ্ট হইতে পারে?"

কুসুম বলিল,—

"প্রেম একটু বুঝিয়া, একটু বিবেচনা করিয়া হইলেই ভাল হয়। আগে পাত্রাপাত্র না বুঝিয়া প্রেম করা ভাল নয়—তাহাতে অনিষ্ট হইতে পারে।"

কুমারী হাসিয়া বলিলেন,—

"তবে আমার আশঙ্কার কোনই কারণ নাই। পাত্রাপাত্র বুঝিয়া প্রেম করিতে হইলে, কুমারের ন্যায় প্রেমের পাত্র আর কোথায় পাইব?"

কুসুম বলিল,—

"কুমার যে এতই সুপাত্র তাহা তুমি কিরূপে জানিলে?"

যমুনা হাসিয়া বলিলেন,—

"তাহা আর জানিতে? কুমার বীর, কুমার রাজভক্ত, কুমার দেশহিতৈষী, কুমার বিদ্বান, কুমার মিষ্টভাষী। মানুষে আর কি হয়?"

কুসুম বলিল,—

"সকল সত্য, কিন্তু এ সকল তো তাঁহার বাহ্য ভাব। তাঁহার অন্তরের ভাব কেমন তাহা তো তুমি জান না।"

কুমারী বলিলেন,—

"তাহা আবার কি জানিব? সেরূপ দেব-শরীরে দোষ স্থান পায় না। যদি তাঁহাতে কোন দোষ থাকে, তবে মানুষের সে দোষ হওয়াই আবশ্যক।"

কুসুম হাসিয়া বলিল,—

"বীর, রাজভক্ত, বিদ্বান্ ও ব্যক্তি চোর, মিথ্যাবাদী, পর-স্ত্রী-কাতর, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইতেও পারে। যদিই তোমার প্রেমাস্পদ কুমারের ঐ সকল দোষের এক বা অধিক থাকে, তবে তাহা কি মনুষ্য মাত্রেরই থাকা আবশ্যক? তুমি প্রেমে এতদূর অগ্রসর হইয়াছ, কিন্তু কুমারের এমন কোন দোষ আছে কি না, অনুসন্ধান করিয়াছ কি?"

"আবশ্যক বোধ হয় নাই, সন্ধানও করি নাই।"

"যাহা করিয়াছ তাহাতে হাত নাই। কিন্তু কখনও যদি জানিতে পার যে, কুমার প্রতারক, কুমার অবিশ্বাসী, কুমারের তোমার অপেক্ষাও প্রিয়তমা আছে, তাহা হইলে কি করিবে?"

কুমারী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন; সহসা স্থির হইয়া বলিলেন,—

"প্রথমে সে সংবাদ বিশ্বাস করিব না, প্রত্যক্ষ হইলেও সংশয় হইবে। স্থির বিশ্বাস জন্মিলে, ইষ্টদেবীকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আজীবন নিষ্ফল প্রেমানলে পুড়িব, তথাপি কুমারের সহিত কখন কথাও কহিব না।"

কুসুম বলিল,—

"ব্যস্ত হইও না—উতলা হইও না। আবার বইস, বলি শুন; সত্য মিথ্যা স্বয়ং বিচার কর। তুমি জান, আমি তোমারই কল্যাণ-কামনায় ত্রিকাল-নিয়ন্ত্রী 'আহের মোগরার' পূজা দিতে গিয়াছিলাম। পূজা সমাপ্তির পর দৈববাণী হইল,—"বালিকা সাবধান। হৃদয় অধিকৃত।"

যমুনা কাঁপিয়া উঠিলেন। কুসুম বলিল,—

"দেবীর এই আদেশ শুনিয়া হৃদয় বড়ই ব্যাকুল হইল। তাহার পর প্রত্যাগমন কালে,

পথে মহারাণীর দ্বাররক্ষিণীর সহিত মহারাণার সংসারের বহুবিধ কথোপকথন হইতে হইতে ক্রমে কুমার রত্নসিংহের কথা উঠিল। সে বলিল রত্নসিংহ স্বর্গীয় চিন্দিনারাজতনয়ার নিমিত্ত উন্মত্ত। মহারাণা কুমারকে তোমাদের কুমারীর পাণিগ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। কাজেই কুমারের আশা মনেই রহিয়া গেল।" এই কথা শুনিয়া তখন দেবী-বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম। যমুনা! এখন স্থির হইয়া বিবেচনা করিয়া কার্য্য কর।"

কুমারীর তখন বিবেচনা করিবার ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়াছে, তাঁহার হৃদয় তখন উদ্বেল হইয়া গিয়াছে, তাঁহাতে তখন তিনি নাই। তাঁহার চক্ষু তখন উন্মাদিনীর ন্যায় অস্থির ও আয়ত, তাঁহার দেহ বিকম্পিত। বহুক্ষণ সেই ভাবে থাকিয়া, কুমারী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। শোণিতবেগ মন্দীভূত করিবার অভিপ্রায়ে, উভয় হস্তদ্বারা দ্রুতগামী চঞ্চল বক্ষকে পেষণ করিয়া বলিলেন,—

"আর কি বিবেচনা? অন্যের কথা বিশ্বাস করিতাম না, কর্ণেও স্থান দিতাম না—দেবীর কথা! কুমার প্রতারক?—অসম্ভব। তবে কি দেবীর আদেশ মিথ্যা?—তদধিক অসম্ভব। দেবি! তোমারই উপদেশ অনুসরণ করিব। যে হৃদয়ে স্থান পাইব না, তাহার লোভ ত্যাগ করিতে অভ্যাস করিব।"

তাহার পর ভগ্ন-হৃদয়া বালিকা বহুক্ষণ উন্মাদিনীর ন্যায় সেই স্থানে বিচরণ করিলেন। তদনন্তর সে স্থান ত্যাগ করিয়া নিজ শয়ন-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। কুসুম অবিলম্বে তাঁহার অনুসরণ করিল। আসিয়া দেখিল, মর্ম্মপীড়িতা কমলা উপাধানে মুখ লুকাইয়া রোদন করিতেছেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ভানু-সপ্তমী।

অদ্য মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয়া সপ্তমী। আজি রাজপুতের চিরসমাদৃত সূর্য্য-পূজার দিন। এই পর্ব্বাহের নাম 'ভানু-সপ্তমী।' সমস্ত রাজপুতানা অদ্য উৎসাহে উন্মত্ত। দেবলবর-রাজভবনেও অদ্য অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই। সমস্ত দিবস বন্ধু-বান্ধবে সম্মিলিত থাকিয়া সূর্য্যদেবের গুণ-গান এবং ত্রিসন্ধি সময়ে সকলে মিলিয়া সমস্বরে তাঁহার স্তুতি-পাঠ ও অর্ঘ্য দান করিতে হইবে বলিয়া, আত্মীয় স্বজনগণ কেহ বা পূর্ব্বরাত্রে, কেহ বা অতি প্রত্যুষে দেবলবর-রাজ-ভবনে সমাগত হইয়াছেন। সমাগত ব্যক্তিগণকে দেবলবর-রাজ অতি-সমাদরে অর্চ্চনামণ্ডপে লইয়া যাইতেছেন। তথায় উচ্চবেদিকোপরি উপবেশন করিয়া এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সূর্য্যের স্তোত্র পাঠ ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন, এবং অদূরে দ্বাদশ জন দ্বিজ পূত-পাবক-কুণ্ডে সূর্য্যোদ্দেশে আহুতি দিতেছেন। নবাগত ব্যক্তিগণ প্রথমতঃ ভানুদেবের উদ্দেশে, পরে সভাস্থ ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া, সভাস্থলে উপবেশন করিতেছেন। ক্রমে কুমার রত্নসিংহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন পৌর্ব্বাহ্নিক অর্ঘ্যদান সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেবলবররাজ রত্নসিংহকে সভামণ্ডপে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। বীর রাজপুতের পক্ষে সূর্য্য-পূজাই সর্ব্বাগ্রে করণীয়। অন্ত প্রণয় বৃত্তি রত্নসিংহকে এই চিরকৃত কর্ত্তব্যে শিথিল করিল। তিনি ভাবি-

লেন, অগ্রে যমুনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পরে সূর্য্যার্চ্চনায় নিবিষ্ট হইব। এই ভাবিয়া রতনসিংহ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে রতনসিংহ পরিভ্রমণ করিলেন, কিন্তু যমুনার সে স্থির উৎফুল্ল নয়নযুগল তাঁহার নয়নে পড়িল না। অবশেষে রতনসিংহ হতাশ হইয়া বাহিরে আসিতেছেন এমন সময় দেখিতে পাইলেন, যমুনা সম্মুখস্থ প্রকোষ্ঠের একতম বাতায়নে বসিয়া আছেন। যমুনার সম্মুখভাগ কুমার দেখিতে পাইলেন না। যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার উৎকণ্ঠা জন্মিল। তিনি দেখিলেন, যমুনার কেশরাশি অবিন্যস্ত, পরিচ্ছদ মলিন, দেহ ভূষণহীন এবং রোগীর ন্যায় কৃশ ও কাতর। কুমার সভয়ে সম্বোধিলেন,—"যমুনে!"

যমুনা ফিরিয়া চাহিলেন;—দেখিলেন রতনসিংহ! তিনি চমকিয়া উঠিলেন; ভূত ঘটনাবলী স্মৃতি-পথে অবিকৃত ভাবে সমাগত হইল। ইচ্ছা হইল, সকলই ভুলিয়া গিয়া রতনসিংহের চরণ ধরিয়া রোদন করেন। তখনই মনে পড়িল—দেবীবাক্য। ভাবিলেন, এই রতনসিংহ প্রতারক?' তখনই দেবীবাক্য মনে আসিয়া তাঁহাকে জানাইয়া দিল, 'হাঁ প্রতারক।' এই বিরুদ্ধ চিন্তা-স্রোতে কোমলহৃদয়া যমুনা অবসন্ন প্রায় হইলেন। ক্ষণেক সংজ্ঞাহীনার ন্যায় বসিয়া রহিলেন। তাহার পর ক্রমশঃ হৃদয়ের পূর্ব্ব পরুষ-ভাব সম্পূর্ণরূপে পুনরাগমন করিল। তখন তিনি স্থির করিলেন, চাতুরী যাহার সিদ্ধবিদ্যা, অবলার সর্ব্বনাশ-সাধন যাহার অভিলাষ, তাহার সহিত কথা কহিব না, তাহার মধু-মাখা কথায় আর ভুলিব না। যমুনাকে দেখিয়া রতনসিংহও চমকিলেন। সেই প্রফুল্ল-বদনা, প্রেম-প্রতিমা যমুনার এ দশা কেন? হায়! উভয়ের চিন্তার গতি এক্ষণে কি বিভিন্ন! রতনসিংহ আবার প্রশ্ন করিলেন,—

"যমুনে, তোমার কি হইয়াছে?"

যমুনা অবনতমস্তকে বসিয়া রহিলেন। একবার তাঁহার জিহ্বাগ্রে একটা উত্তর আসিল কিন্তু তখনই যমুনা সতর্কতা সহকারে তাহা নিরস্ত করিলেন। তখন রতনসিংহ যমুনার সমীপবর্ত্তী হইয়া উপবেশন করিলেন এবং ঘোর উৎকণ্ঠার সহিত কহিলেন,—

"যমুনে! তোমার এমন ভাব কেন?"

যমুনা ব্যস্ততা সহ দণ্ডায়মানা হইয়া বলিলেন,—

"আমার সহিত কথা কহিতে আপনার আর কোনই অধিকার নাই।"

কথা সাঙ্গ হইতে না হইতে, হতাবরোধা নির্ঝরিণীর ন্যায় বেগে, যমুনা অন্তর্দ্ধত হইলেন। কুমার রতনসিংহ হত-বুদ্ধির ন্যায় সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। ভানু-সপ্তমী তখন রতনসিংহের মনে নাই। রাজবারা, মহারাণা, মিবার, স্বাধীনতা সকলই তিনি তখন ভুলিয়া গিয়াছেন, হৃদয় তখন অবক্তব্য উৎকণ্ঠায় আলোড়িত। কতক্ষণ রতনসিংহ তদ্রূপ ভাবে বসিয়া রহিলেন, তাহা তিনি জানিলেন না। সমাগত লোকগণের সমোচ্চারিত স্তব-ধ্বনি তাঁহার সংজ্ঞাসংবিধান করিল। তখন তিনি ভাবিলেন, আবার একবার গিয়া যমুনার সহিত সাক্ষাৎ করি এবং তাঁহার চরণে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করি যে তাঁহার বাক্যের তাৎপর্য্য কি? আবার ভাবিলেন, যমুনা ত স্পষ্টই কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছেন। বহুক্ষণ ধরিয়া কতই চিন্তা করিলেন, কোন বিগতকার্য্যে যমুনার বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না বিবেচনা করিলেন কিন্তু কিছুই স্থির করিতে

পারিলেন না। শেষে মনে হইল, যমুনার কি অন্যত্র বিবাহ স্থির হইয়াছে? কেন হইল? কে করিল? তাঁহার পিতাই তো আমার সহিত বিবাহের প্রস্তাবকর্ত্তা। তাঁহার অন্য সম্বন্ধ স্থির করা অসম্ভব। বহু চিন্তাতেও কোন মীমাংসাই তাঁহার সঙ্গত বলিয়া মনে হইল না। তখন তিনি গাত্রোত্থান করিয়া ঊর্দ্ধ-নেত্র হইয়া কহিলেন,—

"ভগবন্ আদিত্য! আমার কোন্ পাপের নিমিত্ত এই শাস্তিবিধান করিতেছ?"

ধীরে ধীরে রতনসিংহ বাহিরের দিকে চলিলেন। একটী প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিবামাত্র কুসুমের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কুমার ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"কুসুম, সত্য করিয়া বল, যমুনার এমন ভাব কেন হইল?"

কুসুম বলিল,—

"তাহা বলাই ভাল। যমুনা লজ্জায় বলিতে পারেন নাই। কুমারের অপেক্ষা যমুনার অন্যত্র অধিক প্রেমাস্পদ আছেন। যমুনা নিতান্ত বালিকা নহেন। এখন আর যে কোন ব্যক্তির সহিত নিতান্ত আত্মীয়ভাবে কথোপকথন করা ভাল দেখায় না?"

রতনসিংহ অনেকক্ষণ অটল গিরির ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর হৃদয়-বিদারক স্বরে বলিলেন,—

"উত্তম।"

রতনসিংহ বাহিরে আসিলেন; প্রখর সৌরকররাশি তাহার নয়নে লাগিল। তখন তিনি সেই ভূমিতলে উপবেশন করিয়া কহিলেন, "ভগবন্ ভাস্কর! তোমার চিরন্তন সেবক এবার এইরূপেই ভানু-সপ্তমী উদ্‌যাপন করিল। দয়াময়! এ হৃদয়-হীন জগতে যেন আর থাকিতে না হয়; যেন শত্রু-নিপাত ভিন্ন কোন কর্ম্মেই হস্ত বা মন লিপ্ত না থাকে; অন্তিমে হে পিতঃ! যেন তোমার চরণেই স্থান হয়।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

আর এক ভাব।

শৈলম্বর-রাজ অন্তঃপুরের একতম প্রকোষ্ঠে কুমারী উর্ম্মিলা উপবিষ্টা রহিয়াছেন। প্রকোষ্ঠের বাতায়ন দ্বারাদি উন্মুক্ত। উত্তরের বাতায়ন সমীপে কুমারীর পালঙ্ক, তদুপরি কুমারী আসীনা। সেই বাতায়নপার্শ্বে অন্তঃপুরের বৃক্ষ-বাটিকা। কুমারীর দৃষ্টি সেই বৃক্ষবাটিকায় শূন্য-ভাবে নিপতিত। তাঁহার চিত্তের ভাব তখন অন্য কোন পদার্থে লীন নহে। কুমার অমরসিংহ আসিয়াছেন, একথা তাঁহার অবিদিত নাই। সেই কুমার অমরসিংহই এক্ষণে তাঁহার চিন্তার বিষয়। তিনি ভাবিতেছেন, কুমার ও আমার মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। তবে এ দুরাশা কেন হইল? আবার ভাবিতেছেন, আমার আশা দুরাশা না হইতেও পারে।

কুমারী উর্ম্মিলা যখন এবংবিধ ভাবনায় ভাসিতেছেন, সেই সময় সেই প্রকোষ্ঠে তাঁহার মাতুলানী, শৈলম্বর-রাজমহিষী দেবী পুষ্পবতী প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র উর্ম্মিলা স্বীয় অংশ-নিপতিত বিশৃঙ্খল চিকুরদাম হস্তদ্বারা পশ্চাদ্দিকে সরাইয়া, উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার বদনে লজ্জার চিহ্ন প্রকটিত হইল। এস্থলে লজ্জা স্বাভাবিক। মনুষ্য যখন এমন কোন কার্য্য করে, যাহা সে সকলকে জানাইতে

ইচ্ছা করে না; অথবা জানাইলে লজ্জিত হইতে হয়, তখন সে প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে করে, আমার গুপ্ত কথা হয়ত প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ভয়ে সে লোকের সহিত পূর্ব্ববৎ সাহসিকতা-সহকারে কথা কহিতে পারে না; কাহারও বদনের প্রতি পূর্ব্ববৎ স্থির ও উৎফুল্লভাবে চাহিতে পারে না। এই জন্যই উর্ম্মিলা মাতৃবৎ মাননীয়া মাতুলানীর সমক্ষে লজ্জানুভব করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, হয়ত তিনি কুমার অমরসিংহের প্রতি কুমারীর মনের ভাব, জানিতে পারিয়াছেন। ফলতঃ এ বৃত্তান্ত দেবী পুষ্পবতীর অবিদিত নাই। তারা, কুমারীর কঠোর প্রতিজ্ঞা শ্রবণে, এবং তাঁহার মনের ঔদাসীনতা দর্শনে ভয়-প্রযুক্ত সমস্ত বৃত্তান্ত রাজ্ঞী পুষ্পবতীকে নিবেদন করিয়াছিল; রাজ্ঞী এই সংবাদ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি চিন্তান্বিতা হইলেন। তিনি তৎকালে শৈলম্বররাজকে এ সংবাদ বিদিত করা বিধেয় বিবেচনা করিলেন না। ভাবিলেন, অগ্রে কৌশলে এ সম্বন্ধে কুমারের অভিপ্রায় জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। যদি তাহা শুভ হয়, তাহা হইলে তখন এ রহস্য রাজার গোচর করিব যদি বাসনার বিপরীত হয়, তাহা হইলে উর্ম্মিলার আশা মুকুলেই বিনষ্ট করিতে হইবে। এই ভাবিয়া শৈলম্বর-রাজ-প্রিয়া অমরসিংহের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। কুমারী উর্ম্মিলা অভ্যন্তরস্থ এ সকল কথা কিছুই জানিতে পারিলেন না।

মহিষী জিজ্ঞাসিলেন,—

"উর্ম্মিলে! একাকিনী বসিয়া কি ভাবিতেছ? তুমি সমস্ত দিনই ভাব কি?"

উর্ম্মিলা নম্রমুখী হইয়া বলিলেন,—

"ভাবিব কি? একদণ্ড একাকী থাকিলে তুমি ভাব উর্ম্মিলা কি ভাবিতেছে। আমার অত ভাবনা নাই।"

মহিষী বলিলেন,—

"আমি তাহা ভাবি সত্য; কিন্তু আমার ভাবিবার অনেক কারণ আছে। তুমি উত্তরোত্তর কৃশ হইয়া যাইতেছ। তোমার মুখ ক্রমেই মলিন হইতেছে। এ সকল দেখিয়া আমার কাজেই মনে হয়, তুমি কি ভাবিয়া থাক।"

উর্ম্মিলা বলিলেন,—

"তোমার ঐ এক কথা। তুমি আমাকে কেবলই কৃশ হইতে দেখ। দিন রাত্রি না হাসিলে, আর দরবারের থামের মত মোটা না হইলে তোমার মনে আহ্লাদ হয় না।"

কথা সমাপ্তির পর উর্ম্মিলা মস্তক বিনত করিলেন। এক গুচ্ছ কেশ স্থান-ভ্রষ্ট হইয়া তাঁহার কপোলদেশে আসিয়া পড়িল। রাজ্ঞী পুষ্পবতী সস্নেহে কেশগুচ্ছ অপসারিত করিয়া কহিলেন,—

"বৎসে! শুনিয়াছ, মহারাণা প্রতাপসিংহের পুত্র কুমার অমরসিংহ আমাদের বাটীতে আসিয়াছেন?"

কুমারী বিনত মস্তকে কহিলেন,—

"হাঁ—শুনিয়াছি।"

রাজ্ঞী পুনরপি কহিলেন,—

"তুমি কি তাঁহাকে জান না?"

"হাঁ জানি।"

ঈষদ্ধাস্যের সহিত মহিষী আবার জিজ্ঞাসিলেন,—

"তুমি কি তাঁহাকে কখন দেখ নাই?"

"দেখিয়াছি।"

"কোথায় দেখিয়াছ?"

এই প্রশ্নের উত্তর হইবার পূর্ব্বেই একজন দাসী আসিয়া নিবেদিল—

"কুমার অমরসিংহ আসিতেছেন।"

দাসী প্রস্থান করিল। তৎক্ষণাৎ বীরবর অমরসিংহ সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। রাজ্ঞী গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন,—

"এস বৎস, উপবেশন কর।"

এক পালঙ্ক ব্যতীত সে গৃহে উপবেশনোপযোগী অন্য সামগ্রী ছিল না। কুমার কোথায় বসিবেন দেখিতে না পাইয়া, সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পুষ্পবতী কহিলেন,—

"দোষ কি? ঐ পালঙ্কে উপবেশন কর। তুমি তো আমাদের পর নহ।"

কুমার অমরসিংহ পালঙ্কের একদিকে উপবেশন করিলেন। কুমারী ঊর্ম্মিলা ব্রীড়াবনতবদনে স্বীয় চম্পকদাম সদৃশ পদাঙ্গুলির মুক্তা-সদৃশ নখর কণ্ডুয়ন করিতে লাগিলেন।

অন্যান্য বহুবিধ কথাবার্ত্তার পর, রাজ্ঞী জিজ্ঞাসিলেন,—

"অমর! ঊর্ম্মিলাকে কি আর কখন দেখ নাই? ঊর্ম্মিলা যে আমার ভাগিনেয়ী।"

অমর কহিলেন,—

"দাস যে অদ্য আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে, সে কেবল কুমারী ঊর্ম্মিলার কৃপায়। কুমারী আমাকে বার বার মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এ জীবনে ঐ দেবীর নাম কখনই ভুলিব না।"

রাজ্ঞী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন,—

"সে কি কথা?"

কুমারী ঊর্ম্মিলা ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"কি শুনিবে? কুমার হয় তো তিলকে তাল করিয়া গল্প করিবেন। তাহা শুনিয়া কি হইবে?"

অমরসিংহ হাসিয়া বলিলেন—

"আমি সত্য কথা বর্ণনা করিব। তবে এ কথা বলিয়া রাখিতেছি যে, আমি যাহা বলিব তাহা সত্য হইলেও, উপন্যাসের ন্যায় অলীক ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে। কুমারি, তোমাকেও বলিয়া রাখিতেছি যে, যদি আমি কোন স্থানে সত্য কথা না বলি, তাহা হইলে তুমি সংশোধ করিয়া দিও।"

এই সময় একজন দাসী আসিয়া নিবেদিল,—

"ভগবতী অরুণমালিনী আসিয়াছেন।"

রাজ্ঞী ব্যস্ততাসহ উঠিয়া কহিলেন,—

"বৎস। ক্ষণেক অপেক্ষা কর। আমি এখনই আসিতেছি।"

রাজ্ঞী প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠাদশ পরিচ্ছেদ।

'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।'

অদ্য খোশরোজ বা নরোজা পর্ব্বাহ। সম্রাট-ভবন অদ্য আনন্দ, উৎসাহ ও কোলাহলে পূর্ণ। পাঠকগণকে এই উৎসবের কিঞ্চিৎ বিবরণ বিদিত করা বিধেয়।

নরোজা নববর্ষের প্রথম দিন; অর্থাৎ সেই দিন সূর্য্য মেষরাশিতে প্রবেশ করেন। এই দিন এদেশস্থ ভারতেরই মহানন্দের দিন। কিন্তু সম্রাট্ আকবর সে মূল নরোজা পরিবর্ত্তিত করিয়া, খোশরোজ নামে এক অভিনব পর্ব্বের উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহা তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত ও স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনের

কৌশল মাত্র। এই উপলক্ষে অন্তঃপুরে ললনাকুল আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভাসিতেন। আকবরের কুটিল চক্রে বদ্ধ রাজপুত-কুল সীমন্তিনীগণ ও যবন ওমরাহগণের মহিলাগণ সেই আমোদে মিশ্রিতা হইতেন। তথায় রীতিমত বিপণিমালা সজ্জিত হইত। সম্ভ্রান্ত পুরস্ত্রীগণ ও বণিক-সীমন্তিনীগণ নানাবিধ দ্রব্যজাত বিক্রয় করিতেন। আর, পাঠকগণ! —বলিতে লজ্জা করে—যিনি সম্রাট-কুল ভূষণ বলিয়া জগন্মান্য, যাঁহার ন্যায়পরতা ও সাধুতার প্রশংসা সর্ব্ববাদিসম্মত, যাঁহার নাম অদ্যাপি 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' বলিয়া সমাদৃত, সেই নরশ্রেষ্ঠ আকবর একপার্শ্বে লুক্কায়িত থাকিয়া উপস্থিত অপ্সরাসদৃশী রূপসী যুবতীগণের সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিতেন!!!

চতুর্দ্দিকে অত্যুচ্চ শ্বেত-প্রস্তর বিনির্ম্মিত অট্টালিকাশ্রেণীর মধ্যে কৃষ্ণ প্রস্তরাচ্ছাদিত সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। ঊর্দ্ধ-দেশ অতি চমৎকার শিল্প-কৌশল-সম্পন্ন মনোহর চন্দ্রাতপ-সমাচ্ছন্ন। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকস্থ অট্টালিকা-শ্রেণী পুষ্পমালায় সুশোভিত। তাহাতে অত্যুৎকৃষ্ট চিত্রসকল বিলম্বিত ও বিবিধ বর্ণের অত্যুজ্জ্বল প্রস্তর সন্নিবিষ্ট। বিশ্রামার্থ রঙ্গভূমির স্থানে স্থানে সুচারু শয্যাচ্ছাদিত পালঙ্ক সকল সংস্থাপিত। প্রাঙ্গণসীমায় স্থানে স্থানে সুন্দরী যুবতীগণ বসিয়া পণ্য বিক্রয় করিতেছেন। গোলাপের তোড়া, ফুলের মালা, ফুলের ঘটী, বাটী, টুপি, আসন, সূচী শিল্প প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য বিক্রীত হইতেছে। বিক্রয়িত্রীগণ ব্যতীত সকলেই ক্রয়কারিণী। সময়ে সময়ে ক্রেত্রীদলের কেহ বা বিক্রেত্রীর স্থান গ্রহণ করিতেছেন; বিক্রেত্রী অপরা যোষিদ্‌গণের সহিত আমোদে পরিলিপ্তা হইতেছেন। অর্দ্ধমুদ্রা মূল্যের দ্রব্য পঞ্চ মুদ্রায় বিক্রীত হইতেছে। সমবেত সুন্দরীসমূহের সুখ-শান্তি-সংবিধানার্থ, পালঙ্ক ব্যতীত, স্থানে স্থানে শ্বেতপ্রস্তরাধারে আতর ও গোলাবপূর্ণ রৌপ্য-পাত্র সকল স্থাপিত। পুষ্পের তো কথাই নাই। ভূতলে, ঊর্দ্ধে, পার্শ্বে, যুবতীগণের অঞ্চলে, সর্ব্বত্র অপরিমিত গন্ধ যুক্ত পুষ্পরাশি পরিব্যাপ্ত!

এইরূপ স্থানে বিবিধ মহার্ঘ্য বস্ত্রালঙ্কারে বিশোভিতা, পরমা সুন্দরী, নবীনা হিন্দু ও মুসলমান সীমন্তিনীগণ যথেপ্সিত আমোদে নিমগ্না। সুন্দরী নারীগণের শোভাবর্দ্ধনকারী অলঙ্কার সমস্তের মধুর শিঞ্জিনী, রমণী কণ্ঠ-নিঃসৃত সপ্ত-স্বর নিনাদকারী সুমধুর সঙ্গীত-ধ্বনি, অথবা আনন্দের চিহ্নস্বরূপ হাস্যের উচ্ছ্বাস, নৃত্যজনিত পাদ বিক্ষেপ-ধ্বনি, আর সুন্দরীগণ-বাদিত বীণা, সপ্তস্বরা প্রভৃতি যন্ত্রের ধ্বনি সমবেত হইয়া, সম্রাট-প্রাসাদ অতি প্রীতিকর কোলাহলে পরিপূর্ণ করিয়াছে! রমণীগণের কেহ নাচিতেছেন, কেহ গাইতে-ছেন, কেহ বাদ্য করিতেছেন, কেহ বা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সহচরীর গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছেন।

একদিকে কয়েকজন রাজপুত মহিলা সমবেত হইয়া একজনকে রাধা, অপরকে কানাইয়া সাজাইয়া মহা আমোদ করিতেছেন। মানভঞ্জন প্রসঙ্গের অভিনয় দ্বারা, নকল শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে স্বীয় স্বামীর কষ্টের পরিমাণ অনুমান করিতেছেন। নকল কৃষ্ণকে অপর সকলে মান ভাঙ্গিবার কৌশল শিখাইয়া দিতেছেন। অতি কষ্টে কৃত্রিম মান ভাঙ্গিল। তথায় তুমুল হাস্যের লহর উঠিল। তখন রাধাকৃষ্ণ যুগল হইয়া দাঁড়াইলেন; সহচরীগণ তাঁহাদের বেষ্টন করিয়া করতালি দিতে দিতে গাইতে লাগিল,—

'চন্দ্রকচারুময়ূরশিখণ্ডকমণ্ডলবলয়িতকেশং।
'প্রচুরপুরন্দরধনুরনুরঞ্জিত মেদুরমুদিরসুবেশং॥
'গোপকদম্বনিতম্বতীমুখচুম্বনলম্ভিতলোভং।
'বন্ধুজীবমধুরাধরপল্লবমুল্লসিতস্মিতশোভং॥
'বিপুলপুলকভুজপল্লববলয়িতবল্লবযুবতীসহস্রং।
করচরণোরসি মণিগণভূষণকিরণবিভিন্নতমিস্রং॥
মণিময়মকরমনোহরকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডমুদারং।
'পীতবসনমনুগতমুনিমনুজসুরাসুরবরপরিবারং॥

আর এক স্থানে কয়েক জন কজ্জল-নয়না যবন-প্রণয়িনী একত্রিত হইয়া নৃত্যের পারদর্শিতা দেখাইতেছেন। একজন যন্ত্র বাদন করিতেছেন, দুই জন গাইতেছেন ও দুই দুই জন অগ্রসর হইয়া বহুবিধ নৃত্যের পরীক্ষা দিতেছেন। নর্ত্তকীদ্বয়ের গাত্রে দ্রষ্টৃবর্গ তালে তালে পুষ্প প্রক্ষেপ করিতেছেন।

রঙ্গভূমির দক্ষিণপার্শ্বে এক নীলাম্বরাবৃতা, লাবণ্যময়ী যুবতী দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে ঢুলিতে ঢুলিতে সহচরীর সহিত মধুর ভাবে কথা কহিতেছেন। কি চক্ষু, কি দৃষ্টি, কি বর্ণ, কি গঠন, কি কমনীয়তা! শরীরের সর্ব্বত্রই পরিণত; সর্ব্বত্রই সুকুমার! সুন্দরী রাজ-রাজ-মোহিনীরূপে বক্রভাবে দাঁড়াইয়া পার্শ্বস্থ নবীনা কামিনীর সহিত কথোপকথন করিতেছেন। এই রমণী-কুল-কমলিনী রাজকবি পৃথ্বিরাজপত্নী যোধবাই।

পাঠক! আর দেখিয়াছেন, পশ্চিমদিকস্থ কিংখাপ যবনিকার অন্তরালে, বাদশাহ আকবর দাঁড়াইয়া কেমন অনিমিষ লোচনে মনোমোহিনী পৃথ্বিরাজ প্রণয়িনীর প্রতি চাহিয়া আছেন। এই উন্নত বয়সেও বাদশাহের লোচনযুগল হইতে বিংশবর্ষীয় যুবকাপেক্ষা ইন্দ্রিয়-তৃষ্ণা-সূচক দৃষ্টি নিঃসৃত হইতেছে। সমবেত সুন্দরীমণ্ডলী নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে গাত্র বস্ত্রাদি উন্মুক্ত করিয়া মনের সুখে আমোদ করিতেছেন। কে জানে যে বর্ষীয়ান্ ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ রমণীজনভূষণ লজ্জাধনাপহরণ করিতেছেন!

রঙ্গভূমির অপরদিকে যে এক নবীনা প্রবাল-খচিত স্বর্ণাভরণ মধ্যে পদ্মরাগ মণির ন্যায়, কুমুদিনীপূর্ণ নীলাকাশে চন্দ্রমার ন্যায়, পুষ্পপাত্রস্থ বহুবিধ পুষ্পের মধ্যে কমলিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন,—পাঠক, বুঝিতে পারিয়াছেন, সেই সুন্দরী মেহের উন্নিসা। মেহের উন্নিসা আড়ম্বর রহিত পরিচ্ছন্ন সজ্জায় সজ্জিতা। ষোড়শী মেহের উন্নিসা অপরা সমবয়স্কা এক সুন্দরী ললনার সহিত রঙ্গভঙ্গ করিতেছেন। সেই ললনা সাহারজাদি বন্নু। মেহের উন্নিসা যাহার সহিত এক দিন আলাপ করিতেন, সেই তৎক্ষণাৎ তাঁহার অতুলনীয় রূপরাশি, অসীম গুণমালা ও অপার মহিমার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া, তাঁহার নিকট চিত্ত বিক্রয় করিত। এই কারণেই সাহারজাদি বন্নুর সহিত মেহের উন্নিসার বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। মেহের উন্নিসা যখন বন্নুর সহিত নানাবিধ কৌতুকে পরিলিপ্তা রহিয়াছেন, সেই সময়ে ধীরে ধীরে আমিনী তথায় আগমন করিল। মেহের উন্নিসা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"আমিনি! কি সংবাদ?"

আমিনী তাহার উত্তর দিতে লাগিল। ইত্যবসরে বন্নু সন্নিহিত গোলাপপূর্ণ হেমকলস লইয়া নিঃশব্দে মেহের উন্নিসার নিকটস্থ হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে তাহার অধিকাংশ মেহের উন্নিসার গাত্রে ঢালিয়া দিলেন। মেহের উন্নিসার বস্ত্র গোলাপার্দ্র হইয়া গেল বন্নু খল্ খল্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। মেহের উন্নিসা বন্নুর গলদেশে স্বীয় নবনীত-

বিনিন্দিত কোমল বাহুদ্বারা বেষ্টিত করিয়া কহিলেন,—

"এই ভাব কি চিরদিনই থাকিবে ?"

"বন্নু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"প্রার্থনা করি মৃত্যু পর্য্যন্ত যেন এমনই ভাবই থাকে; আর প্রার্থনা তোমার সহিত এরূপ ব্যবহারের পথ যেন নষ্ট না হয়।"

মেহের উন্নিসা হাসিয়া কহিলেন,—

"তা কেমন করিয়া হইবে ? যে দিন তোমার এ সরলহৃদয় পরের হইবে, সেই পরের প্রেম ভিন্ন যখন আর কিছু ভাল লাগিবে না, তখন সাহারজাদি ! তখন কি আর আমাদের মনে থাকিবে ?"

বন্নু অত্যন্ত হাসিতে হাসিতে দুই পদ সরিয়া গিয়া বলিলেন,—

"ছিঃ মেহ ? তুমি আপনার কথায় আপনি ধরা পড়িলে ! তবে তো দাদার সহিত তোমার বিবাহ হইলে, তুমি আমাকে একেবারে ভুলিয়া যাইবে ?"

মেহের উন্নিসা সবিস্ময়ে কহিলেন,—

"তোমার দাদার সহিত আমার বিবাহ হইবে কে বলিল ?"

"তুমি তো কিছু বল না, লোকে বলে তাই শুনিতে পাই।"

তখন মেহের উন্নিসা বলিলেন,—

"বন্নু ! তোমাতে আমাতে মনের কোনই প্রভেদ নাই; এই জন্যই তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছি, তুমিই বল দেখি ভাই, সাহারজাদা সেলিমের সহিত বিবাহ হইলে আমি কি সুখী হইব ?"—

বন্নু অনেকক্ষণ চিন্তার পর কহিলেন,—

"না।"

"তবে কেন ভাই এ বিশ্বাস মনে স্থান দিয়াছ ? যাহাতে এ প্রসঙ্গ আর না উঠে এবং যাহাতে ইহা কার্য্যে পরিণত না হয়, তাহারই চেষ্টা করা তোমার কর্ত্তব্য।"

বন্নু কহিলেন,—

"ভগ্নি ! ভয় নাই। আমি শুনিয়াছি, তোমার পিতা বাদশাহের নিকট তোমায় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং তোমার অন্যত্র সম্বন্ধ হইয়াছে, তাহাও জানাইয়াছেন। বাদশাহ বলিয়াছেন, বাগ্‌দত্তা কন্যার অন্যত্র বিবাহ হইতে পারে না। অতএব পিতার অনিচ্ছায় কিরূপে সাহারজাদার সহিত তোমার বিবাহ ঘটিতে পারে ?"

মেহের উন্নিসা বন্নুর বদন চুম্বন করিয়া কহিলেন,—

"ভগ্নি ! অদ্য তুমি আমাকে যে সুসমাচার দিলে, তাহার প্রতিদান আমি আর কি দিব ? প্রার্থনা করি ঈশ্বর তোমাকে সুখী করুন।

ক্ষণকাল পরে মেহের উন্নিসা বন্নুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আমিনীর সঙ্গে প্রস্থান করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রেমের রহস্য কথা।

কয়েকটি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া গেলে অপর এক প্রাঙ্গণে উপস্থিত হওয়া যায়। সেই প্রাঙ্গণে উপস্থিত যোষিদ্বর্গের শিবিকা সকল সংস্থাপিত আছে। মেহের-উন্নিসা, সেই সমস্ত প্রকোষ্ঠের দুইটি অতিক্রম করিয়া তৃতীয়টিতে পদার্পণ করিয়াছেন, এমন সময় পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠ হইতে শব্দ হইল,—

"মেহের উন্নিসা !"

মেহের উন্নিসা সভয়ে ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন সাহারজাদা সেলিম ! মেহের উন্নিসার ভয় হইল। ভাবিলেন, 'সাহারজাদা এ নির্জ্জনে কেন ?' আবার ভাবিলেন, 'আমি ত একাকিনী নহি।' ফলতঃ সেলিমের মনে কোনই দুরভিসন্ধি ছিল না। বাদশাহ আকবর এ সম্বন্ধে তাঁহাকে কঠিন আজ্ঞা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মেহের উন্নিসার বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়াছে। কথা স্থির হওয়া ও কার্য্যতঃ বিবাহ হওয়া একই কথা। সুতরাং মেহের উন্নিসাকে পরস্ত্রীবৎ মনে করিতে হইবে। অন্যথায় তিনি নিরতিশয় কুপিত হইবেন। সেলিম বুঝিয়াছেন যে, মেহের উন্নিসারূপ রত্ন লাভ করা দুরাশা। তবে তাঁহার এক আশা আছে। মেহের উন্নিসার মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে বাসনা সফল হইলেও হইতে পারে। তিনি স্থির করিয়া আছেন যে, মেহের উন্নিসার সহিত কোন সুযোগে সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া বা লোভ দেখাইয়া চেষ্টা করিব, যদি মত পরিবর্ত্তন করিতে পারি। কিন্তু মেহের উন্নিসা, অবিধেয় বিবেচনায়, ইদানীং সম্রাট-ভবনে সতত আগমন করেন না। সেলিম জানিতেন অদ্য মেহের উন্নিসা নিশ্চয়ই আসিবেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, একটু সুরা-সংযোগে মস্তিষ্ককে উদ্দীপ্ত রাখিলে; হৃদয়ের নিভৃত ভাব সকলও বিশদরূপে ব্যক্ত করিতে পারিব; সুতরাং অধিকতর ফললাভে সমর্থ হইব। সুরার প্রতি এইরূপ অত্যধিক বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অনেকেই আত্ম সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনে এবং পরিণামে পরিতাপানলে দগ্ধ হয়। অবিশ্বাসিনী সুরা এক্ষণে তাঁহার যে অবস্থা করিয়া তুলিয়াছে তাহাতে সুখের কথান পরের চিত্তাপহরণ করা, বা পরের সংস্কার বিদূরিত করা সম্ভব নয়। তাঁহার আয়ত লোচনদ্বয় আরক্ত হইয়াছে ও ঢল ঢল্ করিতেছে; তাঁহার বদনের অনিন্দ্য গৌরবর্ণ রক্তিম হইয়াছে, তাঁহার হস্ত পদ অস্থির; তিনি এক স্থানে দাঁড়াইতে অক্ষম; তাঁহার জিহ্বা বিশুদ্ধ বাক্য কথনের ক্ষমতা-বিরহিত। মেহের উন্নিসা সেলিমকে দেখিবা মাত্র সসম্মানে নিবেদিলেন,—

"জাহাপনা। অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আপনাকে আমি দেখিতে পাই নাই।"

সেলিম বলিলেন,—

"বেশ তো, বেশ তো। মেহের উন্নিসা তুমি ভাল আছ ?"

মেহের উন্নিসা বলিলেন,—

"সাহারজাদার অনুগ্রহে সমস্তই মঙ্গল।"

ক্ষণেক পরে আবার বলিলেন,—

জাহাপনা। আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

সেলিম কহিলেন,—

"ছিঃ। যাবেই তো—দুটো কথা শুনে যাও। মনের কথা বলি শুন। তোমাকে বড় ভালবাসি, তুমি তো বাস না; তাতেই শুনতেছ না। শুন আগে, তার পর ব'লো, শের খাঁ ভাল কি সেলিম ভাল। তুমি আমাকে বিয়ে করবে না কেন ?"

প্রকৃতিস্থ থাকিতে মেহের উন্নিসাকে বলিবেন বলিয়া যাহা স্থির করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা সেলিমের মনে নাই। সেই সকল কথার অপরিস্ফুট ছায়া এক একবার তাঁহার মনে পড়িতেছে। যাহা মনে পড়িতেছে, তাহারও গ্রন্থি নাই, শৃঙ্খল নাই; সুতরাং তিনি যে উদ্দেশ্যে এই প্রলাপ-জাল বিস্তার করিতেছেন, এতদ্দ্বারা ইষ্ট না হইয়া, তৎসম্বন্ধে অনিষ্টই ঘটিতেছে। মেহের উন্নিসা,

সেলিমের কথা শুনিয়া লজ্জায় মস্তক নত করিয়া রহিলেন। সেলিম কহিলেন,—

"এই কি তোমার উচিত? তুমি জান না। তোমাকে কি বলিব? আমার মনে পড়ে না। আমি যাহা বলিতাম, তাহা বলিতে পারিতেছি না। তাই চলিয়া যাইও না--আমি তোমারই।"

মেহের উন্নিসা বুঝিলেন যে, সুরাতেজে সেলিম এক্ষণে অপ্রকৃতিস্থ আছেন। মনে মনে কহিলেন,—

"ধিক্! এই গঠন, এই যৌবন, এই অতুল সম্পত্তি, স্বভাবের দোষে সকলই বৃথা, সকলই অনর্থক!"

প্রকাশ্যে বলিলেন,—

"জাঁহাপনা! যাহা বলিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অদ্য আপনার শরীর ভাল নাই। সময়ান্তরে আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

সেলিম কহিলেন,—

"সত্য?"

"হাঁ।"

সেলিম কহিলেন,—

"তবে এস। মনে থাকে যেন।"

মেহের উন্নিসা বিদায় হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'সেলিম কি যথার্থই আমাকে ভাল বাসেন?—না, এ সকল মোহের উত্তেজনা।' আবার ভাবিলেন, 'না, ইহা হৃদয়স্থিত প্রণয়-উদ্দীপনা।' আবার ভাবিলেন, 'মোহই হউক, বা প্রণয়ই হউক, সেলিমের স্বভাব অতি মন্দ, তাঁহার চরিত্র অতি ঘৃণিত; তিনি প্রণয়ের উপযুক্ত নহেন।' পরক্ষণেই ভাবিলেন, 'স্বভাব চরিত্র কি পরিবর্ত্তিত হয় না? অবশ্যই হয়। তবে স্বভাব মন্দ বলিয়া মনুষ্যকে ঘৃণা করা অবৈধ।' আবার ভাবিলেন, 'আমি কেন এত চিন্তা করিতেছি। উপস্থিত আয়ত্তাগত সুখ ছাড়িয়া অনুপস্থিত সুখের আশায় মত্ত হওয়া মূঢ়ের কার্য্য।' মেহের উন্নিসা একটী অনতি-দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, অস্ফুট স্বরে কহিলেন,—

"অনেক দূর।"

আমিনী জিজ্ঞাসিল,—

"কি বকিতেছ?"

মেহের উন্নিসা বিষণ্ণস্বরে উত্তর দিলেন,—

"বড় গ্রীষ্ম—নয়?"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভণ্ড তপস্বী।

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া রমণীমণ্ডলে খোসরোজ আমোদ স্থগিত হইল। সীমন্তিনীগণ একে একে বিদায় হইতে লাগিলেন। সম্রাট-প্রাসাদ আলোকমালায় পূর্ণ হইল। পুরাভ্যন্তরে ও বহির্দ্দেশে অগণ্য আলোক প্রজ্বলিত হইল।

কামিনী-কুল-শিরোমণি পৃথ্বিরাজ-প্রণয়িনী যোধবাই, প্রধান বেগমের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় একজন প্রৌঢ়বয়স্কা সম্রাট্-পুর-পরিচারিকা আসিয়া কহিল,—

"আপনার শিবিকা পূর্ব্ব দিকের প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করিতেছে।

দাসী চলিয়া গেল। পৃথ্বিরাজমহিষী পূর্ব্বদিকের এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে তিন চারি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিলেন,

কিন্তু বাহিরে যাইবার কোনই সুযোগ দেখিলেন না। ভাবিলেন, আর দুই, একটা প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিলেই হয় তো প্রাঙ্গণে উপস্থিত হওয়া যাইবে। এই ভাবিয়া যোধবাই অপর প্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিলেন। অন্য প্রকোষ্ঠের ন্যায় তথায় অধিক আলোক জ্বলিতেছে না; একটিমাত্র ক্ষীণালোক লম্বিত রহিয়াছে। প্রকোষ্ঠের অন্য দ্বারাদি রুদ্ধ। যোধবাই ভাবিলেন, এইটিই শেষ প্রকোষ্ঠ, এই জন্য দ্বারাদি রুদ্ধ রহিয়াছে। এই ভাবিয়া, পূর্ব্ব দিকের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করিয়া, পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। যেমন যোধবাই প্রবেশ করিলেন, অমনই তাঁহার পশ্চাদ্দিকের উন্মুক্ত দ্বার অপরদিক হইতে রুদ্ধ হইয়া গেল। এতক্ষণে সুন্দরী শঙ্কিতা হইলেন। ভাবিলেন, কোথায় আসিলাম? কে দ্বার রোধ করিল? অধিকাংশ রমণী পশ্চিমদিকে গেল; পরিচারিকা আমাকেই পূর্ব্বদিকে আসিতে বলিল কেন? পশ্চাৎ হইতে দ্বার রুদ্ধ হইল; সুতরাং নিশ্চয়ই আমার পশ্চাতে লোক আছে। তবে কি আমার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত হইয়াছে? তিনি সভয়ে কটিদেশে হস্তার্পণ করিলেন। দেখিলেন তথায় চন্দ্রহাস আছে! ভাবিলেন, 'তবে কিসের ভয়? সঙ্গে অস্ত্র থাকিলে রাজপুতমহিলা শমনকেও ডরে না।' তিনি অধোবদনে নিষ্কৃতির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, এমন সময় অলক্ষিত ভাবে এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিল,—

"সুন্দরি! কি ভাবিতেছ?"

যোধবাই সভয়ে এই পরস্ত্রী স্পর্শকারী মূঢ়ের বদন প্রতি চাহিলেন। সবিস্ময়ে দেখিলেন, সে ব্যক্তি বাদশাহ আকবর। এই বরীয়ান, ভুবন-বিখ্যাত, যশস্বী, ন্যায়বান নৃপতির এতাদৃশ অবৈধ ব্যবহার দর্শনে বুদ্ধিমতী যোধবাইয়ের অন্তরে যাদৃশ বিস্ময়ের উদয় হইল, পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় বা তদ্বৎ প্রাকৃতিক নিয়মের বিপর্য্যয় দেখিলেও তাঁহার চিত্তে তদধিক বিস্ময় জন্মিত না। যোধবাই কিয়ৎকাল সংজ্ঞাশূন্য হইয়া রহিলেন। বাদশাহ আকবরের বুদ্ধি জগদ্বিখ্যাত তিনি, সুন্দরীকে তদবস্থাপন্না দেখিয়া, তাঁহার তৎকালীন মনের ভাব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া কহিলেন,—

"সুন্দরি! তুমি বিস্মিত হইতেছ? বিস্ময়ের কোনই কারণ নাই। প্রেমের এই ধর্ম্ম। আমি তোমার জন্য কত কষ্টই না স্বীকার করিয়াছি। কত কৌশল করিয়া তোমাকে এই পথে আনাইয়াছি। অন্ত ভবনের এই ভাগ—"

বাদশাহের কথা শেষ হইতে না হইতে, যোধবাই সজোরে বাদশাহের মুষ্টিমধ্যস্থ স্বীয় হস্ত আকর্ষণ করিয়া লইলেন। হস্তোন্মোচন কালে তিনি এতাদৃশ বল-প্রয়োগ করিলেন যে, বীরবর আকবর তাহার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, পতনোন্মুখ হইলেন। যোধবাইয়ের বদনে ঘৃণা, ক্রোধ ও লজ্জার চিহ্ন প্রকটিত হইল। তিনি ওড়নার দ্বারা স্বীয় বদনাবৃত করিলেন। নির্লজ্জ আকবর আবার কহিলেন,—

"ললনে! আমার প্রতি বিমুখ হইও না। আমাকে দাস বিবেচনা করিয়া, আমার প্রতি করুণনেত্রে অবলোকন কর।"

লেখনি! তুমি চূর্ণ হইয়া যাও, মস্যাধারে মসী শুষ্ক হইয়া যাউক, কাগজ! ভস্মীভূত হও। তোমাদের আর প্রয়োজন নাই। তোমরা অতল জলে নিমজ্জিত হও। যাঁহার চরিত্র তুষার অপেক্ষাও নির্ম্মল বলিয়া জানি-

তাম, পুণ্যাত্মা জ্ঞানে যাঁহার নাম ভক্তির সহিত স্মরণ করিতাম, তাঁহার এই চরিত্র। তবে আর কাহাকে বিশ্বাস করিব? আর কাহাকে সৎ বলিয়া উল্লেখ করিব? বুঝিলাম মানবজাতি উচ্চ চরিত্রের আদর্শ নহে; এতদ্দেশে তাহাদের সৃষ্টি হয় নাই। এ সকল স্মরণেও লেখনীসহ হস্ত বিকম্পিত হয়। ইচ্ছা হয়, আর লিখিয়া কাজ নাই; যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বিধ্বংসিত হইয়া, তাঁহার ভূত কলেবর ভূতের সহিত বিমিশ্রিত করুক।

যোধবাই কথা না কহিয়া, পশ্চাদ্দিকে দুইপদ সরিয়া গেলেন। ইন্দ্রিয়-চপল আকবর, সুন্দরীর সন্নিহিত হইয়া আবার কহিলেন,—

"সুন্দরি! তুমি আমার প্রাণেশ্বরী। আমাকে উপেক্ষা করিও না। আমি তোমাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসি।"

বাদশাহ পুনরায় যোধবাইয়ের হস্ত ধারণ করিলেন। যোধবাইয়ের পবিত্র দেহ ক্রোধে কম্পিত হইয়া উঠিল। তাঁহার পবিত্র আত্মার পবিত্র ভাব নয়নে পরিস্ফুট হইল। তাঁহার পরম সুন্দর বদন আরক্তিম বর্ণ ধারণ করিল। স্বাভাবিক অনুপম সৌন্দর্য্য আরও সংবর্দ্ধিত হইল। এই সময় আকবর একবার যোধবাইয়ের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া, তাঁহার বদন শোভা দেখিতে পাইলে, হয়ত চিরকালের নিমিত্ত চৈতন্য হারাইতেন। আবার যোধবাই সজোরে বাদশাহের মুষ্টি হইতে স্বীয় হস্ত ছাড়াইয়া লইলেন, এবং ক্রোধোত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—

"নরাধম! স্বীয় পদ-মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়াছ? যাও, এখনও বলিতেছি, সহজে প্রস্থান কর, নচেৎ বিপদ ঘটিবে!"

আকবর হাসিয়া বলিলেন,—

"কেন আমার প্রতি নির্দ্দয় হইতেছ? বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি কিসে প্রণয়ের অযোগ্য?"

যোধবাই ক্রোধ সংবরণ করিয়া কহিলেন,—

"বাদশাহ! ছিঃ ছিঃ! আপনার ন্যায় মহোচ্চ ব্যক্তির মুখে এরূপ কথা শুনিয়া আমারই ঘোর লজ্জা হইতেছে; আপনার আরও অধিক লজ্জা হওয়া উচিত! বুদ্ধির দোষে দৈবাৎ আপনার এরূপ জঘন্য মনোবৃত্তি জন্মিয়া থাকিবে। যাহা হইয়াছে তাহার আর হাত নাই। আপনি এখনও প্রস্থান করুন। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনার গ্লানিসূচক কোন কথা কাহাকেও জানিতে দিব না।"

বাদশাহ ভাবিলেন, যোধবাইয়ের চিত্ত কিয়ৎ পরিমাণে কোমল হইয়াছে। হাসিয়া কহিলেন,—

"প্রাণেশ্বরি!"

যোধবাই বাধা দিয়া কহিলেন—"আবার ঐ কথা? নিশ্চয়ই বুঝিতেছি, তোমার বিপদ নিকটস্থ।"

আবার বাদশাহ হাসিয়া কহিলেন,—ঘোর ক্ষুধা—উপাদেয় আহার্য্য সম্মুখে—অথচ ভোজনে বঞ্চিত। তদপেক্ষা অধিক বিপদ আর কি হইতে পারে।"

যোধবাই অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া ক্রোধ-কষায়িত লোচনে কহিলেন,—

"পামর! এখনও বোধের উদয় হইল না। এখনও পদ-মর্য্যাদা স্মরণ করিয়া সাবধান হও!"

বাদশাহ এ কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। তিনি অল্পে অল্পে সুন্দরীর সমীপস্থ হইয়া, তাঁহার সম্মুখে জানুপাতিয়া বসিলেন এবং কহিলেন,—

"সুন্দরি! কেন আমাকে এত ভৎ'সনা করিতেছ? কেন আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতেছ না? তোমাকে আমি অন্তরের সহিত ভাল বাসি, আমি তোমার দাসানুদাস। আমাদের এ গুপ্তপ্রণয় কেহ জানিতে পারিবে না। কাহার সাধ্য এ কথার উল্লেখ করে।"

যোধবাই মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। আকবর আবার কহিলেন,—

"সুন্দরি! ধন বল, রত্ন বল, সম্পত্তি বল আমার কিছুরই অভাব নাই। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই, তুমি আমার প্রতি কৃপা কর।"

ক্রোধবিকম্পিত স্বরে যোধবাই কহিলেন,-

"নরপ্রেত! তুমি আমাকে লোভ দেখাইতেছ? ভাবিয়াছ আমি সম্পত্তি লোভে তোমার ঘৃণিত প্রস্তাবে কর্ণপাত করিব? ধিক্ তোমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে। সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্যের সহিত সতীত্বের বিনিময় হইতে পারে না; তুমি এ মহৎ তত্ত্ব কিরূপে বুঝিবে? তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, আমার পথ ছাড়িয়া দেও, আমি চলিয়া যাই।"

বাদশাহ বুঝিলেন, সহজে কার্য্যসিদ্ধ হইবে না; ভয় প্রদর্শন আবশ্যক। এই ভাবিয়া কহিলেন,—

"এতক্ষণে দয়া করিয়া তোমার নিকট সম্মতি প্রার্থনা করিলাম; বুঝিলাম তোমার সহিত সদ্ব্যবহার অরণ্যে রোদন। জান আমি কে? আমি মনে করিলে কি না করিতে পারি?"

যোধবাই তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—

"আমি জানি তুমি মানবাকারধারী পশু। তুমি মনে করিলে অনেকের অনেক অনিষ্ট করিতে পার সত্য, কিন্তু ইহা তুমি জানিও যে, তোমার ন্যায় শত বাদশাহ একত্রিত হইলেও যোধবাইয়ের সতীত্বের বিনাশ করিতে পারে না। তোমাকে আবার বলিতেছি, আমাকে পথ ছাড়িয়া দেও, আমি প্রস্থান করি।"

আকবর সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি সুন্দরীর নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত বাহু প্রসারণ করিয়া কহিলেন,—

"চতুরে! আর নিস্তার নাই; কোথায় প্রস্থান করিবে? এখানে কে সাহায্য করিবে? তোমার গর্ব্ব ভাঙ্গিতে পারি কি না দেখ।"

যোধবাই ঈষৎ সরিয়া আকবরের অপবিত্র আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন, এবং ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া মনে মনে কহিলেন,—

"মাতঃ ভবানি! দাসীকে আত্মরক্ষণে সমর্থ কর।"

তাহার পর নিমেষ মধ্যে পরিচ্ছদাভ্যন্তর হইতে চন্দ্রহাস বাহির করিলেন। প্রজ্বলিত আলোক রশ্মি সমুজ্জ্বল-অস্ত্রে প্রতিভাত হইয়া ঝলসিতে লাগিল। দর্শন মাত্র আকবর স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। যোধবাই দক্ষিণ হস্তে চন্দ্রহাস উন্নত করিয়া কহিলেন,—

"দুরাচার! আর এক পদ অগ্রসর হইলেই অদ্যকার দিন তোমার জীবনের শেষ দিন হইবে। যাও আমি তোমাকে ক্ষমা করিতেছি; বিনা বাক্য-ব্যয়ে এস্থান হইতে দূর হইয়া যাও!"

আকবর জ্ঞানহীনের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। বুঝিলেন, এ ব্যাপারে যখন অস্ত্রের আবির্ভাব হইল, তখন ইহার পরিণাম শুভ হইতে পারে না। অতএব ইহার এই স্থানেই উপসংহার হওয়া বিধেয়। আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখা আবশ্যক ভাবিয়া, ধীরে ধীরে বাদশাহ কহিলেন,—

"সুন্দরি!"

বাক্য বাদশাহের বদন বিনির্গত হইবামাত্র যোধবাই অগ্রসর হইয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—

"তোমার, অথবা আমার অথবা উভয়েরই আয়ুকাল অন্ত পূর্ণ হইয়াছে। আইস, মূঢ়, অস্ত্রাগ্রে তোমায় আশার শেষ দেখাইয়া দি।"

আকবর, উত্তোলিত অস্ত্রের আঘাত হইতে নিষ্কৃতি লাভার্থ, পিছাইয়া গেলেন। ভাবিয়া দেখিলেন, বাসনা সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বিরল। এখনও ক্ষান্ত না হইলে, যে পক্ষেরই হউক, একটা বিপদ ঘটিতে পারে। বুদ্ধিমান্ আকবর এই সিদ্ধান্ত করিয়া ক্ষান্ত হওয়াই স্থির করিলেন। যাইবার সময় একটা কথা বলিয়া যাইব ভাবিয়া, একবার মুখ তুলিলেন। কিন্তু যোধবাইয়ের নয়নের প্রদীপ্ত ও গম্ভীর ভাব লক্ষ্য করিয়া, কিছুই বলিতে সাহস করিলেন না। অবশেষে ধীরে ধীরে, পশ্চাদ্দিকে যোধবাইয়ের প্রতি সোৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে, দ্বার উন্মোচন করিয়া, ভগ্নমনোরথ আকবর, অপমানিত চোরের ন্যায়, পলায়ন করিলেন।

জীবনে তিনি কখন কাহারও সমীপে এ ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। এই ব্যাপারে রাজপুত মহিলামণ্ডলীর প্রতি তাঁহার ভক্তি ও শ্রদ্ধা অমিত পরিমাণে সংবর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিল। এইরূপ স্থলই আকবর চরিত্রের উদারতা ও শ্রেষ্ঠতার পরিচায়ক।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

সমর-সঙ্গিনী।

দিবসত্রয় মধ্যে শৈলম্বররাজ তিন সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। সেই সকল সৈন্য সঙ্গে লইয়া সম্প্রতি অমরসিংহ কমলময় যাইবেন স্থির হইল; পরে আরও যত সৈন্য সংগৃহীত হইতে পারে তত্তাবৎ সঙ্গে লইয়া স্বয়ং শৈলম্বররাজ মহারাণার পতাকা-নিম্নে উপস্থিত হইবেন কথা হইল।

সন্ধ্যার সময়ে কুমার অমরসিংহ শৈলম্বররাজ-প্রাসাদের একতম প্রকোষ্ঠে বসিয়া, অদৃষ্টের পরিণাম বিষয়ক দুজ্ঞেয় চিন্তায় নিবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে কুমারী উর্ম্মিলা সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পদাশ্রিত নূপুরশিঞ্জনে অমরসিংহের চিন্তাস্রোত ভাঙ্গিয়া গেল। উর্ম্মিলা জিজ্ঞাসিলেন,—

"যুবরাজ! তুমি—অ্যাঁ—আপনি কি কল্যই কমলময় যাইবেন?"

যুবরাজ কহিলেন,—

"কুমারি! তুমি আমাকে আত্মীয়বৎ সম্ভাষণ করিতে করিতে নিরস্ত হইলে কেন? তুমি আমার সহিত সমান ভাবে কথা না কহিলে, আমি তোমার প্রশ্নের কোনই উত্তর দিব না।"

লজ্জাসহকৃত হাস্যসহকারে উর্ম্মিলা কহিলেন,—

"আপনার সহিত আত্মীয়তায় লাভ কি? আপনি যেরূপ কার্য্য-সাগরে মগ্ন, তাহাতে যেই নয়নান্তরালে যাইবেন, সেই হয়তো সমস্তই ভুলিবেন।"

অমরসিংহ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"যাহার অসি শত বীরবধে পরাঙ্মুখ নহে, যাহার সাহসের তুলনা নাই, তাঁহার এ আশঙ্কা শোভা পায় না। কুমারি! তোমার কথা শুনিয়া আমার হাসি পাইতেছে।"

কুমারী বলিলেন,—

"অসির ক্ষমতা দেহের উপর, হৃদয়ের উপর তাহার কখনই অধিকার নাই। যাহার হৃদয় মাতিয়া উঠে, তাহাকে কাহার সাধ্য নিরস্ত করে? যুবরাজ! কে জানে আপনার হৃদয় আমার অসমক্ষে গিয়া কি ভাব ধারণ করিবে?'

অমরসিংহ বলিলেন,—

"আমার তো হৃদয় নাই।"

কুমারী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"তবে এ সমরায়োজন কেন? যে বীরের হৃদয় নাই, সে কখন দেশের উপকার করিতে পারে না। যুবরাজ! তবে আর কমলমর গিয়া কি হইবে? আপনি নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করুন। হৃদয়হীন ব্যক্তির দ্বারা দেশের কোনই উপকার সম্ভাবিত নহে।"

"তোমার কথা যথার্থ; কিন্তু আমার যে হৃদয় ছিল না, অথবা এখনও নাই, এমন নহে। তবে আমার সে হৃদয়ের উপর আমার এখন কোনই আধিপত্য নাই।"

"একি কথা রাজপুত্র?"

"কথা মিথ্যা নহে। যে সুন্দরীর মধুমাখা কথা শুনিতে শুনিতে এখনও আমি জগৎসংসার সকলই ভুলিতেছি, আমার এ ক্ষুদ্র হৃদয় সম্পূর্ণরূপে সেই ভুবনমোহিনীর বাসনা ও আজ্ঞার অধীন হইয়াছে, সুতরাং এ হৃদয় আর আমার নহে।"

উর্ম্মিলা মস্তক অবনত করিলেন।

অমরসিংহ ধীরে ধীরে নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

উর্ম্মিলে! কল্যই কমলমর যাইব স্থির করিয়াছি, তুমি কি বল?"

কুমারী নীরবে রহিলেন; যুবরাজ পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—

"যাওয়ায় কি তোমার আপত্তি আছে?"

উর্ম্মিলা দীর্ঘ নিশ্বাস সহ বলিলেন,—

"না! আজি কালি আমাদের যেরূপ সময় তাহাতে এক মুহূর্ত্তও অন্য মন করা বিধেয় নহে। আমাদের রাজ্য নাই, ধন নাই; আমাদের গৃহ নাই, ভক্ষ্য নাই, আশ্রয় নাই; আমাদের দ্বারে প্রবল শত্রু উপস্থিত, এ সময় আমাদের হাসি ভাল দেখায় না। কে জানে, যুবরাজ, কখন যবন উদয়পুর আক্রমণ করিবে। এ দারুণ সময়ে আমাদের অন্য চিন্তার অবসর থাকা অনুচিত।"

কুমার অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—

"কর্ত্তব্যসাধনে ভ্রমেও কাতর হইব না, ইহা স্থির। কিন্তু কতদিনে যে এ যুদ্ধ-বিগ্রহের শান্তি হইবে তাহার স্থির কি? আমাদের অদৃষ্টে কি আছে, তাহাই বা কে জানে? যাহাই হউক, উর্ম্মিলে! আমার হৃদয় অধুনা দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়াছে। তোমার সাহস, স্বদেশানুরাগ ও তেজ আমার স্বাভাবিক উৎসাহকে শতগুণে সংবর্দ্ধিত করিয়াছে। যখন রণ-সাগরে নিমগ্ন থাকিব এবং যখন আমার খরধার অসির আঘাতে রাশি রাশি যবন-মুণ্ড বৃন্ত-চ্যুত ফলের ন্যায় ভূপতিত হইবে ও তাহাদের কণ্ঠ-নিঃসৃত রুধির-ধারা উৎসের ন্যায় আমার পদনিম্নে পড়িয়া আমাকে অতুলানন্দে ভাসাইবে, তখন তোমার এই জগন্মোহিনী মূর্ত্তি ইষ্টদেবীর ন্যায় আমার হৃদয়-বেদীতে

আবির্ভূতা হইয়া, আমাকে অধিকতর উৎসাহ প্রদান করিবে। যখন দুরন্ত যবনের অপবিত্র খড়্গ, আমার মস্তকোপরে মস্তকোর্দ্ধে উত্থিত হইয়া, আমাকে জীবনবিহীন করিতে চেষ্টা করিবে, তখন ঊর্ম্মিলে, তোমার এই নিরুপম মূর্ত্তি আমাকে ইষ্টকবচের ন্যায় সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবে।"

ঊর্ম্মিলা বাধা দিয়া বলিলেন,—

"আর, যুবরাজ! যখন যবন যুদ্ধে আপনি ঘোর ক্লান্ত হইয়া সহায়তার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, তখন কি এ দাসী আপনার শ্রীচরণে বাস্তবিকই উপস্থিত থাকিবে না? তখন কি এ হতভাগিনী আপনার হস্তভ্রষ্ট অসি, স্থানভ্রষ্ট তূণ, বিচ্ছিন্ন কবচ, যথাস্থানে পরিস্থাপিত করিবে না? এ অভাগিনী কি তৎকালে সমীপে থাকিয়া আপনার অমোঘ পরাক্রম নিহত যবনের সংখ্যা একটীও বাড়াইবে না?"

সবিস্ময়ে অমর কহিলেন,—

"ঘোর যবনযুদ্ধে, তুমি আমার সহায়তা করিবে? ধন্য তোমার সাহস!"

ঊর্ম্মিলা অশ্রুজলপূর্ণলোচনে কহিলেন,—

"কি যুবরাজ! আমি যখন সংগ্রামে যাইব না? গৃহে বসিয়া সুখ পর্য্যঙ্কে শয়ান থাকিয়া আপনার বিপদ সমস্ত কল্পনার চক্ষে দেখিব, তথাপি স্বয়ং তাহার প্রতিবিধানার্থ দেহের এক বিন্দুও রক্তপাত করিব না, এ কি কথা কুমার?"

অমরসিংহ বলিলেন,—

ঊর্ম্মিলে! আমি অনুরোধ করিতেছি, এ ভয়ানক বাসনা পরিত্যাগ কর।"

"ঊর্ম্মিলা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই একজন পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, শৈলম্বররাজ কুমারকে স্মরণ করিতেছেন। কুমারকে অগত্যা প্রস্থান করিতে হইল। তাঁহাকে যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ কুমারী অতৃপ্তনয়নে সেই স্কন্ধারি সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিলেন। তিনি অদৃশ্য হইলে কহিলেন,—

"এ অনন্ত সুখের তুলনা নাই। এ সুখের গতি কি অব্যাহত থাকা সম্ভব? জগতে কে কবে অবিশ্রান্ত সুখ সম্ভোগ করিয়াছে? যে রাজবারার কল্যাণ-কামনায় আমি অসীম সুখরাশি বিসর্জ্জন দিতেছি, কে জানে, সে রাজবারার কি হইবে? কে যেন আমাকে বলিতেছে, রাজবারার মুক্তি দূর—দূর—অসম্ভব। কি এ পুণ্যভূমির মুক্তি অসম্ভব? কে জানে, ভবানীর হৃদয়ে কি আছে? কিন্তু আশা কে কবে ত্যাগ করিতে পারিয়াছে? আমরাই বা কেন আশা শূন্য হইব? কেন ভগ্নোৎসাহ হইব?" জাতীয় প্রেমোন্মাদিনী বালিকা সেই স্থানে বসিয়া এইরূপ ভাবনায় নিবিষ্টা রহিলেন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

প্রতাপসিংহ উপন্যাস পুস্তকাকারে প্রচারিত হইল। ইহা প্রথমে সুপ্রতিষ্ঠিত "বান্ধব" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। "বান্ধবে" বর্ত্তমান উপন্যাসের যে পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়, মনে করিয়াছিলাম, সেই স্থলেই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করিয়া দিব। কিন্তু পুস্তকাকারে মুদ্রণ-কালে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, সেই স্থলে গ্রন্থের অবসান হইলে, যে ঐতিহাসিক ব্যাপার বর্ত্তমান গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়, পাঠকের সমক্ষে তাহার পূর্ণচিত্র উপস্থাপিত করা হয় না এবং প্রাসঙ্গিক উপন্যাসও নানারূপে অঙ্গহীন থাকিয়া যায়। এই সকল ত্রুটি পরিহার করিবার অভিপ্রায়ে, "বান্ধবে" প্রকাশিত অংশের পর, অধুনা আরও কয়েকটি পরিচ্ছেদ সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইল।

যে মহাত্মার মহান্ চরিত্র অবলম্বনে বর্ত্তমান উপন্যাস লিখিত, তাঁহার জীবনী ও কার্য্য-কলাপ যেরূপ অমানুষী ব্যাপার-সমূহে পরিপূর্ণ, তাহার যথোপযুক্ত বর্ণনা করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। আমার দ্বারা তাহা যে কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সিদ্ধ হইয়াছে, এরূপ প্রগল্ভ-বিশ্বাসকে আমি ভ্রমেও মনে স্থান দিই না।

গ্রন্থে প্রসঙ্গতঃ নানা ঐতিহাসিক ব্যাপারের অবতারণা করা হইয়াছে এবং তৎসমস্তের সমবায়ে ইহা উপন্যাস না হইয়া অনেক স্থলেই ঐতিহাসিক-গ্রন্থ-রূপে পরিণত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ উপন্যাস-পাঠকের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইবে কি না, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। বলা বাহুল্য, ভারত-হিতৈষী মহাত্মা টডপ্রণীত রাজস্থান নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থই আমার প্রধান অবলম্বন। কলিকাতা বৈশাখ ১৩০১।

শ্রীদামোদর দেবশর্ম্মা।

উৎসর্গ পত্র।

৺রামকুমার বিদ্যালঙ্কার

পিতামহ-দেবের

স্বর্গীয় চরণোদ্দেশে

এই গ্রন্থ

ভক্তিময়ী স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপে

গ্রন্থকার কর্তৃক

সমর্পিত

হইল।

প্রতাপসিংহ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শত্রু না মিত্র ?

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর সময়ে মিবারের অন্তর্গত উদয়পুর নগর-সন্নিহিত শৈল-শিরে এক জন অশ্বারোহী যুবক ভ্রমণ করিতেছেন দৃষ্ট হইল। সে স্থান, তৎকালে যার পর-নাই ভয়-সঙ্কুল হইলেও, নিতান্ত অপ্রীতিকর নহে। চতুর্দ্দিকে অর্ব্বলী-শৈল-মালা, মেঘের পর মেঘ, তৎপরে আবার মেঘ—এবংবিধ পরম্পরাগত মেঘমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী, শৈলাঙ্গ বিধৌত করিয়া, কুলু কুলু শব্দে প্রধাবিত হইতেছে। কোথাও বা একটী প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ সুবিস্তৃত শাখা-প্রশাখা সহ দণ্ডায়মান আছে; দূর হইতে তাহাও যেন পর্ব্বত-চূড়া বলিয়া ভ্রম হইতেছে। স্থানে স্থানে দুর্ভেদ্য অরণ্য। বৃক্ষপত্রের শাঁ শাঁ শব্দ, নির্ঝরিণীর কুলু কুলু ধ্বনি, ঝিল্লীর অবিশ্রান্ত চীৎকার, অশ্বপদাঘাত জনিত অত্যুচ্চ শব্দ, দলিত শুষ্কপত্রের মর্ম্মর ধ্বনি প্রভৃতি সমবেত হইয়া তথায় যুগপৎ ভীতি ও সমুৎপাদন করিতেছে।

অন্ধকারে সমস্ত সমাচ্ছন্ন। কৃষ্ণ প্রস্তরময় পর্ব্বত, ঘনারণ্য ও রজনীর অন্ধকার, এই তিন একত্রিত হওয়ায়, সেস্থান এতাদৃশ তমসাচ্ছন্ন হইয়াছে যে, সন্নিহিত পদার্থও লক্ষ্য হওয়া অসম্ভব।

অশ্বারোহীর বেশ রাজপুত যোদ্ধার । তাঁহার মূর্ত্তি বীরত্বব্যঞ্জক। দুর্ভেদ্য অরণ্য, দুর্গম গিরি, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নির্ঝরিণী পদে পদে অশ্বারোহীর গতিরোধ করিতে লাগিল; কিন্তু মিবারের প্রত্যেক স্থানই যেন অশ্বারোহী ও তাঁহার সুশিক্ষিত অশ্বের সুপরিচিত। তিনি সেই সমস্ত ভয়াবহ স্থান, নিতান্ত নির্ভীকের ন্যায়, অতিক্রম করিতে লাগিলেন। সহসা একটী তীর শন্ শন্ শব্দে তাঁহার কর্ণের নিকট দিয়া চলিয়া গেল। তিনি অশ্ববল্গা সংযত করিলেন; অশ্ব কর্ণ উচ্চ করিল। তৎক্ষণাৎ আর একটি তীর তাঁহার কবচে লাগিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। অশ্বারোহী বুঝিলেন, শত্রু অতি নিকট। দূরে অশ্ব-পদ-ধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল; অনতিবিলম্বে অপর এক অশ্বারোহী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে প্রচণ্ড বর্শাঘাতে রাজপুত যোদ্ধার বাম হস্ত বিদ্ধ করিল। তখন রাজপুত বীর কহিলেন,—"যদি তুমি মিবারের মিত্র হও, তবে আমার বধ-চেষ্টা ত্যাগ কর,—আমার সহিত তোমার শত্রুতা হইতে

পারে না। আর যদি তুমি মিবারের শত্রু হও, তবে আইস,—অমরসিংহের হস্ত হইতে তোমার কদাচ নিস্তার নাই।”

আক্রমণকারী, উত্তর না দিয়া অসির দ্বারা, রাজপুতকে আঘাত করিল। অমরসিংহ বিদ্যুদ্বেগে অসি নিষ্কোষিত করিয়া বিপক্ষকে বেগে আঘাত করিলেন। অন্ধকারে লক্ষ্য স্থির হইল না, উভয়েরই আক্রমণ ব্যর্থ হইতে লাগিল, অবশেষে অমরসিংহের জয় হইল; তিনি স্বীয় বর্শা বিপক্ষের বক্ষোমধ্যে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিলেন। সে চীৎকার সহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

অমরসিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া হস্ত দ্বারা মৃতের পরিচ্ছদ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন এবং বুঝিলেন যে, সে ব্যক্তি যবন। কহিলেন, “দুরাত্মন্! যত দিন যাবতীয় যবন এই দশা না পাইতেছে, ততদিন ভারতের উন্নতির আশা নাই।

এই বলিয়া তিনি পুনরায় অশ্বারোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। অমরসিংহ এতক্ষণ নিতান্ত অন্যমনস্ক ছিলেন; সুতরাং বাম হস্তে যে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। এক্ষণে আঘাত-জনিত যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল; এবং বুঝিতে পারিলেন যে, ক্ষত-মুখ হইতে দরদরিত ধারায় রুধির প্রবাহিত হইতেছে। অশ্বে কষাঘাত করিলেন। বেগগামী অশ্ব দ্রুতগতি চলিতে চলিতে একটি নদী-তীরে উপস্থিত হইল। অমরসিংহ দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং নদী-জলে বস্ত্র ভিজাইয়া তদ্দ্বারা ক্ষতস্থান বদ্ধ করিলেন। পরে হস্ত-পদাদি ধৌত করিয়া, তীরস্থিত এক খণ্ড সুবিস্তৃত উপল-পৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন এবং রাত্রি-শেষে প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

শোভাময়ী জ্যোৎস্না তখন বিশ্বের স্বতন্ত্র-বিধ রমণীয়তা সংবিধান করিয়াছে। রাত্রি তিন প্রহর, প্রকৃতি নিস্তব্ধ, প্রশান্ত, ঘোর, অলস। সম্মুখে ক্ষুদ্র বুনাস্ নদী নীরবে স্বীয় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছে; পার্শ্বে ও পশ্চাতে অর্বলীমালা উন্নতমস্তকে বসুধা পরিদর্শন করিতেছে; অদূরে নাথদ্বার নগরের সৌধ-চূড়া, মন্দির-ধ্বজা প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হইতেছে। সকলই নিস্তব্ধ, সকলই শান্ত আকাশে চন্দ্র তারা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে। চন্দ্র-কিরণ নদী-নীরে, গিরি-চূড়ায়, সৌধ-শিখরে প্রতিবিম্বিত হইয়া জ্বলন্তবৎ প্রতীত হইতেছে। এইরূপ সময়ে অমরসিংহ নাথদ্বার নগর-সন্নিধানে বুনাস্ নদী-তীরে পাষাণ-খণ্ডে উপবেশন করিয়া, ভূত-ভবিষ্যৎ-ভাবনায় বিনিবিষ্ট হইলেন।

রাত্রি আরও এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইল উষার স্বভাব-শীতল বায়ু, নদী-নীর সংস্পর্শ-হেতু সমধিক শীতল হইয়া, অমরসিংহের গাত্র স্পর্শ করিতে লাগিল। তিনি সেই শিলাখণ্ডের উপর নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রভু-ভক্ত অশ্ব সন্নিহিত প্রান্তরে স্বীয় আহার্য্য অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রণ-রঙ্গিণী।

ঘোর পরিশ্রম-জনিত ক্লেশে অমরসিংহ গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন হইলেন। দেখিতে দেখিতে

পূর্ব্বকাশের নিম্নভাগে সূর্য্যদেবের প্রতিবিম্ব প্রকটিত হইল। প্রাতঃকাল সমুপস্থিত-প্রায়। এমন সময়ে সহসা অমরসিংহ জাগরিত হইলেন। তিনি নিদ্রাভঙ্গ সহকারে দেখিলেন—চমৎকার!—একটি পরমা সুন্দরী কিশোরী কামিনী, কোন লতিকাগ্র স্বীয় সুকোমল হস্তে দলিত করিয়া, তাহার রস তাঁহার ক্ষত-মুখে ধীরে ধীরে প্রদান করিতেছেন। অমরসিংহ বিস্মিত অবাক্ এবং মোহিত! আরও বিস্ময়ের কারণ কিশোরীর যোদ্ধৃবেশ! সুন্দরী, অমরসিংহের নিদ্রাভঙ্গ দেখিয়া, নিতান্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ সহকারে অবনত মস্তকে, দন্তে রসনা কাটিয়া, দুই পদ সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং কিয়ৎকাল পরে কহিলেন,—

রাজপুত্র! আপনি আমার ব্যবহারে চমৎকৃত হইতেছেন? বীরের সেবা করা আমার স্বভাব;—আপনি রাজপুত-কুলের ভূষণ, রাজপুতজাতির লুপ্তপ্রায় আশার আধার।"

রাজপুত্র অমরসিংহ আরও চমৎকৃত হইলেন। রমণীর পরমরমণীয় সৌন্দর্য্য, বাক্য-কথন সময়ে তাঁহার মনোহর ভাব, এবং কামিনীর [illegible] চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কমনীয়া কামিনীর মুখে এবংবিধ স্বজাতি-প্রিয়তা-সূচক কথা শ্রবণ করিয়া তিনি মোহিত হইলেন। তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইল। ভাবিলেন, কে বলে রাজপুত জাতির অধঃপতন হইয়াছে? সুন্দরী পুনরায় কহিলেন—

"যুবরাজ! আমি এক্ষণে প্রস্থান করি।"

যুবরাজ অমরসিংহ এতক্ষণ অবাক্ হইয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহার কথনোপযোগী ক্ষমতা হইল। তিনি কহিলেন,—"বীরসুন্দরি! আমি তোমার মোহিনী প্রকৃতি সন্দর্শনে বিমোহিত হইতেছি। আমি যদিও তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী নহি, তথাপি তোমার সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সাক্ষ্য দিতেছে যে, তুমি রাজবাবার কোন মহাবংশসম্ভূতা। তুমি কিরূপে রাত্রিশেষে এ বিজন প্রদেশে আসিলে?"

নবীনা লজ্জাসহ কহিলেন,—

"এরূপ বিজন প্রদেশে আমার আগমন অন্যায় বলিয়া কি যুবরাজ বিরক্ত হইতেছেন?"

অমরসিংহ ব্যস্ততাসহ কহিলেন,—

"না সুন্দরি, তাহা নহে। মনে করিও না যে, আমি ইহার উত্তর না পাইলে অসন্তুষ্ট হইব। উত্তর না দিলেও, তোমার ব্যবহারে যে অপার আনন্দ জন্মিয়াছে, তাহার কণিকাও অপচিত হইবে না"।

সুন্দরী কহিলেন,—

"রাজপুত্র! আপনি যাহা জিজ্ঞাসিলেন, তাহা ব্যক্ত করাই আমার উদ্দেশ্য। আপনি রাজপুত কুলপ্রদীপ—আপনি কাহারও নিকট অপরিচিত নহেন। কিন্তু আমি আপনার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিতা। প্রথম সাক্ষাতেই পুরুষের সহিত আলাপ করা কুল-কামিনীর পক্ষে ভাল কথা নহে।"

রাজপুত্র বাধা দিয়া বলিলেন,—

"সে আশঙ্কা করিও না। যাহার চিত্ত নিয়ত উচ্চচিন্তায় নিবিষ্ট, তাহার পক্ষে কিছুই দোষের কথা হইতে পারে না।"

কিশোরী ক্ষণকাল চিন্তার পর কহিলেন,—

"আপনার—পিশাচ-স্বভাব—পিতৃব্য,—যুবরাজ! বিরক্ত হইবেন না,—আপনার পিশাচ-স্বভাব পিতৃব্য শুক্তসিংহ আকবরের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি অধিকতর অনুগ্রহ-লাভ বাসনায় দুরাচার সম্রাট্-সমীপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, পঞ্চবিংশ দক্ষ সৈনিক সঙ্গে লইয়া মিবারের অরণ্য মধ্যে অবস্থান

করিবে এবং সুযোগমতে একে একে আপনাদিগকে বিনষ্ট করিবে।”

রাজপুত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। কহিলেন,—

“এ সকল সংবাদ তোমায় কে জানাইল?”

“শুনুন্ যুবরাজ! কল্য রাত্রিতে গ্রীষ্মাতিশয্য-হেতু, অট্টালিকার উপরে বসিয়া বায়ু সেবন করিতেছিলাম। দেখিতে পাইলাম, অর্দ্ধক্রোশ দূরবর্তী পর্ব্বতোপরি এক স্থানে আলোক জ্বলিতেছে। কৌতূহল সহ দেখিতে দেখিতে বোধ হইল, অগ্নিসমীপে কতকগুলি মনুষ্য বিচরণ করিতেছে। ভাবিলাম রাত্রি কাল, অরণ্যস্থল; শত্রু ভিন্ন অন্য কে তথায় ভ্রমণ করিবে? আমি অলক্ষিতভাবে গৃহনিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে সেই স্থানে উপনীত হইলাম। রাজপুত্র! আমাকে কুলকামিনী বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন না, রমণী দেহ অনর্থক বলিয়া মনে করিবেন না। আমি এই হস্তে ধনুর্ধারণ করিয়া শত শত্রুকে বিমুখ করিতে পারি, বর্শা-ফলক-সাহায্যে শত যবন বিনষ্ট করিতে পারি, অসির আঘাতে অনেক ম্লেচ্ছ নিপাত করিতে পারি। আর যুবরাজ! আর আমি অবিচলিত চিত্তে, শত্রু-বধ-নিরতা থাকিয়া, রণভূমে প্রাণত্যাগ করিতে পারি।”

বলিতে বলিতে বালিকার লোচনযুগল যেন বৰ্দ্ধিত হইল। রাজপুত্র আনন্দে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন—“এ রমণীর দ্বারা নিশ্চয়ই রাজবারা উপকৃত হইবে।” বীরবালা দক্ষিণ হস্ত বিস্তৃত করিয়া কহিতে লাগিলেন,—

“নিকটস্থ কোন স্থানই আমার অপরিচিত নহে। জ্ঞানোদয় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত অরণ্য ও গিরি-শিখরে আমি ইচ্ছামতে পরিভ্রমণ করিতে পাইয়াছি। সুতরাং উদ্দেশ্য স্থানে উপস্থিত হইতে আমার বিলম্ব হইল না। অন্তরাল হইতে শত্রুগণের সমস্ত কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিলাম। আমি একাকিনী, শত্রু পঞ্চবিংশ জন। ঘোর উৎকণ্ঠার সহিত কর্ত্তব্যচিন্তা করিতে লাগিলাম। এমন সময় অশ্ব-পদধ্বনি হওয়াতে সুক্তসিংহ এক সৈনিককে আজ্ঞা দিল, দেখিয়া আইস, অশ্বারোহী কে? সৈনিক বহুবিলম্বে আসিয়া কহিল,—“বোধ হয় অশ্বারোহী একজন যোদ্ধা। সে অশ্বারোহী আপনি। সুক্তসিংহের আজ্ঞাক্রমে একজন অশ্বারোহী, আপনাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত, ধাবমান হইল। আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম। তাহার পর যাহা ঘটিল তাহা রাজপুত্রের অগোচর নাই।”

রাজপুত্র কহিলেন,—

“তোমাকে কি বলিব, কি বলিয়া তোমার প্রশংসা করিব, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। যদি সাহস দেও, তাহা হইলে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।”

কিশোরী, অবনত মস্তকে ঈষৎ হাস্য সহকারে, কহিলেন,—

“যুবরাজ। আমার এতাদৃশ প্রগল্‌ভতাজনিত অপরাধের তিরস্কারের জন্যই কি আপনি এমন সম্ভাষণ করিতেছেন? আমি সাহস দিলে আপনি আমাকে কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, এতদপেক্ষা আমাকে তিরস্কার করিবার অধিকতর সদুপায় আর দেখিতেছি না।”

যুবরাজ কহিলেন,—

“সে কি কথা? তোমাকে তিরস্কার! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, তুমি পুরস্ত্রী; যবনবধে তোমার এত আনন্দ কেন?”

কিশোরী কিয়ৎকাল মস্তক অবনত করিয়া চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন,—

“যুবরাজ? যবনবধে আমার আনন্দ

কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? যবনবধে আমার আনন্দ হইবে না কেন? যাহারা মিবারের, যাহারা রাজপুতজাতির, যাহারা সমস্ত ভারতের প্রবল শত্রু, তাহারা কি আমার শত্রু নহে? রাজপুত্র! আমি কি মিবারের রাজপুতজাতির, ভারতের কেহই নহি? আমি পুরস্ত্রী বলিয়া অত্যাচারীর অত্যাচার কি আমার হৃদয়ে আঘাত করে না? আর যুবরাজ! পুরস্ত্রীরা কি মানব-সমাজের অংশিনী নহে? তাহাদের দেহ কি রক্ত-মাংসে গঠিত নহে? তবে তাহাদের শত্রু-নিপাতে প্রবৃত্তি হইবে না কেন? দেখুন যুবরাজ! আমরা মুসলমানজাতির কি অনিষ্ট করিয়াছি? ধন-ধান্য-সুখ-পূর্ণ ভারত কবে কাহার কি অনিষ্ট করিয়াছে? জগন্মান্য রাজপুত জাতি তাহাদের কি ক্ষতি করিয়াছে? তবে কেন দুরাচারেরা অনর্থক লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, আমাদের বিমল সুখ-সলিলে গরল ঢালিয়া দিতেছে? কেন তাহারা আমাদের সৌভাগ্য-শিরে অশনি-ক্ষেপ করিতেছে? যুবরাজ! কাহাদের দৌরাত্ম্যে এই মিবার জনশূন্য মরুভূমির ন্যায় হইয়াছে? কাহাদের দৌরাত্ম্যে অদ্য চিরসুখী রাজপুত-শিশু অন্নাভাবে আর্ত্তনাদ করিতেছে? কাহাদের ভয়ে জগদ্বিখ্যাত রাজপুতাঙ্গনাগণ পরম স্পৃহণীয় সতীত্বরত্ন সংরক্ষণার্থ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে? দুরাচার, ধর্ম্ম-জ্ঞান-হীন, যবন দস্যুরাই কি এই সমস্ত অশুভের মূল নহে? রাজপুত্র! সেই মহাশত্রুর বিনাশ-সাধনে আমার আনন্দ কেন জিজ্ঞাসিতেছেন?"

অমরসিংহ কিছু অপ্রতিভ হইলেন। ভাবিলেন, "হৃদয়ের এতাদৃশ উদারতা আমারও নাই, তথাপি এই কুমারী এখনও বালিকা বলিলেই হয়। না জানি, আর দুই চারি বৎসর পরে, আমার মত বয়স উপস্থিত হইলে, এই কামিনী কি অসাধারণ ক্ষমতাশালিনী হইবে। এত রূপ, এত গুণ একাধারে থাকিতে পারে তাহা আমি জানিতাম না।' প্রকাশ্যে কহিলেন,—

"রাজপুত-রমণী-কুল-কমলিনি! আমি তোমার কথা শুনিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছি। ভরসা করি যবন-যুদ্ধে তোমায় অগ্রণী দেখিব।"

রমণী করযোড়ে কহিলেন,—

"রাজপুত্রের আশীর্ব্বাদ।"

"অতঃপর কোথায় তোমার সাক্ষাৎ পাইব?"

সুন্দরী একটু ভাবনার পর বলিলেন,—

"সাক্ষাৎ—সাক্ষাতের কথা সময়ান্তরে বলিব।"

"তোমার নাম ও পরিচয় প্রকাশ করিতে আপত্তি আছে কি?"

রমণী যেন কিছু উৎকণ্ঠিতা হইলেন। বলিলেন,—"সন্নিহিত নাথদ্বার নগরে আমার পিত্রালয়। আর পরিচয়, উপযোগী সময় উপস্থিত হইলে বলিব।"

এমন সময়ে অদূরে অশ্ব-পদ-ধ্বনি শুনিয়া উভয়ে সোৎসুকে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমরসিংহ কহিলেন,—

"স্বর্গীয় জয়মল সিংহের পুত্র প্রিয় সুহৃৎ রতন সিংহ আসিতেছেন।"

তরুণী ব্যস্ততা সহ বলিলেন,—

"যুবরাজ! আমি প্রস্থান করি। এ উন্মাদিনীর প্রগল্‌ভতা ও অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

এই বলিতে বলিতে নবীনা প্রস্থান

করিলেন। অমরসিংহ সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অসি, না প্রেম ?

যখন রতনসিংহ তথায় উপস্থিত হইলেন, তখনও অমরসিংহ যে দিকে বীরনারী গমন করিয়াছেন, সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিলেন। রতনসিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অমরের সমীপস্থ হইলেন এবং তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন,—

"ভ্রাতঃ। যুদ্ধ-বিগ্রহ ত্যাগ করিয়া সম্প্রতি কি যুবতী-সন্দর্শন-সুখে পরিলিপ্ত হইলে ?"

অরমসিংহ লজ্জিত ভাবে কহিলেন,—

"তাহা কি তোমার বিশ্বাস হয় ? তুমি যাহাকে যুবতী মনে করিতেছ, সে একটী বালিকামাত্র। আইস, এই স্থানে উপবেশন করিয়া যে কাহিনী বলি, তাহা শ্রবণ কর ; শুনিলে তুমি বিস্ময়াবিষ্ট হইবে, এবং নির্নিমেষ-লোচনে ঐ কামিনীর পরিগৃহীত পন্থা অবলোকন করিবে, বা সমস্ত রাত্রি তাঁহারই আলোচনায় অতিবাহিত করিবে।"

রতনসিংহ সহাস্যে কহিলেন,—

"রহস্য থাউক—ব্যাপার কি বল দেখি।"

অমরসিংহ একে একে সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। রতনসিংহ সমস্ত অবগত হইয়া প্রত্যুত যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। উভয়ে বহুক্ষণ সেই সুন্দরীর বিষয় আলোচনা করিলেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

তখন রতনসিংহ কহিলেন,—

"এরূপ স্থানে আর অধিকক্ষণ থাকা বিহিত নহে। শুক্তসিংহ অন্তরালে থাকিয়া সর্ব্বদা আমাদের বিনাশসাধনে চেষ্টিত রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় অসাবধানে থাকা ভাল নয়। চল, এখান হইতে প্রস্থান করি।"

অমরসিংহ অশ্ব আনয়ন করিলেন এবং রতনসিংহকে কহিলেন, —

"তুমি এখন কোথা হইতে আসিতেছ, কোথায় বা যাইবে ?"

রতনসিংহ কহিলেন,—

"আমি কমলমীর হইতে আসিতেছি, সম্প্রতি রাজনগর যাইব। পূজ্যপাদ মহারাণার আজ্ঞা—রাজনগরের সামন্তকে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সত্বর যুদ্ধ সম্ভাবনা,—প্রতিক্ষণে বিপদ। সামন্তের সহিত এই সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিবার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে। তুমি যে কার্য্যে গিয়াছিলে তাহার কি হইল ?"

"সফল।"

"অনেক ভরসা হইল ”

উভয়ে অশ্বারোহণ করিলেন। অমরসিংহ বিদায় হইয়া অশ্বচালনা করিবেন, এমন সময় রতনসিংহ কহিলেন,—

"শুন অমর ! পথ শত্রু-সমাচ্ছন্ন। আমি বলি তুমি একাকী যাইও না। আইস, উভয়ে রাজনগর যাই—আবার এক সঙ্গে ফিরিব।"

অমরসিংহ হাসিয়া বলিলেন,—

"তোমার বুঝি ভয় লাগিয়াছে ?"

রতনসিংহ উত্তর না দিয়া স্বীয় অসি দেখা-

ইলেন। আর বাক্য ব্যয় না করিয়া উভয়ে স্বতন্ত্র দিকে প্রস্থান করিলেন।

এই অবকাশে এই যুবকদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা পাঠক মহাশয়দিগকে জানাইতে ইচ্ছা করি। অমরসিংহ মিবারের তদানীন্তন মহারাণা প্রতাপসিংহের পুত্র। তাঁহার বয়স অষ্টাদশ বর্ষের অধিক নহে। এই অল্প বয়সেই তিনি যোদ্ধৃত্ব, পাণ্ডিত্য, বিনয়, শিষ্টাচার প্রভৃতি সদ্গুণহেতু সর্ব্বত্র সমাদৃত।

রতনসিংহ প্রথিতনামা বেদ্‌নোর রাজা স্বর্গীয় জয়মল সিংহের পুত্র। জয়মল সিংহের বীরত্ব, স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি সদ্গুণের সীমা ছিল না। বাদসাহ আকবর স্বয়ং তাঁহার প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রতনের নিতান্ত বাল্যাবস্থায় জয়মল সিংহের কালপ্রাপ্তি হয়। মৃত্যু-সময়ে তিনি পুত্রকে স্বীয় অধিনায়ক মহারাণা প্রতাপসিংহের হস্তে সমর্পণ করেন, এবং তাহার প্রতি অনুগ্রহ রাখিতে অনুরোধ করিয়া যান। মহারাণা, রতনসিংহকে পুত্রবৎ লালন পালন ও যথাবিধানে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন।

রতন ও অমর প্রায় সমবয়স্ক। তাঁহারা একত্র লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত; সুতরাং তাঁহাদের পরস্পর অতিশয় সৌহার্দ্দ ছল। রতনসিংহকে অনেকেই মহারাণার পুত্র বলিয়া জানিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঐতিহাসিক কথা।

আমরা এক্ষণে এই আখ্যায়িকা-সংক্রান্ত ঐতিহাসিক বিবরণের সার মর্ম্ম অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব ইচ্ছা করিতেছি। কোন কোন পাঠক উপন্যাস অথবা তদ্বৎ কৌতূহলোদ্দীপক পুস্তক মধ্যে কিয়দংশ নীরস ঐতিহাসিক বিবরণ ও শ্রেণীবদ্ধ পরম্পরাগত ঘটনানিচয়ের বৃত্তান্ত পাঠ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং দুর্ভাগা গ্রন্থকারকেও অনর্থক গ্রন্থ-কলেবর পুষ্টিকারক অকর্ম্মণ্য লেখক বলিয়া কলঙ্কিত ও লাঞ্ছিত করেন। এ সকল অসুবিধা ও অপমান সহ্য করিয়াও, আমরা অতঃপর এই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছি। অনেকেই হয়ত, আমরা এক্ষণে যে দুই একটি কথা বলিব ইচ্ছা করিতেছি, তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন। তাঁহারা অনায়াসে এ পরিচ্ছেদ ত্যাগ করিতে পারেন। যাঁহারা এ সকল কথা জানেন না, তাঁহাদের সমীপে আমাদের সবিনয়ে অনুরোধ এই যে, যৎপরোনাস্তি নীরস হইলেও, স্বদেশের ইতিহাসের মমতায়, একবার এই কয় পৃষ্ঠার উপর নয়নপাত করিলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না।

দুর্দ্দান্ত যবনদিগের প্রতাপের নিকট একে একে ভারতের সমস্ত রাজবর্গ ক্রমশঃ পরাজিত হইয়া চির-গৌরব শূন্য হইতে লাগিলেন। যখন সুবিচক্ষণ সম্রাট আকবর দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন, সে সময়ে হিন্দুজাতির ভরসা স্বরূপ রাজপুত রাজগণের অধিকাংশই ক্রমে ক্রমে মোগলদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অধীনতা স্বীকার করিলেন। কেহ বা বিবাহ-বন্ধনে, কেহ বা সন্ধি-সূত্রে, কেহ বা অনুগ্রহ-পাশে বদ্ধ হইয়া, যবনদিগের ঘোর অত্যাচার হইতে নিস্কৃতি লাভ করিলেন। যাঁহারা এইরূপে জাতীয় গৌরব বিস্মৃত হইয়া বলবন্তের আশ্রয়ে ধন-প্রাণ রক্ষা করেন, তন্মধ্যে অম্বর দেশাধিপ মহারাজ মানসিংহ, বিকানীরের কুমার পৃথ্বীরাজ ও মিবারের শুক্তসিংহের সহিত

কক্ষ্যমাণ আখ্যায়িকার কিঞ্চিৎ সংস্রব আছে। রাজপুত-শ্রেষ্ঠ মিবারেশ্বরগণ ভ্রমেও কদাপি যবনের নিকট হীনতা স্বীকার করেন নাই। রাজ্য যায় যাউক, ধনসম্পত্তি যায় যাউক, প্রাণ যায় যাউক, তথাপি কাহারও—বিশেষতঃ ভারতের চিরশত্রু ম্লেচ্ছ যবনের—দাসত্ব স্বীকার করিয়া পবিত্র ইক্ষ্বাকু-বংশ সম্ভূত রাজপুতকুলে কলঙ্ক অর্পণ করিব না, বাপ্পা রাওয়ের বীর্য্যবন্ত সতেজ বংশধরগণ এই গর্ব্বে গর্ব্বিত ছিলেন। এই গর্ব্ব হেতু তাঁহাদের অপরিমেয় ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল, শোণিত দিয়া সমর-ক্ষেত্র ভাসাইতে হইয়াছিল, তথাপি কদাপি তাঁহাদিগের দৃঢ়তা বিচলিত বা চিত্তের পরিবর্ত্তন হয় নাই।

মিবারেশ্বর মহারাণা উদয়সিংহের সময়, রাজধানী চিতোর নগর সম্রাট্ আকবরের হস্তগত হয়। চিতোর রক্ষার্থ যুদ্ধে রাজপুত বীরগণ ও রাজপুত-রমণী-মণ্ডলী যে অসাধারণ বীরত্ব ও স্বদেশানুরাগ প্রকাশ করেন, তাহার তুলনা, বোধ হয় অন্য কোন জাতির ইতিহাস মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমরা পাঠকগণকে ইতিহাস হইতে সেই অসাধারণ ঘটনার বিবরণ অধ্যয়ন করিয়া হৃদয়কে বিমুগ্ধ করিতে বার বার অনুরোধ করি *। উদয় সিংহ প্রকৃত প্রস্তাবে সুদক্ষ নৃপতি ছিলেন না। আলস্য, শিথিলতা ও ভোগ-সুখোন্মত্ততা তাঁহার স্বভাবের অনপনেয় কলঙ্ক ছিল। এই জন্যই তাহার সময়ে ধন জন-সহায়-শূন্য অধঃপতিত মিবারের সম্পূর্ণ অধঃপতন সঙ্ঘটিত হয়।

উদয়সিংহ রাজধানী-হীন হইয়া রাজপিপ্পলী নামক স্থানের দুর্গ-মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চিতোর-ভ্রষ্ট হইবার পূর্ব্বে তিনি গৈরব নামক পর্ব্বতের উপত্যকা সমীপে "উদয়সাগর" নামে এক হ্রদ খনন করিয়াছিলেন। অধুনা তিনি তৎসমীপে একটি ক্ষুদ্র হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিলেন ও গিরি-সন্নিহিত সমস্ত ভূভাগ অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা বদ্ধ করিলেন। অবিলম্বে ধনবান্ প্রজাবর্গ এই স্থানে সৌধ-মালা নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। এইরূপে সুবিখ্যাত উদয়পুর নগর সৃষ্ট হইল।

সংবৎ'১৬২৮ অব্দে উদয়সিংহের জীবলীলা সমাপ্ত হইল। প্রতাপসিংহ সেই রাজ্য-শূন্য সম্পত্তিশূন্য, শূন্য রাজোপাধির উত্তরাধিকারী হইলেন। কিন্তু প্রতাপসিংহ ধন-জন-শূন্য সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন বলিয়া, তাঁহার হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্যও শূন্য হয় নাই। ভারত হিন্দুশাসনাধীনে সংস্থাপিত করিব, চিতোর নগরে পুনরায় সূর্য্যবংশীয়দিগের জয়-ধ্বজা প্রোথিত করিব। এই আশায় উন্মত্ত হইয়া, বীরবর প্রতাপসিংহ জীবনতরণীকে দারুণ বিপদ-সঙ্কুল সাগরে ভাসাইয়া দিলেন।

প্রতাপসিংহের হৃদয়ের অত্যুচ্চ ভাব বিবরিত করা অসাধ্য; তাহা অনুমান করাই কঠিন, প্রকাশ করা সর্ব্বথা অসম্ভব। চিতোরের মায়া প্রতাপের মনে এতই বলবতী ছিল যে, তিনি চিতোরের দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া, বিরলে বসিয়া, অবিরল অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতেন। বাদশাহ, চিতোর অধিকার করিয়া, তাহার নিরুপম শোভা সমস্ত বিধ্বংসিত করিয়াছিলেন। রাজপুত কবিগণ (চারণ) চিতোরের এই অবস্থা নিরাভরণা বিধবা পুরনারীর দশার সহিত তুলনা করিয়াছেন। প্রতাপসিংহ এই চিন্তায় এতাদৃশ উন্মনা ও কাতর ছিলেন যে, যত দিন চিতোরের এই দারুণ দুর্দ্দশা অপনোদিত না

* Babu Hari Mohan Mookerjia's Edition of Tod's Annals and Antiqulties of Rajasthan, Vol. I, Ch x, pp, 252—254.

হয়, তত দিনই তাঁহার উত্তরাধিকারিবর্গ সমস্ত ভোগবিলাস হইতে বঞ্চিত রহিবেন, এই নিয়ম করিয়াছিলেন। তাঁহার বাসনানুসারে তিনি ও তাঁহার স্বজনগণ স্বর্ণ-রৌপ্য নির্ম্মিত ভোজনপাত্রের পরিবর্ত্তে বৃক্ষপত্র (পাতারিতে) আহার করিতেন, সুকোমল শয্যার পরিবর্ত্তে তৃণ-শয্যায় শয়ন করিতেন, মৃতাশৌচের ন্যায় নখর কেশাদি রাখিতেন এবং সমৃদ্ধির পুরোভাগে যে নাকারা বাদিত হইত, তাহা সেই নিরানন্দ ঘটনা নিরন্তর স্মৃতির সম্মুখে উপস্থিত রাখিবার নিমিত্ত, অতঃপর পশ্চাতে বাদিত হইত। চিতোরের পুনরভ্যুদয় [illegible] বাসনা নহে,— তাহা হইল না। কিন্তু অদ্যাপি প্রতাপের বংশধরগণ সেই কঠিন আজ্ঞা বিস্মৃত হয় নাই। তাঁহারা অদ্যাপি ভোজন পাত্রের নিম্নে বৃক্ষপত্র পাতিত করেন, শয্যার নিম্নে তৃণ বিস্তৃত করেন, কখনই সম্পূর্ণরূপে মুণ্ডন করেন না, এবং নাকারা অদ্যাপি পশ্চাতে বাদিত হয়।

প্রতাপ এই ধন জন-শূন্য রাজোপাধির উত্তরাধিকারী হইয়া দেখিলেন—শত্রু যেরূপ প্রবল প্রতাপ, এবং তাঁহার সহায় সম্পত্তি যেরূপ হীন, তাহাতে সহসা তাঁহার অভ্যুদয়ের কোনই আশা নাই। মিবার ধন-ধান্যে যেরূপ পরিপূর্ণ এবং প্রকৃতির যেরূপ প্রিয়-নিকেতন, তাহাতে ইহা চিরদিন রাজ্য লোলুপ মোগলের মনে নিরতিশয় লোভ উদ্দীপ্ত করিবে। অতএব এক্ষণে অন্য চেষ্টা না করিয়া এবংবিধ উপায় অবলম্বন করা বিধেয়, যাহাতে মিবার মরুভূমির বালুকার ন্যায় অসার ও অপদার্থ বলিয়া প্রতীত হয়। তিনি তদর্থে আজ্ঞা দিলেন যে, প্রজাগণ অতঃপর আর সমতল ভূমিতে—নগরে বা গ্রামে—বাস করিতে পাইবে না, সকলকেই বাসস্থান ত্যাগ করিয়া অরণ্য বা গিরিগহ্বরে বাস করিতে হইবে। প্রতাপের বাসনা ও আজ্ঞা বিচলিত হইবার নহে। প্রজাগণ স্ব স্ব স্ত্রী পুত্র কন্যা সমভিব্যাহারে বনারণ্য ও গিরি-সঙ্কটে উপনিবেশ সংস্থাপন করিল। সোণার মিবার জনহীন, শস্য-হীন, পরিত্যক্ত ও শ্রী-ভ্রষ্ট হইয়া উঠিল; মিবারের নগর সমস্ত শার্দ্দূল, শৃগাল, ও সর্পের আবাস হইল। শোভাময় ভবন সমস্ত শ্রী-হীন, পতনোন্মুখ নিরানন্দময় ও "বেচেরাগ" অর্থাৎ দীপহীন হইয়া উঠিল। মিবারের যেরূপ শোচনীয় দশা হইল, তাহাতে বিরোধী ভূপালের চক্ষে সে রাজ্যে কোনই লোভনীয় সামগ্রী রহিল না। যাঁহারা মিবারের প্রদেশপতি এবং যাঁহাদের আবাস দুর্গমধ্যে সংস্থিত, তাঁহারাই কেবল এই কঠোর নিয়ম হইতে কথঞ্চিৎ অব্যাহতি লাভ করিলেন। তাঁহারা সমস্ত দিবস দুর্গাভ্যন্তরে বাস করিয়া, বিশেষ প্রয়োজন হইলে রাত্রিকালে বাহিরে আসিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। একতঃ এরূপ প্রদেশপতি ও দুর্গসম্পন্ন প্রজার সংখ্যা নিতান্ত অল্প, অপরতঃ তাঁহাদের পক্ষেও দিবা-ভ্রমণ নিষিদ্ধ। সুতরাং মিবারের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিলেও, মানব-কণ্ঠ-ধ্বনি শ্রবণ করা যাইত না।

স্বয়ং প্রতাপসিংহও স্ত্রী-পুত্রাদি সঙ্গে লইয়া বনারণ্যমধ্যে বৃক্ষ-মূলে বাস করিতেন। তাঁহাদের সে অসহনীয় ক্লেশের কথা কি বলিব! সেরূপ অবক্তব্য যাতনাসঙ্কুল রাজপদ অপেক্ষা ছিন্ন কন্থা-ধারী ভিক্ষুকের অবস্থাও শ্রেয়ঃ! যুবরাজ অমরসিংহ সে সময় বালক।

এইরূপে পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইল, তথাপি রাজ্যের কোনই উন্নতি হইল না। মহারাণা দেখিলেন—নিরন্তর অরণ্যে বাস করিলে ও

যবনদিগের আক্রমণ হইতে পরিরক্ষিত থাকিলেও, মিবারে সৌভাগ্যের পুনরাবির্ভাব হওয়া অসম্ভব! বল বিক্রমে স্বাধীনতা ও প্রভাব বিস্তার করিতে পারিলেই উন্নতির সম্ভাবনা।

বনে বসিয়া তাহা কিরূপে হইবে? রাজধানীতে থাকিয়া, বুক পাতিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। তিনি তদর্থে কমলমীর নামক দুর্গসম্পন্ন নগর পুনঃসংস্কৃত করিয়া তথায় স্বজনগণসহ আসিয়া রাজধানী সংস্থাপন করিলেন।

যে কয়জন প্রধান ব্যক্তি মহারাণাকে অবিচলিত শ্রদ্ধা করিতেন ও তাঁহার উন্নতি ও অবনতির সহিত আপনাদের উন্নতি ও অবনতি মিশাইয়া দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে, কুমার অমরসিংহ ও কুমার রত্নসিংহ ব্যতীত, আরও তিনজন বিশেষ প্রশংসার্হ। সে তিনজন শৈলম্বর-রাজ, দেবলবর-রাজ এবং ঝালা-রাজ। শৈলম্বর-রাজ, মহারাণা প্রতাপসিংহের সমবয়স্ক। তাঁহাদের উভয়ের হৃদয়ে কর্ত্তব্য জ্ঞানের বন্ধন ব্যতীত, আত্মীয়তার দৃঢ়-বন্ধন ছিল। দেবলবর-রাজ বৃদ্ধ। তাঁহার ধবল শ্মশ্রু ও ধীর কার্য্য, জ্ঞানের পরিচায়ক। মিবারের যখন হীনদশা উপস্থিত হইল, তখন তিনি ধন-প্রাণ রক্ষার্থে যবনের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহাদের হৃদয়ে তেজের অঙ্কুরও আছে, তাহারা সেরূপ হীন ভাবে কতদিন থাকিতে পারে? ধন যায় যাউক, তথাপি মিবারের হিতার্থে জীবন ব্যয় করা শ্রেয়ঃ মনে করিয়া দেবলবর-রাজ পুনর্ব্বার আসিয়া মহারাণার নিকট সবিনয়ে ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন ও তাঁহারই পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। ঝালা-রাজ সর্ব্বদা মহারাণার সমীপে অবস্থান করিতেছেন না বটে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে, মহারাণার নিমিত্ত জীবন দিতে তিনি কিছু মাত্র কাতর ছিলেন না। এতদ্ভিন্ন আর এক ব্যক্তি সতত মহারাণার সমস্ত পরামর্শে সংলিপ্ত থাকিতেন। তিনি মন্ত্রী—তাঁহার নাম ভবানীসহায় (ভামা সহ) তাঁহার আকৃতি দেখিলে তাঁহাকে কুৎসিত বলিলেও বলা যাইত, কিন্তু জগদীশ্বর তাঁহাকে যে উদার হৃদয় দিয়াছিলেন, সেরূপ হৃদয় লইয়া মনুষ্যত্ব করা অল্প মানবের সৌভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। মহারাণার প্রতি ভক্তি ও দেশের কল্যাণকর কার্য্যই তাঁহার প্রিয়কার্য্য। মন্ত্রণা তাঁহার সাধন হইলেও, অসিধারণে তিনি অপটু ছিলেন না।

প্রতাপসিংহ রাজ্যলাভ করিবার পাঁচ বৎসর পরের ঘটনা এই আখ্যায়িকায় স্থান পাইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চারণ।

বৈকালে মহারাণা প্রতাপসিংহ, শৈলম্বর-রাজা ও মন্ত্রী ভবানী-সহায় কমলমীর দুর্গের উপরে বসিয়া আছেন। সন্ধ্যার এখনও বিলম্ব আছে। দূরে উদয়পুর নগরের সৌধশিরে ও মন্দির-ধ্বজায় স্বর্ণ-বর্ণ সৌর-কররাশি প্রতিভাত হইতেছে! ঘন কৃষ্ণ মেঘমালার ন্যায় অর্ব্বলী পর্ব্বত চতুর্দ্দিকে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া জগতের প্রতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে—মিবারের পূর্ব্ব গাথাবলীর সাক্ষ্য দিতেছে। কারণ তদপেক্ষা

রাজবারার চঞ্চলা অদৃষ্টলিপির উৎকৃষ্টতর সাক্ষী আর কে আছে? অর্ব্বলী-হৃদয়ে রাজবারার কতই উন্মাদকাহিনী অঙ্কিত আছে? রাজবারার উৎকৃষ্ট শোণিত বিন্দু সমস্ত অর্ব্বলীর স্তরে স্তরে সঞ্চিত আছে; অর্ব্বলী চিরকাল বক্ষ পাতিয়া রাজবারার প্রধানগণের পদ-চিহ্ন ধারণ করিয়াছে, অর্ব্বলীর গুহায়, কন্দরে কন্দরে রাজবারের বীর-কীর্ত্তির নিদর্শন আছে; অর্ব্বলী রাজবারার দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যের, সুখ ও দুঃখের জীবন্ত সাক্ষী।

মহারাণা প্রতাপসিংহ ও তাঁহার বন্ধুগণ বসিয়া কর্ত্তব্য চিন্তা করিতেছেন। কি মনে হইল, সহসা উঠিয়া মহারাণা পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টি অতি দূরস্থ ছায়াবৎ চিতোর নগরের ভগ্ন-চূড় দেব-মন্দির শ্রীভ্রষ্ট প্রাসাদ প্রভৃতি অবশেষ সমস্তে নিবদ্ধ হইল। তিনি এমনই উন্মনা হইয়া উঠিলেন যে, যেন দেখিতে লাগিলেন বিগলিত-কুন্তলা, শ্রীহীনা ভবানী কল্যাণী দেবী ভগ্ন-মন্দিরোপরে দাঁড়াইয়া বসনে বদনাবৃত করিয়া রোদন করিতেছেন। বহুক্ষণ এইরূপ দেখিতে দেখিতে, তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেদিক হইতে চক্ষু ফিরাইলেন। সেই সময়ে একজন পরিচারক নিবেদিল;—

"অন্তাল নগরের চারণ দেবীসিংহ নিম্নে অপেক্ষা করিতেছেন।"

মহারাণা সকলের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—

"তাঁহাকে এইখানে লইয়া আইস।"

অচিরে দেবীসিংহ উপস্থিত হইলেন। মহারাণা ও অপর সকলে তাঁহাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। দেবীসিংহ একে একে মহারাণা ও তদনুচরগণকে সম্মান জ্ঞাপন করিলেন।

দেবীসিংহের বয়স ষষ্টি অতিক্রম করিয়াছে। তাঁহার মস্তক বস্ত্রাবৃত শ্বেত উষ্ণীষে সমাবৃত—উষ্ণীষের পার্শ্ব দিয়া কয়েক গুচ্ছ ধবল কেশ প্রকাশিত। তাঁহার বদন শ্মশ্রু-বিহীন—গুম্ফ নির্ম্মল শ্বেত ও উভয় পার্শ্বে বহু বিস্তৃত। ভ্রূ ও চক্ষুর লোম সমস্ত ধবল বেশ ধারণ করিয়াছে। দেবীসিংহের দেহ স্থূল শ্বেত পরিচ্ছদে আচ্ছন্ন। পৃষ্ঠে একখানি প্রকাণ্ড ঢাল এবং শুভ্র কোমরবন্ধে একখানি তরবার ও একখানি কিরীচ বিলম্বিত। দেবীসিংহের দেহ উন্নত, বদন চিন্তাযুক্ত, মূর্ত্তি গম্ভীর। বয়স যতই কেন হউক না, স্বাভাবিক শ্লথতা তাঁহাকে অধীন করিতে পারে নাই। দেবীসিংহ মহারাণাকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"এক্ষণে কি স্থির করিয়াছেন?"

প্রতাপসিংহ বলিলেন,—

"যত শীঘ্র সম্ভব যুদ্ধ করিব।"

দেবী। উত্তম।

ভবানীসহায় বলিলেন,—

"কিন্তু কি ভরসা—আমাদের কি আছে?"

বৃদ্ধ দেবীসিংহের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, তিনি কহিলেন—

"কাহার কি থাকে? আমাদের আমরা আছি। যদি না পারি, তবে এরূপ কলঙ্কিত জীবন বহিয়া থাকা অপেক্ষা মরণে ক্ষতি কি?"

মহারাণা বলিলেন,—

"ঐ কথা। ভবানী জানেন, কেন এতদিন এ কলঙ্ক বহিলাম—ধিক্!"

দেবী। যত্নে কি না হয়? তেজ, উদ্যম, ভরসা।

মহারাণা কহিলেন,—

"দেব! আমার হৃদয় তেজ, উদ্যম বা

ভরসা-শূন্য নহে। আমি এখনও দেখিতেছি, ঐ চিতোরের ভগ্নচূড় মন্দির-মস্তক হইতে যেন শ্রী-হীনা আলুলায়িতকুন্তলা কল্যাণী দেবী আমাকে অভয় দিয়া বলিতেছেন, "বৎস! মিবারের পুনরুদ্ধার তোমার দ্বারাই ঘটিবে।" মরি বাঁচি দেখিব, মিবার থাকে কি না।"

দেবলবর-রাজ বলিলেন,—

"যদি আপনার দ্বারা না হয়, তবে আশা নাই।" দেবীসিংহের নয়ন আবার প্রদীপ্ত হইল। কহিলেন,—

"মানব যাহা করিয়াছে, মানব তাহা কেন পারিবে না? মিবারের বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত হীন হইলেও, ইহার আশা আছে: এইরূপ ঘোরান্ধকারে মিবার বার বার সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, আবার সুখসূর্য্যের উদয়ে আলোকিত হইয়াছে। এবারও কেন তাহা না হইবে? যদি তাহা না হয়, তবে আমাদের হৃদয়ই নিন্দনীয়। হায়! পূর্ব্বে যে হৃদয় লইয়া রাজপুতগণ জগৎ-পূজিত ছিলেন, এক্ষণে আমাদের সে হৃদয় নাই, সে উত্তম নাই, সে অদম্য স্পৃহা নাই, সে উচ্চ আশা নাই; সুতরাং, এক্ষণে আমাদের এই হীনতা, এই দুর্দ্দশা, এই অপমান!"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং উন্মত্তভাবে গায়িতে লাগিলেন,—

"কোথায় সে দিন মনের গরবে
হাসিত ভারত যেদিন সুখে?
কোথায় এখন স্বাধীনতা ধন?
পর-নিপীড়ন, ভারত-বুকে।

"হায়! হায়! হায়! একি হেরি আজি
কাঙ্গালিনী বেশে রাজার মাতা
মলিন বসন, নাহিক ভূষণ,
শীর্ণ-কায় হায়! জীবন-মৃতা।

"কি গায়িব আজি? গায়িতে কি আছে?
সকলই লুটেছে যবন দল।
ভারত এখন শ্মশান-সমান,
শুষ্ক মরুভূমি,, যাতনা-স্থল।

"ঐ যে চিতোর আলু-থালু-বেশা,
কবরী-বিহীনা নারীর মত,
ভূষণ-বিহীনা, শ্রী-হীনা নবীনা,
বিধবা কামিনী রোদনে রত।

"উহার এদিন ভাবিলে সতত
কাঁদিয়া উঠে হে আকুল প্রাণ; —
সলিলে প্রবেশি, হলাহল খাই,
আছাড়িয়ে মাথা করি শত খান্।"

মহারাণা উৎপৎস্যমান শোক-প্রবাহ প্রশান্ত করিবার নিমিত্ত, বক্ষে হস্তদ্বয় চাপিয়া বার বার পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন; চারণ দেবীসিংহ সংক্রুদ্ধ স্বরে হস্তান্দোলন করিতে করিতে গায়িতে লাগিলেন,—

"ভাবিয়ে দেখ হে সে দিনের কথা,
যে দিন চিতোর স্বাধীন ছিল।
সেই শুভদিন মনে কর সবে,
যে দিন বাপ্পা জনম নিল।

"ত্রিকূটের পদে নগেন্দ্র নগরে
খেলিছে বালক বাপ্পা রায়;
বালক যখন তখন হইতে
যশের সৌরভ দিগন্তে ধায়।

"সোলাঙ্কির বালা ঝুলুনি খেলিতে
ছয়শত সখি সঙ্গেতে লয়ে,
আম্র উপবনে মনের আনন্দে
গিয়েছে হরষে যতেক মেয়ে।

"ঝুলুনি খেলিবে নাহি তার দড়ি
ভাবিয়ে আকুল, মরমে মরে;
গোপাল লইয়া দরিদ্র বাপ্পা
ছিল সেই মাঠে, জীবিকা তরে।

"হাসিতে হাসিতে নরেশ-নন্দিনী
বলিল তাহাকে দাঁড়ের কথা।
বাপ্পা কহে 'তাহে কি ভয় তোমার?
'দিইতেছি দড়ি আনিয়া হেথা।'

"আগে হ'ক তবে বিবাহের খেলা,
'ঝুল্ ঝুল্ খেলা খেলিও শেষে'
ভাবিয়া চিন্তিয়া বালিকার দল
ধরিল তাহার হাত হরষে!

"কুমারীর বাস গোপালের বাসে
বাঁধিয়া দিলেক সকলে মিলে;
পাক দিল সবে শাস্ত্রের বিধানে
আনন্দেতে আম্র গাছের মূলে।

"হইল বিবাহ খেলার ছলে,
শুনিলা নরেশ দুদিন পরে;
রাখাল বালক করেছে বিবাহ
রাজার দুহিতা গোপন করে।

"আজ্ঞা দিলা রাজা বাঁধিতে বাপ্পায়,
শুনিয়া বালক ব্যাকুল ভয়ে;
গিরির গুহায় পলাইয়া যায়,
ভীল দুইজন সঙ্গেতে লয়ে।

"চিতোরের যত মোরী রাজা ছিল
তারা আদরিল বাপ্পায় অতি;
সামন্তের পদে অভিষেক তায়
করিল আদরে মোরীর পতি।

"সমরে অটল, প্রবল প্রতাপ—
শাসিল বাপ্পা যবনগণে;
গজনি নগরে বিজয়-কেতন
উড়াইল বীর তেজের সনে।

"চিতোরের ছত্র ক্রমেতে শোভিল
বাপ্পার শিরে ছটার মত।
রাজ, উপরাজ, সামন্ত প্রধান
প্রীতভাবে সব হইল নত!

"'হিন্দু-সূর্য্য' আর 'রাজ-গুরু' দেব
হইল সে হতে বাপ্পার নাম।
ভবেশের দাস, দেবের চিহ্নিত,
অজর, অমর, বিজয়-কাম।

"সেই কাল হতে চিতোরের দ্বার
দেবাদেশে মুক্ত হইয়ে গেল;
নাচিল অপ্সরা, গাইল কিন্নর,
প্রসূন বর্ষিল দেবের দল।"

দেবলবর-রাজ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"হায়! কি দিনই গিয়াছে।"

দেবীসিংহ বলিলেন,—

"আবার শুনুন,—

"কাগার সমরে দুরাত্মা যবন
নাশিল ভারত বীরের দল।
হ'ল অন্ধকার, গেল গেল সব
ধরম করম অতল-তল।

"চিতোরের রাণা ধীর বীরবর
যোগীন্দ্র উপাধি সমর রায় (সিংহ)
ত্যজিল জীবন, কাগার সংগ্রামে,
করি বীরপণা—কহা না যায়।

"পৃথা রাণী তাঁর, নবীন কুসুম,
চিতায় আরোহী জলিয়া গেল।
দেশ ছারখার, শোণিতের ধার
প্রবল বেগেতে বাহিত হল।

"এই চিতোরের কি দশা তখন
স্মরণ করহে ধীমানগণ!
শিশু কর্ণ হাতে রাজ-কার্য্য-ভার—
রাণী কর্ম্মদেবী ব্যাকুল মন।

"কিতব কিঙ্কর কুতব আসিল,
হরিতে চিতোর-স্বাধীনতায়।
স্মরিয়া মহেশে, দেবী কর্ম্মদেবী
দিলা গিয়া তেজে আটক তায়।

"হইল সমর অম্বরের দেশে
কল্যাণীর মত যুঝিলা বামা ;
পরাজিত করি নিজ বাহু বলে
তাড়াইয়া দিলা কুত্ববে রামা।

"সমস্ত ভারত ক্রমে ক্রমে হায় !
যবন চরণে বিনত হ'ল ;
কেবল চিতোর কর্ম্মদেবী তেজে
অটল ভাবেতে স্বাধীন র'ল !

"সে কথা স্মরিলে এখনও উল্লাসে,
নাচিয়া উঠে এ অবশ প্রাণ ;
হর্ষ, ঘৃণা, রাগ এ মৃত হৃদয়ে
করে পুনরায় জীবন দান।

"রমণীর মনে যে তেজ আছিল
এখন কোথায় সে তেজ আর ?
গত যত বল, রোদন এখন
চিতোর অদৃষ্টে হয়েছে সার।"

মহারাণা দন্তে দন্তে নিপীড়ন করিয়া বলিলেন,—

"কেন মরি নাই ?"

দেবীসিংহ কহিলেন,—

"আর এক দিন—

"আর এক দিন চিতোর অদৃষ্টে
ঘটিল ঘটনা কাহিনী শুন।
চৌহান-তনয়া পদ্মিনী সুন্দরী—
অতুল ভুবনে সে রূপ গুণ।

"শোভার ভাণ্ডার পদ্মিনীর কথা,
জগত জুড়িয়া প্রচার হ'ল।
বাদশাহ আলা, শুনিয়া সে কথা,
হইয়া উঠিল যেন পাগল।

"লম্পট হৃদয় ত্যজি লাজ-ভয়
ভীমসিংহে কয় মনের কথা ;—
'দেখিবারে চাই দর্পণেতে ছায়া
বারেক তোমার পদ্মিনী যথা।'

"যে কাল সমর উঠিল তাহাতে
স্মরিলে এখনো উপজে ভয়।
বালক বাদল, রাণা ভীমসিংহ,
আর যোধ যত গণা না যায়,

"যুঝিল অনেক, রহিল না বীর ;
বহিল শোণিত প্রবাহি নালা।
অদৃষ্টের গতি কে খণ্ডাতে পারে ?
জয় পরাজয় বিধির খেলা !

"হ'ল পরাজয় ; চক্রের গতিতে
চিতোর পড়িল যবন করে।
প্রাসাদ উপরে আছিলা পদ্মিনী
ব্যাকুলা সংবাদ পাবার তরে।

"দ্বাদশবর্ষীয় বালক বাদল
শোণিতাক্ত দেহে আসিল সেথা ;
কহিলেক, 'মাতঃ ! কি দেখিছ আর ?
আমাদের আশা বিলুপ্ত হেথা।'

"কহিলা পদ্মিনী, 'বল্‌রে বাছনি
'কিরূপ আছেন পিতৃব্য তব ?'
'কি বলিব দেবী ! শোণিত-শয্যায়
'পাতিয়া গৌরবে নিহত শব,

"অসভ্য যবন করি উপাধান,
'নাশি শত্রুরাশি, লভিয়ে মান,
'ত্যজি এই দেহ ভীমসিংহ রায়,
'অমর লোকেতে লভিলা স্থান।'

"কহিলা সুন্দরী, 'বল্‌রে বাদল
'যুঝিলা কেমন প্রাণেশ মম ?'
কহিলা বাদল, যুড়ি দুই কর
'দেখি নাই কভু তাঁহার সম।

"এই মাত্র জানি, যশ-অপযশ
'বিপক্ষ জনেরা ঘোষণা করে ;
'ছিল না সমরে একটীও অরি
'তাঁর যশাযশ প্রচার তরে।'

"হাসি সুবদনী আশীষি বাদলে
বিদায় করিলা বিধবা রাণী।
পুরের ভিতরে রাণীর আদেশে
জ্বালিলেক চিতা, অনল আনি।

"জ্বলিল অনল, ধিকি ধিকি ধিকি,
উজলিল তায় ভারত দেশ;
একে একে একে আসিল তথায়
চিতোরের নারী পরিয়ে বেশ।

"নূতন বসন পরিয়ে তখন
দুলাইয়ে গলে জবার মালা,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ঘৃতের আহুতি
পূজিলা অনলে বীরের বালা।

"সাঙ্গ হলে পূজা, সঙ্গীত-প্রবাহে
বসুধা আকাশ প্লাবিত করে,
অনলে বেষ্টিয়া, মহিলার দল
গাইতে লাগিল সমান স্বরে।

"নন্দন কাননে দেবতার দল
শুনিলা সে গীত স্তব্ধভাবে।
ক্ষীরোদবাসিনী লক্ষ্মী সনাতনী
ব্যাকুল হৃদয়ে পুছিলা তবে।

" 'কহ নারায়ণ। কাঁপিছে অবনী,
'পাতাল স্বরগ,—কিসের তরে?
'পশু পক্ষী যত নীরব নিচল,
'কে যেন জীবন লয়েছে হরে!

" 'বহিছে না বায়ু— চিরক্রীড়াশীল—
'নড়িছে না পাতা, অচল সব।
'মন্দাকিনী বেগ শিথিল হয়েছে
'নাহি কুল কুল গতির রব!

" 'হাদে দেখ হোথা স্থাণুর ললাটে
'ধক্ ধক্ ধক্ আগুন জ্বলে!
'ছাড়িয়া স্বরগ, বসুধা ভেদিয়া
'পশিতেছে যেন পাতাল-তলে।

" 'পুনঃ দেখ দেখ নাচিছে মহেশ,
'সঙ্গেতে জুটেছে ভৈরব কত!
'নাগদল দেখ এলায়ে পড়িছে
'জীবন বিহীন মরার মত।

" 'হেথা একি নাথ! দেবেশ-হৃদয়ে,
'পড়েছে ঢুলিয়া দেবরে রাণী!
'কবরী-বন্ধন খুলিয়ে গিয়েছে,
'বাঙ্ময়ী শচী কহে না বাণী!

"আরও চমৎকার দেখহ প্রাণেশ!
'বসিয়ে আছেন শচীর পতি,
'শচীর কারণে নহেন ব্যাকুল
'আর কি আনন্দে বিভোর মতি!"

"কহিলা তখন জগতের পতি
'শুন মন দিয়া হৃদয়েশ্বরি!
'রাখিতে সতীত্ব—জাতীয় গৌরব,
'অনলে পশিছে ভারত-নারী।

" 'জগতে অতুল সতীত্ব-রতন
'মহিমা তাহার তাহারা জানে,
'রাখিতে সে ধন অটুট অক্ষয়,
'পরাণ তাহারা সামান্য গণে।

" 'বসুধা ভিতরে আর্য্যনারী সম
'রমণীরতন নাহিক আর,
'কীর্ত্তি তাহাদের দেবের বাঞ্ছিত,
'মিলে না কোথাও তুলনা তার।

" 'সহস্র সহস্র রমণী-রতন
'পশিছে চিতায় আনন্দ মনে—
'উপেক্ষি যৌবনে, রূপের তরঙ্গে,
'ভোগের আশায়, বিভব, ধনে।

" 'গাইছে তাহারা সমস্বরে গীত,
'সে গীতের ধ্বনি পশিছে যথা,
'পুণ্য, পবিত্রতা, ধর্ম্ম, স্বর্গ-সুখ
'অতুল আনন্দ মিশিছে তথা।

"'স্থাবর, জঙ্গম দেবতা, মানব,
'সে গীতের ধ্বনি যাহার কাণে,—
'লভিছে প্রবেশ, হতেছে সে জন,
'আনন্দে উন্মত্ত, বিভোর প্রাণে।

"'সে গীতের হেতু নাচিছে মহেশ,
'এলায়ে পড়েছে শচীর দেহ,
'স্তব্ধ মন্দাকিনী, নিচল পাদপ,
'আপনে আপনি নাহিক কেহ।

"'তুমি সুবদনী শুন মন দিয়া
'তোমারও আসিবে সুখের ঘোর,
'আনন্দ-উন্মাদ ছাইবে অন্তর,
'প্রেমেতে হইবে হৃদয় ভোর।

"হৃষীকেশ বুকে রাখিয়া মস্তক
'শুনিলা বিস্ময়ে কেশব-প্রাণ—
রাজপুতবালা অনলে বেষ্টিয়া
করতালি দিয়া গাইছে গান ;—*

"'যাই যাই প্রাণনাথ ! ত্যজি এ জীবন
'অনলে কি ডরি, দেব ! লভিতে চরণ ?
'জ্বলিছে অনল যাহা,
'প্রিয় বলে মানি তাহা,
'লয়ে যাবে আমাদের সৌর-নিকেতন,
'সে সুখের বিনিময়ে কিছার জীবন !
'এমন সুদিন তবে
'বল আর কবে হবে ?
'হায় আঁখি [illegible] সহচরীগণ,—
'সুখে [illegible]—শোক-বিনোদন !
'বিলম্বে কি প্রয়োজন,
'কর সবে আয়োজন,
'চল সবে করি [illegible] শয়ন—
'কুসুমিত [illegible] যেমন।

'শুন যবনের রব,
'আসিছে ছুটিয়ে সব,
'আসিতে আসিতে হই অনলে মগন,
'জীবন যৌবন দেহ করুক গমন ;
'দেখে সেই ভস্মস্তূপ,
'বুঝিবে যবন ভূপ,
'জীবন্ত ধর্ম্মের ভাব উথলে যখন,
'মানব অক্ষম হায় ! রোধিতে তখন।
'সে পবিত্র ভস্মরাশি,
'উড়িবেক দিশি দিশি,
'কারণে মানব তেজে শিক্ষার প্রদান
'যবনের বাসনার বিরূপ বিধান !
'ঢাল ঢাল হবি আর,
'চন্দন কাষ্ঠের ভার,
'পাবকে প্রবল কর মনের মতন,—
'ঐ দেখ ডাকিছেন হৃদয়ের ধন।
'ক্ষম অপরাধ নাথ,
'এখনি তোমার সাথ,
'মিলিয়া লভিব দেব ! অক্ষয় জীবন,
'সেবিব মনের সুখে কাঙ্ক্ষিত চরণ।
'ঢাল ঢাল হবি আর,
'চন্দন কাষ্ঠের ভার,
'পাবকে প্রবল কর মনের মতন
'নাচুক অনল শিখা ভেদিয়া গগন !
বম্ বম্ ! হর হর।
'উমানাথ ! দিগম্বর !
'ভূতনাথ ! ভোলানাথ ! বিপদভঞ্জন !
'রক্ষ রক্ষ অবলার শ্রীমধুসূদন।*

"এত বলি সব মহিলা-মণ্ডলী
ঝাঁপ দিলা ক্রমে অগনি মাঝে—
ভুবন মোহিনী নবীনা কামিনী
আবরিয়া কায় মোহিনী সাজে।

* প্রথমাবধি এই গীত রাগিণী [illegible] ও তাল সংযোগে গেয়।

* এই গীত হাম্বীর রাগ ও একতালা তাল সংযোগে গেয়।

"সুকুমার ফুল রূপের লতিকা
অকালেতে হায় খসিয়ে প'ল,
পশিয়ে অনলে, অনল-বরণা—
অনলে অনল মিশায়ে গেল!

"শত শত শত স্বরগ দুয়ার
তখনি আপনি খুলিয়ে গেল,
নন্দন হইতে সুরভির ভার
বহিয়ে আনিল মলয়ানিল।

"মধুর বাতাসে পূরিল বসুধা
প্রেমের আনন্দে মাইল ভরে
চেতনাচেতন জীব অগণন
ভাসিল আবেশে সুখের সরে।

"শত শত শত অপ্সরী কিন্নরী
নামিল ভূতলে ধরিয়ে তান—
পরম যতনে মহিলার দলে
লইয়ে চলিল স্বরগ-স্থান।

"ভাতিল স্বরগ দ্বিগুণ বিভায়
যেমন তাঁহারা পশিলা তথা;
শত দিবাকর, শতেক নন্দন,
শত কল্পতরু দেখাল সেথা।

"স্বয়ং পিণাকী হ'য়ে অগ্রসর
আশীষিলা সুখে বামার দলে,—
"ভূতলে অতুল তোমাদের যশ,
'অমর তোমরা কীর্তির বলে;

" 'যতদিন ভবে চন্দ্র সূর্য্য রবে
'রবে ততদিন এই সুনাম;
'সুখে রহ সবে নিজ পতি পাশে;
'যাও সুলোচনে দিনেশ ধাম।

" 'গাইবে স্বরগ, গাইবে বসুধা,
'জয় জয় জয় ভারতনারী,
'ভূতলে অতুল তোমাদের মেয়ে
'ধন্য হ'ল আজি জগৎ পুরী।'

"সুরভি কুসুম বিস্তারিয়া পথে
দাঁড়ায় দুপাশে অমরগণ,
মাঝখান দিয়া হাসিতে হাসিতে
আনন্দে চলিলা রমণীগণ।

"যেথা দিয়া তাঁরা চলিতে লাগিলা
গাইতে লাগিলা অসুর অরি;—
'ভূতলে অতুল তোমরা লো সবে,
'জয় জয় জয় ভারত-নারী!' "

মহারাণা প্রতাপ সিংহের নয়নে আনন্দাশ্রু আবির্ভূত হইল। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শৈলশ্বররাজ বলিলেন,—

"হায়! সেই মিবার!"

দেবীসিংহ আবার গাইতে লাগিলেন,—

"চলিলেক আলা লইতে চিতোর,
দেখিলেক তাহা শ্মশান স্থল—
শোণিতে শবেতে পূরিতা নগরী,
নিহত সমরে বীরের দল।

"যে দিকে নয়ন ফিরাইল আলা
পরিহাস তায় বারম্বার
করিতে লাগিল, জনহীন পুর,
প্রাণহীন দেহ, শোণিত-ধার!

"পশিলা বাদশা প্রাসাদ ভিতরে,
দেখিলা তখনও জ্বলিছে চিতা
পুড়িয়াছে যত মহিলামণ্ডলী
যবন-দৌরাত্ম্যে হইয়া ভীতা।

"হু হু হু হু করি জ্বলিছে চিতা,
অনিলে ছুটিছে তাহার শিখা;
কাঁপিয়া উঠিল যবন রাজন—
এমন কখন হয়নি দেখা!

"ছুটিতেছে শিখা এদিক ওদিক
কভুবা আসিছে বাদশা পাশে;
ভাবিল ভূপতি ধাইছে অনল
আমাকেই বুঝি গ্রহণ আশে!

"সভয়ে তখন যবন রাজন
দুই চারিপদ পিছায়ে গেল,
স্থানের মাহাত্ম্যে পাষাণের হিয়া
আজিকে ভয়েতে আকুল হ'ল !

"দেখিলেক যেন চিতার মাঝারে
পড়িয়া রয়েছে অযুত দেহ ;—
সুকুমার কায়, দহেনি অনলে !
গাইছে কেহবা, হাসিছে কেহ !

"তখনি দেখিলা নাহি সেইরূপ !
পূরিয়াছে চিতা বিকৃত জীবে !
জ্বালা যন্ত্রণায় অধীর হইয়া
ছুটাছুটি হায় ! করিছে সবে !

"পলাই পলাই ভাবিয়া ভূপতি
ফিরিয়া দেখিলা প্রাসাদ পানে ;
খল্ খল্ খল্ ভয়ানক হাসি
চারিদিক্ হ'তে পশিল কাণে !

"শূন্য নিকেতন, মুক্ত গৃহদ্বার,
সে সব ভেদিয়া হাসির ধ্বনি,
কাঁপাইয়া দিল যবনের হিয়া
চাপিলা দু'কাণ প্রমাদ গণি !

"বিকট ধ্বনিতে কহিলা তখন,
'কি দেখিছ ভূপ !' অদৃষ্টচর ;
চমকি উঠিল বিধর্ম্মী যবন
চাহিলা সভয়ে দিগ্দিগন্তর !

কি দেখিছ ভূপ ? ভাবিয়াছ মনে
'ক্ষমতা তোমার অটুট ধন,
'বুঝিয়াছ মনে উৎপীড়ন স্রোতে
'ভাসিয়া যাইবে ক্ষত্রিয়গণ !

"ত্যজিবে সম্মান, জাতীয় গৌরব,
'আশ্রিত হইবে চরণে তব,
'হিন্দু সীমন্তিনী সেবিকা করিয়া
'সুখের সাগরে সাঁতার দিব !

" 'না শুনে যদ্যপি হিন্দুরা একথা—
'অসি আছে হাতে কিসের ডরে ?
'সমরে নাশিয়া, অধীন করিয়া,
বাসনা মিটাব হৃদয় ভরে।'

" 'ভ্রান্ত ম্লেচ্ছরাজ ! তোমার সিদ্ধান্ত
'নিতান্ত অসার, এখন দেখ।
'জ্ঞান উপার্জ্জন হয় না সহসা,
এখন নরেশ ঠেকিয়া শেখ !

"কোথায় পদ্মিনী, নবীনা কামিনী,
'যার কথা শুনে ক্ষেপিয়াছিলে ?
'যাহার কারণে শোণিতের স্রোতে
'বসুধা প্লাবিত করিয়া দিলে ?

" 'কোথায় এখন, হে ইন্দ্রিয়-দাস !
'পদ্মিনী সুন্দরী কোথায় গেল ?
'জলের আশায় ছুটাছুটী করে
'আগুনে আসিয়া পুড়িতে হলো !

" 'দেখিছ যে চিতা, উহার অনলে
পুড়িয়া পদ্মিনী হয়েছে ছাই ;
'করেছ যে সাধ লম্পট বর্ব্বর !
'মিটিবার আর উপায় নাই।

" 'ভেবেছিলে তুমি, হে অদূরদর্শি !
'হইবে যবন চিতোররাজ ;—
'প্রজাহীন দেশে, জনহীন স্থলে
'কর এবে ভূপ রাজার কাজ।

" 'পড়িয়া রয়েছে সম্মুখে তোমার
'সোণার চিতোর-শ্মশান ভূমি !
'কি ভাবিয়া এলে, কি ফল ফলিল—
'কাঞ্চনে অঙ্গার লভিলে তুমি !

" 'ভেবেছিলে মনে, সমরে পুরুষ
'মরে যদি সব তাহে কি হানি ?
'সুন্দরী সকল জীবিতা রহিলে,
'অতুল সম্পদ বলিয়া মানি।

"'যবন ভূপাল! যবনের মত
বিচার বিধান করিয়াছিলে;
'জানিতে না তুমি, কুলের কামিনী
'ত্যজে না সতীত্ব সংসার দিলে।

"'পুরুষের দেখ চিহ্ন পড়ে আছে,
হেথায় সেথায়, দেখিতে পাবে,—
'রমণীর দল কোথায় গিয়েছে,
'চিহ্ন তার আর নাহিক ভবে।

"'এমন যে দেশ, বিধর্ম্মী ভূপাল।
'করিতে এসেছ তাহারে জয়।
'অসির ভয়েতে নহে তাহা ভীত
জয় করা তাহা সু সাধ্য নয়।

"'ক্ষমতা তোমার নিতান্ত অসার
'রাজপুতগণ অন্তরে গণে।
'রাখিতে সম্মান অতি অকাতরে
ত্যাগ করে তারা জীবন ধনে।

"'এদেশে তোমার কোন নাহি আশা
'অসি তব পুনঃ পিধানে লও
যে দেশে মানব কৃপাণ দেখিলে
ভয়ে হয় জড়, তথায় যাও।

"তাহারা এখনি কাতরে পড়িবে
'আসিয়ে তোমার চরণ-তলে,
'নারী দিবে তারা বাছিয়া বাছিয়া,
'মানিবে তোমায় দেবতা বলে!'

"'আবার আবার হইল তখন
অতি ভয়ানক হাসির রোল।
আলা বাদশাহ, হইয়া উঠিল
মন্ত্র-মুগ্ধ প্রায় শুনিয়া গোল।

"চাহিয়া দেখিল এ দিক ও দিক
নাহি কোন খানে একটী জন—
ভয়ে ভয়ে ভয়ে, পায়ে পায়ে পায়ে,
বাহিরে আসিল ব্যাকুল মন।

"এইরূপে হায়! চিতোর নগর
যবন-পীড়নে বিনষ্ট হলো।
বহুকাল পরে হামীর সুধীর
আবার তাহায় জীবন দিলো।

"শোভিল চিতোর স্বাধীন হইয়া
ভাসিল মানব সুখের নীরে;
হিন্দুর নিশান উড়িল আবার
চিতোর নগরে প্রাসাদ-শিরে।

"কত কত কত হইল রাজন,
ভুবনেঅতুল তাঁদের যশ।
সাধি হিত কাজ, নাশি শত্রু-কুল
মানব-মণ্ডলী করিয়া বশ!

"বলিতে হইলে সে সব কাহিনী
সপ্ত দিবানিশি বহিয়া যায়;
স্মরিলে তাঁদের নিরুপম কথা
অশ্রুবারি বক্ষ ভাসায়ে ধায়।

"তাঁদের প্রভায় সমস্ত মিবার
হইয়া উঠিল উজ্জলতর;
হাসিল ভারত মনের আনন্দে,
পাইয়া সে সব কুমার বর।
কিন্তু হায়—

"কোথায় সে দিন মনের আনন্দে
হাসিত ভারত যে দিন সুখে?
কোথায় এখন স্বাধীনতা ধন?
পর-নিপীড়ন, ভারত বুকে।

"ঐ যে চিতোর আলু থালু বেশা,
কবরী বিহীনা, নারীর মত,
ভূষণ-বিহীনা, শ্রী-হীনা নবীনা,
বিধবা কামিনী রোদনে রত।

"উহার এ দিন ভাবিলে সতত
কাঁদিয়ে উঠে এ আকুল প্রাণ,
সলিলে প্রবেশি, হলাহল খাই,
আছাড়িয়ে মাথা করি শত খান্।

"ধিক্ উদয়সিংহে, তাঁহারই সময়ে এ ঘোর—

মহারাণা প্রতাপসিংহ চারণের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন—

"না—ও কথায় আর কাজ নাই।"

বহুক্ষণ অবনত মস্তকে চিন্তা করিয়া, মহারাণা অনুচ্চ স্বরে কহিলেন,—

"উদয়সিংহ—উদয়সিংহ না জন্মিলে আজ কাহার সাধ্য মিবারের এ দুর্দশা করে?"

শৈলম্বর-রাজ কহিলেন—

"সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সায়ংকালীন উপাসনা করা হইল না।"

দেবীসিংহ ও দেবলবর-রাজ বলিলেন,—

"বটেইত· চলুন।"

একে একে সকলে দুর্গের ছাত হইতে অবতরণ করিলেন।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সেই তুমি?

সময়ে সময়ে দুই একটি ঘটনা চিত্তকে এমনই আক্রমণ করে যে, কিছুতেই তাহা মন হইতে অন্তরিত করা যায় না। তাহা হৃদয়ের সহিত এমনই মিশিয়া যায় যে, কিছুতেই তাহার ছায়া বিলুপ্ত হয় না; শয়নে, স্বপ্নে প্রতিকার্য্যে সেই ব্যাপার বিভিন্ন ভঙ্গীতে আসিয়া চিত্তক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। নাথদ্বার নগর-সমীপে বুনাস্ নদী-তীরে সেই বীর-মনোমুগ্ধা কিশোরীর নিরুপম মাধুরী ও তদীয় হৃদয়ের অসামান্য প্রশস্ততা, অমরসিংহের চিত্তকে এরূপ উদ্বেলিত করিয়াছিল যে, এই কয়দিন মধ্যে তিনি সেই ব্যাপার একবারও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। পিতৃ-পার্শ্বে, মাতৃ-সকাশে, শত্রু-নিপাত পরামর্শে সকল সময়েই সেই ভুবন-মোহিনীর আশ্চর্য্য সাহস, অপরিসীম স্বদেশানুরাগ ও অসামান্য সৌন্দর্য্য সজীব চিত্রের ন্যায় মানস-চক্ষে সন্দর্শন করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া কি অমরসিংহ দেশের অবস্থা চিন্তনে উদাসীন ছিলেন? যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী—তজ্জন্য সতর্কতা বিধেয়—একথা শিশোদিয়া বংশাবতংস মহারাণা প্রতাপসিংহের পুত্র সম্পূর্ণই জানিতেন, এবং দিবা কি রাত্রি সততই তিনি সমরায়োজনে রত থাকিতেন।

রাত্রি এক প্রহর। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী বিশ্বভূমে অবতীর্ণা। বহুদূরে কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত গোগুণ্ডা দুর্গ আকাশ পর্য্যন্ত মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে; চন্দ্রালোকে দুর্গ যেন অর্ব্বলী পর্ব্বতের শাখা বিশেষ। বলিয়া প্রতীত হইতেছে। এই সময়ে যুবরাজ অমরসিংহ অশ্ব-পৃষ্ঠে গোগুণ্ডা দুর্গে গমন করিতেছেন। এখনও দুই ক্রোশ যাইতে হইবে। বেগগামী অশ্ব দ্রুতগতি চলিতেছে। হঠাৎ পার্শ্বস্থ বনমধ্য হইতে বিকট চীৎকার-ধ্বনি উঠিল। অশ্ব উৎকর্ণ হইয়া পুচ্ছ আন্দোলন ও শব্দ করিল। অমরসিংহ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ব্যাপারটা কি না জানিয়া অগ্রসর হইতেও ইচ্ছা হইল না। তখন পশ্চাৎ হইতে শব্দ হইল,—

"আজি আর নিস্তার নাই। যদি জীবনের সাধ থাকে, তবে বাদশাহের দাসত্ব স্বীকার কর।"

অমরসিংহ অশ্ব ফিরাইলেন। দেখিলেন, চারি জন মুসলমান তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ধনুকে তীর যোজন করিতেছে। এক লম্ফে তাঁহার অশ্ব তাহাদের সম্মুখীন হইল। তাহাদের লক্ষ্য ব্যর্থ হইল। তখন অমরসিংহ অসি দ্বারা পার্শ্বস্থ যবনকে আঘাত করিলেন; সে যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি করিয়া অশ্ব হইতে পড়িয়া গেল। তিন জন মুসলমান অসি হস্তে অমরসিংহকে আক্রমণ করিল; তিনি কাহাকেও আক্রমণ করিতে অবসর পাইলেন না, কেবল আত্মরক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। যবনেরা মনে মনে তাঁহার শিক্ষায় যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিল। এরূপে কার্য্যসিদ্ধ হইবে না ভাবিয়া তাহারা এককালে অনেকদূর পিছাইয়া গেল। অমরসিংহ সেই অবসরে ধনুক হইতে তীর ত্যাগ করিলেন; সে তীর এক জনের হস্ত-বিদ্ধ করিল, সুতরাং সে অগ্রসর হইতে পারিল না। অপর দুই জন সবেগে আসিয়া এককালে সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিক হইতে আক্রমণ করিল। বিচিত্র শিক্ষার প্রভাবে তিনি তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে লাগিলেন। অমরসিংহ নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন—ভাবিলেন, কিঞ্চিদ্দূরে না যাইলে জয়ের আশা নাই। ইঙ্গিতমাত্র অশ্ব বিংশ হস্ত দূরে গিয়া দাঁড়াইল। অমর তখন ঘন ঘন তীর ছাড়িতে লাগিলেন। এক তীরের আঘাতে পূর্ব্বে যাহার হস্ত-বিদ্ধ হইয়াছিল, এবার তাহার মুণ্ডবিদ্ধ হইয়া গেল। সে তখনই পঞ্চত্ব পাইল। তখন দুই জন মাত্র শত্রু অবশিষ্ট রহিল। এক জন বেগে অগ্রসর হইয়া অমরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। আর একজন দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই ব্যক্তিস্বয়ং মহাবেত খাঁ। নিয়ত অসি চালনায় অমরসিংহ নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তথাপি বিশ্বময়ী ভবানীর চরণ স্মরণ করিয়া, উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাবেত অলক্ষিত ভাবে, অমরের পশ্চাতে আসিল। অমর আগতপ্রায় বিপদের কিছুই জানিতে পারিলেন না। তখন জগৎহিতপরায়ণা দেব-মাতার দৈববাণীর ন্যায়, মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্রের ন্যায়, আকুল সিন্ধু-নীর-নিমগ্ন ব্যক্তির আশ্রয়ের ন্যায় অতি দূর হইতে শব্দ হইল,—

"রাজপুত্র ফিরিয়া দাঁড়াও! সাবধান!

নিমেষ মধ্যে রাজপুত্র ফিরিয়া দেখিলেন—জীবন গতপ্রায়—বিপক্ষের অসি উত্তোলিত। দুই জনেই তখন অমরকে আক্রমণ করিল। কিন্তু সহসা একজন মুসলমান যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক ধ্বনি করিয়া অশ্বভ্রষ্ট হইয়া পড়িল ও গতাসু হইল। অমর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভাবিলেন,—"উহাকে কে মারিল?" কেবল মহাবেত জীবিত রহিলেন। আর যুদ্ধ করা সৎপরামর্শ নহে বিবেচনায়, তিনি বিপরীত দিকে অশ্ব ফিরাইলেন। অমর ঘন ঘন তীর ছাড়িতে লাগিলেন ও তাহার পশ্চাতে অশ্ব চালাইলেন। মহাবেত পলাইতে পলাইতে কহিলেন,—

"ফিরিয়া যাও। তুমি আজি যে যুদ্ধে জয়ী হইয়াছ, তাহা বড় বড় বীরের পক্ষেও শ্লাঘার বিষয়। এই কয় মুসলমানের বীরত্বের কথা বাদশাহও অবগত আছেন। কিন্তু জানিও না, অমর! এ সৌভাগ্য প্রতিদিনই ঘটিবে। যবনের দাসত্ব অবশ্যম্ভাবী বিধিলিপি। আজি না হয় কালি ফলিবে।"

অমর বলিলেন,—

"একবার আকবরকে আসিতে বলিও—বিধি লিপির অর্থ বুঝাইয়া দিব।"

অমরের অশ্বের ন্যায় মহাবেতের অশ্ব শ্রান্ত হয় নাই। অতএব বেগে ছুটিতে লাগিল অমরের অশ্ব তাহার অনুসরণ করিতে পারিল না।

তখন অমরসিংহ হতাশ হইয়া অশ্ব ফিরাইলেন। মহাবেত তখন বনান্তরালে অদৃশ্য হইল। শ্রান্তি পরিহারার্থে ক্ষণেক বসিবেন স্থির করিয়া, অমর অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। তখন সন্নিহিত বৃক্ষপার্শ্বে দেখিলেন—বর্ষাধারিণী শ্বেতাম্বর-বিশোভিতা ভুবন-মোহিনী প্রতিমা! চন্দ্রালোকে রমণীর বদন দেখিতে পাইলেন। সবিস্ময়ে কহিলেন,—

"সেই তুমি?"

কিশোরী সম্মান সহকারে অমরসিংহকে প্রণাম করিলেন। অমর আবার কহিলেন,—

"এতক্ষণে বুঝিলাম অদ্য তোমারই উপদেশে প্রাণ পাইয়াছি, তোমারই বর্ষায় একজন যবন নিহত হইয়াছে। তোমার ঋণ ইহ জন্মে শোধিতে পারিব না।"

সুন্দরী কহিলেন,—

"সে কি কথা—আমি কি করিয়াছি? যুবরাজ—" যুবরাজ কহিলেন—

"তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাতের আশায় নিতান্ত ব্যাকুল ছিলাম। তোমার গুণগ্রাম যে কখন ভুলিতে পারিব, তাহা বোধ হয় না।"

কিশোরী লজ্জায় বদন বিনত করিলেন। অমরসিংহ আবার কহিলেন,—

"তুমি আজি এখানে কেমন করিয়া আসিলে?"

সুন্দরী হাসিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"আমি কোথায় না থাকি? আপনি এখন কোথায় যাইবেন?"

অমরসিংহ বলিলেন,—

"আমি গোগুণ্ডা দুর্গে যাইব।"

কিশোরী বলিলেন,—

"আপনি শ্রান্ত হইয়াছেন, একটু বিশ্রাম করুন,—পরে দুর্গে যাইবেন। আমি এক্ষণে প্রস্থান করি।"

"এখনই যাইবে? যদি তোমাকে কত কথা জিজ্ঞাসিব মনে করিতেছি। যাহার নিকট জীবন এত উপকারে বদ্ধ, তাহার সহিত নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় অল্প সাক্ষাতে মন তৃপ্ত হয় না।"

যখন অমরসিংহ কথা কহিতেছিলেন, সুন্দরী তখন অতৃপ্ত-নয়নে তাঁহাকেই দেখিতেছিলেন। কথা সাঙ্গ করিয়া অমরসিংহ তাঁহার বদনের প্রতি চাহিলেন; উভয়ের দৃষ্টি সম্মিলিত হইল। তখন সুন্দরী ব্রীড়া সহকারে মস্তক বিনত করিলেন। অমরসিংহ আবার বলিলেন,—

তোমার সহিত হয়ত শীঘ্র সাক্ষাৎ হইবে না!"

সুন্দরী বর্ষাগ্র দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে কহিলেন,—

এ অধীনার প্রতি কুমারের অসামান্য অনুগ্রহ। ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু হয় ত"—যাহা বলিতেছিলেন, তাহা না বলিয়া আবার বলিলেন,—

"রাত্রি অধিক হইয়া উঠিল; আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

যুবরাজ কহিলেন,—

"কে জানে আবার তোমার সহিত কবে সাক্ষাৎ হইবে?"

সুন্দরী বলিলেন,—

"সাক্ষাৎ সততই প্রার্থনীয়; কিন্তু যুবরাজ আমি কুলকামিনী—"

রাজপুত্র বলিলেন,—

"পথ শত্রু সমাচ্ছন্ন। অতএব চল, আমি তোমার সঙ্গে যাই।"

"আমি বিপরীত দিকে যাইব।"

দুর্গে না গিয়া আমি তোমার সঙ্গে বিপরীত দিকেই যাইতেছি।”

কিশোরী অবনত মস্তকে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—

“আপনার আশীর্ব্বাদে, কুমারী উর্ম্মীলা কখন ভয়ে ভীতা হয় নাই।”

ধীরে ধীরে কুমারী উর্ম্মীলা অমরসিংহের নিকট হইতে চলিতে লাগিলেন। অবিলম্বে কিশোরী নেত্র-পথের অতীত হইলেন। অমরসিংহ বহুক্ষণ মুগ্ধের ন্যায় সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে দীর্ঘ নিশ্বাস-সহ গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন ;—

“কুমারী উর্ম্মীলা—কুমারী উর্ম্মীলা কখনই মানবী নহেন!”

অমরসিংহ অশ্ব আনয়ন করিয়া আরোহণ করিলেন। সেই গভীর রজনীতে, সেই জনশূন্য অরণ্যপথে বীরবর অমরসিংহ একাকী চলিলেন। বাহ্য-প্রকৃতি তখন তাঁহার অন্তরে আর স্থান পাইতেছে না। সংসার, শত্রু, যবন, ধর্ম্ম, স্বদেশ সে সকল তখন তিনি ভুলিয়াছেন। একই বিষয় চিন্তনে তখন তাঁহার অন্তর বিনিবিষ্ট। কুমারী উর্ম্মীলা সেই চিন্তার বিষয়। সেই দিন হইতে অমরসিংহের হৃদয়ে কি এক অননুভূত-পূর্ব্ব বিদ্যুদ্বেগ সঞ্চালিত হইল ; সেই দিন হইতে অমরসিংহ নিজ-চিত্তের উপর প্রভুতা হারাইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যুবক-যুবতী।

বেলা সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর। ঘোর সন্তপ্তা মেদিনী যেন চম্ চম্ করিতেছে। প্রচণ্ড রবি-কিরণ প্রজ্বলিত বহ্নিবৎ প্রতীত হইতেছে। এইরূপ সময়ে কুমার রতনসিংহ দেবলবর নগরের রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে মহারাণা বা তাঁহার অধীনগণ দেবলবর-রাজের সহিত সৌহার্দ্দ রাখেন নাই। নানা কারণে মহারাণা বৃদ্ধ দেবলবর-রাজের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার যাহাতে বিরাগ, তাঁহার অনুগতগণেরও তাহাতেই বিরাগ। কিন্তু সম্প্রতি তাঁহাদের মনোমালিন্য বিদূরিত হইয়াছে ; মহারাণা এক্ষণে বৃদ্ধ রাজার প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে সহচররূপে গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি এক্ষণে আর কাহারও বিরাগভাজন নহেন। মহারাণার অপ্রীতি জন্মিবার পূর্ব্বে রতনসিংহ কখন কখন দেবলবরে আসিতেন ; কিন্তু যে পাঁচ বৎসর মহারাণা বৃদ্ধের উপর বিরক্ত ছিলেন, সে কয় বৎসরের মধ্যে কাহার সাহস যে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখিবে! অদ্য পাঁচ বৎসর পরে, রতনসিংহ আবার দেবলবর নগরের রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া, দৌবারিককে জিজ্ঞাসিলেন,—

“রাজা কোথায়?”

দৌবারিক সবিনয়ে নিবেদিল,—

“তিনি গত তিন দিবসাবধি বাটী নাই,—কোথায় আমরা জানি না।”

কুমার বলিলেন,—

"তিনি আজি আসিবেন কথা ছিল। কেন আইসেন নাই, বুঝিতেছি না।"

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া আবার বলিলেন,—

"আমি আপাততঃ কিয়ৎকাল এখানে বিশ্রাম করিব।"

দৌবারিক বলিল,—

"অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সহিত আসুন!

কুমার রতনসিংহ ভবন-মধ্যে প্রবেশিলেন। দেবলবর-রাজের প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহাকে পরম সমাদরে সঙ্গে করিয়া একটি প্রকোষ্ঠ-মধ্যে লইয়া গেলেন। সেই প্রকোষ্ঠে একখানি তৃণাচ্ছাদিত পালঙ্ক ছিল; রতনসিংহ তাহার উপর উপবেশন করিলেন। দুইজন ভৃত্য বায়ু ব্যজন করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে কুমার সেই খট্টোপরি গভীর নিদ্রাভিভূত হইলেন। অপরাহ্ন কালে কুমারের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সন্ধ্যা উপস্থিত প্রায়। আর এখানে অবস্থান করা বিধেয় নহে বিবেচনায় সত্বর মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। এমন সময় একজন দাসী আসিয়া নিবেদন করিল,—

"কুমারী যমুনাদেবী মহাশয়কে জানাইতে বলিলেন যে তাঁহার পিতা দেবলবর-রাজ কার্য্যানুরোধে এখানে উপস্থিত নাই। মহাশয়ের পদার্পণে তাঁহাদের ভবন পবিত্র হইয়াছে, কিন্তু মহাশয়ের সমুচিত অভ্যর্থনা তিনি কিছুই জানেন না। অতএব তাঁহার প্রার্থনা যে, মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার সমস্ত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।"

কুমার জিজ্ঞাসিলেন,—

"কুমারী যমুনা এখন কেমন আছেন?"

"ভাল আছেন।"

রতনসিংহ বলিলেন,—

"কুমারীর সৌজন্যে আমি পরম প্রীত হইলাম; আমাদের আজি কালি কিরূপ অবস্থা তাহা অবশ্যই দেবলবর-রাজ-তনয়ার অবিদিত নাই। আমি সেই জন্যই সম্প্রতি তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছি।"

দাসী প্রস্থান করিল এবং অনতিবিলম্বে পুনরাগমন করিয়া নিবেদন করিল—

"যুবরাজ! অদ্য সন্ধ্যা উপস্থিত; সুতরাং অন্ধকারে ও রাত্রিকালে গমনের কষ্ট হইবে। এজন্য কুমারীর প্রার্থনা যে, পদার্পণে যাহাদিগকে পরমানন্দিত করিয়াছেন, আতিথ্য গ্রহণে তাহাদিগকে পবিত্র করুন।"

কুমার কিয়ৎকাল নিরুত্তর থাকিয়া চিন্তা করিলেন, পরে কহিলেন,—

"তাহাই হইল—এ রাত্রি পূজ্যপাদ দেবলরাজ ভবনেই অতিবাহিত করিব। বিশেষ যমুনা দেবীর যে যত্ন—"

দাসী বলিল,—

"রাজপুত্র! কুমারী যে কেবল আপনাকে এরূপ যত্ন করিতেছেন, তাহা নহে; অতিথি সৎকার তাঁহার নিতান্ত প্রিয়কার্য্য। রাজার আন্তরিক বৈষয়িক কার্য্য কুমারী নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। রাজ্যস্থ দীন, দুঃখী, মহৎ সকলেই তাঁহাকে লক্ষ্মী, স্বরূপা বলিয়া জ্ঞান করে।"

রতনসিংহ বলিলেন,—

"না হইবে কেন? দেবলরাজ যেমন ধর্ম্মপরায়ণ তাঁহার দুহিতাও অবশ্যই তদনুরূপ হইবেন। কুমারী যে এত গুণবতী হইয়াছেন, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। কুমারী আমার অপরিচিতা নহেন; পূর্ব্বে আমার এখানে সতত যাতায়াত ছিল। গত পাঁচ বৎসর

এখানে আসি নাই। কেন আসি নাই, তাহা কুমারী অবশ্যই জ্ঞাত আছেন।”

দাসী করযোড়ে কহিল,—

“এ দাসীরও তাহা অবিদিত নাই।”

দাসী প্রস্থান করিল; কিছুকাল পরে পুনরাগতা হইয়া নিবেদিল,—

“সায়ং সন্ধ্যার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত; অতএব যুবরাজ আগমন করুন।”

দাসী চলিল, কুমারও তাহার অনুসরণ করিলেন।

সুপ্রশস্ত কক্ষে আহ্নিকোপযোগী আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত। কুমার তথায় গিয়া ভক্তিভাবে আরাধনা করিলেন। অতঃপর দাসী স্বর্ণ-পাত্র পূর্ণ করিয়া নানাবিধ সুখাদ্য দ্রব্য আনিয়া দিল। অনতিবিলম্বে কুমারী যমুনা তথায় আগমন করিলেন।

যমুনার বয়স ষোড়শ বর্ষ। তাঁহার দেহ পরিণত ও সুকুমার সর্ব্বত্র টলটলিত। বর্ণ প্রদীপ্ত উজ্জ্বল ও গৌর। কেশ-রাশি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; মুক্তমালা-বিজড়িত বেণী পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত। নয়ন যুগল টানা স্থির, প্রশান্ত, উজ্জ্বল ও অসামান্য বুদ্ধির পরিচায়ক। তারাদ্বয় নিবিড় কৃষ্ণ। নাসিকা উন্নত; তদগ্র চিক্কণ; মধ্যনাসা বিদ্ধ, তাহাতে মূল্যবান্ মুক্তাসম্বলিত একটি নোলক লম্বমান। কর্ণদ্বয়ে দুই হীরক-খচিত দুল বিলম্বিত। কণ্ঠ স্তরে স্তরে চিহ্নিত, তাহাতে অলস্ত প্রস্তরখণ্ডপূর্ণ সৌবর্ণ চিক পরিশোভিত। হস্তদ্বয় স্থূল, গোল ও সুকুমার। প্রকোষ্ঠে হীরক-খচিত স্বর্ণ-বলয় এবং বাহুতে তদ্বিধ তাড়। তাঁহার পরিধান অতি মনোরম ও স্বর্ণোজ্জ্বল পরিচ্ছদ।

যমুনা দেবলবর-রাজের একমাত্র সন্তান। শত পুত্র হইলেও দেবলবর-রাজ যে আনন্দ না পাইতেন, এই কন্যা হইতে তদধিক আনন্দ লাভ করিতেছেন। রাজকুমারী পিতার রাজকার্য্যের সহায়, আনন্দের হেতু, বিপদে বুদ্ধি ও গৃহকর্ম্মে কর্ত্রী। যখন যমুনা পঞ্চবর্ষ বয়স্কা, সেই সময়ে যমুনার মাতৃবিয়োগ হয়। দেবলবর-রাজ আর দার-পরিগ্রহ করেন নাই। একে মাতৃহীনা, তাহাতে একমাত্র সন্তান, তাহাতে আবার একাধারে এত গুণ; সুতরাং যমুনা পিতার অসামান্য স্নেহের পাত্রী।

কুমারী যমুনা বীড়াবনত-বদনে তথায় আগমন করিলেন। রতনসিংহ মোহিত হইলেন! দেখিলেন, তিনি তাঁহার পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে যাহাকে একাদশবর্ষীয়া বালিকা দেখিয়াছেন, সেই যমুনা এখন পূর্ণাঙ্গী। সে এখন যৌবনের সুরভি-পূর্ণ পুষ্পময় পথে প্রবেশ করিতেছে। আর সে বালিকার সে তরল হাসি, সে তরল ভাব নাই; লজ্জা এখন তাহার সকল অঙ্গে মাখা। আর রতনসিংহ? রতনসিংহও এখন তেমন ক্রীড়াশীল বালক নহে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ক্রীড়াই যাহার প্রধান আমোদ ছিল, আজি সে দেশের স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যাহাদের বালক ও বালিকা বলা যাইত, আজি তাহারা যুবক ও যুবতী।

যমুনা অবনত মস্তকে লজ্জা-জনিত পরম রমণীয় ভাব সহকারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রকোষ্ঠ মধ্যস্থ প্রদীপ-জ্যোতিঃ তাহার কর্ণস্থ হীরকে, নাসিকাস্থ মুক্তায়, কণ্ঠপ্রস্তরে প্রতিভাত হইয়া জ্বলিতে লাগিল ও স্বভাব-সুন্দরীর শোভা শতগুণ সংবর্দ্ধিত করিল। রতনসিংহ কি জন্য সে স্থলে বসিয়া আছেন, তাহা ভুলিয়া গেলেন; কুমারী কি জন্য সেখানে আসিয়াছেন তাহা ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। চির-পরিচিত ব্যক্তিদ্বয়ের আজি এই নূতন ভাব! তাঁহাদের সময়-ভাণ্ডার হইতে পাঁচটি বৎসর

চুরি গিয়াছে। সেই অপ্রতুলতা তাঁহাদিগকে এখন এই ব্যবহার শিখাইয়া দিয়াছে। পূর্ব্বে যাহারা বালক ও বালিকা ছিলেন এখন তাঁহারা যুবক ও যুবতী হইয়াছেন।

প্রথমে রতনসিংহ কথা কহিলেন। জিজ্ঞাসিলেন,—

"কুমারী! আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?"

যমুনা নতমুখে বলিলেন,—

"আপনি অনেক দিন আসেন নাই।"

"সেই জন্যই কি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ?"

কুমারী একটু হাসি মিশাইয়া বলিলেন,—

"আপনিই বরং আমাদিগকে ভুলিয়াছেন। আগে তো আপনাকে এখানে থাকিবার নিমিত্ত এত বলিতে হইত না।"

"আমাদের এখন যে সময় তাহা তো তুমি জান।"

"তাহা হইলেও একবার দেখা না করিয়া যাইবার কথা বলা, নিতান্ত অপরিচিতের ব্যবহার।"

দোষ কুমারের, সুতরাং তাঁহারই পরাজয় হইল। এমন সময় সেই দাসী তথায় আসিল। তখন যমুনা তাহাকে বলিলেন—

"কুসুম! পিতা বাটী নাই; সুতরাং কুমারের ন্যায় ব্যক্তির যথোচিত অভ্যর্থনা হইতেছে না। ইনি হয়ত কতই দোষ গ্রহণ করিতেছেন।"

রতনসিংহ বলিলেন,—

"তুমি আমার সহিত অত্যন্ত শিষ্টাচার আরম্ভ করিয়াছ; ইহা আমার পক্ষে এখানে এক প্রকার নূতন অভ্যর্থনা বটে।

"নূতন কেন? আপনি যে এখন অপরিচিত লোক।"

আবার তাঁহারই পরাজয়। তখন রতনসিংহ বলিলেন—

পাঁচ বৎসর এখানে আসি নাই; হঠাৎ আসিলে যদি চিনিতে না পার—

রাজকুমারী বাধা দিয়া কহিলেন,—

"যাহারা আপনার আত্মীয়তা শিথিল বলিয়া জানে, তাহারা পরের আত্মীয়তাও দৃঢ় বলিয়া মনে করিতে পারে না। আপনাকে পাঁচ বৎসর পরে দেখিয়া চিনিতে পারিব না?"

কুমারের তিনবার পরাজয় হইল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, কুমারীর সহিত এতকাল পরে প্রথম সাক্ষাৎ দেবলবর-রাজের সম্মুখে হওয়াই বিধেয়। কারণ এই কালের মধ্যে কুমারীর বয়সের পরিবর্ত্তনের সহিত, হয়ত তাঁহার মনেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে। হয়ত বালিকা যমুনার সহিত যুবতী যমুনার মানসিক ভাবেরও অনেক বৈষম্য হইয়াছে। দেবলবর-রাজ বাটী না থাকায়, কুমার সাক্ষাতের প্রস্তাব করেন নাই এবং সেই দোষ উপলক্ষেই তাঁহাকে যমুনা অদ্য এতাদৃশ অপ্রতিভ করিলেন। তখন কুমারী বলিলেন,—

"আপনি জল খাউন। আবার রাত্রির আহার্য্য প্রায় প্রস্তুত।

রতনসিংহ ভাবিলেন, যমুনা আমাকে যথেষ্টই লজ্জা দিয়াছেন, কিন্তু আমিও তাঁহাকে একটা বিষয়ে শোধ দিতে পারি—ছাড়িব কেন? প্রকাশ্যে বলিলেন,—

"দেবলবর-রাজ-কুমারী যে রাজধানীর সমস্ত নিয়ম জানেন না, বা জানিয়াও পালন করেন না, ইহা আশ্চর্য্য।"

কুমারী শঙ্কিতভাবে কুমারের মুখের প্রতি চাহিলেন। তাঁহার হীরক-খচিত কর্ণাভরণ দুলিতে লাগিল। মার দেখিলেন—অপূর্ব্ব! বলিলেন,—

"আমরা মহারাণার আদেশক্রমে পাতা ভিন্ন আর কিছুর উপর আহার করি না, তাহা কি তুমি জান না?"

তখন কুমারী চমকিত হইয়া দুই পদ পিছাইয়া গেলেন এবং উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া, গদগদস্বরে কহিলেন,—

"ভগবন্ ভৈরবেশ! তুমিই জান এ হৃদয়ে মহারাণার আদেশের কি মূল্য। আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের বিনিময়েও মহারাণার আজ্ঞা-লঙ্ঘন-পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না।"

আবার কুমারের প্রতি চাহিয়া, কহিলেন,—

"সর্ব্বনাশ! কুমার আমাকে মার্জ্জনা করুন। আমার দোষে ও ভুল ঘটে নাই; কুসুমের অমনোযোগীতায় উহা ঘটিয়াছে। যাহারই জন্য হউক, অপরাধ আমারই—আমাকে মার্জ্জনা করুন।"

কুমার সানন্দে দেখিলেন, এই কুসুম-সুকুমারীর কোমল অন্তরেও কেমন রাজভক্তি ও স্বদেশানুরাগের তাড়িত-লহরী খেলিতেছে। ভাবিলেন,'এ দেশ কখনই অধঃপতিত হইতে পারে না।'

কুসুম ব্যস্ততাসহ একখানি পাতা আনিয়া দিল। যমুনা খাদ্য দ্রব্য সমস্ত সেই পাতার উপর স্থাপন করিলেন ও সেই স্বর্ণ-পাত্র দূর করিয়া ফেলিয়া দিলেন। আহার সমাপ্ত হইলে, রতন সিংহ রাত্রে আর আহার করিতে অস্বীকৃত হইলেন। বলিলেন—

"বহুকাল পরে তোমাকে আজি দেখিয়া বড় আনন্দিত হইলাম।

কুমারী কথায় কোন উত্তর দিলেন না। একবার মুখ তুলিয়া প্রীতি-পূর্ণ দৃষ্টিতে রতন সিংহের মুখের প্রতি চাহিলেন। সে দৃষ্টি কত কথারই কার্য্য করিল।

আবার রতন সিংহ কহিলেন,—

"আমি তো কালি প্রত্যুষেই গমন করিব। হয় তো তোমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না।"

"কেন?"

"যে বিষম সমরায়োজন হইতেছে, তাহাতে কে বাঁচিবে, কে মরিবে, কে বলিতে পারে?"

সুন্দরী ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,—

"ভবানী করুন মিবার যেন জয়ী হয়।"

কুমার গাত্রোত্থান করিলেন। কুসুম তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। বাহিরে প্রকোষ্ঠে আসিবামাত্র প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন এবং এক সুবিস্তীর্ণ প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া,তাঁহাকে এক খানি তৃণাচ্ছাদিত খট্টা দেখাইয়া দিলেন। কুমার তথায় উপবেশন করিলে কর্ম্মচারী নিম্নে বসিয়া মহারাণা যুদ্ধ, যবন ইত্যাদি নানাবিষয়ক আলাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। কর্ম্মচারী বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। কুমার শয়ন করিলেন—নিদ্রার জন্য, না চিন্তার জন্য? চিরকাল যাহাকে দেখিয়া আসিতেছেন, তাহাকে পাঁচ বৎসরের পরে আজি একবার দেখিয়া, এই অসিজীবী যুবকের হৃদয়ে এক অননুভূত পূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল; আজি তাঁহার শয্যা চিন্তার নিকেতন হইল; আজি তিনি সংসার নূতন চক্ষে দেখিতে লাগিলেন; আজি কুমারী যমুনা তাঁহার অন্তরে ও বাহিরে বিরাজ করিতে লাগিলেন। কুমারের রাত্রে ভাল নিদ্রা হইল না। আরও একটি নিরীহ প্রাণীর নিকট সে রাত্রি নিদ্রা ভাল করিয়া দেখা দেন নাই। তিনি যমুনা।

অতি প্রত্যুষে রতনসিংহ শয্যা-ত্যাগ

করিয়া উঠিলেন এবং গমনার্থ প্রস্তুত হইলেন। যখন তিনি প্রকোষ্ঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, তখন দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে যমুনা, তৎ-পশ্চাতে কুসুম। বিদায়-দান ও বিদায়-গ্রহণ সমাপ্ত হইল। ইতিহাসে তাহার বৃত্তান্ত লেখা নাই বটে, কিন্তু আমরা শুনিয়াছি যে, সেই বিদায় কালে রতনসিংহ 'পত্তন নগর যাইব' বলিতে 'প্রতাপসিংহ নগর যাইব' বলিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং পথে ভুলক্রমে অশ্বকে অনেকক্ষণ বিপরীত দিকে চালাইয়াছিলেন। আর কুসুম লোকের নিকট গল্প করিয়াছিল যে, রতনসিংহ চলিয়া যাওয়ার পরে, চারি পাঁচ দিন যমুনা তাহাকে মধ্যে মধ্যে 'কুমার' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রিয় হরিণ শিশুকে তিন দিন আহার দেন নাই। কিন্তু এ সকল আমাদের শুনা কথা— ইহার কোন প্রমাণ রাখি না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মস্তক-বেদনা।

উদয়-সাগর বেষ্টন করিয়া যে অত্যুচ্চ প্রস্তর-প্রাচীর আছে, তাহার উত্তর ধারে পঞ্চাশটি পট-মণ্ডপ স্থাপিত হইয়াছে। দুইটি বস্ত্র-গৃহ অত্যুৎকৃষ্ট বনাতে রচিত। তাহার উপরিস্থ স্বর্ণ-কলস রবি-কিরণে ঝলসিতেছে এবং তাহার উর্দ্ধদেশে বাদশাহের নিশান উড়িতেছে। অবশিষ্ট পট-মণ্ডপগুলি তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। বাদশাহ আকবরের প্রধান সেনা-নায়ক মহারাজ মানসিংহ, সোলাপুর জয় করিয়া আসিতেছিলেন। উদয়পুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার মহারাণা প্রতাপসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা জন্মে। ইতিহাসানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, মানসিংহ, বাদশাহ আকবরের পুত্র সেলিমের সহিত, আপনার ভগিনীর বিবাহ দেন। এজন্য তিনি তেজীয়ান রাজ-পুতদিগের চক্ষে অত্যন্ত ঘৃণার পাত্র হইয়া-ছিলেন। তাঁহার পদ প্রতিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ হইলেও, স্বজাতীয়েরা তাঁহাকে পতিত কলঙ্কিত বলিয়া নিন্দা করিত। অসাধারণ বুদ্ধিমান মানসিংহ লোকের মনোভাব বুঝিতে অক্ষম ছিলেন না। এই কলঙ্ক বিদূরিত করিবার কেবল একই উপায় ছিল। সে উপায়—মহারাণা প্রতাপসিংহের অনুগ্রহ। মহারাণা রাজপুত কুলের চূড়া। তাঁহার কার্য্যের বা ইচ্ছার দোষ উল্লেখ করে, এত সাহস বা সেরূপ মতি কাহারও নাই। অতএব প্রতাপসিংহ যদি তাঁহাকে কৃপা করেন, যদি দয়া করিয়া তাঁহার সহিত একত্র আহার করেন, তবে আর কাহার সাধ্য তাঁহাকে ঘৃণা করে, বা পতিত বলিয়া ধিক্কার দেয়। এই জন্য মহারাজ মানসিংহ স্থির করিলেন যে, মহারাণার ভবনে অতিথি স্বরূপে উপস্থিত হইলে তিনি অবশ্যই অনুকম্পা করিবেন। মানসিংহ অদ্য স্থির-প্রতিজ্ঞ। প্রতাপের করুণা লাভ করিতে হইবে—এ অপমান আর সহিব না।

মানসিংহ শিবির-সন্নিবেশ পূর্ব্বক সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি মহারাণার সহিত সাক্ষা-তের অভিলাষী এবং অদ্য তাঁহার দ্বারে অতিথি! প্রতাপসিংহ, পুত্র অমরসিংহ সহ,

সমাগত হইয়া মানসিংহকে সমাদর করিলেন। সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যক্তিদ্বয়ের সাক্ষাৎ হইল। একজন গৌরব ও তেজ বিক্রয় করিয়া ধন, সম্পদ ও ক্ষমতা লাভ করিয়া আনন্দিত। আর একজন ধন, সম্পদ ও ক্ষমতা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আপনার অসীম গৌরব ও তেজের বলে বলীয়ান্ ও আনন্দিত। একজন অমিত-প্রতাপ বাদশাহের দক্ষিণহস্ত, তাঁহার বিপদে সহায়, আনন্দে সুহৃদ, মন্ত্রণায় সচিব ও অভ্যুদয়ের মূল। আর একজন, বাদশাহের পরম শত্রু, তাঁহার পদের অবমাননাকারী, তাঁহার প্রতাপে অকাতর, তাঁহার দর্পহরণে চেষ্টান্বিত। একজন অযথা সম্পদশালী, অত্যুন্নত পদ-প্রতিষ্ঠা-ভাজন ও অসাধারণ সমরনিপুণ হইলেও, বাদশাহের অধীন। আর একজন, ধন-জন-গৃহ-শূন্য পথের ভিখারী হইলেও, এ জগতে কাহারও নিকট মস্তক নত করেন না,—কাহারও অধীন নহেন। একজন রাজপুত-কুলের চক্ষে ভ্রষ্ট ও পতিত। আর একজন তাঁহাদের চক্ষে স্বর্গের দেবতার ন্যায় ভক্তি-ভাজন ও তদ্রূপ সমাদরে পূজিত। একজন যাহা হারাইয়াছেন, তাহা এ জীবনে আর পাইবার আশা নাই। আর একজন যাহা হারাইয়াছেন, তাহা পুনরুদ্ধার করিবার শত সহস্র উপায় আছে। অদ্য এই দুই জন বিভিন্ন অবস্থাপন্ন, বিভিন্ন-স্বভাবশালী, এবং বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তির পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। অদ্য বাদশাহ আকবরের প্রধান সেনাপতি; অম্বর রাজ্যের অধীশ্বর মহারাজ মানসিংহ, রাজ্যহীন, অরণ্যবাসী, দরিদ্র প্রতাপসিংহের দ্বারে অতিথি—তাঁহার কৃপার ভিখারী।

সাক্ষাৎ, শিষ্টাচার, আলাপ সমাপ্ত হইল। তখন মানসিংহ বলিলেন,—

"মহারাণা রাজপুতকুলের চূড়ামণি। আপনাকে দেখিলেই মনে যেন কেমন অতুল আনন্দের উদয় হয়।"

মহারাণা পরিহাস-স্বরে বলিলেন,—

"এ ধন-জন-শূন্য দুর্ভাগাকে দেখিয়া দিল্লীশ্বরের প্রধান সেনানায়ক ও অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর অম্বর রাজের আনন্দের কোনই কারণ নাই।"

মহারাজ মানসিংহ একটু অপ্রতিভ হইলেন; বলিলেন,—

তুচ্ছ ধন-সম্পত্তি ভূমণ্ডলে ছড়াছড়ি আছে, কিন্তু মহারাজা যে ধনে ধনী তাহা কয় জনের ভাগ্যে মিলে?

প্রতাপসিংহ হাসিয়া বলিলেন,—

"সকলে এ কথা বুঝে কি?"

"যে না বুঝে সে মূঢ়।"

"আপনি যখন এতদূর বুঝেন, তখন অবশ্য ইহাও বুঝেন যে, আমার যাহা আছে, তাহা সকলেই ইচ্ছা করিলে রাখিতে পারিত!"

সুচতুর মানসিংহ দেখিলেন কথা ক্রমেই তাঁহাকেই আক্রমণ করিতেছে। কি উত্তর দিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। বদন একটু লজ্জিত ভাব ধারণ করিল! কিন্তু তিনি অদ্য স্থির-প্রতিজ্ঞ; তিনি অদ্য অপমানও হাসিয়া উড়াইবেন; তিনি অদ্য ক্রোধের বশীভূত হইয়া কার্য্য হানি করিবেন না। বলিলেন,—

যে রাখে নাই সে আপনিই মরিয়াছে।—এখন মহারাণা আর কত দিন এমন করিয়া থাকিবেন?"

"যত দিন জীবন। নচেৎ উপায়ই বা কি?

"উপায় কি নাই?"

মহারাণা অনেক চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

"আছে—আপনাদের অনুসরণ করিতে পারিলে উপায় হয়। কিন্তু সে উপায় কখনই প্রতাপসিংহের গ্রহণীয় হইবে না।"

আবার মানসিংহের বদন-মণ্ডল নিষ্প্রভ-ভাব ধারণ করিল। তাঁহার ললাট দিয়া ঘর্ম্ম বাহিরিতে লাগিল এবং তাঁহার চক্ষু ঈষদশ্রু আবির্ভাব হেতু একটু উজ্জ্বল হইল। কিন্তু তিনি অত্য স্থির-প্রতিজ্ঞ! বহুক্ষণ পরে আবার বলিলেন,—

"আপনি ভাবিয়া দেখুন কি কর্ত্তব্য। বলুন আর কি উপায় আছে? আপনি কি উপায়ে মান রক্ষা করিবেন?"

প্রতাপসিংহ হাসিয়া বলিলেন,—

"যুদ্ধ করিব, জয় করিব। সাহসে কি না হয়?

"স্বীকার করি, সাহসে অনেক মহৎ কার্য্য হয়; কিন্তু মহারাণা, সময়টা একবার বিবেচনা করুন।"

"সময় যে মন্দ সেও আপনাদের জন্য। আপনারা। যদি আমাদের পক্ষ ত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে ক্ষুদ্র আকবরকে আমরা তৃণের ন্যায় উড়াইয়া দিতাম! ভারতে আকবরের যত শ্রীবৃদ্ধি, আপনার হস্তের পরাক্রমই অধিকাংশ স্থলে তাহার কারণ! অম্বররাজের সেই পরাক্রান্ত হস্ত বিধর্ম্মী যবন-সেবায় নিয়োজিত না হইলে, আকবর-বুদ্বুদ সময়-সলিলে মিশিয়া যাইত; তাহার নিদর্শনও থাকিত না।"

মানসিংহ বলিলেন,—

"যাহা হইয়াছে তাহা তো আর ফিরিবে না; এখন—"

মহারাণা বাধা দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"এখন কি আপনি সকল শৃগালকেই লাঙ্গুল-হীন দেখিতে ইচ্ছা করেন?"

মানসিংহ নীরব ও অধোমুখ। কিন্তু তিনি অত্য স্থির-প্রতিজ্ঞ। বহুক্ষণ পরে আবার বলিলেন,—

"মহারাণার বীরত্ব বাদশাহ বাহাদুরের অবিদিত নাই। তিনি নিয়তই মহারাণার প্রশংসা করিয়া থাকেন।"

প্রতাপসিংহ বলিলেন,—

"যবন ভূপালের গুণগ্রাহিতায় আপ্যায়িত হইলাম। কিন্তু আমি তাঁহার নিকট সম্যগ্‌রূপে আমার ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারিতেছি না, ইহাই দুঃখ।"

"কিন্তু মহারাণা! বাদশাহের পক্ষ যেরূপ বলবান্, তাহাতে।এ পক্ষের জয়ের আশা বড় অনিশ্চিত নয় কি?"

মহারাণা বলিলেন,—

"জয় না হইলেও মানের আশা আছে। যে গৌরব এত দিন শিশোদিয়াকুল রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহা কাহার সাধ্য নষ্ট করে?"

"এ কথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু সে গৌরব রক্ষা করিতে যে আয়োজন চাই, তাহা মহারাণার আছে কি?"

"আমার যদি কিছুই না থাকে, তথাপি আমার আমি আছি; এবং যতক্ষণ আমি থাকিব, ততক্ষণ চন্দ্রবংশের গৌরব অটুট থাকিবে।"

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তাহাই হউক। মহারাণা যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ রাজপুতজাতির ভরসা আছে। কিন্তু মহারাণাও তো চির দিন নহেন।"

"তখন কি হইবে জানি না। সম্ভবতঃ তখন এ গৌরব বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু সে পাপে কখনই প্রতাপসিংহ পাপী নহে।"

মানসিংহ বলিলেন—

"অবশ্য। কিন্তু আমি বলি যাহা থাকিবে না জানিতেছেন, তাহার জন্য এত ক্লেশ কেন করিতেছেন?"

প্রতাপসিংহের চক্ষু উজ্জ্বল হইল, অথচ তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"এ কথা আপনাদের মুখে ভাল শুনায়। মিবারের প্রতাপসিংহ ওরূপ কথায় কর্ণপাত করে না।"

আবার মহারাজ মানসিংহ নীরব। তিনি রুপে বদনাবৃত করিয়া অধোমুখ হইলেন। কিন্তু তিনি অস্থ স্থির-প্রতিজ্ঞ।

এক জন কর্ম্মচারী আসিয়া সংবাদ দিল,—

"আহার্য্য প্রস্তুত।"

প্রতাপসিংহ মানসিংহের মুখের প্রতি চাহিলেন।

মানসিংহ বলিলেন,—

"ক্ষতি কি?"

প্রতাপসিংহ বলিলেন—

"আমি স্বয়ং একবার দেখিয়া আসি। আপনি ক্ষণেক অপেক্ষা করুন।"

বহুক্ষণ পরে অমরসিংহ আসিয়া সংবাদ দিলেন,—

"মহারাজ! অন্ন প্রস্তুত।"

মানসিংহ অমরসিংহের অনুসরণ করিলেন।

প্রাসাদের সন্নিহিত এক মনোহর স্থান এই রাজ-অতিথির সৎকারার্থ নিরূপিত হইয়াছিল। তথায় স্বর্ণপাত্রে অন্নাদি খাদ্য সমস্ত বিন্যস্ত হইয়াছে; এবং অদূরে এক বৃক্ষপত্রে তথাবিধ আহার্য্য সমস্ত পরিস্থাপিত রহিয়াছে। মানসিংহ দেখিয়াই বুঝিলেন, পাতাটি মহারাণার উদ্দেশেই পাতিত হইয়াছে; অতএব এত অপমান সহ্য করা নিষ্ফল হইবে না। চতুর্দ্দিকে চাহিলেন—মহারাণা সেখানে নাই। মনে একটু আশঙ্কা জন্মিল। বলিলেন,—

"রাজপুত্র! তোমার পিতা কোথায়?"

অমরসিংহ তাঁহাকে সেই স্বর্ণ-পাত্র দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,—

"মহারাজ উপবেশন করুন—পিতা আসিতেছেন।"

মানসিংহ বলিলেন,—

"মহারাণা বৃক্ষ-পত্রের উপর আহার করিবেন, আমাকে স্বর্ণ-পাত্র কেন?"

অমরসিংহ বলিলেন,—

"তাহাতে হানি কি? মহারাণা যেরূপ কারণে বৃক্ষ-পত্রে আহার করেন, মহারাজের সেরূপ কোন কারণ নাই।"

মানসিংহ পাত্র সমীপস্থ হইয়া উপবেশন করিলেন। বলিলেন—

"যুবরাজ। মহারাণা কি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত আছেন?"

অমরসিংহ বলিলেন,—

"আপনি আহার করিতে আরম্ভ করুন—আমি তাঁহার সন্ধান করিতেছি।"

মানসিংহ বলিলেন,—

"তাহা কিরূপে হইবে? তাঁহাকে ফেলিয়া আমি কিরূপে আহার করিতে পারি? তুমি তাঁহার সন্ধান কর!"

অমরসিংহ প্রস্থান করিলেন এবং অনতিবিলম্বে প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন,—

"মহারাণা অনুমতি দিলেন—আপনি আহার করিতে পারেন। তিনি একটু বিলম্বে আসিতেছেন। বিশেষ প্রয়োজন হেতু তিনি পার্শ্বস্থ প্রাসাদে গমন করিলেন। শীঘ্রই আসিবেন।"

তখন মানসিংহের মন সন্দেহে আচ্ছন্ন হইল। বুঝি বাসনা সফল হয় না। তখন

ভাবিলেন, মহারাণার নিমিত্ত আহারের স্থান করা হইয়াছে, সেটা তো শিষ্টাচার ও কৌশল। আমাকে বুঝাইতে চাহেন যে, তাঁহার স্থান পর্য্যন্ত করা হইয়াছিল, আহারে আপত্তি ছিল না, কেবল একটা অজ্ঞাত-পূর্ব্ব কার্য্যের প্রতিবন্ধকতায় আসিতে বিলম্ব হইয়া পড়িল। হায়! এত অপমান সহিয়া, দ্বারে আসিয়া উপযাচক হইয়াও, আশার সফলতা হইল না। তিনি আচমন করুন: অন্নদেবতার উদ্দেশে সমস্ত আহার্য্য উৎসর্গ করিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। প্রতাপসিংহ আসিলেন না। খাদ্য সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। তিনি বলিলেন।

"কুমার! প্রাসাদ তো অধিক দূর নহে। তুমি আর একবার যাও—দেখিয়া আইস, কেন তাঁহার বিলম্ব হইতেছে।"

অমরসিংহ পুনর্ব্বার গমন করিলেন এবং অনতিকাল মধ্যে প্রত্যাগত হইয়া কহিলেন,—

"মহারাজ! পিতা শিরোবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়াছেন। সুতরাং তিনি যে এখন শীঘ্র আসিতে পারেন এমন বোধ হয় না। অতএব মহারাজ আর অপেক্ষা না করিয়া, আহার করিতে আরম্ভ করুন।"

মানসিংহ বুঝিলেন, প্রতাপসিংহ তাঁহার সহিত একত্র আহার করিলেন না। মস্তক-বেদনা তো ছলনা। অপমান সার হইল, মনোরথ পূরিল না। এত ধৈর্য্য, এত সহিষ্ণুতা সকলই বৃথা হইল। স্থির-প্রতিজ্ঞায় ফল ফলিল না। তিনি অনেকক্ষণ গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিলেন। অমরসিংহ দেখিলেন, সেই জগজ্জয়ী, বীর-শ্রেষ্ঠ মহারাজ মানসিংহের নয়ন, জলভারাক্রান্ত হইল। তিনি একবার ভাবিতেছেন, "এ অপমানের প্রতিশোধ দিব।" অমনই ক্রোধে তাঁহার বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিতেছে। আবার তখনই অসাধারণ ধীরতা সহকারে সে রাগ নিবারণ করিতেছেন। বহুক্ষণনিস্তব্ধতার পর মানসিংহ বলিলেন,—

"কুমার! তুমি অশেষ বুদ্ধিমান্ হইলেও বালক। তুমি বুঝিতেছ না, মহারাণার কেন মস্তক-বেদনা উপস্থিত। কিন্তু মহারাণার বুঝিয়া দেখা উচিত, যাহা হইয়াছে তাহার আর হাত নাই; আমরা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি, আর ফিরিবার উপায় নাই; যে ভ্রম ঘটিয়াছে, এক্ষণে তাহার সংশোধন করা অসম্ভব। তিনি রাজপুত জাতির চূড়া; সেই জন্যই আশা করিয়াছিলাম যে মহারাণা অদ্য আমার জাতিদান করিবেন। কারণ তাঁহার কার্য্যের উপর আপত্তি করে এমন ব্যক্তি কে আছে? মহারাণা যদি আমার সহিত একত্র আহার করিতে অস্বীকৃত হইলেন, তাহা হইলে আর কে আমার সহিত আহার করিবে? আর ভাবিয়া দেখ, ইহাতে মহারাণার লাভই বা কি হইল? মানসিংহের সহিত মিত্রতা অপেক্ষা শত্রুতা করা সুবিধা নহে। মানসিংহের ক্ষমতা মহারাণার অগোচর নাই। অদ্য তাহাকে এতদ্রূপে অপমানিত না করিলে, সেই মানসিংহ তাঁহার চরণের দাস হইয়া থাকিত; সুতরাং দিল্লীশ্বরের সহিত বিরোধিতার ইচ্ছানুরূপ অবসান হইয়া যাইত এবং তাঁহার সৌভাগ্য, তাঁহার অজ্ঞাতসারে, আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিত। আর এখন? এখন মর্ম্মপীড়িত, অপমানিত, চরণদলিত মানসিংহ মহারাণার আত্মীয় নহে। তাঁহার যাহা হয় হউক, মানসিংহ আর তাহা দেখিবে না। তাহা হইলে কি হইতে পারে, তাহার চিত্র দেখাইতে আমার বাসনা নাই।"

মানসিংহ নীরব হইলেন। এখনও মান-

সিংহের সহিষ্ণুতা প্রশংসনীয়। এখনও তাঁহার কথায় ক্রোধ অপেক্ষা দুঃখের ভাগই প্রবল। এই সময় একজন উন্নত কর্ম্মচারী তথায় প্রবেশিয়া কহিলেন,—

"মহারাজ! মহারাণা, আমাকে বলিতে বলিয়া দিলেন যে, তিনি আসিতে না পারায় নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছেন। তাঁহার শিরঃপীড়া অত্যন্ত প্রবল। আর তিনি বলিতে বলিলেন যে—"

কর্ম্মচারী চুপ করিল। মানসিংহ বলিলেন,—"কি বলিতে বলিলেন, বলুন।"

"আর তিনি বলিলেন যে, যে ব্যক্তি যবনের সহিত স্বীয় ভগ্নীর বিবাহ দিয়াছে এবং সম্ভবতঃ যবন কুটুম্বের সহিত একত্র আহার করিয়া থাকে, তাহার সহিত মিবারেশ্বর কখন একত্র আহার করিতে পারেন না এবং তাহারও এরূপ দুরাশাকে মনে স্থান দেওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে।"

এতক্ষণে মহারাজ মানসিংহের সহিষ্ণুতার বন্ধন শিথিল হইয়া গেল। আর তিনি ক্রোধ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইল। লোচনযুগল আরক্ত হইল। তিনি, জাতীয় রীত্যনুসারে অভুক্ত উচ্ছিষ্ট অন্নের কিয়দংশ স্বীয় উষ্ণীষ মধ্যে রক্ষা করিয়া, আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। যাইবার সময় কহিলেন,—

"অমরসিংহ তোমার পিতাকে বলিও যে, আমরা দুহিতা, ভগ্নী প্রভৃতিকে যবন অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছি বলিয়া অদ্যাপি রাজপুতের সম্মান সংরক্ষিত হইতেছে। কিন্তু আমরা কি করিব? প্রতাপসিংহ স্বীয় গুমান-ধ্যানে অন্ধ। বুঝিলাম এ দেশে আর হিন্দুজাতির জয়ের আশা নাই। যবন-প্রতাপ-সমীপে সকলকেই নত হইতে হইবে। ভগবানের ইচ্ছা কে খণ্ডাইতে পারে?"

মহারাজ মানসিংহ অশ্বে আরোহণ করিলেন; এমন সময় মহারাণা প্রতাপসিংহ তথায় আগমন করিলেন। মানসিংহ তাঁহাকে দেখিয়া সাহঙ্কারে বলিলেন,—

"প্রতাপসিংহ! নিশ্চয় জানিও এ অপমান প্রতিশোধিত হইবে। যদি এই দুষ্কর্ম্মের যথোচিত প্রতিফল না পাও, তাহা হইলে জানিও, আমার নাম মানসিংহ নহে।

প্রতাপসিংহ হাসিয়া বলিলেন,—

"মানসিংহ! তুমি কি—আমাকে ভয় দেখাইতেছ? জানিও বাপ্পারাওয়ের বংশ ভয় কাহাকে বলে জানে না। যে মুহূর্ত্তে তোমার ইচ্ছা হয় আসিও, প্রতাপসিংহ সর্ব্বদা সংগ্রামার্থ—প্রস্তুত থাকে।"

প্রতাপসিংহের পশ্চাতে দেবলবর-রাজা দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—

"পার যদি, তবে তোমার আক্‌বর ফুফুকেও সঙ্গে লইয়া আসিও।"

মানসিংহ ব্যতীত আর যে যে সে স্থলে উপস্থিত ছিল, সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। মানসিংহের চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, তিনি অশ্ব ফিরাইলেন, আবার কি ভাবিয়া, অশ্ব ফিরাইলেন। নিমেষের মধ্যে অশ্ব অদৃশ্য হইল। অমরসিংহ বলিলেন,—

"মানসিংহ যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়াছে। আমার বোধ হয়, ইহার পরিণাম আমাদের পক্ষে কখনই শুভকর হইবে না।"

প্রতাপসিংহ হাসিয়া কহিলেন,—

"অমর! ভয় ?"

"পিতঃ! ভয়ের কথা নহে। আমার বোধ

হয়, মানসিংহ এ অপমানের প্রতিশোধার্থ প্রাণ-পণে চেষ্টা করিবে।

"ভালই তো। দেবলবর-রাজ, তুমি বেশ বলিয়াছিলে। ক্ষুদ্র-হৃদয় মানসিংহ অল্প শিক্ষা পাইয়াছে।"

অতঃপর যে স্থানে মানসিংহ আহার করিতে বসিয়াছিলেন তাহা পবিত্র গঙ্গা-জল দ্বারা বিধৌত করা হইল এবং হল দ্বারা কর্ষিত হইল। যে যে ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিলেন এবং গঙ্গা-জল সংস্পর্শে পরিশুদ্ধ হইলেন! ধন্য জাতি গৌরব! ধন্য তেজ! চণ্ডাল সংস্পর্শে যত অপবিত্রতা না জন্মে, এ অসম সাহসী, অসাধারণ বুদ্ধিমান্ যবন কুটুম্বের সহিত একস্থানে উপস্থিতি ও কথোপকথন হেতু এই রাজপুত-কুল-পুঙ্গবেরা আপনাদিগকে তদধিক অপবিত্র মনে করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

সন্ধ্যাকালে চাঁদেরী নদীতীরস্থ মৈর্ত্ত্য দুর্গ-দ্বারে যুবরাজ অমরসিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। চাঁদেরী নদী সুপ্রশস্ত; কিন্তু প্রতাপের কঠিন শাসনে, অধুনা তদুপরি এক খানি নৌকা নাই। চতুর্দ্দিক জনশূন্য। জনশূন্য নদী তীরে চতুর্দ্দিকস্থ বনারণ্য মধ্যে কৃষ্ণ-প্রস্তর বিনির্ম্মিত দুর্গ ভয়ানক দৃশ্য প্রদর্শন করিতেছে। সেই দুর্গ-সংরক্ষণ ও তাহার যথাবশ্যক ব্যবস্থা করিবার ভার অমরসিংহের উপর অর্পিত হইয়াছে। কুমার দুর্গদ্বারে সমাগত হইবামাত্র দুর্গরক্ষকেরা সসম্মানে আলোক জ্বালিয়া তাঁহাকে দুর্গাভ্যন্তরে লইয়া গেল। দুর্গ মধ্যে প্রবেশিয়া অমরসিংহের বিস্ময় জন্মিল। তিনি দেখিলেন, পার্শ্বে একখানি শিবিকা, কতকগুলি বাহক ও কয়েকজন রক্ষক-বেশ-ধারী পুরুষ রহিয়াছে। তিনি সবিস্ময়ে দুর্গরক্ষকগণকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"এ সকল কি?"

দুর্গ-রক্ষকেরা বিষম বিপদে পড়িল। তাহারা প্রভুর অজ্ঞাতসারে দুর্গ মধ্যে কাহাকেও স্থান দিয়াছে; তজ্জন্যে প্রভুপুত্র বিরক্ত হইতে পারেন বিবেচনায় নিস্তব্ধ রহিল। কুমার পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন,—

"এ কি ব্যাপার আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তোমরা বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছ কেন?"

সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ রক্ষক অগ্রসর হইয়া কর-যোড়ে কহিল,—

"অন্যায় কার্য্য হইয়াছে, ক্ষমা করিবেন। নাথদ্বার নগরস্থ রাজা রঘুবর রায়ের দুহিতা শৈলেশ্বর গমন করিতেছেন। এই স্থানে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, অথচ নিকটে আর থাকিবার স্থান নাই। তাঁহাদিগকে এইরূপ বিপদাপন্ন দেখিয়া আমরা এই দুর্গে তাঁহাদের রাত্রি যাপন করিতে দিয়াছি। তাঁহারা এক প্রান্তে আছেন।

অমরসিংহ জিজ্ঞাসিলেন,—

তাঁহারা কয়জন আছেন?"

"একটি অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক ও একজন সঙ্গিনী মাত্র।"

"রাজা রঘুবর রায়" এই শব্দটি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিয়া কুমার অমরসিংহ দুর্গের দক্ষিণ দিকস্থ একটী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তথায়

উপবেশন করিয়া মনে মনে কহিলেন,—"রাজা রঘুবর—রাজা রঘুবর ইদানীং মিবারের রাজ-মুকুটের বিশেষ অনুগত ছিলেন না।" ক্ষণেক পরে আবার ভাবিলেন,—"বিশেষ শত্রুও ছিলেন না; কিন্তু তিনি তো এখন আর এ জগতের লোক নহেন।" তাহার পর কুমার প্রধান দুর্গরক্ষককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিলে দুর্গ সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য তাহার পরামর্শ করিলেন এবং পরদিন প্রাতেই যাহাতে আবশ্যক কার্য্য সমস্ত আরব্ধ হয় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিতে করিতে ক্রমে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। তাহার পর রক্ষক ভৃত্যাদিকে বিদায় দিয়া কুমার শয়ন করিলেন। কিন্তু গ্রীষ্মাতিশয্য হেতু নিদ্রা আসিল না। অনর্থক নিদ্রার সাধনা করা রাজপুতজাতির স্বভাব নহে। কুমার গাত্রোত্থান করিয়া বায়ুসেবনার্থ ছাতের উপর আসিলেন। রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধকার নাই। বিমল জ্যোৎস্না এখন তরল জ্যোতিঃ ঢালিয়া সমস্ত পদার্থ "মলয়া অম্বরে" আবরিত করিয়াছে। প্রকৃতি শান্ত। সম্মুখে চাঁদেরী নদী গৈরিক উপকূল বিধৌত করিতে করিতে চন্দ্রমা ও অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জের ছায়া বক্ষে ধারণ করিয়া অবিশ্রান্তভাবে ধাইতেছে। অমরসিংহ সেই ছাতের উপর পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন নাথ-দ্বার-নগর নিবাসিনী কুমারী উর্ম্মিলার চিন্তায় তাঁহার চিত্ত নিবিষ্ট; সুতরাং কোন দিকেই তাঁহার দৃষ্টি নাই। একবার তিনি পার্শ্বদিকে নেত্রপাত করিলেন। সেই নেত্র তখন এক রমণীর মূর্ত্তি বহন করিয়া তাঁহার উদ্বোধন করাইল। দেখিলেন—অদূরে যুবতী স্ত্রীলোক। বুঝিলেন—দুর্গাশ্রিতা রাজা রঘুবরের কন্যা বায়ু সেবনার্থ বেড়াইতেছেন। তখন অমরসিংহের মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিল—"কুমারী উর্ম্মিলাও তো নাথদ্বার-নিবাসিনী। তবে তিনিই কি রঘুবরের কন্যা?" মীমাংসা হইল—"হইতে পারে।" তাহার পর আশঙ্কা,—"তবে কেন? পিতা রঘুবরের নামে সন্তুষ্ট নহেন।" অমরসিংহের হৃদয় শুষ্ক, অন্তর শূন্য হইয়া গেল। তাহার পর ভাবিলেন,—"অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে, আমি সে দেবী-মূর্ত্তি হৃদয় হইতে অন্তরিত করিব না।" কে যেন তাঁহাকে বলিয়া দিল,—"ঐ রমণী উর্ম্মিলা।" তাঁহার চরণ যেন অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে সেই দিকে লইয়া চলিল। অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হইয়া কুমার বুঝিতে পারিলেন,—তাঁহার আশঙ্কা সত্য—সেই কামিনী উর্ম্মিলা! অমরসিংহের মস্তক বিঘূর্ণিত হইল; পৃথিবী শূন্যবোধ হইতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বে দুইবার কুমারী উর্ম্মিলার সহিত পাঠক মহাশয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে দুইবার উর্ম্মিলা যোদ্ধৃবেশে সজ্জিতা ছিলেন। অদ্য তাঁহার বেশ অন্যবিধ। শেল, অসি, চর্ম্ম প্রভৃতির পরিবর্ত্তে হীরকখচিত স্বর্ণালঙ্কার সমস্ত অঙ্গ তাঁহার শরীরের শোভা সম্পাদন করিতেছে। তাঁহার বদনে এক্ষণে শান্তি, সরলতা, পবিত্রতা ও অসামান্য বুদ্ধি ক্রীড়া করিতেছে। কোমলতা তাঁহার সকল অঙ্গে মাখা। কে বলিবে, এই ভুবনমোহিনী গভীরা রজনীতে, একাকিনী, ঘনারণ্য মধ্যে বর্শাহস্তে ভ্রমণ করিতে পারেন; অথবা কে বলিবে যে, এই কোমলাঙ্গীর কমনীয় কায়ায় জলন্ত অলঙ্কার অপেক্ষা রণায়ুধ অধিক শোভা পায়?

বহুক্ষণে অমরসিংহ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "কুমারি! অদ্য এ স্থানে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

উর্ম্মিলা ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"আপনি এখানে ছিলেন, তাহা তো কেহই বলে নাই।"

তোমরা দুর্গে আগমন করার পর, আমি আসিয়াছি। তোমার সহিত সাক্ষাতের আশায় আমি কতই কষ্ট করিয়াছি, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, কিছুতেই কৃতকার্য্য হই নাই।"

ঊর্ম্মিলা বলিলেন,—

"আপনি যে কৃপা করিয়া আমাকে মনে রাখিয়াছিলেন, ইহা আমার সৌভাগ্য।"

অমরসিংহ বহুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর বলিলেন,—

"এতদিন বুঝিতে পারিলাম, তুমি স্বর্গীয় রঘুবররায়ের দুহিতা। কিন্তু তুমি যাহারই দুহিতা হও, মিবারের তুমি পরম হিতৈষিণী।"

সুন্দরী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর কহিলেন,—

"যুবরাজ! আমি তো আপনাদের চক্ষে পতিতা; আমি ৺ রঘুবর রায়ের দুহিতা। জনসাধারণের বিশ্বাস, আমার পিতা মিবারের রাজশ্রীর অনুকূল ছিলেন না; সুতরাং মহারাণা তাঁহাকে পতিত বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু সাধারণে যাহাই বলুক এবং আপনারা যাহাই ভাবুন, আমার বিশ্বাস আমি মুক্তকণ্ঠে জগৎকে জানাইব। আমার বিশ্বাস যে, পিতৃদেবের হৃদয়ে রাজভক্তি বা মিবারের কল্যাণ-কামনার কোনই ত্রুটি ছিল না। সাধারণে যাহাকে দেশ-হিতৈষিতা বলে, পিতার তাহা তদপেক্ষা দশগুণ অধিক ছিল। তবে তাঁহার এক বিষম ভ্রান্তি ছিল। তিনি জানিতেন, শত চেষ্টাতেও আর মিবারের অভ্যুদয় হইবে না; মিবারের পতন আরম্ভ হইয়াছে, ইহার চরমে অবসান হইবে। এ সময়ে ইহার প্রতিকূল চেষ্টা করা বালির বন্ধন দ্বারা প্রখর স্রোতস্বিনীর গতি-রোধ করার ন্যায়, বিড়ম্বনা মাত্র। এই ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি সকল চেষ্টায় উদাসীন ছিলেন। অদৃষ্টের গতিতে যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তিনি তাহারই নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার এই বিষম বিশ্বাসই তাঁহার ঔদাসীন্যের হেতু এবং মহারাণার সহিত মনোমালিন্যের কারণ। কিন্তু একথা এখন কাহাকে বলিব? কে এখন এই কথা বিশ্বাস করিবে?"

কুমার বলিলেন,—

"কেনই বা না বিশ্বাস করিবে? আমি কখন শুনি নাই, বা কেহ কখন শুনে নাই যে, তিনি আমাদের কখন কোন অনিষ্ট করিয়াছেন।"

কুমারী ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—

"লোকে বিশ্বাস করিবে না—মহারাণা একথায় কর্ণপাত করিবেন না। কিন্তু এই ক্ষুদ্রকায়া পিতৃহীনা কুমারী এ বিশ্বাস বিদূরিত করিবেই করিবে। এই মনোমালিন্য, যুবরাজ! আমার দ্বারাই অবসিত হইবে। আমি দেশের জন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণ বিক্রীত করিয়াছি, দেশের হিতার্থে আমি সকল ভোগ-বাসনা বিসর্জ্জন দিয়াছি, যবন-বধই আমি জীবনের সার-ব্রত করিয়াছি, এবং শাণিত লৌহই এ দেহের প্রধান ভূষণ বলিয়া স্থির করিয়াছি। যুবরাজ! ইহাতেও কি মহারাণা বুঝিবেন না? ইহাতেও কি তিনি সদয় হইবেন না? যদি ইহাতেও তাঁহার করুণা লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে তাঁহার চরণে এই ক্ষুদ্র প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া অদম্য রাজভক্তির প্রমাণ দিয়া যাইব। রাজপুত্র! তখনও কি লোকে বলিবে না যে, রঘুবর রায়ের দুহিতার দেহে অতি পবিত্র রাজভক্তির শোণিত প্রবাহিত ছিল?"

অমরসিংহ বলিলেন,—

"যখন তোমার এই অনির্ব্বচনীয় গুণগ্রাম মহারাণার গোচরে আসিবে, তখন তোমাকে তিনি আরাধনা করিবেন। এরূপ অকৃত্রিম রাজভক্তি, এরূপ আন্তরিক স্বদেশানুরাগ কে কবে কোথায় দেখিয়াছে? আমি জানি তুমি মানবী নহ, তুমি দেবী। তোমার যে সকল উচ্চ মনোবৃত্তি ঈশ্বরেচ্ছায় আমার নিকট প্রকাশিত হইয়াছে, রাজপুতের নিকট তাহা অতি আদরের ধন। উর্ম্মিলে! আমি আমার কথা বলিতেছি—আমি তোমাকে আজীবনকাল পরম শ্রদ্ধা করিব এবং তোমার ঐ মূর্ত্তি আমি যাবজ্জীবন হৃদয়ে বহন করিব।"

কুমারী লজ্জাহেতু বদন বিনত করিয়া নীরব রহিলেন। অমরসিংহ জিজ্ঞাসিলেন,—

"শুনিলাম তুমি শৈলম্বর যাইতেছ। শৈলম্বররাজ তোমার মাতুল তাহা আমি জানি। তিনি মহারাণার বিরাগ-ভয়ে এতদিন তোমাদের সহিত সম্পর্ক এক প্রকার উচ্ছেদ করিয়াছিলেন বলিলেই হয়। এখনও কি তাঁহার সেই ভাব আছে।

কুমারী বলিলেন,—

"যে কারণে তাঁহার মহারাণার বিরাগের ভয়, সে কারণই আর এ জগতে নাই, সুতরাং মাতুলের আর সে ভাবও নাই। পিতার পরলোক-প্রাপ্তির পর হইতে মাতুল আমার অভিভাবক। আমার প্রতি তাঁহার স্নেহের সীমা নাই। তিনি নিঃসন্তান। আমি মাতুল ও মাতুলানীর বাৎসল্যের এক মাত্র স্থল! আমি এক্ষণে তাঁহাদের আজ্ঞাক্রমে সেই স্থানেই গমন করিতেছি।"

অমরসিংহ আহ্লাদসহ কহিলেন,—

"ভালই হইল; তোমাকে যে অতঃপর সময়ে সময়ে দেখিতে পাইব, তাহার ভরসা হইল। মহারাণার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ শৈলম্বররাজ আমাকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকেন। তাঁহার আবাস আমি পরের আবাস বলিয়া ভাবি না।"

উর্ম্মিলা বলিলেন,—

"কুমারের এত অনুগ্রহ থাকিবে কি? কুমার কি কখন মনে করিয়া এ অভাগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন?"

কুমার বিস্মিতের ন্যায় কহিলেন,—

"একি আশঙ্কা উর্ম্মিলে? আমি কি মানুষ নহি? তোমাকে ভুলিব?"

তখন উর্ম্মিলা ঈষদ্ধাস্যের সহিত বলিলেন,—

"কুমারের কতই কার্য্য; কত বিষয়ে কুমারের কতই অনুরাগ? সেই সকল কার্য্য ও অনুরাগ-সাগরে এ ক্ষুদ্রহৃদয়া মন্দ-ভাগিনী কোথায় ডুবিয়া থাকিবে!"

"শত কার্য্য, শত অনুরাগ একদিকে, আর কুমারী উর্ম্মিলা একদিকে!"

উভয়ে নীরব। বাক্য-স্রোতকে আর অগ্রসর হইতে দিতে উভয়েরই সাহস নাই।

রাত্রি অবসান প্রায় হইল। পিঙ্গল উষা আসিয়া রজনীকে দূর করিয়া দিতে লাগিল। পক্ষিগণ সেই পরিবর্ত্তনে আনন্দিত হইয়া চারিদিক হইতে শব্দ করিতে লাগিল।

তখন উর্ম্মিলা কহিলেন—

"যুবরাজ! দেখিতে দেখিতে রাত্রি অবসান হইয়া গেল। আমার যাত্রার সময় উপস্থিত; অতএব আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

যুবরাজ বলিলেন—

"তোমাকে বিদায় দেওয়া সহজ নহে; কিন্তু বিলম্বে অসুবিধা হইতে পারে। ভগবান ভবানীপতি তোমাকে সুখে রাখুন। জানিও, তোমার নাম এই হৃদয়ে ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় স্থাপিত রহিল।"

কুমারী উর্ম্মিলা এরূপ কথা বলিবেন ভাবিয়া মস্তক উন্নত করিলেন, একবার অধরৌষ্ঠের স্পন্দন হইল। কিন্তু কোন শব্দ বাহির হইল না। তিনি প্রস্থান করিলেন।

অমর সিংহ সংজ্ঞাহীনের ন্যায় অনেকক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দুর্গরক্ষকগণের "বম্ বম্ হর হর" শব্দে তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—"এই দেবীর নিকট চিত্ত বিক্রয় করায় যদি পিতার সমীপে অপরাধী হই, তাহা হইলে পিতার সন্তোষসাধন এ কুসন্তানের অদৃষ্টে নাই।" তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

উর্ম্মিলা যুবরাজের নিকট হইতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার কোন দিকে লক্ষ্য নাই, অন্য কিছু মনে নাই। সহসা তাঁহার প্রৌঢ় বয়স্কা সঙ্গিনীকে দেখিয়া বলিলেন,—

"কে ও তারা? আমার ভয় লাগিয়াছিল!"

কিন্তু তারার তখন আপাদ মস্তক জ্বলিয়া গিয়াছে। সে, কুমারীকে শয্যায় না দেখিয়া, তাঁহার সন্ধানার্থ ছাতের উপর আসিয়াছিল। দেখিল, কুমারী উর্ম্মিলা একজন অপরিচিত পুরুষের সহিত গাঢ় আলাপে মগ্ন। তাহার চক্ষুকে সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। অবশেষে তাহার সংজ্ঞাবিলুপ্ত হইল।

উর্ম্মিলার কথা শুনিয়া তারা ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিল। বলিল,—

"যে রাজপুত-রমণী গোপনে রাত্রিকালে পরপুরুষের সহিত আলাপ করিয়া পিতামাতার বংশ কলঙ্কিত করিতে পারে, তাহার আবার ভয়?"

উর্ম্মিলা অতি শৈশবাবস্থায় মাতৃহীনা। তারা সেই কা হইতে তাঁহাকে মাতৃবৎ যত্নে লালন পালন করিতেছে। সুতরাং তাঁহার দোষ দেখিলে, তারার শাসন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তারা-কৃত ঘোর অপমান উর্ম্মিলার পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও চারু হৃদয়ে আঘাত করিল। তাহার উপর তাঁহার সহজে ক্রোধ হইত না। কিন্তু অদ্য ক্রোধ হইল। তিনি যথাসাধ্য হৃদয়কে শান্ত করিয়া বলিলেন,—

"যাহাকে যখন যাহা বলিবে, তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া বলিও। না জানিয়া কথা বলায় সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে।"

তারা বলিল,—

"আমি না জানিয়া কি বলিয়াছি? স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিয়াছি। তুমি কি ভাবিয়াছ আমায় ধম্‌কাইয়া সারিবে? যে কার্য্য করিয়াছ ইহার ফল শৈলশ্বর গিয়া পাইবে। যাও, তোমার সহিত আমার আর কথা কহিবার প্রয়োজন নাই! যাহার স্বভাবে এত দোষ, আমি তাহার সহিত আলাপ করিতে চাহি না। তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও—যাহার সহিত ইচ্ছা রাতি কাটাইয়া আইস।"

তারা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। উর্ম্মিলা কহিলেন,—

"বলি শুন। তাহার পর রাগ করিতে হয় করিও।" তারা দাঁড়াইল, কিন্তু কথা কহিল না। উর্ম্মিলা, বুনাস্ নদী-তীরে যুবরাজের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ অবধি অদ্য পর্য্যন্ত, যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্ত কথা বলিলেন। তারা শুনিতে শুনিতে ক্রমে ফিরিয়া দাঁড়াইল, ক্রমে উর্ম্মিলার মুখের প্রতি তাকাইল। সমস্ত শুনিয়া বলিল,—

"এত হইয়াছে বল নাই কেন?"

উর্ম্মিলা বলিলেন,—

"আরও বলি শুন। তুমি যাঁহাকে পর-

পুরুষ বিবেচনা করিতেছ, তিনি আপাততঃ তোমাদের নিকট পর-পুরুষ বটেন; কিন্তু তিনি এই হৃদয়ের রাজা—তিনি আমার স্বামী। আমি ভবানী গৌরীর নামে শপথ করিয়াছি যে, যুবরাজ অমরসিংহ ভিন্ন আর কাহাকেও এ হৃদয়ে স্থান দিব না। আমি জানি, আমার এ আশা নিতান্ত দুরাশা; আমি জানি, আমার এ বাসনা চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই; তথাপি তারা! আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি। ইহাতে যদি আমার দোষ হইয়া থাকে, আমি সে দোষের জন্য কাতর নহি। আমি না বুঝিয়া নিরাশ-প্রণয়-সাগরে ডুবিয়াছি বলিয়া যদি তোমরা ঘৃণা করিতে ইচ্ছা কর, বা মানব-সমাজ আমাকে কলঙ্কিত মনে করে, তাহা হইলে—তারা—তোমার ঘৃণা বা মানব-সমাজের কলঙ্কে কুমারী উর্ম্মিলা ভ্রূক্ষেপও করিবে না।”

তারা আর কথাটীও না কহিয়া উর্ম্মিলার হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

বেলা অপরাহ্ণ। আগরা নগরের অতি মনোহর শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত সম্রাট-ভবনের স্বর্ণ-চূড়ায় অস্তোন্মুখ সূর্য্যের স্বর্ণময় কররাশি পড়িয়া ঝলসিতেছে। প্রাসাদোপরিস্থ পতাকা পবনহিল্লোলে একবার বক্র ও একবার ঋজু হইতেছে। প্রাসাদ অর্দ্ধক্রোশ পরিমিত স্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু তাহার অগণ্য-পুরী ও প্রকোষ্ঠ মধ্যে নেত্রপাত করিবার এক্ষণে প্রয়োজন নাই। বাদশাহ আকবর প্রতিদিন প্রাতে দরবার-গৃহে ওমরাহগণের সহিত উপবেশন করেন এবং প্রকাশ্য রাজকীয় কার্য্য সমস্তের আলোচনা করেন। বৈকালে তিনি মন্ত্রণা-গৃহে উপবেশন করিয়া বিশেষ বিশেষ লোকের সহিত নিগূঢ় বিষয়ের পরামর্শ করিয়া থাকেন। এক্ষণে বাদশাহ বাহাদুর মন্ত্রণা-গৃহে বসিয়া আছেন। আমাদের অধুনা সেই গৃহেই প্রয়োজন।

মন্ত্রণা-গৃহ একটী বিস্তীর্ণ প্রকোষ্ঠ। তাহার মধ্যে তুরস্ক হইতে সমানীত একখানি অতি চমৎকার গালিচা বিস্তৃত। সেই গালিচার উপরে হীরক-খচিত স্বর্ণময় সিংহাসনে সম্রাট-কুল-তিলক আকবর সমাসীন। তাঁহার পার্শ্বে অপর এক আসনে একজন অপূর্ব্ব-কান্তি রাজপুত যুবক উপবিষ্ট। তিনি বিকানীরের কুমার পৃথিরাজ। সুকৌশলী আকবর জানিতেন যে, রাজপুতগণ এই ভারতের মুখস্বরূপ। তাঁহারা সাহসে অতুল, বলে অদ্বিতীয় এবং বুদ্ধিতে অজেয়। অতএব সেই রাজপুতগণকে স্বপক্ষ করিতে না পারিলে, ভারতে মুসলমান রাজ্যের ভদ্রস্থতা নাই। বলা বাহুল্য যে, আকবরের এই বিশ্বাসই তাঁহার অভ্যুন্নতির মূল। তিনি কৌশলে রাজপুত প্রধানগণকে অতি মান্য রাজ্যপদ সমূহে প্রতিষ্ঠিত করেন। ধর্ম্ম-বৈপরীত্য হেতু বা প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ নিবন্ধন বিদ্বেষ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি কদাচ রাজপুতগণকে অপমান, বা অনাদর করিতেন না। এই জন্যই অসাধারণ বুদ্ধি, বল ও কৌশলসম্পন্ন রাজপুতগণ ক্রমশঃই আপনা আপনি তাঁহার আশ্রিত হইতে থাকেন এবং জেতা ও বিজিতভাব ক্রমে ক্রমে অন্তরিত হইতে থাকে। রাজপুতগণ কৃতঘ্ন নহেন;

তাঁহারা সম্রাটদত্ত অতুল সম্মানলাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে আপনাদিগকে তাঁহার কর্ম্মে ব্রতী করিতে লাগিল ; সুতরাং মোগল-রাজ-শ্রী অবিলম্বে অত্যুন্নত গৌরবপদবীতে সমারূঢ়া হইল। কুমার পৃথ্বিরাজ, আত্মরাজ্যের স্বাধীনতা সংরক্ষণে অক্ষমতা হেতু, বিজয়ী আকবরের শরণাগত হইয়াছিলেন। আকবর তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। তাঁহার এক অসাধারণ শক্তি ছিল, তিনি মুখে মুখে অনর্গল কবিতা রচনা করিতে পারিতেন এবং পত্রাদি যাহা লিখিতেন, সমস্তই শ্লোকে রচনা করিতেন। গুণগ্রাহী আকবর, তাঁহার এই অসাধারণ গুণে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে "রাজকবি" নাম প্রদান করিয়াছিলেন। এবং সর্ব্বদা তাঁহাকে সমাদরে সঙ্গে রাখিতেন। পৃথ্বিরাজ যদিও কোনরূপ সম্রাট-প্রসাদেই বঞ্চিত ছিলেন না, তথাপি তিনি, আত্মরাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই বলিয়া, আপনাকে আপনি অতি ঘৃণার্হ ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতেন। তিনি মহারাণা প্রতাপসিংহের বড়ই অনুরাগী ছিলেন ; কারণ মহারাণা মিবারের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত যেরূপ যত্ন করিতেছিলেন, অন্য কোন রাজপুতই তাহা করে না।

অদ্য বাদশাহ আকবরের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ। কারণ সোলাপুর জয়ের সংবাদ অদ্য তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে। তিনি পৃথ্বিরাজকে বলিতেছেন,—

"কেমন রাজকবি ! মানসিংহের ন্যায় রণনিপুণ ও অধ্যবসায়শীল ব্যক্তি বোধ করি আর দ্বিতীয় নাই ?"

পৃথ্বিরাজ বলিলেন,—

"এ কথা কে না স্বীকার করে ? বাদশাহের ন্যায় অদ্বিতীয় প্রতাপশালী ব্যক্তির অভিপ্রায়াধীনে যাহারা কার্য্য করেন, তাঁহাদের কার্য্যমাত্রই সফল হওয়া বিচিত্র কথা নহে। মানসিংহ তো অসাধারণ যোদ্ধা।"

বাদশাহ বলিলেন,—

"মানসিংহ আমার দক্ষিণ হস্ত। মানসিংহ বীরচূড়া-মণি। বোধ করি তুমি মহারাজ মানসিংহের ন্যায় কর্ম্মঠ ও অধ্যবসায়ী দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম করিতে পার না।"

রাজ-কবি বলিলেন,—

"বাদশাহ বোধ করি এ কথাটী হৃদয়ের সহিত বলেন নাই। মহারাজ মানসিংহ যে অসাধারণ বীর একথায় কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু বাদশাহ স্মরণ করিলে জানিতে পারিবেন যে, এখনও রাজপুত-কুলে এমন বীর আছেন, যাঁহারা অম্বরেশ্বরকে তৃণ জ্ঞান করেন এবং তাঁহাকে এখনও অসি-চালনায় উপদেশ দিতে পারেন। তাঁহারা বিক্রমে অতুল, প্রতিজ্ঞাপালনে দৃঢ়-ব্রত এবং রণ-কৌশলে অনির্ব্বচনীয়। সেরূপ অসামান্য ব্যক্তির অপেক্ষাও যে মানসিংহ শ্রেষ্ঠ, একথা এ অধম স্বীকার করিতে পারে না।"

বাদশাহ ক্ষণকাল চিন্তার পর বলিলেন,—

আমার বোধ হইতেছে যে, মিবারের প্রতাপসিংহকে তুমি লক্ষ্য করিয়া এত কথা বলিতেছ। আমি স্বীকার করি, প্রতাপ অসাধারণ বীর ও অতিশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু তুমি কি ভাবিয়াছ যে, প্রতাপের এই তেজ থাকিবে ? মানসিংহের দ্বারাই প্রতাপের গর্ব্ব খর্ব্ব করাইব। এইবার তাহার বিক্রমের পরীক্ষা হইবে।"

পৃথ্বিরাজ বলিলেন,—

"বাদশাহ আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে আমি এই বলিতে পারি যে, প্রতাপসিংহকে অবনত করা সহজ হইবে না—কখন ঘটিবে কি না সন্দেহ। মানসিংহের ন্যায় যোদ্ধা প্রতাপের কি করিবে ?

সে অদম্য বিক্রম-প্রবাহে মানসিংহরূপ প্রবল মাতঙ্গও ভাসিয়া যাইবে।"

তাহার পর মনে মনে বলিলেন,—

"প্রতাপ! তোমার সার্থক জন্ম? কিন্তু সমুদ্রে বান ডাকিয়াছে, সব ভাসিয়া যাইবে; যে ঝড় উঠিয়াছে, সব উড়িয়া যাইবে! নিস্তার নাই! তথাপি দেখা ভাল। দেখ, যদি কোন উপায় হয়। কেন দেখিবে না?"

বাদশাহ কিয়ৎকাল নিস্তব্ধতার পর কহিলেন,—

"প্রতাপের বীরত্ব যে অতুল তাহা আমি জানি এবং সেজন্য আমি তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করি। কিন্তু সে সিংহ যদি জালে না পড়ে, তবে আমার কিসের কৌশল? সে দর্প যদি চূর্ণ না হয়, তবে আমার কিসের গৌরব? সে বীর যদি অধীন না হয়, তবে আমার কিসের বল? আমার এই রাজপুত যোদ্ধৃগণ পৃথিবীকে ক্ষুদ্র বর্ত্তুলের ন্যায় ঘুরাইয়া ফেলিতে পারে, তাহারা একজন মনুষ্যকে অবনত করিতে পারিবে না?"

"পৃথিরাজ অবনত মস্তকে বলিলেন,—

"জাঁহাপনা! জয় ও পরাজয় সমস্তই বিধি-নিয়োজিত ফল; বল বা প্রতাপদ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বাদশাহের সহিত তুলনা করিলে, প্রতাপসিংহ তো গণনায় আইসে না। আবুলফজেল যাঁহার মন্ত্রী, টোডরমল্ল যাঁহার সচিব, ফৈজি যাঁহার পার্শ্বচর, মানসিংহ যাঁহার অনুগত, এবং মহাবেত খাঁ, রায় বীরবলসিংহ, সাগরজি, শোভাসিংহ প্রভৃতি বীরেরা যাঁহার আশ্রিত; যাঁহার রাজ্য আসমুদ্র বিস্তৃত, যাঁহার সৈন্যসংখ্যা অগণনীয়, যাঁহার প্রতাপে ভারত অবনত, তাঁহার সহিত ক্ষুদ্র মিবারের ধন-জন-শূন্য ক্ষুদ্র প্রতাপের কোনই তুলনা হয় না। কিন্তু—"

এই সময়ে একজন কর্ম্মচারী তথায় আগমন করিয়া সম্মানসহ নিবেদিল,—

জাঁহাপনা! মহারাজ মানসিংহ বাহাদুর প্রাসাদ-তোরণ পর্য্যন্ত আসিয়াছেন।"

বাদশাহ অতিশয় সন্তোষের সহিত কর্ম্মচারীকে বিদায় করিয়া দিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"কিন্তু কি?"

বাদশাহ ক্ষুদ্র বা মহৎ কাহারও নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতে অপমান মনে করিতেন না, বা তাঁহার সংস্কারের বিরুদ্ধ মত সমর্থিত হইলে বিরক্ত হইতেন না। এই জন্যই প্রতাপসিংহ সম্বন্ধে পৃথিরাজের অভিপ্রায় কি এবং তাঁহাকে জয় করার পক্ষে পৃথিরাজের মনে কি কি আপত্তি আছে, তাহা বাদশাহ আগ্রহের সহিত শুনিতেছেন; অথচ এমনই ভাব প্রকাশ করিতেছেন যে, যেন তিনি পৃথিরাজের ভ্রম-ভঞ্জন ও তাঁহার কুসংস্কার দূরীভূত করিবার বাসনাতেই এত কথা কহিতেছেন। যে সকল ব্যক্তি সতত তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন ও তাঁহার প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রিয়তার দ্বারা বাদশাহের মনস্তুষ্টি করিতে হইত না। তাহাতে বাদশাহ সন্তুষ্ট হইতেন না। সুতরাং তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন। এই জন্যই পৃথিরাজ বলিতে সাহস করিলেন যে,—

কিন্তু প্রতাপের প্রতাপ আছে, যতদিন প্রতাপ আছে, কাহার সাধ্য তাহাকে জয় করে? এ দীনের এই বিশ্বাস, প্রতাপসিংহ কখনই নত হইবে না। বাদশাহের চেষ্টা এক্ষণে সফল হইবে না।'

বাদশাহ চিন্তা করিতে লাগিলেন। আবার সেই কর্ম্মচারী আসিয়া তদ্রূপ ভাবে নিবেদিল,—

মহারাজ মানসিহ বাহাদুর এই দিকে আসিতেছেন।”

কর্ম্মচারী বিদায় হইল। তখন নকিব চীৎকার করিতে লাগিল,—

অম্বররাজ, ত্রিশ হাজারী মনসবদার, অতুল-প্রতাপ, বাদশাহ বাহাদুরের অনুগ্রহভাজন, রাজপুত-চূড়ামণি মহারাজ মানসিংহ বাহাদুর উপস্থিত।”

বাদশাহ উঠিয়া দ্বার-সমীপস্থ হইলেন; তথা হইতে হাসিতে হাসিতে মানসিংহকে প্রবেশ করিতে সঙ্কেত করিলেন। মানসিংহ, ভূমিস্পর্শ করিয়া সেলাম করিতে করিতে, মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—

“বীরবর! তোমার যশঃ-সৌরভ তুমি আসিবার অনেক পূর্ব্বে, আমার নিকটে আসিয়াছে। আমরা এখনও তোমার কথায় নিযুক্ত ছিলাম।”

মানসিংহ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

“এ ক্ষুদ্র ব্যক্তির বিষয় আলোচনায় বাদশাহ বাহাদুরের একটী মুহূর্ত্তকালও অতিবাহিত হইয়াছে এ সংবাদ অপেক্ষা অধিকতর গৌরবের প্রশংসার বা অনুগ্রহের কথা মানসিংহ আর কিছু জানে না।”

বাদশাহ তাহার পর আসন গ্রহণ করিলেন এবং মানসিংহকেও আসন গ্রহণে অনুমতি দিলেন। তাহার পর পরস্পর স্বাস্থ্যাদি সম্বন্ধীয় কথা-বার্ত্তা হইল। বাদশাহ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

“আমরা কিন্তু তোমার নিন্দা করিতেছিলাম।”

মানসিংহ বলিলেন,—

“এ অধমের এমন কি সৌভাগ্য যে, সে বাদশাহ বাহাদুরের নিকট হইতে প্রশংসা লাভ করিবে। কিন্তু নিন্দাতে হউক, বা প্রশংসায় হউক, বাদশাহ বাহাদুর যে তাহাকে স্মরণ করিয়াছেন, ইহাই এ দীনের পক্ষে অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়।”

আকবর বলিলেন,—

“যে বীর হিন্দুস্থান পদাবনত করিয়াও তৃপ্ত হয় নাই; যাহার ক্ষমতা, সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া, গজ্নী নগরকেও হতবল করিয়াছে; সে বীরের অমিত তেজ যদি স্থান বিশেষে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে অবশ্যই সে ঘটনা চিরকাল তাহার বীর-চরিত্রের কলঙ্কস্বরূপে সন্ধোষিত হইবে।”

মহারাজ মানসিংহ বহুক্ষণ অবনত মস্তকে চিন্তা করিয়া কহিলেন,—

“বাদশাহ আজ্ঞা করিলে এ দীন অনলে শয়ন করিতে পারে, সমুদ্রে প্রবেশ করিতে পারে, একাকী শূন্য হস্তে সিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু অধীন জানে না, কোথায় সে বাদশাহের জয়-ধ্বজা প্রোথিত করিতে চেষ্টা করে নাই।”

বাদশাহ ঈষৎ হাস্যের সহিত কহিলেন,—

“মিবার—প্রতাপসিংহ।”

মানসিংহ কাঁপিয়া উঠিলেন। বহুক্ষণ নীরবে রহিলেন; পরে আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ; যেন স্থানভ্রষ্ট হইয়া বাহিরে আসিতেছে।

“প্রতাপসিংহ-দাম্ভিক প্রতাপসিংহ—দরিদ্র, ভিক্ষুক, কুটীরবাসী প্রতাপসিংহ—সে আমার মর্ম্মে আঘাত করিয়াছে—সে আমার অন্তরে তীব্র বিষ ঢালিয়া দিয়াছে। আমি তাহার সর্ব্বনাশ করিব; আমি তাহাকে পথের ভিখারী করিব; আমি তাহাকে অন্নহীন করিব; আমি তাহাকে বাদশাহের চরণে বাঁধিয়া আনিয়া দিব, আমি তাহাকে আমার চরণ ধরিয়া

রোদন করাইব; তবে আমার ক্রোধ শান্ত হইবে,—হৃদয়ের তৃপ্তি হইবে।"

আকবর জিজ্ঞাসিলেন,—

তাঁহার উপর অদ্য তোমার এত ক্রোধ দেখিতেছি কেন? সে সম্প্রতি আর কোন নূতন অপরাধে অপরাধী হইয়াছে কি?"

তখন মানসিংহ একে একে সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া বাদশাহ আকবর অনেকক্ষণ তূষ্ণীম্ভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহারও অত্যন্ত ক্রোধোদয় হইল, কিন্তু তিনি ক্রোধ ব্যক্ত করিবার লোক নহেন। তাঁহার পার্ষদ রাজপুত-মণ্ডলী যদি তাঁহার অনধীন কোন রাজপুত-বীরের উপর বিরক্ত হইতেন তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, রাজপুতগণের পরস্পর মনোবাদ ও অনৈক্য ঘটিলে ভারতে যবন-প্রতাপের আর প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিবে না। কিন্তু রাজপুতগণ সমমতাবলম্বী হইলে, শত যবন ভূপেরও এমন সাধ্য হইবে না যে, ভারতে একদিনও রাজত্ব করে। তিনি বুঝিলেন যে, প্রতাপসিংহ অতুল বীর ও প্রভাবশালী হইলেও, আর তাঁহার নিস্তার নাই। কারণ, মানসিংহের ন্যায় স্বজাতীয় বীর এক্ষণে তাঁহার প্রবল শত্রু। কর্ত্তব্য কর্ম্ম বা প্রভুর সন্তোষ-সাধন এক কথা, আর নিজ হৃদয়ের বিজাতীয় জ্বালা নিবারণের চেষ্টা আর এক কথা। অসাধারণ প্রভু-ভক্ত হইলেও, প্রতাপসিংহের ন্যায় স্বজাতীয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রক্ষেপ করিতে কোনও রাজপুতেরই প্রবৃত্তি বা অনুরাগ হইত না। কিন্তু এক্ষণে আর সে অনুরাগের অপ্রতুলতা থাকিতেছে না। সুক্তসিংহ প্রভৃতি বীরেরাও প্রতাপের বিরোধী।* সুতরাং প্রতাপের নিস্তার কোথা? এ সকল কথাই তিনি বুঝিলেন।

এমন সময়ে নকিব আবার চীৎকার করিয়া জানাইল, সাহারজাদা সেলিম উপস্থিত। বাদশাহের আজ্ঞাক্রমে সেলিম মন্ত্রণা-গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কান্তি ভুবন-মোহন। তাঁহার পরিচ্ছদ অতি উজ্জ্বল ও অতি সুদৃশ্য। তাঁহার মস্তকে বিবিধ কারুকার্য্য-সমন্বিত শিরপেঁচ জ্বলিতেছে। তাঁহার বিশাল বক্ষে সুগোল মুক্তার মালা শোভা পাইতেছে। তাঁহার আয়ত ইন্দীবর নয়ন হইতে তেজঃ ও বহ্নির জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। কিন্তু বিচক্ষণ লোক দেখিলে বুঝিতে পারিতেন যে, সেলিমের এই অপূর্ব্ব লাবণ্যের উপর, অযথা ভোগ-বিলাসানুরাগিতা এবং স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় নিয়মা-বহেলন হেতু, একটা কালিমা পড়িয়াছে। সাহারজাদা সেলিম প্রবেশ করিয়া বাদশাহের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিলেন এবং বাদশাহের চরণে হস্ত স্পর্শ করিয়া সেই হস্ত স্বীয় মস্তকে স্থাপন করিলেন। বাদশাহ অত্যন্ত স্নেহের সহিত সেই যুবককে আলিঙ্গন করিলেন। মানসিংহ ও পৃথিরাজ সাহারজাদাকে যথাবিহিত সম্মান জ্ঞাপন করিলেন। তাহার পর সকলে আসন গ্রহণ করিলে বাদশাহ বলিলেন,—

"সেলিম! কোন গুরুতর সাময়িক কার্য্যে তোমাকে নিযুক্ত করি না বলিয়াই, সর্ব্বদাই তুমি দুঃখ করিয়া থাক। এবার তোমাকে

* সুক্তসিংহের সহিত কেন মহারাণা প্রতাপসিংহের মনান্তর ছিল, তাহা বোধ করি ইতিহাসানুসন্ধিৎসু পাঠকের অবিদিত না থাকিতে পারে। Tod' Rajasthan, Vol I, p, p, 275 এবং 276 দেখ।

যেরূপে সুক্তসিংহের সহিত প্রতাপ সিংহে মনান্তর ও পার্থক্য ঘটে এবং তৎকালে কুল-পুরোহি তাঁহাদের বিবাদ ভঞ্জনার্থে যেরূপে আত্মজীবন বিস র্জ্জন করেন, তাহার বিবরণ এবং অনুক্ষোত্তর সুক্ত সিংহের বাল্যজীবনের সাহসের কথা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

এমন এক যুদ্ধের ভার দিব স্থির করিয়াছি যে, তাহাতে জয়-পরাজয়ের সহিত তোমার ভবিষ্যৎ উন্নতি অবনতির দৃঢ় সম্বন্ধ থাকিবে।”

সেলিম বলিলেন,—

“যেমনই কেন বিপক্ষ হউক না, জয়-লাভে এ দাসের কোন সংশয় নাই। বাদশাহের আশীর্ব্বাদই দাসের বল। যত দিন সেই আশীর্ব্বাদের প্রতি এ দীনের অবিচলিত ভক্তি থাকিবে তত দিন কোথায়ও এ দাস অপদস্থ হইবে না। এক্ষণে বাদশাহ কোন্ অভিনব ক্ষেত্রে এ দাসকে নিযুক্ত করিয়া অনুগৃহীত করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করিতে পারি না কি?”

আকবর বলিলেন,—

“রাজা মান! তুমি যখন প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবে, তখন সেলিমকে সঙ্গে লইবে। সেলিমের অদম্য সমর-সাধ নিবৃত্তির এই উত্তম ক্ষেত্র। এক্ষণে সেলিম তুমি প্রস্তুত হও। রাজা মানের সহিত তোমাকে এবার মিবারের প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে।”

সাহাজাদা বলিলেন,—

“এ দাস সর্ব্বদা সম্রাট্-কার্য্যে প্রস্তুত। অনুমতি হইলে এই মুহূর্ত্তেই যাত্রা করিতে পারি।”

মানসিংহ বলিলেন,—

“বাদশাহের আদেশে পরম পরিতুষ্ট হইলাম। কিন্তু আমাদের কোন্ সময়ে যাত্রা করা আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে বাদশাহের কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় নাই।”

বাদশাহ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া [illegible]লিলেন,—

“সম্মুখে খোসরোজ পর্ব্ব উপস্থিত। খোসরোজের পর যাত্রা করাই আমার মতে যুক্তিযুক্ত। তোমাদের কি মত?”

মানসিংহ বলিলেন,—

“তাই স্থির।”

তাহার পর একে একে পৃথিরাজ ও মানসিংহ বিহিত-বিধানে বাদশাহের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে, পিতা ও পুত্র বিষয়ান্তরের কথায় নিবিষ্ট হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভাবী ভূপতি।

আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে সাহাজাদা সেলিমের যে চিত্র দেখিয়াছি, সর্ব্বত্র তিনি সেরূপ সুচারু বর্ণে চিত্রিত হন না। তাঁহার চরিত্রের দুই ভাব। এক ভাব দেখিলে, তিনি স্বর্গের দেবতা; আর এক ভাব দেখিলে, তিনি নরকের প্রেত। এক ভাব দেখিলে, তিনি পূজা ও ভক্তির সামগ্রী; আর এক ভাব দেখিলে তিনি ঘৃণা ও অরুচির বিষয়। তাঁহার হৃদয়ে যেমন অতি মহৎ অপার্থিব মনোবৃত্তি সমস্ত নিহিত ছিল, তেমনই তথায় অতি জঘন্য ইন্দ্রিয়পরতা, ভোগশক্তি ও নীচতা বাস করিত। তাঁহার কত কার্য্যে অতুল তেজস্বিনী বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইত আবার তাঁহারই কত কার্য্যে দারুণ হিতাহিত বোধ-বিহীনতা প্রকাশ পাইত। তিনি যখন দরবারে বসিতেন, তখন তাঁহাকে আবুল ফজেলের ন্যায় বুদ্ধিমান্ ও মানসিংহের ন্যায় সাহসী বলিয়া বোধ হইত; আবার তিনি যখন বিলাস গৃহে বসিতেন, তখন তাঁহার নীচতা ও অদূরদর্শিতার পরাকাষ্ঠা দেখা

যাইত। তিনি যখন রাজ-কার্য্যের মন্ত্রণায় নিযুক্ত থাকিতেন, তখন সময়ে সময়ে চতুর-চূড়ামণি আকবরও মনে মনে তাঁহার নিকট হারি মানিতেন; আবার তিনি যখন ভ্রষ্টমতি, তোষামোদী পারিষদগণে পরিবৃত থাকিতেন, তখন তাঁহাকে নির্ব্বোধের একশেষ বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু সমস্ত দোষ ও গুণ একত্রিত করিয়া তুলনা করিলে দেখা যায় যে, সাহাবজাদা সেলিমের চরিত্রে দোষের অপেক্ষা গুণের ভাগই অধিক। তাঁহার শান্তস্বভাব, তাঁহার মিষ্টভাষা, তাঁহার সরলতা, তাঁহার সহিষ্ণুতা, তাঁহার বুদ্ধি, তাঁহার লোকানুরাগিতা প্রভৃতি অসংখ্য সদ্‌গুণ একত্রিত করিয়া তুলায় আরোপ করিলে, গুণের দিক, গুরু ভার হেতু, অবনত হইয়া পড়ে।

অতি সুসজ্জিত, মর্ম্মর প্রস্তরের এক মনোহর প্রকোষ্ঠে, সন্ধ্যার পর সাহাবজাদা সেলিম উপবিষ্ট আছেন। তোষামোদী অসৎ-স্বভাব পারিষদগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছে। চতুর্দ্দিকে অগণ্য স্ফাটিক আলোকাধারে অগণ্য আলোকমালা জ্বলিতেছে। অপূর্ব্ব গন্ধদ্রব্যের অপূর্ব্ব গন্ধে প্রকোষ্ঠ আমোদিত। দুইজন অপ্সরা সদৃশী রূপসী নর্ত্তকী ভুবনমোহন পরিচ্ছদে ও ভূষণে, আপনাদের পাপকায়া বিভূষিত করিয়া অঙ্গ-ভঙ্গী সহকৃত নৃত্য ও গীত দ্বারা অনিময়ী, অদূরদর্শী যুবক শ্রোতৃবর্গের ইন্দ্রিয়তৃষা বলবতী করিতেছে। আবেশভরে তাহাদের আয়তলোচন কখন যেন মুকুলিত হইয়া আসিতেছে, আবার কখন তাহা হইতে রসনার তীব্র গরল নিঃসৃত হইয়া দর্শকগণকে বিচেতন করিতেছে; কখন তাহা হইতে প্রণয়ের অতি স্নিগ্ধ সুধা স্যন্দিত হইয়া সকলকে বিহ্বল করিতেছে, এবং কখন বা তাহা হইতে কটাক্ষের তীক্ষ্ণ তাড়িত তাঁহাদের মর্ম্মভেদ করিতেছে। এই ঘোর মাদকতাতেও যুবকগণের তৃপ্তি নাই; সিরাজ হইতে সমানীত, স্বর্ণপান-পাত্রস্থ, উজ্জ্বল সুরা তাঁহাদের অস্থির বুদ্ধিকে আরও চঞ্চল ও আরও অপ্রকৃতিস্থ করিতেছে। সেলিম, এইরূপ বিকৃত সংসর্গে বসিয়া, অনবরত সুরাপান করিতেছেন এবং সুরাপানমত্ত ও মদোন্মত্ত হইয়া, নিয়ত চীৎকার করিতেছেন।

কে বলে মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ জীব? মনুষ্য যদি বুদ্ধিমান তবে নির্ব্বোধ কে? আর কোন জন্তু, স্বেচ্ছায় এরূপে স্বীয় পদে কুঠারাঘাত করে? আর কোন জন্তু, মনুষ্যের ন্যায় নিরন্তর নিয়মাবহেলন করিয়া, স্বাস্থ্য, সুখ ও আনন্দ বিধ্বংসিত করে? আর কোন্ প্রাণী ইচ্ছা পূর্ব্বক আপন আয়ুষ্কাল সংক্ষিপ্ত করিয়া অকালে কালসমুদ্রে ডুবিয়া যায়? মনুষ্যের ন্যায় ভ্রম-পরায়ণ জীব আর কোথায় আছে? ফলতঃ এক পক্ষে মনুষ্যের কার্য্যবিশেষ দেখিয়া যেমন বিস্ময়াবিষ্ট না হইয়া থাকিতে পারা যায় না, তেমনই পক্ষান্তরে তাহাদের ভ্রান্তি দেখিয়া, ইতর প্রাণিগণের যদি বুঝিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে, তাহারাও হাস্য-সংবরণ করিতে পারিত না। মনুষ্যের স্বাধীন বুদ্ধিই তাঁহাদের উন্নতি ও অবনতি উভয়েরই হেতু।

নর্ত্তকী নাচিতেছে এবং লীলা ও লালসাসূচক ভঙ্গী-সহ গায়িতেছে। দুইটি গানের পর তাহারা তৃতীয় গান ধরিল;—

"পিও বঁধু মধু কমল কোমলে।
রহে না রস সথা ফুল সুখালে॥"

সেলিম চীৎকার স্বরে কহিলেন,—

বহুত আচ্ছা। মদ।"

একজন তৎক্ষণাৎ একপাত্র সুরা দিল। সেলিম পান করিলেন। গায়িকা আবার গাইল,—

"থাকিতে সময়,
লুঠো রসময়,
জানত যৌবন ফিরে না গেলে ॥"

সেই ভ্রষ্ট-মতি যুবকগণ প্রশংসাসূচক ও সন্তোষজ্ঞাপক এতই শব্দ এক সঙ্গে বলিল যে, তথায় একটা বিকট গোল পড়িয়া গেল। সেলিম তখন এক রমণীর বদন-শোভা দেখিতে দেখিতে এতই বিমোহিত হইয়াছেন যে, তাঁহার হস্ত হইতে পান-পাত্র পড়িয়া গেল; তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না।

গায়িকা গাইতে লাগিল,—

"এ ফুল নূতন,
রস-নিকেতন,
কি হইবে বঁধু শুধু রাখিলে ॥"

আবার সেই বিকট চীৎকার-ধ্বনি। সেলিম বলিলেন,—

"বটে তো! তা কি হয়? মদ।"

গায়িকা আবার গাইতে লাগিল,—

"কে আছ রসিক,
প্রেমের প্রেমিক,
লও এ রতন যতনে তুলি ॥"*

তখন সেলিম,—"আমি, আমি—এই যে আমি আছি" বলিয়া টলিতে টলিতে উঠিলেন এবং একজন গায়িকার হাত ধরিয়া তাহার বদন চুম্বন করিলেন। সকলে 'হো' 'হো' শব্দে হাসিয়া উঠিল। সেলিম চৈতন্যশূন্য-হিতাহিত বোধ-রহিত। একজন লোক আসিয়া সংবাদ দিল,—

"বাদশাহ বাহাদুর ও মহারাজ মানসিংহ সাহারজাদাকে স্মরণ করিতেছেন।"

* এই গীত রাগিণী ঝিঁঝিট ও তাল দাদরায় সমাবিষ্ট। 'বিঝিয়া সে সেইহো মেরে বাহারিয়া' ইত্যাদি প্রচলিত হিন্দী গানের অনুরূপ।

সেলিম রমণীর হাত ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু অবলম্বনহীন হইয়া শরীর স্থির রাখিতে পারিলেন না—তথায় পড়িয়া গেলেন। সহচরেরা একে একে প্রস্থান করিল। সেলিম বলিলেন,—

"আঃ! দিবারাত্র স্মরণ করিলে আর পারা যায় না। বল গিয়া, আমি এখন যাইতে পারিব না।"

আবার বলিলেন,—

"না না না—বল গিয়া, আমি যাইতেছি। তুমি যাও, আমি যাইতেছি।"

দুইবার, তিনবার সাহারজাদা উঠিবার নিমিত্ত প্রযত্ন করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অগত্যা ভারতের ভাবী ভূপতি সুরাপহৃতচেতন হইয়া জঘন্য চিন্তা ও অশ্লীল অনুধ্যান করিতে করিতে সেই স্থানে পড়িয়া রহিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

রাজ-রাজ-মোহিনী।

আগরা নগরের যমুনা-তীরস্থ একটি পরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র ভবনের একতম প্রকোষ্ঠে দুইটী যুবতী বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। যে যুবতী অদ্বিতীয়া সুন্দরী, যাঁহার লাবণ্যে গৃহ উজ্জ্বল, যাঁহাকে দর্শনমাত্র দেবী বিবেচনায় মোহিত ও চমকিত হইতে হয় এবং যাঁহার বর্ণ, গঠন, শিক্ষা, কমনীয়তা, ভঙ্গী সকলই অমানুষী ও অপার্থিব সেই সুন্দরী মেহের-

উন্নিসা।* অপরা তাঁহারই সহচরী—আমিনী। মেহের উন্নিসার বয়স ষোড়শ বর্ষের অধিক নহে। যাহার সৌন্দর্য্য ও শিক্ষা ভুবনবিখ্যাত, আমরা সেই রমণী-কুল-ললাম-ভূতা তিলোত্তমার সৌন্দর্য্য-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া হাস্যাস্পদ হইব না। প্রবাদ আছে, বিশ্ব-পতি কোন বস্তুই দোষশূন্য করেন নাই পদ্ম ও গোলাবে কণ্টক আছে; ময়ূরের পদ দেহের অযোগ্য। কিন্তু মেহের উন্নিসা সেই প্রবাদের ব্যাবৃত্তি স্থল। তাঁহার দেহে, স্বভাবে ও কার্য্যে কিছুতেই দোষের সংস্পর্শ দেখা যায় না।

রাজ-রাজ-মোহিনী মেহের উন্নিসার সকল কার্য্যই সুরুচির পরিচায়ক। তাঁহার পরিচ্ছদ, গৃহ-সজ্জা প্রভৃতি তাঁহার সুরুচির সাক্ষ্য দিতেছে। মেহের উন্নিসার পিতা ধনবান্ নহেন, সুতরাং গৃহের শোভা সংবিধানার্থ মহামূল্য দ্রব্য সমস্ত ক্রয় করা তাঁহার সাধ্যাতীত। কিন্তু যাহার গৃহে মেহের উন্নিসার জন্ম, তাঁহার অন্য শোভায় প্রয়োজন? মেহের উন্নিসা সামান্য সামান্য দ্রব্যে গৃহ, দ্বার, ভবন-সংলগ্ন, ক্ষুদ্র উদ্যান প্রভৃতি এমনই সুশৃঙ্খল ও সজ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছেন যে দর্শনমাত্র তাহা চিত্তকে আকর্ষণ করে। মেহের উন্নিসার পরিচ্ছদ মূল্যবান না হইলেও, তাহা এমনই সুরুচি-সঙ্গত ও পরিষ্কার এবং তাহা এমনই দেহ আবরণ করিয়া আছে যে, তাহা মহামূল্য বলিয়াই প্রতীত হইতেছে। মেহের উন্নিসা সহচরীকে বলিতেছেন,—

"আমিনি! তুমি কি আমাকে এতই অসার, ও অপদার্থ বিবেচনা কর? তুমি কি ভাব, আমার অন্তর এতই জঘন্য? প্রণয়-বৃত্তি মনুষ্য-হৃদয়ের উচ্চতার পবিত্র নিদর্শন। সেই পবিত্র বৃত্তি ত্যাগ করিয়া আমি কি পাশব বৃত্তির অনুসরণ করিব?"

আমিনী একটু চিন্তার পর কহিল,—

"মেহের উন্নিসে! ভাবিয়া দেখ তুমি কি হইবে। ধন বল, সম্পত্তি বল, পদ বল, প্রভুত্ব বল, সংসারে মনুষ্য জীবনের যাহা কিছু প্রার্থনীয়, সাহারজাদা সেলিমের তাহার কিছুরই অপ্রতুল নাই। সেই সমস্ত দুর্লভ সুখের অংশিনী হওয়া কি সামান্য ভাগ্যের কথা? মেহের উন্নিসা তুমি ভাবিয়া দেখ।"

মেহের উন্নিসা বিষাদব্যঞ্জক হাস্য করিয়া কহিলেন,—"আমিনি! আমি তোমার প্রস্তাবিত, জীবনের প্রধান প্রার্থনীয় সুখের সহিত আমার হৃদয়ের অতুল সুখের বিনিময় করিতে ইচ্ছা করি না। একমাত্র অমূল্য নিধি প্রেম আমার প্রার্থনীয়। যদি তাহা পাই, তাহা হইলে দারিদ্র্যও আমি শ্রেয়ঃজ্ঞান করি।

আমিনী বলিল,—

"তুমি যাহা চাও, তাহাই কেন্ না পাইবে? সাহারজাদা সেলিম বাহাদুর তোমাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন। তুমি শুন নাই, তিনি তোমার নিমিত্ত উন্মাদ প্রায় হইয়াছেন।"

মেহেরউন্নিসা একটু লজ্জিতা হইলেন। বলিলেন—

"আমিও যে সেলিম বাহাদুরের রূপের প্রশংসা, অথবা তাঁহার অত্যুন্নত পদের প্রতিষ্ঠা করি না, এমন নহে। প্রত্যুত তাঁহার ন্যায় সুন্দর পুরুষ আমি আর দেখি নাই।"

* কোন কোন ইতিহাসে গিয়াসউদ্দীন তনয়ার অমীরুন্নিসা এই নাম লিখিত আছে। যে সুন্দরীকালে নুরজাহান নামে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনা সকলের বিবরণ বোধ করি কাহারও অবিদিত নাই।

মেহেরউন্নিসার চিত্ত একটু ভাবান্তরিত হইল; তিনি ক্ষণেক নীরব হইলেন। আবার কহিলেন।

"কিন্তু তিনি আমাকে ভাল বাসেন না। তাঁহার হৃদয়ে ভালবাসা নাই। তবে কখন যে তাঁহার হৃদয়ে ভালবাসা জন্মিতে পারে না, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। তিনি আমার নিমিত্ত উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন—একথা অসম্ভব নয়। কিন্তু সে উন্মত্ততা স্বতন্ত্র কারণে জন্মিয়াছে; তুমি তাহা বুঝিতে পার নাই। স্বর্গীয় প্রণয় সে মত্ততার কারণ নহে—ঘৃণিত ভোগাসক্তি ও লিপ্সা তাহার হেতু! আমিনি! জগতে যে কিছু কষ্ট আছে, আমি তাহা হাসিতে হাসিতে সহ্য করিতে পারি; তথাপি আমি স্বর্গীয় সুখ-সংবেষ্টিত হইয়াও, কাহারও জঘন্য মনোবৃত্তি সংসাধনের পাত্র হইয়া থাকিতে পারি না। সুতরাং সাহারজাদার প্রস্তাব আমার অরুচিকর।"

আমিনী আবার কহিল,—

"তুমি বুঝিতেছ না—সাহারজাদা তোমাকে বিবাহ করিবেন। বিবাহিতা স্ত্রীকে ভাল বাসিবেন না, ইহাও কি সম্ভব? আর দেখ, সেলিম ভবিষ্যতে বাদশাহ হইবেন। তিনি বাদশাহ হইলে মনে কর তখন তোমার কত সুখ হইবে।

মেহেরউন্নিসা বলিলেন,—

"সেলিম যে ভবিষ্যতে বাদশাহ হইবেন, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। তাঁহার ন্যায় রূপবান্ ও অত্যুন্নত ব্যক্তির ভার্য্যা হইতে কে না ইচ্ছা করে? তাঁহার প্রণয়িনী হওয়া আমি আনন্দের বিষয় বলিয়াই বিবেচনা করি। কিন্তু যখন মনে হয় যে, সেলিম কেবল রূপ-লোলুপ বাসনায় আমার নিমিত্ত উন্মত্ত হইয়াছেন, তখনই আমার চৈতন্য হয়, তখনই ভাবি, যদি মন না পাইলাম, তবে সিংহাসন ধন, সম্পত্তি কিসের জন্য? তখন আমি স্থির করি যে, জীবন যায় সেও স্বীকার, তথাপি আমি পদ-গৌরবে বিমোহিত হইয়া সেলিমের নিকট দেহ বিক্রয় করিব না।

সুন্দরী নীরব হইলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার বলিলেন,—

"সেলিম আমাকে বিবাহ করিবেন সত্য, কিন্তু বিবাহ করিলেই যে স্ত্রীকে ভালবাসিতে হয়, ইহা বাদশাহদিগের শাস্ত্রে লেখে না—মনুষ্যের কোন সমাজেই এরূপ বাধ্যবাধকতা নাই। আর দেখ, পিতা শের আফগানের সহিত, আমার সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। যখন সে সম্বন্ধ স্থির হয়, তখন আমিও তাহাতে সম্মতি দিয়াছি। সুতরাং আমি ধর্ম্মতঃ তাঁহারই পত্নী হইয়াছি। অধুনা আমি যদি অন্য মত করি, তাহা হইলে পিতাকে অপমানিত করা হয়, আমাকে ধর্ম্মে পতিতা হইতে হয় অথচ আমার বিশেষ লাভ কিছুই নাই; বরং আমাকে, সুবর্ণ পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিণীর ন্যায়, যাবজ্জীবন কষ্টই পাইতে হইবে। যে কার্য্যে এত অনর্থপাতের সম্ভাবনা, সেরূপ গর্হিত কার্য্য কেন করিব? আরও বিবেচনা কর, শের, সেলিমের ন্যায়, অত্যুন্নত পদশালী নহেন সত্য, কিন্তু তাঁহার সেলিমের অপেক্ষা বিস্তর গুণ আছে। তিনি বিনয়ী, নম্র, শান্তস্বভাব, মিতাচারী, প্রেমিক, বীর ও কর্ম্মঠ। সেলিমের এ সকল গুণ কখনও না হইতে পারে এমন নয়, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার তাহা নাই। তবে বিধাতা তাঁহাকে যে অত্যুচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও তাঁহাকে যে অতুলনীয় রূপরাশি প্রদান করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই নারীহৃদয়ের লোভ উদ্দীপক। আমার হৃদয়ে সে রমণের লোভ হয় না, প্রণয়

প্রতাপসিংহ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—*—

হল্‌দি ঘাট।

তামস ভবিষ্যতের অন্তরতম প্রদেশে জাগতিক নিয়তির কি ব্যবস্থা পরিস্থাপিত আছে তাহা কে জানে? মানব, তুমি যে আশায়—যে চিন্তায় সংসারসাগরে সাঁতার দিতেছ, কে জানে তাহার পরিণাম কি হইবে? যে আকাঙ্ক্ষায় মানব, তুমি জলধির জলে ডুবিতেছ, কে জানে সে কার্য্যের কি পুরস্কার হইবে? বীরবর মহারাণা প্রতাপসিংহ এবং তদীয় আত্মীয় ও অনুচরগণ যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা হইল না। জগদ্বিখ্যাত হল্‌দিঘাট-সমরে মহারাণার পরাজয় হইল।

সংবৎ ১৬৩২ অব্দের ৭ই শ্রাবণ! ভয়ানক দিন! ইতিহাসের সেই চিরস্মরণীয় শোণিতাক্ত দিন! সে দিন হলদিঘাটে যে ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, কে তাহার বর্ণনা করিতে পারে?

উত্তরে কমলমর, দক্ষিণে রক্ষনাথ এই চত্বারিংশ ক্রোশ পরিমিত ভূখণ্ডের নাম হলদিঘাট। স্থানটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অরণ্য ও নির্ঝরিণী সমূহে পরিপূর্ণ। রাজধানীতে প্রবেশ করিতে হইলে, গিরিসঙ্কট অতিক্রম না করিলে, উপায়ান্তর নাই।

এই স্থানে অদ্য দ্বাবিংশতি সহস্র রাজপুত সৈন্য, সশস্ত্রে ও প্রফুল্লবদনে, শত্রুর সমাগম প্রতীক্ষায়, দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভীল যোদ্ধৃগণ তীর, ধনুক অথবা প্রস্তরখণ্ড হস্তে পর্ব্বতোপরি দণ্ডায়মান। অনেকে স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড এরূপে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে যে, সামান্য বল প্রয়োগ করিলেই তাহা ভূপতিত হইয়া বহুসংখ্যক বিপক্ষকে এককালে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিবে। সৈন্য সমূহের বদনে তেজ, উৎসাহ ও আনন্দের চিহ্ন বিদ্যমান। সকলেই শত্রু নিপাত করিতে দৃঢ়-সংকল্প। উন্মুক্ত অসি, শাণিত শেল প্রভৃতি অস্ত্রসমূহের উজ্জ্বলতায়, বীর-নয়ন-নিঃসৃত তেজে, পরিচ্ছদের চাকচিক্যে অদ্য রণভূমি প্রদীপ্ত। পুরোভাগে স্বয়ং মহারাণা প্রতাপ-

সিংহ বিশাল বক্ষ পাতিয়া, যেন যবনের গতি রোধ করিবেন বলিয়া দণ্ডায়মান। তাঁহার মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র। চৈথক নামক প্রভু-পরায়ণ, অমিত-তেজ অশ্ব বীরবর প্রতাপসিংহকে বহন করিয়া রহিয়াছে। দারুণ উৎসাহে অশ্ব স্থির থাকিতে পারিতেছে না। তেজ-ভরে পৃথিবী বিদীর্ণ করিব ভাবিয়া, নিয়ত পদনিম্নস্থ পর্ব্বত-শিলায় পদাঘাত করিতেছে; আঘাত হেতু পদনিম্ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহিরিতেছে। মহারাণার দক্ষিণ পার্শ্বে কুমার অমরসিংহ ও কুমার রতনসিংহ অশ্ব-পৃষ্ঠে উপবিষ্ট। অমর-সিংহের বদনের ভাব ঘোর চিন্তায় আচ্ছন্ন; রতনসিংহের মূর্ত্তি উন্মাদের ন্যায়, লোচনযুগল রক্তবর্ণ, বদন শ্রী-হীন। অদ্য সমরে প্রাণত্যাগ করিয়া, এ হৃদয়হীন জগৎ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন, ইহাই তাঁহার স্থির সংকল্প।

রাজপুত-কুল-পালগণ, অদ্য আপনাদের লুপ্ত-গৌরব উদ্ধারার্থে, প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন। সে ঘোর যুদ্ধে রাজপুত বীরগণ যে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব। রণকল্যাণী ভবানীদেবীর পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া, যে রণ-সাগরে অদ্য রাজ-বারার ভূষণবৃন্দ সাঁতার দিতেছেন, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় বিস্ময়ে আপ্লুত হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী যবন-সৈন্য-মণ্ডলী সংখ্যায় বিপুল। মুসলমান সৈন্যবৃন্দ হইতে নির্ণীত দক্ষগণ অদ্য এই যুদ্ধে উপস্থিত। স্বয়ং সাহাজাদা সেলিম তাহাদের অধিনায়ক। অসাধারণ ধী-শক্তি-সম্পন্ন, রণ-চতুর মহারাজ মানসিংহ ও সুপটু মহাবেত খাঁ তাঁহার দক্ষিণ ও বাম হস্ত। এরূপ প্রবল-বল বিরোধী শত্রু-মণ্ডলীর সহিত সমরে জয়লাভ অসম্ভব। তথাপি পাঠক! একবার কল্পনা নেত্রে সেই শোণিত-স্রোত প্রবাহিত ভারতের পবিত্র ক্ষেত্র হলদিঘাট সন্দর্শন কর; একবার, দুইশত অতীত বর্ষ অতিক্রম করিয়া কল্পনাকে সেই চির-স্মরণীয় ঘটনার ধ্যান করিতে বল; একবার সেই হৃদয়-মন-বিহ্বলকারী, জীবনান্তক রণভূমির চিত্র মানস-মন্দিরে স্থাপনা কর; একবার সেই তেজ, উৎসাহ, আনন্দ ও আশা-পূর্ণ, যন্ত্রণাচিহ্ন-বিবর্জ্জিত রাজপুত শবের বদন স্মরণ কর; আর পাঠক! যদি পার তবে সেই সকল ভাবিতে ভাবিতে দুই বিন্দু অশ্রুপাত কর; তাঁহাতেও পুণ্য আছে, তাহাতেও শান্তি আছে।

প্রতাপের অদ্য কি উৎসাহ, কি উদ্যম, কি আনন্দ, কি অনুরাগ! পদতলে যবনমুণ্ড বিলুণ্ঠিত হইতেছে, দেহ ও পরিচ্ছদ যবন-শোণিতে আর্দ্র হইয়া গিয়াছে, হস্তস্থিত অস্ত্র নিয়ত সম্মুখস্থ যবনশত্রুর বিনাশ সাধন করিতেছে, এতদপেক্ষা রাজপুত-কুল-ভরসার আর কি আনন্দ হইতে পারে? কিন্তু কোথায় মানসিংহ? সে ভ্রষ্ট কুলাঙ্গার কোথায়? তাহাকে সমর-ক্ষেত্রে কর্ম্মোচিত পুরস্কার দিবার কথা ছিল, সে পাষণ্ড কোথায়? প্রতাপসিংহ একবার অস্ত্রসংযম করিয়া, মানসিংহ কোথায় দেখিবার নিমিত্ত, সমর-ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন অনেক দূর! রাশি রাশি শত্রুসৈন্য ভেদ করিতে না পারিলে, তথায় উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। এদিকে দেখিলেন, নিজ সৈন্যসংখ্যা নিতান্ত হ্রাস হইয়া উঠিয়াছে—জয়ের আশা নাই। তবে কেন শত্রুনিপাত করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইব না? মান-সিংহকে স্বহস্তে সমুচিত প্রতিফল দিব ভাবিয়া, বীরবর প্রতাপসিংহ সজোরে ও সোৎসাহে বিপক্ষ-পক্ষ ভেদ করিয়া ধাবিত হইলেন। উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল না; হস্তি-সমারূঢ় সেলিম বাহাদুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার গতি-রোধ করিলেন। সেলিমকে দেখিয়া, প্রতাপ-

সিংহ স্বীয় উদ্দেশ্য ভুলিয়া গেলেন। প্রতাপের অমোঘ আক্রমণ কাহার সাধ্য সহ্য করে? একে একে সেলিমের শরীর-রক্ষিবর্গ ধরাশায়ী হইল; তখন সুশিক্ষিত চৈথক সম্মুখস্থ পদদ্বয় সেলিলের হস্তি-শিরে উঠাইয়া দিল এবং প্রতাপসিংহ, বর্শাফলকে বাদশাহ-তনয়ের মুণ্ড বিদ্ধ করিবেন ভাবিয়া যেমন তাহা উত্তোলন করিলেন, অমনই ভীত, কাতর ও চালকহীন হস্তী বেগে পলায়ন করিয়া ভাবী ভারতেশ্বরের জীবন রক্ষা করিল। নচেৎ সেই দিন—সেই সমরক্ষেত্রেই তাঁহার জীব-লীলার অবসান হইত; আকবরের উত্তরাধিকারীর স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইত; ইতিহাসের পৃষ্ঠা বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নাম বহন করিত না এবং নুর-জাহানের ভাগ্য-লতিকা মোগল-মুকুটে জড়িত হইত না। সেলিম ভীত হস্তীর অনুগ্রহে নিষ্কৃতি পাইলেন বটে, কিন্তু সেই স্থান মানব-শোণিত-স্রোতে ভাসিয়া গেল। ক্ষতদেহ প্রতাপের সহায়তা করিবার নিমিত্ত রাজপুত সৈন্যগণ সেই দিকে ব্যস্ততা সহ উপস্থিত; আর সেলিমের জীবনরক্ষার্থ মুসলমানেরা সেই স্থলে অগ্রসর; সুতরাং তথায় নরহত্যার বহিল না। সেলিমের হস্তী পলায়ন করিলে পর, প্রতাপকে নিপাত করাই যবন মাত্রেরই প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া অভিমান রক্ষা—প্রতাপের জীবন রক্ষা করাই তখন হিন্দুরা প্রধান ব্রত করিয়া তুলিল; সুতরাং যখন যে যে দিকে প্রতাপসিংহ যাইতে লাগিলেন, তখন সেই সেই দিকে মানব-জীবন ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় বিনষ্ট হইতে লাগিল।

রক্তাক্তকলেবর রতনসিংহ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। শরীর ক্ষত বিক্ষত, শোণিতাপচয় হেতু, হস্ত-পদ বলহীন ও বিকম্পিত, লোচন-যুগল মুদ্রিত প্রায়। হস্ত তখনও অসি চালনা করিতেছে বটে, কিন্তু সে চালনা অনর্থক। সেই সময়ে কয়েকজন যবন-যোদ্ধা আসিয়া তাঁহাকে ভীম বলে আক্রমণ করিল। অমরসিংহ দূর হইতে তাহা লক্ষ্য করিয়া বেগে সেই দিকে ধাবিত হইলেন, এবং অসাধারণ কৌশল সহকারে আক্রমণকারী যবনগণকে পরাভূত করিলেন। তখন ক্ষীণ ও বিকম্পিতস্বরে রতন বলিলেন,—

"ভাই! আমার শেষ প্রার্থনায় কর্ণপাত কর। অদ্যকার দিন আমার জীবনের শেষ দিন হইতে দাও, আমাকে আর বাঁচাইও না।"

অমরসিংহ জানিতেন, রতনসিংহের হৃদয় কেন সম্প্রতি এরূপ উদাসীন ভাব ধারণ করিয়াছে। তিনি সোৎসুক হইয়া বলিলেন,—

"ভাই একি ভ্রান্তি? হৃদয়ের হতাশ প্রেমের যাতনা, তুমি কি মিবারের শান্তি-সুখ নষ্ট করিয়া প্রশমিত করিবে?"

রতনসিংহ প্রথমতঃ আকাশের দিকে, পরে মহারাণার দিকে, অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন,—

"মিবারের স্বাধীনতা ও উন্নতি মহারাণার দ্বারাই সাধ্য। আমরা কালসাগরে, জল বুদ্বুদ মাত্র।"

এই সময়ে মহারাণা শত্রুবেষ্টিত হওয়ায় সেই দিকে তুমুল গোল উঠিল। অমরসিংহ ব্যস্ততা সহ সেই দিকে ধাবিত হইলেন, রতনসিংহও সেই দিকে যাইবার নিমিত্ত প্রয়াস করিলেন, কিন্তু দুই পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই তাঁহার কাতর দেহ কম্পিত হইয়া ভূপতিত হইয়া গেল। অমরসিংহ তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন কিন্তু তাঁহার সেই উৎকণ্ঠা অধিকক্ষণ থাকিতে পাইল না। তখনই এক কিশোর বয়স্ক রাজপুত যোদ্ধা সযত্নে দুইজন ভীলদ্বারা রতনসিংহের

বিচেতন দেহ উঠাইয়া লইলেন এবং সাব ধানতা সহ প্রস্থান করিলেন। অমরসিংহ যেন সেই কিশোর যোদ্ধাকে পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক তিনি অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত হৃদয়ে পিতার সাহায্যার্থ গমন করিলেন। ঘোর সমর-সমুদ্রে অমরসিংহ ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু তাঁহাকে অধিকক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইল না। চারি পাঁচজন যবন যোদ্ধা তাঁহাকে বেষ্টন করিল ও অনবরত আঘাত করিতে লাগিল। অমর দেখিলেন, সমস্ত রাজপুত মহারাণার রক্ষাকার্য্যে ব্যস্ত এবং সমস্ত যবন তাঁহারই বিনাশ সাধনে চেষ্টিত। তাঁহার সাহায্যার্থে কেহই নাই! কেবল দেখিলেন, সেই কিশোর যোদ্ধা ঘর্ম্মাক্ত ও শোণিতাক্ত কলেবরে, তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান এবং কেবল মাত্র সেই ব্যক্তি যথাসাধ্য যত্নে শত্রুনিধনে নিযুক্ত। অমরসিংহ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন,—শত্রু কয়জন নিহত হইল বটে, কিন্তু অমরসিংহও আর আপনার দেহ স্থির রাখিতে পারিলেন না তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত ও চৈতন্য বিলুপ্ত হইতে লাগিল। তখন সেই কিশোর যোদ্ধা তাঁহার অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতনশীল চেতনাহীন দেহ বাহু পাতিয়া ধরিল এবং পূর্ব্বের ন্যায়, ভীলের সাহায্যে তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া গেল। পতনকালে অমরসিংহ বলিলেন,—চিনিয়াছি—উর্ম্মিলে—ভাল কর নাই—মহারাণাকে দেখ।"

উন্মত্ত প্রতাপসিংহ বাহ্যজ্ঞান বিরহিত। বার বার তিনি প্রোৎসাহে বিপক্ষ সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অসাধারণ বীরত্ব সহকারে শত্রুক্ষয় করিতে লাগিলেন এবং আত্মজীবনকে যৎপরোনাস্তি বিপদে মগ্ন করিতে লাগিলেন। বার বার রাজপুত বীরেরা প্রাণপণ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনিল। প্রতাপের দেহ শোণিতাক্ত এবং আঘাত হেতু ক্ষত বিক্ষত। মুসলমানেরা বুঝিতেছে, প্রতাপকে বিনাশ করিতে পারিলেই সমরে জয়ী হওয়া যায়। রাজপুতেরা বুঝিতেছে মহারাণাকে রক্ষা করিতে পারিলেই সকল রক্ষা এবং তাহা হইলে কোন পরাজয়ই পরাজয় নহে। কিন্তু যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে মহারাণাকে রক্ষা করা অসম্ভব। মহারাণা স্বয়ং আত্মজীবনের প্রতি লক্ষ্য বা মমতা শূন্য, অথচ তাঁহার পক্ষীয় সৈন্য-বল এতই হীন যে, তাহাদের চেষ্টায় তাঁহাকে রক্ষা করা সম্পূর্ণরূপ অসাধ্য। তখন স্বদেশ-বৎসল, বীর-ভক্ত ঝালারাজ মানাসিংহ, বিপক্ষের জয়ধ্বনি, সৈন্যগণের কোলাহল, মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ, অস্ত্রের ঝঞ্জনা, অশ্বের হ্রেষারব, গজের গর্জ্জন, ভেদ করিয়া, প্রতাপসিংহের কর্ণে কহিলেন,—

"বীরবর! জগৎ পূজ্য মহারাণা বংশের কেতন! আপনি এক্ষণে আমাদের একমাত্র ভরসা। আপনি বাঁচিলে মিবারের ভবিষ্যতের সকল আশাই আছে। এই যুদ্ধে যদি আপনার জীবন অবসান হয়, তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আশা ফুরাইবে। এক্ষণে তাহাই কি আপনার বাসনা?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রতাপসিংহ কহিলেন,—"অদ্য কি জয়ের আশা নাই?"

গলদশ্রুলোচনে ঝালাপতি কহিলেন—"আশা বহুক্ষণ ত্যাগ করিয়াছি। কেবল আপনার আশায় এখনও সমরক্ষেত্রে আছি। আপনাকে বাঁচাইতে পারিলে, শত্রু জয়ের অপেক্ষা অধিক লাভ মনে করি!"

"অমর, রতন কোথায়?"

"সমরে পতিত হইয়াছেন; কিন্তু জীবন

ন্যায় নাই বোধ হয়। তাঁহাদের দেহ স্থানান্তরিত হইয়াছে।"

নিতান্ত হতাশ স্বরে প্রতাপসিংহ কহিলেন,—যদি অমরের বিনিময়েও যুদ্ধে জয় হইত, সেও ভাল ছিল। কিন্তু মিবারের—এখন আমাকে কি করিতে বলেন ?"

তখন প্রভুপরায়ণ ঝালারাজ হস্তদ্বারা মহারাণার পাদস্পর্শ করিয়া অশ্রু-সমাকুল লোচনে কহিলেন,—

"মহারাণা! এ দীনের এই শেষ প্রার্থনা অবহেলা করিবেন না। আমার প্রার্থনা ন্যায় কি অন্যায়, সঙ্গত কি অসঙ্গত, তাহার বিচার করিবেন না। আমি ভবদীয় চরণে অদ্য যে শেষ প্রার্থনা করিতেছি তাহা গ্রাহ্য করিতেই হইবে!"

মহারাণা বলিলেন,—

"স্বীকার করিলাম।"

মানাইসিংহ বলিলেন,—

"আমার প্রধান প্রার্থনা, মহারাণাকে সমরক্ষেত্র ত্যাগ করিতে হইবে। আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা, সম্প্রতি আমি যাহা করিব, মহারাণা তাহাতে আপত্তি করিবেন না।"

মহারাণা, মানাইসিংহ কৃত প্রথম প্রার্থনা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—

"আপনার দ্বিতীয় প্রস্তাব অবশ্যই গ্রাহ্য; আপনি কি আমাকে জীবিতাবস্থায় সমরক্ষেত্র ত্যাগ করিতে বলিতেছেন ?"

"নচেৎ কি? মহারাণার জীবনই আমরা মিবারের স্বাধীনতা বলিয়া জানি। আপনি কি বিশ্বাস করেন, আমরা মিবারের স্বাধীনতা ধ্বংস করিতে অভিলাষী ?"

মহারাণা অধোবদনে রহিলেন। ইত্যবসরে মানাইসিংহের আদেশক্রমে মহারাণার ছত্রধারী ঝালাপতির মস্তকে রাজচ্ছত্র ধারণ করিল এবং মানাইসিংহ নিজ সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে, দ্বিগুণ উৎসাহে, চণ্ডিকার নাম উচ্চারণ করিয়া, সমর সাগরে ঝাঁপ দিলেন। রাজচ্ছত্র দেখিয়া মানাইসিংহকে মহারাণা মনে করিয়া, মুসলমানেরা তাঁহাকে, উন্মত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় আক্রমণ করিল।

মহারাণা প্রতাপসিংহ তখন একবার সুবিস্তৃত সমরক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষু দিয়া কয় বিন্দু অশ্রু নিপতিত হইয়া, শোণিতরাশির সহিত, মিলিয়া গেল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মহারাণা কহিলেন,—

"ভগবন্! এই কি তোমার বাসনা? আর এ বিড়ম্বনা দেখিয়া কি কাজ? যদি পরাজিত হইলাম তবে এ জীবনে কি আবশ্যক? কিন্তু জীবন বিসর্জ্জন দিলেই বা লাভ কি? যদি আমার প্রাণের পরিবর্ত্তে মিবারের স্বাধীনতা রক্ষিত হয়, তবে কথায় কি প্রয়োজন? যাহার ইচ্ছা সেই আমায় বধ করুক, বা স্বয়ং বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করি। মিবারের আশা ভরসার কি এই শেষ? না, কখন না। প্রতাপ জীবিত থাকিতে মিবার অধীন? না, মরিব না। মিবারকে এ দশায় রাখিয়া কদাচ মরিব না। এই লৌহ হস্তে করিয়া বলিতেছি, মাতঃ জন্মভূমি! তোমাকে এ দশায় রাখিয়া মরিব না। তোমার দুর্দ্দশা ঘুচাইবার পূর্ব্বে যদি আমার কাল পূর্ণ হয়, তবে যেন আমার আত্মা চিরকাল নরক-মধ্যে প্রোথিত থাকে। হে দেবি! আমার সহায় হও। ভগবন্! আমার আশা পূর্ণ কর।" অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রতাপসিংহ চৈথককে বিপরীত দিকে গমন করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

প্রভুর জীবন রক্ষার্থ ঝালারাজের মন্ত্রণা সিদ্ধ হইল। রাজ-ভ্রমে অসংখ্য মুসলমান-

সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সেই ঘোর সংগ্রামে প্রভুরাজের প্রাণরক্ষার্থ, মানাহসিংহ সদল-বলে ইচ্ছায় প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃত্যু-কালে ঝালারাজ অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন;—

"ভগবন্ ভবানীপতি! প্রতাপসিংহকে রক্ষা কর। মিবারের লুপ্ত গৌরব তিনিই রক্ষা করিবেন।"

স্বদেশ-বৎসল প্রভুপরায়ণ ঝালারাজের জীবন বিগত হইল। জগতে তাঁহার কীর্ত্তি অতুলনীয়। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস অন্বেষণ করিয়া এরূপ মহোচ্চ মনের অতি অল্পই নিদর্শন পাওয়া যায়। ধন্য ঝালবারা! ধন্য তোমার বীর সন্তান!

প্রতাপসিংহ রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্ট হিন্দু সৈন্যেরাও সমর ত্যাগ করিল। দ্বাবিংশ সহস্র সৈন্যের মধ্যে অষ্ট সহস্রের জীবন রক্ষিত হইল।

এইরূপে হলদিঘাট সমরের অবসান হইল। কুরুক্ষেত্র সমরের পরে ভারতে হলদিঘাটের ন্যায় মহারণ আর ঘটিয়াছিল কি না সন্দেহ। কাল-চক্র-নেমির আবর্ত্তনে বীরবর প্রতাপসিংহ অন্ধকার সময়ে উর্দ্ধ হইতে অধঃস্থাপিত হইলেন। যে আশায় উন্মত্ত হইয়া এবং যে সাহসে বুক বাঁধিয়া ভারতীয় বীরেরা অদ্য সমরক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছিলেন তাহার কিছুই সফল হইল না। কালসূর্য্যের অস্তগমন সহ, অদ্য কালযবন অমিত-প্রতাপ প্রতাপ-সিংহকে পরাজিত করিল। এ সংসারে কে বিধাতার বাসনার অন্যথাচরণ করিতে পারে বা পারিয়াছে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চৈথক।

মহাবলশালী চৈথক প্রতাপসিংহকে লইয়া বায়ুবেগে প্রস্থান করিল। কেবল একজনমাত্র বিপক্ষ অশ্বারোহী প্রতাপের অনুসরণ করিল। প্রতাপের সে দিকে লক্ষ্য নাই। তাঁহার তৎকালে যেরূপ চিন্তা ও যন্ত্রণা-স্রোত প্রবাহিত, তাহাতে তথায় বাহ্যজগতের অপর কোন বিষয়েরই স্থান হওয়া অসম্ভব। বহুদূর আগমন করার পর, অনুসরণকারী চীৎকার করিল,—

"ওহে নীলঘোড়ার সওয়ার!"

প্রতাপসিংহ অশ্ব থামাইয়া মুখ ফিরাইলেন। দেখিলেন, অনুসরণকারী তাঁহারই ভ্রাতা শুক্তসিংহ। শুক্ত, বহুদিন হইতে জাতীয় পক্ষ ত্যাগ করিয়া, বাদশাহের আনুগত্য ও তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন; সুতরাং অধুনা তিনি মিবারের প্রধান শত্রু। কিন্তু বহুকাল পরে অদ্য তাঁহার দর্শনলাভ করায়, প্রতাপের মনে স্নেহের সঞ্চার হইল। শুক্তসিংহ সমীপে সমাগত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। মহারাণাও অশ্ব ত্যাগ করিলেন। হিংসা, দ্বেষ, শত্রুতা, বিরোধ তখন দূরে পলায়ন করিল। উভয় ভ্রাতা বহুকালের পর অদ্য আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন। উভয়ে অনেকক্ষণ নীরব রহিলেন। প্রতাপসিংহ প্রথমে জিজ্ঞাসিলেন,—

"ভ্রাতঃ! শরীর ও মন ভাল আছে তো?"

শুক্ত ভাবিলেন, প্রতাপসিংহ তাঁহাকে উপহাস করিয়া একথা জিজ্ঞাসিলেন। লজ্জা-

তির মমতা ত্যাগ করিয়া, যবনের সহিত মৈত্রী করায়, শরীর ও মন ভাল না থাকিবারই কথা, তাহা শুক্ত বুঝিতেন। তিনি ভাবিলেন, প্রতাপ তাহাই লক্ষ্য করিয়া এই বাক্যদ্বারা পরিহাস করিলেন। তৎক্ষণাৎ মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। কহিলেন,—

শত্রুর ভয়ে, জীবন লইয়া, মনুষ্য যখন পলায়ন করে তখন তাহার শরীর ও মন ভাল থাকে তো?"

এ তিরস্কার প্রতাপসিংহের পক্ষে অসহ্য! তিনি একবার কটি-সংলগ্ন অসিতে হস্তার্পণ করিলেন। আবার তখনই চিত্তবেগ সংবরণ করিয়া বলিলেন,—

"যাও শুক্ত! তুমি শত্রুভাবে আমার সহিত সাক্ষাৎ কর নাই। আমিও তোমার সহিত বিরোধ করিতে ইচ্ছা করি না। জানিলাম, তোমার সহিত সৌহার্দ্দ বিধাতার বাসনা নহে। প্রার্থনা করি, তোমার সহিত ইহ জীবনে আর সাক্ষাৎ না হয়।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, প্রতাপসিংহ অশ্বের উদ্দেশে গমন করিলেন। শুক্তসিংহও, বিনাবাক্যব্যয়ে স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া, সেলিম বাহাদুরের উদ্দেশে গমন করিলেন। বহুকালের পর প্রতাপসিংহের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, শুক্তসিংহের হৃদয়ে বিষম ভাবান্তর উপস্থিত হইল।

সমস্ত দিন দারুণ রৌদ্রের উত্তাপে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রমে ও অস্ত্রাঘাত জন্য শোণিতক্ষয়ে চৈথক নিতান্ত কাতর হইয়াছিল। ঘর্ম্মে তাহার শরীর আপ্লাবিত, মুখে ও পদ-সন্ধি-স্থলে তুষারধবল ফেনরাশি সমুত্থিত; বল্গার ঘর্ষণে মুখ হইতে এবং অস্ত্রাঘাত হেতু দেহের অসংখ্য স্থান হইতে, রুধির-ধারা প্রবাহিত হওয়ায় চৈথকের শারীরিক শক্তির অপচয় ঘটিয়াছিল। ক্রমে তাহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইতে লাগিল; দেহ কম্পিত হইতে থাকিল; পদচতুষ্টয় দেহের ভার বহনে অক্ষম হইয়া পড়িল। প্রতাপসিংহ যন্ত্রণাপীড়িত চৈথকের অনুসন্ধানে সেই স্থানে উপস্থিত হইলে, চৈথক একটী অপরিস্ফুট যন্ত্রণাব্যঞ্জক ধ্বনি করিল। প্রতাপ, চৈথকের এই শোচনীয় দশা দেখিয়া, মাথায় হাত দিয়া তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। চৈথক তখন সতৃষ্ণ কাতর নয়নে প্রতাপসিংহের প্রতি চাহিল। প্রতাপের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। চৈথক, তাঁহার বিপদ বা সম্পদ, শান্তি বা বিগ্রহ সকল অবস্থাতেই প্রধান সহায়, ভরসা ও আনন্দ। কতবার এই চৈথক তাঁহাকে অপরিহার্য্য বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে! কতবার এই চৈথক তাঁহার জয়ের সহায়তা করিয়াছে! কতবার এই চৈথক অনাহারে, অবিশ্রামে নিরন্তর তাঁহাকে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে, বন হইতে বনান্তরে লইয়া গিয়াছে! কতবার এই চৈথক, আত্ম-জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া, প্রতাপকে পৃষ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক, গিরি-শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে লম্ফ প্রদান করিয়াছে! যে চৈথক সঙ্গে থাকিলে প্রতাপসিংহ কোন স্থানেই আপনাকে সহায়শূন্য মনে করেন না; যে চৈথক প্রভুর নিমিত্ত গহন বন বা উত্তুঙ্গ শৈল, অগ্নিবৎ মরুভূমি বা বিশালকায়া, নদী, সর্ব্বত্রই অকুণ্ঠিত ভাবে বিচরণ করিত; যে চৈথক হস্তী বা ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বা মহিষ, ভীমাকার অজগর, বা অস্ত্রধারী শত্রুসেনা কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিত না, সেই চৈথকের আজি এই দুর্দ্দশা! প্রতাপসিংহ চৈথকের মস্তক স্বীয় উরুদেশে স্থাপন করিলেন। চৈথক, অতি ক্লেশে একবার মস্তক উত্তোলন করিয়া, কাতরভাবব্যঞ্জক শব্দ করিল। তাহার নেত্রনির্গত কয়েক বিন্দু জল প্রতাপের

অঙ্কে পড়িল। প্রতাপসিংহ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—

"আজি রাজ্যশূন্য, ধনজনশূন্য হইয়াও আমার এত ক্লেশ হয় নাই। চৈথক, আজি তুমি আমার বক্ষে শেল আঘাত করিয়া চলিলে।"

কথা যেন অশ্ব বুঝিতে পারিল! বাক্য কথনের ক্ষমতা থাকিলে, সে যেন আজি কত কথাই প্রভুকে জানাইত। প্রতাপসিংহ চৈথকের মুখে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অশ্ব, প্রভুকে দেখিবার নিমিত্ত একবার মুখ ফিরাইবার প্রযত্ন করিল। প্রতাপসিংহ তাহা বুঝিতে পারিয়া ঘুরিয়া বসিলেন। পুনরায় অশ্ব শব্দ করিল। আবার তাহার দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মস্তক প্রতাপসিংহের উরুদেশ হইতে পড়িয়া গেল। আবার একবার শব্দ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। চিরজীবন প্রভুর হিতসাধন করিয়া, অশ্ব চৈথক, প্রভুর পার্শ্বে শয়ন করিয়া প্রাণত্যাগ করিল *। প্রতাপসিংহের প্রাণাধিক প্রিয়তর অশ্ব প্রাণশূন্য হইল। জগতে চৈথক তাঁহার প্রধান আদরের সামগ্রী! সেই চৈথকের বিহনে মহারাণার যার-পর-নাই ক্লেশ হইল। তিনি চৈথকের মৃতদেহের পার্শ্বে বসিয়া উন্মত্তের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

* যে স্থলে চৈথক গতাসু হয়, স্মরণার্থে তথায় এক চৌতারা নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার নাম "চৈথকা চবুতারা।" তাহা আরোয়া নগরের নিকটবর্ত্তী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নবীন তাপস।

হলদিঘাটের অনতিদূরে অর্ব্বলী পর্ব্বতের নিভৃতপ্রদেশ বিশেষে এক তাপসাশ্রম ছিল। দুই সুকুমারকায় মোহনকান্তি যুবা সন্ন্যাসী তথায় বাস করিতেন। সন্ন্যাসীদ্বয়ের এক জনের অঙ্গসৌষ্ঠব, বদন-শ্রী ও দেহের বর্ণ অতি চমৎকার; অপরের তাদৃশ উত্তম না হইলেও সর্ব্বথা সুন্দর বলিয়া অভিহিত হইবার উপযুক্ত। তাঁহাদের প্রকৃতি কোমলতায় পরিপূর্ণ এবং কথোপকথন নিতান্ত ধীর সুমিষ্ট। সন্ন্যাসীদ্বয়ের মস্তক জটাভারে সমাচ্ছন্ন —বদন দীর্ঘায়ত শ্মশ্রু ও গুম্ফরাজি-সমাবৃত।

কুমারী উর্ম্মিলা পুরুষবেশে হলদিঘাটের সমরক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, তাহা পাঠক পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন। তিনিই বহু কষ্টে কুমার অমরসিংহ ও রতনসিংহের মৃতপ্রায় দেহ বহন করিয়া এই তাপসাশ্রমে লইয়া আইসেন। তথায় কুমারী উর্ম্মিলা ও সন্ন্যাসীদ্বয় যথাবিহিত যত্নে এই আহত বীরদ্বয়ের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। অমরসিংহের আঘাত নিতান্ত গুরুতর হয় নাই। অত্যল্পকাল মধ্যেই তাঁহার চৈতন্য হইল; কিন্তু রতনসিংহের অবস্থা অতীব ভয়জনক। মৃত্যুই তাঁহার কামনা ছিল; সুতরাং যে দিকে অধিক আঘাতের সম্ভাবনা সেই দিকেই তিনি বক্ষ পাতিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার আঘাত নিতান্ত গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল এবং তিনি

যে এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন এরূপ সম্ভাবনা ছিল না।

চৈতন্য লাভ করিয়া, অমরসিংহ, রতনের অবস্থা প্রণিধান করিতে সক্ষম হইলেন এবং চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিলেন। কোথায় পিতা, কোথায় মাতা, কোথায় বন্ধুগণ ইত্যাদি নানা চিন্তায় তিনি নিরতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। ঊর্ম্মিলা দেবী, তাঁহাকে যতদূর সম্ভব সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে অবস্থায় সে চিত্তে স্থৈর্য্য অসম্ভব। অগত্যা তাঁহাকে সমস্ত বিস্তারিত বিবরণ জানাইবার নিমিত্ত, ঊর্ম্মিলা দেবী, সংবাদ সংগ্রহ করিবার ভার লইয়া, আশ্রম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সন্ন্যাসীদ্বয়, তাঁহার অনুপস্থিতি কালে, বিহিত বিধানে রতনসিংহের শুশ্রূষা করিবেন এবং অমরসিংহও সে পক্ষে যথাসম্ভব মনোযোগী থাকিবেন বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন।

কুমারী চলিয়া গেলে অমরসিংহ, স্বীয় শরীর যৎপরোনাস্তি অবসন্ন হইলেও, সন্ন্যাসীদ্বয়ের সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধ চেষ্টা উপেক্ষা করিয়া, বারংবার রতনসিংহের নিমিত্ত আন্তরিক উদ্বেগ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। সোদরপ্রতিম রতনের অবস্থা নিতান্ত মন্দ বুঝিয়া তিনি দীর্ঘ নিশ্বাসসহ বলিলেন,—

"ভগবন্, কি হইবে?"

সন্ন্যাসীদ্বয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত জ্যেষ্ঠ বলিলেন,—

"যুবরাজ, আপনার শরীরের অবস্থা ভাল নহে। আপনি এক্ষণে এরূপ চিন্তা ত্যাগ করুন। বিধাতা কি এমনই নির্দ্দয় যে, আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা তাঁহার কর্ণে স্থান পাইবে না?"

অমরসিংহ দেখিলেন নবীন সন্ন্যাসী নির্ব্বাক্; কিন্তু তাঁহার চক্ষু দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত। তখন অমরসিংহ বলিলেন,—

"পাপ দেবলবর-রাজ-তনয়া—পাপীয়সী যমুনাই এই সর্ব্বনাশের কারণ।"

উভয় সন্ন্যাসীই চমকিয়া উঠিলেন। অমর দেখিলেন, নবীন সন্ন্যাসী নিতান্ত চঞ্চল ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। জ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসিলেন,—

"সে কি কুমার! দেবলবর-রাজ-নন্দিনী কিসে বর্ত্তমান সর্ব্বনাশের কারণ?"

অমরসিংহ বলিলেন,—

"কিসে? সেই কুহকিনীর প্রেমে রতনসিংহ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাহার পর দুষ্টা নিজ সখীর দ্বারা রতনকে বলিয়াছে, সে তাঁহার হইবে না। সেই অবধি রতনসিংহ সংসার-ব্যাপারে উদাসীন—জীবনের মমতা-শূন্য—মৃত্যুর প্রার্থী। সেই জন্যই রতনের অদ্য এই দশা।"

নবীন সন্ন্যাসী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—

"ভগবতি! তোমার কথা কি মিথ্যা?"

জ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ অধোবদনে চিন্তা করিলেন, তাঁহার নেত্রদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিলেন,—

"না, যুবরাজ, আপনার ভ্রম হইয়াছে। আমি কিয়ৎকাল পূর্ব্বে এই যুবকের ভূত ভবিষ্যৎ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। দেখিয়াছি, ইঁহার চিত্ত স্বর্গীয় নিন্দিনারাজ-তনয়ার প্রেমে মগ্ন। ইনি সেই কুমারী ভিন্ন আর কাহারও নহেন এবং ইনি শঠ ও প্রবঞ্চক।"

অমরসিংহ বলিলেন,—

আপনি ব্রাহ্মণ ও তপশ্চর, সুতরাং আপনাকে কিছু বলিব না। কিন্তু ইহাই যদি আপ-

নার গণনার ফল হয়, তাহা হইলে হয় আদৌ আপনি গণনা শাস্ত্র অভ্যাস করেন নাই, না হয় গণনা শাস্ত্র যতদূর সম্ভব অমূলক ও অতল জলে নিক্ষিপ্ত হইবার উপযুক্ত। আপনি দেখিতেছেন, ঐ মরণাপন্ন বীর ও আমি পরস্পর স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কিন্তু জানিবেন, হৃদয়ে আমরা অভিন্ন। আমি জানি, কুমারের হৃদয়ে কুমারী যমুনা ভিন্ন অন্য নারীর প্রেমের স্থান নাই।"

নবীন সন্ন্যাসী আবার অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—

"দেবী-বাক্য! মিথ্যা কথা! হৃদয় ফাটিয়া যাও।"

তিনি বেগে বাহিরে চলিয়া আসিলেন এবং তত্রত্য উপল-খণ্ডের উপর অধোমুখে নিপতিত হইয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং নিতান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে, অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। তাঁহাদের চিত্তের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া, অমরসিংহ জিজ্ঞাসিলেন,—

"ভগবন্! আপনাদের উভয়কে, বিশেষতঃ নবীনসন্ন্যাসী মহাশয়কে, বড়ই কাতর দেখিতেছি কেন? বর্ত্তমান সংবাদের সহিত আপনাদের কোন সম্পর্ক থাকিবার সম্ভাবনা আছে কি না জানি না।"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—

"কাতর—হাঁ—অন্য কারণে কাতর নহি। বীরবর রতনসিংহের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া আমরা উভয়েই কাতর। আমার নবীনভ্রাতা বড়ই কোমল-স্বভাব! দেখি, তিনি কোন্ দিকে গমন করিলেন।

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। গমনকালে অমরসিংহ দেখিতে পাইলেন, তাঁহার লোচন দিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। তিনি মনে করিলেন, এরূপ ব্যাকুলতার স্বতন্ত্র কারণ থাকা সম্ভব! তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শয়ন করিয়া পড়িলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অনুতপ্ত।

মহাসমরের পর তৃতীয় রাত্রে হল্‌দিঘাট-সন্নিহিত মুসলমান পট-মণ্ডপে বড় ঘটা। তথায় সে রাত্রে মহাভোজের আয়োজন। সকলেই আনন্দ ও উৎসাহে উন্মত্ত! সে স্থান তখন আনন্দ-কোলাহল ও গুণ-গরিমা-গর্ব্বিত বীরগণের কলরবে পরিপূর্ণ। সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতাই বিগত জয়ের কারণ স্বরূপে সপ্রমাণিত করিতে ব্যস্ত। যে সুলতানী বনাতময়ী মণ্ডপ মধ্যে সাহারজাদা সেলিম, মানসিংহ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ বীরগণ উপবিষ্ট সেখানেও অহঙ্কার-স্রোত প্রবাহিত। সেলিম বলিলেন,—

"প্রতাপের কি দুর্দ্দশা! সে আমাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল। আমাকে আক্রমণ করা কি তাহার কার্য্য! কেমন অম্বররাজ! আমি তাহাকে কেমন জব্দ করিয়া দিয়াছি?

অম্বররাজ মানসিংহ, সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, বলিলেন,—

"এ সকল দুর্গম পথ আমার চিরপরিচিত; নচেৎ এরূপ যুদ্ধে জয়লাভ করা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার হইত।"

সেলিম জিজ্ঞাসিলেন,—

"আপনি শুক্তসিংহের কোন সন্ধান পাইয়াছেন কি? তাঁহাকে এ কয়দিন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না কেন? তিনি কি ভ্রাতৃ-অপমানে কাতর হইয়া নির্জ্জনে রোদন করিতেছেন?"

কথা সমাপ্তির সমসময়ে শুক্তসিংহ তথায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—

"সাহারজাদার অনুমান যথার্থ। আমি অপমানিত ভ্রাতার শোকে কাতর ছিলাম বলিয়া, এ কয়দিন আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করি নাই।"

সেলিম, জিজ্ঞাসিলেন,—

"সেই পরাজিত, পলাতককে ভ্রাতা বলিয়া মনে করিতে আপনার কষ্ট হয় না?

শুক্ত কহিলেন,—

"প্রতাপ পলাতক বটেন, কিন্তু কখনই পরাজিত নহেন। হলদিঘাট সমরে আপনারা জয়লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিবেন না যে, প্রতাপ পরাজিত হইয়াছেন। প্রতাপের প্রতাপ চির-সঙ্গী এবং তিনি জীবিত থাকিতে তাঁহাকে পরাজিত করে কাহার সাধ্য? প্রতাপের ক্ষমতার পরিচয় সাহারজাদা যথেষ্ট জ্ঞাত হইয়াছেন; কারণ আপনি তাঁহার পরাক্রান্ত আক্রমণের হস্ত হইতে দৈবাৎ বাঁচিয়া গিয়াছেন।"

সেলিম হাসিয়া কহিলেন,—

"প্রতাপের ন্যায় পিপীলিকা আমার কি করিতে পারে?"

সঙ্গে সঙ্গে শুক্তসিংহ উত্তর দিলেন,—

"পিপীলিকা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র জীবের প্রাণ সংহার করিতে পারে?"

সেলিম কহিলেন,—

"তোমার যদি ভয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি এখনই গিয়া প্রতাপের আশ্রয় গ্রহণ কর।"

শুক্তসিংহ বলিলেন,—

"হৃদয়ের তাহাই আন্তরিক বাসনা। ভাবনা কেবল তিনি এই অধম, কৃতঘ্ন দুরাচারকে চরণে স্থান দিবেন কি?

তাঁহারই আশ্রয়ে জীবনের শেষ কয়দিন অতিবাহিত করিব সংকল্প করিয়াছি। ভাবিবেন না সাহারজাদা, হলদিঘাট সমরে আপনাদের জয় হইয়াছে বলিয়া, প্রতাপকে জয় করা হইয়াছে। যতক্ষণ প্রতাপ জীবিত, ততক্ষণ আপনাদের কোন জয়ই জয় নহে। কাল যদি প্রতাপকে পরাজয় করে, তবেই আপনাদের মিবার জয়ের বাসনা মিটিবে। এক্ষণে আমি বিদায় হই।"

তিনি সেলিমকে সেলাম করিয়া ও মহারাজ মানসিংহেকে নমস্কার করিয়া বিদায় হইবার উদ্যোগ করিলে মানসিংহ বলিলেন,—

"নির্ব্বোধ! কাহার উপর অভিমান করিতেছ? বাদশাহের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কাহার শরণাগত হইবে?"

হাসিতে হাসিতে শুক্ত বলিলেন,—

"এরূপ চিন্তা যবন-কুটুম্ব মানসিংহেরই শোভা পায়। প্রতাপসিংহের ভ্রাতার এ ভাবনা ভাল দেখায় না।"

লজ্জায় মানসিংহ মস্তক বিনত করিয়া রহিলেন। উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, সেই রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে, শুক্তসিংহ যবন-শিবির ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিবাদের অবসান।

তিন দিবস পরে কুমার রতনসিংহের অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইয়া পড়িল। সেদিন যে কাটিবে এমন সম্ভাবনা রহিল না। অমরসিংহ এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তিনি ও কুমারী উর্ম্মিলা নিরন্তর প্রিয় বন্ধুর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অশ্রু-বর্ষণ করিতেছেন। পথ যেরূপ যবন-শত্রুসমাকুল তাহাতে অন্য কোন আত্মীয়ের সে স্থানে আগমন করা সম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ কুমারী উর্ম্মিলা, উভয়ই কুমারই সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাপদ আছেন বলিয়া, সকলকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। কুমারী আর সকলকে আশ্বস্ত করিয়া নিরস্ত করিয়াছেন বটে কিন্তু স্বয়ং বিপদের পরিমাণ সমস্তই জ্ঞাত ছিলেন; সুতরাং স্থির থাকিতে পারেন নাই। তিনি নানা কৌশলে চিরপরিচিত অরণ্য পথাবলম্বন করিয়া, একদিন পরেই এই গিরি-গুহায় উপস্থিত হইয়াছেন। এই নিঃসহায় স্থলে তিনিই একমাত্র চিকিৎসিকা। বাল্যকাল হইতে বনলতা ও মূলাদির গুণাগুণ জানিতে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল এবং তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়-বলে এ সম্বন্ধে আশাতিরিক্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত দ্রব্য-গুণ-প্রভাবে রতনসিংহের ক্ষত সকল পরিষ্কৃত, রক্তস্রাব নিরুদ্ধ এবং আনুষঙ্গিক উপসর্গ সমূহ বিদূরিত হইয়াছে। কিন্তু উপসর্গ বিদূরিত হইলে কি হয়? জীবনী-শক্তি কে সঞ্চার করিতে পারে? বিজাতীয় দুর্ব্বলতা হেতু তাঁহার দেহ অবসন্ন। অন্তিম অবসাদ কালে যেরূপ অত্যল্প জ্বর উপস্থিত হয়, তাঁহার তাহা হইয়াছে। সেরূপ জ্বরে যেরূপ প্রলাপ উপস্থিত হয়, তাহাও হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় নাড়ীর যেরূপ দ্রুত ও অস্থির গতি হয়, তাহাও দেখা যাইতেছে।

সন্ন্যাসীদ্বয় যত্নের ত্রুটি করিতেছেন না। তাঁহারা উর্ম্মিলার পরামর্শ মত পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। রতনসিংহ প্রলাপ বকিতেছেন,—

"যমুনে!—আঃ হলদিঘাট—মোহিনী—মরিলাম।"

অমরসিংহ, স্বীয় বদন, মুকুলিত নেত্র রতনসিংহের সম্মুখ করিয়া, উচ্চ স্বরে কহিলেন,—

"ভাই রতন, ভয় কি ভাই? এখনই তুমি আরোগ্য হইয়া উঠিবে।"

কিয়ৎকাল পরে রতনসিংহ আবার বলিয়া উঠিলেন,—

'মহারাণা! মিবার—আঃ যমুনা—যাই যে।"

পীড়িতের এই অবস্থা, এদিকে সন্ন্যাসী-দ্বয়ের, বিশেষতঃ নবীন সন্ন্যাসীর, অবস্থা বড় ভয়ানক। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিতে কাঁদিতে, গিরি-গুহার বাহিরে গমন করিলেন। গমনকালে বলিয়া গেলেন,—

"ওঃ, আগে কেন জানি নাই, আগে কেন বুঝি নাই? এখন বাঁচিয়া কি কাজ?"

তিনি বাহিরে গমন করিলে, জ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসীও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার নবীন ভ্রাতা অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে ভূপতিত হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিবার আয়োজন করিতেছেন। অতি

কষ্টে অপেক্ষাকৃত প্রবীণ সন্ন্যাসী, অল্পবয়স্ক সন্ন্যাসীকে সেই বিষম কার্য্য হইতে নিরস্ত করিলেন। তখন নবীন সন্ন্যাসী মূর্চ্ছিত হইয়া, সেই-গিরিপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন।

স্থির-বুদ্ধি উর্ম্মিলা সন্ন্যাসীদিগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার নিমিত্ত বাহিরে আসিলেন। তিনি নবীন সন্ন্যাসীর মূর্চ্ছিত অবস্থা দেখিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। জ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসী বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার নবীন সহচর নিতান্ত কোমল-স্বভাব ও করুণার্দ্র-হৃদয়। বর্ত্তমান ব্যাপারের পরিণাম চিন্তা করিয়া তিনি এতাদৃশ কাতর হইয়াছেন। উর্ম্মিলা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তখন সে হৃদয়ের যে ভাব তাহা সান্ত্বনায় স্থৈর্য্য মানে না। উর্ম্মিলা তাঁহার এবংবিধ ভাব দর্শনে এক একবার বিস্ময়াবিষ্ট হইতে লাগিলেন। এক একবার সন্ন্যাসীর দেবদুর্লভ হৃদয় দেখিয়া, তিনি তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা উপহার দিতে লাগিলেন। বহু যত্নে ও বহু প্রবোধে, বিশেষতঃ পীড়িতের শুশ্রূষার অভাব ঘটিলে নিশ্চয়ই তাঁহার জীবন সম্বন্ধে যে অত্যল্প ভরসা আছে, তাহাও থাকিবে না, ইত্যাদি কারণ বুঝাইয়া, তিনি, তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া, পুনরায় গুহা-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা প্রবেশ করিয়া শুনিতে পাইলেন, রতনসিংহ বলিতেছেন,—

"ওঃ ! প্রেম—কি দায় ? যমুনা—আঃ কোথায় তুমি ?"

উর্ম্মিলা জিজ্ঞাসিলেন,—

"এখন কেমন ?"

অমরসিংহ বলিলেন,—

"সেইরূপ ; বোধ হয় যেন কথাবার্ত্তা পূর্ব্বের অপেক্ষা একটু গ্রন্থিযুক্ত।"

উর্ম্মিলা পীড়িতের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। নবীন সন্ন্যাসী রতনসিংহের চরণসমীপে এবং বয়োজ্যেষ্ঠ মস্তক সন্নিধানে উপবেশন করিলেন।

অমরসিংহ আবার বলিলেন—

"কোন কথাই যমুনার নাম শূন্য নহে। যমুনাই এই সর্ব্বনাশের কারণ।"

উর্ম্মিলা বলিলেন,—

"এক্ষণে কোন উপায়ে যমুনাকে এ স্থানে আনিতে পারিলে, কুমারের অবস্থা হয়তো ভাল হইলেও হইতে পারিত।"

অমরসিংহ বলিলেন,—

"যমুনা—পাপ যমুনা! সে অবিশ্বাসিনী, সে সর্ব্বনাশসাধিনী—সে এখানে আসিবে কেন ? আসিলেই বা তাহাতে কি উপকার! তাহাকে দেখিলে ও চিনিতে পারিলে, কুমারের ক্রোধোদয় এবং ক্লেশাধিক্য হেতু, অবস্থা আরও মন্দ হইয়া যাইতে পারে।"

প্রবীণ সন্ন্যাসী বলিলেন,—

"যুবরাজ! কুমারী যমুনার সম্বন্ধে আপনার যেরূপ মনের ভাব, তাহা বোধ হয় অমূলক। আমার বিশ্বাস, দেবলরাজ-রাজ-তনয়া প্রবঞ্চনা কাহাকে বলে তাহা জানেন না।"

অমরসিংহ বলিলেন,—

"আমার বাক্যের প্রমাণ, এই শয্যাশায়ী মুমূর্ষু।"

নবীন সন্ন্যাসী বলিলেন,—

"যুবরাজ, আমি জ্ঞাত আছি, যমুনার দেহ-মন-প্রাণ সমস্তই কুমার রতনসিংহের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। যদি বিধাতৃ-নিগ্রহে কুমারের কোন অশুভ ঘটে, তাহা হইলে যমুনা তিলার্দ্ধও জীবিত থাকিবে না, ইহা আমার স্থির বিশ্বাস।"

অমরসিংহ প্রথমে প্রবীণ সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—

"দেব! আপনার মীমাংসা কোন কোন সময়ে ভ্রান্ত হইয়া পড়ে, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি।" পরে দ্বিতীয় সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"আপনি বোধ হয় দেবলবর-রাজ-তনয়া যমুনাকে জানেন না।"

নবীন সন্ন্যাসী কহিলেন,—

"যুবরাজ, আপনি কুমার রতনসিংহের মুখে যমুনার স্বভাবের পরিচয় পাইয়াছেন। কুমারের ক্রুদ্ধ হইবার যথেষ্ট কারণ ঘটিয়াছিল। প্রকৃতই হতভাগিনী যমুনা উপস্থিত সর্ব্বনাশের কারণ। কিন্তু আমি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছি, যমুনার অপরাধ তাহার জ্ঞানকৃত নহে এবং সে নিরপরাধা। আমি যাহা জানি তাহা বলি শুনুন যুবরাজ; তাহার পর যথাবিহিত বিচার করিবেন।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী দেবীবাক্য ও মহারাণীর দ্বাররক্ষণীর বাক্য, কুমারের সহিত যমুনার সাক্ষাৎ, যমুনার উত্তর ও যমুনার সহচরীর উক্তি সমস্তই ব্যক্ত করিলেন।

তাহার পর বলিলেন,—

"আমি যাহা বলিলাম, তাহাই প্রকৃত বৃত্তান্ত। এক্ষণে আপনাদের অভিপ্রায় কি?"

কুমারী ঊর্ম্মিলা বলিলেন,—

"এ কথা সম্পূর্ণ সম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। বোধ হয়, উভয় পক্ষই অমূলক সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া এই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছেন।"

অমরসিংহ বলিলেন,—

"হায়! এত কথা সময় থাকিতে আগে কেন হয় নাই। আজি রতন অচৈতন্য। এ সুখ-সংবাদ তাঁহার গোচর করিবার এক্ষণে কোনই উপায় নাই।"

ঊর্ম্মিলা বলিলেন,—

"যুবরাজ, একবার কুমারী যমুনা দেবীকে এ সময়ে এস্থানে আনিতে চেষ্টা করা সৎপরামর্শ। যদি কুমারের চৈতন্য হয়, তাহা হইলে কুমারীকে দেখিয়া ও এই সকল অজ্ঞাত রহস্য জানিয়া, তাঁহার ত্বরিত আশাতিরিক্ত উপকার হইবে। আর যদি অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় তাহা না ঘটে, তাহা হইলেও এই মরণ সময়ে এই প্রকৃত প্রেমিক-যুগলের একবার মিলন সর্ব্বপ্রকারেই বাঞ্ছনীয়।"

অমরসিংহ বলিলেন,—

"কুমারি! তোমার পরামর্শ অতি উত্তম। কিন্তু তাহা সাধিত হইবে কি প্রকারে? কোথায় দেবলবর, আর কোথায় হল্‌দিঘাট। বিশেষতঃ পথ শত্রু সমাচ্ছন্ন।",

প্রবীণ সন্ন্যাসী বলিলেন,—

"যুবরাজের যদি ইচ্ছা ও আদেশ হয় তাহা হইলে বোধ হয়, আমি সহজেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারি।"

অমরসিংহ বলিলেন,—

"ভগবন্! বিলম্ব সহে না। যদি আপনি এই মহদুপকার করিতে পারেন, তাহা হইলে অচিরে তাহার উদ্যোগ করুন।"

অমরসিংহের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে, নবীন সন্ন্যাসী সজোরে স্বীয় বহুবায়ত শ্মশ্রুরাজি ও জটাভার উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ভূপতিত হইয়া বলিলেন,—

"যুবরাজ! এই অভাগিনীই পাপীয়সী যমুনা।"

তাহার পর তিনি রতনসিংহের চরণদ্বয় বক্ষে ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—

"কিসের লজ্জা—কিসের সঙ্কোচ? আমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়! দাসী তোমার চরণাশ্রিতা। জীবনে বা মরণে এ বক্ষ

তোমার চরণ তিলার্দ্ধের জন্যও ত্যাগ করিবে না। মৃত্যুর জন্য দাসীর ভয় নাই। মরণের পর এমন জীবন আছে, যেখানে জরা-মরণের প্রবেশাধিকার নাই, যেখানে সন্দেহের ক্ষমতা নাই।”

ঊর্ম্মিলা ও অমরসিংহ প্রথমে যৎ-পরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, পরে অবিরল ধারায় অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রতন-সিংহ চীৎকার করিলেন,—

“যমুনা কোথায়? প্রেম কি ক্রীড়ার সামগ্রী?”

সঙ্গে সঙ্গে যমুনা রতনসিংহের বদন সমীপস্থ হইয়া বলিলেন,—

“হৃদয়েশ্বর! দাসী যে চরণে।”

রতনসিংহ একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। আবার তখনই সে চক্ষু নিমীলিত হইল। অমরসিংহ হাত দেখিয়া বলিলেন,—

“বিশেষ উন্নতি বুঝা যায় না। যেন নাড়ী একটু স্থির।”

কুমারী ঊর্ম্মিলা বলিলেন,—

“কুমার, যমুনাদেবী আসিয়াছেন।”

রতনসিংহ বলিয়া উঠিলেন,—

“স্বপ্ন—হাঁ যমুনা—কে তুমি?”

রতনসিংহ চক্ষু মেলিয়া যমুনার প্রতি চাহিলেন। যমুনা বলিলেন,—

“নাথ, আমি অপরাধিনী দাসী—আমি যমুনা।”

রতনসিংহ বলিলেন,—

“য—মু—না। হাঁ—ওঃ প্রতারণা—শঠতা—উঃ।”

রতনসিংহ পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। অপর সন্ন্যাসীও স্বীয় জটা ও শ্মশ্রু আদি উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। এই সন্ন্যাসী যমুনার সহচরী কুসুম। কুসুম বলিল,—

“হিতে বিপরীত হইল বা।”

ঊর্ম্মিলা বলিলেন,—

“শীঘ্রই শুভফল ফলিবে। কথাবার্ত্তায় যথেষ্ট জ্ঞানের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইহা শুভ চিহ্ন।”

রতনসিংহ আবার চক্ষু ফিরাইয়া চাহি-লেন। চারিদিকে একবার নয়ন ফিরাইলেন। নয়ন ক্রমে গিয়া যমুনার নয়নের সহিত মিলিত হইল। তিনি বলিলেন,—

“আপনি কুমারী যমুনা!”

রতনসিংহ নীরব হইলেন। যমুনা বলিলেন,—

“হৃদয়সর্ব্বস্ব! আমি দাসী—চরণাশ্রিতা দাসী। দাসী না বুঝিয়া তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছে। প্রাণেশ্বর! তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেও আমার অধিকার নাই।”

এই বলিয়া উন্মাদিনী যমুনা রতনসিংহের চরণে পড়িলেন। রতনসিংহ বলিলেন,—

“ভাই অমর, দেবলবর-রাজ-তনয়া—এখানে কেন? আমরা কোথায় আছি?”

অমরসিংহ তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। যেরূপ ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া কুমারী যমুনা রতনসিংহের প্রেমে সন্দেহ করিয়াছিলেন এবং কুসুম, তাঁহাকে, অনুমিত শঠতার অনুরূপ, শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে, কুমারীর স্বতন্ত্র বিবাহ সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়া-ছিল, সমস্তই সংক্ষেপে ও সুকৌশলে অমরসিংহ রতনসিংহের গোচর করিলেন দুর্ব্বল ও ক্ষীণ রতনসিংহের উত্থানশক্তি ছিল না। তাঁহার লোচন হইতে আনন্দাশ্রু বাহি-রিল। সমস্ত বদনে আনন্দের জ্যোতিঃ প্রকটিত হইল। তিনি বলিলেন,—

“যমুনা! কোথায় তুমি?”

কাঁদিতে কাঁদিতে যমুনা কুমারের বদন

সমীপস্থ হইলেন। হাসিতে হাসিতে অমরসিংহকে লক্ষ্য করিয়া কুমারী উর্ম্মিলা বলিলেন,—

"দেখুন যুবরাজ, আমার পরামর্শ কেমন শুভফল উৎপাদন করিল!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

-*-

গায়িকা।

কি রমণীয় স্থান! সম্মুখে চন্দ্র সরোবর, অনন্ত বারিরাশির ন্যায়, গগনের ছায়া বক্ষে ধারণ করিয়া হাসিতেছে। সরোবর প্রতিকূলে ধর্ম্মোতি দুর্গের উচ্চ চূড়া দেখা যাইতেছে। দুর্গ যেন জলের বক্ষ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বট, অশ্বত্থ ও তিন্তিড়ী বৃক্ষ সরোবরের চতুর্দ্দিকে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সরসীর তিন দিকে, কূল হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত, ফল-পুষ্প সুশোভিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাবিধ বৃক্ষ-লতায় সমাচ্ছন্ন। তৎপরে তিল তিল করিয়া ক্রমোচ্চ পাহাড়, সরোবর ও তৎসন্নিহিত উদ্যানের প্রাচীর স্বরূপে সমুত্থিত হইয়া রহিয়াছে। সেই পাহাড় হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী বৃক্ষমূল বিধৌত করিয়া কুল কুল শব্দে আসিয়া সরসীর জলে মিশিতেছে। দুর্গের এক দিক দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী সেই সমাগত বারিরাশি লইয়া স্থানান্তরে যাইতেছে। নবোদ্ভিন্ন সৌর-কররাশি, এই মনোহর দৃশ্যোপরি নিপতিত হইয়া ইহাকে রমণীয়তর ভাণ্ডার করিয়া তুলিয়াছে।

এই জনশূন্য স্থানে সহসা এ কাহার কণ্ঠস্বর? এ মধুময় উষাকালে সঙ্গীত-ধ্বনিতে কে বন-ভূমি নাচাইয়া তুলিল? এরূপ জনশূন্য স্থানে, অসময়ে রমণীকণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত-ধ্বনি কিরূপে সম্ভব? গায়িকা কুমারী উর্ম্মিলা। তিনি দুর্গের বিপরীত দিকে একখণ্ড পাষাণে উপবেশন করিয়া গাহিতেছেন। তাঁহার উন্মুক্ত চিকুরদাম অব্যবস্থিত ভাবে সমস্ত পৃষ্ঠ আবরণ করিয়া পাষাণে পড়িয়া আছে। তাঁহার দেহে সৌন্দর্য্য-সাধক অলঙ্কার নাই—বসন মলিন। সুন্দরী সেই উপলখণ্ডে বসিয়া গাহিতেছেন,—

"কেন উষে কেন আজ তুমি ভারত মাঝার।
পার না করিতে দূর যদি তমোরাশি তার।
কেন উষে মৃদু হাসি,
আস তবে উপহাসি,
তোমার মধুরালোক, কিন্তু তার ঘোর অন্ধকার
দিবস যাতনা পরে,
দেখ ক্ষণকাল তরে,
ঘুমায় নিবারি আর্য্য অবারিত আঁখিধার।
তুমি তারে ব্যথা দিতে,
নব দুঃখে জাগরিতে,
কেন তবে-কেন তবে-কেন তবে-আস আর।"*

সঙ্গীত-ধ্বনিতে বন-ভূমি নিস্তব্ধ হইল। পক্ষিগণ ক্ষণেকের নিমিত্ত শব্দ করিতে ভুলিয়া গেল। এক ব্যক্তি, অদূরে বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া, এই কলধ্বনি শুনিতেছিলেন। সংগীত শুনিতে শুনিতে তাঁহার চক্ষে অশ্রুর আবির্ভাব হইল। তিনি বস্ত্রে নয়ন মার্জ্জনা করিয়া গীত-সমাপ্তির সমসময়েই সুন্দরীর সমীপস্থ হইলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন,—

* আর্য্যগাথা। (ঈষৎ পরিবর্ত্তিত) রাগিণী ভৈরবী,—তাল মধ্যমান।

"উর্ম্মিলে! যদি তোমার এই যন্ত্রণা বিদূরিত করিতে পারি তবেই জীবন সার্থক।"

কুমারী উর্ম্মিলা হতাশ ভাবে আগন্তুকের বদনের প্রতি চাহিলেন। পরে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—

"অমর! বিধাতার মনে কি এই ছিল?"

অমর কহিলেন,—

"না দেবি। বিধাতার এ বাসনা নহে। স্বর্গের দেবতা আসিলেও, প্রতাপসিংহ থাকিতে মিবারের ভাগ্যপাদপ বিশুষ্ক করিতে পারিবে না। ঘটনাচক্রে মিবার এখন দুর্দ্দশাপন্ন, কিন্তু কখনই মিবারের এ কুদিন রহিবে না।

"তোমার কথা সিদ্ধ হউক। ভবানী তোমার আশা ফলবতী করুন।"

উভয়ে ক্ষণেক নিস্তব্ধ রহিলেন। পরে অমরসিংহ আবার কহিলেন,—

"কুমারি! তোমার এ বেশ কি পরিবর্ত্তিত হইবে না?"

দীর্ঘনিশ্বাস সহ কুমারী বলিলেন,—

"যদি কখন ভগবান্ দিন দেন, তবেই এ বেশ পরিবর্ত্তন করিব, নচেৎ ইহা জীবনের সঙ্গী। পূজ্যপাদ প্রতাপসিংহের পবিত্র আত্মা মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিতেছে, প্রাণাধিক প্রিয়তম অমরসিংহের"—বলিতে বলিতে কুমারী লজ্জাসহ অমরের বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন—তাঁহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"অমরসিংহের হৃদয়ে নিয়ত শত বৃশ্চিক দংশন করিতেছে। চিরসমাদরণীয় মহারাণা-পরিবার প্রাণের ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া বেড়াইতেছেন, সুকুমারকায় রাজ-শিশুগণ অন্নাভাবে ব্যথিত হইতেছে, তখন আমার সুবেশ শোভা পায় না—ভালও লাগে না। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যতদিন মিবারের সৌভাগ্যসূর্য্য পুনঃ প্রকাশিত না হইবে, ততদিন এ কেশে বেণী বাঁধিব না। হল্‌দিঘাট যুদ্ধের পর, দুরন্ত যবন কমলমেরু অধিকার করিয়াছে। আমাদের দুর্দ্দশার চরমাবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। এখন আমরা বনবাসী—আর আমাদের গ্রাম নাই, নগর নাই, দুর্গ নাই। এখন আমরা দস্যু ও অপরাধীর ন্যায় বনে বনে লুকাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়া বেড়াইতেছি। হায়! অমর, আমাদের এ দারুণ দুর্দ্দশার বুঝি বা অবসান নাই।"

অমরসিংহ নীরবে মস্তক বিনত করিয়া সুন্দরীর কথা শুনিতেছিলেন। কথা সমাপ্ত হইলে বলিলেন,

"হতাশ হইও না, উর্ম্মিলে! মিবারের এ দুর্দ্দিন কখনই থাকিবে না।"

উর্ম্মিলা জিজ্ঞাসিলেন,—

"অদ্য মুসলমানের কি সংবাদ?"

"শুনিতেছি, তাহারা অদ্য দেবলবর অধিকার করিবে।"

"মহারাণা অদ্য কোথায়?"

"কল্য শেষরাত্রে কয়েকজন ভীল তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে ঘুঘার বনে লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে।"

"দেবলবর আক্রমণ করিবার কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে?"

"হইয়াছে।"

"তিনি কোন নূতন আদেশ করেন নাই?"

"না—তাঁহার সেই আদেশ সর্ব্বদা বলবান। মিবারের সমগ্র গ্রামে, নগরে ও জনপদে একটিও মানব থাকিতে পাইবে না। সকলকে গুপ্ত ভাবে অরণ্যে বাস করিতে হইবে। মুসলমানেরা ধনজনশূন্য মিবার লইয়া যাহা ইচ্ছা করুক, তাহার কোন বিরুদ্ধাচরণে প্রয়োজন নাই। ইহাই মহারাণার ইচ্ছা এবং কার্য্যও তদনুযায়ী হইতেছে! সমস্ত মিবার

অনুসন্ধান করিয়া, কোথাও একটি রাজপুত বালকও খুঁজিয়া পাইবে না। মিবার এক্ষণে শ্মশান-ভূমি।"

"কুমারী যমুনা এ কয়দিন কোথায় ?"

"বৃদ্ধ দেবলবর-রাজ ও যমুনা বনে আছেন। তাঁহারা ভাল আছেন।"

তাঁহারা তৎকালে এবংবিধ কথোপকথনে মগ্ন ছিলেন, সেই সময়ে দূরে একটি শব্দ হইল। অমরসিংহ ও ঊর্ম্মিলা উৎকর্ণ হইয়া সেই দিকে চাহিলেন। পুনরায় সেই দিক হইতে সেইরূপ শব্দ হইল। অমরসিংহ তখন স্বীয় বদনে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া সেইরূপ শব্দ সমুৎপাদন করিলেন। অবিলম্বে পর্ব্বত-শিখরে একজন সশস্ত্র ভীলের মূর্ত্তি দেখা গেল। অমরসিংহ তাহাকে নিকটস্থ হইতে সঙ্কেত করিলেন। ভীল নিকটস্থ হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া কহিল,—

"মহারাণা আপনাদিকে স্মরণ করিতেছেন।"

অমরসিংহ বলিলেন,—

"চল যাইতেছি।"

ভীল অগ্রসর হইল। অবিলম্বে কুমার ও ঊর্ম্মিলা তাহার অনুসরণ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—*—

সহিষ্ণুতার চরম সীমা।

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল। প্রতাপসিংহের ভাগ্য-প্রবাহের স্রোত আর ফিরিল না! বিধাতার কি বিড়ম্বনা! সময়ের কি বিরুদ্ধ গতি! অবস্থার কি ক্ষণ-ভঙ্গুরতা! মহারাণা প্রতাপসিংহ সপরিবারে বনবাসী। বসিবার আসন নাই, শয়নের শয্যা নাই, আহারের খাদ্য নাই, ভোজনের পাত্র নাই, সমুচিত পরিধেয় নাই। যে স্থানে অধুনা মহারাণা ও তাঁহার পরিবারবর্গ অধিষ্ঠিত, তাহা ঘনারণ্যে সম্বেষ্টিত। তথায় গমনাগমনের পথ নাই। কিন্তু এক স্থানেই কি থাকিবার উপায় আছে? হয়ত মহারাণা ক্লেশ সঞ্চিত সামান্য আহারে প্রবৃত্ত হইবেন, এমন সময়ে সংবাদ পাইলেন, অনতিদূরে মুসলমানেরা তাঁহার সন্ধান করিতেছে। অমনই আহার্য্য ত্যাগ করিতে হইল; শিশুগণ, আহার ত্যাগ করিতে হইল বলিয়া, কাঁদিয়া উঠিল। প্রতাপ, সেই ক্রন্দমান শিশুদিগকে বক্ষে লইয়া, প্রাণাধিক প্রণয়িনীর হস্ত ধারণ করিয়া, সে বন ত্যাগ করিলেন। এইরূপে যার-পর-নাই কষ্ট সহ্য করিয়া, প্রতাপসিংহ পরিবার সহ বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন। এক স্থানে দুই বারের অধিক আহার প্রায়ই তাঁহার ভাগ্যে ঘটে না। অধিকাংশ দিন তিনি এবং তাঁহার মহিষী অনাহারেই দিনপাত করিতেছেন। মহারাণার দুর্দ্দশার সীমা নাই। জগতে তাঁহার ন্যায় তেজস্বী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত অতি দুর্ল্লভ। এই সকল বিজাতীয় ক্লেশই তাঁহার নাম অনন্তকালের নিমিত্ত গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল যাতনা তাঁহার সহিষ্ণুতার প্রবল পরীক্ষা—তাঁহার অদমনীয়তার মহান্ সাক্ষী।

কুমারী ঊর্ম্মিলা ইদানীং নিয়ত রাজপরিবারের সঙ্গেই অবস্থান করিতেছেন। মহারাণা ও মহিষীর শরীর ও মনের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। এ সময় তাঁহাদের সেবার্থ একজন

পরিচারিকা না থাকিলে, তাঁহাদের শরীর রক্ষিত হওয়া অসম্ভব। উর্ম্মিলা সেই কার্য্য সাধনার্থ সতত তাঁহাদের সঙ্গিনী। মহারাণা তাঁহার আশ্চর্য্য ব্যবহারে, অসাধারণ যত্নে অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগে নিরতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করিতেন। তাঁহার সহিত অমরসিংহের বিবাহ হইবে, ইহা স্থির হইয়াছে। এ অবস্থায় কেহ পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে পাইবে না, ইহাই প্রতাপসিংহের আদেশ। প্রতাপসিংহ স্বয়ং স্বকৃত নিয়ম ভঙ্গ করিবার লোক ছিলেন না। সেই জন্যই এই পরম স্পৃহণীয় বিবাহ ঘটনা ঘটিতে পায় নাই। আত্মীয়গণ সকলেই উর্ম্মিলাকে রাজ-বধূ বলিয়াই জানিত এবং তদনুরূপ সম্মান করিত।

শৈলম্বর-রাজ ও রাণী পুষ্পবতী, দেবলরাজ ও কুমারী যমুনা, সকলেই গহনারণ্য-বিশেষে ক্লেশে সময়পাত করিতেছেন। কুমার অমরসিংহ ও রতনসিংহ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া সকলের সন্ধান লইতেছেন ও একের সংবাদ অপরকে জানাইতেছেন। আর ভীলগণ—এই বন্য, অশিক্ষিত, অসভ্যজাতি, এই তেজোগর্ব্বিত রাজপুতগণকে আপনাদের জ্ঞাতি-কুটুম্বজ্ঞানে তাঁহাদের সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে।

বেলা দ্বিপ্রহর। মহারাণা এক বৃক্ষমূলে বসিয়া চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন। অদূরে বৃক্ষদ্বয়-মূলে মহিষী, সন্তানগণ ও উর্ম্মিলা বসিয়া আছেন। মহারাণা, মহিষী ও উর্ম্মিলা দুই দিবস কিছুই আহার করেন নাই। প্রতাপসিংহ ঘোর চিন্তায় ব্যথিত। তিনি চিন্তা করিতেছেন, কি হইবে? এরূপ করিয়া আর কতদিন কাটাইতে হইবে? মিবারের চিরবিরাজিত গৌরবলক্ষ্মী আর থাকিবেন না। তবে এ জীবনে কাজ কি? হায়! অন্তিম সময়ে মিবারের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া যাইতে হইল; ইহার কিছুই করিতে পারিলাম না! এ ভূতময় দেহ ধরিয়া, এই উন্নত রাজপদ লাভ করিয়া, স্বজাতির স্বাধীনতা সংস্থাপন করিতে পারিলাম না! বৃথা এ জীবন। বৃথা এ দেহ! মিবারের স্বাধীনতা বিলুপ্ত, মিবারবাসী, এখন বনবাসী, মিবার শ্মশানভূমি। মিবারের এ দশা দেখিলাম, তথাপি কিছুই করিলাম না। ধিক্ আমায়! বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছ যবন অতঃপর মিবারের মস্তকে পদাঘাত করিবে, মিবারের দেবদেবী বিধর্ম্মীর উপহাস স্থল হইবে, মিবারের রাজলক্ষ্মী ম্লেচ্ছের অঙ্কশায়িনী হইবে—এ সকল জানিতেছি, অথচ ইহা কিছুই প্রতিবিধান করিলাম না। ভগবন্! এ নারকীর নিমিত্ত নূতন নরক সৃষ্টি কর। মিবারের রাজবংশ আর থাকিবে না, বাপ্পা রাওয়ের বংশ যবনের দাস হইবে, মিবারের রাজ-পরিবার অন্ন-দৈন্যে ব্যথিত থাকিবে, মিবারের কুলকামিনীরা সতীত্ব-রত্ন হারাইবে, মিবারের ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজ-বন্ধন প্রতিপদে যবন কর্ত্তৃক বিদলিত হইবে। হা ভগবন্! এই সমস্ত দেখিবার জন্যই কি হতভাগ্য প্রতাপসিংহের জন্ম হইয়াছিল? না—তাহা হইবে না। প্রতাপসিংহ মিবারের এ দুর্দ্দশা অপনোদন না করিয়া ক[illegible] ম[illegible] না। প্রতাপসিংহের জীবন এত [illegible]শূন্য অপদার্থ হইতে পারে না। প্রতাপসিংহের দ্বারা মিবারের কোন না কোন কার্য্য হইবেই হইবে। আকবর বার বার অনুরোধ করিতেছে; আমি মুখে যদি একবার মাত্র যবনের অধীনতা স্বীকার করি, তাহা হইলেই আমার সমস্ত ক্লেশের অবসান হইবে; যবন মিবার ত্যাগ করিয়া যাইবে এবং এবং মিবার-

বাসী পুনরায় ভাগ্যবান্ হইবে। কর দিতে হইবে না—অধীন থাকিতে হইবে না। কেবল মুখে অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে মাত্র। না—না। জীবন থাকিতে, সামান্য ক্লেশের জন্য শারীরিক সুখের লোভে প্রতাপসিংহ খনই যবনের দাসত্ব স্বীকার করিবে না। কিসের ক্লেশ? কিসের যাতনা? যদি পারি বাহুবলে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিব; যদি না পারি তুরাঙ্গে প্রাণ ত্যাগ করিব!”

প্রতাপসিংহ যখন এবংবিধ চিন্তিত সেই সময়ে বাল-কণ্ঠ-নিঃসৃত এক মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ তাঁহার চিন্তা-গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া দিল। তিনি চমকিত হইয়া পশ্চাদ্দিকে মুখ ফিরাইলেন। দেখিলেন, তাঁহার চম্পকদামসদৃশী, পঞ্চম বর্ষীয়া, নবনীতবিনিন্দিত কোমলাঙ্গী কন্যা ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতেছে। প্রতাপসিংহ কোমলস্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—

“মা হেমন্ত! কি হয়েছে মা?”

হেমন্তকুমারী পিতার এবংবিধ প্রশ্নে অধিকতর কাতরতার সহিত কাঁদিতে লাগিল। মহারাণা তখন হেমন্তের সমীপস্থ হইয়া, সস্নেহে তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া বদন চুম্বন করিলেন এবং বস্ত্রাগ্রে নয়নজল মুছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

“কেন মা! এত কাঁদিতেছ কেন?”

তখন হেমন্ত আবার কাঁদিতে কাঁদিতে, রোদনজনিত শোচনীয়, অথচ সুমিষ্ট গদগদ স্বরে বলিল,—

“বাবা ইঁদুরে”—হেমন্ত আর বলিতে পারিল না। অত্যন্ত রোদন জন্য কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

প্রতাপসিংহ আবার বলিলেন,—

“বল মা, ইঁদুর তোমার কি করিয়াছে?”

রাণা পুনরায় কুমারীর নেত্র মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। হেমন্ত আবার কহিল,—

ইঁদুরে আমার ঘাসের রুটি লইয়াছে।”

প্রতাপসিংহ বলিলেন,—

“সে কি কথা মা?”

হিমু আবার বলিল,—

“আমি ও বেলা কি খাইব বাবা? কালি একবেলা কিছু খাই নাই। আজও কিছু খাইব না ভাবিয়া, আমি আমার রুটি অর্দ্ধেক খাইয়া আর অর্দ্ধেক তুলিয়া রাখিয়াছিলাম। বাবা, ইঁদুরে আমার সে রুটিটুকু লইয়া গিয়াছে। বাবা, ইঁদুর মারিয়া সে রুটি আনিয়া দেও।”

কথা সাঙ্গ করিয়া হিমু কাঁদিতে লাগিল। প্রতাপসিংহ মর্ম্মান্তিকস্বরে “হা ভগবন্” বলিয়া হেমন্তকুমারীকে ক্রোড় হইতে নামাইলেন। ক্ষণবিলম্ব না করিয়া, তিনি পুনরায় পূর্ব্বোপবিষ্ট বৃক্ষ-মূলে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তখন তাঁহার নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ, লোচন-তারা উদ্ধোত্থিত; মুখমণ্ডল বিশুষ্ক। ক্ষণেকের মধ্যে তাঁহার মূর্ত্তি উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে।

প্রতাপসিংহ যখন বৃক্ষমূলে আসিয়াছেন তখন মন্ত্রী ভাবনী-সহায় সেই স্থলে উপস্থিত। যৎকালে প্রতাপ হেমন্তের রোদনের কারণ জিজ্ঞাসিতেছিলেন, সেই সময় মন্ত্রীবর তথায় আসিয়াছিলেন। প্রতাপসিংহ তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিলেন না। তিনি দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া কহিলেন,—

“আর কাজ নাই—না, আর কাজ নাই। এ গৌরবে প্রয়োজন কি? কাহার জন্য এ দারুণ ক্লেশ-ভোগ করিতেছি? মিবারের জন্য, স্বজাতির জন্য? মিবার রসাতলে যাউক, স্বজাতি ধ্বংস হউক, আমার তাহাতে কি? অদ্যই আমি বাদশাহকে পত্র লিখিব,

অগ্রই আমি তাঁহার নিকট হইতে স্বাধীনতা ভিক্ষা করিব, সত্বরে আমি নির্ব্বিঘ্ন হইব। এ ঘোর যাতনা আর সহে না। বাদশাহের অধীনতায় দোষ কি? দোষ যদি থাকে, তাহাতে হাত নাই। সমস্ত রাজপুত জাতি যদি সেই দোষে ডুবিয়া থাকে, তবে আমি কেন না ডুবিব? তাহারা সুখে আছে, স্বচ্ছন্দে আছে। আর আমার গর্ব্বের এই পরিণাম! বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল। চিরস্পর্দ্ধী রাণাবংশ আজ কলঙ্ক-হ্রদে ডুবিল। সকলই বিধাতার ইচ্ছা। মান, অপমান, যশ, অযশ, স্বেচ্ছায় অর্জ্জন করা যায় না। বিধাতা আমার মান রাখিলেন না। বিধাতার ইচ্ছার বিরোধে বৃথা প্রতিবাদ করিয়া কি হইবে? অগ্রই বাদশাহকে পত্র লিখিব। সমস্ত সংসার আজি আমার বিরোধী হউক, আমি কাহারও কথা শুনিব না। রাজ্যে প্রয়োজন? ধন-সম্পত্তি কি জন্য? গৌরব কেন? স্বাধীনতায় আবশ্যক? মিবারবাসী আমায় না চাহে, তাহারা স্বতন্ত্র দেশপতি স্থির করিয়া লউক। এ হতভাগ্য তাহাদের অধীশ্বর হইতে চাহে না। আমি সামান্য পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিব। মিবার ছাড়িয়া দেশ দেশান্তরে যাইব, আপনাকে মিবারবাসী বলিয়া কুত্রাপি পরিচিত করিব না। সকলই এ কষ্টের অপেক্ষা সহনীয়।"

মহারাণার কথা সমাপ্তি মাত্র মন্ত্রী সম্মুখীন হইয়া যথাবিহিত অভিবাদন সহকারে কহিলেন,—

"মহারাণার—"

প্রতাপসিংহ তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন,—

"মন্ত্রি—না—ভবানি আর আমি তোমাদের মহারাণা নহি। সে গৌরবে আর আমার কাজ নাই। তুমি সমস্ত মিবারবাসীকে আমার হইয়া বলিও যে, প্রতাপসিংহ অযোগ্য, অক্ষম, ঘৃণিত, অধম। সে আপনি, আপনা হইতে, এ উচ্চ সম্মান পরিত্যাগ করিয়াছে। তাঁহারা অন্য যোগ্যতর ব্যক্তিকে আপনাদের অধীশ্বর মনোনীত করুন।"

মন্ত্রী অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার লোচন-নিঃসৃত দুই বিন্দু জল ভূমিতল আর্দ্র করিল। প্রতাপসিংহ আবার কহিলেন,—

"ভবানি! জন্মের মত আমাকে বিদায় দেও। আমার মায়া ত্যাগ কর। আমি অধম—তোমাদের প্রভু হইবার নিতান্ত অযোগ্য।"

ভবানী কাঁদিতে কাঁদিতে মহারাণার পদযুগল ধারণ করিলেন। প্রতাপ, মন্ত্রীকে উঠাইয়া, কহিলেন,

"ভবানি! আর কেন? এ দুরাশা আমি ত্যাগ করিয়াছি। জয়-পরাজয় দূরের কথা; আমি এ কষ্ট আর সহিতে অক্ষম। আমি রাজ-পদের অযোগ্য। ভাই! আমাকে ক্ষমা কর! মিবারবাসিগণকে আমায় ক্ষমা করিতে বলিও। আপাততঃ অনুগ্রহ করিয়া আমাকে মসী, কাগজ ও লেখনী আনিয়া দেও।"

মন্ত্রী জানিতেন, পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে সমুদিত হইলেও মহারাণা প্রতাপসিংহ স্বীয় সঙ্কল্প ত্যাগ করেন না। সেই মহারাণা যখন অগ্য এতাদৃশ কল্পনাকে মনে স্থান দিয়াছেন, তখন যুক্তি বা প্রবোধ দ্বারা তাঁহার অন্যমত করিতে চেষ্টা করা বৃথা। সুতরাং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, মহারাণার সম্মুখে জানু পাতিয়া, করযোড়ে উপবিষ্ট রহিলেন। মহারাণা পুনরপি কহিলেন,—

"ভবানি! আমার সহিষ্ণুতার সীমা ছাড়াইয়া ক্লেশ অধিক দূর উঠিয়াছে। গৌরব বা কীর্ত্তির আশায় হৃদয় আর বদ্ধ হয় না।

চিরকাল যাহার অশেষ উপকার করিয়াছ, অদ্য লিখিবার সামগ্রী আনয়ন করিয়া, তাহার শেষ উপকার কর। অতঃপর তোমাদের নিকট আমার আর কোন উপকার প্রার্থনা করিতে অধিকার থাকিবে না।”

মন্ত্রী বিনা বাক্যে প্রস্থান করিলেন এবং অবিলম্বে লেখ্য সামগ্রী লইয়া তথায় পুনরাগমন করিলেন। প্রতাপসিংহ লিখিতে বসিলেন। লেখনী ধারণ করিয়া পত্র লিখিবেন, এমন সময়ে দুই বিন্দু অশ্রু পত্রের উপর পতিত হইল। তিনি নেত্র-মার্জ্জন করিয়া পুনরায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়দ্দূর লিখিত হওয়ার পর, তিনি মন্ত্রীকে কহিলেন,—

“আর একটি উপকার। একজন ভীল যোদ্ধাকে ডাকিয়া আন।”

মন্ত্রী প্রস্থান করিলেন। প্রতাপসিংহের লিপি সম্পূর্ণ হইল। মন্ত্রীসহ একজন সবল ভীল সম্মুখীন হইয়া, অতীব সম্মানসহ, দূর হইতে, মহারাণার চরণোদ্দেশে, প্রণাম করিল। মহারাণা তাহার নিকটস্থ হইয়া কহিলেন,—

“শুন বীরবর! তোমরা অনেক সময়ে অনেক উপকারে আমাকে উপকৃত করিয়াছ। সম্প্রতি আমার আর একটি উপকার করিতে হইবে। এই পত্রখানি বাদশাহ আকবরের হস্তে দিতে হইবে। তিনি এক্ষণে আগ্রা নগরে আছেন। তুমি ইহা আর কাহাকেও দিবে না, আর কাহাকেও এ কথা জানাইবে না। ইহার উপরে যাহা লিখিত আছে, তাহা দেখিলে পথে কেহই তোমার গতি-রোধ করিবে না।”

যোদ্ধা এতাদৃশ বিনয়সহ রাজাজ্ঞা শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল। পরে কৃতার্থের ন্যায় হইয়া প্রস্থান করিল। যতদূর দেখা যায়, মহারাণা, অমূল্য সম্পত্তিহারী তস্করবোধে, তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। দূত অদৃশ্য হইলে, তিনি বলিলেন,—

“মিবার! আজ তোমার আশা ফুরাইল। রাজবার! তোমার গৌরবের এই শেষ। উদয়পুর! অদ্য তোমার মহিমা বিগত হইল। মিবারবাসিন্! অদ্য তোমরা চিরগৌরব হারাইলে। প্রতাপসিংহ! অদ্য তোমার মৃত্যু হইল।” বলিতে বলিতে তাঁহার ললাট —দেশে স্বেদবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল, পদদ্বয় কম্পিত হইতে থাকিল, শরীর বল-শূন্য হইল। অবশেষে, চেতনাশূন্য হইয়া, মিবারেশ্বর মহারাণা প্রতাপসিংহ সেই গৈরিক পাষাণস্তরে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার পরিবারগণ নিকটস্থ হইয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। বালক-বালিকা আকুল স্বরে কাঁদিয়া উঠিল। মন্ত্রী কিঞ্চিদ্দূরে পাগলের ন্যায় বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মহারাণায় চৈতন্যের লক্ষণ দৃষ্ট হইল। কুমারী ঊর্ম্মিলা তখন দাঁড়াইয়া কহিলেন,—

“রাজপুত-ভরসা! গাত্রোত্থান করুন। আপনি থাকিতে মিবারের কোন দুর্দ্দশাই হইতে পারে না। মিবারের এ দুর্দ্দিন কখনই থাকিবে না।”

প্রতাপসিংহ চেতনাকালে ঊর্ম্মিলার শেষ কথা শুনিতে পাইলেন। ব্যস্ততা সহ কহিলেন,

“কাহার এ দৈববাণী? বৎসে! তোমার কথা সফল হউক।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রতিঘাত।

যে প্রকাণ্ড মরুভূমি রাজপুতানার বক্ষ ব্যাপিয়া আছে, তাহারই প্রান্তভাগে এক গহন কানন মধ্যে বহুসংখ্যক মানব উপবিষ্ট। স্বয়ং মহারাণা প্রতাপসিংহ, অমরসিংহ, শৈলম্বর-রাজ, দেবলবর-রাজ, মন্ত্রী ভবানী, এবং সহস্র রাজপুত-সৈন্য সপরিবারে সেই গহন কানন-মধ্যে বসিয়া আছেন। মহারাণা বাদশাহকে পত্র প্রেরণ করার পর, স্বজাতীয় শ্রেষ্ঠগণকে আহ্বান করেন। সকলেই কাঁদিতে কাঁদিতে মহারাণার চরণ ধরিয়া, তাঁহাকে এই দৃঢ় সঙ্কল্প হইতে বিরত হইতে বলেন। সর্ব্বসাধারণের মতানুসারে স্থির হয় যে, যবনের দাস হওয়া অপেক্ষা, স্বদেশের মায়া ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে যাওয়াই ভাল। মরুভূমি পার হইয়া সিন্ধুনদের সমীপে কোনস্থানে গিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করা রাজপুতগণের অভিপ্রায় হইল। সেই জন্য তেজস্বী মিবারবাসিগণ, অদ্য দেশ ত্যাগ করিয়া, এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। কেহ কাহাকেও অনুরোধ করে নাই, কেহ কাহাকেও বলে নাই। যিনি আসিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তিনিই আসিয়াছেন।

বাদশাহ আকবর প্রতাপসিংহের অধীনতা সূচক পত্র পাইয়া যার-পর নাই আনন্দে মগ্ন। কিন্তু সে হৃদয়-স্তম্ভ ভগ্ন হইতে পারে, তথাপি কদাচ নমিত হইবার নহে। তাঁহার আশা অপূর্ণ রহিল। তিনি বাপ্পা রাওয়ের বংশধরকে পদানত করিয়া কলঙ্ক-সিন্ধু-নীরে নিমগ্ন করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা হইল না। তেজস্বী রাজপুতবীরগণ, অধীনতা অপেক্ষা, দেশত্যাগ শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছেন। প্রতাপসিংহ তাঁহাদের অধিনায়ক। অদ্য এই গৌরব স্ফীত রাজপুতগণ এই গহন কাননে বসিয়া আছেন। আর এক পদ অগ্রসর হইলে, মিবার চিরদিনের মত পশ্চাতে রহিবে। আর একপদ অগ্রসর হইলে মিবারের সহিত চিরকালের মত সম্বন্ধ ঘুচিবে। আর একপদ অগ্রসর হইলে, জন্মভূমিতে তাঁহাদের আর কোনই স্বত্ব থাকিবে না। তাই রাজপুত-বীরগণ, জন্মভূমির চরণে শেষ স্নেহাশ্রু উপহার দিবার নিমিত্ত, সীমান্ত প্রদেশে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। সেই গহন কানন-মধ্যে, ভূমিতলে, মহারাণা উপবিষ্ট; চতুর্দ্দিকে পর্য্যায়ক্রমে যথ নিয়মে অন্যান্য রাজপুতগণ উপবিষ্ট। যে যেখানে উপবেশন করা আবশ্যক, মহারাণার প্রতি যাহার যাদৃশ সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, অদ্য এতাদৃশ ভয়ঙ্কর অবস্থাতেও তাহার কিছুমাত্র অনবধানতা নাই।

প্রথমেই মহারাণা কহিলেন,—

"শুন রাজপুতগণ! অদ্য হইতে আমরা জীবনের যে গতি অবলম্বন করিতেছি, বলা বাহুল্য, তদপেক্ষা ক্লেশকর ব্যাপার মনুষ্য-জন্মে আর কিছুই হইতে পারে না। ক্লেশ হউক, কিন্তু আমি তোমাদের একটি বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি। আমাদের এই জীবিকা আমাদের নামে সমধিক গৌরব ভিন্ন অপযশ সংযুক্ত করিবে না। ইহা আমাদিগকে একপক্ষে যেমন যার পর-নাই যাতনা দিবে তেমনই অপর পক্ষে, আমাদের অতুলনীয় আনন্দ উৎপাদন করিবে। অতএব সুহৃদ্গণ তোমরা স্মরণ রাখিও যে, আমাদের এই কঠিন প্রতিজ্ঞা-সুদৃঢ় পণ যেন চিরদিনের মত সমান থাকে। আমাদের হৃদয়গত একতা

যেন কস্মিন্‌কালেও বিন্দুমাত্র শিথিলতা প্রাপ্ত না হয়। সেই জন্য আমি এখনও বলিতেছি যাঁহাদের হৃদয় এখনও এই দারুণ ঘটনার নিমিত্ত প্রস্তুত হয় নাই, যাহারা এখনও মিবারের মায়া ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা এখনই আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করুন, বা এতদপেক্ষা যদি অন্য কোন সদ্যুক্তি থাকে, তাহার প্রস্তাব করুন।"

সেই সহস্রাধিক রাজপুত এককালে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "না, না, আমরা মরিব সেও ভাল তথাপি মহারাণার সঙ্গ ছাড়িব না।"

বনে ঘোর শব্দ হইয়া উঠিল। কেবল এক ব্যক্তি এ শব্দে যোগ দিলেন না। তাঁহার চিত্ত বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট ছিল। সেই ব্যক্তি দারুণ চিন্তায় আকুল ছিলেন। তিনি মন্ত্রী ভবানী। রাজপুতগণকৃত চীৎকারধ্বনি অরণ্যস্থল কম্পিত করিয়া, গিরি-কন্দরে প্রতি-ধ্বনিত হইয়া, মরুস্থলীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত প্রধাবিত হইল। অবিলম্বে সে স্থান নিস্তব্ধ হইল। পুনরায় সহস্র মানব সমাকীর্ণ বনভূমি, জনশূন্য স্থানের ন্যায়, "নিশ্চলম নির্ব্বিকম্পম্", হইয়া উঠিল। পুনরায় সহস্র রাজপুত অবনতমস্তকে বসিয়া আছে, তাহাদের নেত্র দিয়া অগ্নিবৎ জ্যোতিঃ বাহিরিতেছে, হৃদয়ে তদধিক গুরুতর তড়িৎলহরী ক্রীড়া করিতেছে। সকলেই নিস্তব্ধ—পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় স্থির, নিশ্চল। সহসা এই শান্তিভঙ্গ করিয়া মন্ত্রী ভবানী, রোরুদ্যমান হইয়া মহারাণার চরণারবিন্দে পতিত হইলেন এবং কহিলেন,

"রাজন্! দাসের এক প্রস্তাব আছে। আপনারা সকলে অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ করুন। এতদিন সমুচিত সময় হয় নাই বলিয়া, দাস সে প্রস্তাব করে নাই; তাহার এ গুরুতর দোষ ক্ষমা করিতে হইবে।"

মহারাণা কহিলেন।

"মন্ত্রী ভবানি! তোমার যেরূপ কোন দোষ হউক না, তাহা সর্ব্বথা মার্জ্জনীয়।" এই বলিয়া মহারাণা মন্ত্রীর হস্ত ধারণ করিয়া বসাইলেন। তখন ভবানী কহিলেন,—

"শুনুন মহারাণা, শুনুন রাজপুতগণ! এই অভাগা বিপুল পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। জীবনে কখন প্রয়োজন হয় নাই, সুতরাং তাহার ব্যয়ও হয় নাই। সেই ধন সম্পত্তি ব্যয় করিলে, বিংশতি সহস্র মানব দ্বাদশবর্ষ কাল সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে। সে ধনে আমার কোনই অধিকার নাই। প্রজার ধন-জন-জীবন সকলই রাজার। রাজা প্রয়োজন হইলে, তাহা অবাধে গ্রহণ করিতে পারেন। আমার এই অতুল সম্পত্তি আমি অকাতরে রাজ-চরণে, দেশের হিতার্থে ভবানীর নাম স্মরণ করিয়া, প্রদান করিলাম; তাহাতে আমার আর কোন অধিকার রহিল না। চিতোরে, আমার ভগ্নাবশেষ ভবনের নিম্নে, ভূগর্ভে সেই ধন সঞ্চিত আছে?"

রাজপুতগণ বলিয়া উঠিল,—

"মন্ত্রিবর, আপনারই জীবন সার্থক। আপনি রাজপুত জাতির গৌরব। আপনার এ কীর্ত্তির তুলনা নাই। যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে, ততদিন আপনার কীর্ত্তি ধরণীধাম হইতে বিলুপ্ত হইবে না!"

মন্ত্রী পুনরপি কহিলেন,—

"শুনুন রাজপুতগণ! এই সম্পত্তির দ্বারা পুনরায় সৈন্য-সংগ্রহ করিয়া আমি অবিলম্বে একে একে মিবারের মুসলমানাধিকৃত দুর্গ সকল আক্রমণ করিতে পরামর্শ দিই। মানব-নিয়তির যতদূর অধঃপতন হইতে পারে, আমাদের তাহা হইয়াছে। আর অধঃপতন হয় না

এক্ষণে পুনরায় উন্নতির সময়। এ সময়ে আমাদের জয় নিশ্চিত।”

সেই সহস্র রাজপুত পুনরায় কহিল,—

“নিশ্চয়! নিশ্চয়! নিশ্চয়!”

যখন রাজপুতগণ এবংবিধ নবোৎসাহ-সাগরে নিমগ্ন, সেই সময় একজন মুসলমান সৈনিক সহসা সেই স্থানে প্রবেশ করিল। সকলেরই দৃষ্টি তৎ প্রতি ধাবিত হইল! মুসলমান সৈনিক প্রবেশ করিয়া, যথাবিহিত সম্মান সহকারে, কহিল;—

“বীরগণ! আমাকে দেখিয়া কোন বিরুদ্ধ ভাব মনে করিবেন না। আমি বিকানীরের ভূতপূর্ব্ব অধিপতি, অধুনা বাদশাহ সভাস্থ রাজকবি পৃথিরাজ বাহাদুরের দূত মাত্র।” এই বলিয়া সৈনিক পরিচ্ছদ মধ্য হইতে এক-খণ্ড পত্র বাহির করিয়া মন্ত্রীর হস্তে দিল। মন্ত্রী তাহা মহারাণার হস্তে প্রদান করিলেন। মহারাণা পত্রোন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন,—

“রাজন,—

হিন্দুর ভরসা যত হিন্দু তাহা জানে।
তথাপি প্রতাপসিংহ নাহি তাহা মানে॥
প্রতাপ সহিত যদি সকল রাজনে।
আকবর রেখে দিত সমান ওজনে॥
বীর্য্য-শূন্য হইয়াছে নরেশ সকল।
সতীত্ব সম্পত্তি শূন্য রমণীর দল॥
ক্রেতা আকবর রাজপুত-পণ্য শালে।
উদয়-অপত্য * ছাড়া কিনেছে সকলে॥
কোন্ রাজপুত বল নরোজার দিন।
স্বেচ্ছায় গৌরব যত হইবে বিহীন॥
কিন্তু হায়! কতজন ত্যজেছে সম্মান॥
চিতোরের সেই ভাগ্য হবে কি বিধান॥
হারায়েছে ধন জন পত্তু * নৃপবর।
গৌরব পরম ধন আছে নির্ভর।
নিরাশ পবনে হায় অনেক রাজনে।
উড়াইয়া আনিয়াছে এই নিকেতনে॥
স্বচক্ষে দেখিছে তারা স্বীয় অপমান।
কলঙ্ক হামির বংশে পায় নাই স্থান॥
জিজ্ঞাসে জগৎ-বাসী বিস্মিত অন্তরে।
কোথায় প্রতাপ থাকে প্রতাপের তরে॥
ক্ষত্রিয়ের তরবার মানব-হৃদয়।
এই বলে বলীয়ান্ উদয়-তনয়॥
হৃদয়ের তেজ আর তরবার-বলে।
সগৌরবে নরবর আসিতেছ চ'লে॥
অবশ্যই হেন দিন ত্বরায় আসিবে।
যেই দিন আকবর এ দেহ ত্যজিবে॥
সেই দিন রাজপুত প্রতাপ-চরণে।
আসিবে নমিতে সবে প্রফুল্লিত মনে॥
বসাইতে পাপদেশে পবিত্র মানবে।
সবিনয়ে জাতীয়েরা তোমারেই কবে॥
সকলেই তব প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে।
চেয়ে আছে মাহারাণা রক্ষাকর্ত্তা জ্ঞানে॥
জানে তারা তোমা হতে হইবে নিশ্চয়।
পবিত্রতা পুণ্য ভূমে পুনশ্চ উদয়॥

অভাগা পৃথিরাজ।

পত্র পাঠান্তে মহারাণা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার লোচন-যুগল রক্ত বর্ণ হইল। মন্ত্রী তাঁহার এবংবিধ ভাব দর্শনে সভয়ে জিজ্ঞাসিলেন,—

“কি ব্যাপার?”

প্রতাপসিংহ তখন উচ্চৈঃস্বরে সেই পত্র সর্ব্ব সমক্ষে পাঠ করিলেন।

মুসলমান সৈনিক কহিল,—

“আমার প্রতি কি আজ্ঞা?”

মহারাণা কহিলেন,—

“তুমি যাইতে পার। উত্তর লিখিবার প্রয়োজন নাই। পৃথিরাজ বাহাদুরকে, আমার

* প্রতাপসিংহ।

সম্মান জানাইয়া কহিবে, তাঁহার বাসনানুযায়ী কার্য্যই হইবে।”

দূত সম্মান জ্ঞাপন করিয়া প্রস্থান করিল। তৎক্ষণাৎ এক জন ভীল যোদ্ধা ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে,মহারাণার সমক্ষে উপস্থিত হইল। মহারাণা জিজ্ঞাসিলেন—

“তোমার কি সংবাদ ?”

সে প্রণাম করিয়া করযোড়ে কহিল,—

“ভয়ানক বিপদ! স্বর্গীয় জয়মলসিংহের পুত্র রতনসিংহ ও দেবলবর-রাজ-কুমারী যমুনা দেবী সাহবাজ খাঁ কর্ত্তৃক দিউয়র দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়াছেন।”

দেবলবর-রাজ কাঁপিয়া উঠিলেন। অমরসিংহ অসিমূলে হস্তার্পণ করিলেন। প্রতাপসিংহ মস্তকের কেশ উৎপাটন করিবার চেষ্টা করিলেন, রাজপুতগণ অসি হস্তে দাঁড়াইয়া উঠিল। তখন প্রতাপ কহিলেন,—

“যোদ্ধৃগণ! তোমরা সকলেই অবগত আছ, কুমার রতনসিংহ ও কুমারী যমুনা তোমাদের ও তোমাদের পরিবারগণের প্রতিভূ হইয়া পঞ্চজন ভীলযোদ্ধা সঙ্গে লইয়া চিতোরেশ্বরীর চরণে শেষ পূজা দিতে গিয়াছেন। তাঁহাদের এই বিপদ। এক্ষণে কি কর্ত্তব্য ?”

যোদ্ধৃগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—

“যুদ্ধ যুদ্ধ যুদ্ধ।”

অনতিবিলম্বে রাজপুতগণ বহ্নি-লোলুপ পতঙ্গের ন্যায়, যবন-বিরোধে যাত্রা করিলেন। পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণার্থ সেই কাননে দুই শত যোদ্ধা রহিল। তখন পরিণাম চিন্তার সময় নয়। ভবিষ্যৎ ভাবনা সে সময় মনে স্থান পায় না। প্রতাপসিংহ সেই স্বল্প-সংখ্যক সৈন্য সহ পুনরায় রণ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

—*—

উৎসাহের সফলতা।

বেলা দ্বি-প্রহর কালে দিউয়র দুর্গাভ্যন্তরে, এক বিস্তীর্ণ প্রকোষ্ঠ মধ্যে পারিষদবর্গসহ সাহবাজ খাঁ উপবিষ্ট। এক জন দূত প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল, এক ক্ষত্রিয় যুবক ও যুবতী ধৃত হইয়াছে। হুজুরের আদেশ পাইলে তাহার বিহিত বিধান করা যায়।”

সাহবাজ খাঁ কহিলেন,—

“তাহাদের এই স্থানে লইয়া আইস। তাহাদের নিকট হইতে প্রতাপসিংহের সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে।”

দূত সম্মান সহ প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল এবং অনতিবিলম্বে প্রহরি পরিবৃত রতনসিংহ ও যমুনা দেবীকে সভাকুটিমে উপনীত করিল। লজ্জায় যমুনার মুখ ম্লান, বর্ণ পাণ্ডু, গতি মন্থর, মস্তক অবনত। ক্রোধে রতনের বদন আরক্ত, লোচন প্রদীপ্ত, গতি সজোর, বক্ষ উন্নত, মস্তক উচ্চ। ব্রীড়াবনতমুখী যমুনা ধীরে ধীরে অবনত মস্তকে, প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। সাহবাজ খাঁ ও তাহার সহচরগণ কুমারীর নিরুপম সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া গেল। তাহারা উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া, সতৃষ্ণ নয়নে কুমারীর বদনের প্রতি চাহিয়া রহিল। রতনসিংহ তাহা দেখিয়া বজ্র গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—

“যবন! আমাদের কি নিমিত্ত এখানে আনিয়াছ ?”

সাহবাজ খাঁ রতনসিংহের কণ্ঠ-স্বর শুনিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার মুখের প্রতি

চাহিয়া দেখিলেন যে, যুবার লোচন দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। সাহবাজ খাঁ ভাবিলেন, যে জাতির মধ্যে এতাদৃশ যুবা-পুরুষের অসদ্ভাব নাই সে জাতি অদম্য। ধীরে ধীরে কহিলেন,—

"বীর! তুমি কি সুখের আশা কর না?"

রতনসিংহ কোমল স্বরে কহিলেন,—

"মনুষ্যের সকল আশা কি পূর্ণ হয়?"

সাহ। তোমাকে মুক্তি দিতে আমার অনিচ্ছা নাই।

রত। দুর্গপতির হৃদয়ের প্রশংসা করি। কিন্তু ইহা যেন তাঁহার স্মরণ থাকে যে,আমি জীবন থাকিতে, অনুগ্রহের নিমিত্ত, যবনের নিকট প্রার্থী নহি।

সাহ। প্রতাপসিংহ এক্ষণে কোথায় আছেন?

রতন। প্রতাপ বনবাসী, প্রতাপ রাজ্য-ভ্রষ্ট, তাঁহার সংবাদে যবনের কোনই প্রয়োজন নাই।

সাহ। তুমি জান না। প্রতাপ সম্প্রতি বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে।

রত। তুমি জান না। মিবারের প্রত্যেক স্থান তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিলেও, প্রতাপ-সিংহ নামক কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পাইবে না।

সাহ। তবে কি প্রতাপসিংহ জীবিত নাই?

রত। আমি সে সংবাদ জানাইতে প্রস্তুত নহি।

আবার সাহবাজের চক্ষু সেই নিরুপম সৌন্দর্য্য সাগরে ডুবিয়া গেল। আবার তিনি মুগ্ধ হইলেন। যমুনা লজ্জায় সঙ্কোচিত হই-লেন। রতন আবার প্রচণ্ড স্বরে কহিলেন,—

"আমাদের প্রতি কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা কর।"

সাহবাজ পুনরায় কহিলেন,—

"হিন্দু যুবক! তোমাকে মুক্তি দিলাম। তুমি যথেচ্ছ স্থানে প্রস্থান করিতে পার।"

রক্ষিগণ রতনসিংহের নিকট হইতে চলিয়া গিয়া অন্য দিকে দাঁড়াইল। রতনসিংহ দাঁড়া-ইয়া রহিলেন। সাহবাজ পুনরায় কহিলেন,—

"তুমি এখনও দাঁড়াইয়া কেন?"

রতন। কুমারীর সম্বন্ধে তোমার মত স্থির হউক।

সাহ। সে মতের সহিত তোমার কোনই সম্বন্ধ নাই। তুমি আত্ম-স্বাধীনতা লইয়া প্রস্থান কর।

রতন। (সাহাস্যে) মুসলমান! রাজ-পুত তোমাদের ন্যায় স্বার্থপর নহে।

সাহ। তবে কি তুমি মুক্তি চাহ না?

রতন। এরূপ মুক্তি ঘৃণা করি।

সাহ। সুন্দরীর মায়া ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে স্বীকৃত থাক, তোমার স্বাধীন-তার দ্বার মুক্ত; নচেৎ বন্দী হও।

রতন। প্রস্তুত।

সাহ। সুন্দরি! তোমার সম্বন্ধে এ ভ্রান্ত যুবার ন্যায় রূঢ় বিচার হইতে পারে না। তোমাকে বন্দিনী করা আমার অসাধ্য। ও কোমল লোচনের মধুর দৃষ্টিতে অসির ধার থাকে না, হৃদয় তো তুচ্ছ কথা! তোমাকে বন্দিনী করিতে পারিলাম না; আমি তোমার নিকট বিচারের প্রার্থী।

রতনসিংহ ক্রোধ-বিকম্পিত স্বরে কহিলেন,

"মূঢ় যবন! সাবধান!"

সাহ। শুন রক্ষিগণ, এই সুন্দরীকে আমার প্রমোদ প্রকোষ্ঠে লইয়া যাও। আমি অনতি-বিলম্বে তথায় যাইতেছি। আর এই যুবককে এখনই বন্দী করিয়া কারাগারে রাখ।

কথা শেষ হইতে না হইতেই, উন্মত্ত

সিংহের ন্যায় এক লম্ফে, চক্ষের নিমিষে, রতনসিংহ সাহবাজ খাঁর মস্তকের উপর পড়িলেন এবং এতাদৃশ বল সহকারে তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন যে সাহবাজ জ্ঞানহীন ও নিস্পন্দ হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। রক্ষিগণ 'মার মার' শব্দে আসিয়া রতনসিংহকে আক্রমণ করিল। কিন্তু সে সময়ে সাহবাজের জীবন সংশয় দেখিয়া সকলেই তৎপ্রতি নিবিষ্টমনা হইল; রতনসিংহের প্রতি বৈরনির্য্যাতনের সময় পাইল না। আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই; কিঞ্চিৎ কাল পরে সাহবাজের সংজ্ঞা হইল। জ্ঞানোদয় হইবামাত্র তিনি কহিলেন,—

"বধ কর, উহাকে বধ কর।"

রক্ষিবর্গ শশব্যস্তে রতনসিংহকে ধরিল।

সাহবাজ পুনরায় কহিলেন;—

"ঐ যুবতীকে ধর। উহাকে প্রমোদ প্রকোষ্ঠে লইয়া যাও।"

তৎক্ষণাৎ রক্ষিবর্গ কুমারী যমুনাকে বেষ্টন করিল। কুমার রতন ক্রোধে ও অপমানে, বিকল-চিত্ত হইয়া উঠিলেন। যমুনা ধীরে ধীরে চেতনা হারাইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। সাহবাজ খাঁ কহিলেন,—

"রমণীকে স্বতন্ত্র স্থলে লইয়া গিয়া বিহিতবিধানে সেবা শুশ্রূষা কর।"

সেই সময় অদূরে ঘোর চীৎকারধ্বনি শুনা গেল। সাহবাজ খাঁ চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন "ব্যাপার কি ?" শব্দ আরও অধিক হইয়া উঠিল। একজন শোণিতাক্ত সৈন্য আসিয়া সংবাদ দিল,—

"নবাব সাহেব! সর্ব্বনাশ উপস্থিত। বহুসংখ্যক রাজপুত সৈন্য আসিয়া ছাউনি আক্রমণ করিয়াছে। আমরা কেহই প্রস্তুত নহি। সর্ব্বনাশ! এতক্ষণে হয়ত আমাদের অর্দ্ধাধিক সৈন্য হত হইল,—

সাহবাজ দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—

"মুরাদবক্স কোথায় ?"

"তিনি প্রথমেই বিনষ্ট হইয়াছেন।"

"রহিম খাঁ ?"

"অসি অসি বলিয়া চীৎকার করিতেছেন।"

শত্রুর চীৎকার-ধ্বনি নিতান্ত নিকটস্থ হইল। সাহবাজ কহিলেন,—

"সংখ্যায় শত্রু কত জন ?"

"সংখ্যায় অধিক নহে, কিন্তু তাহাদের যে উৎসাহ, তাহাতে অসংখ্য সৈন্যও তাহাদের সমকক্ষ হইবে না।"

সাহবাজ কহিলেন,—

"আমার অসি ও বর্ম্ম দেও।"

সেনিক কহিল,—

বোধ হয়, এতক্ষণে তাহাদের জয়ের আর কিছু বাকি নাই।"

একজন রক্ষী সাহবাজের অসি ও বর্ম্ম আনিল। তিনি প্রস্তুত হইয়া দ্রুতপদে বাহিরে আসিলেন। সৈনিক অগ্রে চলিল। কিন্তু তাঁহাদের আর সে মণ্ডপ ছাড়াইয়া অধিক দূর যাইতে হইল না। শত্রুর জয়ধ্বনি, তাম্বুর নিকটেই গগন ভেদ করিয়া উঠিল। কুমার রতনসিংহ ও যমুনাকে ছাড়িয়া রক্ষিবর্গ তখন সাহবাজের সহায়তায় ছুটিল। রতনসিংহ যমুনার নিকটস্থ হইয়া, তাঁহার চেতনা বিধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে যমুনা চৈতন্য লাভ করিয়া কহিলেন,—

"গোল কিসের ?"

রতন কহিলেন,—

"রাজবারার প্রতি ভগবান্ অনুকূল হইলেন বোধ হয়। আমাদের মহারাণার কণ্ঠস্বর শুনিতেছি। তুমি অপেক্ষা কর, আমি দেখিয়া আসি।"

রতনসিংহ ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া দেখিলেন মণ্ডপদ্বারে ঘোর যুদ্ধ। সাহবাজ খাঁর অধীন দশসহস্র সেনার মধ্যে অনুমান চারি হাজার জীবিত আছে। অনুমান ছয় শত রাজপুত তাহাদের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিতেছে। ক্রমশই মুসলমানদিগের বল-ক্ষয় হইতে লাগিল এবং হিন্দুর জয়ধ্বনিতে গগন কাঁপিয়া উঠিতে থাকিল। তখন সাহবাজ ক্ষণেক যুদ্ধ থামাইয়া কি চিন্তা করিলেন। চিন্তার পর একটি ইঙ্গিত করিবামাত্র অনুমান তিন শত সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া তাঁহার সঙ্গে ঊর্দ্ধশ্বাসে বিপরীত দিকে পলাইতে লাগিল। রাজপুতগণ মহাবেগে তাহাদের অনুসরণ করিল। রতনসিংহ ও অমরসিংহ সেই অনুসরণকারীদিগের নায়ক হইলেন। প্রতাপ ও মন্ত্রী সেই যবনমণ্ডপে রহিলেন। প্রতাপ কহিলেন,—

"বোধ হয়, মুসলমানেরা নিকটস্থ কোন মুসলমানাধিকৃত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। অতএব আর সৈন্য নহিলে যুদ্ধ চলে না। তাহার কি উপায়?"

মন্ত্রী উত্তর করিলেন,—

"সৈন্য স্থির আছে। আজ্ঞা পাইলে আপাততঃ দুই সহস্র সৈন্য মহারাণার পতাকা নিম্নে উপস্থিত করি।"

এমন সময় যমুনা দেবী, ধীরে ধীরে নিকটস্থ হইয়া, মহারাণার চরণে প্রণাম করিলেন। মহারাণা সস্নেহে কুমারীর শিরশ্চুম্বন করিয়া কহিলেন,—

"বৎসে! দৈব-নিগ্রহে তোমাকে নিতান্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি আর কোন আশঙ্কা নাই। মিবারের এ দুর্দ্দশা আর অধিক দিন থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না। মন্ত্রি! তুমি শিবিকা ও বাহক সংগ্রহ করিয়া যমুনাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাও এবং দুই সহস্র সৈন্য সহ সত্বর অমৈত দুর্গে আমাদের সহিত মিলিত হও। আমি এক্ষণে চলিলাম।"

এই বলিয়া মহারাণা প্রতাপসিংহ অশ্বে কষাঘাত করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

—*—

আশায় অতৃপ্তি।

জয় ও পরাজয় সকলই বিধাতার অনুগ্রহ বা নিগ্রহ। সৌভাগ্য, সৌভাগ্যের অনুগামী। যে মিবারবাসী মানবগণের অদৃষ্টাকাশ নিয়ত ঘোর জলদজালে আবৃত ছিল, ঘটনা-ঝটিকা তাহা আবার পরিষ্কার করিয়া দিল। আবার তথায় ক্রমে ক্রমে সহস্রকরধারী ভাস্কর দেবের উদয় হইল। একে একে মহারাণা আপনার বিজিত নগর সকলের উদ্ধার সাধন করিতে লাগিলেন। দুর্গের পর দুর্গ, নগরের পর নগর, গ্রামের পর গ্রাম, এইরূপে ক্রমশঃ মহারাণা প্রতাপসিংহ, অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে দেখিলেন, সমস্ত মিবার পুনরায় স্বীয় হস্তগত হইয়াছে। চিতোর, আজমীর এবং মণ্ডলগড় ব্যতীত মিবারের সমস্ত অংশ আবার মহারাণার শাসনাধীনে আসিল। আবার মহারাণার জয়ধ্বজা মিবারের দুর্গ সমস্তের শিরোদেশে উড়িতে লাগিল। আবার মিবারবাসী, মুসলমানের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, পরমানন্দে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, দেব-দেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল। আবার জন-শূন্য শ্মশানভূমিবৎ মিবারের নগর সকল মানব-সমাগমে হাসিতে লাগিল। আবার উদয়পুর নগর, রাজ-সিংহকে

বক্ষে ধরিয়া, আনন্দে ভাসিতে লাগিল। আবার ক্রমশঃ ধন-ধান্তে পরিপূর্ণ হইয়া, মিবার সুখময় হইল। প্রতাপসিংহের ঘোর উদ্যম অসাধারণ তেজ অতুল অধ্যবসায়ের ফল এতদিনে ফলিল। এতদিনে তাঁহার ভাগ্যলতিকায় আনন্দ-প্রসূন ফুটিল; বনে বনে অনাহারে কাঙ্গালের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া, তিনি সপরিবারে যে যৎপরোনাস্তি ক্লেশভোগ করিতেছিলেন, এতকাল পরে তাহা সার্থক হইল। মিবারবাসী জনগণ, প্রতাপের দুর্লঙ্ঘ্য আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া ধন জন গৃহ বাসের মমতা ত্যাগ করতঃ, এতদিন যে অভূতপূর্ব্ব ক্লেশরাশি বহন করিতেছিলেন, সময়ের আবর্ত্তনে তদ্বিনিময়ে তাঁহাদের নিমিত্ত বিমল সুখ আসিল। আর মিবারের অতুলনীয় বীরগণ! তোমরা যে স্বদেশের হিতার্থ, স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষার্থ, স্বীয় গৌরব বর্দ্ধনার্থ,অকাতরে দেহের শোণিতপাত করিয়াছ, রণস্থলে ইচ্ছাপূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছ, তোমাদের সেই সমস্ত দারুণ অনুরাগের ফল এত দিনে ফলিল। এতদিনে, এত ক্লেশে, এত যত্নে মিবার স্বাধীন হইল।

ধন্য মন্ত্রি ভবানি! তোমার গুণ, অনন্ত কাল ইতিহাসের পবিত্র পৃষ্ঠায় জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিবে। তোমার নির্লোভ স্বভাব ও উদারচিত্ততা, মিবারের এতাদৃশ ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের প্রধানতম হেতু। মিবারবাসী চিরদিন তোমার নাম সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিবে। পৃথিবীতে তোমার নাম চিরকাল সমাদৃত হইবে। আর কাহার কথা বা বলিব? কাহার বা নাম করিব? হল্‌দিঘাটের ঘোর যুদ্ধের পর হইতে, মিবারের আধুনিক স্বাধীনতা পর্য্যন্ত যুদ্ধ বিগ্রহে যে সকল বীরগণ প্রভুর প্রাণরক্ষার্থ, বা দেশের দুর্দ্দশা অপনোদনার্থ স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; অন্য কোন জাতির ইতিহাসমধ্যে তাঁহাদের তুলনা স্থল প্রচুর দেখা যায় না। ধন্য বীর-প্রসবিনি রাজস্থান! ধন্য তোমার ভূতলে অতুলনীয় বীর সন্তান!

উদয়সরোবর সমীপস্থ প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের ছায়ায়, মহারাণা প্রতাপসিংহ ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতেছেন। সরোবর-সলিলে বালক বালিকা প্রীতি-প্রফুল্লিত মনে হাসিতে হাসিতে সাঁতার দিতেছে, দূরে সুন্দরীগণ জলের তরঙ্গ তুলিয়া হাস্যের তরঙ্গ তুলিতেছেন, এবং অদূরে মিবারবাসিগণ আনন্দ-উৎফুল্ল বদনে আপনাদের ভাগ্যের গৌরব করিতেছে। মহারাণা তৎসমস্ত শ্রবণ ও দর্শন করিয়া সুখ-সরসীনীরে ভাসিতেছেন। তিনি অনতিমৃদুস্বরে কহিলেন,—

"আহা! কি শুভ দিনই উদয় হইল। এই সকল আমার পুত্রবৎ স্নেহ-পুত্তলী প্রজাগণ; ইহাদের আনন্দ দেখিব, এ আশা এ জীবনে ছিল না। ধন্য ভগবান্ একলিঙ্গ।"

অমনই পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি কহিলেন,—

"ধন্য ভগবান্ একলিঙ্গ! আমরা তাঁহারই প্রসাদে মহারাণার বদন-কমলে হাস্য দেখিতে পাইতেছি।" আগন্তুক মন্ত্রী ভবানী। মহারাণা কহিলেন,—

"সে কেবল তোমারই গুণ।"

"মহারাণার আর কি বাসনা এখনও অপূর্ণ আছে?"

প্রতাপসিংহ হাসিয়া কহিলেন,—

"প্রতাপের বাসনা পূর্ণ হইতে পারে না। আমার বাসনার কি কখন শেষ হইবে? চিতোর জয় না হইলে, মিবার জয় হইল বলিয়া আমি মনে করি না। শরীরের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে অধিক দিন এ দেহে জীবন

থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। অতএব চিতোর যে আমার দ্বারা মুক্তি প্রাপ্ত হইবে তাহা আমার বোধ হয় না। কারণ ঘোর ক্লেশে ও অজাতীয় পরিশ্রমে আমার দেহ ক্রমশঃ অপটু হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং চিতোর লাভের আশা আমাকে এক প্রকার ত্যাগ করিতেই হইল। মিবারকে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন করিতে পারিলাম না, এই আমার বড় দুঃখ। কিন্তু কি করিব? সে যাহা হউক, এক্ষণে আর এক বাসনা নিতান্ত প্রবল। প্রিয়তম অমর ও রতনের বিবাহ উৎসব আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে ঘটে, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।"

মন্ত্রী কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাসসহ কহিলেন,—

"এ দাস অচিরে মহারাণার বাসনা সফল করিবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

হতাশ প্রেমিক।

আগ্রা নগরের প্রাসাদ-মূল বিধৌত করিয়া কুল কুল শব্দে যমুনা শ্যাম দেহ দুলাইতে, দুলাইতে আপন মনে চলিয়া যাইতেছে। অসংখ্য তরণী, দ্রব্যভারে উদর-পূর্ণ করিয়া, অবশিতা, গুর্ব্বিণীর ন্যায়, যেন অনিচ্ছায় ভাসিয়া যাইতেছে। প্রাসাদের একতম প্রকোষ্ঠে দুইটী যুবতী বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। যুবতীদ্বয়ের [illegible] পাঠকের অপরিচিত নহেন। এক সুন্দরী জগদ্বিখ্যাত মেহের উন্নিসা, অপরা সাহারজাদি বন্নু।

মেহ বলিলেন,—

"তোমার বুঝি ফুল ফুটে নাই।"

বন্নু হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—

"দিদি ফুল ফুটিয়া কাজ নাই। তোমার এখনই যে উৎকট চিন্তা দেখিতে পাইতেছি, না জানি বিবাহ হইলে আরও কত বাড়িবে; আমার বিবাহে কাজ নাই।"

মেহের উন্নিসা কিছু বিমর্ষ ভাবে বলিলেন,—

"সাহারজাদি! আমার চিন্তার যথেষ্ট কারণ আছে। আমার ন্যায় সংশয়-দোলায়িত ঘটনা কাহার ঘটে ভাই? তোমাকে কি বলিব ভগ্নি! ভাবিয়া দেখ, আমার কি অবস্থা। এক দিকে রূপ, ধন গৌরব, পদ প্রভৃতি যাহা কিছু প্রার্থনীয়, সমস্তই প্রচুর; আর এক দিকে তদপেক্ষা বহুগুণ হীনতা, দারিদ্র্য প্রভৃতির ভয়। একদিকে সুরা, মোহ, ইন্দ্রিয়-তৃষ্ণা, ভ্রান্তি; আর দিকে প্রেম, স্নেহ, বিশ্বা, অনুরাগ প্রভৃতি। বল দেখি ভাই, এ দুইয়ের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করা কি কঠিন! ভগ্নি! আমার হৃদয়ে যে কষ্ট তাহা তোমাকে কি জানাইব। যে লোভ আমি সংবরণ করিতেছি, মানব হৃদয় ধরিয়া কেহ তাহা পারে না।"

বন্নু কহিলেন,—

"দিদি। তোমাকে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। তোমার চিত্তের উপর সাহারজাদা সেলিমের কি কোনই আধিপত্য নাই?"

মেহের উন্নিসা নীরব। অনেকক্ষণ পরে কহিলেন,—

"আধিপত্য নাই কে বলিবে?" সাহারজাদা এ হৃদয়ের মধ্যে অগ্নি জ্বালাইয়াছেন।

সে অগ্নি আমাকে পুড়াইবে—এক দিন নয়—দুই দিন নয়—চিরকাল পুড়াইবে। কিন্তু দিদি! আমি সে দাহ নীরবে সহ্য করিব—নীরবে সে জ্বালা ভোগ করিব; তথাপি যে জলে ডুবিলে সে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, তাহাতে ডুবিব না। সে অগ্নি নিবিবে না, কিন্তু আর কেহ তাহা জানিতেও পাইবে না। কবরের শীতল মৃত্তিকায় তাহার শান্তি হইবে।"

মেহের-উন্নিসা রুমালে বদন আবৃত করিলেন। বন্নুর নেত্র দিয়াও জল পড়িল। তিনিও অবনত মস্তকে বসিয়া রহিলেন। উভয়ে পুত্তলীবৎ নীরব। এমন সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া সসম্মানে জ্ঞাপন করিল,—

"সাহারজাদি! বাদশাহ আপনাকে স্মরণ করিতেছেন।"

বন্নু কহিলেন,—

"দিদি! কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর, আমি বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি।"

মেহের বলিলেন,—"যাও।"

পরিচারিকার সঙ্গে বন্নু প্রস্থান করিলেন। মেহের উন্নিসা অন্যমনস্ক ভাবে, সেই সম্মুখস্থ পুষ্প-গুচ্ছ হইতে একটী গোলাপ লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

নিঃশব্দে, পশ্চাতের উন্মুক্ত দ্বার দিয়া, এক ব্যক্তি আসিয়া সুন্দরীর পশ্চাতে দাঁড়াইলেন এবং অতিমৃদু মধুর স্বরে কহিলেন,—

"মেহের উন্নিসা! জগতে কি বিচার নাই?"

মেহের উন্নিসা চমকিত হইয়া উঠিলেন। বদন ফিরাইয়া দেখিলেন, প্রশ্নকারী সাহারজাদা সেলিম। তিনি সম্মান সহকারে ফিরিলেন এবং লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেলিম পুনরায় কহিলেন,—

"সুন্দরি! আর কতকাল এ আশা পুষিয়া রাখিব?"

মেহের উন্নিসার বদন লজ্জা, চিন্তা, মনস্তাপ ক্লেশ প্রভৃতিতে বিমিশ্রিত হইয়া এক মনোহর ভাব ধারণ করিল। তিনি নীরবে রহিলেন! সাহাজাদার প্রশ্নের তিনি কি উত্তর দিবেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। সেলিম পুনরায় কহিলেন,—

"তুমি যেন কি ভাবিতেছ বোধ হইতেছে। যাই ভাব মেহের! তোমার প্রতি আমার হৃদয়ের যে অনুরাগ তাহা নিতান্ত বদ্ধমূল। কোন রূপেই তাহা উচ্ছেদ করিবার সম্ভাবনা নাই। আমি তোমাকে বিস্মৃত হইবার নিমিত্ত বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হই নাই। তোমাকে বিস্মৃত হওয়া সাধ্যাতীত। এ জীবনে আমি তোমাকে ভুলিতে পারিব না। প্রমোদকাননে বা সমরক্ষেত্রে, আত্মীয়-মধ্যে বা শত্রুসমক্ষে, কুত্রাপি আমি নিমেষের নিমিত্তও তোমাকে ভুলিতে পারি নাই। কিন্তু মেহের উন্নিসা, আমি আর এ লুব্ধ আশ্বাস বহন করিয়া থাকিতে পারি না। তোমাকে মিনতি করি, তুমি আমাকে অন্ত মনের কথা বল।

মেহের উন্নিসার নেত্রে দুই বিন্দু জল আসিল। তিনি মস্তক বিনত করিয়া রহিলেন, সুতরাং তাঁহার নেত্রজল সাহাজাদা দেখিতে পাইলেন না। শোক-সংক্ষুব্ধ বিজড়িত স্বরে সুন্দরী কহিলেন,—

"আপনার সহিত বিবাহ, বোধ করি, বিধাতার বাঞ্ছনীয় নয়। আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

"যাও, তোমাকে আর আমার কিছু বলিবার নাই। আর আমার কিছু জানিবারও নাই। তুমি যাও, সুখে থাক, ঈশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন! আর একটী কথা বলি, শুনিয়া যাও! না—আর কিছু বলিব না। আমার

যাতনা তোমাকে জানাইয়া আর ফল ?”

সাহারজাদার চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িতে গল। মেহের উন্নিসা ধীরে ধীরে প্রস্থান লেন। তাঁহার লোচন দিয়া অর্গল জল তে লাগিল। তিনি তরু-সন্নিহিত হইয়া স্বরে কহিলেন,—

হায় ! এ কথা আমি এতদিন কেন জানি ”

লিম চক্ষে রুমাল দিয়া অনেকক্ষণ করিলেন। সেই সময়ে তাঁহার অজ্ঞাত-বাদশাহ আকবর তাঁহার সম্মুখে আসিয়া মান হইলেন। সেলিম নেত্র হইতে অন্তরিত করিয়া দেখিলেন কই মেহের উ সা সে প্রকোষ্ঠে নাই তো। দেখিলেন, মেহের উন্নিসার স্থানে বাদশাহ দাঁড়াইয়া। তিনি সসম্মান অভিবাদন করিয়া দূরে দাঁড়াইলেন। বাদশাহ কহিলেন,—

“সেলিম অনেকদিন অবধি তোমাকে একটি কথা বলিব মনে আছে, কিন্তু বলিয়া উঠিতে পারি নাই। তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা তাহা তোমাকে জানাইয়াছি। [illegible] তোমাকে স্বয়ং বলিব, স্থির করিয়াছি। [illegible] হয়, অদ্য ঘটনাক্রমে বলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। মেহের উন্নিসা নাম্নী এক কুমারীকে বিবাহ করিতে তুমি যার-পর-নাই অভিলাষী হইয়াছ। সে কন্যা পরমাসুন্দরী তাহা আমি জানি। কিন্তু তাহার সহিত তোমার বিবাহ হইতে পারে না—হইবেও না। অপর এক ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইয়াছে। সে সম্বন্ধ তাহার পিতার সম্মতিক্রমে ধার্য্য হইয়াছে। লোকতঃ এবং ধর্ম্মতঃ সে কন্যার বিবাহ হইয়াছে। অন্য পাত্রের সহিত কোনক্রমেই তাহার বিবাহ হইবে না। যদি তাহার সম্বন্ধে তোমার কোন দুর্দ্দমনীয় অনুরাগ থাকে, তাহা সংবরণ কর, ইহাই আমার অনুরোধ এবং আজ্ঞা। এ আজ্ঞার কোন রূপ অন্যথা হইলে, আমি নিতান্ত বিরক্ত হইব—সাবধান।”

সেলিম সবিনয়ে কহিলেন,—

“বাদশাহের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।”

বাদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,—“রাজ্য-সংক্রান্ত সংবাদ কিছু জান কি ?”

“না—নূতন সংবাদ কি ? রাজপুত-যুদ্ধে আমাদের জয় হইবে কি ?”

“না—তুমি যে রাজপুত যুদ্ধ ভুল না। হলদিঘাট যুদ্ধের পর হইতে, রাজপুত জাতির প্রতি তোমার নিতান্ত অনুরাগ দেখিতেছি।”

“বীরত্বে তাহাদের সমকক্ষ জাতি জগতে আর নাই বলিয়া বোধ হয়। সে যুদ্ধে আপনি উপস্থিত থাকিলে, বীরত্বে বিমোহিত হইয়া, তাহাদিগকে চির-স্বাধীনতার সনন্দ দিয়া আসিতেন।”

“সংপ্রতি প্রতাপসিংহ মিবার উদ্ধারার্থ বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়াছে।”

“আজ কাল তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য যাইবে কি ?”

“না—তাহাদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি কোন চেষ্টাই হইতেছে না। সম্প্রতি দাক্ষিণাত্যে সৈন্য না পাঠাইলে নয়। আমি সেই কথাই তোমাকে বলিতেছিলাম। তথায় বড় গোল উপস্থিত। তুমি তথায় যাইতে প্রস্তুত আছ কি ?”

“এ দাস সতত প্রস্তুত।”

“উত্তম। আইস, কর্ম্মচারিগণের সহিত তাহার পরামর্শ করা যাউক।”

সুকৌশলী আকবর ও হতাশ সেলিম সে প্রকোষ্ঠ হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অন্তিমে।

ঘোর পরিশ্রমে, যৎপরোনাস্তি মানসিক উদ্বেগে, নিরন্তর অনিয়মে বীরবর প্রতাপসিংহের শরীর ভগ্ন হইয়াছিল। ধীরে ধীরে ব্যাধি আসিয়া সেই সুঘটিত কমনীয় কান্তিকে গ্রাস করিল। দারুণ দুর্ব্বলতা আসিয়া ক্রমে বীরেন্দ্র-কেশরীকে শয্যাশায়ী করিল। ক্রমে এমন অবস্থা হইয়া উঠিল যে, চিকিৎসকেরা তাঁহার জীবনের আশা-ভরসা ত্যাগ করিলেন।

বীরবর প্রতাপসিংহ শয্যায় শয়ান। তাঁহার চতুর্দ্দিকে মিবারের প্রধান প্রধান যোদ্ধৃবর্গ আসীন। সকলেরই অবনত মস্তক, সকলেই ম্রিয়মাণ। কি ভয়ানক সংবাদ! অদ্য মিবার শ্রীভ্রষ্ট হইবে, অদ্য মিবারবাসী শিরঃশূন্য হইবে। অদ্য রাজপুত জাতি সহায়-শূন্য হইবে। অদ্য প্রতাপসিংহের জীবন দেহাশ্রয় ত্যাগ করিবে। অদ্যকার দিন কি ভয়ঙ্কর!

প্রতাপসিংহ ধীরে ধীরে মন্ত্রির হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—

"ভবানি, আমার বাসনা পূর্ণ করিতে পারিলে না।"

"মহারাণা সময় কই! দাস মহারাণার বাসনা এখনও যতদূর সম্ভব পূরণ করিবে।"

দুই খানি শূন্য সিংহাসন প্রতাপসিংহের পদসমীপে পাতিত হইল। অনতিবিলম্বে কুমার অমরসিংহ ও রতনসিংহ এবং কুমারী উর্ম্মিলা ও যমুনা সেই স্থলে নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা আসিয়া ভক্তিভাবে মহারাণার চরণে প্রণাম করিলেন ও পদধূলি মস্তকে লইলেন। প্রতাপসিংহ কুমার অমরসিংহ ও কুমার উর্ম্মিলার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—

"বৎস! সমৃদ্ধিসহ তোমাদের বিবাহ দি[illegible] হৃদয় তৃপ্ত করিব, বড় বাসনা ছিল। বিধা[illegible] সে সাধ মিটাইতে দিলেন না। আমি অ[illegible] এইরূপে মিবারবাসী প্রধানগণের সমক্ষে তোমাদিগকে পবিত্র বিবাহবন্ধনে বদ্ধ করিলাম আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা রাজধর্ম্ম পাল[illegible] করিয়া, অক্ষয় সুখে চিরজীবন অতিবাহি[illegible] কর।"

মন্ত্রী তাহাদের উভয়কে লইয়া সম্মু[illegible] সিংহাসনে বসাইলেন। মহারাণা পুনর[illegible] রতনসিংহ ও যমুনার হস্ত ধরিয়া কহিলেন,—

"পুত্রাধিক প্রিয়তম সুহৃদ! স্বর্গীয় জয়ম[illegible] সিংহের নাম আমার হৃদয়ে জলন্ত অক্ষ[illegible] লিখিত আছে। তোমার সুখ দেখিয়া যাই মনে বাসনা ছিল। অদ্য দেবলবর-রাজ-তন[illegible] যমুনার সহিত তোমার বিবাহ হইল এ[illegible] গোগণ্ডা-দুর্গাধীন প্রদেশ তোমার হইল প্রার্থনা করি, তুমি ভার্য্যাসহ, অমরের সহি[illegible] চিরসৌহৃদ্যে বদ্ধ থাকিয়া, পরম সুখে কালযাপ[illegible] কর।"

মন্ত্রী তাঁহাদের হস্ত ধারণ করিয়া অপ[illegible] সিংহাসনে বসাইলেন। মিবারের নাকা[illegible] বাদিত হইল। অমরসিংহের মস্তকে শ্বেতচ্ছ[illegible] উত্থিত হইল; সম্মুখে লোহিত কেতন উড্ডী[illegible] হইল। প্রধানগণ জয়ধ্বনি করিয়া অম[illegible] সিংহকে সম্মান জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু উৎস[illegible] নিরানন্দ। অমরের চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে প্রতাপসিংহের শরীরের অবস্থা আরও মন্দ তিনি ধীরে ধীরে আবার বলিলেন,—

"পুত্র! কাঁদিতেছ কেন? জগতে কাহা[illegible] জীবন চিরস্থায়ী হয়? জন্ম ও মৃত্যু বিধাতা

ভাবী নিয়ম। রোদন সংবরণ কর। ার আর অধিক বিলম্ব নাই। এই অল্প য়ের মধ্যে আমি যে দুই একটী কথা বলি, া মনোযোগ দিয়া শুন।" অমরের চক্ষু দিয়া রও জল পড়িতে লাগিল। প্রতাপসিংহ বার কহিতে লাগিলেন,—

"বৎস! মৃত্যু তাদৃশ দুঃখের বিষয় নহে। ারে কীর্ত্তি, যশ, গৌরব ও মানশূন্য হওয়ার পক্ষা মৃত্যু দুঃখের কথা নহে। আমার ইত্ত দুঃখ নিষ্প্রয়োজন। আমি যদিও দুঃখী , যদিও আমার অদৃষ্টে, এ জীবনে সুখের মলন ঘটে নাই, তথাপি আমার মনে যে মলানন্দ আছে সমস্ত পৃথিবীর সাম্রাজ্য ার নিকট অতি তুচ্ছ। আমি যে অন্যান্য জপুত জাতির ন্যায়, মুসলমান সমীপে স্বীয় তীয় গৌরব হারাই নাই, তাহাই আমার ন সুখের মূল। প্রিয়তম! এ সংসারে যে ক গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মরিতে পারে সেই । আমার বড় ভয় বৎস, তোমার দ্বারা বুঝি আমাদের এ গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। ণাধিক! এই মৃত্যু-শয্যায় শয়ান হইয়া দি-জনিত কোন ক্লেশেই আমি কাতর হই-ছি না। কেবল এক ভাবনা, এক চিন্তা, ব বিষয় আমার চিত্তকে আকুলিত করিয়া াখিয়াছে। বুঝি মিবার, এতকালের পর গৌরব শূন্য হইবে, ইহাই সেই গুরুতর চিন্তা। ই চিন্তায় আমি উন্মত্তের ন্যায় অস্থির হইয়া তেছি। সুহৃদ্গণ, এ অভাগা চিরজীবন দুঃখী। যদি সে এখনও বুঝিয়া যাইতে পারে য, তাহার অভাবে মিবারের গৌরব অপচিত হইবে না, তাহা হইলে এ চিরদুর্ভাগা মৃত্যুকালে রম সুখ ভোগ করে।"

গলদশ্রু লোচনে শৈলম্বর-রাজ নিকটস্থ ইয়া মহারাণার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—

"দেব! আমি ভবদীয় চরণ স্পর্শ করিয়া ও ভবানীর নাম স্মরণ করিয়া, সর্ব্ব সমক্ষে শপথ করিতেছি, আমি জীবিত থাকিতে নবীন মিবারেশ্বরকে কখনই কলঙ্কিত হইতে দিব না।" সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত বীরবৃন্দ হুঙ্কার ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—

"ঐ—কথা, ঐ—কথা, ঐ—কথা।"

কুমার রত্নসিংহ মহারাণার চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া কহিলেন,—"ইষ্টদেবের নাম ভুলিলেও, এ জীবন যাঁহার অনুগ্রহে রক্ষিত তাহার শেষ বাসনা কদাপি ভুলিব না।"

পিতৃ-চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া অমরসিংহ কহিলেন,—

"পিতৃদেব! জগতে যাহা কিছু পবিত্র তৎসমস্ত স্মরণ করিয়া কহিতেছি, এ দাস জীবিত থাকিতে, মিবার কখনই গৌরব হারাইবেন না।"

ব্যাধি-বিকলিত প্রতাপসিংহের বদনে আবার হাস্যের আবির্ভাব হইল। তিনি কহিলেন,—

"কি আনন্দ—এ আনন্দের তুলনা নাই। কিন্তু আমি হতভাগ্য। আমার অদৃষ্টে এ আনন্দ অধিক দিন ভোগ করা ঘটিল না; মিবার আমাকে বিদায় দাও—বীরগণ আমার আর বিলম্ব নাই।"

অমর ও রতন নিকটস্থ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বীরগণের নেত্র হইতে জল নিঃসৃত হইতে লাগিল। প্রতাপ আবার কহিলেন,—

"কাঁদিও না—মিবারের হিতচেষ্টা কর।" প্রতাপ এক হস্তে অমরের অপর হস্তে রতনের হস্ত ধারণ করিলেন। আর কথা বাহিরিল না। সকলে দেখিলেন, প্রতাপের বদনে অন্তিম লক্ষণ সমস্ত দেখা দিয়াছে। আর বিলম্ব নাই।

অমরের হস্ত ধারণ করিয়া প্রতাপ বীরগণের প্রতি নেত্রপাত করিলেন। সকলেই কহিলেন,—

"আমরা কদাপি মিবারের রাজচ্ছত্রের বাধী হইব না।"

তাহার পর ধীরে ধীরে প্রতাপসিংহের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। যাঁহার বীরত্ব অতুলনীয়, দেশানুরাগ অপরিমেয়, অধ্যবসায় বিস্ময়কর, সহিষ্ণুতা অপরিসীম, তেজ অমানুষী, সাহস ও শক্তি অচিন্তনীয় সেই পরম পুণ্যাত্মা প্রতাপসিংহের প্রাণ অদ্য অনন্ত সময় সমুদ্রে বিলীন হইয়া গেল। কঠোর কাল অকালে সেই প্রকাণ্ড মহীরুহ পাতিত করিয়া দিল—প্রতাপ-দিবাকর খসিয়া পড়িল—ঘোর বিষাদান্ধকারে বসুধা সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

প্রতাপ বিগতজীব হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সে পবিত্র স্মৃতি, বিলোপ করে, কাহার সাধ্য? কালের ক্ষমতা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে অক্ষম। যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে যতদিন ধরণী মানবের নিবাসভূমি থাকিবে যতদিন মানব হৃদয়হীন পশুবৎ না হইবে ততদিন পুণ্যশীল সাধু প্রতাপসিংহের পুণ্যময় নাম সর্ব্বত্র সমাদৃত ও সম্পূজিত হইতে থাকিবে।

সমাপ্ত।